Special Thanks to Partho Kumer Nonda Who created the file.....
and also thanks the group and group members of BCS All Books PDF 2020.....
#stay home, save life.....

st in the
heologian
sh theolo-

an period
ind clergy

আসুন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই বক্তব্যকে
ভুল প্রমাণ করি :

'আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; আড়ম্বর করি, কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি, তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি, তাহা পালন করি না; ভূরিপরিমাণ বাক্যরচনা করিতে পারি, তিলপরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না; আমরা অহংকার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতা সাভের চেষ্টা করি না; আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি, অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি; পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিক্স এবং নিজের বাক্‌চাতুর্যে নিজের প্রতি ভক্তি-বিহ্বল হইয়া উঠাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য।'

'হাতির লেজ হওয়ার চেয়ে স্বাধীন পিঁপড়া হওয়া শ্রেয়।' –সৌমিত্র শেখর

সূচিপত্র

বাঙালি ও বাংলা ভাষা

বিশ্বায়নকৃত জাতি নিয়ে
সাধারণ আলোচনা ২৩
জাতি-বিষয়ক জিজ্ঞাসা ২৫
লিপি-বিষয়ক জিজ্ঞাসা ২৬
ভাষা-বিষয়ক জিজ্ঞাসা ২৭
বাংলা ভাষা : সংজ্ঞার্থ ও স্থান ৩১
ভাষাচিত্র ৩২

বাংলা ব্যাকরণ
সাধারণ আলোচনা ৩৬
ধ্বনি ও বর্ণ ৩৭
যুক্তব্যঞ্জন বিশ্লেষণ ৪০
ধ্বনি পরিবর্তন ৪২
ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান ৪৬
সন্ধি ৪৭
লৈঙ্গিক শব্দ ৫১
বচন ৫৪
উপসর্গ ৫৫
প্রত্যয় ৫৭
কারক ৬০
সমাস ৭৭
অব্যয়ীভাব সমাস ৭৭
তৎপুরুষ সমাস ৭৯
দ্বিগু সমাস ৮২
কর্মধারয় সমাস ৮২
দ্বন্দ্ব সমাস ৮৫
বহুব্রীহি সমাস ৮৬
অন্যান্য সমাস ৮৮
শব্দ ৮৯
উৎপত্তিগত দিক ৯০
গঠনগত দিক ৯৪
অর্থগত দিক ৯৪
দ্বিরুক্ত শব্দ / ধ্বন্যাত্মক শব্দ ৯৫
শব্দের শুদ্ধরূপ ৯৬
পদ-প্রকরণ ১০২
পদ এবং Parts of Speech: সম্পর্ক ১০৬
বিশেষ্য-উদাহরণ ১০৭
সর্বনাম-উদাহরণ ১০৭
নাম-বিশেষণ-উদাহরণ ১০৭
ভাব-বিশেষণ-উদাহরণ ১০৮
ক্রিয়া-উদাহরণ ১০৮
পদাশ্রয়ী অব্যয়-উদাহরণ ১১০
সংযোজক অব্যয়-উদাহরণ ১১০
অনন্বয়ী অব্যয়-উদাহরণ ১১০
বাক্য-প্রকরণ ১১১
যতি বা ছেদচিহ্ন ১১৪
সমার্থক ও প্রতিশব্দ ১১৬
বিপরীতার্থক শব্দ ১১৯
প্রায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ ১২৪
অশুদ্ধ বাক্য শুদ্ধকরণ ১৫৫
সংক্ষেপে বাক্যশুদ্ধি ১৫৯
বানানের নিয়ম ১৬০

বাংলা-বিদ্যার অন্যান্য শৃঙ্খলা
ভাষাবিজ্ঞান
পরিচয় ১৬৪
ধ্বনিতত্ত্ব ১৭১
রূপতত্ত্ব ১৭৩
বাক্যতত্ত্ব ১৭৪
শব্দার্থতত্ত্ব ১৭৬
ছন্দ-প্রকরণ ১৭৮
অলঙ্কার শোভন ১৮১

Special Thanks to Partho Kumer Nonda Who created the file.....
and also thanks the group and group members of BCS All Books PDF 2020.....
#stay home, save life.....

Scanned with CamScanner

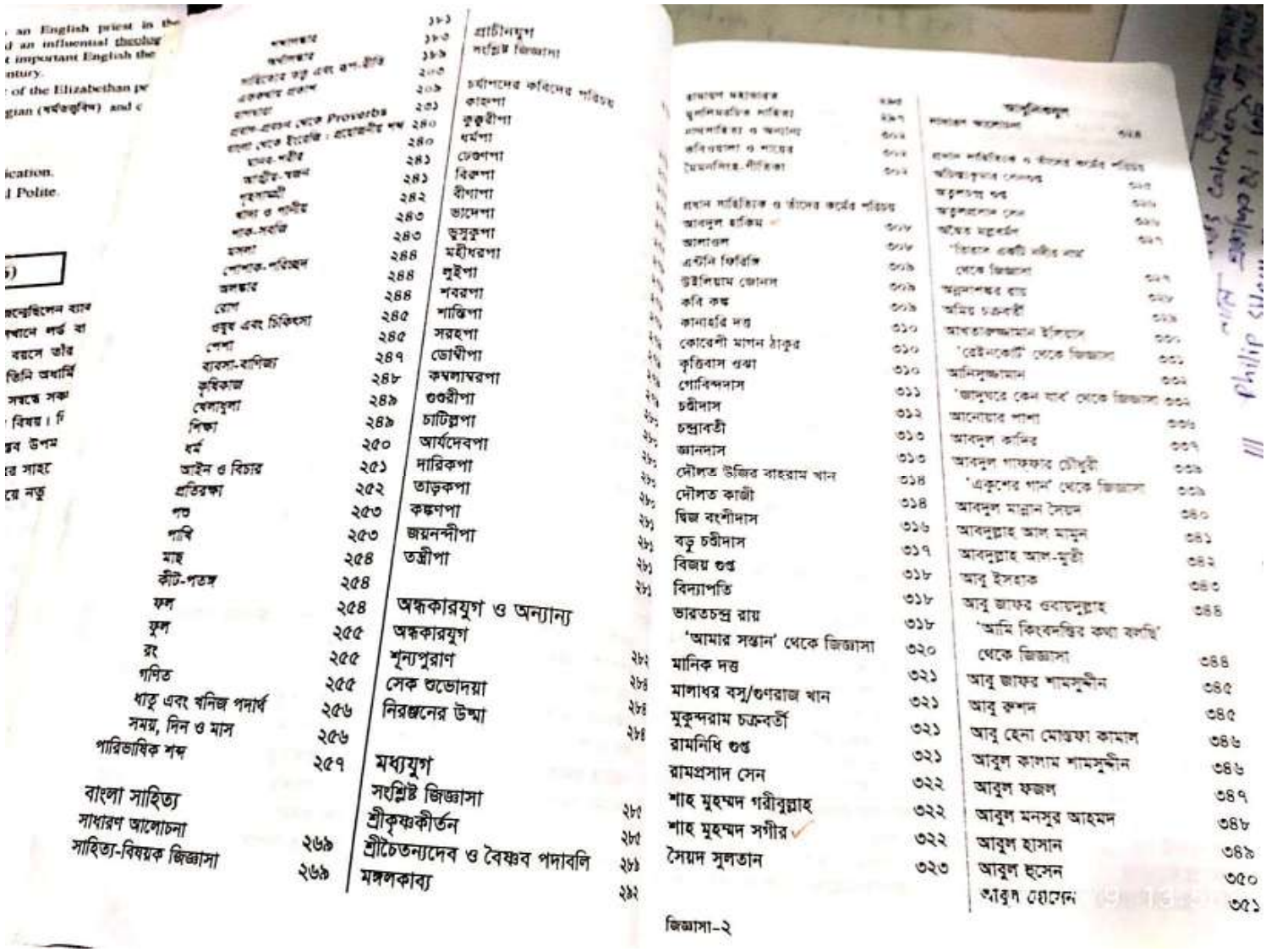

বাংলা সাহিত্য
সাধারণ আলোচনা
সাহিত্য-বিষয়ক জিজ্ঞাসা ২৬৯
২৬৯

প্রাচীনযুগ
সংশ্লিষ্ট জিজ্ঞাসা
চর্যাপদের কবিদের পরিচয়
কাহ্নপা
কুক্কুরীপা
ধর্মপা
ঢেণ্ডণপা
বিরূপা
বীণাপা
ভাদেপা
ভুসুকুপা
মহীধরপা
লুইপা
শবরপা
শান্তিপা
সরহপা
ডোম্বীপা
কম্বলাম্বরপা
গুণ্ডরীপা
চাটিল্লপা
আর্যদেবপা
দারিকপা
তাড়কপা
কঙ্কণপা
জয়নন্দীপা
তন্ত্রীপা

অন্ধকারযুগ ও অন্যান্য
অন্ধকারযুগ
শূন্যপুরাণ
সেক শুভোদয়া
নিরঞ্জনের উষ্মা

মধ্যযুগ
সংশ্লিষ্ট জিজ্ঞাসা
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
শ্রীচৈতন্যদেব ও বৈষ্ণব পদাবলি
মঙ্গলকাব্য

আবদুল হাকিম
আলাওল
এন্টনি ফিরিঙ্গি
উইলিয়াম জোন্স
কবি কঙ্ক
কানাহরি দত্ত
কোরেশী মাগন ঠাকুর
কৃত্তিবাস ওঝা
গোবিন্দদাস
চণ্ডীদাস
চন্দ্রাবতী
জ্ঞানদাস
দৌলত উজির বাহরাম খান
দৌলত কাজী
দ্বিজ বংশীদাস
বড়ু চণ্ডীদাস
বিজয় গুপ্ত
বিদ্যাপতি
ভারতচন্দ্র রায়
'আমার সন্তান' থেকে জিজ্ঞাসা
মানিক দত্ত
মালাধর বসু/গুণরাজ খান
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
রামনিধি গুপ্ত
রামপ্রসাদ সেন
শাহ মুহম্মদ গরীবুল্লাহ
শাহ মুহম্মদ সগীর
সৈয়দ সুলতান

আধুনিকযুগ
'হিজল একটি নদীর নাম' থেকে জিজ্ঞাসা
'রেইনকোট' থেকে জিজ্ঞাসা
'জাদুঘরে কেন মার্ব' থেকে জিজ্ঞাসা
'একুশের গান' থেকে জিজ্ঞাসা
'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' থেকে জিজ্ঞাসা
আবু জাফর শামসুদ্দীন
আবু রুশদ
আবু হেনা মোস্তফা কামাল
আবুল কালাম শামসুদ্দীন
আবুল ফজল
আবুল মনসুর আহমদ
আবুল হাসান
আবুল হুসেন

Special Thanks to Partho Kumer Nonda Who created the file.....
and also thanks the group and group members of BCS All Books PDF 2020.....
#stay home, save life.....

Scanned with CamScanner

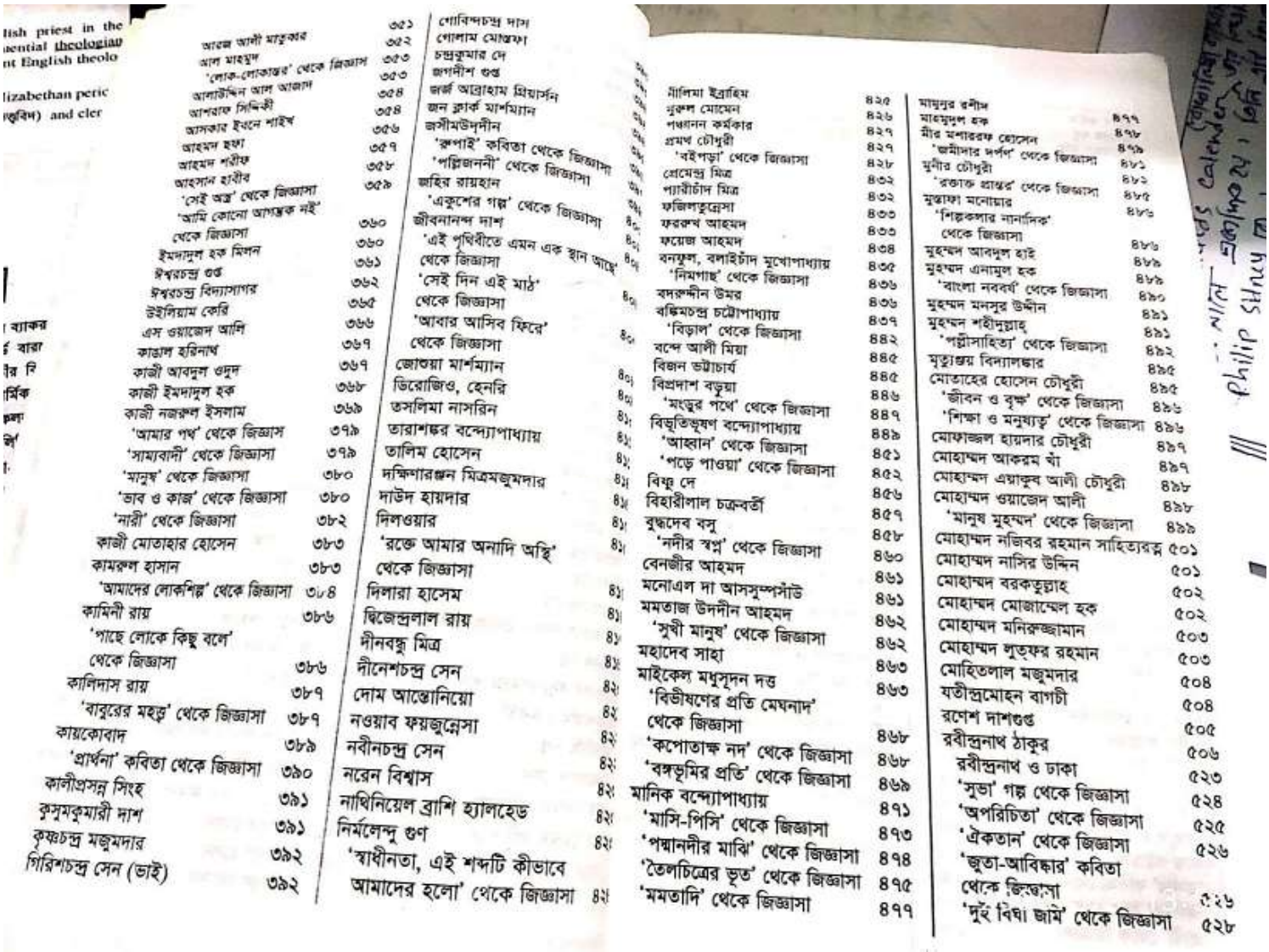

আরজ আলী মাতুব্বর ৩৫১
আল মাহমুদ ৩৫২
'লোক-লোকান্তর' থেকে জিজ্ঞাসা ৩৫৩
আবাউদ্দিন আল আজাদ ৩৫৪
আশরাফ সিদ্দিকী ৩৫৪
আসকার ইবনে শাইখ ৩৫৬
আহমদ ছফা ৩৫৭
আহমদ শরীফ ৩৫৮
আহসান হাবীব ৩৫৯
'সেই অস্ত্র' থেকে জিজ্ঞাসা
'আমি কোনো আগন্তুক নই'
থেকে জিজ্ঞাসা ৩৬০
ইমদাদুল হক মিলন ৩৬০
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ৩৬১
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৩৬২
উইলিয়াম কেরি ৩৬৫
এস ওয়াজেদ আলি ৩৬৬
কাঙাল হরিনাথ ৩৬৭
কাজী আবদুল ওদুদ ৩৬৭
কাজী ইমদাদুল হক ৩৬৮
কাজী নজরুল ইসলাম ৩৬৯
'আমার পথ' থেকে জিজ্ঞাস ৩৭৯
'সাম্যবাদী' থেকে জিজ্ঞাসা ৩৭৯
'মানুষ' থেকে জিজ্ঞাসা ৩৮০
'ভাব ও কাজ' থেকে জিজ্ঞাসা ৩৮০
'নারী' থেকে জিজ্ঞাসা ৩৮২
কাজী মোতাহার হোসেন ৩৮৩
কামরুল হাসান ৩৮৩
'আমাদের লোকশিল্প' থেকে জিজ্ঞাসা ৩৮৪
কামিনী রায় ৩৮৬
'গাছে লোকে কিছু বলে'
থেকে জিজ্ঞাসা ৩৮৬
কালিদাস রায় ৩৮৭
'বাবুরের মহত্ত্ব' থেকে জিজ্ঞাসা ৩৮৭
কায়কোবাদ ৩৮৯
'প্রার্থনা' কবিতা থেকে জিজ্ঞাসা ৩৯০
কালীপ্রসন্ন সিংহ ৩৯১
কুসুমকুমারী দাশ ৩৯১
কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ৩৯২
গিরিশচন্দ্র সেন (ভাই) ৩৯২
গোবিন্দচন্দ্র দাস
গোলাম মোস্তফা
চন্দ্রকুমার দে
জগদীশ গুপ্ত
জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন
জন ক্লার্ক মার্শম্যান
জসীমউদ্দীন
'রূপাই' কবিতা থেকে জিজ্ঞাসা
'পল্লিজননী' থেকে জিজ্ঞাসা
জহির রায়হান
'একুশের গল্প' থেকে জিজ্ঞাসা
জীবনানন্দ দাশ
'এই পৃথিবীতে এমন এক স্থান আছে'
থেকে জিজ্ঞাসা
'সেই দিন এই মাঠ'
থেকে জিজ্ঞাসা
'আবার আসিব ফিরে'
থেকে জিজ্ঞাসা
জোশুয়া মার্শম্যান
ডিরোজিও, হেনরি
তসলিমা নাসরিন
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
তালিম হোসেন
দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার
দাউদ হায়দার
দিলওয়ার
'রক্তে আমার অনাদি অস্থি'
থেকে জিজ্ঞাসা
দিলারা হাসেম
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
দীনবন্ধু মিত্র
দীনেশচন্দ্র সেন
দোম আন্তোনিয়ো
নওয়াব ফয়জুন্নেসা
নবীনচন্দ্র সেন
নরেন বিশ্বাস
নাথিনিয়েল ব্রাশি হ্যালহেড
নির্মলেন্দু গুণ
'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে
আমাদের হলো' থেকে জিজ্ঞাসা
নীলিমা ইব্রাহিম
নূরুল মোমেন
পঞ্চানন কর্মকার
প্রমথ চৌধুরী
'বইপড়া' থেকে জিজ্ঞাসা
প্রেমেন্দ্র মিত্র
প্যারীচাঁদ মিত্র
ফজিলতুন্নেসা
ফররুখ আহমদ
ফয়েজ আহমদ
বনফুল, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
'নিমগাছ' থেকে জিজ্ঞাসা
বদরুদ্দীন উমর
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
'বিড়াল' থেকে জিজ্ঞাসা
বন্দে আলী মিয়া
বিজন ভট্টাচার্য
বিপ্রদাশ বড়ুয়া
'মংডুর পথে' থেকে জিজ্ঞাসা
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
'আহ্বান' থেকে জিজ্ঞাসা
'পড়ে পাওয়া' থেকে জিজ্ঞাসা
বিষ্ণু দে
বিহারীলাল চক্রবর্তী
বুদ্ধদেব বসু
'নদীর স্বপ্ন' থেকে জিজ্ঞাসা
বেনজীর আহমদ
মনোএল দা আসসুম্পসাঁউ
মমতাজ উদদীন আহমদ
'সুখী মানুষ' থেকে জিজ্ঞাসা
মহাদেব সাহা
মাইকেল মধুসূদন দত্ত
'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ'
থেকে জিজ্ঞাসা
'কপোতাক্ষ নদ' থেকে জিজ্ঞাসা
'বঙ্গভূমির প্রতি' থেকে জিজ্ঞাসা
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
'মাসি-পিসি' থেকে জিজ্ঞাসা
'পদ্মানদীর মাঝি' থেকে জিজ্ঞাসা
'তৈলচিত্রের ভূত' থেকে জিজ্ঞাসা
'মমতাদি' থেকে জিজ্ঞাসা
মামুনুর রশীদ
মাহমুদুল হক
মীর মশাররফ হোসেন
'জমীদার দর্পণ' থেকে জিজ্ঞাসা
মুনীর চৌধুরী
'রক্তাক্ত প্রান্তর' থেকে জিজ্ঞাসা
মুস্তাফা মনোয়ার
'শিল্পকলার নানাদিক'
থেকে জিজ্ঞাসা
মুহম্মদ আবদুল হাই
মুহম্মদ এনামুল হক
'বাংলা নববর্ষ' থেকে জিজ্ঞাসা
মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
'পল্লীসাহিত্য' থেকে জিজ্ঞাসা
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
মোতাহের হোসেন চৌধুরী
'জীবন ও বৃক্ষ' থেকে জিজ্ঞাসা
'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' থেকে জিজ্ঞাসা
মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী
মোহাম্মদ আকরম খাঁ
মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী
মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী
'মানুষ মুহম্মদ' থেকে জিজ্ঞাসা
মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন
মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন
মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ
মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
মোহাম্মদ লুতফর রহমান
মোহিতলাল মজুমদার
যতীন্দ্রমোহন বাগচী
রণেশ দাশগুপ্ত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রবীন্দ্রনাথ ও ঢাকা
'সুভা' গল্প থেকে জিজ্ঞাসা
'অপরিচিতা' থেকে জিজ্ঞাসা
'ঐকতান' থেকে জিজ্ঞাসা
'জুতা-আবিষ্কার' কবিতা
থেকে জিজ্ঞাসা
'দুই বিঘা জমি' থেকে জিজ্ঞাসা

Special Thanks to Partho Kumer Nonda Who created the file.....
and also thanks the group and group members of BCS All Books PDF 2020.....
#stay home, save life.....

Scanned with CamScanner

ফরীদ কবীম ৫৩০
রামরাম বসু ৫৩০
রামমোহন রায় ৫৩১
লুৎফ মুহম্মদ শহিদুল্লাহ ৫৩২
রোকনুজ্জামান খান (দাদাভাই) ৫৩৩
রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ৫৩৩
'চাষার দুক্খু' থেকে জিজ্ঞাসা ৫৩৪
লালন সাঁই ৫৩৫
'মানবধর্ম' থেকে জিজ্ঞাসা ৫৩৬
শওকত আলী ৫৩৭
শওকত ওসমান ৫৩৮
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৫৪১
'অতিথির স্মৃতি' থেকে জিজ্ঞাসা ৫৪৬
শহীদ কাদরী ৫৪৭
শহীদুল জহির ৫৪৮
শহীদুল্লা কায়সার ৫৪৮
শামসুজ্জামান খান ৫৫০
'বাংলা নববর্ষ' থেকে জিজ্ঞাসা ৫৫১
শামসুদ্দীন আবুল কালাম ৫৫৪
শামসুর রাহমান ৫৫৬
'ফেব্রুয়ারি : ১৯৬৯' থেকে জিজ্ঞাসা ৫৫৭
'তোমাকে পাওয়ার জন্য
হে স্বাধীনতা' থেকে জিজ্ঞাসা ৫৫৮
শাহ্ আবদুল করিম ৫৫৯
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৫৬০
'পালামৌ' থেকে জিজ্ঞাসা ৫৬১
সতীনাথ ভাদুড়ী ৫৬৬
সত্যেন সেন ৫৬৭
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ৫৬৮
'ঝর্ণার গান' থেকে জিজ্ঞাসা ৫৬৯
সমর সেন ৫৬৯
সমরেশ বসু ৫৭০
সরদার জয়েনউদ্দীন ৫৭১
সাঈদ আহমেদ ৫৭১
সানাউল হক ৫৭২
সিকান্দার আবু জাফর ৫৭২
'আশা' কবিতা থেকে জিজ্ঞাসা ৫৭৪
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ৫৭৫
সুকান্ত ভট্টাচার্য ৫৭৫
'রানার' কবিতা থেকে জিজ্ঞাসা ৫৭৬
'আঠারো বছর বয়স' থেকে জিজ্ঞাসা ৫৭৭
'প্রার্থী' থেকে জিজ্ঞাসা ৫৭৮
সুকুমার রায় ৫৭৯
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ৫৭৯
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৫৮০
সুফিয়া কামাল ৫৮১
'তাহারেই পড়ে মনে' থেকে জিজ্ঞাসা ৫৮১
'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা'
থেকে জিজ্ঞাসা ৫৮২
সেলিনা হোসেন ৫৮৩
সেলিম আল দীন ৫৮৪
সৈয়দ আলী আহসান ৫৮৪
সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী ৫৮৬
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ৫৮৬
সৈয়দ মুজতবা আলী ৫৮৭
'প্রবাস বন্ধু' গল্প থেকে জিজ্ঞাসা ৫৯১
সৈয়দ শামসুল হক ৫৯২
'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে'
থেকে জিজ্ঞাসা ৫৯৩
'আমার পরিচয়' থেকে জিজ্ঞাসা ৫৯৭
সোমেন চন্দ ৬০১
স্বর্ণকুমারী দেবী ৬০২
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৬০২
হাসান আজিজুল হক ৬০৩
হাসান হাফিজুর রহমান ৬০৯
হুমায়ুন আজাদ ৬০৯
'বাঙলা শব্দ' থেকে জিজ্ঞাসা ৬০৯
হুমায়ুন কবির ৬০৯
হুমায়ুন আহমেদ ৬০৯
'নিয়তি' গল্প থেকে জিজ্ঞাসা ৬০৯
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৬০৯

বাংলা ভাষার সাহিত্যিকদের ছদ্মনাম ৬১৩
বাংলা পত্র-পত্রিকা ৬১৫
বাংলা গানের ইতিহাস ৬২৩
'বাংলা একাডেমি' ও একুশে বইমেলা
সংক্রান্ত তথ্যাবলি ৬৪৩
ভাষাশহিদ দিবস ও
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ৬৪৫
খনার বচন ৬৬৩
সংখ্যাসূচক বাংলাজ্ঞান ৬৭৩

Scanned with CamScanner

r was an English
nd and an influential
e most important Eng
nth century.
writer of the Eliza
theologian (ধর্মতত্ত্ব

Justification.
astical Polite

1606)
কার। জন্ম
ান। সেখ
বছর
এ গ্রন্থে
য়েদের
লক্ষণ
ত
ক্ট
ি

বাংলা ভাষার প্রাচীনতম গ্রন্থ চর্যাপদ-এর মুদ্রণচিত্র নমুনা
উল্লিখিত পদটি বিকল্পে মুদ্রিত

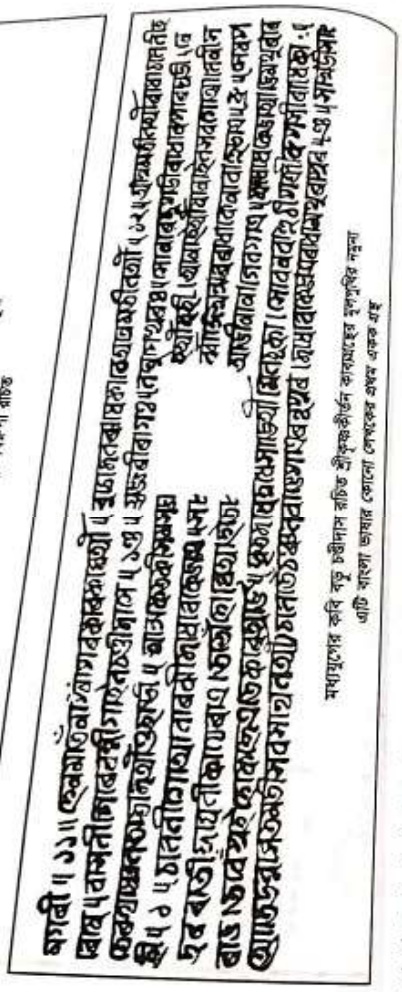

মধ্যযুগের কবি বড়ু চণ্ডীদাস রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যগ্রন্থের মুদ্রণচিত্র নমুনা
এটি বাংলা ভাষার কোনো লেখকের প্রথম একক গ্রন্থ

বাঙালি ও বাংলা ভাষা

বিশ্বায়নকৃত জাতি নিয়ে সাধারণ আলোচনা

পৃথিবীতে কবেঃ জাতি বলেছে ঠিকঠাক বলা মুশকিল। তবে বিশ্বায়নের কারণে ধীরে ধীরে জাতিসত্তার পরিচায়ি যে পরিবর্তমান, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশ্বায়নের কথা এলেই আমরা শুধু আধুনিক এ-সময়ের পরিবর্তনকেই মনে করি। কিন্তু আমরা ভুলে যাই, বাঙালি জাতিই প্রথম বিশ্বায়নের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। বিভিন্ন জাতের মানুষ একত্রিত হয়েই বাঙালির সৃষ্টি হয়েছে। আমরা এতোদিন অবশ্য বলেছি : 'বাঙালি সংকর জাতি।' এটি খুবই সাদামাটা পরিচয়। আমরা বরং বলবো, বাঙালি বিশ্বায়নকৃত জাতিঃ সম্ভবত মানবদেহ ও সংস্কৃতিতে প্রথম বিশ্বায়নের দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে বাঙালিরা। বাঙালির শরীরদেহেতো বটেই, তার ভাষাদেহ, সংস্কৃতিদেহ, পরিমণ্ডলদেহ সবকিছুতেই এই প্রথম বিশ্বায়নের ছাপ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে বহিরাগত জনগোষ্ঠীর শারীরিক ও সাংস্কৃতিক সম্মিলনে আজকের বাঙালি জাতি গড়ে উঠেছে। জনতত্ত্বের সাক্ষ্য অনুসারে এই অঞ্চলে প্রথম আসে খর্বকায় নিগ্রোপ্রতিম মানুষ। আফ্রিকা থেকে আরব উপদ্বীপ অতিক্রম করে পারস্য উপকূল বেয়ে ধীরে ধীরে এই মানুষেরা বর্তমান ভূখণ্ডে বসতি স্থাপন করে। এরপর আসে অস্ট্রিকরা। অস্ট্রিকদের পর দ্রাবিড় ভাগী মানুষ। প্রাক-ঐতিহাসিককালেই আসে নর্ডিক ও মোঙ্গলরা। বলা হয়, এরাই প্রাক-ঐতিহাসিককালে সর্বশেষ জনধারা, যারা এ অঞ্চলে আসে। আর ঐতিহাসিককালে এসেছে পারসিক, মেসিডোনীয়, গ্রিক, শক, হুন, তুর্কি, আফগান, মোগল, ইংরেজ, পাকিস্তানিরা। এই জনধারার মিশ্রণ এখনও অব্যাহত আছে, তবে অন্যভাবে। খ্রিষ্টের জন্মের তিন হাজার বছর আগে প্রথম বেদ সংকলন করা হয় এবং ঋক বেদে প্রথম বঙ্গ কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায় বলে সুকুমার সেন উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া মহাভারত ও মৎস্যপুরাণে বলি রাজার পাঁচ পুত্রের নাম বর্ণনা করা হয়েছে এই বলেঃ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র। এদেরকে আর্য ও অনার্য দুই শ্রেণির মানুষের কথা বিবেচনা করা হয়। দীর্ঘ কায়, গৌর বর্ণ, উন্নত নাসিকা, পাতলা ঠোঁট, সরল চোখ বিশিষ্ট মানুষ আর্য এবং এর বিপরীত বৈশিষ্ট্যের মানুষকে অনার্য বলা হয়। বাঙালির দেহ গড়ে উঠেছে উভয়ের মিশ্রণে।

এই উপমহাদেশে আর্যভাষার যে প্রাচীনতম বর্ণমালার সন্ধান পাওয়া যায় তা খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে অশোকের অনুশাসনের সময় বহুস্থান মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত লিপির সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে। এই লিপিকে ব্রাহ্মী লিপি বলা হয়। ব্রাহ্মী লিপি কুষাণ ও গুপ্ত রাজাদের আমলে পরিবর্তিত হয়ে তিনটি রূপ ধারণ করে। এর একটি কুটিল রূপ। বাংলা লিপি ব্রাহ্মী লিপির এই কুটিল রূপ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। অনেকে একে কুটিল লিপি, কেউ কেউ অশোক লিপি বলেন। সে লিক থেকে সুখের বিষয় এই যে, বাংলা ভাষা ও বাংলা লিপির সৃষ্টিকাল মোটামুটি কাছাকাছি। শুরু থেকেই বাংলা ভাষা বাংলা লিপি দিয়ে লিখিত হতো। ভাষাকে ভিত্তিকে করেই গড়ে উঠেছে এক-একটি জাতি বা উপজাতি। যেমন, বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বাঙালি জাতি। কিন্তু নামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক বা অন্য কোনো কারণে কোনো জাতি যখন তার নিজস্ব ভাষাকে বর্জন ও পর ভাষাকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়, তখন সে তার জাতিসত্তাকেই ক্রমে ক্রমে হারিয়ে ফেলে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মিশর বা ইজিপ্টের সভ্যতা যেমন প্রাচীন ছিল, তেমনি মিশরীয়রাও ছিল এক প্রাচীন জাতি। ৪০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের প্রাচীন মিশরীয় ভাষার নিদর্শন পাওয়া গেছে। তৃতীয় শতাব্দীতে প্রাচীন মিশরীয় ভাষা থেকে আধুনিক মিশরীয় ভাষা কপ্‌টিক (Coptic) উদ্ভূত হয়। ষোড়শ শতাব্দী অবধি মিশরবাসী এই ভাষাতেই কথা বলত এবং মিশরীয়দের জাতি-পরিচয়ও বজায় ছিল। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে ইসলাম ধর্মাবলম্বী আরব-জাতির মিশরে অনুপ্রবেশের ফলে সমস্ত মিশরবাসী আরবি ভাষা গ্রহণ করে।

Scanned with CamScanner

ফলে ক্রমে ক্রমে তারা আরব জাতিপরিচয়ে বিশ্বে পরিচিত হয়ে যায়।

ভাষার নিয়মই হলো এই যে, কোনো একটি ভাষা লুপ্ত হয়ে গেলে সেই ভাষাভাষীদের প্রাতিস্বিক পরিচয়ও ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হয়ে যায়। সেই ভাষাভাষীরা যে পৃথক ভাষা গ্রহণ করে, সেই ভাষার জাতি-পরিচয়েই ক্রমে ক্রমে তারা পরিচিত হয়। তেমনি কোনো এক ভাষা যখন অন্য কোনো ভাষায় রূপান্তরিত হয়, তখন সেই প্রাচীন ভাষাভাষীর জাতি-পরিচয়ও পরিবর্তিত হয়ে যায়।

আর্যভাষী মানুষ ককেশীয় পার্বত্য পথে ভারতে আগমন করে। তাদের ভাষাকে ভাষাবিজ্ঞানীগণ Old Indo-Aryan (O.I.A.) নামে অভিহিত করেছেন। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, এই ভাষারই একটা বিশিষ্ট রূপ দেখা যায় বৈদিক সাহিত্যে। খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দে 'বেদ' সংগৃহীত বলে তিনি মনে করেন। আর্যরা তাদের অগ্রবর্তী যাত্রা সিন্ধু নদের কূল থেকে গঙ্গা-যমুনার কূল পর্যন্ত বিস্তৃত করলে নিজেদের আধিপত্য ও ঔপনিবেশিকতা এবং ভাষার বিস্তার ঘটে। এই বিস্তার মূলত মধ্যভারত পর্যন্ত বিস্তৃত আর্যদের সঙ্গে অনার্যদের ভাষার মিশ্রণের মধ্য দিয়ে হয়ে থাকে। সম্প্রতিকালে অনেক গবেষক মনে করেন যে, আর্যরা আজকের পাশ্চাত্য বা তার চেয়ে দূরবর্তী কোনো দেশ থেকে আসে নি, এসেছে এ অঞ্চলের কাছাকাছি কোনো দেশ থেকে। কেননা, আর্যদের জীবনযাপন ও ভাষা-সংস্কৃতিতে বহুদূর দেশে অবস্থানের পরিচয় নেই। খ্রিষ্টপূর্ব আনুমানিক ৬০০ অব্দের দিকে আর্যরা নিজেদের ভাষা সংস্কারে মনোনিবেশ করে। এই সংস্কারকৃত ভাষাই 'সংস্কৃত' ভাষা নামে পরিচিত। ভাষা হিসেবে **'সংস্কৃত' শব্দটির উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায় মহাকাব্য 'রামায়ণে'।** লোকমুখে চর্চিত হয়ে এই ভাষায় যে সাহিত্য রচিত হয়, তার রূপের সঙ্গে 'বেদ'-এর ভাষার স্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ করা যায়। ফলে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার একটি 'লৌকিক সংস্কৃত' এবং অন্যটি 'বৈদিক সংস্কৃত'—এই দুই রূপের পরিচয় মেলে। তবে একথা সত্য, নিদর্শন পাওয়া এই দুই রূপের বাইরেও আলোচ্য ভাষার একাধিক রূপ অবশ্যই প্রচলিত কোনো পৃথক নিদর্শন পরবর্তীকালে আর পাওয়া যায় নি। ভাষার ক্রমবিবর্তিত এই রূপটিকে 'মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা' বা Middle Indo-Aryan (M.I.A) বলা হয়। খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দ এই হাজার বছর সময় অতিক্রান্ত হয়েছে ভাষার বিবর্তনের এই অধ্যায়। 'মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা'র পর আসে প্রায় দেড় হাজার বছর পিছিয়ে আমাদের এমনি পরিমার্জিত ভাষারূপ পেতে।

'মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা'— যাকে 'প্রাকৃত' ভাষা হিসেবে অভিহিত করা হয়, কালের ধারাবাহিকতায় এর চারটি রূপে বিবর্তন ঘটেছিল। যেমন :

এক. **আদিস্তর** : খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ২০০ অব্দ পর্যন্ত

দুই. **প্রাক-মধ্যস্তর** : খ্রিষ্টপূর্ব ২০০ অব্দ থেকে ২০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত

তিন. **মধ্যস্তর** : ২০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৬০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত

চার. **অন্ত্যস্তর** : ৬০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১০০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত

ভাষার এই আদিস্তরের নিদর্শন মেলে পালি ভাষায় রচিত বৌদ্ধদের বিভিন্ন ধর্মপুস্তকে। তাছাড়া অশোকের কালের শিলালিপি বা উত্তর প্রদেশের যোগীমারা গুহায় প্রাপ্ত 'সুতনুকা' নাট্য শিলালিপিতে এই স্তরের ভাষার নিদর্শন 'উদীচ্যা-প্রাকৃত' বা 'প্রাচ্যা-প্রাকৃত' ভাষায় পাওয়া যাবে। মধ্যস্তরের ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় সংস্কৃত ভাষায় রচিত নাটক ও মহাকাব্যে। এখানে অশিক্ষিত পুরুষ চরিত্রের মুখের ভাষায় 'মাগধী প্রাকৃত', নারীর মুখে 'শৌরসেনী প্রাকৃত', কাব্যদেহের ভাষায় 'মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত' ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ স্থান ও পাত্র ভেদে ভাষারূপের একটি বৈচিত্র্য আমরা লক্ষ করি। এভাবেই ভাষা অন্ত্যস্তরে এসে পৌছে। একে ভাষাতাত্ত্বিকগণ 'গৌড়ী প্রাকৃত' বলেছেন। বাংলা ভাষার প্রকৃত বিকাশ এখান থেকেই। কিন্তু ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে লিখেছেন যে, গৌড়ী প্রাকৃতের পরবর্তী স্তর 'গৌড় অপভ্রংশ' থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি।

উল্লিখিত চারটি [illegible]

'অপভ্রষ্ট'ও বলে। অপভ্রংশ কখনো শৌরসেনী, কখনো মাগধী ইত্যাদি ভাষায় লক্ষ করা গেছে। কোনো কোনো ভাষাবিজ্ঞানী মনে করেন, 'শৌরসেনী অবহট্‌ঠ' এক সময় সমগ্র উত্তর ভারতে শিষ্টজনসম্মত সাহিত্যিক ভাষা রূপে প্রচলিত ছিল। এই অবহট্‌ঠ ভাষা থেকেই আনুমানিক খ্রিষ্টীয় দশম শতকের দিকে নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাসমূহের উদ্ভব ঘটে। ড. সুকুমার সেনের মতে, 'নব্য ভারতীয় আর্যের উদ্ভবের সময় ভাষাগুলির মধ্যে যে সাধারণ লক্ষণ ছিল সেইগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই সময়ের ভাষাগুচ্ছকে একটি বিশিষ্ট ভাষার সন্তান বলিয়া গণ্য করিতে হয়। ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া আলোচনার সুবিধার জন্য এই কাল্পনিক ধাত্রী ভাষাটিকে প্রত্ন নব্য ভারতীয় আর্য (Proto-New Indo-Aryan) বলা হয়। অপভ্রষ্টের দ্বিতীয় বা শেষ স্তর হইল এই প্রত্ন নব্য ভারতীয়।' এইভাবে ভাষা বিবর্তনের মাধ্যমে অগ্রবর্তী হয়। তবে এটা ঠিক, যে অনুমান 'প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা' থেকে অগ্রবর্তী হয়েছে, তা-ই পরবর্তীকালে 'গৌড়ী ভাষা'য় বিবর্তিত হয়। এর নিদর্শন মালবে প্রাপ্ত শিলালিপিতে মেলে। এই ভাষাগুলি থেকে পূর্ব ভারতের অসমিয়া, ওড়িয়া, মৈথিলি, ভোজপুরী, বাংলা ইত্যাদি ভাষার উদ্ভব ঘটে। অতএব এ কথা বলা চলে যে, প্রাচীন আর্য ভাষা থেকে যে ক্রমিক ধারাবাহিকতা চলে এসেছে, উল্লিখিত সে রীতিতেই বৈদিক কথ্যভাষা, মাগধী ও গৌড়ী প্রাকৃত-অপভ্রংশ-অপভ্রষ্ট (অবহট্‌ঠ)—এই স্তর অতিক্রম করে প্রাচীন বাংলা ভাষার উদ্ভব ঘটে। এরপর বাংলা ভাষা প্রায় দেড় হাজার বছর অতিক্রম করে আজকের আধুনিক পর্যায়ে এসে পৌছেছে।

প্রাচীন বাংলা ভাষা থেকে আধুনিক বাংলা ভাষা পর্যন্ত সময়কে নিদর্শনের ওপর ভিত্তি করে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে :

এক. **প্রাচীনযুগের** বাংলা ভাষা (৯৫০-১২০০ খ্রি.)

দুই. **অন্ধকারযুগের** বাংলা ভাষা (১২০১-১৩৫০ খ্রি.)

তিন. **মধ্যযুগের** বাংলা ভাষা (১৩৫১-১৮০০ খ্রি.)

অনেকের মতে ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দের পর বাংলা ভাষায় এসেছে **উত্তর-আধুনিক যুগ**। অবশ্য এই মত সর্বজন স্বীকৃত নয়।

প্রাচীনযুগের বাংলা ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় 'চর্যাপদ' গ্রন্থে। বৌদ্ধদের সাধন-ভজনতত্ত্বসমৃদ্ধ এই গ্রন্থের ভাষাকে ভাষাবিজ্ঞানীরা 'সান্ধ্যভাষা' হিসেবেও চিহ্নিত করেন। এখানে শুধু ভাষায় নয়, বক্তব্যেও আলো-আঁধারি ভাবটি স্পষ্ট। অন্ধকারযুগের কোনো ভাষা-নিদর্শন পাওয়া যায় না। মধ্যযুগের ভাষার উল্লেখ এ দিক দিয়ে প্রচুর। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর ভাষা এবং অন্যান্য পদকারদের রচিত বৈষ্ণব পদাবলিতে ব্রজবুলিমিশ্রিত বাংলা ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়। তাছাড়া অনুবাদসাহিত্যেও বিদেশি শব্দবহুল বাংলা ভাষার প্রমাণ রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ সময় থেকে বাংলা ভাষায় পরিবর্তন দ্রুত ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আধুনিকযুগের বাংলা ভাষা দুটো দিকে আমাদের সামনে পরিদৃষ্ট হয় : এক. কাব্যসাহিত্য, দুই. গদ্যসাহিত্য। কাব্যসাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং গদ্যসাহিত্যে উইলিয়াম কেরি থেকে শুরু করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখের কৃতিত্ব ও কীর্তির মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা আজ আরো পরিশীলিত ও গতিশীলতার দিকে অগ্রসরমান।

জাতি-বিষয়ক জিজ্ঞাসা

প্র : বাঙালির জাতি-গঠন কিরূপ?

উ : বিশ্বায়নকৃত সংকর জাতি।

প্র : কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে বঙ্গ কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায়?

উ : ঋক বেদ, মহাভারত, মৎস্যপুরাণ।

প্র : কোন গ্রন্থে বঙ্গ ও বঙ্গাল এই উভয় শব্দের উল্লেখ আছে?

উ : শামস্-ই-সিরাজ আফিফ লিখিত তারিখ-ই-ফিরোজ শাহি গ্রন্থে।

প্র : আকবরের সুবা-বাঙলা কথাটি কোন শব্দ থেকে সৃষ্টি?

উ : বঙ্গাল শব্দ থেকে সুবা-বাঙলা নামটি গ্রহণ

Scanned with CamScanner

1. Learned Discourse on
2. Of the Laws o

John Ly

প্র : 'আটি হইতে আইল বঙ্গাল লখা লখা মাড়ি।' — এই প্রাচীন পঙ্‌ক্তিটি কোন কাহিনিতে পাওয়া যায়?

উ : ময়নামতি-গোপীচাঁদের কাহিনিতে।

প্র : বাংলাদেশের বিভিন্ন জনপদ কোন সময় পর্যন্ত বিভক্ত ছিল?

উ : খ্রিস্টের জন্মের পর সাতশ বছর পর্যন্ত।

প্র : কার সময়ে বাংলাদেশ সর্বপ্রথম এক রাষ্ট্রীয় ঐক্য লাভ করে?

উ : গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক এবং পরবর্তীকালে পাল আমলে। উল্লেখ্য, 'গৌড়' বাংলাদেশের অখণ্ড জনপদ সত্তার আরেক নাম।

প্র : সম্রাট আকবর এই অখণ্ডসত্তার কী নাম দিয়েছিলেন?

উ : সুবা-বাঙলা।

প্র : এ-সম্পর্কে কোন গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায়?

উ : আইন-ই-আকবরি।

লিপি-বিষয়ক জিজ্ঞাসা

প্র : এই উপমহাদেশে আর্য ভাষার যে প্রাচীনতম বর্ণমালার সন্ধান পাওয়া যায় তা কোন সময়ের?

উ : খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে অশোকের অনুশাসনের সময়।

প্র : মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত লিপির সঙ্গে কোন লিপি সাদৃশ্যপূর্ণ?

উ : অশোকের সময়ের লিপির।

প্র : এই লিপির নাম কী?

উ : ব্রাহ্মী লিপি।

প্র : বাংলা লিপি কোন লিপি থেকে এসেছে?

উ : ব্রাহ্মী লিপি।

প্র : ব্রাহ্মী লিপির কয়টি রূপ দেখা যায়?

উ : তিনটি। সারদা (কাশ্মির ও পাঞ্জাবে প্রচলিত রূপ), নাগর (রাজস্থান ও মালব; গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশে প্রচলিত রূপ), কুটিল (ভারতের পূর্বাঞ্চলে প্রচলিত রূপ)।

প্র : ব্রাহ্মী লিপির কোন রূপ থেকে বাংলা এসেছে?

উ : কুটিল রূপ থেকে।

প্র : কোন সম্রাট তাঁর অধিকাংশ কর্ম ব্রাহ্মী লিপিতে লেখান?

উ : সম্রাট অশোক।

প্র : কখন ব্রাহ্মী লিপিতে কিছু পরিবর্তন আসে?

উ : কুষাণ ও গুপ্ত রাজাদের সময়।

প্র : বাংলা লিপি বা বর্ণ কীভাবে সৃষ্টি?

উ : এই উপমহাদেশে আর্য ভাষার প্রাচীনতম যে বর্ণমালার সন্ধান পাওয়া যায় তা খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের, অশোকের অনুশাসনের সময়ের। নতুবা মহাস্থানগড়ে যে লিপি পাওয়া গেছে তার প্রাপ্ত লিপির সাদৃশ্য আছে। এই লিপিকে ব্রাহ্মী লিপি বলে। ব্রাহ্মী লিপি কুষাণ ও গুপ্ত রাজাদের আমলে পরিবর্তিত হয়ে তিনটি রূপ ধারণ করে। যথা: সারদা (কাশ্মির ও পাঞ্জাবে প্রচলিত রূপ), নাগর (রাজস্থান ও মালব; গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশে প্রচলিত রূপ) ও কুটিল (ভারতের পূর্বাঞ্চলে প্রচলিত রূপ)। বাংলা লিপি ব্রাহ্মী লিপির এই কুটিল রূপ থেকে সৃষ্টি হয়েছে।

প্র : এর নাম কুটিল কেন? আর কোন লিপি এই রূপ থেকে এসেছে?

উ : এর মাত্রা ও বর্ণ কুটিল। কোথাও পূর্ণ, কোথাও অর্ধ, কোথাও মাত্রাহীন এবং বর্ণগুলি বিশেষ করে যুক্তাক্ষরগুলি খুবই জটিল বা কুটিল। বাংলা, অসমিয়া, উড়িয়া, মৈথিলি লিপি ব্রাহ্মী লিপির এই কুটিল রূপ থেকে সৃষ্টি হয়ে প্রায় সহস্র বৎসরে নিজ নিজ বিশিষ্টতা অর্জন করেছে।

প্র : বাংলা লিপির ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে লেখ।

উ : জাপানের হরিয়াজি বৌদ্ধমঠে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর একটি হস্তলিখিত পুথি আছে যেখানে প্রাচ্যলিপির নমুনা পাওয়া যায়। ৭ম শতাব্দীর লিপির প্রমাণ মেলে আদিত্য সেন নামক এক মগধরাজের অনুশাসনকালে। পরে এ অঞ্চলের পালরাজাদের সময় লিপি ক্রমবিবর্তিত হয়ে বাংলা লিপির রূপ পরিগ্রহ করে। ৯ম শতাব্দীতে বাংলাদেশের পালবংশীয় রাজা নারায়ণ পালের তাম্রশাসনে বাংলা লিপির সুস্পষ্টরূপ পরিলক্ষিত হয়। আজকের বাংলা লিপি সেই ধারার পরবর্তী রূপ।

প্র : বাংলা লিপির সুসংগঠন কোন আমলে হয়?

উ : সেন রাজাদের সময়।

প্র : কে বাংলা লিপিকে ছাপাখানায় মুদ্রণযোগ্য করে তৈরি করেন?

উ : ইংরেজ আমলে, পঞ্চানন কর্মকার।

প্র : পঞ্চানন কর্মকার কার কাছ থেকে বাংলা লিপি তৈরির কৌশল শিখেছিলেন?

উ : ইংরেজ কর্মচারী চার্লস উইলকিন্সের মাতামহ ছিলেন ইংল্যান্ডের সুলিপুণ ইংরেজি লিপি তৈরির কারিগর। উইলকিন্স তাঁর মাতামহের কাছ থেকে লিপি তৈরির কৌশল রপ্ত করেছিলেন। তিনি পঞ্চানন কর্মকারকে লিপি তৈরির কৌশল শেখান। পঞ্চানন কর্মকারের পর তাঁর পুত্র ও পৌত্র মিলে প্রায় পঞ্চাশ বছর সুলিপুণতার সঙ্গে বাংলা লিপি তৈরি করে গেছেন।

প্র : উড়িয়া, অসমিয়া ও বাংলা ভাষার লিপির সম্পর্ক কী?

উ : উড়িয়া ও বাংলালিপির উদ্ভব ব্রাহ্মীলিপির কুটিল রূপ থেকে। প্রাচীনকালে কলা পাতাতে লেখার সময় উড়িষ্যার লোহার 'খুন্তি' ব্যবহার করায় প্রথম দিকে পাতা ছিঁড়ে যেত। তাই তারা বর্ণগুলো গোল করে লেখে। আর বাংলাভাষীরা যেহেতু খাগ বা বাঁশের লেখনী ব্যবহার করত সেহেতু তাদের বর্ণের কোনাগুলো অক্ষুণ্ন থাকে। অসমিয়ারা বাংলালিপিতেই লেখে তবে তাদের দু-একটি বর্ণে এখনো মৈথিলি ও বাংলার প্রাচীন রূপ রয়ে গেছে।

ভাষা-বিষয়ক জিজ্ঞাসা

প্র : বাংলা কোন ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত?

উ : ইন্দো-ইউরোপীয়।

প্র : 'ইন্দো-ইউরোপীয়' ভাষা কাকে বলে?

উ : পৃথিবীর সমস্ত ভাষাকে কয়েকটি ভাষাবৃক্ষে বিভক্ত করা হয়। এই ভাষাবৃক্ষগুলোর মূলভাষার একটি ইন্দো-ইউরোপীয়। নামটি কাল্পনিক। ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে ইউরোপ পর্যন্ত মধ্যবর্তী সব ভাষাকে এই মূলভাষা বা ভাষাবংশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ বা মূলভাষাকে প্রধান দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা: কেন্তুম ও শতম। কেন্তুম শাখায় ইউরোপীয় এবং শতম শাখায় ইন্দো-ইরানীয় ভাষাগুলির অবস্থান। বাংলা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের শতম শাখার একটি ভাষা।

প্র : ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকে জাত ভাষা শাখাগুলো কী কী?

উ : পৃথিবীতে শতগুলি ভাষাবংশ বা ভাষাপরিবার আছে, তাদের মধ্যে ইন্দো-ইউরোপীয়ই শ্রেষ্ঠ। অনুমানিক ৫০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে অখিল বর্তমান উরাল পর্বতের পাদদেশে (মতান্তরে মধ্য ইউরোপে) এই ভাষাপরিবারের আদি ভাষার জন্ম। যে মূল ভাষা (Parent Language) থেকে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর ভাষার কোনো নিদর্শন (প্রত্নলিপি বা গ্রন্থ) এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি। তাই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার আদি রূপ আমরা জানতে পারি নি। সেকারণেই, সেই মূল ভাষা-উদ্ভূত প্রাচীন ভাষাগুলির (যেমন বৈদিক, আবেস্তীয়, গ্রিক, লাতিন, প্রাচীন পারসিক ইত্যাদি) মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করে মূল ভাষার একটি অনুমান-নির্ভর রূপ খাড়া করা হয়েছে। আনুমানিক ২৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে নাগাদ মূল ইন্দো-ইউরোপীয় জাতি আর্যরা তাদের আদি বাসস্থান থেকে ক্রমশ এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে মূল আর্যভাষা থেকে ক্রমশ নয়টি প্রাচীন ভাষাশাখার জন্ম হয়–

(১) ইন্দো-ইরানীয় (Indo-Iranian), (২) বাল্তো-স্লাভিক (Balto-Slavic), (৩) আলবানীয় (Albanian), (৪) আর্মেনীয় (Armenian), (৫) গ্রিক (Greek), (৬) ইতালিক (Italic), (৭) কেল্তিক (Celtic), (৮) জার্মানিক (Germanic), (৯) তোখারীয় (Tokharian) এবং (১০) হিত্তীয় (Hittite)। প্রথম চারটি কেন্তুম (Centum) বর্গের এবং শেষ ৬টি শতম (Satam) বর্গের ভাষাশাখা।

প্র : ইন্দো-ইরানীয় ভাষার পরিচয় দাও।

উ : ইন্দো-ইরানীয় শাখাটি দুটি উপশাখায় বিভক্ত–(১) ইরানীয় আর্য উপশাখা এবং (২) 'ভারতীয় আর্য' উপশাখা। ইরানীয় আর্য শাখাটি বিস্তার লাভ করে প্রাচীন পারস্য জুড়ে-এলম এবং মেসোপটেমিয়া (প্রাচীন ইরাক)-র পূর্ব দিক থেকে ব্যাকট্রিয়া পর্যন্ত। ইরানীয় উপশাখার দুটি প্রাচীন ভাষা হলো আবেস্তীয় এবং প্রাচীন

Scanned with CamScanner

পারসিক। এই দুটি ভাষাই প্রাচীন ইরানে প্রচলিত ছিল এবং তাদের মধ্যে সাদৃশ্যও ছিল যথেষ্ট। আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে ইরানের ধর্মগুরু, পারসি-ধর্ম-প্রবর্তক জরথুস্ত্র রচিত গাথাগুলির (মন্ত্রের নাম 'আবেস্তা' বা 'ছেন্দ আবেস্তা') ভাষাই হল আবেস্তীয় ভাষা। প্রকৃতপক্ষে উত্তর-ইরানের প্রাচীন কথ্য ভাষা অবলম্বনেই আবেস্তীয় ভাষা গড়ে উঠেছিল। তবে ৫৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ এই ভাষা লুপ্ত হয়ে প্রাচীন পারসিক সম্রাট ইরানের রাজভাষা হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে প্রাচীন পারসিক ছিল ইরানের দক্ষিণ-পশ্চিমের প্রদেশ পারস (>পারসা)-এর ভাষা। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক কারণেই প্রাচীন পারসিক সম্রাট ইরানের রাজভাষা হয়ে দাঁড়ায়। আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মধ্য-পারসিক ভাষা 'পুহ্লবী' উদ্ভূত হয়। অষ্টম শতাব্দীতে পুহ্লবী ভাষা থেকে নব্য-পারসিক ভাষা ফারসি জন্মগ্রহণ করে। বর্তমানে ফারসি ভাষায় এতো বেশি সংখ্যক বিজাতীয় ভাষা আরবি শব্দ প্রবেশ করেছে যে, একে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বলে চেনা যায় না। ইরানীয় উপশাখার অন্য দুটি আধুনিক ভাষা হলো আফগানিস্তানের ভাষা পশতো বা পুশতু (Pashtu) (পাঠান জাতির ভাষা) এবং পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের ভাষা বেলুচি (Baluchi)। অন্যদিকে ভারতে প্রবেশ করা 'ভারতীয় আর্য' উপশাখার অন্তর্গত প্রাচীন যুগের ভাষা হলো বৈদিক ভাষা, পরবর্তীকালের ভাষা হলো পালি, সংস্কৃত, প্রাকৃত ইত্যাদি এবং আধুনিক যুগের ভাষা হলো হিন্দুস্থানি (হিন্দি ও উর্দু), বাংলা, মারাঠি ইত্যাদি।

প্র : ভাষার কোন রূপ থেকে বাংলার সৃষ্টি?

উ : প্রাকৃত।

প্র : এই প্রাকৃতকে অনেক ভাষাতাত্ত্বিক কী বলেছেন?

উ : গৌড়ী প্রাকৃত।

প্র : বাংলা ভাষার উদ্ভব সম্পর্কে আধুনিক মত কী?

উ : ভারতীয় গৌড়ী ভাষা থেকে প্রাচীন বাংলা ভাষার উদ্ভব।

প্র : বাংলা ভাষার উৎপত্তির সময় সম্পর্কে মতগুলো কী?

উ : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেছেন সপ্তম শতাব্দী, স্যার জর্জ অব্রাহাম গ্রিয়ার্সন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়সহ অধিকাংশ পণ্ডিত বলেছেন দশম শতাব্দীতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি।

প্র : বাংলা সাহিত্যে 'ব্রজবুলি' একটি পরিচিত নাম। 'ব্রজবুলি' কোন ধরনের ভাষা?

উ : 'ব্রজবুলি' একটি কৃত্রিম বা artificial ভাষা। এ ভাষায় কেউ কোনো দিন কথা বলে নি। মৈথিলি ভাষার সঙ্গে অবহট্‌ঠ বা বাংলা ভাষার বিশেষ রূপের সংমিশ্রণে এই কৃত্রিম ভাষা তৈরি করেন কতিপয় লেখক। এই ভাষা ব্রজধামের ভাষা নয়। ব্রজধামের ভাষার নাম 'ব্রজভাষা'। তবে এই কৃত্রিম ভাষায় শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা বর্ণিত হওয়ায় তা ব্রজবুলি নামকরণ হয়। ব্রজবুলির বৈশিষ্ট্য হলো : এই ভাষা অভিনব, কোমল, মধুর ও কাব্যিক। মৈথিলি ও বাংলার সঙ্গে এখানে বেশ কিছু হিন্দি শব্দের মিশ্রণ আছে। এই ভাষা চতুর্দশ শতাব্দীর মৈথিলি কবি বিদ্যাপতির কল্যাণে বাংলায় ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ করে। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা এই ভাষায় যেরূপ মোহনীয়ভাবে প্রকাশিত হয়, অন্য ভাষাতে তেমন নয় বলে অনেকে মনে করেন। বিদ্যাপতির সঙ্গে মিথিলার কবি উমাপতি উপাধ্যায় এমন কি আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত এই ভাষা ব্যবহার করেন। 'ব্রজবুলি' ভাষা হিসেবে প্রচারিত থাকলেও শব্দটির লিখিত ব্যবহার ঈশ্বর গুপ্তের রচনার আগে বাংলায় দেখা যায় না। ব্রজবুলির উদাহরণ : 'গাগরি বারি ঢারি করি পীছল / চলতহি অঙ্গুলি চাপি / মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।'

–গোবিন্দ দাস

প্র : 'অপভ্রংশ' কী?

উ : বৈয়াকরণিক পতঞ্জলি বিশেষ ভাষার বিচ্যুত বা বিকৃত ভাবকে অপভ্রংশ নামকরণ করেন। 'অপভ্রংশ' শব্দটিকে বিভাজন করলে পাওয়া যায় : অপ+ভ্রংশ+অ (ষঞ্) -ভা। অপভ্রংশ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতান্তর আছে। কেউ বলেন : 'ভারতীয় আর্যভাষার একটি স্তরের নাম অপভ্রংশ।' প্রাকৃত ভাষার শেষ এবং আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষাসমূহের সূচনার অন্তবর্তীকালে অপভ্রংশ ভাষার স্তর ধরা হয়। কেউ বলেন : 'সাধুভাষা হতে ভ্রষ্ট কিংবা বিকৃতভাবে উচ্চারিত শব্দই অপভ্রংশ। ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অপভ্রংশের বিস্তারকাল হিসেবে ধরা হয়। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে গ্রথিত গীতি কবিতার সংকলন 'প্রাকৃত পৈঙ্গল' অপভ্রংশে রচিত। অপভ্রংশ ও অবহট্‌ঠ প্রায় সমার্থক শব্দ।

প্র : 'অবহট্‌ঠ' কী?

উ : প্রাচীন অপভ্রংশের অপেক্ষাকৃত আধুনিক রূপকে সুকুমার সেন নাম দিয়েছেন 'অবহট্‌ঠ', অনেকে বলেন 'অর্বাচীন অপভ্রংশ'। এ প্রসঙ্গে 'অপভ্রংশ কী' আলোচনা-অংশ দেখা যেতে পারে।

প্র : 'অর্ধমাগধী ভাষা' কী?

উ : প্রাচীন ভারতের এক ভাষারূপ। পুরাতন জৈনগ্রন্থসমূহ অর্ধমাগধী ভাষায় রচিত। প্রাকৃত বৈয়াকরণিকগণ মধ্যভারতীয় আর্যভাষার দ্বিতীয় স্তরে দুধরনের ভাষারূপ লক্ষ করেন। এর প্রথম স্তরকে বলেন প্রাচীন মাগধী এবং দ্বিতীয় স্তরকে বলেন প্রাচীন অর্ধমাগধী। উত্তর বিহার অর্থাৎ প্রাক্তন কোশল অঞ্চলে অর্ধমাগধী ভাষা প্রচলিত ছিল। পণ্ডিতেরা মনে করেন, বৌদ্ধ ধর্মের প্রবক্তা গৌতম ও জৈনধর্মের প্রবর্তক মহাবীর এই ভাষাতেই ধর্মপ্রচার করেছিলেন। তবে পরবর্তীকালে বৌদ্ধদের হাতে অর্ধমাগধীর চেয়ে পালি ভাষা অধিক চর্চিত হয়। কিন্তু মহাবীরের ভাষা হিসেবে জৈনরা তাদের রচিত সাহিত্যিক ও ধর্মীয় গ্রন্থে এই ভাষার চর্চা করে।

প্র : কৃত্রিম বিশ্বভাষা এসপেরান্তো সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা কর।

উ : প্রতিটি ভাষাই তার নিজের সভ্যতা-সংস্কৃতির বাহক এবং তার স্বভাববৈশিষ্ট্যও স্বাতন্ত্র্যের পরিচায়ক। যে-কোনো ভাষাভাষী মানুষের জীবনে মাতৃভাষার গুরুত্ব অপরিসীম হলেও কেবলমাত্র মাতৃভাষার গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থেকে কেউ যথার্থ আন্তর্জাতিক মানুষ হয়ে উঠতে পারে না। এমনকি মাতৃভাষা ভিন্ন আরও কয়েকটি ভাষা শিখেও এই লক্ষ্য পূরণ সম্ভব নয়। বর্তমান বিশ্বের ইংরেজি আন্তর্জাতিক ভাষার স্বীকৃতি লাভ করলেও চিন, জাপান, উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া, জার্মান, ফ্রান্স, রাশিয়া, ইতালি প্রভৃতি উন্নত দেশের মানুষ এখনও আত্মমর্যাদার সঙ্গে নিজেদের ভাষাকেই প্রাধান্য দিচ্ছে। এ ব্যাপারটা আন্তর্জাতিকতা এবং বিশ্বমানবতা-ভাবনাকে অনেকখানিই পিছনে সরিয়ে দিয়েছে। বিশ্ব-ঐক্য এবং একবিশ্বের ভাবনা যেমন বিশ্বমনীষীদের ভাবিত করেছে, তেমনি ভাবিয়েছে ভাষাবিজ্ঞানীদেরও। মানুষে মানুষে ভাষাগত ব্যবধান দূর করার জন্য ভাষাবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সময়ে একটি বিশ্বভাষা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন। অবশ্য অন্যসমস্ত ভাষাকে লুপ্ত করে এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর কথা তাঁরা কখনোই চিন্তা করেন নি। মানুষের জাতিগত পরিচয়বাহী ভাষাটিকে অক্ষুণ্ণ রেখেই প্রতিটি মানুষের জন্য দ্বিতীয় একটি ভাষার চিন্তা করে তাঁরা। সেই ভাষাটি অবশ্যই কৃত্রিম এবং সর্বজনীন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত দার্শনিক রেনে দেকার্ত (Descartes)-ই প্রথম এই রকম কৃত্রিম এক আন্তর্জাতিক ভাষার কল্পনা করেছিলেন। এরপর জার্মান চিন্তাবিদ জোহান মার্টিন শ্লেয়ের (Schleyer)-ও এমনই এক বিশ্ব-ভাষার পরিকল্পনা করেন, যার নাম তিনি দেন ভোলাপ্যুক (Volapuk)। এরপর ফ্রান্সিস বেকন, জন উইলকিন্স্ প্রভৃতি বহু চিন্তাবিদ এ ধরনের বিশ্বজনীন ভাষার পরিকল্পনা করেন এবং তার নামকরণও করেন। যেমন Idiom Neutral, Ido, Latino Sine Flexione, Antido, Occidental, Novial ইত্যাদি। কিন্তু এগুলির কোনোটিই বিশ্ব-চিন্তাবিদদের দ্বারা সমর্থিত হয় নি।

উৎপত্তি : যে কৃত্রিম আন্তর্জাতিক ভাষাটি 'বিশ্বভাষা' হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, তা হলো এসপেরান্তো (Esperanto)। পোল্যান্ডের চক্ষুচিকিৎসক ডা. এল. এল. জামেনহফ (Dr. L. L. Zamenhof) ১৮৫৯–১৯১৭) ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে এসপেরান্তো ছদ্মনামে রুশ ভাষায় এ গ্রন্থ রচনা করেন। বইটিতে সর্ব

Scanned with CamScanner

বিশ্বভাষার গঠনবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ডা. জামেনহফের ছদ্মনাম অনুসারে বইটিতে আলোচিত বিশ্বভাষাটির নাম দেওয়া হয় এসপেরান্তো।

বৈশিষ্ট্য : 'বিশ্বভাষা' এসপেরান্তো প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি বিশ্ববাসীর জন্য তৈরি করা একটি দ্বিতীয় ভাষা। ভাষাটি এমন সহজসরল যে, পৃথিবীর যে-কোনো মানুষ সহজেই এই ভাষায় কথা বলতে ও বুঝতে সক্ষম হবে। এই ভাষা মানুষের মাতৃভাষার বিরোধীও নয়। বিশ্বভাষা এসপেরান্তোর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো–

(১) ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলির ওপর ভিত্তি করেই এসপেরান্তো ভাষা গড়ে উঠেছে। ধ্বনিতত্ত্বের ক্ষেত্রে স্লাভ এবং রূপতত্ত্বের ক্ষেত্রে রোমান ও জার্মানিক ভাষাগুলির দ্বারা এই কৃত্রিম ভাষা প্রভাবিত। এই ভাষায় ৫টি স্বরধ্বনি, ২৩টি ব্যঞ্জনধ্বনি, ২টি অর্ধস্বর এবং ৬টি যৌগিক স্বর আছে। ৯২১টি শব্দমূলের সঙ্গে বিভক্তি-প্রত্যয় যুক্ত হয়ে এই ভাষার শব্দ তৈরি হয়। যেমন, -a যোগে বিশেষণ, -i যোগে অতীতকাল ইত্যাদি।

(২) বর্তমান পৃথিবীর প্রতিটি উন্নত ভাষাতেই দেখা যায় যে, শব্দের বানান সর্বদা উচ্চারণ অনুযায়ী গঠিত হয় না। যেমন, বাংলা ভাষায় আমরা 'বন' (=জঙ্গল) লিখলেও তার মান্য উচ্চারণ হলো বোন্ (ব্ + ও + ন্)। এসপেরান্তো ভাষায় **বানান ও উচ্চারণের এই বৈপরীত্য নেই।** এ ভাষার বানান নির্ধিবদ্ধ।

(৩) এসপেরান্তো ভাষার ব্যাকরণ **সহজসরল** এবং **সংক্ষিপ্ত**। এই ভাষার ব্যাকরণে আছে মাত্র ষোলটা নিয়ম। উদাহরণস্বরূপ, এই ভাষার **ক্রিয়াপদ বচন ও পুরুষ নিরপেক্ষ।** যেমন–

Mi dormas nokte (আমি রাতে ঘুমাই)

Li Dormas nokte (সে রাতে ঘুমায়)

বাংলায় 'আমি' উত্তমপুরুষের ক্রিয়ারূপ 'ঘুমাই' হলেও 'সে' প্রথম পুরুষের ক্রিয়ারূপ 'ঘুমায়'। কিন্তু এসপেরান্তো ভাষায় **উত্তমপুরুষ এবং প্রথমপুরুষে একই ক্রিয়ারূপ** (উপরের দুটি উদাহরণ nokte) ব্যবহৃত হয়েছে।

(৪) **মাত্র ছয় হাজার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সহজ শব্দ** দিয়ে তৈরি হয়েছে এ ভাষার **শব্দভাণ্ডার।**

(৫) পৃথিবীর **প্রধান ভাষাগুলির শব্দ** এবং **ব্যাকরণগত উপাদান কমবেশি গ্রহণ** করেই এই ভাষা তৈরি করা হয়েছে এবং এ ভাষার প্রচারের জন্য তৈরি হয়েছে **'এসপেরান্তো অ্যাসোসিয়েশন'।**

সারা পৃথিবীর কুড়ি লক্ষ মানুষ এই ভাষায় কথা বলতে সক্ষম এবং বহুসংখ্যক ভাষাবিদ ও ভাষাবিজ্ঞানী এসপেরান্তো ভাষা-শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তবু এখন অবধি সাধারণ বিশ্ববাসীর মধ্যে এই ভাষা **বিশেষ জনপ্রিয় হয় নি।** প্রতিটি রাষ্ট্র যদি এ ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ না নেয়, তবে কোনোদিনই এই ভাষা তেমনভাবে স্বীকৃতি পাবে না।

প্র : কোনো ভাষা কি হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে?

উ : বিখ্যাত 'ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল'-এ ভাষাবিদ ড. জন ম্যাকহোর্টার ২০১৫ সালে একটি প্রবন্ধে আশংকা ব্যক্ত করে লেখেন যে, বিশ্বায়ন ও আধুনিক বিশ্বে প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে আগামী ২১১৫ সালের মধ্যে বিশ্বে ক্ষুদ্র ভাষাগুলো লুপ্ত হয়ে যাবে এবং সারা বিশ্বে মাত্র ৬০০-এর মতো ভাষা জীবিত থাকতে পারে। আধিপত্যবাদী অর্থনীতির কারণে মানুষ নিজ ভাষার বদলে পরভাষায় আগ্রহী হবে আরো বেশি। এর ফলে ক্ষুদ্র ভাষাগুলোতো লুপ্ত হবেই, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল জাতির অনেক ঋদ্ধ ভাষাও সীমিত হয়ে যাবে। ভাষার সংখ্যা কমে গিয়ে মানুষের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যও কমবে।

প্র : বাংলা ভাষার উদ্ভব সম্পর্কে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মত কী?

উ : বাংলা ভাষার উদ্ভব সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। এই মতসমূহে ব্যাপক কোনো পার্থক্য নেই। শুধু দু একটি স্থানে পণ্ডিতেরা একমত হতে পারেন নি। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর অভিমতই সর্বাপেক্ষা বেশি মানা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে শহীদুল্লাহর মতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। ইন্দো-ইউরোপীয় নামে একটি কল্পিত ভাষাগোষ্ঠী বিবেচনায় এনে ভাষার জন্মের ইতিহাস খোঁজা হয়েছে। এই গোষ্ঠীভাষা পাঁচ হাজার খ্রিষ্টপূর্বকালের। এর দুটো শাখা কেন্তুম ও শতম। সাড়ে তিন হাজার খ্রিষ্টপূর্ব কাল আগে এরা স্বতন্ত্র রূপ নেয়। কেন্তুম থেকে ইউরোপীয় বেশির ভাগ ভাষার জন্ম আর শতম থেকে ভারতীয় বা তার আশপাশের ভাষাগুলোর সৃষ্টি হয়। খ্রিষ্টপূর্ব বারোশ অব্দে। 'ভারতিক' একটি আনুমানিক ভাষা-নাম। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মনে করেন, ভারতিক ভাষা থেকেই বৈদিক এবং প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার সৃষ্টি। ঋগ্বেদ বৈদিক ভাষায় রচিত। আজ বৈদিক ভাষা মৃত আর ভারতীয় আর্য ভাষা অনুমান-নির্ভর। খ্রিষ্টপূর্ব আটশ অব্দে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকেই আদিম প্রাকৃত ভাষার সৃষ্টি। আদিম প্রাকৃত প্রাচীন ভারতের এই অঞ্চলে শক্তিশালী ভাষা ছিল। পালিসহ একাধিক ভাষা এই ধারার। খ্রিষ্টপূর্ব পাঁচশ অব্দে আদিম প্রাকৃত ভাষা থেকে পালি ভাষার মতো প্রাচীন প্রাচ্য ভাষার সৃষ্টি হয় বলে শহীদুল্লাহ্ মনে করেন। আনুমানিক দুইশ খ্রিষ্টপূর্ব অব্দে এই ভাষা থেকে গৌড়ী প্রাকৃত এবং আনুমানিক চারশ অব্দে গৌড়ী প্রাকৃত থেকে গৌড় অপভ্রংশের সৃষ্টি। জর্জ গ্রিয়ার্সন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়সহ অধিকাংশ ভাষাবিজ্ঞানী মনে করেন, মাগধী প্রাকৃত থেকেই বাংলা ভাষার উৎপত্তি। কিন্তু মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মনে করেন, গৌড় অপভ্রংশ থেকে আনুমানিক খ্রিষ্টীয় পাঁচশ অব্দে বঙ্গ কামরূপী ভাষা তৈরি হয়। তিনি বলেন, গৌড় অপভ্রংশ এখন মৃতভাষা। বঙ্গ কামরূপীও একটি অনুমান-সিদ্ধ নাম। মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে গৌড় অপভ্রংশ হয়ে বঙ্গ কামরূপী ভাষার মাধ্যমে ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা ভাষা স্বতন্ত্ররূপ পরিগ্রহ করে। শহীদুল্লাহ্ তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে 'বাঙ্গালা ভাষার বুলচাল' শিরোনামে একটি আলোচিত উল্লেখ করেছেন। বাংলাভাষা সংশ্লিষ্ট অংশটুকু পরের পৃষ্ঠায় হুবহু তুলে ধরা হলো।

বাংলা ভাষা : সংজ্ঞার্থ ও স্থান

প্র : ভাষা কাকে বলে?

উ : ভাষা যোগাযোগের মাধ্যম। আইটি (ইনফরমেশন টেকনোলজি)-র এই যুগে তথ্য প্রবাহের জন্যেও প্রয়োজন হয় ভাষা। আর বহুকাল ধরে প্রচলিত যে সংজ্ঞার্থ তা হলো : মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য মানুষ বাগযন্ত্রের সাহায্যে যে সব ধ্বনি উচ্চারণ করে বা স্বীকৃত বর্ণে যা কিছু লিপিবদ্ধ করে অথবা কোনো বিশেষ সংকেত (ধ্বনি, অঙ্গভঙ্গি, লেখা, অঙ্কন যে কোনোভাবে সৃষ্টি হতে পারে) প্রকাশ করে, তাকে ভাষা বলে।

প্র : ভাষা কিভাবে প্রকাশ করা যায়?

উ : কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে, লেখনীর মাধ্যমে, ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমে। অর্থাৎ ভাষা প্রকাশ মাধ্যম হলো তিনটি। এক্ষেত্রে ইঙ্গিতের ভাষা নির্দিষ্ট ও গণ্ডিবদ্ধ। আবার এখানে কোনো ব্যাকরণও কাজ করে না।

প্র : বাংলা ভাষা কাকে বলে?

উ : প্রত্যেক ভাষার উচ্চারণ ও লেখা রীতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বাঙালি জাতির মাতৃভাষাকে বাংলা ভাষা বলে। পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার তুলনায় এর রয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। বহু বছর আগে এই বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়েছে ও বর্তমানে তা বিবর্তিত হচ্ছে।

প্র : ভাষা হিসেবে বাংলা নামের উৎপত্তি কেমন করে হয়?

উ : রাঢ়, বরেন্দ্র, কামরূপ, বগড়ী, বঙ্গ, চট্টল এই ভূভাগকে একত্রে বাংলা বলা হতো। এই সব অঞ্চলের ভাষা এক হলেও অন্তত চারটি উপভাষায় তা বিভক্ত ছিল। এই বিভক্তি সত্ত্বেও মুসলিম শাসনামলে অঞ্চলসমূহের ভাষাকে 'জবান-ই-বাংলা' অর্থাৎ 'বাংলার ভাষা' বলে অভিহিত করা হতো। পণ্ডিতগণ অবশ্য এই ভাষাকে প্রাকৃত ভাষা বলে অভিহিত করেন।

Scanned with CamScanner

টীকা : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর ভাষাচিত্রে (*) চিহ্ন দিয়ে আনুমানিক ভাষা এবং (+) চিহ্ন দিয়ে মৃত ভাষাকে বুঝিয়েছেন।

সাধারণ মানুষের মুখে 'বাংলার জন্য' এই ধারণাটি 'বাংলা ভাষার' ওপর লাভ করে। লক্ষ করার বিষয়, বাংলার গণমানুষ নিজেদের ভাষার নাম নিজেরাই সন্ধান করে। তারা শাসকদের দেয়া তিলতিলি শব্দ 'জবান-ই-বাংলা' যেমন পরিত্যাগ করে তেমনি পণ্ডিতদের তৈরি করা শব্দ 'প্রাকৃত' সেটাও গ্রহণ করে না।

প্র : **গৌড়ভাষা কোনটি?**

উ : এককালে উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গ এবং পরবর্তীকালে আরো বেশি অঞ্চলকে গৌড় বলা হতো। ষোড়শ শতাব্দী থেকে বাংলা ভাষাকে অনেক শিক্ষিত বাঙালি তাই গৌড়ভাষা বলে অভিহিত করতে থাকেন। সে কারণে রাজা রামমোহন রায় তাঁর রচিত ব্যাকরণগ্রন্থের নাম দেন 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ', মধুসূদন তাঁর কাব্যে বাঙালিকে 'গৌড়জন' বলে অভিহিত করেন। গৌড়ভাষাই বাংলা ভাষা।

প্র : **বাংলা ভাষার প্রসার ক্ষেত্র কোথায়?**

উ : বাংলা বাঙালির মাতৃভাষা বিধায় বাঙালি মাত্রই বাংলায় কথা বলে। সে দিক থেকে বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসামের কাছাড় ও গোয়ালপাড়া জেলা, উড়িষ্যা, বিহার ও ছোটনাগপুরের সাঁওতাল পরগনা, মানভূম, সিংহভূম ও পূর্ব পূর্ণিয়ায় বাংলা ভাষা প্রচলিত। আজকের বিশ্বায়নের যুগে বাঙালি যেহেতু বহির্বিশ্বেও ছড়িয়ে পড়েছে তাই ইংল্যান্ড, আমেরিকা, সৌদি আরবসহ বিশ্বের বহু দেশে বাংলা ভাষায় মানুষ কথা বলে।

প্র : **বর্তমানে পৃথিবীতে বাংলা ভাষার স্থান কত?**

উ : ভাষার স্থান নির্ণয় একটি দুরূহ কর্ম। তবে মাতৃভাষা হিসেবে ভাষা ব্যবহারকারীদের বিচারে ভাষার স্থান নির্ণয় হতে পারে। সে দিকে থেকে মাঠ পর্যায়ে তথ্যানুসন্ধান করে আন্তর্জাতিক জরিপে দেখা গেছে যে, পৃথিবীর সব ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষার স্থান চতুর্থ।

প্র : **বর্তমানে পৃথিবীর প্রধান ভাষাসমূহের স্থান উল্লেখসহ একটি তালিকা দাও।**

উ : বর্তমানে পৃথিবীর ভাষাসমূহের মধ্যে মাতৃভাষার বিবেচনায় বাংলা ভাষার স্থান ৪র্থ। তা নির্দেশসহ নিচে প্রধান ভাষা ও এর দেশসমূহের নামের তালিকা দেয়া হলো :

ক্রমিক	ভাষা	প্রধান দেশ
১	চৈনিক (মেন্ডারিন, পাই, কেন্টোনিজসহ)	চিন (তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ভিয়েতনাম
২	স্প্যানিশ	স্পেন, ইতালি, আমেরিকা
৩	ইংরেজি	ইউকে, ইউ.এস.এ, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া
৪	বাংলা	বাংলাদেশ, ভারত
৫	হিন্দি	ভারত
৬	আরবি	আলজেরিয়া, মিশর, ইরাক, মরক্কো, সৌদি আরব, লিবিয়া, টিউনিশিয়া, ইয়েমেন
৭	পর্তুগিজ	পর্তুগাল, ব্রাজিল
৮	রুশীয়	রাশিয়া
৯	জাপানি	জাপান
১০	জার্মান	জার্মানি, অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যান্ড
১১	জাভীয়	ইন্দোনেশিয়া, জাভা, বালি
১২	কোরীয়	উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া
১৩	ফরাসি	ফ্রান্স, কানাডা
১৪	ভিয়েতনামি	ভিয়েতনাম
১৫	তেলেগু	ভারত
১৬	মারাঠি	ভারত
১৭	তামিল	ভারত
১৮	তুর্কি	তুরস্ক

(সূত্র : Wysiwyg://1/file : /A/Global languages ranks of world languages. html)

প্র : **১৯৯৩ সালের হিসাব অনুসারে বিশ্বে বাংলা ভাষার অবস্থান কোথায় ছিল এবং বাংলার পূর্বে অবস্থানকৃত ভাষাসমূহ কী?**

উ : এই সময় বাংলা ছিল পঞ্চম অবস্থানে। একই অবস্থানে ছিল আরবি ও রুশীয় ভাষা। আর চৈনিক ছিল প্রথম, স্প্যানিশ দ্বিতীয়, ইংরেজি তৃতীয় ও হিন্দি চতুর্থ।

Scanned with CamScanner

1. Learned Discourse on Justification.
2. Of the Laws of Ecclesiastical P...

(সূত্র : The Cambridge Factfinder, Cambridge University Press, 1993)

প্র : দাপ্তরিক ভাষা বা Official language হিসেবে বিশ্বে কোন ভাষার স্থান প্রথম?

উ : ইংরেজি।

প্র : Official language হিসেবে বিশ্বে বাংলার স্থান কত?

উ : দশম।

প্র : দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত বিশ্বের শীর্ষ দশটি ভাষার নাম লেখ।

উ : ১ম > ইংরেজি; ২য় > চৈনিক; ৩য় > হিন্দি; ৪র্থ > স্পেনিশ; ৫ম > রুশীয়; ৬ষ্ঠ > ফরাসি; ৭ম > আরবি; ৮ম > পর্তুগিজ; ৯ম > মালয়; ১০ম > বাংলা।
এখানে উল্লেখ্য যে, বিশ্বে বেশ কিছু শীর্ষ ভাষা (যেমন : তেলেগু, জাভীয়) দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃত নয়, আবার অন্য কিছু ভাষা (যেমন : মালয়) বহুভাষী দেশসমূহে দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃত।

(সূত্র : http : //www.chtech.com / BrainBank / COMMUNICATIONS/ TopLanguages.html)

প্র : অবিভক্ত ভারতে বাংলা ভাষার স্থান কত ছিল?

উ : ১৯২১ সালের গণনায় দেখা যায়, অবিভক্ত ভারতের ১২৫টি ভাষার মধ্যে মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহৃত ভাষার দিক থেকে বাংলার স্থান প্রথম। মাতৃভাষা নয় কিন্তু প্রচলনের দিক থেকে হিন্দি ভাষা প্রথম।

প্র : বাংলার সীমান্ত ভাষা কী ও কোনগুলো?

উ : ভাষার মানচিত্র আর রাজনৈতিক মানচিত্র সাধারণত এক হয় না। বাংলার ক্ষেত্রেও নয়। সীমান্ত ভাষা হলো কোনো ভাষা-অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমানার বাইরে কিন্তু সংলগ্ন এলাকার ভাষা। এই ভাষা একাধিক হতে পারে এবং পারস্পরিক সম্পর্কযুক্তও হতে পারে। সে দিক থেকে বাংলার সীমান্ত ভাষা হলো : পূর্ব সীমান্তে অসমিয়া এবং পশ্চিম সীমান্তে উড়িয়া, মগধি ও মৈথিলি ভাষা। তাছাড়া কতিপয় অনার্য ভাষা যেমন, পশ্চিমে সাঁওতালি, হো, মুণ্ডারি, ওরাওঁ, উত্তরে সিকিমি ও ভুটানি, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে বোড়ো ও খাসিয়া ভাষা। তাছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের চাকমা, ককবরক (ত্রিপুরা) ইত্যাদি ভাষা।

প্র : কোন কোন দেশ/অঞ্চলে বাংলা ভাষার প্রসার দেখা যায়?

উ : বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও আসামের কাছাড় ও গোয়ালপাড়া জেলা, বিহার ও ছোটনাগপুরের সাঁওতাল পরগনা, মানভূম, সিংহভূম, পূর্বপূর্ণিয়া; উড়িষ্যার পুরী; ত্রিপুরার বেশ কিছু অঞ্চল; ইংল্যান্ডের ব্রিক লেন।

প্র : বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বয়স কত?

উ : বাংলা ভাষা তার সুনির্দিষ্ট রূপ নিয়েছে প্রায় এক হাজার বছর আগে। বাংলা সাহিত্যও ভাষার সমবয়সী। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক আবিষ্কৃত 'চর্যাপদ' রচনার কাল বিবেচনা করলে দেখা যায় বাংলা ভাষা গঠনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্য রচিত হতে থাকে।

প্র : বাংলা ভাষার প্রকাশ-প্রকারভেদ কী?

উ : বাংলা ভাষা দ্বিবিধ। শ্রী যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি প্রদত্ত পরিভাষায় বলা যেতে পারে : মৌখিক ও লৈখিক। প্রতিটি সচল ও স্বচ্ছ ভাষাতেই এ দুটি প্রকাশ-প্রকার আছে।

প্র : বাংলা মৌখিক ভাষা কত প্রকার ও কী কী?

উ : দুই প্রকার। যথা : মান মৌখিক ভাষা ও আঞ্চলিক মৌখিক ভাষা।

প্র : মান মৌখিক ভাষা কী?

উ : আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা পত্তনের ফলে সব কিছুই পরিমার্জিত ও সর্বজনীন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এক্ষেত্রে ভাষাও নানা স্থানের বহুরূপ থেকে পরিমার্জনার মাধ্যমে একটি বিশেষ মান অবস্থার চেষ্টা চলে। বাংলা ভাষায় এক্ষেত্রে নদীয়া-শান্তিপুরের ভাষাকে মৌখিক মান ভাষা ধরা হয়। উল্লেখ্য, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙা, মেহেরপুর, একদা নদীয়া জেলাধীন ছিল। অনেকে 'মানভাষা' না বলে এ ধরনের ভাষাকে 'মান্যভাষা' বলেন।

প্র : আঞ্চলিক মৌখিক ভাষা কী?

উ : ভাষা বিজ্ঞানীরা বলেন, মৌখিক ভাষায় প্রতি দশ বর্গকিলোমিটার অন্তর পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ প্রত্যেক ভাষাতেই মৌখিক একাধিক রূপ আছে। বাংলা ভাষাতেও থানা বা উপজেলা ভেদে মৌখিক ভাষার রূপান্তর ঘটেছে। ভাষার এ রূপকে অবশ্য উপভাষা বা dialect বলে।

ব্রিটিশ রাজের উচ্চপদস্থ আমলা জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন ভারতের উপভাষাতত্ত্বের জরিপ করে 'লিঙ্গুইস্টিক সারভে অফ ইন্ডিয়া' (১৯০৩) নামে বিশ খণ্ডে প্রকাশ করেন। এর পঞ্চম খণ্ডের প্রথম ভাগে রয়েছে বাংলা আঞ্চলিক মৌখিক ভাষা বা উপভাষার উদাহরণ ও আলোচনা। এই ভাষারূপ নির্দিষ্ট অঞ্চলে সাবলীলভাবে ব্যবহার হলেও ওই নির্দিষ্ট অঞ্চলের বাইরে তা কষ্টকর ও দুর্বোধ্য বলে মনে হয়। গ্রিয়ার্সন সংগৃহীত আঞ্চলিক মৌখিক ভাষা থেকে একটি বাক্যের উদাহরণ দেয়া হলো। এতেই বোঝা যাবে, আঞ্চলিক মৌখিক ভাষা পরস্পর থেকে কতটা পৃথক। উদাহরণ :

সাধুভাষা : কোনো এক ব্যক্তির দুই পুত্র ছিল।

মানিকগঞ্জ : য়্যাক জনের দুইডী ছাওয়াল আছিলো।

ময়মনসিংহ : এক জনের দুই পুৎ আছিল্।

বগুড়া : এক কনের দুই বাটাছিল আছিল।

নোয়াখালি : একজন মাইন্সের দুগা হোলা আছিল্।

প্র : উপভাষা বা Dialect কাকে বলে?

উ : আঞ্চলিক মৌখিক ভাষা কী?-এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্র : বাংলাদেশের উপভাষার অভিধান রচনা সম্পর্কে লেখ।

উ : বাংলাদেশ অঞ্চলের উপভাষার অভিধান রচনার সর্বপ্রথম নিদর্শন স্থাপন করেন এফ. ই. পাজিটার। তিনি ১৯২৩ সালে লেখেন 'Vocabulary of Peculiar Vernacular Bengali Words'. এটি কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল থেকে প্রকাশ পায়। ১৯৬৪ সালে বাংলা একাডেমি থেকে বের হয় 'বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান'। এর প্রধান সম্পাদক ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এবং বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা ছিলেন মুহম্মদ এনামুল হক, মুহম্মদ আবদুল হাই, মুনীর চৌধুরী, কাজী দীন মুহম্মদ।

প্র : লৈখিক ভাষা কত প্রকার ও কী কী?

উ : দুই প্রকার। যথা : সাধু ও চলিত।

প্র : সাধু ভাষা কী?

উ : যে ভাষা প্রধানত তৎসম শব্দসমূহ, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদসমূহ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, কিছুটা গুরুগম্ভীর ও কৃত্রিম তাকেই সাধু ভাষা বলে। যেমন : 'যৌবনে যখন পৃথিবী সুন্দরী ছিল, যখন প্রতি পুষ্পে পুষ্পে সুগন্ধ পাইতাম, প্রতি পত্রমর্মরে নূপুর শব্দ শুনিতাম, প্রতি নক্ষত্রে চিত্রা-বেণীসীনা শোভা দেখিতাম, প্রতি মনুষ্য-মুখে সরলতা দেখিতাম, তখন আনন্দ ছিল।'
— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্র : চলিত ভাষা কী?

উ : ভাগীরথী-তীরবর্তী জনপদের ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজে ব্যবহৃত মৌখিক ভাষা পরিমার্জিত হয়ে সাহিত্যে যেভাবে স্থান পেয়েছে তাকেই চলিত ভাষা (লৈখিক) বলে। এ ভাষায় অতৎসম শব্দসমূহলতা, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত রূপ, স্বরসংগতি ও অভিশ্রুতির প্রভাব এবং গতিময়তা বিশেষ গুণ। যেমন: 'অমিত যেখানে সেখানে হো হো করে বেড়াচ্ছে– ফিরপোর দোকানে যাকে তাকে চা খাওয়াচ্ছে, যখন তখন মোটরে চড়িয়ে বন্ধুদের অনাবশ্যক ঘুরিয়ে নিয়ে আসছে। এখান ওখান থেকে যা তা কিনছে আর একে ওকে বিলিয়ে দিচ্ছে; ইংরেজি বই সদ্য কিনে এ বাড়িতে ও বাড়িতে ফেলে আসছে আর ফিরিয়ে আনছে না।' — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্র : কোন কোন ক্ষেত্রে সাধু ও চলিত ভাষার গঠনগত পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়?

উ : ১. সর্বনামপদে— তাহার > তার; ইহারা > এরা।
২. ক্রিয়াপদে— করিতেছি > করছি; যাইবো > যাবো।
৩. অনুসর্গে— অপেক্ষা > চেয়ে; হইতে > হতে।
৪. তৎসম শব্দে— সমভিব্যাহার > সঙ্গে; যৎপরনাস্তি > খুব।
৫. বিশেষণে— সাতিশয় > অত্যন্ত; ঈদৃশ > এ রকম।
৬. সমাসবদ্ধতায় — নীলোৎপলদলতুল্য > নীল পদ্মের পাপড়ির মতো।

Scanned with CamScanner

2. Of the Laws of Eccle-

বাংলা ব্যাকরণ

সাধারণ আলোচনা

প্র : ব্যাকরণ কাকে বলে?
উ : ভাষা ব্যবহারের জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ম, যা ওই ভাষাকে অশুদ্ধির সীমানায় প্রবেশ করতে দেয় না, শুদ্ধির পরিকাঠামো তৈরি করে তাকে ব্যাকরণ বলে।

প্র : বাংলা ভাষার ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত লেখ।
উ : পর্তুগিজ পাদ্রি মনোএল দা আসুম্পসাউ রচিত ও জোকাবুশারিও এম ইদিওমা বেনগল্লা ই পোরতুগিজ গ্রন্থের ব্যাকরণ অংশই বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ, কিন্তু প্রথম ব্যাকরণগ্রন্থ নয়। এটি ১৭৩৪ খ্রিষ্টাব্দে রচিত, ১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন শহর থেকে রোমান লিপিতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। বাংলাভাষার প্রথম ব্যাকরণগ্রন্থ ন্যাথিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড রচিত 'এ গ্রামার অফ দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ'। এই গ্রন্থটি ১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রধানত ইংরেজি, অংশত বাংলায় রচিত এবং ১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে হুগলি থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এরপর উইলিয়াম কেরি ১৮০১ সালে, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ১৮১৬ সালে, কিথ সাহেব ১৮২০ সালে বাংলা ব্যাকরণ রচনার প্রয়াস পান। কিন্তু এই সবগুলোই ইংরেজি ভাষায় লেখা। ১৮২৬ সালে রাজা রামমোহন রায় ইংরেজিতে বাংলা ব্যাকরণ লেখেন। এরপর তিনি ১৮৩৩ সালে স্কুল বুক সোসাইটির জন্য ওই গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করে নাম দেন 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'। সে-বিচারে এই গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থ।

প্র : ব্যাকরণ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত রূপ কী?
উ : বি + আ + √কৃ + অন।

প্র : ব্যাকরণ শব্দের সঠিক অর্থ কী?
উ : বিশেষভাবে বিশ্লেষণ।

প্র : ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা কী?
উ : ভাষার বিভিন্ন উপাদানের গঠন ও প্রকৃতি সম্পর্কে সুষ্ঠু জ্ঞান; বলা ও লেখায় শুদ্ধভাবে ব্যবহার করার জন্য ব্যাকরণ পাঠ প্রয়োজন।

প্র : ব্যাকরণে সাধারণ আলোচ্য বিষয় কয়টি?
উ : তিনটি। ধ্বনিতত্ত্ব: শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম।

প্র : ব্যাকরণে সার্বিক আলোচ্য বিষয় কয়টি?
উ : ছয়টি। ধ্বনিতত্ত্ব: শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব; বাক্যতত্ত্ব; ছন্দ ও অলঙ্কার প্রকরণ; বাগর্থ বিজ্ঞান বা অর্থতত্ত্ব; অভিধানতত্ত্ব।

প্র : ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় কী?
উ : ধ্বনি, এর উচ্চারণরীতি, উচ্চারণের স্থান, ধ্বনি পরিবর্তন, সন্ধি, ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান ইত্যাদি।

প্র : রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় কী?
উ : শব্দ, শব্দের গঠন, বচন, লিঙ্গ, কারক, পুরুষ, উপসর্গ, প্রত্যয়, বিভক্তি, সমাস, পদের পরিচয়, ক্রিয়া প্রকরণ ইত্যাদি।

প্র : বাক্যতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় কী?
উ : বাক্যের সঠিক গঠন প্রণালি, পদক্রম, পদের স্থান, পদ পরিবর্তন, বাগধারা, বাক্য সংযোজন, বাক্য সংকোচন, প্রবাদ-প্রবচন, বিরামচিহ্ন ইত্যাদি।

প্র : ভাষার সাংগঠনিক গড়ন কী?
উ : কোনো কথ্য ভাষায় ধ্বনি শব্দ ও পদ এবং লেখ্য ভাষায় বর্ণ, শব্দ ও পদ বাক্যে প্রযুক্ত হয়ে একটি ভাবের দ্যোতনা সৃষ্টি করে। সুতরাং ধ্বনি/বর্ণ, শব্দ, বাক্যের সম্মিলনে ভাষা গড়ে ওঠে।

প্র : ভাষার মৌলিক উপাদান কী এবং কেন?
উ : ভাষার মৌলিক উপাদান শব্দ। কারণ শব্দেই প্রথম অর্থের সংশ্লিষ্টতা দেখা দেয়। ধ্বনিতে অর্থের সংশ্লিষ্টতা নেই। ভাষার প্রধান উদ্দেশ্য যেহেতু অর্থবাচকতা প্রকাশ করা, সেহেতু এক্ষেত্রে শব্দ ভাষার মৌলিক উপাদান।

প্র : ভাষার মূল উপকরণ কী?
উ : বাক্য ভাষার মূল উপকরণ। কারণ, একটি সম্পূর্ণ বাক্যই ভাষার প্রাণ। বাক্য না হলে ভাষাকে সঠিকভাবে চেনা যায় না। শুধু শব্দের সমষ্টি থাকলে তা অভিধান হিসেবে গণ্য হতে পারে, ভাষার নির্দশন হিসেবে গণ্য হবে না।

ধ্বনি ও বর্ণ

প্র : ধ্বনি ও বর্ণের মধ্যে সম্পর্ক কী?
উ : একটি মৌখিক ও অন্যটি লৈখিক রূপ। ধ্বনি লিখিতভাবে প্রকাশের প্রতীকচিহ্নই বর্ণ।

প্র : বাংলা ভাষায় মৌলিক ধ্বনিগুলো কয়ভাগে বিভক্ত, কী কী?
উ : দুইভাগে। স্বরধ্বনি, ব্যঞ্জনধ্বনি।

প্র : স্বরধ্বনি কাকে বলে?
উ : যে ধ্বনি বা ধ্বনিসমূহ অন্য কোনো ধ্বনির সংমিশ্রণ বা সহায়তা ছাড়া স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয় সেগুলোকে স্বরধ্বনি বলে।

প্র : বাংলা স্বরবর্ণ কয়টি ও কী কী?
উ : ১১টি। যথা : অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ।

প্র : আগে যে স্বরবর্ণগুলো ব্যবহৃত হতো সেগুলো লেখ।
উ : অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ঌ ৯ ৯৹ এ ঐ ও ঔ অং অঃ।

প্র : মৌলিক স্বরধ্বনিগুলো উল্লেখ কর।
উ : অ আ ই উ এ অ্যা ও।

প্র : যৌগিক স্বরধ্বনিগুলো উল্লেখ কর।
উ : ঐ ঔ।

প্র : ব্যঞ্জনধ্বনি কাকে বলে?
উ : যে সবধ্বনি অন্তত একটি স্বরধ্বনির সংমিশ্রণ বা সহায়তা ছাড়া উচ্চারিত হতে পারে না, সেগুলোকে ব্যঞ্জন ধ্বনি বলে।

প্র : বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ কয়টি ও কী কী?
উ : ৩৯টি। যথা : ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য র ল শ ষ স হ ড় ঢ় য় ৎ ং ঃ ঁ। (অনেকে অন্তঃস্থ ব বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণে গণ্য করার পক্ষে।)

প্র : স্পর্শ ধ্বনি কাকে বলে, এগুলো কী কী?
উ : কণ্ঠ, তালু, মূর্ধা, দন্ত, ওষ্ঠ স্পর্শ করে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় তাকে স্পর্শ ধ্বনি বলে। ক থেকে ম পর্যন্ত পঁচিশটি ধ্বনি স্পর্শ ধ্বনি।

প্র : কণ্ঠ্য বর্ণ কোনগুলো?
উ : ক, খ, গ, ঘ, ঙ।

প্র : তালব্য বর্ণ কোনগুলো?
উ : চ, ছ, জ, ঝ, ঞ।

প্র : মূর্ধন্য বর্ণ কোনগুলো?
উ : ট, ঠ, ড, ঢ, ণ।

প্র : দন্ত্য বর্ণ কোনগুলো?
উ : ত, থ, দ, ধ, ন।

প্র : ওষ্ঠ্য বর্ণ কোনগুলো?
উ : প, ফ, ব, ভ, ম।

প্র : নাসিক্য বর্ণ কোনগুলো?
উ : ঙ, ঞ, ণ, ন, ম।

প্র : অনুনাসিক বা সানুনাসিক বর্ণ কী?
উ : নাসিক্য বর্ণগুলোকেই অনেকে অনুনাসিক বা সানুনাসিক বলেন।

প্র : অন্তঃস্থ বর্ণ কোনগুলো?
উ : য, র, ল, ব (এই 'ব' আগে গণ্য ছিল। এখন গণনাতে আনা হয় না)।

প্র : য-এর উচ্চারণ স্থানগত অবস্থান কী?
উ : তালব্য।

প্র : র-এর উচ্চারণ স্থানগত অবস্থান কী?
উ : কম্পনজাত মূর্ধা স্থানীয়।

প্র : ল-এর উচ্চারণ স্থানজাত অবস্থান কী?
উ : পার্শ্বিক দন্ত্য স্থানীয়।

প্র : উষ্মবর্ণ কাকে বলে, কোনগুলো?
উ : যে বর্ণ উচ্চারণে বায়ুর প্রাধান্য থাকে তাকে উষ্মবর্ণ বলে। এগুলো : শ, ষ, স, হ।

প্র : শ, ষ, স, হ উষ্মবর্ণগুলোর অন্তর্বিভাগ কী?
উ : শ, ষ, স শিশ্‌ধ্বনি; হ ঘোষ ধ্বনি।

প্র : তাড়নজাত ধ্বনি কোনগুলো?
উ : ড়, ঢ়।

প্র : খণ্ডব্যঞ্জন কোনটি?
উ : ৎ (মূল = ত)।

প্র : অঘোষ হ ধ্বনির বর্ণরূপ কী?
উ : ঃ (বিসর্গ)।

প্র : পরাশ্রিত ব্যঞ্জনবর্ণ কী ও কোনগুলো?
উ : যে ব্যঞ্জন বর্ণসমূহ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বর্ণের মতো কার বা ফলাশ্রয়ণ করতে পারে না, অন্য বর্ণের আশ্রয়ে শব্দ তৈরি করে, সেগুলোকে পরাশ্রিত ব্যঞ্জন বর্ণ বলে। এগুলো হচ্ছে : ং ঃ ঁ।

20/5/9 13:59

Scanned with CamScanner

প্র : স্বরবর্ণে পূর্ণমাত্রা বিশিষ্ট বর্ণ কয়টি ও কী কী?

উ : ছয়টি। যথা : অ আ ই ঈ উ ঊ।

প্র : স্বরবর্ণে অর্ধমাত্রা বিশিষ্ট বর্ণ কয়টি?

উ : একটি। যথা : ঋ

প্র : স্বরবর্ণে মাত্রাহীন বর্ণের সংখ্যা কয়টি?

উ : চারটি। যথা : এ ঐ ও ঔ।

প্র : বাংলা দুই স্বরধ্বনি কোনগুলো?

উ : ঐ (অ+ই), ঔ (অ+উ)।

প্র : যৌগিক স্বরধ্বনি কয়টি ও কী কী?

উ : চারটি। যথা : অ আ ই উ এ আ ও।

প্র : ব্যঞ্জনবর্ণে পূর্ণমাত্রা বিশিষ্ট বর্ণের সংখ্যা কয়টি ও কী কী?

উ : ব্যঞ্জনবর্ণে পূর্ণমাত্রা বিশিষ্ট বর্ণ ৩৩টি। যথা : ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য র ল শ ষ স হ ড় ঢ় য়।

প্র : ব্যঞ্জনবর্ণে অর্ধমাত্রা বিশিষ্টবর্ণের সংখ্যা কয়টি ও কী কী?

উ : সাতটি। যথা : খ, গ, ণ, ঘ, ব, প, শ।

প্র : ব্যঞ্জনবর্ণে মাত্রাহীন বর্ণের সংখ্যা কয়টি ও কী কী?

উ : দুইটি। যথা : ঃ এবং ং।

প্র : বাংলা বর্ণমালায় মোট বর্ণের সংখ্যা কত?

উ : পঞ্চাশ।

প্র : পঞ্চাশটি বর্ণে পূর্ণমাত্রা বিশিষ্ট বর্ণের সংখ্যা কত?

উ : বত্রিশ।

প্র : পঞ্চাশটি বর্ণে অর্ধমাত্রা বিশিষ্ট বর্ণের সংখ্যা কত?

উ : আট।

প্র : পঞ্চাশটি বর্ণে মাত্রাহীন বর্ণের সংখ্যা কত?

উ : দশ।

প্র : উচ্চারণরীতি অনুসারে ব্যঞ্জনবর্ণের শ্রেণিভাগ কী?

উ : ঘোষ-অঘোষ; মহাপ্রাণ-অল্পপ্রাণ।

প্র : ঘোষ বর্ণ কী ও কোনগুলো?

উ : যে বর্ণগুলো উচ্চারণ করতে ফুসফুস থেকে অপেক্ষাকৃত অধিক বাতাস প্রবাহিত হয় এবং নিনাদিত উচ্চারণ হয় তাদের ঘোষ বর্ণ বলে। বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ এবং য, র, ল, ব, হ।

প্র : অঘোষ বর্ণ কী ও কোনগুলো?

উ : যে বর্ণগুলো উচ্চারণ করতে ফুসফুস থেকে অপেক্ষাকৃত কম বাতাস প্রবাহিত হয় এবং কম নাদিত হয়, তাদের অঘোষ বর্ণ বলে। যথা: বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ এবং শ, ষ, স।

প্র : মহাপ্রাণ বর্ণ কী ও কোনগুলো?

উ : যে বর্ণসমূহ উচ্চারণ প্রসঙ্গে হা ধ্বনির ন্যায় ফুসফুস তাড়িত বাতাস অধিক প্রবাহিত হয়, সেগুলো মহাপ্রাণ বর্ণ। যথা: বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ।

প্র : অল্পপ্রাণ বর্ণ কী ও কোনগুলো?

উ : যে বর্ণসমূহের উচ্চারণ নাসিক্যমুক্ত হয় অর্থাৎ ফুসফুস তাড়িত বাতাস কম প্রবাহিত হয়, সেগুলো অল্পপ্রাণ বর্ণ। যথা: বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ।

প্র : ধ্বনন কাকে বলে?

উ : ব্যঞ্জনবর্ণে স্বরবর্ণে যোগ করাকে ধ্বনন বলে।

প্র : সংযুক্ত বর্ণ কাকে বলে?

উ : দুই বা অধিক ব্যঞ্জনবর্ণ একত্র মিলিত হয়ে সংযুক্ত বর্ণ হয়। যথা: ক্ত, জ্ঞ।

প্র : কার কাকে বলে?

উ : স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কার বলে।

প্র : কোন স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ নেই?

উ : অ।

প্র : কোনটি নিলীন বর্ণ?

উ : অ।

প্র : 'অ' নিলীন বর্ণ কেন?

উ : 'অ' কোনো বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হলে দেখা যায় না। কারণ 'অ'-এর কোনো সংক্ষিপ্ত রূপ নেই। কিন্তু 'অ' ছাড়া বাকি স্বরধ্বনিগুলোর সংক্ষিপ্ত রূপ আছে বলে সেগুলো কোনো বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হলে দেখা যায়। যেমন :
কর = কর্ + অ ('অ') দেখা যায় না।)
করা = কর্ + আ ('আ' দেখা যায়।)
অর্থাৎ 'অ' অন্য বর্ণের সঙ্গে লুকিয়ে থাকতে পারে বা নিঃশেষে লীন হয়ে থাকতে পারে বলে নিলীন বর্ণ।

প্র : স্বরবর্ণসমূহের সংক্ষিপ্ত রূপ দেখাও।

উ : আ = া, ই = ি, ঈ = ী, উ = ু, ঊ = ূ, ঋ = ৃ, এ = ে, ঐ = ৈ, ও = ো, ঔ = ৌ।

প্র : ধ্বনন কাকে বলে?

উ : ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে স্বরধ্বনি যুক্ত করাকে ধ্বনন বলে।

প্র : কয়টি ব্যঞ্জনবর্ণ ধ্বনন ছাড়া ব্যবহৃত হতে পারে?

উ : ছয়টি। যথা : ঙ ঞ ণ ন ম ং। ব্যঞ্জন বর্ণকে স্বরধ্বনি যুক্ত হওয়ার ক্ষমতা হিসেবে দুভাগ করা হয়। এই ছয়টি বর্ণের কোনো কোনটি স্বরধ্বনির রূপ পরিবর্তন করে। যেমন : ম + া = মা, ম + ি = মি ...।

প্র : বাংলা বর্ণমালায় কয়টি যৌগিক স্বরধ্বনির বর্ণ আছে?

উ : ২টি (ঐ ঔ)।

প্র : যৌগিক স্বরধ্বনি কাকে বলে?

উ : পাশাপাশি দুটো স্বরধ্বনি এক প্রয়াসে ও দ্রুত উচ্চারিত হয়ে যদি একটি যুক্তধ্বনিতে রূপ নেয়, তাকে যৌগিক স্বরধ্বনি বলে।
যেমন : অ + ই = ঐ; অ + উ = ঔ
বাংলায় এই যৌগিক স্বরধ্বনি দুটোকে পৃথক বর্ণ দিয়ে চিহ্নিত করা হয় (ঐ, ঔ)।

প্র : যৌগিক স্বরধ্বনিকে আর কী নামে অভিহিত করা হয়?

উ : দ্বিস্বর বা সন্ধিস্বর বা যৌগিক স্বর।

প্র : বাংলা যৌগিক স্বরধ্বনি আসলে কয়টি?

উ : পৃথক বর্ণ দিয়ে চিহ্নিত করা হয় দুটো (ঐ, ঔ)। এ ছাড়া আরো তেইশটি যৌগিক স্বরধ্বনি আছে কিন্তু এদের জন্য পৃথক কোনো বর্ণ নেই। অর্থাৎ বাংলা যৌগিক স্বরধ্বনি সাকুল্যে পঁচিশটি। এর মধ্যে নিচে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো :
অ + ও = অও > লও;
অ + এ = অয় > নয়;
আ + ই = আই > গাই;
আ + এ = আয় > খায়;
আ + উ = আউ > হাউ;
ই + আ = ইআ > উড়িয়া;
ই + ই = ইই > দিই;
ই + উ = ইউ > মিউ;
ই + এ = ইএ > গাইয়ে;
ই + ও = ইও > নিও;
উ + ই = উই > ছুঁই;
উ + ও = উও > কুয়ো;
এ + ই = এই > সেই;
ও + উ = ওউ > শৌউ;
ও + ই = ওই > বৌই;
ও + এ = ওএ > যোয়ে;
ও + ও = ওও > ভোও;

প্র : কোন বর্ণ দুটির পূরক উচ্চারণ নেই?

উ : ঙ ঞ।

প্র : ঠোঁট ও দাতের মিত্রতায় উচ্চারিত হয় কোন ধ্বনিটি?

উ : ফ।

প্র : তালব্য উচ্চারণে 'এ' ধ্বনির কয় প্রকার উচ্চারণ হয়েছে? কী কী?

উ : দুই প্রকার : এ-কার (একটি > একটি, চেল > ছেলে)।

প্র : 'অ' ধ্বনির কয় প্রকার উচ্চারণ পাওয়া যায়? কী কী?

উ : দুই প্রকার : স্বাভাবিক ও বিকৃত (অমর > অমর); এবং সাধুরূপ (অজল > গুজল)।

প্র : ধ্বনি উৎপাদনের ক্ষেত্রে মুখবিবরের উচ্চারণের মূল উপকরণ কী কী?

উ : কণ্ঠ ও জিহ্বা।

প্র : ই ও উ ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বা কী অবস্থায় থাকে?

উ : সামনে এগিয়ে আসে।

প্র : বাংলা বর্ণমালার কোন বর্ণটি স্বরমধ্যভাবে উচ্চারিত হয় না?

উ : ং (খাং উ)।

প্র : বাঙালি শিশুরা কোন বর্ণের ধ্বনিগুলো আগে শেখে?

উ : 'প' বর্গের অর্থাৎ ওষ্ঠ্য ধ্বনি।

প্র : 'ম' ধ্বনি কোন স্থান থেকে উচ্চারিত হয়?

উ : জিহ্বের ডগা দন্তমূলকে স্পর্শ করে।

প্র : 'ঐ' কি রকম ধ্বনি?

উ : যৌগিক ধ্বনি (অ+ই)।

প্র : 'ঋ' কোন বর্ণ?

উ : তালব্য বর্ণ।

প্র : প্রত্যেক বর্গের ২য় ও ৪র্থ বর্ণকে বলে?

উ : মহাপ্রাণ বর্ণ।

প্র : 'ত' এর উচ্চারণ স্থান হল?

উ : দন্ত্য।

প্র : 'প' এর উচ্চারণ স্থানের নাম?

উ : ওষ্ঠ্য।

Scanned with CamScanner

প্র : 'অ' এর উচ্চারণ স্থান হলো?
উ : কণ্ঠ্য।
প্র : অ আ ক খ এগুলোকে কি বলে?
উ : বর্ণ।
প্র : জিহ্বার গোড়াদি ও তালুর নরম অংশের সংযোগে কোন ধ্বনিগুলো উচ্চারিত হয়?
উ : ক খ গ ঘ।
প্র : 'ল' ধ্বনি কোন স্থান থেকে উচ্চারিত হয়?
উ : জিভের ডগা উপরের পাটি দাঁতকে স্পর্শ করে।
প্র : জিভের ডগা আর উপর পাটি দাঁতের সংস্পর্শে উচ্চারিত ধ্বনি কোনগুলো?
উ : ত থ দ ধ ন।
প্র : ঙ ঞ ণ ন, ং ঃ ধ্বনিগুলো ইংরেজি করলে কোন বর্ণ লিখতে হয়?
উ : N (এন)।
প্র : অন্তঃস্থ বর্ণ কাকে বলে?
উ : যে বর্ণগুলো স্পর্শ বর্ণের অন্তে স্থিত (কিন্তু উষ্মবর্ণের পূর্বে) তাকে অন্তঃস্থ বর্ণ বলে।
প্র : অন্তঃস্থ বর্ণের মধ্যে অর্ধস্বর বা Semi-vowels কোনগুলো?
উ : য, ব
প্র : 'হ্' বর্ণের পরিচয় দাও।
উ : 'হ্' কণ্ঠজাত উষ্ম ঘোষবর্ণ। যদি 'ঁ' (য-ফলা)-র সঙ্গে যুক্ত হয় তবে এর উচ্চারণে 'ঝ'-এর মতো হয়। য-ফলাসহ এর উচ্চারণ দাঁড়ায় 'জ্‌ঝ'।
প্র : 'ং' বর্ণের পরিচয় দাও।
উ : 'ং' পরাশ্রিত বর্ণ। নিজে এককভাবে কোনো শব্দে অবস্থান করতে পারে না। বাংলায় এর উচ্চারণ 'ঙ'-এর মতো।
প্র : ' ঁ ' বর্ণের পরিচয় দাও।
উ : ' ঁ ' পরাশ্রিত বর্ণ। অন্যবর্ণের উপরে বসে। মূলত অনুনাসিক। যে-বর্ণের উপরে ' ঁ ' বসে সেই বর্ণকে নাসিকা-সংযোগে উচ্চারণ করতে হয়।

যুক্তব্যঞ্জন বিশ্লেষণ

বাংলা বানানে যুক্তবর্ণ অনিবার্য নিয়তি। প্রাচীনকালে হাতে লেখার প্রথম পর্যায়ে বর্ণগুলো পরস্পরের সঙ্গে খুবই লাগিয়ে দেয়া হতো। পরে লেখকের দ্রুততার কারণে বর্ণগুলো ছিন্নরূপ নিয়ে নেয়। যেমন : 'এ' এর সঙ্গে 'ক' যুক্ত হলে 'ক্ক' হয়। এটা লেখা ও বোঝা সহজ। জটিল। যৌগিক বর্ণগুলো ছাড়া বাংলা স্বরবর্ণে কোনো যুক্তাক্ষর নেই। কিন্তু ব্যঞ্জনবর্ণে এ যুক্তাক্ষরের সংখ্যা প্রচুর। বাংলা ৩০টি ব্যঞ্জনবর্ণ বাইরে এগুলো নতুন করে শিখতে হয়। এ যুক্তবর্ণ বাংলা ভাষা লেখার ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি করে।

যুক্তব্যঞ্জন স্পষ্টতার দিক থেকে দুভাগে ভাগ করতে পারি : স্পষ্ট যুক্তব্যঞ্জন; অস্পষ্ট যুক্তব্যঞ্জন। স্পষ্ট যুক্তব্যঞ্জন বলব সেগুলোকেই, যেখানে যুক্ত হওয়া বর্ণগুলো স্পষ্ট করে বোঝা যায়। যেমন : প + ন = প্ন; জ + জ + ব = জ্জ্ব ইত্যাদি। আর অস্পষ্ট যুক্তব্যঞ্জন বলব সেগুলোকে, যেখানে যুক্ত হওয়া বর্ণগুলো স্পষ্ট বোঝা যায় না, আয়াস করে বুঝে নিতে হয়। যেমন : এ্ + চ = ঞ; ক্ + ষ = ক্ষ; হ্ + ম = হ্ম ইত্যাদি। অন্যদিকে যুক্তব্যঞ্জনকে বর্ণের সংখ্যা অনুসারে দুভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন : দ্বিযুক্তব্যঞ্জন ও বহুযুক্তব্যঞ্জন। যে যুক্তব্যঞ্জনে দুটো বর্ণ যুক্ত হয় (স্পষ্ট বা অস্পষ্ট যেমনই হোক) তাকে দ্বিযুক্তব্যঞ্জন বলে। যেমন : ব্ + ব = ব্ব; এ্ + জ = ঞ্জ; ট্ + ট = ট্ট ইত্যাদি। আর যে যুক্তব্যঞ্জনে দুয়ের অধিক বর্ণযুক্ত হয় (স্পষ্ট বা অস্পষ্ট যেমনই হোক) তাকে বহুযুক্তব্যঞ্জন বলে। যেমন : চ্ + ছ্ + ব = চ্ছ্ব; ন্ + ত্ + ব = ন্ত্ব; ত্ + ম্ + য = ত্ম্য; ন্ + ধ্ + র = ন্ধ্র ইত্যাদি। ফলাও একটি ব্যঞ্জন হিসেবে মান্য।

পশ্চিমবঙ্গে সম্প্রতি সরকারিভাবে লিপিসংস্কার করার চেষ্টা হচ্ছে। এর ফলে অস্পষ্ট ব্যঞ্জনসমূহ তারা যথাসম্ভব ভেঙে লিখছেন। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বই ছাড়া বাংলাদেশের সর্বত্র অস্পষ্ট ব্যঞ্জন বর্ণ পরিদৃষ্ট হয়।

প্র : র্ক-এখানে কোন কোন ব্যঞ্জন যুক্ত আছে?
উ : র্ + ক।
প্র : র্ক-সহযোগে গঠিত শব্দ লেখ।
উ : তর্ক, অর্ক ইত্যাদি।

প্র : ক্ক-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : ক্ + ক।
প্র : ক্ক-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : প্রাকাল, বৃক্কট, বৃক্ক, চক্কা, থাক্কা ইত্যাদি।
প্র : ক্ক-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : ক্ + ব।
প্র : ক্ক-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : পক্ক, কুচিৎ, নিক্কণ, কৃণ, ক্বাথ, দ্বাবি।
প্র : ক্ষ-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : ক্ + ষ।
প্র : ক্ষ-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : পরীক্ষা, ক্ষিপ্রা, অক্ষয়, দীক্ষিত ইত্যাদি।
প্র : ক্ক-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : ক্ + ক্ + ষ।
প্র : ক্ক-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : আকাঙ্ক্ষা, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, শুভাকাঙ্ক্ষী।
প্র : ক্ষ্ম বর্ণটি বিশ্লেষণ কর।
উ : ক্ + ষ্ + ম।
প্র : ক্ষ্ম-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দের প্রয়োগ দেখাও।
উ : লক্ষ্মী, লক্ষ্মণ ইত্যাদি।
প্র : ক্ষ-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : হ্ + ম।
প্র : হ্ম-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ব্রহ্ম, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মপুত্র।
প্র : জ্ঞ-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : জ্ + ঞ।
প্র : জ্ঞ-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : জ্ঞান, প্রজ্ঞা, জ্ঞাত, বিজ্ঞান, অভিজ্ঞান।
প্র : জ্জ্ব-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : জ্ + জ্ + ব।
প্র : জ্জ্ব-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : উজ্জ্বল, ঔজ্জ্বল্য ইত্যাদি।
প্র : ঞ্জ-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : ঞ্ + জ।
প্র : ঞ্জ-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : গঞ্জ, অঞ্জন, খঞ্জন, গঞ্জনা ইত্যাদি।
প্র : ঞ্চ-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : ঞ্ + চ।
প্র : ঞ্চ-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : সাঞ্চয়, সঞ্চালা, অঞ্চল, সঞ্চারিতা, সঞ্চিতা।
প্র : চ্ঞ-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : চ্ + ঞ।
প্র : চ্ঞ-সহযোগে গঠিত একটি শব্দ লেখ।
উ : যাচ্ঞা।
প্র : ঞ্ছ-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : ঞ্ + ছ।
প্র : ঞ্ছ-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : বাঞ্ছা, বাঞ্ছনীয়, লাঞ্ছিত, লাঞ্ছনা, লাঞ্ছিত।
প্র : ঞ্ঝ-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : ঞ্ + ঝ।
প্র : ঞ্ঝ-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : ঝঞ্ঝা, ঝঞ্ঝাট ইত্যাদি।
প্র : ঞ্ঝ-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : ঞ্ + ঝ।
প্র : ঞ্ঝ-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : কৃষ্ণা, কৃষ্ণচূড়া, তৃষ্ণা, উষ্ণ ইত্যাদি।
প্র : ট্ট-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : ট্ + ট।
প্র : ট্ট-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : চট্টলা, চট্টগ্রাম, চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি।
প্র : ট্র-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : ট + র (ফলা)।
প্র : ট্র-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : ট্রাক, ট্রেন, ট্রাম ইত্যাদি।
প্র : ত্ত-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : ত্ + ত।
প্র : ত্ত-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : মত্ত, চিত্ত, উত্তাল, প্রদত্ত ইত্যাদি।
প্র : ক্ত-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : ক্ + ত।
প্র : ক্ত-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : উক্ত, ব্যক্ত, ভক্তি, শক্তি ইত্যাদি।
প্র : ত্ন-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : ত্ + ন।
প্র : ত্ন-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : যত্ন, প্রযত্ন, প্রত্ন, রত্ন ইত্যাদি।
প্র : ত্ম-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : ত্ + ম।

Scanned with CamScanner

প্র : ঋ-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : আত্মা, আত্মিক, মাতৃত্বক, সর্বাত্মক।
প্র : ক্ত-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : ক্ + ত (ফলা)।
প্র : ত্র-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : পত্র, মিত্র, পবিত্র ইত্যাদি।
প্র : ক্র-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : ক্ + র (ফলা) + ঊ (কার)।
প্র : ক্র-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : ক্রটি, শত্রু, শত্রুঘ্ন ইত্যাদি।
প্র : ক্র-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : ক্ + র (ফলা)।
প্র : ক্র-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : ক্রেতা, ক্রীড়া, বিক্রি, ক্রয় ইত্যাদি।
প্র : থ-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : ত্ + থ।
প্র : থ-সহযোগে যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : উত্থান, উত্থিত ইত্যাদি।
প্র : দ্ধ-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : দ্ + ধ।
প্র : দ্ধ-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : দ্বাদশ, দ্বিতীয়, দ্বেষ, বিদ্বান ইত্যাদি।
প্র : দ্ধ-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : দ্ + ধ।
প্র : দ্ধ-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : যুদ্ধ, আবদ্ধ, উদ্ধার, উদ্ধত ইত্যাদি।
প্র : দ্ধ-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : দ্ + ধ।
প্র : দ্ধ-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : মুগ্ধ, দগ্ধ, মুগ্ধ ইত্যাদি।
প্র : ন্ধ- এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : ন্ + ধ।
প্র : ন্ধ-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : অন্ধকার, বন্ধ, সম্বন্ধ, প্রবন্ধ ইত্যাদি।
প্র : ন্ত্র-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : ন্ + ত্ + র (ফলা) + অ (ফলা)।
প্র : ন্ত্র-সহযোগে গঠিত শব্দ লেখ।
উ : মন্ত্রণা।
প্র : ন্দ-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : ন্ + দ।

প্র : ন্ধ-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : ক্রুদ্ধ, ক্রুব্ধ, উপলব্ধি ইত্যাদি।
প্র : ন্ধ্র-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : ন্ + ধ্।
প্র : ন্ধ্র-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ ইত্যাদি।
প্র : হ্ন-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : হ্ + ন।
প্র : হ্ন-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : চিহ্ন, মধ্যাহ্ন, ন্যায়াহ্ন ইত্যাদি।
প্র : হ্ম-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : হ + ম (কার)।
প্র : হ্ম-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : হৃদ, সুহৃদ, হৃদয় ইত্যাদি।
প্র : হ্ল-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : হ্ + ল (ফলা)।
প্র : হ্র-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : হ্রদ, হ্রাস, হ্রী (লজ্জা) ইত্যাদি।

ধ্বনি পরিবর্তন

ভাষা বহমান নদীর মতো। এই বহমানতা রক্ষিত হয় মৌখিকভাবে ধ্বনি পরিবর্তন এবং লেখার ক্ষেত্রে বিবর্তিত শব্দের মাধ্যমে। ১৮৭৫ সালে বিশ্ব-ধ্বনিবিজ্ঞানীরা এক মত হয়ে বলেন যে, ভাষায় ধ্বনি পরিবর্তন একটি নিয়মিত ব্যাপার। কোনো ভাষার ধ্বনি পরিবর্তনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেলে তা মৃতভাষাতে পরিণত হবে এবং অতি-পরিবর্তন হলে সে ভাষা তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারাবে (সম্প্রতি বাংলা ভাষায় কি অতি-পরিবর্তনের প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে না?)।

প্র : ধ্বনি পরিবর্তন কী?
উ : কোনো ভাষার শব্দ বহুজনে ব্যবহার হতে হতে কখনো সেই শব্দের ধ্বনিসমূহে নির্দিষ্ট ক্রমরক্ষা হয় না অথবা এর কোনো কোনো ধ্বনি লোপ বা এতে ধ্বনির আগমন ঘটে কিন্তু আগের অর্থ বোঝায়। শব্দের ধ্বনিসমূহের এ রূপ পরিবর্তনকে ধ্বনি পরিবর্তন বলে। যেমন :
স্থূল > ইস্থুল,
পিশাচ > পিসাচ,
ফিনাইনস > ফিনাইস > ফিসেনা ইত্যাদি।

প্র : ধ্বনি পরিবর্তনের কারণসমূহ কী?
উ : * উচ্চারণের দ্রুততা
* উচ্চারণে সহজতা
* উচ্চারণের সময় অসাবধানতা
* মুখগহ্বরের প্রত্যঙ্গ-আড়ষ্টতা বা হীনতা।

প্র : স্বরাগম কী?
উ : এক ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন। উচ্চারণের কারণে অনেক শব্দে যে ধ্বনি নেই তাও এসে গেলে তাকে ধ্বনির আগম বা ধ্বন্যাগম বলে। আগত ধ্বনি স্বরধ্বনি হলে বলে স্বরাগম, ব্যঞ্জনধ্বনি হলে বলে ব্যঞ্জনাগম।

প্র : আদি স্বরাগম কাকে বলে?
উ : ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে মূল শব্দের আদিতে স্বরধ্বনির আগমন ঘটাকে। যেমন :
স্থুল > ইস্থুল,
স্পর্ধা > আস্পর্ধা,
স্ত্রী > ইস্ত্রী,
স্টেশন > ইস্টেশন,
স্তাবল > আস্তাবল,
স্টিমার > ইস্টিমার ইত্যাদি।

প্র : মধ্য স্বরাগম কাকে বলে?
উ : ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে মূল শব্দের মধ্যে স্বরধ্বনির আগমন ঘটাকে মধ্য স্বরাগম বলে। যেমন : রত্ন > রতন, ধর্ম > ধরম, স্বপ্ন > স্বপন, নয়ন > নয়ান, প্রীতি > পীরিতি, ফিল্ম > ফিলিম, মুক্তা > মুকুতা, ভ্রু > ভুরু, গ্রাম > গেরাম , শ্লোক > শোলোক, মুরগ > মুরোগ > মোরগ, ক্লিপ > কিলিপ, শুক্রবার > শুক্কুরবার ইত্যাদি।

প্র : অন্ত্য স্বরাগম কাকে বলে?
উ : ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে মূল শব্দের অন্তে বা শেষে স্বরধ্বনির আগমন ঘটাকে। যেমন : সত্য > সত্যি, বেঞ্চ > বেঞ্চি, ট্যাক্স > ট্যাকসো, দিশ্ > দিশা ইত্যাদি।

প্র : অপিনিহিতি কাকে বলে?
উ : শব্দের মধ্যে ই বা উ ধ্বনি থাকলে তাদের উচ্চারণ যথাস্থানের আগে করার প্রবণতা। এর দরুন ই অথবা উ নির্দিষ্ট স্থানের আগে উচ্চারিত হলে তাকে অপিনিহিতি বলে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এই ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। যেমন : আজি > আইজ, চাটি > চাইট, মাতি > মাইত, জাতিয়া > জাইতা, বাতি > বাইত, কালি > কাইল ইত্যাদি। শব্দে আপাতত দেখা যাচ্ছে না, তবে অন্তর্নিহিত আছে, এমন ক্ষেত্রেও অপিনিহিতি হয়। যেমন : আগা (ভাগইয়া) > ভাইগা, বাত্যা (বাতইয়া) > বাইত্যা, সত্য (সতইয়া) > সইত্যা। অনুরূপ : কন্যা > কইন্যা, লক্ষ > লইক্ষ, লক্ষ > লইক্ষ, কাব্য > কাইব্য। সাধু > সাইধ, মাধুয়া > মাইধ্যা ইত্যাদি।

প্র : অভিশ্রুতি কাকে বলে?
উ : অপিনিহিতির প্রভাবজাত ই কিংবা উ-ধ্বনি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিলে শব্দের পরিবর্তন ঘটালে তাকে অভিশ্রুতি বলে। বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষায় যেমন অপিনিহিতির প্রাচুর্য, পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক কথ্যভাষা ও মান্যচলিত ভাষায় তেমনি অনেক অভিশ্রুতি শব্দ লক্ষ করা যায়। যেমন : মানিষ্য > মাইন্যা > মোনে, করিয়া > কইর‍্যা > করে, বাড়িয়া > বাইড়্যা > বেড়ে, শহরিয়া > শইরর‍্যা > শহুরে, মাছুয়া > মাউছ্যা > মোছো, আজি > আইজ > আজ, মাঠুয়া > মাউঠ্যা > মেঠো, হাটুয়া > হাউট্যা > হেটো ইত্যাদি।

প্র : অসমীকরণ ধ্বনি পরিবর্তন কাকে বলে?
উ : সমধ্বনি পাশাপাশি উচ্চারণের সময় অনেক ক্ষেত্রে একটি স্বরধ্বনি যুক্ত হলে তাকে অসমীকরণ বলে। যেমন : ফট + ফট > ফটাফট, ধপ + ধপ > ধপাধপ, টপ + টপ > টপাটপ, পট + পট > পটাপট ইত্যাদি।

প্র : স্বরসঙ্গতি কাকে বলে?
উ : পরপর দুটি স্বরধ্বনি থাকলে উচ্চারণের সময় তাদের একটি পরিবর্তিত হয়ে অন্যটির মতো হওয়াকে স্বরসঙ্গতি বা উচ্চতাসাম্য বলে। যেমন : অতি > ওতি (অ = নিম্নমধ্য থেকে পরিবর্তিত হয়ে ও =

Scanned with CamScanner

উচ্চমধ্য হলো। কারণ, ই = উচ্চ উচ্চারণ স্থানীয়। কবুল>কোবুল, বিলাতি>বিলিতি, মুলা>মুলো, বিদ্যা> বিদ্যে ইত্যাদি। স্বরসঙ্গতির আরো উদাহরণ : দেশি > দিশি, শিকা > শিকে, চুলা > চুলো, মোজা > মুজো, মিথ্যা > মিথ্যে, ফিতা > ফিতে, নৌকা > নৌকো, পূজা > পুজো, জুতা > জুতো, চুলা > চুলো, জবা > জবো, সুতা > সুতো, বন্যা > বুনো, শিয়াল > শেয়াল, মিঠা > মিঠে, ইচ্ছা > ইচ্ছে, ধুলা > ধুলো, সৌরভ > সৌরোভ, শিখা > শেখা, পোষা > পুষি।

প্র : ধ্বনিলোপ কাকে বলে?

উ : অনেক উচ্চারণের সময় শব্দস্থিত কিছু ধ্বনি উচ্চারিত হয় না। এই প্রক্রিয়াকে ধ্বনিলোপ বলে। স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি উভয়ই লোপ পেতে পারে। স্বরধ্বনি হলে স্বরধ্বনিলোপ, ব্যঞ্জনধ্বনি হলে ব্যঞ্জনধ্বনিলোপ বলে।

প্র : আদিস্বরলোপ কাকে বলে?

উ : শব্দের আদি বা প্রথমে স্বরধ্বনি লোপ পেলে। যেমন : অলাবু > লাবু > লাউ, উদ্ধার > উধার > ধার ইত্যাদি।

প্র : মধ্যস্বরলোপ কাকে বলে?

উ : শব্দের মধ্যে স্বরধ্বনি লোপ পেলে। যেমন : বসতি > বস্তি, গামোছা > গামছা, তৈআরি > তৈরি, সুবর্ণ > স্বর্ণ , উপরে > উপ্রে, অগুরু > অগ্রু ইত্যাদি।

প্র : অন্ত্যস্বরলোপ কাকে বলে?

উ : শব্দের অন্তে বা শেষে স্বরধ্বনি লোপ পেলে। যেমন : আকাশ (অ) > আকাশ্, জল (অ) > জল্, পোকা > পোক্, থোকা > থোক্, আশা (আ) > আশ, আজি (ই) > আজ, চারি (ই) > চার ইত্যাদি।

প্র : স্বরাগম এবং স্বরলোপের মধ্যে সম্পর্কের প্রকৃতি কীরূপ?

উ : স্বরাগম এবং স্বরলোপ উভয়ই একটি বিপরীত প্রক্রিয়া।

প্র : আদিব্যঞ্জনলোপ কাকে বলে?

উ : শব্দের আদি বা প্রথমে ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে। যেমন : রংপুর > অংপুর, গ্রাহক > গাহক, শ্রাবণ > শাবন, স্ফটিক > ফটিক ইত্যাদি।

প্র : মধ্যব্যঞ্জনলোপ কাকে বলে?

উ : শব্দের মধ্যে কোন ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে। যেমন : গোষ্ঠ > গোঠ, মজদুর > মজুর, দুগ্ধ > দুধ ইত্যাদি।

প্র : অন্ত্যব্যঞ্জনলোপ কাকে বলে?

উ : শব্দের শেষে বা অন্তে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে। যেমন : বৌদিদি > বৌদি, আলোক > আলো, ছোটকাকা > ছোটকা, ঝিনাইদহ > ঝিনাইদ, শিয়ালদহ > শিয়ালদ ইত্যাদি।

প্র : অন্তর্হতি কাকে বলে?

উ : শব্দের মধ্যে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে তাকে অন্তর্হতি বলে। যেমন : আলাহিদা > আলাদা, ফাল্গুন > ফাগুন, ফলাহার > ফলার।

প্র : ব্যঞ্জন বিকৃতি কাকে বলে?

উ : শব্দের মধ্যে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে যদি কোনো নতুন ব্যঞ্জনধ্বনি ব্যবহৃত হয়, তাকে ব্যঞ্জন বিকৃতি বলে। যেমন : ধোবা > ধোপা, কবাট > কপাট, ধাইমা > দাইমা, শাক > শাগ ইত্যাদি।

প্র : ব্যঞ্জনচ্যুতি কাকে বলে?

উ : শব্দের শেষে পাশাপাশি সমউচ্চরণ সম্পন্ন দুটো ব্যঞ্জনধ্বনি থেকে একটি লোপ পাওয়াকে ব্যঞ্জনচ্যুতি বা ধ্বনিচ্যুতি বলে। যেমন : বড়দাদা > বড়দা, বড়দিদি > বড়দি ইত্যাদি।

প্র : সমাক্ষর লোপ কাকে বলে?

উ : উচ্চারণের সময় কোনো শব্দে একই জাতীয় অক্ষর অথবা সম (বা একই) অক্ষর (বা Syllable) লোপ পেলে তাকে সমাক্ষর লোপ বলে। যেমন : ছোটদাদা > ছোটদা; বড়দাদা > বড়দা; বউদিদি > বউদি; ঠাকুরদাদা > ঠাকুরদা; ভাইশ্বশুর > ভাইশুর > ভাশুর। সমাক্ষর লোপ ব্যঞ্জনচ্যুতি ও ব্যঞ্জনলোপের উদাহরণও বটে।

প্র : ধ্বনিবিপর্যয় কাকে বলে?

উ : উচ্চারণের সময় শব্দের কোনো কোনো ধ্বনি স্থান পরিবর্তন হলে। একে বর্ণ বিপর্যয়ও বলা হয়। যেমন : নকশা > নশকা, কলমি > কমলি, পিশাচ > পিচাশ, বাক্স > বাসক, রিক্সা > রিস্কা, লাফ > ফাল, তলোয়ার > তরোয়াল, চাকরি > চারকি, লোকসান > লোসকান, টুলটুলা > পুতপুতা, বাঁশঝেড় > ঝাঁশবেড় ইত্যাদি।

প্র : সমীকরণ কাকে বলে?

উ : দেখা যায় পর পর উচ্চার্য দুটি ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ স্থান পৃথক হলে একটির ধ্বনি বদলে যায়, যাতে ধ্বনি দুটির উচ্চারণস্থান এক কিংবা কাছাকাছি হয়, একপ হলে। যেমন : অনু + স্থান= অনুস্থান (এখানে স > থ হলে উচ্চারণস্থানের পরিবর্তন হেতু থ > ঠ হচ্ছে। এতে থ ও ঠ একই উচ্চারণ স্থানীয় হল।)

প্র : সমীভবন কাকে বলে?

উ : উচ্চারণের সময় পাশাপাশি অবস্থিত দুটি ব্যঞ্জনধ্বনি একই রকম হয়ে যাওয়া, কিংবা একই রকম হওয়ার প্রবণতাকে বলা হয় সমীভবন। সমীভবনকে ব্যঞ্জনসঙ্গতিও বলা হয়। যেমন : দুর্গা > দুগ্গা, জন্ম > জম্ম ইত্যাদি।

প্র : পরাগত সমীভবন কাকে বলে?

উ : সমীভবন ঘটিত পরিবর্তনটি যদি প্রথম ধ্বনির ক্ষেত্রে ঘটে এবং প্রথম ধ্বনি পরের ধ্বনির মতো হয়। যেমন : গল্প > গপ্প, তৎ + জন্য > তজ্জন্য, তৎ + হিত > তদ্ধিত, উৎ + মুখ > উন্মুখ, বদ্ + জাত > বজ্জাত ইত্যাদি।

প্র : প্রগত সমীভবন কাকে বলে?

উ : সমীভবন ঘটিত পরিবর্তন যদি দ্বিতীয় ধ্বনির ক্ষেত্রে ঘটে এবং দ্বিতীয় ধ্বনি প্রথম ধ্বনির মতো হয়। যেমন : চন্দন > চন্নন, পদ্ম > পদ্দ, পক্ক > পক্ক, চক্র > চক্কর, লগ্ন > লগ্গ ইত্যাদি।

প্র : অন্যোন্য সমীভবন কাকে বলে?

উ : যে সমীভবন প্রক্রিয়ায় শব্দস্থিত দুটো ব্যঞ্জন ধ্বনির রূপান্তর হয়। যেমন : বৎসর > বছর, সত্য > সচ্চ (পরে স্বরাগমের মাধ্যমে সচ্চ > সাচ্চা হয়), বিদ্যা > বিজ্জা (এখানে 'বিদ্যা'র য-ফলা অর্থাৎ য > জ এর মত উচ্চারণ হয়ে দ্বিত্ব হচ্ছে) ইত্যাদি।

প্র : বিষমীভবন কাকে বলে?

উ : দুটো সমবর্ণের একটির অপরিবর্তনকে বিষমীভবন বলে। যেমন : শরীর > শরীল, লাল > নাল, আরশি > আলশি, অকাল > অকাল, মরণ > মারণ, লাঙল > নাঙল, নুকসান (আরবি) > লোকসান ইত্যাদি।

প্র : শুনীকরণ কাকে বলে?

উ : শব্দে / ঃ / ধ্বনির আগে বা পরে যদি স্বরধ্বনি থাকে তবে উচ্চারণের সময় অনেক ক্ষেত্রে / ঃ / ধ্বনির লোপ ঘটে। / ঃ / ধ্বনির এই লোপকরণ-রীতির নামই শুনীকরণ। যেমন : বড়ে > বড়, বড়ে > বড়; সরে > সর। আঞ্চলিক বা চলতিরীতির বাংলায় এর উদাহরণগুলো।

প্র : য-শ্রুতি, ই-শ্রুতি, (অন্তঃস্থ) ব-শ্রুতি কাকে বলে?

উ : ধ্বনিবিজ্ঞানে Glide বলে একটি প্রবৃত্তি আছে; এর বঙ্গানুবাদ শ্রুতি। স্বর উচ্চারণ সহজ, এটা ঠিক। কিন্তু কখনো দুটো স্বরের উচ্চারণ করতে কষ্ট হতে পারে। এরকম হলে শব্দস্থানে দুই স্বরের মধ্যে য-ধ্বনি (y) বা ই-ধ্বনি (i) বা অন্তঃস্থ ব-ধ্বনির (w = বাংলায় ওয়, ও-এর মতো উচ্চারণ।) আগমন ঘটতে পারে। এগুলোকে Glide বা শ্রুতি ধ্বনি বলে। য-এর আগমন হলে য-শ্রুতি; ই-এর আগমন হলে ই-শ্রুতি; (অন্তঃস্থ) ব-এর আগমন হলে ব-শ্রুতি হয়। যেমন : কেআ > কেয়া; শূকর > শুঅর > শুয়র; করিআ > করিয়া; মেআ > মেয়া; খেআ > খেয়া; পিউ > পিইউ; নিউ > নিইউ; যাআ > যাওয়া; যাআ > যাওয়া ইত্যাদি।

প্র : র-ভ্রান্তি কিভাবে হয়?

উ : অন্য ব্যঞ্জনের পূর্বে র-ধ্বনির আগমন পূর্বক উচ্চারণের মাধ্যমে র-ভ্রান্তি হয়ে থাকে। সাধারণত গ্রাম্য ও অশিক্ষিতজনের উচ্চারণে এই প্রবণতা লক্ষ করা যায়। অল্পশিক্ষিত লেখকের হাতে, যেখানে 'র' নেই সেখানেও 'র'-এর আমদানি এই ভ্রান্তির কারণেই ঘটে থাকে বলে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন। যেমন : সাহায্য > (সাহায্য) সাহার্য; চিন্তান্বিত > চিন্তার্নিত; মোকদ্দমা > মোকর্দমা ইত্যাদি। র-ভ্রান্তি এ ব্যঞ্জনাগমও বটে।

Scanned with CamScanner

ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান

প্র : ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান কী?

উ : বাংলা ভাষায় বহু সংস্কৃত বা সংস্কৃতসম (তৎসম) শব্দ আছে, সংস্কৃত ভাষার ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান বাংলা রীতিতে কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা নিয়ম আকারে লেখাকে ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান বলে।

প্র : ণ ব্যবহার হয় এমন দুটি নিয়ম লেখ।

উ : ১. ট বর্গের আগে ণ হবে। যেমন: কণ্টক, খণ্ড, ঘণ্টা, কাণ্ড ইত্যাদি।

২. ঋ র ষ বর্ণের পরে ণ হবে। যেমন: তৃণ, ঋণ, বেণু, বিশেষণ, দূষণ, ভূষণ, তর্কীয়, তৃণ, বর্ণ, স্মরণ ইত্যাদি।

প্র : ণ-ত্ব বিধানের দুটি অন্য নিয়ম লেখ।

উ : ১. ঋ র ষ ধ্বনির পর যদি কোনো স্বরবর্ণ ক-বর্গ, প-বর্গ, য, ব, হ, ং ধ্বনি থাকে, তার পরে ণ হবে। যেমন: গ্রহণ, পরিবহণ, পরিমাণ, রোদন, ব্রহ্মণ, কর্ষণ, গ্রহণ, ব্রাহ্মণ, নির্মাণ ইত্যাদি।

২. ঋ র ষ-এর পর চ-বর্গ, ত-বর্গ, ট-বর্গের কোনো বর্ণ থাকলে এরপর ণ না হয়ে ন হবে। যেমন: রচনা, রটনা, রাত্রিন্দিন, আবর্জনা ইত্যাদি।

প্র : নিত্য মূর্ধন্য ণ বিধান কী?

উ : কোনো কোনো তৎসম শব্দে স্বাভাবিকভাবেই ণ ব্যবহৃত হয়। এর জন্য কোনো নিয়ম রীতি নেই। এগুলোকে নিত্য মূর্ধন্য-ণ বলে। যেমন : অণু, কঙ্কণ, নিপুণ, পণ্য, পাণি, পুণ্য, ফণী, বণিক, বাণ, লাবণ্য, ক্ষুণ্ণ, মণি, বেণু, বীণা, কণিকা, বাণিজ্য, লবণ, মণ্ড, বেণী, বিপণী, আপণ, পণ, শোণিত, মণি, বেণী, বিপণী, আপণ, পণ, শাণ, নিকুণ ইত্যাদি। এসব বানানে ণ এর স্থলে ন লিখলে ভুল হবে।

গল্পচ্ছলে এগুলো মনে রাখা যায় :

এক বণিক কয়েকশ মণ লবণ বাণিজ্য করে। মণি, মাণিকা তার শোনার কণিকায় নেই। অণু পরমের এ নিপুণ লাবণ্যময়ী নারী কঙ্কণ, বেণু আর বীণা হাতে নিপুণ ভঙ্গিতে পাশ বাঁকানো খাটে বা বিছে বণিকের জন্যে বিপণীতে আসে। নিত্য আপণে স্বাদু হয়। বসে বহু পুণ্য ও চাদাকের সঙ্গে আলাপে ব্যস্ত তখন নিপুণ সেই বণিক। অণু পণ করেছিল, তার দেহে এক কণিকা শোণিত থাকলেও কণিকের মুখোমুখি হবে সে এবং পরিণতে থাকবে তার মৃত্যুবরণ।

প্র : ষ-ত্ব বিধানের দুটির সরল নিয়ম লেখ।

উ : ১. ট ও ঠ ধ্বনির আগে যুক্তবর্ণরূপে সর্বদা ষ হবে। যেমন : স্পষ্ট, কাষ্ঠ, ষষ্ঠ, কষ্ট, নিষ্ঠুর, নষ্ট ইত্যাদি।

২. ঋ-কার ও র-এর পর ষ হয়। যেমন : কৃষক, বর্ষা, কর্ষণ, বৃষ্টি, তৃষা ইত্যাদি।

প্র : ষ-ত্ব বিধানের অন্য দুটি নিয়ম লেখ।

উ : ১. ই-কার ও উ-কারান্ত উপসর্গের পর কতকগুলো ধাতুতে (যেমন : সদ, সিচ, সনুজ, সিধ, সেন্, স্থা) ষ হয়। যেমন: অভি-সেক>অভিষেক, সু-সুপ্ত>সুষুপ্ত, অনু-সঙ্গ> অনুষঙ্গ, প্রতি-সেধক> প্রতিষেধক, প্রতি-স্থান> প্রতিষ্ঠান, অনু-স্থান> অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

২. অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি এবং ক/র-এর পর ষ প্রয়োগ হলে তা অবিকৃত থাকে। যেমন : ভবিষ্যৎ, মুমূর্ষু, চক্ষুষ্মান, বিষয়, সুষমা, চিকীর্ষা ইত্যাদি।

প্র : নিত্য মূর্ধন্য-ষ রীতি কী?

উ : কোনো কোনো শব্দে স্বভাবতই ষ বসে, এক্ষেত্রে কোনো ব্যত্যয় ঘটলে বানান ভুল হয়। যেমন : আষাঢ়, বাষ্প, মহিষ, উষা, অভিলাষ, মানুষ, সরিষা, ঔষধ, ঔষধি, ষোড়শ, পৌষ, ভূষণ, রোষ ইত্যাদি।

গল্পচ্ছলে এগুলো মনে রাখা যায় :

বাষ্পহীন আষাঢ়ের ঊষাকালে সরিষা

ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটে। উদাহরণ হিসেবে শত্রু প্রায়শই অভিলাষ হয়, তাদের ঘুমে ভোজন ভূষণ সবসময় যে আপাতই দেখাবে।

প্র : ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব নিয়েম কী?

উ : দুটি ক্ষেত্রে ণ / ষ ব্যবহার করা যাবে না বলে সিদ্ধান্ত আছে। তাকে ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব নিয়েম বলছি। যেমন :

১. যে কোন বিদেশি শব্দে ণ/ষ ব্যবহার ভুল।

২. দেশি শব্দেও ণ/ষ ব্যবহার ভুল।

এছাড়াও সমাসবদ্ধ শব্দে সাধারণ ণ-ত্ব বিধান প্রযোজ্য নয়, এক্ষেত্রে কখনো বিশেষ নিয়ম মেনে রাখতে হয়। একক ক্ষেত্রে 'না' হয়। যেমন— ধানমন্ডি, [illegible] ইত্যাদি।

প্র : কতকগুলি বিদেশি শব্দের শুদ্ধ বানান লেখ।

উ : স্টেশন > ষ্টেশন, স্টুডিও > ষ্টুডিও, অফিসার্স > অফিসার্স, মডার্ন > মডার্ন, কলার > কলার, স্কুল > স্কুল, স্কলার > স্কলার, স্কলারশিপ > স্কলারশিপ, স্কলার > স্কলার ইত্যাদি।

সন্ধি

সন্ধি ভাষার একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। ভাষায় শব্দাবলি দ্রুত উচ্চারণের সুবিধার্থে বক্তা শব্দস্থিত পাশাপাশি অবস্থিত একাধিক ধ্বনিকে একত্রে উচ্চারণ করেন। এই একত্র উচ্চারণ ঐ ধ্বনিসমূহের বৈশিষ্ট্য মোতাবেক হয়ে থাকে। বক্তার স্বেচ্ছাচারিতার উপর তা নির্ভরশীল নয়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, সব ভাষাতেই সন্ধি আছে। তিনি ইংরেজি ভাষার উদাহরণ দিয়ে লিখেছেন : 'extraordinary – উচ্চারণে [ikstrordinari] (a এবং o-এর সন্ধিতে প্রথম স্বর-ধ্বনি লোপ)' ঘটে। তবে একথা ঠিক, সব ভাষাতেই নিজস্ব নিয়মে সন্ধি সম্পন্ন হয়। ইংরেজির নিয়ম সংস্কৃতে খাটে না, সংস্কৃতের রীতি বাংলায় হুবহু চলে না।

প্র : সন্ধি কাকে বলে?

উ : দ্রুত উচ্চারণের ফলে পরস্পর সন্নিহিত দুই ধ্বনি পরিবর্তন হয়ে এক ধ্বনিতে রূপান্তরকে সন্ধি বলে। বাংলা ভাষার তুলনায় সংস্কৃতে সন্ধি বেশি হয়।

প্র : 'সন্ধি' শব্দের বিশেষণাত্মক রূপ কী?

উ : সম+√ধা (সমভাবে যা ধারণ করে)।

প্র : সন্ধি কত প্রকার ও কী কী?

উ : বাংলা ব্যাকরণ অনুসারে সন্ধি দু প্রকার। স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধি। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে তিন প্রকার: স্বর, ব্যঞ্জন ও বিসর্গ সন্ধি। বাংলা ভাষায় তৎসম শব্দ ব্যবহার হয়, তাই বাংলা সন্ধি আলোচনাকালে বিসর্গ সন্ধি আলোচিত থাকে না।

প্র : সন্ধি ও সমাসের সম্পর্ক কী?

উ : পরস্পর সন্নিহিত দুই ধ্বনির এক ধ্বনিতে পরিণত হওয়ার নাম সন্ধি, আর সমাস বহুপদ একপদে পরিণত হওয়াকে বোঝায়। ফলে সন্ধিতে ধ্বনির সংযোজন ঘটে, সমাসে পুরো শব্দের সংযোজন ঘটে।

প্র : সন্ধির উদ্দেশ্য কী?

উ : উদ্দেশ্য দুটি : শব্দসঞ্চিত উচ্চারণ সহজ করা, ধ্বনিগত মধুরতা ও সমন্বয়।

প্র : যে দুটি শব্দে সন্ধি হয়, সেগুলোকে কী বলে?

উ : প্রথমটি পূর্বপদ, পরেরটি অন্যপদ।

প্র : অন্তরঙ্গসন্ধি কাকে বলে?

উ : যে সন্ধি অর্থাপেক্ষাকারী কোনো শব্দ নয়, কোনো ধ্বনি, অবয়ব, উপসর্গ বা এই জাতীয় শব্দাংশ বা ধ্বনিসমষ্টির সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়। যেমন : পো + ইত্র > পবিত্র। এখানে পো বা ইত্র-র কোনো পৃথক অর্থ নেই।

অনুরূপ : ভক্ত + ত = ভক্ত; মুহ্ + ত = মুগ্ধ; দুহ্ + ত = দুগ্ধ।

Scanned with CamScanner

প্র : ব্যঞ্জনসন্ধি কাকে বলে?
উ : দুটি পদের অন্ত বিসর্গ ছাড়া শব্দ একত্র হলে যে সন্ধি হয়, যেমন : হিমাদ্রি = হিম + অদ্রি। এখানে হিমের ম-এর সঙ্গে অদ্রির অ মিলে ম > মা হয়েছে। এখানে ম-এর পরিবর্তে মা হওয়ায় ব্যঞ্জনসন্ধি হয়েছে।

প্র : স্বরসন্ধি কাকে বলে?
উ : স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনি মিলে যে সন্ধি হয় : পাশে এ প্রকার তাহার এই সন্ধি অধিক দেখা যায়। প্রকৃত শব্দের এই রীতি বাংলায় এসেছে। যেমন : গঙ্গা + ঊর্মি = গঙ্গোর্মি, অতি + ইত = অতীত ইত্যাদি।

প্র : ব্যঞ্জনসন্ধি কাকে বলে?
উ : ব্যঞ্জনধ্বনির আগে বা পরে স্বর অথবা ব্যঞ্জন যে কোনো ধ্বনি সংযুক্ত হয়ে সন্ধিবদ্ধ হোক বা কেন, তাকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলে। যেমন : দিক্ + অন্ত = দিগন্ত, বাক্ + দান = বাগ্দান ইত্যাদি।

প্র : বিসর্গসন্ধি কাকে বলে?
উ : পূর্বপদের বিসর্গের সঙ্গে পরের পদের ব্যঞ্জনধ্বনি কিংবা স্বরধ্বনির সন্ধিকে বিসর্গসন্ধি বলে। যেমন : তত্ত্ব+অধিক = তত্ত্বোধিক, আশীঃ+বাদ = আশীর্বাদ ইত্যাদি।

প্র : বিসর্গসন্ধিকে করলাদে জন্য করা হয়েছে?
উ : দুইভাগে : ক-জাত বিসর্গ (প্রাতঃ) এখানে প্রাতর্ এবং স-জাত বিসর্গ (নমঃ) এখানে নমস্।

প্র : কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্বরসন্ধির উদাহরণ দাও।
উ : হিমালয় = হিম + আলয়
শতক = শত + এক
একত্রিত = একত্র + ইত
ওচ্ছা = গুড় + ইচ্ছা
কাঁকলা = কাঁচা + কলা
শীতার্ত = শীত + ঋত
জনৈক = জন + এক
ঐশ্বর্য = মহা + ঐশ্বর্য
রবীন্দ্র = রবি + ইন্দ্র
পরীক্ষা = পরি + ঈক্ষা
ইত্যাদি = ইতি + আদি
নবোঢ়া = নব + ঊঢ়া
হিতোপদেশ = হিত + উপদেশ
কথোপকথন = কথা + উপকথন

উত্তমর্ণ = উত্তম + ঋণ
অধমর্ণ = অধম + ঋণ
রাজর্ষি = রাজা + ঋষি
তৃষ্ণার্ত = তৃষ্ণা + ঋত
ক্ষুধার্ত = ক্ষুধা + ঋত
মসাধার = মসী + আধার
একোন = এক + ঊন
মাত্রাদেশ = মাতৃ + আদেশ
পিত্রালয় = পিতৃ + আলয়
ভবন = ভো + অন
নরাধম = নর + অধম
হস্তান্তর = হস্ত + অন্তর
কথামৃত = কথা + অমৃত
যথার্থ = যথা + অর্থ
সানুনাসিক = স + অনুনাসিক
পঙ্কধম = পঙ্ক + অধম
পশ্বাচার = পশু + আচার
বেশকম = বেশি + কম
অন্বেষণ = অনু + এষণ
মন্বন্তর = মনু + অন্তর
লবণ = লো + অন
পবিত্র = পো + ইত্র
গবেষণা = গো + এষণা
শায়ন = শে + অন
গায়ক = গৈ + অক
মিশকাল = মিশি + কাল
অর্ধেক = অর্ধ + এক
বধূক্তি = বধূ + উক্তি
লঘূর্মি = লঘু + ঊর্মি
তথৈবচ = তথা + এবচ
বধূৎসব = বধূ + উৎসব
রত্নাকর = রত্ন + আকর
স্বাধীন = স্ব + অধীন
স্বাধিকার = স্ব + অধিকার
স্বেচ্ছা = স্ব + ইচ্ছা
নরেন্দ্র = নর + ইন্দ্র
নীলোৎপল = নীল + উৎপল
হিতৈষী = হিত + ঐষী
মতৈক্য = মত + ঐক্য
মহৌষধি = মহা + ওষধি
উপর্যুক্ত = উপরি + উক্ত
প্রত্যেক = প্রতি + এক
নদ্যম্বু = নদী + অম্বু
স্বল্প = সু + অল্প

অত্যন্ত = অতি + অন্ত
প্রত্যেহ = প্রতি + অহ
গত্যন্তর = গতি + অন্তর
যদ্যপি = যদি + অপি
তন্বী = তনু + ঈ
ধর্মাধর্ম = ধর্ম + অধর্ম
চন্দ্রানন = চন্দ্র + আনন
নিশ্চাই = নিশ্চা + অই
নদ্যুপকণ্ঠ = নদী + উপকণ্ঠ
মাত্রাপদেশ = মাতৃ + উপদেশ
সুক্ত = সু + উক্ত
একৈক = এক + এক

প্র : কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যঞ্জনসন্ধি লেখ।
উ : শিক্ষক = শিচ্ + অক
সুবন্ত = সুপ্ + অন্ত
বাগধারা = বাক্ + ধারা
বাগদত্তা = বাক্ + দত্তা
সচ্চিন্তা = সৎ + চিন্তা
সচ্চরিত্র = সৎ + চরিত্র
কুল্পটিকা = কুৎ + ঝটিকা
উচ্ছ্বাস = উৎ + শ্বাস
উড্ডীন = উৎ + ডীন
ষড়ঋতু = ষট্ + ঋতু
পদ্ধতি = পদ্ + হতি
উদ্যোগ = উৎ + যোগ
সঞ্চয় = সম্ + চয়
দিগন্ত = দিক্ + অন্ত
বাগীশ = বাক্ + ঈশ
কৃদন্ত = কৃৎ + অন্ত
সদুপদেশ = সৎ + উপদেশ
মুখচ্ছবি = মুখ + ছবি
বৃক্ষচ্ছায়া = বৃক্ষ + ছায়া
উচ্চারণ = উৎ + চারণ
শরচ্চন্দ্র = শরৎ + চন্দ্র
উজ্জ্বল = উৎ + জ্বল
যাবজ্জীবন = যাবৎ + জীবন
উচ্ছৃঙ্খল = উৎ + শৃঙ্খল
ষড়যন্ত্র = ষট্ + যন্ত্র
জগন্নাথ = জগৎ + নাথ
শঙ্কা = শম্ + কা
কিঞ্চুত = কিম্ + ভূত
কিন্নর = কিম্ + নর
সন্ধান = সম্ + ধান
স্বয়ংবরা = স্বয়ম্ + বরা
সংগত = সম্ + গত

সংখ = সম্ + খ
অহংকার = অহম্ + কার
সংখ্যা = সম্ + খ্যা
সংলাপ = সম্ + লাপ
কিংবা = কিম্ + বা
সন্ত্রাট = সম্ + রাট
যজ্ঞ = যজ্ + ন
রাজ্ঞী = রাজ্ + ঈ
কৃদ্ধি = কৃধ্ + ধি
যদ্ধ = যধ্ + ধ
বাঙ্ময় = বাক্ + ময়
উদ্ধত = উৎ + হত
ষড়ানন = ষট্ + আনন
বিশ্লেষণ = বি + শ্লেষ
প্রিয়ংবদা = প্রিয়ম্ + বদা
সম্মান = সম্ + মান
সিংহ = সিন্ + হ
হিংসা = হিন্ + সা
চলচ্চিত্র = চলৎ + চিত্র
উদ্যম = উৎ + যম
বাগ্যুদ্ধ = বাক্ + যোদ্ধ
পদ্ধতি = পদ্ + হতি
ক্ষুৎপিপাসা = ক্ষুধ্ + পিপাসা
সম্পন্নাত = সম্পদ্ + লাভ
বসুন্ধরা = বসুন্ + ধরা
বিশ্লেষ = বি + শ্লেষ
বুদ্ধ = বুধ্ + ত
সংস্কৃত = সম্ + কৃত
পরিচ্ছেদ = পরি + ছেদ
কিন্তু = কিন্ + তু
বরঞ্চা = বরম্ + চ

প্র : কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিসর্গসন্ধি লেখ।
উ : প্রাতরাশ = প্রাতঃ + আশ
অতএব = অতঃ + এব
তপোবন = তপঃ + বন
তপোধিক্য = তপঃ + আধিক্য
যশোচ্ছা = যশঃ + ইচ্ছা
শিরোপরি = শিরঃ + উপরি
মনোহর = মনঃ + হর
পুনরায় = পুনঃ +আয়
পুনর্জন্ম = পুনঃ + জন্ম
দুর্যোগ = দুঃ + যোগ
নিরাকার = নিঃ + আকার
নীরস = নিঃ + রস
নীরব = নিঃ + রব

Scanned with CamScanner

অহরহ = অহঃ + অহ
আশীর্বাদ = আশীঃ + বাদ
দুর্লোভ = দুঃ + লোভ
নিশ্চয় = নিঃ + চয়
বহিষ্কার = বহিঃ + কার
ধনুষ্টঙ্কার = ধনুঃ + টঙ্কার
দুস্তর = দুঃ + তর
মনোযোগ = মনঃ + যোগ
দুস্থ = দুঃ + স্থ
শিরশ্ছেদ = শিরঃ + ছেদ
ইতস্তত = ইতঃ + তত
যশোলাভ = যশঃ + লাভ
ধিরাগমন = ধিঃ + আগমন
অন্তর্লীন = অন্তঃ + লীন
ততোধিক = ততঃ + অধিক
পুরস্কার = পুরঃ + কার
তিরস্কার = তিরঃ + কার
আবিষ্কার = আবিঃ + কার
চতুষ্কোণ = চতুঃ + কোণ
মনোজ = মনঃ + জ
দুরাত্মা = দুঃ + আত্মা
দুরবস্থা = দুঃ + অবস্থা
ভ্রাতুষ্পুত্র = ভ্রাতুঃ + পুত্র
শ্রেয়স্কর = শ্রেয়ঃ + কর
ভাস্কর = ভাঃ + কর
যশোভিলাষ = যশঃ + অভিলাষ

প্র : নিপাতনে সিদ্ধ কাকে বলে?

উ : ব্যাকরণের সাধারণ বা বিশেষ কোনো নিয়মানুসারেই যখন কোনো কর্ম ব্যাখ্যা করা যায় না, অথচ তা সংঘটিত হয়, তখন সেই ব্যতিক্রমকে বৈধতা দেয়ার নাম নিপাতনে সিদ্ধ। বৈয়াকরণিকগণ নিপাতনে সিদ্ধ সহযোগে সন্ধিসহ বেশ কিছু বিষয় অনুমোদন করেছেন।

প্র : নিপাতনে সিদ্ধ ও বিশেষ নিয়মে সাধিত কতিপয় সন্ধি উল্লেখ কর।

উ : নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি :

অন্যান্য = অন্য + অন্য
কুলটা = কুল + অটা
গবাক্ষ = গো + অক্ষ
প্রৌঢ় = প্র + ঊঢ়
স্বৈর = স্ব + ঈর
গবেন্দ্র = গো + ইন্দ্র
গবেশ্বর = গো + ঈশ্বর
অক্ষৌহিণী = অক্ষ + ঊহিণী
মার্তণ্ড = মার্ত + অণ্ড
রক্তোষ্ঠ = রক্ত + ওষ্ঠ
সীমন্ত = সীমন + অত
শারঙ্গ = শার + অঙ্গ
শুদ্ধোধন = শুদ্ধ + ওদন

মনে রেখো এভাবে :

স্বৈর রাজা গবেন্দ্র, তাঁর দুই মন্ত্রী গবেশ্বর ও শুদ্ধোধন-কে নিয়ে সকালবেলার মার্তণ্ড (সূর্য) দেখবেন বলে গবাক্ষ (জানালা) পথে তাকালেন। একদিকে দেখলেন শারঙ্গ (এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র) হাতে এক প্রৌঢ় কুলটা (সমাজ যাদের অসতী বলে) নারী। তার সীমন্ত (সিঁথি) এলোমেলো ও রক্তোষ্ঠ। অন্যদিকে দেখলেন অক্ষৌহিণী (২১৮৭০০ যোদ্ধাবিশিষ্ট সেনাদল) সহ তাঁর সেনাপতি ও অন্যান্য মন্ত্রী রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য আসছেন।

নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি :

আশ্চর্য = আ + চর্য
ষোড়শ = ষট্ + দশ
দ্যুলোক = দিব্ + লোক
পতঞ্জলি = পতৎ + অঞ্জলি
একাদশ = এক + দশ
বৃহস্পতি = বৃহৎ + পতি
গোস্পদ = গো + পদ
বনস্পতি = বন + পতি
পরস্পর = পর + পর
তস্কর = তৎ + কর
মনীষা = মনস্ + ঈষা

মনে রেখো এভাবে :

পতঞ্জলি ও মনীষা আশ্চর্য হয়ে পরস্পর তাকায়। সেই তস্করকে (চোর) তারা চিনে ফেলে। গত বৃহস্পতিবার ষোড়শ অথবা একাদশজন মিলে দ্যুলোকের গোস্পদ আর বনস্পতি এরা ধ্বংস করেছে।

বিশেষ নিয়মে সাধিত ব্যঞ্জনসন্ধি :

উত্থান = উৎ + স্থান
সংস্কার = সম + কার
উত্থাপন = উৎ + স্থাপন
পরিষ্কার = পরি + কার
সংস্কৃতি = সম + কৃতি
পরিষ্কৃত = পরি + কৃত
সংস্কৃত = সম + কৃত

মনে রেখো এভাবে :

চুরির এই ঘটনা তারা কোনো সংস্কার না রেখেই সংস্কৃত ভাষায় পরিষ্কারভাবে উত্থাপন করে এবং এতে এক পরিষ্কৃত সংস্কৃতির উত্থান ঘটে।

নিপাতনে সিদ্ধ বিসর্গসন্ধি :

আস্পদ = আঃ + পদ
অহরহ = অহঃ + অহ
ভাস্কর = ভাঃ + কর
বাচস্পতি = বাচঃ + পতি
মনঃকষ্ট = মনঃ + কষ্ট
অহর্নিশ = অহঃ + নিশা
প্রাতঃকাল = প্রাতঃ + কাল
শিরঃপীড়া = শিরঃ + পীড়া
হরিশ্চন্দ্র = হরিঃ + চন্দ্র

মনে রেখো এভাবে :

বাচস্পতি বাবুর স্নেহের আস্পদ হরিশ্চন্দ্র। তিনি অহরহ শিরঃপীড়ায় ভোগেন। তাই প্রাতঃকালে তিনি ভাস্কর (সূর্য) দেখতে পান না বলে অহর্নিশ মনঃকষ্টে আছেন।

লৈঙ্গিক শব্দ

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন :

এক. 'লিঙ্গ' নামে একটি বিষয় বাংলা ব্যাকরণে পঠিত হয়ে আসছে। ইংরেজিতে যাকে Gender বলে বাংলায় তাকে বলা হচ্ছে 'লিঙ্গ'। আবার ইংরেজরা যাকে 'penis' বলেন তাকেও বাঙালিরা চলতি বাংলায় 'লিঙ্গ' বলেই চেনেন। ইংরেজদের 'sex' শব্দের অনুবাদেও বাংলা ভাষায় 'লিঙ্গ' লেখা হয়। (উদাহরণ : 'Sex : Female / Male'। বিভিন্ন ছাপা ফরমে এই উদাহরণটি খুবই দেখা যাবে।) বারংবার 'লিঙ্গ' শব্দের ব্যবহার বাংলার শব্দ-দারিদ্র্যকে প্রকটভাবে প্রকাশ করে। বিশেষ করে 'Gender' বলতে যে প্রতীতি বোঝায় তার জন্য পৃথক শব্দের আগমন জরুরি। ব্যাকরণ পাঠের সময় 'লিঙ্গ' শব্দটি শ্রুতিমধুর হয় না; বারংবার উচ্চারণের সময় ক্ষেত্রবিশেষে তা শিক্ষার্থীদের হাস্যরসের উদ্রেক করে। Gender-এর বাংলা পরিভাষা হিসেবে 'লিঙ্গ'-এর বদলে 'জন' প্রস্তাব করছি।

দুই. প্রচলিত ব্যাকরণে 'স্ত্রীলিঙ্গ' নামে যে প্রতীতি আলোচিত হয় তাকেও 'স্ত্রীলিঙ্গ' না বলে 'নারীলিঙ্গ (জন) বলা সময়ের দাবি। 'স্ত্রীলিঙ্গ' শব্দটি পুরুষের সামন্ত মানসিকতাজাত। নারীরা কেন শুধু 'স্ত্রী' হিসেবে চিহ্নিত হবেন? স্ত্রী-র প্রতিশব্দ পত্নী, জায়া, বধূ, নারী, রমণী, বামা, কামিনী। (দ্র. সংসদ বাঙ্গালা অভিধান) যেখানে 'বালক'-এর লিঙ্গান্তর 'বালিকা' সেখানে 'বালিকা' 'স্ত্রী' হয় কীভাবে? সেদিক থেকে Feminine gender অর্থে স্ত্রীলিঙ্গের বদলে 'নারীজন' এবং Masculine gender অর্থে পুংলিঙ্গের (হাস্যকর : 'পুং') বদলে 'নরজন' শব্দবন্ধ গৃহীত হতে পারে। পশু-পাখির ক্ষেত্রেও এটা গ্রহণ করা যায়। কারণ এখনও 'নর-হাতি', 'নর-চিল' শব্দগুলো প্রচলিত আছে।

প্রস্তাব রইল প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাকরণ-কর্তাদের উদ্দেশে। বর্তমান অধ্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের কথা বিবেচনা করে প্রথাগত শব্দই (অনিচ্ছাসত্ত্বে) ব্যবহার করা হলো।

Scanned with CamScanner

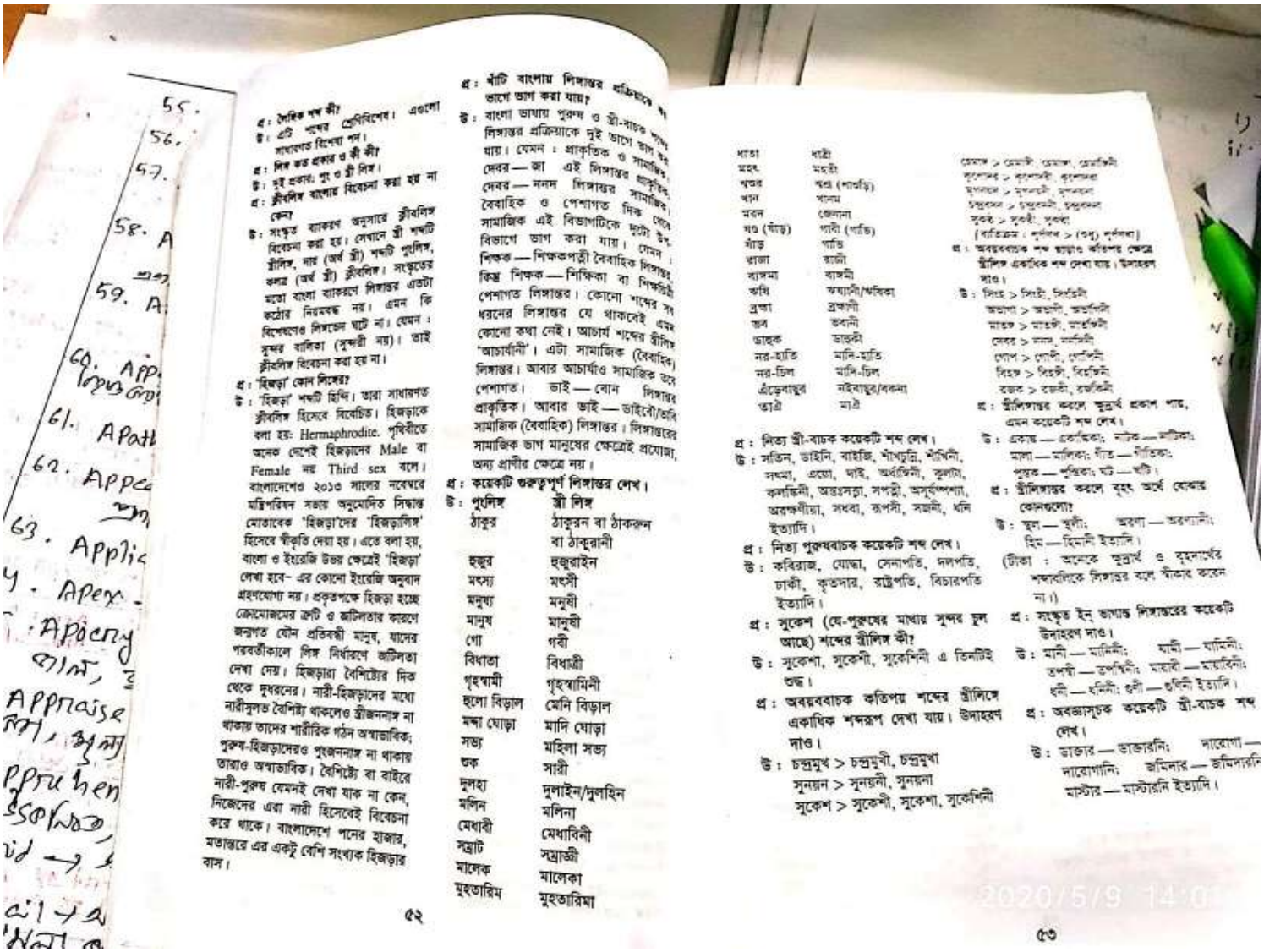

প্র : লৈঙ্গিক শব্দ কী?
উ : এটি শব্দের শ্রেণিবিশেষ। এগুলো সাধারণত বিশেষ্য পদ।
প্র : লিঙ্গ কত প্রকার ও কী কী?
উ : দুই প্রকার: পুং ও স্ত্রী লিঙ্গ।
প্র : ক্লীবলিঙ্গ বাংলায় বিবেচনা করা হয় না কেন?
উ : সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে ক্লীবলিঙ্গ বিবেচনা করা হয়। সেখানে স্ত্রী শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ, দার (অর্থ স্ত্রী) শব্দটি পুংলিঙ্গ, কলত্র (অর্থ স্ত্রী) ক্লীবলিঙ্গ। সংস্কৃতের মতো বাংলা ব্যাকরণে লিঙ্গান্তর এতটা কঠোর নিয়মবদ্ধ নয়। এমন কি বিশেষণেও লিঙ্গভেদ ঘটে না। যেমন : সুন্দর বালিকা (সুন্দরী নয়)। তাই ক্লীবলিঙ্গ বিবেচনা করা হয় না।

প্র : 'হিজড়া' কোন লিঙ্গের?
উ : 'হিজড়া' শব্দটি হিন্দি। তারা সাধারণত ক্লীবলিঙ্গ হিসেবে বিবেচিত। হিজড়াকে বলা হয়: Hermaphrodite. পৃথিবীতে অনেক দেশেই হিজড়াদের Male বা Female নয় Third sex বলে। বাংলাদেশেও ২০১৩ সালের নবেম্বরে মন্ত্রিপরিষদ সভায় অনুমোদিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক 'হিজড়া'দের 'হিজড়ালিঙ্গ' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। এতে বলা হয়, বাংলা ও ইংরেজি উভয় ক্ষেত্রেই 'হিজড়া' লেখা হবে- এর কোনো ইংরেজি অনুবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে হিজড়া হচ্ছে ক্রোমোজমের ত্রুটি ও জটিলতার কারণে জন্মগত যৌন প্রতিবন্ধী মানুষ, যাদের পরবর্তীকালে লিঙ্গ নির্ধারণে জটিলতা দেখা দেয়। হিজড়ারা বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে দুধরনের। নারী-হিজড়াদের মধ্যে নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য থাকলেও স্ত্রীজননাঙ্গ না থাকায় তাদের শারীরিক গঠন অস্বাভাবিক; পুরুষ-হিজড়াদেরও পুংজননাঙ্গ না থাকায় তারাও অস্বাভাবিক। বৈশিষ্ট্যে বা বাইরে নারী-পুরুষ যেমনই দেখা যাক না কেন, নিজেদের এরা নারী হিসেবেই বিবেচনা করে থাকে। বাংলাদেশে পনের হাজার, মতান্তরে এর একটু বেশি সংখ্যক হিজড়ার বাস।

প্র : খাঁটি বাংলায় লিঙ্গান্তর প্রক্রিয়াকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
উ : বাংলা ভাষায় পুরুষ ও স্ত্রী-বাচক শব্দে লিঙ্গান্তর প্রক্রিয়াকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন : প্রাকৃতিক ও সামাজিক। দেবর — জা এই লিঙ্গান্তর প্রাকৃতিক, দেবর — ননদ লিঙ্গান্তর সামাজিক। বৈবাহিক ও পেশাগত দিক থেকে সামাজিক এই বিভাগটিকে দুটো উপ-বিভাগে ভাগ করা যায়। যেমন : শিক্ষক — শিক্ষকপত্নী বৈবাহিক লিঙ্গান্তর কিন্তু শিক্ষক — শিক্ষিকা বা শিক্ষয়িত্রী পেশাগত লিঙ্গান্তর। কোনো শব্দের সব ধরনের লিঙ্গান্তর যে থাকবেই এমন কোনো কথা নেই। আচার্য শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ 'আচার্যানী'। এটা সামাজিক (বৈবাহিক) লিঙ্গান্তর। আবার আচার্যাও সামাজিক তবে পেশাগত। ভাই — বোন লিঙ্গান্তর প্রাকৃতিক। আবার ভাই — ভাইবৌ/ভাবি সামাজিক (বৈবাহিক) লিঙ্গান্তর। লিঙ্গান্তরের সামাজিক ভাগ মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, অন্য প্রাণীর ক্ষেত্রে নয়।

প্র : কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ লিঙ্গান্তর লেখ।

উ : পুংলিঙ্গ	স্ত্রী লিঙ্গ
ঠাকুর	ঠাকুরন বা ঠাকরুন বা ঠাকুরানী
হুজুর	হুজুরাইন
মৎস্য	মৎসী
মনুষ্য	মনুষী
মানুষ	মানুষী
গো	গবী
বিধাতা	বিধাত্রী
গৃহস্বামী	গৃহস্বামিনী
হুলো বিড়াল	মেনি বিড়াল
মদ্দা ঘোড়া	মাদি ঘোড়া
সভ্য	মহিলা সভ্য
শুক	সারী
দুলহা	দুলাইন/দুলহিন
মলিন	মলিনা
মেধাবী	মেধাবিনী
সম্রাট	সম্রাজ্ঞী
মালেক	মালেকা
মুহতারিম	মুহতারিমা

দাতা	দাত্রী
মহৎ	মহতী
শ্বশুর	শ্বশ্রূ (শাশুড়ি)
খান	খানম
মরদ	জেনানা
ষণ্ড (ষাঁড়)	গাভী (গাভি)
ষাঁড়	গাভি
রাজা	রাজ্ঞী
বাদশা	বাঈ
ঋণি	ঋণায়ী/ঋণিকা
প্রভা	প্রভাণী
ভব	ভবানী
ভাবুক	ভাবুকী
নর-হাতি	মাদি-হাতি
নর-চিল	মাদি-চিল
এঁড়েবাছুর	নইবাছুর/বকনা
ভাত্রী	মাত্রী

প্র : নিত্য স্ত্রী-বাচক কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : সতিন, ডাইনি, বাইজি, শাঁখচুন্নি, শঁখিনী, লক্ষ্মী, এয়ো, দাই, অর্ধাঙ্গিনী, কুলীন, কলঙ্কিনী, অন্তঃসত্ত্বা, সপত্নী, অসূর্যম্পশ্যা, অবক্ষণীয়া, সধবা, রূপসী, সজনী, ধনি ইত্যাদি।

প্র : নিত্য পুরুষবাচক কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : কবিরাজ, যোদ্ধা, সেনাপতি, দলপতি, ঢাকী, কুতদার, রাষ্ট্রপতি, বিচারপতি ইত্যাদি।

প্র : সুকেশ (যে-পুরুষের মাথায় সুন্দর চুল আছে) শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ কী?
উ : সুকেশা, সুকেশী, সুকেশিনী এ তিনটিই শুদ্ধ।

প্র : অবয়ববাচক কতিপয় শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে একাধিক শব্দরূপ দেখা যায়। উদাহরণ দাও।
উ : চন্দ্রমুখ > চন্দ্রমুখী, চন্দ্রমুখা
সুনয়ন > সুনয়নী, সুনয়না
সুকেশ > সুকেশী, সুকেশা, সুকেশিনী
হেমাঙ্গ > হেমাঙ্গী, হেমাঙ্গা, হেমাঙ্গিনী
কৃপাসর > কৃপাসরী, কৃপাসরা
মৃণালভ > মৃণালভী, মৃণালভা
চন্দ্রবদন > চন্দ্রবদনী, চন্দ্রবদনা
সুকর্ণ > সুকর্ণী, সুকর্ণা
(ব্যতিক্রম : সুকর্ণক > (বহু) সুকর্ণকা)

প্র : অবয়ববাচক শব্দ ছাড়াও কতিপয় ক্ষেত্রে স্ত্রীলিঙ্গ একাধিক শব্দ দেখা যায়। উদাহরণ দাও।
উ : সিংহ > সিংহী, সিংহিনী
অভাগা > অভাগী, অভাগিনী
মাতঙ্গ > মাতঙ্গী, মাতঙ্গিনী
দেবর > দেবরা, দেবরিনী
গোপ > গোপী, গোপিনী
সিংহ > সিংহী, সিংহিনী
বজত > বজতী, বজতিনী

প্র : স্ত্রীলিঙ্গান্তর করলে ভূয়ার্থ প্রকাশ পায়, এমন কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : একাঙ্ক — একাঙ্কিকা; নাটক — নাটিকা;
মালা — মালিকা; গীত — গীতিকা;
পুস্তক — পুস্তিকা; মঠ — মঠী।

প্র : স্ত্রীলিঙ্গান্তর করলে বৃহৎ অর্থে বোঝার কোনগুলো?
উ : ঘুল — ঘুলী; অরণ্য — অরণ্যানী;
হিম — হিমানী ইত্যাদি।
(টীকা : অনেকে ভূয়ার্থ ও বৃহদার্থের শব্দগুলিকে লিঙ্গান্তর বলে স্বীকার করেন না।)

প্র : সংস্কৃত ইন্ জাতীয় লিঙ্গান্তরের কয়েকটি উদাহরণ দাও।
উ : মানী — মানিনী; মানী — মানিনী;
তপস্বী — তপস্বিনী; মায়াবী — মায়াবিনী;
ধনী — ধনিনী; গুণী — গুণিনী ইত্যাদি।

প্র : অবজ্ঞাসূচক কয়েকটি স্ত্রী-বাচক শব্দ লেখ।
উ : ডাক্তার — ডাক্তারনি; দারোগা — দারোগানি; জমিদার — জমিদারনি
মাস্টার — মাস্টারনি ইত্যাদি।

2020/5/9 14:0

Scanned with CamScanner

বচন

মনে রেখো : বাংলা ভাষায় একটি বাক্যে একাধিক বহুবচনাত্মক শব্দের ব্যবহার ভুল। যেমন : 'সব ছাত্ররা পড়ছে।' এটা ভুল। শুদ্ধ হবে : 'সব ছাত্র পড়ছে' অথবা 'ছাত্ররা পড়ছে।' কিন্তু All students are reading শুদ্ধ বাক্য। যদিও এখানে (All) (students) (are) এই তিনটি বহুবচন ব্যবহার হয়েছে।

প্র : বচন কাকে বলে?
উ : যার দ্বারা ব্যক্তি বা বস্তুর সংখ্যা-জ্ঞান সূচিত ও চিহ্নিত হয় তাকে বচন বলে।

প্র : এক কথায় বচনকে কী বলে?
উ : সংখ্যার ধারণা।

প্র : বচন একটি পারিভাষিক শব্দ। এর মূল শব্দ কী?
উ : Number.

প্র : বচন কত প্রকার?
উ : বচন দু প্রকার : একবচন, বহুবচন।

প্র : সব ভাষাতেই কি এক এবং বহুবচন নির্দিষ্ট?
উ : বচন পরিমাণগত ধারণা দেয়। বাংলা ভাষায় এক এবং বহুবচন থাকলেও পৃথিবীর সব ভাষাতেই এ রীতি অনুসৃত হয়, তা বলা যায় না। সংস্কৃত ভাষাতেই বচন তিন প্রকার। যেমন : একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন। একবচনে নরঃ (একজন পুরুষ মানুষ), দ্বিবচনে নরৌ (দুজন), বহুবচনে নরাঃ (দুয়ের বেশি)। বাংলাও এর প্রয়োগ দেখা যাবে। যেমন : বালকঃ বিনীতস্বভাবঃ (বালকটি বিনীত স্বভাবের।); বালকৌ বিনীতস্বভাবৌ (বালক ও বালিকাটি বিনীত স্বভাবের।); বালকাঃ বালিকাশ্চ বিনীতস্বভাবাঃ (বালক এবং বালিকাগুলো বিনীত স্বভাবের।)- এখানে স্বভাবঃ→ স্বভাবৌ→স্বভাবাঃ যথাক্রমে একবচন → দ্বিবচন → বহুবচনাত্মক। সংস্কৃত ভাষাতে বচন তিন প্রকারের হলেও বাংলা ভাষায় বচন দু রকমেরই।

প্র : কোন ধরনের শব্দের বচনভেদ হয়?
উ : শুধু বিশেষ্য ও সর্বনাম জাতীয় শব্দের বচনভেদ হয়।

প্র : কেবল উন্নত প্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে ব্যবহৃত শব্দ কোনগুলো?
উ : গণ (সবগণ), বৃন্দ (ভক্তবৃন্দ), মণ্ডলী (শিক্ষকমণ্ডলী), বর্গ (পণ্ডিতবর্গ)।

প্র : কেবল অপ্রাণিবাচক শব্দে ব্যবহৃত বহুবচনবোধক শব্দ কোনগুলো?
উ : আবলি (কুসুমাবলি/গ্রন্থাবলি), গুচ্ছ (কবিতাগুচ্ছ), দাম (বৈশাখলদাম), নিকর (কমলনিকর), পুঞ্জ (মেঘপুঞ্জ), মালা (পর্বতমালা), রাজি (তারকারাজি), রাশি (ফুলরাশি)।

প্র : কেবল উন্নত প্রাণিবাচক শব্দের শেষে কোন বিভক্তি যুক্ত হয়?
উ : গণ-বিভক্তি। যেমন— শিক্ষকগণ জ্ঞান দান করেন।

প্র : কেবল জন্তুর বহুবচনে ব্যবহৃত শব্দ কী কী?
উ : পাল ও যূথ। যেমন— হস্তিযূথ দেখে মৃগপাল দৌড়ে পালালো।

প্র : প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক উভয় শব্দের বহুবচনে ব্যবহৃত শব্দসমূহ লেখ।
উ : কুল (ইষ্টককুল/ কবিকুল); নিচয় (পর্বতনিচয়/ মনুষ্যনিচয়); সকল (পর্বতসকল/ মনুষ্যসকল); সব (নখিসব/ পাখিসব); সমূহ (বইসমূহ/ বৃক্ষসমূহ)।

প্র : বিশেষ্য দ্বিত্ব বসে যখন বহুবচন বোঝায়, তার উদাহরণ দাও।
উ : 'পাগল হইয়া ফিরি বনে বনে' –রবীন্দ্রনাথ
'দেশ দেশ নন্দিত করি' –রবীন্দ্রনাথ
'চরকার ঘর্ ঘর্ পল্লীর ঘর ঘর'
–সত্যেন্দ্রনাথ।

প্র : বিশেষণ দ্বিত্ব বসে যখন বহুবচন বোঝায়, তার উদাহরণ দাও।
উ : ছোট ছোট ফল (অনেকগুলো ফল, তবে প্রতিটি ছোট)।
সুন্দর সুন্দর ছেলে (অনেকগুলো ছেলে, তবে সবাই সুন্দর)।

প্র : বিদেশি শব্দে বহুবচনে বিদেশি নিয়ম মানা হয় কি?
উ : সবক্ষেত্রে নয়। যেমন : জনাব > সর্বজনাব, এটা বিদেশি নিয়মে বহুবচন হলো না। কিন্তু সাহেব > সাহেবান; বুজুর্গ > বুজুর্গান বিদেশি নিয়মে হয়েছে।

উপসর্গ

প্র : উপসর্গ কাকে বলে?
উ : উপসর্গ সাধারণত কতিপয় অব্যয়, যা ধাতু বা শব্দের আগে যুক্ত হয় এবং এর অর্থবদল ঘটায়। উপসর্গের নিজের কোনো অর্থ নাও থাকতে পারে, তবে তা অর্থবদলে কার্যকর ভূমিকা রাখে। কখনো একই উপসর্গ একাধিক অর্থে ব্যবহার হতে দেখা যায়। নিলাজ > নি + লাজ। এখানে উপসর্গ : নি।

প্র : উপসর্গকে ইংরেজি ব্যাকরণে কী বলে?
উ : Prefix.

প্র : উপসর্গ শব্দে কী ধরনের পরিবর্তন সাধন করে?
উ : উপসর্গ শব্দে একাধিক পরিবর্তন আনতে পারে। যেমন :
ক. শব্দের সংগঠনগত পরিবর্তন
খ. শব্দের অর্থগত পরিবর্তন
গ. অর্থের সংকোচন বা সম্প্রসারণ
ঘ. অর্থের সম্পূর্ণতা সাধন।
ঙ. শব্দের বিপরীতার্থক পরিবর্তনও আনতে পারে।

প্র : বাংলা ভাষায় কত প্রকারের উপসর্গ আছে?
উ : তিন প্রকার। যেমন : খাঁটি বাংলা, তৎসম (সংস্কৃত) ও বিদেশি।

প্র : খাঁটি বাংলা উপসর্গ কতগুলো?
উ : মোট একুশটি।

প্র : খাঁটি বাংলা উপসর্গগুলো লেখ।
উ : অ / অঘা / অজা / অনা / আ / আড় / আন / আব / ইতি / উন (উনা) / কদ্ / কু / নি / পাতি / বি / ভর / রাম / স / সা / সু / হা = মোট একুশটি।

প্র : খাঁটি বাংলা উপসর্গসমূহ সাধারণত কোন ধরনের শব্দের আগে যুক্ত হয়?
উ : খাঁটি বাংলা শব্দের আগে।

প্র : তৎসম (সংস্কৃত) উপসর্গ কতগুলো?
উ : মোট বিশটি।

প্র : তৎসম (সংস্কৃত) উপসর্গগুলো লেখ।
উ : প্র / পরা / অপ / সম / নি / অব / অনু / নির / দুর / বি / অধি / সু / উৎ / পরি / প্রতি / অপি / উপ / অভি / অতি / আ = মোট বিশটি।

প্র : কোনো শব্দের পূর্বে 'অপ' উপসর্গটি বসলে এর দ্বারা সাধারণত ঋণাত্মক অর্থ বোঝায়। যেমন : অপব্যবহার, অপব্যয় ইত্যাদি। কোন শব্দের আগে 'অপ' ব্যবহার করলে তা নিয়ে খুবই ইতিবাচক অর্থ প্রকাশ পায়?
উ : ক্ষয়। অপ + ক্ষয়= অপক্ষয় বা অপক্ষপা।

প্র : সংস্কৃত উপসর্গগুলো সাধারণ কোন অর্থে ব্যবহার হয়?
উ : প্র > প্রকৃষ্ট, খ্যাতি, গতি, অধিকা;
পরা > বৈপরীত্য, অনাদর, প্রাধান্য;
অপ > বৈপরীত্য, দূরে;
সম > সম্যক, সহিত, সমীপ;
অনু > পশ্চাৎ, পরে, সাদৃশ্য;
নি > নিম্নে, বহির্গত;
অব > অনাদর, নিশ্চয়, অল্প;
নির > অভাব, নিশ্চয়, নিঃশেষ;
দুর > অভাব, মন্দ, নিষিদ্ধ;
বি > বিশেষ, বিপরীত;
অধি > অধিপতা, উপরে;
সু > উত্তম, সহজ;
উৎ > উপর, বিরুদ্ধ, প্রশংসা;
পরি > আতিশয্য, সম্যকরূপ;
প্রতি > সাদৃশ্য, ব্যাপ্তি, বিরোধ;
অভি > সর্বতোভাবে, সম্মুখে;
অতি > আতিশয্য;
অপি > ও, সমুচ্চয়;
উপ > নিকট, সহিত, সাদৃশ্য;
আ> ঈষৎ, অবধি, সীমা।

প্র : তৎসম (সংস্কৃত) উপসর্গসমূহ সাধারণত কোন ধরনের শব্দের আগে যুক্ত হয়?
উ : তৎসম শব্দসমূহের আগে।

প্র : কোন চারটি উপসর্গ খাঁটি বাংলা ও তৎসম (সংস্কৃত) উভয় ক্ষেত্রে দেখা যায়?
উ : সু, বি, নি, আ।

প্র : এই উপসর্গগুলো দিয়ে পৃথক শব্দ তৈরি কর।
উ : খাঁটি বাংলা উপসর্গ সহযোগে :
সু > সুদিন, সুনজর, সুনাম, সুকাজ।
বি > বিপথ, বিফল, বিভুই।
নি > নিলাজ, নিখোঁজ, নিখুঁত, নিরো
আ > আধোয়া, আকাঁড়া, আলুনি, আকাঠা, আ

Scanned with CamScanner

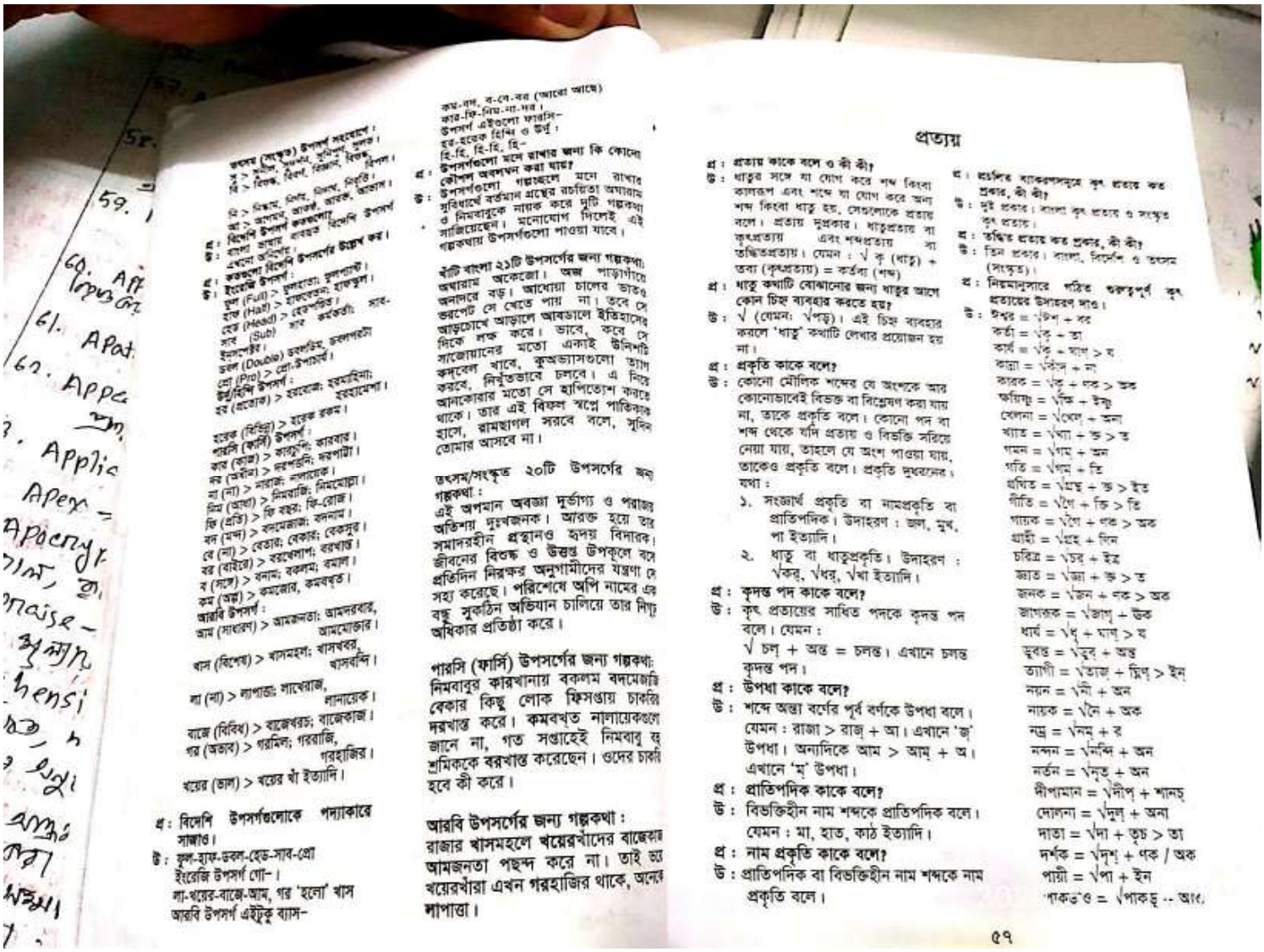

প্রত্যয়

প্র : প্রত্যয় কাকে বলে ও কী কী?

উ : ধাতুর সঙ্গে যা যোগ করে শব্দ কিংবা ক্রিয়ারূপ এবং শব্দে যা যোগ করে অন্য শব্দ কিংবা ধাতু হয়, সেগুলোকে প্রত্যয় বলে। প্রত্যয় দুপ্রকার। ধাতুপ্রত্যয় বা কৃৎপ্রত্যয় এবং শব্দপ্রত্যয় বা তদ্ধিতপ্রত্যয়। যেমন : √ কৃ (ধাতু) + তব্য (কৃৎপ্রত্যয়) = কর্তব্য (শব্দ)

প্র : ধাতু কথাটি বোঝানোর জন্য ধাতুর আগে কোন চিহ্ন ব্যবহার করতে হয়?

উ : √ (যেমন: √পড়্)। এই চিহ্ন ব্যবহার করলে 'ধাতু' কথাটি লেখার প্রয়োজন হয় না।

প্র : প্রকৃতি কাকে বলে?

উ : কোনো মৌলিক শব্দের যে অংশকে আর কোনোভাবেই বিভক্ত বা বিশ্লেষণ করা যায় না, তাকে প্রকৃতি বলে। কোনো পদ বা শব্দ থেকে যদি প্রত্যয় ও বিভক্তি সরিয়ে নেয়া যায়, তাহলে যে অংশ পাওয়া যায়, তাকেও প্রকৃতি বলে। প্রকৃতি দুধরনের। যথা :

১. সংজ্ঞার্থ প্রকৃতি বা নামপ্রকৃতি বা প্রাতিপদিক। উদাহরণ : জল, মুখ, পা ইত্যাদি।

২. ধাতু বা ধাতুপ্রকৃতি। উদাহরণ : √কর্, √ধর্, √খা ইত্যাদি।

প্র : কৃদন্ত পদ কাকে বলে?

উ : কৃৎ প্রত্যয়ের সাধিত পদকে কৃদন্ত পদ বলে। যেমন :
√ চল্ + অন্ত = চলন্ত। এখানে চলন্ত কৃদন্ত পদ।

প্র : উপধা কাকে বলে?

উ : শব্দে অন্ত্য বর্ণের পূর্ব বর্ণকে উপধা বলে। যেমন : রাজা > রাজ্ + আ। এখানে 'জ্' উপধা। অন্যদিকে আম > আম্ + অ। এখানে 'ম্' উপধা।

প্র : প্রাতিপদিক কাকে বলে?

উ : বিভক্তিহীন নাম শব্দকে প্রাতিপদিক বলে। যেমন : মা, হাত, কাঠ ইত্যাদি।

প্র : নাম প্রকৃতি কাকে বলে?

উ : প্রাতিপদিক বা বিভক্তিহীন নাম শব্দকে নাম প্রকৃতি বলে।

প্র : বাংলার ব্যাকরণসম্মত কৃৎ প্রত্যয় কত প্রকার, কী কী?

উ : দুই প্রকার। বাংলা কৃৎ প্রত্যয় ও সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়।

প্র : তদ্ধিত প্রত্যয় কত প্রকার, কী কী?

উ : তিন প্রকার। বাংলা, বিদেশি ও তৎসম (সংস্কৃত)।

প্র : নিয়মানুসারে গঠিত গুরুত্বপূর্ণ কৃৎ প্রত্যয়ের উদাহরণ দাও।

উ : ঈশ্বর = √ঈশ + বর
কর্তা = √কৃ + তা
কার্য = √কৃ + ঘাঞ্ > য
কান্না = √কাঁদ + না
কারক = √কৃ + ণক > অক
ক্ষয়িষ্ণু = √ক্ষি + ইষ্ণু
খেলনা = √খেল্ + অনা
খ্যাত = √খ্যা + ক্ত > ত
গমন = √গম্ + অন
গতি = √গম্ + ক্তি
গর্হিত = √গর্হ্ + ক্ত > ইত
গীতি = √গৈ + ক্তি > তি
গায়ক = √গৈ + ণক > অক
গ্রাহী = √গ্রহ্ + ণিন
চরিত্র = √চর + ইত্র
জ্ঞাত = √জ্ঞা + ক্ত > ত
জনক = √জন + ণক > অক
জাগরূক = √জাগ্ + ঊক
ধার্য = √ধৃ + ঘাঞ্ > য
দ্রুবন্ত = √দ্রু + অন্ত
ত্যাগী = √ত্যাজ্ + ণিন্ > ইন্
নয়ন = √নী + অন
নায়ক = √নৈ + অক
নদ্র = √নম্ + র
নন্দন = √নন্দ্ + অন
নর্তন = √নৃত্ + অন
দীপ্যমান = √দীপ্ + শানচ্
দোলনা = √দুল্ + অনা
দাতা = √দা + তৃচ > তা
দর্শক = √দৃশ্ + ণক / অক
পায়ী = √পা + ইন
পাকড়ও = √পাকড়্ -- আও

Scanned with CamScanner

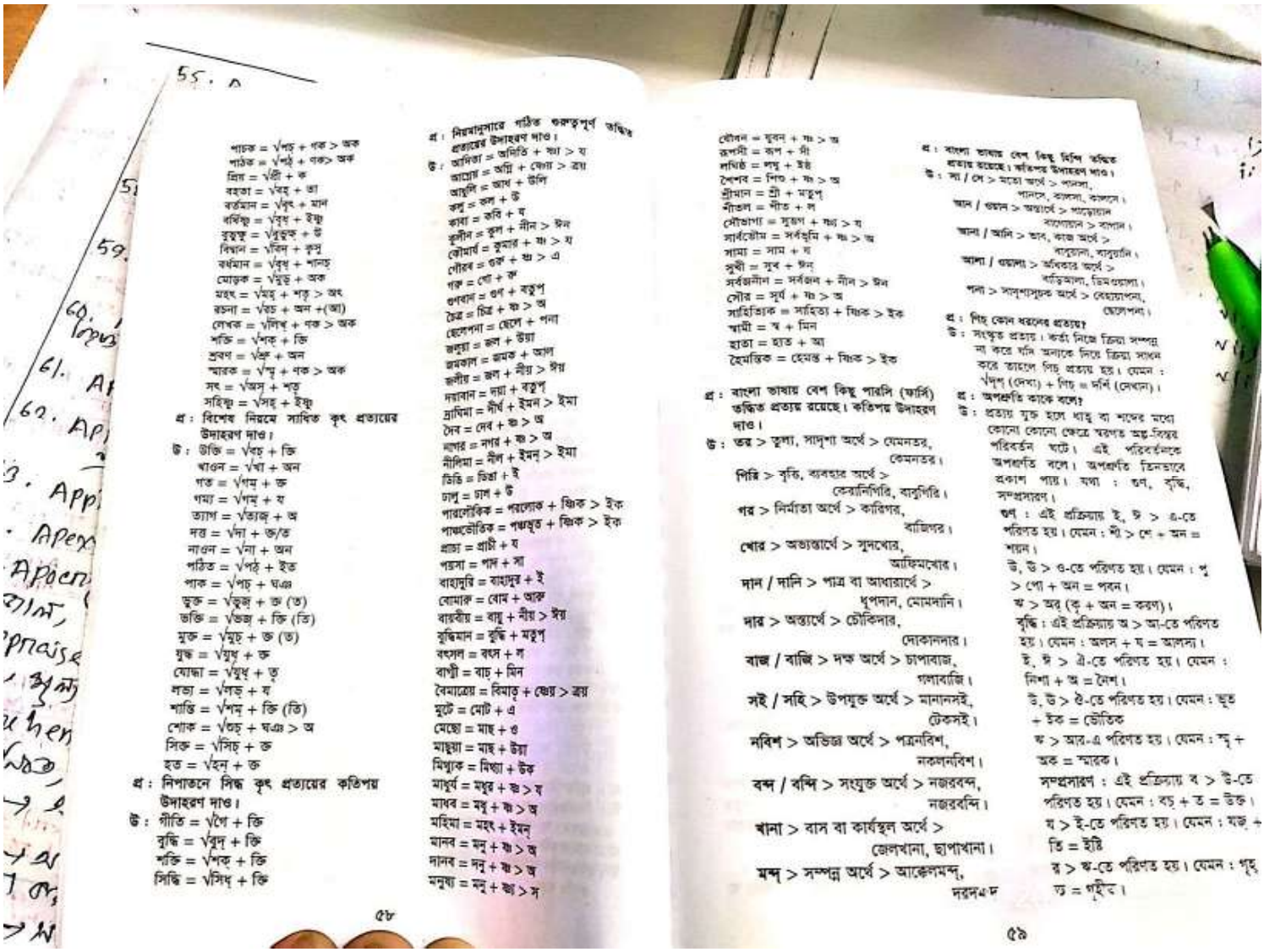

পাচক = √পচ্ + ণক > অক
পাঠক = √পঠ্ + ণক> অক
প্রিয় = √প্রী + ক
বহতা = √বহ্ + তা
বর্তমান = √বৃৎ + মান
ধবিষ্ণু = √বৃধ্ + ইষ্ণু
বৃদ্ধত্ব = √বৃদ্ধ্ + ত্ব
বিদ্বান = √বিদ্ + কৃপ্
বর্ধমান = √বৃধ্ + শানচ্
মোড়ক = √মুড়্ + অক
মহৎ = √মহ্ + শতৃ > অৎ
রচনা = √রচ্ + অন +(আ)
লেখক = √লিখ্ + ণক > অক
শক্তি = √শক্ + ক্তি
শ্রবণ = √শ্রু + অন
স্মারক = √স্মৃ + ণক > অক
সৎ = √অস্ + শতৃ
সহিষ্ণু = √সহ্ + ইষ্ণু

প্র : বিশেষ নিয়মে সাধিত কৃৎ প্রত্যয়ের উদাহরণ দাও।

উ : উক্তি = √বচ্ + ক্তি
খাওন = √খা + অন
গত = √গম্ + ক্ত
গম্য = √গম্ + য
ত্যাগ = √ত্যজ্ + অ
দত্ত = √দা + ক্ত/ত
নাওন = √না + অন
পঠিত = √পঠ্ + ইত
পাক = √পচ্ + ঘঞ
ভুক্ত = √ভুজ্ + ক্ত (ত)
ভক্তি = √ভজ্ + ক্তি (তি)
মুক্ত = √মুচ্ + ক্ত (ত)
যুক্ত = √যুধ্ + ক্ত
যোদ্ধা = √যুধ্ + তৃ
লভ্য = √লভ্ + য
শান্তি = √শম্ + ক্তি (তি)
শোক = √শুচ্ + ঘঞ > অ
সিক্ত = √সিচ্ + ক্ত
হত = √হন্ + ক্ত

প্র : নিপাতনে সিদ্ধ কৃৎ প্রত্যয়ের কতিপয় উদাহরণ দাও।

উ : গীতি = √গৈ + ক্তি
বুদ্ধি = √বুধ্ + ক্তি
শক্তি = √শক্ + ক্তি
সিদ্ধি = √সিধ্ + ক্তি

প্র : নিম্নরূপানুসারে গঠিত গুরুত্বপূর্ণ তদ্ধিত প্রত্যয়ের উদাহরণ দাও।

উ : অদিতা = অদিতি + ষ্যা > য
আগ্নেয় = অগ্নি + ঢেয়্য > ঐয়
আহুতি = আহ + উতি
কবু = কবি + উ
কাব্য = কবি + য
কুলীন = কুল + নীন > ঈন
কৌমার্য = কুমার + ষ্ণ > য
গৌরব = গুরু + অণ > এ
গুরু = গো + রু
গুণবান = গুণ + বতুপ্
চৈত্র = চিত্রা + ষ্ণ > অ
ছেলেপনা = ছেলে + পনা
জলুয়া = জল + উয়া
জ্রমকাল = জ্রমত + আল
জলীয় = জল + নীয় > ঈয়
দয়াবান = দয়া + বতুপ্
দ্রাঘিমা = দীর্ঘ + ইমন > ইমা
দৈব = দেব + ষ্ণ > অ
নাগর = নগর + ষ্ণ > অ
নীলিমা = নীল + ইমন্ > ইমা
তিথি = তিত্রা + ই
ঢালু = ঢাল + উ
পারলৌকিক = পরলোক + ষ্ণিক > ইক
পাঞ্চভৌতিক = পঞ্চভূত + ষ্ণিক > ইক
প্রাচ্য = প্রাচী + য
পড়সা = পাদ + সা
বাহ্যদৃরি = বাহ্যদৃর + ই
বোমারু = বোম + আরু
বায়বীয় = বায়ু + নীয় > ঈয়
বুদ্ধিমান = বুদ্ধি + মতুপ্
বৎসল = বৎস + ল
বাগ্মী = বাচ্ + মিন
বৈমাত্রেয় = বিমাতৃ + ঢেয় > ত্রেয়
মুটে = মোট + এ
মেছো = মাছ + ও
মাছুয়া = মাছ + উয়া
মিথ্যুক = মিথ্যা + উক
মাধুর্য = মধুর + ষ্ণ > য
মাধব = মধু + ষ্ণ > অ
মহিমা = মহৎ + ইমন্
মানব = মনু + ষ্ণ > অ
দানব = দনু + ষ্ণ > অ
মনুষ্য = মনু + ষ্য > স

যৌবন = যুবন + ষ্ণ > অ
রসনা = রস + নী
লঘিষ্ঠ = লঘু + ইষ্ঠ
শৈশব = শিশু + ষ্ণ > অ
শ্রীমান = শ্রী + মতুপ্
শীতল = শীত + ল
সৌভাগ্য = সুভগ + ষ্ণ্য > য
সার্বভৌম = সর্বভূমি + ষ্ণ > অ
সাম্য = সাম + য
সুখী = সুখ + ঈন্
সর্বজনীন = সর্বজন + নীন > ঈন
সৌর = সূর্য + ষ্ণ > অ
সাহিত্যিক = সাহিত্য + ষ্ণিক > ইক
স্বামী = স্ব + মিন
হাতা = হাত + আ
হৈমন্তিক = হেমন্ত + ষ্ণিক > ইক

প্র : বাংলা ভাষায় বেশ কিছু পারসি (ফার্সি) তদ্ধিত প্রত্যয় রয়েছে। কতিপয় উদাহরণ দাও।

উ : তর > তুলা, সাদৃশ্য অর্থে > যেমনতর, কেমনতর।
পিরি > বৃত্তি, ব্যবহার অর্থে > কেরানিপিরি, বাবুগিরি।
গর > নির্মাতা অর্থে > কারিগর, বাজিগর।
খোর > অত্যন্তার্থে > সুদখোর, আফিমখোর।
দান / দানি > পাত্র বা আধারার্থে > ধূপদান, মোমদানি।
দার > অস্ত্যর্থে > চৌকিদার, দোকানদার।
বাজ / বাজি > দক্ষ অর্থে > চাপাবাজ, গলাবাজি।
সই / সহি > উপযুক্ত অর্থে > মানানসই, টেকসই।
নবিশ > অভিজ্ঞ অর্থে > পত্রনবিশ, নকলনবিশ।
বন্দ / বন্দি > সংযুক্ত অর্থে > নজরবন্দ, নজরবন্দি।
খানা > বাস বা কার্যস্থল অর্থে > জেলখানা, ছাপাখানা।
মন্দ > সম্পন্ন অর্থে > আক্কেলমন্দ, দরদমন্দ

প্র : বাংলা ভাষায় বেশ কিছু বিশিষ্ট তদ্ধিত প্রত্যয় রয়েছে। কতিপয় উদাহরণ দাও।

উ : সা / সে > মতো অর্থে > পাগলা, পাগলে, বাসলা, বাসলে।
আন / ওয়ান > অস্ত্যার্থে > শয়তান, বাগোয়ান > বাগান।
আনা / আনি > ভাব, কাজ অর্থে > বাবুয়ানা, বাবুয়ানি।
আলা / ওয়ালা > অধিকার অর্থে > বাড়িআলা, জিমওয়ালা।
পনা > সাদৃশ্যসূচক অর্থে > বোয়াপনা, ছেলেপনা।

প্র : শিচ্ কোন ধরনের প্রত্যয়?

উ : সংস্কৃত প্রত্যয়। কর্তা নিজে ক্রিয়া সম্পন্ন না করে যদি অন্যকে দিয়ে ক্রিয়া সাধন করে তাহলে শিচ্ প্রত্যয় হয়। যেমন : √দৃশ্ (দেখা) + শিচ্ = দর্শি (দেখান)।

প্র : অপশ্রুতি কাকে বলে?

উ : প্রত্যয় যুক্ত হলে ধাতু বা শব্দের মধ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বরধ্বনি অঙ্গ-বিস্তর পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনকে অপশ্রুতি বলে। অপশ্রুতি তিনভাবে প্রকাশ পায়। যথা : গুণ, বৃদ্ধি, সম্প্রসারণ।
গুণ : এই প্রক্রিয়ায় ই, ঈ > এ-তে পরিণত হয়। যেমন : শী > শে + অন = শয়ন।
উ, ঊ > ও-তে পরিণত হয়। যেমন : পু > পো + অন = পবন।
ঋ > অর্ (কৃ + অন = করণ)।
বৃদ্ধি : এই প্রক্রিয়ায় অ > আ-তে পরিণত হয়। যেমন : অলস + ষ্ণ = আলস্য।
ই, ঈ > ঐ-তে পরিণত হয়। যেমন : নিশা + অ = নৈশ।
উ, ঊ > ঔ-তে পরিণত হয়। যেমন : ভূত + ইক = ভৌতিক
ঋ > আর্-এ পরিণত হয়। যেমন : স্মৃ + অক = স্মারক।
সম্প্রসারণ : এই প্রক্রিয়ায় ব > উ-তে পরিণত হয়। যেমন : বচ্ + ত = উক্ত।
য > ই-তে পরিণত হয়। যেমন : যজ্ + তি = ইষ্টি
র > ঋ-তে পরিণত হয়। যেমন : গৃহ্ + ত = গৃহীত।

Scanned with CamScanner

কারক

প্র : কারক শব্দের অর্থ কী?
উ : যা ক্রিয়া সম্পাদন করে (কৃ + ণক)।

প্র : কারক কাকে বলে?
উ : বাক্যান্বিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে নাম পদের (বিশেষ্য/সর্বনাম) যে সম্পর্ক তাকে কারক বলে।

প্র : বিভক্তি কাকে বলে?
উ : পদকে বাক্যে ব্যবহারের উপযোগী পদে রূপান্তরিত করার জন্য শব্দের সঙ্গে যা যোগ করতে হয় তাকে বিভক্তি বলে। যেমন : মাকে > এখানে 'কে' বিভক্তি।

প্র : বাংলা বাংলা শব্দ বিভক্তির উল্লেখ কর।
উ : শূন্য বা অ, এ, (য়), তে (এ), কে (এ), রে, র (এরা)।

প্র : বিভক্তি কয়টি ও কী কী?
উ : ৭টি। প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী।

প্র : কয়েকটি বিভক্তিবোধক টিহ্ন-নাম লেখ?
উ : শূন্য বা অ / এ / য় / তে / কে / রে / র / এর / রা / এরা / এরে / দিগ / দ্বারা / দিয়া / কর্তৃক / হইতে / থেকে ইত্যাদি।

প্র : এগুলোর মধ্যে কারক-অব্যয় কোনগুলো?
উ : দ্বারা / দিয়া / কর্তৃক / হইতে / থেকে এই পাঁচটি কারক অব্যয়।

প্র : বাংলা কারকে ব্যবহৃত বিভক্তি চিহ্নগুলো শ্রেণিভুক্ত কর :

উ :

শূন্য বা প্রথমা	০ / অ	রা / এরা / গুলি / সমূহ
দ্বিতীয়া	কে / রে / রে	দের / দিগকে
তৃতীয়া	দ্বারা / দিয়া / কর্তৃক	দিগের দ্বারা / দের দ্বারা
চতুর্থী	দ্বিতীয়ার মতো	দ্বিতীয়ার মতো
পঞ্চমী	হতে/থেকে / চেয়ে	দিগ হতে / দের থেকে
ষষ্ঠী	র / এর	দিগের / দের
সপ্তমী	এ, য়, তে	দিগে/দিগেতে ইত্যাদি।

প্র : কোন কারক দুটোতে কোনো বিভক্তি নেই?
উ : করণ ও অপাদান কারকে।

প্র : শূন্য বিভক্তি কাকে বলে?
উ : বাক্যের কোনো পদে যখন কোনো বিভক্তি দৃশ্যমান হয় না, সেই আপাত বিভক্তিহীন পদে যে বিভক্তি থাকে। যেমন : ছেলেটি সকালের চা নিজে করে। এই বাক্যে 'চা'-এর সঙ্গে শূন্য বিভক্তি আছে।

প্র : কর্তৃকারক কাকে বলে?
উ : বাক্যে কর্তাপদের কারকের নাম। যেমন: পাখি ওড়ে।

প্র : ক্রিয়া সম্পাদনের বৈচিত্র্য অনুযায়ী কর্তৃকারক কত প্রকার?
উ : চার প্রকার। মুখ্য, প্রযোজক, প্রযোজ্য, ব্যতিহার।

প্র : বাক্যের বাচ্য ও প্রকাশভঙ্গি অনুসার কর্তৃকারক কত প্রকার?
উ : তিন প্রকার। কর্মবাচ্যের কর্তা, ভাববাচ্যের কর্তা, কর্মকর্তৃবাচ্যের কর্তা।

প্র : কর্মকারক কাকে বলে?
উ : ক্রিয়াপদের সঙ্গে কর্মপদের সম্পর্কে, যেমন : তিনি *ব্যাগান* দেখাশোনা করেন।

প্র : কর্মকারকে কোন কর্মে বিভক্তিযুক্ত হয়?
উ : গৌণকর্মে হয়, মুখ্য কর্মে হয় না।

প্র : কর্মকারক কত প্রকার?
উ : চার প্রকার। সকর্মক ক্রিয়ার কর্ম, প্রযোজক ক্রিয়ার কর্ম, সমধাতুজ কর্ম, উদ্দেশ্য বিধেয় কর্ম।

প্র : করণ শব্দের অর্থ কী?
উ : সহায়ক বা উপায়।

প্র : করণ কারক কাকে বলে?
উ : কর্তা যার সাহায্যে ক্রিয়া সম্পাদন করে। যেমন : আমি *পেনসিল দিয়ে* লিখি।

প্র : সমধাতুজ করণ কাকে বলে?
উ : কোনো বাক্যে করণ কারক ও ক্রিয়াপদ একই ধাতু থেকে উৎপন্ন হলে সমধাতুজ করণ কারক বলে। যেমন: মনের জ্বালায় জ্বলছে।

প্র : সম্প্রদান কারক কাকে বলে?
উ : যাকে স্বত্বত্যাগ করে কিছু দান করা বা দেয়া হয়।

প্র : সম্প্রদান কারকের প্রয়োজনীয়তা আছে কি?
উ : স্বত্ব ত্যাগ করে যাকে কিছু দান করা অথবা যার জন্য বা যার উদ্দেশে কিছু করা যায়, তাকে সম্প্রদান কারক বলে। কাকে, কার জন্য, কার তরে ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরে সম্প্রদান কারক পাওয়া যায়। প্রচলিতভাবে 'ক্ষুধার্তকে অন্ন দান কর' বা 'সৎ পাত্রে কন্যা দান কর' সম্প্রদান কারক। কিন্তু লক্ষ করলে বোঝা যাবে, ক্ষুধার্তকে অন্ন দানের পেছনে বা দরিদ্রকে অর্থ দানের পেছনে মানুষের মনে পুণ্য লাভের মোহ কাজ করে। আজকাল কন্যাকে চিরতরে দান করা হয় না। স্বামীর বাড়িতে অত্যাচারিত হলে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সব কন্যাই আজ সে বসত ত্যাগ করার অধিকার রাখে। যেখানে স্বত্ব ত্যাগ করে দান করা হয় না– স্বত্ব রেখে, ভয় বলে বা দেয় বস্তু বলে যেখানে অর্পণ হয় সেখানেও সম্প্রদান কারক স্বীকার করতে চান না অনেকে। যেমন : এবার ডাকাতকে সর্বস্ব দিন অথবা শ্রমিককে মজুরি দিন। এসব দান স্বত্ব ত্যাগ করেই দিতে হয়, কিন্তু এগুলো কি সম্প্রদান?
সংস্কৃতে সম্প্রদান কারকে বিশেষ বিভক্তি আছে কিন্তু বাংলায় কর্ম ও সম্প্রদান কারকের বিভক্তি অভিন্ন। বাংলায় সম্প্রদান কারক প্রচলিত আছে শুধু সংস্কৃত ব্যাকরণের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার জন্য। প্রাচীনকালে স্বত্ব ত্যাগ করে দানের ব্যাপারটি স্বাভাবিক ছিল। আজ যে-কোনো দানের পেছনেই উদ্দেশ্য থাকে। আর উদ্দেশ্য যে দানে থাকে তাকে সম্প্রদান বলা যায় না।
বাংলা গৌণকর্ম ও সংস্কৃতের সম্প্রদান কারকের মধ্যে অর্থগত দিক থেকে পার্থক্য নেই। দান অর্থে, নিমিত্ত অর্থে এবং অন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংস্কৃত শব্দের উত্তর চতুর্থী বিভক্তিযোগে সংস্কৃতে সম্প্রদান কারক হয়। গৌণকর্ম ও সম্প্রদান কারক। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন : 'এই দুইটিকে পৃথক করিয়া ধরিবার বিশেষ সার্থকতা বাঙ্গালায় নাই।' রামমোহন রায় তাঁর 'গৌড়ীয় ব্যাকরণে' সম্প্রদান কারককে স্বীকার করেন নি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বাংলায় শুধু একটি বিশেষ দান-ক্রিয়ার জন্য আলাদা কারকের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেছেন। অবশ্য মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্প্রদান কারক উঠিয়ে দেওয়াকে অযৌক্তিক মনে করেন।

প্র : সৎপাত্রে কন্যা দান কর। 'সৎপাত্রে' কারক-বিভক্তি কী?
উ : কর্মে ৭মী। কারণ এখন কন্যাকে স্বত্বত্যাগ করে দান করা হয় না।

প্র : কোনো শব্দের সঙ্গে নিমিত্তার্থে 'কে' যুক্ত হলে কোন বিভক্তি বলে?
উ : চতুর্থী। যেমন : জলকে চল।

প্র : অপাদান কারক কাকে বলে?
উ : বাক্যে ক্রিয়াটির সম্পাদন যে জায়গা থেকে হয়, ক্রিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্কের নাম অপাদান কারক। যেমন : তিলে তৈল হয়।

প্র : অধিকরণ কারক কাকে বলে?
উ : ক্রিয়ার সংঘটন যে স্থানে, সময়ে কিংবা বিষয়কে অবলম্বন করে ঘটে, বাক্যের ক্রিয়াপদের সঙ্গে সেই স্থান, সময় কিংবা বিষয়ের সম্পর্ককে বলা হয় অধিকরণ কারক। যেমন : সুন্দরবনে বাঘ আছে।

প্র : অধিকরণ কারক কত প্রকার?
উ : তিন প্রকার। যথা : আধার অধিকরণ, কালাধিকরণ, ভাবাধিকরণ।

প্র : ভাবে সপ্তমী কাকে বলে?
উ : ভাবাধিকরণে সর্বদা সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ হয় বলে।

প্র : আধার অধিকরণ কত প্রকার?
উ : তিন প্রকার। ঐকদেশিক, অভিব্যাপক, বৈষয়িক।

প্র : সম্বন্ধপদ কাকে বলে?
উ : নাম পদের সঙ্গে সাধারণত ক্রিয়ার সম্পর্ক থাকে। কোনো বাক্যে যদি তা না থাকে এবং নামপদ অন্য পদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়, তাকে সম্বন্ধ পদ বলে। যেমন : রতনের বন্ধু ভাল ছাত্র। এই বাক্যে 'রতনের' সম্বন্ধ পদ। এই পদের সঙ্গে ক্রিয়ার সম্পর্ক নেই।

প্র : সম্বন্ধ পদকে কারক বলা হয় না কেন?
উ : ক্রিয়ার সঙ্গে এই পদের সম্বন্ধ নেই বলে।

প্র : সম্বোধন পদ কাকে বলে?
উ : বাক্যে যে পদের মাধ্যমে কাউকে ডাকা বা আহ্বান করা হয়। যেমন : হে মাধবী, দ্বিধা কেন?

প্র : সম্বোধন পদ কারক নয় কেন?
উ : বাক্যের ক্রিয়াপদের সঙ্গে এই পদের কোনো সম্বন্ধ থাকে না বলে।

Scanned with CamScanner

/57

প্র : কারক নির্ণয় করার জন্য কোন প্রশ্নগুলো করা যায়?

উ : কারক ক্রিয়ার সঙ্গে কোনো নির্দিষ্ট পদের (সাধারণত নিচে দাগ দেয়া থাকে) সম্পর্ক বোঝায়। তাই বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদকে এভাবে প্রশ্ন করলে পাওয়া যায় কারকের উত্তর।

ক. কে / কারা দিয়ে প্রশ্নের উত্তরে কর্তৃকারক;

খ. কি / কাকে দিয়ে প্রশ্নের উত্তরে কর্মকারক;

খ. কীসে / কীসের সাহায্যে / কার সাহায্যে দিয়ে প্রশ্নের উত্তরে করণ কারক;

ঘ. কার জন্য দিয়ে প্রশ্নের উত্তরে (যদি স্বত্ব ত্যাগ করে দান বোঝায়) সম্প্রদান কারক;

ঙ. কোথা থেকে / কী হতে / কীসের হতে দিয়ে প্রশ্নের উত্তরে অথবা ভয়-ডর-ভীতি-শংকা প্রকাশ পেলে অপাদান কারক;

চ. কোথায় / কীসে / কখন দিয়ে প্রশ্নের উত্তরে অর্থাৎ স্থান-কাল-পাত্র-সময়-বিষয় বোঝালে অধিকরণ কারক হবে।

প্র : কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারক বিভক্তির প্রয়োগ দেখাও।

উ : অ

অর্থ অনর্থ ঘটায় > কর্তায় শূন্য
অর্থে অনর্থ ঘটে > করণে ৭মী
অন্ধজনে দেহ আলো > সম্প্রদানে ৭মী
অন্নহীনে অন্ন দাও > সম্প্রদানে ৭মী
অল্প শোকে কাতর অধিক শোকে পাথর > করণে ৭মী
অঙ্গে আঁচল সুনীল বরণ, রুনুঝুনু রবে বাজে আভরণ > অধিকরণে ৭মী
অতিবড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ। > অধিকরণে ৭মী

(প্রচলিত ব্যাকরণ বইতে সিদ্ধিতে করণ কারক নির্দেশ করা হলেও কবি এখানে সিদ্ধি দুই অর্থে ব্যবহার করেছেন : সাধনা ও নেশা।)

অভিমানে কিবা আজি ত্যজিল পরাণ > অপাদানে ৭মী; কর্মে শূন্য
অহংকারে পতন ঘটে > করণে ৭মী
অশুতে গঠিত হিমালয় > করণে ৭মী
অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী, কথায় কথায় টিকশনারি > কর্মে শূন্য
অধ্যয়নে বিরত হতে নেই > অপাদানে ৭মী

আ

আজকে নগদ কালকে ধার > অধিকরণে ২য়া
আমাদের একটি গল্প বলুন > কর্মে ৬ষ্ঠী
আমা হতে এ কার্য হবে না সাধন > কর্তায় ৫মী
আমাদের সেনারা সাহসে দুর্জয়, যুদ্ধে অপরাজেয় > অধিকরণে ৭মী
আমি চাকা যাবো > অধিকরণে শূন্য
আমরা রোজ স্কুলে যাই > অধিকরণে ৭মী
আমারে তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা > কর্মে ২য়া
আমাকে একখানা বই দাও > কর্মে শূন্য
আমার যাওয়া হয় নি > কর্তায় ৬ষ্ঠী
আমার খাওয়া হলো না > কর্তায় ৬ষ্ঠী
আমাকে যেতে হবে > কর্তায় ২য়া
আমার একটু আশ্রয় দিন > সম্প্রদানে ৭মী
আমি কি ডরাই সখী ভিখারী রাঘবে > অপাদানে ৭মী
আগুনে সেঁক দাও > করণে ৭মী
আকাশে চাঁদ উঠেছে > অধিকরণে ৭মী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি > করণে ৭মী
আলো চাই, অন্ন চাই, চাই মুক্তবায়ু > সম্প্রদানে শূন্য
আকাশের ঐ তারার সনে কইব কথা নাই বা তুমি এলে। > কর্মে ৬ষ্ঠী, কর্তায় শূন্য
আমারে লহ তুমি করুণা করে। > কর্মে ২য়া
আচার ব্যবহারে ভদ্র-অভদ্র চেনা যায় > অপাদানে ৭মী
আত্মার সম্পর্কই হল আত্মীয় > কর্মে শূন্য
আকাশ আজি মেঘলা যেয়ো নাকো একলা > অধিকরণে শূন্য
আজকে তোমায় দেখতে এলাম জগৎ আলো নূরজাহান > অধিকরণে ২য়া
আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ > অধিকরণে ৭মী
আমার স্বপন আধো জাগরণ > কর্মে শূন্য
আমারে করহ তোমার বীণা > কর্মে ২য়া

আলোয় আঁধার কাটিয়া যায় > করণে ৭মী
আজ হবে না, কাল এসো > অধিকরণে শূন্য

এ

এ প্রার্থনা হতে পাপ দূর হবে না > করণে ৫মী
এ বাড়িতে কেউ নেই > অধিকরণে ৭মী
এ সুতায় কাপড় হয় না > করণে ৭মী
এত শঠতা, এত যে বাধা, তবু কেন তা মধুতে মাখা > করণে ৭মী
এ দেহে প্রাণ নেই > অধিকরণে ৭মী
এ কলমে ভাল লেখা হয় > করণে ৭মী
এ বছর খুব ভাল ফসল হয়েছে > অধিকরণে শূন্য
এর অধীনে দায়িত্বভার অর্পণ করুন > কর্মে ৭মী
এই বনে বাঘের ভয় নেই > অপাদানে ৬ষ্ঠী
এই নদীর মাছ বড় > অধিকরণে ৬ষ্ঠী
এক যে ছিল রাজা > কর্তায় শূন্য
একদিন যাব > অধিকরণে শূন্য
এ জমিতে সোনা ফলে > অধিকরণে ৭মী
একদিন পাপের ফল ফলিবে > অধিকরণে শূন্য
এ মেঘে বৃষ্টি হয় না > অপাদানে ৭মী
এ সময় তার দেখা মেলা ভার > অধিকরণে শূন্য
এমন চোরের মতো বাঁচা বাঁচিতে চাই না > কর্মে শূন্য
'একদা প্রভাতে ভানুর 'প্রভাতে' ফুটিলে কমলগুলি' > করণে ৭মী
এক যে ছিল চাঁদেরকোনায় চরকা কাটা বুড়ি > অধিকরণে ৭মী
একটি গান শোনাও > কর্মে শূন্য
এবারের সংগ্রাম দেশগড়ার সংগ্রাম > কর্মে ৬ষ্ঠী
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম > নিমিত্তার্থে ৬ষ্ঠী

ঐ

ঐ দেখা যায় তালগাছ ঐ আমাদের গাঁ > কর্মে শূন্য

ক

কপোল ভাসিয়া গেল নয়নের জলে > কর্মে শূন্য

কানন কুসুমকলি সকলি ফুটিল > কর্মে শূন্য
কত ধানে কত চাল তা আমি জানি > অপাদানে ৭মী
কান্নায় শোক মলীভূত হয় > ভাবাধিকরণে ৭মী
কপালের লেখা না যায় খণ্ডন > অধিকরণে ৬ষ্ঠী
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল > অধিকরণে ৭মী
কথায় কথা বাড়ে > করণে ৭মী
কাঁথায় শীত মানে না > করণে ৭মী
কলমের খোঁচা দিও না > করণে ৬ষ্ঠী
কুকর্মে বিরত হও > অপাদানে ৭মী
কাজে মন দাও > অধিকরণে ৭মী
কাচের জিনিস অতি সহজে ভাঙে > করণে ৬ষ্ঠী
কাজের বেলা গোল করো না > অধিকরণে শূন্য
কি সাহসে এমন কথা বললে > কর্মে ৭মী
কোথাও আমার হারিয়ে যেতে নেই মানা > কর্তায় ৬ষ্ঠী
কবিগুরু গীতাঞ্জলি লিখেছেন > কর্মে শূন্য
কথায় চিড়ে ভেজে না > করণে ৭মী, কর্মে ৭মী
কোথা সে ছায়া সখি কোথায় সে জল > কর্মে শূন্য
কত ধানে কত চাল হয় আমি তা জানি > অপাদানে ৭মী
ক্রোধ থেকে জন্মে মোহ, মোহ থেকে পাপ > অপাদানে শূন্য
কূলে একা বসি আছি নাহি ভরসা > অধিকরণে ৭মী
কোকিল ডাকে > কর্তায় শূন্য
কি করি আজ ভেবে না পাই > অধিকরণে শূন্য
কষ্ট না করলে কেষ্ট মিলে না > কর্মে শূন্য

খ

খুব ঘুম ঘুমিয়েছি > কর্মে শূন্য
খিলিপান দিয়ে সে ঔষধ খাবে > অধিকরণে ৩য়া
খড়্গে ছাগে কাটে > করণে ৭মী
খড়্গে ছাগে কাটে > কর্মে ৭মী
খুব ঠকেছি > কর্মে শূন্য

Scanned with CamScanner

খেঁদু বাবুর এলোপাতুর মাছ খেয়ে জ্বরে
> অধিকরণে শূন্য
খেঁদু বাবুর এলোপাতুর মাছ খেয়ে জ্বরে
> করণে ৭মী
খেয়ে-বসে কাজ ২ > অপাদানে ৭মী

গ
গাধে পায়স মন ভরেছে > করণে ৭মী
গুরুজনে ভক্তি > সম্প্রদানে ৭মী
গুহাহীন পশু নাই > সম্প্রদানে ৭মী
গরু গাড়ি টানে > কর্তায় শূন্য
গরুতে ঘাস খায় > কর্তায় ৭মী
গরুতে গাড়ি টানে > কর্তায় ৭মী
গাড়ি স্টেশন ছাড়ে > অপাদানে শূন্য
গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল >
অধিকরণে ৭মী
গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল >
কর্তায় ৭মী
গুণহীন চিরদিন থাকে পরাধীন >
কর্তায় শূন্য
গুণহীনে ভ্রাণ কর > কর্মে ৭মী
গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা >
অধিকরণে ৭মী
ওরারা পথিকের মাথায় লাঠি মেরেছে
> অধিকরণে ৭মী
গাধায় খায় পাকা কলা > কর্তায় ৭মী
গত বিষয়ের জন্য শোক করিও না
> কর্মে শূন্য
গাছ থেকে পাতা পড়ে > অপাদানে শূন্য

ঘ
ঘোড়াকে চাবুক মার > করণে শূন্য
ঘোড়ায় গাড়ি টানে > কর্তায় ৭মী
ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে
> অধিকরণে ৭ম, কর্তায় শূন্য
ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল
> অধিকরণে ৭মী

চ
চেষ্টায় সব হয় > করণে ৭মী
চোখ দিয়া পানি পড়ে > অপাদানে শূন্য
চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনি >
কর্তায় ৭মী
চণ্ডীদাসে কয় শুন পরিচয় > কর্তায় ৭মী
চিন্তা রোগের ওষুধ নেই > কর্মে শূন্য
চোর ধৃত হয়েছে > কর্মে শূন্য

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির
> কর্মে শূন্য
চাঁদ বুঝি তা জানে > কর্তায় শূন্য
চাহি না করিতে বাদ-প্রতিবাদ >
কর্মে শূন্য

ছ
ছাত্ররা বল খেলে > করণে শূন্য
ছাত্ররা ক্রিকেট খেলে > কর্মে শূন্য
ছাগলে কি না খায় > কর্তায় ৭মী
ছাদে পানি পড়ে > অপাদানে ৭মী
(ছাদ থেকে)
ছাদে বৃষ্টি পড়ে > অধিকরণে ৭মী
(ছাদেতে)
ছেলেটি অঙ্কে কাঁচা > অধিকরণে ৭মী
ছায়ায় বস > অধিকরণে ৭মী
ছিলাম নিশিদিন আশাহীন প্রবাসী
> অধিকরণে শূন্য

জ
জিজ্ঞাসিব জনে জনে > কর্মে ৭মী
জল পড়ে পাতা নড়ে > কর্মে শূন্য
জলে বাষ্প হয় > অপাদানে ৭মী
জলে কুমির থাকে > অধিকরণে ৭মী
জন্য হোক যথা তথা কর্ম হোক ভালো
> কর্মে শূন্য
জগতে কীর্তিমান হওয়া যায় সাধনায়
> অধিকরণে ৭মী, করণে ৭মী
জটাতে তাপস চিনি
> করণে ৭মী, কর্মে শূন্য
জলকে চল > নিমিত্তার্থে ৪র্থী
জ্যোৎস্নাতে আলোকিত এই রাত্রি
> করণে ৭মী
জাহাজে সাগর পার হওয়া যায়
> করণে ৭মী

ঝ
ঝিকে মেরে বৌকে শিখানো > কর্মে ২য়া

ট
টানে এক আঁকে বক > করণে ৭মী
টাকায় বাঘের দুধ মেলে > করণে ৭মী
টাকায় কিনা হয় > করণে ৭মী
ট্রেন ঢাকা ছাড়ল > অপাদানে শূন্য
ট্রেন ঢাকা পৌঁছল > অধিকরণে শূন্য
টাকায় টাকা হয় > অপাদানে ৭মী

ড
ডাকার ডাক > কর্মে শূন্য
ডাকাতেরা গৃহস্বামীর মাথায় লাঠি
মেরেছে > করণে শূন্য

ত
তার চোখ দিয়ে জল পড়ে > অপাদানে
৭মী
তোমাদ্বারা একাজ হইবে না সাধনা >
কর্তায় ৩য়া
তোমার দেখা পেলাম না > কর্মে ৬ষ্ঠী
তাকে বল > কর্মে ২য়া
তিলে তৈল হয় > অপাদানে ৭মী
তিলে তৈল আছে > অধিকরণে ৭মী
তিনি ব্যাকরণে পণ্ডিত > অধিকরণে ৭মী
তিনি শুক্রবারে আসবেন >
অধিকরণে ৭মী
তিরিশ বছর ভিক্ষায়ে বেরেছি দুই নয়নের
জলে > করণে ৭মী
তাস খেলে কত ছেলে পড়া নষ্ট করে >
করণে শূন্য
তোমায় কেন দেই নি আমার সকল শূন্য
করে > সম্প্রদানে ৭মী
তোমায় দেখলেও পাপ > কর্মে ৭মী
তোমার পতাকা যারে দাও, তারে
বহিবারে দাও শকতি > সম্প্রদানে ৪র্থী
তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি
> সম্প্রদানে ৬ষ্ঠী
তর্কে বিরত হও > অপাদানে ৭মী
ত্যাগে তিনি নিরহঙ্কার > অধিকরণে ৭মী
তোমার মহিমা জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা
> করণে ৭মী
তাকে হাতে না মারলেও ভাতে মারব
> করণে ৭মী
তোমায় কেন দেই নি আমার সকল শূন্য
করে > সম্প্রদানে ৭মী
তুমি সন্ধ্যাকাশের তারার মত
> অধিকরণে ৬ষ্ঠী

থ
থানায় এজাহার দাও > অধিকরণে ৭মী

দ
দীনে দয়া কর > সম্প্রদানে ৭মী
দরিদ্রকে ধন দাও > নিমিত্তার্থে ৪র্থী
দিব তোমা শ্রদ্ধাভক্তি > সম্প্রদানে শূন্য
দুধে ছানা হয় > অপাদানে ৭মী
দেশের জন্য প্রাণ দাও > সম্প্রদানে ৪র্থী

[illegible] > অধিকরণে ৭মী
[illegible] > অধিকরণে ৭মী
[illegible] > সম্প্রদানে ৭মী
[illegible] > অধিকরণে ৭মী
[illegible] > অধিকরণে ৭মী
[illegible] > কর্মে ২য়া
[illegible] > অধিকরণে ৭মী
[illegible] > কর্মে ২য়া
[illegible] > অধিকরণে ৭মী
[illegible] > কর্মে শূন্য
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে
> কর্মে শূন্য, অধিকরণে ৭মী
দেশ থেকে পঙ্গপাল চলে গেছে
> অপাদানে ৭মী

ধ
ধন হইতে সুখ হয় না > অপাদানে ৫মী
ধর্ম হতে বিচলিত হয়ো না >
অপাদানে ৫মী
ধর্মের কল বাতাসে নড়ে > করণে ৩য়া
ধোপাকে কাপড় দাও > কর্মে ২য়া
ধানেতে তৈরি হয় মুড়ি চিড়ে খই >
অপাদানে ৭মী
ধৈর্য ধর, বাঁধ বুক > কর্মে শূন্য, কর্মে শূন্য

ন
না মরে পাষাণ বাপ নিলা হেন বরে >
কর্মে ২য়া
নতুন ধান্যে হবে নবান্ন > করণে ৭মী
নিজের চেষ্টায় বড় হও > করণে ৭মী
নাইবা তুমি এলে > কর্তায় শূন্য
নগরের নটী চলে অভিসারে যৌবনমদে
মত্তা > নিমিত্তার্থে ৭মী

প
প্রভাতে উঠিল রবি লোহিত বরণ >
অধিকরণে ৭মী
পাইলটে কলি ধরে বেশি > অধিকরণে
৭মী
পরাজয়ে ডরে না বীর > অপাদানে ৫মী
পাপে বিরত হও > অপাদানে ৭মী
পাগলে কি না বলে ছাগলে কি না খায় >
কর্তায় ৭মী

Scanned with CamScanner

পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল > কর্তায় শূন্য

প

পুলিশে খবর দাও > কর্মে ৭মী
পুলিশ ডাক > কর্মে শূন্য
পুলিশ চোর ধরেছে > কর্তায় শূন্য
পাহাড়ে নড়ায় সাধা তাহা > কর্মে শূন্য
পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির > অধিকরণে ৭মী
পরীক্ষা আসিলে তাই চোখে জল করে > অপাদানে ৭মী
প্রসাদ হইতে তাহাকে ডাকিলাম > অধিকরণে ৫মী
পরের মুখে শেখা বুলি > অপাদানে ৭মী
পাপীকে ধিক > কর্মে ২য়া
পাপী পশুর অধম > অপাদানে ৬ষ্ঠী
পাছে লোকে কিছু বলে > কর্তায় ৭মী
পারুল বনের চম্পারে মোর হয় জ্ঞানা > কর্মে ২য়া
পণ্ডিতে পণ্ডিতে লড়াই চলে > কর্তায় ৭মী
পাপ থেকে পুণ্য পৃথক > অপাদানে ৫মী
প্রাণপণে চেষ্টা কর > কর্মে শূন্য
প্রিয়জনে যাহা দিতে চাই তাই দিই > কর্মে ৭মী; সম্প্রদানে ৬ষ্ঠী
ফেরকারে

ফ

ফেরদৌসী কর্তৃক শাহনামা রচিত হয় > কর্তায় ৩য়া
ফলে বৃক্ষের পরিচয় > করণে ৭মী
ফুলে ফুলে সাজিয়েছে ঘর > করণে ৭মী
ফুটেছে বাগানে আজ অজস্র গোলাপ > অধিকরণে ৭মী
ফলে না বৃক্ষে সুমধুর ফল > অধিকরণে ৭মী
ফুলদল দিয়া কাটিল কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে > কর্মে ৭মী
ফুলে ফুলে ঘর ভরেছে > করণে ৭মী

ব

বিনা জ্বালে ভাত হয় না > করণে ৭মী
বাড়ি থেকে নদী দেখা যায় > অধিকরণে ৫মী
বাবা বাড়ি নেই > অধিকরণে শূন্য
বাবাকে বড্ড ভয় পাই > অপাদানে ২য়া
বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে > কর্তায় ৭মী
বনে বাঘ থাকে > অধিকরণে ৭মী
বসন্তে কোকিল ডাকে > অধিকরণে ৭মী
বিপদে মোরে রক্ষা কর > অপাদানে ৭মী
বিপদে অধীর হইও না > অধিকরণে ৭মী
বিপদে যেন করিতে পারি জয় > কর্মে ৭মী
বিপদে আমি না যেন করি ভয় > অপাদানে ৭মী
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে গায়জনা দিব কিসে > কর্তায় ৭মী
বাঘে মহিষে এক ঘাটে পানি খায় > কর্তায় ৭মী
বেলা যে পড়ে এল জলকে চল > নিমিত্তার্থে ৪র্থী
বাজিল কাহার বীণা > কর্মে শূন্য
বনোরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে > অধিকরণে ৭মী
বড় হও নিজের চেষ্টায় > করণে ৭মী
বসিরকে যেতে হবে > কর্তায় ২য়া
বোঁটা আলগা ফল গাছে থাকে না > অধিকরণে ৭মী
ব্যবহারেই ইতরভদ্র চেনা যায় > করণে ৭মী
বাজনা বাজে > কর্মে শূন্য
বিশ্বাস বুদ্ধিকে হার মানায় > কর্মে ২য়া
বিমান থেকে বোমা ফেলা হয়েছে > অপাদানে ৩য়া; কর্মে শূন্য

ভ

ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও > সম্প্রদানে ৪র্থী
ভিক্ষা দাও দুয়ারে দাঁড়ায়ে ভিক্ষুক > সম্প্রদানে শূন্য
ভূতকে আবার কিসের ভয় > অপাদানে ২য়া
ভয়কি মরণে > অপাদানে ৭মী
ভোরে সূর্য ওঠে > অধিকরণে ৭মী

ম

মনেতে আগুন জ্বলে চোখে কেন জ্বলে না > অধিকরণে ৭মী
মৃতজনে দেহ প্রাণ > সম্প্রদানে ৭মী
মন দিয়া কর সবে বিদ্যা উপার্জন > করণে ৩য়া
মানুষ ভাবে এক হয় আরেক > কর্তায় শূন্য
মশা মারতে কামান দাগা > কর্মে শূন্য
মানুষকে মানুষ হতে হয় > কর্তায় ২য়া; কর্মে শূন্য
মীরা বাগানে ফুল তুলছে > কর্মে শূন্য

মিথ্যারে করো না উপাসনা > কর্মে ২য়া

য

যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যা হয় > অপাদানে ৬ষ্ঠী
যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে > কর্মে শূন্য
যদি করি বিষপান তথাপি না যায় প্রাণ > কর্মে শূন্য

র

রাতে মশা দিনে মাছি, এই নিয়ে চাকায় আছি > অধিকরণে ৭মী
রকিব অঙ্কে কাঁচা, কিন্তু ব্যাকরণে ভাল > অধিকরণে ৭মী
রতনে রতন চিনে > কর্তায় ৭মী
রেখ মা দাসেরে মনে > কর্মে ২য়া
রামের ভাই গান গায় > সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী
রবীন্দ্রনাথ পড়লাম > কর্মে শূন্য
রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি লিখেছেন > কর্মে শূন্য
রাতে তারা দেখা যায় > অধিকরণে ৭মী
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি > কর্তায় শূন্য
রাখাল গরুর পাল নিয়ে বাড়ি ফিরে > কর্তায় শূন্য
রাজায় রাজায় লড়াই উলুখাগড়ার প্রাণান্ত > কর্তায় ৭মী

ল

লাঙল দিয়ে জমি চাষ করা হয় > করণে ৩য়া
লাঙলে জমি চাষ করা হয় > করণে ৭মী
লোভে পাপ পাপে মৃত্যু > অপাদানে ৭মী
লোকটি কানে খাটো > করণে ৭মী
লোকটা জাতিতে বৈষ্ণব > করণে ৭মী
লোকমুখে এ কথা শোনা যায় > অপাদানে ৭মী

শ

শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে > অধিকরণে ৭মী
শরতে ধরাতল শিশিরে ঝলমল > করণে ৭মী
শিকারি বিড়াল গোঁফে চেনা যায় > করণে ৭মী
শ্রদ্ধাবান লভে জ্ঞান অন্যে কভু নয় > কর্তায় শূন্য
শাক দিয়ে মাছ ঢেকো না > করণে তৃতীয়া
শিক্ষককে শ্রদ্ধা কর > সম্প্রদানে ৪র্থী
শ্রম বিনা ধন লাভ হয় না > করণে শূন্য
শুধু বৈকুণ্ঠের তরে তরে বৈষ্ণবের গান > সম্প্রদানে ৬ষ্ঠী

স

সর্বাঙ্গ দর্শিল মোর নাগ নাগবালা > কর্মে শূন্য
সর্বশাস্ত্রে জ্ঞান দেন শিক্ষকগণ > সম্প্রদানে ৭মী
সমিতিতে চাঁদা দাও > সম্প্রদানে ৭মী
সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু > নিমিত্তার্থে ৬ষ্ঠী
সরোবরে পদ্ম ফোটে > অধিকরণে ৭মী
সমুদ্রে লবণ আছে > অধিকরণে ৭মী
সাধনায় সিদ্ধি লাভ হয় > করণে ৭মী
সর্বাঙ্গে ব্যথা ঔষধ দিব কোথা > অধিকরণে ৭মী
সর্বজনে দয়া কর > সম্প্রদানে ৭মী
সারারাত বৃষ্টি ছিল > অধিকরণে শূন্য
সব ঝিনুকে মুক্তা পাওয়া যায় না > অপাদানে ৭মী
সৌন্দর্যে কার না রুচি আছে > অধিকরণে ৭মী
সাদা মেঘে বৃষ্টি হয় না > অপাদানে ৭মী
স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় > কর্তায় শূন্য
সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হয় > অধিকরণে ৭মী (ভাবে ৭মী)
সেই সুমধুর শুব্ধ দুপুর পাঠশালা পলায়ন > অপাদানে শূন্য
সকলকে মরিতে হইবে > কর্তায় ২য়া
সরিষা হইতে তৈল হয় > অপাদানে ৫মী
সোজা পথে চল না কেন? > করণে ৭মী
সর্বভূতে ধন দাও > সম্প্রদানে ৭মী

হ

হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে > অধিকরণে ২য়া
হাতে যেমন তেমন মইয়ে তুফান > অধিকরণে ৭মী
হাতে কিছু নাই, লাজ > কর্মে শূন্য

Scanned with CamScanner

কারক বিভক্তি : বিখ্যাত লেখকদের বিখ্যাত পঙ্‌ক্তিসমূহ

০১। একক্ষণে অধিক্ষম অহিলা বিষাদে- করণকারকে ৭মী
০২। নিজস্ব হেম জিনি- কর্মকারক শূন্য
০৩। প্রতি ঘর পড়ি যায়- অধিকরণ কারকে শূন্য
০৪। দান করহে জনেজনে- কর্মকারকে ৭মী
০৫। সাক্ষিতে ঈশ্বর দেখিলা সম্মুখে- কর্তৃকারকে শূন্য
০৬। শক্তির রেখিয়া কাজে- কর্মকারকে শূন্য
০৭। নিজ দুই পক্ষ তাত দেখাও তস্করে- কর্মকারকে ৭মী
০৮। চন্দ্রালে কলাও আনি রাজার আলয়ে- কর্মকারকে ৭মী
০৯। নাহি পক্তি তোমা- কর্মকারকে শূন্য
১০। সন্ধ্যে কলঙ্ক আজি ভক্তির আহবে- করণকারকে ৭মী
১১। ফুল্লিলা বিধুরে বিধি ফুল্লর ললাটে- কর্মকারকে ২য়া / অধিকারণকারকে ৭মী
১২। জন্ম তব কোন মহাকুলে?- অধিকরণকারকে ৭মী
১৩। অস্ত্রহীন যোধে কী সে সংঘাধে সংগ্রামে- কর্মকারকে ৭মী
১৪। কী দেখে ভবিবে এলাস হেন দুর্বল মানবে?-অপাদানকারকে ৭মী বিভক্তি
১৫। মহামন্ত্রবলে যথা নম্রশির ফণী- করণকারকে ৭মী
১৬। মজালিলা এ কনকলঙ্কা রাজা- কর্মকারকে শূন্য
১৭। বিরত সতত পাপে দেবকুল- অপাদানকারকে ৭মী
১৮। বাঘের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী- অধিকরণকারকে ৭মী
১৯। পরদোষে কে চাহে মজিতে?- করণকারকে ৭মী
২০। শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই- কর্মকারকে শূন্য
২১। বুঝেছ উপেন ও জমি লইব কিনে- উপেন=সম্বন্ধপদ, জমি=কর্মকারকে ৭মী
২২। পেলে দুই বিঘে প্রস্থে ও দিঘে সমান হইবে টান্যা।-করণ কারকে ৭মী
২৩। ওটা দিতে হবে।-কর্ম কারকে শূন্য
২৪। কহিলাম তবে বক্ষে জুড়িয়া-অধিকরণ কারকে ৭মী
২৫। সজল চক্ষে।-করণ কারকে ৭মী
২৬। সত্যপুরুষ যেথায় মানুষ।-কর্তৃকারকে শূন্য
২৭। দৈন্যের দায়ে বেচিব সে মায়ে- কর্মকারকে ৭মী
২৮। রাজা ক্ষণকাল রহিলা মৌনভাবে- কর্তৃকারকে শূন্য
২৯। রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি। রাজার=সম্বন্ধপদ, হস্ত = কর্তৃকারকে শূন্য
৩০। মোরে ভগবান রাখিবে না মোর ধর্মে।-কর্তৃকারকে শূন্য
৩১। তাই লিখি দিল বিশ্ব নিখিল-কর্মকারকে শূন্য
৩২। সন্ন্যাসীবেশে ফিরি দেশে দেশে- অপাদান কারকে ৭মী
৩৩। স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি-কর্তৃকারকে শূন্য
৩৪। পৌরবিকে এখানে নিয়ে আসে মুকুন্দ- কর্মকারকে ২য়া
৩৫। চোখে আসে জল ভরে।-অধিকরণ কারকে ৭মী
৩৬। সেই সুমধুর শুষ্ক দুপুর পাঠশালা পলায়ন।-অপাদান কারকে শূন্য
৩৭। সহসা বাতাস ফেলি গেল শ্বাস। -কর্তৃকারকে শূন্য
৩৮। দুটি পাকাফল লভিল ভূতল- কর্তৃকারকে শূন্য
৩৯। সপ্তম সুরে পড়িতে লাগিলভূতল। -কর্তৃকারকে শূন্য
৪০। শুনি বিবরণ ক্রোধে তিনি কন-করণকারকে ৭মী
৪১। পরিষদ দলে বলে তার শতগুণ- কর্তৃকারকে শূন্য
৪২। বন্দন করি তাঁরে- কর্মকারকে ৭মী
৪৩। এক দেহে হল লীন-অধিকরণ কারকে ৭মী
৪৪। ভাসছে যেন আলগা স্রোতে। -করণকারকে ৭মী
৪৫। ভাবা যা সে ওদের পিঠে।- অধিকরণকারকে ৭মী
৪৬। প্রাণের হাসি হাসতে জানে। -কর্মকারকে শূন্য
৪৭। অন্নহীনে অন্ন দিতে ভিক্ষা মাগে লক্ষ্মী হয়ে।-নিমিত্তার্থে ৭মী
৪৮। পুরাতনে শ্রদ্ধা রাখ-অধিকরণ কারকে ৭মী

৪৯। দেশ দেশান্তে ঘুরিয়ে আজি আনতে দেশ জাগে বিভব- অধিকরণকারকে ৭মী
৫০। মৃণ্ময়তাকে হয় গো কাবু-করণকারকে ৭মী
৫১। আকুল করিয়া তোলে মন-কর্মকারকে শূন্য
৫২। কেহ বাতায়ন-পাশে চেয়ে রয় নীলাকাশে -কর্মকারকে শূন্য
৫৩। সাগোর মুখ আমি দেখিয়াছি-কর্মকারকে শূন্য
৫৪। অন্ধকারে জেগে ওঠা-অধিকরণ কারকে ৭মী
৫৫। পাতাটির নিচে বসে আছে চোরের দোয়েল পাখি।-কর্তৃকারকে শূন্য
৫৬। চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ- কর্মকারকে শূন্য
৫৭। কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে-কর্তৃকারকে শূন্য
৫৮। একদিন অমরায় গিয়ে।-অধিকরণে ৭মী
৫৯। বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঘুরের মত কেঁদেছিল পায়।-কর্তৃকারকে শূন্য
৬০। রে অগ্রদূত চলতে কী তুই পারবি আপন প্রাণ বাঁচিয়ে-অগ্রদূত = সম্বন্ধ পদ, প্রাণ = কর্মকারকে শূন্য
৬১। আজকে প্রাণের গো জাগরে উড়ছে জাঠ কালাপাহাড়?-কর্তৃকারকে শূন্য
৬২। খবর শোনা বন্ধ খাঁচায় ঘেরাটোপে- অধিকরণকারকে ৭মী
৬৩। উড়ছে আজো ধর্মধ্বজা ঢিকির পিঠে দাড়ির ঝোপে-কর্তৃকারকে শূন্য
৬৪। নিন্দবাদের বৃন্দাবনে ভেবেছিলাম গাইব না গান-অধিকরণকারকে ৭মী
৬৫। ক্রুদ্ধ রোষে রুদ্ধ ব্যথায় ফোঁপায় প্রাণে ক্ষুব্ধ বাণী-রোষে = করণকারকে ৭মী, ব্যথায় = করণ কারকে ৭মী, বাণী = কর্তৃকারকে শূন্য
৬৬। মাতালদের ওই ভাটিশালায় নটিনী আজ বীণাপাণি-অধিকারণ কারকে ৭মী
৬৭। বিষের জ্বালায় বিশ্ব জুড়ে-করণকারকে ৭মী
৬৮। ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে-করণে ৭মী
৬৯। কেঁদে ভাসাইত বুক- কর্মে শূন্য
৭০। এত সোনা মোর ছড়াইয়া দিল কারা- কর্মে শূন্য
৭১। ভাবি সাব মোর তামাশা করিত কত-কর্তৃকারকে শূন্য
৭২। আমার কেবিনে ঘাইলে কিন্তু উজান ধলির দা-অধিকরণে শূন্য
৭৩। আজি যে তোমার কাছ খুশি হত- কর্তৃকারকে শূন্য
৭৪। কেঁদে তার অধিবাসে-করণকারকে ৭মী
৭৫। মাটির আড়ি যে পাড়া আসলাপাড়ি- কর্মে শূন্য
৭৬। সবত্র হাতরাতি ভিজে-কর্তৃকারকে শূন্য
৭৭। সন্ধ্যা সবার ভালে-কর্তৃকারকে শূন্য
৭৮। একটি শিশুর ঘুম-কর্তৃকারকে শূন্য
৭৯। কোলে আম্বরের পাতের ছাতার- অধিকরণে ৭মী
৮০। একালে আমার অঙ্গে তোমার উজল উপস্থিতি- অধিকরণে ৭মী
৮১। একালে তোমার লাগে সকল উজল হয়ে উঠি-করণে ৭মী
৮২। তোমার নামের মালা সোনার মানস স্কুলে ধরে-কর্তৃকারকে শূন্য
৮৩। তবু খুশিতে ঝিল-মিলন সন্ধ্যা পাড় তোলে-কর্তৃকারকে শূন্য
৮৪। আমার বলতে কাউ থাকের সাথিরে প্রতীক্ষায়-অধিকরণে ৭মী
৮৫। শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস-কর্তৃকারকে শূন্য
৮৬। বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া মন্ত্রিকে তিরস্কার করিতে লাগিল-কর্মে ২য়া
৮৭। সমুদ্র দেখিব বাড়ো সাধ ছিল-কর্মে শূন্য
৮৮। চতুর্দিক অতি শান্ত কুসুটিকায় বাপ্ত হইয়াছে-করণে ৭মী
৮৯। বুঝিলেন মন্ত্রিবর নিজের নিশ্চয়ম হইয়াছে- কর্মে শূন্য
৯০। একটি স্ত্রীলোক গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন করিয়া আসিয়াছিল-অধিকরণে ৭মী
৯১। তাহারা মহাসমুদ্র আসিয়া পড়িয়াছেন- অপাদানে ৭মী
৯২। ঈশ্বরের জিনিস তো-সম্বন্ধ পদ (কারক নয়)
৯৩। কিছুদিন বাদেই হারার বাবা মাবা যায়-সম্বন্ধ পদ (ঐ)
৯৪। পৌরবি অবাক হয়ে গেল-কর্তৃকারকে শূন্য
৯৫। নদী আজ বহুকাল অবধি তোমার সহিত আমার সখ্য-সম্বোধন পদ (কারক নয়)
৯৬। সেই ক্ষীণবায়ু দেবধূপের সৌরভে পরিপূর্ণ-সম্বন্ধ পদ (ঐ)

Scanned with CamScanner

৯১। ছোটো ছোটো ডালগুলি ঈষৎ ঝুঁকিয়া রহিয়াছে-অধিকরণে ৭মী
৯২। [illegible]
৯৩। [illegible]
৯৪। [illegible]
৯৫। [illegible]
৯৬। [illegible]
৯৭। [illegible]
৯৮। [illegible]
৯৯। [illegible]
১০০। [illegible]
১০১। [illegible]
১০২। [illegible]
১০৩। [illegible]
১০৪। [illegible]
১০৫। [illegible]
১০৬। [illegible]
১০৭। [illegible]
১০৮। [illegible]
১০৯। [illegible]
১১০। [illegible]
১১১। [illegible]
১১২। [illegible]
১১৩। [illegible]
১১৪। [illegible]
১১৫। [illegible]
১১৬। [illegible]
১১৭। [illegible]
১১৮। [illegible]
১১৯। [illegible]
১২০। [illegible]
১২১। [illegible]
১২২। [illegible]
১২৩। [illegible]
১২৪। [illegible]
১২৫। [illegible]
১২৬। [illegible]
১২৭। [illegible]
১২৮। [illegible]
১২৯। [illegible]
১৩০। [illegible]
১৩১। [illegible]
১৩২। [illegible]
১৩৩। [illegible]
১৩৪। [illegible]
১৩৫। [illegible]
১৩৬। [illegible]
১৩৭। [illegible]
১৩৮। [illegible]
১৩৯। [illegible]
১৪০। [illegible]
১৪১। [illegible]
১৪২। [illegible]

১৪৩। [illegible]
১৪৪। [illegible]
১৪৫। [illegible]
১৪৬। [illegible]
১৪৭। [illegible]
১৪৮। [illegible]
১৪৯। [illegible]
১৫০। [illegible]
১৫১। [illegible]
১৫২। [illegible]
১৫৩। [illegible]
১৫৪। [illegible]
১৫৫। [illegible]
১৫৬। [illegible]
১৫৭। [illegible]
১৫৮। [illegible]
১৫৯। [illegible]
১৬০। [illegible]
১৬১। [illegible]
১৬২। [illegible]
১৬৩। [illegible]
১৬৪। [illegible]
১৬৫। [illegible]
১৬৬। [illegible]
১৬৭। [illegible]
১৬৮। [illegible]
১৬৯। [illegible]
১৭০। [illegible]
১৭১। [illegible]
১৭২। [illegible]
১৭৩। [illegible]
১৭৪। [illegible]
১৭৫। [illegible]
১৭৬। [illegible]
১৭৭। [illegible]
১৭৮। [illegible]
১৭৯। [illegible]
১৮০। [illegible]
১৮১। [illegible]
১৮২। [illegible]
১৮৩। [illegible]
১৮৪। [illegible]
১৮৫। [illegible]
১৮৬। [illegible]
১৮৭। [illegible]
১৮৮। [illegible]
১৮৯। [illegible]

Scanned with CamScanner

১৯০। তাহাতেও ওর যেন সমস্ত সংসারকে বাঙ্গল-কর্মকারকে ২য়া

১৯১। দাদুটে তার প্রজাবা টু শব্দটি করিতে পারে না-করণে ৭মী

১৯২। তক্তপোষ দ্বিপ্রহর বেশায় বাটী দিতেছিলেন-অধিকরণে ৭মী

১৯৩। অন্য বৃষ্টির আকাশ হইতে যেন আগুন ঝরিয়া পড়িতেছে-অপাদানে ৫মী

১৯৪। ওরে ও 'গফুরা' বলি ঘরে আছিস-সম্বোধন পদ (কারক নয়)

১৯৫। গফুর চাহিয়া রহিল-কর্তৃকারকে শূন্য

১৯৬। কর্তা তোকে জ্যান্ত করে দেবে-কর্মকারকে ২য়া

১৯৭। খামারে পড়ে-অধিকরণে ৭মী

১৯৮। কার গাদা কেড়ে খাবে-কর্মকারকে শূন্য

১৯৯। গফুর জবাব দিল না-কর্তৃকারকে শূন্য

২০০। তোর মেয়ে জাত রাখে নি-কর্মকারকে শূন্য

২০১। এই নিষ্ঠুর অভিযোগে গফুরের যেন বাকা রোধ হইয়া গেল-করণে ৭মী

২০২। কর্তামশায় সব ধরে রাখলেন-কর্তৃকারকে শূন্য

২০৩। আমার মহেশ মরে যাবে-কর্তৃকারকে শূন্য

২০৪। এ বিদ্রূপ গফুরের কানে গেল না-কর্মকারকে শূন্য বিভক্তি/কর্তৃকারকে ৬ষ্ঠী

২০৫। মাঠের ধান মাঠে শুকিয়ে গেল-অধিকরণে ৭মী

২০৬। তোমাকে ফাঁকি দেবনা-কর্মকারকে ২য়া

২০৭। ঘরে যাই বেলা বয়ে গেল-অধিকরণে ৭মী

২০৮। একমুখো খেতে চায়-কর্মকারকে শূন্য

২০৯। তোকে দিলে না-কর্মকারকে ২য়া

২১০। গলা বাড়াইয়া আমানে চোখ বুজিয়া রহিল-করণে ৭মী

২১১। গায়ে আর তোর জোর নেই-অধিকরণে ৭মী

২১২। একখানি মাটির সানকিতে ভাত বাড়িয়া লইয়াছে-অধিকরণে ৭মী

২১৩। একজন বোধ করি অন্তরীক্ষে থাকিয়া লক্ষ করিলেন-অধিকরণে ৭মী

২১৪। মানিক ঘোষেরা মহেশকে আমাদের... -কর্মকারকে ২য়া

২১৫। পুলিশের লোক তাকে গোহাটায় পেয়ে ফেলবে?-অধিকরণে ৭মী

২১৬। আমিনা তাহা জানিত না-কর্তৃকারকে শূন্য

২১৭। আজও আপত্তি করিল না-অধিকরণে শূন্য

২১৮। একথা কর্তার কানে গিয়াছে-কর্তৃকারকে ৬ষ্ঠী

২১৯। সকলেই বিস্মিত হইল-কর্তৃকারকে ৭মী

২২০। ছেঁড়া বুক ফেটে গেল-করণে ৭মী

২২১। এত লোকে মরে-কর্তৃকারকে ৭মী

২২২। গফুরের বুকে শেল বিধিল-অধিকরণে ৭মী

২২৩। সেই লক্ষ ফাটল দিয়া ধরিত্রীর বুকের রক্ত নিরন্তর-সম্বন্ধ পদ (কারক নয়)

২২৪। ওরে ও গফরা বলি ঘরে আছিস-সম্বোধন পদ (ঐ)

২২৫। কী করব বাবাঠাকুর-সম্বোধন পদ (ঐ)

২২৬। বাবুমশায় হাজির তুমি-সম্বোধন পদ (ঐ)

২২৭। দাও না ঠাকুর মশায় কাহন দুই ধার-সম্বোধন পদ (ঐ)

২২৮। মহেশ তুই আমার ছেলে-সম্বোধন পদ (ঐ)

২২৯। গফুর চোখের জল গেরুটার পিঠের উপর-সম্বন্ধ পদ (ঐ)

২৩০। মহেশকে আবার চাল ফেড়ে খড় দিয়েছ বাবা-সম্বন্ধ পদ (ঐ)

২৩১। একটা পিতলের থালায় পিতার হাত - সম্বন্ধ পদ (ঐ)

২৩২। একটুখানি হাসনার অভিনয়-সম্বন্ধ পদ (ঐ)

২৩৩। কাজের সন্ধানে বাহির হইয়াছিল-সম্বন্ধ পদ (ঐ)

২৩৪। বুড়া চাদরের খুট হইতে-সম্বন্ধ পদ (ঐ)

২৩৫। গফরা ঘরে আছিস-সম্বোধন পদ (ঐ)

২৩৬। আমিনা চল আমরা যাই-সম্বোধন পদ (ঐ)

২৩৭। আল্লা যত খুশি আমাকে সাজা দিয়ো -সম্বোধন পদ (ঐ)

২৩৮। তাহা সাধারণে পায় না-কর্তৃকারকে ৭মী

২৩৯। এই ছোটো মেয়েটা তো কাছেই ঘেঁষিতে পারে না-কর্তৃকারকে শূন্য

২৪০। আমার খাওয়া দাওয়া হয়নি-কর্তৃকারকে ৬ষ্ঠী

২৪১। অন্ধকার গভীর নিশীথে সে মেয়ের হাত ধরিয়া বাহির হইল-অধিকরণে ৭মী

২৪২। আমাকে যত খুশি সাজা দিও-কর্মকারকে ২য়া

২৪৩। তার কসুর তুমি যেন কখনো মাপ কোরো না-কর্মকারকে শূন্য

২৪৪। তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস তেষ্টার জল-সম্বন্ধ পদ (কারক নয়)

২৪৫। মাঝরাতে শংকরের ঘুম ছেড়ে গেল-অধিকরণে ৭মী

২৪৬। দুজনেই কান খাড়া করে শুনলে-কর্তৃকারকে ৭মী

২৪৭। দুটো চিতা বাঘ তো ওদের গা ঘেসে ছুটে পালাল-কর্তৃকারকে শূন্য

২৪৮। প্রাণের ভয়ে ছুটেছে-অপাদানে ৭মী

২৪৯। আগুনটা ভালো করে জ্বালা-কর্মকারকে শূন্য

২৫০। কী হচ্ছে বাইরে-অধিকরণে ৭মী

২৫১। অলভারেজ সেদিকে চেয়ে ভয়ে বিস্ময়ে বলে উঠল-কর্তৃকারকে শূন্য

২৫২। লঙ্কটা তুবড়ি একসঙ্গে জ্বলছে-কর্মকারকে শূন্য

২৫৩। শংকরের মনে হল-কর্তৃকারকে ৭মী

২৫৪। ওরা কেউ এর আগে প্রজ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি দেখিনি-কর্মকারকে শূন্য

২৫৫। শংকরের টর্চের আলোয় সেটা গমোমতো খেয়ে-করণকারকে ৭মী

২৫৬। দুজনেই হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়ল-কর্তৃকারকে ৭মী

২৫৭। কুব মিহি ধূসর বর্ণের ছাই আকাশ থেকে পড়েছে-অপাদানে ৫মী

২৫৮। হেমলক গাছের জঙ্গল দাবানলে ও প্রস্তর বর্ষণে সম্পূর্ণ নষ্ট হতে গেল-করণ কারকে ৭মী

২৫৯। সারাদিন সন্ধানভাবে অগ্নিলীলা চলল-অধিকরণে শূন্য

২৬০। রাত্রি এল-কর্তৃকারকে শূন্য

২৬১। অবশিষ্ট জঙ্গলটাকেও ঢাকা ছিল-কর্মকারকে ২য়া

১৬২। আলভারেজ পাথরের ঘায়ে আহত হল-করণকারকে ৭মী

১৬৩। সকালে বেশ স্পষ্ট দেখা গেল-অধিকরণে ৭মী

২৬৪। আলভারেজ ম্যাপ দেখে বললে-কর্মকারকে শূন্য

২৬৫। নামটা শুনে মনে হয়-কর্মকারকে শূন্য

২৬৬। আমার সমস্ত কষ্ট সার্থক হল-কর্তৃকারকে ৬ষ্ঠী বিভক্তি/কর্মকারকে শূন্য

২৬৭। শংকর আগুনটা ভালো করে জ্বালো-সম্বোধন পদ (কারক নয়)

২৬৮। একটা শিশ্নসক ছরিণের দল ওদের দশগজের মধ্যে এসে পড়ল-সম্বন্ধ পদ (ঐ)

২৬৯। নজর পড়ল দূরের পাহাড়ের চূড়াটার দিকে-সম্বন্ধ পদ (ঐ)

২৭০। রাঙা আগুনের মেঘ নিচু হয়ে যায়-সম্বন্ধ পদ (ঐ)

২৭১। পালাও পালাও শংকর-সম্বোধন পদ (ঐ)

২৭২। ধ্বংকের গন্ধ বাতাসে-সম্বন্ধ পদ (ঐ)

২৭৩। জলন্ত পাহাড়ের চূড়ার মুখটা উড়ে গিয়েছে-সম্বন্ধ পদ (ঐ)

২৭৪। গাছের ডাল ভেঙে পড়ল পাথরের চোট খেয়ে-সম্বন্ধ পদ (ঐ)

২৭৫। জ্বলভায়ায় এর নাম অগ্নিসেবের শয্যা -সম্বন্ধ পদ (ঐ)

২৭৬। হে রুদ্রদেব প্রণাম-সম্বন্ধ পদ (ঐ)

২৭৭। এই বসিবসি আসমান জমিন কতয় কীভাবি-কর্মকারকে শূন্য

২৭৮। ভালকরি বাজাইলে কত সুর কণ্ঠ-কর্তৃকারকে শূন্য

২৭৯। আইজো কোন ও কাম পালুনা-অধিকরণে শূন্য বিভক্তি/কর্মকারকে শূন্য

২৮০। নাইন কইরে মারামারি লাগিলেন বুঝি-কর্মকারকে শূন্য

২৮১। হাকিমুদ্দির বাড়ি ক্যানে যাবার কইস-অধিকরণে শূন্য

২৮২। ক্যামন আগে থাকি শহরে যারা গুলকি ত্যালেয়া-অধিকরণে ৭মী

২৮৩। ইয়ারাই দুনিয়ায় আগুন লাগেয়া দিলে -অধিকরণে ৭মী

২৮৪। কাইল বিছানে উঠিয়া বছির আর ফুলজানকে রাখি আসীছ-অধিকরণে ৭মী

২৮৫। আইজ বাড়িটি সুনসুনটা হয়া গেইছে-অধিকরণে শূন্য

Scanned with CamScanner

২৯৪। পলার সবর বেকলায় করুণ হয়ে এল-করুণ কারকে ৭মী

২৯৭। কাইল দুই শরবখলার কান্না নিহি-অধিকরণে ৭মী

২৯৮। পদেশ ধর্মপটী দেখি জ্বালা ছিল-কর্তৃকারকে শূন্য

২৯৯। কানা জকির কলেরা চালান দিছে-কর্তৃকারকে শূন্য

২৯০। তাইর রাইতে কিছুই বাচ নাই-অধিকরণে ৭মী

২৯১। শ্রীমন্তরে আইজ মোর দরিয়ায় ডুবায় দাদিবে-অধিকরণে ৭মী

২৯২। জালোয়ার নিজে নিজে মইরবারে পারে না-কর্তৃকারকে শূন্য

২৯৩। কোন বসুর হাম্বরা কচ্ছি-কর্মকারকে শূন্য

২৯৬। আসমান ভাতি ফ্যারিস্তা আসিয়া সালেশ মিঠাই দিয়া যাইবে-কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তি/কর্মকারকে শূন্য

২৯৫। বাচ্চা কালে দুঃখের দিন দেখছি হয়-অধিকরণে ৭মী

২৯৬। ওই টাকায় বাপজান হজ্ব করি অইল-করণে ৭মী/কর্মে শূন্য

২৯৭। বাপজানের মুশকিল আসান হচ্ছিল-কর্তৃকারকে ৬ষ্ঠী

২৯৮। আইজ মোরও পরীক্ষা-কর্তৃকারকে ৬ষ্ঠী

২৯৯। একটা কথা কবার চাই-কর্মকারকে শূন্য

৩০০। শাশুড়ি না খায়া মইল-কর্তৃকারকে শূন্য

৩০১। মুই শহরে চালি যাই-অধিকরণে ৭মী

৩০২। স্থির অপলক দৃষ্টিতে রহিমের দিকে চেয়ে-করণে ৭মী

৩০৩। রহিম অস্থির হয়ে উঠানে ঘুরছে-কর্তৃকারকে শূন্য

৩০৪। হাকিমুদ্দির মনের সাধটা মিছিল-কর্তৃকারকে ৬ষ্ঠী

৩০৫। আকালে সব এক হয়া গেল-অধিকরণে ৭মী

৩০৬। তারা মাইনষের হাতে সব করায়-করণে ৭মী

৩০৭। মইলে কবরে মুতি নিদ যায়-অধিকরণে ৭মী

৩০৮। ভগবান যা করায় তায় ভাল-কর্তৃকারকে ৬ষ্ঠী

৩০৯। আর মাদিকেরও পরীক্ষা-কর্তৃকারকে ৬ষ্ঠী

৩১০। খাবার ন্যায় নাইও-কর্মকারকে শূন্য

৩১১। দ্যাওয়ানি তাড়েয়া দিলে-কর্তৃকারকে শূন্য

৩১২। বছিরকে দেখিয়া দ্যাওয়ানি চিনেছে-কর্মকারকে শূন্য

৩১৩। রহিমের দিকে চেয়ে বলল-কর্তৃকারকে ৬ষ্ঠী

৩১৪। ফুলজান ধরি যাও এই কাগজ-কর্মকারকে শূন্য

৩১৫। তোক তাল্লাক লেখি দিছি-কর্মকারকে শূন্য

৩১৬। এক শয়তানটা খাবার দিবার বাধা-কর্তৃকারকে শূন্য

৩১৭। কাঁয়ো শুনি যায়া শয়তানকে কইবে-কর্মকারকে ২য়া

৩১৮। উদ্ধার মান গেলে মোরও মান যায়-কর্তৃকারকে ৬ষ্ঠী

৩১৯। বছির একমনে চিড়া খাচ্ছিল-কর্মকারকে শূন্য

৩২০। মানুষের জানটাও বাজাটারে মতো-সম্বন্ধ পদ (কারক নয়)

৩২১। হয়রে রহিমভাই লঙড়খানা না তোরে বুদ্ধিতে হইল-সম্বোধন পদ (ঐ)

৩২২। ময়লাটয়লা গুণা দিঘির জলে আর কুঁয়াতে ফেলি দেয়-সম্বন্ধ পদ (ঐ)

৩২৩। নাদির বাড়ি থাকি আলুরে বছির- সম্বন্ধ পদ (ঐ)

৩২৪। বাচ্চা কালে দুঃখের দিন দেখছি হয়-সম্বন্ধ পদ (ঐ)

৩২৫। কিয়ামতের রোজ কমো-সম্বন্ধ পদ (ঐ)

৩২৬। মাস্তরে বড়ো ভোখ লাইগছে-সম্বোধন পদ (ঐ)

৩২৭। শ্রীমন্ত তুইয়ে তো দ্যাখোঁ মোর ফ্যারিস্তা হলুরে-সম্বোধন পদ (ঐ)

৩২৮। দুনিয়ার মালিক যদি এই জন্যে-সম্বন্ধ পদ (ঐ)

৩২৯। ফুলজান ধরি যাও এই কাগজ-সম্বোধন পদ (ঐ)

৩৩০। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমার চোখে ধরা পড়ে না-করণে ৭মী

৩৩১। জাহাজের মেজো সারেঙের আজ বোধ হয় ছুটি-কর্তৃকারকে ৬ষ্ঠী

৩৩২। আর কল্পনায় বুনেছে কতখানি-করণে ৬ষ্ঠী

৩৩৩। আমাকে আপনি বলবেন না সাহেব-কর্মকারকে ২য়া

৩৩৬। শেষটায় মোকা পেয়ে দুপদর্শী দর্শন তাকে আগাগোড়া পড়ে শোনালুম-কর্মকারকে শূন্য বিভক্তি/কর্মকারকে ২য়া

৩৩৫। যাদের খুশী ধনসৌলত দিয়েছেন-কর্তৃকারকে শূন্য

৩৩৬। আমারেই গাঁ ধনাইছড়ার লোক-অধিকরণে ৬ষ্ঠী

৩৩৭। আমার ঠিক মনে পড়ছে না-কর্তৃকারকে ৬ষ্ঠী

৩৩৮। তখন তো মানুষ খুন করে-কর্মকারকে শূন্য

৩৩৯। শুধু সমীরুদ্দি একবারের তারও তাতর হয়নি-কর্তৃকারকে শূন্য

৩৪০। সমীরুদ্দি বন্দরে নামলেই না-অধিকরণে ৭মী

৩৪১। আমার চিটে ছেড়ে দাও-সম্বন্ধ পদ (কারক নয়)

৩৪২। আমরা শাকসবজি খেতে নামলাম সেখানে-কর্মকারকে শূন্য

৩৪৩। হাম ঘুরে সব মাল নেমে গেলে-অধিকরণে ৭মী

৩৪৪। পৌজ্জালুম নুক্তক বন্দরে-অধিকরণে ৭মী

৩৪৫। মিরকিন মজুরদের জবর লোকসান হয়-কর্মকারকে শূন্য

৩৪৬। তাই আমরা হয়ে রইলাম জাহাজে বন্দি-অপাদানে ৭মী

৩৪৭। ডাক্তার তাকে শুয়ে থাকবার হুকুম দিলে-কর্তৃকারকে শূন্য

৩৪৮। সে জাহাজ থেকে পালাবে-অপাদানে ৫মী

৩৪৯। সে খবর দিয়ে রেখেছিল-কর্মকারকে শূন্য

৩৫০। সমুদ্রপারে এসেছিল হাওয়া খেতে-অধিকরণে ৭মী

৩৫১। কিন্তু দেশে যাবার ফুরসত হয়ে ওঠে নি- অধিকরণে ৭মী

৩৫২। বুড়ি নাকি আমার জন্য কাঁদত-কর্তৃকারকে শূন্য

৩৫৩। সে আস্তানা গেড়ে বসেছে মিরকিন মুলুকে-অধিকরণে ৭মী

৩৫৪। মিরিকিন মুলুক সোনার দেশ-সম্বন্ধ পদ (কারক নয়)

৩৫৫। নউক বন্দরে আমাদের নামতে দেয় নি- অধিকরণে ৭মী

৩৫৬। সে আমাকে সব কিছু বলেছিল-কর্মকারকে ২য়া

৩৫৭। এর কম যা মানুষ কি সইতে পারে-কর্তৃকারকে শূন্য

৩৫৮। সে গাঁয়েই ছিল-অধিকরণে ৭মী

৩৫৯। অতি অল্প কথায় সমীরুদ্দি আমাকে সবকিছু বলেছিল-করণে ৭মী

৩৬০। আবার সে টাকটা গুড়লি-কর্মকারকে শূন্য

৩৬১। আমি জাহাজের খালাসি এই-সম্বন্ধ পদ (কারক নয়)

৩৬২। সাহেং সাহেব জাহাজ লেট যাচ্ছে নাতো-সম্বোধন পদ (ঐ)

৩৬৩। টিপলে মনে হোত কঙ্কালের খোল-সম্বন্ধ পদ (ঐ)

৩৬৪। সমীরুদ্দি সাঁতারের ভাসিয়া পরে নামল- সম্বন্ধ পদ (ঐ)

৩৬৫। গেল জোহরের নমাজ পড়তে-সম্বন্ধ পদ (ঐ)

৩৬৬। শা বন্দরের বাকলীর পুতুলের মতো চুপ করে বসে-সম্বন্ধ পদ (ঐ)

৩৬৭। তার ছাতির খুন করিয়ে ছিল-সম্বন্ধ পদ (ঐ)

৩৬৮। মোল্লাজি আর গাঁয়ের মুরুব্বিরা তাই ভাইকে নিয়ে এলেন-সম্বন্ধ পদ (ঐ)

৩৬৯। সমীরুদ্দির ভাই এলের বলেছেন-সম্বন্ধ পদ (ঐ)

৩৭০। পাথরের পুতুলের মতো বসে রইল সে- সম্বন্ধ পদ (ঐ)

৩৭১। আমরা এই বায়ুকে দূষিত বায়ুবলি-কর্মকারকে ২য়া

৩৭২। বিজ্ঞানীরা তা ক্রমশ বুঝতে পারছিলেন - কর্তৃকারকে শূন্য

৩৭৩। তখন আমেরিকায় লস অ্যাঞ্জেলস ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়-অধিকরণে শূন্য বিভক্তি/করণে ৭মী

৩৭৪। প্রশাসন সচেতন হয়-কর্তৃকারকে শূন্য

৩৭৫। আমেরিকাতে ক্লিন এয়ার অ্যাক্ট আইন পাশ হয়ে যায়-অধিকরণে ৭মী

৩৭৬। প্রাণী বাঁচতে পারে না-কর্তৃকারকে শূন্য

৩৭৭। এসব আবর্জনা থেকে রোগ জীবাণুবাহী মাছি কীটপতঙ্গের জন্ম হয়-অপাদানে ৫মী

৩৭৮। ভ্রূণস্থ শিশুর ক্ষতি করে-কর্তৃকারকে ৬ষ্ঠী

Scanned with CamScanner

৩৭৯। গাছের শিকড় প্রচুর জল টেনে নিতে পারে-কর্মকারকে শূন্য
৩৮০। মানুষের সৃষ্ট সভ্যতা যেন পৃথিবীকে না গ্রাস করে-কর্মকারকে ২য়া
৩৮১। আমেরিকায় টমাটো গাছে অতি হয়-অধিকরণে ৬ষ্ঠী
৩৮২। বায়ুর নাইট্রোজেন উদ্ভিদ জগতের পোষণে সাহায্য করে-সম্বন্ধ পদ (কারক নয়)
৩৮৩। তেজস্ক্রিয় বিকিরণের মান নিচু রাখতে বাধ্য হয়-সম্বন্ধ পদ (ঐ)
৩৮৪। নদীর জল দূষিত হয়-সম্বন্ধ পদ (ঐ)
৩৮৫। জল উদ্ভিদ ও প্রাণী বাঁচতে পারে না-কর্তৃকারকে শূন্য
৩৮৬। প্রাণীদেহের জীবকোষ অচিরেই নষ্ট হয়-সম্বন্ধ পদ (কারক নয়)
৩৮৭। গাছের শিকড় প্রচুর জল টেনে নেয়-সম্বন্ধ পদ (ঐ)
৩৮৮। সংগীতের সুস্বর এই শ্রেণিতে পড়ে না-সম্বন্ধ পদ (ঐ)
৩৮৯। কানের ঢাকা পরে শব্দ কারখানার কর্মীরা কাজ করতে পারেন-সম্বন্ধ পদ (ঐ)
৩৯০। প্রায় ৭০ হাজার মাছির সূতিকাগার হতে পারে-সম্বন্ধ পদ (ঐ)
৩৯১। হারা গৌরবের উঠানে এসে দাঁড়াল-কর্তৃকারকে এ বিভক্তি/অধিকরণে ৭মী
৩৯২। ছুরে ছুরে জিভ এড়ে কথা ওর সড়োগড়ো হয়নি এখনও-করণে ৭মী
৩৯৩। গৌরবি তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারে না-কর্তৃকারকে শূন্য
৯৪। বলে মাটিতে গুতু ফেলেছিল-অধিকরণে ৭মী
৩৫। মানুষে বউ এসে শাশুড়িতে পর করে-কর্মকারকে ২য়া
৯। আজকাল মানুষ বড়ো মন্দ হয়ে গেছে-অধিকরণে শূন্য
। বিকেলে পয়সা দে যাবে-অধিকরণে ৭মী বিভক্তি/কর্মকারকে শূন্য
৩৯৮। গৌরবির বৈকালে শাশুড়িরা বসন্ত, কর্তৃকারকে শূন্য
৩৯৯। এ গ্রামে যে মানুষ বসতে ছে, অধিকরণে ৭মী
৪০০। গৌরবির ভেতরটা ভয়ে শুকিয়ে গেল, অপাদানে ৭মী
৪০১। শেয়াল উঠোন দিয়ে হাঁটে-কর্তৃকারকে শূন্য
৪০২। ছেলেকে বোলে না যেন-কর্মকারকে ২য়া
৪০৩। বউকালে চলে এলাম-অধিকরণে ৭মী
৪০৪। শহরে গৌরবি আর হারার সময়ও অনেক বড়ো-অধিকরণে ৭মী
৪০৫। বিষ খুব তাড়াতাড়ি মাতায় উঠে গিয়েছিল-কর্তৃকারকে শূন্য
৪০৬। বাসস্ট্যান্ডের চায়ের দোকানে উনুন ধরেনি-সম্বন্ধ পদ (কারক নয়)
৪০৭। হারার মা র ওপরই ওর নির্ভর-সম্বন্ধ পদ (ঐ)
৪০৮। ওর মাথায় বালিশের নিচে রূপোর হাঁসুলির মতো চকচকে নিয়ড়চাঁদা সাপ-সম্বন্ধ পদ (ঐ)
৪০৯। মাদুর মুড়ে হারার বাবাকে-সম্বন্ধ পদ (ঐ)
৪১০। তুমি পাশ্যাবাবুদের চেয়ে উচু ঘর তোল কেন-সম্বন্ধ পদ (ঐ)
৪১১। আমাদের দেশের কথা মনে পড়ে-সম্বন্ধ পদ (ঐ)
৪১২। কাত ফিরে শো হারা-সম্বোধন পদ (ঐ)
৪১৩। মার গাছের ধুঁধুলটা গৌরবিকে দিয়ে যায়- সম্বন্ধ পদ (ঐ)
৪১৪। মাদার গাছের ছায়ায় চৌকিশালের জঙ্গল-সম্বন্ধ পদ (ঐ)
৪১৫। সকাল বেলা গৌরবি হারাকে বলল-অধিকরণে শূন্য বিভক্তি/কর্মকারকে ২য়া
৪১৬। নিবারণ তো ওকে চায় না-কর্মকারকে ২য়া
৪১৭। মেটে আলুটা নিয়ে যা-কর্মকারকে শূন্য
৪১৮। একখানি যাত্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিল।- অপাদানে ৫মী।

সমাস

প্র : সমাস শব্দের অর্থ কী?
উ : সমাস অর্থ সংক্ষেপ।
প্র : সমাসের সংজ্ঞার্থ লেখ।
উ : পরস্পর অর্থসঙ্গতি ও সম্বন্ধ বিশিষ্ট দুই বা ততোধিক পদের এক পদে পরিণত হওয়াকে সমাস বলে।
প্র : সমাসের বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ।
উ : (১) সমাসে পদের সঙ্গে পদের মিলন ঘটে ও পদের বিভক্তি লোপ পায়।
(২) সমাস দ্বারা দুই বা ততোধিক পদের সমন্বয়ে নতুন অর্থবোধক পদ সৃষ্টি হয়।
(৩) বাক্যে শব্দের ব্যবহার সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে সমাসের সৃষ্টি।
প্র : সমাসের প্রতীতি কয়টি ও কী কী?
উ : সমাসের প্রতীতি পাঁচটি। এগুলো হচ্ছে : সমস্তপদ, পূর্বপদ, পরপদ, ব্যাসবাক্য ও সমস্যমান পদ।
প্র : সমস্তপদ কোন কোন পদের সমন্বয়ে গঠিত?
উ : পূর্ব ও পরপদ।
প্র : বৈশিষ্ট্যের বিচারে সমাস কত প্রকার ও কী কী?
উ : চার প্রকার। অব্যয়ীভাবীয়, তৎপুরুষীয়, দ্বন্দ্বমূলক ও বহুব্রীহিমূলক।
প্র : সমাস সাধারণত কত প্রকার ও কী কী?
উ : ছয় প্রকার। অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ, দ্বন্দ্ব, বহুব্রীহি, দ্বিগু, কর্মধারয়।
প্র : উপরিউক্ত সমাসের বাইরে কতিপয় অপ্রধান সমাসের নাম লেখ।
উ : প্রাদি, নিত্য, অলুক, উপপদ।
প্র : বৈশিষ্ট্যের বিচারে দ্বিগু ও কর্মধারয় কোন শ্রেণির সমাস?
উ : তৎপুরুষীয়।
প্র : সমাস চিহ্নিতকরণের প্রধান উপায় কী?
উ : পূর্বপদের অর্থের প্রাধান্য থাকলে অব্যয়ীভাব; পরপদ বা উত্তরপদের অর্থের প্রাধান্য থাকলে তৎপুরুষ, কর্মধারয়, দ্বিগু; উভয়পদের অর্থের প্রাধান্য থাকলে দ্বন্দ্ব এবং কোনো পদের অর্থ প্রধান না হয়ে তৃতীয় কোনো অর্থের সৃষ্টি হলে বহুব্রীহি সমাস হয়।
প্র : ব্যাসবাক্য নিয়ে সহজে কিভাবে সমাস চেনা যায়?
উ : ব্যাসবাক্যের উপর নির্ভর করে বর্তমান গ্রন্থের লেখক নিম্নের পদ্যাংশটি তৈরি করেছেন। এটি মনে থাকলে ব্যাসবাক্য থেকে সমাস নির্ণয় কিছুটা সহজ হবে :
'ও দিয়ে যুক্ত হলে বলবে দ্বন্দ্ব
সমাহারে দ্বিগু হয়, এটা নয় সন্দ।
যে যিনি যেটি তিনি কর্মধারয়
যাহার বাক্যের শেষে বহুব্রীহি পায়।
বিভক্তি লোপ হলে তৎপুরুষ করে
ব্যয়হীন পদটি জেনো অব্যয়ী হবে,
বিভক্তি না লুপ্ত হলে অলুকও হয়
মন দিয়ে পড় সবে, কোরো নাকো ভয়।'

অব্যয়ীভাব সমাস

প্র : অব্যয়ীভাব সমাস কাকে বলে?
উ : যে সমাসে পূর্বপদ অব্যয় থাকে, উত্তরপদে সাধারণত বিশেষ্য থাকে এবং অব্যয়ের অর্থ প্রধান হয়ে দেখা দেয়, তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে।
প্র : সাধারণত কোন কোন অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হয়?
উ : সামীপ্য, বীপ্সা, অনতিক্রম, অভাব, পর্যন্ত, অতিক্রান্ত, বিরোধ, যোগ্যতা, সাদৃশ্য, পশ্চাৎ প্রভৃতি অর্থে।
প্র : কতিপয় উল্লেখযোগ্য অব্যয়ীভাব সমাস লেখ।
উ : সামীপ্য (উপ) অর্থে :
উপনগরী = নগরীর সমীপে
উপকণ্ঠ = কণ্ঠের সমীপে
উপকূল = কূলের সমীপে
সাদৃশ্য (উপ) অর্থে :
উপভাষা = ভাষার সদৃশ
উপবন = বনের সদৃশ
উপগ্রহ = গ্রহের তুল্য
উপকথা = কথার সদৃশ্য
উপদ্বীপ = দ্বীপের সদৃশ
উপশহর = শহরের সদৃশ
উপনদী = নদীর সদৃশ
উপসাগর = সাগরের সদৃশ
উপবিভাগ = বিভাগের সদৃশ

Scanned with CamScanner

প্রতিমূর্তি = মূর্তির সদৃশ
উপমাতা = মাতার সদৃশ
(মাসি, পিসি, ফুফু, খালা)
(দ্রষ্টব্য : বিমাতা ও উপমাতা এক নয়)

বীপ্সা (পুনঃ পুনঃ) অর্থে :
প্রতিগৃহে = গৃহে গৃহে
প্রতিক্ষণ / অনুক্ষণ = ক্ষণে ক্ষণে
প্রতিদিন = দিন দিন
প্রতিমণ = মণে মণে
প্রতিজন / জনপিছু = জনে জনে
ফিবছর = বছর বছর
হররোজ = রোজ রোজ

অনতিক্রম (যথা) অর্থে :
যথানিয়ম = নিয়মকে অতিক্রম না করে
যথাবিধি = বিধিকে অতিক্রম না করে
যথেষ্ট = ইষ্টকে অতিক্রম না করে
যথাসাধ্য = সাধ্যকে অতিক্রম না করে
যথেচ্ছা = ইচ্ছাকে অতিক্রম না করে

অভাব (নি/নির) অর্থে :
নির্জল = জলের অভাব
নিরামিষ = আমিষের অভাব
নির্ভাবনা = ভাবনার অভাব
নিরুৎসাহ = উৎসাহের অভাব
নির্ঝঞ্ঝাট = ঝঞ্ঝাটের অভাব

ঈষৎ (আ) অর্থে :
আনত = ঈষৎ নত
আরক্তিম = ঈষৎ রক্তিম

পর্যন্ত (আ) অর্থে :
আজীবন = জীবন পর্যন্ত
আসমুদ্র = সমুদ্র পর্যন্ত
আবালবৃদ্ধবনিতা = বাল, বৃদ্ধ ও বনিতা পর্যন্ত
আসমুদ্রহিমাচল = সমুদ্র থেকে হিমাচল পর্যন্ত
আমূল = মূল পর্যন্ত
আমরণ = মরণ পর্যন্ত
আকৈশোর = কৈশোর পর্যন্ত (অবধি)
আপাদমস্তক = পদ (পা) হতে মস্তক পর্যন্ত
আজন্ম = জন্ম (-এর বিনাশ) পর্যন্ত
আজানু = জানু পর্যন্ত
আবাল্য = বাল্যের সূচনা থেকে বাল্যের শেষ পর্যন্ত
আশৈশব = শৈশবের সূচনা থেকে শৈশবের শেষ পর্যন্ত
অদ্যাবধি = অদ্য পর্যন্ত
আকর্ণ = কর্ণ পর্যন্ত
যাবজ্জীবন = জীবন পর্যন্ত
আবালবৃদ্ধবনিতা = বাল, বৃদ্ধ ও বনিতা সবাই
(নোট: 'বাল' অর্থ শিশু)
আপামরজনসাধারণ = পামর থেকে জনসাধারণ সবাই

অতিক্রান্ত (উৎ) অর্থে :
উদ্বেল = বেলাকে অতিক্রান্ত
উচ্ছৃঙ্খল = শৃঙ্খলাকে অতিক্রান্ত
উচ্ছিন্ন = ছিন্নকে অতিক্রান্ত
যথেষ্ট = ইষ্টকে অতিক্রম না করে

বিরোধ (প্রতি) অর্থে :
প্রতিবাদ = বিরুদ্ধ বাদ
প্রতিকূল = বিরুদ্ধ কূল
প্রতিযোগ = বিরুদ্ধ যোগ

পশ্চাৎ (অনু) অর্থে :
অনুগমন = পশ্চাৎ গমন
অনুধাবন = পশ্চাৎ ধাবন
অনুসরণ = পশ্চাৎ সরণ
অনুতাপ = পশ্চাৎ তাপ

প্র : আরো কিছু অব্যয়ীভাব সমাস লেখ।

উ : বেমালান = মানানের অভাব
বেবন্দোবস্ত = বন্দোবস্তের অভাব
হাভাত = ভাতের অভাব
গরমিল = মিলের অভাব
আলুনি = নুনের (লবণের) অভাব
না-টক না-মিষ্টি = টকের অভাব মিষ্টির অভাব
হা-ঘর = ঘরের অভাব
যাবজ্জীবন = জীবন পর্যন্ত
উপদেবতা = হীন দেবতা
ফিকালাল = ঈষৎ লাল
ফিকানীল = ঈষৎ নীল
অনুরূপ = রূপের যোগ্য।
সমস্তদিন = দিনভর
সমস্তরাত = রাতভর
বেহায়া = হায়ার অভাব
বেকার = কারের অভাব
বিশ্রী = শ্রীর অভাব
প্রত্যহ = অহ অহ
প্রত্যঙ্গ = ক্ষুদ্র অঙ্গ
অন্যায় = ন্যায়ের অভাব
দুর্ভিক্ষ = ভিক্ষার অভাব

প্র : কতগুলো নিপাতনে সিদ্ধ অব্যয়ীভাব সমাস লেখ।

উ : সমক্ষ = অক্ষির সমীপে
প্রত্যক্ষ = অক্ষির অভিমুখে
পরোক্ষ = অক্ষির অগোচরে
অধ্যাত্ম = আত্মাকে অধি ('অধিকার' অর্থে)
অধিভূত = ভূতকে অধিকার করে
অধিদৈব = দৈবকে অধিকার করে
দুর্গত = দুঃ-কে (দুঃখকে) গত
প্রদক্ষিণ = দক্ষিণকে প্রগত

তৎপুরুষ সমাস

প্র : তৎপুরুষ সমাস কাকে বলে?

উ : পূর্বপদে দ্বিতীয়াদি (দ্বিতীয়া থেকে সপ্তমী পর্যন্ত) বিভক্তি লোপ পেয়ে যে সমাস হয় এবং যেখানে পরপদের অর্থ প্রধান রূপে প্রতীয়মান হয়।

প্র : তৎপুরুষ সমাস প্রধানত কত প্রকার ও কী কী?

উ : প্রধানত ছয় প্রকার। যেমন : দ্বিতীয়া থেকে সপ্তমী তৎপুরুষ। তবে এছাড়াও কতিপয় তৎপুরুষ সমাস আছে (এই নামগুলো অন্য সমাসের সঙ্গেও দেখা যাবে)। যেমন : নঞ্ তৎপরুষ, উপপদ তৎপুরুষ, অলুক তৎপুরুষ, প্রাদি তৎপুরুষ ইত্যাদি।

প্র : নঞ্ তৎপুরুষ সমাস কাকে বলে, উদাহরণ দাও।

উ : পরপদের প্রাধান্য রেখে নঞ্ অব্যয় (ন, না, নাই, নেই, নয় ইত্যাদি) পূর্বে বসে যে তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন :
অক্ষত = ন (নয়) ক্ষত
অবিশ্বাস্য = নয় বিশ্বাস্য
বেআইনি = বে (নয়) আইনি
অপর্যাপ্ত = নয় পর্যাপ্ত
অনতিবৃহৎ = ন অতিবৃহৎ
অমিল = ন মিল
অনভিজ্ঞ = ন অভিজ্ঞ
নাতিদূর / অনতিদূর = ন অতিদূর
অসময় = ন সময়
অনাচার = ন আচার
অনুর্বর = ন উর্বর
নাতিশীতোষ্ণ = ন অতিশীতোষ্ণ
অসহযোগ = ন সহযোগ
অকেজো = ন কেজো
অনশন = ন অশন
অনুন্নত = ন উন্নত
অসুখ = ন সুখ
অকাতর = ন কাতর
অনাদর = ন আদর
নাতিদীর্ঘ = ন অতি দীর্ঘ
নাতিখর্ব = ন অতি খর্ব
অভাব = ন ভাব
অকাশ / আকাশ = ন কাশ
অনৈতিক = ন নৈতিক
অকেশা = ন কেশা/কেশী
অসুর = ন সুর
অবিশ্বাস = ন বিশ্বাস
আগাছা = ন (মন্দ অর্থে) গাছ
অজানা = নাই জানা
বেসরকারি = ন (নয়) সরকারি
অছাড়া = নয় ছাড়া
নিবরফ = নাই বরফ
অনাসৃষ্টি = নয় সৃষ্টি
বেদেশ = নাই দেশ
বেরসিক = নয় রসিক
নামঞ্জুর = নয় মঞ্জুর
অনুচিত = নয় উচিত
নিখুঁত = নাই খুঁত
অনেক = নয় এক
গরমিল = নাই মিল
গরহাজির = নয় হাজির

প্র : উপপদ কাকে বলে?

উ : কোনো শব্দকে বিশ্লেষণ করলে যদি একটি পূরক শব্দ, এরপর ধাতু, এরপর প্রত্যয় পাওয়া যায় (শব্দ+ধাতু+প্রত্যয়)। এবং সেই প্রত্যয়টি হয় কৃৎ প্রত্যয় তাহলে প্রাপ্ত বিশিষ্ট শব্দকে উপপদ বলা হয়। যেমন :
বাস্তুহারা = বাস্তু + √হৃ + আ;
খেচর = খ + √চর্ + অ।
এখানে বাস্তু এবং খ (আকাশ) যথাক্রমে উপপদ।

প্র : কৃদন্ত পদ কাকে বলে?

উ : কৃৎ প্রত্যয় যোগে যে শব্দ তৈরি হয় তাকে কৃদন্ত পদ বলে। যেমন : √চর্ > চর (বিচরণ করা অর্থে); √ধর্ >ধর (ধরা অর্থে)।

প্র : উপপদ তৎপুরুষ সমাস কাকে বলে?

উ : উপপদের সঙ্গে কৃদন্ত পদের যে সমাস হয়, তাকে উপপদ তৎপুরুষ সমাস বলে। এ সমাসে পূর্বপদ সাধারণত বিশেষ্য হয়ে থাকে।

প্র : কতিপয় উপপদ তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ দাও।

উ : প্রিয়ংবদা = প্রিয়ম্ বলে যে (নারী)
ক্ষীণজীবী = ক্ষীণভাবে বাঁচে যে
মনোহারিণী = মন হরণ করে যে (নারী)
গৃহস্থ = গৃহে থাকে যে

Scanned with CamScanner

জলচর = জলে চরে যা
সর্বহারা = সব হারিয়েছে যারা
জলদ = জল দেয় যে / যা
পুষ্পিপোড়ো = পুষ্পি পড়ে যে
মনমরা = মনে মনে ম
কুম্ভকার = কুম্ভ করে যে
প্রভাকর = প্রভা করে যে
সত্যবাদী = সত্য বলে যে
সর্বনাশা = সর্বনাশ করে যে
ধামাধরা = ধামা ধরে যে
ছোলেধরা = ছোলে ধরে যে
হাড়ভাঙা = হাড় ভাঙে যাতে
বুকভাঙা = বুক ভাঙে যাতে
অর্থকরী = অর্থ করা যায় যার দ্বারা
বাক্সিকর = বাক্স করে যে
হাসুইকর = হাসুই করে যে
একাম্রবর্তী = একাম্র (এক অম্র) বর্তে যে
পাচাটা = পা চাটে যে
ভারবাহী = ভার বহন করে যে
জানুকর = জানু করে যে
স্বর্ণকার = স্বর্ণ করে যে
টনকনড়া = টনক নড়ে যাতে
পকেটমার = পকেট মারে যে
মাছিমারা = মাছি মারে যে
ছা-পোষা = ছা-পোষে যে

প্র : অলুক তৎপুরুষ সমাস কাকে বলে?

উ : যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদে বিভক্তি লোপ পায় না। তৎপুরুষ সমাসের যতগুলি শ্রেণি আছে, অলুক তৎপুরুষ তার সবরকম শ্রেণিরই হতে পারে। যেমন :

ঘোড়ার-ডিম = ঘোড়ার ডিম
বসে পড়া = বসে পড়া
ছাঁচে ঢালা = ছাঁচে ঢালা
আইনের পাঁচ = আইনের পাঁচ
ভাগের-মা = ভাগের মা
সোনার-বাংলা = সোনার বাংলা
সোনার-তরী = সোনার তরী
হাতের-পাঁচ = হাতের পাঁচ
সাপের-পা = সাপের পা
মনের-মানুষ = মনের মানুষ
কলের-গান = কলের গান
হাতে-কাটা = হাতে কাটা
ঘিয়ে-ভাজা = ঘিয়ে ভাজা
চোখের-বালি = চোখের বালি
কলুরবলদ = কলুর বলদ
চোখের-দেখা = চোখের দেখা
গাঁয়ের-আদর = গাঁয়ের আদর
অন্তরবাসী = অন্তর বাসী যে
ছেলেছাড়া = ছেলে ছাড়া যা

প্র : প্রাদি তৎপুরুষ সমাস কাকে বলে?

উ : যে তৎপুরুষ সমাসের পূর্বপদে উপসর্গ থাকে, সে সমাসকে প্রাদি তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন :

প্রভাত = প্রকৃষ্টরূপে ভাত
প্রমনা = প্রকৃষ্ট মন যার।

প্র : কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ দাও।

উ : দ্বিতীয়া তৎপুরুষ বা কর্মতৎপুরুষ সমাস

বয়ঃগণনা = বয়ঃকে গণনা
শব্দনিক্ষেপ = শব্দকে নিক্ষেপ
পুরোভাগ = পুরোকে ভাগ
মামকুড়ানো = মামকে কুড়ানো
দেশভক্ত = দেশকে ভক্ত
পৃষ্ঠপ্রদর্শন = পৃষ্ঠকে প্রদর্শন
জলসেচন = জলকে সেচন
চিরসুখী = চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী
দুঃখাতীত = দুঃখকে অতীত
বিপন্নাপন্ন = বিপন্নকে আপন্ন
ব্যক্তিগত = ব্যক্তিকে গত
বিপদাপন্ন = বিপদকে আপন্ন
শরণাগত = শরণকে আগত
বয়ঃপ্রাপ্ত = বয়ঃকে প্রাপ্ত
পরলোকগত = পরলোকে গত
দুঃখপ্রাপ্ত = দুঃখকে প্রাপ্ত
ক্ষণস্থায়ী = ক্ষণকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী
সংখ্যাতীত = সংখ্যাকে অতীত
চরণাশ্রিত = চরণকে আশ্রিত
চিরশত্রু = চির দিন ধরে শত্রু
নিত্যধারা = নিত্যকাল ব্যাপিয়া ধারা
অর্ধমৃত = অর্ধ রূপে মৃত
দ্রুতগামী = দ্রুত যথা তথা গামী
চিরসুন্দর = চিরকাল ব্যাপিয়া সুন্দর।
বেগসংবরণ = বেগকে সংবরণ
স্বর্গপ্রাপ্ত = স্বর্গকে প্রাপ্ত
ভারপ্রাপ্ত = ভারকে প্রাপ্ত
সাহায্যপ্রাপ্ত = সাহায্যকে প্রাপ্ত
কলাবেচা = কলাকে বেচা
হ্রদদেখা = হ্রদকে দেখা
শোকাতীত = শোককে অতীত
তপবনদর্শন = তপবনকে দর্শন

তৃতীয়া তৎপুরুষ বা করণতৎপুরুষ সমাস

স্বর্গস্থিত = স্বর্গ দ্বারা স্থিত
জ্ঞানশূন্য = জ্ঞান দ্বারা শূন্য
সমবেদনাহত = সমবেদনা দিয়ে হত
স্বল্পবয়সি = স্বল্প দ্বারা বিদ্ধ
ন্যায়সঙ্গত = ন্যায় দ্বারা সঙ্গত
নাকবিহীন = নাক দ্বারা বিহীন
মনমরা = মন দ্বারা পড়া
বাগদত্তা = বাক দিয়ে দত্তা
বিদ্যাহীন = বিদ্যা দ্বারা হীন
একোন = এক দ্বারা উন
মাতৃহীন = মাতৃ দ্বারা হীন
মধুমাখা = মধু দ্বারা মাখা
কণ্টকাকীর্ণ = কণ্টক দ্বারা আকীর্ণ
ধনাঢ্য = ধন দ্বারা আঢ্য
শ্রমলব্ধ = শ্রম দ্বারা লব্ধ
ছায়াশীতল = ছায়া দ্বারা শীতল
রবাহূত = বল দ্বারা আহূত
বজ্রাহত = বজ্র দ্বারা আহত
অস্ত্রোপচার = অস্ত্র দ্বারা উপচার
পদদলিত = পদ দ্বারা দলিত
জলমগ্ন = জল দ্বারা মগ্ন
বিজ্ঞানসম্মত = বিজ্ঞান দ্বারা সম্মত
ঢেঁকিছাঁটা = ঢেঁকি দ্বারা ছাঁটা
রক্তাক্ত = রক্ত দ্বারা অক্ত

চতুর্থী তৎপুরুষ বা সম্প্রদান/নিমিত্ত তৎপুরুষ সমাস

দেবদত্ত = দেবকে দত্ত
গুরুভক্তি = গুরুকে ভক্তি
বিয়েপাগলা = বিয়ের জন্য (নিমিত্তে) পাগলা
আরামকেদারা = আরামের জন্য কেদারা
শিশুবিভাগ = শিশুদের জন্য বিভাগ
বসতবাটি = বসতের নিমিত্তে বাটি
মরাকান্না = মরেছে জন্য কান্না (নিমিত্তে)
চোষকাগজ = চুষবার জন্য কাগজ
তপোবন = তপের নিমিত্ত বন
সেচনকলস = সেচনের নিমিত্ত কলস
মাথারকাঁটা = মাথার (চুলের) জন্য কাঁটা।
পাঠশালা = পাঠের জন্য শালা

পঞ্চমী তৎপুরুষ বা অপাদান তৎপুরুষ সমাস

মুখভ্রষ্ট = মুখ থেকে ভ্রষ্ট
দেশপলাতক = দেশ থেকে পলাতক
জন্মান্ধ = জন্ম হতে অন্ধ·
সত্যভ্রষ্ট = সত্য হতে ভ্রষ্ট
জলাতঙ্ক = জলে হয়ে রোগ
কর্মবীর = কর্ম হতে বীর
লোকত্রাস = লোক হতে ত্রাস
জেলমুক্ত = জেল থেকে মুক্ত
ঋণমুক্ত = ঋণ থেকে মুক্ত
দেশমুক্ত = দেশ থেকে মুক্ত
ভয়ংকর = ভয় হতে ভীষণ
বিদ্যোৎসাহক = বিদ্যার হতে সোহাগ
স্থলশায়ালো = স্থল হতে শায়ালো
বন্ধনমুক্ত = বন্ধন হতে মুক্ত
স্বর্গচ্যুত = স্বর্গ হতে চ্যুত
রোগমুক্ত = রোগ হতে মুক্ত
জলমুক্ত = জল থেকে মুক্ত
সর্বশ্রেষ্ঠ = সর্ব হতে শ্রেষ্ঠ
হ্রাসবোধক = হ্রাসক থেকে উদ্ভব
ধর্মভ্রষ্ট = ধর্ম হতে ভ্রষ্ট

ষষ্ঠী তৎপুরুষ বা সম্বন্ধ তৎপুরুষ সমাস

শ্বশুরবাড়ি = শ্বশুরের বাড়ি
বৃহস্পতি = বৃহতের পতি
চাষাবাগান = চাষের বাগান
কবিগুরু = কবিদের গুরু
পূর্বাহ্ণ = অহ্নের পূর্বভাগ
ছাগদুগ্ধ = ছাগীর দুগ্ধ
যুদ্ধোত্তর = যুদ্ধের উত্তর
বনস্পতি = বনের পতি
ক্রোড়পত্র = ক্রোড়ের পত্র
কার্যালয় = কার্যের আলয়
গণতন্ত্র = গণের তন্ত্র
বনমধ্যে = বনের মধ্যে
তৎপ্রতি = তার প্রতি
জনকণ্ঠ = জনের কণ্ঠ
রাজকন্যা = রাজার কন্যা
রাজপথ = পথের রাজা
অতিথিসৎকার = অতিথির সৎকার
বিদ্যাসাগর = বিদ্যার সাগর (টীকা : বিদ্যা রূপ সাগর : এটি রূপক কর্মধারয়ও বটে)
কর্ণকুহর = কর্ণের কুহর
তপস্বীকন্যা = তপস্বীর কন্যা
দূতাবাস = দূতের আবাস
মাঝনদী = নদীর মাঝ
মালগুদাম = মালের গুদাম
প্রাণবধ = প্রাণের বধ
বজ্রসম = বজ্রের সম
কার্যক্ষতি = কার্যের ক্ষতি
ভুজবল = ভুজের বল
ভাগ্যফল = ভাগ্যের ফল

Scanned with CamScanner

উৎপলখড্গ = উৎপলের খড্গ
পুষ্পসৌরভ = পুষ্পের সৌরভ
জীবনসঞ্চার = জীবনের সঞ্চার
সন্ধ্যাপ্রদীপ = সন্ধ্যার প্রদীপ
সুখসময় = সুখের সময়
দুঃখকষ্ট = দুঃখ কষ্ট
মাতৃসেবা = মাতার সেবা
নটাভিনয় = নটকের অভিনয়
হাতঘড়ি = হাতের ঘড়ি
মৎপ্রতি = আমার প্রতি
খেয়াঘাট = খেয়ার ঘাট
প্রাগৈতিহাসিক = ঐতিহাসিকের প্রাক্
মনোযোগ = মনের যোগ
পৌরসভা = পৌরদের সভা
প্রজাতন্ত্র = প্রজাদের তন্ত্র
কলাভবন = কলার (Art) ভবন
বিশ্বভারতী = বিশ্বের ভারতী (বিদ্যা)
ফুলকুমারী = ফুলের কুমারী (দ্র. উপমিত কর্মধারয়)

সপ্তমী তৎপুরুষ বা অধিকরণ তৎপুরুষ সমাস

দিবানিদ্রা = দিবায় নিদ্রা
রথারোহণ = রথে আরোহণ
কোটরস্থিত = কোটরে স্থিত
গাছপাকা = গাছে পাকা
মানবীর = মানে বীর
পুথিগত = পুথিতে গত
শ্রুতপূর্ব = পূর্বে শ্রুত
সংখ্যালঘিষ্ঠ = সংখ্যায় লঘিষ্ঠ
তালকানা = তালে কানা
সত্যাগ্রহ = সত্যে আগ্রহ (নিষ্ঠা)
ভূতপূর্ব = পূর্বে ভূত
অশ্রুতপূর্ব = পূর্বে অশ্রুত
অদৃষ্টপূর্ব = পূর্বে অদৃষ্ট।
জলমগ্ন = জলে মগ্ন
অকালপক্ব = অকালে পক্ব
মাথাব্যথা = মাথায় ব্যথা
কর্মনিপুণ = কর্মে নিপুণ
বাকপটু = বাকে পটু
রাতকানা = রাতে কানা

দ্বিত সমাস

প্র : দ্বিত সমাস কাকে বলে?
উ : পূর্বপদে সংখ্যাবাচক পদ ও উত্তরপদে বিশেষ্য বাচক পদে যে সমাস হয়। এখানে সমাহার বা সমষ্টি বোঝাবে।

প্র : কয়েকটি দ্বিত সমাসের উদাহরণ দাও।
উ : যেমন :
চতুরঙ্গ = চার অঙ্গের সমাহার
ত্রিপদী = ত্রি পদের সমাহার
সপ্তাহ = সপ্ত অহের (দিবস) সমাহার
চৌরাস্তা = চৌ (চারি) রাস্তার মিলন
তেমোহনা = তিন মোহনার মিলন
ত্রিকাল = তিন কালের সমাহার
শতাব্দী = শত অব্দের সমাহার
ত্রিফলা = তিন ফলের সমাহার
ত্রিপদী = তিন পদের সমাহার
পঞ্চমি = পাঁচ সেরের সমাহার
নবরত্ন = নব (নয়) রত্নের সমাহার
সপ্তর্ষি = সপ্ত ঋষির সমাহার
ষড়ঋতু = ছয় ঋতুর সমাহার
তেমাথা = তে (তিন) মাথার সমাহার
অষ্টধাতু = অষ্ট ধাতুর সমাহার
তেরনদী = তের নদীর সমাহার
সাতসমুদ্র = সাত সমুদ্রের সমাহার
পঞ্চবটী = পঞ্চ বটের সমাহার
পঞ্চনদ = পঞ্চ নদীর সমাহার
পঞ্চভূত = পঞ্চ ভূতের (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপাদানসমূহ) সমাহার

কর্মধারয় সমাস

প্র : কর্মধারয় সমাস কাকে বলে?
উ : যে সমাসে বিশেষণ বা বিশেষণ ভাবাপন্ন পদের সঙ্গে বিশেষ্য বা বিশেষ্য ভাবাপন্ন পদের মিলন ঘটে ও পরপদের অর্থের প্রাধান্য থাকে। যেমন : সুন্দর যে পুরুষ = সুপুরুষ।
প্র : কর্মধারয় সমাস কত প্রকার, কী কী?
উ : তিন প্রকার। সাধারণ, মধ্যপদলোপী ও উপমামূলক কর্মধারয়।
প্র : উপমামূলক কর্মধারয় সমাস কত প্রকার?
উ : তিন প্রকার। উপমান, উপমিত, রূপক।
প্র : সাধারণ কর্মধারয় সমাস কাকে বলে?
উ : বিশেষণপদ পূর্বে ও বিশেষ্যপদ পরে বসে যে সমাস হয়। যেমন :
মহাজন = মহৎ যে জন
নীলোৎপল = নীল যে উৎপল
সৎলোক = সৎ যে লোক
রক্তকমল = রক্ত যে কমল
চলচ্চিত্র = চলৎ যে চিত্র
পাণ্ডুলিপি = পাণ্ডু (চলনসই) যে লিপি
নবযৌবন = নব যে যৌবন
নীলপদ্ম = নীল যে পদ্ম
সুন্দরলতা = সুন্দরী যে লতা
মহাকীর্তি = মহতী যে কীর্তি
মহানদি = মহান যে নদি
কুদর্থ = কু যে অর্থ
কুদাচার = কু যে আচার
মহারাজা = মহান যে রাজা
নরাধম = অধম যে নর
আলুসিদ্ধ = সিদ্ধ যে আলু
প্রিয়সখা = প্রিয় যে সখা
মহাবীর = মহান যে বীর
সুখবর = সু যে খবর
শ্বেতবস্ত্র = শ্বেত যে বস্ত্র
মন্দভাগ্য = মন্দ যে ভাগ্য

প্র : মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস কাকে বলে?
উ : যে সমাসে সমাসবদ্ধ পদটির যে রূপ তাতে ব্যাসবাক্যের মধ্যে ব্যাখ্যামূলক পদগুলি থাকে না। যেমন :
জ্যোৎস্নারাত্র = জ্যোৎস্না শোভিত রাত
রান্নাঘর = রান্না করার ঘর
পলান্ন = পল (মাংস) মিশ্রিত অন্ন
মৌমাছি = মৌ-সঞ্চয়কারী মাছি
জাদুঘর = জাদু (Magic) পরিপূর্ণ ঘর
প্রীতিভোজ = প্রীতি উপলক্ষে ভোজ
সিংহাসন = সিংহ চিহ্নিত আসন
আত্মজীবনী = আত্মলিখিত জীবনী
প্রাণভয় = প্রাণ যাওয়ার তরে ভয়
ভিক্ষান্ন = ভিক্ষা লব্ধ অন্ন
ধর্মকার্য = ধর্মবিহিত কার্য
এণাক্ষি = এণর (মৃগের) অক্ষির ন্যায় অক্ষি
একবিংশতি = এক অধিক বিংশতি
বৌভাত = বৌ পরিবেশন করা ভাত
রেলগাড়ি = রেলের উপর চলে যে গাড়ি
রাষ্ট্রনীতি = রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় নীতি
আয়কর = আয়ের উপর কর
চিনিকল = চিনি নির্মাণের কল
হস্তশিল্প = হস্ত দ্বারা চালিত শিল্প
গোষ্পদ = গো (ক্ষুরের) পরিমিত পদ (স্থান)
তুফানমেল = তুফান তুল্য গতিশীল যে মেল
একাদশ = এক অধিক দশ।
জীবনবাসা = জীবন সমূহের আশাভঙ্গ যে নিরাশা
হাতপাখা = হাতে চালানো পাখা
আক্কেলদাঁত = আক্কেলসূচক দাঁত
আত্মমর্যাদা = আত্মবিশ্বাসে যে স্বাতন্ত্র্য
কার্যপরিকল্পনা = কার্যসাধনের জন্য যে পরিকল্পনা
সাহিত্যসভা = সাহিত্য বিষয়ক সভা
স্মৃতিসৌধ = স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ
মোমবাতি = মোমনির্মিত বাতি
ঘরজামাই = ঘরে আশ্রিত জামাই
মণিব্যাগ = মণি (টাকা) রাখার ব্যাগ
গীতিনাট্য = গীতিপূর্ণ যে নাট্য
যোগণাপত্র = যোগণা সম্বলিত যে পত্র

প্র : উপমান উপমেয় কাকে বলে?
উ : যার সঙ্গে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর তুলনা করা হয় তাকে উপমান, যাকে তুলনা করা হয় তাকে উপমেয় বলে। একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য উপমান ও উপমেয়র মধ্যে কল্পনা করা হয়। আর উপমান ও উপমেয়র মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে একটি সাদৃশ্যবাচক শব্দ। যেমন:
নরসিংহ = নর সিংহের ন্যায় (বলশালী)
এখানে নর> উপমেয়; সিংহ > উপমান; ন্যায়> সাদৃশ্যবাচক শব্দ;
বলশালী (উহ্য আছে) > সাধারণ ধর্ম।

প্র : উপমান কর্মধারয় সমাস কাকে বলে?
উ : সাধারণ ধর্মবাচক পদের সঙ্গে উপমা বাচক পদের যে সমাস হয়। যার সঙ্গে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর তুলনা করা হয় তাকে উপমান বলে। যেমন :
কুন্দশুভ্র = কুন্দের মতো শুভ্র
ফুটিফাটা = ফুটির মতো ফাটা
তুষারশুভ্র = তুষারের ন্যায় শুভ্র
ঘনশ্যাম = ঘনের (মেঘের) ন্যায় শ্যাম
বকধার্মিক = বকের ন্যায় ধার্মিক
হরিণচপল = হরিণের ন্যায় চপল
গজমূর্খ = গজের ন্যায় মূর্খ
কুসুমকোমল = কুসুমের ন্যায় কোমল
অরুণরাঙা = অরুণের ন্যায় রাঙা
বিড়ালতপস্বী = বিড়ালের ন্যায় তপস্বী
কাজলকালো = কাজলের ন্যায় কালো
তুষারধবল = তুষারের ন্যায় ধবল
বজ্রকঠোর = বজ্রের ন্যায় কঠোর
প্রস্তরকঠিন = প্রস্তরের ন্যায় কঠিন
অগ্নিশর্মা = অগ্নির ন্যায় শর্মা;

Scanned with CamScanner

হিমশীতল = হিমের ন্যায় শীতল
শশব্যস্ত = শশকের ন্যায় ব্যস্ত
নবনীতকোমল = নবনীতের (ননির) ন্যায় কোমল
গোবেচারী = গো-র ন্যায় বেচারী
তমাললতা = তমালের (কালো বা ছায়াদানকারী অর্থে) লতা
মিশকালো = মিশির (পোড়া তামাক) মতো কালো।

প্র : উপমিত কর্মধারয় সমাস কাকে বলে?
উ : সাধারণ গুণের উল্লেখ না করে উপমেয় পদের সঙ্গে উপমানের যে সমাস হয় তাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন :
চরণকমল = চরণ কমলের ন্যায়
পুরুষসিংহ = পুরুষ সিংহের ন্যায়
অধরপল্লব = অধর পল্লবের ন্যায়
চরণপদ্ম = চরণ পদ্মের ন্যায়
মুখচন্দ্র = মুখ চন্দ্রের ন্যায়
কথামৃত = কথা অমৃতের ন্যায়
নয়নপদ্ম = নয়ন পদ্মের ন্যায়
করকমল = কর কমলের ন্যায়
বীরসিংহ = বীর সিংহের ন্যায়
বাহুলতা = বাহু লতার ন্যায়
নরসিংহ = নর সিংহের ন্যায়
করপল্লব = কর পল্লবের ন্যায়
পাদপদ্ম = পাদ পদ্মের ন্যায়।
কুমারীকুমারী = কুমারী ফুলের ন্যায় (দ্র. ষষ্ঠী তৎপুরুষ)

প্র : রূপক কর্মধারয় সমাস কাকে বলে?
উ : যেখানে উপমেয় ও উপমান পদে সমাস হয় এবং উভয়ের মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হয়। এক্ষেত্রে একটি কথা অবশ্যই স্মরণীয় যে, রূপক কর্মধারয় সমাসের সমস্তপদে পূর্বপদটি সাধারণত কোনো বস্তু হয় না, হয় কোনো ধারণা বা অভিজ্ঞতা অর্থাৎ অবস্তু। পূর্বপদের সেই বিমূর্ততাকে পরপদের বস্তুর সঙ্গে একমানে তুলনা করা হয় রূপক কর্মধারয় সমাসে। যেমন :
বিদ্যাধন = বিদ্যা রূপ ধন
চন্দ্রমুখ = চন্দ্র রূপ মুখ
মনমাঝি = মন রূপ মাঝি
বিষাদসিন্ধু = বিষাদ রূপ সিন্ধু
ক্রোধানল = ক্রোধ রূপ অনল
সংসারসাগর = সংসার রূপ সাগর
হৃদয়মন্দির = হৃদয় রূপ মন্দির
আনন্দসাগর = আনন্দ রূপ সাগর
ভবনদী = ভব (বিশ্বসৃষ্টি) রূপ নদী
পরানপাখি = পরান রূপ পাখি
চিত্তচকোর = চিত্ত রূপ চকোর
আকাশগাঙ = আকাশ রূপ গাঙ
যৌবনবন = যৌবন রূপ বন
ক্ষুধানল = ক্ষুধা রূপ অনল
জীবনপ্রদীপ = জীবন রূপ প্রদীপ
শোকসাগর = শোক রূপ সাগর
বিদ্যাসাগর = বিদ্যা রূপ সাগর (টীকা : বিদ্যার সাগর : এটি ষষ্ঠী তৎপুরুষও বটে)
শোকানল = শোক রূপ অনল
সুখসাগর = সুখ রূপ সাগর
জ্ঞানবৃক্ষ = জ্ঞান রূপ বৃক্ষ
মোহনিদ্রা = মোহ রূপ নিদ্রা
দেহপিঞ্জর = দেহ রূপ পিঞ্জর
জীবনস্রোত = জীবন রূপ স্রোত
জীবনতরী = জীবন রূপ তরী

প্র : চন্দ্রমুখ, চাঁদমুখ, মুখচন্দ্র এই সমস্তপদ তিনটির সমাস নিয়ে বিভ্রান্তি দূর কর।
উ : চন্দ্র শব্দের তদ্ভব রূপ চাঁদ। অর্থাৎ যা চন্দ্রমুখ, তা-ই চাঁদমুখ। চাঁদমুখ / চন্দ্রমুখ রূপক কর্মধারয় এবং মুখচন্দ্র উপমিত কর্মধারয় সমাস। 'চন্দ্রমুখ'-এ চন্দ্র বা চাঁদের সৌন্দর্যের (অবস্তু) সঙ্গে মুখের (বস্তু) সৌন্দর্যের অভেদ কল্পনা করা হয়েছে। চাঁদের আকারের সঙ্গে (অবশ্য চাঁদের আকার পৃথিবী থেকে কাস্তে, অর্ধবৃত্ত, গোল ইত্যাদি নানারূপ দেখা যায়।) তুলনা করা হয় নি। অন্যদিকে 'মুখচন্দ্র' বলতে 'মুখ চন্দ্রের ন্যায়' সুন্দর বোঝায়। এখানে চন্দ্র সৌন্দর্যের (বিশেষ্য) প্রতীক। গোল বা কাস্তের আকৃতি এখানে বোঝানো হচ্ছে না। অনেক গ্রন্থে 'মুখচন্দ্র = মুখ চন্দ্রের ন্যায়' 'চাঁদমুখ = চাঁদের ন্যায় মুখ' লিখে উভয়ই উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে উল্লেখ করা হয়েছে (দ্রষ্টব্য : হরলাল রায় : 'উচ্চতর ব্যাকরণ ও ভাষা')। কিন্তু এ দুটো তো এক হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে জগদীশ ঘোষ রচিত 'আধুনিক বাংলা ব্যাকরণে' (১৯৪০) সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে, 'চন্দ্রমুখ' রূপক কর্মধারয় সমাস। তিনি বরং 'মুখচন্দ্র' কে ব্যবহার ভেদে উপমিতের সঙ্গে রূপকও বলেছেন। তাঁর উল্লেখকৃত উদ্ধৃতিটি এ রকম: 'রমণী যে মুখচন্দ্র (উপমিত) দর্পণে দেখিয়া একটু হাসিল, তাহার সেই মুখচন্দ্র (রূপক) আমার হৃদয়ের গভীর অন্ধকার বিদূরিত করিল।'

প্র : দ্বন্দ্ব সমাস কাকে বলে?
উ : যে সমাসে দুই বা বহুপদ মিলে এক পদ এবং প্রত্যেক পদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন : জায়া ও পতি = জায়াপতি > দম্পতি > দম্পতি।

প্র : দ্বন্দ্ব সমাসের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ দেখ।
উ : ১. দ্বন্দ্ব সমাসের সমস্ত পদে অল্পস্বর বিশিষ্ট শব্দ পূর্বে বসে। যেমন : সাত-সতের, দুতি-চারদ ইত্যাদি।
২. সমস্ত পদে অপেক্ষাকৃত সম্মানিত বা শ্রীবাচক পদ পূর্বে বসে। যেমন : শিক্ষক-ছাত্র, কর্মকর্তা-কর্মচারী, মা-বাবা ইত্যাদি।
৩. দ্বন্দ্ব সমাসের ব্যাসবাক্যে ও, এবং, আর এই তিনটিমাত্র অব্যয়পদ ব্যবহার হয়। যেমন। আয় ও ব্যয়; ভাল এবং মন্দ; চা আর বিস্কুট।

প্র : সমার্থক দ্বন্দ্ব সমাস কাকে বলে?
উ : বাংলা ভাষায় বহু যুগ্মশব্দ প্রচলিত আছে। এগুলো সমার্থক দ্বন্দ্ব সমাসের অন্তর্ভুক্ত। যেমন : জন-মানব, কাজ-কর্ম, লজ্জা-শরম, নাম-ডাক, খাতা-পত্র, হাট-বাজার, ঘর-দুয়ার ইত্যাদি।

প্র : অলুক দ্বন্দ্ব সমাস কাকে বলে?
উ : যে দ্বন্দ্ব সমাসে সমনামান পদের বিভক্তি সমস্তপদে অক্ষুণ্ন থাকে, লোপ পায় না। যেমন : কলে-কারখানায়; দেশে-বিদেশে; নয়ে-ছয়ে, হাতে-কলমে, জলে-স্থলে, দুধে-ভাতে ইত্যাদি।

প্র : বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস কাকে বলে?
উ : তিন বা তার বেশি পদের সমন্বয়ে সমাস সংঘটিত হলে। যেমন :
কায়মনোবাক্য = কায় ও মন ও বাক্য
সাহেববিবিগোলাম = সাহেব ও বিবি ও গোলাম
ইটসুরকিচুনকাঠ = ইট ও সুরকি ও চুন ও কাঠ।

প্র : বিরোধাত্মক দ্বন্দ্ব সমাস কাকে বলে?
উ : যে দ্বন্দ্ব সমাসের পূর্ব ও পরপদের মধ্যে আপাত বিরোধ আছে বলে মনে হয়। যেমন: আকাশ-পাতাল, দা-কুমড়ো, স্বর্গ-নরক ইত্যাদি।

প্র : মিলনার্থক দ্বন্দ্ব সমাস কাকে বলে?
উ : যে দ্বন্দ্ব সমাসের পূর্ব ও পরপদের মধ্যে আপাত মিলনের সুর শোনা যায়। যেমন : পুঁথি-পাঁথি, মা-বাবা, মাসি-পিসি ইত্যাদি।

প্র : বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব সমাস কাকে বলে?
উ : যে দ্বন্দ্ব সমাসের পূর্ব ও পরপদে আপাত বিপরীতার্থক শব্দ থাকে। যেমন : লাভ-লোকসান, আয়-ব্যয়, ছোট-বড় ইত্যাদি।

প্র : উপরে উল্লেখকৃত বৈশিষ্ট্যের মতো আর কত রকমের দ্বন্দ্ব সমাস হতে পারে?
উ : অসংখ্যরূপ। শুধু সহযোগে দ্বন্দ্ব সমাস (যেমন : নাক-কান, মাথা-মুণ্ড)। সংখ্যাবাচক শব্দ সহযোগে দ্বন্দ্ব সমাস (যেমন : সাত-সতের, নয়-ছয়)। সর্বনাম বা প্রায় সর্বনাম শব্দ সহযোগে দ্বন্দ্ব সমাস (যেমন : নয়া-মায়া, দুতি-চারদ)। শুধু সর্বনাম সহযোগে দ্বন্দ্ব সমাস (যেমন : যথা-তথা, এখানে-সেখানে)। শুধু ক্রিয়াপদ সহযোগে দ্বন্দ্ব সমাস (যেমন : দেবা-শোনা, চলা-ফেরা)। শুধু ক্রিয়া-বিশেষণ সহযোগে দ্বন্দ্ব সমাস (যেমন : আগে-পাছে, ধীরে-সুস্থে)। খাঁটি বাংলা শব্দ সহযোগে দ্বন্দ্ব সমাস (যেমন : সোনা-রূপা, রাত-দিন)।

প্র : বিশেষ্য এবং বিশেষণ স্থানীয় দ্বন্দ্ব সমাস কী?
উ : পূর্বপদ ও পরপদ উভয়ই বিশেষ্য হলে বিশেষ্য স্থানীয় আর বিশেষণ হলে বিশেষণ স্থানীয় দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন: বিশেষ্য স্থানীয় : মাবাবা > মা ও বাবা; আদিমধ্যান্ত > আদি ও মধ্য ও অন্ত। বিশেষণ স্থানীয় : শীতোষ্ণ > শীত ও উষ্ণ; নরমগরম > নরম ও গরম। আসলনকল > আসল ও নকল; ভালোমন্দ > ভালো ও মন্দ।

প্র : একশেষ দ্বন্দ্ব সমাস কাকে বলে?
উ : যে দ্বন্দ্ব সমাসে সমস্তপদ একটি একক শব্দ হিসেবে দেখা দেয়; যে সমস্তপদে ব্যাস ব্যক্যের একাধিক শব্দ একপদে লুপ্ত থাকে; যে সমাসের সমস্তপদ সর্বদা বহুবচন হয় (একবচন নয়), তাকে একশেষ দ্বন্দ্ব সমাস বলে। একশেষে ব্যাসবাক্যে 'সমাহার' হবে না। বাংলায় এর উদাহরণ বেশি নেই, সংস্কৃতে প্রচুর। যেমন : নরশ্চ নরশ্চ নরশ্চ = নরাঃ (মানুষ মানুষ মানুষ = বহুমানুষ) আবার নরশ্চ নরশ্চ = নরৌ (মানুষ মানুষ = দুজন মানুষ)। এখানে নরাঃ বা নরৌ একশেষ দ্বন্দ্ব সমাস। বাংলায় 'আমরা'কে একশেষ দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ হিসেবে গণ্য কর

Scanned with CamScanner

যায় (যে তুমি আমি = আমরা)। অবশ্য আমরাটক নিত্যসমাসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। (ব্রাইকা : নিত্য সমাস)।

বহুব্রীহি সমাস

প্র : বহুব্রীহি সমাস কাকে বলে?

উ : যে সমাসে পূর্ব বা পর পদ কোনোটির অর্থ না বুঝিয়ে অন্য কোনো তৃতীয় অর্থ প্রকাশ করে, তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে।

প্র : বহুব্রীহি শব্দটি কোন সমাস?

উ : বহু ব্রীহি (ধান) আছে যার > বহুব্রীহি সমাস।

প্র : কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ দাও।

উ : দশানন = দশ আনন যার
মহাত্মা = মহান আত্মা যার
সবান্ধব = বান্ধবসহ বর্তমান
বিপত্নীক = বিগত পত্নী যার
ঊর্ণনাভ = ঊর্ণ নাভিতে যার
যুবজানি = যুবতী জায়া যার
চন্দ্রচূড় = চন্দ্র চূড়ায় যার
সহকর্মী = সমান কর্মী যে
পঙ্কজ = পঙ্কে জন্মে যা
মৎস্যগন্ধা = মৎস্যের ন্যায় গন্ধ যার
পদ্মগন্ধি = পদ্মের ন্যায় গন্ধ যার
নীলবসনা = নীল বসন যার
স্থিরপ্রতিজ্ঞ = স্থিরপ্রতিজ্ঞ যার
সবান্ধব = বান্ধবসহ বর্তমান
নদীমাতৃক = নদী মাতা (মাতৃ) যার
কমলাক্ষ = কমলের ন্যায় অক্ষি যার
পদ্মনাভ = পদ্ম নাভিতে যার
বিশ্বামিত্র = বিশ্ব মিত্র যার
সমবর্ণ = সমান বর্ণ যার
আটপৌরে = আট প্রহরের উপযুক্ত
সতীর্থ = সমান তীর্থ যার
অপয়া = পয় নাই যার
সবেগ = বেগের সঙ্গে বর্তমান
নির্মল = নাই মল (দোষ) যাতে
নীলাম্বর = নীল অম্বর যার
বীণাপাণি = বীণা পাণিতে যার
শূলপাণি = শূল পাণিতে যার
হতভাগ্য = হত ভাগ্য যার
গৌরাঙ্গ = গৌর অঙ্গ যার
রাশভারি = রাশ ভারি যার
সজল = জলের সহিত বর্তমান
বিচিত্রকর্মা = বিচিত্র কর্ম যার
চতুর্ভুজ = চার ভুজ [হাত] বিশিষ্ট যার
চতুষ্পদ = চার পা বিশিষ্ট প্রাণী
সহোদর = সহ উদর যাদের বা সমান উদর যাদের

প্র : বহুব্রীহি সমাস কত প্রকার ও কী কী?

উ : নয় প্রকার। যথা : সমানাধিকরণ, ব্যধিকরণ, ব্যতিহার, মধ্যপদলোপী, নঞর্থক, সহার্থক, প্রত্যয়ান্ত, সংখ্যাবাচক ও অলুক বহুব্রীহি। তবে নিপাতনে সিদ্ধ বলে আর একপ্রকার বহুব্রীহি সমাস আছে।

প্র : সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উ : যে বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদে বিশেষণ ও পরপদে বিশেষ্য থাকে। যেমন :
হৃতসর্বস্ব = হৃত হয়েছে সর্বস্ব যার
খোশমেজাজ = খোশ মেজাজ যার
হৃতশ্রী = হৃত হয়েছে শ্রী যার
নীলকণ্ঠ = নীল কণ্ঠ যার
পক্বকেশ = পক্ব কেশ যার।

প্র : ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাস কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উ : যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব বা পরপদ কোনোটিই সাধারণত বিশেষণ নয় (অন্যপদ)। যেমন :
আশীবিষ = আশীতে বিষ যার
বজ্রদেহ = বজ্রতে দেহ যার
বীণাপাণি = বীণা পাণিতে যার
পদ্মনাভ = পদ্ম নাভিতে যার
কথাসর্বস্ব = কথা সর্বস্ব যার
বৌটাখসা = বৌটা খসেছে যার
দুকানকাটা = দুই কান কাটা যার
ছাপোষা = ছা পোষা যার।

প্র : ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উ : পরস্পর এক জাতীয় ক্রিয়া করা বোঝালে এ সমাস হয়। এতে পূর্বপদে আ এবং উত্তরপদে ই যুক্ত হতে দেখা যায়। যেমন:
ঘুষাঘুষি = ঘুষিতে ঘুষিতে যে লড়াই
কানাকানি = কানে কানে যে কথা
লাঠালাঠি = লাঠিতে লাঠিতে যে যুদ্ধ
কেশাকেশি = কেশে কেশে ধরে যে যুদ্ধ
দেখাদেখি = দেখায় দেখায় যে ক্রিয়া
হাসাহাসি = হাসিতে হাসিতে যে ক্রিয়া।

প্র : মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উ : মধ্যপদ পদের সঙ্গে বিশেষ্যের যে সমাস হয় তাই মধ্য বহুব্রীহি সমাস। যেমন :
বেওয়ারিশ = যে (নাই) ওয়ারিশ যার
বেতার = যে (নাই) তার যার
নিঃশঙ্ক = নাই শঙ্কা যার
নিষ্কলঙ্ক = নাই কলঙ্ক যার
বিপত্নীক = বিগত পত্নী যার
বেকার = কর্ম নাই যার
নিরক্ষর = অক্ষরজ্ঞান নেই যার
অজানা = না (নয়) জানা যা।

প্র : মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উ : যে বহুব্রীহি সমাস ব্যাসবাক্যের মধ্যস্থিত কোনো পদকে লোপ করে বা গ্রহণ না করেই তৈরি হয়। যেমন :
দশবছরে = দশ বছর বয়স যার
কমলাক্ষ = কমলের মতো অক্ষি যার
বিড়ালচোখা = বিড়ালের চোখের ন্যায় চোখ যে নারীর
কাঞ্চনপ্রভ = কাঞ্চন বা সোনার মতো প্রভা যার
শূর্পণখা = শূর্পের (কুলা) ন্যায় নখ যে নারীর।

প্র : মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাসের আর দুটো নাম কী?

উ : উপমানাত্মক বহুব্রীহি ও ব্যাখ্যাত্মক বহুব্রীহি।

প্র : প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি সমাস কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উ : যে বহুব্রীহি সমাসে আ, এ, ও ইত্যাদি প্রত্যয়যুক্ত হয়। যেমন :
দোটানা = দুই দিকে টান যার
নিখরচে = নেই খরচ যার
অকেজো = কোনো কাজে লাগে না যা
ঘরমুখো = ঘরের দিকে মুখ যার
দোমনা = দুই দিকে মন যার।

প্র : সহার্থক বহুব্রীহি কী?

উ : অনেকে বহুব্রীহি সমাসের আর এক প্রকারকে মানা করেন। তাদের বিবেচনায় সহার্থক পূর্বপদের সঙ্গে বিশেষ্য উত্তরপদের বহুব্রীহি সমাস নিষ্পন্ন হলে তাকে সহার্থক বহুব্রীহি সমাস বলা হয়। যেমন :
সশিষ্য = শিষ্যের সহিত বর্তমান
সকর্ম = কর্মের সহিত বর্তমান
সবান্ধব = বান্ধবের সহিত বর্তমান
সক্রিয় = ক্রিয়ার সহিত বর্তমান
সজল = জলের সহিত বর্তমান

প্র : অলুক বহুব্রীহি সমাস কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উ : বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি বজায় থাকলে এবং কোনো পদের পরিবর্তন না হলে অলুক বহুব্রীহি সমাস হয়। যেমন :
মাথায়পাগড়ি = মাথায় পাগড়ি যার
গলায়গামছা = গলায় গামছা যার
মুখেভাত = মুখে ভাত (শিশুকে) দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে
হাতেখড়ি = হাতে খড়ি দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে
গায়েহলুদ = গায়ে হলুদ দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে।
(নোট : মুনীর চৌধুরী ও অন্যান্য রচিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ গ্রন্থে 'গায়েহলুদ'কে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস দেখানো হয়েছে। এটা ঠিক নয়।)

প্র : সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উ : যে বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদ সংখ্যাবাচক এবং পরপদ বিশেষ্য। যেমন :
দশানন = দশ আনন (মুখ) যার
দশভুজা = দশ ভুজ (হাত) যার
দোনলা = দুটি নল যার
সহস্রলোচন = সহস্র লোচন যার
দশগজি = দশ গজ পরিমাণ যা
চৌচালা = চার চাল যে ঘরের
সেতার = সে (তিন) তার যে যন্ত্রের
চারহাতি = চার হাত পরিমাণ যা
তেপায়া = তিন পা বিশিষ্ট যা।

প্র : নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি সমাস কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উ : কোনো নিয়মে ব্যাখ্যা করা যায় না, অথচ বহুব্রীহি সমাস বলে গণ্য। যেমন :
সুহৃদ = সু (শোভন) হৃদয় যার
নিষ্কৌশাম্ব = নিঃ (নাই) উপায় যার
বেহায়া = হায়া নাই যার
বেপরোয়া = নাই পরোয়া যার
দ্বীপ = দুই দিকে জল যার

Scanned with CamScanner

অন্তর্দীপ = অন্তর্গত জল যার
জীবন্মৃত = জীবিত থেকেও যে মৃত
পণ্ডিতমূর্খ = পণ্ডিত হয়েও মূর্খ।

অন্যান্য সমাস আলোচনা

প্র : অলুক সমাস কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উ : যে সমাসে কখনো পূর্বপদে বিভক্তি লোপ হয় না। অলুক সমাস কোনো স্বতন্ত্র সমাস নয়, যে কোনো শ্রেণির সমাস অলুক হতে পারে। যেমন :
যুধিষ্ঠির = যুদ্ধে স্থির যে
তেলেভাজা = তেলে ভাজা যা
পরাৎপর = পর হতে পর।

প্র : নিত্য সমাস কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উ : যে সমাসে সমস্যমান পদগুলো সবসময় একসঙ্গে থাকে, ব্যাসবাক্য হয় না, তাকে নিত্য সমাস বলে। নিত্য সমাস কোনো স্বতন্ত্র সমাস নয়। ব্যাসবাক্য না থাকলে অন্য শ্রেণির সমাসকেও নিত্য সমাস বলে। যেমন : কাঁচাকলা (ব্যাসবাক্য : এক রকমের কলা যা কাঁচা অবস্থাতেই খাওয়া হয়); গ্রামান্তর = অন্যগ্রাম;
কৃষ্ণসর্প = এক জাতীয় সাপ যা কৃষ্ণ (কালো);
গৃহান্তর = অন্যগৃহ;
দর্শনমাত্র = কেবল দর্শন;
কালসাপ = বিষাক্ত কাল (যম) তুল্য সাপ;
বিরানব্বই = দুই এবং নব্বই;
আমরা = সে তুমি ও আমি ('আমরা' একশেষ দ্বন্দ্বসমাসও হয়)।

প্র : প্রাদি সমাস কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উ : প্র, পরা ইত্যাদি উপসর্গ পূর্বপদে বসে যে তৎপুরুষ সমাস হয়। প্র+আদি = প্রাদি। অব্যয়ীভাব সমাস ও প্রাদি সমাস এক পর্যায়ভুক্ত। ব্যাসবাক্য নেই বলে প্রাদি সমাসকে নিত্য সমাসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। যেমন :
অনুতাপ = অনু (পশ্চাৎ) তাপ
উদ্বেল = উৎ (উৎক্রান্ত) বেলা।

প্র : সুপসুপা সমাস কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উ : এই সমাস বাংলা নয়, সংস্কৃতে আলোচ্য। সংস্কৃত ব্যাকরণে সু, ঔ, যস্ প্রভৃতি বিভক্তির নাম সুপ্। বিভক্তিযুক্ত পদকে সুবন্ত পদ বলে। একটি সুবন্ত পদের সঙ্গে আর একটি সুবন্ত পদের যে সমাস হয় অর্থাৎ বিভক্তিযুক্ত নামপদের সঙ্গে বিভক্তিযুক্ত অন্যপদের যে সমাস হয় তাকে সুপসুপা বা সহসুপা সমাস বলে। বাংলা তৎপুরুষ বা কর্মধারায় পর্যায়ে কিছু এ ধরনের সমাস আলোচিত হয়। যেমন :
ভূতপূর্ব > পূর্বে ভূত;
পূর্বগত > পূর্বে গত;
প্রত্যক্ষদৃষ্ট > প্রত্যক্ষে দৃষ্ট।

প্র : ছন্দবেশী সমাস কাকে বলে?

উ : প্রথমেই বলে রাখা ভালো, 'ছন্দবেশী সমাস' বলে বাংলা ব্যাকরণে স্বীকৃত কিছু নেই। সমাসের কোনো কোনো সমস্তপদ অতি ব্যবহারে সংক্ষিপ্ততর হয়ে পড়ে। তখন তাদের চেনাই কষ্ট হয়। এ ধরনের সমস্তপদের সমাসকে ছন্দবেশী সমাস বলতে চেয়েছেন কেউ কেউ ('এগুলোকে ছন্দবেশী সমাস বলতে ইচ্ছে করে।'–জ্যোতিভূষণ চাকী)। উদাহরণ :
অঘ্রান, বাসর, আমানি, পোলাও।
অঘ্রান এসেছে অঘ্রহায়ণ (হায়নের অগ্র : ষষ্ঠী তৎপুরুষ) থেকে;
বাসর এসেছে বাসগৃহ (বাসের জন্য গৃহ : নিমিত্তার্থে চতুর্থী) থেকে;
আমানি এসেছে অম্লান্ন-(অম্ল মিশ্রিত যে অন্ন : মধ্যপদলোপী কর্মধারয়) থেকে;
পোলাও এসেছে পলান্ন (পল মিশ্রিত যে অন্ন : মধ্যপদলোপী কর্মধারয়) থেকে।
এগুলো পৃথক পৃথক সমাস হলেও এ জাতীয় সমস্তপদ বিশিষ্ট সমাসকে ছন্দবেশী সমাস বলা হয়েছে।

প্র : একই পদের বিভিন্ন সমাস হতে পারে; উদাহরণ?

উ : পীতাম্বর (কৃষ্ণ অর্থে) > পীত অম্বর যাঁর (বহুব্রীহি) কিন্তু পীতাম্বর (পীতবর্ণ বস্ত্র অর্থে) > পীত যে অম্বর (কর্মধারয়)।
গরমিল > মিল নেই যাতে (বহুব্রীহি) কিন্তু গরমিল > মিলের অভাব (নঞ তৎপুরুষ / অব্যয়ীভাব)।
আমরা > একশেষ দ্বন্দ্ব সমাস ও নিত্য সমাস উভয়েরই উদাহরণ।

Partha Kumar Nandi
Dept of EFE
Varendra University.

প্র : শব্দ কী?

উ : কিছু ধ্বনি উচ্চারিত হয়ে বা বর্ণ একত্রে বসে যদি কোন নির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে তবে তাকে শব্দ বলে। প্রথমে ব্যবহার প্রয়োগ।

প্র : শব্দ সম্পর্কে আধুনিক চিন্তা কী?

উ : আধুনিক চিন্তা থেকে বলা যায়, শব্দ একটি ধারণা বা ইমেজ। শব্দ মানুষের মনোজগতে পৃথক পৃথক ইমেজ সৃষ্টি করে। যেমন : 'লোকটি জ্বরে ছটফট করছে।' এই বাক্যটি বললে যে-কোনো বাঙালি বুঝবেন যে, একটি মানুষ একটি নির্দিষ্ট অসুস্থতায় এখনো কাতরাচ্ছে। প্রতিটি বঙ্গভাষী এর একই অর্থ বুঝবেন। কেউ কিন্তু মনে করবেন না যে, কোনো সাপ বা কোনো বাঘ ঘুমিয়ে আছে বা অন্য কিছু। অর্থাৎ 'লোক' বললে 'মানুষ' কল্পনায় আসবে, কোনো সাপ, গাছ, মাছ, বাঘ ইত্যাদি নয়। অনুরূপভাবে 'ফুল' বললে একটি নির্দিষ্ট রোগই বোঝাবে অন্য কিছু নয়। অতএব, শব্দ হলো আইডিয়া যা মানুষের জ্ঞানরাজ্য বা অভিজ্ঞতায় বিস্তৃত। শব্দই ব্রহ্ম- সংস্কৃত পণ্ডিতদের এই বক্তব্যের সঙ্গে আধুনিক 'ওয়ার্ড ইজ আইডিয়া'র মিল পাওয়া যায়।

প্র : সর্বজনীন শব্দ বলে কি কিছু আছে?

উ : পাঁচটি মহাদেশে ব্যবহৃত হয় এমন একটি শব্দের খোঁজ পেয়েছেন ভাষাবিজ্ঞানীরা। 'টাইমস অব ইন্ডিয়া' পত্রিকার সূত্রে জানা যায়, নেদারল্যান্ডসের ম্যাক্স ইনস্টিটিউট ফর সাইকোলিঙ্গুইস্টিকসের বিজ্ঞানীরা দাবি করেন, উচ্চারণে সামান্য একটু হেরফের হলেও এ রকম একটি শব্দ তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন। এটিকে আসলে শব্দ না বলে বরং ধ্বনি বলাই ভালো। সেটি হলো 'হাহ্' (ইংরেজি বানানে এইচইউএইচ)। কখনো প্রশ্নবোধক, কখনো-বা অনিশ্চয়তাসূচক এই ধ্বনিটিই পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ ব্যবহার করে বলে দাবি করেছেন বিশেষজ্ঞরা। এর অর্থ অবশ্যই 'হাই বা-এর মতো' এই পর্যবেক্ষণের আর এক উদাহরণ হলো আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের জনক বলে খ্যাত নোয়াম চমস্কির মতবাদ বলা চলে। চমস্কি যেখানে ভাষার মতো বাকবৈচিত্র্যময় কাজকে প্রাথমিকভাবে মেনে চলার সহজতর প্রবণতা আছে বলে মনে নেন, সেখানে এই বিশেষজ্ঞরা বলছেন– সার্বজনীন নির্মাণকৌশলের মধ্যেই ভাষার ভিত্তি নিহিত। 'হাহ্' এমনই সার্বজনীন উদ্ভূতি নিয়ে 'টাইমস অব ইন্ডিয়া' জানায় এই ভাষাবিজ্ঞানীরা বলছেন, মা বা মমা শব্দ ব্যবহারে বিভিন্ন ভাষায় ভিন্নতা আছে। পিতা বা পাপা শব্দেও সেই ভিন্নতা লক্ষ্যণীয়। কিন্তু 'হাহ্'-এর ব্যবহার বিশ্বব্যাপী ভিন্নতা অনেক কম। তাই একে সর্বজনীন শব্দ বলাই যায়।

প্র : শব্দ গঠনের উপায়সমূহ দেখ।

উ : মৌলিক শব্দ বাংলা ভাষা কেন, যে-কোনো ভাষাতেই অপেক্ষাকৃত কম। যে-কোনো ভাষার শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি পায় বিভিন্ন উপায়ে শব্দ গঠনের মাধ্যমে। বাংলা ভাষাতেও সে-রকম ঘটে। নিম্নে বাংলা শব্দ গঠনের কয়েকটি উপায় উল্লেখ করা হলো :

১. সন্ধির মাধ্যমে : হিম + অচল = হিমাচল
২. সমাসের মাধ্যমে : জায়া ও পতি = দম্পতি
৩. বহুবচনের মাধ্যমে : (গ্রন্থ থেকে) গ্রন্থাবলি
৪. বাক্য সংকোচনের মাধ্যমে : লাভ করার ইচ্ছা = লিপ্সা
৫. পদ-পরিবর্তনের মাধ্যমে : সুন্দর > সৌন্দর্য
৬. উপসর্গ সহযোগে : দুর্ + অবস্থা = দুরবস্থা
৭. প্রত্যয় সহযোগে : ঘর + আমি = ঘরামি
৮. দ্বিরুক্তি শব্দের সহায্যাগে : টক্ টক্, ঘ্যান্ ঘ্যান

Scanned with CamScanner

শব্দ : উৎপত্তিগত দিক

প্র : উৎপত্তিগত দিক থেকে বাংলা ভাষার শব্দরাজি যথাযথভাবে কয়ভাগে বিভক্ত?

উ : পাঁচ ভাগে। যথা : তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি।

প্র : বাংলা ভাষার শব্দরাজি নিয়ে অন্য মন্তব্যগুলো কী?

উ : বাংলা ভাষার কত প্রকার শব্দ আছে, এ সম্পর্কে এক শতাব্দী আগে বলা হতো, এই ভাষায় চার প্রকার শব্দ আছে। ব্যাকরণবিদ জগদীশচন্দ্র ঘোষ তাঁর 'আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ' (১৯৪০) গ্রন্থে লিখেছেন যে, তৎসম তদ্ভব দেশি বিদেশি শব্দের সমন্বয়ে বর্তমানের বাংলা ভাষা। মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, ইব্রাহিম খলিল, কাজী দীন মুহম্মদ, শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী তাঁদের যৌথভাবে রচিত 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' গ্রন্থে প্রথাগত পাঁচ প্রকার শব্দের সঙ্গে আরও এক প্রকার শব্দের কথা বলেছেন এবং সেটা হলো 'মিশ্রশব্দ'। উদাহরণ নিয়েছেন : হেডপণ্ডিত (ইংরেজি+সংস্কৃত), হেডমৌলবি (ইংরেজি+আরবি) ইত্যাদি।

প্র : বাংলা শব্দভাণ্ডার বা শব্দরাজি নিয়ে আধুনিক মত কী হতে পারে?

উ : বর্তমান গ্রন্থের রচয়িতা মনে করেন, বাংলা ভাষাকে সাবলীল রাখতে এবং এর বানানরীতিতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে হলে বহুদিন আগে তৈরি করা শব্দরাজির এই ভাগসমূহ আজ অচল। কেননা, বাংলা ভাষার প্রায় দুলক্ষ শব্দের মধ্যে কয়টি অর্ধতৎসম শব্দ আছে? কোনগুলো? সেগুলো চিহ্নিত করে পৃথক একটি বিভাগ করা ভাষার জন্য কতটা সমীচীন তা ভেবে দেখা দরকার। অন্যদিকে 'মিশ্রশব্দ' শব্দের উৎপত্তিগত দিক থেকে কোনো পৃথক ভাগ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। কারণ, এগুলো শব্দ নয় শব্দবন্ধ। এদের উদ্ভব- ভাষাও এক নয়। এগুলো অনেকটা শব্দবন্ধ সমাসের মতো। সাতসমুদ্র, চন্দ্রমুখ, বসতবাড়ি ইত্যাদি যেমন শব্দবন্ধ, হেডপণ্ডিত বা হাফহাতাও তেমনি। এগুলো বন্ধনমুক্ত করে বিশ্লেষণ করলেই এই শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। অর্ধ শতাব্দী আগে ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সংকলিত অভিধান অবলম্বনে হিসেব করে জানিয়েছিলেন যে, বাংলা ভাষায় ৬৯.৭% তৎসম, ৪.৫৫% বিদেশি, ৫১.৪৫% দেশি ও অতৎসম শব্দ রয়েছে। কিছু শতকরা এই হিসেবটি সামান্য কম-বেশি হতে পারে। কিন্তু মনে হয়, বাংলা শব্দভাইমবারে কয় প্রকার শব্দ আছে তার ইঙ্গিত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এখানে নিয়েছেন। সেই ইঙ্গিতানুসারে বলতে পারি :

১. তৎসম
২. বিদেশি
৩. নিজস্ব (অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশি)

এই তিন প্রকার শব্দ নিয়ে আজকের বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার গঠিত। এভাবে শব্দের উৎপত্তিগত শ্রেণিবিন্যাস করা হলে বাংলা বানানের ক্ষেত্রেও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা সহজ হবে। আজকের ব্যাকরণবিদদের এ বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার।

প্র : উৎপত্তিগত দিক থেকে শব্দের বিভিন্ন শ্রেণি সম্পর্কে লেখ।

উ : তৎসম : বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দাবলি তৎসম শব্দ নামে পরিচিত। যেমন : নক্ষত্র, ক্ষুধা, সূর্য, পদ্ম, ক্ষমা, অন্ন, নিমন্ত্রণ, চন্দ্র, স্বামী, পুত্র, খাদ্য ইত্যাদি।

বিদেশি : বহু বছর আগে থেকে বঙ্গদেশে বিদেশি ভাষার শব্দ প্রবেশ করছে। এই শব্দাবলি এখন বাংলা ভাষার জন্য ক্ষেত্র বিশেষে আবশ্যক শব্দে পরিণত হয়েছে। যেমন : রিক্সা, চিনি ইত্যাদি।

নিজস্ব শব্দ :

অর্ধতৎসম : বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বহু সংস্কৃত শব্দ বানান ও উচ্চারণ উভয় ক্ষেত্রে আদিরূপ বিচ্যুত হয়েছে। কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত এই সংস্কৃত শব্দাবলিকে অর্ধতৎসম শব্দ বলে। যেমন : চর্মকার > চম্মআর।

তদ্ভব : বাংলা শব্দভাণ্ডারের আদি সম্পদ তদ্ভব শব্দ। বলা হয়, সংস্কৃত ভাষা থেকে প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক বাংলায় যেসব শব্দ স্থান করে নিয়েছে

সেগুলোকে তদ্ভব শব্দ বলে। যেমন : হস্ত > হত্থ > হাত।

দেশি : বাংলাদেশের আদি অনার্যভাষীর ভাষার যে শাব্দিক উপাদান এখনো বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়, সেগুলোকে দেশি শব্দ বলে। যেমন : কুড়ি, চুলা ইত্যাদি।

প্র : তদ্ভব শব্দ সম্পর্কে আধুনিক মত কী?

উ : বাংলা ভাষাকে বৈজ্ঞানিকভাবে বিন্যাস ও সরলীকরণের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হলে তদ্ভব শব্দ নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে। সংস্কৃত থেকে বিচ্যুতিপ্রাপ্ত শব্দাবলি প্রাকৃতের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় এলেই শুধু তদ্ভব শব্দ হবে- প্রথাগত এই সংজ্ঞার্থ পরিবর্তন আবশ্যক। কেননা, বিভিন্ন ভাষার বহু শব্দ আছে, সেগুলো পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন: মুটই (তামিল শব্দ) > মুটক > মুত্তম > মোটা (বোঝা অর্থে)। সুরিংক্স (গ্রিক)> সুরুঙ্গ > সুরঙ্গ > সুড়ং (মাটির নিচে গর্ত বিশেষ)।

পোস্ত (পাহলবি শব্দ) > পুস্তিকা > পুথিঅ > পুথি (বই অর্থে)। মোট সুড়ং, পুথি ইত্যাদিকে তদ্ভব শব্দ হিসেবে ধরা হচ্ছে, যদিও এগুলোর মূলে সংস্কৃত ভাষা নেই। এরকম আরো শব্দ আছে। যদি তাই হয়, তবে ইংরেজি থেকে আগত বক্স > বাক্স, হসপিটাল > হাসপাতাল ইত্যাদি তদ্ভব শব্দ হবে না কেন? এরকম বহু শব্দ পাওয়া যাবে। তাহলে তদ্ভব শব্দের সংজ্ঞার্থ দেওয়া যায় এভাবে : অন্য ভাষার যে শব্দ অর্থ ঠিক রেখে বানান ও উচ্চারণ পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে এবং একটি নিজস্ব রূপ গ্রহণ করেছে তাকে তদ্ভব শব্দ বলে। যেমন : হাত, চামার, আফিম, বোতল ইত্যাদি।

প্র : বাংলা ভাষার 'নিজস্ব শব্দ' কাকে বলা হচ্ছে?

উ : বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম ও বিদেশি শব্দাবলি ছাড়া আর সব শব্দকে 'নিজস্ব' শব্দ বলা হবে। প্রথাগত ব্যাকরণের অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশি শব্দাবলি 'নিজস্ব' শব্দভুক্ত। তাছাড়া যে-সব বিদেশি শব্দ বানান ও শব্দবন্ধে যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়ে গেছে, সেগুলোও বাংলার 'নিজস্ব শব্দ' হিসেবে পরিচিত। উল্লেখ্য, তদ্ভব শব্দ বলে সেগুলোকে বোঝানো হয়, যেগুলো ভাষার শব্দভাণ্ডারে কোনো এই শব্দগুলো ভাষার শব্দভাণ্ডারে কোনো ভাষার নিজস্ব সম্পদ। কারণ ভাষা সদা পরিবর্তনশীল। পরিবর্তিত বিকৃত হয়ে নিজ ভাষায় যখন এগুলো পরিবর্তনশীল ও সময়সাপেক্ষ, তখন বাংলা ভাষের নিজস্ব ভাণ্ডারে এগুলো ঠাঁই দিতে আমাদের আপত্তি থাকবার কথা নয়।

প্র : কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ 'নিজস্ব শব্দ' উদাহরণ দাও।

উ : 'নিজস্ব শব্দ' একটি শব্দপুঞ্জি। অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশি এবং বিদেশি শব্দ থেকে সব শব্দরাজি এখানে অন্তর্ভুক্ত। এগুলো উদাহরণ করা হলো :

অর্ধতৎসম :
কৃষ্ণ > কেষ্ট
ক্ষুধা > খিদে
গৃহিণী > গিন্নি
চন্দ্র > চন্দর
জ্যোৎস্না > জ্যোছনা
নিমন্ত্রণ > নেমন্তন্ন
পত্র > পত্তর
পুরোহিত > পুরুত
প্রীতি > পিরিতি
বৈষ্ণব > বোষ্টম
মহোৎসব > মোচ্ছব
মিত্র > মিতির
সূর্য > সরজ
শ্রাদ্ধ > ছেরাদ্দ

তদ্ভব :

তৎসম	অর্ধতৎসম	তদ্ভব
অস্তি >	অস্থি >	আছে
অদ্য >	অজ্জ >	আজ
অর্ধ >	অদ্ধ >	আধ
ইন্দ্রাগার >	ইন্দ্রাআর >	ইদারা
উপাধ্যায় >	উবজ্ঝাঅ >	ওঝা
উদ্ঘাপন >	উনহাবন >	উদ্‌যাপন
কারোতি >	কারোই >	করে
কথয়তি >	কহই >	কহে
কক্ষোনিকা >	কহোনিআ >	কনুই
ক্রীণাতি >	কিনই >	কিনে

Scanned with CamScanner

কার্য >	কজ্জ >	কাজ
পৃষ্ঠ >	থর >	থর
চক্র >	চক্ক >	চাকা
চর্মকার >	চম্মআর >	চামার
তুম্হ >	তুম্ম >	তুমি
দ্বার >	দুআর >	দোর
নৃত্যতি >	নচ্চই >	নাচে
চক্ক >	চাক্ক >	চাক
প্রস্তর >	পত্থর >	পাথর
বৃদ্ধ >	বুড্ঢ >	বুড়া
বর্দ্ধতে >	বড্ঢই >	বাড়ে
বধূ >	বহু >	বৌ
ভক্ত >	ভত্ত >	ভাত
মধ্য >	মজ্ঝ >	মাঝ
মিথ্যা >	মিচ্ছা >	মিছা
লবণ >	লোণ >	নুন / নুন
বহস >	বাহু >	বায়া
ষোড়শ >	ষোলহ >	ষোল
সপ্তা >	সত্তঅ >	সাত
স্তম্ভ >	থম্ভ >	থাম
স্থান >	থান >	চান
হস্ত >	হত্থ >	হাত

দেশি :
আড়ং, আলু, কুড়ি, পেট, চুলা, ঝাঁটা, কোল, ডিঙা, ডিঙি, কুলা, টোপর, ডাব, ডাগর, ঢেঁকি, ঢেউ, ঢিল, ডাহা, গল্প, চোস্য ইত্যাদি।

বিদেশি শব্দ থেকে সৃষ্ট শব্দ :
খ্রিষ্ট (Christ)
আফিম (Opium)
বাক্স (Box)
গেলাস (Glass)
হাসপাতাল (Hospital)
লণ্ঠন (Lantern)
বোতল (Bottle)
ফেরি (ঘাট) (Ferry)
লাট (Lord)
গারদ (Guard)
সান্ত্রি (Sentry)
ইংরেজি (English) ইত্যাদি।

(নোট : পর্তুগিজ Engrez ও ফরাসি Anglaisa থেকে এসেছে English. 'ইংরেজি' এর পরিবর্তিত রূপ।)

প্র : বাংলা ভাষায় বিদেশি শব্দ কিভাবে এসেছে?

উ : তিনভাবে বাংলা ভাষায় বিদেশি শব্দ এসেছে:

১. প্রতিবেশী ভাষার শব্দ ব্যবহারের প্রবেশ ঘটেছে মানুষের সম-সম্পর্কের মাধ্যমে;

২. বহির্দেশীয়দের বঙ্গদেশে এবং বঙ্গদেশীয়দের বহির্দেশে গমনাগমনের কারণে বিদেশি শব্দের সমাগম ঘটেছে;

৩. এদেশে বিদেশিদের ক্ষমতা দখল এবং দীর্ঘদিন দেশ শাসনের কারণে তাদের ভাষার শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে তুর্কিদের আক্রমণ ও ক্ষমতাদখল থেকে আরম্ভ করে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানিদের বিতাড়নের পূর্ব পর্যন্ত এদেশের বাঙালিরা বিদেশি শাসনাধীন ছিলেন। দীর্ঘদিন ব্যবহার করার কারণে বাংলাভাষীরা এই প্রবেশ-সমাগম-অনুপ্রবিষ্ট বিদেশি শব্দাবলি নিজের ভাষার অঙ্গীভূত করেছেন।

প্র : বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বিদেশি শব্দাবলি কয়ভাগে বিভক্ত করা যায়?

উ : দুইভাগে :
১. ধর্মসংক্রান্ত
২. ধর্ম-বহির্ভূত।

ধর্মসংক্রান্ত বিদেশি শব্দসমূহ নির্দিষ্ট ধর্মের বাইরে অন্য ধর্মাবলম্বীরা ব্যবহার করেন না বা ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু ধর্ম-বহির্ভূত ব্যবহারিক জীবনকেন্দ্রিক বিদেশি শব্দসমূহ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব শ্রেণির মানুষ ব্যবহার করে থাকেন।

প্র : বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ইংরেজি ভিন্ন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিদেশি শব্দ লেখ।

উ : জাপানি শব্দ : রিক্সা, হাসনাহেনা, ক্যারাটে, জুডো, হারিকিরি।
চিনা শব্দ : চা, চিনি, সাম্পান, লিচু, লুচি।

ফরাসি শব্দ : ওলন্দাজ, দিনেমার, কাফে, রেস্তরাঁ, আঁতাত, ডিপো, কার্তুজ, কুপন, বুর্জোয়া, রেনেসাঁস।

ওলন্দাজ শব্দ : ইস্কুপ, তুরুপ, টেক্কা, হরতন, রুইতন, ইস্তাপন।

সিংহলি শব্দ : লিচু (অর্থ : চোর)
গ্রিক শব্দ : লাম (গ্রামফোন), সেমাফোর (সেমাফলিম), সুড়ঙ্গ (সুরিনজ), ইউনিফর্ম (আইওনিমন)।
গুজরাটি শব্দ : চরতাল, খদ্দর।

পর্তুগিজ শব্দ : আলপিন, পাউরুটি, ইংরেজ, সাবান, তোয়ালে, বালতি, নিলাম, আলকাতরা, মার্কা, জানালা, পেরেক, ক্রশ, পরাত (বৃহৎ থালা), বারান্দা, মোমা, ঘিত, বেহালা, পেঁপে, পাচার, পেয়ারা, বোতাম, আলমারি, মিস্ত্রি, গামলা, ফিতা, সেমিজ, কামিজ, গির্জা, চাবি, পাদ্রি, আনারস, টুপি, বোমা, কেরানি, কামরা, আতা, তামাক, ইস্পাত, আয়া, আচার, পিস্তল, বেহালা, মাস্তুল, মাইরি, গুদাম।

ইতালীয় শব্দ : মাফিয়া।
অস্ট্রেলীয় শব্দ : বুমেরাং, ক্যাঙারু।
মালয় শব্দ : কিরিচ, কাকাতোয়া, আইলা (অর্থ : ডলফিন জাতীয় কিছু)।
বর্মি শব্দ : লুঙ্গি, ফুঙ্গি।
মেক্সিকান শব্দ : চকোলেট।
দক্ষিণ আফ্রিকান শব্দ : জেব্রা।
পেরুর শব্দ : কুইনাইন।
জার্মান ভাষা : নাৎসি।
তামিল : চুরুট বা চুরট।

হিন্দি শব্দ : আগড়ম-বাগড়ম, আচ্ছা, কাছারি, কাহিনি, কুত্তা, খাম (খুঁটি অর্থে), খুজলি, খেলনা, গদি, ঘাবড়ানো, ঘুষাঘুষি, চাঁদোয়া, চাচা, চাটনি, চাটা, চাটাই, চানা (চানাচুর), চাপাতি (রুটি বিশেষ), চিড়িয়া, চোট্টা, ছাতি (বুক অর্থে), ছালুন, জায়গা, জিলাপি, ঝান্ডা, ঝামেলা, টক্কা, ঠিকানা, ঠক্কর, ঢিলা, তার, দাদা, দাদি, দুলা, ধোলাই, পানি, ফুফা, ফুফি, বড়াই, বেটা, ভরসা, সুজি, ওয়ালা, ছিনতাই, ডেরা, টহল, ডেমরা, ইস্তক।

তুর্কি শব্দ : উজবুক, কোর্মা, তুরুক, তোশক, বন্দুক, বাইজি (মূলশব্দ বাজি), বারুদ, বেগম, সওগাত, তোপ, কাবু, তক্মা, কাঁচি, খাতুন, খাঁ, বিবি, মুচলেকা, আলখেল্লা, চাকু, লাশ, বাবা, ঠাকুর, উর্দি, উর্দু, কুলি, কুরনিশ, খোকা, বাবুর্চি।

উর্দু শব্দ : আপ্পু, কলিজা, আলবাত, খুশি ছিলিম (কল্কি অর্থ), চুরট, শলাকা, গুন্ডা

পার্সি (ফার্সি) শব্দ : আইন, আকার, আজাদ, আদালত, আন্দোলন, আফিম, আবদার, আমদানি, আমলা, ইতর, ইসলাম, ইস্পাহান, কবুতর, কমর, কামান, কিমা, কারখানা, গরম, গোলাপ, চেহেলতার, চাদর, চালাক, চুক্তি, জমা, জরিমানা, তাজা, দরিয়া, দারোগা, দেওয়ানা, দোয়াত, নমুনা, নকিব, নিলাম, পলক, পেয়াজ, পোলাও, পোশাক, ফরিয়াদ, বর্ধমান, বরখাস্ত, বন্দুক, বাগান, বাজার, বা. কমাল, শরাফত, সাদাই, শালগম, সালোয়ার, সওগাতদার, সস্তা, সিপাই, সুদ, হালিয়া, হোকান, হজার, দরকার, হাসনা, চাকরি, তুলাশ, চিন্তা, আওয়াজ, পেয়ালা, সওদাগর, ফরমান, বাজি, আলাদা, কারচুপি, আলমতমারি, আফগান, শাস্তুরি, জিন্দা, জিম্মেদারি, বাবা, খাস, দিল, নজর, পেরেশান, কারবানা, কারচুপি, কারবার, কিংখাব, কিনারা, খোলা, খুশি, গোলাপ, জবানবন্দি, জেলানা, হোশামদের, নাজেলা, পয়জার, পরি, পাজি, পাহারাদার, পালোয়ান, পোশাকি, বুনিয়াদ, বদমাশি, বিমা, মগজ, মজুর, মেমর, মোবল, রোজনা, লস্করখানা, লাল, সফেদ, সর্দিগর্মি, সেতার, হাতেশা, হিন্দু, হুঁশ, হুঁশিয়ার, খতরনাক, স্টেজদারি।

আরবি শব্দ : অন্দর, আজকাল, আদাব, আদালত, আমলা, আমদানি, আয়েশ, আসামি, ইজ্জত, ইন্তিল, ইমন, ইমরত, ইশারা, ইশতেহার, উকিল, উজির, এখতিয়ার, এত্তিম, এলাকা, ওয়াদিশ, কদর, কলম, কসম, কালিয়া, কুমকুম, কুলুপ, খবর, খাজনা, খালাস, গরিব, জলসা, জেলা, তালিকা, তবলা, তুফান, তুলকালাম, দালাল, নকল, নতশা, নিকাহ, ফসল, বকেয়া, মফস্বল, ময়দান, মশাল, মসলা, মুনাফা, মুলতবি, মোলায়েম, লেবাস, লোকসান, শহিদ, হুলিয়া, সবুর, তকলিফ, দখল, তদারক, শতরঞ্জ, জালিয়াতি, মুশকিল, ওয়াকিফ, কবুল, মুফিদ, নেয়ামত, মোক্তার, মামলা,

Scanned with CamScanner

ফজিহ, ফকরি, আমেন, শরিক, হামলা, ছয়লাব, মৌসুমি, হালক, ওস্তাদ, ছয়লাব, ঘরত, মিছিল, বেহাল, সফর, বাসিয়া, হাহেরা, জাহাজ, মুসাফির, ফুলমাত, গাফলত, খেয়াল, মুজলুম, বাজে, কৈফিয়ত, জমিন, হুকিম, মুহুরি, ফুকির, আবিব, আলমা, কবর, কলাপ, কসাই, কুসুম, তোফা, কেয়ামতে, খসড়া, কৌসুম, তাবিব, চুনিয়া, নাকাল, ফতোয়া, মস্কিত, মসজিদ, মহকুমা, মৌলবি, রায়, লেবু, হামুয়া।

শব্দ : গঠনগত দিক

প্র : গঠনগত দিক থেকে বাংলা শব্দাবলি কয় ভাগে বিভক্ত?

উ : দুইভাগে। যৌলিক ও সাধিত।

প্র : মৌলিক শব্দ কাকে বলে?

উ : যে শব্দকে আর কোনোভাবে বিশ্লেষণ করা বা ভাঙা যায় না, তাকে মৌলিক শব্দ বলে। এই শব্দগুলোকে নিজ শব্দ বা স্বয়ংসিদ্ধ শব্দও বলা হয়। যেমন : মা, বাবা, তিন, পা ইত্যাদি।

প্র : সাধিত শব্দ কাকে বলে?

উ : মৌলিক শব্দ ছাড়া অন্য যেকোনো শব্দই সাধিত। একাধিক শব্দের সমাস হয়ে বা ধাতু ও শব্দের সঙ্গে প্রত্যয় যোগ হয়ে যে শব্দ তৈরি হয়, তা-ই সাধিত শব্দ। যেমন : দয়ালু, জমিদার, সাহিত্য ইত্যাদি।

প্র : সাধিত শব্দ কীভাবে গঠিত হয়?

উ : সাধারণত প্রত্যয়যোগে ও সমাসবদ্ধ হয়ে। যেমন :

প্রত্যয়যোগে>সরস্ + বতী = সরস্বতী

সমাসবদ্ধ হয়ে>পঞ্চ আনন যার = পঞ্চানন (শিবকে বোঝায়)।

শব্দ : অর্থগত দিক

প্র : অর্থগত বিচারে বাংলা শব্দ কয়ভাগে বিভক্ত?

উ : তিনভাগে। যথা : যৌগিক শব্দ, রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ, যোগরূঢ় শব্দ।

প্র : যৌগিক শব্দ কাকে বলে?

উ : যে সব সাধিত শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও প্রচলিত অর্থের মধ্যে মিল থাকে, তাকে যৌগিক শব্দ বলে। অর্থাৎ, এ শব্দগুলো প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থানুসারে হয়। নবগঠিত শব্দের প্রকৃতি বা প্রত্যয়ের কোনো বিলোপ হয় না। যেমন :

নায়ক > নৈ + অক
নয়ন > নে + অন
শয়ন > শে + অন
বাঁদরামি > বাঁদর + আমি
কর্তব্য > কৃ + তব্য ইত্যাদি।

তাছাড়া আরো কিছু যৌগিক শব্দ হচ্ছে গায়ক, বাবুয়ানা, দৌহিত্র, মধু, চিকামারা, গুণবান, পাঠক, বিদ্যুৎ, ভাড়াটে, মেয়েলি।

প্র : রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ কাকে বলে?

উ : রূঢ় শব্দের অর্থ অর্কশ বা অপ্রোথিত। যখন কোনো শব্দ সৃষ্টির সময় কোনো অস্বাভাবিকতা দেখা যায় তখন সেটি যৌগিক বা রূঢ়ি শব্দের মধ্যে পড়ে। এ-বিচারে বলা যায়, যে শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সঙ্গে প্রচলিত অর্থের পার্থক্য থাকে তাকে রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ বলে। অর্থাৎ প্রত্যয় বা উপসর্গ যোগকৃত শব্দ যখন মূল শব্দের অর্থের অনুগামী না হয়ে অন্য অর্থ প্রকাশ করে। যেমন : প্রবীণ অর্থ যে প্রকৃষ্টভাবে বীণা বাজায় (প্র+বীণ)। কিন্তু এখন প্রবীণ অর্থ বৃদ্ধ বা প্রাচীন। অনুরূপ :

হস্ত+ইন> হস্তী;
বাঁশ+ইক> বাঁশি;
তিল+ক্ত > তৈল;
কুশ (এক প্রকার তৃণ) + অল > কুশল।

অন্যভাবে, যে হরণ করে > হরিণ;
নিজ কন্যা > ঝি (চাকরানি),
খবরাখবর> সন্দেশ (মিষ্টিবিশেষ);
পাঞ্জাবের অধিবাসী > পাঞ্জাবি (পোশাক বিশেষ)।

এছাড়াও রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দের আর কিছু উদাহরণ হলো :

গবেষণা, মন্দির, ফলাহার, থ, কারচুপি, তঞ্চয়া, বৎস, রাখাল, কদর্য।

প্র : যোগরূঢ় শব্দ কাকে বলে?

উ : এই জাতীয় শব্দ একই সঙ্গে যৌগিক ও রূঢ় উভয় জাতীয় শব্দের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। অর্থাৎ এ ধরনের শব্দ সৃজনে স্বাভাবিকতা ও অস্বাভাবিকতা উভয়ের সমন্বিলন দেখা যায়। যে-বিচারে বলা যায়, সাধিতশব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ভিন্ন হলেও অর্থগত দিক থেকে কোনো নির্দিষ্ট একটিকেই যখন বোঝায় বা বিশেষার্থ প্রকাশ করে তখন তাকে যোগরূঢ় শব্দ বলে। বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণে একেবে বেশ মিলে যায়। যেমন : শঙ্খচুড় > শঙ্খ জন্মে যা। কিন্তু এখন তা শঙ্খমুক্তাকে বোঝায়। একদ :

আদিত্য (অদিতির পুত্র বা সব দেবতা) > সূর্য;
তুরঙ্গম (যা তাড়াতাড়ি যায়) > ঘোড়া;
রাজপুত (রাজার পুত্র) > জাতিবিশেষ;
মহাযাত্রা (ধুমধাম করে গমন) > মৃত্যু;
অলধি (জল ধারণ করে এমন কলসি)> সমুদ্র।

এছাড়াও যোগরূঢ় শব্দের আর কিছু উদাহরণ হলো : জলদ, দশানন, পরিবার, বহুব্রীহি, গোফেখেজুরে, অসুখ (এখানে সুখ-এর অভাব না বুঝিয়ে রোগ বোঝায়)।

দ্বিরুক্ত শব্দ / ধ্বন্যাত্মক শব্দ

প্র : দ্বিরুক্ত শব্দ কাকে বলে?

উ : একটি শব্দ পরপর দুবার উক্ত বা বলা বা ব্যবহার হলে তাকে দ্বিরুক্ত শব্দ বলে। যেমন : দিন দিন, বারে বারে।

প্র : কেন দ্বিরুক্ত শব্দ ব্যবহার হয়?

উ : প্রতিটি শব্দ এক একটি পৃথক ইমেজ। এগুলোর ভিন্ন অর্থ আছে। যখন ওই নির্দিষ্ট ইমেজ বা অর্থের কম বা বেশি বোঝানো হয়, তখন ব্যবহার হয় দ্বিরুক্ত শব্দ। যেমন:'স্বপনের গরম লেগেছে।' এই বাক্য যদি এভাবে লেখা হয় : 'স্বপনের গরম গরম লাগছে।' তাহলে গরম শব্দের দ্বিরুক্তি ব্যবহার করে গরমের মাত্রা কম বোঝায়। আবার, 'বাগান ফুলে ছেয়ে গেছে' এই বাক্যকে যদি 'বাগান ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে' লেখা হয়, তাহলে বাগানে ফুলের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য উভয়েরই বৃদ্ধি বোঝায়। এসব কারণে সাধারণত দ্বিরুক্ত শব্দ ব্যবহার করা হয়।

প্র : দ্বিরুক্ত কত প্রকার?

উ : তিন প্রকার :
শব্দের দ্বিরুক্তি (রোজ রোজ, কেউ কেউ);
শব্দের দ্বিরুক্তি (শক শক, ঝিম ঝিম);
অনুকার দ্বিরুক্তি (খেয়ে খেয়ে, যেতে যেতে)।

প্র : দ্বিরুক্ত শব্দ ব্যবহারের দিক থেকে কত প্রকারের হতে পারে?

উ : তবে প্রকারের। যথা :

যথারীতিরুক্ত :
এতে মূল শব্দের অর্থের কোনোরকম পরিবর্তন হয় না শব্দের অর্থের বিস্তৃতিও ঘটে না। যেমন : ছোট ছোট পাখা। শব্দ দুটো একই।

সমার্থক দ্বিরুক্ত :
কোনো শব্দের সাথে এই শব্দের দ্বিরুক্তি না হয়ে, সমার্থক ও সমগোত্রীয় জাতীয় অন্য কোনো শব্দের দ্বিরুক্তি হলে। যেমন : আশপাশ-বিপদ বলে-কয়ে আসে না।

যুগ্মরীতির বা অনুচর-দ্বিরুক্ত :
এখানে প্রথম শব্দের অর্থ যথাযথ থাকলেও দ্বিতীয় শব্দটির অর্থ যথার্থ থাকে না। প্রথম শব্দের অনুকরণে বা অনুচর হিসেবে দ্বিতীয় শব্দটি তৈরি হয়। যেমন : খেয়ে-দেয়ে বই-টই নিয়ে পড়তে বসে। এই বাক্যে 'দেয়ে' ও 'টই' দুটোরই অর্থাজ্ঞান নয়।

বিপরীতার্থক দ্বিরুক্ত :
শব্দদ্বয়ের নিজস্ব অর্থ থাকবে, তার বা বিপরীত অর্থ বোঝাবে, এমন হলে। যেমন : কেনা-বেচার শর আয়-ব্যয় হিসাব করা দরকার।

প্র : সমার্থক ও বিপরীতার্থক দ্বিরুক্ত নিয়ে ভিন্ন মত কী?

উ : অনেক ব্যাকরণবিদ সমার্থক দ্বিরুক্ত ও বিপরীতার্থক দ্বিরুক্ত শব্দকে 'দ্বিরুক্ত' শব্দ বলতে চান না; বলেন 'শব্দ-দ্বৈত'। তাঁরা এক্ষেত্রে 'ভিন্নার্থক শব্দ-দ্বৈত' বলে আর একটি বিভাগও সংযোজন করেন। যেমন : চন্দ্র-সূর্য, আহার-বিহার, ভাত-কাপড় ইত্যাদি।

প্র : ধ্বন্যাত্মক শব্দ কাকে বলে?

উ : শব্দ একটি ইমেজ। কখনো ধ্বনি থেকে অনুকরণ করে শব্দ তৈরি করা হয়। এই শব্দকে ধ্বন্যাত্মক শব্দ বলে। যেমন :

খিল্ খিল্ = হাসির শব্দ
ভেউ ভেউ = মানুষের উচ্চ কান্নার
ঘেউ ঘেউ = কুকুরের উচ্চ ডাক
ঝম্ ঝম্ = বৃষ্টি পতনের শব্দ।

Scanned with CamScanner

প্র : ধ্বন্যাত্মক শব্দ কি শুধু ধ্বনির অনুকরণেই সৃষ্টি হয়?

উ : না। মানুষের শারীরিক অনুভূতি, যেমন : ভয়, হাসি ও কান্নার ধ্বনি, নিস্তব্ধতা, স্তব্ধতা ও শূন্যতা ইত্যাদি অনুভবযোগ্য ধারণা প্রকাশক শব্দগুলোও ধ্বন্যাত্মক শব্দ বলে। যেমন :

খাঁ খাঁ = আলোকিত কিন্তু শূন্যতা
হুম হুম = ভয় / স্তব্ধতা
ঝিকিমিকি = ঝিকমিক
পিট পিট = বহুবার পতন
ঠাঁ ঠাঁ = পরমের উত্তাপ
মৃদু মৃদু = হালকা ভাব।

প্র : ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও অনুকার দ্বিরুক্তির সম্পর্ক কী?

উ : ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও অনুকার দ্বিরুক্তি মূলত একই। উভয়ই নির্দিষ্ট অর্থবহ শব্দ নয়, ধ্বন্যাত্মক বা অনুকার দুই শব্দ মিলে একটি অর্থ প্রকাশ করে। অনুকার ধ্বনিগুলো মূলত অব্যয়বাচক শব্দ। সে দিক থেকে বলা যায়, ধ্বন্যাত্মক শব্দসমূহ বিশেষণ রূপেও ব্যবহৃত হয়। যেমন :

অব্যয়সূচক অনুকার দ্বিরুক্তি > টক্ টক্ (উজ্জ্বল অর্থে)।
বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত ধ্বন্যাত্মক শব্দ > গোলাপটি টক্-টকে লাল।

প্র : পদাশ্রিত দ্বিরুক্তি কাকে বলে?

উ : বিচ্ছিন্নযুক্ত পদ পর পর দুবার ব্যবহৃত হলে তাকে পদাশ্রিত দ্বিরুক্তি বলে। যেমন : গানে গানে ভরিয়ে দেবো মন।

প্র : পদাশ্রিত দ্বিরুক্তি কতভাবে সম্পন্ন হতে পারে?

উ : দুইভাবে হতে পারে :

১. যথাদ্বিরুক্তি:
২. যুগ্মরীতি বা অনুচর-দ্বিরুক্তি।

উদাহরণ :

পদাশ্রিত যথাদ্বিরুক্তি :
জনে জনে আজকে আমি জানিয়ে যাব সব।

পদাশ্রিত যুগ্মরীতি বা অনুচর দ্বিরুক্তি :
হাতে-নাতে পড়লে ধরা দলে-বলে জেলে যাবে।

প্র : কোনো শব্দ কি এককভাবে ধ্বন্যাত্মক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে?

উ : পারে। ধ্বন্যাত্মক শব্দ সর্বদা দ্বিরুক্ত হবেই, এমন নয়। দ্বিরুক্ত হতে পারে, তবে এককভাবেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন :

বৃংহিত > হাতির ডাক
ক্রাকার > বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি
গুঞ্জন > ভ্রমরের শব্দ
নিক্কণ > নূপুরের ধ্বনি
কাকলি/কূজন > পাখির শব্দ / ডাক
মর্মর > শুকনো পাতার শব্দ
কল্লোল > সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ
কেকা > ময়ূরের ডাক
হ্রেষা > অশ্বের ডাক
হুঙ্কার > বীরের গর্জন।
কূহু > কোকিলের ডাক
ক্রেঙ্কার > রাজহাঁসের ডাক
হুঙ্কার > সিংহের নাদ (ডাক)
শিঞ্জন > অলঙ্কারের ধ্বনি

* আরো উদাহরণ এই বইয়ের এককথায় প্রকাশ অংশে পাওয়া যাবে।

শব্দের শুদ্ধরূপ

প্র : শব্দের শুদ্ধরূপ কী?

উ : বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সব শব্দই কোনো না কোনো নিয়ম দিয়ে ব্যাখ্যা বা উল্লেখ করা যায়। বানানের এই নিয়ম-কেন্দ্রিকতাকেই শব্দের শুদ্ধরূপ বলে। অনেক ভুল বানান প্রচলিত থাকলেও পরিশুদ্ধবাদীগণ সর্বদা শুদ্ধ বানানের পক্ষে। শুধু সে-কারণেও নয়। ভাষাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখতে হলে শুদ্ধভাবে শব্দ লিখতেই হবে।

প্র : সাক্ষর ও স্বাক্ষর এর কোনটি শুদ্ধ?

উ : দুটোই। সাক্ষর অর্থ শিক্ষিত বা অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন, আর স্বাক্ষর অর্থ সহি বা দস্তখত।

প্র : অক্ষরজ্ঞ ও অক্ষরাজ্ঞ এ দুটি বানানের শুদ্ধ কোনটি?

উ : দুটোই। অক্ষরজ্ঞ অর্থ যিনি অক্ষর (বিদ্যা) সম্পর্কে জ্ঞানী (যে অর্থে বিশেষজ্ঞ) আর অক্ষরাজ্ঞ অর্থ যিনি অক্ষর সম্পর্কে অজ্ঞ অর্থাৎ বিদ্যাহীন।

প্র : 'অত্র বিদ্যালয়' ব্যবহার শুদ্ধ কি না।

উ : ভুল। কারণ, অত্র অর্থ এইখানে। বিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান বা অন্য কিছুর আগে অত্র ব্যবহার করলে এর অর্থ দাঁড়ায় ' এইখানে বিদ্যালয়'। কিন্তু বোঝাতে চাওয়া হয় ' এই বিদ্যালয়'।

প্র : বঁধু ও বধূ কোন বানানটি শুদ্ধ?

উ : দুটোই সঠিক। বঁধু অর্থ বন্ধু আর বধূ অর্থ স্ত্রী।

প্র : প্রজ্বলন ও প্রোজ্জ্বল বানান দুটো কি সঠিক?

উ : হ্যাঁ। কারণ, প্র+জ্বলন= প্রজ্বলন আবার প্র+উজ্জ্বল= প্রোজ্জ্বল।

প্র : বন্দোপাধ্যায় বানানটি কি ভুল?

উ : হ্যাঁ। বন্দ্য+উপাধ্যায়= বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্র : কৌতুক ও কৌতূহল বানান কি সঠিক?

উ : কৌতুক বানানে 'উ-কার' হলেও কৌতূহলে 'ঊ-কার'।

প্র : 'বিভিষীকা' বানানটি কি শুদ্ধ?

উ : না, ভুল। এর শুদ্ধরূপ 'বিভীষিকা'।

প্র : আপোষ বানানটি শুদ্ধ নয় কেন?

উ : শব্দটি পারসি। তাই ষ হবে না। হবে আপোস বা আপস।

প্র : শ্রেণি বানান শুদ্ধ কিনা?

উ : সংস্কৃতে শ্রেণী ও শ্রেণি উভয় বানানই শুদ্ধ ও এক অর্থ।

প্র : 'শ্রদ্ধাঞ্জলী' বানানটি কি ভুল?

উ : হ্যাঁ। 'অঞ্জলি' অর্থ 'জোড়হাত'। শ্রদ্ধার সঙ্গে যে অঞ্জলি, সেটা শ্রদ্ধা+অঞ্জলি = শ্রদ্ধাঞ্জলি। অনুরূপ, প্রেমাঞ্জলি, গীতাঞ্জলি, পুষ্পাঞ্জলি, জলাঞ্জলি ইত্যাদি।

প্র : উপরোক্ত শব্দের সঠিক রূপ কী?

উ : উপরিউক্ত ও উপর্যুক্ত।

প্র : উল্লেখিত শব্দ কি ভুল?

উ : কোথাও বা কখনও উল্লেখ হয়েছে এমন অর্থে উল্লেখিত ভুল, শুদ্ধ হবে উল্লেখকৃত। তবে উপরে উল্লেখ করা হয়েছে এমন অর্থে উল্লিখিত শুদ্ধ।

প্র : ইতিপূর্বে, ইতিমধ্যে শব্দ দুটি কি শুদ্ধ?

উ : ভুল। এই শব্দ দুটি প্রচলিত হলেও এর শুদ্ধ হবে ইতঃপূর্বে, ইতোমধ্যে।

প্র : এবস্থা কি শুদ্ধ?

উ : না, ভুল বানান। সন্ধির নিয়ম অনুসারে এবংভূতা শুদ্ধ বানান।

প্র : শাদ্ধলা বানানে ভুল কোথায়?

উ : এটি যদি এক শব্দ হয় তবে তা যদি যাবোন দেয়া অর্থ বোঝায় তবে বানানটি হবে শাদ্ধলা। শাদ্ধ না—অর্থ ঘাস বোঝাতে পারে। তবে উদ্ভিদিবং বানানের শাদ্ধ এবং না একত্র থেকার ফলে তা কোনোভাবেই শুদ্ধ নয়।

প্র : এমতাবস্থায় শব্দটির ব্যবহার কি ভুল?

উ : হ্যাঁ। কারণ, এখানে 'এই তত অবস্থায়' তিনটি শব্দ আছে। ফলে বাড়তি দোষ ঘটেছে। শুদ্ধ হবে : এই অবস্থায় বা এই মতে।

প্র : হোস্টিস হোস্টেল অর্থে ছাত্রীবাস কথাটি শুদ্ধ কি?

উ : ছাত্রীবাস বলতে ছাত্রীদের পরিবহনের জন্য বাস (Bus) বোঝাবে। অর্থ Hostel অর্থে লিখতে হবে ছাত্রীনিবাস বা ছাত্রী-আবাস।

প্র : 'মুহুর্মুহু' শব্দের বানানটি কি শুদ্ধ?

উ : ভুল। এর সঠিক উচ্চারণ চারটি উ-কার হবে এবং একটি হবে বেফ। 'মুহুর্মুহু' সঠিক বানান।

প্র : সহসা অর্থে শীঘ্র বোঝায়?

উ : সহসা অর্থ হঠাৎ। শীঘ্র বোঝানো ভুল।

প্র : পরিষ্কার অবিষ্কার কিন্তু পুরস্কার তিরস্কার কোন বিধানে বানান চারটি শুদ্ধ?

উ : ষ-ত্ব বিধান অনুসারে।

প্র : কল্যাণীয়েষু কিন্তু কল্যাণীয়াসু কোন নিয়মে শুদ্ধ?

উ : ষ-ত্ব বিধান অনুসারে।

প্র : পূর্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন, সায়াহ্ন—এই বানানে কোথায় ভুল আছে?

উ : পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ, সায়াহ্ন। (এখানে হ্ + ন = হ্ণ; হ্ + ণ = হ্ণ)

প্র : দুরাবস্থা বানানটি শুদ্ধ কিনা?

উ : ভুল। এটি সন্ধিঘটিত বানান। এর শুদ্ধরূপ দুর্+অবস্থা=দুরবস্থা।

প্র : কোনো কিছু ভেঙে পড়া অর্থে ধস না ধ্বস কোনটি শুদ্ধ?

উ : ধস।

Scanned with CamScanner

প্র : 'নিরাশায়' বানানটি 'নিরাশয়' কোন বানান শুদ্ধ?

উ : নিরাশায়। এখানে 'আশয়' শব্দের আগে সংস্কৃত নিঃ উপসর্গ যুক্ত হয়েছে।

প্র : টর্ন না টার্ন কোন বানান শুদ্ধ?

উ : টার্ন।

প্র : পত্রিকা প্রবন্ধ লেখাটি কি ভুল?

উ : ভুল। সংস্কৃতে পত্রিকা অর্থ চেক্কা। তাই চেক্কার মতো বোর্ডগুলোকে আমরা সাদা দিয়ে ঘেরা অর্থে পত্রিকা প্রবন্ধ শুদ্ধ।

প্র : প্রজ্ঞাবন্তু ও প্রজ্ঞাবন্তু সঠিক কি না?

উ : সঠিক। পুংলিঙ্গে প্রজ্ঞাবন্তু, স্ত্রীলিঙ্গে প্রজ্ঞাবন্তু। অনুরূপভাবে, কল্যাণবন্তু (পুং) কল্যাণবন্তু (স্ত্রী); কল্যাণীবন্তু (পুং) কল্যাণীবন্তু (স্ত্রী)।

প্র : ত্রেতাগ্নি, দেবাগ্নি বানান শুদ্ধ কি না?

উ : ভুল। 'অগ্নি' অর্থ আগুন। সে নিজ থেকে ত্রেতা+অগ্নি = ত্রেতাগ্নি, দেব+অগ্নি = দেবাগ্নি শুদ্ধ।

প্র : অনুষ্ঠানিক বানান ভুল না শুদ্ধ?

উ : ভুল। শুদ্ধ হবে প্রানুষ্ঠানিক।
প্রনু+সঙ্গ= অনুষ্ঠ+ইক=প্রানুষ্ঠানিক।

প্র : নুব্জ বানানের শুদ্ধরূপ কি?

উ : নুব্জ (নুয়ে থাকে যা)।

প্র : ঔৎকর্ষতা বানান ভুল কেন?

উ : ঔৎকর্ষ বিশেষ্য পদের সঙ্গে তা প্রত্যয়যুক্ত হয় না। ঔৎকর্ষ লিখতে হবে অথবা উৎকৃষ্টতা।

প্র : অভ্যন্তরীণ/আভ্যন্তরীণ কোন বানান শুদ্ধ?

উ : দুটো শুদ্ধ। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের বাঙ্গালা ভাষার অভিধানে বলা হয়েছে, অভ্যন্তরে বিদ্যমান অর্থে অভ্যন্তরীণ এবং অভ্যন্তর থেকে উৎপন্ন বা জাত অর্থে আভ্যন্তরীণ সঠিক।

প্র : সর্বজনীন/সার্বজনীন কোন বানান শুদ্ধ?

উ : দুটোই শুদ্ধ। সবার জন্য অনুষ্ঠিত বা মঙ্গলকর অর্থে সর্বজনীন এবং সকলের যোগ্য অর্থে সার্বজনীন শব্দ ব্যবহার হয়।

প্র : নিরোগ না নীরোগ কোনটি শুদ্ধ?

উ : নীরোগ শুদ্ধ (নিঃ+রোগ = নীরোগ)।

প্র : বিসর্গ সন্ধিযুক্ত কয়েকটি শব্দের বানান নির্দেশ কর।

উ : শিরঃপীড়া (মাথা ব্যথা) কিন্তু মনঃকষ্ট কিন্তু মনোযোগ। মনোযোগ।

প্র : পরপর দুটি উ-কার ব্যবহার হয় এমন কয়েকটি শব্দ লিখ।

উ : সমীচীন, উদীচী (উত্তর দিক), প্রতীচী (পশ্চিম দিক)।

প্র : মুহ্যমান শব্দটি প্রচলিত কিন্তু কি শুদ্ধরূপ কী?

উ : মোহ্যমান।

প্র : মুহুর্ত এবং তৎক্ষণ বানান দুটির শুদ্ধরূপ কী?

উ : মুহূর্ত এবং তৎক্ষণ।

প্র : ভূত, উদ্ভূত, অদ্ভূত ইত্যাদি বানান শুদ্ধ কি না?

উ : একটি সরল কথা মনে রাখলেই এ ধরনের বানান শুদ্ধ রাখা যায়। কথাটি হলো যতো রকমের ভূত আছে (যেমন : ভূত ভূতপূর্ব, অভূতপূর্ব, উদ্ভূত, সম্ভূত, প্রভূত, আবির্ভূত ইত্যাদি) সর্বত্র ভূত বানানে দীর্ঘ ঊ-কার হবে। ব্যতিক্রম : অদ্ভুত ও ভুতুড়ে। এ বানান দুটোই অদ্ভুত, তাই না কি!

প্র : মুহূর্ত বানানটি শুদ্ধ রূপ কোনটি?

উ : মুহূর্ত। 'হূ' রূপটি হ + ঊ বোঝায়। তাই মুহূর্ত লিখলে বানানটি ভুল হবে।

প্র : জোৎস্না বানানটির ভুল কোথায়?

উ : ৎ-ফলা ব্যবহারে। এর শুদ্ধরূপ : জ্যোৎস্না।

প্র : পুরুষ ও পরুষ শব্দ দুটোর মধ্যে পার্থক্য কী?

উ : পুরুষ হলো নর; পরুষ অর্থ কর্কশ। যেমন: কোনো কোনো পুরুষ পরুষ কণ্ঠে চিৎকার করে সারাদিন কথা বলে।

প্র : স্বাধীনতাত্তোর ও মুক্তিযুদ্ধোত্তর–বানান গুলো শুদ্ধ কী?

উ : স্বাধীনতাত্তোর ভুল, শুদ্ধ হবে স্বাধীনতা-উত্তর। মুক্তিযুদ্ধোত্তর শুদ্ধ।

প্র : প্রায় শতাধিক বা প্রায় সহস্রাধিক শুদ্ধ কি-না?

উ : ভুল। 'প্রায়' অনুমান নির্ভরতা বোঝায়, অধিকও অনুমাননির্ভর। দুটো অনুমাননির্ভর শব্দ ব্যবহার অনুচিত। হবে

'প্রায় একশত' বা শতাধিক'; অনুরূপ প্রায় এক হাজার বা সহস্রাধিক'।

প্র : প্রতিযোগিতা এবং প্রতিযোগিতামূলক শব্দ দুটোর অর্থ কী?

উ : দুটো শব্দের অর্থই প্রতিযোগিতা।

প্র : স্বাস্থ্যশাসন কি শুদ্ধ বানান?

উ : ভুল। আয়ত অর্থ অধিকার বা সকল। অত এব, স্ব+আয়ত্ত = স্বায়ত্ত+শাসন =স্বায়ত্তশাসন শুদ্ধ বানান। অনুরূপ, কর + আয়ত্ত = করায়ত্ত, বশ + আয়ত্ত = বশীভূত ইত্যাদি।

প্র : চন্দ্রিমা শব্দটি কি শুদ্ধ?

উ : চন্দ্রিমা ব্যাকরণগত দিক থেকে ভুল। সংস্কৃত চন্দ্রমায় এবং চন্দ্রিকা শব্দ দুটির মিশ্রণে চন্দ্রিমা শব্দের সৃষ্টি। চন্দ্রিমা অর্থ জোৎস্না বোঝান হয়।

প্র : বনজ এবং ফলজ বৃক্ষ শব্দ দুটোর প্রয়োগ কি ঠিক?

উ : যদি বলা হয় : 'বনজ বৃক্ষ' এবং 'ফলজ বৃক্ষ' তাহলে বোঝায়, বনে জন্মে যে গাছ এবং ফলে জন্মে যে গাছ। 'জ' এখানে জাত বা জন্য অর্থে ব্যবহৃত। ফল প্রদানকারী গাছ বোঝাতে 'ফলজ বৃক্ষ' ব্যবহার ঠিক নয়। সেক্ষেত্রে লিখতে হবে : 'ফলদ বৃক্ষ।' যেমন : বৃক্ষমেলা উদ্বোধনের সময় প্রধানমন্ত্রী নিজ হাতে একটি করে বনজ ও ফলদ গাছের চারা রোপণ করেন।

প্র : পরিসেবা নাকি পরিষেবা– কোনটি ঠিক?

উ : 'সেবা' বানান ঠিক হলেও 'পরিষেবা'ই শুদ্ধ বানান, 'পরিসেবা' নয়।

প্র : 'প্রাতরাশ' বানানটি শুদ্ধ কিনা?

উ : ভুল। সংস্কৃত 'প্রাত' অর্থ প্রভাত এবং 'আশ' অর্থ 'খাদ্য'। সন্ধিতে প্রাত+আশ মিলে 'প্রাতরাশ' হয়। 'প্রাতরাশ' বানানে বিসর্গ নেই। আবার সন্ধির সময় মনে রাখতে হবে, শব্দটি 'আশ' (খাদ্য) 'বাশ' নয়।

প্র : কতিপয় উল্লেখযোগ্য অশুদ্ধ > শুদ্ধ চিহ্নিত কর।

উ :

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পিপিলিকা	পিপীলিকা
বুদ্ধিজীবি	বুদ্ধিজীবী
বিদ্রুপ	বিদ্রূপ
প্রাঙ্গন	প্রাঙ্গণ
সামর্থ	সামর্থ্য
বিদ্যান	বিদ্বান
ত্রাহস্পর্শ	ত্রাহস্পর্শ

Scanned with CamScanner

প্রতীচি	প্রতীচী
উচ্ছ্বাস	উচ্ছ্বাস
সমিচীন	সমীচীন
জীণজির্ী	জীর্ণজীর্ী
নিহারিকা	নীহারিকা
উজ্জ্বল্য	ঔজ্জ্বল্য
যান্ত্রাসিক	যান্ত্রাসিক
মুহূর্ত	মুহূর্ত
শরিরী	শরীরী
মৃয়মান	ম্রিয়মাণ
শান্তনা	সান্ত্বনা
জৈষ্ট্য	জ্যৈষ্ঠ
উপন্যাসিক	ঔপন্যাসিক
ঐক্যতান	ঐকতান
ইদানিংকাল	ইদানীং
উদাসীন্য	ঔদাসীন্য
সৌজন্যতা	সৌজন্য
সম্ভব	সম্ভবপর
ভৌগলিক	ভৌগোলিক
রজ্জকিনী	রজকী
পৌরহিত্ব	পৌরহিত্য
নিরীশ্ব	নিরীশ
দ্ব্যার্থ	দ্ব্যর্থ
গন্ডুস	গণ্ডূষ
নিশীত	নিশীথ
যক্ষা	যক্ষ্মা
শুশ্রুষা	শুশ্রূষা
সখ্যতা	সখ্য/সখিত্ব
দৌরাত্ম্য	দৌরাত্ম্য
বাহুল্যতা	বাহুল্য।

প্র : বাংলা ভাষায় ব্যবহারের সময় প্রায়শ ভুল হয় এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দ উল্লেখ কর।

উ : বাংলা ভাষায় এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলো লেখার সময় অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও ভুল করেন। সেগুলোর শুদ্ধ বানান নিচে উল্লেখ করা হলো :

অগ্ন্যাশয়	উচ্চৈঃস্বর
অগ্ন্যুৎপাত	উচ্ছ্বাস
অচিন্ত্য	উজ্জ্বল
অধ্যাত্ম	উদ্ভাক্ত
অনিন্দ্য	উদ্ভিজ্জ
অনূর্ধ্ব	এতদ্ব্যতীত
অন্তঃসত্ত্বা	ঔজ্জ্বল্য
অন্তর্জ্বালা	ঔদ্ধত্য
অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া	কাঙ্ক্ষিত
অমর্ত্য	কৃচ্ছ্র
অলঙ্ঘ্য	কুলিবৃত্তি

গার্হস্থ্য	বিদ্যুতিদ্বৃণ
ঘূর্ণ্যমান	বৈচিত্র্য
জলোচ্ছ্বাস	বৈদগ্ধ্য
জাজ্বল্যমান	বাত্যয়
জ্বলজ্বল	ব্যপদেশ
জ্যোতিষী	ব্যবচ্ছেদ
জ্যোতিষ্ক	ব্যবধান
টীকাটিপ্পনি	ব্যুৎপত্তি
তদ্ভবতীত	ব্যূহ
তীক্ষ্ণ	ব্রাহ্মণ
তুচ্ছীভাব	ভৌগোলিক
তৃরণ	ভ্রাতৃত্ব
তুরান্বিত	মধুসূদন
তুরিত	মনন্তত্ত্ব
ত্যাক্ত	মন্বন্তর
দয়র্দ্র	মর্ত্য
দুরাকাঙ্ক্ষা	মহত্ত্ব
দুর্নিরীক্ষা	মাহাত্ম্য
দৌরাত্ম্য	যশস্বী
দ্বেষ	যাচঞা
দ্বৈত	যাথার্থ্য
দ্ব্যর্থ	লক্ষণ
দ্যূতক্রীড়া	লক্ষ্মী
ধ্বজা	লক্ষ্য
ধ্বন্যাত্মক	শাশ্বত
নঅর্থক	শিরশ্ছেদ
নির্দ্বন্দ্ব	শ্বশুর
নির্দ্বিধা	শ্বশূ
নীরব	শ্বাপদ
নৈর্ঋত	শ্মশান
ন্যুজ	শ্মশ্রু
ন্যূন	শ্রীমতী
পঙ্‌ক্তি	শ্যেন
পক্ষ	শ্লেষ্মা
পরাঙ্মুখ	সংবর্ধনা
পরিস্রাবণ	সন্ধ্যা
প্রত্যুষ	সন্ন্যাস
প্রাতঃকৃত্য	সন্ন্যাসী
প্রাতর্ভ্রমণ	সরস্বতী
পৌরোহিত্য	সাত্ত্বিক
বক্ষ্যমাণ	সান্ত্বনা
বন্দ্যোপাধ্যায়	সৌহার্দ্য
বন্ধ্যা	স্বতঃস্ফূর্ত
বয়োজ্যেষ্ঠ	স্বাচ্ছন্দ্য
বর্ত্ম	স্বাতন্ত্র্য
বাল্মীকি	স্বায়ত্তশাসন
বিদ্বজ্জন	হীনম্মন্যতা।
বিভীষিকা	

প্র : 'বুদ্ধিজীবি' বানানটি শুদ্ধ কি?

উ : 'বুদ্ধিজীবি' ভুল বানান। এর শুদ্ধরূপ 'বুদ্ধিজীবী'। মনে রাখতে হবে : 'জীবিকা' বানানে একটি ঈ-কার এবং একটি ই-কার। কিন্তু 'জীবী' বানানে দুটোই ঈ-কার। যে-কোনো 'জীবী' লিখতে দুটো ঈ-কার প্রয়োগ করতে হবে। যেমন : আইনজীবী, কৃষিজীবী, শ্রমজীবী, পেশাজীবী ইত্যাদি।

প্র : 'বিবিধপ্রকার' শব্দটি শুদ্ধ কি-না?

উ : ভুল। এর শুদ্ধরূপ 'বিবিধ'। বিবিধ অর্থই বহু প্রকার। বিবিধ-এরপর তাই 'প্রকার' ব্যবহারের প্রয়োজন নেই।

প্র : 'দারিদ্র্য' বানানে য-ফলা থাকবে কি-না?

উ : পদ হিসেবে বিশেষণ 'দরিদ্র'-এর বিশেষ্যরূপ 'দারিদ্র্য'। এই বানানে য-ফলা দিতেই হবে। তবে দারিদ্র্য এবং দরিদ্রতা একই অর্থ বহন করে। 'দরিদ্রতা' লিখতে য-ফলা লাগে না। অনেকে 'দারিদ্র্যতা' লেখেন। সেটা ভুল।

প্র : 'জ্যেষ্ঠ' বানানটি কি ভুল?

উ : ভুল। 'বড়' অর্থে 'জ্যেষ্ঠ' বানান হবে। মাসের নাম হবে 'জ্যৈষ্ঠ'। যেমন : 'জ্যৈষ্ঠ মাসে জ্যৈষ্ঠ সন্তানের জন্ম হলো।'

প্র : পার্সি না ফার্সি কোন বানান ঠিক?

উ : আজকের ইরানের আগে এটি। ইরানের নাম ছিল পারস্য। পারস্যের ভাষা পার্সি। সে দেশের ভাষায় 'প'-এর যথাযথ উচ্চারণ না থাকায় 'পার্সি' হয়ে যায় 'ফার্সি'। কিন্তু বাংলায় 'প'-এর উচ্চারণ আছে। তাই পার্সি-ই ঠিক। তবে বহুল প্রচলিত ফার্সি বা বানানভেদে ফার্সি।

প্র : 'মার্কিন' শব্দটি 'আমেরিকা' অর্থে কিভাবে হয়েছে?

উ : 'আমেরিকান' কথাটির দ্বিতীয় অপভ্রংশে হলো 'মার্কিন'। ধ্বনিলোপের মাধ্যমে আমেরিকান > মারকিন > মার্কিন হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে আমেরিকা থেকে সাদা মোটা কাপড় আসতো বলে ক্যানভাস বা মোটা সাদা কাপড়কে মার্কিন কাপড়ও বলা হয়। দ্বিতীয় থেকে শব্দটি বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে।

2020/5/9

Scanned with CamScanner

বাংলা-বিদ্যার
মৌলিকজ্ঞান
কোষগ্রন্থ

বাংলা
ভাষা ও সাহিত্য
জিজ্ঞাসা

Scanned with CamScanner

প্র : পদ কাকে বলে?

উ : বিভক্তিযুক্ত শব্দকে পদ বলে।

প্র : বাক্যে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দকে পদ বলে কেন?

উ : বাক্যে ব্যবহার হওয়ামাত্র শব্দসমূহে বিভক্তিযুক্ত হয়। যে শব্দে বিভক্তি দেখা যায় না, সেই শব্দে শূন্য বিভক্তি থাকে। তাই বাক্যের প্রতিটি শব্দই পদ।

প্র : পদ প্রধানত কত প্রকার?

উ : দুই প্রকার। নামপদ ও ক্রিয়াপদ।

প্র : নামপদ কাকে বলে?

উ : বাক্যে ক্রিয়াপদ ভিন্ন সব পদই (যেমন: বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয়) নামপদ।

প্র : ক্রিয়াপদকে বাক্যের আবশ্যিক পদ বলা হয় কেন?

উ : বাংলা ব্যাকরণের নিয়মানুসারে ক্রিয়াপদ ভিন্ন কোনো বাংলা বাক্য গঠিত হয় না। প্রকাশ্য না থাকলেও উহ্য অবস্থায় ক্রিয়াপদ বাক্যে থাকে বলে একে আবশ্যিক পদ বলে। যেমন : রাম ও রহিম বন্ধু। এখানে 'হয়' উহ্য।

প্র : বিশেষ্য কাকে বলে, কত প্রকার?

উ : যে পদে কোনো কিছুর নাম বোঝায়। ভাষাবিজ্ঞানী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, বিশেষ্য পাঁচ, ব্যাকরণবিদ জগদীশচন্দ্র ঘোষের মতে সাত কিন্তু সাধারণত ছয় প্রকার বিশেষ্যের কথা জানা যায়।

প্র : বিভিন্ন প্রকারের বিশেষ্যের উদাহরণ দাও।

উ : **নাম বা সংজ্ঞার্থবাচক** > অমর, ইমরুল, পদ্মা, বুড়িগঙ্গা ইত্যাদি।

বস্তুবাচক > লেখনী, কাগজ, চাল, চিনি ইত্যাদি।

ভাববাচক (বিশেষ্যের মনোগত বা অবস্থাগত ভাব প্রকাশক) > গমন, আনন্দ, সুখ, শয়ন, দুঃখ, উন্মাদনা, তৃপ্তি, অস্থিরতা ইত্যাদি।

জাতিবাচক > মানুষ, পশু, বাঙালি, জার্মান, ইংরেজ ইত্যাদি।

সমষ্টিবাচক > ঝাঁক, গোষ্ঠী, শ্রেণি, সংঘ, জনতা, সমিতি, দল ইত্যাদি।

গুণবাচক (বিশেষ্যপদে গুণ, দোষ, ধর্ম ইত্যাদির ভাব বা নাম বোঝায়) > তারুণ্য, সৌন্দর্য, মনুষ্যত্ব, ভীরুতা, ক্ষমা, সাহস, সৌরভ ইত্যাদি।

প্র : বিশেষণ কাকে বলে?

উ : বাক্যস্থিত কোনো পদের গুণ, পরিমাণ, অবস্থা, সংখ্যা, ধর্ম ইত্যাদি বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত পদকে।

প্র : বিশেষণ প্রধানত কত প্রকার?

উ : দুই প্রকার। নাম বিশেষণ ও ভাব বিশেষণ।

প্র : নাম বিশেষণ কাকে বলে?

উ : বাক্যে বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের বিশেষণকে।

প্র : ভাব বিশেষণ কাকে বলে?

উ : বাক্যে বিশেষণ, অব্যয় ও ক্রিয়া বিশেষণকে।

প্র : বিশেষণের বিশেষণ কাকে বলে?

উ : বাক্যের বিশেষণ পদকে বিশেষায়িত করে যে বিশেষণ। যেমন : খুব মিষ্টি দই। এখানে 'খুব' বিশেষণের বিশেষণ।

প্র : ক্রিয়া-বিশেষণ কাকে বলে?

উ : যে পদে বাক্যের ক্রিয়াপদের গুণ, প্রকৃতি, তীব্রতা ইত্যাদি চিহ্নিত করে। যেমন : গুনগুনিয়ে > ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে; হনহনিয়ে > আসছে কারা হনহনিয়ে; সহাস্যে > তিনি সহাস্যে সব খবর দিলেন; ধীরে > বায়ু ধীরে বয় ইত্যাদি।

প্র : অব্যয়-বিশেষণ কাকে বলে?

উ : যে পদে বাক্যে অব্যয় পদকে বিশেষায়িত করা হয়। অব্যয় পদের বিশেষণ সাধারণত কম দেখা যায়। যেমন।

১. 'তুমি তো প্রায় পাগলের মতো দৌড়াচ্ছ।' এই বাক্যে 'মতো' পদাশ্রয়ী অব্যয়। 'প্রায়' অব্যয় বিশেষণ। কারণ, 'প্রায়' দিয়ে 'কতটুক মতো' তা প্রকাশ করা হয়েছে।

২. 'ঠিক যেন তোর মতো, তোর নামে নাম।' এই বাক্যে 'যেন' সমুচ্চয়ী অব্যয়। 'ঠিক' অব্যয় বিশেষণ। 'ঠিক' দিয়ে 'কতটুকু যেন' তা বোঝানো হয়েছে।

৩. 'শত ধিক্! জন্মভূমি রক্ষা হেতু কে ডরে মরিতে?' এখানে অনন্বয়ী অব্যয় 'ধিক্'। 'শত' অব্যয় বিশেষণ।

প্র : বাক্যের বিশেষণ বলে কিছু আছে কি?

উ : বাক্যের বিশেষণ বলে একটি ধারণা আছে। বিশেষণ শুধু পদকে পৃথকভাবে বিশেষায়িত করে না, অনেক সময় পুরো বাক্যকেও বিশেষায়িত করে এবং তখন তাকে বাক্যের বিশেষণ বলে। যেমন :

ঘটনাচক্রে তারা চোর সন্দেহে জেলে গেছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে দেশে অপশক্তির উত্থান ঘটেছে।

বাস্তবিকই তোমাদের সামনে দেশরক্ষার কঠিন সংগ্রাম উপস্থিত।

প্র : বিশেষণের অতিশায়ন কাকে বলে।

উ : বিশেষণ পদ যখন একের চেয়ে অন্যের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝিয়ে থাকে, তখন তাকে বিশেষণের অতিশায়ন বলে। যেমন: (১) কাঞ্চন ক্লাসের সবচেয়ে ভাল ছেলে। এখানে 'চেয়ে' বিশেষণকে অতিশায়ন করে 'সবচেয়ে' করা হয়েছে। (২) পিতামহ পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সুস্থ। এখানে 'অধিক' বিশেষণ এবং 'অধিকতর' বিশেষণের অতিশায়ন।

প্র : সর্বনাম কাকে বলে?

উ : বিশেষ্যের পরিবর্তে বাক্যে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন : সে, তারা, তুমি ইত্যাদি।

প্র : সর্বনামের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে লেখ।

উ : বিভিন্ন প্রকারের সর্বনাম দেখা যায়। তবে এগুলোর মধ্যে দৃষ্টান্ত স্থানীয় :

১. ব্যক্তি বা পুরুষবাচক : আমি, তুমি, সে ইত্যাদি।
২. আত্মবাচক : স্বয়ং, খোদ, আপনি (নিজ) ইত্যাদি।
৩. সামীপ্যবাচক : এ, এই, এরা ইত্যাদি।
৪. দূরত্ববাচক : ওই, ওইসব, ওইগুলো ইত্যাদি।
৫. সাকুল্যবাচক : সব, সমুদয়, তাবৎ ইত্যাদি।
৬. প্রশ্নবাচক : কী, কে, কার ইত্যাদি।
৭. অনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক : কোন, কেউ, কেহ ইত্যাদি।
৮. ব্যতিহারিক : আপনা-আপনি, নিজে-নিজে ইত্যাদি।
৯. সংযোগজ্ঞাপক : যে, যিনি, যারা ইত্যাদি।
১০. অন্যাদিবাচক : অন্য, অপর, পর ইত্যাদি।

প্র : সর্বনামে সম্ভ্রমার্থে বিশেষ কী ব্যবহার হয়?

উ : চন্দ্রবিন্দু। যেমন : খুবলাল মালি তার পরিশ্রম অনুপাতে অর্থ উপার্জন করতে পারত না। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কারে প্রাপ্ত তাঁর কিছু টাকা বিশ্বভারতীকে দান করেন।

প্র : সব্যয় ও অব্যয় শব্দ কাকে বলে?

উ : কতগুলি শব্দ আছে, যেগুলির লিঙ্গ, বচন বা বিভক্তিযোগে কোনোরূপ ব্যয় বা পরিবর্তন হয় না। এগুলিকে বলে অব্যয় পদ। যথা : বাঃ, মরি মরি, টপ টপ, যেন, ওহে, তথা, যথা ইত্যাদি। এ ধরনের শব্দ ছাড়া সব শব্দই সব্যয়।

প্র : অব্যয় পদ কাকে বলে?

উ : যে পদ বাক্যে ব্যবহার হয় কিন্তু কোনো বিভক্তি বা প্রত্যয় দিয়ে সংযুক্ত হয় না, একই রকম থাকে।

Scanned with CamScanner

প্র : অব্যয় কত প্রকার ও কী কী?

উ : চার প্রকার। সমুচ্চয়ী বা সম্বন্ধবাচক, অনন্বয়ী, অনুসর্গ, অনুকার অব্যয়।

প্র : সমুচ্চয়ী বা সম্বন্ধবাচক অব্যয় কাকে বলে?

উ : যে অব্যয় বাক্যে অন্যপদগুলোকে সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন ঘটায়। এখানে সাধারণত একই ধরনের পদে বা বাক্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যেমন : সংযোজক সমুচ্চয়ী অব্যয় > সিদ্ধার্থ ও আলি দুই বন্ধু। বিয়োজক সমুচ্চয়ী অব্যয় > সুরুজ অথবা শেফালি আজ রান্না করবে। সংকোচক সমুচ্চয়ী অব্যয় > সাগর অল্প পড়ে, বলেও কম কিন্তু খুব মেধাবী।

প্র : পদান্বয়ী অব্যয় কাকে বলে?

উ : যে অব্যয় বাক্যের দুটি পদের মধ্যে অন্বয় বা সম্বন্ধ নিরূপণ করে। এসব ক্ষেত্রে এক প্রকার কারকবাচকতা দেখা যায়। যেমন : সুখের জন্য এ ঘর বেঁধেছি; তোমাকে দিয়ে এ কাজ হবে; পাগলের মতো কী বকছ?

প্র : অনুসর্গ অব্যয় কাকে বলে?

উ : পদান্বয়ী অব্যয়কেই অনুসর্গ অব্যয় বলে।

প্র : অনন্বয়ী অব্যয় কাকে বলে?

উ : যে অব্যয় বাক্যের অন্যপদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। সাধারণ বাক্যের বিস্ময়াত্মক শব্দরাজি এর অন্তর্গত। যেমন : আহা, আজি এ বসন্তে কত ফুল ফোটে; হ্যাঁ, আমার যাওয়া উচিত; বাহ, কি সুন্দর সকাল!

প্র : অনুকার অব্যয় কাকে বলে?

উ : বাংলায় যে ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলো বাক্যে অব্যয় হিসেবে ব্যবহার হয় তাকে অনুকার অব্যয় বলে। এগুলোকে ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ও বলে। যেমন : খাঁ খাঁ (শূন্যতা অর্থে) > বাড়িটি খাঁ খাঁ করছে। এরূপ :

কোকিলের রব > কুহু কুহু;
ঘোড়ার ডাক > চিহিঁ চিহিঁ;
নূপুরে নৃত্যধ্বনি > রুমঝুম;
স্রোতের ধ্বনি > কলকল;
মানুষের কান্না > ভেউ ভেউ ইত্যাদি।

প্র : ক্রিয়াপদ কাকে বলে?

উ : বাক্যে যে পদে কোনো কিছু করা, ঘটা, হওয়া অর্থাৎ কোনো কার্য সম্পাদন বোঝায়। যথা : আমি পড়ি।

প্র : অনুক্ত ক্রিয়া কাকে বলে?

উ : বাংলা ব্যাকরণ অনুসারে বাক্য গঠনে ক্রিয়াপদ থাকতে হয়। এ কারণে ক্রিয়া পদকে আবশ্যিক পদও বলে। কিন্তু যখন বাক্যে ক্রিয়াপদ প্রকাশ্যে থাকে না, তখন তাকে অনুক্ত ক্রিয়া বলে। যথা : তোমার শরীর কেমন? (অনুক্ত ক্রিয়া > আছে)

প্র : ভাবপ্রকাশের দিক থেকে ক্রিয়া কত ভাগে বিভক্ত?

উ : দুই ভাগে।
১. সমাপিকা ক্রিয়া,
২. অসমাপিকা ক্রিয়া।

প্র : সমাপিকা ক্রিয়া কাকে বলে?

উ : যে ক্রিয়া প্রয়োগ করলে বাক্যের কথা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হয়, অন্য ক্রিয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে না।
যেমন : আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাব।

প্র : অসমাপিকা ক্রিয়া কাকে বলে?

উ : যে ক্রিয়া প্রয়োগ করলে বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত হয় না, বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকে তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে।
যেমন : তুমি ভাত খেয়ে ...।

প্র : অর্থভেদে সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া কয়ভাগে বিভক্ত?

উ : দুইভাগে।
১. সকর্মক, ২. অকর্মক।

প্র : সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়া কাকে বলে?

উ : যে ক্রিয়ার কর্মপদ আছে তাকে সকর্মক, যে ক্রিয়ার কর্মপদ নেই তাকে অকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন : সকর্মক ক্রিয়া > সে বই পড়ে। অকর্মক ক্রিয়া > আমি যাচ্ছি।

প্র : দ্বিকর্মক ক্রিয়া কাকে বলে?

উ : কতিপয় ক্রিয়ার দুটি কর্ম থাকে। এর বস্তুবাচক কর্মকে **মুখ্যকর্ম**, ব্যক্তিবাচক কর্মকে **গৌণকর্ম** বলে। দুটি কর্মই ব্যক্তিবাচক বা বস্তুবাচক হলে ক্রিয়া দ্বিকর্মক হবে না। যেমন : স্বপনকে সংবাদ দাও। এখানে স্বপনকে গৌণ ও সংবাদ মুখ্য কর্ম। এরূপ, কাজল তোমাকে একটি গল্প বলেছে।/ শিবম চমৎকার ছবি আঁকে।/ অধ্যক্ষ মহোদয় আমাকে ছুটি দিয়েছেন।

প্র : দুটি কর্মই ব্যক্তিবাচক বা বস্তুবাচক হলে ক্রিয়া কি দ্বিকর্মক হবে?

উ : না। যেমন : মা ছেলে ও মেয়েকে আদর করছেন। অথবা মালি গোলাপ ও জবা ফুল তুলছে। এই বাক্য দুটোতে করছেন ও তুলছে ক্রিয়া দুটো দ্বিকর্মক নয়। আসলে এখানে দুটো করে বাক্য। যেমন : মা ছেলেকে আদর করছেন। মা মেয়েকে আদর করছেন। তেমনি, মালি গোলাপ ফুল তুলছে। মালি জবা ফুল তুলছে।

প্র : সমধাতুজ কর্ম কাকে বলে?

উ : বাক্যের ক্রিয়া ও কর্মপদ একই ধাতু থেকে গঠিত হলে ওই কর্মপদকে সমধাতুজ কর্ম বা ধাতুর্থক কর্মপদ বলে। যেমন :

প্রলয় নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে।
—রবীন্দ্রনাথ

এমন খেলা সে খেলেছে!

প্র : প্রযোজক ক্রিয়া কাকে বলে?

উ : যে ক্রিয়ায় অন্যকে দিয়ে করানো বা সংঘটন বোঝায়। সংস্কৃতে একে **নিজন্ত ক্রিয়া** বলে। যেমন : মা শিশুকে পড়াচ্ছেন। সে ঝাড়ুদার দিয়ে মাঠ পরিষ্কার করাবে।

প্র : জাদুকর জাদু দেখায়।—এই বাক্যের প্রযোজক পদ বিশ্লেষণ কর।

উ : প্রযোজক কর্তা জাদুকর/ প্রযোজ্য কর্তা জাদু/ প্রযোজক ক্রিয়া দেখায়।

Scanned with CamScanner

পদ এবং Parts of Speech : সম্পর্ক

বাংলা ব্যাকরণের পদ প্রকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা থাকলে ইংরেজি Parts of Speech-এ তা কাজে লাগান যায়। বাংলার বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয়, ক্রিয়া এবং ইংরেজির Noun, Pronoun, Adjective, Verb, Adverb, Preposition, Conjunction, Interjection-কে সমন্বিত করে নিচে পদ ও Parts of Speech-এর সম্পর্ক উল্লেখ করা হলো :

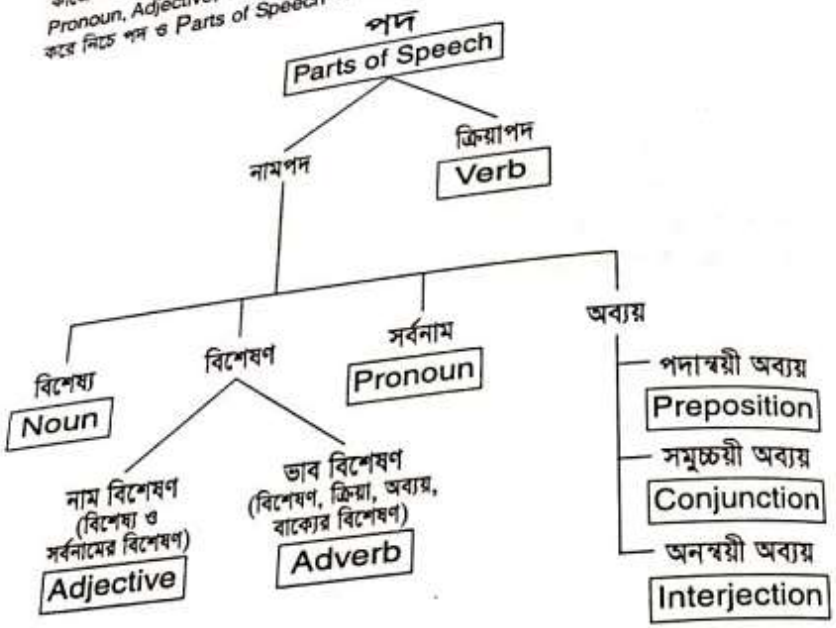

১. বিশেষ্য > Noun
২. বিশেষণ > Adjective – বিশেষ্য ও সর্বনামের বিশেষণ
Adverb – বিশেষণ, অব্যয়, ক্রিয়া ও বাক্যের বিশেষণ
৩. সর্বনাম > Pronoun
৪. অব্যয় > Conjunction – সমুচ্চয়ী
Preposition – পদান্বয়ী
Interjection – অনন্বয়ী
৫. ক্রিয়া > Verb

বি. দ্র. Parts of Speech-এ বাংলার অনুকার অব্যয় অন্তর্ভুক্ত নয়।

অতএব, বাংলায় পদ ৫ প্রকার এবং ইংরেজিতে Parts of Speech ৮ প্রকার হলেও আসলে এ দুয়ের মধ্যে নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে। এগুলো সূত্রবদ্ধ করলে দাঁড়ায় —

বিশেষ্য
NOUN

বাক্যে ব্যবহার হয়ে যে Word দিয়ে সাধারণত কোনো কিছুর নাম বোঝায়। তাকে Noun বা বিশেষ্য বলে। বিভিন্ন রকমের বিশেষ্য হতে পারে। বাংলার সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে দেখা যায়:

১. নাম বা সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য (Proper Noun) : Swapan, Alisha, Kajal, Sunday, January, Dhaka etc.
২. বস্তুবাচক বিশেষ্য (Material Noun) : Chair, Table, Wood, Sugar, Ball, Pen, Book, Cap, Rice, Jute, Paddy, Tea etc.
৩. সমষ্টিবাচক বিশেষ্য (Collective Noun) : Army, Team, Gang, Flock (পশু বা পাখির সমষ্টি) etc.
৪. জাতিবাচক বিশেষ্য (Common Noun) : Poet, Doctor, Novel, Flower, Fish, Man, Mother, Teacher, Young, King, Begger, Agent etc.
৫. গুণবাচক বিশেষ্য (Abstract Noun (From Adjective & Common Noun)):
Adjective থেকে > Kindness, Honesty, Poverty, Pride, Wisdom, Darkness, Lenght, Justice etc.
Common Noun থেকে > Childhood, Kingship, Heroism, Youth, Motherhood, Friendship, Beggary etc.
৬. ভাববাচক বিশেষ্য (Abstract Noun (From Verb)) :
Action (Act থেকে)
Choice (Choose থেকে)
Belief (Believe থেকে)
Growth (Grow থেকে)
Knowledge (Know থেকে) etc.

সর্বনাম
PRONOUN

Noun-এর পরিবর্তে যে সব শব্দ ব্যবহার করা হয়, সেগুলোকে Pronoun বা সর্বনাম বলা হয়। যেমন :

আমি	: I (আই)
আমাকে	: Me (মি)
আমার	: Mine (মাইন)
আমরা	: We (ই্উ)
আমাদের	: Our (আওয়ার)
আমাদেরকে	: Us (আস)
আমাদের	: Ours (আওয়ারস)
ইহা, এটা	: It (ইট)
এই	: This (দিস)
এটা	: Its (ইটস)
এগুলো	: These (দিজ)
ঐগুলো	: Those (দৌজ)
ওই	: That (দ্যাট)
কি	: What (হোয়াট)
কার, কাহার	: Whose (হুজ)
কাকে	: Whom (হোম)
কে, কারা	: Who (হু)
কোনটি	: Which (হুইচ)
তুমি	: You (ইউ)
তোমার	: Your (ইউর)
তার/তাহার (পুং)	: His (হিজ)
তাকে/তাহাকে	: Him (হিম)
তার/তাহার (স্ত্রী)	: Her (হার)
তোমাদের	: Your (ইউর)
তারা	: They (দে)
তাদেরকে	: Them (দেম)
তাদের	: Their (দেয়ার)
তোমরা	: You (ইউ)
সে (পুং)	: He (হি)
সে (স্ত্রী)	: She (শি)

নাম-বিশেষণ
ADJECTIVE

যে Word কোনো Noun বা Pronoun-এর অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ, দোষগুণ, আকৃতি-প্রকৃতি ইত্যাদি বোঝায় তাকে Adjective বা নাম বিশেষণ বলে। যেমন :

অনেক	: Many (ম্যানি)
অলস	: Lazy (লেজি)
অন্ধ	: Blind (ব্লাইন্ড)
উঁচু	: High (হাই)
উজ্জ্বল	: Bright (ব্রাইট)
কুৎসিত	: Ugly (আগলি)
কাল	: Black (ব্লাক)
খোড়া	: Lame (লেইম)
গরম	: Hot (হট)

Scanned with CamScanner

গোলাকার	: Round (রাউন্ড)
জ্ঞানী	: Wise (ওয়াইজ)
তরুণ	: Young (ইয়ং)
তিন	: Three (থ্রি)
দুই	: Two (টু)
দ্রুত	: Rapid (র‍্যাপিড)
দুর্বল	: Weak (উইক)
দয়ালু	: Kind (কাইন্ড)
ধনী	: Rich (রিচ)
ধারাল	: Sharp (শার্প)
নতুন	: New (নিউ)
নোংরা	: Dirty (ডার্টি)
নরম	: Soft (সফট)
ঠান্ডা	: Cold (কোল্ড)
পীড়িত	: Sick (সিক)
পরিষ্কার	: Clean (ক্লিন)
পুরাতন	: Old (ওল্ড)
পূর্ণ	: Full (ফুল)
পাতলা	: Thin (থিন)
পাকা	: Ripe (রাইপ)
প্রশস্ত	: Wide (ওয়াইড)
বৃহৎ	: Large (লার্জ)
বিখ্যাত	: Famous (ফেমাস)
ভালো	: Good (গুড)
মন্দ	: Bad (ব্যাড)
লম্বা	: Long (লং)
শক্ত	: Hard (হার্ড)
সুন্দর	: Fair (ফেয়ার)
সহজ	: Easy (ইজি)
সৎ	: Honest (অনেস্ট)
সুন্দর	: Nice (নাইস)
হলদে	: Yellow (ইয়েলো)

ভাব-বিশেষণ
ADVERB

যে সব Word Verb, Adjective, Preposition, Conjuction, Interjuction-এর ধরন, রকম বা প্রকৃতি প্রকাশ করে তাদেরকে Adverb বা ভাব বিশেষণ বলা হয়। যেমন :

অবশ্য	: Must (মাস্ট)
অধিক	: More (মোর)
অধিক	: Much (মাচ)
আজ	: Today (টুডে)
আগে	: Before (বিফোর)
ইতোমধ্যে	: Already (অলরেডি)
এখন	: Now (নাউ)
এখানে	: Here (হিয়ার)
উপরে	: Up (আপ)
উপরে	: Above (অ্যাবাভ)
ও, অতি	: Too (টু)
কখন, যখন	: When (হোয়েন)
কেন	: Why (হোয়াই)
কিরূপে	: How (হাউ)
কম	: Less (লেছ)
কঠোর	: Hard (হার্ড)
খুব	: Very (ভেরি)
গভীরভাবে	: Deeply (ডিপলি)
ছোট	: Little (লিটল)
জন্য	: For (ফর)
তখন	: Then (দেন)
দূরে	: Far (ফার)
দূরে	: Off (অফ)
দূরে	: Away (এওয়ে)
দ্রুত	: Fast (ফাস্ট)
দৈনিক	: Daily (ডেইলি)
নিকটে	: Near (নিয়ার)
নিচে	: Down (ডাউন)
না	: No (নো)
পেছনে	: Behind (বিহাইন্ড)
ব্যতীত	: Without (উইদাউট)
ভালো	: Well (ওয়েল)
মাত্র / কেবল	: Only (অনলি)
শীঘ্র	: Soon (সুন)
সকালে	: Early (আর্লি)
সহজভাবে	: Easily (ইজিলি)
সর্বদা	: Always (অলওয়েজ)
সেখানে	: There (দেয়ার)
হাঁ	: Yes (ইয়েস)

ক্রিয়া
VERB

যে Word দিয়ে কোনো কাজ করা বোঝায়, তাকে Verb বা ক্রিয়া বলা হয়। যেমন :

অন্বেষণ করা	: Seek (সিক)
অনুভব করা	: Feel (ফিল)
অপেক্ষা করা	: Wait (ওয়েট)
আবেদন করা	: Apply (অ্যাপলাই)
আঘাত করা	: Knock (নক)
আসা	: Come (কাম)
আঘাত করা	: Hit (হিট)
উড়া	: Fly (ফ্লাই)
ওঠা	: Rise (রাইজ)
কল্পনা করা	: Think (থিংক)
কথা বলা	: Speak (স্পিক)
কাটা	: Cut (কাট)
কাজ করা	: Work (ওয়ার্ক)
ক্রয় করা	: Buy (বাই)
করা	: Do (ডু)
কাজ করা	: Act (এ্যাকট)
খাওয়ানো	: Feed (ফিড)
খাওয়া	: Eat (ইট)
খনন করা	: Dig (গিড)
খোলা	: Open (ওপেন)
ঘুমান	: Sleep (স্লিপ)
ঘৃণা করা	: Hate (হেইট)
চিন্তা করা	: Think (থিঙ্ক)
চেষ্টা করা	: Try (ট্রাই)
চুম্বন করা	: Kiss (কিস)
চালনা করা	: Guide (গাইড)
জন্মান	: Grow (গ্রো)
জয় লাভ করা	: Win (উইন)
তাকান	: Look (লুক)
তৈরি করা	: Make (মেক)
ত্যাগ করা	: Leave (লিভ)
দৌড়ান	: Run (রান)
দাঁড়ান	: Stand (স্ট্যান্ড)
দেখা	: See (সি)
দেওয়া	: Give (গিভ)
ধরা	: Catch (ক্যাচ)
ধরা	: Hold (হোল্ড)
নিক্ষেপ করা	: Throw (থ্রো)
নড়াচড়া	: Move (মুভ)
টানা	: Draw (ড্র)
ডাকা	: Call (কল)
পানকরা	: Drink (ড্রিঙ্ক)
পড়া	: Read (রিড)
পরীক্ষা করা	: Test (টেস্ট)
প্রার্থনা করা	: Pray (প্রে)
প্রবেশ করা	: Enter (এন্টার)
পাঠান	: Send (সেন্ড)
পাওয়া	: Get (গেট)
পরিদর্শন করা	: Visit (ভিজিট)
প্রতিজ্ঞা করা	: Vow (ভাউ)
পাশ করা	: Win (উইন)
পছন্দ করা	: Suits (সুটস)
পছন্দ করা	: Like (লাইক)
বলা	: Say (সে)
বলা	: Tell (টেল)
বসা	: Sit (সিট)
বন্ধ করা	: Shut (শাট)
বহন করা	: Carry (ক্যারি)
বাস করা	: Dwell (ডোয়েল)
বাধা দেওয়া	: Bar (বার)
বহন করা	: Bear (বিয়ার)
বন্ধ করা	: Close (ক্লোজ)
বোনা	: Knit (নিট)
বাস করা	: Live (লিভ)
ব্যবহার করা	: Use (ইউজ)
বপন করা	: Sow (সো)
ভালোবাসা	: Love (লাভ)
ভাগ করা	: Divide (ডিভাইড)
মান্য করা	: Obey (ওবে)
মরা	: Die (ডাই)
মনে করা	: Mind (মাইন্ড)
যাওয়া	: Go (গো)
যুদ্ধ করা	: Fight (ফাইট)
রাখা	: Put (পুট)
রাখা	: Lay (লে)
লেখা	: Write (রাইট)
শয়নকরা	: Lie (লাই)
শিক্ষা দেওয়া	: Teach (টিচ)
শ্রবণ করা	: Listen (লিসন)
শিক্ষা করা	: Learn (লার্ন)
শোনা	: Hear (হিয়ার)
স্থাপন করা	: Set (সেট)
সাক্ষাৎ করা	: Meet (মিট)
সাহায্য করা	: Help (হেল্প)
হিংসা করা	: Envey (এনভি)

Scanned with CamScanner

পদাশ্বয়ী অব্যয়
PREPOSITION

যে শব্দ কোনো Noun অথবা Pronoun-এর আগে বসে Sentence-এর অন্য শব্দের সঙ্গে সম্বন্ধ প্রকাশ করে, তাকে Preposition বলা হয়। Pre অর্থ পূর্বে, Position অর্থ অবস্থান-অর্থাৎ, আগে অবস্থান। যেমন :

অনেকের মধ্যে	: Among (এমং)
এ, প্রতি	: At (এট)
এর	: Of (অফ)
উপরে	: Upon (আপন)
উপর দিয়ে	: Over (ওভার)
উপরে	: Above (এবাভ)
চারদিক	: About (এবাউট)
জন্য	: For (ফর)
থেকে, হতে	: From (ফ্রম)
থেকে, যেহেতু	: Since (সিনস্)
দিকে, প্রতি	: To (টু)
দ্বারা	: By (বাই)
দুয়ের মধ্যে	: Between (বিটুইন)
নিম্নে	: Below (বিলো)
নিচে	: Under (আন্ডার)
পাশে	: Beside (বিসাইড)
পরে	: After (আফটার)
পূর্বে	: Before (বিফোর)
ভিতরে	: Into (ইনটু)
মধ্যে	: In (ইন)
মধ্য দিয়ে	: Through (থ্রু)
মধ্যে	: Within (উইদিন)
সাথে, সঙ্গে	: With (উইথ)

সংযোজক অব্যয়
CONJUNCTION

যে Word দুটি Word বা তার অধিক Word কে যুক্ত করে অথবা দুটি Sentence যুক্ত করে তাকে Conjunction বা সংযোজক অব্যয় বলা হয়। যেমন :

অথবা	: Or (অর)
অতএব	: Therefore (দেয়ারফোর)
এবং	: And (এ্যান্ড)
এখনও, তথাপি	: Yet (ইয়েট)
একটিওনা	: Neither (নিদার)
উভয়	: Both (বোথ)
কারণ	: Because (বিকজ)
কিন্তু	: But (বাট)
চেয়ে, থেকে	: Than (দ্যান)
তাই	: So (সো)
দুয়ের মধ্যে একটি	: Either (ইদার)
নতুবা, নয়	: Nor (নর)
পরে	: After (আফটার)
যা হউক	: However (হাউয়েভার)
যে পর্যন্ত	: Until (আনটিল)
যেমন, যেহেতু	: As (এজ)
যদি	: If (ইফ)
যদিও	: Though (দো)
যতক্ষণ	: While (হোয়াইল)

অনন্বয়ী অব্যয়
INTERJECTION

যে সব Word দ্বারা দুঃখ, আনন্দ, হর্ষ, বিষাদ, বিস্ময় প্রভৃতি মনের আকস্মিক ভাব ও আবেগ প্রকাশ হয়, তাকে Interjection বলা হয়। যেমন:

আরে	: Oh (ওহ্)
ইস্	: Pooh (পুহ)
ওহে	: Hallo (হ্যালো)
কি মজা	: Hurrah (হুররা)
ঘোড়ার ডিম	: Dam Shite (ড্যাম সাইট)
চমৎকার	: Capital (ক্যাপিটাল)
চমৎকার	: Excellent (একসিলেন্ট)
ছিঃ ছিঃ	: Fie (ফাই)
থাম	: Tush (ট্যাশ)
দেখা	: Lo (লো)
ধুর ছাই	: Dam (ড্যাম)
বিস্ময়, করুণা	: Ah (আহ্)
বাঃ বেশ	: Marvellous (মার্ভেলাস)
লজ্জা	: Shame (শেম)
শুন	: Hark (হার্ক)
সাবাস	: Bravo (ব্রাভো)
সুন্দর	: Beautiful (বিউটিফুল)
সাবাস	: Well done (ওয়েল ডান)
হে ঈশ্বর	: Oh God (ওহ্ গড)
হায় কপাল	: Oh! my godness (ওহ্! মাই গুডনেস)
হায়	: Alas (এলাস)

বাক্য-প্রকরণ

প্র : ভাষার প্রাণ কী?
উ : অর্থবোধক বাক্য।

প্র : বাক্যের গুণসমূহ কী?
উ : বিশ্বনাথ কবিরাজ 'সাহিত্য দর্পণে' বলেছেন : 'বাক্যং স্যাদ্ যোগ্যতাকাঙ্ক্ষাসত্তিযুক্তঃ পদোচ্চয়ঃ।' অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি, যোগ্যতা তিনটি বাক্যের গুণ।

প্র : বাক্যের আকাঙ্ক্ষা কাকে বলে?
উ : বাক্যের অর্থ স্পষ্টকরণের জন্য এক পদের পর অন্যপদের যে সংস্থাপন, বাক্য পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত শ্রোতার যে না-মেটা কৌতূহল, তাকে বাক্যের আকাঙ্ক্ষা বলে। যেমন : 'কাজল নিয়মিত লেখাপড়া।' এই বাক্যে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নি।

প্র : আসত্তি কাকে বলে?
উ : বাক্যের পদগুলিকে অর্থসঙ্গতিক্রমে পূর্বাপর সন্নিবিষ্ট করার নাম আসত্তি। যেমন : করে ১৯৭১ বাংলাদেশ স্বাধীনতা সালে অর্জন। এই বাক্য আসত্তিহীন। '১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে।' আসত্তিপূর্ণ বাক্য।

প্র : আসত্তি অর্থ কী?
উ : আসত্তি অর্থ মিলন বা নৈকট্য বা পারস্পরিক সংযোগ।

প্র : যোগ্যতা কী?
উ : বাক্যের অন্তর্গত পদসমূহের বিশ্বাসযোগ্য ভাবসম্মিলনের নাম যোগ্যতা। সাধারণ গদ্যের ক্ষেত্রে যোগ্যতার বিচার হয়, কাব্যের ক্ষেত্রে নয়। যেমন : 'চাঁদে বসে মা শিশুকে ছাদ দেখাচ্ছেন।' এই বাক্য গদ্যে যোগ্যতাহীন। তবে কাব্যে ভুল নয়। অনুরূপভাবে, 'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে'– এ পঙ্‌ক্তি কবিতায় মান্য হলেও গদ্যে যোগ্যতাহীন বলে বিবেচিত।

প্র : বাক্যে কী কী থাকলে তা যোগ্যতাহীন বলে বিবেচিত হয়?
উ : রীতিসিদ্ধ অর্থবাচকতা, দুর্বোধ্যতা, উপমার ভুল প্রয়োগ, বাহুল্যদোষ, বাগধারার রদবদল, গুরুচণ্ডালী দোষ ইত্যাদি।

প্র : গুরুচণ্ডালী দোষ কাকে বলে?
উ : তৎসম শব্দের সঙ্গে দেশীয় শব্দের একত্র ব্যবহার গুরুচণ্ডালী দোষ সৃষ্টি করে। যেমন : 'ঘোড়াশকট' গুরুচণ্ডালী দোষে দুষ্ট। হবে ঘোড়াগাড়ি বা অশ্বশকট। একইভাবে, 'শবপোড়া' হবে না। হবে 'শবদাহ' বা 'মড়াপোড়া'।

প্র : বাক্য কত প্রকার?
উ : তিন প্রকার। সরল, মিশ্র বা জটিল, যৌগিক বাক্য।

প্র : সরল বাক্য কাকে বলে?
উ : যে বাক্যে একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে এবং যা অন্য কোনো বাক্যের সঙ্গে যুক্ত কিংবা সম্পর্কিত নয়। সরল বাক্যকে সাধারণ বাক্যও বলে। যেমন : বিমল খুব ভাল ছাত্র।

প্র : মিশ্র বা জটিল বাক্য কাকে বলে?
উ : একটি প্রধান বাক্যের সঙ্গে অঙ্গীভূত এক বা একাধিক খণ্ড বাক্য সাধারণভাবে বা কোনো অনুগামী সমুচ্চয়ী অব্যয় বা সাপেক্ষ সর্বনাম দিয়ে যুক্ত হয়ে পরস্পর সাপেক্ষভাবে ব্যবহৃত হলে তাকে মিশ্র বা জটিল বাক্য বলে। যেমন : 'কাকলি বলল যে, শম্পাই কাজটি করেছে।' এখানে 'কাকলি বলল যে' প্রধান বাক্য আর অপ্রধান বাক্য হলো, 'শম্পাই কাজটি করেছে'।

প্র : মিশ্র বা জটিল বাক্যের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ দাও।
উ : মিশ্র বা জটিল বাক্যের কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ তুলে ধরা হলো :

১. যে পরিশ্রম করে, সেই সুখলাভ করে।
২. যে ব্যক্তির মাথায় বুদ্ধি নেই, সে পরের সমালোচনায় উদ্বিগ্ন হয়।
৩. সবাই জানেন যে, কালো টাকার মালিকগণ সুখী হন না।
৪. লেখাপড়া বিষয়ে তার যে গভীর অনুরাগ ছিল, একথা বলা যায় না।
৫. যদি তারে নাই চিনি গো, সে কি আমায় নেবে চিনে।

Scanned with CamScanner

৬. আমি মাঠে গিয়ে দেখলাম, খেলা শেষ হয়ে গিয়েছে।
৭. তিনি বাড়ি আছেন কিনা আমি জানি না।
৮. লেখাপড়া করে যেই, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই।
৯. খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি, আমার দেশের মাটি।
১০. ধনধান্য পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা।
১১. যতই করিবে দান, ততই যাবে বেড়ে।
১২. তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা, সখিনা বিবির কপাল ভাঙল।
১৩. তুমি ঢাকায় যাবে বলে, আমি উদ্বিগ্ন হয়ে আছি।
১৪. যারা ভালো ছাত্র, তারা শিক্ষককে শ্রদ্ধা করে।
১৫. যে ভিক্ষা চায়, তাকে দান কর।
১৬. যাদের বুদ্ধি নেই, তারাই একথা বিশ্বাস করবে।
১৭. যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন এ ঋণ স্বীকার করব।
১৮. যদি সে কাল আসে, তাহলে আমি যাবো।
১৯. যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখও আসে।
যেহেতু, সেহেতু প্রয়োগেও জটিল বাক্য হতে পারে। যেমন :
২০. যেহেতু তুমি প্রথম হয়েছ, সেহেতু পুরস্কার তুমিই পাবে।
২১. যেহেতু পড়াশোনা করেছ, সেহেতু কৃতকার্য হবেই।
২২. যেহেতু বৃষ্টিতে ভিজেছ, সেহেতু সর্দি তোমার হবেই।
২৩. যেহেতু নির্বাচন হয়েছে, সেহেতু দেশে গণতন্ত্র ফিরে আসবেই।

প্র : যৌগিক বাক্য কাকে বলে?

উ : সম্পূর্ণ পৃথক ও নিরপেক্ষ একাধিক স্বতন্ত্রবাক্য সংযোগবাচক অব্যয়ের সাহায্যে (যেমন : ও, অথবা, এবং, কিন্তু, অথচ, কিংবা, বরং, তথাপি প্রভৃতি) যুক্ত হয়ে পরিপূর্ণ অর্থপ্রকাশ করলে তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যেমন : 'জয়দেবপুরের ভাওয়াল রাজারা কার্জন হলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং তাঁরা হলের নির্মাণ ব্যয় সম্পূর্ণ বহন করেন'।

প্র : যৌগিক বাক্যের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ দাও।

উ : যৌগিক বাক্যের কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ তুলে ধরা হলো :

১. মানুষ সূর্যোদয়ে আনন্দিত হয় এবং রাত্রির আগমনে পুলকিত হয়ে থাকে।
২. মোহিতলাল মজুমদার ভালো অধ্যাপক ছিলেন এবং তিনি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন।
৩. উদয়াস্ত পরিশ্রম করব, তথাপি অন্যের দ্বারস্থ হব না।
৪. গিয়াস পড়াশোনা করেছিল প্রচুর কিন্তু পরীক্ষায় পাস করে নি।
৫. জননেতা জনগণকে উৎসাহিত করলেন বটে, কিন্তু কোনো পথ দেখাতে পারলেন না।
৬. তার বয়স হয়েছে, কিন্তু বুদ্ধি হয় নি।
৭. তিনি অত্যন্ত দরিদ্র কিন্তু তাঁর অন্তঃকরণ অতিশয় উচ্চ।
৮. তাঁর টাকা আছে, কিন্তু তিনি দান করেন না।
৯. তিনি আমাকে দশটি টাকা দিলেন এবং বাড়ি যেতে বললেন।
১০. আমি বহু কষ্ট করেছি, ফলে শিক্ষা লাভ করেছি।
১১. মিথ্যা কথা বলি নি, তাই বিপদে পড়েছি।
১২. তার বয়স বেড়েছে, কিন্তু বুদ্ধি পাকে নি।
১৩. মেঘ গর্জন করে, তবে ময়ূর নৃত্য করে।
১৪. বিপদ এবং দুঃখ এক সময়ে আসে।
১৫. মন্ত্রী এলাকা পরিদর্শনে যাবেন ও বন্যার্তদের তিনি সাহায্য দেবেন।
১৬. সে না এলে তুমি যাবে না, কিন্তু সে বলে পাঠিয়েছে যে তার আসতে দেরি হবে।
১৭. তারা দুজনে খুব ঝগড়া করে বটে, কিন্তু একজন যদি খাবার জন্য একটি বার্গার পায় দুজনে ভাগ করে খায়।
১৮. সে কারো বশ্যতা স্বীকার করতে চায় না, এদিকে টাকা অভাব হলেই যার তার কাছে আত্মসম্মান বলি দিয়ে হাত পাতে।

প্র : সরল থেকে যৌগিক বাক্য পরিবর্তনের কয়েকটি উদাহরণ দাও।

উ : সরল : ভোর হলে, সে ব্যক্তি, ঐ ইউরোপীয়ের সঙ্গে কিছুটা দূরে গেল।
যৌগিক : যখন ভোর হলো তখন সে ব্যক্তি ঐ ইউরোপীয়ের সঙ্গে কিছুটা দূরে গেল।
সরল : গৃহস্বামী তার কাছে গিয়ে নিজের দুরবস্থা জানাল।
যৌগিক : সে গৃহস্বামীর কাছে গেল এবং নিজের দুরবস্থা জানাল।
সরল : তুমি আমাকে আমার বাড়িতে পৌছে দাও।
যৌগিক : যে স্থানে আমার বাড়ি তুমি আমায় সেখানে পৌছে দাও।
সরল : ওর সমস্ত মনটাতে ভিজে হাওয়া যেন শ্রাবণ-অরণ্যের গন্ধ নিয়ে ঘনিয়ে ওঠে।
যৌগিক : ওর সমস্ত মনটাতে ভিজে হাওয়া লাগে এবং শ্রাবণ-অরণ্যের গন্ধ যেন ঘনিয়ে তোলে।
সরল : শিমুল গাছটা বড় হলে চারদিকে তুলো ছড়িয়ে অস্থির করে দেবে।
যৌগিক : শিমুল গাছটা একদিন বড় হবে এবং চারিদিকে তুলো ছড়িয়ে অস্থির করে দেবে।
সরল : গফুর কত কী চিন্তা করিয়া হঠাৎ সেই সমস্যার সমাধান করিয়া ফেলিল।
যৌগিক : গফুর কত কী চিন্তা করিল এবং হঠাৎ সেই সমস্যার সমাধান করিয়া ফেলিল।
সরল : তাহার মাটির প্রাচীর পড়িয়া গিয়া পাষাণ আসিয়া পথে মিশিয়াছে।
যৌগিক : তাহার মাটির প্রাচীর পড়িয়া গিয়াছে এবং পাষাণ আসিয়া পথে মিশিয়াছে।

প্র : যৌগিক থেকে সরল বাক্য পরিবর্তনের কয়েকটি উদাহরণ দাও।

উ : যৌগিক : এখন পরকালের কর্ম করিব নাতো কবে করিব?
সরল : এখন পরকালের কর্ম না করিলে কবে করিব?
যৌগিক : সেইটে দেখে, আর বলাইয়ের মন ভারি খুশি হয়ে ওঠে।
সরল : সেইটে দেখে বলাইয়ের মন ভারি খুশি হয়ে ওঠে।
যৌগিক : আমার এক চাকর ছিল, তার নাম আবদুর রহিম।
সরল : আবদুর রহিম নামে আমার এক চাকর ছিল।
যৌগিক : বৈশাখ শেষ হইয়া আসে কিন্তু মেঘের ছায়াটুকু কোথাও নাই।
সরল : বৈশাখ শেষ হইয়া আসিলেও মেঘের ছায়াটুকু কোথাও নাই।
যৌগিক : কবিত্ব আমার আসে না, তাই প্রকৃতির সৌন্দর্য আমার চোখে ধরা পড়ে না।
সরল : কবিত্ব আমার আসে না বলে প্রকৃতির সৌন্দর্য আমার চোখে ধরা পড়ে না।

প্র : সরল থেকে মিশ্র বা জটিল বাক্যে পরিবর্তনের উদাহরণ দাও।

উ : সরল : রৌদ্রতাপ কমে এলে পরামর্শ করা যাবে।
মিশ্র বা জটিল : যখন রৌদ্রতাপ কমবে তখন পরামর্শ করা যাবে।
সরল : শোনামাত্র তারা আনন্দে চিৎকার করে উঠল।
মিশ্র বা জটিল : যখনই তারা শুনল তখনই তারা আনন্দে চিৎকার করে উঠল।
সরল : গণ্ডির বাইরে গেলেই বিষম বিপদ।
মিশ্র বা জটিল : যখনই গণ্ডির বাইরে যাবে তখনই বিষম বিপদে পড়বে।
সরল : এই-সব প্রকাণ্ড গাছের ভিতরকার মানুষকেও যেন বলাই দেখতে পায়।
মিশ্র বা জটিল : এইসব প্রকাণ্ড গাছের ভিতর যে মানুষ আছে, তাকে বলাই যেন দেখতে পায়।
সরল : গোড়ায় বলাই শিমুল গাছটা না দেখালে ওটা আমার হয়তো লক্ষ্যই হতো না।
মিশ্র বা জটিল : গোড়ায় বলাই শিমুল গাছটা না যদি দেখাত হবে হয়তো ওটা আমার লক্ষ্যই হতো না।
সরল : ইহারই সীমানার পথের ধারে গফুরের বাড়ি।

Scanned with CamScanner

মিশ্র বা জটিল : ইহার সীমানার পতের ধারে গরুরের বাড়ি।
সরল : চোখ বেঁধে দিলেও ঠিক বের করতে পারব কোথায় জলের কল, কোথায় চা-খিলির দোকান।
মিশ্র বা জটিল : যদি চোখ বেঁধে দাও তবু ঠিক বের করতে পারব কোথায় জলের কল, কোথায় চা-খিলির দোকান।
সরল : পয়লা পয়লা কাজে নেমে সবাই ভিরমি খায়।
মিশ্র বা জটিল : পয়লা পয়লা যারা কাজে নামে তারা সবাই ভিরমি খায়।

প্র : মিশ্র বা জটিল বাক্য থেকে যৌগিক বাক্য পরিবর্তনের উদাহরণ দাও।
উ : মিশ্র বা জটিল : বাইরে এসে দেখলাম যে প্রায় প্রভাত হয়েছে।
যৌগিক : বাইরে এলাম এবং প্রায় প্রভাত হয়েছে দেখলাম।
মিশ্র বা জটিল : তারা যদিও কথা কয় না, কিন্তু বলাই সমস্ত কথাই যেন জানে।
যৌগিক : তারা কথা কয় না, কিন্তু বলাই সমস্তই যেন জানে।

যতি বা ছেদ-চিহ্ন

প্র : যতি বা ছেদ-চিহ্ন কী?
উ : বাক্য লেখার সময় যে-সব চিহ্ন ব্যবহার করে লেখক নিজের আনন্দ-আবেগ, জিজ্ঞাসা-প্রশ্ন ইত্যাদি প্রকাশ করেন এবং যে-সব চিহ্ন ব্যবহার করে ভাব প্রকাশের বিরতি বা সমাপ্তি বুঝিয়ে থাকেন, সেই চিহ্নসমূহকে যতি বা ছেদ-চিহ্ন বলা হয়।

প্র : প্রাচীন বাংলায় কোনো ছেদ-চিহ্ন ছিল কি?
উ : আজকের মতো বিচিত্র ছেদ-চিহ্ন ছিল না। এক দাঁড়ি (।) এবং দুই দাঁড়ি (॥) ছিল। এক দাঁড়ি দিয়ে কমার মতো অল্প বিরাম এবং দুই দাঁড়ি দিয়ে অধিক বিরাম বোঝাতো। যেমন :
'মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস ভনে শুনে পুণ্যবান॥'

প্র : বাংলা ভাষায় যতি বা ছেদ-চিহ্নের প্রবর্তক কে?
উ : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের আগে বাংলা গদ্য বা কবিতা কোথাও যথাযথ যতিচিহ্ন ব্যবহার হতো না। শুধু পূর্ণচ্ছেদ বা দাঁড়িজ্ঞাপক চিহ্নটি (এক দাঁড়ি / দুই দাঁড়ি) ছিল। বিদ্যাসাগর গদ্য রচনাকালে বক্তব্য যথাযথভাবে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হন। তখন তিনি গদ্যের মধ্যে শ্বাসপর্ব ও অর্থপর্ব ভাগ করে ইংরেজি গদ্য থেকে সবগুলো যতি বা ছেদ-চিহ্ন বাংলায় ব্যবহার করেন। যেহেতু বাংলায় পূর্ণচ্ছেদ জ্ঞাপক দাঁড়ি(।) আগেই ছিল, সেহেতু তিনি ফুলস্টপ (.) গ্রহণ না-করে বাংলার নিজস্ব সম্পদ দাঁড়ি (।)কেই রক্ষা করলেন। বিদ্যাসাগর যে যতিচিহ্নসমূহ বাংলায় ব্যবহার করেন আজো এর সবগুলোর বাংলা-নাম হয় নি। কোনোটির বাংলা নাম হলেও তা ইংরেজি নামেই বেশি পরিচিত।

প্র : যতি বা ছেদ-চিহ্নসমূহ উল্লেখ কর।
উ :

নাম	চিহ্ন	বিরতি-কাল
দাঁড়ি (পূর্ণচ্ছেদ)	(।)	এক সেকেন্ড
জিজ্ঞাসাচিহ্ন	(?)	ওই
বিস্ময়চিহ্ন	(!)	ওই
কোলন	(:)	ওই
কোলন-ড্যাস	(:-)	ওই
ড্যাস	(-)	ওই
কমা	(,)	১ উচ্চারণের সময়
সেমিকোলন	(;)	১ উচ্চারণের দ্বিগুণ সময়
উদ্ধরণ চিহ্ন	(" ")	'এক' উচ্চারণের সময়
হাইফেন	(-)	থামার প্রয়োজন নেই
ইলেক্ বা	(')	ওই লোপচিহ্ন
একটি ডট্ বা শব্দসংক্ষেপ	(.)	ওই
তিনটি ডট্ বা পূর্ণলোপ	(...)	ওই
প্রথম বন্ধনী	(( ))	ওই
দ্বিতীয় বন্ধনী	({ })	ওই
তৃতীয় বন্ধনী	([ ])	ওই

(নোট : অনেকে কোলন-ড্যাসকে পৃথক যতিচিহ্ন হিসেবে স্বীকার করেন না।)

প্র : যতিচিহ্নসমূহের বিরতি-কাল সুনির্দিষ্ট কর।
উ : থামার প্রয়োজন নেই : হাইফেন, ইলেক, ডট, ব্রাকেট।
১ সেকেন্ড থামতে হবে : দাঁড়ি, বিস্ময়, প্রশ্নবোধক, কোলন, কোলন-ড্যাস, ড্যাস।
১ (এক) বলতে যে-সময় : কমা, উদ্ধরণচিহ্ন।
১ বলার দ্বিগুণ সময় : সেমিকোলন।

প্র : যতি বা ছেদ-চিহ্নগুলোকে কী কী বাংলা পারিভাষিক নামে চিহ্নিত করা যায়?
উ : Comma (,) > পাদচ্ছেদ; Semi-Colon (;) > অর্ধচ্ছেদ; Colon (:) > দৃষ্টান্তচ্ছেদ; Note of interrogation (?) > প্রশ্নবোধক বা প্রশ্নচিহ্ন; Note of exclamation (!) > বিস্ময়চিহ্ন; Dash (–) > রেখাচিহ্ন; Inverted Commas (' ') > উদ্ধরণচিহ্ন বা উদ্ধৃতিচিহ্ন; Hyphen (-) > পদযোজক চিহ্ন ইত্যাদি। পরিভাষা তৈরি করাই যথেষ্ট নয়। একে লোকপ্রিয় করতে প্রচুর ব্যবহার করতে হয়। এজন্য চাই দেশপ্রেমের গরজ এবং একাগ্রতা।

প্র : যতি বা ছেদ-চিহ্ন ব্যবহারের প্রয়োজন কেন?
উ : **দাঁড়ি (।)** : বাক্যের অর্থ সমাপনান্তে পরিসমাপ্তি বোঝাতে।
যেমন : রহিম ঘরে ঢুকে করুণ দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চাইল।
জিজ্ঞাসাচিহ্ন (?) : বাক্যে কোন জিজ্ঞাসা বা প্রশ্ন করা বুঝাতে।
যেমন : তুমি কি রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' পাঠ করেছ?

বিস্ময়চিহ্ন (!) : হৃদয়ের বিস্ময় ও আবেগ প্রকাশার্থে। অবশ্য সম্বোধনে আবেগ বোঝালেও এই চিহ্ন বসে।
যেমন : আহ! কী করুণ দৃশ্য। জননী! আজ্ঞা দেহ মোরে যাই রণস্থলে।

কোলন (:) : বাক্য অসম্পূর্ণ রেখে প্রাসঙ্গিক অন্য তথ্য জ্ঞাপনের সময়।
যেমন : কমিটিতে সিদ্ধান্ত হলো : আগামী মাসেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ড্যাস (—) :
ক. কোনো কথার উদাহরণ, দৃষ্টান্ত বা বিস্তার বুঝাতে।
যেমন : শহীদদের শব দুই প্রকার — যৌগিক শব্দ, অযৌগিক শব্দ।
খ. পৃথক ভাবাপন্ন একাধিক বাক্য এক বাক্যে স্থাপনের সময়।
যেমন : তোমরা কঠিন শ্রম কর- এতে তোমাদের সম্মান যাবে না — বাড়বে।

কমা (,) :
ক. সম্বোধন পদের পরে কমা বসে।
যেমন : স্যার, আমাকে বাংলাটি বুঝিয়ে দেবেন?
খ. সমজাতীয় পদ পাশাপাশি বসলে তাদের পর কমা বসে।
যেমন : হাঁস, মুরগি, ছেড়া, ছাগল গৃহপালিত পশু। (বিশেষ্য অর্থে); অর্ক চালাক, চতুর, সাহসী ও ন্যায়পরায়ণ। (বিশেষণ অর্থে)।
গ. জটিল বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেক খণ্ড বাক্যের পরে কমা বসে।
যেমন : লেখাপড়া করে যে, বাড়ি গাড়ি করে সে।
ঘ. তারিখ লেখার সময় মাস ও দিনের পর কমা বসে।
যেমন : সোমবার, ২৫শে জুন, ১৯৮৭ সাল।
ঙ. বাড়ি বা রাস্তার নম্বরের পরে কমা বসে।
যেমন : ৮৩, নিউপল্টন, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫।

সেমিকোলন (;) :
ক. কমা অপেক্ষা বেশি বিরতির জন্য সেমিকোলন বসে।
খ. কমার বারংবার ব্যবহারের পর কিন্তু দাঁড়ি ব্যবহারের আগে সেমিকোলন বসে।
গ. একাধিক স্বাধীন বাক্যকে একটি স্বাধীন বাক্যে লিখলে সেগুলোর মাঝখানে সেমিকোলন বসে।
যেমন : তিনি শুধু তামাশা দেখিতেছিলেন; কোথাকার জল কোথায় গিয়া পড়ে।

হাইফেন (-) : একাধিক শব্দ বা পদ সংযোগ দেবার জন্য হাইফেন ব্যবহার করা হয়। যেমন : আমার মা-বাবা গ্রামে থাকেন।

Scanned with CamScanner

হলেক বা লোপ চিহ্ন (') : এক বর্ণ বা একাধিক বর্ণের লোপ বোঝাতে।
যেমন : দুরন্ত বেগে যাচ্ছে কা'রা (এখানে 'কা'রা' কাহারা অর্থে ব্যবহৃত হয়ে 'হা' লোপ পেয়েছে।)

উদ্ধরণ চিহ্ন (" ") : কোনো বক্তব্য বা তথ্য প্রত্যক্ষ বা হুবহুভাবে ব্যবহারকালে।
যেমন : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।"

সংক্ষেপ (.) : কোনো একটি ডট বা শব্দসংকেপ শব্দ সংক্ষেপ করতে হলে ব্যবহার হয়।
যেমন : ডক্টর > ড.; মোহম্মদ > মো.।

লোপ (...) : বাক্যের তিনটি ডট বা পূর্ণলোপ কোনো অংশ বা শব্দাবলি বিলোপ বা উল্লেখ না-করার প্রয়োজনে।

বন্ধনী চিহ্ন ( ), { }, [ ] : এগুলো যতি বা ছেদ-চিহ্ন নয়। তবে বাক্যে বিশেষ ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হলে বাক্যের ভেতর এর ব্যবহার হয়।

প্র : যতি বা ছেদ-চিহ্ন ছাড়াও কতিপয় চিহ্ন বাংলা ব্যাকরণ বা গদ্যে ব্যবহার হয়, সেগুলো কী?

উ : √ : ধাতুর চিহ্ন
< : পরবর্তী থেকে পূর্ববর্তী
> : পূর্ববর্তী থেকে পরবর্তী
= : সমন্বয় বোঝাতে।

সমার্থক ও প্রতিশব্দ

মূলশব্দ	সমার্থক ও প্রতিশব্দ
অগ্নি	অনল, বহ্নি, হুতাশন, পাবক, বৈশ্বানর, আশুন, দহন, সর্বভুক, শিখা, হোমাগ্নি, কৃশানু, সর্বশুচি, বিভাবসু।
অশ্ব	ঘোড়া, বাজী, হয়, তুরগ, ঘোটক, তুরঙ্গ, তুরঙ্গম, ত্রেষা।
অন্ধকার	আঁধার, তিমির, তমঃ, তমিস্র, আঁধিয়ার, আন্ধার।
অতিশয়	অতি, অতীব, অতিমাত্র, অধিক, অত্যন্ত, একান্ত, নিতান্ত, পরম, সাতিশয়, অত্যধিক।
অনঙ্গ	ফুলশর, মনোজ, পুষ্পধনু, মনসিজ, মদন, ফুলধনু, কামদেব, কন্দর্প, অতনু, মন্মথ, পঞ্চশর, স্মর, রতিপতি, মনোভব, মকরকেতু, মকরধ্বজ, মকরকেতন, মীনকেতন, মীনধ্বজ।
অন্ন	ভাত, ওদন, আহার, দব্য, তণ্ডুল।
অন্নদা	পার্বতী, দুর্গা, অন্নদাত্রী, ভগবতী, অন্নপূর্ণা, শিবপত্নী, জগদম্বা, উমা, অপর্ণা, জগন্মাতা।
অপবাদ	দুর্নাম, বদনাম, কুৎসা, নিন্দা।
আনন্দ	হর্ষ, পুলক, আহ্লাদ, সুখ, খুশি, তৃপ্তি, সন্তোষ।
আদেশ	আজ্ঞা, হুকুম, অনুমতি, উপদেশ, অনুশাসন, অনুজ্ঞা, নির্দেশ।
আকাশ	খ, গগন, নভঃ, অন্তরিক্ষ, ব্যোম, শূন্য, দ্যুলোক, ছায়ালোক, অনন্ত, আসমান, অম্বর, নভোমণ্ডল, দ্যু।
ইচ্ছা	অভিলাষ, বাঞ্ছা, অভিপ্রায়, স্পৃহা, বাসনা, আকাঙ্ক্ষা, কামনা, অভিরুচি. সাধ, মনোরথ, আকিঞ্চন, আগ্রহ, লালসা।
ইতি	শেষ, যবনিকা, সমাপ্তি, রফা, অন্তিম, সাঙ্গ, অবশিষ্ট, অবসান।
ঈশ্বর	ইষ্ট, ভগবান, বিধাতা, ধাতা, আল্লাহ, খোদা, জগন্নাথ, ঈশ, সৃষ্টিকর্তা, অনন্ত, বিশ্বপতি, বিভু, ব্রহ্ম, পরমাত্মা, জগদীশ্বর, পরমেশ্বর, বিধি, জগদীশ, জগৎপতি, জগবন্ধু, ধাতা, স্রষ্টা, প্রজাপতি, স্বয়ম্ভু, প্রভু, জগদাধিপতি।

ঈক্ষণ	দৃষ্টি, দর্শন, চক্ষু, অক্ষি, নয়ন, লোচন, নজর।	গরু	ধেনু, গো, গাভি, পয়স্বিনী।
ঈর্ষা	বিরাগ, হিংসা, অপ্রীতি, বৈরভাব, দ্বেষ, অসূয়া, বিদ্বেষ, বৈরিতা, পরশ্রীকাতরতা।	গৃহ	আলয়, ভবন, নিলয়, নিকেতন, সদন, আগার, ঘর, বাড়ি, আবাস, ধাম, বাটী, নিবাস, কক্ষ, নিকেত, আশ্রয়, বাসস্থান।
ঊর্মি	ঢেউ, তরঙ্গ, বীচি।		
উচ্ছেদ	বিনাশ, উৎপাটন, উন্মূলন, স্থানচ্যুতি।	ঘন	মেঘ, বারিদ, জলধর, অম্বুদ, পয়োধর, নীরদ, জলদ, জীমূত, তোয়দ, পর্জন্য, পয়োদ, বলাহক, তোয়ধর।
উগ্র	রূঢ়, নিষ্ঠুর, তীক্ষ্ণ, প্রখর, ভয়ানক, কোপন, প্রচণ্ড, কর্কশ, তীব্র, ক্রুদ্ধ	চন্দ্র	চাঁদ, সুধাংশু, সুধাকর, শশাঙ্ক, শশধর, শশী, হিমাংশু, বিধু, নিশাকর, সোম, শীতাংশু, সুধানিধি, কলানিধি, হিমকর, ইন্দু, চন্দ্রমা, নিশাপতি, দ্বিজরাজ, নিশাকান্ত, মৃগাঙ্ক, কলাধর, কলাভৃৎ, কুমুদনাথ।
উজ্জ্বল	আলোকিত, উদ্ভাসিত, ঝলমলে, দীপ্ত, দীপ্তিমান, প্রদীপ্ত, চকচকে, শোভমান, প্রজ্বলিত।		
কর্ণ	শ্রবণ, শ্রুতি, শ্রবণেন্দ্রিয়, কান, শ্রবণপথ, শ্রোত্র, শ্রুতিপথ, শ্রবণবিবর।	চক্ষু	দর্শন, লোচন, নয়ন, নেত্র, অক্ষি, চোখ, আঁখি।
কেশ	চুল, কুন্তল, অলক, চিকুর, কেশপাশ, কেশদাম, কবরী।	জল	সলিল, বারি, অপ্, উদক, অম্বু, নীর, পয়ঃ, তোয়, পানি, অম্ভঃ, অর্ণঃ।
কিরণ	কর, প্রভা, দীপ্তি, জ্যোতি, অংশু, রশ্মি, আলো, আলোক, বিভা, ময়ূখ।	জ্যোৎস্না	চাঁদিনী, চন্দ্রিমা, কৌমুদী।
কোরক	কুঁড়ি, মুকুল, কলি, কলিকা, বউল (আমের মুকুল)।	ঝড়	ঝটিকা, বাত্যা, প্রবলবায়ু, ঘূর্ণিবায়ু, ঝঞ্ঝা।
কোকিল	কাকপুষ্ট, পরপুষ্ট, কলকণ্ঠ, পিক, পরভৃত, বসন্তদূত, অন্যপুষ্ট, মধুস্বর, মধুসখা।	দেবতা	সুর, দেব, ত্রিদশ, অমর, অজর, ঠাকুর, ঈশ্বর।
কপাল	ভাল, ভাগ্য, ললাট, অলিক, নিয়তি, অদৃষ্ট, দৈব।	দেহ	কায়া, কলেবর, গা, গাত্র, তনু, শরীর, অঙ্গ, কায়।
কুল	গোত্র, গোষ্ঠী, কৌলীন্য, বংশ, সমাজ, আভিজাত্য, জাতি, বর্ণ।	দোকান	আপণ, বিপণি, হাট, পণ্যশালা, পণ্যনিকেতন, পণ্যগৃহ, পণ্যবিচিত্রা।
কন্যা	নন্দিনী, আত্মজা, দুহিতা, মেয়ে, সুতা, তনয়া, দুলালী।	দিবস	দিবা, দিনমান, তমসতাড়িনী, অযামিনী, অহন, দিন, অহ।
কুহক	মায়া, ইন্দ্রজাল, ভেলকি, প্রতারণা, ছল, ধোঁকা।	দীন	নিঃস্ব, দরিদ্র, সহায়হীন, গরিব, অতি দুঃখী, অর্থহীন, কাতর, হীন, অভাবগ্রস্থ।
কথা	উক্তি, বচন, বিবৃতি, বক্তব্য, অঙ্গীকার, গদ্য, পরামর্শ, আখ্যান, গল্প, ভাষণ, বাক্য।	ধন	বিত্ত, অর্থ, সম্পদ, বিভব, বৈভব, বিভূতি, নিধি, ঐশ্বর্য, বিত্ত।
কালো	অসিত, শ্যাম, শ্যামল, কৃষ্ণবর্ণ।	নদী	স্রোতস্বিনী, স্রোতস্বতী, তটিনী, তরঙ্গিনী, প্রবাহিনী, শৈবলিনী, কলস্বিনী, কল্লোলিনী, গাঙ, পয়স্বিনী, নির্ঝরিণী, সরিৎ।
খবর	সংবাদ, বার্তা, ফরমান, সন্দেশ, সন্ধান, তথ্য, সমাচার।	নারী	স্ত্রীজাতি, বনিতা, ভামিনী, কান্তা, সীমন্তিনী, পত্নী, বামা, রামা,
খড়্গ	তলোয়ার, কৃপাণ, তরবারি, অসি।		
গঙ্গা	সুরধুনী, ভাগীরথী, জাহ্নবী, জহ্নুকন্যা।		

Scanned with CamScanner
2020/5/10 15:23

অঙ্গনা, ললনা, মহিলা, কামিনী, রমণী (এই শব্দগুলো প্রচলিত হলেও এর অনেকগুলোই সামন্ততান্ত্রিক শব্দ। এ যুগে এর অনেকগুলোই নারীর সমার্থক শব্দ হওয়ার অযোগ্য। অনেকে 'অবলা'কে নারী শব্দের সমার্থক হিসেবে লিখে থাকেন। আমাদের প্রশ্ন : নারী-রা সত্যি কি অবলা?)	
অনুকরণ, অনুসরণ, ভেজাল, প্রতিলিপি, দূষণীয় কাগজ।	নকল
জনক, বাপ, তাত, বাবা, জন্মদাতা, আব্বা।	পিতা
ধরা, ধরণি, ধরিত্রী, বসুন্ধরা, বসুধা, ভূ, ভূমণ্ডল, অবনি, ক্ষিতি, মহী, বসুমতী, মেদিনী, জগৎ, মর্ত্যলোক, ব্রহ্মাণ্ড, বিশ্ব, অখিল, ভুবন, ভূমি, পৃথ্বী, দুনিয়া, ভুবন, ভূলোক, উর্বী, মরলোক, সংসার।	পৃথিবী
পক্ষী, বিহগ, বিহঙ্গ, খগ, গরুড়, বিহঙ্গম, শকুন্ত, খেচর, দ্বিজ, অণ্ডজ, পতত্রী।	পাখি
পাতক, কলুষ, দুষ্কর্ম, দুষ্কৃতি।	পাপ
শতদল, উৎপল, নলিনী, অরবিন্দ, সরসিজ, পঙ্কজ, সরোজ, কমল, কুবলয়, তামরস, সরোরুহ, কোকনদ, ইন্দীবর, কুমুদ, পুণ্ডরীক, রাজীব, পুষ্কর।	পদ্ম
আত্মজ, নন্দন, সুত, তনয়, ছেলে, দুলাল, সূনু, অঙ্গজ।	পুত্র
মহীধর, পাহাড়, গিরি, অচল, শৈল, ভূধর, অদ্রি, শিখরী, শৃঙ্গী, শৃঙ্গধর, মহীধ্র, ভূভৃৎ, নগ।	পর্বত
কুসুম, পুষ্প, প্রসূন।	ফুল
অনিল, পবন, বাতাস, হাওয়া, সমীরণ, সমীর, বাত, মরুৎ, প্রভঞ্জন, মারুত, গন্ধবহ।	বায়ু
অরণ্য, জঙ্গল, অটবি, কানন, বিপিন, গহন, কুঞ্জ, কান্তার উপবন, বনানী।	বন
গাছ, পাদপ, তরু, বিটপী, দ্রুম, মহীরুহ, শাখী, শৃঙ্গী, শিখরী, পণী।	বৃক্ষ
বিজলি, তড়িৎ, ক্ষণপ্রভা, সৌদামিনী, চপলা, চঞ্চলা, চিকুর, দামিনী, শম্পা, অচিরপ্রভা।	বিদ্যুৎ
স্ত্রী, পত্নী, সহধর্মিণী, অর্ধাঙ্গী, অর্ধাঙ্গিনী, দার, কলত্র, অঙ্গনা, বনিতা, ভার্যা, জায়া, গৃহিণী, গিন্নি, দারা।	বধূ
সখা, মিত্র, সুহৃদ, বান্ধব।	বন্ধু
বসন, বাস, পরিধেয়, অম্বর, কাপড়, পরিচ্ছদ, পোশাক।	বস্ত্র
মধুকর, ষট্‌পদ, মধুপ, অলি, ভৃঙ্গ, শিলীমুখ, মধুলিট্, মধুলিহ, দ্বিরেফ, মধুভৃৎ, ভোমরা, মৌমাছি, মধুমক্ষিকা।	ভ্রমর
জননী, মা, অম্বা, প্রসূতি, গর্ভধারিণী, জন্মদাত্রী, আম্মা।	মাতা
কলাপী, কেকা, শিখী, শিখণ্ডী, কেকী, বর্হী।	ময়ূর
অন্ত, ইন্তেকাল, বিনাশ, মরণ, নাশ, নিধন, নিপাত, পরলোকগমন, স্বর্গলাভ, দেহত্যাগ, লোকান্তরপ্রাপ্তি, পঞ্চত্বপ্রাপ্তি, ইহলীলা সংবরণ, চিরবিদায়, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ।	মৃত্যু
সংগ্রাম, সমর, আহব, বিগ্রহ, রণ।	যুদ্ধ
নৃপেন্দ্র, নৃপতি, নরেশ, ভূপতি, ভূপ, নরপতি, ভূপাল, মহীপাল, দণ্ডধর, রাজ্যপাল, নরপাল, দণ্ডপাল, নরেন্দ্র, ক্ষিতিপ, প্রজাধিপ, ক্ষিতিপতি, নৃপ, মহীনাথ, মহীন্দ্র, মহীপ, ক্ষিতীশ, বাদশা, সম্রাট।	রাজা
নিশি, রাত, নিশা, রজনী, শর্বরী, যামিনী, বিভাবরী, ক্ষণদা, নিশীথিনী, ত্রিযামা।	রাত্রি
অরাতি, অরি, বৈরি, অররু, রিপু, প্রতিপক্ষ।	শত্রু
রবি, ভানু, আফতাব, ভাস্কর, আদিত্য, দিবাকর, তপন, দিনমণি, মার্তণ্ড, অর্ঘমা, অংশুমালী, অর্ক, পুষা, সবিতা, সুর, প্রভাকর, বিভাবসু, বিবস্বান, মিহির, অরুণ, দিনেশ, দিননাথ, কিরণমালী, ময়ূখমালী, বিভাকর, বালার্ক, দিবাবসু, হরিদশ্ব।	সূর্য

সাগর, রত্নাকর, জলধি, সিন্ধু, বারিধি, বারীশ, উদধি, অর্ণব, অম্বুধি, পয়োধি, পারাবার, জলনিধি, নীলাম্বু, পাথার, পয়োনিধি, জলধর, অম্বুনিধি, তোয়নিধি, বারীশ, বারীন্দ্র।	সমুদ্র
সাপ, ফণী, ভুজঙ্গ, ভুজগ, অহি, পন্নগ, নাগ, উরগ, আশীবিষ, ভুজঙ্গম, ফণাধর, বিষধর, বায়ুভুক।	সর্প
মনোহর, মনোরম, শোভন, সুদৃশ্য, চারু, রমণীয়, রম্য।	সুন্দর
বেহেশ্‌ত, সুরলোক, অমরাবতী, দ্যুলোক, দেবলোক।	স্বর্গ
কনক, স্বর্ণ, কাঞ্চন, হিরণ্য, সুবর্ণ, হেম, হিরণ।	সোনা
সিত, শ্বেত, শুভ্র, সফেদ, শুভ্র, অরঞ্জিত, ধবল, নির্মল, শুচি।	সাদা
পশুরাজ, কেশরী, মৃগেন্দ্র, মৃগরাজ, হরি, হর্যক্ষ।	সিংহ
গণ, বৃন্দ, চয়, নিচয়, সুসমূহ, পটল, বর্গ, মালা, বর্ত্তি, সকল।	সমূহ
বাহু, ভুজ, কর, হাত, পাণি।	হস্ত
হাতি, করী, দ্বিপ, মাতঙ্গ, বারণ, গজ, কুঞ্জর, নক্কী, দ্বিরদ।	হস্তী

বিপরীতার্থক শব্দ

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
অনুগ্রহ	নিগ্রহ	অর্জন	বর্জন
অনুলোম	প্রতিলোম	অর্পণ	গ্রহণ
অনুজ	অগ্রজ	অতিকায়	ক্ষুদ্রকায়
অন্তর	বাহির	অলীক	সত্য
অপকার	উপকার	অল্প	মধুর
অমৃত	বিষ, গরল	অগ্র	পশ্চাৎ
অনুরক্ত	বিরক্ত	অভ্যাস	অনভ্যাস
অন্তরঙ্গ	বহিরঙ্গ	অপরাধ	নিরপরাধ
অনুকূল	প্রতিকূল	অগ্রগামী	পশ্চাৎগামী
অনুরাগ	বিরাগ	অশন	অনশন
অণু	বৃহৎ	অন্ধকার	আলোক
অন্ত্য	আদ্য	অবনত	উন্নত
অভিজ্ঞ	অনভিজ্ঞ		
অতিবৃষ্টি	অনাবৃষ্টি	আকর্ষণ	বিকর্ষণ
অধমর্ণ	উত্তমর্ণ	আকুঞ্চন	বিকুঞ্চন, প্রসারণ
অর্থ	অনর্থ	আগম	লোপ
অনির্বাণ	নির্বাণ	আদর	ঘৃণা
অধিত্যকা	উপত্যকা	আদ্য	অন্ত্য
অবিরল	বিরল	আপত্তি	সম্মতি
অসীম	সসীম	আবাহন	বিসর্জন
অধম	উত্তম	আবির্ভাব	তিরোভাব
অলস	পরিশ্রমী	আশু	বিলম্ব
অর্বাচীন	প্রাচীন	আশ্লেষ	বিশ্লেষ
অগ্রজ	অনুজ	আসক্ত	বিরক্ত

Scanned with CamScanner

আগমন	নির্গমন/প্রত্যাগমন	উপরোধ	অনুরোধ
আলোক	অন্ধকার	উপকার	অপকার
আশা	নিরাশা	উপস্থিত	অনুপস্থিত
আহার	অনাহার	ঊর্ধ্ব	মৃদু / সৌম্য
আত্মীয়	অনাত্মীয়	উৎকর্ষ	অপকর্ষ
আবশ্যক	অনাবশ্যক	উহ্য	স্পষ্ট
আবিল	অনাবিল	উজ্জ্বল	ম্লান
আস্থা	অনাস্থা	উন্নতি	অবনতি
আস্তিক	নাস্তিক	উপচয়	অপচয়
আঁটা	শাঁস	উৎকৃষ্ট	অপকৃষ্ট
আদান	প্রদান	উপসর্গ	অনুসর্গ
আমদানি	রপ্তানি	উপগত	অপগত
আয়	ব্যয়	উদ্ধত	বিনীত
আলো	কর্মঠ	উত্তরণ	অবতরণ
আকাশ	পাতাল	উদার	সংকীর্ণ
আরোহণ	অবতরণ		
আলস্য	শ্রম		
আর্দ্র	শুষ্ক	**ঊষর**	বজ্র
আটক	ছাড়		
আবদ্ধ	মুক্ত	**ঊর্ধ্ব**	অধঃ
আহ্বান	উপেক্ষা	ঊষা	সন্ধ্যা
আদিষ্ট	নিষিদ্ধ	ঊর্ধ্বগামী	নিম্নগামী
আলঙ্কিক	চিরন্তন		
আবৃত	অনাবৃত/উন্মুক্ত	একাল	সেকাল
আগামি	বাদী	একযুগ	সেযুগ
আগম	নির্গমি	একমত	দ্বিমত
		একপিঠ	ওপিঠ
ইহ	পর	**ঐহিক**	পারত্রিক
ইতর	ভদ্র	ঐচ্ছিক	আবশ্যিক
ইচ্ছা	অনিচ্ছা	এঁড়ে	বকনা
ইষ্ট	অনিষ্ট	ঐশ্বর্য	দারিদ্র্য
ইহকাল	পরকাল	ঐক্য	অনৈক্য/বিভেদ
ইষৎ	অধিক	**ঔদ্ধত্য**	বিনয়
ঈদৃশ	তাদৃশ	ঔদার্য	কার্পণ্য
ঈর্ষা	প্রীতি		
ঈপ্সিত	অনীপ্সিত	**কুটিল**	সরল
		কৃত্রিম	স্বাভাবিক
উচ্চ	নীচ	কৃপণ	বদান্য
উত্তমর্ণ	অধমর্ণ	কুৎসিত	সুন্দর
উত্থান	পতন	কৃষ্ণ	শুক্ল, শুভ্র
উদয়	অস্ত	কোমল	কঠিন/কর্কশ
উন্মুখ	বিমুখ	কৃতজ্ঞ	কৃতঘ্ন
উন্মীলন	নিমীলন	কুৎসা	প্রশংসা
উজান	ভাটি	করাল	সৌম্য
উক্ত	অনুক্ত	কপট	অকপট
উত্তম	অধম	কেজো	অকেজো
		কৃশ	স্থূল

কনিষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ	**অক্ষয়**	**ম্লান**
কর্কশ	কোমল	জরা	যৌবন
কাজ	অকাজ	জয়	পরাজয়
কান্না	হাসি	ক্ষয়ণ	নিক্ষয়
ক্রয়	বিক্রয়	জোয়ার	ভাটা
ক্রোধ	প্রীতি	জন্তু	মুক্তা
ক্ষীণ	পুষ্ট	জীবন	মরণ
ক্ষয়িষ্ণু	বর্ধিষ্ণু	জানা	অজানা
ক্ষিপ্ত	শান্ত	জড়	চেতন
ক্ষয়	বৃদ্ধি	জাগরিত	নিদ্রিত
ক্ষীয়মাণ	বর্ধমান	জাগ্রত	সুপ্ত
ক্ষুদ্র	বৃহৎ	জীবিত	মৃত
		জ্ঞানী	মূর্খ
খোলা	ঢাকা		
খ্যাতি	অখ্যাতি	**খাদু**	অপটু, অপক্ব
খাতক	মহাজন	ঝুলা	কাঁচা
গরিষ্ঠ	লঘিষ্ঠ	**টাইকা**	খাসি
গাম্ভীর্য	চাপল্য		
গুপ্ত	ব্যাপ্ত, প্রকাশিত	**ঠকা**	জেতা
গোপন	প্রকাশ	ঠাত্তা (হিন্দি শব্দ)	পরম
গরল	অমৃত	ঠিক	বেঠিক
গ্রহণ	বর্জন	ঠুনকা	মজবুত
গৌরব	লাঘব		
গ্রাম্য	নাগরিক/শহুরে	**ডুবন্ত**	ভাসন্ত
গুরু	লঘু	ডাগর	ম্লান
গৃহী	সন্ন্যাসী		
গঞ্জনা	প্রশংসা	ঢেংগা	খাটো
গৌণ	মুখ্য	ঢোসা	হালকা
গ্রহীতা	দাতা		
গুরু	শিষ্য	**তরুণ**	প্রবীণ
		তিক্ত	মধুর
ঘাত	প্রতিঘাত	ত্যাগ	ভোগ
ঘোলা	স্বচ্ছ	ত্বরা	বিলম্ব
ঘন	তরল	তিমির	আলোক
ঘরে	বাইরে	তরল	কঠিন
		তিরস্কার	পুরস্কার
চঞ্চল	স্থির	তৃপ্তি	অতৃপ্তি
চড়াই	উৎরাই	তাপ	শৈত্য
চেতন	জড়	তস্কর	সাধু
চোর	সাধু	তেজি	মেদা, মন্দা
চতুর	নির্বোধ	তারুণ্য	বার্ধক্য
চোখা	ভোঁতা	তেজ	নিস্তেজ
চেনা	অচেনা	তীব্র	লঘু
চয়	অপচয়	তামসিক	রাজসিক
চক্ষুষ্মান	অন্ধ		
ছাড়া	**ধরা**	**থামা**	**চলা**

2020/5/10 15:23

Scanned with CamScanner

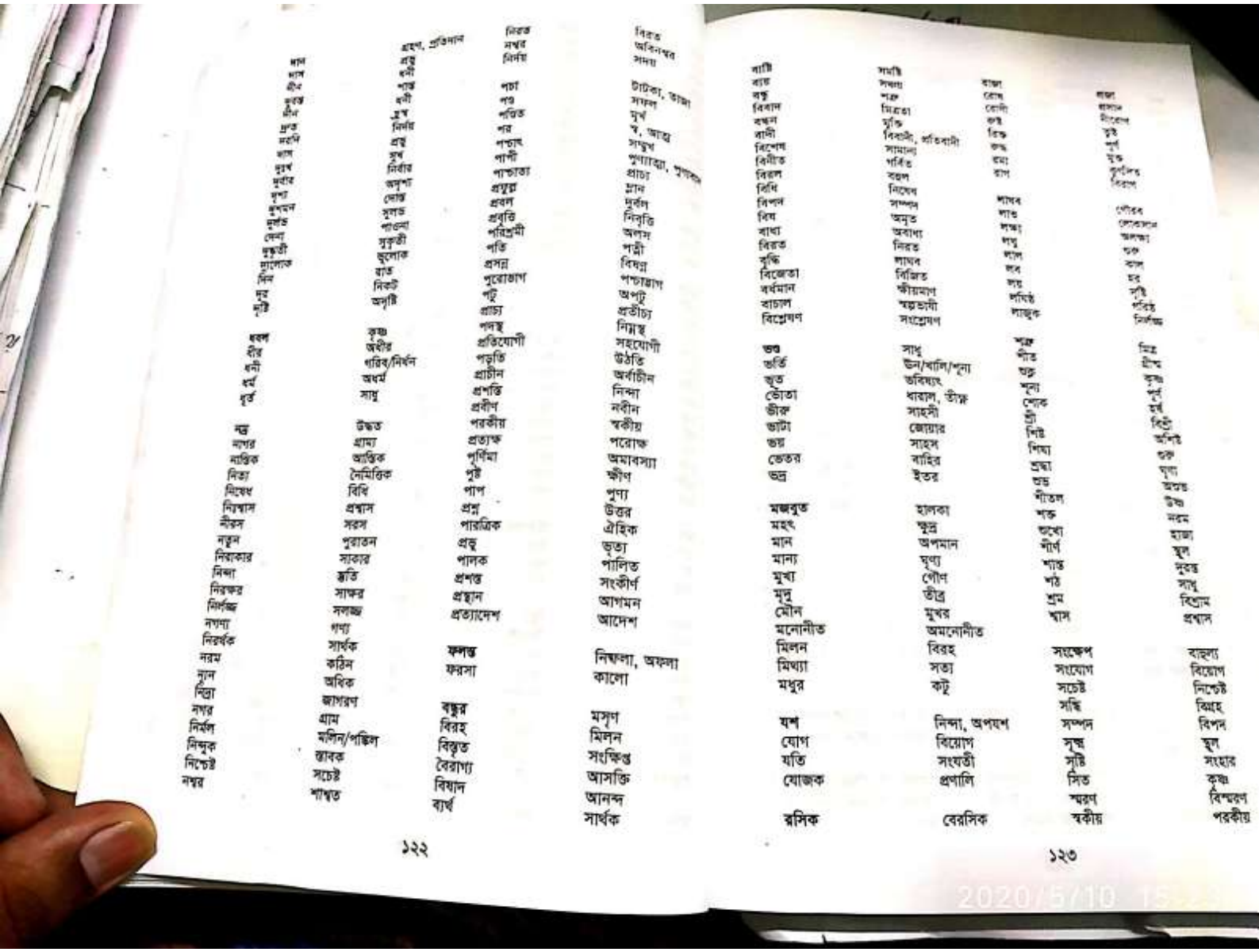

দাস
দাস
ধীর
ধ্রুবক
ধ্রুব
দ্রুত
নদী
দ্রাস
দুঃখ
দুর্বার
দৃশ্য
দুশমন
দুর্লভ
দেনা
দুষ্কৃতী
দুলোক
দিন
দূত
দৃষ্টি

ধবল
ধীর
ধনী
ধর্ম
ধূর্ত

নত্র
নগর
নাস্তিক
নিত্য
নিষেধ
নিশ্বাস
নীরস
নতুন
নিয়াকার
নিন্দা
নিরক্ষর
নির্লজ্জ
নগণ্য
নিরর্থক
নরম
নূন
নিদ্রা
নগর
নির্মল
নিন্দুক
নিশ্চেষ্ট
নশ্বর

গ্রহণ, প্রতিদান
প্রভু
ধনী
শান্ত
ধনী
দুঃখ
নির্মিত
প্রভু
সুখ
নির্বাক
অনুশা
ভোজ্য
সুলভ
পাওনা
সুকৃতী
ভূলোক
রাত
নিকট
অবৃষ্টি

কৃষ্ণ
অতীত
পরিবর্/নির্ধন
অধর্ম
সাধু

উদ্ধত
গ্রাম্য
আন্তিক
নৈমিত্তিক
বিধি
প্রশ্বাস
সরস
পুরাতন
সাকার
স্তুতি
সাক্ষর
সলজ্জ
গণ্য
সার্থক
কঠিন
অধিক
জাগরণ
গ্রাম
মলিন/পঙ্কিল
স্তাবক
সচেষ্ট
শাশ্বত

নিরত
নশ্বর
নির্দয়

পচা
পণ্ড
পতিত
পর
পশ্চাৎ
পাপী
পাতাতা
প্রচুর
প্রবল
প্রবৃত্তি
পরিশ্রমী
পতি
প্রসন্ন
পুরোভাগ
পটু
প্রাচ্য
পদস্থ
প্রতিযোগী
পড়তি
প্রাচীন
প্রশস্তি
প্রবীণ
পরকীয়
প্রত্যক্ষ
পূর্ণিমা
পুষ্ট
পাপ
প্রশ্ন
পারত্রিক
প্রভু
পালক
প্রশস্ত
প্রস্থান
প্রত্যাদেশ

ফলন্ত
ফরসা

বন্ধুর
বিরহ
বিস্তৃত
বৈরাগ্য
বিষাদ
ব্যর্থ

বিরত
অবিনশ্বর
সদয়

টাটকা, তাজা
সফল
মূর্খ
স্ব, আত্ম
সম্মুখ
পুণ্যাত্মা, মহাপ্রাণ
প্রাচ্য
ম্লান
দুর্বল
নিবৃত্তি
অলস
পত্নী
বিদগ্ধ
পশ্চাদ্ভাগ
অপটু
প্রতীচ্য
নিম্নস্থ
সহযোগী
উঠতি
অর্বাচীন
নিন্দা
নবীন
স্বকীয়
পরোক্ষ
অমাবস্যা
ক্ষীণ
পুণ্য
উত্তর
ঐহিক
ভৃত্য
পালিত
সংকীর্ণ
আগমন
আদেশ

নিষ্ফলা, অফলা
কালো

মসৃণ
মিলন
সংক্ষিপ্ত
আসক্তি
আনন্দ
সার্থক

সাহি
ব্যস্ত
বন্ধু
বিবাদ
বন্ধন
বাদী
বিশেষ
বিনীত
বিরল
বিধি
বিপদ
বিষ
বাধা
বিরত
বুদ্ধি
বিজেতা
বর্ধমান
বাচাল
বিশ্লেষণ

ভক্ত
ভর্তি
ভূত
ভীতা
ভীরু
ভাটা
ভয়
ভেতর
ভদ্র

মজবুত
মহৎ
মান
মান্য
মুখ্য
মৃদু
মৌন
মনোনীত
মিলন
মিথ্যা
মধুর

যশ
যোগ
যতি
যোজক

রসিক

সমষ্টি
সম্পদ
শত্রু
মিত্রতা
সৃষ্টি
বিবাদী, শান্তিবাদী
সামান্য
পর্বত
বহুল
নিষেধ
সম্পদ
অমৃত
অবাধ্য
নিরত
লাঘব
বিজিত
ক্ষীয়মাণ
স্বল্পভাষী
সংশ্লেষণ

সাধু
ঊন/খালি/শূন্য
ভবিষ্যৎ
ধারাল, তীক্ষ্ণ
সাহসী
জোয়ার
সাহস
বাহির
ইতর

হালকা
ক্ষুদ্র
অপমান
ঘৃণ্য
গৌণ
তীব্র
মুখর
অমনোনীত
বিরহ
সত্য
কটু

নিন্দা, অপযশ
বিয়োগ
সংযতী
প্রণালি

বেরসিক

রাজা
রোষ
রোদী
রুগ্ন
রিক্ত
রুদ্ধ
রমা
রাগ

লাঘব
লাভ
লজ্জা
লঘু
লাল
লব
লয়
লম্বিষ্ঠ
লাজুক

শত্রু
শীত
শুক্ল
শূন্য
শোক
শ্রী
শিষ্ট
শিক্ষা
শ্রদ্ধা
শুভ্র
শীতল
শক্ত
শুখো
শীর্ণ
শান্ত
শঠ
শ্রম
শ্বাস

সংক্ষেপ
সংযোগ
সচেষ্ট
সন্ধি
সম্পদ
সুস্থ
সৃষ্টি
সিত
স্মরণ
স্বকীয়

রাজা
রাজন
রীতিমত
দুই
পূর্ণ
যুক্ত
বুদ্ধিমান
বিরাগ

গৌরব
গোরাচাদ
অলক্ষ্য
গুরু
কাল
হর
সৃষ্টি
পরিষ্কার
নির্লজ্জ

মিত্র
হীন
কৃষ্ণ
পূর্ণ
হর্ষ
বিষ্টি
অর্জিত
শুক্ল
ঘৃণা
অসত্য
উষ্ণ
নরম
হাজা
স্থূল
দুরন্ত
সাধু
বিশ্রাম
প্রধান

বাহুল্য
বিয়োগ
নিশ্চেষ্ট
বিগ্রহ
বিপদ
স্থূল
সংহার
কৃষ্ণ
বিস্মরণ
পরকীয়

Scanned with CamScanner

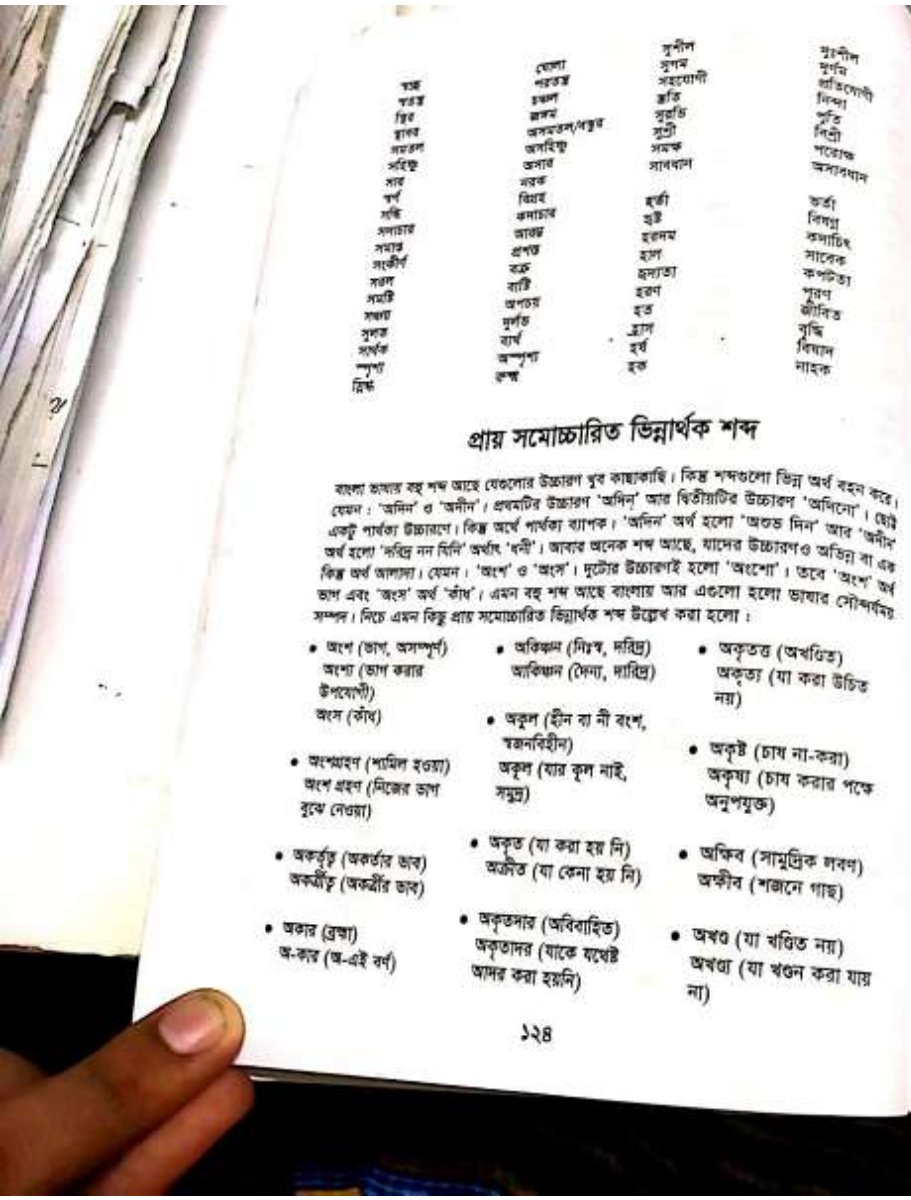

প্রায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ

বাংলা ভাষার বহু শব্দ আছে যেগুলোর উচ্চারণ খুব কাছাকাছি। কিন্তু শব্দগুলো ভিন্ন অর্থ বহন করে। যেমন : 'অদিন' ও 'অদীন'। প্রথমটির উচ্চারণ 'অদিন্' আর দ্বিতীয়টির উচ্চারণ 'অদিনো'। ছোট একটু পার্থক্য উচ্চারণে। কিন্তু অর্থে পার্থক্য ব্যাপক। 'অদিন' অর্থ হলো 'অশুভ দিন' আর 'অদীন' অর্থ হলো 'দরিদ্র নন যিনি' অর্থাৎ 'ধনী'। আবার অনেক শব্দ আছে, যাদের উচ্চারণও অভিন্ন বা এক কিন্তু অর্থ আলাদা। যেমন। 'অংশ' ও 'অংস'। দুটোর উচ্চারণই হলো 'অংশো'। তবে 'অংশ' অর্থ ভাগ এবং 'অংস' অর্থ 'কাঁধ'। এমন বহু শব্দ আছে বাংলায় আর এগুলো হলো ভাষার সৌন্দর্যময় সম্পদ। নিচে এমন কিছু প্রায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ উল্লেখ করা হলো :

- অংশ (ভাগ, অসম্পূর্ণ) অংশ্য (ভাগ করার উপযোগী) অংস (কাঁধ)
- অংশগ্রহণ (শামিল হওয়া) অংশে গ্রহণ (নিজের ভাগ বুঝে নেওয়া)
- অকর্তৃত্ব (অকর্তার ভাব) অকর্মীত্ব (অকর্মীর ভাব)
- অকার (ব্রহ্মা) অ-কার (অ-এই বর্ণ)
- অকিঞ্চন (নিঃস্ব, দরিদ্র) আকিঞ্চন (দৈন্য, দারিদ্র)
- অকূল (হীন বা নীচ বংশে, স্বজনবিহীন) অকূল (যার কূল নাই, সমুদ্র)
- অকৃত (যা করা হয় নি) অক্রীত (যা কেনা হয় নি)
- অকৃতদার (অবিবাহিত) অকৃতাদর (যাকে যথেষ্ট আদর করা হয়নি)
- অকৃতত্ত্ব (অখণ্ডিত) অকৃত্য (যা করা উচিত নয়)
- অকৃষ্ট (চাষ না-করা) অকৃষ্য (চাষ করার পক্ষে অনুপযুক্ত)
- অক্ষিব (সামুদ্রিক লবণ) অক্ষীব (শজনে গাছ)
- অখণ্ড (যা খণ্ডিত নয়) অখণ্ড্য (যা খণ্ডন করা যায় না)

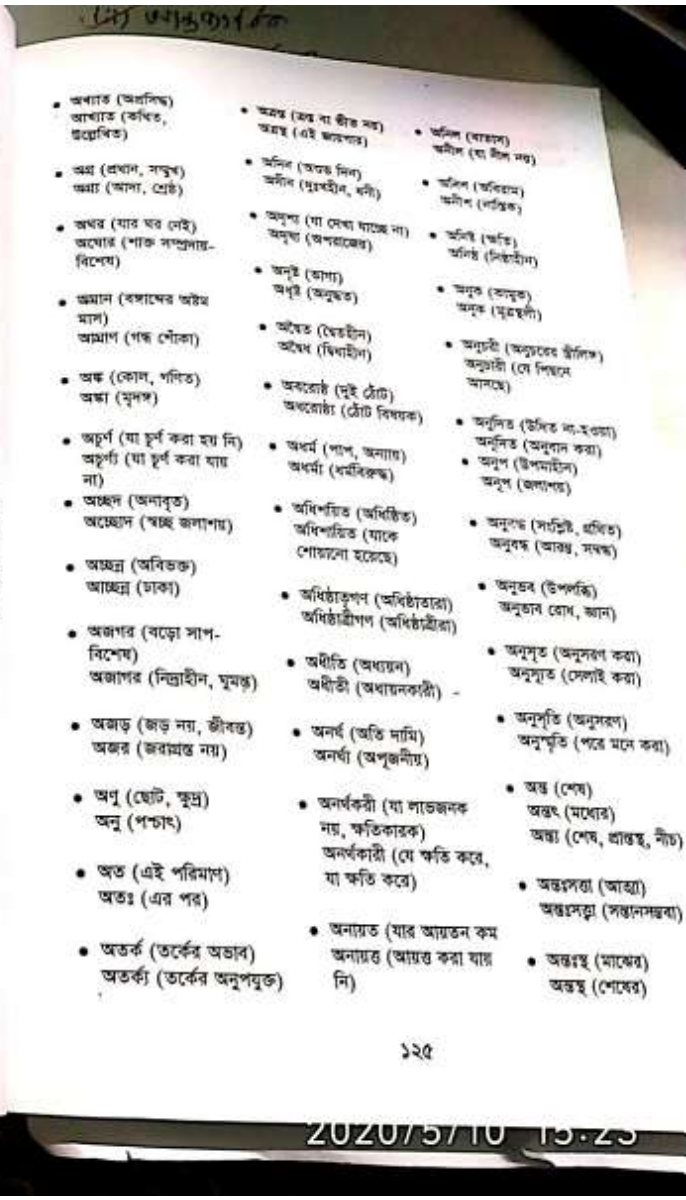

- অখ্যাত (অপ্রসিদ্ধ) আখ্যাত (কথিত, প্রস্তোবিত)
- অগ্র (প্রধান, সম্মুখ) অগ্র্য (আগা, শ্রেষ্ঠ)
- অঘর (যার ঘর নেই) অঘোর (শাক সম্প্রদায়-বিশেষ)
- অঘ্রান (বঙ্গাব্দের অষ্টম মাস) আঘ্রাণ (গন্ধ শোঁকা)
- অঙ্ক (কোল, গণিত) অঙ্কা (মৃদঙ্গ)
- অচূর্ণ (যা চূর্ণ করা হয় নি) অচূর্ণ্য (যা চূর্ণ করা যায় না)
- অচ্ছদ (অনাবৃত) অচ্ছোদ (স্বচ্ছ জলাশয়)
- অচ্ছন্ন (অবিভক্ত) আচ্ছন্ন (ঢাকা)
- অজগর (বড়ো সাপ-বিশেষ) অজাগর (নিদ্রাহীন, ঘুমন্ত)
- অজড় (জড় নয়, জীবন্ত) অজর (জরাগ্রস্ত নয়)
- অণু (ছোট, ক্ষুদ্র) অনু (পশ্চাৎ)
- অত (এই পরিমাণ) অতঃ (এর পর)
- অতর্ক (তর্কের অভাব) অতর্ক্য (তর্কের অনুপযুক্ত)
- অত্রস্থ (এর বা জীব নয়) অত্রস্থ (এই জায়গার)
- অদিন (অশুভ দিন) অদীন (দুরবস্থাহীন, ধনী)
- অদৃশ্য (যা দেখা যাচ্ছে না) অদৃষ্য (অপরাজেয়)
- অদৃষ্ট (আগা) অদৃষ্ট (অদৃষ্টবাদ)
- অধৈত (দ্বৈতহীন) অদ্বৈধ (দ্বিধাহীন)
- অধরোষ্ঠ (দুই ঠোঁট) অধরোষ্ঠ্য (ঠোঁট বিষয়ক)
- অধর্ম (পাপ, অন্যায়) অধর্ম্য (ধর্মবিরুদ্ধ)
- অধিশয়িত (অধিষ্ঠিত) অধিশায়িত (যাকে শোয়ানো হয়েছে)
- অধিষ্ঠাতৃগণ (অধিষ্ঠাতারা) অধিষ্ঠাত্রীগণ (অধিষ্ঠাত্রীরা)
- অধীতি (অধ্যয়ন) অধীতী (অধ্যয়নকারী)
- অনর্ঘ (অতি দামি) অনর্ঘ্য (অপূজনীয়)
- অনর্থকরী (যা লাভজনক নয়, ক্ষতিকারক) অনর্থকারী (যে ক্ষতি করে, যা ক্ষতি করে)
- অনায়ত্ত (যার আয়তন কম অনায়ত্ত (আয়ত্ত করা যায় নি)
- অনিল (বায়ুদাস) অনীল (যা নীল নয়)
- অনিশ (অবিরাম) অনীশ (নপুংসক)
- অনিষ্ট (ক্ষতি) অনিষ্ট (নিষ্টাহীন)
- অনুক (অনুকূল) অনূক (মূর্খমণ্ডলী)
- অনুচারী (অনুচরের স্ত্রীলিঙ্গ) অনুচারী (যে পিছনে আসছে)
- অনুদিত (উদিত না-হওয়া) অনূদিত (অনুবাদ করা)
- অনুপ (উপমাহীন) অনূপ (জলাশয়)
- অনুবদ্ধ (সংশ্লিষ্ট, গ্রথিত) অনুবন্ধ (আরম্ভ, সম্বন্ধ)
- অনুভব (উপলব্ধি) অনুভাব (বোধ, জ্ঞান)
- অনুসৃত (অনুসরণ করা) অনুসৃত (সেলাই করা)
- অনুস্মৃতি (অনুসরণ) অনুস্মৃতি (পরে মনে করা)
- অন্ত (শেষ) অন্তৎ (মধ্যের) অন্ত্য (শেষ, প্রান্তস্থ, নীচ)
- অন্তঃসত্ত্বা (আত্মা) অন্তঃসত্ত্বা (সন্তানসম্ভবা)
- অন্তঃস্থ (মাঝের) অন্ত্যস্থ (শেষের)

2020/5/10 13:23

Scanned with CamScanner

• অন্তরঙ্গ (ঘনিষ্ঠ)
অন্তরঙ্গ (অন্তরালী)

• অন্তর্দেশিক (একই দেশ বিষয়ক)
আন্তর্দেশিক (ভিন্ন দেশ বিষয়ক)

• অন্তর্দেশীয় (একই দেশের)
আন্তর্দেশীয় (অন্য দেশের)

• অন্তর্বেদি (দুই শিকের মধ্য, যে জমিতে দোআঁশ)
অন্তর্বেদী (যিনি মন বুঝতে পারেন)
অন্তর্ভেদী (যা অন্তরকে ভেদ করে)

• অন্ন (খাদ্য)
অন্য (ভিন্ন)

• অন্নাগতগ্রাস (যে কেবল খেতে চায়)
অন্যাগতগ্রাস (পরোপকারী)

• অন্নদা (অন্নপূর্ণা, দুর্গা)
অন্যদা (অন্য সময়)

• অন্নপুষ্ট (অন্ন অর্থাৎ খাবার খেয়ে পুষ্ট)
অন্যপুষ্ট (অপরের দ্বারা পালিত)

• অন্যভৃৎ (অন্যকে যে পালন করে, কাক)
অন্যভৃত (অপরের দ্বারা পালিত, কোকিল)

• অন্যান্য (অন্য সব)
অন্যোন্য (পরস্পর)

• অপগত (বিদূরিত)
অবগত (জানা)

• অপচয় (নষ্ট করা)
অবচয় (চয়ন)

• অপত্য (সন্তান)
অপথ্য (কুখাদ্য)

• অপর (অন্য)
অবর (অশ্রেষ্ঠ, হীন)

• অপরিস্রুত (যা পোষা হয় নি)
অপরিস্রুত (যা স্রবণ করা হয় নি, আর্দ্রাক্ত)

• অপসরণ (সরে যাওয়া)
অপসারণ (সরিয়ে দেওয়া)

• অপসৃত (সরিয়ে দেওয়া)
অবসৃত (অবসরপ্রাপ্ত)
অবসিত (অবসান হওয়া)

• অবতংস (ভূষণ)
অবদংশ (মনের চাট)

• অবতরণ (নামা)
অবতারণ (নামিয়ে আনা)

• অবদান (কৃতি)
অবধান (জানা)

• অবদ্ধ (বন্ধ নয়, খোলা)
অবদ্য (যা বলা যায় না)
অবধ্য (যাকে বধ করা উচিত নয়)

• অবলম্ব (অবলম্বন)
অবলম্ব্য (অবলম্বনের যোগ্য)

• অবলা (দুর্বল, নারী)
অবোলা (যে কথা বলতে পারে না, জীবজন্তু)

• অবাচীন (দক্ষিণ বিষয়ক)
অর্বাচীন (নবীন)

• অবি (মেষ)
অবী (রজস্বলা)

• অবিকৃত (যা বিকৃত করা হয় নি)
অবিক্রীত (যা বিক্রি হয় নি)

• অবিধেয় (যা করা উচিত নয়)
অভিধেয় (নামধারী)

• অবিনীত (উদ্ধত)
অভিনীত (অভিনয় করা)

• অবিমিশ্র (খাঁটি)
অবিমৃশ্য (অবিবেচক)

• অবিরাম (ছেদহীন)
অভিরাম (সুন্দর)

• অবিহিত (অশাস্ত্রীয়)
অভিহিত (নামধারী)

• অবেক্ষমাণ (যে দেখছে)
অপেক্ষ্যমাণ (যাকে দেখা হচ্ছে)

• অব্দি (পর্যন্ত অবধি)
অব্ধি (সমুদ্র)

• অব্যবহিত (সংলগ্ন)
অব্যবহৃত (যা ব্যবহার করা হয় নি)

• অভিক (কামুক)
অভীক (নির্ভীক, ভয়হীন)

• অভিনেতৃসংঘ (অভিনেতাদের সংঘ)
অভিনেত্রীসংঘ (অভিনেত্রীদের সংঘ)

• অভিবাসন (অন্য আস্তানায় গিয়ে বাস করা)
প্রতিভাষণ (বক্তৃতা)

• অভিসন্ধি (ফন্দি)
প্রতিসন্ধী (ক্ষরণশীল)

• অভিসার (অনুচর)
অভিসার (প্রেমাস্পদের সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ)

• অভ্যাশ (আবৃত্তি)
অভ্যাস (চর্চা)

• অমর্ত (স্বর্গ)
অমর্ত্য (স্বর্গীয়, দেবতা)

• অম্বরিষ (মুড়ি ইত্যাদি ভাজার পাত্র)
অম্বরীষ (সূর্যবংশীয় রাজা)

• অযাচ্য (চাওয়ার অযোগ্য)
অযাজ্য (যজ্ঞক্রিয়ার অযোগ্য)

• অরতি (অসন্তোষ)
অরাতি (শত্রু)

• অর্ঘ (মূল্য, দাম)
অর্ঘ্য (পূজার উপকরণ)

• অর্থ (মানে, টাকাপয়সা)
অর্থ্য (ন্যায়সংগত, ন্যায্য)

• অর্হণ (পূজা)
অর্হন (জৈন সন্ন্যাসী)

• অলক (চুলের গোছা)
অলোক (নির্জন, অসাধারণ)
অলখ (দৃষ্টির অগোচর)

• অলক্ষ (না দেয়া; লক্ষ না করা)
অলক্ষ্য (যেটা উদ্দেশ্য নয়, অলক্ষণীয়)

• অলস (শরহীন)
আলস (নাড়ি)

• অসার (স্থূলত্ব অসার)
আসার (স্থূলত্ব অসার বিষয়ক)

• অসক্ত (উপায়হীন, সাধ্যহীন)
অসক্ত (আসক্তিহীন)

• অসখ্য (অসমর্থ)
অসখ্য (বন্ধুত্বের অভাব)

• অসিত (ভক্ষিত)
অসিত (কালো)

• অসুর (বীর নয়)
অসুর (দেবতাদের শত্রু)

• অশ্ব (ঘোড়া)
অশ্ম (পাথর)

• অসাক্ষর (যার অক্ষরপরিচয় নেই)
অস্বাক্ষর (সই না-করা)

• অসার (সারবত্তাহীন)
অসার (সারবত্তাহীন)

• অস্থায়ী (বেশি দিনের জন্য নয়, ক্ষণস্থায়ী)
আস্থায়ী (গানের প্রথম অংশ)

• অস্পর্শ (স্পর্শ না করা)
অস্পর্শ্য (যা ছোঁয়া যায় না, যা ছোঁয়া উচিত নয়)

• অহার্য (অহরণীয়)
আহার্য (খাবার)

• অহিংস (অহিংস্র)
অহিংস্য (হিংসার যোগ্য নয়)

• অহিত (অনুপকার)
আহিত (লাভ)

• আঁক (শব্দ)
আঁক (সংখ্যা ৯)

• আঁচা (বন্ধ)
আঁচা (পূর্ণ পূর্ণ)
আঁচা (জোড়া লাগানোর ক্রিয়া)

• আঁচুড় (শিশুর জন্ম নিয়ামক)
আচুর (কলস)

• আঁধি (অন্ধকার, ঘুসোর যন্ত্র)
আঁধি (প্রথম)
আঁধি (রোদ)

• আঁশ, আইশ (তন্তু)
আঁশ, আইশ (অনিষ্ট)

• আঁশটে (আঁশযুক্ত)
আঁশটে (অনিষ্ট, বিশেষত মাছ সম্বন্ধীয়)

• আঙ্কনেয় (হনুমান)
আঙ্গিনেয় (টিকটিকি-জাতীয় সরীসৃপ)

• আনক (ছোট, অল্প)
আনক (আনদ্ধ যন্ত্র)

• আনি (চাকার খিল)
আনি (ষোলো ভাগের এক ভাগ)

• আত্ম (স্বীয়, আপনার)
আত্ত (গ্রাস্ত)

• আত্মগর্ব (অহংকার)
আত্তগর্ব (হতগর্ব, হতদর্প

Scanned with CamScanner

- আত্তীকরণ (আত্তীভূত করা বা আত্মসাৎ করা)
  আত্তীকরণ (দেহের মধ্যে নিয়ে নেওয়া)
- আদান (নেওয়া)
  আধান (স্থাপন)
- আদিত্য (অদিতির ভাব)
  আদিত্য (সূর্য)
- আদৃত (আদরপ্রাপ্ত)
  আবৃত্তি (যা ঢেকে দেওয়া হয়েছে)
  আবৃত (বৃত)
- আধার (পাত্র)
  আঁধার (অন্ধকার)
- আধ্মান (শব্দ)
  আধ্যান (স্মরণ)
- আনকা (অভিনয়, বিচিত্র)
  আনখা (শুধু শুধু, বিনা কারণে)
- আনিল (হনুমান)
  আনীল (ঈষৎ নীল)
- আপণ (দোকান)
  আপন (নিজের)
- আবল্য (দুর্বলতা)
  আবাল্য (বাল্যকাল থেকে)
- আবরণ (আড়াল, ঢাকনা)
  আভরণ (অলংকার)
- আবাস (বাসস্থান)
  আভাষ (আলাপ, ভাষণ)
  আভাস (আভাস, নীতি)
- আবৃত্তি (আবরণ)
  আবৃত্তি (সশব্দে পাঠ)
- আবেদ্য (আবেদনীয়)
  আভেদ্য (ভেদনযোগ্য)
- আভাষিত (যা বলা হয়েছে)
  আভাসিত (আলোয় উদ্ভাসিত)
- আমরা (আমি ও অন্যরা)
  আমড়া (ফল-বিশেষ)
- আমর্শ (স্পর্শ)
  আমর্ষ (ক্রোধ)
- আয়ত (বিস্তৃত)
  আয়ত্ত (দখলিত)
  আয়াত (কোরানের বাণী)
- আয়তি (সধবা)
  আয়ত্তি (বশ্যতা)
- আয়াস (চেষ্টা)
  আয়েশ (আরাম)
- আয়াসী (পরিশ্রমী)
  আয়েশি (আরামে অভ্যস্ত)
- আর (এবং, এর বেশি, অথবা)
  আড় (প্রস্থ, আড়াল, বাঁকা)
- আরত (কোনো কাজে লিপ্ত)
  আড়ত (পণ্য মজুত ও বিপণনের জায়গা)
- আরতি (পুজো)
  আরাতি (শত্রু)
- আরভমাণ (যে শুরু করেছে)
  আরভ্যমাণ (যা শুরু করা হয়েছে)
- আরোহণী (সিঁড়ি)
  আরোহিণী (আরোহণকারিণী)
- আর্হত (জৈন দিগম্বর)
  আহত (আঘাতপ্রাপ্ত)
- আলশে (ছাদের মাস্তু)
  আলসে (অলস)
- আশক্ত (শক্ত, সমর্থ)
  আসক্ত (একান্ত অনুরক্ত, নেশামত্ত)
- আশয় (মন, আধার)
  আশ্রয় (থাকার জায়গা)
- আশা (আকাঙ্ক্ষা)
  আসা (আগমন)
- আশি (৮০ সংখ্যা)
  আশী (ভোজী, বিষদাঁত)
- আশিস (আশীর্বাদ)
  আশীষ (শীর্ষ পর্যন্ত)
- আশ্বিন (বাংলা মাস)
  আশ্বীন (ঘোড়ার একদিনের পথ)
- আষাঢ় (বঙ্গাব্দের তৃতীয় মাস)
  আসার (প্রবল বৃষ্টি)
- আসক্তি (অনুরাগ, অনুরক্তি)
  আসত্তি (নিকটতা)
- আহব (যুদ্ধ)
  আহাব (জলপাত্র-বিশেষ)
- আহরিৎ (ঈষৎ সবুজ)
  আহরিত, আহৃত (সংগৃহীত)
- আহিড়ি (ব্যাধ)
  আহিরি (গোপী)

- আহুত (যজ্ঞের আগুনে সমর্পিত)
  আহূত (যাকে ডাকা হয়েছে)
- আহুতি (যজ্ঞে সমর্পণ)
  আহূতি (ঢাকা)
- ঋতি (শেষ)
  ঋতি (ফসল উৎপাদনে বিঘ্ন)
- ইনাম (পুরস্কার)
  ইমান (ধর্ম, বিশ্বাস)
  ইমাম (ইসলাম ধর্মগুরু)
- ইন্দ্রিয়গোচর (ইন্দ্রিয় দিয়ে যা অনুভব করা যায়)
  ইন্দ্রিয়াগোচর (ইন্দ্রি দিয়ে যা অনুভব করা যায় না)
- ঈশা (যিশু খ্রিষ্ট)
  ঈষা (লাঙল)
- উঁকি (আড়াল থেকে দেখা)
  উকি (হেঁচকি)
- উঁচকপালি (কপাল-উঁচু মেয়ে)
  উচকপালে (কপাল-উঁচু ছেলে)
- উক্থ (সামবেদ)
  উক্ত (কথিত)
- উচ্ছোষণ (শুষে নেওয়া)
  উচ্ছ্বসন (উচ্ছ্বাস)
- উচ্ছোষিত (শোষিত)
  উচ্ছ্বাসিত (স্ফীত, ভাবাবেগে আকুল)
- উৎপত (পাখি)
  উৎপথ (বিপথ)
  উৎপা (উপদ্রব)
- উদ্গীত (উচ্চকণ্ঠে গীত, নিনাদিত)
  উদ্গীথ (সামবেদের গান)
- উদর (পেট)
  উদার (মহৎ)
- উদ্দেশ (সন্ধান)
  উদ্দেশ্য (লক্ষ্য, মতলব, অভিপ্রায়)
- উদ্ধত (দুর্বিনীত)
  উদ্যত (উদ্গীরণ)
- উদ্গার (জোর শব্দ, চিৎকার)
  উদ্গার (পাগল)
- উন্নীত (উত্তোলিত)
  উন্নিদ্র (ওজন-করা)
- উন্মীলন (খোলা, উন্মোচন)
  উন্মূলন (উৎপাটন)
- উপকণ্ঠ (কাছাকাছি জায়গা)
  উপকণ্ঠা (উপকণ্ঠ বিষয়ক)
- উপকরণ (প্রয়োজনীয় জিনিস)
  উপাকরণ (বেদ অনুশীলন আরম্ভ)
- উপগ্রহ (গ্রহের অনুষঙ্গী ছোটো গ্রহ)
  উপগ্রাহ (উপহার)
- উপধি (ছল, চাতুরী, রথের চাকা)
  উপাধি (পদবি, উপনাম)
- উপনয় (আগমন)
  উপায় (উপহার)
- উপপুত (ছিন্নভিন্ন ক্ষেত, ইলিশ)
  উপাপুত (পর্যবসিত, পুনরাগত, পূর্ণপত)
- উপযুক্ত (যোগ্য, মানানসই)
  উপর্যুক্ত (উপরিউক্ত)
- উপহার (পুরস্কার)
  উপাহার (জলযোগ)
- উপাসন (উপকরণ)
  উপাধান (বালিশ)
- উপাসেব (সুস্বাদু)
  উপাস্যে (নামধারী)
- উপাধ্যায়া, উপাধ্যায়ী (শিক্ষিকা, উপসেনিনী)
  উপাধ্যায়ানী (অধ্যাপকের স্ত্রী, পণ্ডিতের স্ত্রী)
- উপান্ত (প্রান্ত)
  উপান্ত্য (প্রান্তবর্তী)
- উপাসিত (পূজিত)
  উপোসিত (অভুক্ত)
- উপাত্তি (উপাসনা, লক্ষ্যভেদ, শিক্ষা)
  উপাস্থি (হাড়ের মতো অথচ নরম প্রত্যঙ্গ)
- উমান (পরিমাণ)
  উমানো (গরম করা)
- উরু (বিশাল)
  উরু (কুঁচকি থেকে হাঁটু পর্যন্ত দেহাংশ)
- উহ্য (ভয়ে নিয়ে যাওয়া মতো)
  উহ্য (অনুপস্থিত, অনু

Scanned with CamScanner

• ঋদ্ধি (সফল)
ঋদ্ধি (প্রথা)

• একলা (কোনো সময়)
একবা (এক প্রকারে)

• ঐশিক (ঈশ্বর বিষয়ক)
ঐহিক (কাল-বিশেষ)
ঐহীক (হাতের চতুষ্পোনত বিষয়ক)

• ওজন (ভার)
ওজোন (তিন পরমাণুবিশিষ্ট অক্সিজেন অণু)

• ওষধি (জল শুকালে যে-গাছ মরে যায়)
ঔষধি (রোগের চিকিৎসা)

• ওষ্ঠ (ওপরের ঠোঁট)
ওষ্ঠ্য, ঔষ্ঠ্য (ঠোঁট বিষয়ক, ঠোঁট সম্পর্কিত)

• ঔকা (ষাঁড়ের পাল)
ঐকা (রাস্তাকরা খাবার)

• ঔপচিত (ধর্মসংগত, উপযোগী)
উপচিত (উপচয় বিষয়ক, উপচারযুক্ত)

• কটীল (কাল, জোয়ার)
কোটীল (প্রবহী)

• কটি (কোমর)
কোটি (এক-পো শঙ্খ)

• কড়কড় (বাজ ইত্যাদির শব্দ)
কড়কড় (রাশি ইত্যাদির জন্য মজবুত)

• কড়কা (ঘমক)
কড়কা (শিলা, শিলাবৃষ্টি)

• কড়ি (টাকা-পয়সা)
কড়ী (হাতি)

• কণ্ঠ (গলা)
কণ্ঠ্য (কণ্ঠ বিষয়ক, কণ্ঠে উচ্চারিত)

• কণ্ঠি (বৈষ্ণবদের গলার মালা)
কণ্ঠী (কণ্ঠস্বরযুক্ত)

• কণ্ঠ্য (বাজ পড়ার শব্দ)
কড়াত (কাঠ চেরাইয়ের যন্ত্র)

• কথক (তাত্ত্বিক বৃত্তা-বিশেষ)
কত্থক (যিনি বলেন, কথকতা করেন যিনি)

• কন্দর (গুহা)
কন্ধর (কাঁকর)

• কপটি (প্রবঞ্চক, ঠগ)
কপাটী (হাডুডু খেলা)

• কপাল (ললাট)
কপোল (গাল, গণ্ড)

• কপালি (চৌকাঠের মাথা, অট্টিপ্রস্তরকারী)
কপালী (মহাদেব)

• কপোত (পায়রা)
খপোত (বিমান)

• কপোতপালি (পাকা বাড়ির কার্নিশ)
কপোতপালী (পায়রার খোপ)

• কবচ (বর্ম, সাঁজোয়া)
কবচ্চ (মাদুলি)

• কমঠ (কাছিম)
কমঠ (কর্মপক্ষ)

• কমনীয় (সুন্দর)
কামনীয় (কাম্য)

• কমল (পদ্ম)
কোমল (পেলব, নরম)

• কবিরা (হাতির দাঁত)
কবীরা (বিশিষ্ট পোকা)

• কবচি (কাঁকড়া)
কবকোট (ঠোঁট নিম-বিশেষ কাঁকরোল)

• কর্ণ (কান)
কার্ণী (কান বিষয়ক)

• কর্ণি (কামান)
কার্ণী (কান বিষয়ক, কার্ণযুক্ত)

• কর্তৃত্ব (কর্তার ভাব, ক্ষমতা)
কার্ত্তৃত্ব (কর্তীর ভাব)

• কর্দুর (সোনা)
কর্দুর (রাজকন)

• কলসি, কলসে (চাঁকা খাওয়ার কলসের মুখ-বিশেষ)
কাঙ্ক্ষি (অবতার)

• কল্প (তাৎসমূহ, কল্পনা)
কল্পা (কল্পনার যোগ্য)

• কল্প (বর্বর)
কাল্প (কাল)

• কশ (ঠোঁটের পার্শ্ব)
কষ (কষায় দ্রব্য)

• কশা (চাবুক)
কষা (কষটে)

• কষায় (তিক্ত, কটু)
কাষায় (গৈরিক)

• কষ্টি (নিকষ)
কোষ্টী (জন্মপত্রিকা)

• কাক (বক-জাতীয় পাখি)
কাঁখ (কোল)
কাক (সাধারণ কাক)

• কাঁড়া (অপঙ্গ)
কাড়া (কাপড় ইত্যাদি জল দিয়ে ধোওয়া)

• কাঁড়া (ধানের তুষ ছাড়ানো, পরিষ্কার করা)
কাড়া (ঝিনিয়ে নেওয়া)

• কাঁটা (কণ্টক)
কাটা (কর্তন)

• কাঁসা (কাংস্য)
কাশা (শাক)

• কাঁসানে (যা কাঁসায়)
কাঁসুনি (কাংস্যকাটি)
কাঁসুনে (যে কাঁদে)

• কাঁসা (সংকর ধাতু-বিশেষ)
কাশা (গলা খক খক করা)

• কাঁসার (কাঁসার তৈরি বাদ্যযন্ত্র)
কাসর (মোষ)
কাসার (জলাশয়)

• কাঁসি (কাঁসার থালা)
কাশি (কাশ রোগ)
কাশী (কাশীধাম)

• কাকি (কাকিমা)
কাকী (মাসি কাক)

• কাপালি (শুভ্র জাতি-বিশেষ)
কাপালী (শিব)

• কাষ্ণ (স্ত্রীবৃক্ষ বিষয়ক)
কাষ্ণা (কালো রং)

• কালি (লেখার কালি)
কালী (দেবী কালিকা)

• কাশ (কাশি)
কাষ (বস্তিশাখর)

• কাশীশ (শিব)
কাসীস (ধিরাকস)

• কি (প্রশ্নবাচক অব্যয়)
কী (প্রশ্নবাচক সর্বনাম)

• কির (সংযোগ)
কীর (শুক পাখি)

• কিল (হাতের মুঠো দিয়ে আঘাত)
কীল (পেরেক, পাকাল)

• কীকশ (চওড়া)
কীকস (কর্কশ)

• কীর্তি (ভালো কাজ)
কৃতি (বাসস্থান)

• কুচ (স্তনাগ্রফল)
কুচ (স্তন)

• কুচি (কুঞ্চিত অংশ)
কুচি (টুকরো)

• কুঁড়োনো (কুঞ্চিত করা)
কুড়োনো (টুকরো করা)

• কুড়ি (কুড়ুল)
কুড়ি (সংখ্যা ২০)

• কুজন (খারাপ মানুষ, দুর্জন)
কূজন (পাখির ডাক)

• কুতি (দেশ-বিশেষ, ওই দেশের রাজা)
কুত্তী (পাণ্ডবদের মা)

• কুল (বংশ)
কূল (তীর)

• কুলাস (পর্যাপ্ততা)
কুলানো, কুলোনো (কুলিয়ে যাওয়া)

• কুলি (মোটবাহক)
কুলী (কুলীন)

• কুলা (খাল)
কুল্লা (কুলকুচো)

• কুষ্ঠি (কোষ্ঠী)
কুষ্ঠী (কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত)

• কুসম (উষ্ণদুগ্ধ)
কুসুম (ফুল)

• কুহু (কোকিলের ডাক)
কুহূ (অমাবস্যা)

• কৃত (যা করা হয়েছে)
ক্রীত (যা কেনা হয়েছে)

• কৃতঘ্ন (উপকার স্বীকার যে করে না)
কৃতজ্ঞ (উপকার স্বীকারকারী)

• কৃতি (কাজ করণ, সম্পাদন)
কৃতী (সফলকাম)

Scanned with CamScanner

• কৃত (কর্তিত)
কৃতা (কর্তনীয়)

• কেশ (চুল)
কেস (মামলা, ঘটনা)

• কৈশিক (কেশ বিষয়ক, সূক্ষ্ম)
কৌশিক (বেশমি, জনৈক মুনির নাম)

• কোঁড়া (বাঁশ বেত প্রভৃতির অঙ্কুর)
কোড়া (চাবুক)
কোরা (নতুন)

• কোণ (দুই সরল রেখার সংযোগস্থান)
কোন (বিশেষ কিছু জানার জন্য প্রশ্ন)

• কোমল (কাপড়া)
কম্বল (কম্বলাগাছ, অঙ্কুর)

• ক্রিয়মাণ (যা করা হচ্ছে)
ক্রীয়মাণ (যা কেনা হচ্ছে)

• ক্ষতি (লোকসান)
খতি (কাপড়ের জমি, ঘুস)

• ক্ষত্রিয়া, ক্ষত্রিয়াণী (ক্ষত্রীয় রমণী)
ক্ষত্রিয়ী (ক্ষত্রিয়ের পত্নী)

• ক্ষর (ক্ষরণ)
খড় (বিচালি)
খর (তীব্র, প্রবল)

• ক্ষুৎ (খিদে, হাঁচি)
খুঁত (দোষ)

• খটমট (ধ্বন্যাত্মক শব্দ)
খটোমটো (জটিল, অসহজ)

• খটাশ (জাম)
খটাস (ধ্বন্যাত্মক শব্দ)

• খণ্ড (টুকরো)
খণ্ড (যা খণ্ডন করা যায়, খণ্ডনীয়)

• খস খস (ঘষার শব্দ)
খসখস (বেনার মূল দিয়ে তৈরি আচ্ছাদন কিংবা পর্দা)

• খাট (পালঙ্ক)
খাটো (ছোটো)

• খাদি (খন্দর)
খাদী (খাদক)

• খাম (লেফাফা)
ক্ষাম (কৃশ, দুর্বল)

• খিঁচ (দাঁত-মুখের বিকৃতি)
খিচ (কাপড়া, কথা কাটাকাটি)

• খুঁট (প্রান্ত)
খুট (টোকা মারার শব্দ)

• খুঁড়ি (পশু নারী)
খুড়ি (কাকিমা)
খুরি (মাটির ছোটো ভাঁড়)

• খুর (গবাদি পশুর পায়ের নীচের শক্ত অংশ)
ক্ষুর (দাড়ি-চুল কামানোর ছুরি)

• খুরা (আসবাবপত্রের ছোট পায়া)
খুড়া (কাকা)

• খুরো (আসবাবপত্রের ছোট পায়া)
খুড়ো (কাকা)

• খোঁজা (সন্ধান করা)
খোজা (নপুংসক প্রহরী)

• খোঁয়াড় (গরু, মহিষ প্রভৃতি রাখার জায়গা)
খোয়ার (দুর্গতি)

• গৎ (ধারা, নিয়ম, ধারা বা বোল)
গত্ত (অতীত)

• গর্ব (অহংকার)
গর্ভ (অভ্যন্তর, উদর)

• গলৎ (যা গলছে)
গলদ (ভুল)

• গাঁথা (গ্রন্থন করা বা নির্মাণ)
গাথা (কাব্য, কাহিনি)

• গাঁদা (ফুল-বিশেষ)
গাদা (স্তূপ)

• গা (শরীর)
গাঁ (গ্রাম)

• গাং (নদী)
গাঙ্গ (গঙ্গা বিষয়ক)

• গাজন (চড়কের সময় শিব পুজোর উৎসব)
গাঁজন (পচে যাওয়া)

• গাদ (ময়লা)
গাধ (অগভীর)

• গায়কি (গাইবার ঢং)
গায়িকা (নারী গাইয়ে)

• গার্গি (গর্গমুনির সন্তান)
গার্গী গর্গমুনির মেয়ে)

• গিরিশ (মহাদেব)
গিরীশ (হিমালয়)

• গীতি (গান)
গীতী (গায়ক)

• গুণ (ধর্ম, প্রকৃতি)
গুন (চট, মোটা সুতলি)

• গুড় (মিষ্টি দ্রব্য-বিশেষ)
গুঢ় (লিবিড়, গোপন)

• গুরুমুখি (পাঞ্জাবি ভাষার লিপি)
গুরুমুখী (গুরুর মুখ থেকে শেখা)

• গেরিলা (গোপন যোদ্ধা)
গোরিলা (বৃহদাকৃতি বানর-বিশেষ)

• গৌড়া (রক্ষণশীল, অন্ধভক্ত)
গোড়া (আদি, শুরু, শিকড়)
গোরা (ফর্সা)

• গোলক (গোলাকৃতি ও ঘনাকৃতি বস্তু)
গোলোক (বিষ্ণুর আলয়)

• গৌড় (বাংলার, বিশেষত উত্তরবঙ্গের প্রাচীন নাম)
গৌর (ফর্সা)

• গৌরী (দুর্গা)
গৌড়ী (সংগীতের রাগিণী-বিশেষ)

• গ্রন্থি (বন্ধন)
গ্রন্থী (গ্রন্থকার)

• গ্রামণী (গ্রামের প্রধান)
গ্রামীণ (গ্রামের, গ্রাম বিষয়ক)

• ঘটক (যে ঘটায়)
ঘোটক (ঘোড়া)

• ঘটি (জল রাখার ছোটো পাত্র)
ঘটী (আড়াই দণ্ড সময়, ঘড়ি)

• ঘণ্টি (ছোট ঘণ্টা, ঘণ্টার শব্দ)
ঘন্টী (ছোট ঘণ্টা)

• ঘাঁটা (নাড়াচাড়া করা)
ঘাটা (ঘাট)

• ঘাঁটি (থাকা কিংবা রাখার জায়গা)
ঘাটি (ঘাট)

• ঘাঁটিয়াল (ঘাঁটির প্রধান)
ঘাটিয়াল (ঘাটের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি)

• ঘূর্ণমান, ঘূর্ণায়মান (যা ঘুরছে)
ঘূর্ণ্যমান (যাকে ঘোরানো হচ্ছে)

• ঘেঁষ (ঘেঁষা)
ঘেস (কয়লার ছাই)

• ঘোড় (ঘোড়া)
ঘোর (আবেশ)

• চঞ্চু (পাখির ঠোঁট)
চুঞ্চু (প্রসিদ্ধ)

• চড় (থাপ্পড়)
চর (গোপন সংবাদদাতা)

• চড়চড়ি, চচ্চড়ি (ব্যঞ্জন-বিশেষ)
চচ্চরী (প্রাচীন সংগীত)

• চড়ুল (চড়া, আরোহণ)
চরণ (পা)

• চড়া (আরোহণ করা)
চরা (নদীর চর, ঘুরে বেড়ানো)

• চতুষ্পদ (চৌরাস্তা)
চতুষ্পদ (চারপেয়ে)

• চপল (অস্থির, চঞ্চল)
চাপল (তরল, বায়বীয়)

• চর্চা (অনুশীলন)
চর্যা (পালন, নিয়ম)

• চলচ্চিত্র (চঞ্চলমতি)
চলচ্চিত্র (সিনেমা)

• চাটা (লেহন)
চাঁটা (চড়)

• চাড় (তাগিদ, তোলার চেষ্টা)
চার (সংখ্যা ৪)

• চাড়া (বলপ্রয়োগ, তোলার চেষ্টা)
চারা (ছোট গাছ)

• চাণক্য (চৌতিল্য)
চানক (চাঁদোয়া, শামিয়ানা)

• চাপা (ভর দেওয়া, পিষ্ট হওয়া)
চাঁপা (ফুল-বিশেষ)

• চাষ (কৃষিকাজ)
চাষ (নীলকণ্ঠ পাখি)

• চির (সদা, সর্বকাল)
চীর (ছেঁড়া কাপড়)

Scanned with CamScanner

• চিৎ (চিত)
চিত (চিত হয়ে শোওয়া)

• চুত (হাতের পঞ্জা-বিশেষ)
চুর (চূর্ণ, বেশআন্ত)

• চুড়ি (হাতের গয়না-বিশেষ)
চুড়ি (অপহরণ)

• চুত (আম)
চ্যুত (বিশ্লিষ্ট বা স্খলিত)

• চূর্ণ (গুঁড়ো)
চূর্ণা (চূর্ণ করার যোগ্য)

• চৈত্র (চিত্র বিষয়ক)
চৈত্রা (বৃদ্ধমন্দির, যজ্ঞবেদি)
চৈত্র (বঙ্গাব্দের দ্বাদশ মাস)

• ছ'টা (দীপ্তি)
ছ-টা (ছয় সংখ্যক)

• ছত্রি (নৌকোর ছই, খাটের ছত্রি)
ছত্রী (ছাতাধারী)

• ছাঁট (টুকরো, কাটার ধরন)
ছাট (জলের ঝাপটা)

• ছুতো (অছিলা)
ছ্যুত (অপবিত্র)

• ছাঁদ (আকৃতি, ধরন)
ছাদ, ছাত (পাকা বাড়ির ওপরের আচ্ছাদন)

• ছান্দোগ্য (বেদের মধ্যে গান-যোগ্য অংশ)
ছন্দোগ (সামবেদ গান-কর্তা)

• ছুড়ি (কিশোরী)
ছুরি (কাটার যন্ত্র)

• ছোঁড়া (কিশোর)
ছোড়া (নিক্ষেপ)
ছোড়া (বড়ো ছুরি)

• জওয়ান (সেনা, বলশালী)
জোয়ান (আঁতালো মশলা, বলশালী)

• জগতি (সিংহাসন)
জগতী (পৃথিবী, ইহলোক)

• জড় (অচেতন, প্রাণহীন)
জড়ো (একত্রিত)
জুড় (শরীরের উষ্ণতা বেড়ে যাওয়া)

• জড়া (জড়ানো)
জরা (বার্ধক্য)

• জনি (জন্ম, উৎপত্তি)
জনী (মা, নারী)

• জমক (আড়ম্বর)
যমক (অর্থালংকার-বিশেষ)

• জমি (ভূমি)
যমী (সংযমী)

• জরি (সোনালি, রূপালি প্রভৃতি রঙের সুতো)
জরী (জরাগ্রস্ত)

• জলজান (হাইড্রোজেন)
জলযান (নৌকো ইত্যাদি)

• জলা (জলময় ভূমি)
জ্বলা (প্রজ্বলন)

• জাঁতি (সুপরি কাটার যন্ত্র)
জাতি (দেশীয় জনসমষ্টি)
জাতী (ফুল-বিশেষ)

• জাড় (শীত)
জার (উপপত্নী)

• জাড়ি (কাও, ভেঙ্গি)
জারি (বলবৎ)

• জাত (অন্বিত)
যাত (বিগত)

• জান (প্রাণ)
যান (বাহন)

• জাপন (জপ করা)
যাপন (অতিবাহন)

• জাম (ফল-বিশেষ)
যাম (প্রহর)

• জাল (মেকি, নকল, মাছ ধরার জাল)
জ্বাল (আগুনে তরল জিনিস গরম করা)

• জ্বালা (মাটির বড়ো কলসি)
জ্বালা (প্রদাহ)

• জিভ (জিহ্বা)
জীব (প্রাণী)

• জুজুৎসু (জাপানি মল্লযুদ্ধ)
যুযুৎসু (যুদ্ধ করতে উৎসুক)

• জুটি (সংযোগ)
যুটি (সহচরী)

• জুড়ি (সমকক্ষ, দু-টির জোড়)
জুরি (বিচারে সাহায্যকারী মনোনীত ব্যক্তিগণ)

• জেটি (লঞ্চ, স্টিমার ভেড়াবার জায়গা)
জেঠি (বাবার দাদার স্ত্রী)
জেঠী (টিকটিকি)

• ঝোক (রক্ত-চোষা প্রাণী-বিশেষ)
ঝোক, ঝোঁক (মাপা, পরিমাপ করা)

• জোড় (সংলগ্ন, একমাত্র, যুটি)
জোর (শক্তি, সামর্থ্য)

• জ্যৈষ্ঠ (বাংলা বছরের দ্বিতীয় মাস)
জ্যৈষ্ঠা (বাংলা বছরের দ্বিতীয় মাস বিষয়ক)

• জ্যোতি (দীপ্তি)
যতি (ছেদ)
যতী (সংযমী)

• জ্যোতিষ (ভাগ্যগণনা শাস্ত্র)
যতীশ (মুনিশ্রেষ্ঠ)

• ঝরঝর (ক্রমাগত ক্ষরণ কিংবা প্রবাহের শব্দ)
ঝর্ঝর (জলপ্রবাহের শব্দ, ঝাঁঝরি, হাতা)

• ঝাঁট (ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করা)
ঝাট (এখনই, শীঘ্র)

• ঝাড়া (পরিষ্কার করা)
ঝারা (ছিদ্রযুক্ত পাত্র)

• ঝুড়ি (ছাঁটা)
ঝোরা (ঝরনা)

• টন টন (অনেক টন ওজনের)
টনটন (ব্যথা)

• টলটল (স্বচ্ছ, পরিষ্কার)
টলো-টলো (বেসামাল)

• টাক (সেলাই)
টাক (মাথায় চুলের অভাব)

• টাকা (সেলাই)
টাকা (অর্থ, আধুনীক মুদ্রার বাংলা নাম)

• টিকা, টিকে (প্রতিষেধক)
টীকা (ব্যাখ্যা, ভাষ্য)

• ট্যাড়া (তেরচা)
ট্যারা (বক্র দৃষ্টি)

• ঠক (প্রহারক, ঠোকার শব্দ)
ঠগ (দস্যু)

• ডানহাত (সহায়ক)
ডান হাত (ডান দিকের হাত)

• ঢল ঢল (ঢিলা, ভরতি ও চঞ্চল)
ঢলো-ঢলো (লাবণ্যচঞ্চল)

• তড়াক (হঠাৎ লাফ)
তড়াগ (জলাশয়)

• তড়িৎ (বিদ্যুৎ)
তরিত (পারে নীত, যে পার হয়েছে)
ত্বরিত (দ্রুত)

• তক (অবধি)
ত্বক (চামড়া)

• তক্ষণী (তক্ষণাস্ত্র)
তক্ষুনি (তখনই)

• তৎকাল (সেই সময়)
ততকাল (ততোটা সময়)

• তৎক্ষণ (সেই মুহূর্ত)
ততক্ষণ (অতটা সময়)

• তত্ত্ব (সত্য, সুসার্থ)
তত্ত্ব (খবর)

• তদীয় (তার, তাঁর)
তুদীয় (তোমার)

• তদুপদেশ (তাকে শিক্ষা করে)
তদুপদেশ (সেই অভিপ্রায়ে)

• তমস (অন্ধকার)
তমসা (নদী-বিশেষের নাম)

• তরল (পাতলা হওয়া)
ত্বরণ (বেগের ক্রমবৃদ্ধি)

• তরা (পার হওয়া)
ত্বরা (দ্রুততা)

• তরিকা (পদ্ধতি, প্রণালী)
তারিকা (তারের বল)

• তাঁত (কাপড় তৈরি যন্ত্র)
তাত (পরম, পিতৃব্য)

• তারক (হাড়ুকারী)
তারক (উদ্ধারকারী)

• তারকা (রাক্ষসী, মারীচের মা)
তারকা (তারা)

• তারণ (বকুনি, আঘাতন, পীড়াপীড়ি)
তারণ (উদ্ধারকারী)

• তারা (গোয়া, আগানো)
তারা (তারকা)

• তাদৃশ (সেইরকম, সেরূপ)
ত্বাদৃশ (তোমার তুল্য)

Scanned with CamScanner

• তালি (পটি, দুই হাত দিয়ে শব্দ করা)
তালী (তাল গাছ)

• তির (শর)
তীর (কূল)

• তুড়ি (বুড়ো আঙুলের ও অনামিকার সাহায্যে উৎপন্ন শব্দ)
তুরি (তাতের মাকু)
তূরী (রণশিঙ্গা)

• তুত (পাখির ঠোঁট)
তুন্ড (তুঁড়ি)

• তুলাধর (সূর্য)
তুলাধর (ব্যবসাদার)

• তুষ (ধানের খোসা)
তুস (পশমি কাপড়-বিশেষ)

• তেওড় (বাঁকা)
তেওর, তীবর (মৎস্যজীবী সম্প্রদায়)

• তেতলা (তিন তলা)
তেতালা (তিনতালের আবদ্ধ সংগীত)

• তোটক (সংস্কৃত ছন্দ-বিশেষ)
ত্রোটক (ছেদক, দৃশ্যকাব্যের প্রকারভেদ)

• তোশা (আসবাবপত্র)
তোষা (তোলন করা)

• ত্যাজমান (যে ত্যাগ করছে)
ত্যাজ্যমান (যাকে ত্যাগ করা হচ্ছে)

• ত্রাসন (ভয় পাওয়া)
ত্রাসন (ভয় পাওয়ানো)

• ত্রিদশ ((দেবতা, অমর)
ত্রিদোষ (বাত পিত্ত ও কফের দোষ)

• দফাদফি (দড়িতলি)
দরাদরি (দরদাম করা)

• দড়ি (রজ্জু)
দরি (গুহা)

• দণ্ড (শাস্তি, লাঠি)
দন্ড্য (দণ্ডনীয়)

• দতি (ইতে, সরু লাঠি)
দন্ডী (দণ্ডীধারী)

• দতি (দান)
দত্যি (দানব)

• দন্ত (দাঁত)
দন্ত্য (দাঁত বিষয়ক)

• দয়িত (প্রিয়)
দৈত্য (দানব)
দ্বৈত (যুগল)

• দর (দাম)
দড়ো (পটু, শক্ত)

• দর্প (রাক্ষস)
দর্ভ (ঘাস)

• দলিত (মর্দিত, নিপীড়িত)
দোলিত (যা দুলছে)

• দশ দিক (১০ সংখ্যক দিক)
দশদিক (নানান দিক, পরিপার্শ্ব)

• দশম (দশতম)
দশন (দাঁত)

• দশাশ্ব (দশ ঘোড়া)
দশাস্য (দশটি মুখ যার, রাবণ)

• দাঁড়া (দণ্ড)
দাড়া (হুল, কাঁকড়া প্রভৃতির পা)
দারা (পত্নী)
দাঁড়ি (যে নৌকোর দাঁড় টানে, পূর্ণচ্ছেদ)
দাড়ি (পুরুষের গালের দাড়ি)

• দাক্ষ (দক্ষজ)
দাক্ষ্য (নৈপুণ্য)

• দানি (পাত্র)
দানী (দানশীল)

• দানেশমন্দ (জ্ঞানী, পণ্ডিত)
দানেশমন্দি (পাণ্ডিত্যপূর্ণ, জ্ঞানগর্ভ)

• দাশ (ধীবর)
দাস (ভৃত্য)

• দিন (সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়, সূর্যোদয় থেকে পরের সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়)
দীন (দরিদ্র)

• দিননাথ (সূর্য)
দীননাথ (গরিবের ত্রাতা)

• দিনেন্দ্র (সূর্য)
দীনেশ (গরিবের ত্রাতা)

• দিয়ড়ি (দীপাবলি)
দিয়াড়ি (নদীর চড়া)

• দীপ্ত (উজ্জ্বল)
দৃপ্ত (গর্বিত)

• দ্বীপ (প্রদীপ)
দ্বিপ (হাতি)
দ্বীপ (জলবেষ্টিত ভূভাগ)

• দু-কূল (দুই বংশ, মাতৃকুল ও পিতৃকুল)
দু-কূল (জলাশয়ের দুই তীর)
দুকূল (রেশমি কাপড়)

• দুরন্বয় (বাক্য গঠনে ত্রুটি)
দুরান্বয় (দূরের জিনিসের সঙ্গে যোগ)

• দুরবস্থ (দরিদ্র)
দুরবস্থা (দারিদ্র্য)

• দুরন্ত (নির্ভুল, পরিপাটি, অনুযায়ী)
দুরন্ত (দূরে অবস্থিত)

• দুরাচর (কৃচ্ছ্রসাধ্য)
দুরাচার (দুষ্কৃতী)

• দুরালাপ (খারাপ কথা)
দুরালাপ (দূর থেকে কথা বলা)

• দুর্বধ্য (যাকে বধ করা যায় না)
দুর্বোধ্য (যা বোঝা যায় না)

• দুর্ভগ (মন্দভাগ্য)
দুর্ভোগ (দুর্গতি)

• দুর্ভগা (অভাগিনি)
দুর্ভাগা (মন্দভাগ্য)

• দুর্ভাষ (খারাপ কথা)
দূরভাষ (টেলিফোন)

• দুলারি (কন্যা)
দুলালি (আদুরে মেয়ে)

• দুষ্কৃতি (খারাপ কাজ)
দুষ্কৃতী (যে খারাপ কাজ করে)

• দূত (খবর বহনকারী, চর)
দ্যূত (পাশা খেলা)

• দূতী (মহিলা দূত)
দ্যূতি (দীপ্তি)

• দেওয়া (প্রদান করা)
দেয়া (মেঘ)

• দেবত্ব (দেবতার ভাব)
দেবত্র (দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত)

• দেশ (রাষ্ট্র, বাস করার জায়গা)
দ্বেষ (ঈর্ষা, নিরূপভাব)

• দেশি (দেশজ)
দ্বেষী (বিদ্বেষী)

• দৈন (সৈনিক, দিন সংক্রান্ত)
দৈন্য (দারিদ্র্য)

• দোধারি (দুই প্রান্ত)
দোধারী (যার দুই দিকই ধারালো)

• দ্বার (দরজা, ফটক)
দ্বার (যুক্ত কিংবা আছে অর্থে ব্যবহৃত অনুসর্গ, দণ্ড)

• দ্বিরশন (দু-বার খাওয়া)
দ্বিরসন (সাপ)

• দ্বিশত (২০০)
দ্বিষৎ (দ্বেষপূর্ণ, বিদ্বেষী)

• দ্বৈবর্ষিক (যা হতে দু-বছর লাগে)
দ্বৈবার্ষিক (যা দু-বছর অন্তর ঘটে)

• দ্রাব (গলন)
দ্রাব্য (যা গলানো যায়)

• দ্রোণি (পাত্র, কলসি)
দ্রৌণি (দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা)

• ধনন (কূপের)
ধন্য (লক্ষ্য)

• ধন্যাহক (পরিচিত)
ধন্যাহ্যক (ধনি-অনুসারী)

• ধনি (সুপণ্ডিত)
ধনী (ধনশালী)
ধ্বনি (শব্দ)

• ধন্যা (ধরনা, ধরে থাকা)
ধন্বা (ধনুকধারী)

• ধন্ব (ধনুক)
ধন্য (অনুগৃহীত)

• ধরণ (ধরা)
ধরন (প্রকার)

• ধরা (পৃথিবী)
ধড়া (কটিবস্ত্র)

• ধর্ম (ঈশ্বর বিশ্বাস, আচার-আচরণের রীতিপদ্ধতি)
ধর্ম্য (ধর্ম সংক্রান্ত)

• ধানি (ধান বিষয়ক)
ধানী (আবাস)

• ধান্য (ধান)
ধান্যক, ধান্যাক (ধনে)

• ধারি (কিনারা)
ধারী (ধারণকারী)
ধাড়ি (বয়স্ক, প্রধান)

• ধুনি (অগ্নিপাত্র)
ধুনী (নদী)

Scanned with CamScanner

• ধুপ (পতনের শব্দ)
ধূপ (ধুনো, ধোঁয়া)

• ধুম (পতনের শব্দ, আড়ম্বর)
ধূম (ধোঁয়া)

• দুদুল (ঢাকের বাজনা)
দুদল (ধোঁয়া-রং)

• ধের (মাথা, বাড়ী)
ধেয় (ধ্যানযোগ্য, শরণীয়)

• ধোঁয়া (ধুম)
ধোয়া (জল প্রভৃতি দিয়ে পরিষ্কার করা)

• ধ্বান (শব্দ)
ধ্যান (স্মরণ, চিন্তন)

• নকশি (নক্সাযুক্ত)
নকাশি (চিত্রণ, ধাতুতে খোদাইয়ের কাজ)

• নক্ত (রাত্রি)
নক্তক (ভেঁড়া কাপড়, তুচ্ছ-বস্ত্র)

• নড়ি (লাঠি)
নরি (পঙ্‌ক্তি, শ্রেণি)

• নাড়ি (ধমনী)
নারী (স্ত্রীলোক)

• নত (নীচু)
নখ (নাকের গয়না)

• নতি (প্রণতি)
নথি (কোনো বিষয় সংক্রান্ত কাগজপত্র)

• নন্দ (আনন্দ)
নন্দ্য (আনন্দদায়ক)

• নন্দিত (আনন্দিত)
নিন্দিত (নিন্দাগ্রস্তপ্রাপ্ত)

• নাপরি (মাটির কলসি)
নাগরী (প্রণয়িনী, রসিকা রমণী, দেবনাগরি লিপি, নাগরবাসিনী)

• নাচ (মৃত্য)
নাঙ্ক (শিক্ষন)

• নাচনে (যে নাচায়)
নাচুনে (যে নাচে)

• নাদি (পশুর বিষ্ঠা)
নাদী (গর্জনকারী, শব্দকারী)

• নারাচ (বাণ)
নারাজ (অরাজি)

• নারি (পারি না)
নারী (স্ত্রীলোক)
নাড়ী (শিরা)

• নাশিকা (নাশকারক)
নাসিকা (নাক)

• নিঃসজ্জ (সজ্জাহীন)
নিঃসঙ্গ (সঙ্গীহীন)
নিষঙ্গ (তূণ)

• নিঃসত্ত্ব (অসার)
নিঃস্বত্ব (অধিকারহীন)

• নিঃসরণ (বার হওয়া)
নিঃসারণ (বার করে দেওয়া)

• নিঃসাড় (সাড়াহীন)
নিঃসার (সারপদার্থহীন)

• নিকৃত (পরাভূত)
নিকৃত্ত (কর্তিত, ছেদিত)

• নিঝাত (খনন-করা)
নিখান ("নি"-স্বর, নিষাদ)

• নিচুল (বেত গাছ)
নিচোল (উত্তরীয় বস্ত্র)

• নিতি (নিত্য)
নীতি (সুপ্রণীতী, মতবাদ)

• নিদান (কারণ, সমাধান)
নিধান (আধার)

• নিধন (মৃত্যু)
নির্ধন (ধনহীন)

• নিধ্বান (ধ্বনি)
নিধ্যান (চিন্তা)

• নিপ (জলপাত্র)
নীপ (কদম)
নৃপ (রাজা)

• নিপট (লম্পট)
নিপাট (ভাঁজহীন, নিতান্ত)

• নিবর্তন (নিরতি, ক্ষান্তি)
নির্বর্তন (কোনো কাজে সমাপ্তি)

• নিবৃত (আচ্ছাদিত)
নির্বৃত (শান্তিপূর্ণ, মুক্ত, মৃত)

• নিবৃত্ত (ক্ষান্ত)
নির্বৃত্ত (সম্পাতিত, সুসম্পন্ন)

• নিবৃত্তি (নিষ্পত্তি)
নির্বৃত্তি (সম্পাদন)

• নিবেদ্য (নিবেদনের উপযুক্ত)
নৈবেদ্য (দেবতাকে প্রদত্ত)

• নিষ (নিম)
নিষক, নিষু (লেপু)

• নিয়মিত (বিধিত বিধান)
নিয়তী (দুর্গা)

• নিরত (রত, ব্যস্ত)
নীরত (বিরহ)

• নিরশন (অনশন, না খাওয়া)
নিরসন (দূরীকরণ)

• নিরস্ত্র (বিরত)
নিরস্ত্র (যার সঙ্গে অস্ত্র নেই)

• নিরাবরণ (আবরণহীন)
নিরাভরণ (অলংকারহীন)

• নিরাশ (হতাশ)
নিরাস (নিক্ষেপণ)

• নিরীক্ষমাণ (যে দেখছে)
নিরীক্ষ্যমাণ (যাকে দেখা হচ্ছে)

• নিরেস (খারাপ)
নীরেশ (বরুণদেব)

• নির্জর (জরাহীন)
নির্ঝর (ঝরনা)

• নির্বপণ (পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডদান)
নির্বাপণ (আগুন ইত্যাদি নিভিয়ে ফেলা)

• নির্বাত (বায়ুহীন)
নির্বাদ (নিন্দা)
নির্বাধ (বাধাহীন)

• নিশিত (শাণিত, ধারালো)
নিশীথ (রাত্রি)

• নিষ্কৃতি (পরিত্রাণ)
নিষ্পূর্তি (ধুম, ধুমন্ত)

• নিষধ (প্রাচীন ভারতের রাজা-বিশেষ)
নিষাদ (ব্যাধ)
নিষাদী (হস্তীচালক, মাহুত)

• নিহত (মৃত)
নিহিত (স্থাপিত, গুপ্ত)

• নীড় (পাখির বাসা)
নীর (জল)

• নুড়ি (ছোট পাথর)
নুরি (শক-জাতীয় পার্থি-বিশেষ)

• নুন (লবণ)
ন্যূন (কম, সামান্য)

• নৃত্য (অভিনয়)
নৃত্য (নাচ)

• নেতৃত্ব (নেতার কাজ, নেতার পদ)
নেত্রীত্ব (নেত্রীর কাজ, নেত্রীর পদ)

• নৈতিক (নীতি বিষয়ক)
নৈতিক (প্রতিদিনকার)

• নৈষধ (নিষেধ বিষয়ক, নল রাজা)
নৈষাদ (ব্যাধের ছেলে)
নৈষাদি (ব্যাধের ছেলে)

• ন্যায় (ক্ষতি, নাশ)
ন্যায় (ঠিক, উচিত)

• ন্যাকড়া (পুরোনো কাপড়ের টুকরো)
ন্যাকরা (হাসিতামাশা)

• পক্ষ (দল, অংশ)
পক্ষ (চোখের পাতার লোম)

• পঙ্ক (পাঁক, কাদা)
পঙ্ক (বাড়ির দেওয়ালে চুনের কাজকার্য)

• পচ্য (যা রান্না করা যেতে পারে)
পাচ্য (হজমের যোগ্য)

• পঞ্জিকা (বর্ণাঙ্ক রেখে খেলা, জুয়া)
পঞ্জিকা (তিথি নক্ষত্র দিন বার প্রভৃতির তথ্যসমৃদ্ধ বই)

• পটল (রাশি, সমূহ, আচ্ছাদন, ছাউনি)
পটোল (ফল-বিশেষ)

• পটাশ (মৌল পটাশিয়াম, পটাশিয়াম কারবোনেট, পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত নাম)
পটাস (তফাটার ধ্বন্যাত্মক শব্দ)

• পঠন (নিজে পড়া)
পাঠন (অন্যকে পড়ানো)

• পড়শ (পল্লি)
পরশ (স্পর্শ)

• পড়া (পাঠ করা, পতন)
পরা (পরিধান করা)

• পণব (বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ)
প্রণব (ওঁকার)

• পতত্র (পাখির ডানা)
পতত্রি, পতত্রী (পাখি)

Scanned with CamScanner

• পতন (পড়া, নীচে পড়া)
পত্তন (আরম্ভ)

• পত্তি (পদাতিক সৈন্য)
পত্থি (রোগীর খাবার)

• পথ (রাস্তা)
পাথ (জল)
পাত (পতন)

• পদ্ম (পদ্ম ফুল)
পদ্য (কবিতা)
পাদ্য (পা ধোয়ার জল)

• পদ্মা (লক্ষ্মী, নদী-বিশেষ)
পদ্যা (পথ)

• পদ্মালয় (পদ্ম ফুটে-থাকা জলাশয়)
পদ্মালয়া (লক্ষ্মী)

• পরক (আয়না, কাচ)
পরখ (পরীক্ষা)

• পরতু (ভিন্নতা)
পরত্র (পরকালে)

• পরভৃৎ (অপরের আশ্রয়দাতা, কাক
পরভৃত (পরাশ্রিত, কোকিল)

• পরশ্ব (পরশুদিন)
পরস্ব (অন্যের সম্পদ)

• পরাবার (পরিয়ে দেওয়ার)
পারাবার (সমুদ্র)

• পরামর্শ (আলোচনা, উপদেশ)
পরামর্ষ (সহনশীলতা)

• পরাহ্ন (অন্য বেলা, বিকেল)
পরান্ন (অপরের অন্ন)

• পরিচ্ছদ (পোশাক)
পরিচ্ছেদ (ভাগ, বইয়ের অংশ)

• পরিচ্ছন্ন (পরিষ্কার)
পরিচ্ছিন্ন (ছিন্ন, বিচ্ছিন্ন)

• পরিদান (বদল)
পরিধান (বস্ত্র)

• পরিদেবন (বিলাপ, অনুতাপ)
পরিবেদন (বড়ো ভাইয়ের আগে ছোটো ভাইয়ের বিয়ে)

• পরিযাতী (যাযাবর)
পুরোযাতী (অগ্রগামী)

• পরিষদ (সভা, গোষ্ঠী)
পারিষদ (সভা, সভাষদ)

• পরীক্ষিৎ (অভিমন্যুর ছেলে)
পরীক্ষিত (পরীক্ষা করা)

• পরুষ (কর্কশ, কঠোর)
পুরুষ (পুরুষ জাতি)

• পর্যয় (বিপর্যয়)
পর্যায় (ক্রম)

• পলল (মাংস)
পল্বল (জলাশয়)

• পসরা (বিক্রির জিনিস)
পসার (প্রভাব, নামডাক)

• পাঁজি (পঞ্জিকা)
পাজি (দুষ্ট)

• পাঁড় (ঘোরতর আকৃষ্ট)
পাড় (ধার, কিনার)
পার (তীর)

• পাঁতি (পঙ্‌ক্তি, সারি)
পাতি (সারি, সমুদয়, ছোটো)

• পাক (ঘূর্ণন, রান্না, বিপদ)
পাঁক (কাদা)

• পাকস্থলী (পরিপাক যন্ত্র)
পাকস্থালী (রান্নার পাত্র)

• পাট (তন্তু)
পাঠ (পড়া)

• পাড়া (পল্লি, নামানো)
পারা (সক্ষম)

• পাণি (হাত)
পানি (জল)

• পাবনি (পবনন্দন হনুমান)
পাবনী (পবিত্রকারিণী)

• পার্থব (স্থূলতা)
পার্থিব (জাগতিক, ঐহিক)

• পাশ (বন্ধন, সাফল্য)
পাঁশ (ছাই)

• পাশক (পাশা খেলা)
পায়ক (পায়ের অলংকার-বিশেষ)

• পিঠ (বুকের উলকো দিক)
পীঠ (দেবদেবীর আসন কিংবা অধিষ্ঠানক্ষেত্র)

• পিড়ক (ফুসকুড়ি)
পীড়ক (পীড়নকারী)

• পিড়া (বেদি)
পীড়া (রোগ)

• পিন (ছুঁচোলো শলাকা)
পীন (স্থূল, বড়ো)

• পিনাস (ছোট ও দ্রুতগামী নৌকো)
নীনাস (নাকের ক্ষতজনিত রোগ)
পিষ্ট (পেষিত)
পৃষ্ট (জিজ্ঞাসিত)

• পৃষ্ঠ (পিঠ)
পৃষ্ঠা (মোড়া)

• পুঁতি (কাচ ইত্যাদির ছোটো দানা যা দিয়ে মালা গাঁথা হয়)
পুথি (বই)
পূতি (দুর্গন্ধ)

• পুট (আবরণ)
পুট্ট (সোনা প্রভৃতি গলাবার পাত্র)

• পুড়ন (পোড়া)
পূরণ (পূর্ণ করা)

• পুত (পুত্র)
পূত (পবিত্র)

• পুর (নগর)
পুরঃ সামনে)
পূর (পরিপূরণ, জলরাশি)

• পুরি (লুচি)
পুরী (শহর, বাড়ি)
পূরী (পূরযুক্ত খাদ্য)

• পুষ্কর (পদ্ম)
পুষ্কল (পর্যাপ্ত)

• পূর্বাভাষ (আগে থাকতে বলা)
পূর্বাভাস (আগে থাকতে আভাস দেওয়া বা জানানো)

• পূর্বাহ্ন (অপের দিন)
পূর্বাহ্ণ (সকাল)

• পেখন (দর্শন, দেখা)
পেখম (ময়ূরের পেখম)

• পেশা (পুতি, ব্যবসা)
পেসা (গুঁড়ো করা)

• পেষণ (চেপা, পিষ্ট করা)
প্রেষণ (প্রবর্তনা, নিয়োগ)

• পৌঁচ (আস্তরণ)
পৌঁছ (পরিষ্কার)
পোঁচ (ক্রিমের পোঁচ)

• পৌঁছা (পরিষ্কার)
পোছা (জিজ্ঞাসা করা)

• পোগণ্ড (অল্পবয়স্ক, নাবালক)
প্রগণ্ড (বাহুর কনুই থেকে কাঁধ পর্যন্ত অংশ)

• পোশাক (পরিচ্ছদ)
পোষক (পোষণকারী)

• পৌরুষ (বীরত্ব)
পৌরুষ (পুরুষ বিষয়ক, পুরুষোচিত)

• প্রকার (রকম)
প্রাকার (প্রাচীর)

• প্রকৃত (আসল)
প্রাকৃত (চলিত, লোক-ব্যবহারোপযোগী)

• প্রজ্বল (জ্বলন্ত)
প্রোজ্জ্বল (অত্যন্ত উজ্জ্বল)

• প্রতিতি (ব্যাপ্তি)
প্রতীতি (জ্ঞান, বিশ্বাস)

• প্রতর্ক (অনুমান)
প্রতীক্ষণ (অনুমানসাধ্য)

• প্রতিক্ষণ (সবসময়)
প্রতীক্ষণ (অপেক্ষা)

• প্রতিবাত (বাতাসের বিপরীতে)
প্রতিবাদ (বিরুদ্ধে বলা)

• প্রতিভাষণ (ভাষণের উত্তরে ভাষণ)
প্রতিভাসন (আলোয় উদ্ভাসন)

• প্রতিসরণ (গতিপথ পরিবর্তন)
প্রতিসারণ (দূরীকরণ)

• প্রতীক্ষমাণ (প্রতীক্ষাকারী)
প্রতীক্ষ্যমাণ (যার জন্য প্রতীক্ষা করা হচ্ছে)

• প্রত্যহ (রোজ)
প্রত্যূহ (বাধা, তর্ক)

• প্রথিত (খ্যাত)
প্রোথিত (পোঁতা)

• প্রধান (দেওয়া)
প্রধান (মুখ্য)

• প্রধি (চাকার নেমি বা রিম)
প্রধী (বুদ্ধিমান)

• প্রবাস (বিদেশে বসবাস)
প্রভাষ (ভালোভাবে বলা)
প্রভাস (দীপ্তিময়, তীর্থ-বিশেষ)

• প্রবুদ্ধ (জ্ঞানী)
প্রবৃদ্ধ (বয়স্ক)

Scanned with CamScanner

• প্রভঞ্জন (ঝড়)
প্রাভঞ্জন (স্বাতি নক্ষত্র)

• প্রভব (উৎপত্তিস্থান)
প্রভাব (প্রতিপত্তি)

• প্রচুর (আধিক্যতা)
প্রচুত (অনেক)

• প্রমথ (শিবানুচর)
প্রমাথ (হত্যা)

• প্রমিত (প্রমাণিত, পরিমিত)
প্রমীত (প্রবঞ্চনা)

• প্রসক্তি (আসক্তি)
প্রসত্তি (প্রসন্নতা)

• প্রসব (সন্তান উৎপাদন)
প্রসভ (বলপ্রয়োগ, সহসা)

• প্রসরণ (ইতস্তত ভ্রমণ, ব্যাপ্তি)
প্রসারণ (বিস্তার করা)

• প্রসাদ (প্রসন্নতা, দেবতাকে নিবেদিত খাদ্যসামগ্রী)
প্রাসাদ (বড়ো এবং পাকা বাড়ি)

• প্রসাদন (সন্তুষ্ট করা)
প্রসাধন (অপচর্চা, সাজসজ্জা)

• প্রসাদি (দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত)
প্রসাদী (প্রসাদজনক, আনন্দের)

• প্রস্ত (দফা)
প্রস্থ (বিস্তার)

• প্রহিত (নিরস্ত, বিক্ষিপ্ত)
প্রহৃত (মার-খাওয়া)

• প্রাতিপথিক (বিপরীতগামী পথিক)
প্রাতিপদিক (বিভক্তিহীন শব্দ)

• প্রাবর (প্রাচীর)
প্রাবার (আবরণের কাপড়)

• প্রাশ (আহার)
প্রাস (প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্র-বিশেষ)

• প্রিন্সিপল (নিয়ম, নীতি)
প্রিন্সিপাল (প্রধান, মুখ্য, অধ্যক্ষ)

• প্রেস (ছাপ)
প্রেস (ছাপাখানা)

• প্রোত (প্রথিত, জড়িত)
প্রোথ (ঘোড়ার নাসিকাগ্র, প্রসিদ্ধ)

• ফলি (ফলুই মাছ)
ফলী (ফলবান, ফলিত)

• ফাঁড়া (বিপদ)
ফাড়া (চিরে ফেলা)

• ফাল্গুনি (অর্জুন)
ফাল্গুনী (ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা)

• ফুঁক (ফুৎকার)
ফুক (অতিদ্রুততার ভাব)

• ফুসফুস (শ্বাসযন্ত্র)
ফুস ফুস (ধ্বন্যাত্মক মৃদু শব্দ)

• ফোঁটা (টিপ, বিন্দু)
ফোটা (প্রস্ফুটিত হওয়া)

• ফোঁড়ন (সেলাই, ছিদ্র করা)
ফোড়ন (ব্যঞ্জনে বিশেষরকম মশলা দেওয়া)

• ফোঁড়া (বিদ্ধ করা, সেলাই)
ফোড়া (স্ফোটক, ব্রণ)

• বংশ (পরিবার, বাঁশ)
বংশ্য (বংশীয়, বংশ বিষয়ক)

• বংশগত (পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত)
বংশগত (বংশে-আসা, আয়ত্ত)

• বঁটি (মাছ তরকারি কাটার যন্ত্র)
বটি (আলজিভ)
বটী (বড়ি, বটিকা)

• বঁধু, বঁধুয়া (বন্ধু)
বধূ (পত্নী, স্ত্রী)

• বখরা (ভাগ)
বখেড়া (বাধা, প্রতিবন্ধকতা)

• বঙ্ক (বাঁকা)
বঙ্ক্য (বাঁচানোর উপযুক্ত)

• বজরা (বড়ো ও বাহারি নৌকো)
বাজরা (গম-জাতীয় শস্য)

• বজ্র (বাজ)
বর্জ্য (বর্জনীয়)
বর্য (শ্রেষ্ঠ, প্রধান)

• বট (অংশ)
বষ্ট (অবিবাহিত, বেঁটে)

• বদরি (ফুল)
বদরী (হিমালয়ের তীর্থস্থান-বিশেষ)

• বনাশ্রম (বনের মধ্যে আশ্রম)
বর্ণাশ্রম (হিন্দু ধর্মের চার বর্ণ প্রথা)

• বনিতা (নারী)
ভণিতা (কবিতার মধ্যে কবির নামোল্লেখ)

• বন্দ (বাড়ির মাপ, খণ্ড)
বন্দ্য (বন্দনীয়, পূজ্য)
বদ্ধ (রুদ্ধ, অচল, বাঁধন)
বন্ধ্য (বন্ধনযোগ্য)

• বন্দন (পূজা)
বন্ধন (বাঁধন)

• বন্দি (আবদ্ধ, কারারুদ্ধ)
বন্দী (স্তুতিগায়ক)

• বন্দিনি (কারারুদ্ধা)
বন্দিনী (বন্দনাকারিণী)

• বয়ড়া (বহেড়া)
বয়রা (বধির)

• বয়ন (বোনা)
ব্যয়ন (খরচ করা)

• বরগা (ছাদের টালি পাতার জন্য ব্যবহৃত কাঠ কিংবা লোহার পাত)
বর্গ (সমূহ, দুই সমান রাশির গুণফল)
বর্গা (ভাগচাষি)
বর্গ্য (বর্গভুক্ত)

• বরণ (অভ্যর্থনা)
বরন (বর্ণ, রং)

• বরাঙ্গনা (শ্রেষ্ঠ রমণী)
বারাঙ্গনা (বেশ্যা)

• বরাহ (শূকর)
বারাহ (শূকর বিষয়ক)

• বর্ণ (লিপি, রং)
বর্ণ্য (বর্ণ বিষয়ক, বর্ণনার যোগ্য)

• বর্তি (বাতি)
বর্তী (স্থিত)

• বর্তিষ্ণু (স্থিতিশীল)
বর্ধিষ্ণু (যা বেড়ে চলেছে)

• বর্মি (ব্রহ্মদেশবাসী)
বর্মী (বর্মধারী)

• বর্শা (হাতিয়ার-বিশেষ)
বর্ষা (বৃষ্টি, বৃষ্টির কাল, আষাঢ়-শ্রাবণ মাস)

• বর্হি (আগুন)
বর্হী (ময়ূর)

• বলকা (উতলোনা)
বলাকা (স্ত্রী-জাতীয় হাঁস)

• বলি (দেবতার উদ্দেশে পশু-হত্যা)
বলী (বলবান)

• বল্লব (গোয়ালা)
বল্লভ (পতি, প্রিয়জন)

• বশিষ্ঠ (মুনি-বিশেষ)
বাশিষ্ঠ (বশিষ্ঠের ছেলে)

• বসন (পরিধেয় বস্ত্র)
ব্যসন (চারিত্রিক দোষ, পাপ)

• বহুত (অনেকগুলি)
বহুত (অনেক জায়গায়)

• বাঁচন (বেঁচে থাকা)
বাচন (কথা, উক্তি)

• বাজা (বন্ধ্যা)
বাজা (শব্দ করা)

• বাট (পক্ক ইষ্টকাদির স্তূপ)
বাট (রাস্তা)

• বাঁটা (কণ্টন করা, ছাপ করা)
বাটা (পেষণ করা, পান রাখার পাত্র, ছোট মাটি-বিশেষ)

• বাঁদি (পরিচারিকা)
বাদী (অভিযোগকারী)

• বাঁধন (বাঁধা)
বাদন (বাজানো)

• বাঁধা (বন্ধক রাখা, আটকানো)
বাধা (প্রতিবন্ধকতা, বিঘ্ন)
বান্ধা (জলাভূমি)

• বাঁধানো (বাধাই করা, ফ্রেমে আটকানো)
বাধানো (ঘটানো)

• বাঁশ (বাঁশ গাছ)
বাস (বসবাস, গন্ধ)

• বাঁশি (সুষির যন্ত্র)
বাসি (পচা, টাটকা নয়)
বাসী (নিবাসী, বাসিন্দা)

• বাগুড়া (সুপারি নারকেল প্রভৃতি গাছের সবৃন্ত পাতা)
বাগুরা (জাল, ফাঁদ)

Scanned with CamScanner

• বাজি (জেলকি, জুয়া খেলার পণ)
বাজী (ঘোড়া)

• বাটি (কালা-উঁচু পাত্র)
বাটী (বাড়ি)

• বাণ (শর, তির)
বান (বন্যা)

• বাণী (কথা, উক্তি)
বানি (স্যাকরার মজুরি)

• বাধা (বাজনা)
বাধা (অনুপস্ত)

• বামন (বেঁটে)
বামুন (ব্রাহ্মণ)

• বারুণি (অপাত্র)
বারুণী (বরুণকন্যা)

• বারোমাস (সারা বছর, সবসময়)
বারো মাস (১২ মাস, বারো সংখ্যক মাস)

• বালি (বালুক)
বালী (কিষ্কিন্ধার রাজা)

• বালিশ (মাথায় দেওয়ার বালিশ)
বালীশ (পাণ্ডুরি রোগ)

• বিকৃত (বিকারপ্রাপ্ত)
বিক্রীত (যা বিক্রি হয়ে গেছে)

• বিন্ন (উৎকণ্ঠিত)
বিঘ্ন (বাধা)

• বিটি (বীজ)
বীটি (ঢেউ)

• বিজন (নির্জন)
বীজন (বাতাস দেওয়া)

• বিজিত (বিজয়ী)
বিজিত (পরাজিত)
বীজিত (যাকে বাতাস দেওয়া হচ্ছে)

• বিতংস (ফাঁদ, জাল)
বিদংশ (চাট, দংশন)

• বিতত (ছড়ানো, বিস্তীর্ণ)
বিতথ (মিথ্যা)

• বিতান (মণ্ডপ)
বিধান (নিয়ম)

• বিত্ত (সম্পদ)
বৃত্ত (গোলাকৃতি ক্ষেত্র)
বৃত্তা (বরণীয়)

• বিত্রস্ত (ভীত)
বিস্রস্ত (জলিত)

• বিদুর (ধৃতরাষ্ট্রের কনিষ্ঠ ভাই)
বিদূর (দূরবর্তী, সম্পর্কহীন)

• বিদ্যমান (অবস্থিত)
বিধ্যমান (যাকে বিদ্ধ করা হচ্ছে)

• বিনদ (ধ্বনি, শব্দ)
বিনোদ (আমোদ, আনন্দ)

• বিনা (ছাড়া, ব্যতিরেকে)
বীণা (তারযন্ত্র-বিশেষ)

• বিপ্লব (দ্রুত ও আমূল পরিবর্তন)
বিপ্লাব (প্লাবন)

• বিবক্ষা (বলার ইচ্ছে)
বিবিক্ষা (প্রবেশের ইচ্ছা)

• বিবীত (গোচারণ ভূমি)
বিবৃত (বর্ণিত)
বিবৃত (ঘূর্ণিত)
বিভীত (ভয়হীন)

• বিবৃতি (বিবরণ)
বিবৃতি (ঘূর্ণন)

• বিমর্শ (বিতর্ক)
বিমর্ষ (বিষাদগ্রস্ত)

• বিষ (বুনবুন)
বিষু (বিষাক্তকৃতি)

• বিরচন (বই ইত্যাদি লেখা)
বিরেচন (মল নিঃসারণ)
বিরোচন (সূর্য, অগ্নি, চন্দ্র)

• বিরচিত (রচিত)
বীরোচিত (বীরের মতো)

• বিরুত (কলরব)
বিরুন (গাছ)

• বিশ (কুড়ি)
বিষ (মারক দ্রব্য)
বিস (পদ্মের ডাটা)

• বিশদ (সবিস্তার)
বিষদ (বিষদায়ক)
বিষাদ (দুঃখ)

• বিশ্বায়ন (সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়া)
বিস্ময়ন (বিস্ময় উৎপাদন)

• বিশ্রুত (সুবিখ্যাত, প্রসিদ্ধ)
বিস্রুত (স্খলিত, পতিত, পরিস্রুত, প্রবাহিত)

• বিসরণ (বিস্তার)
বিস্মরণ (ভুলে যাওয়া)

• বিসৃত (বিস্তৃত, ব্যাপ্ত)
বিকৃত (ব্যাপ্ত)
বিস্মৃত (ভুলে যাওয়া)

• বিস্তর (অনেক)
বিস্তার (প্রসার)

• বিহারি (বিহার প্রদেশ বিষয়ক, বিহারের অধিবাসী)
বিহারী (ভ্রমণকারী)

• ঈক্ষমাণ (নিরীক্ষণরত, যে দেখছে)
ঈক্ষ্যমাণ (যাকে দেখা হচ্ছে, নিরীক্ষিত)

• ঐতি (মুক্তি)
ঐধি (শ্রেণি, পদ্ম)

• বৃক্ষ (কিডনি)
বৃক্ষ (গাছ)

• বৃত্তি (আবরণ)
বৃত্তি (জীবিকা)

• বেঁড়ে (বেঁটে)
বেড়ে (খুব ভালো)

• বেদ (জ্ঞান, ধর্মশাস্ত্র)
বেধ (পুরু, পরিমাণ)

• বেদি (পুজো কিংবা যজ্ঞের উঁচু স্থান)
বেদী (বেত্রা)

• বেয়াড়া (বদমেজাজি)
বেয়ারা, বেহারা (পালকির বাহক, পিয়োন)

• বেশি (অতিরিক্ত)
বেশী (বেশধারী)

• বৈচিত্র্য (অভিক্রম)
বৈচিত্র (চমৎকারিত্ব)
বৈচিত্র্য (বিভিন্নতা, রকম-ফেরতা)

• বৈয়াসকি (ব্যাসের ছেলে)
বৈয়াসিক (ব্যাস বিষয়ক)

• ব্যাঘ্র (উনবিংশ)
ব্যাঘ্র (বাঘ)

• ব্যঙ্গ (বিদ্রুপ, ঠাট্টা)
ব্যঙ্গ্য (গূঢ়, ব্যঞ্জনার দ্বারা বোধ্য)

• ব্যাসোক্তি (বিদ্রুপপূর্ণ কথা)
ব্যাসোক্তি (ব্যঞ্জনাপূর্ণ বাক্য)

• ব্যবহিত (অন্তরিত, কৃত-ব্যবধান)
ব্যবহৃত (ব্যবহার করা)

• ব্যাসক্ত (ব্যাভিচারী)
ব্যাসোক্ত (ব্যাস কথিত)

• ব্যাসক্তি (ব্যাভিচার)
ব্যাসোক্তি (ব্যাসদেবের কথা)

• ব্রহ্মণ্য (ব্রহ্ম বিষয়ক)
ব্রাহ্মণ্য (ব্রাহ্মণ বিষয়ক)

• ব্রাত (শ্রমিক, মজুরি)
ব্রাত্য (সংস্কারহীন, পতিত)

• ভগবৎ (ভগবান)
ভাগবৎ (ভগবান বিষয়ক)

• ভগবতী (দুর্গা)
ভাগবতী (ভগবান বিষয়ক)

• ভগিনী (ভগ্নী)
ভোগিনী (ভোগকারিণী)

• ভঙ্গ (আঘ্র)
ভঙ্গ্য (ভাঙার যোগ্য, ভঙ্গ-প্রবণ)

• ভজমান (উপাসনারত)
ভজ্যমান (যাকে উপাসনা করা হচ্ছে, যা বিভাজন করা যায়)

• ভড় (যে-নৌকো অনেক মাল বইতে পারে, বড়ো ও মালবাহী নৌকো)
ভর (বস্তুর ভার, সমস্ত, পূর্ণ)
ভোর (সকাল)

• ভয়াপহ (যিনি ভয় দূর করেন)
ভয়াবহ (ভীতিপ্রদ)

• ভরণ (ভরা, ভর্তি করা)
ভরন (এক ধরনের সংকর ধাতু)

• ভরদ্বাজ (মুনি-বিশেষ, দ্রোণের পিতা)
ভারদ্বাজ (ভরদ্বাজসংক্রান্ত)

• ভাঁজ (পাট, স্তর)
ভাজ (ভাতৃবধূ)

• ভাঁজা (পাট করা, সুর অভ্যাস করা, সঞ্চালন)
ভাজা (তেল ইত্যাদিতে রান্না করা)

Scanned with CamScanner

• ভাঁটা (ইট ইত্যাদি পোড়ানোর চুল্লি, খেলার বল)
ভাটা (সমুদ্রের জলস্তর নেমে যাওয়া, স্রোতের উলটো দিক)

• ভাঁড় (মাটির পাত্র, বিদূষক)
ভার (ওজন, দায়িত্ব)

• ভাড়া (যানবাহনে চড়ার মূল্য, বাড়ি ইত্যাদি ব্যবহারের জন্য দেয় টাকা)
ভারা (উঁচু জায়গায় কাজ করার জন্য তৈরি মাচা)
ভাষ (সংস্কৃত রূপক নাটক-বিশেষ, ভর্ণতা, বলা)
ভান (ছল)

• ভদ্রপদ (ভদ্র মাস)
ভদ্রপদা (নক্ষত্র-বিশেষ)

• ভাবি (বউদি)
ভাবী (ভবিষ্যতের)

• ভারি (খুব)
ভারী (ভারযুক্ত)

• ভাল (কপাল)
ভালো (উৎকৃষ্ট)

• ভাসুর (স্বামীর বড়ো ভাই)
ভাসুর (দীপ্তিশীল)

• ভাষ (ভাষণ, কথা)
ভাস (দীপ্তি)

• ভাষণ (বক্তৃতা)
ভাসন (উদ্ভাসন)

• ভাষা (মনের ভাব বোঝানোর জন্য মানুষ যে-অর্থপূর্ণ ধ্বনি মুখ দিয়ে বার করে)
ভাসা (জলে কিংবা বাতাসে সঞ্চরণশীল অবস্থা)

• ভাষাভাষী (কোনো ভাষার ব্যবহারকারী, ওই ভাষায় যারা কথা বলে)
ভাসাভাসি (জলে ভাসা)

• ভাস্কর (মূর্তিশিল্পী, সূর্য)
ভাস্কর (উজ্জ্বল)

• ভিসা (বিদেশে প্রবেশের অনুমতিপত্র)
ভীষা (ভয়ন্তর)

• ভুঁড়ি (মোটা পেট)
ভুরি (প্রচুর)

• ভূতি (কাঁঠালের ভূতি)
ভূতি (বিভূতি)

• ভুসা (কালি)
ভূষা (সাজ, গয়না)

• ভূপতিত (মাটিতে পড়া)
ভূপাতিত (যাকে মাটিতে ফেলা হয়েছে)

• ভেক (ব্যাং)
ভেখ (ছদ্মবেশ, বৈরাগির পোশাক)

• ভেড়ি (মাছ চাষের জলাশয়, স্ত্রী ভেড়া)
ভেরি (ঢাক, দামামা)

• ভোমর (তুরপুন)
ভ্রমর (ভোমরা)

• মঙ্গল (শুভ)
মোঙ্গল (মধ্যএশিয়ার জাতি-বিশেষ)

• মঞ্চাকৃতি (নাটকাভিনয়)
মঞ্চাকৃতি (মঞ্চের মতো আকৃতি-বিশিষ্ট)

• মটর (ডাল-বিশেষ)
মোটর (যন্ত্রচালিত ও রাস্তায় চলার উপযোগী যান)

• মড়ক (মারি)
মোড়ক (আবরণ)

• মণীষ (মণির মতো)
মনিষ (মালিক)

• মণীশ (শ্রেষ্ঠ মণি)
মনিষ (জনমজুর)

• মত (মনোগত ভাব, ধারণা)
মতো (সদৃশ, অনুসারে)

• মৎস্যাশন (মাছ খাওয়া)
মৎস্যাসন (একপ্রকার যোগাসন)

• মতি (মনোভাব, ইচ্ছা)
মোতি (মুক্তা)

• মত্ত (মাতাল, ক্ষিপ্ত, আত্মহারা)
মত্য (সিঁড়ি)

• মদোন্মত্ত (গর্বিত)
মদ্যোন্মত্ত (মাতাল)

• মন্দ (জোয়ান পুরুষ)
মদ্য (সুরা, মদ)

• মনোভব (কামদেব)
মনোভাব (মনের ইচ্ছা)

• মন্দর (সমুদ্রমন্থনে ব্যবহৃত পর্বত)
মন্দার (পারিজাত ফুল, মাদার গাছ)

• মরুদ্বিপ (মরুভূমির হাতি অর্থাৎ উট)
মরুদ্বীপ (মরুভূমির দ্বীপ অর্থাৎ মরূদ্যান)

• মর্ত (পৃথিবী)
মর্ত্য (পৃথিবী বিষয়ক)

• মসুরি (ডাল-বিশেষ)
মসূরী (বসন্ত রোগ)

• মহড়া (অভিনয় অভ্যাস)
মহলা (মহলাবিশিষ্ট)
মোহাড়া (অগ্রভাগ)

• মহিত (অর্চিত)
মোহিত (মুগ্ধ)

• মহিষ (মোষ)
মহীশ (ধরণিপতি, রাজা)

• মহিসুত (মঙ্গল গ্রহ)
মহিসুতা (সীতা)

• মাকন্দ (আম)
মাকুন্দ (যার বাড়ি-গোঁফ নেই)

• মাঘ (বঙ্গাব্দের দশম মাস)
মাঘ্য (কুন্দ ফুল)

• মাঙা (চাওয়া)
মাঙ্গা (দুর্মূল্য)

• মাড় (ভাতের ফেন)
মার (মরণ, কামদেব, প্রহার)

• মাড়ানো (পদদলন)
মারানো (মেরে ফেলা)

• মাড়ি (তাল, কাঁঠালের ঘন রস)
মাড়ি (পাতার শিরা)
মাড়ী (দাঁতের গোঁড়ার মাংস)

• মাতাল (মদ্যপ)
মাখাল (তাল পাতার টোকা)

• মাতৃক (মা বিষয়ক)
মাত্রিক (মাত্রাযুক্ত)

• মানুষি (মানুষের ভাব)
মানুষী (নারী)

• মাশ্ব (রাগিণীর নাম)
মাশ্য (কর্মতি)

• মার্গ (পথ)
মার্গ (গবেষণার যোগ্য)

• মাষ (মাষকলাই)
মাস (তিরিশ দিন, মাংস)

• মিত (পরিমিত)
মিথ্য (পরস্পর)

• মিল (সাদৃশ্য, কারখানা)
মীল (সংকোচ)

• মিলন (সংযোগ, একত্রিত হওয়া)
মীলন (সংকোচন)

• মিলিত (একত্রিত, সংযুক্ত)
মীলিত (মুনিত)

• মুখ (বদন)
মূক (বোবা)

• মুখপত্র (কোনো দলের পত্রিকা, প্রচারপত্র)
মুখপাত্র (প্রতিনিধি)

• মুচি (জুতোনির্মাতা)
মুছি (ছোটো পাত্র)

• মুড়ি (ভাজা চাল)
মুরি (নর্দমা)

• মূল (মূলো)
মূল (নক্ষত্র-বিশেষ)

• মূক (অক্ষকেষ)
মূলকো (বলবান)

• মূলা (ইস্পাত পরীক্ষণকারী)
মূষা (সোনা গলানোর পাত্র)

• মূল্যবান (দামি)
মূল্যমান (মূল্যের সূচক)

• মৃদু (মাটি)
মৃদু (বিশ্রব্ধালাপ)

• মেজ (টেবিল)
মেজো (দ্বিতীয়)

• মেদ (চর্বি)
মেধ (যজ্ঞ)

• মেষ (ভেড়া)
মেস (একত্রে থাকার জায়গা)

• মৈত্র (বন্ধু বিষয়ক)
মৈত্র্য (বন্ধুত্ব)

• মৈথিলি (মিথিলার ভাষা)
মৈথিলী (সীতা)

• যজন (পুজো করা)
যাজন (যজ্ঞ করা)
যোজন (যোগ করা, ৫ মাইল দূরত্ব)

• যজ্ঞ (হোম, অগ্নিপূজা)
যোগ্য (উপযুক্ত)

• যৎ (সংগীতের তাল-বিশেষ)
যত (যে-পরিমাণ, সংযম)

Scanned with CamScanner

- বশাল (দস্তা)
  বশোল (খাতি দেয় যে)
- বাচক (প্রার্থী)
  যাচক (পুরোহিত)
- যাচমান (যে প্রার্থনা করছে)
  যাচ্যমান (যা কিংবা যার কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে)
- যামিনী (রাত্রি)
  জামিনি (জামিনদার)
- যুক্তি-সহ (যুক্তি দিয়ে)
  যুক্তিসহ (যা যুক্তির বিচারে টিকে যায়, যুক্তিসংগত)
- যুগ্ম (মৈত)
  যুগা (বাহন)
- যোগরূঢ় (বিশেষার্থবোধক শব্দ)
  যোগারূঢ় (যোগ বা ধ্যানে নিমগ্ন)
- রক্ষ (রাক্ষস)
  রক্ষা (যা রক্ষা করা উচিত)
- রজত (রুপো)
  রাজত (রুপোর তৈরি)
- রঞ্জিত (রাঙানো)
  রণজিৎ (যুদ্ধজয়ী)
- রত (লিপ্ত)
  রথ (বাহন, যান-বিশেষ)
- রশনা (এক ধরনের কটিভূষণ)
  রসনা (জিহ্বা)
- রশা (দড়ি)
  রসা (পৃথিবী, ঝোল)
- রসাভাস (রসের আনেজ)
  রসাভাস (রসভুলা, অশিষ্ট রস কিংবা তার বর্ণনা)
- রসিত (আস্বাদিত)
  রসিদ (প্রাপ্তিস্বীকারপত্র)
- রসা (আস্বাদ্য)
  রুস (ছোটো)
- রহস (সংসর্গ)
  রহস্য (গূঢ় তাৎপর্য)
- রহিত (বিহীন)
  রোহিত (রুই মাছ)
- রাঁড়ি (বিধবা)
  রাড়ি (রাঢ় অঞ্চলের)
- রাজবংশ (রাজার বংশ)
  রাজবংশ্য (রাজবংশীয়, রাজ-বংশে জাত)
- রাতদিন, রাত্রিদিন (সর্বক্ষণ)
  রাত-দিন, রাত্রি-দিন (দিন এবং রাত্রি)
- রাম (রামচন্দ্র)
  রামা (সুন্দরী)
- রাশ (লাগাম)
  রাস (কার্তিক পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যোৎসব)
- রাষ্ট্রীকরণ (প্রচার করা)
  রাষ্ট্রীয়করণ (রাষ্ট্রের অধীনে আনা)
- রিক্থ (স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি)
  রিক্ত (শূন্য, দরিদ্র)
- রিপু (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য-শরীরের এই ছয় শত্রু)
  রিপু (সূক্ষ্ম সেলাইয়ের কাজ)
- রিবেট (দাম থেকে কিছু ছাড়)
  রিভেট (ধাতুর পাত জোড়ার জন্য ব্যবহৃত বিশেষ ধরনের কাঁটা)
- রিষ্ট (পাপ, খঙ্গ)
  রিস্ট (কবজি)
- রুক্ষ (সোনা)
  রুক্ষ (কর্কশ, অমসৃণ)
- রুপা (সাদা রঙের ধাতু-বিশেষ)
  রূপা (রূপযুক্তা)
- রেজলা (নীচ)
  রেজালা (ব্যঞ্জন-বিশেষ)
  রেসালা বা রিসালা (অশ্বারোহী সৈন্যদল)
- রেতি (উখো)
  রেতী (বেলাভূমি, তীর)
- রেশ (জের, আভাস)
  রেস (গতির প্রতিযোগিতা)
- রোঁদ (নজর রাখা, টহল-দারি)
  রোদ (রোদ্দুর)
  রোধ (বাধা)
- রোঁয়া (লোম)
  রোয়া (বপন)
- রোক (নগদ)
  রোখ (জেদ)

- রোকা (চিরকুট)
  রোখা (আটকানো)
- রোজকার (প্রতিদিনের)
  রোজগার (উপার্জন)
- রোহি (গাছ)
  রোহী (আরোহী)
- লক্ষ (দেখা, ১০০০০০)
  লক্ষ্য (উদ্দেশ্য)
- লক্ষণ (চিহ্ন)
  লক্ষ্মণ (রামচন্দ্রের ভাই)
- লক্ষেশ্বর (লক্ষপতি)
  লক্ষ্মীশ্বর (নারায়ণ)
- লতিকা (লতা)
  লত্তিকা (গিরগিটি)
- লব্ধ (প্রাপ্ত)
  লভ্য (যা লাভ করা সম্ভব)
- ললিত (সুন্দর)
  লোলিত (শিথিল)
- লম্বিত (বাহ্যিত)
  লম্বিত (উল্লম্বিত)
- লহনা (বাকি, প্রাপ্য)
  লহমা (মুহূর্ত)
- লাঙ্গলী (কৃষক)
  লাঙ্গুলী (লেজযুক্ত)
- লাশ (মৃতদেহ)
  লাস (স্ত্রীলোকের নৃত্য, বিলাস)
- লেবেল (নামলেখা কাগজ)
  লেভেল (চৌরস, সমভূমি)
- লেশ (সামান্য)
  লেস (ফিতে)
- লোলজিহ্ব (যার জিহ্বা লকলকে)
  লোলজিহ্বা (যে-জিহ্বা লকলকে)
- ল্যাটা (মাছ-বিশেষ)
  ল্যাঠা (উপদ্রব)
- শওয়াল (হিজরি বছরের দশম মাস)
  সওয়াল (প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা)
- শংকর (শিব)
  সংকর (মিশ্রণ)
- শংস্থ (সুস্থ)
  সংস্থ (অবস্থিত)
- সংস্থা (সুস্থতা)
  সংস্থা (প্রতিষ্ঠান)
- শকল (মাছের আঁশ)
  সকল (সব)
- শক্ত (দৃঢ়, কঠিন)
  সক্ত (আসক্ত, সংলগ্ন)
- শক্তাশক্ত (শক্ত এবং অশক্ত)
  শক্তাশক্তি (শক্তি এবং অশক্তি)
- শক্তি (ক্ষমতা, বল)
  সক্তি (আসক্তি)
- শঙ্খক (শাঁখা)
  সংখ্যক (সংখ্যা বিষয়ক)
- শড়া (পচা)
  সরা (মাটির সরা)
- শণ (পাট-জাতীয় তন্তু)
  সন (বছর)
  স্বন (শব্দ)
- শণ্ড (নপুংসক)
  ষণ্ড (ষাঁড়)
- শণ্ড (শাণ্ডমন্ত্র)
  সণ্ড (ণ)
- শব (মৃতদেহ)
  সব (সমস্ত)
- শবল (নানা বর্ণযুক্ত, চিত্র-বিচিত্র)
  সবল (বলশালী)
  স্বকল (নিজের বল)
- শম (মোক্ষ)
  সম (সমান, সংগীতে তালের প্রথম মাত্রা)
- শমতা (নিবৃত্তি)
  সমতা (সমানে ভাব)
- শমন (যম)
  সমন (আদালতে পরোয়ানা)
- শমি, শমী (বাবলা শ্রেণির মাছ-বিশেষ)
  শমী (শান্ত, সংযমী)
- শমীক (মুনি-বিশেষ)
  সমিক (বেধনাস্ত্র-বিশেষ)
  সমীক (যুদ্ধ)
  সামীক (উই পোকা)
- শম্ব (বজ্র)
  সম্ব (উলটো দিকে হাল চালানো)
- শম্বু (ছোটো শঙ্খ)
  শম্ভু (শিব)
  স্বয়ম্ভু (ব্রহ্মা)

Scanned with CamScanner

- শয্যা (বিছানা)
  সজ্জা (সাজ)
- শয়ন (শোয়া)
  শয়ান (শোয়ানো)
- শয়িত (যে শুয়ে আছে)
  শায়িত (যাকে শোয়ানো হয়েছে)
- শর (তির)
  সর (দুধের সর)
  স্বর (শব্দ)
  শ্বর (মদন)
- শরণ (আশ্রয়, ভরসা)
  সরণ (সরে যাওয়া)
  স্মরণ (মনে করা)
- শরবৎ (তিরের মতো)
  শরবত (মিষ্টি পানীয়)
- শরাব (মদ)
  সরাব (কলসি)
- শরু (বাণ)
  সরু (শীর্ণ, কৃশ)
- শর্ব (শিব)
  সর্ব (সব, সকল)
- শলা (শলাকা)
  সলা (পরামর্শ)
- শল্য (অস্ত্র)
  শল্ক (আঁশ)
- শল্যক (গজার)
  শল্লক (আঁশ)
- শশা (ফল-বিশেষ)
  বসা (বোন)
- শস্ত (সুখী, মঙ্গলজনক)
  শস্ত্র (প্রহরণ)
- শস্য (ধান ইত্যাদি কৃষিজাত দ্রব্য)
  সস্য (ফলের ভেতরের অংশ)
- শাঁখা (শঙ্খ থেকে তৈরি হাতের গয়না)
  শাখা (গাছের ডাল, অংশ)
- শাকুনিক (ব্যাধ)
  শাকুলিক (মৎস্যজীবী)
- শাখ্য (শাখা বিষয়ক)
  সাক্ষ্য (আদালতে-দেওয়া বিবৃতি)
- শাঙ্খ (শঙ্খ বিষয়ক)
  সাংখ্য (কপিল দর্শন)
- শাট (ধুতি)
  ছাট (ছাঁ)
  সাঁট (সলাপরামর্শ)
  সাট (ছাপার কাজে ব্যবহৃত হরফসমষ্টি)
- শাড়ি (লম্বা কাপড় যা ভারতীয় মেয়েরা পোশাক হিসেবে ব্যবহার করে)
  শারি (শালিখ পাখি)
  সারি (লাইন)
- সাত (শাণিত, সুন্দর, ক্ষীণ)
  সাত (৭)
- শাদ (কচি ঘাস)
  সাদ (আরোহী)
  সাধ (সখ)
  স্বাদ (জিভে খাদ্যাদির অনুভূতি)
- শাদি (বিয়ে)
  সাদি (আরোহী)
- শান (পাথর)
  সান (চেতনা)
  স্বান (শব্দ)
- শানানো (ধার দেওয়া)
  সানানো (চটকে-মাখা)
- শান্ত (ধীর, স্থির)
  সান্ত (সসীম)
  সান্ত্ব (প্রবোধবাক্য)
  স্বান্ত (নিজের, মন)
- শাপ (অভিশাপ)
  সাপ (সর্প)
- শাবান (হিজরি বছরের অষ্টম মাস)
  সাবান (পরিষ্কার করার দ্রব্য-বিশেষ)
- শামা (বাতি, প্রদীপ)
  শ্যামা (কালী, কালো)
- শামি (লাঠির সরু মুখ)
  স্বামী (প্রভু, পতি)
- শায়ক (বাণ)
  সায়ক (খড়্গ)
- শারদা (দুর্গা)
  সারদা (সরস্বতী)
- শারীরক (জীবনধারী জীবাত্মার স্বরূপনির্ণয়)
  শারীরিক (শরীর বিষয়ক)
- শাল, সাল (পশমের চাদর, গাছ-বিশেষ)
  সাল (বছর)
- শিউলি (শেফালি ফুল)
  সিউলি (যারা শুঁড় তৈরি করে)
- শিক (শলাকা)
  শিখ (ধর্ম সম্প্রদায়-বিশেষ)
- শিকড় (মূল)
  শিখর (শীর্ষ)
  শীকর (জলবিন্দু)
  শেখর (মাথার অলংকার)
- শিকার (পশুহত্যা)
  স্বীকার (মেনে নেওয়া)
- শিট (কাগজ, চাদর)
  সিট (বসার জায়গা, আসন)
- শিত (শানিত, ক্ষীণ)
  শীত (ঠাণ্ডা)
  সিত (সাদা)
- শির (মাথা)
  শীর (অজগর)
  সীর (প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্র-বিশেষ)
- শিরীষ (গাছ-বিশেষ)
  শ্রীশ (নারায়ণ)
  সিরিশ (আঠা, বালি কাগজ)
- শিল (পাথর, শিলা)
  শীল (স্বভাব)
  সিল (ছাপ)
- শিলি (ব্যাঙের ছাতা, ভূর্জ-পত্র)
  শিলী (কেঁচো)
- শিশা (কাচ)
  সিসা (ধাতু-বিশেষ)
- শিশি (কাচের ছোটো বোতল)
  সিসি (কিউবিক সেন্টিমিটার)
- শিষ (শীর্ষ, পেনসিলের ডগার লেড)
  শিস (জিভ ও ঠোঁটের সাহায্যে উৎপন্ন শব্দ যা শুনতে বাঁশির শব্দের মতো)
- শীতাংশু (ঠাণ্ডা রশ্মি, চাঁদ)
  সিতাংশু (চাঁদ, সাদা রশ্মি)
- শুক (শুকপাখি)
  শূক (শূককীট)
- শুক্ত (পর্যুসিত)
  সুক্তো (তিক্ত ব্যঞ্জন-বিশেষ)
  সূক্ত (ঋকের সমষ্টি)
- শুক্তি (ঝিনুক)
  সুক্তি (সদ্‌ব্যাক্য, সুভাষিত)
- শুচি (পবিত্র)
  সূচি, সূচী (সারণি)
- শুদ্ধ (পবিত্র, ঠিক)
  সুদ্ধ (সহিত)
- শুধা (প্রশ্ন করা)
  সুধা (অমৃত)
- শুবা (সন্দেহ)
  সুবা (প্রদেশ)
- শুলফা, শুলফো (মৌরি-জাতীয় শাক)
  সুলফা (শুকনো তামাক-বিশেষ)
- শূকর (শুয়োর)
  সূকর (সুসাধ্য)
- শূর (পরাক্রান্ত)
  সুর (দেবতা, গানের সুর)
  সূর (সূর্য)
- শেজ (বীণাদার)
  সেজো (তৃতীয়)
- শৈত্য (শীতের ভাব)
  সৈত্য (সেনার ভাব, জড়তা)
- শোটি (মাতগুড়)
  শোঠ (অলস, মূর্খ)
- শোনা (শ্রবণ)
  সোনা (মূল্যবান ধাতু-বিশেষ)
- শৌভিক (সুন্দর, শোভা)
  শৌভিক (জানুকর)
- শোয়া (শয়ন)
  সোয়া (একের চার ভাগ)
- শৌকর্য (শুয়োর বিষয়ক)
  সৌকর্য (সৌন্দর্য)
- শৌনক (পুরাণোক্ত মুনি-বিশেষ)
  শৌনিক (কসাই, হরিণ শিকারকারী)
- শৌরি (কৃষ্ণ)
  সৌরি (যম)
- শৌর্য (বলবত্তা, বীর্য)
  সৌর্য (সূর্য বিষয়ক)
- শ্ব (কুকুর, পরের দিন)
  স্ব (স্বয়ং, নিজের)
  স্ব (স্বর্গ)

Scanned with CamScanner

- শ্মশ্রু (গালভরা)
  শ্মশ্রু (দাড়ি)
- শ্যাম (সবুজ)
  শ্যাম (চতুর্বর্ণের অন্যতম)
- শ্রুত (যা শোনা হয়েছে)
  শ্রুত (স্মরিত)
- শ্রুতি (শোনা)
  স্মৃতি (স্মরণ)
- শ্রোতা (যে শুনছে)
  শ্রোতা (শ্রোতাযুক্ত)
- শ্রোত্র (কান)
  শ্রৌত্র (বেদবিহিত)
- ষড়যন্ত্র (চক্রান্ত)
  স্বরযন্ত্র (কণ্ঠনালি)
- ষণ্মুখ (ছয় মুখবিশিষ্ট)
  সম্মুখ (সামনের দিক)
- ষষ্ঠি (৬০)
  ষষ্ঠী (সন্তানের রক্ষাকারিণী দেবী)
- সংজ্ঞান (চৈতন্য)
  সজ্ঞান (সচেতন)
- সংবরা (সংবরণ করা)
  সম্বরা (তেল, মশলা প্রভৃতি মিশিয়ে ব্যঞ্জনাদি সুস্বাদু করা)
- সংবাদ (খবর)
  সম্বাধ (সম্যক বাধা)
- সংবিৎ (চেতনা)
  সংবীত (বেষ্টিত)
  সংবৃত (আবৃত, আচ্ছাদিত)
  সংবৃত (জাত, নিষ্পন্ন)
- সংবিত্তি (অনুভব, বোধ)
  সংবৃতি (আচ্ছাদন, আবরণ)
  সংবৃত্তি (সম্পাদন, জন্ম)
- সংঘাত (অনুগমন)
  সঙ্গাত (জাত, উৎপন্ন)
- সংরাধন (আরাধনা)
  সংরোধন (প্রতিরোধ)
- সংশয় (সন্দেহ)
  সংশ্রয় (আশ্রয়)
- সংসদ (প্রতিষ্ঠান, আইনসভা)
  সাংসদ (সংসদের সদস্য)
- সকৃৎ (এক বার)
  স্বকৃত (নিজের করা)
- সখিত্ব (বন্ধুত্ব)
  সখীত্ব (বান্ধবীর ভাব)
- সজন (লোকজন-সহ)
  সর্জন (সৃষ্টি)
  স্বজন (আত্মীয়)
- সঞ্চালন (চলন, আন্দোলন)
  সঞ্চালন (চালানো, পরিচালনা)
- সত্তর (৭০)
  সত্বর (তাড়াতাড়ি)
- সত্তা (অস্তিত্ব)
  সত্ত্ব (সত্তা, অস্তিত্ব)
  সত্য (ঠিক, যথার্থ)
  স্বত্ব (অধিকার)
- সত্ত্ব (আবাস, গৃহ)
  সদ্য (এখনই, এইমাত্র)
- সন্তরণ (সাঁতার)
  সন্তলন (হাল্কা করে ভাজা, সাঁতলানো)
- সন্ধিক্ষণ (সংযোগকাল)
  সঙ্কৃক্ষণ (উদ্দীপন, উত্তেজন)
- সপক্ষ (পক্ষ বা পাখাযুক্ত, পক্ষাবলম্বী)
  স্বপক্ষ (নিজের পক্ষ)
- সপিণ্ড (একবংশীয়)
  সাপিণ্ড (জ্ঞাতিত্ব)
- সবিতৃ (পৃথিবী)
  সাবিত্রী (প্রসূতি)
  সাবিত্রী (বেদমন্ত্রের উৎস, দুর্গা)
- সব্য (বাম)
  সভ্য (শিষ্ট, সদস্য)
- সমন্বয় (সংগতি, সামঞ্জস্য)
  সমুন্নয় (সমাক উন্নয়ন)
- সমর্থক (সমর্থনকারী)
  সমার্থক (একই অর্থের)
- সমাবৃত (সম্যকভাবে ঢাকা)
  সমাবৃত্ত (প্রত্যাগত)
- সমাসক্তি (সম্যক আসক্তি)
  সমাসোক্তি (অর্থালংকার বিশেষ)
- সমাহিত (কবর দেওয়া)
  সমাহৃত (চয়িত)
- সম্প্রতি (অধুনা, এখন)
  সম্প্রীতি (ভাব, সৌহার্দ্য)
- সম্ভূত (জাত)
  সম্ভূতি (উৎপত্তি)
- সম্মত (রাজি)
  সম্পন্ন (আহ্লাদ, আমোদ)
- সম্মিলন (সংযোগ, বহু লোকের একত্র হওয়া)
  সম্মীলন (ভালো করে খোলা)
- সরজ (নবনীত, ননি)
  সরোজ (জলে জন্ম যার, পদ্ম)
- সরূপ (রূপ-সহ)
  স্বরূপ (নিজের রূপ, নিজমূর্তি)
- সর্গ (পরিচ্ছেদ, ত্যাগ)
  স্বর্গ (দেবলোক)
  স্বর্গ্য (স্বর্গীয়)
- সর্পি (ঘি)
  সর্পী (সাপিনি)
- সর্বথা (সব জায়গায়)
  সর্বদা (সবসময়)
  সর্বথা (সবরকম উপায়ে)
- সলিল (জল)
  সলীল (লীলাযুক্ত)
- সসাজ (সজ্জা-সহ)
  সসেজ (এক বিশেষ ধরনের রান্না মাংস)
- সহিত (সঙ্গে)
  স্বহিত (নিজের ভালো)
- সাঁচা (সঞ্চয় করে রাখা)
  সাচা (খাঁটি)
- সাঁজা (দুইয়ের দম্বল)
  সাজা (প্রসাধন)
- সাঁঝ (সন্ধ্যা)
  সাজ (প্রসাধন)
- সাক্ষর (অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন)
  স্বাক্ষর (নিজের হাতের লেখা, সই)
- সাজাত্য (এক-জাতীয়তা)
  স্বজাত্য (স্বজাতি বিষয়ক বোধ)
- সাড় (চেতনা)
  সার (শ্রেষ্ঠ অংশ)
- সাত্তা (শব্দ, ডাকের উত্তর)
  সাত্ত্বা (শেষ, সব)
- সাত্বৎ (যদুবংশীয় লোক)
  সাত্ত্বত (বলদেব, বিষ্ণু)
- সাধন (দৃঢ়ীকরণ)
  সাধন (সাধনা)
  স্বাধন (আস্বাদন)
- সাধু (সন্ন্যাসী)
  স্বাদু (স্বাদযুক্ত)
- সাধুতা (সততা, ধার্মিকতা)
  স্বাদুতা (সুস্বাদময়তা)
- সান্দ্র (ঘন তরল)
  সান্ধ্য (সন্ধ্যাকালীন)
- সারক (বিরেচক)
  স্মারক (স্মৃতি জাগরক)
- সার্থ (অর্থ-সহ)
  স্বার্থ (নিজের লাভ)
- সাহা (সহকার জাতি)
  স্বাহা (যজ্ঞে আহুতি দেওয়ার মন্ত্র)
- সিঁথি (চুলের মাঝের রেখা)
  সিতি (সাদা)
- সিকতা (বালি)
  সিক্থ (মোম)
  সিক্তা (জলে-ভেজা যমণী)
- সিদ্ধ (ভদ্র, ভালোভাবে পক্ক)
  সিধ্য (কার্য সমাধাকারী)
- সীমন্ত (সিঁথি)
  সীমান্ত (শেষ প্রান্ত)
- সুতি (মালা, নর্দমা)
  সূতি (সুতোর তৈরি)
  সূতী (পুত্রবান, জনক)
  সূতি (জন্ম, উৎপত্তি)
  সূতি (সেলাই)
- সুকৃতি (ভালো কাজ)
  সুকৃতী (সুকর্মকারী)
- সুত (পুত্র)
  সুতো (সেলাই করার সুতো)
  সূত (সারথি)
- সুদিন (ভালো দিন, শুভ দিন)
  সুদীন (সমাকরূপে দীন)
- সুবাসিনী (সুন্দর গন্ধযুক্ত)
  সুভাষিণী (যে-নারীর কথা সুন্দর)
- সুভাষ (ভালো কথা)
  সুভাস (ভালোভাবে আলোকিত)
- সুরতি (রতি, আলিঙ্গন)
  সুর্তি (তামাক-বিশেষ)
- সূরি (পণ্ডিত, কবি)
  সূরী (দুর্গাপটী, দুর্গী)

Scanned with CamScanner

- সুধালাক (সৌকর্যপূর্ণ)
  সুধালাক (সুধাতিরপূর্ণ)
- সুতি (সরল)
  সুতি (মনে রাখা)
- সেঁউতি (জল ছেঁচবার পাত্র)
  সেঁউতি (দেশি গোলাপ)
- সেচ্ছা (ইচ্ছা-সহ, ইচ্ছায়)
  স্বেচ্ছা (নিজের ইচ্ছা)
- সেজনা (সেজো দাদা)
  সেজ্‌দা (হাঁটু গেড়ে ও প্রণতিতে কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম)
- সেবমান (যে সেবা করছে)
  সেব্যমান (যার সেবা করা হচ্ছে)
- স্কন্দ (কার্তিক)
  স্কন্ধ (কাঁধ)
- স্টাম্প (ক্রিকেট খেলার স্টাম্প)
  স্ট্যাম্প (ছাপ, ডাকটিকিট)
- স্তম্ব (ধান ইত্যাদি গাছের ডাঁটা)
  স্তম্ভ (থাম, খুঁটি)
- স্তবক (গুচ্ছ)
  স্তাবক (খোশামোদকারী)
- স্তুত (কীর্তিত, প্রশংসিত)
  স্তুত্য (প্রশংসনীয়)
- স্তৈন (চুরি)
  স্ত্রৈণ (স্ত্রীর বাধ্য)
- স্থূলি (যজ্ঞের জন্য তৈরি জায়গা)
  স্থূলি (যজ্ঞভূমিতে শয়নকারী ব্রতী)
- স্থূবির (চলৎশক্তিহীন, বৃদ্ধ)
  স্থূবির, স্থাবির্য (বার্ধক্য, স্থবিরত্ব)
- স্পন্দ (কম্পন)
  স্পন্দ্য (কম্পিত)
- স্ফটিক (কেলাস)
  স্ফটিক (কেলাস বিষয়ক)
- স্বর্গত (আঘ্রাত)
  স্বর্গত (পরলোকগত)
- স্বধিতি (কুঠার)
  স্বধীতি (বেদপাঠ)
- স্বয়ংবর (নিজের বর বাছাইয়ের প্রথা)
  স্বয়ম্বর (স্বাবলম্বী)
- স্মিত (হাস্যযুক্ত)
  স্মৃত (স্মরণ-করা)
- হরিতাশ্ব (মরকত মণি)
  হরিদশ্ব (সূর্য)
- হর্ম (হাই, জৃম্ভণ)
  হর্ম্য (হলধর, কৃষক)
- হস্ত (হাত)
  হস্ত্য (হস্তনির্মিত)
- হাঁ (মুখ হাঁ)
  হ্যাঁ (সায় দেওয়া)
- হাঁড়ি (রন্ধন পাত্র-বিশেষ)
  হাড়ি (হিন্দু জাতি-বিশেষ)
- হাগি (মাদি হাঁস)
  হাগি (হাস্য)
- হাড় (অস্থি)
  হার (পরাজয় বা পরিচ্ছদ অলঙ্কার বিশেষ)
- হিংস্য (হিংসার উপযোগী, বন্য)
  হিংস্র (প্রাণহারক, হিংসাশীল)
- হিজড়া (একই দেহে স্ত্রী ও পুরুষ অঙ্গযুক্ত)
  হিজরি (৬২২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে গণিত চান্দ্র অব্দ)
- হিমাদ্রি (হিমালয়)
  হেমাদ্রি (সুমেরু পর্বত)
- হিরোয়িন (নায়িকা)
  হেরোয়িন (মাদক দ্রব্য-বিশেষ)
- হুঁশ (জ্ঞান, চেতনা)
  হুস (উড়ে যাওয়া, ধোঁয়া বার ইত্যাদিবোধক ধ্বন্যাত্মক শব্দ)
- হুত (যজ্ঞের আগুনে সমর্পিত)
  হূত (যাকে ডাকা হয়েছে)
- হৃৎ (হৃদয়, মন)
  হৃত (লুণ্ঠিত)
  হ্রিত (লজ্জিত)
- হ্রাদ (ধ্বনি)
  হ্লাদ (আহ্লাদ)
- হ্রাদিনী (বিদ্যুৎ, বল্লা)
  হ্লাদিনী (আনন্দিতা)

অশুদ্ধ বাক্য শুদ্ধকরণ

	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
০১।	তোমার সাথে আমার একটি গোপন পরামর্শ আছে।	তোমার সঙ্গে আমার একটি গোপনীয় পরামর্শ আছে।
০২।	আবশ্যকীয় বায়ে কার্পণ্যতা অনুচিৎ	আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।
০৩।	আমি বড় অপমান হইয়াছি	আমি বড় অপমানিত হইয়াছি।
০৪।	সকল সুধীমণ্ডলী উপস্থিত আছেন	সুধীমণ্ডলী উপস্থিত আছেন।
০৫।	এ বিষয়ে তাহারা সচেষ্টিত নহে	এ বিষয়ে তাহারা সচেষ্ট নহে।
০৬।	তাহারা যেন ভুল করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে	তারা যেন ভুল করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে।
০৭।	আশাকরি তুমি আরোগ্য হইয়াছ	আশাকরি তুমি আরোগ্য লাভ করিয়াছ।
০৮।	ইহা প্রমাণ হইয়াছে	ইহা প্রমাণিত হইয়াছে।
০৯।	তিনি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলেন	তিনি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন।
১০।	অন্যায়ের প্রতিফল দুর্নিবার্য	অন্যায়ের প্রতিফলন অনিবার্য।
১১।	অন্যাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার	অন্যায়ভাবে প্রতি ঘরে হাহাকার।
১২।	একের লাঠি দশের বোঝা	দশের লাঠি একের বোঝা।
১৩।	ইহার আবশ্যক নাই	ইহার আবশ্যকতা নাই।
১৪।	হীন চরিত্রবান লোক পশ্বাধম	চরিত্রহীন লোক পশ্বধম।
১৫।	তার অন্তর অজ্ঞান সমুদ্রে আচ্ছন্ন	তার অন্তর তিমিরাচ্ছন্ন।
১৬।	মাতাহীন শিশুর কি দুঃখ	মাতৃহীন শিশুর কি দুঃখ!
১৭।	সবিনয় পূর্বক নিবেদন করি	বিনয়পূর্বক নিবেদন করি।
১৮।	সব মাছগুলোর দাম কত	মাছগুলোর দাম কত।
১৯।	বিদ্যান হইতে হলে নিয়মিত অধ্যয়ন করতে হয়	বিদ্বান হতে হলে নিয়মিত অধ্যয়ন করতে হয়।
২০।	দিবারাত্র পরিশ্রমে তাহার শারীরিক স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছে	দিবারাত্র পরিশ্রমে তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছে।
২১।	তাহার সৌন্দর্যতাবোধ আমাকে অভিভূত করেছে	তার সৌজন্যবোধ আমাকে অভিভূত করেছে।
২২।	দুর্বিসহ বনানটি অধিকাংশ ব্যক্তি ভুল লেখে।	দুর্বিষহ বানানটি অধিকাংশ ব্যক্তি ভুল লেখে।
২৩।	বিদ্যান লোকেরা মনে করেন আমাদের ছেলেমেয়েরা অধ্যায়ন ছেড়েছে বলেই তারা ব্যাথা আকাঙ্খা মুহুর্ত প্রতিযোগীতা দরিদ্র্যতা ইত্যাদি বানান ভুল করে।	বিদ্বান লোকেরা মনে করেন, আমাদের ছেলেমেয়েরা অধ্যয়ন ছেড়েছে বলেই তারা ব্যথা, আকাঙ্ক্ষা, মুহূর্ত, প্রতিযোগিতা, দরিদ্রতা ইত্যাদি বানান ভুল করে।
২৪।	ছেলেটি নিস্পাপী নিরপরাধী কিন্তু সেই সেষ বংশের মাথায় চূণকালী দিল।	ছেলেটি নিস্পাপ, নিরপরাধ কিন্তু সেই শেষ পর্যন্ত বংশের মুখে চুনকালি দিল।
২৫।	আকণ্ঠ পর্যন্ত ভোজন ভাল নয়	আকণ্ঠ ভোজন ভাল নয়।
২৬।	আমি সন্তোষ হইলাম	আমি সন্তুষ্ট হইলাম।
২৭।	আজকাল বিদ্বান মেয়ের অভাব নেই	আজকাল বিদুষী মেয়ের অভাব নেই।
২৮।	এমন লজ্জাস্কর ব্যাপার যে ঘটবে তাহা কদাপিও চিন্তা করিনি	এমন লজ্জাকর ব্যাপার যে ঘটবে তা কখনও চিন্তা করি নি।
২৯।	ক্ষমা একটি মহানগুণ	ক্ষমা একটি মহৎ গুণ।

Scanned with CamScanner

৩০। ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী
৩১। দৈনতা সব সময় ভাল নয়
৩২। তিনি খল্লীক বাজারে গিয়েছেন
৩৩। সে ক্রোধে আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছে
৩৪। সশঙ্কিত চিত্তে সে বলল
৩৫। বাংলা দেশ একটি উন্নতশীল দেশ
৩৬। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন
৩৭। তুমি, করিম ও আমি আজ পড়িতে যাইব
৩৮। আইনানুসারে তিনি একাজ করতে পারেন না।
৩৯। এটা কাঁচা হাতের লেখা
৪০। বৃক্ষটি মূলসহ উৎপাটিত হইয়াছে
৪১। মেয়েটি সুকেশী ও সুহাসিনী
৪২। আমার এ কাজে মনোযোগীতা নাই
৪৩। আমরা বাংলা দেশের সুসন্তান এই কথা যেন কদাপিও না ভুলি
৪৪। সকল সভ্যগণ এখানে উপস্থিত ছিলেন
৪৫। প্রায়ই অর্থ কথাগুলো বড় হয়ে থাকে অস্পষ্ট
৪৬। রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য
৪৭। সর্ব বিষয়ে বাহুল্যতা বর্জন করিবে
৪৮। জ্যোৎস্না রাত বড়ই মাধুর্যময়
৪৯। তুমি নির্দোষী নও
৫০। বিপদগ্রস্থকে সাহায্য কর
৫১। তাহার সাংঘাতিক আনন্দ হইল
৫২। এ রূপ জীবন কল্পনা করিতেও আমাদের আতঙ্কিত হয়েছিল।
৫৩। শরীর অসুস্থোর জন্য আমি কাল আসিতে পারি নাই
৫৪। তিনি মনোকষ্টে কাল কাটাচ্ছেন
৫৫। দরীদ্রকে দয়া কর
৫৬। আমার আর বাঁচিবার স্বাদ নেই
৫৭। মুমূর্ষু রোগীকে শুশ্রসা কর।
৫৮। ইহা একটি কিম্বদন্তী
৫৯। লালালু খুব পুষ্টিকর
৬০। অশ্রুর জলে বুক ভেসে গেল
৬১। সে শৈশবেই মাতা বাপ হারিয়েছে
৬২। তার দুরাবস্থা দেখিলে দুঃখী হয়
৬৩। শুধুমাত্র গায়ের জোরে কাজ হয় না
৬৪। এই কাজে স্বার্থকতা লাভ করিতে চাইলে আরো মনযোগ করিতে হইবে
৬৫। আমি এখন ভীষণ ব্যস্ত
৬৬। হাতে ব্যাথা পেয়েছি
৬৭। শশান ঘাট কোথায়
৬৮। এর একটা ব্যাবস্থা কর

৩০। ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী।
৩১। দীনতা সব সময় ভাল নয়।
৩২। তিনি শল্লীক বাজারে গিয়েছেন।
৩৩। সে ক্রোধান্ধ হইয়াছে।
৩৪। শঙ্কিত চিত্তে সে বলল।
৩৫। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।
৩৬। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন।
৩৭। করিম, তুমি ও আমি আজ পড়িতে যাইব।
৩৮। আইনত তিনি একাজ করতে পারেন না।
৩৯। এটা কাঁচা হাতের লেখা।
৪০। বৃক্ষটি মূলসহ উৎপাটিত হইয়াছে।
৪১। মেয়েটি সুকেশী ও সুহাসিনী।
৪২। আমার এ কাজে মনোযোগ নেই।
৪৩। আমরা বাংলাদেশের সুসন্তান এই কথা যেন কদাপি না ভুলি।
৪৪। সভ্যগণ এখানে উপস্থিত ছিলেন।
৪৫। বড় কথাগুলোর অর্থ প্রায়ই অস্পষ্ট হয়ে থাকে।
৪৬। রচনাটির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য।
৪৭। সর্ব বিষয়ে বাহুল্য বর্জন করিবে।
৪৮। জ্যোৎস্না রাত বড়ই মধুর।
৪৯। তুমি নির্দোষ নও।
৫০। বিপদগ্রস্তকে সাহায্য কর।
৫১। তাহার অপরিসীম আনন্দ হইল।
৫২। এরূপ জীবন কল্পনা করিতেও আমাদের আতঙ্ক হয়েছিল।
৫৩। অসুস্থতার জন্য আমি কল্য আসিতে পারি নাই।
৫৪। তিনি মনঃকষ্টে কাল কাটাচ্ছেন।
৫৫। দরিদ্রকে দয়া কর।
৫৬। আমার আর বাঁচার সাধ নেই।
৫৭। মুমূর্ষু রোগীকে শুশ্রূষা কর।
৫৮। ইহা একটি কিংবদন্তি।
৫৯। লাল আলু খুব পুষ্টিকর।
৬০। চোখের জলে বুক ভেসে গেল।
৬১। সে শৈশবেই মা-বাপ হারিয়েছে।
৬২। তার দুরবস্থা দেখলে দুঃখ হয়।
৬৩। শুধু গায়ের জোরে কাজ হয় না।
৬৪। এই কাজে সার্থকতা লাভ করতে চাইলে আরো মনোযোগ দিতে হবে।
৬৫। আমি এখন ভীষণ ব্যস্ত।
৬৬। হাতে ব্যথা পেয়েছি।
৬৭। শ্মশান ঘাট কোথায়?
৬৮। এর একটা ব্যবস্থা কর।

৬৯। সে কৌতুক করার কৌতুহল সম্বরণ করিতে পারিল না
৭০। তার সব ছেলেরাই কৃতি
৭১। বাজী করের অদ্ভুত ক্রিয়া দেখিয়া ছাত্রগণেরা প্রফুল্লিত হল।
৭২। এক অগ্রহায়ণে শীত যায় না
৭৩। হে ত্রি নয়নী আমাকে রক্ষা কর
৭৪। স্তুতিপূর্বে তার সাথে হয় নাই।
৭৫। কায়কবাদ মহাশশান লেখেন।
৭৬। শিল্পায়নের সাহায্যে দেশ সমৃদ্ধশালী হইতে পারে।
৭৭। উহার উল্লতপূর্ণ আচারণে ব্যাথিত হইয়াছি।
৭৮। তাহার দূর্নমনীয় অধ্যাবসায় সর্তাই প্রশংসনীয়।
৭৯। বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল আধুনিক রাষ্ট্র।
৮০। আমি এই ঘটনা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছি।
৮১। তাহাদের মধ্যে বেশ সখ্যতা দেখিতে পাই।
৮২। শশীভূষণ কি আসে নাই?
৮৩। শওকত ওসমানের কৃতদাসের হাসি একটি আদমজি পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস।
৮৪। স্নেহভাজন পুরুষলোককে পত্রের আদিতে কল্যানীয়াসু বলিয়া সম্বোধন করিবে।
৮৫। কুপুরুষের মত কথা বল কেন?
৮৬। এক সদ্যজাত শিশুর সর্বাংগীন কুশলতা কামনা করে তিনি কাব্যিকতা করেছেন।
৮৭। কালীদাস বিখ্যাত কবি।
৮৮। উহার আবশ্যক নাই।
৮৯। হস্তীটি অপরিসীম স্থুল।
৯০। তোমার তিরস্কার বা পুরস্কার কিছুই চাই না।
৯১। বংকিমচন্দ্রের ভয়ানক প্রতিভা ছিল।
৯২। তারকারাজি আকাশে মিটিমিটি করে জ্বলছে।
৯৩। অধ্যাপনাই ছাত্রদের তাপস্যা।
৯৪। প্রাতকালে লোকটি গাত্রোত্থান করে।
৯৫। ছোট নাটকটি সবাইকে মুগ্ধ করল।
৯৬। তাহার বৈমাত্রেয় সহোদর অসুস্থ।
৯৭। সে এমন রূপসী যেন অপ্সরী।
৯৮। দারিদ্র্যতার মধ্যেই মহত্ব আছে।
৯৯। মেয়েটি স্বয়ম্বর।

৬৯। সে কৌতুক করার কৌতুহল সম্বরণ করিতে পারিল না।
৭০। তার সব ছেলেই কৃতী।
৭১। বাজিকরের অদ্ভুত খেলা দেখে ছাত্ররা আনন্দিত হল।
৭২। এক মাঘে শীত যায় না।
৭৩। হে ত্রিনয়না, আমাকে রক্ষা কর।
৭৪। ইতঃপূর্বে তার সঙ্গে দেখা হয় নি।
৭৫। কায়কোবাদ 'মহাশ্মশান' লেখেন।
৭৬। শিল্পায়নের সাহায্যে দেশ সমৃদ্ধ (বা সমৃদ্ধিশালী) হইতে পারে।
৭৭। তাহার উদ্ধত (বা উদ্ধতপূর্ণ) আচরণে ব্যাথিত হইয়াছি।
৭৮। তাহার অধ্যবসায় সর্তাই প্রশংসনীয়।
৭৯। বাংলাদেশ একটি উন্নতিশীল (বা উন্নয়নশীল) আধুনিক রাষ্ট্র।
৮০। আমি এই ঘটনা চাক্ষুষ দেখিয়াছি (বা প্রত্যক্ষ করিয়াছি)।
৮১। তাহাদের মধ্যে বেশ সখ্য দেখিতে পাই।
৮২। শশিভূষণ কি আসে নাই?
৮৩। শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি' আদমজি পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস।
৮৪। স্নেহভাজন পুরুষলোককে লিখিত পত্রের আদিতে 'কল্যাণীয়েষু' বলিয়া সম্বোধন করিবে।
৮৫। কাপুরুষের মতো কথা বল কেন?
৮৬। এক সদ্যোজাত শিশুর সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করে তিনি কাব্য রচনা করেছেন।
৮৭। কালিদাস বিখ্যাত কবি।
৮৮। ইহার আবশ্যকতা নাই।
৮৯। হস্তীটি অত্যন্ত স্থূল।
৯০। তোমার তিরস্কার বা পুরস্কার কিছুই চাই না।
৯১। বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ প্রতিভা ছিল।
৯২। তারকারাজি আকাশে মিটিমিটি করে জ্বলছে।
৯৩। অধ্যয়নই ছাত্রদের তাপস্যা।
৯৪। প্রাতঃকালে লোকটি গাত্রোত্থান করে।
৯৫। নাটকটি সবাইকে মুগ্ধ করল।
৯৬। তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অসুস্থ।
৯৭। সে এমন রূপবতী যেন অপ্সরা।
৯৮। দরিদ্রতার মধ্যেই মহত্ব আছে।
৯৯। মেয়েটি স্বয়ংবরা।

Scanned with CamScanner

১০০। আবাল্য হতে তিনি কাব্য প্রিয়।
১০১। মনরঞ্জন মনমোহনের বড় ভাই।
১০২। এখানে খাটি গরুর দুধ পাওয়া যায়।
১০৩। কীর্তিবাস বাঙলা রামায়ণ রচনা করেছিলেন।
১০৪। প্রেমগঙ্গা আজ এমন করিয়া উদ্বেল হইল কেন?
১০৫। সারা জীবন ভূতের মজুরী খেটে মরলাম।
১০৬। বুনো কচু, বাঘা তেঁতুল।
১০৭। উপরোক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।
১০৮। পরের মাথায় বন্দুক রেখে শিকার।
১০৯। যার লাঠি, তার মাটি।
১১০। তপ্ত ভাতে নুন জোটে না, ঠাণ্ডা ভাতে ঘি।
১১১। ভাত ছড়ালে শালিখের অভাব হয় না।
১১২। শুধুমাত্র গায়ের জোরে সব হয় না।
১১৩। তার দুচোখ অশ্রুজলে ভেসে গেল।
১১৪। এ মহান নারীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।
১১৫। এ প্রেক্ষিতে আমরা ঘটনাটি ঘটিয়েছি।
১১৬। আজকের সন্ধ্যা বড়ই মনমুগ্ধকর।
১১৭। যাদুঘরে কিন্তু যাদু দেখানো হয় না।
১১৮। বাংলা বানান আয়ত্ত করা কঠিন নয়।
১১৯। যাবতীয় লোক সমূহ সভায় উপস্থিত ছিল।
১২০। এমন অষহনীয় ব্যাথা কখনো অনুভব করিনি।
১২১। বমাল্যশুদ্ধ চোর ধরা পড়েছে।
১২২। মনস্কামনা পূর্ণ না হওয়ায় সে মনোস্তাপ ভুগছে।
১২৩। পিপিলিকা আর মরিচিকার পিছু ধাওয়া করা একই কথা।
১২৪। রাত্রিতে আসন্ন পরীক্ষার বিভীষিকা উপেক্ষা করে তাড়াতাড়ি গেলাম শয়ন করতে ভাল নিদ্রা না হলেপাছে অসুখ-বিসুখ হতে পারে এই ভয়ে।
১২৫। নদীর ঘাটে যাইয়া আমরা মরাদাহ দেখিতে লাগিলাম। চিতার ধোঁয়ায় সমস্ত জায়গাটা সমাচ্ছন্ন হইয়া আঁধার করে তুলিছিল যে আমাদের নিঃশ্বাস আটকাইয়া যাইতেছিল।

১০০। বাল্য হতেই তিনি কাব্য প্রিয়।
১০১। মনোরঞ্জন মনোমোহনের বড় ভাই।
১০২। এখানে গরুর খাঁটি দুধ পাওয়া যায়।
১০৩। কৃত্তিবাস বাংলা 'রামায়ণ' রচনা করেছিলেন।
১০৪। প্রেমযমুনা আজ এমন উদ্বেল হইল কেন?
১০৫। সারা জীবন ভূতের বেগার খেটে মরলাম।
১০৬। বুনো ওল, বাঘা তেঁতুল।
১০৭। উপর্যুক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।
১০৮। পরের কাঁধে বন্দুক রেখে শিকার।
১০৯। যার লাঠি, তার মাটি।
১১০। তপ্ত ভাতে নুন জোটে না, পান্তা ভাতে ঘি।
১১১। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না।
১১২। শুধু গায়ের জোরে সব হয় না।
১১৩। তার দুচোখ অশ্রুতে ভেসে গেল।
১১৪। এই মহিয়সী নারীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।
১১৫। এ পরিপ্রেক্ষিতে (প্রেক্ষাপটে) আমরা ঘটনাটি ঘটিয়েছি।
১১৬। আজকের সন্ধ্যা বড়ই মনোমুগ্ধকর।
১১৭। জাদুঘরে কিন্তু জাদু দেখানো হয় না।
১১৮। বাংলা বানান আয়ত্ত করা কঠিন নয়।
১১৯। যাবতীয় লোক সভায় উপস্থিত ছিল।
১২০। এমন অসহ্য ব্যথা কখনো অনুভব করি নি।
১২১। বমাল বা মালশুদ্ধ চোর ধরা পড়েছে।
১২২। মনস্কামনা পূর্ণ না হওয়ায় সে মনস্তাপে ভুগছে।
১২৩। পিপীলিকা আর মরীচিকার পিছু ধাওয়া করা একই কথা।
১২৪। পাছে রাতে ভাল ঘুম না হলে অসুখ-বিসুখ হতে পারে এই ভয়ে আসন্ন পরীক্ষার বিভীষিকা উপেক্ষা করে তাড়াতাড়ি ঘুমোতে গেলাম।
১২৫। নদীর তীরে যাইয়া আমরা শবদাহ দেখিতে লাগিলাম। চিতার ধূমে সমস্ত স্থান সমাচ্ছন্ন হইয়া এরূপ অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল যে আমাদের নিঃশ্বাস রোধ হইয়া যাইতেছিল।

সংক্ষেপে বাক্যশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
তোমার পত্র পাইয়া পরম সন্তোষ হইলাম >	সন্তুষ্ট হইলাম
এই কথা শুনিয়া সে অত্যন্ত আশ্চর্য হইল >	আশ্চর্যান্বিত হইল
এই কথা শুনিয়া সকলেই মৌন হইয়া রহিলেন >	মৌনী হইলেন/ মৌনাবলম্বন করিলেন
এখন আমার এই পুস্তকের কোন আবশ্যক নাই >	আবশ্যকতা নাই
তদ্দৃষ্টে সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইল >	তদ্দর্শনে
তাহার একটুও সাবকাশ নাই >	অবকাশ নাই
তিনি আরোগ্য হইয়াছেন >	আরোগ্যলাভ করিয়াছেন
সে এই মোকদ্দমায় সাক্ষী দিয়াছে >	সাক্ষ্য দিয়াছে
দেবী অন্তর্ধান হইয়াছেন >	অন্তর্হিত
এ কথা প্রমাণ হইয়াছে >	প্রমাণিত বা সপ্রমাণ
অপমান হইবার ভয় নাই >	অপমানিত
নদীর জলহ্রাস হইয়াছে >	পাইয়াছে (কিন্তু বহু-প্রচলিত হইয়াছে)
গৌরব লোপ হইয়াছে >	পাইয়াছে
সঙ্কট অবস্থায় পড়িলাম >	সঙ্কটাপন্ন, সঙ্কটজনক
যুদ্ধ শেষ হইল >	সমাপ্ত
একথা আমার মনে উদয় হইল >	উদিত হইল
গোপন কথাটা শুন >	গোপনীয়
ইহা আমার পক্ষে সম্ভব নহে >	সম্ভবপর
বিশেষ প্রয়োজনে আসিল >	সবিশেষ
অতিশয় দুঃখ হইল >	সাতিশয়
তাহার বিস্তর দেনা >	অনেক
তাহারা একত্রে গমন করিল >	একত্র গমন করিল
অত্রস্থানের সকলেই ভাল আছেন >	এই স্থানের
বুদ্ধিমতী রমণীগণ >	বুদ্ধিমতী রমণীরা
সেখানে সকল বালকেরাই উপস্থিত হইয়াছিল >	সকল বালকই বা বালকেরা
এই বৃক্ষে নানাবিধ পক্ষীগণ বাস করে >	নানাবিধ পক্ষী বাস করে
এই শ্রেণিতে ২৫টি বালক আছে, তাহার মধ্যে	
এই বালকটি সকলের চাইতে ভাল >	তাহাদের মধ্যে
বালকটি আমার পানে চাহিয়া রহিল >	আমার দিকে
বালক যুবার সঙ্গে সমানে যুঝিতে পারে না >	যুদ্ধ করিতে
তাহার এইরূপ দুর্দশা হেরিয়া	
সকলেই মর্মাহত হইল >	দেখিয়া, দর্শন করিয়া
সে সমস্ত কথা বিস্তারিত বলিল >	বিস্তার করিয়া
সে আমাকে সম্বোধন করি এই কথা কৈল >	সম্বোধন করিয়া এই কথা কহিল
যাহার ভকতি নাই তাহার ধরম করম কিছু হয় না >	ভক্তি, ধর্মকর্ম।

Scanned with CamScanner

বানানের নিয়ম

প্র : বানান কাকে বলে?

উ : ব্যঞ্জন বর্ণে স্বরবর্ণ যোগ করাকে বানান বলে। দুই বা ততোধিক ব্যঞ্জনবর্ণ একত্র মিলিত হলে তাদের সংযুক্তবর্ণ বলে। এভাবে বানান নিষ্পন্ন হয়।

প্র : বাংলা বানানের নিয়ম প্রণীত হয় কিভাবে?

উ : উনিশ শতকের গোড়া থেকে বাংলা গদ্যরচনা আরম্ভ হলে বাংলা বানানে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ ব্যাপারটি অনুধাবন করে একটি বানান-রীতি প্রণয়নের জন্য ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এ প্রস্তাব সমর্থন জানান। এই পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সংস্কার সমিতি' গঠন করে এবং ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই মে প্রথম বাংলা বানানের নিয়ম প্রকাশ করে। যুগের প্রয়োজনে পরে এই নিয়ম নানা সময় সংশোধিত হয়েছে। অবশ্য, ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথ অনুমোদিত একটি বানান-রীতি 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশ করে (নবেম্বর-ডিসেম্বর ১৯২৬)।

প্র : কয়েকটি বানান-সূত্র লেখ।

উ : বানানের সূত্র পৃথকভাব মনে রাখা যায়। তবে বর্তমানগ্রন্থের লেখক কতিপয় সূত্রকে সমিল পদ্যবদ্ধ করেছেন। নিচের পদ্যটি মনে রাখলে বহু বানান শুদ্ধভাবে লেখা সম্ভবপর :

বানান-সূত্র

দেশ, ভাষা, জাতির নামে কার হয় 'ই'
অপ্রাণী, ইতরপ্রাণী তা-ও জেনেছি,
উভয় ক্ষেত্রে ই-কার নিশ্চিত জানি
সংস্কৃতের স্ত্রী ঈ-কার মানি।
বিদেশি শব্দে 'ষ' হবে না কখনো
তৎসম ভিন্ন শব্দে 'ন' হয় জেনো,
রেফ থাকলে বর্ণে দ্বিত্ব না-হয়
অন্তে বিসর্গ বর্জন জানিবে নিশ্চয়।
জগৎ-বাচক-বিদ্যা-ত্ব-তা-নী-ণী হলে
শব্দান্তের 'ঈ' ই-কার হয় সৌমিত্র বলে।

প্র : বানান-সূত্রটি ব্যাখ্যা কর এবং উদাহরণ দাও।

উ : ১. যে-কোনো দেশ, ভাষা ও জাতির নাম লিখতে ই/ঈ-কার দেয়ার প্রশ্ন এলে তাতে নিশ্চিন্তে ই-কার (ি) দেয়া যাবে। যেমন :
দেশ : গ্রিস, জার্মানি, চিন, ইতালি, হাঙ্গেরি ইত্যাদি। (ব্যতিক্রম : শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ)
ভাষা : হিন্দি, সাঁওতালি, আরবি, পারসি ইত্যাদি।
জাতি : বাঙালি, পর্তুগিজ, তুর্কি ইত্যাদি।

২. অপ্রাণিবাচক শব্দ ও ইতরপ্রাণিবাচক অতৎসম শব্দের শেষে ই/ঈ-কারের মধ্যে ই-কার হবে। যেমন :
অপ্রাণিবাচক শব্দ : বাড়ি, গড়ি, শাড়ি, চাবি ইত্যাদি।
ইতরপ্রাণিবাচক শব্দ : পাখি, হাতি, চড়ুই, মুরগি ইত্যাদি।

৩. সংস্কৃত বা তৎসম স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে সর্বদা ঈ-কার হবে। যেমন : জননী, স্ত্রী, নারী, সাধ্বী ইত্যাদি।

৪. বিদেশি শব্দের বানান বাংলায় লেখার সময় কখনো 'ষ' লেখা যাবে না। যেমন : ষ্টেশন হবে না, হবে স্টেশন। ষ্টুডিও হবে না, হবে স্টুডিও। ফটোষ্ট্যাট হবে না, হবে ফটোস্ট্যাট ইত্যাদি।

৫. তৎসম বা সংস্কৃত কতিপয় শব্দ ছাড়া অন্য সব শব্দের বানানে 'ণ' হবে না, হবে 'ন'। যেমন : কর্ণার হবে না, হবে কর্নার। কর্ণেল হবে না, হবে কর্নেল। বাদুণ হবে না, হবে বাদুন ইত্যাদি।

৬. বানানে যে বর্ণের উপর রেফ থাকবে, সেই বর্ণে দ্বিত্ব হবে না। যেমন : কার্যালয় হবে না, হবে কার্যালয়, নির্দিষ্ট হবে না, হবে নির্দিষ্ট, ধর্মসভা হবে না, হবে ধর্মসভা, পর্বত হবে না, হবে পর্বত ইত্যাদি।

৭. বিস্ময়সূচক অব্যয় (যেমন : বাঃ / ছিঃ / উঃ ইত্যাদি) ছাড়া বাংলা কোনো শব্দের শেষে বিসর্গ রাখা যাবে না। যেমন : প্রায়শঃ / বিশেষতঃ / কার্যতঃ / প্রথমতঃ ইত্যাদি লেখা যাবে না, লিখতে হবে প্রায়শ / বিশেষত / কার্যত / প্রথমত ইত্যাদি।

৮. কোনো শব্দের শেষে যদি ঈ-কার থাকে, সেই শব্দের সঙ্গে জগৎ, বাচক, বিদ্যা, সভা, ত্ব, তা, নী, ণী, পরিষদ, তন্ত্র ইত্যাদি যুক্ত হয়ে যদি নতুন শব্দ গঠন করে, তবে পূর্ববর্তী শব্দের ঈ-কার নবগঠিত শব্দে সাধারণত ই-কারে পরিণত হয়। যেমন :

প্রাণী+বিদ্যা = প্রাণিবিদ্যা
প্রাণী+জগৎ = প্রাণিজগৎ
প্রাণী+বাচক = প্রাণিবাচক
মন্ত্রী+সভা = মন্ত্রিসভা
মন্ত্রী+পরিষদ = মন্ত্রিপরিষদ
কৃতী+ত্ব = কৃতিত্ব
স্থায়ী+ত্ব = স্থায়িত্ব
দায়ী+ত্ব = দায়িত্ব
প্রতিদ্বন্দ্বী+তা = প্রতিদ্বন্দ্বিতা
সহমর্মী+তা = সহমর্মিতা
বাগ্মী+তা = বাগ্মিতা
সঙ্গী+নী = সঙ্গিনী
তপস্বী+নী = তপস্বিনী
অধিকারী+ণী = অধিকারিণী
প্রতিহারী+ণী = প্রতিহারিণী
আদী + ণী = আদিণী ইত্যাদি।

৯. শব্দে ঊর্ধ্বকমা দেখা যাবে না। যেমন : আগে লেখা হতো (হ'ল) এখন (হল); আগে (পুঁথি) এখন (পুথি); আগে (তা'র) এখন (তার) ইত্যাদি।

১০. বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে একই নীতিমালায় বাংলা বানান লেখা কর্তব্য। 'ধর্মীয় কারণ', 'বিশেষ বিবেচনা', 'সহজ প্রচলিত' ইত্যাদি কারণ দেখিয়ে বিদেশি শব্দের বানান-নীতিমালা জটিল না-করা। যেমন :
আযান > আজান,
রোযা > রোজা,
নদী > নদি,
খুশী > খুশি,
ঈদ > ইদ,
শহীদ > শহিদ,
স্পীকার > স্পিকার ইত্যাদি লেখা উচিত।

প্র : ষ্ক / ষ্ক সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান দেখ।

উ : এই সমস্যা ব্যাকরণ সংক্রান্ত। সূত্র মনে রাখলে কিছু বানানে এর সমাধান সম্ভব। যেমন : বিসর্গযুক্ত অ-ধ্বনির সঙ্গে সন্ধি হলে বর্ণে সাধারণত 'স' যুক্ত হয় (পুরঃ + কার = পুরস্কার) এবং বিসর্গযুক্ত ই-ধ্বনির সঙ্গে সন্ধি হলে সাধারণত 'ষ' যুক্ত হয় (বহিঃ + কার = বহিষ্কার)। তবে ষ্ক / ষ্ক সংক্রান্ত সমস্যার সহজ সমাধানকল্পে বলা যায় : অ-যুক্ত বা যুক্ত বর্ণের পরে সাধারণত 'স' হবে। যেমন : নমস্কার, পুরস্কার, বনস্পতি, তিরস্কার, বাচস্পতি ইত্যাদি। অন্যদিকে ই-যুক্ত বর্ণের পর সাধারণত 'ষ' হবে। যেমন : অভিষ্কার, নিষ্কলঙ্ক, পরিষ্কার, নিষ্ফল, নিষ্প্রভ, নিষ্পাপ, নিষ্পন্ন, নিষ্কর, জ্যোতিষ্ক ইত্যাদি। (স্প / স্ত / স্থ থাকলে 'ষ' হয় না। যেমন : নিস্পন্দ / নিস্তব্ধ / দুস্থ ইত্যাদি)

Scanned with CamScanner

প্র : বাংলা একাডেমি প্রণীত (১৯৯২) প্রমিত বাংলা বানানের কয়েকটি নিয়ম উল্লেখ কর।

উ : ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের বেশ কয়েকটি নিয়ম প্রণয়ন করেছে। নিচে এর কয়েকটি নিয়ম উল্লেখ করা হলো:

ক) তৎসম শব্দগুলো সংস্কৃতের যথাযথ বানানে লিখতে হবে। তবে, যে-সব বানানে মূল সংস্কৃত ই-কার ও ঈ-কার এবং উ-কার ও ঊ-কার উভয়ই শুদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করেছে, সে বানানগুলোতে শুধু ই-কার এবং উ-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন : সংস্কৃতে পদবী ও পদবি দুটোই শুদ্ধ বানান। এক্ষেত্রে বাংলায় 'পদবি' গৃহীত হবে। সংস্কৃতে উষা ও ঊষা দুটোই শুদ্ধ বানান। এক্ষেত্রে 'উষা' গৃহীত হবে। এ-রকম আরো উদাহরণ: কিংবদন্তি, শ্রেণি, খঞ্জনি, চিৎকার, ধ্বনি, ধূলি, পঙ্ক্তি, ভঙ্গি, মন্ত্রণা, মসি, লহরি, সরণি, সূচি, উর্দি ইত্যাদি।

খ) ঙ ঞ ণ ন পরে থাকলে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) লেখা যাবে। যেমন : অহংকার, ভয়ংকর, সংগীত, শুভংকর, হৃদয়ংগম, সংঘটন। বিকল্পে ঙ্ লেখা যাবে। ক্ষ-এর পূর্বে সর্বত্র ঙ্ হবে। যেমন : আকাঙ্ক্ষা।

গ) অতৎসম অর্থাৎ নিজস্ব (অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশি ইত্যাদি) ও বিদেশি শব্দে সর্বদা ঈ-কার এবং ঊ-কার বর্জিত হবে। যেমন : তরকারি, মুল্য, বিধি, সরকারি, শাড়ি, পশমি, ইমান, কুরান, দিচু, জুবা ইত্যাদি।

ঘ) -আলি প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার হবে। যেমন : সোনালী হবে না, হবে সোনালি, মিতালী হবে না, হবে মিতালি। অনুরূপভাবে, বর্ণালি, খেয়ালি, রূপালি, হেঁয়ালি ইত্যাদি।

ঙ) তৎসম শব্দের বানানে ণ-ত্ব বিধানের শুদ্ধতা রক্ষা করতে হবে। 'অতৎসম শব্দে 'ণ' হবে না, তার বদলে হবে 'ন'। যেমন : অঘ্রান, কারন, গুর্ণি, ঝরনা, ইরান, কুরান, ধরন, সোনা ইত্যাদি।

চ) তৎসম শব্দের বানানে ষ-ত্ব বিধানের শুদ্ধতা রক্ষা করতে হবে। এ-ছাড়া অন্য কোনো শব্দের ক্ষেত্রে সংস্কৃত ষ-ত্ব বিধি প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু সে-সব ক্ষেত্রে ষ-এর ব্যবহার নিষিদ্ধ তা নয়। যেমন : সাল, শহর, হিসাব, শখ, শৌখিন, পোশাক। কিন্তু বোম্বাই, খ্রিষ্টান ইত্যাদি।

ছ) ইংরেজি শব্দের প্রতিবর্ণীকরণে S-এর জন্য 'স' এবং Sh, -sion, -ssion, -tion ইত্যাদির জন্য সাধারণত 'শ' ব্যবহার হবে। যেমন: স্টেশন, কমিশন, শার্ট, ফটোস্ট্যাট ইত্যাদি।

প্র : 'কী' এবং 'কি' কখন, বসবে?

উ : ১. সর্বনাম ২. বিশেষণ ৩. ক্রিয়া-বিশেষণ পদরূপে বসলে 'কী' লিখতে হবে। যেমন: কী বলছো তুমি? কী করছো? কী পড়ছো? কী খেলে? কী আর বলবো? কী জানি? কী যে করি! তোমার কী? এটা কী বই? কীভাবে যাবো? কী বুদ্ধি তোমার! কী আনন্দ! কী দুরাশা! পদ কত প্রকার ও কী কী? কী ছায়া কী মায়া গো!

কিন্তু অব্যয় পদ হিসেবে যদি ব্যবহার হয় তাহলে 'কি' লিখতে হবে। যেমন : তুমি কি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি হতে চাও? তুমি কি বিসিএস পরীক্ষা দিতে চাও? সে কি ঢাকায় এসেছিলো? বাংলা কি শ্রুতিমধুর ভাষা?

কি / কী-এর ব্যবহার : উদাহরণ–

সর্বনাম হিসেবে : 'কী'

ক. তুমি কী খাবে? (What will you eat?) : খাদ্য-নামের পরিবর্তে প্রশ্নসূচক 'কী' একটি সর্বনাম।

খ. আপনার নাম কী? : ব্যক্তি-নামের পরিবর্তে প্রশ্নসূচক 'কী' একটি সর্বনাম।

গ. তুমি কীভাবে যাবে? : প্রশ্নসূচক 'কীভাবে' (কেমন করে) পদটি সর্বনাম।

বিশেষণ হিসেবে : 'কী'

ক. কী শোভা কী মায়া গো– : অপূর্ব শোভা ও পরিপূর্ণ মায়া অর্থে।

খ. বাবা মেয়েকে কী আদর করেন! : খুব আদর অর্থে।

অব্যয় হিসেবে : 'কি'

ক. তুমি কি খাবে? (Will you eat?) : খেতে ইচ্ছুক অথবা অনিচ্ছুক তা জানতে।

খ. তুমি যাবে কি?

গ. জান কি? (কিন্তু 'কী জান'?)

সংশয়সূচক প্রশ্নে অব্যয় হিসেবে 'কি'–

খ. কি জানি!

ঙ. তাতে আমার সন্দেহ কি!

চ. কি ধনী কি নির্ধন!

টীকা : সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ, অব্যয় এভাবে চিহ্নিত করে অনেকের পক্ষেই কী এবং কি শুদ্ধভাবে লেখা সম্ভব হয় না। যারা কী এবং কি ঠিকভাবে লিখতে পারেন না তাদের জন্য একটি ছোট্ট পরামর্শ দিই : খেয়াল রাখবেন– 'কি / কী' দিয়ে প্রশ্ন করলে যদি মুখে কোনো উত্তর না দিয়ে শুধু মাথা নাড়িয়ে উত্তর দিয়ে প্রশ্নকর্তাকে সন্তুষ্ট করা যায় তাহলে 'কি' লিখতে হবে। যদি মুখ খুলে উত্তর দিতে হয় তাহলে 'কী' লিখতে হবে। যেমন : 'আপনার নাম কি / কী'? এখানে 'কী' হবে। কারণ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আপনাকে মুখ খুলতেই হবে। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয় 'আপনি কবি যাবেন কি / কী'? এখানে 'কি' হবে। কারণ মাথা নেড়ে হ্যাঁ বা না প্রকাশ করে আপনি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন।

প্র : 'বাংলা' এবং 'বাঙলা' কোন বানান গ্রহণযোগ্য?

উ : শব্দটির বিবর্তনের ধারা পণ্ডিতজনের মতো মান্য করলে বাঙ্গালা > বাঙলা হয়েছে সে কথাই মনে হয়। কিন্তু প্রাচীন বানানে 'বাঙ্গালা' থাকলেও পরবর্তীকালে এই বানানে 'ঙ' অক্ষুণ্ন থাকে নি। পুরোনো পাণ্ডুলিপিগুলো তার প্রমাণ। বাংলা ভাষার প্রধান লেখকগণ, যেমন : বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মশাররফ, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, নজরুল, জীবনানন্দ, শামসুর রাহমান প্রমুখের লেখাতেও 'বাঙলা' বানান নেই, সবাই 'বাংলা' বানান ব্যবহার করেছেন। অতএব বলা যায়, বাঙ্গালা বানানটি বিবর্তনের সময় পণ্ডিতদের মত অনুসারে আদ্বিক নিয়ম না মেনে অনুস্বর (ং) গ্রহণ করেছে। স্বাধীন 'বাংলাদেশ' বানানেও 'ং' গৃহীত। সংবিধানেও 'ং' দিয়ে 'বাংলা' লেখা। অতএব 'বাংলা' বানানই মান্য হওয়া উচিত। বাংলাদেশের বাইরেও 'বাংলা' বানান গৃহীত। বাংলাদেশে এখনো অনেকে শব্দটির পণ্ডিতী বিবর্তন মান্য করে 'বাঙলা' বানান লেখেন। সেই ধারা এখন ক্ষীণতর থেকে ক্ষীণতম।

Scanned with CamScanner

ভাষাবিজ্ঞান

পরিচয়

প্র : ভাষাবিজ্ঞান কী?

উ। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভাষা সম্পর্কে আলোচনা ও গবেষণার বিকাশ খুবই আধুনিককালের বিষয়। তবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মানুষের মনে ভাষাজিজ্ঞাসা বহু প্রাচীন কালেই শুরু হয়েছিল। এমন কি, প্রাচীন ভারতে পাণিনি, পতঞ্জলি, ভর্তৃহরি প্রমুখ মনীষী তাঁদের ভাষাবিষয়ক আলোচনায় যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু সে সময়ে 'ভাষাবিজ্ঞান', 'ভাষাতত্ত্ব' প্রভৃতি শব্দের প্রচলন হয়নি। তখনকার ভাষাবিষয়ক আলোচনার নীতি-পদ্ধতিও ছিল এখনকার থেকে কিছু আলাদা। ভারতবর্ষে সে সময়ে ভাষাবিষয়ক আলোচনাকে বলা হতো 'ব্যাকরণ'। কেউ কেউ তাকে 'শব্দবিদ্যা'ও বলেছেন। আর পাশ্চাত্যে ভাষা আলোচনার ওই বিশেষ পদ্ধতিকে বলা হতো 'Grammar'। আজও আমরা 'Grammar'-কে ব্যাকরণের প্রতিশব্দ রূপেই জানি। তাই বলা চলে, Grammar বা ব্যাকরণের বিকৃতি, বিজ্ঞানসম্মত ভাষাবিশ্লেষণ প্রণালীই হলো ভাষাবিজ্ঞান।

প্র : ভাষাবিজ্ঞান ও ব্যাকরণের আলোচনায় পার্থক্য কী?

উ : ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনা একান্তভাবেই একটা নির্দিষ্ট কালে সীমাবদ্ধ থাকে, কিন্তু ব্যাকরণের আলোচনায় সেই কালসীমা কিছুটা প্রসারিত হয়। ভাষার প্রাচীন ইতিহাসও এখানে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়। যেমন-বসিতে, বসিব, বসিয়া শব্দগুলিকে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে বিশ্লিষ্ট করা হবে সম্পূর্ণভাবে তার ব্যবহারিক গঠনরীতির দিক থেকে, যেমন- বসিতে = বসি + তে, বসিব = বসি + ব, বসিয়া = বসি + য়া। কিন্তু ব্যাকরণে মূল ধাতুটি খুঁজে বের করে তার প্রকৃতি-প্রত্যয় বিশ্লেষণ করলে দাঁড়াবে- বসিতে = বস্ + ইতে, বসিব = বস্ + ইব, বসিয়া = বস + ইয়া। এক্ষেত্রে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের মাত্র দুটো শাখাই কল্পনা করা হয়। যেমন- ১. ধ্বনিতত্ত্ব; ২. রূপতত্ত্ব (পদপ্রকরণ)।

ভারতে উৎপত্তি : প্রাচীন ভারতবর্ষে খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে মহামনীষী পাণিনির হাত ধরে বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বের জন্ম হয়। পাণিনি রচিত 'অষ্টাধ্যায়ী' ব্যাকরণ গ্রন্থেই ধরা পড়েছে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের রীতিপদ্ধতি। পাণিনির পরবর্তীকালে কাত্যায়ণ, পতঞ্জলি, চন্দ্রগোমী, ভর্তৃহরি, বামন, কৈয়ট প্রমুখ বর্ণনামূলক ভাষাচর্চার ধারাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

ইউরোপ ও আমেরিকায় উৎপত্তি : ভাষাবিজ্ঞানী ওটো ব্যোয়েটলিঙ্ক পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' ব্যাকরণের একটি সংস্করণ প্রকাশ করতেই সারা পৃথিবীতে বর্ণনামূলক ভাষাচর্চা শুরু হয়ে যায়। পাশ্চাত্যে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা সুইস ভাষাবিজ্ঞানী ফার্দিনান্দ দ্য স্যোসুর পাণিনির ব্যাকরণ এবং হুইটনির 'সংস্কৃত ব্যাকরণ' পড়েই ভাষাবিজ্ঞানে বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'Course in General Linguistics' (1915)। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে একই সঙ্গে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের প্রসার ঘটে। এই ধারার কয়েকজন বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী ও তাঁদের গ্রন্থের নাম দেওয়া হলো–

* ফ্রানৎস বোয়েস– 'Handbook of American Indian Language' (1911)
* এডওয়ার্ড স্যাপির– 'Language' (1915)

* লুই হয়েলস্লেভ– 'Principles of General Grammar' (1928)
* লিওনার্দ ব্লুমফিল্ড– 'Language' (1933)
* হেনরি এ. গ্লিসন– 'An Introduction to Linguistics Structures'
* চার্লস এফ হকেট– 'A Curse in Modern Linguistics'

বাংলা ভাষায় চর্চার সূত্রপাত : বাংলা ভাষায় বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান চর্চার সূত্রপাত হয়েছিল ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে। এক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ দুটি হলো–

১. 'A Brief Sketch of Bengali Phonetics' (1921).
২. 'ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' (১৯৩৯)।

এছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, অধ্যাপক প্রবোধ সিংহরায়, অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মজুমদার, মুহম্মদ আবদুল হাই, অধ্যাপক শিশিরকুমার দাশ প্রমুখের নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্র : ভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় ও বিকাশ সম্পর্কে লেখ।

উ : মানুষের উচ্চারিত ভাষা নিয়ে ভাষাবিষয়ক পণ্ডিতদের চিন্তাভাবনা ও গবেষণাই হলো ভাষাবিজ্ঞান (Linguistics)। অর্থাৎ, ভাষাবিজ্ঞান হলো মানুষের ভাষার বিজ্ঞানসম্মত চর্চা (The scientific study or language)।

বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা সমগ্র জগৎকে অখণ্ডরূপে গ্রহণ না করে তার এক-একটা দিক বা অংশকে বিজ্ঞানের এক-এক শাখায় বিশ্লেষণ ও আলোচনা করেন। তাই পদার্থ বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় কিংবা রসায়ন বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় একে অপরের থেকে আলাদা। একইই রকমভাবে ভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ও আলাদা। ভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হলো ভাষা। ভাষার গঠনপ্রক্রিয়া ও আদর্শিকার সূত্র সন্ধান ভাষাবিজ্ঞানের পরিপন্থক।

বিকাশ : খুব খুব ঘরে ভাষার আলোচনা হতে থাকলেও একটা স্বাধীন বিদ্যা হিসেবে ভাষার চর্চা শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে, তবে তখন তাকে বলা হতো ভাষাতত্ত্ব (Philology)। ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রটি হলো ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনা, তোলো এক বা একাধিক ভাষার পুঁথি বা মন্থপাঠ, তার ভাষার বিশ্লেষণ ও টীকা রচনা এবং তা থেকে তার সংশোধন ও সংস্কৃতির বহুমা সন্ধান। ভাষাবিজ্ঞানেও পাঠে, তবে তার লক্ষ্য হলো বিশেষ ভাষাটিকে বিশ্লেষণ করে ভাষার সাধারণ সূত্রের দিকে এগিয়ে যাওয়া। উভয়ের মধ্যেকার এই লক্ষ্যমূলক ভিন্নতার কারণেই ভাষাতত্ত্ব এবং ভাষাবিজ্ঞানের মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য গড়ে ওঠে।

প্র : ভাষাবিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্বের পার্থক্য লেখ।

উ : **ভাষাবিজ্ঞান (Linguistics)**

১. ভাষাবিজ্ঞানের লক্ষ্য হলো ভাষাবিশেষকে বিশ্লেষণ করে ভাষার সাধারণ সূত্রের দিকে এগিয়ে যাওয়া।

২. ভাষাবিজ্ঞানীরা প্রধানত আধুনিক ভাষার, বিশেষত জীবন্ত কথ্যভাষার বিশ্লেষণে এবং ভাষার সাধারণ তত্ত্ব অনুসন্ধানে মনোযোগী হন।

৩. ভাষাবিজ্ঞানীরা প্রধানত ভাষার গঠন ও ক্রিয়া বিশ্লেষণ করেন।

৪. ভাষাবিজ্ঞানের বিকাশ ঘটে বিংশ শতাব্দীতে, যার প্রধান কেন্দ্র হলো আমেরিকা।

ভাষাতত্ত্ব (Philology)

১. ভাষাতত্ত্বের লক্ষ্য হলো ভাষাবিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সূত্রগুলি প্রয়োগ করে এক বা একাধিক ভাষার বিশেষ রূপ ব্যাখ্যা করা, অর্থাৎ বিশেষ থেকে বিশেষের গভীরে যাওয়া।

২. ভাষাতত্ত্ববিদেরা প্রধানত প্রাচীন ভাষা অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকেন। গ্রিক, লাতিন, সংস্কৃত, পহ্লবিক, হিব্রি, আবেস্তীয়, প্রাচীন পারসিক প্রভৃতি ভাষায় রচিত গ্রন্থ ও

Scanned with CamScanner

প্রাচীন পরিবেশের ভাষা বিশ্লেষণে
২. ভাষাপরিবার ভিত্তিক ভাষার উৎস,
সম্পর্কের ও ইতিহাস অনুসন্ধান করে।
৪. ভাষাসমূহের সমৃদ্ধি ধারা প্রকাশের
উপাদান শনাক্তকরণ, যার প্রকাশ বীজশব্দ
ভিত্তিক আলোচনা।

প্র : ভাষাবিজ্ঞানের ধারাসমূহ কী?

উ : আধুনিক বিশ্বে ভাষার স্বরূপ, উদ্দেশ্য, বিভিন্নতা ইত্যাদি বোঝার জন্য ভাষাবিজ্ঞানে অনেক পদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছে। অনেকে সেগুলিকে ভাষার 'ধারা' বলতে ইচ্ছুক করেন। যেমন-

১ বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের ধারা (Descriptive Linguistics)।
২ ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের ধারা (Historical Linguistics)।
৩ তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের ধারা (Comparative Linguistics)।

প্র : বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের ধারার পরিচয় দাও।

উ : ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় কোনো ভাষার নির্দিষ্ট কালের রূপ, গঠন ইত্যাদি আলোচনা বা বিশ্লেষণ করা হয় এবং তা যদি একটি কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে সংঘটিত হয়, তবে তাকে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান বলে। বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের ধারায় কোনো ভাষার বর্ণনাই মুখ্য।

প্র : ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের ধারার পরিচয় দাও।

উ : ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় কোনো ভাষার উৎস, ইতিহাস, ক্রমবিবর্তনের রূপরেখা কালক্রমিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা বা বিশ্লেষণ করা হয়, তাকে বলা হয় ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান।

পর্যালোচনার বিষয় : ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানে সামগ্রিকভাবে যে পর্যালোচনাগুলি করা হয়, তা হলো-

১. বিভিন্ন সময়ে ভাষা বিবর্তনের কালানুক্রমিক ইতিহাস।
২. বিবর্তনের ফলে ভাষার পূর্বরূপের গঠনগত পরিবর্তন।

৩ ভাষার অভিজাতের শ্রেণি-সাপেক্ষ আলোচনা ইত্যাদি।

ব্যাপক উদ্দেশ্য : ভাষা প্রবাহমান পরিবর্তনশীল। তবে ভাষার পরিবর্তন কোনোভাবেই বিশৃঙ্খলভাবে ঘটে না, বরং একটা নিয়মানুযায়ী ভাষার কাঠামো পরিবর্তিত হতে থাকে। এই পরিবর্তন সূত্রাকারে সহজেই নির্দেশ করা সম্ভব বিভিন্ন সময়ে ভাষার গঠনে যে পরিবর্তন সাধিত হয়, তা সূত্রাকারে বর্ণনা করাই হলো ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের ব্যাপক উদ্দেশ্য।

দৃষ্টিভঙ্গি : এখন আমরা সংস্কৃত থেকে আগত বাংলা শব্দের পরিবর্তনের ধারাকে বিশ্লেষণ করলে সহজেই ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিটি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারব। যেমন- বাংলায় প্রচলিত সর্বনাম শব্দ 'আমি'। এখন 'আমি' শব্দটির বিবর্তনের ধারা বিচার করা যাক-

আমি
আমিরূপ- অস্মাবিঃ (সংস্কৃত 'অস্মদ' শব্দের তৃতীয় বিভক্তির বহুবচনের রূপ)
প্রাকৃতরূপ- অম্হাহি
অপভ্রংশরূপ- অম্হহি
প্রাচীন বাংলারূপ- আম্হে
মধ্যবাংলারূপ- আম্হি
আধুনিক বাংলা- আমি

প্র : তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের ধারার পরিচয় দাও।

উ : ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় একাধিক ভাষার মধ্যে তুলনা করে তার উৎস, অতীত রূপ, প্রকৃতি ও ক্রমবিকাশের রূপরেখা অঙ্কন করা যায়, তাকে তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান বলে।

আলোচনার পরিধি : ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানে কোনো একটি ভাষার ইতিহাস, উদ্ভব ও বিবর্তনের ধারা আলোচিত হয়, কিন্তু তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান সেই ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য ইতিহাসের বিবর্তনের তুলনামূলক আলোচনা করে। যেমন- আমরা যদি তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের সাহায্যে বাংলা ভাষার আলোচনা করি, তবে সে প্রসঙ্গে

Scanned with CamScanner

আলোচনা করা হয়। তাই এই ধারণাটিকে অনেকে সাধারণভাবে 'কালানুক্রমিক ভাষাবিজ্ঞান' রূপে অভিহিত করতে চান।

প্র। ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সম্পর্ক কী?

উ। আধুনিককালে ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রটি বহু প্রসারিত। ফলে সংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্বের (Philology) অনেক প্রসঙ্গই বিতর্ক ভাষাবিজ্ঞানে (Linguistics) এসে পড়েছে। তাছাড়া ভাষাতত্ত্বে যেমন গণিতশাস্ত্র, দর্শন ও মনোবিদ্যার বিভিন্ন তত্ত্বের সাহায্যে ধ্বনি, রূপ, বাক্য ও অর্থগত দিক বিশ্লেষণ করা হয়, তেমনি ভাষাতত্ত্বের বিভিন্ন প্রয়োগগত রূপের ব্যবহার অন্যান্য শাস্ত্রেও লক্ষ করা যায়। এর ফলে এখন ভাষার ইতিহাস, ভাষার সঙ্গে জাতিতত্ত্বের সম্পর্ক, ভাষার সামাজিক দিক এবং ভাষার সঙ্গে সাহিত্যের কিংবা অন্যান্য শাস্ত্রের সম্পর্কও আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। সেই হিসেবে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের শাখাগুলিও বৈচিত্র্যময়। এগুলি হলো–

১. মনোভাষাবিজ্ঞান (Psycholinguistics)।
২. সমাজভাষাবিজ্ঞান (Sociolinguistics)।
৩. নৃ-ভাষাবিজ্ঞান (Anthropological linguistics)।
৪. স্নায়ুভাষাবিজ্ঞান (Neurolinguistics)।
৫. শৈলীবিজ্ঞান (Stylistics)।
৬. অভিধানবিজ্ঞান (Lexicography) ইত্যাদি।

এই শাখাগুলির আলোচ্য বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

মনোভাষাবিজ্ঞান : ভাষাশিক্ষায় এবং ভাষাব্যবহারে মনের ভূমিকাই মনোভাষাবিজ্ঞানের উপজীব্য। স্বভাবতই কোন কোন মানসিক উপাদান ভাষাশিক্ষার সহায়ক বা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা নেয়, তারই চর্চা করে মনোভাষাবিজ্ঞান।

সমাজভাষাবিজ্ঞান : ভাষাবিজ্ঞানের চর্চা যেখানে সমাজনির্ভর এবং সামাজিক শ্রেণি, শিক্ষার স্তর ও প্রণালী, বয়স, লিঙ্গভেদ প্রভৃতি ভাষার আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, তখনই বিষয়টি সমাজভাষাবিজ্ঞানের পরিধিভুক্ত হয়ে পড়ে। এককথায়, ভাষা ও সমাজের সম্পর্কই সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।

নৃ-ভাষাবিজ্ঞান : নৃ-ভাষাবিজ্ঞান হলো ভাষাবিজ্ঞানের সেই শাখা, যেখানে মানুষেরা একই ভাষায় ভাব বিনিময় করে এমন সমাজে ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক আলোচিত হয়। অর্থাৎ, সেই সমাজের ঐতিহ্য, বিশ্বাস, রীতি, পারিবারিক সংগঠন প্রভৃতির সঙ্গে ভাষার সম্পর্কই নৃ-ভাষাবিজ্ঞানের বিষয়।

স্নায়ুভাষাবিজ্ঞান : মানব মস্তিষ্ক তার স্নায়ুতন্ত্রীয় কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে কিভাবে ভাষাকে আয়ত্ত করে, কিভাবে তার মধ্যে ভাষার বোধ জন্মায় এবং কিভাবে ভাষা নির্মাণ করে, এ সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক আলোচনাই হলো স্নায়ুভাষাবিজ্ঞানের একটি অন্যতম বিষয়। আছে। কারণ, মানুষের মস্তিষ্কে বিশেষ বিশেষ মানসিক অবস্থায় ভাষার ধ্বনি, শব্দ, শব্দের অর্থ সম্পর্কে যেমন বোধ জন্মায় তেমনি তার আয়ত্তীকরণও ঘটে। Aphosiology, Brain imaging, Electrophysiology এবং Computer modeling ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বারা বিচার করে দেখা হয় যে, আমাদের মস্তিষ্ক কিভাবে ভাষার তথ্য সংগ্রহ করে তাকে মূল্যায়ন করে। এই ধরনের মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াগুলিও স্নায়ুভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।

শৈলীবিজ্ঞান : সাহিত্যের ভাষা ও শৈলীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণকেই বলে শৈলীবিজ্ঞান। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রভৃতির সাহিত্যিক বিচারের প্রতিযোগী হিসেবেই শৈলীবিজ্ঞান বিকাশ লাভ করেছে।

অভিধানবিজ্ঞান : অভিধান রচনার নীতি ও পদ্ধতিই হলো অভিধানবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। অভিধানকে আমরা ভাষাবিজ্ঞানের একটি সংযোগমূলক বিভাগ বলতে পারি। এর কারণ, অভিধান ভাষার প্রকাশগত দিক এবং বিষয়গত দিকের মধ্যে অর্থাৎ ভাষার ধ্বনি ও অর্থের মধ্যে সংযোগ ব্যাখ্যা করে। এটিই হচ্ছে অভিধানের প্রধান ভূমিকা।

প্র। অভিধান কত রকমের হতে পারে? তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

উ। অভিধানের সামান্য শ্রেণি বা ধরন। তবে সমস্ত অভিধানেরই দুটি প্রধান শ্রেণি হলো ব্যবহারিক অভিধান এবং তাত্ত্বিক অভিধান।

ব্যবহারিক অভিধান : সহজ কথায় বলতে গেলে, যে-কোনো কাজের বা কোজে অভিধানই হলো ব্যবহারিক অভিধান। বিখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী জেফ্রিলিচ ব্যবহারিক অভিধানকে বলেছেন 'Flesh-and-blood' dictionary। বাংলা ভাষায় 'বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক অভিধান', হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গীয় শব্দকোষ', জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান', সাহিত্য সংসদ থেকে প্রকাশিত 'সংসদ বাংলা অভিধান' প্রভৃতি হলো ব্যবহারিক অভিধানের উদাহরণ।

তাত্ত্বিক অভিধান : তাত্ত্বিক অভিধানকে বলা যেতে পারে অভিধানের মডেল বা আদর্শরূপ। অভিধান তাত্ত্বিকরা ব্যবহারিক অভিধানকে তত্ত্বগতভাবে নিখুঁত বলে মনে করেন না, কিন্তু সেটিকে সাধারণ ব্যবহারকারীর পক্ষে উপযোগী বলে স্বীকার করেন। তাঁরা এমন একটি মডেল বা আদর্শের কথা বলেন, যা ব্যবহারিক অভিধানের চেয়ে বেশি বিজ্ঞানসম্মত। তবে তা সাধারণ ব্যবহারকারীর পক্ষে সহজবোধ্য না-ও হতে পারে। এই ধরনের অভিধানকে তাঁরা লেক্সিকন (Lexicon) বলেন।

একভাষিক অভিধান : অভিধানের একটি অতি-পরিচিত শ্রেণি হলো একভাষিক অভিধান, যাতে একটি ভাষার শব্দকে সেই ভাষাতেই ব্যাখ্যা করা হয়। যেমন– ইংরেজি থেকে ইংরেজি, বাংলা থেকে বাংলা ইত্যাদি।

দ্বিভাষিক অভিধান : অভিধান দ্বিভাষিকও হতে পারে। অর্থাৎ ইংরেজি থেকে বাংলা, বাংলা থেকে ইংরেজি, সংস্কৃত থেকে বাংলা ইত্যাদি।

ঐতিহাসিকভিত্তিক অভিধান : আর একরকম অভিধান হলো ঐতিহাসিকভিত্তিক অভিধান। তার সেরা দৃষ্টান্ত 'The Shorter Oxford English Dictionary'। একটি শব্দের প্রথম প্রচলন কবে হয়েছিল, সময় সময়ান্তরে তার অর্থ কী ছিল, সবশেষে কিভাবে অর্থপরিবর্তন ঘটে তার পরিচয় বর্তমান রূপ কী, অর্থাৎ যা কী– এই হল ঐতিহাসিকভিত্তিক অভিধানের উপজীব্য।

অন্যান্য : এছাড়াও বিশেষ অভিধান, চরিতাভিধান, সমার্থক শব্দের অভিধান ইত্যাদি নানা শ্রেণির অভিধান রচিত হয়।

প্র : 'থিসরাস' কাকে বলে?

উ : শব্দের অর্থ, ভাব বা বিষয় অনুযায়ী এক-একটি 'শব্দ শ্রেণিমূল' গড়ে নিয়ে তার অন্তর্গত সমস্ত শব্দের বিন্যাস করে যে অভিধান রচিত হয়, তাকে 'থিসরাস' বা সমার্থ শব্দকোষ বলা হয়।

প্র : একটি বাংলা থিসরাসের উদাহরণ দাও।

উ : প্রথম বাংলা থিসরাস হলো সুবোধ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ও সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত 'সমার্থ শব্দকোষ'। অন্য একটি হলো : মুহম্মদ হাবিবুর রহমান সংকলিত 'যথাশব্দ'।

প্র : Linguistics-কে বাংলায় 'ভাষাবিজ্ঞান' বলা হয় কেন?

উ : Linguistics-কে বাংলায় 'ভাষাবিজ্ঞান' বলার কারণ হলো Linguistics শব্দের অর্থ Science of Linguistics বা ভাষার বিজ্ঞান। অর্থাৎ, এখানে ভাষা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আলোচনা করা হয়।

প্র : বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভাষা সম্পর্কে আলোচনার প্রথম ধাপটি উল্লেখ কর।

উ : বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভাষা সম্পর্কে আলোচনার প্রথম ধাপ হচ্ছে তথ্য সংগ্রহ করে তাকে লিপিভুক্ত করা। প্রয়োজনবোধে তথ্য ও লেখ্য উভয় প্রকার ভাষা থেকেই তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

প্র : ভাষা বিশ্লেষণে কী কী ধরনের যন্ত্রের সাহায্য লাগে?

উ : ভাষার ধ্বনিসমূহের বেখাচিত্র, উচ্চারণ প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা হয় কাইমোগ্রাফ, কৃত্রিম তালু, এক্স-রে ফোটোগ্রাফ প্রভৃতির সাহায্যে।

Scanned with CamScanner

প্র : বর্ণনামূলক ব্যাকরণের সঙ্গে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের পার্থক্য সম্বন্ধে ড. সুকুমার সেনের মতটি লেখ।

উ : এ বিষয়ে ড. সুকুমার সেনের মতটি হলো এই যে, বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে ভাষার অতীত ইতিহাস নিয়ে কোনোরূপ আলোচনা থাকে না, এখানে শুধু ব্যবহারিক দিক দিয়েই ভাষার গঠনরীতি বিশ্লেষণ করা হয়।

প্র : ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের একটি বৈশিষ্ট্য লেখ।

উ : ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতিতে ভাষাবিশেষের উৎস, ইতিহাস, ক্রমবিবর্তনের রূপরেখা আলোচনা বা বিশ্লেষণ করা হয়।

প্র : 'মনের এই ত্রিধা বৃত্তির প্রকাশ ঘটে ত্রিবিধ ক্রিয়ায়'– ত্রিবিধ ক্রিয়া কী?

উ : যে মন মানুষের অনন্যসুলভ সম্পদ, সেই মনের ত্রিধা বৃত্তি হল চিন্তা, সংকল্প ও অনুভব। এই ত্রিধা বৃত্তির প্রকাশ ঘটে জ্ঞানান্বেষণ, কর্মসাধনা ও সৌন্দর্য সৃষ্টির তিনটি ক্রিয়ায়।

প্র : ভাষাবিজ্ঞানী স্টার্টেভান্ট নির্দেশিত ভাষার সংজ্ঞার্থ দাও।

উ : ভাষা হলো মানুষের বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত কতকগুলি ধ্বনিগত প্রতীকের সমষ্টি, যা দিয়ে মানুষ তার সমাজের অন্যান্য মানুষের সঙ্গে ভাব বিনিময় ও যোগাযোগ স্থাপন করে।

প্র : বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের একটি বৈশিষ্ট্য লেখ।

উ : এই পদ্ধতিতে ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনি, শব্দ, বাক্য, বাক্যাংশ ইত্যাদি বিশ্লেষণের সময় তার ইতিহাস বা অতীতকালের রূপ নির্ণয় করা হয় না, শুধুমাত্র এগুলির স্বরূপ ও গঠনগত দিকই বিশ্লেষিত হয়।

প্র : বিশ্বে সর্বপ্রথম কার হাত ধরে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের রীতি-পদ্ধতি চালু হয়?

উ : প্রাচীন ভারতে মহামনীষী পাণিনির হাত ধরে খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বের জন্ম। পাণিনি যে 'অষ্টাধ্যায়ী' ব্যাকরণ লিখেছিলেন, তাতেই বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের রীতি-পদ্ধতি ধরা পড়েছে।

প্র : পাণিনির পরবর্তীকালে কারা বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের চর্চাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন?

উ : পাণিনির পরবর্তীকালে ক্যাত্যায়ন, পতঞ্জলি, চন্দ্রগোমী, ভর্তৃহরি, জয়াদিত্য, বামন, কৈয়াট প্রমুখ বর্ণনামূলক ভাষাচর্চার ধারাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

প্র : ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখা বর্ণনামূলক ভাষাবিষয়ক দুটি গ্রন্থের নাম লেখ।

উ : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বর্ণনামূলক ভাষাবিষয়ক যে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন, সেগুলি হলো–
১. 'A Brief Sketch of Bengali Phonetics'
২. 'ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ'।

প্র : পাশ্চাত্যে কে প্রথম বর্ণনামূলক ধারার সূত্র প্রতিষ্ঠা করেন?

উ : সুইস ভাষাবিজ্ঞানী ফার্দিনান্দ দা সোসুর পাশ্চাত্যে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা। তিনিই প্রথম বর্ণনামূলক ধারার সূত্র প্রতিষ্ঠা করেন।

প্র : 'Handbook of American Indian Language' গ্রন্থটি বিখ্যাত কেন?

উ : আমেরিকান ভাষাবিজ্ঞানী ফ্রানৎস বোয়েস এই গ্রন্থে দেখান যে, আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের অনুন্নত যে সব ভাষা আছে, তার এক ভাষার রূপ অন্য ভাষার ওপর আরোপ করা সম্ভব নয়। এই সাধারণ সূত্রটি প্রতিষ্ঠার জন্যই আলোচ্য গ্রন্থটি বিখ্যাত।

প্র : ভাষাবিজ্ঞানের ইতিহাসে স্যার উইলিয়াম জোনস বিখ্যাত কেন?

উ : স্যার উইলিয়াম জোনসের হাত ধরেই ভাষার তুলনামূলক চর্চা শুরু হয়। তিনি ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে এক বক্তৃতায় সংস্কৃতের সঙ্গে প্রাচীন গ্রিক, গথিক, কেলটিক, ইতালীয় ইত্যাদি ভাষার তুলনা করে বলেন যে, এইসব ভাষা আদিতে একটি ভাষাবংশ থেকে সৃষ্ট হয়েছিল।

প্র : তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

উ : এই পদ্ধতিতে মূলত রূপগত বৈপরীত্য, ধ্বনিগত ঐক্য, বিন্যাসগত সাদৃশ্য ও সমতার উপর ভিত্তি করে একাধিক ভাষার মধ্যে তুলনা করা হয়।

প্র : তুলনামূলক ব্যাকরণ রচনায় জ্যাকব গ্রিমের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কেন?

উ : জ্যাকব গ্রিম তুলনামূলক ভাষাচর্চা বিষয়ে যে গ্রন্থটি রচনা করেন, তার নাম 'Deutsche Grammatik'। এই গ্রন্থে তিনি টিউটো-টিউরোনীয় ভাষাবংশের ধ্বনি পরিবর্তনের রীতি সূত্রাকারে প্রথম প্রকাশ করেন।

প্র : 'নিঘণ্টু' কী?

উ : প্রাচীন ভারতীয় ব্যাকরণবিদ যাস্ক হলেন প্রথম ভারতীয় অভিধানকার। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'নিরুক্ত'-এর শেষে তিনি বৈদিক শব্দাবলির একটি তালিকা নির্মাণ করেন। এই অংশটিকেই বলা হয় 'নিঘণ্টু'। নিঘণ্টু থেকে এখন নির্ঘণ্ট।

প্র : অমরসিংহ রচিত অভিধান গ্রন্থের নাম লেখ।

উ : অমরসিংহ রচিত 'অমরকোষ' বা 'নাম-লিঙ্গানুশাসন' প্রাচীন ভারতের একটি উন্নত অভিধান গ্রন্থ।

প্র : 'শব্দকল্পদ্রুম' কী?

উ : উনবিংশ শতাব্দীতে রাজা রাধাকান্ত দেবের পৃষ্ঠপোষকতায় সংকলিত 'শব্দকল্পদ্রুম' হলো ভারতীয় অভিধান ধারার এক সমৃদ্ধ সংযোজন। এটি শুধু অভিধান নয়, এটি একটি বিশ্বকোষ।

প্র : বিশ্ববিখ্যাত 'Oxford English Dictionary'-র আদি পরিচয় দাও।

উ : আলোচ্য অভিধানের আদি নাম ছিল 'A New English Dictionary on Histirical Principles'। এখানে শব্দের ব্যুৎপত্তি বা অর্থ নিরূপণের নতুন ধারা লক্ষণীয়। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা থেকে অভিজাত অথচ প্রয়োজনীয় শব্দাবলি নিয়ে মোট ১৩খণ্ডে এটি রচিত।

প্র : সমাজভাষাবিজ্ঞান কাকে বলে?

উ : সহজ ভাষায় বলতে গেলে, ভাষা কিভাবে সমাজে কাজ করে এবং সমাজ কিভাবে ভাষার ওপর প্রভাব বিস্তার করে, তা যে শাস্ত্র আলোচনা করে, সেটিই সমাজভাষাবিজ্ঞান।

প্র : শু-আর্থবিজ্ঞানের কাজ কী?

উ : শু-আর্থবিজ্ঞানের কাজ হলো একটি ভাষিক সমাজে ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন ভাষা, ঐ সমাজের ঐতিহ্য, বিশ্বাস, ভাষা-ব্যবহারিক সম্পর্ক ভাষিদের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক আলোচনা করা।

প্র : ভাষাতত্ত্বে মনস্তত্ত্বকে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে কোন দিকের ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়?

উ : মনোভাষাবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, একপ্রকার মানসিক সংগঠন থেকেই আমরা ভাষা ব্যবহার করি। এক্ষেত্রে সেই মানসিক প্রক্রিয়াসমূহ, ভাষার উৎপাদন, অভ্যাসকরণ ও উপলব্ধি অনুযায়ী ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

প্র : শৈলীবিজ্ঞানী যেসব প্রকরণ (Tool) ব্যবহার করেন, সেগুলি কী কী?

উ : শৈলী বিচার-বিশ্লেষণে যে প্রকরণগুলি ব্যবহৃত হয়, সেগুলি হলো–
১. প্রমুখন (Foregrounding)
২. বিচ্যুতি (Deviation)
৩. সমান্তরালতা (Parallelism)
৪. কোড-বদল (Code-switching)
৫. বহু-ধ্বনিময়তা (Polyphony)।

ধ্বনিতত্ত্ব

প্র : ধ্বনিতত্ত্বের মূল আলোচ্য বিষয় কী?

উ : ধ্বনিতত্ত্বের মূল আলোচ্য বিষয় হলো মানুষ তার বাগযন্ত্রের সাহায্যে যে ধ্বনি উচ্চারণ করে, সেইসব বাগধ্বনির চর্চা।

প্র : বাগযন্ত্র কাকে বলে?

উ : ভাষার বাগধ্বনিগুলি মানুষের মুখ, নাসিকা, কণ্ঠ ইত্যাদি যেসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাহায্যে উচ্চারিত হয়, তাদের বাগযন্ত্র বলে।

প্র : ধ্বনির উচ্চারণ ঘটে কিভাবে?

উ : বক্তার বাগযন্ত্রগুলি শ্বাসবায়ুতে নানাভাবে যখন নানা রকমের তরঙ্গ সৃষ্টি করে, তখন ধ্বনির উচ্চারণ হয়।

প্র : উচ্চারণমূলক ধ্বনিবিজ্ঞান (Articulatory Phonetics) কাকে বলে?

উ : ধ্বনির উচ্চারণ নিয়ে ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখা আলোচনা করে, তাকে বাগোদ্ভব বা উচ্চারণমূলক ধ্বনিবিজ্ঞান।

Scanned with CamScanner

প্র : ধ্বনিবিচারে (Phonemics) কোন বিষয়টি আলোচিত হয়?

উ : কোনো ভাষার কোন কোন বাগ্ধ্বনিকে মূলধ্বনি বা ধ্বনিম বলা যায়, তা বিশেষ পদ্ধতিতে বিচার করাই হলো ধ্বনিবিচারের আলোচ্য বিষয়।

প্র : ধ্বনিম প্রক্রিয়াবিজ্ঞানের নিজস্ব বিষয় বলতে কী বোঝা?

উ : ভাষায় স্বনিমের ভূমিকা, একটি স্বনিমের সঙ্গে অন্য স্বনিমের সংযোগের নিয়ম এবং শব্দের আদি-মধ্য-অন্তে স্বনিমের অবস্থানবিধি বিশ্লেষণ ও সূত্রবদ্ধ করাই হলো স্বনিম প্রক্রিয়াবিজ্ঞানের (Phonology) নিজস্ব বিষয়।

প্র : ধ্বনিতত্ত্বের শাখাগুলির উল্লেখ কর।

উ : আলোচ্য বিষয়ের প্রকারভেদ অনুসারে ধ্বনিতত্ত্বের তিনটি শাখা। যেমন- ধ্বনি-বিজ্ঞান, স্বনিমবিজ্ঞান বা ধ্বনিবিচার ও স্বনিম প্রক্রিয়াবিজ্ঞান।

প্র : কোন দুটি দিক দিয়ে ধ্বনিসমষ্টির পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচিত হয়?

উ : ভাষার ধ্বনিসমষ্টির পারস্পরিক সম্পর্কের দুটি দিক আছে-

১. শব্দমধ্যে ধ্বনির অবস্থান (Distribution of sound) এবং

২. একটি ধ্বনির সঙ্গে অন্য ধ্বনির সংযোগ বা ধ্বনির সমাবেশ (Combination of sound)।

প্র : বাংলায় 'অ্যা' ধ্বনির অবস্থান নির্ণয় কর।

উ : 'অ্যা' ধ্বনিটি শব্দের সব অবস্থানেই বসতে পারে। তবে শব্দের অন্তে 'অ্যা' বসলে তার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জন দ্বৈত উচ্চারিত হয়। যেমন- বন্যা = বোন্না। কিন্তু এটাই একমাত্র নিয়ম নয় কারণ, বাংলায় শব্দের শেষে 'অ্যা'-এর পূর্ণাঙ্গ উচ্চারণও হয়। যেমন- 'জ্যা' (ধনুকের ছিলা)।

প্র : শব্দের আদিতে বসে না, এমন দুটি বাংলা ধ্বনি কী কী?

উ : বাংলা ভাষায় শব্দের আদিতে 'ঙ' এবং 'ড়' ধ্বনি দুটোকে কখনও পাওয়া যায় না।

প্র : স্বনিম কাকে বলে?

উ : স্বনিম হলো একাধিক শব্দের মধ্যে অর্থের পার্থক্য সৃষ্টিকারী ক্ষুদ্রতম ধ্বনিগত একক। যেমন- 'কাল' ও 'খাল' শব্দের অন্তর্গত ক্ষুদ্রতম ধ্বনি 'ক' এবং 'খ' দুটিকে পৃথক অর্থদান করেছে। তাই 'ক' ও 'খ' হলো স্বনিম বা ধ্বনিমূল।

প্র : পূরকধ্বনি বা উপধ্বনি কাকে বলে?

উ : একটি মূল ধ্বনির যেসব উচ্চারণ বৈচিত্র্য যখন শব্দের মধ্যে তার অবস্থান বা পরিবেশের সমাবেশের শর্তের অধীন হয়, শুধু খেয়ালখুশির উপর নির্ভর করে না, সেই উচ্চারণ বৈচিত্র্যগুলিকে ঐ পূরকধ্বনি বা উপধ্বনি।

প্র : স্বনিমের স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যের ধারক কে?

উ : ভাষাবিজ্ঞানী অধ্যাপক ত্রুবেৎস্কয় (Trubetzkoy)-এর রচনায় স্বনিমের স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যের ধারণাটি ব্যক্ত হয়।

প্র : ইয়াকপসন কথিত স্বনিমের স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যের সংখ্যা কটি?

উ : ইয়াকপসন স্বনিমের ১২টি স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

প্র : বাংলা ভাষায় স্বনিমের একটি স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কর।

উ : স্বর ও ব্যঞ্জন- এই দুটি বিভাগে বাংলা ভাষার স্বনিমগুলিকে ভাগ করলেই এর একটি স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। যেমন-

যাও = য + আ + ও ('স্বর')

যান = য + আ + ন (ব্যঞ্জন)

উপরের উদাহরণে ''ও এবং 'ন' ব্যঞ্জনে প্রভাবে শব্দ দুটি আলাদা অর্থ বহন করছে।

প্র : সন্দেহভাজন জোড় (Suspicious pair) কাকে বলে?

উ : প্রায় সমোচ্চারিত যেসব ধ্বনিকে এবং স্বনিমের পূরকধ্বনি সন্দেহকরে শব্দের মধ্যে তাদের অবস্থান ইত্যাদি বিষয় বিচার করা হয়, তাদের সন্দেহভাজন জোড় বলে। যেমন- শারদা-সারদা।

প্র : 'মুক্ত বৈচিত্র্য' কী?

উ : ভাষাবিজ্ঞানী গ্লিসন উল্লেখ করেছেন যে একই 'key' শব্দ যদি কেউ একশো বার উচ্চারণ করে তবে প্রত্যেকবারই তার উচ্চারণে ঐ ধ্বনির একটু-আধটু পার্থক্য হবে। এইভাবে কোনো স্বনিমের সমস্ত স্বাধীন, শর্তহীন উচ্চারণ বৈচিত্র্য যখন, তখন তাকে মুক্ত বৈচিত্র্য (free variation) বলে।

প্র : ন্যূনতম শব্দজোড় কাকে বলে?

উ : যখন দুটি শব্দ গতানুগতিক সমান ছোটো হয় এবং তাদের মধ্যে সর্বাধিক মিল থাকে, শুধু প্রত্যেক শব্দের একটি করে ধ্বনি আলাদা বলে শব্দ দুটির অর্থ পৃথক হয়, তখন সেই শব্দ দুটিকে ন্যূনতম শব্দজোড় বা Minimal pair বলে।

যেমন-

কাল = ক্ + আ + ল্

বাল = খ্ + আ + ল্

অমিল মিল

রূপতত্ত্ব

প্র : রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় কী?

উ : রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় হলো কোনো ভাষায় উচ্চারিত সমস্ত শব্দের নানা দিক, অর্থাৎ তার গঠন, রূপবৈচিত্র্য, রূপবৈচিত্র্য সাধনের বিভিন্ন উপকরণ যেমন- প্রত্যয়, বিভক্তি ইত্যাদি।

প্র : 'আমসত্ত্ব' কথাটি একটি রূপিম নয় কেন?

উ : কারণ, এটি ক্ষুদ্রতম ধ্বনিসমষ্টি নয়। একে ক্ষুদ্রতর দুটি অর্থপূর্ণ ধ্বনিসমষ্টিতে ভাগ করা যায়, যেমন- 'আম' ও 'সত্ত্ব'। তাই 'আমসত্ত্ব' রূপিম নয়, এটি একটি সমস্তপদ।

প্র : 'বাঘের' শব্দটির রূপিম বিভাগ করে দেখাও কোনটি কী ধরনের রূপিম?

উ : 'বাঘের' শব্দটিকে ভাঙলে দুটি রূপিম পাওয়া যাবে। 'বাঘ' ও 'এর'। 'বাঘ' হলো মুক্ত রূপিম এবং 'এর' হলো বদ্ধ রূপিম।

প্র : শব্দের সঙ্গে রূপিমের একটা পার্থক্যের সূত্র নির্দেশ কর।

উ : সব শব্দই একা একা ব্যবহৃত হতে পারে, কিন্তু সব রূপিমই একা একা ব্যবহৃত হতে পারে না।

প্র : মুক্ত রূপিম কাকে বলে?

উ : যে অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্রতম ধ্বনিসমষ্টি অন্য ধ্বনিসমষ্টির সঙ্গে যুক্ত না হয়েও স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে, তাকে মুক্ত রূপিম বলে। যেমন- আম, জল, কলম ইত্যাদি।

প্র : বদ্ধ রূপিম বলতে কী বোঝ?

উ : যে অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্রতম ধ্বনিসমষ্টি সর্বদা অন্য ধ্বনিসমষ্টির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়, কখনও স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে না, তাকে বদ্ধ রূপিম বলে। যেমন- 'ছেলেটি' শব্দের 'টি' হলো বদ্ধ রূপিম।

প্র : Unique Morpheme বা অনন্য সাধারণ রূপিম কাকে বলে?

উ : যে রূপিম পৌনঃপুনিকভাবে ব্যবহৃত না হয়ে শুধুমাত্র একটি সমধ্বনি শিমাবদ্ধ, তাকেই অনন্য সাধারণ রূপিম বা Unique Morpheme বলে। যেমন- ইংরেজিতে 'Cranberry' শব্দের 'Cran' রূপিমটি ইংরেজি ভাষায় আর কোথাও ব্যবহৃত না হয়ে শুধুমাত্র 'Cranberry' শব্দেই ব্যবহৃত হয়।

প্র : 'সমধ্বনিরূপ' কাকে বলে?

উ : যদি এমন হয় যে, দুটি ধ্বনিগুচ্ছের মধ্যে শুধু ধ্বনিগত সাদৃশ্য আছে কিন্তু অর্থগত সাদৃশ্য নেই, তবে সেই শব্দ বা শব্দাংশগুলিকে রূপিম বলা হয় না। এদের বলা হয় 'সমধ্বনিরূপ'। যেমন- 'বই পড়ে' ও 'জল পড়ে' বাক্য দুটির 'পড়ে' শব্দের মধ্যে ধ্বনিগত সাদৃশ্য আছে কিন্তু অর্থগত সাদৃশ্য নেই। তাই এরা পরস্পরের সমধ্বনিরূপ।

প্র : মিশ্র রূপমূলের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?

উ : দুটি মুক্ত রূপমূল সহযোগে যখন একটি মিশ্র রূপমূল গঠিত হয়, তখন মুক্ত রূপমূল দুটির পূর্ব অর্থের বদলে একটি নতুন অর্থ প্রকাশিত হয়। যেমন- 'গাড়িল'। এখানে 'গাং' ও 'চিল'-এর অর্থ বদলে গিয়ে একটি বিশেষ ধরনের পাখির নাম বোঝাচ্ছে।

Scanned with CamScanner

প্র : জটিল রূপমূলের সংজ্ঞার্থসহ উদাহরণ দাও।

উ : দুইয়ের বেশি মুক্ত রূপমূলের সংযোগে যে রূপমূল গঠিত হয়, তাকে জটিল রূপমূল বলা হয়। বাংলায় এই ধরনের জটিল রূপমূল হলো- বহুবর্ণপাঁচর।

প্র : বাংলা ভাষায় ব্যাকরণিক সংবর্গ বলতে কাদের বোঝানো হয়?

উ : বাংলা শব্দের রূপবৈচিত্র্যের মুখ্য কারিগর হল বিভক্তি। এই বিভক্তি বচন, লিঙ্গ, পুরুষ, কারক, কাল, ভাব-প্রকার প্রভৃতি শব্দের রূপবৈচিত্র্য নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে বলে এদের ব্যাকরণিক সংবর্গ বলা হয়।

প্র : 'মা' শব্দটিকে আমরা মৌলিক শব্দ বলি কেন?

উ : আমরা জানি, যে শব্দ একটি মাত্র রূপিম নিয়ে গঠিত, সেই শব্দকে মৌলিক শব্দ বলে। 'মা' শব্দটিও একটি মাত্র রূপিম দ্বারা গঠিত, কারণ 'মা'-কে ভাঙলে আমরা পাব 'ম'+ 'আ', যার কোনো অর্থ নেই, তাই 'মা' শব্দটি একটি মৌলিক শব্দ।

প্র : জটিল শব্দ কাকে বলে?

উ : যে শব্দ এক বা একাধিক মুক্ত রূপিমের সঙ্গে এক বা একাধিক বদ্ধ রূপিমের সংযোগে অথবা শুধুই একাধিক বদ্ধ রূপিমের সংযোগে গঠিত হয়, তাকে জটিল শব্দ বলে। যেমন- ছেলে + মি = ছেলেমি।

প্র : দেশ + বিদেশ = দেশবিদেশ। এই ধরনের শব্দগঠনকে ব্যাকরণের ভাষায় কী বলে?

উ : প্রশ্নের উদাহরণে দেখা যাচ্ছে, 'দেশ' ও 'বিদেশ' দুটি পৃথক শব্দ মিলে 'দেশবিদেশ' শব্দটি তৈরি হয়েছে। আমরা জানি, যে শব্দ একাধিক মুক্ত রূপিম বা একাধিক শব্দ নিয়ে গঠিত, তাকে সমাসবদ্ধ শব্দ বলে। এক্ষেত্রে তাই বলতে পারি যে, 'দেশবিদেশ' শব্দটি সমাসবদ্ধ শব্দ।

প্র : স্বনিম ও রূপিমের দুটি পার্থক্য কী?

উ : ১. স্বনিম হলো ভাষার ক্ষুদ্রতম একক, কিন্তু রূপিম বা রূপমূল তা না-ও হতে পারে।
২. স্বনিমের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই, কিন্তু রূপিমের নিজস্ব একটা অর্থ থাকবেই।

বাক্যতত্ত্ব

প্র : ভাষাবিজ্ঞানী এডওয়ার্ড স্যাপির 'Language' গ্রন্থে 'বাক্য' সম্বন্ধে কী লেখেন?

উ : আলোচ্য গ্রন্থে বাক্যের সংজ্ঞা হিসেবে লেখা হয়েছে যে, 'It is the linguistic expression of a proposition' অর্থাৎ বাক্য কোনো একটি বক্তব্যকে ভাষায় প্রকাশ করে।

প্র : আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে প্রাথমিকস্তরে প্রধান যে দুটি অংশে বাক্যকে বিশ্লেষণ করা হয়, তা উল্লেখ কর।

উ : আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান মতে বাক্যের প্রধান দুটি অংশ হল কর্তাখণ্ড এবং ক্রিয়াখণ্ড। এই দুটি অংশকে কেউ কেউ আবার যথাক্রমে বিশেষ্যগুচ্ছ এবং ক্রিয়াগুচ্ছ রূপেও বিশ্লেষণ করেন।

প্র : বাক্যের 'উদ্দেশ্য' অংশ বলতে কী বোঝ?

উ : কোনো একটি বিষয়, বস্তু-ভাব বা ক্রিয়াকে অবলম্বন করে বক্তা তার মনোভাব বাক্যে প্রকাশ করে থাকেন। সেক্ষেত্রে মনোভাব প্রকাশকারী বক্তাই হলেন বাক্যের উদ্দেশ্য। অন্যভাবে বললে, বাক্যে যার সম্বন্ধে কোনো কিছু বলা হয় বা ভাব প্রকাশ করা হয় তা-ই উদ্দেশ্য।

প্র : বাক্যের বিধেয় অংশ কাকে বলে?

উ : বাক্যের উদ্দেশ্যকে অবলম্বন করে যা কিছু বলা হয়, অর্থাৎ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলা হয়, তা-ই হলো বাক্যের 'বিধেয়' অংশ।

প্র : বাক্যের বিশেষখণ্ডে কী কী ধরনের পদ থাকতে পারে?

উ : 'বিশেষ্যখণ্ড' নামে বিশেষ্য হলেও এতে যেমন বিশেষ্য পদ থাকে, তেমনি

সর্বনামও থাকতে পারে। এরা কর্তৃস্থানীয় অর্থাৎ, বিশেষ্য বা সর্বনাম কর্তার স্থান দখল করে। এ ছাড়া, বিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ, নির্দেশক এবং সংযোজক পদও থাকতে পারে।

প্র : বাক্যের 'ক্রিয়াখণ্ডে' কোন কোন পদ থাকতে পারে?

উ : ক্রিয়াখণ্ডে অবশ্যই ক্রিয়াপদ থাকে। এছাড়া এর সঙ্গে গৌণ কর্ম, মুখ্য কর্ম, ক্রিয়াবিশেষণ, কালবাচক পদ ইত্যাদি থাকতে পারে।

প্র : বাক্যের অধোগঠনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য কী?

উ : চমস্কির মতে বাক্যের অধোগঠনের অর্থ অপরিবর্তনীয়। এই অপরিবর্তনীয়তাই এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

প্র : 'অধিগঠন' বলতে কী বোঝ?

উ : চমস্কির 'সংবর্তনী-সঞ্জননী' ব্যাকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হলো বাক্যের 'অধিগঠন'। তাঁর মতে, বাক্যের অন্তর্গত গঠনের স্তরটিই হলো অধিগঠন যাকে পরিবর্তন করা যায়। এছাড়া তিনি অধিগঠনকে বাক্যের 'প্রকাশভঙ্গি' রূপে অভিহিত করেছেন।

প্র : বাক্যের 'অব্যবহিত উপাদান' কাকে বলে?

উ : বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে বাক্যকে ধাপে ধাপে ক্রমশ বৃহত্তর থেকে ক্ষুদ্রতর উপাদানে ভাগ করা হয়। এদের এক-একটি উপাদান সমষ্টিকে বলা হয় গঠন। এই যে-কোনো গঠনকে আমরা যে দুটি বা যে কটি বৃহত্তম অর্থপূর্ণ উপাদানে ভাগ করতে পারি, তাদের অব্যবহিত উপাদান বলে।

প্র : বাক্যবিধির প্রধান দুটি দিক উল্লেখ কর।

উ : বাক্যবিধির প্রধান দুটি দিক হলো-
১. বাক্যের মধ্যে শব্দগুলিকে সাজাবার বা বিন্যাসের নিয়ম, এবং
২. বাক্যের প্রয়োজন অনুসারে শব্দের রূপ পরিবর্তনের নিয়ম।

প্র : ভাষাবিজ্ঞানের ইতিহাসে দিওনুসিওস থ্রাক্স বিখ্যাত কেন?

উ : গ্রিক বাকরণবিদ দিওনসিওস থ্রাক্স বাক্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বাক্যকে পদের 'একক বিন্যাস' অংশে অভিহিত করেন। গ্রিক ভাষায় থেকে বলা হয় Syntaxis। এই শব্দটি থেকেই পরবর্তীকালে ইংরেজি Syntax শব্দের উৎপত্তি। যার বাংলা প্রতিশব্দ হল 'বাক্যতত্ত্ব'। সেই অর্থে বাক্যতত্ত্বের জনকরূপে এই গ্রিক ব্যাকরণবিদ ভাষাবিজ্ঞানের ইতিহাসে বিখ্যাত।

প্র : বাক্যের এক শব্দের সঙ্গে অপর শব্দের সম্পর্ক বোঝানোর জন্য শব্দের সঙ্গে কোন বিভক্তি দুটি যুক্ত থাকে?

উ : বাক্যের অন্তর্গত প্রতিটি শব্দের সঙ্গে হয় শব্দবিভক্তি নয়তো ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত থাকে। নাম শব্দের সঙ্গে যুক্ত বিভক্তিকে বলা হয় শব্দ বিভক্তি এবং ক্রিয়া শব্দের সঙ্গে যুক্ত বিভক্তিকে বলা হয় ক্রিয়াবিভক্তি।

প্র : গঠন-বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ রেখে বাক্যের স্বীকৃত চারটি রূপ কী কী?

উ : গঠন-বৈচিত্র্য অনুযায়ী বাক্যের যে চারটি রূপ স্বীকৃত, সেগুলি হলো-
১. অসমবায়ী বা অযোগাত্মক (Isolating)
২. সমবায়ী বা প্রশ্লিষ্ট যোগাত্মক (Incorporation)
৩. যৌগিক বা অশ্লিষ্ট যোগাত্মক (Agglutinating)
৪. সমবয়ী বা শ্লিষ্ট যোগাত্মক (Infectional)।

প্র : গঠনগতভাবে বাংলা বাক্যের শ্রেণিবিভাগ গুলি কী কী?

উ : বাক্যের গঠনের দিক থেকে বিচার করলে বাংলা বাক্যকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।
১. সরল বাক্য (Simsple sentence)
২. জটিল বাক্য (Complex sentence) এবং
৩. যৌগিক বা সংযুক্ত বাক্য (Compund sentence)।

প্র : অর্থগত দিক থেকে বাংলা বাক্যকে মূল কটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়?

উ : অর্থের দিক থেকে বাংলা বাক্যকে নানা

Scanned with CamScanner

শ্রেণিতে ভাগ করা চলে। সেগুলির মধ্যে মূল চারটি শ্রেণি হলো–

১. নির্দেশক বা উক্তিবাচক বাক্য (*Indicative sentence*)

২. প্রশ্নবাচক বাক্য (*interrogative sentence*)

৩. বিস্ময়বাচক বা উচ্ছ্বাসবাচক বাক্য (*Interjective sentence*)।

৪. অনুজ্ঞাবাচক বাক্য (*Imperative sentence*)।

প্র : বাক্যের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য তিনটি কী কী?

উ : প্রথাগত ব্যাকরণের আলোচনায় ভাষাবিদরা বাক্যের তিনটি বিশিষ্ট লক্ষণের কথা উল্লেখ করেন, সেগুলির অভাবে বাক্যের গঠন ত্রুটিপূর্ণ হয়। এই লক্ষণগুলো হলো– ১. আকাঙ্ক্ষা, ২. যোগ্যতা, ৩. আসত্তি।

প্র : 'বাক্যতত্ত্ব' (Syntax) কাকে বলে?

উ : বাক্যে অবস্থিত শব্দগুলির বিন্যাস অর্থাৎ বাক্যের মধ্যে কোন শব্দ কোথায় বসবে এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কী রকম হবে তা ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচনা করা হয়, তাকে বলে বাক্যতত্ত্ব।

শব্দার্থতত্ত্ব

প্র : 'শব্দার্থতত্ত্ব' কথাটির অর্থ কী?

উ : শব্দার্থতত্ত্ব বা Semantes কথাটির অর্থ হলো The stydy of meaning অর্থাৎ ভাষায় শব্দ ইত্যাদির অর্থের চর্চা।

প্র : শব্দের অর্থ আলোচনায় প্লেটোর প্রকৃতিবাদী মতটি কী?

উ : প্লেটো ও তাঁর অনুগামীদের মতে, শব্দের ধ্বনি ও অর্থের মধ্যে স্বাভাবিক ও অন্তর্লীন সম্পর্ক আছে।

প্র : শব্দার্থতত্ত্বের মূল আলোচ্য বিষয় কী?

উ : শব্দের অর্থ সম্পর্কিত আলোচনাই শব্দার্থতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। তবে, একটি শব্দ যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবেশে ভিন্ন অর্থ ধারণ করতে পারে, তেমনি অর্থের অর্থও থাকতে পারে। অর্থ ও অর্থের সঙ্গে শব্দের সম্পর্ক, অর্থের সঙ্গে চিন্তার সম্পর্ক শব্দার্থতত্ত্বের মূল আলোচ্য বিষয়।

প্র : শব্দার্থ সম্পর্কে ভাষাবিজ্ঞানী জেফ্রি লিচের মতামতটি লেখ।

উ : ভাষাবিজ্ঞানী জেফ্রি লিচের মতে, শব্দের অর্থের একাধিক দিক বা ভাব থাকে। শব্দের অর্থকে বুঝতে হলে সামগ্রিকভাবে বুঝতে হয়। কারণ শব্দের যেমন বোধমূলক অর্থ থাকে, তেমনি ইঙ্গিতময় অর্থও থাকে কিংবা আবেগচালিত অর্থও থাকতে পারে।

প্র : সিমিয়ন পটার শব্দার্থের যে তিনটি দিকের কথা বলেছেন সেগুলি কী কী?

উ : ইংরেজ ভাষাতাত্ত্বিক সিমিয়ন পটার সহজ ভাষায় শব্দার্থের তিনটি দিকের কথা বলেছেন। এগুলি হলো– ১. নিছক অর্থগত, ২. শব্দগত, ৩. প্রসঙ্গগত।

প্র : শব্দগত অর্থ বোঝাবার তিনটি উপায় কী কী?

উ : শব্দগত অর্থ জ্ঞাপন করা বা বোঝাবার সাধারণত তিন রকম উপায় রয়েছে। এগুলি হলো– ১. ইশারায় বা ইঙ্গিতে বা নির্দেশ করে, ২. ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলে, ৩. অনুবাদের মাধ্যমে।

প্র : শব্দের 'প্রসঙ্গগত' অর্থ সম্পর্কে ভিগেনস্টাইন (Wittgenstein)-এর মতামতটি লেখ।

উ : শব্দের 'প্রসঙ্গগত' অর্থ সম্পর্কে অস্ট্রীয় দার্শনিক ভিগেনস্টাইন বলেছেন– 'The meaning of a word is it's use in the language' । অর্থাৎ একটা শব্দের অর্থ বোঝা যায় ভাষায় তার প্রয়োগ থেকে।

প্র : শব্দার্থতত্ত্বের তাত্ত্বিক ধারণাগুলির উল্লেখ কর।

উ : শব্দের অর্থ ও তার প্রয়োগের তত্ত্ব বিশ্লেষণের প্রকৃতি অনুসারে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে তিনটি তাত্ত্বিক ধারণা প্রচলিত আছে। এগুলি হলো– ১. উপাদানমূলক তত্ত্ব, ২. সত্তা-সাপেক্ষ তত্ত্ব, ৩. বিষয়মূলক তত্ত্ব।

প্র : শব্দার্থের সত্তা-সাপেক্ষ তত্ত্বটির মূল কথা কী?

উ : যখন আমরা কোনো বাক্যকে সত্য বলে জ্ঞান করি বা বাস্তব সত্যের ভিত্তিতে রচিত বলে মনে করি, তখন সেই বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলি সম্পর্কে আমাদের মধ্যে একটি অর্থের বোধ গড়ে ওঠে। এটাই হল সত্তা-সাপেক্ষ তত্ত্বের মূল কথা।

প্র : শব্দার্থ নির্ণয়ে উপাদানমূলক তত্ত্বের দার্শনিক ভিত্তি কী?

উ : শব্দের মূর্ত প্রতিরূপ ছাড়াও তার সাধারণ ধর্মটিকে কল্পনা করাই হলো উপাদানমূলক তত্ত্বের দার্শনিক ভিত্তি।

প্র : বিষয়মূলক শব্দার্থতত্ত্বে শব্দের যে দু-রকম অর্থের কথা বলা হয় সেগুলি লেখ।

উ : বিষয়মূলক শব্দার্থ তাত্ত্বিকদের মতে, শব্দের অর্থ দু-রকম হতে পারে। যেমন–

১. সুস্পষ্ট নির্দিষ্ট অভিধানিক অর্থ বা মুখ্য অর্থ।

২. মুখ্য অর্থ থেকে জাত আলংকারিক ব্যবহারে প্রযুক্ত গৌণ অর্থ বা ব্যঙ্গার্থ।

প্র : অর্থগত দিক থেকে শব্দের পারস্পরিক সম্পর্ক কী কী রূপে হতে পারে?

উ : শব্দের সঙ্গে শব্দের যে অর্থ সম্পর্ক তা মূলত তিনটি রূপে হতে পারে। এগুলি হলো–

১. সমার্থকতা,

২. বিপরীতার্থকতা,

৩. ব্যাপকতার্থকতা।

প্র : গঠনগত সাদৃশ্য আছে অথচ অর্থ বিপরীতধর্মী, এমন বাংলা শব্দের উদাহরণ দাও।

উ : সমান-অসমান, জল-পরাজয়, আসর-অসার ইত্যাদি শব্দজোড়ের মধ্যে গঠনগত সাদৃশ্য আছে, অথচ অর্থের দিক থেকে এরা একে অপরের বিপরীত।

প্র : শব্দার্থ বিশ্লেষণে প্রয়োগবাদীদের প্রধান লক্ষ্য কী?

উ : শব্দার্থ বিশ্লেষণে প্রয়োগবাদীদের প্রধান লক্ষ্য হলো ভাষাভাষিক সম্পর্কের বাইরে জ্ঞান ও বিশ্বাসের সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক অন্বিষ্কার। প্রয়োগবাদীরা মনে করেন, কোনো বক্তার কথনভঙ্গি ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে তার বক্তব্যকে বুঝতে পারার ক্ষমতা অর্জনই প্রয়োগবাদের মূল উদ্দেশ্য।

প্র : ক্ষুদ্র শস্য > খুদ, এই অর্থ পরিবর্তনের কারণ উল্লেখ কর।

উ : আমরা ভাষা ব্যবহারের সময় অনেক ক্ষেত্রেই শিথিলতা প্রকাশ করি বা কখনো-কখনো শব্দ বা বাক্যাংশকে ছোট করে নিই। এক্ষেত্রেও তাই ক্ষুদ্র শস্য এবং অর্থের অনুরূপে শস্যের ক্ষুদ্র অংশটি 'খুদ' রূপে পরিবর্তিত হয়েছে। তবে ক্ষুদ্র শস্য থেকে 'শস্য' শব্দটি বাদ গেলেও 'খুদ' শব্দে শস্যের অনুষঙ্গ রয়ে গেছে।

Scanned with CamScanner

প্র : ছন্দ কাকে বলে?

উ : যেসব বিশৃঙ্খল ধ্বনি পরিমিতি ও শৃঙ্খলার সুষম ও যৌক্তিক বিন্যাসকে ছন্দ বলে। তবে সাহিত্যের ক্ষেত্রে একথা বলা যায়। ভাষাকে শ্রুতিমধুর করার জন্য অর্থগ্রাহ্যে সুনির্দিষ্ট ও সুপরিমিত ধ্বনি-পরিবেষ্টনীর করার বিধিই প্রকৃতির নাম ছন্দ। কবিতার যেমন ছন্দ থাকে, গদ্যেরও তেমনি ছন্দ থাকে।

প্র : কবিতা ও পদ্যের মধ্যে পার্থক্য কী?

উ : অন্তর্মিল বিশিষ্ট সরল কথায় শ্রুতিমধুর পঙ্‌ক্তি-সমাবেশ যখন একটি নির্দিষ্ট ছন্দে রূপায়িত হয়, যেখানে চিন্তার খোরাক থাকে না, অনুভবকেও স্পর্শ করে কম শুধু ভাবলোকের আবেশ বা নীহারিকা থাকে মাত্র তাকে পদ্য বলে। আর গভীর অর্থব্যঞ্জক, অনুভূতির বহুমাত্রিকতায় ভাবিত শব্দরাশি যখন অনতিনিরূপিত ধ্বনি-স্পন্দনময় হয়ে বাঙ্ময় রূপ লাভ করে, তখন তাকে কবিতা বলে। কবিতা গদ্যেও রচিত হতে পারে। এখানে সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়মিত ছন্দের বন্ধনের আবশ্যকতা নেই।

প্র : অক্ষর (Syllable) কাকে বলে?

উ : ইংরেজি Letter বলতে বাংলায় বর্ণ বোঝায়, অক্ষর বোঝায় না। অক্ষর বলতে বোঝায় Syllable. অক্ষর ছন্দ-বিচারে আবশ্যিক এক প্রত্যয়টি।

বাগযন্ত্রের ক্ষুদ্রতম প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা শব্দাংশের নাম অক্ষর (Syllable)। যেমন : রবি বার। এখানে (র) (বি) (বার) এই তিনটি অক্ষর। শ্রাবার, সোম বার। এখানে অক্ষর দুটি : (সোম) (বার)।

প্র : অক্ষর (Syllable) কত প্রকার ও কী কী?

উ : অক্ষর (Syllable) দু প্রকার। যথা : মুক্তাক্ষর (Open Syllable), বদ্ধাক্ষর (Close Syllable).

প্র : মুক্তাক্ষর ও বদ্ধাক্ষরের পরিচয় দাও।

উ : অযুগ্ম বা মুক্ত স্বরান্ত ধ্বনিকে মুক্তাক্ষর (Open Syllable) বলে। যেমন : 'ভালোবাসো যদি বলিবে না কেন?' এখানে (ভা) (লো) (বা) (সো) (য) (দি) (ব) (লি) (বে) (না) (কে) (ন) এই সবগুলোই (১২টি) মুক্তাক্ষর। মুক্তাক্ষর ∪ চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়।

বদ্ধ অর্থাৎ যুগ্মস্বরান্ত বা ব্যঞ্জনান্ত ধ্বনিকে বদ্ধাক্ষর (Close Syllable) বলে। যেমন : 'সোম বার নিবাস ঢাকায়।' এখানে (সোম) (বার) (দিন) (ঢাকা) এই সবগুলোই (৩টি) বদ্ধাক্ষর। চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়।

প্র : পঙ্‌ক্তি ও ছত্রের মধ্যে পার্থক্য কী?

উ : কবিতায় পূর্ণযতি দিয়ে নির্দিষ্ট ছন্দোবিভাগের নাম পঙ্‌ক্তি। আর যতিচিহ্নের সঙ্গে সম্পর্কহীন। যেমন ত্রিপদীতে একটি পঙ্‌ক্তি তিন ছত্রে সাজানো থাকে। উদাহরণ।

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর। -বিদ্যাপতি

প্র : যতি, পূর্ণপর্ব, অতিপর্ব, অপূর্ণপর্ব কাকে বলে?

উ : একটি কবিতা পাঠ করার সময় পাঠক দুভাবে থামেন। কবিতাংশে বাক্য বা অর্থ সমাপনান্তে একবার, অন্যবার কবিতা পাঠকালে নিঃশ্বাস পতন ও শ্বাসগ্রহণ কালে। কবিতায় পর্ব নির্ণয়ের সময় পাঠকের নিঃশ্বাস পতন ও শ্বাসগ্রহণের স্বাচ্ছন্দকে বিবেচনা করা হয়। কবিতা পাঠের সুবিধার্থে কবিতার প্রতি ছত্রে এক বা একাধিক বিশ্রামস্থান সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই বিশ্রামস্থানকে যতি বলা হয়। কবিতার ছত্রে 'যতি' পতনের পূর্ব অংশকে পর্ব বলে। বিভিন্ন ছন্দে নির্দিষ্ট মাত্রার পর্বগুলোকে **পূর্ণপর্ব**, নির্দিষ্টমাত্রার চেয়ে কম কিন্তু ছত্রের শেষে উপস্থিত এমন পর্বকে **অপূর্ণপর্ব**, নির্দিষ্টমাত্রার চেয়ে কম কিন্তু ছত্রের প্রারম্ভে বর্তমান এমন পর্বকে **অতিপর্ব** বলা হয়। যেমন : (মাত্রাবৃত্ত ছন্দে)

'খাঁচার পাখি ছিল / সোনার খাঁচাটিতে /
বনের পাখি ছিল / বনে।/
-রবীন্দ্রনাথ

এখানে 'বনে' অপূর্ণ পর্ব। বাকি তিনটি পূর্ণপর্বের উদাহরণ। নিচের উদাহরণে 'বল' অতিপর্ব :

'বল / উন্নত মম / শির'।
-নজরুল

প্র : মুক্তাক্ষর কাকে বলে?

উ : পর্ব বিভাগের সংযোজনে যদি দেখানো শব্দকে বিভক্ত করে উচ্চারণ করতে হয়, তখন সেই শব্দখণ্ডনের স্বাভাবিক উচ্চারণকে বলে। যেমন : (মাত্রাবৃত্ত ছন্দ)

'বাতাস ঘরে / প্রবেশ করে / প্যাকুল উচ্ছ্বাসে।' -রবীন্দ্রনাথ

এখানে 'উচ্ছ্বাসে' শব্দের মধ্যাক্ষর হরফে।

প্র : বাংলা ছন্দ-বিচার কোন নিরিখে করা হয়?

উ : পর্বের পাঠরীতিগত পার্থক্য অনুসারে বাংলা ছন্দ-বিচার করা হয়।

প্র : বাংলা ছন্দ কত প্রকার ও কী কী?

উ : তিন প্রকার। যথা : অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত।

প্র : অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্তের একাধিক নাম আছে, সেগুলো কী?

উ : **অক্ষরবৃত্ত** > জটিল কলামাত্রিক, মিশ্রকলামাত্রিক, যৌগিক ছন্দ;
মাত্রাবৃত্ত > কলাবৃত্ত ছন্দ> ধ্বনিপ্রধান ছন্দ;
স্বরবৃত্ত > দলবৃত্ত ছন্দ > ছড়ার ছন্দ > লৌকিক ছন্দ।

প্র : 'লয়' কী? কোন ছন্দ কোন লয়ের?

উ : 'লয়' অর্থ ছন্দের গতি। সাধারণত ধীর, মধ্য, দ্রুত এই তিন লয়ে কাব্যপাঠ হয়ে থাকে। অক্ষরবৃত্ত ধীর, মাত্রাবৃত্ত মধ্য, স্বরবৃত্ত দ্রুত লয়ের ছন্দ।

প্র : বিভিন্ন ছন্দে মুক্তাক্ষর ও বদ্ধাক্ষরের মাত্রা কত?

উ : স্বরবৃত্তে মুক্তাক্ষর ও বদ্ধাক্ষর সর্বত্র একমাত্রা। মাত্রাবৃত্তে মুক্তাক্ষর একমাত্রা ও বদ্ধাক্ষর দুই মাত্রা। অক্ষরবৃত্তে মুক্তাক্ষর একমাত্রা ও বদ্ধাক্ষর দুই মাত্রা; কিন্তু বদ্ধাক্ষর যদি শব্দের প্রথমে বা মধ্যে থাকে তবে একমাত্রা।

প্র : স্বরবৃত্ত ছন্দের পরিচয় দাও।

উ : স্বরধ্বনির সংখ্যার উপর পর্বের মাত্রা-সংখ্যা নির্ভরশীল যে ছন্দের, তার নাম স্বরবৃত্ত ছন্দ। এই ছন্দে সাধারণত প্রতি পর্বে চারটি অক্ষর থাকে। এর লয় হবে দ্রুত। যেমন :

'আবার যদি / ইচ্ছা কর / আবার আসি / ফিরে (৪+৪+৪+২)
দুঃখসুখের / ঢেউখেলানো / এই সাগরের / তীরে।' (৪+৪+৪+২)

প্র : স্বরবৃত্ত ছন্দকে ছড়ার ছন্দ বা লৌকিক ছন্দ বলা হয় কেন?

উ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরবৃত্তকে ছড়ায় ছন্দ বলেছেন। ছান্দসিকগণ একে লৌকিক ছন্দও বলেন। কারণ একই। এই ছন্দে

প্র : মাত্রাবৃত্ত ছন্দের পরিচয় দাও।

উ : যে ছন্দে যুগ্মধ্বনি সর্বদা দ্বিমাত্রিক উচ্চারিত হয় এবং যুগ্মধ্বনির অন্তর্গত প্রথমটির পরে পর্বের অন্তর্গত হসন্ত বর্ণ থাকলে তাকে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ বলে। সাধারণত ছন্দ ধ্বনি-প্রধান। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে ছয় মাত্রার পর্বই অধিক। চার, পাঁচ, সাত, আট মাত্রার পর্বও এ ছন্দে পাওয়া যায়। যেমন:

'সোনার পর্বে ছিল / সোনার খাঁচাটিতে
বনের পর্বে ছিল / বনে।' (৬+৬)
-রবীন্দ্রনাথ

'সুবলাকে বেজে ওঠে / শঙ্খ (৬+২)
নরলোকে বাজে জয় / ঢক্ক (৬+২)
এল মহাজন্মের / লগ্ন।' (৬+২)
-রবীন্দ্রনাথ

প্র : মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য সূত্রাকারে লেখ।

উ : মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য :

১. একই শব্দের অন্তর্গত যুক্তধ্বনির পূর্ববর্ণ দীর্ঘ বা দ্বিমাত্রিক।
২. হসন্ত অক্ষর বা বদ্ধাক্ষরের দীর্ঘ বা দ্বিমাত্রিক।
৩. অনুস্বর ও বিসর্গের পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ।
৪. যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর (যেমন : ঐ, ঔ) দ্বিমাত্রিক।
৫. অবশিষ্ট সমস্ত স্বর হ্রস্ব বা একমাত্রিক।

প্র : অক্ষরবৃত্ত ছন্দের পরিচয় দাও।

উ : যে ছন্দের পর্বে শব্দের আদি ও মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনি সংকুচিত ও একমাত্রা, শব্দের অন্তস্থিত যুগ্মধ্বনি সম্প্রসারিত ও দুইমাত্রা হয় তাকে অক্ষরবৃত্ত ছন্দ বলে। এই ছন্দে

Scanned with CamScanner

মূল পর্ব আট বা দশ মাত্রা হয় এবং শব্দধ্বনির অতিরিক্ত একটা তান থাকে। এই ছন্দ সুর প্রধান। যেমন।

'মধা নিলে যবে গান / বন্ধ করে পাখি (৮+৬)
যে বাতাস বেণু তব / বাজাও একাকি'। (৮+৬) –রবীন্দ্রনাথ

প্র : অক্ষরবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য সূত্রাকারে লেখ।

উ : অক্ষরবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য :

১. মূল পর্ব আট বা দশ মাত্রার হয়।
২. শব্দধ্বনির অতিরিক্ত তান বা সুর থাকে।
৩. শব্দান্তের হলন্ত বা যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর দ্বিমাত্রিক হয়। একাক্ষর শব্দের অক্ষরটি ব্যঞ্জনান্ত বা যৌগিক স্বরান্ত (এ, ঔ) হলে দুই মাত্রা হয়।
৪. সম্যসবদ্ধ শব্দের আদিতে যদি হলন্ত অক্ষর থাকে এবং তা যদি একটি শব্দ হয় তবে কখনো কখনো দুমাত্রা ধরা হয়।
৫. যুক্তব্যঞ্জনের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ হয়। তাই পূর্ববর্তী অক্ষর দীর্ঘ ও দ্বিমাত্রিক হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না।
৬. ছন্দটিতে দীর্ঘ লয় থাকে।

প্র : অমিত্রাক্ষর ছন্দের (Blank Verse) পরিচয় দাও।

উ : মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা অমিত্রাক্ষর ছন্দের জনক। এই ছন্দ অক্ষরবৃত্তের পয়ার অবলম্বন করেই তৈরি। প্রতি ছত্রেই এখানে ১৪ মাত্রা। প্রথম ৮ মাত্রায় অর্ধযতি, শেষ ৬ মাত্রায় পূর্ণ যতি। এখানে গম্ভীর ও ধ্বনি-মাধুর্যপূর্ণ শব্দের ব্যবহার হয়। ভাবের গভীরতা অতলস্পর্শী। এই ছন্দে অন্ত্যমিল বা অন্ত্যানুপ্রাস নেই। ছন্দটির প্রধান বিশেষত্ব এই যে, কত মাত্রার পর যতি পড়বে তা এখানে সুনির্দিষ্ট নয়। ভাবের প্রয়োজন অনুসারে শীঘ্র বা বিলম্বে এখানে যতির পতন হয়। যেমন :

'দানব-নন্দিনী আমি/রক্ষঃকুলবধূ (৮+৬)
রাবণ শ্বশুর মম/মেঘনাদ স্বামী, (৮+৬)
আমি কি ডরাই, সখি / ভিখারী রাঘবে?'
(৮+৬) –মধুসূদন

প্র : সনেট-এর পরিচয় দাও।

উ : সনেট পাশ্চাত্য ধারার কাব্য প্রকরণ। মধুসূদন দত্ত এর নাম দিয়েছেন চতুর্দশপদী কবিতা। তিনিই বাংলা সনেটের জনক। সনেটের আদি স্রষ্টা ইতালীয় কবি পেত্রার্ক (Francesco Petrurca # 130–1374 A.D) এবং আধুনিক ধারা ইংরেজ কবি শেক্সপিয়র (William Shakespeare 1564–1616 A.D) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। একটি আদর্শ সনেটের মধ্যে মুটি অংশ থাকে। ১৪ ছত্র বিশিষ্ট এই কবিতার প্রথম ৮ ছত্রকে বলে Octave বা অষ্টক, পরবর্তী ৬ ছত্রকে বলে Seslet বা ষষ্টক।

প্র : পেত্রার্কীয় ও শেক্সপিয়রীয় সনেটে অষ্টক ও ষট্‌ক বিন্যাসের বৈচিত্র্য কোথায়?

উ : *পেত্রার্কীয় সনেট :*
অষ্টকের মিল বিন্যাস হবে :
AB, BA, AB, BA।
ষট্‌কের মিল বিন্যাস হবে : CDE, CDE
(ষট্‌ক CD CD CD-ও হতে পারে)

শেক্সপিয়রীয় সনেট :
অষ্টকের মিল বিন্যাস হবে : ABAB, CDCD।
ষট্‌কের মিল বিন্যাস হবে : EFEF, GG
পেত্রার্কীয় সনেটে যেমন ৮ পঙ্‌ক্তি পর Turn বা আবর্তন (ইতালীয় শব্দ volta) আছে, শেক্সপিয়রীয় সনেটে ১২ পঙ্‌ক্তির পর সেই আবর্তন। এর শেষ দুই পঙ্‌ক্তি জোড় বা Cuplet.

প্র : গদ্যছন্দের পরিচয় দাও।

উ : শুধু কবিতাই ছন্দে রচিত হয় এমন নয়। গদ্যেরও ছন্দ আছে। গদ্যের এই ছন্দকে কবিতায় ব্যবহার করা হয়। এটাই গদ্যছন্দ। গদ্যকবিতার ছন্দ পদ্যছন্দের মত বাঁধাধরা কাঠামোতে নিয়ন্ত্রিত না হলেও কবির ছন্দোবোধের দ্বারা তা সংযমিত। রবীন্দ্রনাথ তুলনা করেছেন, গদ্যছন্দের চাল স্বাভাবিক চলন আর পদ্যছন্দের চাল নাচের চলন। গদ্যকবিতার পর্ব বিভাজন হয় অর্থকে অবলম্বন করে কিন্তু এই পর্বগুলি বিন্যস্ত হয় ভাবানুযায়ী। গদ্যছন্দ যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী। এই স্বাচ্ছন্দ্য ও অন্তরঙ্গতা গদ্যছন্দের বহুল বর্জনেরই ফল। এই ছন্দ প্রচলিতভাবে অক্ষরবৃত্তের রকমফের মাত্র। নিচে একটি গদ্যকবিতার উদাহরণ দেয়া হলো:

'একটুকু রইলেম চুপ করে (১০)
তারপর বললেম (৬)
রাতের সব তারাই আছে (১০)
দিনের আলোর গভীরে।' (৯)
–রবীন্দ্রনাথ

অলঙ্কার সোপান

প্র : অলঙ্কার কাকে বলে? অলঙ্কার কত প্রকার ও কী কী?

উ : কৌষিতকী উপনিষদে প্রথম 'অলঙ্কার' শব্দটি পাওয়া যায় : 'প্রকালঙ্কারেণ অলঙ্কৃত।' তবে ষষ্ঠ শতাব্দীতে আলঙ্কারিক দন্ডী প্রথম অলঙ্কারের সংজ্ঞার্থ দেন। তাঁর মতে : 'কাব্য শরীরের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত অস্থীষ্ঠ অর্থ সংবলিত পদ বিন্যাসই অলঙ্কার।' কাব্যকে সৌন্দর্যমন্ডিত ও সহৃদয়হৃদয়সংবেদ্য করার জন্য কবি যেসব কৌশল অবলম্বন করেন, তাকে অলঙ্কার বলে। যথা :

'যব গোধূলি সময় বেলি
ধনি মন্দির বাহির ভেলি
নব জলধরে বিজুরি রেহা দ্বন্দ্ব পাসরি
গেলি'
–বিদ্যাপতি

এখানে মূলকথা হলো, গোধূলি বেলায় নায়িকা মন্দির থেকে বের হয়ে গেল। এ সামান্য ঘটনাটিকেই কবি রূপময় করে তুললেন। বললেন– মেয়েটি চলে গেল, মনে হল, নবীন মেঘপুঞ্জে বিদ্যুৎ রেখার চমক খেলে গেল। এ রূপায়নই হলো অলঙ্কার। অলঙ্কার দুই প্রকার। যথা : শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার।

শব্দালঙ্কার

প্র : শব্দালঙ্কার কাকে বলে?

উ : বলা হয় 'শব্দই ব্রহ্ম'। শব্দের ধ্বনি বা Sound অলঙ্কারের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শব্দের ধ্বনিরূপের আশ্রয়ে যে সমস্ত অলঙ্কারের সৃষ্টি হয় তাকে শব্দালঙ্কার বলা হয়। শব্দালঙ্কার শব্দের ধ্বনির পরিবর্তন সহ্য করে না। যেমন :

'কুলায় কাঁপিছে কাতর কপোত।'
–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(ক-এর অনুপ্রাস)

এখানে 'কাতর' এর স্থলে 'ভীত' লিখলে অর্থ ঠিক থাকলেও শব্দালঙ্কার ক্ষুণ্ন হবে। 'ভারত ভারত খ্যাত আপনার গুণে' এখানে 'ভারত ইতিহা খ্যাত আপনার গুণে' লিখলে শব্দালঙ্কার ক্ষুণ্ন হবে।

প্র : উল্লেখযোগ্য শব্দালঙ্কারের নাম লেখ।

উ : শব্দালঙ্কারের মধ্যে
১. অনুপ্রাস
২. যমক
৩. শ্লেষ
৪. বক্রোক্তি
৫. পুনরুক্তবদাভাস
৬. ধ্বন্যুক্তিই প্রধান।

প্র : ১. 'অনুপ্রাস' কাকে বলে? অনুপ্রাস কত প্রকার ও কী কী?

উ : একই ব্যঞ্জনাধ্বনির বাক্যের মধ্যে পৌনঃপৌনিক ব্যবহারকে অনুপ্রাস বলে। অর্থাৎ একই বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ যুক্ত বা বিযুক্তভাবে একাধিকবার ধ্বনিত হলে অনুপ্রাস অলঙ্কার হয়। যথা :

'কাক কালো কোকিল কালো কালো
কন্যার কেশ।' – লোক ছড়া
'বাজে বায়ু আসি বিল্লুপ বাঁশি ডীর্ণ বাঁশের
ফাঁকে' –যতীন্দ্রনাথ
(ক এবং খ-ধ্বনির অনুপ্রাস)

অনুপ্রাস ছয় রকমের। যথা :
১.ক) সরল
১.খ) অন্ত্য
১.গ) গুচ্ছ
১.ঘ) ছেক
১.ঙ) শ্রুতি
১.চ) মালা।

প্র : প্রত্যেক প্রকার অনুপ্রাসের পরিচয় দাও।

উ : **১.ক) সরল অনুপ্রাস :** কবিতার কোনো ছত্রে এক / দুটি বর্ণ একাধিকবার ধ্বনিত হলে তাকে সরল অনুপ্রাস বলে। যেমন :

'পেলব প্রাণের প্রথম পশরা নিয়ে।'
–রবীন্দ্রনাথ
(প-এর অনুপ্রাস)

Scanned with CamScanner

১.খ) **অন্ত্যানুপ্রাস :** কবিতার প্রতি চরণান্তে যে মিল, তাকে অন্ত্যানুপ্রাস বলে। যেমন :
'ঘনায়ে গগনে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।'
–রবীন্দ্রনাথ

(বরষা/ভরসা-এর মিল)

১.গ) **গুচ্ছানুপ্রাস :** একাধিক ব্যঞ্জনধ্বনি যখন দুয়ের বেশি বার একই ছত্রে ব্যবহার হয় তখন তাকে গুচ্ছানুপ্রাস বলে। যেমন:
'না মানে শাসন, বসন বাসন অশন আসন যত।' – রবীন্দ্রনাথ

(এখানে '-সন' ধ্বনির গুচ্ছানুপ্রাস)

১.ঘ) **ছেকানুপ্রাস :** একাধিক ব্যঞ্জনধ্বনি যদি মাত্র দুবার (এর বেশি হলে গুচ্ছানুপ্রাস হবে) কবিতার ছত্রে ব্যবহার হয়, তখন তাকে ছেকানুপ্রাস বলে। যেমন: 'এখনি অন্ধ বন্ধ করো না পাখা।'
–রবীন্দ্রনাথ

('ন্ধ'-এর ছেকানুপ্রাস)

১.ঙ) **শ্রুতি অনুপ্রাস বা শ্রুত্যনুপ্রাস :** একই স্থান থেকে ধ্বনির উৎপত্তি নয় কিন্তু শুনতে মনে হয় একস্থান থেকে যেন পারস্পরিক। এমন শ্রুতসুখকর ধ্বনির অনুপ্রাসকে শ্রুতি অনুপ্রাস বা শ্রুত্যনুপ্রাস বলে। যেমন:
'যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে।'
–রবীন্দ্রনাথ

(এখানে ন্ধ, ন্দ, ন্থ-এর শ্রুত্যনুপ্রাস)

১.চ) **মালানুপ্রাস :** অনুপ্রাসের পর অনুপ্রাস অর্থাৎ অনুপ্রাসের মালা যখন একই ছত্র বা কবিতায় সৃষ্টি হয়, তখন তাকে মালানুপ্রাস বলে। যেমন : 'দেশ দেশ দিশি দিশি দৌড়িছে নিবা নিশি'
–সত্যেন্দ্রনাথ

(এখানে দ / শ-এর মালানুপ্রাস)

প্র : ২. 'যমক' কাকে বলে? বিভিন্ন প্রকার যমকের পরিচয় দাও।

উ : যমক শব্দের অর্থ 'যুগ্ম'। একই শব্দ বা প্রায় একই রকম উচ্চার্য শব্দ যদি নির্দিষ্টক্রমে দুই বা তার বেশিবার আলাদা, আলাদা অর্থে বসে, তবে সে অলঙ্কার হবে যমক। যথা :
'তরু কাছে লব তরু দুখ।'
–রবীন্দ্রনাথ

১ম তরু = পুরোহিত
২য় তরু = কবিতা / গাছ

যমক প্রধানত তিন প্রকার :
২.ক) আদ্যযমক
২.খ) মধ্যযমক
২.গ) অন্ত্যযমক।

২.ক) আদ্যযমক : ছত্র বা চরণের অন্তর্গত যে যমক তাই আদ্যযমক। যথা:
'ভারত, ভারত খ্যাত আপনার গুণে।'
–ভারতচন্দ্র

১ম ভারত = কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
২য় ভারত = ভারতবর্ষ

২.খ) মধ্যযমক : শব্দের মধ্যে যে যমক তাকে মধ্যযমক বলে। যথা :
'প্রভাকর প্রভাতে, প্রভাতে মনোলোভা।'
–ঈশ্বর গুপ্ত

১ম প্রভাত = ভোরবেলা
২য় প্রভাত = প্রকৃষ্টরূপে দেখা যাওয়া

২.গ) অন্ত্যযমক : কবিতার পঙ্‌ক্তির শেষ শব্দে যে যমক অলঙ্কার হয় তাকে অন্ত্যযমক বলে। যথা :
'দুহিতা আনিয়া যদি না দেহ
নিশ্চই আমি ত্যজিব দেহ।'
–ঈশ্বর গুপ্ত

১ম দেহ = দেয়া
২য় দেহ = শরীর

প্র : ৩. শ্লেষ কাকে বলে? বিভিন্ন প্রকার শ্লেষের পরিচয় দাও।

উ : চরণে একটিমাত্র শব্দ একাধিক অর্থ প্রকাশ করলে এবং পাঠকও যদি একাধিক অর্থেই তাকে গ্রহণ করে তবে তাকে শ্লেষ বলে। যথা :
'মধুহীন করোনা মা তব মনঃ কোকনদে।'
–মধুসূদন

(এখানে 'মধুহীন' বলতে মিষ্টিহীন ও মধুসূদনহীন-এ দুই অর্থ প্রকাশিত)

শ্লেষ দুই প্রকার। যথা :
৩.ক) অভঙ্গ শ্লেষ
৩.খ) সভঙ্গ শ্লেষ।

৩. ক) অভঙ্গ শ্লেষ : শব্দকে যখন না ভেঙ্গে কাঙ্ক্ষিত অর্থ বের করা যায় তখন তাকে অভঙ্গ শ্লেষ বলে। যথা:
'কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর।'
–ঈশ্বর গুপ্ত

(এখানে ঈশ্বর গুপ্ত দুই অর্থে। ভগবান দেখা দেন না এবং কবি ঈশ্বর গুপ্ত। প্রভাকরও দুই অর্থে। সূর্য এবং 'সম্বাদ প্রভাকর' পত্রিকা।)

৩. খ) সভঙ্গ শ্লেষ : শব্দকে যখন ভেঙ্গে কাঙ্ক্ষিত অর্থ পাওয়া যায় তখন তাকে সভঙ্গ শ্লেষ বলে। যথা:
'জগৎ টা কার বশ?' – প্রচলিত

(এখানে পৃথিবী 'কার' অথবা 'টাকার' উভয় অর্থে ব্যবহার হচ্ছে)।

প্র : ৪. বক্রোক্তি কাকে বলে? বক্রোক্তির পরিচয় দাও।

উ : কবিতায় এক অর্থে ব্যবহার করা কোনো শব্দকে যদি প্রশ্ন বা স্বর বিকৃতির দ্বারা অন্য অর্থে সংযোজন করে ব্যাখ্যা করা যায়, তবে বক্রোক্তি অলঙ্কার হয়। বক্তা এখানে বলতে চান এক, শ্রোতা তাকে বেঁকিয়ে অর্থ করেন অন্য। যেমন :
'দেয়ালে প্রশ্রাব করবেন না করলে দিতে হবে টাকা।' –প্রচলিত

(এখানে প্রশ্রাব করলে নাকি না-করলে জরিমানার টাকা দিতে হবে তা বোঝা যাচ্ছে না। সে অর্থ নির্ভর করে বাকাটি পাঠকের পড়ার কৌশলের উপর।)

প্র : ৫. পুনরুক্তবদাভাসের পরিচয় দাও।

উ : একই চরণে একার্থক একাধিক শব্দ যদি বিভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয় কিন্তু বিশ্লেষণে যদি সেই পুনরাবৃত্তির বিভিন্ন অর্থ প্রতীয়মান হয় তাহলে তাকে পুনরুক্তবদাভাস বলা হয়। বাংলা সাহিত্যে এর দৃষ্টান্ত অল্প।
'নিশীথ রাতে একা বসে গান গাই।'
–রবীন্দ্রনাথ

(এখানে নিশীথ ও রাত একার্থ হলেও নিশীথ 'গভীর' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।)
'তনু দেহটি সাজাব তব আমার আভরণে।' –রবীন্দ্রনাথ

(এখানে তনু ও দেহ একার্থ হলেও তনু 'ছিপছিপে' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।)

প্র : ৬. ধ্বন্যুক্তি কাকে বলে?

উ : ধ্বনির উচ্চারণে যদি বিষয়বস্তুকে দৃশ্যমান করা যায়, এমন অলঙ্কার। অর্থাৎ কবিতার চরণে ধ্বনিসমূহ নিজস্ব গতি অর্থের অনুরূপতা করা যায় তবে তাকে ধ্বন্যুক্তি বলে। যেমন:
'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
নদীতে এসেছে পানুর-ঘনুর।
টাপুর-টুপুর পানুর-ঘনুর
পানুর-ঘনুর টাপুর-টুপুর।
ঝাপুর-ঝুপুর ঝাপুর-ঝুপুর
ঝাপুর-ঝুপুর ঝাপুর-ঝুপুর।'
–অমলীন্দ্রনাথ

(এখানে শব্দ দিয়ে এমন ধ্বনিসৃজন হয়েছে, যেন দেখা যাচ্ছে বৃষ্টি হচ্ছে।)

অর্থালঙ্কার

প্র : অর্থালঙ্কার কাকে বলে? অর্থালঙ্কার কত প্রকার ও কী কী?

উ : অর্থালঙ্কার : যে অলঙ্কার একান্তভাবে শব্দের অর্থের উপর নির্ভর করে; অর্থ-প্রকাশক শব্দ বা শব্দাবলিকে পরিবর্তিত করে সেখানে সমার্থক অন্য শব্দ বসিয়ে দিলেও যে অলঙ্কার অক্ষুণ্ন থাকে তাকে অর্থালঙ্কার বলে। অর্থাৎ অর্থালঙ্কার শব্দের অর্থের উপর নির্ভরশীল। যথা :
'পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।' –জীবনানন্দ

এতে একটি উপমা প্রকাশ পেয়েছে। এখানে যদি শব্দ পরিবর্তন করে 'পাখির বাসার মতো আঁখি তুলে নাটোরের বনলতা সেন' লেখা হয় তাহলেও অলঙ্কার ম্লান হয় না, অটুটই থাকে। অর্থালঙ্কারকে প্রধানত পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা :
১. সাদৃশ্য মূল
২. বিরোধ মূল
৩. শৃঙ্খলা মূল
৪. ন্যায় মূল
৫. গূঢ়ার্থ মূল।

প্র : ১. সাদৃশ্য মূল অর্থালঙ্কারের পরিচয় দাও।

উ : সাদৃশ্য মূল অলঙ্কার : দুটো বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে কোনোরকম ঐক্য, সঙ্গতি

Scanned with CamScanner

কিংবা সাদৃশ্য নির্দেশে যেসব অলঙ্কার প্রয়োগ করা হয়, তাকে সাদৃশ্য মূল অলঙ্কার বলে। সাদৃশ্য মূল অলঙ্কারের মধ্যে

১.ক) উপমা
১.খ) রূপক
১.গ) উৎপ্রেক্ষা
১.ঘ) ভ্রান্তিমান
১.ঙ) অতিশয়োক্তি

ইত্যাদি প্রধান।

১.চ) সমাসোক্তি ইত্যাদি প্রধান।

প্র : ১.ক) উপমা অলঙ্কারের পরিচয় দাও।

উ : Anistolle-এর মতানুসারে, উপমা হলো 'বৈসাদৃশ্যের মধ্যে সাদৃশ্য কল্পনা।' স্বভাবধর্মে বিজাতীয় দুটি পদার্থের বিসদৃশ কোনো ধর্মের উল্লেখ না করে যদি বস্তুদুটোর মধ্যে শুধু সাদৃশ্য বা সামান্যাপক গুণগুলো উল্লেখ করা হয়, তবে তাকে উপমা অলঙ্কার বলে।

উপমা অলঙ্কারে সাধারণত ৪টি অঙ্গ থাকে। যথা :

* উপমান
* উপমেয়
* সাধারণ ধর্ম
* সাদৃশ্যবাচক শব্দ।

যে বস্তু বা যার তুলনা করা হয় তাকে উপমেয়, যার সঙ্গে তুলনা করা হয় তাকে উপমান, যে গুণ বা ধর্ম দিয়ে তুলনা করা হয় তাকে সাধারণ ধর্ম, যে ধরনের শব্দ দিয়ে (যেমন : মতো, সম, যেন, ন্যায়) তুলনা সংঘটিত হয় তাকে সাদৃশ্যবাচক শব্দ বলে। যথা :

'বেতের ফলের মত তার ম্লান চোখ মনে আসে।'

–জীবনানন্দ

এখানে উপমান = বেতের ফল
উপমেয় = চোখ
সাধারণ ধর্ম = ম্লান
সাদৃশ্যবাচক শব্দ = মত

উপমা প্রধানত পাঁচ প্রকার :

পূর্ণোপমা, লুপ্তোপমা, বস্তুপ্রতিবস্তুভাবের উপমা, বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের উপমা, মালোপমা।

প্র : ১.খ) রূপক অলঙ্কারের পরিচয় দাও।

উ : উপমান ও উপমেয়ের তুলনা করতে যখন তাদের অভেদ কল্পনা করা হয়, তাকে রূপক বলে। যথা :

'জীবন-সিন্ধু মথিয়া যে কেহ অমৃত বাহির।'

এখানে 'জীবন' উপমেয়, 'সিন্ধু' উপমান। রূপক অলঙ্কারে উপমেয় ও উপমানের অপেক্ষাকৃত বিমূর্ত এবং অপেক্ষাকৃত মূর্ত থাকে। যেমন : জীবন, সিন্ধু, মনমাঝি, যৌবনধন, ইত্যাদি। রূপক অনেক রকম। এর মধ্যে প্রধান তিনটি হলো : নিরঙ্গ, সাঙ্গ, পরম্পরিত।

প্র : ১.গ) উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের পরিচয় দাও।

উ : প্রবল সাদৃশ্যের জন্য উপমেয়কে যখন উপমান বলে ভুল বা সংশয় হয় তখন তাকে উৎপ্রেক্ষা বলে। এ অলঙ্কারে যেন, বুঝি, মনে হয়, প্রায় ইত্যাদি সম্ভাবনাবাচক শব্দের উল্লেখ থাকে। উৎপ্রেক্ষা দুপ্রকার, যথা :

বাচ্যোৎপ্রেক্ষা
প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

বাচ্যোৎপ্রেক্ষা : যে উৎপ্রেক্ষায় সম্ভাবনাবাচক শব্দে উল্লেখ থাকে তাকে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা বলে। যথা :

'হাড়-বেরানো খেজুরগুলো
ডাইনী যেন ঝামর-চুলো।'

–সত্যেন্দ্রনাথ

প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা : যে উৎপ্রেক্ষায় সম্ভাবনাবাচক শব্দ অনুপস্থিত অথচ অর্থ থেকে সম্ভাবনার ভাবটি স্পষ্টতর হয়ে ওঠে তাকে প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা বলে। যথা :

'আগে পিছে পাঁচটি মেয়ে, পাঁচটি রঙের ফুল।' –জসীমউদ্‌দীন

(পাঁচটি মেয়েতো আর প্রকৃত ফুল নয়, যেন পাঁচটি রঙের ফুল। এখানে 'যেন' অনুক্ত কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হয় না।)

প্র : ১.ঘ) ভ্রান্তিমান অলঙ্কারের পরিচয় দাও।

উ : প্রবল সাদৃশ্যবশত এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলে ভুল হলে এবং সে ভুল যদি সাধারণ না হয়ে কবি-কল্পনায় চমৎকারিত্ব লাভ

করে, তবে তাকে ভ্রান্তিমান অলঙ্কার বলে। যথা :

'নিদ্রাঘ আকুল রাধা হল অচেতন।
চরণ-পঙ্কজ ভ্রমে ধায় অলিগণ।'

–মুক্তেশ্বর

(রাধা গভীর নিদ্রায়। রাধার পা পদ্মফুল বলে ভুল করে মৌমাছি সেখানে বসছে।)

প্র : ১.ঙ) অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের পরিচয় দাও।

উ : উপমার চরম পরিণতি অতিশয়োক্তি। উপমেয়কে উল্লেখ না করে উপমানকে উপমেয় রূপে উল্লেখ করলে তাকে অতিশয়োক্তি বলে। যথা :

'মাঘের সকালে সূর্য ছড়ায়
মুঠ হাতে সোনা মুঠি মুঠি।' –বিষ্ণু দে

(সোনার মতো রোদ। রোদ এখানে খুব।)

বিশ্বনাথ কবিরাজ পাঁচ ভাগে অতিশয়োক্তি বিভক্ত করেছেন। যথা :

ভেদে অভেদে, অভেদে ভেদে, সম্বন্ধে অসম্বন্ধে, অসম্বন্ধে সম্বন্ধে, কার্যকারণে পৌর্বাপর্যনাশ।

প্র : ১.চ) সমাসোক্তি অলঙ্কারের পরিচয় দাও।

উ : উপমেয়র উপর উপমানের ব্যবহার সমারোপিত হলে তাকে সমাসোক্তি অলঙ্কার বলা হয়। অর্থাৎ বর্ণনীয় নির্জীব পদার্থে যখন সজীব পদার্থের সমান কাজ, সমান বিশেষণের দ্বারা আরোপ করা হয়, তখন সমাসোক্তি অলঙ্কার হয়। যথা :

'পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ।' –রবীন্দ্রনাথ

(এখানে নিশ্চল পর্বতে চলিষ্ণু মেঘের গতিময়তা আরোপিত।)

প্র : ২. বিরোধমূল অলঙ্কার কাকে বলে? প্রধান প্রধান বিরোধমূল অলঙ্কারের পরিচয় দাও।

উ : বক্তব্যকে সুন্দর করে প্রকাশ করার জন্য কবি তাঁর উক্তিতে আপাত বিরোধের সৃষ্টি করতে পারেন। যদি এই কল্পিত বিরোধকে কেন্দ্র করে কোনো অলঙ্কার গড়ে ওঠে– তখন তাকে বিরোধমূল অলঙ্কার বলে। বিরোধমূল অলঙ্কার কয়েক প্রকার রয়েছে। তবে এ শ্রেণির অলঙ্কারের মধ্যে প্রধান হচ্ছে :

২.ক) বিরোধাভাস
২.খ) বিষম
২.গ) বিভাবনা
২.ঘ) বিশেষোক্তি
২.ঙ) অসঙ্গতি।

প্র : ২.ক) বিরোধাভাস অলঙ্কারের পরিচয় দাও।

উ : যদি দুটি বস্তুর মধ্যে আপাত বিরোধ দেখা যায়, এই বিরোধে যদি শেষ পর্যন্ত চমৎকারিত্ব বা উৎকর্ষের সৃষ্টি হয়– তবে তাকে বিরোধাভাস অলঙ্কার বলে। যেমন :

'পীযূষ মাঝে অমিয় তুমি ঢালায়ে অমর সুর।'

–কবিশেখর

(পীযূষ মানে অমৃত। সুতরাং বিরোধের চিন্তা। কিন্তু অমৃত ও পীযূষ বিশেষণ বিরাজমান। সুতরাং বিরোধ এখানে যথার্থ নয়, কারো মাঝে অমর করার জন্য।)

প্র : ২.খ) বিষম অলঙ্কারের পরিচয় দাও।

উ : কার্য ও কারণের মধ্যে যদি কোনো সম্বন্ধ দেখা যায়, কিংবা কারণ থেকে যে ফল পাবার কথা, তার বদলে অনিচ্ছিত ফল দেখা দেয় কিংবা একই ক্ষণে দুটি অসমান ঘটনার মিলন ঘটে তখন তাকে বিষম অলঙ্কার বলা হয়। যেমন :

'যমুনার জলে যদি নিই গিয়া ঝাঁপ
পরাণ জুড়াবে কি, অধিক উঠে তাপ।'

–প্রসঙ্গিত

(এখানে যমুনার জলে স্নান শীতল হবার কথা। কিন্তু এর উল্টো ঘটছে।)

প্র : ২.গ) বিভাবনা অলঙ্কারের পরিচয় দাও।

উ : সাধারণত কারণ ছাড়া কোনো কার্য হয় না। একে কার্যকারণ বলে। কিন্তু কারো কারণ ছাড়াও কার্য হতে পারে। আর এমন হলে তাকে বিভাবনা বলে। তবে প্রচলিত কারণের বাইরে এখানে কোনো গূঢ় কারণ অবশ্যই থাকবে। যেমন :

'মদ না খেয়েও মাতাল তুমি তাহার গরমে।'

–শুভসত্ত্ব বসু

(এখানে মাতাল হবার গূঢ় কারণ অর্থের গর্ব।)

Scanned with CamScanner

প্র : ২.খ) বিশেষোক্তি অলঙ্কারের পরিচয় দাও।

উ : বিরোধমূলক ঠিক বিপরীত অলঙ্কার হলো বিশেষোক্তি। অর্থাৎ কারণ থাকা সত্ত্বেও যেখানে কাজ বা ফল কিছু ঘটে না তাকে বিশেষোক্তি অলঙ্কার বলা হয়। যেমন :

'আছে চক্ষু, কিন্তু তার দেখা নাহি যায়।
আছে কর্ণ, কিন্তু তা শব্দ নাহি ধায়।'

–ঈশ্বর গুপ্ত

(এখানে বাক্যটা বোঝাতে বলা হয়েছে।)

প্র : ২.ঙ) অসঙ্গতি অলঙ্কারের পরিচয় দাও।

উ : কার্য এবং কারণের ঘটমানস্থান যদি ভিন্ন হয় অর্থাৎ এক জায়গায় কারণ ঘটছে আর অন্যত্র তার ফল দেখা যাচ্ছে, তখন তাকে অসঙ্গতি অলঙ্কার বলে। যেমন :

'দূরবর্তী কালো মেঘ ছাইল গগনে
আঁখি জল বরষিল রাধিকা নয়নে।'

–ব্রজগীত

(আকাশ মেঘে কালো হয়েছে কিন্তু জল ঝরছে রাধার নয়ন হতে।)

প্র : ৩. শৃঙ্খলামূল অলঙ্কার কাকে বলে? শৃঙ্খলামূল অলঙ্কারের পরিচয় দাও।

উ : কবি তাঁর কবিতা রচনা করার ক্ষেত্রে অনেক সময় বাক্য এমনভাবে সংযোজন করেন, যাতে এক বাক্যের একটি কাজ অন্য বাক্যের কারণ হয়, এবং সেই কারণের কাজ আবার অন্য কারণের কারণ হয়। এভাবে উৎকর্ষবাচক শব্দ সবার শেষে বসে এবং কবিতাটি একটি পারম্পর্যের অংশ হয়। এরূপ অলঙ্কারকে শৃঙ্খলামূল অলঙ্কার বলে। শৃঙ্খলামূল অলঙ্কারের মধ্যে তিনটি প্রধান :

৩.ক) কারণমালা
৩.খ) একাবলি
৩.গ) সার।

প্র : ৩.ক) কারণমালা অলঙ্কারের পরিচয় দাও।

উ : কোনো কাব্যের বাক্যে কারণের কাজ যদি পরের বাক্যে কারণরূপে মনে হয় এবং ওই কারণের কাজ যদি তার পরের বাক্যের কারণ হয়ে ওঠে, তখন তাকে কারণমালা অলঙ্কার বলে। যেমন :

'বিদ্যা হতে জ্ঞান হয়, জ্ঞানে হয় ভক্তি,
ভক্তি হতে মুক্তি হয়, এই সার যুক্তি।'

–অজ্ঞাতনামা

প্র : ৩.খ) একাবলি অলঙ্কারের পরিচয় দাও।

উ : একই শৃঙ্খলাক্রমে যখন একটি বিশেষ্যপদ তার আগের বাক্যে বিশেষণ রূপে বসে তখন তাকে একাবলি অলঙ্কার বলে। যেমন :

'সুনীল আকাশ, স্নিগ্ধ বাতাস, বিমল সলিল জল
গাছে গাছে ফুল, ফুলে ফুলে অলি গুঞ্জন ধরাতল।'

–যতীন্দ্রনাথ

('গাছে গাছে ফুল' বিশেষণের ভাব নিয়ে বসেছে, পরে ফুল বিশেষ্যপদ হিসেবে বসেছে।)

প্র : ৩.গ) সার অলঙ্কারের পরিচয় দাও।

উ : আগে বর্ণিত পদার্থগুলোর চেয়ে পরে বর্ণিত পদার্থগুলোতে যখন উৎকর্ষ বোঝানো হয়, তখন তাকে সার অলঙ্কার বলে। এ অলঙ্কারকে কোনো কোনো অলঙ্কারিক 'উদার' নামেও অভিহিত করেছেন। যেমন :

'আমাদের দেশের অধিকাংশ পুরুষ
গৃহপালিত, পত্নী চালিত, মাতৃলালিত।'

–প্রচলিত

(এখানে স্ত্রীর চালনা ও মাতার লালনই মূল।)

প্র : ৪. ন্যায়মূল অলঙ্কার কাকে বলে? ন্যায়মূল অলঙ্কারের পরিচয় দাও।

উ : কবি যখন কোনো বক্তব্যের মধ্যে ন্যায়বাচক উক্তি করেন এবং ওই উক্তি দিয়ে বক্তব্যকে জোরালো করার চেষ্টা করেন তখন তাকে ন্যায়মূল অলঙ্কার বলে। ন্যায়মূল অলঙ্কারের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দুটি :

৪.ক) অর্থান্তরন্যাস
৪.খ) কাব্যলিঙ্গ।

প্র : ৪.ক) অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কারের পরিচয় দাও।

উ : সামান্যের দ্বারা বিশেষ অথবা বিশেষের দ্বারা সামান্য যখন সমর্থিত হয় এবং কার্যের দ্বারা কারণ অথবা কারণের দ্বারা

কার্য যখন সমর্থিত হয় তখন তাকে অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার বলে। যেমন :

'চির সুখীজন, ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।'

–কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

(সুখী ব্যক্তি ব্যথিতের বেদনা বোঝে না, এটা সাধারণত দেখা যায়। কিন্তু সাপের বিষের জ্বালা কিভাবে মানুষ বুঝবে? এখানে একটির অর্থ অন্যটিতে প্রয়োগ করা হয়েছে।)

প্র : ৪.খ) কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার কাকে বলে?

উ : যখন কোনো পদ বা বাক্যের অর্থ বাস্তবের দ্বারা বর্ণনীয় বিষয়ের কারণ বলে মনে হয় তখন তাকে কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার বলে। যেমন :

'তুমি আমায় ভালোবাসো তাই ত আমি কবি।'

–নজরুল

(প্রেমিকা ভালোবাসে বলেই কি নজরুল কবি হয়েছেন? কবি বলেছেন, বিশ্বাসও হচ্ছে পাঠকের। আসলে সে কারণে তিনি কবি হন নি।)

প্র : ৫. গূঢ়ার্থমূল অলঙ্কার কাকে বলে? প্রধান প্রধান গূঢ়ার্থমূল অলঙ্কারের পরিচয় দাও।

উ : কবি তাঁর কাব্যে যখন কোনো বাক্যের আসল বক্তব্য বা গূঢ়ার্থ লুকিয়ে রাখেন অন্য বাচ্যার্থের আড়ালে, তখন তাকে গূঢ়ার্থমূল অলঙ্কার বলে। গূঢ়ার্থমূল অলঙ্কার অনেক প্রকার। তবে–

৫.ক) ব্যাজস্তুতি
৫.খ) অপ্রস্তুত
৫.গ) প্রশংসা
৫.ঘ) সূক্ষ্ম
৫.ঙ) অর্থাপত্তি
৫.চ) স্বভাবোক্তি
৫.ছ) আক্ষেপ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্র : ৫.ক) ব্যাজস্তুতি অলঙ্কারের পরিচয় দাও।

উ : যে অলঙ্কারে নিন্দার স্থলে স্তুতি বা স্তুতির ছলে নিন্দা বোঝানো হয় তাকে ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার বলা হয়। যেমন :

'অতি বড় বৃদ্ধ তুমি হিতীয় বিধুর,
কোন গুণ নাই তব প্রশংসা কেবল।'

–ভারতচন্দ্র

(একথায় আসলে নিন্দা আছে। অতি বুদ্ধ বড় চলৎশক্তিহীন, কথা বলতে পারে না, অতি জরাগ্রস্ত অর্থাৎ অকর্মণ্য তুমি। অতি উচ্চ, হিমাংশু বিধুর।)

প্র : ৫.খ) স্বভাবোক্তি অলঙ্কারের পরিচয় দাও।

উ : বস্তু-স্বভাবের সমস্ত খুঁটি ও বর্ণ সকল সাধারণ মানুষের চোখে পড়ে না, অথচ গূঢ়ভাবে কবির সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তা ধরা পড়ে, এমন কবি তাঁর কবিতায় ফুটিয়ে তুলতে পারেন। কোনো পদার্থের স্বরূপের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যথাযথ অথবা চমৎকার বর্ণনাকে স্বভাবোক্তি অলঙ্কার বলা হয়। যেমন:

'একখানি ছোট ক্ষেত আমি একেলা
চারিদিকে বাঁকা জল কবিতে খেলা
পরপারে দেখি আঁকা তরুছায়া মসী মাখা,
এপারেতে ছোট ক্ষেত আমি একেলা।'

–রবীন্দ্রনাথ

(গ্রামবাংলার একটা সূক্ষ্ম বর্ণনা তাঁর গভীর দৃষ্টির প্রকাশ।)

প্র : ৫.গ) অপ্রস্তুত প্রশংসা অলঙ্কার কাকে বলে?

উ : অপ্রস্তুত (অবর্ণনীয়) বিষয়ের উল্লেখ করে যখন প্রস্তুত (আসল বক্তব্য) বিষয়কে বোঝানো হয় তখন তাকে অপ্রস্তুত প্রশংসা অলঙ্কার বলে। যেমন :

'কুকুরের কাজ কুকুর করেছে
কামড় দিয়েছে পায়,
তাই বলে কুকুরে কামড়ালে ফিরে
মানুষের তোজা খায়?'

–সত্যেন্দ্রনাথ

(কুকুর মানুষকে কামড়ালেও মানুষের কুকুরকে ফিরে কামড়ানো সম্ভব নয়। এ বিশেষ অপ্রস্তুতের দ্বারা বোঝানো হচ্ছে উত্তম ব্যক্তি অধম ব্যক্তির আচরণকে অনুরূপভাবে ফিরিয়ে দিতে পারে না।)

প্র : ৫.ঘ) সূক্ষ্ম অলঙ্কার কাকে বলে?

উ : কোনো সূক্ষ্ম অথবা অপরিস্ফুট অর্থ ভাবভঙ্গি দিয়ে বা আকারে ইঙ্গিতে কিংবা

Scanned with CamScanner

কোনো সংকেত দিয়ে প্রকাশ করা হলে তাকে সূক্ষ্ম অলঙ্কার বলা হয়। যেমন :

'কখন মিলন হবে তাহা যখন,
হাসি দিয়া বীণাপদ্ম কৈল নিমীলন।'

—শ্যামাপদ চক্রবর্তী

(রাতে পদ্ম নিমীলিত হয়, মিলনের সময়টিকে পদ্ম নিমীলনের সংকেতের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হলো।)

প্র : ৫.৪) অর্থাপত্তি অলঙ্কার কাকে বলে?

উ : একটি বিষয়ের উল্লেখে সেই বিষয়টি এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই বিষয়ের জোরে তার সংশ্লিষ্ট অন্য বিষয়গুলোর যদি অর্থবোধ জন্মায়, তখন তাকে অর্থাপত্তি অলঙ্কার বলে। যেমন:

'হাতি ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল।'

—প্রচলিত

(যা শক্তিশালীরা করতে পারে না, দুর্বলের অহমিকা সেখানে তুচ্ছ।)

প্র : ৫.৫) আক্ষেপ অলঙ্কার কাকে বলে?

উ : বলতে ইচ্ছুক বিষয়ে সৌন্দর্যারোপ করার জন্য বক্তা যখন ঐ বিষয়ের উপর নিষেধাভাস আরোপ করে তখন তাকে আক্ষেপ অলঙ্কার বলে। যেমন :

কোনো সংসদসদস্য যদি স্পিকারের কাছে প্রশ্ন করে জানতে চান 'মাননীয় স্পিকার, আমি কি মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীকে চিনি চোর বলতে পারি?' এর উত্তরে স্পিকার হয়তো বলবেন, 'না, পারেন না। কারণ তিনি দেশের সম্মানিত মন্ত্রী।' তাহলেও কিন্তু মন্ত্রীকে অকপটে 'চিনি চোর' বলাই হলো। উল্লেখ্য এই ধরনের শাসনামলে জাতীয় সংসদে এমনটি ঘটেছিল। 'মেঘনাদবধ কাব্যে' আছে :

'নিজগৃহ পথ, তাত, দেখাও তস্করে?
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরুজন তুমি
পিতৃ-তুল্য।'

—মধুসূদন

(মেঘনাদ তার পিতৃব্য বিভীষণকে তিরস্কার করেছে এভাবে যে, বিভীষণ চোর ও চণ্ডালকে লঙ্কার সিংহাসন দেখিয়ে দিয়েছেন। একথা বলার পর পরই মেঘনাদ আবার বলছে যে, তুমি আমার পিতৃব্য, পিতার তুল্য তোমাকে গঞ্জনা করব না। আসলে তিরস্কার বা গঞ্জনা যতটুকু করার তা করা হয়ে গেছে।)

সাহিত্যের তত্ত্ব এবং রূপ-রীতি

প্র : তত্ত্বচিন্তার বিশ্বপরিধি সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

উ : যারা সাহিত্যচর্চা করেন তাদের সারস্বত সৃষ্টি প্রথম দিকে আনন্দজাত ছিল শুধু, কোনো তাত্ত্বিকতার ধার ধারেন নি তারা। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সারা পৃথিবীতে মানুষকে নতুন করে ভাবালো। সাহিত্য ও শিল্পস্রষ্টারা যেহেতু প্রাগ্রসর মানুষ, সেহেতু তাদের চিন্তা হলো, যদি এরপরও মহাযুদ্ধ বেঁধে যায় তাহলে কী হবে? এই চিন্তা থেকে কেউ আশার আলো দেখলেন, অন্যকে দেখাতে চাইলেন; কেউ কেউ নিরাশ হলেন, অন্যের মধ্যে সে নৈরাশ্য ছড়িয়ে দিলেন; কেউ কেউ সংশয়বাদে আস্থা রাখলেন, অন্যকেও সংশয়িত করে তুললেন। এগুলো এলো তাদের সৃষ্টির মধ্যে আর জন্ম নিল নানা তত্ত্ব। পাশ্চাত্যে এই তত্ত্বের আধার বেশি পাওয়া গেল। মূলত নানামুখী চিন্তা ও এর প্রকাশ থেকেই এসব তত্ত্বের জন্ম। সমালোচনা বা তত্ত্বভিত্তিক সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার ইতিহাসে প্রথমেই গ্রিক পণ্ডিত প্লেটো আর এরিস্টটলের নাম করতে হয়। প্লেটো তাঁর 'দা রিপাবলিক' গ্রন্থে কাব্যকলার প্রতি বিরূপতা প্রকাশ করেছেন নিজের মতো করে এবং বলেছেন, কাব্যসৃষ্টি পাগলের কাজ। এই মতের বিরোধিতা করেন তাঁরই শিষ্য এরিস্টটল। রোমান তাত্ত্বিক হোরেস ও লংগিনাসও তত্ত্বের জগতে প্রাতঃস্মরণীয়। তাঁরা প্লেটো ও এরিস্টটলেরও আগে। এরপর জন ড্রাইডেন, এডমন্ড বার্ক, স্তেফান মালার্মে, এমিল জোলা, বেনেদেত্তো ক্রোচের হাত ধরে শিল্পসাহিত্যের তাত্ত্বিক বিশ্ব প্রসারিত হয়েছে। বাংলায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, কাজী নজরুল ইসলাম, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ তত্ত্ব নির্ভর সাহিত্যচর্চা করেছেন। তবে অধিকাংশের বক্তব্যই সাধারণভাবে বিশ্লেষণ অনুসরণ। তাঁদের অধিকাংশ বক্তব্য কারও কাছে স্পষ্ট নয়। সেজন্য থেকে বড় লোকবিশ্লেষণ বা লাভের জন্যই অনুসারীরা অনেকে নিজস্বতত্ত্বের ভিত্তি তৈরি করেছেন।

আধুনিককালে, বিশেষ করে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বিশ্বের দুকান, জাক দেরিদা, জাক লাকা, জোনাথন কুলার, গোরাম চর্সস্কি, মিশেল ফুঁকো, এডওয়ার্ড সাইদ বিশ্বতাত্ত্বিকের মর্যাদা পেয়েছেন। গৌতম ভদ্র, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, তপোধীর ভট্টাচার্য প্রমুখ বাঙালিও এ সাহিত্যে নিজের নাম লিখিয়েছেন।

প্র : ক্লাসিসিজম (Classicism) কী?

উ : ইংরেজি Classic শব্দের অর্থ দ্রুপদ। এই পরিভাষাটি বাংলায় প্রথম ব্যবহার করেন কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। সে সূত্রেই Classical অর্থ দ্রুপদী আর Classicism দ্রুপদবাদ। সাধারণভাবে শব্দটি দ্বারা প্রাচীনকালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের গুরুত্বপূর্ণ রচনার প্রধানসমূহ ও বিষয়বস্তু প্রভৃতির কথা বোঝানো হয়, যার আবেদন রয়েছে সমপ্রতিকালেও। তবে এই অবিধা ভিন্ন ভিন্ন অর্থও ধারণ করে। টি.এস এলিয়টের মতে, 'ক্লাসিক হলো সাহিত্যের সু-পরিণতি ও পরিপক্কতা, যা সভ্যতার সুপরিণত পর্যায়ের মননশীল ধারণা থেকে উদ্ভূত।' সে সাহিত্য কালজয়ী, যে সাহিত্য সংযত ভাষায় ও সুসংহত চিন্তার সম্ভ্রম ও ঔজ্জ্বল্যে রচিত, তার রীতি ও আদর্শকে অনুসরণ করার প্রবণতাই ক্ল্যাসিসিজম। ক্ল্যাসিসিজম তকমা কোনো বিশেষ যুগ বা সময়পর্বের গায়ে এঁটে দেয়া বোধ হয় সঙ্গত নয়। সুচারু নির্মিতি, সুসংগতি, সুদৃঢ় সংহতি এবং খণ্ড ও সমগ্রের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ক্লাসিক বা দ্রুপদ সাহিত্যের নীল

Scanned with CamScanner

বৈশিষ্ট্য। বাল্মীকি রচিত সংস্কৃত মহাকাব্য 'রামায়ণ', বেদব্যাস রচিত 'মহাভারত', হোমর রচিত 'ইলিয়াড' ও 'অডেসি', সোফোক্লিস রচিত 'ইডিপাস' ধ্রুপদ সাহিত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। আবার সঙ্গীত, স্থাপত্যকলা, ভাস্কর্যশিল্পেও ধ্রুপদীয় ধারণা রয়েছে। মোটকথা, ধ্রুপদ একটি ধারণামাত্র, যে ধারণার ফলে বিগত সময়ের কালোত্তীর্ণ সৃষ্টিগুলোকে সম্মান জানিয়ে গ্রহণ করা হয়। ইউরোপের গ্রিক ও রোমান শিল্প-সাহিত্যে ও ধ্রুপদ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। এবারক্রম্বি জানায়, 'There are elements which can together in a concord of equilibrium and such concord such a health is classicism.' মোট কথা, শিল্প, সাহিত্য, চিত্রকলা প্রভৃতিতে ব্যবহৃত উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যকে ধ্রুপদ বৈশিষ্ট্য বলে। যে তাত্ত্বিক প্রণোদনায় এই বৈশিষ্ট্যসকল আলোচনা, পর্যালোচনা বা সমালোচনা করা হয় তাকেই বলে Classicism বা ধ্রুপদবাদ।

প্র : নব্য-ধ্রুপদবাদ (Neo-classism) কী?

উ : নিওক্লাসিক যুগ হচ্ছে ১৬৬০ সালের রেস্টোরেশনের সময় থেকে প্রায় একশ চল্লিশ বছর। বিগত যুগের সাহিত্যরীতি বিশেষত ধ্রুপদী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সমূহের পুনরুজ্জীবন ঘটানোই এই সাহিত্য আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল। নিওক্লাসিক লেখকরা তাঁদের কালের দার্শনিকদের মতোই মানুষকে দেখেছেন সীমিত সাধ্য ও সম্ভাবনার প্রাণীরূপে। এ যুগের অনেক রচনায়, ব্যাঙ্গাত্মক এবং উপদেশমূখী আক্রমণের বিষয় হচ্ছে মানুষের অহমিকা, মাত্রাতিরিক্ত মানুষকে তাই সীমারেখা মেনে চলতে হবে, যেমন জীবনে তেমনি সাহিত্যকর্মে। সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনেক নিয়ম তাঁরা সানন্দে মেনে নিয়েছিলেন। যেমন কবিতার ক্ষেত্রে Closed couplet. ইংরেজি সাহিত্যে ড্রাইডেন, আলেকজান্ডার পোপ, জনাথন সুইফট এবং ফরাসি সাহিত্যে নাট্যকার কর্নেই ও রাসিনের রচনাকে

নব্য ধ্রুপদবাদী আন্দোলনের স্বপ্ন [illegible] চলে। ইংরেজ কবি-সমালোচক ড্রাইডেন (Boeleau) ১৬৭৪ সালে ইঁর [illegible] পোয়েটিক' গ্রন্থে নব্য ধ্রুপদীবাদী [illegible] বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

প্র : রোমান্টিসিজম (Romanticism) কী?

উ : 'রোমান্টিক' শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে 'আত্মপন্থী' কথাটি অনেকে ব্যবহার করলেও আমাদের বিবেচনায় এ প্রতিশব্দ শব্দ মূল শব্দের ব্যঞ্জনাকে ধারণ করে না। 'রোমান্টিক' শব্দের যে প্রতিশব্দই ব্যবহার করা হোক না কেন তাতে মূলশব্দের 'রোমান্টিকতা' নষ্ট হয়। যুক্তিবাদী দর্শন, বস্তুতান্ত্রিক জীবনদৃষ্টি ও নব্য-ধ্রুপদ সাহিত্যাদর্শে ভাবরস ও আঙ্গিকের কঠোর নিয়মানুগত্যের বিরুদ্ধে একটি বিকল্প নন্দনভাবনাকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে সপ্তদশ শতকের শেষে এবং অষ্টাদশ শতকের শুরুতে ইংল্যান্ডে রোমান্টিক আন্দোলনের সূত্রপাত। রোমান্টিক কল্পনা মানব-চিত্তকে আন্দোলিত, উদ্বেলিত, উদ্বোধিত ও নাড়া করে তোলে। কেননা, রোমান্টিক সৃষ্টি অসীমের সন্ধানী, রহস্যের অনুসারী, অতীতের পূজারী, ভবিষ্যতের অভিযাত্রী, অঘটনঘটনপটীয়সী, অশান্ত, বিদ্রোহী, ভাবাবেগসমৃদ্ধ ও রক্তবিহ্বল। Herford-এর ভাষায়, 'An enteordinary development of imagination Sensibility.' রোমান্টিকতার স্বরূপ নির্ণয়ে এত বিচার-বিশ্লেষণ হয়েছে যে, জেরোম হ্যামিলটন বাকলের- 'The Victorin Temper' গ্রন্থের 'Romanticism has already passed into the realm of the unknowable' কথাটিই ঠিক। ওয়ালটার পেট বলেন, 'রোমান্টিকতা হলো সৌন্দর্যানুভূতির সঙ্গে তীব্র কৌতূহলবোধের সংযোগ।'– The addition of strangeness of beauty- কোলরিজের 'Kubla Khan' বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মানসী' কাব্যগ্রন্থে রোমান্টিসিজম মুখ্য।

প্র : পরাবাস্তববাদ (Surrealism) কী?

উ : সুররিয়ালিজম বা সার্রবিয়ালিজম শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ– পরাবাস্তববাদ। ফরাসি কবি গিয়োম আপোলিনেয়ার ১৯১৭ সালে প্রথম সুররিয়ালিজম শব্দটি ব্যবহার করেন। সার্থিতা ও শিল্পজগতে স্বপ্ন ও কার্ল মার্ক্সবাদের অনুসারী হলেন সুর-রিয়ালিস্ট শিল্পীগণ। ইরানীয় অদ্ভুত, অলৌকিক কাহিনিকার-ভাব ইত্যাদি রোমান্টিকতাও প্রযুক্ত হতে দেখা যায়। পরাবাস্তববাদী রচনায় প্রতীকী প্রয়োগ একটা সাধারণ ও জনপ্রিয় রীতি। স্বপ্নের মতোই প্রতীকের মাধ্যমে মনশ্চেতনাকে প্রতিফলিত করতে চাইলেন সুররিয়ালিস্ট কবি ও শিল্পীরা। স্বপ্নের মতোই একটি প্রতীক বা ছবি চকিতে সরিয়ে নিলো অন্য একটিকে, অনুষঙ্গ ও ইঙ্গিত তৈরি করলো অর্থনমতা। Replacement ও ambiguity হলো পরাবাস্তবতার কুললক্ষণ। সিগমন্ড ফ্রয়েডের স্বপ্ন-তত্ত্ব ছিল পরাবাস্তবতার মূলাধার। পরাবাস্তববাদীরা বললেন যে, জাগ্রত ও সচেতন চিন্তা যখন শিথিল হয়, তখনই মগ্ন চৈতন্য থেকে আমাদের অন্তরের শিশু ও পশুরা জেগে ওঠে মনের রাজ্যে আধিপত্য করে। স্বপ্ন, যৌন ইচ্ছা প্রভৃতির সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রে অনুধাবন করাও সুররিয়ালিস্ট শিল্পীদের বিশেষ প্রবণতা। জীবনানন্দ দাশের কবিতা থেকে পরাবাস্তবতার উদাহরণ নেয়া যেতে পারে :

"আমরা যাইনি মরে আজো– তবু কেবলি
দৃশ্যের জন্ম হয়
মহীনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায় কার্তিকের
জ্যোৎস্নার প্রান্তরে;
প্রস্তর যুগের সব ঘোড়া যেন– এখনও
ঘাসের লোভে চরে
পৃথিবীর কিমাকার ডাইনামোর পরে। –
'ঘোড়া'

প্র : মিস্টিসিজম (Mysticism) বা মরমিয়াবাদ কী?

উ : মিস্টিসিজম কোনো বিশেষ আন্দোলন নয়, এ এক দৃষ্টিভঙ্গি বা প্রবণতা যা [illegible] অনুভূতির বহুসম্ভাবিত [illegible] ভাষায় [illegible] জানতে চাইনে, তা উপলব্ধি করলেই [illegible] কোনো ভাষা খুঁজে পাওয়া যায় না, [illegible] করার চেষ্টা করা হলে, তাকেই বলা হয় মরমিয়াবাদ। অন্যভাবে বলা যায় : যে 'অপর সৃষ্টির আড়ালে কবি ভাষায় সত্য, তথা বিশ্বসৃষ্টির পরম সত্যকে উপলব্ধি করে– একমাত্রার পরম আনন্দ লাভ করতে পারেন, সাহিত্যে সেই বোধ-সৃষ্টি-সাধনাকে আমরা মিস্টিসিজম নামে অভিহিত করতে পারি। Oxford অভিধানে এই মিস্টিসিজম এর সংজ্ঞার্থ পাওয়া যায়, One who believes in spiritual apprehension of truths beyond understandige derstanding. রবীন্দ্রনাথের ভাষায়–

'হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি'

কিংবা,

'সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে,
বলিতে না পারে স্পষ্ট করি।'

বিহারীলাল চক্রবর্তীকে পরম মিস্টিক কবি বলা যেতে পারে। অক্সফোর্ডজজমন ইলিয়াসের 'থেয়ারি', 'জল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল' গল্পগ্রন্থের বেশ কিছু লেখাকে গল্প মরমিয়াবাদ লক্ষণীয়। উত্তর ভারতে রামানন্দ, তুলসীদাস, নানক, কবীর ও দাদু, পশ্চিমে তুকারাম ও মারাঠী ভক্ত সম্প্রদায়, দক্ষিণাঞ্চলে শৈবসন্তানেরা এবং বাংলায় মরমিয়া সাধক গোষ্ঠী মিস্টিসিজমের উপলব্ধি চিরস্থায়ী করে রেখে গেছেন।

প্র : দাদাবাদ বা দাদাইজম (Dadaism) কী?

উ : ডাডা ফরাসি শব্দ যার অর্থ কাঠের ঘোড়া। এই শব্দটিকে বেছে নিয়েছিলেন একদল কবি ও শিল্পী যাঁরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা ও বিনাশের মধ্যে দাঁড়িয়ে শিল্প-সাহিত্যের প্রচলিত, প্রথা, রীতি, বক্তব্য-সব কিছুকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আক্রমণে ছিন্নভিন্ন করতে এগিয়ে এলেন

Scanned with CamScanner

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বাস্তবরূপবাদ, যার লক্ষ্য ছিল মানুষ প্রত্যক্ষভিজ্ঞা ব্যতিরেকে প্রথম দৃষ্টিপাতে প্রকৃতি ও জগৎকে যেভাবে দেখবে ঠিক সেইভাবে চিত্রিত করা। চিত্রাঙ্কনের গতানুগতিকতা উপেক্ষা করা, রোমান্টিকতার মূল স্বীকার্য যে শিল্প ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ তাকে নাকচ করে, প্রাকৃতিক দৃশ্যপট ও বর্ণিতব্যের পারিপার্শ্বিকতা এবং বিশেষ করে রং ও আলোর যথার্থ বজায় রাখাই ছিল ভাবপ্রেক্ষণবাদের উদ্দেশ্য। ১৮৭৪ সালে ফরাসি চিত্রশিল্পী কে. মোনের ছবি 'ইম্প্রেসি ওঁসলেইল লর্জো'র আলোচনায় সম্ভবত ইম্প্রেশন শব্দটা সর্বপ্রথম উদ্ভূত হয়। আধুনিক উপন্যাস ও নাটকের ক্ষেত্রে কোনো চরিত্রের অন্তর্জীবনকে চিত্রায়নকেই ইম্প্রেশনিজম-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বাংলা সাহিত্যে জীবনানন্দ দাশসহ ত্রিশোত্তর ও তৎপরবর্তী যুগের কবিদের অনেকের রচনায় ভাবপ্রেক্ষণরীতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। নমুনা থেকে বিষয়টি বুঝে নেয়া যাক :

'তখন হলুদ নদী
নরম নরম হয় শর কাশ হোগলায়-
মাঠের ভিতরে।'

– 'কুড়ি বছর পরে', জীবনানন্দ দাশ

এই 'হলুদ' বর্ণটি ইম্প্রেশনিস্ট। অপরাহ্নের আলোয় নদীর রং এখন নরম ও হলুদ দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু পরে তার রূপ বদলে যাবে।

প্র : জাদু বাস্তববাদ (Magic Realism) কী?

উ : বাস্তব ঘটনা নয় কিংবা বাস্তবে আদৌ সম্ভব নয়, বরং অভিনব বর্ণনা, উপস্থাপনা, চরিত্র সৃজন ও রসপরিণতি সম্বলিত উপন্যাসে কোনো অবিশ্বাস্য বা অলৌকিক ঘটনা বিশ্বাসের মতো করে প্রকাশ করাকে জাদু বাস্তববাদ বা Magic Realism বলে। এ জাতীয় রচনা অর্বাচীনকালের সৃষ্টি। উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে জার্মান ঔপন্যাসিকদের হাতে এই ধারার প্রবর্তন ঘটে। সাম্প্রতিককালে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মারকেস এবং কারপেনতিয়ের প্রমুখ তাঁদের উপন্যাসে জাদু বাস্তববাদ প্রয়োগ করেছেন। সাহিত্যে জাদু বাস্তববাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় : ১. কাহিনি পরিকল্পনায় জটিলতা সৃষ্টি;
২. বাস্তববাদ ও অলৌকিকের সহাবস্থান ঘটানো;
৩. সময়ের অদ্ভুত বিন্যাস ও সঙ্গতি রক্ষা;
৪. স্বপ্ন ও মিথ-এর ব্যবহার;
৫. পরাবাস্তববাদী বর্ণনা;
৬. ব্যাখ্যাতীত বিষয়ের অবতারণা।

প্রকৃতপক্ষে, প্রচলিত বাস্তববাদের গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার প্রবণতাই জাদু বাস্তববাদের মূল উপজীব্য। জাদু বাস্তববাদ বা Magic Realism শব্দটা জার্মান ঔপন্যাসিক Franz Roh (ফ্রানজ রহ)-ই ১৯২৫ সালে সর্বপ্রথম তাঁর লেখা একটা বইয়ের শিরোনামে প্রয়োগ করেছিলেন।

প্র : ফবিজম (Fauvism) কী?

উ : বিশ শতকের একেবারে গোড়ায় (১৯০৬) প্যারিসে গড়ে ওঠা এক প্রকার আর্ট, বিশেষত চিত্রশিল্প-আন্দোলন। নিছক ইম্প্রেশনিস্ট আর্টের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। ফন শব্দের অর্থ 'বুনো জন্তু'। এদের কর্মকাণ্ড বা আন্দোলনকে ফবিজম বা বন্যজন্তুবাদ আখ্যায়িত করা হয়। আর এ জাতীয় শিল্পকে ফবিষ্ট বলা হয়। চিত্র-শিল্পের নিয়ম-নীতিবর্জিত কিংবা বাস্তবধর্মী কলা-কৌশলের বিরুদ্ধে নকশার ছন্দে সৌন্দর্যানুভূতির প্রকাশ ঘটানোই ছিল 'ফবিস্ট' শিল্পীদের বৈশিষ্ট্য। ইমপ্রেশনিজম-এর পরবর্তী অধ্যায়ে কেতাবি শিল্পের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ায় প্রাণবন্ত ও বর্ণোজ্জ্বল চিত্রাঙ্কনের সংস্কারমুক্ত আদিমতা নিয়ে এসেছিলেন যেসব 'ফবিস্ট' শিল্পীরা ভিরেইন, ভ্লামিঙ্ক ও মাতিস তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। শিল্পে আদিমতা ফিরে আনার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন গগ্যাঁ এবং তাঁরই শুরুতে এসেছিলেন একদল শিল্পী শিশুর সারল্য ও সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে। অকৃত্রিম রঙের সরল-স্বচ্ছন্দ প্রয়োগে নিজেদের আবেগময় অভিঘাতকে তাঁরা ব্যক্ত করতে চেয়েছিলেন। ফবিস্ট শিল্পীদের মাঝে সবচাইতে কীর্তিমান অঁরি মাতিস। উজ্জ্বল রংকে তিনি ব্যবহার করেছিলেন আবেগ ও প্রতীকের অবদান ব্যক্ত করার কাজে। মূলত বাস্তববাদী কলাকৌশলের বিরুদ্ধে রঙিন নকশার ছন্দে সৌন্দর্যানুভূতি সঞ্চার করাই ছিল মাতিসের লক্ষ্য। স্পষ্টতাও প্রাবল্য, রং ও নকশার জৌলুস দিয়ে প্রচলিত বর্ণনাত্মক ধারার বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহের কণ্ঠস্বর শোনা গেল ফবিজমে। নিয়মনীতি ভঙ্গকারী, এই অর্থে মাতিস ও অপরাপর চিত্রশিল্পীদের ফবিস্ট বলা হলো। দীপ্তি ত্রিপাঠী, জীবনানন্দের এই পঙক্তি ফবিজমের উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেছেন :

'হলুদ কঠিন ঠ্যাং উঁচু করে ঘুমোবে সে
শিশিরের জলে'। (–'দুজন')

এখানে 'হলুদ' বর্ণটি ফবিস্ট। হলুদ কঠিন ঠ্যাং বাক্যাংশের মধ্যেই আছে একটি কর্কশ ভাব– এ লক্ষণ ফবিস্টদের।

প্র : ন্যাচারালিজম (Naturalism) কী?

উ : বাস্তবধর্মী রচনা ও সমালোচনার ধারা হলো ন্যাচারালিজম। এর আক্ষরিক অর্থ যথাস্থিতবাদ। যদিও শব্দটা বাংলা ব্যবহৃত না হয়ে ন্যাচারালিজম পারিভাষিক শব্দ হিসেবে প্রচলিত। এটা বাস্তবধর্মিতার সমার্থক তবু বাস্তববাদের সাথে এর সূক্ষ্ম-পার্থক্য বিদ্যমান। এ জাতীয় বিষয় একদিকে যেমন– সাহিত্যর, বিশেষত গল্প-নাটক-উপন্যাসের কাহিনি সংস্থাপনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে, তেমনি সমালোচনার ক্ষেত্রেও বিশেষ ধারা হিসেবে গুরুত্ব বহন করে। ফরাসি ঔপন্যাসিক গঁকুর ভ্রাতৃদ্বয় প্রথম উপন্যাসে সাহিত্যে ন্যাচারালিজম আন্দোলনের সূচনা করেন। বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমরেশ বসু প্রমুখ ন্যাচারালিস্ট কথাসাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতকীর্ত হয়ে আছেন। সামাজিক দুর্গোপ, অর্থনৈতিক, সংস্কৃতি-বিপর্যয় ও পারিপার্শ্বিক বিশৃঙ্খলার সূক্ষ্ম রূপায়ণের পাশপাশি যৌনজীবনের নানা দিক এ জাতীয় রচনায় ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত।

প্র : বাস্তববাদ (Realism) কী?

উ : জগৎ, জীবন ও প্রকৃতিতে বাস্তবনিষ্ঠ ও যথাযথরূপে চিত্রিত করাই বাস্তববাদ। রোমান্টিক ভাবকল্পনা, আদর্শবাদ, দূরগামী ও অতিলৌকিক বিস্ময় ও রহস্য ইত্যাদির পরিবর্তে বস্তুজগতের বহিরঙ্গের নিখুঁত ও বিশ্বাসযোগ্য চিত্রাঙ্কনই বাস্তববাদী লেখক-শিল্পীদের অভিপ্রায়। বৃহত্তর অর্থে বাস্তববাদী বলতে বিভিন্ন যুগের, বিভিন্ন ভাষার অনেক লেখককেই চিহ্নিত করা যায়, যেমন– চতুর্দশ শতকের ইংরেজ কবি চসার, যাঁর- The canterbury Tales সমাজবাস্তবতার এক অসামান্য উদাহরণ। কিংবা রবিনসন ক্রুশোর অভিযান কাহিনির রচয়িতা ড্যানিয়েল ডেফো। ১৮৫০-এর দশকে ফ্রান্সে 'রিয়ালিজম' শব্দটি প্রথম সাহিত্য ও সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় জীবনের রূঢ় ও কঠিন বাস্তবতার বিশ্বস্ত চিত্রণ বোঝাতে। বালজাককে এই বাস্তববাদের মুখ্য প্রবর্তক বলে চিহ্নিত করা হয় তাঁর চরিত্র চিত্রণের দক্ষতা, পরিপ্রেক্ষিত ও পরিবেশ রচনায় নিখুঁত পারিপাট্য, পর্যবেক্ষণ ও চিত্রণে বিশ্বাসযোগ্যতা, অনুপুঙ্খের ব্যবহার জীবনধর্মিতা ইত্যাদির কারণে। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাসঙ্কুল বাস্তবতাকে গভীর আগ্রহে ও বিশ্বাসযোগ্যভাবে ফুটিয়ে তোলাই ছিল বাস্তববাদীদের কাজ। বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা সুকান্ত ভট্টাচার্যে (লেখায় বাস্তবতার) দৃষ্টান্ত মেলে।

Scanned with CamScanner

প্র : গঙ্গেরিজম (Gangorism) কী?

উ : গঙ্গেরিজম শব্দটা ধারার একটা সাহিত্য অনুবাদের। এই অনুবাদনের প্রবক্তা স্পেনীয় কবি লুই দি. গঙ্গোরা আবাদোরে। ষোল শতকে কবি লুই গঙ্গোরাই শব্দটা কাব্য-জগতে এক ধরনের কৃত্রিম, উদ্ভট কবিতা রচনার কৌশল উদ্ভাবন করেন। এতে ভাবি, গুরুগম্ভীর ও দুরূহ শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে এক ধরনের অদ্ভুত, উদ্ভট, ও চটকদার কবিতা রচনা করেন, যাতে বক্তব্য-বাহুল্য, বৃত্তিমতা ও অবিশ্বাস্য ঘটনার সমাবেশ ঘটে। এ জাতীয় কবিতায় মৌলিকতার পরিবর্তে গতিশীল আড়ই ভাব ফুটে উঠে। তবে এ ধরনের কবিতা কোনো প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি বলে সমসাময়িককালে কিছুটা হুজুগ সৃষ্টি করে অবার স্তিমিত হয়ে পড়ে। তাছাড়া কতিপয় অপ্রধান কবি ছাড়া শক্তিশালী কোনো কবি এই রীতি অবলম্বন না করায় তা অচিরেই বিলোপ ঘটে। টমাস ব্রাউনিং ও রিচার্ড ক্রাশের রচনায় এর কিছুটা প্রভাব লক্ষণীয়। বাংলা সাহিত্যে এর তেমন কোনো প্রভাব নেই।

প্র : **সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা (Socialistic Realism) কী?**

উ : আধুনিকতাবাদী বুর্জোয়া শিল্প-সাহিত্যের নানা 'উৎকেন্দ্রিকতা ও বিচ্যুতির' বিরুদ্ধে শিল্পীর সামাজিক দায়বদ্ধতাকে নিরঙ্কুশ গুরুত্ব দিতে ১৯৩৪-এ সোভিয়েত রাশিয়ায় যে 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'র তত্ত্ব গৃহীত হয়েছিল তার আদর্শ প্রতিনিধি লেখক ম্যাক্সিম গোর্কি। উনিশ শতকে প্রবর্তিত বাস্তববাদের শিল্প-প্রকরণসমূহকে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও বিপ্লবী আন্দোলনের পুষ্টি ও প্রসারে সচেতনভাবে প্রয়োগ করাই ছিল 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'র সারকথা। ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা' উপন্যাসকে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সারক্যাথা বলে মনে করা হয়। সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যতত্ত্ব নিছক বাস্তবতার অনুকৃতি, পাপবোধ ও পাশবিকতার যথাস্থিত চিত্রণ নয়, শিল্পের জন্য শিল্প বা ঐ জাতীয় কলাকৈবল্যবাদী শিল্পতত্ত্বের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক শিল্প ও সাহিত্যের এক উদ্দেশ্যমূলক, সাহায্যকারী আত্মিক ও দৃষ্টিকোণ। বালজাক, তুর্গেনিভ, গোগল, চেকভ প্রমুখ লেখকের গোর্কির মতো এই শ্রেণিভুক্ত। গোর্কির সাহিত্য ও সাহিত্যতত্ত্বের কেন্দ্রে ছিল মানুষ, অসংখ্য দরিদ্র ও নিপীড়িত মানুষের সঙ্গে লেখককে যুক্ত হতে হবে, যুক্ত হতে হবে শ্রমের সঙ্গে, জাগিয়ে তুলতে হবে সমষ্টিগত দায়িত্বের চেতনা। মানুষের জন্যই শিল্প, জীবনের জন্যই শিল্প। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জননী' উপন্যাস বা সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থ সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাতত্ত্বের দৃষ্টান্ত।

প্র : **বাক্প্রতিমা (Imagery) কী?**

উ : শব্দটি আধুনিক সমালোচনার ক্ষেত্রে অতিপরিচিত এবং বহুল ব্যবহৃত। কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ নিয়ে অস্পষ্টতা আছে। সবার কাছে এর মানে এক নয়। একজন পাঠকের মনে একটি কবিতা পড়ার পর যেসব উপাদান মিলে গোটা কবিতাটি যে ভাব তৈরি করে তার সমগ্রতাকেও অনেকে ওই শব্দে অভিহিত করেন। শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বাক্প্রতিমাকে তিনভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা যেতে পারে:

১. প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, ইন্দ্রিয়-বেদ্য, ইন্দ্রিয়াশ্রয়ী;
২. মানব-গ্রাহ্য, অনুভব-সংবেদ্য, ইন্দ্রিয়াতীত, ব্যঞ্জনাশ্রয়ী;
৩. ইন্দ্রিয়-নির্ভর অথচ মনোগ্রাহী, রূপাশ্রয়ী অথচ অনুভব সংবেদ্য।

সি. ডে. লিউইস তাঁর 'পোয়েটিক ইমেজ' (১৯৪৮) গ্রন্থে বলেছেন–

'A picture made out of words' আবার 'a poem may itself be an image composed from a multiplicity of images.'

তিনি দেখিয়েছেন যে, শেক্সপিয়রের নাটকে মাঝে মাঝেই এক জাতীয় একগুচ্ছ চিত্রকল্প (Image clusters) পরিলক্ষিত হয়। (যেমন 'কিং লিয়ার' নাটকে জীবজন্তুর চিত্রকল্প, 'হ্যামলেটে'

রোগ, অবক্ষয়, পচন ও মৃত্যুর চিত্রকল্প) যার ফলে গোটা নাটক এক বিশেষ সুর ও আবহ অর্জন করে। আরও উদাহরণ–

- 'নিশাচলি মোর সোনার খাঁচায় বইসো না'। (জ্ঞানদাস)।– রবীন্দ্রনাথ
- 'সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতো সন্ধ্যা আসে'। (রূপকাশ্রয়ী)।

–জীবনানন্দ

প্র : **কিউবিজম (Cubism) কী?**

উ : ১৯০৭ থেকে ১৯১৪-র মধ্যে ফরাসি চিত্রকর জর্জ ব্রাক ও পাবলো পিকাসো এক নতুন আঙ্গিক প্রয়োগ করেন যা কিউবিজম বা আকৃতিবিন্যাসবাদ নামে খ্যাত। বাইরের জড়ত্ব থেকে চিত্রের আত্মিক রূপ প্রকাশই এ জাতীয় চিত্রকর্মের মূল উদ্দেশ্য। শিল্পীর তুলিতে চিত্রের বাহ্যিক রূপটা ত্রিভুজ বা চতুর্ভুজের আকৃতিতে প্রকাশিত হয়ে অন্তরিস্থিত রূপের প্রকাশ ঘটানোই এর উদ্দেশ্য। নানা দৃষ্টিকোণ থেকে অনুভূত শিল্পীর সূক্ষ্ম কল্পনা প্রসূত টুকরো টুকরো চিত্রের সমাবেশে একটা পূর্ণাঙ্গ ছবি ফুটে তোলাই এ জাতীয় চিত্রের বৈশিষ্ট্য। চিত্রের জড়ত্ব মুক্তিদানই এই চিত্রশিল্পীদের মূল লক্ষ্য ও আদর্শ। এদেরকে 'কিউবিস্ট' শিল্পী অভিহিত করা হয়। পিকাসোর মতো শক্তিমান মহান শিল্পীর হাতে কিউবিজম রীতি চিত্রকলার ক্ষেত্রে বিশেষ মাত্রা ও স্থায়ী রূপকল্প সৃষ্টির সহায়ক হয়।

প্র : **অভিব্যক্তিবাদ (Expressionism) কী?**

উ : সাহিত্যে ও চিত্রকলায় বাহ্যিক জীবনের চেয়ে অভ্যন্তরীণ জীবনের মর্মোদঘাটন-ই হলো অভিব্যক্তিবাদ। একটি সুসংহত আন্দোলন না হলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগেই জার্মানিতে অভিব্যক্তিবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল। মঞ্চসজ্জা, প্লটের গঠন, চরিত্র-চিত্রণ ও সংলাপ রচনায় ধ্বনির প্রয়োগ ও আলোক সম্পাতের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অভিব্যক্তিবাদী নাট্যকারেরা বাস্তবতন্ত্রী ও প্রকৃতিবাদী ভাবনা ও কৌশলের

প্র : **অ্যাবসার্ড বা উদ্ভট তত্ত্ব (Absurdism) কী?**

উ : অ্যাবসার্ড অর্থাৎ উদ্ভট বা অদ্ভুত বা অর্থহীন। অনেকে বলেন এটা 'কিমিতিবাদী' তত্ত্ব। কিমিতি অর্থ 'এটা কী হলো'। এই শব্দটি ও তার সংশ্লিষ্ট ভাবনা প্রথম এসেছে আলবেয়ার কামুর 'The Myth of Sisyphus' (১৯৪২) গ্রন্থে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইউরোপে সর্বনাশা সামাজিক, রাজনৈতিক বিপর্যয়ে মানুষ যখন হারিয়ে ফেলেছিল তার যাবতীয় বিশ্বাস, একনিষ্ঠতার বেদনা ও ভয় যখন তাকে করেছিল অস্থির, তখনই অর্থহীনতার এই বোধ জাঁকিয়ে বসে। সর্বগ্রাসী অবক্ষয়ের মাঝে হতাশ ও বিচ্ছিন্ন মানুষ হারিয়ে ফেলে যুক্তি পারম্পর্যের শৃঙ্খলা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চৌহদ্দিতে যান্ত্রিকতার উন্নতি মানুষের জীবনের বহিরঙ্গ যতই চাকচিক্য করুক না কেন, অস্তিত্বগত নানা প্রশ্ন ও সমস্যা অসমাধেয় বলে প্রতিপন্ন হয় তার কাছে। জীবনকে মনে হয় উদ্দেশ্যবিহীন ও অর্থহীন। এই পরিপ্রেক্ষিতে শিল্প-সাহিত্যেও অসংলগ্নতা

Scanned with CamScanner

এসে পড়ে। জীবন যেখানে অস্তিত্বহীন, শিল্প-সাহিত্যও সেখানে অস্তিত্বহীন। যুগের ভেতে যাওয়া বিশ্বাস, অর্থহীন জীবন পরিকল্পনার বোধ থেকেই এই তত্ত্বের উদ্ভব। আলবেয়ার কামুর বক্তব্য স্মরণ করে বলা যায় : "Absurd originally means 'Out of harmony', in a musical contest." অভিধান বলছে : এটি 'Out of harmony with reason or prosperity; incongruous, unreasonable, illogical.' জীবনের সংগীতময়তা যেখানে ক্ষুণ্ণ, সেখানেই অ্যাবসার্ডবাদের জন্ম। শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে অ্যাবসার্ডের শুরু যেখানে, শেষও সেখানে। নাটকের ক্ষেত্রে সংলাপের কোনো পারম্পর্য থাকে না। কাম্যু, কেফো, সিস্টার, আয়োনেস্কো প্রমুখের নাটকে এই অ্যাবসার্ডিটি চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটেছিল। নাটকে অ্যাবসার্ডিটি তত্ত্বকে প্রয়োগ করেছিলেন স্যামুয়েল বেকেট তাঁর 'Waiting for Godont' নাটকে। বাংলা সাহিত্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ 'তরঙ্গ-ভঙ্গ', সাঈদ আহমদ 'কালবেলা', 'মাইল পোস্ট', 'তৃষ্ণা' নাটকে এর প্রয়োগ দেখা যায়।

প্র : অবক্ষয়বাদ (Decadentism) কী?

উ : সাধারণত মূল্যবোধের ক্রমাবনতি ও অভাবই 'অবক্ষয়' শব্দের সমার্থক। সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলা প্রভৃতির ক্ষেত্রে অবক্ষয়ের কিংবা এ থেকে উত্তরণের চিত্র প্রতিফলিত হওয়া এবং ব্যাপক প্রসার লাভ করাকে অবক্ষয়বাদ বলা হয়। শিল্পে-সাহিত্যে নানান যুগে কোনো না কোনো ভাবে এর প্রতিফলন ঘটেই। তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে লোভ, হিংসা, লালসা, অর্থনৈতিক মন্দা, শোষণ, বঞ্চনা, শ্রেণিসংগ্রাম, হত্যা, শঠতা, ধর্মহীনতা, ধর্মান্ধতা সমাজ ও রাষ্ট্রের নানা পর্যায়ে বিশ্বব্যাপী চিরায়ত মূল্যবোধের যে গুরুতর বিপর্যয় সংঘটিত হতে থাকে তা থেকেই বিশ শতকের প্রথম দশকের শেষ পর্যায় থেকে শিল্প, সাহিত্য, দর্শনের ক্ষেত্রে এ জাতীয় বিষয় দানা বাঁধতে শুরু করে। বিশ্বসাহিত্যে টি. এস. এলিয়ট, এজরা পাউন্ড, জেমস্ জয়েস, মালার্মে প্রমুখ কবির কবিতায় অবক্ষয়ের নানা রূপ প্রতিফলিত হতে শুরু করে। বাংলা সাহিত্যে জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ প্রমুখের রচনায় অল্প-বিস্তর অবক্ষয়ের চিত্র উদঘাটিত হয়।

প্র : অস্তিত্ববাদ (Existentialism) কী?

উ : অস্তিত্বের সংগ্রাম থেকেই অস্তিত্ববাদ বা অস্তিত্ববাদী আন্দোলনের সূত্রপাত। জার্মান রোমান্টিসিজমের ভেতরে ছিল এর বীজ এবং আধুনিককালে জর্মান এডমুন্ড হুসালের মানস ঘটনাবাদ থেকে এর উদ্ভব ঘটেছে। সোরেন কিয়ের্কেগার্ডের রচনার মধ্যে অস্তিত্ববাদী চিন্তার প্রথম উন্মেষ ঘটেছে বলে ধরা হয়। বিংশ শতাব্দীতে আলবেয়ার কামু, জাপ সার্ত্রে প্রমুখ লেখক তাঁদের সাহিত্যকর্মে অস্তিত্ববাদী দর্শনকে বিশেষভাবে ব্যবহার করেন। এ দর্শনের মূল কথা হচ্ছে, ব্যক্তিরূপে মানুষের বিশেষ মূল্য আছে এবং নিজের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যক্তির স্বাধীন ক্ষমতা ও দায়িত্ব আছে। মানুষ অচেতন বস্তুসমূহের মতো কতকগুলি দৈবী বা প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয় না, সে স্বাধীন এবং আপন কর্মের মধ্য দিয়েই তার সারধর্ম গড়ে তোলে। শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছবার লক্ষ্যে নিজের অবস্থার উন্নয়নে মানুষকে তাই পরিবেশকে ছাড়িয়ে যাবার সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়। এই সংগ্রামই অস্তিত্ববাদী সংগ্রাম বলে বিবেচিত। এ থেকে দুটো ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে :

১. মানবিকসত্তার বিষয়ে জিজ্ঞাসা;

২. সত্তা জিজ্ঞাসায় বহিরঙ্গের পরিবর্তে অন্তরঙ্গ একাত্মতার ওপর প্রাধান্য বিস্তার।

অস্তিত্ববাদী দার্শনিকগণ ভাগ্যের হাতে জীবনকে সঁপে দেয়ার বিরোধী বরং তাঁদের মত হলো– সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির সাথে মোকাবেলার মাধ্যমে মানব-অস্তিত্ব

নির্ধারিত ও পরিচালিত হবে। ভাগ্যের হাতে অসহায় আত্মসমর্পণকে তাঁরা আদৌ সহানুভূতির চোখে দেখেন নি। তাঁরা ছিলেন মূলত আদর্শবাদী দর্শনের বিপরীতে। বিশ্বসাহিত্যে দস্তয়েভস্কির 'ক্রাইম এ্যান্ড পানিশমেন্ট', 'দা ইডিয়ট', 'আলবেয়ার কামুর 'দা প্লেগ', 'দা আউট সাইডার'; বাংলা সাহিত্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র 'চাঁদের অমাবস্যা', 'কাঁদো নদী কাঁদো' সার্থক অস্তিত্ববাদী উপন্যাস।

প্র : নবজাগরণ (Renaissance) কী?

উ : নবজাগরণ বা Renaissance একটি ইউরোপীয় ধারণা। মধ্যযুগে নানাবিধ কুসংস্কার ধর্মের নামে অমানবিক কর্মকাণ্ড ছুতাদির বিরুদ্ধে জীবনের স্বাভাবিক গতিকে অক্ষুণ্ন রাখার যে প্রণোদনা তাকেই অভিহিত করা হয় Renaissance বা নবজাগরণ বলে। 'রেনেশাঁস' ফরাসি শব্দ। ইংরেজিতে লেখা হয় Renaissance। ইতালি ভাষায় লেখে Rinascita এর আক্ষরিক অর্থ হলো 'পুনর্জন্ম'। তবে বাংলায় একে 'নবজাগরণ'ও বলা হয়ে থাকে।

চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইতালিতে এই নবজাগরণের শুরু। এরপর প্রায় দুশো বছর ধরে সমগ্র ইউরোপের চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, সাহিত্যসহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে একটা ঐশ্বর্যময় সৃজনশীলতার জোয়ার দেখা দেয়। সাহিত্য ক্ষেত্রে ধ্রুপদী সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ শৈল্পিক ও বৌদ্ধিক শক্তির উন্মেষ, মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, জ্ঞানের পরিধির ব্যাপ্তি, ব্যক্তিবাদের সূচনা প্রভৃতি নবজাগরণের বৈশিষ্ট্য। রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তন, মুদ্রণযন্ত্রের ব্যবহার, দেশীয় সাহিত্যের উন্নতি ও নবরূপায়ণ, বাংলা গদ্যের প্রচলন, ধর্মীয়-সংস্কার মুক্তি ও মুক্ত মনোভাবের প্রকাশই ছিল এই বাংলার নবজাগরণ বা রেনেশাঁসের মূল লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্য। মূলত উনিশ শতক ছিল বাংলার রেনেশাঁসকাল।

প্র : শোকগাথা বা (Elegy) কী?

উ : শোককবিতা বা এলিজি মানুষ প্রাচীনকাল থেকে আজও গভীর শোকে কবি কবিতায় শোকানুভূতি ব্যক্ত করেন। কবি জন মিল্টনের মৃত্যুতে তাঁর শেলি কর্তৃক রচিত 'অ্যাডোনাইস', আর্থার হ্যালামের মৃত্যুতে টেনিসনের লেখা 'ইন মেমোরিয়াম' (In memoriam); বাংলা সাহিত্যে বিহারীলাল চক্রবর্তী 'বন্ধু-বিয়োগ' লিখিত শোককবিতা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত : 'এসেছিল সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ / মরণে তাই তুমি করে গেলে দান।' পত্নীবিরহে ও পুত্র শোক-কবিতা হিসেবে বাঙালি পাঠকদের আকৃষ্ট করে।

প্র : মহাকাব্য (Epic) কী?

উ : Epic বলতে বোঝায় এক সুদীর্ঘ বীরগাথা যা এক বা একাধিক নায়কের অসামান্য কীর্তির মহিমা উজ্জ্বল আখ্যায়িকার মধ্যে দিয়ে একটি দেশ বা জাতির সমগ্র ঐতিহ্য ও ভাবাদর্শকে পরিস্ফুট করে তোলে। ড্রাইডেন মহাকাব্যের সংজ্ঞার্থ নিয়েছেন–

'A heroic poem which epito mises the feeling of many ages and voices the aspiratinn and imagination of all people.' গ্রিক epicos বা epos থেকে Epic শব্দের উদ্ভব। মহাকাব্যের নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি উল্লেখযোগ্য :

১. মহাকাব্যের আখ্যান হবে পৌরাণিক;

২. মহাকাব্যের নায়ক বীরোদাত্ত গুণসমন্বিত কোনো দেবতা বা উচ্চবংশজাত বীর বা নৃপতি;

৩. কমপক্ষে ৯টি, সর্বাধিক ৩০টি সর্গে মহাকাব্য বিভক্ত হবে। প্রতি পর্বের শেষে পরের পর্বের সূচনা থাকবে;

৪. মহাকাব্যের পটভূমি হবে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল প্রসারী;

Scanned with CamScanner

৫. মহাকাব্যের ভাষা হবে ওজস্বী ও গাম্ভীর্যপূর্ণ।

মহাকাব্য যুগে যুগে সর্বসাধারণের জীবন ও সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের মুকুর হয়ে ওঠে। মুখে মুখে গীত ও পঠিত হয়ে, শ্রুতির পথ ধরে এই জাতীয় কাব্য বিধৃত হয় স্মৃতিতে। হোমারের 'ইলিয়ড', 'ওডেসি', বাল্মীকিকৃত 'রামায়ণ', ব্যাসদেবের 'মহাভারত' জাত মহাকাব্যের উদাহরণ। বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য', হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৃত্রসংহার', নবীনচন্দ্র সেনের 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র', 'প্রভাস'; কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য মহাকাব্য।

প্র : প্রহসন (Farce) কী?

উ : সামাজিক দুর্নীতি, কপটতা, অনাচারকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে মূল হাস্য-পরিহাসের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা এক ধরনের সংক্ষিপ্ত নাটককে প্রহসন বা Farce বলে। অন্য কথায় সামাজিক অপকীর্তির উদ্‌ঘাটন ও শোধনার্থে যে ব্যঙ্গাত্মক একাঙ্ক নাটক তাই প্রহসন। সরস ও সজীব সংলাপ, ধারালো রঙ্গব্যঙ্গ, চটুল তামাশা, সর্বোপরি ঘটনা চরিত্রসমূহের চমকপ্রদ সংযোগে প্রহসন রচয়িতা ভণ্ডামি ও স্বেচ্ছাচারিতার মুখোশ খুলে দিতে চান।

ল্যাটিন Farsus থেকে এই Farce শব্দটির উৎপত্তি। শ্রেষ্ঠ প্রহসন হিসেবে স্মরণীয় ব্রানডন টমাস কৃত 'Charley Gunt'. বাংলায় রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব'কে অনেকেই প্রহসন বলেন আখ্যা দেন। এছাড়া মাইকেল মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ', দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'কল্কি অবতার', জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অলীকবাবু' প্রভৃতি এই শ্রেণিভুক্ত।

রম্যরচনা (Belle Letter) কী

রম্যরচনা নামটা হাল আমলের হলেও 'বেল লেটর' নামটা অনেক দিনের। ফরাসি এই অভিধায় এক সবকের রচনাকে বোঝাতো যা সুচিন্তিত, পরিমার্জিত, সুললিত গদ্যে, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক রচনার থেকে 'স্বাদে-গন্ধে' আলাদা। উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের গোড়ায় এই ধরনের রচনা প্রবন্ধধর্মী রচনা ইংরেজি সাহিত্যে জনপ্রিয় হয়েছিল। বাংলা গদ্যের জন্মলগ্ন থেকে দুটি সমান্তরাল ভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। একটি পণ্ডিতী, অন্যটি ঘরোয়া। বিদ্যাসাগরের 'প্রভাবতী সম্ভাষণ', বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোক-রহস্য', বাঁকা রম্যরচনার অনন্য দৃষ্টান্ত। সৈয়দ মুজতবা আলীর 'দেশে-বিদেশে', 'চাচা-কাহিনি', 'পঞ্চতন্ত্র' রম্য রচনার দৃষ্টান্ত।

প্র : জীবনীসাহিত্য কী?

উ : জীবনী বা Biography বলতে সাধারণভাবে আমরা কোনো ব্যক্তিবিশেষের জীবনবৃত্তান্তকে সুবিন্যস্তভাবে লিপিবদ্ধ করা ও তার চরিত্রের বিশ্লেষণ, এই বুঝে থাকি। কোনো ব্যক্তিবিশেষের জীবনের আদ্যোপান্ত যাবতীয় ঘটনা ও তথ্য স্তূপীকৃত করলেই জীবনচরিত হয় না। লিটন স্ট্র্যাচি তাই ঠাট্টা করে বলেছিলেন– 'A mase of notes and documents is no more a biography than a mountain of eggs an omelette'. ফ্রাঙ্ক হ্যারিসের দৃষ্টিতে জীবনী নিছক ব্যক্তিজীবনের ইতিহাস নয়– 'Biography is not only history can also be good literature'. জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের বাইরের ও ভেতরের সমগ্র সত্তাকে শিল্পসম্মতভাবে উদ্‌ঘাটিত করার দায়িত্ব জীবনীকারের। জীবনের নানা ঘটনা ও তথ্যের ওপর ভিত্তি করে মানবাত্মার দুঃসাহসিক অভিযানের আলেখ্য নির্মাণ প্রকৃতই দুরূহ এক সৃজনীকর্ম, বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণ ও শৈল্পিক দক্ষতার সার্থক পরিণতি ব্যতীত যা অসম্ভব। একজন জীবনীকারকে একাধারে হতে হবে

ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও চিত্রকর। শুধু জীবনের ঘটনাবলিই নয়, তাঁকে উদ্‌ঘাটিত করতে হবে জীবনরহস্যকেও। বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনের সুসমঞ্জস নির্মাণ, ইতিহাসের শিল্পসম্মত সমন্বয় ব্যক্তিকে কোনো জীবনচরিতই সার্থক হতে পারে না। জীবনচরিত যাঁকে নিয়ে লেখা হবে তাঁর জীবনের আদ্যপূর্বিক পরিচয় জীবনীকারকে পেতে হবে। জীবনচরিত তো সে কারণেই অসোত্তীর্ণ সাহিত্যসৃষ্টি।

প্র : ভ্রমণ-সাহিত্য কী?

উ : পাঠকারীর মানসভ্রমণ না হলে সার্থক ভ্রমণসাহিত্য হয় না। অর্থাৎ বইটি পাঠ করে পাঠক যেন মনে মনে ঘুরে আসতে পারেন। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের অনুসন্ধিৎসা তাকে তার পরিচিত ভৌগোলিক, সামাজিক জীবনবৃত্তের বাইরে বার বার ঠেলে দিয়েছে। কেউ পাহাড়ে, কেউ জঙ্গলে, কেউবা সাগরে বা মরুভূমিতে পাড়ি দিয়েছে। এইসব ভ্রমণ ও পর্যটন, নানা দুঃসাহসিক অভিযান ইত্যাদি থেকে জন্ম নিচ্ছে 'ভ্রমণ সাহিত্যে'র নানা স্বাদের লেখা। ভ্রমণ বৃত্তান্ত যিনি সাহিত্যমূল্যে মূল্যবান করতে চান তাকে এক নিরপেক্ষ ও সহৃদয় মানসিকতা নিয়ে স্থান, কাল, পাত্র-পাত্রীদের দেখতে হয়। বাংলায় এ ভ্রমণ কাহিনির প্রথম ও বিশেষ দৃষ্টান্ত সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ' এবং পরে অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'নদীপথে'। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে দেখলে রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ অনেকেই এই শাখাটিকে উল্লেখযোগ্য সমৃদ্ধি দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি', নবীনচন্দ্র সেনের 'প্রবাসের পত্র', জলধর সেনের 'হিমালয়' প্রভৃতি বাংলায় লেখা ভ্রমণ বৃত্তান্ত বা কাহিনির জনপ্রিয় কয়েকটি উদাহরণ।

প্র : ব্যঙ্গরচনা (Satire) কী?

উ : যে রচনা আলোচ্য বিষয়কে লঘু ও তুচ্ছ করে তার প্রতি অবজ্ঞা, ঘৃণা, ক্রোধ বা কৌতুকের মনোভাব জাগিয়ে তোলে তাকে 'স্যাটায়ার' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। সচিক বলতে গেলে যে রচনা হাস্যরসের সাধ্যম, তার সেখানে আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু স্যাটায়ার হাস্যরসকে শাধ্যম করে অন্যের মতো, তার উদ্দেশ্য-পরিচালনাকে ত্রুটি চালিয়ে কোনো অন্যায়, অবিচার বা অসঙ্গতিকে আক্রমণ করা। এই আক্রমণের ভঙ্গি কোনো বিশেষ ব্যক্তি হতে পারে, একটি বিশেষ ধরনের টাইপের মানুষ কিংবা কোনো প্রতিষ্ঠান কিংবা জাতি হতে পারে। এমনকি সমগ্র মানবজাতিও হতে পারে। যেমন জোনাথন সুইফটের 'গালিভারের সফরনামা'। কখনো এসব স্যাটায়ারের মাঝে পার্থক্য সর্বত্র খুব তীক্ষ্ণ নয়। জননন তাঁর 'ভলপোনি' নাটকে স্পষ্টতই এক শ্রেণির ধূর্ত অর্থগৃধ্নু মানুষকে তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন। ব্যঙ্গরচনার রচয়িতাগণ 'স্যাটায়ার'কে বিবেচনা করেছেন মানুষের নির্বুদ্ধিতা ও অন্যায় আচার-আচরণের সংশোধক রূপে। অষ্টাদশ শতককেই ইংরেজি ব্যঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ যুগ বলে অভিহিত করা হয়। বাংলা ভাষায় প্রথম যৌবুকি হলেন নাগর স্যাটায়ার গদ্য রচয়িতা। তাঁর রচিত 'ভাষা মানুষের মুখ থেকেই কলমের মুখে আসে, উল্টোটা করতে গেলে মুখ শুধু কালিই পড়ে।'– স্যাটায়ারের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

প্র : উত্তর-আধুনিকতাবাদ বা Postmodernism কী?

উ : উত্তর-আধুনিকবাদ মতটি সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি, স্থাপত্য, সমালোচনার ক্ষেত্রে Deconstruction ও Post-structuralism-এর সঙ্গে অনেকটাই সংশ্লিষ্ট। Postmodernism শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয় ১৮৭০ সালে। জন ওয়াটকিনস চ্যাপম্যান ফরাসি Impressionism থেকে চিত্রকর্মকে পৃথক করার জন্য প্রথম এটি

Scanned with CamScanner

ধারার চিত্রের কথা বলেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে Postmodern ধারণাটি প্রথম আসে ১৯৭২ সালে আমেরিকার 'বীমাস্থ ২' (Boundary 2) পত্রিকার মাধ্যমে। ডেভিড এনটিন, চার্লস অলসন, কর্ড লুইস বর্জ প্রমুখ এই ধারাকে বেগবান করেন। আরব-আমেরিকার লেখক ইহাব হাসান ১৯৭১ সালে উত্তর-আধুনিক ধারায় সাহিত্য সমালোচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। উত্তর-আধুনিকতার মূলকথা হচ্ছে : 'সব কিছুই বহমান ও খণ্ডিত। সত্তার কোনো বস্তুগত রূপ নেই। সমস্ত নৈতিক, সামাজিক রীতি-নীতি কৃত্রিম, বিধি বহির্ভূত অকারণ ও বাইরে থেকে চাপানো; সত্তা কেবল বিষয়গত ও আধারাশ্রীয়।' আরনল্ড টয়েনবি, আরভিং হো, হ্যারি লেভিন, এডওয়ার্ড সাইড প্রমুখ উত্তর-আধুনিক ধারার সমর্থক। এই ধারা মূলত আধুনিকতার বিপরীতে পথসন্ধান করে এবং মধ্যযুগের মূল্যবোধে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। মধ্যযুগ ব্যাখ্যায় বৈজ্ঞানিকতার বদলে অনেকে ধর্মীয় ব্যাখ্যায় স্থিত হন। এখানেই উত্তর-আধুনিকতার সীমাবদ্ধতা। মূলত নৈরাশ্য থেকে এ পথে তারা সর্বসমস্যার সমাধান খোঁজেন। তখন আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধারাকে পাশ কাটিয়ে তারা পতিত হন ধর্মমোহে।

প্র : কারা-সাহিত্য কী?

উ : কারাগারে অন্তরীণ অবস্থায় রচিত সাহিত্য সাধারণত কারা-সাহিত্য হিসেবে স্বীকৃত। তবে কারাগার থেকে বাইরে গিয়েও এ ধরনের লেখা হতে পারে। সেখানে কারাগারের নিয়ম পদ্ধতি সম্পর্কে সার্বিক ধারণার প্রকাশ থাকতে হবে। রচয়িতার জেলজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কারাগারের সংকীর্ণ জীবনের বাইরে কল্পনার বিস্তার তিনি ঘটাবেন সত্য কিন্তু কারাজীবনের অভিজ্ঞতার ছাপ থাকবে তার রচনায়। অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যেমন কারাসাহিত্য লিখেছেন তেমনি অনেক শিল্পী ও সাহিত্যিকও কারা-সাহিত্য রচনা করেছেন। চারণকবি মুকুন্দ দাস 'ছিল ধান গোলাভরা, খেত ইঁদুরে করল সারা' গান রচনার জন্যে ব্রিটিশদের জেলে যান। জেলে গিয়েও তিনি এই ধারার গান লেখেন। কাজী নজরুল ইসলাম জেলে বসে লেখেন 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'। সত্যেন সেন লেখেন 'অভিশপ্ত নগরী' ও 'পাপের সন্তান'; মুনীর চৌধুরীর 'কবর' এগুলো কারা-সাহিত্য হিসেবে গণ্য। রাজনীতিবিদ শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বা 'কারাগারের রোজনামচা', মতিয়া চৌধুরীর 'দেয়াল দিয়ে ঘেরা' ইত্যাদিও এই ধারার গ্রন্থ।

এককথায় প্রকাশ বা বাক্য সংকোচন

অতির সমীপে = সমক্ষ
অতির অভিমুখে = প্রত্যক্ষ
অতির অগোচরে = পরোক্ষ
চতুর সম্মুখে সংঘটিত = চাক্ষুষ
অক্ষি পত্রের (চোখের পাতা) লোম = অক্ষিপক্ষ্ম
চোখের কোণ = অপাঙ্গ
অতিতে কাম যার (যে নারীর) = কামাক্ষী
পতের ন্যায় অক্ষি বা চোখ = পুণ্ডরীকাক্ষ

পঁচিশ বছর পূর্ণ হওয়ার উৎসব = রজত জয়ন্তী
পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হওয়ার উৎসব = সুবর্ণ জয়ন্তী
ষাট বছর পূর্ণ হওয়ার উৎসব = হীরক জয়ন্তী
একশত পঞ্চাশ বছর = সার্ধশতবর্ষ

সৃষ্টি করার ইচ্ছা = সিসৃক্ষা
যে রূপ ইচ্ছা = যদৃচ্ছা
দেখবার ইচ্ছা = দিদৃক্ষা
জানবার ইচ্ছা = জিজ্ঞাসা
হনন করার ইচ্ছা = জিঘাংসা
সেবা করার ইচ্ছা = শুশ্রূষা
ভোজন করার ইচ্ছা = বুভুক্ষা
লাভ করার ইচ্ছা = লিপ্সা
প্রবেশ করার ইচ্ছা = বিবক্ষা
পান করার ইচ্ছা = পিপাসা
নিন্দা করার ইচ্ছা = জুগুপ্সা
রমণের ইচ্ছা = রিরংসা
করার ইচ্ছা = চিকীর্ষা
প্রতিকার করার ইচ্ছা = প্রতিচিকীর্ষা
অনুকরণ করার ইচ্ছা = অনুচিকীর্ষা
অপকার করার ইচ্ছা = অপচিকীর্ষা
অনুসন্ধান করার ইচ্ছা = অনুসন্ধিৎসা
জয় করার ইচ্ছা = জিগীষা
বিজয় লাভের ইচ্ছা = বিজিগীষা
গমন করার ইচ্ছা = জিগমিষা
উদক (জল) পানের ইচ্ছা = উদন্যা
ক্ষমা করার ইচ্ছা = চিক্ষমিষা
বেঁচে থাকার ইচ্ছা = জিজীবিষা
ত্রাণ লাভ করার ইচ্ছা = তিতীর্ষা
দান করার ইচ্ছা = দিৎসা
রোদন করতে ইচ্ছা = রুরুদিষা

নির্মাণ করার ইচ্ছা = চিনির্মিষা
হিংসা করার ইচ্ছা = জিঘাংসা
প্রতিবিধান করার ইচ্ছা = চিকিৎসা
বাদ করার ইচ্ছা = বিবাদিষা
মুক্তি পেতে ইচ্ছা = মুমুক্ষা
হিত করার ইচ্ছা = হিতেষা

মযূরের ডাক = কেকা
কোকিলের ডাক = কূজন
সিংহের নাদ (ডাক) = গর্জন
রাসভের (গর্দভ) কর্কশ ডাক = চেক্কার
হাতির ডাক = বৃংহণ বা বৃংহিত
কুকুরের ডাক = বুক্কন
অশ্বের ডাক = হ্রেষা
পেঁচা বা উলূকের ডাক = ঘুঘুকার
মোরগের ডাক = শকুনিনাদ

আনন্দজনক ধ্বনি = মঞ্জিমোষ
আনন্দের আতিশয্যে সৃষ্ট কোলাহল = হরষ
গম্ভীর ধ্বনি = মন্দ্র
অলঙ্কারের ধ্বনি = শিঞ্জন
ঝনঝন শব্দ = ঝনৎকার
বিহঙ্গের ধ্বনি = কাকলি
বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি = ঝংকার
নূপুরের ধ্বনি = নিক্কণ
ধনুকের ধ্বনি = টঙ্কার
শুকনো পাতার শব্দ = মর্মর
ভ্রমরের শব্দ = গুঞ্জন
সমুদ্রের ঢেউ = ঊর্মি
সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ = কল্লোল
বীরের গর্জন = হুঙ্কার

বাঘের চর্ম = কৃত্তি
হরিণের চর্ম = অজিন
হরিণের চর্মের আসন = অজিনাসন

হাতির শাবক (বাচ্চা) = করভ
ব্যাঙের ছানা = ব্যাঙাচি
সাপের খোলস = নির্মোক বা কঞ্চুক

Scanned with CamScanner

যে নারীর বিয়ে হয় না = অনূঢ়া

(আইবুড়ো অর্থে)

যে নারীর নখ শূর্পের (কুলা) মত = শূর্পণখা
যে নারীর অসূয়া (হিংসা) নেই = অনসূয়া
যে নারীর দুটি মাত্র পুত্র = দ্বিপুত্রিকা
যে নারীর স্বামী (ভর্তা) বিদেশে থাকে =
প্রোষিতভর্তৃকা
যে নারীর পঞ্চ স্বামী = পঞ্চভর্তৃকা
যে নারীর সতীন/শত্রু নেই = নিঃসপত্ন
যে নারীর সন্তান হয় না = বন্ধ্যা
যে নারীর সন্তান বাঁচে না = মৃতবৎসা
যে নারীর স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করেছে =
অধিবিন্না

যে নারীর হাসি সুন্দর = সুস্মিতা
যে নারীর হাসি কুটিলতাবর্জিত = অচিন্মিতা
যে মেয়ের বয়স দশ বৎসর = কন্যকা
কুমারীর পুত্র = কানীন
নারীর লীলাময়ী নৃত্য = লাস্য
উত্তম বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত নটীগণের নৃত্য
= গৌরত
অবিবাহিতা জ্যেষ্ঠা থাকায় পরও যে কনিষ্ঠার
বিয়ে হয় = অমোদিনি

পুরুষের উদ্দাম নৃত্য = তাণ্ডব
যে (পুরুষ) দ্বার পরিগ্রহ করে নি = অকৃতদার
যে (পুরুষ) দ্বার পরিগ্রহ করেছে = কৃতদার
যে (পুরুষ) প্রথম স্ত্রী জীবিত থাকতে দ্বিতীয়
দার পরিগ্রহ করেছে = অধিবেত্তা
(যে পুরুষ) পত্নী সহ বর্তমান = সপত্নীক
(যে পুরুষ) স্ত্রীর বশীভূত = স্ত্রৈণ
যে পুরুষের স্ত্রী বিদেশে থাকে =
প্রোষিতপত্নীক বা প্রোষিতভার্য
যে পুত্রের মাতা কুমারী = কানীন

যে বৃক্ষের ফল হয় কিন্তু ফুল হয় না = বনস্পতি
যে গাভি প্রসবও করে না, দুধও দেয় না =
গোবশা

যে মেঘে প্রচুর বৃষ্টি হয় = সংবর্ত
দিনের পূর্ব ভাগ = পূর্বাহ্ণ
দিনের মধ্য ভাগ = মধ্যাহ্ন
দিনের অপর ভাগ = অপরাহ্ণ
দিনের সায় (অবসান) ভাগ = সায়াহ্ন
প্রায় প্রভাত হয়েছে এমন = প্রভাতকল্প
রাত্রির প্রথম ভাগ = পূর্বরাত্র

মুখের সাহায্যে (এঁকে বেঁকে) চলে যে =
ভুজগ/ভুজঙ্গ(সর্প)
পা দিয়ে যে চলে না = পন্নগ (সর্প)
উরস (বক) দিয়ে হাঁটে যে = উরগ (সর্প)
লাফিয়ে চলে যে = প্লবগ (ব্যাঙ/কানর)
দ্রুতি গমন করতে পারে যে = তুরগ (ঘোড়া)
বিহায়সে (আকাশে) বিচরণ করে যে =
বিহগ/বিহঙ্গ
পরকে (কোকিল শাবক) পালন করে যে =
পরভৃত (কাক)
পরের (কাকের) দ্বারা প্রতিপালিত যে =
পরভৃত (কোকিল)

যে নারী অতি উজ্জ্বল ও ফর্সা = মহাশ্বেতা
যে নারী আনন্দ দান করে = বিনোদিনী
যে নারী কহনপ্রিয় = খাতানী
যে নারী (বিবাহিত বা অবিবাহিত) চিরকাল
পিতৃগৃহবাসিনী = চিরণ্টী
যে নারীর সহবাসে মৃত্যু হয় = বিষকন্যকা
যে নারী বীর = বীরাঙ্গনা
যে নারী বার (সমূহ) গামিনী = বারাঙ্গনা
যে নারী শিশুসন্তানসহ বিধবা = বালপুত্রিকা
যে নারী অঘটন ঘটাতে পারদর্শী =
অঘটনঘটনপটিয়সী
যে নারী সূর্যকে দেখে না (অন্তঃপুরে থাকে) =
অসূর্যম্পশ্যা
যে নারী একবার সন্তান প্রসব করেছে =
কাকবন্ধ্যা
যে নারী পূর্বে অন্যের স্ত্রী ছিল = অন্যপূর্বা
যে নারী চিত্রে অর্পিতা বা নিবদ্ধা = চিত্রার্পিতা
যে নারী (বা গাভী) দুগ্ধবতী = পয়স্বিনী
যে নারী প্রিয় বাক্য বলে = প্রিয়ংবদা
যে নারী স্বয়ং পতি বরণ করে = স্বয়ংবরা
যে নারী বীর সন্তান প্রসব করে = বীরপ্রসূ
যে নারী দেহ সৌষ্ঠব সম্পন্না = অঙ্গনা
যে নারী সুন্দরী = রামা
যে নারী সাগরে বিচরণ করে = সাগরিকা
যে নারী অপরের দ্বারা প্রতিপালিতা =
পরভৃতা বা পরভৃতিকা
যে নারীর স্বামী ও পুত্র জীবিত =
বীরা বা পুত্রঙ্গী
যে নারীর স্বামী ও পুত্র মৃত = অবীরা
যে নারীর (মেয়ের) বিয়ে হয় নি = কুমারী
যে নারীর বিয়ে হয়েছে = উঢ়া
যে নারীর সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে = নবোঢ়া

রাত্রির মধ্যভাগ = মহানিশা
রাত্রির শেষভাগ = পররাত্র
রাত্রির তিনভাগ একত্রে = ত্রিযামা
রাত্রিকালীন যুদ্ধ = নৌক্তিক
যার ইচ্ছা (চেষ্টা) নেই = নিরীহ
যার নেশপাস সংযুত নয় = অসংযুত
যার অন্য কোনো উপায় নেই = অনন্যোপায়
যার দাঁড়ি গোঁফ উঠে নি = অজাতশ্মশ্রু
যার পুত্র নেই = অপুত্রক
যার দুটি মাত্র দাঁত = দ্বিরদ (হাতি)
যার উপস্থিত বুদ্ধি আছে = প্রত্যুৎপন্নমতি
যার নরম্বাহের (শূকর) মতো মুখ = বরাহমুখ
যার সব কিছু হারিয়েছে = হৃতসর্বস্ব
যার দুবার জন্ম হয় = দ্বিজ
যার দুহাত সমান চলে = সব্যসাচী
যার শুভ ক্ষণে জন্ম = ক্ষণজন্মা
যার পূর্বজন্মের কথা স্মরণ আছে = জাতিস্মর
যার দুই দিক বা চার দিকে জল = দ্বীপ
যার চারদিকে স্থল = হ্রদ
যার বংশ পরিচয় বা স্বভাব কেউই জানে না =
অজ্ঞাতকুলশীল

যার কোনো তিথি নেই = অতিথি
যার অর্থ নেই = অর্থহীন
যিনি অতিশয় হিসাবি = প্যাটোয়ারি
যিনি বক্তৃতা দানে পটু = বাগ্মী
যাকে আদর করা হচ্ছে = আদ্রিয়মাণ
যাকে পীড়া দেয়া হয়েছে = পীড্যমান
অন্যের অপেক্ষা করতে হয় না যাকে =
অনপেক্ষ

দমন করা যায় না যাকে = অদম্য
দমন করা কষ্টকর যাকে = দুর্দমনীয়
দেখে চোখের আশা মেটে না যাকে =
অতৃপ্তদৃশ্য

যে পরের গুণেও দোষ ধরে = অসূয়ক
যে অগ্র-পশ্চাৎ চিন্তা না-করে কাজ করে =
অবিমৃশ্যকারী

যে সমাজের (বর্ণের) অন্তর্দেশে জন্ম = অন্ত্যজ
যে-শিশু আটমাসে জন্মগ্রহণ করেছে = আটাসে
যে আপনাকে হত্যা করে = আত্মঘাতী
যে সুপথ থেকে কুপথে যায় = উন্মার্গগামী
যে আকৃষ্ট হচ্ছে = কৃষ্যমাণ
যে অপরের লেখা চুরি করে নিজনামে চালায়
= কুম্ভীলক

যে দিন তিন তিথির মিলন ঘটে = ত্র্যহস্পর্শ

যে চির নিদ্রোপগত = চিরনিদ্রিত
যে আপনাকে পণ্ডিত মনে করে = পণ্ডিতম্মন্য
যে আপনাকে কৃতার্থ মনে করে = কৃতার্থম্মন্য
যে অন্য দিকে মন দেয় না = অনন্যমনা
যে বিদ্যা লাভ করেছে = কৃতবিদ্য
যে গমন করে না = নগ্য (পাহাড়)
যে সন্তান পিতার মৃত্যুর পর জন্মে =
মরণোত্তরজাতক
যে রোগ নিবারণ করতে হাতুড়িয়ে চিকিৎসা = হাতুড়ে
যে ক্রমাগত রোদন করছে = রোরুদ্যমান
যে বন হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ = শ্বাপদসঙ্কুল
যে বন শুকিয়ে এসেছে = বনশুষ্ক
যে সর্বত্র গমন করে = সর্বগ
যে গৃহের বাইরে ব্যভিচারে রত
ভালোবাসে = বহির্মনা
যে জমিতে ফসল জন্মায় না = উষর
যে জমিতে দুবার ফসল হয় = দো-ফসলি
যেখানে মৃতজন্তু ফেলা হয় = আগাড় / উপলা
যে আলো রঙ্গমঞ্চে অভিনেতার পায়ের কাছে
স্থাপন করা হয় = পাদপ্রদীপ
যে আলোতে কুমুদ ফোটে = কৌমুদী
(জোছনা)
যে বিষয়ে কোনো বিতর্ক নেই = অবিসংবাদী
যে গাঁজায় নেশা করে = গেঁজেল

যা অতিক্রম করা যায় না = অনতিক্রম্য
যা অস্ত যাচ্ছে = অস্ত্যমান
যা বচন / বাক্যে প্রকাশযোগ্য নয় = অনির্বচনীয়
যা পূর্বে দেখা যায় নি = অদৃষ্টপূর্ব
যা পূর্বে ছিল এমন নেই = ভূতপূর্ব
যা পূর্বে কখনো হয় নি = অভূতপূর্ব
যা অপনয়ন (দূর) করা যায় না = অনপনেয়
যা অপনয়ন (দূর) করা কষ্টকর = দুরপনেয়
যা পূর্বে শোনা যায় নি = অশ্রুতপূর্ব
যা পূর্বে চিন্তা করা যায় নি = অচিন্তিতপূর্ব
যা প্রতিরোধ করা যায় না = অপ্রতিরোধ্য
যা উচ্চারণ করা যায় না = অনুচ্চার্য
যা উচ্চারণ করা কঠিন = দুরুচ্চার্য
যা অনুভব করা হচ্ছে = অনুভূয়মান
যা আগুনে পোড়ে না = অগ্নিসহ
যা ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে = অপসৃয়মাণ
যা বহন করা হচ্ছে = নীয়মান
যা বলা হচ্ছে = বক্ষ্যমাণ
যা উপলব্ধি করা যাচ্ছে = উপলভ্যমান

Scanned with CamScanner

যা ক্রয় করার যোগ্য = ক্রেয়
যা বিক্রয় করার যোগ্য = বিক্রেয়
যা জল দেয় = জলদ (মেঘ)
যা ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে = ক্ষীয়মাণ
যা ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে = ক্ষীয়মাণ
যা ক্রমশ বিস্তীর্ণ হচ্ছে = ক্রমবিস্তার্যমান
যা চুষে খাবার যোগ্য = চোষ্য
যা চিবিয়ে খাবার যোগ্য = চর্ব্য
যা চেটে খাবার যোগ্য = লেহ্য
যা পান করার যোগ্য = পেয়
যা মুছে ফেলা যায় না = দুর্মোচ্য
যা সহজে জানা যায় না = দুর্জ্ঞেয়
যা পুনঃ পুনঃ নীতি পাচ্ছে = দেদীপ্যমান
যা পুনঃ পুনঃ দুলছে = দোদুল্যমান
যা পলা-বাঁধা নূরীকৃত করে = বিশল্যকরণী
যা প্রমাণ করা যায় না = অপ্রমেয়
যা মাটি ভেদ করে ওঠে = উদ্ভিদ
যা আঘাত পায় নি = অনাহত
যা আহত (ডাকা) হয় নি = অনাহূত
যা নীতি পাচ্ছে = দেদীপ্যমান
যা কষ্টে জয় করা যায় = দুর্জয়
যা কষ্টে লাভ করা যায় = দুর্লভ
যা বলা হয় নি = অনুক্ত
যা কথায় যোগ্য নয় = অকথ্য
যা প্রকাশ করা হয় নি = অব্যক্ত
যা অতি দীর্ঘ নয় = নাতিদীর্ঘ
যা কোথাও উঁচু কোথাও নিচু = বন্ধুর
যা খুব শীতল বা উষ্ণ নয় = নাতিশীতোষ্ণ
যা ধারণ বা পোষণ করে = ধর্ম
যা নিজের দ্বারা অর্জিত = স্বোপার্জিত

অকর্মণ্য গবাদি পশু রাখার স্থান = পিঁজরাপোল
অকালে উৎপন্ন কুমড়া = অকালকুষ্মাণ্ড
অগ্রহায়ণ মাসে সন্ধ্যাকালীন ব্রত (কুমারীদের) = সেঁজুতি
অতিশয় ঘটা বা জাঁকজমক = বহ্বাড়ম্বর
অধর-প্রান্তের হাসি = বক্রোষ্ঠিকা
অনশনে মৃত্যু = প্রায়
অভ্রান্ত জ্ঞান = প্রমা
অন্যের মনোরঞ্জনের জন্য অসত্য ভাষণ = উপচার
আশীর্বাদ ও অভয়দানসূচক হাতের মুদ্রা = বরাভয়
আশ্বিনমাসের পূর্ণিমা তিথি = কোজাগর
ইতস্তত গমনশীল বা সঞ্চরণশীল = বিসর্পী
উচ্চস্থানে অবস্থিত ক্ষুদ্র কুটির = টঙি
ঋণ শোধের জন্য যে ঋণ করা হয় = ঋণান্তর
এক বস্তুতে অন্য বস্তুর কল্পনা = অধ্যাস
ঐতিহাসিককালেরও আগের = প্রাগৈতিহাসিক
কথার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রসঙ্গ বা প্রবন্ধনানি = প্রাহোণ = ঈষাণ
কাচের তৈরি বাড়ি = শিশমহল
প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার মতো অবস্থা = লংজান
বন্দুক বা তির ছোঁড়ার অনুশীলনের জন্য স্থাপিত লক্ষ্য = চাঁদমারি
হস্ত, অশ্ব, রথ, পদাতিকের সমাহার = চতুরঙ্গ
সূর্যোদয় থেকে পরবর্তী সূর্যোদয় পর্যন্ত = সাবন
সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্ববর্তী দুই দণ্ডকাল = প্রাজ্ঞমুহূর্ত
পুণ্যকর্ম সম্পাদনের জন্য শুভ দিন = পুণ্যাহ
আকাশ ও পৃথিবী বা স্বর্গ ও মর্ত্য = ক্রন্দসী
আকাশ ও পৃথিবীর অন্তরাল = রোদসী
ভুলহীন ঋষি বাক্য = আর্ষবাক্য
বোঁটা ছাড়া কোনো আম = আমশি
নীল বর্ণ পদ্ম = ইন্দিবর
রক্ত বর্ণ পদ্ম = কোকনদ
শ্বেত বর্ণ পদ্ম = পুণ্ডরীক
পদ্মের ডাঁটা বা নাল = মৃণাল
পদ্মের ঝাড় বা মৃণালসমূহ = মৃণালিনী
ইন্দ্রের অশ্ব = উচ্চৈঃশ্রবা
ক্ষমার যোগ্য = ক্ষমার্হ
প্রশংসার যোগ্য = প্রশংস্যার্হ
স্মরণের যোগ্য = স্মরণার্হ
ধন্যবাদের যোগ্য = ধন্যবাদার্হ
ঈষৎ উষ্ণ = কবোষ্ণ
গুরুর বাসগৃহ = গুরুকুল
মাপের যোগ্য = মেয়
গদ্যপদ্যময় কাব্য = চম্পূ
সদ্য দোহনকৃত উষ্ণ দুধ = ধাঁরোষ্ণ
পূর্ব ও পরের অবস্থা = পৌর্বাপর্য
পুরুষের কর্ণভূষণ = বীরবৌলি
নারীর কটিভূষণ = রশনা
নারীর কোমরবেষ্টনিভূষণ = মেখলা
পুরুষের কটিবন্ধ = সরাসন
গ্রহণের জন্য উপুড় হামাগুড়ি প্রদান = হুমড়ি
রাহু বা রাস্তায় ডাকাতি = রাহাজানি
তৃণাচ্ছাদিত ভূমি = শাদ্বল
মাসের শেষ দিন = সংক্রান্তি

সৈন্যদলের বিশ্রাম নিবির = স্কন্ধাবার
ঘুম হতে জাত = ঘুমন্ত
নিতান্ত পক্ষ হয় যে সামান্য (মাসকলা) = নিমাষ
রাত্র (জাগল)কে গ্রাস করে যা = অজগর
ব্রত (মেঘ) দেহন / স্পর্শ করে যা = অভ্রলিহ
অকালোপক্ক হয়েছে যে = অকালপক্ক
গ্রহকোর নেই যার = নিরহংকার
অদৃতে (পা পশ্চাতে) জন্মেছে যে = অনুজ
প্রতিজ্ঞাভঙ্গ অভাব আছে যার = অনৃতিক
অন্য গতি নাই যার = অগত্যা
অশ্ব-রথ-হস্তী-পদাতিক সৈন্যের সমাহার = চতুরঙ্গ
ধানাদি পশুর চর্বিত চর্বণ বা রোমন্থন = জাবর
অষ্টপ্রহর (সারা দিন) ব্যাপিয়ে যা = আষ্টপৌরে
প্রস্তরে জল আছে এমন যে (নদী) = অন্তঃসলিলা
অন্তরে যা ঈক্ষণ (দেখার) যোগ্য = অন্তরিক্ষ
অভিজাতাপূর্ণ মনে হলেও আসলে অর্থহীন ও বিভ্রান্তিকর = হিংটিংছট
আচারে নিষ্ঠা আছে যার = আচারনিষ্ঠ
আপনাকে কেন্দ্র করে চিন্তা = আত্মকেন্দ্রিক
আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত = আদ্যোপান্ত

দুয়ের মধ্যে একটি = অন্যতর
ঘুরে থাকে যে = পৌর্বাহ্নিক
চুরি করার উদ্দীপন বাতিক = চৌর্যোন্মাদ

মানাবাজিকে অভ্যর্থনার জন্য কিছুদূর এগিয়ে যাওয়া = প্রত্যুদ্গমন
মান্যব্যক্তি বিদায়কালে কিছুদূর এগিয়ে দেওয়া = অনুব্রজন
মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে এমন = উপাবৃত্ত
মৃত্তিকার দ্বারা নির্মিত = মৃন্ময়

ইন্দ্রকে জয় করেন যিনি = ইন্দ্রজিৎ
ইন্দ্রিয়কে জয় করেন যিনি = জিতেন্দ্রিয়
ইতিহাস রচনা করেন যিনি = ঐতিহাসিক
ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি = ইতিহাসবেত্তা
স্বার্থের জন্য অন্যায় অর্থ প্রদান (ঘুষ) = উপদা

উপদেশ ছাড়া লব্ধ প্রথম জ্ঞান = উপজ্ঞা
উপকারীর উপকার স্বীকার করে যে = কৃতজ্ঞ
উপকারীর উপকার স্বীকার করে না যে = অকৃতজ্ঞ
উপকারীর অপকার করে যে = কৃতঘ্ন
কি করতে হবে তা বুঝতে না পারা = বিবেকবিলিন্দ্য
কোনো কিছু খেলেই যার ভয় ওঠে = অকৃতোদ্যম
কর্ম সম্পাদনে পরিশ্রমী = কর্মঠ
কোনো ভাবেই যা নিবারণ করা যায় না = অনিবার্য
কাজে যার অভিজ্ঞতা আছে = কর্মকুশলী
গবাদি পশুর চিরন্তন স্থান = গোষ্পদ

ঘরের অভাব = হা-ঘর

চৈত্র মাসে উৎপন্ন ফসল = চৈতালি
পৌষ মাসে উৎপন্ন ফসল = পৌষালি
হেমন্তকালে উৎপন্ন ফসল = হৈমন্তিক
ফুলছে যে অর্চি (শিখা) = ফুলদর্চি
পত্নী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও পুনর্বিবাহ = অধিবেদন
পত্নীর সাথে বর্তমান = সপত্নীক
পদ্ধতিতে বসার অনুপযুক্ত = অপাঙ্‌ক্তেয়
পা ধোয়ার জল = পাদ্য
পা থেকে মাথা পর্যন্ত = আপাদমস্তক

স্বপ্নে (ঘুমে) শিশুর স্বগত হাসি-কান্না = দেয়ালা
মাছিও প্রবেশ করে না যেখানে = নির্মক্ষিক
বড় ভাই থাকতে ছোট ভাইয়ের বিয়ে = পরিবেদন
শোনামাত্র যার মনে থাকে = শ্রুতিধর
স্বামীর চিতায় পুড়ে মরা = সহমরণ
স্নান গ্রহণ করা হয়েছে এমন = স্নাপিত
ধর্মীয় কাজ করার জন্য তীর্থভ্রমণ = প্রব্রজ্যা
ধর্মপুরুষ বা সন্ন্যাসীর পর্যটন = পরিব্রাজন
যুদ্ধ থেকে যে বীর পালায় না = সংশপ্তক
জয়ের জন্য যে উৎসব = জয়ন্তী
ফল পাকলে যে গাছ মরে যায় = ওষধি
যে সব গাছ থেকে ঔষধ প্রস্তুত হয় = ঔষধি
ফেলে দেবার যোগ্য = ফেলনা
ছেঁকে পরিষ্কার বা শোধন করা হয়েছে = পরিস্রুত
বহু গৃহ থেকে ভিক্ষা সংগ্রহ করা = মাধুকরী/মধুকরী

Scanned with CamScanner

বাংলা-বিদ্যার
মৌলিকজ্ঞান
কোষগ্রন্থ

বাংলা
ভাষা ও সাহিত্য
জিজ্ঞাসা

Scanned with CamScanner

বেশি কথা বলে যে = বাচাল
নদীর মাঝে একটি = অন্যতম

এক থেকে চার করে = একাদিক্রমে
স্তন স্পর্শ করা যায় না = যা = অস্তনন্ধয়ী
ছোটদের লেখার তালপাতার ছাব্বা বা ছাড়া = পাতাড়ি

নষ্ট হওয়া স্বভাব যার = নষ্টস্বভাব
মাথা (ছুল) ছাটেন না যে = অমাথিক
ভবিষ্যতে ভবিষ্যতে যজ্ঞ করেন যিনি = ঋত্বিক
অবস্থায় নাচে উঁচু করেন যিনি = উদ্ধ্বাসিক
জলে ৩ ছলে চরে যে = উভচর
অল্প-বাজনা ছাড়া অন্য আহার্য = জলপান
জলপানের জন্য দেয় অর্থ = জলপানি (বৃত্তি)
ফুল ফুল ভবছে যা = জাতুল্যমান
জীবিত থেকেও যে মৃত = জীবন্মৃত

আকাশে (ক-তে) চরে যে = কপোত
আকাশে (খ-তে) চরে যে = খেচর / খচর
আকাশে (খ-তে) ওড়ে যে বাজি = খ-ধূপ
ছেড়িয়ে ভাকাতি করে যারা = ঠ্যাঙাড়ে
ধুব (তীক্ষ্ণ বুদ্ধি) ধারণ করে যে = ধুরন্ধর
ন্যায় শাস্ত্র জানেন যিনি = নৈয়ায়িক
শত্রুকে ভয় করেন যিনি = পরন্তপ বা শত্রুজিৎ
শত্রুকে হত্যা করেন যিনি = শত্রুঘ্ন
সকলের মধ্যে প্রবীণ বা জ্যেষ্ঠ = সার্বজনীন
সকলের জন্য হিতকর বা মঙ্গলজনক = সর্বজনীন
সমুদ্র থেকে হিমালয় পর্যন্ত = আসমুদ্রহিমাচল
সূর্য হতে কোনো গ্রহকক্ষের সর্বদূরবর্তী বিন্দু = অপসূর
স্বমত অন্যের উপর চাপিয়ে দেয় যে = স্বৈরাচারী

সরোবরে জন্মে যা = সরোজ
সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস নাই যার = নাস্তিক
সব কিছু সহ্য করেন যিনি = সর্বংসহা
যুদ্ধে স্থির থাকেন যিনি = যুধিষ্ঠির
অরিকে দমন করে যে = অরিন্দম
বিশেষ খ্যাতি আছে যার = বিখ্যাত
আয়ুর পক্ষে হিতকর = আয়ুষ্য
স্তন্য পান করে যে = স্তন্যপায়ী
সর্বত্র গমন করেন যিনি = সর্বগ
ঈষৎ আমিষ গন্ধ যার = আঁষটে

ইন্দ্রজাল (জাদু) বিদ্যায় পারদর্শী = ঐন্দ্রজালিক
যিনাদের ইজ্জায় নায়ক বা নায়িকার সঙ্গে = ছাদে যমন = অভিসার
সূর্যের ভ্রমণপথের অংশ বা পরিমাণ = অয়ন
বেশম দিয়ে নির্মিত = রেশমি
লবণ জল মেওয়া হয়েছে এমন = আমুন
হাতির পিঠে আরোহী বসার স্থান = হাওদা
হিত ইচ্ছা করে যে = হিতৈষী
হরেক রকম বলে যে = হরবোলা

ক্ষুদ্র হাঁস = পাতিহাঁস
ক্ষুদ্র শিয়াল = খেঁকশিয়াল
ক্ষুদ্র লেবু = পাতিলেবু
ক্ষুদ্র লতা = লতিকা
ক্ষুদ্র রাজা = রাজড়া
ক্ষুদ্র বধ = রথাভর্ক
ক্ষুদ্র প্রলয় = খণ্ডপ্রলয়
ক্ষুদ্র মৃৎপাত্র = ভাঁড়
ক্ষুদ্র চিহ্ন = বিন্দু
ক্ষুদ্র বিন্দু = ফুটকি
ক্ষুদ্র বাগান = বাগিচা
ক্ষুদ্র ফোঁড়া = ফুসকুড়ি
ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড = নুড়ি
ক্ষুদ্র নালা = নালি
ক্ষুদ্র নাটক = নাটিকা
ক্ষুদ্র নদী =সারণি
ক্ষুদ্র ঢাক বা ঢাক জাতীয় বাদ্যযন্ত্র = নাকাড়া
ক্ষুদ্র জাতীয় বক = বলাক
ক্ষুদ্র জাতীয় বকের শ্রেণি = বলাকা
ক্ষুদ্র গ্রাম = পল্লি
ক্ষুদ্র গাছ = গাছড়া
ক্ষুদ্র কূপ = পাতকুয়া
ক্ষুদ্রকায় ঘোড়া = টাট্টু
ক্ষুদ্র বা নিচু কাঠের আসন = পিঁড়ি
ক্ষুদ্র অঙ্গ = উপাঙ্গ

হাতের প্রথম আঙুল (গুড়ো আঙুল) = অঙ্গুষ্ঠ
হাতের দ্বিতীয় আঙুল = তর্জনী
হাতের তৃতীয় আঙুল = মধ্যমা
হাতের চতুর্থ আঙুল = অনামিকা
হাতের পঞ্চম আঙুল = কনিষ্ঠা
হাতের তেলো বা তালু = করতল
হাতের কব্জি = মণিবন্ধ
হাতের কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত অংশ = প্রকোষ্ঠ
হাতের কব্জি থেকে আঙুলের ডগা পর্যন্ত = পাণি

Partha Kumar Mondal
Dept of EEE
Varendra University

বাগধারা

অঞ্জলি বন্ধ (আয়ু বা সময় শেষ হওয়া) : প্রাচীনপন্থি বর্ষক উপাসনের অংশ বৃদ্ধ হলেও পৃথিবী থেকে মানুষের সহজে **অঞ্জলি বন্ধ** হচ্ছে না।

অষ্টমঙ্গলা (আনন্দের বেশ থাকাবস্থা) : **অষ্টমঙ্গলার** আগেই নববধূ মৌটুকের বলি হলো।

অকটবিকট (ছটফটানি) : বিপদ আসার আগেই এমন **অকটবিকট** করলে চলবে কেন?

অকড়িয়া (ধনহীন) : তার মতো **অকড়িয়া** লোকের কাছে ধার চেয়ে লাভ নেই।

অকালকুসুম (অসম্ভব জিনিস) : **অকালকুসুম** আশা কোরো না, তাতে তোমার দুঃখই বাড়বে।

অকালপক্ব (ইঁচড়ে পাকা) : এমন **অকালপক্ব** ছেলেকে যে সবাই অপছন্দ করবে সেটাই তো স্বাভাবিক।

অকাল বোধন (অসময়ে আবির্ভাব) : তার আসার কথা আগামী দিন, আজ এসেছে; এমন **অকাল বোধনের** কারণ কী?

অগত্যা মধুসূদন (অনন্যোপায় হয়ে) : তার অনুরোধ এড়াতে পারলাম না; **অগত্যা মধুসূদন**, যেতেই হলো।

অগস্ত্য যাত্রা (শেষ বিদায়) : পরীক্ষায় ফেল করার পর তামান্না মাথা নত করে সেই যে গেল, সেটাই তার **অগস্ত্য যাত্রা** হলো।

অঙ্কুশ-তাড়না (অন্তর্গত আঘাত) : সব সময়ই বিবেকের **অঙ্কুশ-তাড়না** অনুভব করছি।

অজগর বৃত্তি (আলসেমি) : এই **অজগর বৃত্তির** জন্যেই তার কোনো উন্নতি হলো না।

অঞ্চলপ্রভাব (স্ত্রীর প্রভাব) : যতই দাপট দেখাক, ঘরে **অঞ্চলপ্রভাব** সে মোটেই কাটিয়ে উঠতে পারে না।

অনন্তশয্যা (শেষ শয্যা) : আমাকে ডাকলেই হতো- আমি তো আর **অনন্ত শয্যায়** শুয়ে ছিলাম না।

অন্ধিসন্ধি (ফাঁকফোকর) : এই ব্যবসার **অন্ধিসন্ধি** কেবল তারই জানা আছে।

অপোগণ্ড (অকর্মণ্য/অপ্রাপ্ত বয়স্ক) : এমন **অপোগণ্ড** লোকের উপর নির্ভর করা যায় না।

অবরেসবরে (কালে-ভদ্রে) : সে **অবরেসবরে** গ্রামের বাড়িতে যায়।

অমন্ত্র-তন্ত্র (উপায় অবলম্বন) : তখন শাশুড়ি সন্তানের জন্যে এমন **অমন্ত্র-তন্ত্র** অবস্থা।

অশ্বমেধ যজ্ঞ (বিপুল আয়োজন) : ছেলের মুখে ভাতে তুমি দেখছি **অশ্বমেধ যজ্ঞ** করে ফেলেছ!

অষ্টকপাল (হতাশা) : অমন মতো **অষ্টকপাল** হোসের আকল কি না হবে!

অষ্টরম্ভা (কাজকাজ/কাঁকি) : অনেক কিছু কিছু শেখা, কিন্তু আমি শেখাব **অষ্টরম্ভা**।

অসূর্যম্পশ্যা (ঘরে অন্তরীণ) : মেয়েকে **অসূর্যম্পশ্যা** করে রাখলেই কি শাইতের প্রভাব আটকানো যাবে?

অস্থির পঞ্চাশ, অস্থির পঞ্চাশ (বিশৃঙ্খলাকারী) : আমি এখন **অস্থির পঞ্চাশে** পড়েছি, কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।

অক্ষরে অক্ষরে (সম্পূর্ণভাবে) : অভিযোগের কথাটা **অক্ষরে অক্ষরে** ফলেছে।

অ আ ক খ (প্রাথমিক জ্ঞান) : তুমি যে বিজ্ঞানের **অ আ ক খ** জানো না, এ নিয়েই করবে কী?

অকাল কুষ্মাণ্ড (অপদার্থ) : তুমিও একটা **অকাল কুষ্মাণ্ড**, এর দ্বারা কিছু হবে না।

অক্ষের যষ্টি (অপরিহার্য অবলম্বন) : শেষ বয়সে নাতিটিই বুড়ির **অক্ষের যষ্টি** হয়ে রইল।

অকালের বাদলা (অপ্রত্যাশিত বাধা) : **অকালের বাদলার** মতো বৈদ্যুতিক আলো ছুলে গিয়ে সমস্ত আনন্দটাই নষ্ট করে দিল।

অক্ষয় বট (প্রাচীন বস্তু) : বুড়ো বেঁচে আছে **অক্ষয় বট** হয়ে।

আগড়ম বাগড়ম (অর্থহীন কথা) : তোমার **আগড়ম বাগড়ম** বন্ধ করো, আসল কথা বলো।

অগ্নিশর্মা (ক্ষিপ্ত) : ছেলের অকৃতকার্যতার কথা শুনে বাবা **অগ্নিশর্মা** হয়ে উঠলেন।

অঙ্গ জল হওয়া (শীতল) : গামছার মোসাহেবিতে সাহেবের **অঙ্গ জল** হলো।

অতি দর্পে হত লঙ্কা (অহংকারে পতন) : শক্তির বড়াই করা ভাল না, তাতায় আছে **অতি দর্পে হত লঙ্কা**।

Scanned with CamScanner

অদৃষ্টের পরিহাস (ভাগ্যের বিড়ম্বনা) : অদৃষ্টের পরিহাস, দুর্ঘটনায় দারুণভাবে বাবা-মা দুজনেই মারা গেলেন।

অন্তর টিপুনি (গোপন ইশারা) : তুমির কথার অন্তর টিপুনি বোঝার সাধ্য আমার নেই।

অতি চালাকের গলায় দড়ি (বেশি চালাকির অন্তত পরিণাম) : সব কাজেই তোমার বাঁড়ি মেয়ের স্বভাব, জানো তো অতি চালাকের গলায় দড়ি পড়ে।

অর্থচন্দ্র দেয়া (গলাধাক্কা) : বেয়াদবটাকে অর্থচন্দ্র দিয়ে বের করে দাও।

অমাবস্যার চাঁদ (দুর্লভ বস্তু) : আমার বন্ধু নীলিমার দেখা পাওয়াটা অমাবস্যার চাঁদ হয়ে দাঁড়িয়ে।

অষ্টরম্ভ সম্মিলন (প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের একত্র সমাবেশ) : নজরুল জয়ন্তীর অষ্টরম্ভ সম্মিলনে সংস্কৃতির নানাদিক নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

অসাকাঙ্ক্ষ/অষ্টাঙ্গী/অষ্টারাম (নির্বোধ, নিরেট বোকা) : তোমার মতো অসাকাঙ্ক-কে দিয়ে এ কাজ হবে না।

অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া (পুরাপুরি আন্দাজে কাজ করা) : অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ে কোনো কাজেই চূড়ান্ত সফলতা আসে না।

অঁধে জল (ভীষণ বিপদ) : ব্যবসায় ক্ষতি হয়ে নিজাম সাহেব অঁধে জলে পড়েছেন।

অনুরোধে ঢেঁকি গেলা (পরের অনুরোধে কষ্ট পাওয়া) : অনুরোধে ঢেঁকি গিলে কি ভুলটাই না করেছি।

আড়াইহাত বোয়াচাক (অসম্ভব ব্যাপার) : আড়াইহাত বোয়াচাকের মত পুকুর ভরাট করে রাতারাতি অট্টালিকা তোলা হলো।

আমড়াগাছি করা (অযথা প্রশংসা করা) : এমপি সাহেবকে আমড়াগাছি করে পাঁচ হাজার টাকা আদায় হয়েছে।

আকাশ ধরা (বৃষ্টি বন্ধ হওয়া) : এতক্ষণে আকাশ ধরেছে, এবার বাড়ি যাই।

আকাশে থুপু ফেলা (নিজেরই ক্ষতি করা) : এ কাজ করলে তো আকাশে থুপু ফেলা হবে।

আক্কেলমন্দ, আক্কেলমন্দ (বিবেচনা করে এমন) : আক্কেলমন্দ লোকের উপর ভরসা করা যায়।

আখাখা (বেখাপ্পা) : লোকটা একটা আখাখা বাঁশ নিয়ে লাফিয়ে পড়ল।

আটকপালে (হতভাগা) : আমার মতো আটকপালের ভাগ্যে কি এই চাকরি জুটবে?

আটখান করা, আটখানা করা (টুকরো টুকরো করা) : যে রাগের চোটে পুরস্কারটাকে ছেঁড়ে আটখানা করেছে।

আটাশে ছেলে (দুর্বল ছেলে) : সে তো আর আটাশে ছেলে নয় যে তোমাদের ভয় পাবে।

আঠারো আনা (বাড়াবাড়ি) : কাজের কাজ কিছু না করলেও সর্দারি করে মোড়লো আনার উপর আঠারো আনা।

আঠারো মাসে বছর (দীর্ঘসূত্রিতা) : সরকারি অফিসে তো আঠারো মাসে বছর, কীভাবে তাড়াতাড়ি হবে কী করে?

আড়ং ঘাটা (খেয়াঘাট) : আড়ংঘাটায় রোজ শত শত যাত্রী এপার-ওপার করে।

আতান্তরে পড়া (বিপদে পড়া) : দুটো নাবালক ছেলেমেয়ে নিয়ে অসহায় বিধবা কী আতান্তরেই না পড়েছে।

আতারি কাতারি (ছটফটে ভাব) : যে খেতেই ব্যথায় আতারি কাতারি করছে।

আদমের কাল (সুপ্রাচীন কাল) : এটা তো চলে আসছে সেই আদমের কাল থেকে।

আদায় কাঁচকলায় (শত্রুভাবাপন্ন) : কেউ কারও কথাটি সহ্য করতে পারে না, তাদের সম্পর্ক যেন আদায় কাঁচকলায়।

আদার ব্যাপারি (সাধারণ লোক) : আমি ছোট আদার ব্যাপারি, ওসব বড় বড় অনুষ্ঠান আমি নেই।

আনাড়ের হাঁড়ি (সামান্য লোক) : আমার কথা বাদ দাও ভাই, আমি তো একটা আনাড়ের হাঁড়ি ছাড়া কিছু না।

আমগন্ধি (কাঁচাগন্ধযুক্ত) : এমন আমগন্ধি মাংস কি খাওয়া যায়!

আমড়া কাঠের ঢেঁকি (অকেজো লোক) : এমন আমড়া কাঠের ঢেঁকি আমার কোনো কাজে লাগবে?

আমি-আমি করা (আত্মপ্রশংসা করা) : ভদ্রলোক বড্ড আমি-আমি করেন বলে ওঁকে সবাই এড়িয়ে চলে।

আয়োসুয়ো (সধবা স্ত্রীলোকের দল) : বিয়ে বাড়িতে আয়োসুয়োর দল খুব হইচই বাঁধিয়ে দিয়েছে।

আর আর (অন্যান্য) : দেখতে হবে আর আর লোকে কী বলে।

আলোর আলো (দুর্লভ বস্তু) : তুমি তো আলোর আলোর পিছনে ছুটে সারাটা জীবন নষ্ট করলে।

এপাশে ফুটকড়াই (হেসে কুটিকুটি) : মেয়েটা দেখি ওপাশে ফুটকড়াই– কী এমন হলো?

এঁকুপাঁকু করা (ছটফটানি) : এত এঁকুপাঁকু না করে একটু ঠান্ডা হয়ে বস তো।

এঁচল ধরে বেড়ানো (বাজিকরীন) : হাসান এঁচল ধরে বেড়ায়, সে সংসারের কী পরামর্শ দেবে!

আকাট মূর্খ (নিরেট বোকা) : আকাট মূর্খের হাতে পড়ে মেয়েটার দুর্গতির শেষ নেই।

আকাশ থেকে পড়া (অপ্রত্যাশিত) : পরীক্ষায় ফেলের খবর শুনে পলাশ আকাশ থেকে পড়ল।

আকাশ-পাতাল (বিশাল ব্যবধান) : এই নেতার মাঠের ভাষণ আর বাস্তব কাজে আকাশ পাতাল প্রভেদ।

আকাশের চাঁদ (দুর্লভ বস্তু) : হারানো মেয়েকে ফিরে পেয়ে বুড়ো যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেল।

আক্কেল গুড়ুম (হতবুদ্ধি হওয়া) : মেধাবী পুত্রের অকৃতকার্যতার কথা শুনে পিতার আক্কেল গুড়ুম!

আগুনে ঘি ঢালা (রাগ বাড়ানো) : গ্রাম প্রধানের দুর্নীতির বিবরণ ছেপে অনেক পত্রিকা আগুনে ঘি ঢালছে।

আক্কেল সেলামি (ভুলের মাশুল) : বিনা টিকিটে ভ্রমণ করতে গিয়ে কাইয়ুমকে আক্কেল সেলামি দিতে হলো।

আল্লাদি (আহ্লাদে) পুতুল (আদুরে অকর্মণ্য) : সে তো আমার তোমার মতো আল্লাদে পুতুল নয়, তাকে রীতি মতো খাটতে হয়।

আকাশ কুসুম (অসম্ভব কল্পনা) : বোকারাই আকাশ কুসুম চিন্তা করে।

আদুল ফুলে কলাগাছ (হঠাৎ বড়লোক) : চোরাকারবারি করে অনেকেই আদুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে।

আদা জল খেয়ে লাগা (প্রাণপণ চেষ্টা করা) : বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য আদা জল খেয়ে লাগতে হবে।

আমতা আমতা করা (ইতস্তত করা, দ্বিধা করা) : আমতা আমতা কর কেন? আসল কথা বলে ফেল।

আশার ঘরে দুশাল (অতি আদুরে নষ্ট ছেলে) : করিম সাহেবের আশার ঘরে দুশালটি সকল নষ্টের মূল।

আকাশে তোলা (অতিরিক্ত প্রশংসা করা) : তোমাদের লোকেরা ভণ্ডী ব্যক্তিদের কথায় কথায় আকাশে তোলে।

আঁতে ঘা (প্রাণে আঘাত) : এমন আঁতে ঘা দিয়ে কথা বললে কার না রাগ হয়!

আদিখ্যেতা (ন্যাকামি) : তোমার এমন আদিখ্যেতা দেখলে গা জ্বলে যায়।

আনাড়ি (অপটু, অনভিজ্ঞ) : তুমি যে আনাড়ি তা কথা শুনলেই বোঝা যায়।

আঁটকুড়ো (নিঃসন্তান) : আঁটকুড়ো বুড়ি কাউকেই সহ্য করতে পারে না।

ইন্দ্রপতন (বিখ্যাত ব্যক্তির মৃত্যু) : শামসুর রাহমানের মৃত্যুতে কাব্যজগতে ইন্দ্রপতন ঘটল।

ইউনাম জপা (প্রশংসা করা) : সেন্টমার্টিন বেড়াতে গিয়ে ঝড়ের কবলে পড়লে বন্ধুরা সবে ইউনাম জপেছে।

ইতুদিনকুঁড়ে (অলস) : কথায় যতই চটপটে হোক, কাজের বেলায় মেয়েটা একেবারেই ইতুদিনকুঁড়ে।

ইঁচড়ে পাকা (অকালপক্ব) : সঙ্গদোষে অনেক ছেলেই ইঁচড়ে পাকা হয়ে যায়।

ইলশে গুঁড়ি (গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি) : কী যে ইলশে গুঁড়ি শুরু হয়েছে সকাল থেকে, অসহ্য!

ইঁদুর কপালে (মন্দভাগ্য) : টিটু এম.এ পাশ করেও চাকরি পেল না, এমন ইঁদুর কপালে আর দেখি নি।

ইতর বিশেষ (প্রভেদ বা পার্থক্য) : পড়া-লেখা, বিদ্যা-বুদ্ধি ও রূপে-গুণে রহিম এবং করিমের মাঝে ইতর বিশেষ নেই।

ইদের চাঁদ (কাঙ্ক্ষিত বস্তু) : ছেলে ফিরে আসায় মা যেন ইদের চাঁদ হাতে পেলো।

উড়ো কথা (গুজব) : উড়ো কথায় কান দিতে নেই।

উড়নচণ্ডী (উচ্ছৃঙ্খল) : এমন উড়নচণ্ডী ছেলের কাছে উন্নতি আশা করা যায় না।

উকর-ধাকর (এলোপাথাড়ি) : উকর-ধাকর নাচ দিয়ে আসর মাতানো যাবে না।

ঊনিশ-বিশ (সামান্য, পার্থক্য) : যার ডিগ্রি, ঠিকই আছে একটুও ঊনিশ-বিশ হয় নি।

Scanned with CamScanner

উজলপাজল (উখালপাথাল) : ঢেউয়ের **উজলপাজল** দেখে নৌকারোহীরা ভীত হলো।

উজ্জ্বলের কৈ (সহজ লভ্য) : পরীক্ষায় ভালো ফল কি **উজ্জ্বলের কৈ** যে চাইলেই পাওয়া যাবে!

উড়নশেকে (অপব্যয়ী) : **উড়নশেকের** মতো মুহূর্তে টাকা খরচ করলে দুদিনে সব শেষ হয়ে যাবে।

উপোসি ছারপোকা (অত্যন্ত লোক) : ও তো **উপোসি ছারপোকা**, তাই ওর অমাহটা বেশি।

উপুখাড়া (তরুচুরীন লোক) : আমরা ভাই **উপুখাড়া**, আমাদের কথায় ওঁরা গুরুত্ব দেবেন কেন?

উপুবনে মুক্তো ছড়ান (বৃথা আয়োজন) : রাজনকে উপদেশ দেওয়া আর **উপুবনে মুক্তো ছড়ান** একই কথা।

উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে (একের দোষ অপরের ওপর) : দুষ্টামি করল প্রীতু, শাস্তি পেল বিপু, একেই বলে **উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে**!

উত্তম মধ্যম (পিটানি, প্রহার) : পকেটমারদের মাঝেমধ্যে **উত্তম মধ্যম** খেতে হয়।

উড়ো চিঠি (বেনামি পত্র) : আকবর সাহেবের ঠিকানায় প্রায়শ **উড়ো চিঠি** আসে।

উড়ে এসে জুড়ে বসা (অকস্মাৎ আবির্ভাব) : বড় ভাই সংসার সাজালো, কিন্তু **উড়ে এসে জুড়ে বসল** ছোট ভাই।

উনপাঁজরে (অপদার্থ) : মলির মতো **উনপাঁজরে** মেয়ে আর দেখি নি।

উনপঞ্চাশ বায়ু (পাগলামি) : পরীক্ষা গনিয়ে আসছে, আর তার মাথায় **উনপঞ্চাশ বায়ু** দেখা দিয়েছে।

উনকোটি চৌষট্টি (প্রায় সম্পূর্ণ) : **উনকোটি চৌষট্টি** আয়োজন হবার পর সব স্থগিত করা হলো।

উনো বর্ষা দুনো শীত (যে বছর বৃষ্টি কম হয়, সে বছর শীত বেশি পড়ে) : **উনো বর্ষা দুনো শীত** তাই গরিব মানুষের এত কষ্ট।

উর্মিমালী (সমুদ্র) : **উর্মিমালী**-তে স্নান করার আনন্দই আলাদা।

এওয়ায় গণ্ডায় (গোঁজামিল দেওয়া) : তরুণ বয়সেই **এওয়ায় গণ্ডায়** কর্ম শিখলে ভবিষ্যত ভালো হয় না।

এক লহমায় (এক মুহূর্তে) : এক লহমায় ব্যাপারটা বুঝে নাও।

এলেবেলে (নিকৃষ্ট) : এলেবেলে খেলা দেখতে ভালো লাগে না।

এক ডাকের পথ (কাছাকাছি) : মুজনের বাড়ি থেকে স্কুল হচ্ছে এক ডাকের পথ।

এককে একুশ করা (অযথা বাড়ানো) : সার কথা বল, এককে একুশ করছ কেন?

এক গোয়ালের গরু (এক শ্রেণিভুক্ত) : তারা এক গোয়ালের গরু, ওই আচরণই পাবে।

এক হাত লওয়া (জব্দ করা) : তথাকথিত মুসলেহ পেয়েই হাসানের উপর এক হাত নিয়ে ছাড়ল।

এক চোখা (পক্ষপাত দুষ্ট) : তার ওই এক চোখা ব্যবহারের জন্যে সবাই তাকে অপছন্দ করে।

এক ছাঁচে ঢালা (সাদৃশ্য) : কাজল আর সরল হচ্ছে এক ছাঁচে ঢালা, তাই পরীক্ষার ফলও হয়েছে একরকম।

একাদশে বৃহস্পতি (মহাসৌভাগ্য) : ব্যবসায় লাভ, ছেলের বিদেশ যাত্রা, এ বছর চৌধুরির **একাদশে বৃহস্পতি**।

এক ক্ষুরে মাথা মুড়ানো (এক দলভুক্ত) : সবাই এক ক্ষুরে মাথা মুড়ায় বলে একটাকে ধরলে অন্যদেরও পাওয়া যাবে।

এক বনে দুই বাঘ (প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী) : 'লালসালু' উপন্যাসের দুই পির এক বনে দুই বাঘের মতো ছিলেন।

এক কথার মানুষ (দৃঢ় সংকল্প ব্যক্তি) : নজরুল সাহেব এক কথার মানুষ, কোনো লোভই তাঁকে নাড়াতে পারবে না।

এক যাত্রায় পৃথক ফল (একই কাজের ভিন্ন প্রাপ্তি) : দুজনেই রাত জেগে মাছ ধরেছি। তুমি তিন ভাগ নিয়ে আমাকে দিলে এক ভাগ? এক যাত্রার পৃথক ফল হতে পারে না।

এসপার ওসপার (মীমাংসা) : ঝগড়া করে লাভ কি, এসপার ওসপার করাটাই উত্তম।

এলাহি কাণ্ড (বিরাট আয়োজন) : একমাত্র ছেলের বিয়েতে ফজলুল সাহেব এলাহি কাণ্ড করেছেন।

ওলা-ওঠা প্রতি ঘরে (মহামারি) : বন্যা-উত্তরকালে গ্রামে **ওলা-ওঠা প্রতি ঘরের** অবস্থা হয়।

ওষুধ করা (বশ করা) : কেউ হাত **ওষুধ** করেছে, তাই রাবেয়া চুপচাপ।

ওষুধ লাগা (সঠিক ব্যবস্থা নেওয়া) : **ওষুধ** লাগছে- এবার যদি শাহানার লেখাপড়া হয়।

ওকর ঘাড়ে ভূত (বিপদগ্রস্ত কাতারি) : আমি খেলাম ডাক্তারের কাছে জিভস চিকিৎসার আশায়, দেখি ডাক্তারেরই জিভস। এ যে **ওকর ঘাড়ে ভূত**।

কতশত (অসংখ্য) : কতশত শহিদের রক্তের ঋণ শোধ করতে হলে আমাদের।

কথার ফুলঝুরি (বাকপটুতা) : আজকের নেতারা দেশের কাজ না করে শুধু কথার **ফুলঝুরিতে** জনগণের মন ভরাতে চান।

কনি খাওয়া (পক্ষপাতিত্ব) : ছেলে ও ভাইপোর মধ্যে জমি বণ্টনের প্রশ্নে পিতারা সাধারণত ছেলের দিকেই কানি খান।

ক-অক্ষর গোমাংসে (সম্পূর্ণ মূর্খ) : তাকে এইসব তত্ত্বকথা বোঝাতে গেছ- সে তো **ক-অক্ষর গোমাংসে**!

কলমির ঝাড় (বংশে বহু লোক) : চৌধুরি বাড়িতে **কলমির ঝাড়**।

কচু পোড়া (অখাদ্য) : লেখাপড়া না করে কি **কচু পোড়া** খেয়ে জীবন কাটাবে?

কচ্ছপের কামড় (যা সহজে ছাড়ে না) : জাফর পেছনে লাগার অর্থ **কচ্ছপের কামড়**। টাকা তোমাকে দিতেই হবে।

কড়ার ভিখারি (দীন) : এমন **কড়ার** ভিখারির কাছে দয়া প্রত্যাশা করি না।

কড়ি কপালে (ভাগ্যবান) : রাতারাতি বড়লোক, এমন **কড়ি কপালে** লোক দেখি নি।

কড়িকাঠ গনা (কাজ না করে কালহরণ) : ফেল করেছ, এবার শুয়ে শুয়ে **কড়িকাঠ** গুনতে থাক।

কথার মানুষ (কথা ঠিক রাখে এমন) : তিনি **কথার মানুষ**, তাঁর কাছ থেকে ন্যায় বিচার পাবে।

কপাল ঠুকে লাগা (প্রত্যয় নিয়ে) : **কপাল ঠুকে** লেগেছি, দেখি কী ফল পাই।

কর খাওয়া (জীবিকার উপায় পাওয়া) : লেখাপড়া শিখলে যা হোক কিছু একটা **কর খাওয়া** যাবে।

কষ্ট কাটব্য (তিরস্কার) : রেগে গিয়ে ওকে অযথা অনেক **কটু কাটব্য** করে ফেলেছি।

কপোল-কল্পনা (অলীক কথা) : তোমার এই **কপোল-কল্পনায়** কেউ গুরুত্ব দেবে না।

কপালের লিখন (ভবিতব্য) : **কপালের** লিখন কে খণ্ডাবে? তার বাবা-মা কত চেষ্টা করল, কিন্তু ছেলে পড়ল না।

কপির সন্ধ্যা (দুর্দিনের সূচনা) : সবে তো কপির সন্ধ্যা, অনেক দুঃখ এখনও লিখিত আছে।

কপালি কায়েন (দরিদ্র কিন্তু বিলাসী) : গুরু বাবুয়ানি দেখে চমকে গেও না। সে স্বভাবী **কপালি কায়েন**।

কলমের খোঁচা (অলিখ করার উদ্দেশ্যে লিখিত আদেশ) : ঘুষ গ্রহণ করায় মন্ত্রীর **কলমের খোঁচাতেই** আমাদের চাকরি চলে গেল।

কর্মফলি ছাড়ে না (সহজে ছাড়বে না) : আমি তো রেহাই পেতে চাই, কিন্তু **কর্মফলি ছাড়ে** নাতো।

কানখড়কে (যার কান খুব সজাগ) : যা **কানখড়কে** লোক সে, আশেপাশে বলাও শুনে ফেলে।

কাগুজে বাঘ (মিথ্যা ভুজু) : সন্ত্রাসবাদ মোটেই **কাগুজে বাঘ** নয়।

কাজের থই (কাজের সীমা) : সকাল থেকে খেটে চলেছি, **কাজের থই** নেই।

কায়দা হওয়া (বশে আসা) : এতদিন এড়িয়ে এড়িয়ে এবারে **কায়দা** হয়ে গেছি।

কার্তিকে ঝড় (অসময়ের ঝড়) : এই **কার্তিকে** ঝড়ে ফসলের খুব ক্ষতি হয়ে গেল।

কাক ভেজা (সম্পূর্ণ ভেজা) : ঝড়জলের রাতে একেবারে **কাক ভেজা** হয়ে বাড়ি ফিরলে।

কাট-গোঁয়ার (অত্যন্ত একগুঁয়ে) : এমনই **কাট-গোঁয়ার** লোক যে শত অনুরোধেও পিছিয়ে আসতে রাজি নয়।

কাটনার কড়ি (উপার্জন সামান্য) : **কাটনার কড়ি** দিয়ে সংসার চালানো বড়ই কঠিন।

কানু ছাড়া গীত নাই (একমাত্র অবলম্বন) : এই শর্মাকে সব কাজে ডাকতেই হবে। জানই তো, **কানু ছাড়া গীত নাই**।

কাবুতে পাওয়া (বাগে পাওয়া) : এবারে ওকে **কাবুতে** পেয়েছি- আর যায় কোথায়!

কালাপানি পার (দ্বীপান্তরে যাওয়া) : ব্রিটিশ বিরোধীদের **কালাপানি পার** করে দেয়া হতো।

কাঁজি ভক্ষণ নামে গোয়ালা (হতভাগ্য) : গফুর জমি চাষ করলে কী হবে, **কাঁজি ভক্ষণ নামে গোয়ালার** মতো সে ধান যায় জমিদারের গোলায়।

Scanned with CamScanner

কাঁঠালের আমসত্ত্ব (অলীক বস্তু) : ওই হাড় কিপটের কাছে দুহাজার টাকা চাওয়াও যা কাঁঠালের আমসত্ত্ব চাওয়াও তা।

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে (আহতকে আরও আঘাত দেওয়া) : তোমার সমালোচনা তার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মতো কাজ করেছে।

কানাগলির ভিন্ন পথ (অজ্ঞানে মুনিদেশনা) : যতই মহৎ পরামর্শ দাও না কেন ও চলবে ওর মতো। সাধে কি বলে কানাগলির ভিন্ন পথ?

কায়েতের ঘরের ঢেঁকি (অপদার্থ লোক) : ওই হতভাগা কায়েতের ঘরের ঢেঁকিকে নিয়ে আমার সুবিধের চেয়ে অসুবিধেই বেশি হবে।

কিপটের জাদু (অত্যন্ত কৃপণ) : যতই টাকা থাকুক, লোকটা একেবারে কিপটের জাদু।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড (ঝুমুল হট্টগোল) : গোলমাল শুনে রাস্তায় বেরিয়ে দেখি এক কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড বেধে গেছে।

কিম্ভূতকিমাকার (অদ্ভুত ও কুৎসিত) : লোকটার কিম্ভূতকিমাকার চেহারা আর বিচিত্র বেশবাস দেখে একটু হকচকিয়ে যেতে হয় বই কি!

কিল খেয়ে কিল হজম (অপমান গোপন করা) : কিল খেয়ে কিল হজম করেছি, যাতে আবার অপদস্থ হতে না হয়।

কুঁচো বাসন (ছোটখাটো থালাবাটি) : হাঁড়ি কলসি তুমি নাও, কুঁচো বাসনগুলো আমি করে নিয়ে যেতে পারব।

কুঁজড়োপনা (ঝগড়াটে স্বভাব) : তার এই কুঁজড়োপনার জন্যেই কেউ তাকে দেখতে পারে না।

কুবেরের ভাণ্ডার (অফুরন্ত ঐশ্বর্য) : ঘরে কি কুবেরের ভাণ্ডার রয়েছে, যে সারাজীবন বসে খাবে।

কুমড়ো কাটা বটঠাকুর (অকর্মণ্য লোক) : পিকনিকে তোমাকে নেব না, তুমি তো একটি কুমড়ো কাটা বটঠাকুর।

কুমিরের সন্নিপাত (অসম্ভব ব্যাপার) : পুলিশের সোর্স জাফরচোরাকে পুলিশের ধরেছে? এযে কুমিরের সন্নিপাতের মতো।

কুল কাঠের আগুন (দীর্ঘস্থায়ী মনকষ্ট) : আমার ভেতর জ্বলছে কুল কাঠের আগুন।

কুলোপানা চক্কর (সারহীন আড়ম্বর) : আজকাল শহরের অনেকেই কুলোপানা চক্করের দলে পড়েছেন।

কেঁচে যাওয়া (পণ্ড হয়ে যাওয়া) : এত চেষ্টা এত পরিশ্রম সবই কেঁচে গেল।

কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোনো (তুচ্ছ ব্যাপার থেকে গুরুতর ব্যাপার প্রকাশ) : চোরের বিরুদ্ধে ধাওয়া করে পুলিশ একটি বিরাট চোরাচালানকারী চক্র ধরে ফেলেছে। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়েছে।

কেতাদুরস্ত (ফ্যাশনবাদিশ/পরিপাটি) : চালচলন আর পোশাকে সে খুবই কেতাদুরস্ত লোক।

কেস কেরোসিন (ব্যাপার গুরুতর) : এদিকে তো কেস কেরোসিন- এবার কীভাবে সামলাবে?

কেল-ফতে (জয়লাভ) : এত যে কেল্লাফতে হবে তা স্বপ্নেও ভাবি নি।

কেঁচে গণ্ডুষ (গোড়া থেকে শুরু) : অনেকখানি করার পর জানা গেল এ পর্যন্ত সবই ভুল হয়েছে। আবার কেঁচে গণ্ডুষ করতে হবে।

কলুর বলদ (একটানা খাটুনি) : কলুর বলদের মতো সংসারের চাকায় ঘুরে কী লাভ?

কপাল ফেরা (সৌভাগ্য লাভ) : কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে কপাল ফেরানো সম্ভব।

কত ধানে কত চাল (হিসেব করে চলা) : নিজেতো শুধু খরচই কর, কত ধানে কত চাল বুঝবে কেমন করে।

কড়ায় গণ্ডায় (সম্পূর্ণ, পুরোপুরি) : আমিনুল সাহেব কড়ায় গণ্ডায় তার পাওনা বুঝে নিলেন।

কাঁচা পয়সা (নগদ উপার্জন) : কাঁচা পয়সা থাকতেই সঞ্চয় করা উচিত।

কূপমণ্ডূক (ঘরকুনো/সীমাবদ্ধ জ্ঞান সম্পন্ন) : তোমার মতো কূপমণ্ডূক লোক দিয়ে কিছুই হবে না।

কথায় চিঁড়ে ভেজা (ফাঁকা বুলিতে কার্যসাধন) : কাজটি করানোর জন্য নগদ কিছু ঢালতে হবে, কারণ শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না।

কেউ কেটা (সামান্য) : ও কেউ কেটা ধরনের লোক নয়, ওর সাথে পেরে উঠবে না।

কচু বনের কালাচাঁদ (অপদার্থ) : রাহাতের মতো কচু বনের কালাচাঁদ আর একজন নেই।

কংস মামা (নির্মম আত্মীয়) : ভাইঝিকে বিক্রি করে দেয় যে চাচা, সে আসলে কংস মামা।

কেবলা হাকিম (অনভিজ্ঞ) : তার মতো কেবলা হাকিম দিয়ে কোনো কাজ হবে না, অন্য চেষ্টা করলেই ভাল।

কালে অন্নে (কালাদিন) : কালে অন্নে আমাদের মুলতুবি দেয়া হয়।

কলা দেখানো (ফাঁকি দেয়া) : যার জন্য তুমি এতো কিছু করলে, আর সেই শেষ পর্যন্ত কলা দেখালো।

কুরীরাম (মামাকায়া, কপট অশ্রু) : প্রতারকের কুরীরাম দেখে ভুলতে নেই।

কুম্ভকর্ণের নিদ্রা (দীর্ঘদিনের আলস্য) : পরীক্ষার যাতি তো এক মাস। কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ছেড়ে লেখাপড়ায় মন দাও।

কেউ-কিটু (বিশিষ্ট ব্যক্তি) : ইদানীং রাজনৈতিক মহলে কেউ-কিটু লোকের অভাব নেই।

কাঠ হাসি (কপট হাসি) : মহাজনের কাঠ হাসি দেখে লাভ নেই — সময় হলেই টের পাবে।

কাকস্নান (অসম্পূর্ণ গোসল) : শীতের দিনে কাকস্নান করতে অনেকেই অভ্যস্ত।

খেউর গাওয়া (গালাগালি করা) : ভদ্রলোক হলে সে এভাবে খেউর গাইত না।

খাংরাকাঠি (বিসদৃশরকম রোগা) : রফিক বিদেশে থেকে অর্থ জমিয়েছে ঠিকই, কিন্তু খাংরাকাঠিও হয়ে এসেছে।

খামকাজ (ভুলকাজ) : তোমার খামকাজের খোঁজ নিতেই সময় গেল, নিজের কাজ করব কখন?

খুদে রাক্ষস (পেটুক মানুষ) : ওর খাওয়া দেখে ওকে একটা খুদে রাক্ষসই মনে হয়।

খুরে খুরে দণ্ডবৎ (হার স্বীকার) : তোমার খুরে খুরে দণ্ডবৎ, এবার আমাকে কাজ করার অনুমতি দাও।

খেজুরে আলাপ (অকাজের কথা) : অকারণে খেজুরে আলাপ করতে ভালো লাগে না।

খেরো খাতা (বাজে হিসাবের খাতা) : আমার এই খেরো খাতায় তুমি সবই পাবে।

খোদার উপর খোদকারি (অসংগত হস্তক্ষেপ) : মিস্ত্রিরি তো ওটাকে সারিয়েই দিয়েছিল, তুমি আবার খোদার উপর খোদকারি করে নাড়াচাড়া করতে গেলে কেন?

খোল নলচে বদলানো (আমূল পরিবর্তন) : গাড়িটার খোল নলচে বদলানো দরকার।

খয়ের খাঁ (চাটুকার) : খয়ের খাঁ হয়ে ভাগ্য ফেরানো যায় না।

খাতির জমা (নিরুদ্বিগ্ন) : খাতির জমিয়ে বসলে যে, আর কোনো কাজ নেই?

খিচুড়ি পাকানো (জটিল করা) : সহজ কথাকে জটিল করে খিচুড়ি পাকিয়ো না।

খড়কপাল (দুর্ভাগা) : আমরা খড়কপালে মানুষ, আমাদের আর কি 'আর সংসার হবে!

খড়মপেটা (চুমুলকাম, ভীষণ ব্যাপার) : এইটুকু ঘটনাতে খড়মপেটা ঘটানোর কী আছে?

খোদার খাসি (অইপুষ ব্যক্তি) : কাজ কামের নামে ভাই, খায় আর শুয়ে বসে, একদম খোদার খাসি।

খাবি খাওয়া (ঘটনাট করা) : খাবি খেয়ে লাভ নেই, যা কিছু করা ছেবে চিন্তে করা।

গঙ্গা পাওয়া (মারা যাওয়া) : শেষ বয়সে মানের বাড়িতে গেলেই গিন্নি গঙ্গা পেয়েছেন।

গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ (শক্তিধর দুই পক্ষের লড়াই) : সম্পত্তি নিয়ে দুই ভাইয়ের লড়াইটা নয়, যেন গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ। (ব্যাপার্থে প্রয়োগ)

গোস্তিমওয়ালা শিশু (দুধের বাচ্চা) : এযুগের অনেক আধুনিক মা গোস্তিমওয়ালা শিশুকে বাসায় একা রেখে বেড়াতে বের হতে দ্বিধা করে না।

গয়ংগচ্ছ (ঢিলেমি) : এমন গয়ংগচ্ছ ভাব করছ যেন তোমার হাতে এক বছর সময় আছে।

গলবস্ত্র হওয়া (বিনীতভাবে অনুরোধ) : গলবস্ত্র হয়ে তাঁকে বলেছি।

গড্ডলিকা প্রবাহ (অন্ধভাবে অনুসরণ) : গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিলেই সমাজের উন্নতি হবে না।

গদাই লস্করি চাল (মন্থর গতি) : এমন গদাই লস্করি চালে চললে জীবনেও উন্নতি করতে পারবে না।

গরজ বড় বালাই (প্রয়োজনে গুরুত্ব) : যেতেই হল শেষ পর্যন্ত, কী আর করা, গরজ বড় বালাই।

গরিবের ঘোড়া রোগ (অবস্থার অতিরিক্ত অন্যায় ইচ্ছা) : কোনো মতে পাশ করেছ, এখন পড়তে চাও ইংরেজি স্কুলে, গরিবের ঘোড়া রোগ হয়েছে আর কি।

গরু মেরে জুতো দান (বড় ক্ষতি করে সামান্য পূরণ) : মোড়ল বিধবার লাখ টাকার সম্পত্তি হাতিয়ে নিয়ে শেষকালে তাকে দুমুঠো খেতে দিচ্ছে- এ যে গরু মেরে জুতো দান।

Scanned with CamScanner

পঞ্চজনে পঞ্চাশুদ্ধা (পরে পরে সমাপন) : অতিথিরা যে যাঁটির হাঁড়ি নিয়ে এসেছিল, তাই দিয়েই তাদের আপ্যায়ন পরকার্য-পঞ্চজনে পঞ্চাশুদ্ধা অব জী।

পঞ্চাশে পা দেওয়া (বয়স বৃদ্ধি করা) : পঁচিশ করা। পরিবেশ পঞ্চাশে পা দিয়ে টাকা আদায় করতে তাঁর একটুও কষ্ট হয় না।

পা চোলা (ভাঁটা) : আড্ডা অনেক হয়েছে, এবার পা চোল।

পায়ে কাঁটা দেওয়া (রোমাঞ্চ হওয়া) : ভূতের গল্প শুনে অনেকের পায়ে কাঁটা দেয়।

পায়ে কাঁটাল গোঁফে তেল (ফলের আগেই ফলাফলের প্রত্যাশা) : ছবির জন্য টাকা জমা দেবে বলেছো, অথচ ফলই তো বের হয় নি- এ যে দেখছি পায়ে কাঁটাল গোঁফে তেল।

পায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ানো (আরামে সময় কাটানো) : বাবা যত দিন বেঁচে ছিলেন সেদিন ততদিন বেশ পায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়িয়েছে।

পায়ে তুলে মই কেড়ে নেওয়া (আশা দিয়ে পরে নিরাশ করা) : তোমাদের কথাতেই দায়িত্ব নিয়েছি। আমাকে পায়ে তুলে এখন মই কেড়ে নিলে চলবে না।

পোড়ায় গলদ (প্রথমেই ত্রুটি) : বই না কিনেই ক্লাসে এসেছ, তোমার তো দেখছি পোড়াতেই গলদ।

গোবর গণেশ (অকর্মণ্য) : তোমার মতো গোবর গণেশকে নিয়ে কোনো কাজ হবে না।

গোঁপ-খেজুরে (অত্যন্ত কুঁড়ে) : তোমার মতো গোঁপ-খেজুরে লোকের সঙ্গে একযোগে ব্যবসা করতে আমি রাজি নই ভাই।

গোদের উপর বিষফোঁড়া (যন্ত্রণার উপর আরও যন্ত্রণা) : একে চাকরি নেই, আবার গোদের উপর বিষফোঁড়া এই দেনা!

গুরুচণ্ডালী (উঁচু-নিচুর সহাবস্থান) : মন্ত্রী ও নারায়ানকে একই ধরনের চেয়ারে বসতে দিলে গুরুচণ্ডালী দোষ হবে।

গলগ্রহ (পরের বোঝা হয়ে থাকা) : গলগ্রহ ঘরজামাইদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

গুড়ে বালি (আশায় নৈরাশ্য) : আশা করে ছিলাম চাচার সম্পত্তি পাব, এখন দেখছি তা গুড়ে বালি।

গর্দভরাগিণী (কর্কশ সুর) : আজকাল গর্দভ রাগিণী সমৃদ্ধ শিল্পীর অভাব নেই।

গো-মূর্খ (নিরেট মূর্খ বা বর্ণজ্ঞানহীন) : তার ভাগ্যটাই ভাল, এমন গো-মূর্খ লোকের রূপবতী বউ!

গোঁয়ার গোবিন্দ (কাণ্ডজ্ঞানহীন) : গোঁয়ার গোবিন্দ হলে কোনো কাজই ঠিকভাবে করতে পারবে না।

গৌরীসেনের টাকা (অফুরন্ত অর্থ) : আমাদের রাজনীতিবিদগণ গৌরীসেনের টাকা ভেবে ইচ্ছামতো দেশের টাকা খরচ করে থাকেন।

গো-বৈদ্য (হাতুড়ে) : গো-বৈদ্য দিয়ে কি আর ক্যান্সারের চিকিৎসা চলে?

গৌরচন্দ্রিকা (ভূমিকা) : গৌরচন্দ্রিকা বাদ দিয়ে আসল কথা বলো।

গণ্ডগ্রাম (বড় গ্রাম) : রহিমদের বাড়ি উত্তরপাড়ের এক গণ্ডগ্রামে।

ঘাটি-চোর (ছিচকে চোর) : বড় বড় ডাকাত দলে অভ্যাস, তোমার মতো ঘাটি-চোরকে পাকড়াও করতে কোনো কষ্টই হবে না আমার।

ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো (ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে কর্ম করা) : ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো কিছু মানুষের জন্য না হলে সমাজ এগিয়ে যায় না।

ঘরভেদী বিভীষণ (কপট স্বজন) : পরিবারে ঘরভেদী বিভীষণ থাকলে সে পরিবারের উন্নতি হয় না।

ঘুমপড়ে (ঘুমকাতুরে) : রাজিত বাবু ঘুমপড়ে লোক।

ঘাট মানা (অন্যায় স্বীকার করা) : ঘাট মানছি, এবার আমাকে রেহাই দাও।

ঘাড়ে-গর্দানে (অত্যন্ত মোটা) : কী খাও যে এমন ঘাড়ে-গর্দানে হয়েছ?

ঘুণ হওয়া (দক্ষতা লাভ করা) : অল্প দিনেই মেরামতির কাজে সে ঘুণ হয়ে গেছে।

ঘোড়ার ডিম (অবাস্তব) : পরিকল্পনা না ঘোড়ার ডিম, উন্নতি তো কিছুই হয় নি।

ঘুঘু চরানো (সর্বনাশ করা) : তোমার ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে তবে আমার শান্তি।

ঘর ভাঙা (ঐক্য নষ্ট করা) : দলের মধ্যে ঘর ভাঙানো লোকের অভাব নেই।

ঘা খাওয়া (আঘাত পাওয়া) : প্রস্তাব নাকচ হওয়ায় সে বেশ ঘা খেয়েছে।

ঘোড়ার ঘাস কাটা (অকাজে সময় নষ্ট) : পড়া হয় নি কেন, এতক্ষণ কি ঘোড়ার ঘাস কেটেছ?

ঘোড়ার জামঢ় (দূর পথ) : ওর বা ঘোড়ার জামঢ়, দেশ অবধি তোমার কাছ থেকে এটা আদায় করেই ছাড়বে।

ঘণ্টাকর্ণ (অকর্মণ্য লোক) : একটি পেয়ারা ঘণ্টাকর্ণের মতো চব্বিশ ঘণ্টা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে।

ঘাটের মড়া (অতি বৃদ্ধ, যে মরতে বসেছে) : বড় লোক বলেই কি ঘাটের মড়ার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে।

ঘোড়া দেখে খোঁড়া হওয়া (আরামের সন্ধানদাতা দেখে পরিশ্রম ত্যাগ) : এতক্ষণ তো লন্ঠনের আলোয় বেশ কাজ করছিলে, এখন বিজলিবাতি দেখেই বিগড়ে গেলে? এভাবে ঘোড়া দেখে খোঁড়া হলেই তো সুশরিল।

ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া (পদ্ধতির ব্যতিক্রম করা) : আবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পাঠাবে- ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেয়ো না।

ঘর থাকতে বাবুই ভিজা (সুযোগ থাকতে কষ্ট) : টাকা আছে অথচ ছাতা না কিনে বৃষ্টিতে ভিজছো, ঘর থাকতে বাবুই ভিজা কেন?

ঘোড়া রোগ (সাধ্যের অতিরিক্ত সাধ) : চার হাজার টাকা মাসিক বেতন পেয়ে দৈনিক পোলাও খেতে চাও, একেই বলে গরিবের ঘোড়া রোগ।

ঘরপোড়া গরু (বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি) : ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়।

চটকের মাংস (সামান্য জিনিস) : মৌচাক ভেঙে যে মধু পাওয়া গেল, সে-তো চটকের মাংস- পড়শিদের বিলাব কী?

চড়কগাছ (অত্যন্ত দীর্ঘকায়) : বোকা-বোকা ভাবে থাকা ছেলেটির কুকীর্তির কথা শুনে অভিভাবকদের চক্ষুতো চড়কগাছ!

চক্ষুদান করা (চুরি করা) : আমার পেনসিলটা আবার কে চক্ষুদান করল?

চশমখোর (সম্পূর্ণ বেহায়া) : আত্মসম্মানহীন লোকই চশমখোর হতে পারে।

চাঁদ-কপালে (ভাগ্যবান) : এমন চাঁদ-কপালে ছেলে খুব কমই দেখেছি।

চতুর্ভুজ হওয়া (উৎফুল্ল হওয়া) : প্রশংসা শুনেই এমন চতুর্ভুজ হয়ে যাও কেন?

চোখের চামড়াপশারী (চক্ষুলজ্জা) : চোখের চামড়া থাকলে ও কাজ কেউ করতে পারে না।

চোখের বালি (চক্ষুশূল) : আমি তো তার চোখের বালি, আমি তার কাছে যাব না।

চক্ষের পুতলি (আদরের ধন) : ছেলেটা তার চক্ষের পুতলি, এক মুহূর্ত ছেড়ে থাকে না।

চড়ুই পাখির হাগা (ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার) : পুরোর যায়।

চিনির পুতুল (প্রমকাতুরে) : বৃষ্টি কয়েক সহ্য করতে পারবে না? চিনির পুতুল নাকি তুমি?

চর্বিত চর্বণ (পুনরাবৃত্তি) : বড় সেমিনারে অনেক লেখকেই আজকাল চর্বিত চর্বণ করছেন।

চচ্চা আপন প্রাণ বাঁচা (স্বার্থপর) : বন্যার সময় চচ্চা আপন প্রাণ বাঁচা, হাঁসফাঁসানি কষ্ট ডাকাতে পড়লে কেউ আসে না।

চিনির বলদ (ভারবাহী) : সারা জীবন চিনির বলদের মত খাটাল, কিন্তু মিষ্টি করতে পারলে না।

চক্ষু চড়কগাছ (বিস্ময়ে চোখ বড় হয়ে যাওয়া) : আবদ্ধা নুর্তিটিকে দেখেই তো আমার চক্ষু চড়কগাছ।

চোক্ষবুড়ি (প্রচুর) : তাকে যেই পরামর্শ দিতে গেলাম অমনি সে আমাকে চোক্ষবুড়ি কথা শুনিয়ে দিল। (বি. দ্র. শব্দটি 'চৌক্ষবুড়ি' নয় 'চোক্ষবুড়ি')।

চুনোপুটি (সামান্য লোক) : বাবুল বড়লোক হয়েছে, এখন আমাদের মত চুনো পুটিদের সঙ্গে আর মিশবে কেন?

চোখ কপালে তোলা (বিস্মিত হওয়া) : পরীক্ষায় অকৃতকার্যের কথা শুনে জবেদ চোখ কপালে তুলল।

চোখ নাচা (শুভাশুভের লক্ষণ) : বাবার চোখ নাচছিল বলে সে খুব চিন্তায় আছে, কী জানি কী হয়!

চুলের টিকি না দেখা যাওয়া (অদর্শন হওয়া) : সেই যে গেছ, আর তো তোমার চুলের টিকি দেখা যায় না।

চেটেনেটে (কমবয়সী বধূ) : চেটেনেটে কেন একা ঘাটে যায়?

চোখে সরষে ফুল দেখা (বিপদে দিশাহারা হয়ে পড়া) : হঠাৎ বাবার মৃত্যু হওয়ায় ছোটো চোখে সরষে ফুল দেখতে লাগল।

Scanned with CamScanner

চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন (নিঃসন্দেহ হওয়া) : ঠিক আছে চল, দেখানে গিয়ে ব্যাপারটা দেখে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে আসি।

চড় মেরে গড় করা (অন্যে অপমান করে পেয়ে সন্তুষ্ট) : দুরন্ত অতি করে এখন মাত্র চাইতে এসেছ? এইজন্যে চড় মেরে গড় নাইয়া করলে।

চাপাল-উতোর (পারস্পরিক সন্দেহ) : বাইরে থেকে বোঝা যাবে না। আসলে দুই পরিবারে চাপাল-উতোর সম্পর্ক।

চিত্রগুপ্তের খাতা (যে খাতায় সবকিছু পাওয়া যায়) : তোমার এই চিত্রগুপ্তের খাতা থেকে আমি কিছুই বার করতে পারছি না।

চোরা রাত (চুরি করার পক্ষে প্রশস্ত) : একে অমাবস্যা, তার উপর টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, আজকের এই চোরা রাতটায় একটু সজাগ থাকতে হবে।

চাঁদের হাট (ঘরোয়ানে পরিপূর্ণ সংসার) : ছেলে-মেয়েরা সবাই প্রতিষ্ঠিত, বিবাহিত– এখন তোমার সংসার তো চাঁদের হাট।

চিচিং ফাঁক (গোপন রহস্যের প্রকাশ) : তোমাকে আর বলতে হবে না, অনেক আগেই সব চিচিং ফাঁক হয়ে গেছে।

চোখে ধুলা দেওয়া (ঠকানো)। **চোখে ধুলা দিয়ে** দুলাল আমার কাছ থেকে পাঁচশ টাকা নিল।

চিনে জোঁক (নাছোড়বান্দা) : করিমের মতো এমন চিনে জোঁক আর দেখি নি বাপু!

ছাপল টাঙানো (লম্বা জায়গা নেওয়া) : **ছাপল টাঙানোর** মতো করে বিছানায় শুয়েছ কেন?

ছাঁদনাতলা (বিবাহের মণ্ডপ) : আর যাই করি **ছাঁদনাতলায়** যাচ্ছি না।

ছামনি নাড়া (দৃষ্টি বিনিময়) : ছুটে আয়, বর-কনের **ছামনি নাড়া** দেখবি আয়।

ছারেখারে যাওয়া (ধ্বংস হওয়া) : তার বদ স্বভাবের জন্যেই এমন সংসারটা **ছারেখারে গেল।**

ছুঁচোর কেত্তন (অবিরাম কলহ) : ও বাড়িতে সব সময় **ছুঁচোর কেত্তন** লেগেই আছে।

ছাই চাপা আগুন (অপ্রকাশিত প্রতিভা) : মানিক হচ্ছে **ছাই চাপা আগুন,** তার উন্নতি হবেই।

ছেলের হাতের মোয়া (সামান্য লাভ, সহজলভ্য) : প্রথম হওয়া **ছেলের হাতের মোয়া** নয় যে সবাই হতে পারে।

ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা (সামান্য লাভে দুর্নাম অর্জন) : **ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ** করতে চাও বলেছে?

ছক্কা পাঞ্জা করা (বড় রকম কথা বলা) : পড়ালেখার বোঝা নেই, **ছক্কা পাঞ্জা** করার ওস্তাদ।

ছিঁচ কাঁদুনে (অল্পেই কাঁদে এমন) : নেবির মতো **ছিঁচ কাঁদুনে** মেয়ের কাছে কী আশা করা যায়?

ছা-পোষা (পোষ্য ভরাজনক/অত্যন্ত গরিব) : **ছা-পোষা** লোক দেশের কথা কী ভাববে?

ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো (সামান্যের বিশেষ প্রয়োজন) : কলিম হচ্ছে **ছাই ফেলতে ভাঙা কুলোর** মতো, তাকে দিয়ে একাজ করানো যায়।

ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধা (পরকে আপন করার চেষ্টা করা) : হঠাৎ **ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধার** শখ হল কেন আপনার? আগে তো এমন দেখি নি।

ছ কড়া ন কড়া (অপচয়/অবহেলা করা) : লাখি জিনিসটা **ছ কড়া ন কড়া** করে বেচে ফেললে?

ছয়কে নয় নয়কে ছয় (অপচয় করা) : রোজগার করতে পারো না, অথচ টাকা দিয়ে **ছয়কে নয়, নয়কে ছয়** করতে খুব শিখেছ।

ছাতা দিয়ে মাথা রাখা (বিপদে সাহায্য করা) : তিনি **ছাতা দিয়ে** আমার **মাথা রেখেছেন,** আমি তাঁর প্রতি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব।

ছিনিমিনি খেলা (নষ্ট করা) : আমরা সহজে পরের টাকায় **ছিনিমিনি খেলতে** পছন্দ করি।

জবড়জং (এলোমেলো) : পড়ার টেবিল **জবড়জং** অবস্থায় রাখা ভালো শিক্ষার্থীর লক্ষণ নয়।

জলভাত (সহজসাধ্য) : এসব অঙ্ক তাঁর কাছে **জলভাত।**

জলযোগ (হালকা খাবার) : দশটা বাজে, এখন **জলযোগ** হয় নি?

জলপান (হালকা খাবার) : **জলপান** যে করতে দেব শালিধানের চিঁড়ে।

জলপানি (বৃত্তি) : পরীক্ষায় ভালো ফল করে দশ টাকা **জলপানি** পেয়েছে।

জল (জগ) দেওয়া (ঠকানো) : সবাই মিলে ওই পেয়ারাকে দশ টাকা **জল** দিয়েছে।

জলগ্রহণ না করা (সম্পর্ক না রাখা) : ওর বাড়িতে আমি আর **জলগ্রহণ** করব না।

জলের দাগ (ক্ষণস্থায়ী) : আমাকে কি আর মনে থাকবে? আমার কথা নিশ্চয় **জলের দাগের** মতো মিলিয়ে গেছে।

জামাই-আদর (সাদর আদর-যত্ন) : ওখানে গিয়ে সে যা **জামাই-আদর** পেল তা আবার যায় না।

ঝিনির ঝোলা (ধ্বনি দেওয়া) : দর্শের ঝিনির তুলে সাম্প্রদায়িক ঐক্য নষ্ট করার ফল হলে সুস্পষ্টপ্রার্থী।

ঝীবন্তে-মারা (জীবন্মৃত) : বেঘোরে ভুগে ভুগে লোকটা এক রকম **জীয়ন্ত-মরা** হয়ে আছে।

জোড়ের পায়রা (ঘনিষ্ঠ বন্ধু) : দুটিতে যেন ঠিক **জোড়ের পায়রা,** সব সময়ই একসঙ্গে ঘুরে বেড়ায়।

জগা খিচুড়ি (বিশৃঙ্খল) : সব জগা খিচুড়ি না পাকিয়ে এক দিক থেকে গুছিয়ে পড়ো।

জগদ্দল পাথর (গুরুভার) : অনেক কুসংস্কার সমাজের বুকে **জগদ্দল পাথরের** মত চেপে আছে।

জিলাপির প্যাঁচ (কূটবুদ্ধি) : পেটে জিলাপির প্যাঁচ রেখে তুমি আর ভাল মানুষ সাজতে চেয়ো না।

জাহাজ্জামে যাওয়া (উচ্ছন্নে যাওয়া) : মায়ের আদরে আদরে ছেলেটা **জাহাজ্জামে** যাচ্ছে।

জলাঞ্জলি দেওয়া (বিসর্জন দেওয়া) : গিয়াস সাহেবের মান সম্মান **জলাঞ্জলি** দিতে হল নিজের ছেলের জন্যে।

জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ (ছোটবড় সব কাজ) : **জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ** সবই ওই একজনকেই করতে হয়।

জলে কুমির ডাঙায় বাঘ (উভয় সঙ্কট) : ধরা পড়লে শাস্তির ভয়, অন্যদিকে মালিকের আদেশ, **জলে কুমির ডাঙায় বাঘ,** যাই কোন দিকে?

ঝাঁকি দর্শন (ক্ষণিক দেখা) : কুমিল্লায় বেড়াতে গিয়ে **ঝাঁকি দর্শনের** জন্য হলেও ময়নামতি যাবে।

ঝাড়েবংশে (সবসুদ্ধ) : ওরা একেবারে **ঝাড়েবংশে** বদমাশ।

ঝাঁকের কৈ (এক দলভুক্ত) : ওরা সব **ঝাঁকের কই,** এক কথা তো বলবেই।

ঝাপে কোপে অথাপে (সর্বত্র বিরাজিত) : ও ঝাপে কোপে অথাপে সবখানেই আছে।

ঝড়া কাক (বিশর্ণ) : সারাদিন রাস্তায় ঘুরে ঘুরে **ঝড়া কাক** হতে বিশল বাসায় ফিরল।

ঝড়তি-পড়তি (ছোটখাটো অংশ) : ঝড়তি-পড়তি যা এই টিফলের আছে তা বড় হয় নি।

ঝিমেঝুল ফোটা (অল্প মূল্যের আলো) : অতি আর তাদিনই না আছি। আমার হেঁ ঝিমেঝুল ফুটে গেল।

কোলের লাড্ডু অথলের অম্ব (সব সময়ের জন্য সুলিয়ে থাকা) : ওকে বিশ্বাস করো না। ও সব সময়ই **কোলের লাড্ডু অথলের অম্ব।**

কোপে অথলে এক করা (নিশ্চিহ্ন ফেলা) : এক এক করে বলো। **কোপে অথলে এক করে** ফেলো না।

ঝরাপাতা (জীর্ণশীর্ণ লোক) : আমরা **ঝরাপাতার** দল, হাওয়া আমাদের কখনো-না একত্র জড় করে, কখনো-বা ছড়িয়ে দেয়।

ঝিকে মেরে বউকে শেখানো (একজনের মাধ্যমে অপরকে শিক্ষাদান) : চতুর লক্ষার ঝাঁচরে সংসারে অনেকেই **ঝিকে মেরে বউকে শেখায়।**

কোপ বুঝে কোপ মারা (সুযোগ মতো কাজ করা) : **কোপ বুঝে কোপ মারতে** পারলেই সফলতা পাওয়া যায়।

টুলো পণ্ডিত (পুথিগত বিদ্যাসার) : বিশ্বমানের হতে হলে শুধু কিছু জানা থাই, **টুলো পণ্ডিত** হলে চলবে না।

টই টম্বুর (কানায় কানায় পূর্ণ) : পুকুরটা জলে **টই টম্বুর** হয়ে আছে।

টনক নড়া (সজাগ হওয়া) : পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি দেখে বাবার **টনক নড়ল।**

টাকার আণ্ডিল (বিপুল টাকার মালিক) : লোকটা একটা আস্ত **টাকার আণ্ডিল।**

টাকার কুমির (ধনী ব্যক্তি) : বিবেকানন্দ চৌধুরি **টাকার কুমির,** কিন্তু ভীষণ কৃপণ।

টাকাটা সিকিটা (খুব সামান্য টাকা) : **টাকাটা সিকিটা** যা পাওয়া যায় তাই লাভ।

টুপ ডুবুরি (নেশায় বিভোর) : সব সময় **টুপ ডুবুরি** হয়ে থাকলে কোনো আশা নেই।

টেন্ডাই-মেন্ডাই (আস্ফালন) : এখন যত **টেন্ডাই-মেন্ডাই,** আসল কাজের সময় পালাবে।

Scanned with CamScanner

টানা পোড়েন (বিরক্তিকর যাতায়াত) : দুই পক্ষের টানা পোড়েনে আমার প্রাণ যায় যায়।

টেঁকে গোঁজা (আত্মসাৎ করা) : আমার পাঁচশ টাকা অমন নির্বিকারভাবে টেঁকে গুঁজে নিলে?

টুপি পরানো (খোসামোদ করা) : লোকটা তোমাকে টুপি পরিয়ে একগাদা টাকা খরচ করিয়ে নিয়ে গেল?

টাল সামলানো (বিপদ হতে মুক্তি) : আকস্মিক সাহেব ব্যাংক ঋণ পরিশোধ করে টাল সামলে উঠলেন।

টীকা ভাষ্য (দীর্ঘ আলোচনা) : বিষয়ের উপর টীকা ভাষ্য থাকলে পরীক্ষার্থীরা উপকৃত হয়।

ঠোলাপাতি (বনভোজন) : স্কুল ছুটি হলে ছেলেমেয়েরা ঠোলাপাতিতে মেতেছে।

ঠক বাছতে গাঁ উজাড় (পরিণামে শূন্য লাভ) : এত্তো আদর্শ খুঁজতে যেও না, তাহলে ঠক বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে।

ঠারে ঠারে (ইঙ্গিতে) : ঠারে ঠারে না বলে যা বলার সরাসরি বল।

ঠাডা লড়াই (গোপনে বিরোধিতা) : তাদের মধ্যে এমন ঠাডা লড়াই চলছে যে তা বাইরে থেকে বোঝা যায় না।

ঠোঁট কাটা (স্পষ্টভাষী) : এমন ঠোঁট কাটা লোক আর দেখি নি, গুরুজনদের সামনেও মুখে কিছু আটকায় না।

ঠেকা মেয়ে (চিরকুমারী) : জাফর সাহেবের ঠেকা মেয়েটিই তার সমস্যা।

ঠুঁটো জগন্নাথ (অকর্মণ্য) : অমন ঠুঁটো জগন্নাথ হলে সংসার চলবে কেমন করে?

ঠাঁট বজায় রাখা (অভাব চাপা রাখা) : বংশের গৌরব রক্ষার্থে অনেকেই ঠাঁট বজায় রেখে চলেন।

ডানাকাটা পরি (বাগার্থে: পরমা সুন্দরী) : আবু জাফর মিয়া তার ডানাকাটা পরি মেয়ের বিয়ের জন্য উপযুক্ত পাত্রই খুঁজে পাচ্ছে না।

ডিমে রোগা (চির-রুগ্ণ) : ওই ডিমে রোগা ছেলেটা আবার কী খেলবে?

ডান হাতের ব্যাপার (খাওয়া) : আগে ডান হাতের ব্যাপারটা সেরে নিতে দাও।

ডামাডোল (গোলযোগ) : রাজনীতির ডামাডোলে অনেকেই আখের গুছাচ্ছে ব্যস্ত।

ডকে ওঠা (নষ্ট হওয়া) : তার বানানো তো টাকার অভাবে কবেই ডকে উঠে গেছে।

ডুমুরের ফুল (বিরল বা দুর্লভ) : পরীক্ষায় ভাল করে ফরিদ এখন ডুমুরের ফুল হয়ে উঠেছে।

ডুবে ডুবে জল খাওয়া (গোপনে কাজ করা) : তুমি যে ডুবে ডুবে জল খাচ্ছ- সেটা সবাই জেনে গেছে।

ডাইনির কোলে ছেলে সঁপা (ভক্ষককেই রক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া) : ওই মেয়েটা তো আস্ত চোর। ওকে চালের বস্তা পাহারা দিতে বলা তো ডাইনির কোলে ছেলে সঁপা।

ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না (আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি) : সংসারে একগাদা খাইয়ে। এমনিতেই ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। তার উপর মাইনে পেতেও এত দেরি। কী করব বুঝতে পারছি না।

ঢেটরা পেটা (ব্যাপক প্রচার) : বহিম এসএসসি পরীক্ষায় বি-গ্রাস পেয়েও আনন্দে সে খবর গ্রামময় ঢেটরা পেটা করেছে।

ঢক্কা-নিনাদ (উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা) : নিজের গুণপনা নিয়ে ঢক্কা-নিনাদ করা শোভা পায় না।

ঢাকের কাঠি (তোষামুদে) : মিজান হচ্ছে মাঝি সাহেবের ঢাকের কাঠি, যা বলে তা শোনে।

ঢাক ঢাক গুড় গুড় (লুকোচুরি) : তোমার ঢাক ঢাক গুড় গুড় কাজ আমার ভাল লাগে না।

ঢাকের বাঁয়া (অপ্রয়োজনীয়) : তোমার মতো ঢাকের বাঁয়া সঙ্গে থাকাও যা, না থাকাও তাই।

ঢাকে কাঠি পড়া (সূচনা হওয়া) : আর দুচার দিনের মধ্যেই ভোটের ঢাকে কাঠি পড়বে।

ঢেঁকি অবতার (নির্বোধ লোক) : এমন ঢেঁকি অবতারের খাওয়া জুটবে কী করে?

ঢেরা সই (নিরক্ষর লোকের সই) : লিখতে জানো না তো কী হয়েছে? ঢেরা সই দিয়ে টাকা নেবে।

ঢেউ গনা (বাজে কাজে সময় নষ্ট) : তীরে বসে ঢেউ গুনে লাভ নেই- ঝাঁপিয়ে পড়।

ঢেঁকি না কুলো, না ঢেঁকি না কুলো (অন্যসংস্থানের উপায় না থাকা) : দুমাস মাইনে পায় নি, তার এখন না ঢেঁকি না কুলো অবস্থা।

ঢেঁপোনো (অকাজে সময় নষ্ট) : ঢেউ গুনে দিন কাটানো উচিত নয়।

ঢেঁকির কুমির (অপদার্থ) : তোমার মতো ঢেঁকির কুমির নিয়ে কোনো কাজই হবে না।

ঢি ঢি পড়া (কলঙ্ক) : তার কুকর্মের জন্য সমাজে ঢি ঢি পড়ে গেছে।

তলানো করা (স্থির করা) : গ্রামের লোক সবাই মিলেই পুকুর খননের স্থান তলানো করেছে।

তেল-কাজলা (চকচকে) : রবীন্দ্রনাথের কৃষ্ণকলি রূপে নিশ্চয়ই তেল-কাজলা ছিল।

ত-খরচ (বাজে খরচা) : হাতে আছে ত-খরচের জন্যে সামান্য কিছু টাকা।

তকে তকে থাকা (গোপনে সতর্ক থাকা) : পৌফিক তকে তকে আছে, কখন যে ধরে বলা যায় না।

তালগাছের আড়াই হাত (শেষ ও সবচেয়ে কঠিন অংশ) : প্রথমটা তাওলায় ভাওলায় উতরে গেল, এখনও ও কাজের তালগাছের আড়াই হাত বাকি।

তাল পাতার সেপাই (ক্ষীণজীবী) : রবিনের মত তালপাতার সেপাই নিয়ে কাজ হবে না।

তালের ঘর (ক্ষণস্থায়ী ঘর) : ছেলেটা খেলা করায় মায়ের সব স্বপ্ন তালের ঘরের মত ভেঙে গেল।

তামার বিষ (অর্থের কুপ্রভাব) : তোমাকে তামার বিষে পেয়েছে বলে মানুষকে মানুষ মনে কর না।

তারে নাচন (দূরবস্থার একশেষ) : তোমাকে এমন তারে নাচন নাচাবো, তখন বুঝবে শঠতার পরিণাম কী!

তেল-নুন-লকড়ি (মৌলিক প্রয়োজন) : সব কিছুর আগে আমাদের ভাবতে হয় তেল-নুন-লকড়ির সংস্থানের কথা।

তীর্থের কাক (প্রতীক্ষারত) : মঙ্গার সময় সাহায্যের আশায় তীর্থের কাক হয়ে বসে থাকে অনেক ক্ষুধার্ত।

তিন মাথা এক হওয়া (খুব বৃদ্ধ হওয়া) : তার তিন মাথা এক হয়ে গেছে, এখন আর পোশাক-আশাকের চাহিদা নেই।

ত্রিশঙ্কু অবস্থা (মধ্যাবস্থা) : দুই অফিস কর্তার দুই বিপরীত আদেশের ফলে আমার এখন ত্রিশঙ্কু অবস্থা।

ত্রিসংসারে (পরিবারে কেউ) : ত্রিসংসারে কেউ আবার আসছে।

ত্রুর্কি নাচন (নাজেহাল অবস্থা) : একবিংশ শতাব্দীতেও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যে ত্রুর্কি নাচন চলছে, এ কারণে দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হবে না।

ত্রুসের আঙন (দীর্ঘস্থায়ী মানসিক যন্ত্রণা) : পরীক্ষায় ছেলের জন্য বাবার চিরস্থায়ী ত্রুসের আঙন জ্বলছে।

তুলসী বনের বাঘ (সুবেশে দুর্বৃত্ত) : সোজা মনে হলেও আসলে বিবেকানন্দ চৌধুরী তুলসী বনের বাঘ।

তালকানা (বেতাল হওয়া) : এমন তালকানা হলে কি চলবে? একটু হুশ করে কাজ কর বাপু।

তাসের ঘর (ক্ষণস্থায়ী) : দুনিয়া বন্ধুত্ব স্বার্থের সামান্য আঘাতেই তাসের ঘরের মতো ভেঙে যায়।

তুবড়ি ছোটা (বেশি কথা বলা) : আমাদের বন্ধুদের মাঝে মনির ছিল তুবড়ি ছোটাতে ওস্তাদ।

তোলা হাঁড়ি (গম্ভীর) : মনি স্বামীর সাথে রাগ করে মুখখানা তোলা হাঁড়ি করে বসে আছে।

থুরে দেওয়া (জব্দ করা) : অন্যের পারিবারিক বিষয়ে নাক গলাতে এলে আবু জাফর মিয়াকে থুরে দেওয়া হয়েছে।

থ হওয়া (স্তম্ভিত হওয়া) : কর্তার চাকরি গেছে শুনে গিন্নি থ হয়ে গেল।

থ পাতা (স্থায়ীভাবে কিছু করা) : অনেকদিন তো থুরে বেড়ালে, এবার একটু থ পেতে বসো।

থোড়াই কেয়ার করা (গ্রাহ্য না করা) : ও আমার কী করবে? ওকে আমি থোড়াই কেয়ার করি।

থরহরি কম্প (ভয়ে প্রচণ্ড কাঁপা) : সামনে বাঘ দেখে চন্দনার থরহরি কম্প শুরু হয়ে গেল।

দক্ষযজ্ঞ (ব্যাপক আয়োজন) : ব্যাপারির বাড়িতে মন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে দক্ষযজ্ঞের সূচনা হলো।

দানোয় পাওয়া (ভূতে পাওয়া) : কোনো ব্যক্তির মধ্যে অসঙ্গতি দেখলেই গ্রামের লোক ভাবে লোকটিকে দানোয় পেয়েছে।

Scanned with CamScanner

বিশ্বংবদেষ্কা (কথামালা প্রকাশের সংখ্যা) : নিজের মেয়েটি বাদে পৃথিবীর সমস্ত মিষ্টি মেয়েকে বিশ্বংবদেষ্কা এক ঘোষণায় বিয়ে করেছে।

দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার (ঘোকন) : দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটা এখনও সারা হল না?

দড়ি-কলসি (আত্মহত্যার উপায়) : দড়ি-কলসির জোটে না তোমার?

দফা নিকেশ (সমূহ সর্বনাশ) : শত্রুরা আমাদের দফা নিকেশ করার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে।

দহরম-মহরম করা (ইতস্তত করা) : বলবো হবার আগেও মুহূর্ত পর্যন্ত সে খুব দহরম-মহরম করেছে।

দহরম মহরম (অন্তরঙ্গতা) : বড়লোকের সঙ্গে এত দহরম মহরম ভাল নয়।

দা-কুমড়ো সম্বন্ধ (শত্রুতা) : রামাদের দুভাইয়ের মধ্যে দা-কুমড়ো সম্বন্ধ।

দাঁতে দড়ি দিয়ে পড়ে থাকা (অনাহারে থাকা) : সারাদিন এইভাবে দাঁতে দড়ি দিয়ে পড়ে থাকবে।

দাঁড়কাকের ময়ূরপুচ্ছ (অনুকরণের হাসাকর চেষ্টা) : দোকানের কর্মচারী মালিকের মতো ঘন ঘন পোশাক পরিবর্তন করলে তাকে দাঁড়কাকের ময়ূরপুচ্ছ ছাড়া আর কী বলা যাবে?

দুধে ভাতে থাকা (সুখে থাকা) : আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।

দেঁতো হাসি (কৃত্রিম হাসি) : তোমার দেঁতো হাসি দেখে আর যেই ভুলুক, আমি ভুলছি না।

দুধ-ঘিয়ের শ্রাদ্ধ করা (অপব্যয়) : বিয়ে উপলক্ষে তারা সেদিন দুধ ঘিয়ের শ্রাদ্ধ করে ছেড়েছে।

দোজবরে (দ্বিতীয়বার যে ছেলে বিয়ে করতে চায়) : আমার মেয়েকে আমি দোজবরের সঙ্গে বিয়ে দেব না।

দুধের সাধ ঘোলে মিটানো (ভালর অভাব মন্দ দিয়ে পূরণ) : তুমি কলম চেয়েছিলে আমি পেনসিল এসেছি- আপাতত দুধের সাধ ঘোলে মেটাও।

দিন ফুরানো (আয়ু শেষ) : প্রভু, দিন ফুরানো অধম আমি, কৃপা কর আমাকে।

দুধের মাছি (সুসময়ে বন্ধু) : সুদিনে দুধের মাছির অভাব হয় না, কিন্তু দুর্দিনে একজনও মিলে না।

দু নৌকায় পা (উভয় সংকট) : দু নৌকায় পা দিয়ে কোনো কাজেই উন্নতি লাভ করা যায় না।

দক্ষিণার জোরে (টাকা পয়সা দিয়ে) : দক্ষিণার জোরে অনেকেই বিদেশি ডিগ্রি অর্জন করে।

ধোয়া তুলসীপাতা (নির্দোষ) : আমাদের দেশের রাজনীতিবিদগণ দুর্নীতির প্রশ্নে কেউ ধোয়া তুলসীপাতা নন।

ধুয়ো তোলা (অজুহাত বের করা) : সিলেবাস শেষ হয় নি- এমন ধুয়ো তুলে পরীক্ষা পেছাতে ছাত্রদেরই জুড়ি হয়।

ধর্মের কল (সত্য) : ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

ধরতাই বুলি (চালু কথা) : গণতন্ত্র হচ্ছে একটা ধরতাই বুলি, কথাটার মানে লোকে করুন?

ধড়া-চূড়া (সাজপোশাক) : অফিস থেকে বাড়ি এসে ধড়া-চূড়া ছেড়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

ধর্মের ষাঁড় (যথেচ্ছাচারী) : তোমার ছেলে হয়েছে ধর্মের ষাঁড়- কে তাকে বশে রাখবে?

ধামাধরা (তোষামোদকারী) : তোমার মতো এমন ধামাধরা লোক আর একজনও দেখি নি।

ধেয়ে নাচনি (ধিঙ্গি মেয়ে) : আমার কাজের মেয়েটা একটা ধেয়ে নাচনি, সারাদিন কোথায় যে টহল দেয়।

ধোপা নাপিত বন্ধ করা (একঘরে করা) : তুমি কি এমন অপরাধ করেছ, যে তারা তোমার ধোপা নাপিত বন্ধ করল?

ধোপার গাধা (পরের জন্য খাটা) : সারাজীবন ধোপার গাধা হয়ে কাটালাম— কেউ কি তার দাম দিল?

ধড়ে প্রাণ আসা (বিপদ থেকে উদ্ধার) : মাস্তান লোকটা চলে যাওয়ায় ধড়ে প্রাণ এল।

ধরাকে সরা জ্ঞান করা (অহঙ্কারে সব কিছুকে তুচ্ছ মনে করা) : টাকা হয়েছে বলে কি ধরাকে সরা জ্ঞান করতে হবে নাকি?

ধান ভানতে শিবের গীত (অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতরণা) : কেমন আছ জানতে চেয়েই তো মুশকিল হল দেখছি। তুমি যে এখন ধান ভানতে শিবের গীত আরম্ভ করলে।

ধান দিয়ে লেখাপড়া শেখা (নামমাত্র খরচ) : তুমি তো ধান দিয়ে লেখাপড়া শিখেছ, এর চেয়ে বেশি আর এগোতে পারবে কী করে?

নকুল-দানা পশ (সুকঠিন প্রতিজ্ঞা) : আমরা অনেক অনুরোধ করেছি, কিন্তু সব ব্যর্থ হয়েছে। নকুল-দানা পণ-এখন কিছুতেই বিয়ে করবে না।

নর্থপুর দুর্দান্তির (নার্সারি) : দেখতে মনে হয় নর্থপুর দুর্দান্তির, কিন্তু ভেতরে ভেতরে পাকাপোক্ত হাড়।

নদি মাছ নাই ছুই পানি (কোশলে কার্যোদ্ধার) : নদি মাছ নাই ছুই পানি নীতি আমি মোটেই পছন্দ করি না।

নরকুণ্ডলে (মূর্খ) : নাড়াবুলেদের স্বর্গে ধর্মের কথার মূল্য নেই।

নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা (নিজের অনিষ্ট করেও পরের ব্যাপক ক্ষতি করা) : সমাজে কিছু মানুষ আছে যারা নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করে আনন্দ পায়।

নখদর্পণে (পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আয়ত্তে) : এই শহরের সবকিছু আমার নখদর্পণে।

নবমী দশা (মূর্ছা) : কথাটা শুনেই সে নবমী দশা প্রাপ্ত হল।

নমাসে-ছমাসে (কালে-ভদ্রে) : সে আমার বাড়ি নমাসে-ছমাসে একবার আসে।

নয়-দুয়ারি (ন-দুয়ারি) (দ্বারে দ্বারে) : নয়-দুয়ারি হয়ে না ঘুরে এবার সংসারী হও।

নরক গুলজার (অনেকে জুটে সরগরম) : এখানে বসে তোমরা তো বেশ নরক গুলজার করছ দেখছি।

নাচতে নেমে ঘোমটা (বৃথা লজ্জা) : ব্যবসা করতে এসে ওসব ভাবলে চলে না, নাচতে নেমে ঘোমটা!

নারদের ঢেঁকি (বিবাদের বিষয়) : ওই নারদের ঢেঁকি সম্পত্তি নিয়ে কাজ নেই— আমি শান্তিতে থাকতে চাই।

নিজের ঢাক নিজে পেটানা (আত্মপ্রকাশ) : এ যুগে নিজের ঢাক নিজেই পেটাতে হবে।

নুড়ো জ্বেলে দেওয়া (মৃত্যু কামনা করা) : অমন স্বামীর মুখে নুড়ো জ্বেলে দিতে হয়।

নোলা বাড়ানো (লোভ করা) : খাবার দেখলেই অমন করে নোলা বাড়াও কেন?

নকড়া ছকড়া করা (হেলা ফেলা করা) : কাজের জিনিস নকড়া ছকড়া করা ঠিক নয়।

নগদ নারায়ণ (নগদ অর্থ) : লোকটাকে নগদ নারায়ণ দিয়ে বিদায় করো।

নস্যর দেওয়া (তুচ্ছ) : পাওনার সামান্য নস্যর দেওয়া ঠিক নয়।

নদির পুরুল (সেতুর কাছের আকার আকৃতির সুন্দর) : তোমার মতো নদির পুরুলের ধার এ কাজে হবে না।

নয় ছয় (অগোছাল) : অফিসের টেবিলের ফাইল নয় ছয় হয়ে পড়ে থাকলে টাকা পয়সার হিসাব তার নিজামপুরহাটের শাখা (সেখানের দর্শন) : ওখানে অনেক টাকা খরচ করেও তার কোনো চিহ্ন নিজের চরকায় তেল দেওয়া (নিজের কাজে মন দেওয়া) : আমার সমালোচনা না করে তুমি একবার নিজের চরকায় তেল দাও।

নেই আঁকড়া (একগুঁয়ে স্বভাবের) : তোমার মতো নেই আঁকড়াকে দিয়ে কিছু হবে না।

নিমরাজি (অনিশ্চিত স্বীকার করা) : অনেক কষ্টের পর কাজটির জন্য তাকে নিমরাজি করাতে পারলাম।

পড়ে-পাওয়া চোদ্দ আনা (বিনা পরিশ্রমে প্রাপ্ত) : পৈতৃকসূত্রে পড়ে-পাওয়া চোদ্দ আনা জমি বিক্রি করতে বন্ধুদের কোনোই মনস্থ হচ্ছে না।

পয়দানখর (অতি চমৎকার) : তোমার জন্য পয়দানখর জামা কেনা হয়েছে।

পুকুর-চুরি (বড় রকমের চুরি) : ব্যাঙ্কিং ব্যাংক-পাড়ায় গড়বাড়ে পুকুর-চুরি হয়েছে।

পঞ্চত্ব প্রাপ্ত (মারা যাওয়া) : কোটালের পো এক ঘাতেই পঞ্চত্ব পেলেন।

পই পই করে (বার বার স্মরণ করিয়ে দেওয়া) : পই পই করে বলার পরও তুমি বইটি আনলে না।

পরঘড়ি পাত্তা মারি (হাড়হাভাতে লোক) : সে তো আর তোমাদের মতো পরঘরি পাত্তা মারি নয় যে না ডাকতেও নেমন্তন্ন খেতে যাবে।

পর্বতের মূষিক প্রসব (বিরাট সম্ভাবনার সামান্য প্রাপ্তি) : এত আলোচনা এত প্রতিশ্রুতির পরে এইটুকু পেলাম? এ তো পর্বতের মূষিক প্রসব হলো।

পশ্চিমদিকে সূর্য ওঠা (অসম্ভব ব্যাপার) : জাফর কিপটে যেদিন একশো টাকা দান করবে সেদিন পশ্চিম দিকে সূর্য উঠবে।

Scanned with CamScanner

পায়ে রাখা (আশ্রয় দেওয়া) : দয়া করে আপনার পায়ে রাখুন, নইলে এই অভাগা কোথায় যাবে?

পাকে-প্রকারে (কলে-কৌশলে) : তাকে একবার পাকে-প্রকারে রাজি করাতে হবে।

পাণ্ডবর্জিত (সভা লোকের বাসের অযোগ্য) : কে যাবে ওই পাণ্ডবর্জিত জায়গায়?

পাথরে পাঁচ কিল (অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন) : ফটিকের লটারি জেতার খবর এল। এখন ফটিকের পাথরে পাঁচ কিল।

পান থেকে চুন খসা (সামান্য ত্রুটি হওয়া) : তাঁর সঙ্গে কাজ করে শান্তি নেই, পান থেকে চুন খসলেই বকুনি।

পান্তা ভাতে ঘি (অপব্যবহার) : কিসের মধ্যে কী, পান্তা ভাতে ঘি।

পায়াভারি (অহংকার) : ভালো চাকরি পেয়ে ওর খুব পায়াভারি হয়েছে।

পাষাণ ভাঙা (দাঁড়িপাল্লায় ফের ভাঙা) : আগে তোমার পাষাণ ভাঙো, তারপর ওজন করো।

পিঁপড়ের পেট টেপা (অত্যধিক হিসাব করে চলা) : ওভাবে পিঁপড়ের টেপ টিপে সংসার চালাতে পারে না সবাই।

পুঁটিমাছের প্রাণ (ক্ষীণজীবী লোক) : একটু পরিশ্রমেই আমাদের পুঁটিমাছের প্রাণ যেন যায় যায়।

পুথি বাড়ানো (ফেনিয়ে বর্ণনা করা) : আর পুথি না বাড়িয়ে সংক্ষেপে আসল কথাটা বলো।

পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটা (অপ্রীতিকর আলোচনা) : আর পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে কাজ নেই, অন্য কথা বলো।

পঞ্চমুখ হওয়া (অতিরিক্ত কথা বলা) : জামানের লেখা পড়ে শিক্ষক পঞ্চমুখ হয়ে প্রশংসা করলেন।

পটল তোলা (মারা যাওয়া) : বুড়ো আজ বাদে কাল পটল তুলবে অথচ রাগ কমে না।

পটের বিবি (সুসজ্জিত) : পটের বিবি হয়ে বসে থাকলে সংসার চলবে কেমন করে?

পত্রপাঠ (তৎক্ষণাৎ) : তার কথা শুনে পত্রপাঠ জাহিদকে বিদায় করা হলো।

পালের গোদা (দলপতি) : পালের গোদা দক্ষ না হলে তো দলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবেই।

পসারপার (পালানো) : বাবু জাত চোর, টের পাওয়া মাত্রই পসারপার করেছে।

ফেকলু পার্টি (কদরহীন লোক) : যাওয়ার আশায় বিয়ে বাড়িতে ইদানীং ফেকলু পার্টি হানা দিচ্ছে।

ফোপর-দালাল (উপযাচক হয়ে অন্যের ব্যাপারে কথা বলা) : পারিবারিক কলহ মীমাংসা করতে বাকিকে না ডাকা হলেও সে ফোপর-দালাল সেজে বসেছে।

ফতো নবাব (সম্বলহীনের বড়লোকিভাব) : আজানের পোশাক ও ব্যবহার ফতো নবাবের মতো মনে হয়।

ফুটিফাটা (চৌচির) : প্রচণ্ড গ্রীষ্মে মাটি একেবারে ফুটিফাটা হয়ে গেছে।

ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাওয়া (সামান্য পরিশ্রমে কাতর) : আমি তো আর তোমার মতো ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাই না, আমাকে খেটে খেতে হয়।

ফোঁস মনসা (ক্রোধী লোক) : ওকে আমি বলতে পারব না, ও তো একেবারে ফোঁস মনসা।

ফপর দালালি (অতিরিক্ত চালবাজি) : সব জায়গায় ফপর দালালি করতে গেলে বকা খেতে হয়।

বাস্তুঘুঘু (অতি ধূর্ত লোক) : ঠাকু মিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে সাবধান থেকো। জানো তো, তার মত বাস্তুঘুঘু দ্বিতীয়টি নেই।

বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধা (বিপদের ঝুঁকি নেওয়া) : অধ্যক্ষ মহোদয়ের কাছে গেলেই ছুটি পাওয়া যাবে সত্য। কিন্তু তাঁর কাছে যাওয়া আর বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধা একই কথা।

বিন্দু বিসর্গ (সামান্য অংশ) : এই ব্যাপারে আমি বিন্দু বিসর্গ জানি না।

বউ-কাঁটকি (পুত্রবধূকে যন্ত্রণা দেয়) : মেয়েটাকে তার বউ-কাঁটকি শাশুড়ি এমনই জ্বালায় যে সে এখন বাপের বাড়ি আসতে পারলে বাঁচে।

বক দেখানো (অশোভনভাবে বিদ্রূপ করা) : আড়ালে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত আমাকে বক দেখাতে লাগল।

বচনবাগীশ (কথায় পটু) : কেবল বচনবাগীশ হলে তো চলবে না, কাজও করে দেখাতে হবে।

বটের গাছ-পাথর না থাকা (অত্যন্ত বৃদ্ধ) : তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন তোমার বটের গাছ-পাথর নেই।

বইয়ের পোকা (পড়ুয়া) : বাপু হয়ে বইয়ের পোকা সই পেলে হাতছাড়া করে না।

বর্ণচোরা আম (বাহ্যিক একমাত্র পরিচয় নাই/কপট ব্যক্তি) : সে তো একটা বর্ণচোরা আম, তার আসল পরিচয় তোমরা কেউই জানো না।

বরে গোরুতে এক ঘাটে জল খাওয়া (ক্ষমতা প্রদর্শন) : বড় কর্তার দাপটে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায়।

বাঙালকে হাইকোর্ট দেখানো (সরল লোককে প্রতারণা) : আমাকে বাঙাল ভেবে হাইকোর্ট দেখাতে চাও নাকি? সুবিধা হবে না।

বাড়া ভাতে ছাই দেওয়া (সফলতা হওয়ার মুখে বাধা) : কেউ তার বাড়া ভাতে ছাই দেয় নি। তাহলে তার এত রাগ কিসের?

বামন হয়ে চাঁদে হাত দেওয়া (অসম্ভব কিছু পাবার চেষ্টা) : বড় লোক হবার শখ দিয়েছে তো? কেন বাপু বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে গিয়েছিলে?

বামনের গরু (যে অল্প পারিশ্রমিকে বেশি কাজ করে) : ভেবে লাভ নেই। খাটতে তো হবেই। তুমি যে বামুনের গরু হয়ে জন্মেছ।

বারো সতেরো (খুঁটিনাটি) : আমার অবসর কোথায়? সারাদিন বারো সতেরো লেগেই আছে।

বারো মাস ত্রিশ দিন (প্রতিদিন) : বারো মাস ত্রিশ দিন এই হাঁড়ি ঠেলা কার ভালো লাগে?

বারো মাসে তেরো পার্বণ (উৎসবের আধিক্য) : পাড়াগাঁয়ে বারো মাসে তেরো পার্বণ তো লেগেই আছে।

বালির বাঁধ (ক্ষণস্থায়ী) : বড়লোকের দয়ার উপর ভরসা করা যায় না- সে তো বালির বাঁধ।

বাতাসে ধরা (মতিচ্ছন্ন হওয়া) : কী আবোল-তাবোল বলছ, তোমায় কি বাতাসে ধরেছে?

বিড়াল-তপস্বী (ভণ্ড লোক) : সাধু সেজে থাকলেও সে যে আসলে একটি বিড়াল-তপস্বী তা এখন সবাই বুঝে গেছে।

বিড়ালের আড়াই পা (ক্ষণস্থায়ী রাগ) : তার কাছে যেতে ভয় পাচ্ছ কেন? তার রাগ তো বিড়ালের আড়াই পা।

বিনা মেঘে বজ্রপাত (অপ্রত্যাশিত বিপদ) : হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো বাবার মৃত্যু হল।

বিরাশি সিক্কা ওজন (বিপুল ওজন) : সে তখন নিল বিরাশি সিক্কা ওজনের এক চড়।

বুড়ি ছোঁয়া (সামান্যে নিয়ম পালন) : অফিসের কাজে চার আর ফেলন মন দেখি না, কেবল বুড়ি ছোঁয়া যায়।

বুড়ো বয়সে দুষ্কাকরণ (বোকামি) : বুড়ো বয়সে তোমার এই দুষ্কাকরণ মানায় না।

বুদ্ধির ঢেঁকি (নির্বোধ লোক) : ও যা বুদ্ধির ঢেঁকি, ওর ওপর নির্ভর করা যায় না।

বেনাবনে মুক্তো ছড়ানো (অপাত্রে মূল্যবান জিনিস) : এক ঘণ্টা ধরে এই যে আমি দামি কথা শোনালাম ওদের, এতে কিছু লাভ হবে? ওরা কি তোমার কথামতো কাজ করবে? কী হবে বেনাবনে মুক্তো ছড়িয়ে?

বোঝার উপর শাকের আঁটি (অতিরিক্তের অতিরিক্ত) : আমার এত জিনিসের মধ্যে তোমার ওই বইগুলো তো বোঝার উপর শাকের আঁটি।

ব্যাঙের আধুলি (সামান্য পুঁজি হলেও যা গর্বের) : স্বামীর রেখে যাওয়া ওই বটি টাকা এখন বিধবার ব্যাঙের আধুলি হয়েছে।

ব্যাঙের নাথি (নগণ্য লোকের দ্বারা অপমান) : না হয় বয়স হয়েছে, তাই বলে কি আজ ব্যাঙের নাথি খেতে হবে?

ব্যাঙের সর্দি (অসম্ভব ব্যাপার) : ব্রজবাবু টাকা দান করেছেন? এ ব্যাঙের সর্দি ছাড়া আর কী?

বকধার্মিক (ভণ্ড) : সমাজে বকধার্মিকের অভাব নেই।

বগল বাজানো (আনন্দ প্রকাশ করা) : পরকে বিপদে পড়তে দেখলে বগল বাজিয়ো না।

বল্ল আঁটুনি ফসকা গেরো (বাইরে আড়ম্বর ভেতরে শূন্যতা) : কাজের আয়োজনের সময়ে খুব আঁটাআঁটি, কিন্তু শেষ দিকে যত শিথিলতা- এযে বল্ল আঁটুনি ফসকা গেরো।

বয়ে যাওয়া (ক্ষতিবৃদ্ধি জ্ঞান না করা) : তোমার পাশের মিষ্টি না খেলে আমার বয়েই গেল।

Scanned with CamScanner

বসন্তের কোকিল (সুবিধের বন্ধু) : দুর্দিনে তো বসন্তের কোকিল, সুদিনের দিনে সে পাশে থাকবে না।

ভূতের মুখে রাম নাম (অনুচিত ক্রিয়াকর্ম) : পরনিন্দুক নন্দু মিত্তির যখন কারো প্রশংসা করে তখন সেটা ভূতের মুখে রাম নামের মত শোনায়।

ভয়ে কেঁচো হয়ে থাকা (ভয়ে জড়সড় হওয়া) : ওই ঝোপা-পাকা লোকটার ভয়েই তুমি কেঁচো হয়ে আছ?

ভাঁড়ে মা ভবানী (একেবারে নর্দ্রি) : টাকা দেবে কোত্থেকে? ভাঁড়ে যে মা ভবানী।

ভিমরুলের চাকে খোঁচা দেওয়া (উস্কানি দেয়া) : কী দরকার ভিমরুলের চাকে খোঁচা দিয়ে? চুপচাপ সহ্য করে যাও।

ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা (অনড় সংকল্প) : ও যদি বলে যাবে না তো যাবেই না, ওর ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা থেকে ওকে কেউ নড়াতে পারবে না।

ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ (অশোভনজনক ব্যাপার) : একে লোডশেডিং তার উপর তুমুল বৃষ্টি। এত ভালো আয়োজন সত্ত্বেও সব ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ হল।

ভালুক জ্বর (এই আসে, এই যায়) : নতুন প্রধান শিক্ষক ছাত্রদের ভালুক জ্বর ছাড়িয়ে দিয়েছেন।

ভূষণ্ডির কাক (বিচক্ষণ ব্যক্তি) : সব অধ্যাপকই ভূষণ্ডির কাক হতে পারেন না। (বি. দ্র. পুরাণে ভূষণ্ডি নামের এক ত্রিকালজ্ঞ কাকের নাম পাওয়া যায়।)

ভস্মে ঘি ঢালা (নিষ্ফল কাজ) : মাস্তান কামালকে উপদেশ দেওয়া আর ভস্মে ঘি ঢালা একই কথা।

ভদ্র মাসের তাল (প্রচণ্ড কিল) : পিঠে ভদ্র মাসের তাল পড়লেই ঠিক হবে।

ভানুমতীর খেল (অবিশ্বাস্য ব্যাপার) : না পড়ে প্রথম বিভাগে পাস করে সে ভানুমতীর খেল দেখিয়েছে।

ভেজে বিড়াল (কপটচারী) : মনে করেছিলাম শিরিন ভিজে বিড়াল, এখন দেখি তা না।

ভয় ঘুঘু চরানো (সর্বস্বান্ত করা) : আগের দিনে অনেক জমিদারই প্রজার ভিটেয় ঘুঘু চরাতেন।

ভূত ঝাড়া (নির্দয়ভাবে প্রহার বা শাসি দেওয়া) : শিক্ষক এমন ভূত ঝাড়া ঝাড়লেন যে ছাত্ররা পড়া শিখে ক্লাসে আসবে কি না হলো।

ভূতের বেগার খাটা (নিষ্ফল পরিশ্রম করা) : এত করলাম তবু নাম হলো না- শুধু ভূতের বেগার খাটা হলো।

ভরাডুবি (সর্বনাশ) : কারো ভরাডুবি ঘটতে গেলে নিজেকেই ভরাডুবিতে পড়তে হয়।

ভেরেন্ডা ভাজা (অকাজে সময় নষ্ট করা) : সময়ের কাজ সময়ে করা উচিত, ভেরেন্ডা ভাজা ঠিক নয়।

ভুইফোড় (নতুন আগমন) : ভুইফোড়দের আগমনে পুরাতনদের কদর কমে যায়।

মুখে ফুল-চন্দন পড়া (ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হওয়ার কামনা) : তুমি বলেছো, আমি গোত্তেন এ প্লাস পাবো?- তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক।

মামদোবাজি (প্রতারণা) : শহরের রাস্তায় কিছু লোক মামদোবাজি করে জীবন চালায়।

ম-ম করা (সুগন্ধে ভরে যাওয়া) : ঘরটা গোলাপের গন্ধে একেবারে ম-ম করছে।

মকশো করা (অভ্যাস করা) : দুদিন ধরে সে কায়দাটা মকশো করছে।

মণিকাঞ্চন যোগ (উপযুক্ত মিলন) : যেমন পাত্র তেমনি পাত্রী- একেবারে মণিকাঞ্চন যোগ।

মণিহারা ফণী (প্রিয়জনের জন্য অস্থির লোক) : একটা সামান্য কলম হারিয়েই সে এমন মণিহারা ফণীর মতো ভাব করছে?

মন উচাটন হওয়া (অস্থির হওয়া) : ছেলে দূরে থাকে, তাকে দেখার জন্য মাঝে মাঝে মন একটু উচাটন হয় বইকি!

মশা মারতে কামান দাগা (সামান্য কাজে বিরাট আয়োজন) : একটা ছিঁচকে চোর ধরতে এত আয়োজন? এ তো মশা মারতে কামান দাগার ব্যবস্থা।

ময়ূর ছাড়া কার্তিক (রূপবান পুরুষ) : সুন্দর পোশাকে সালামকে দেখাচ্ছে একেবারে ময়ূর ছাড়া কার্তিকের মতো।

মহাভারত অশুদ্ধ (বড় রকমের অপরাধ) : না হয় তাঁকে নেমন্তন্ন করা হয় নি- তাতে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হল?

মাছের কেলে মাছ ভাজা (পরে পরে কার্যোদ্ধার) : বাড়ির সুদের টাকায় দোকান কিনে মাছের কেলে মাছ ভাজলেন।

মাছের মায়ের পুত্রশোক (লোক-দেখানো শোক) : বুঝতি বুঝেছি, তোমাকে আর মাছের মায়ের পুত্রশোক দেখাতে হবে না, আমার জানা তোমার দরদ কত তা জানা আছে।

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া (আকস্মিক বিপদে) : এই দুর্ঘটনায় তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।

মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল (ভীষণ বিপদে অস্থির অবস্থা) : এদিকে চাকরি নেই, ওদিকে বাড়িতে অসুখ লেগেই আছে, তার এখন মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল অবস্থা।

মাথে ওড়ে বালি (সম্মানহানি) : মানের গুড়ে বালি দিয়ে মেয়েটা ভেগেছে।

মান্ধাতার আমল (অতি প্রাচীনকাল) : এ কী পরেশ? এ তো সেই মান্ধাতার আমলের পোশাক?

মিষ্টির ছুরি (আপাতমধুর কিন্তু তীক্ষ্ণ ও দুর্ভেদী) : কথা তো নয় যেন মিষ্টির ছুরি!

মেঘ না চাইতে জল (আশাতীত ফল) : চাইলাম চা, এনে দিলে এক প্লেট লুচি-হালুয়া; এ যে মেঘ না চাইতেই জল!

মেঘে মেঘে বেলা হওয়া (বয়স বাড়া) : তাকে মোটেই ছোট মনে করো না, মেঘে মেঘে বেলা কম হয় নি।

মৌতাত চড়ানো (নেশা করা) : শত ডাকাডাকি করলেও তিনি এখন আসবেন না; তিনি এখন মৌতাত চড়াচ্ছেন।

মগের মুল্লুক (অরাজক দেশ) : চাঁদা চাইলেই দিতে হবে, মগের মুল্লুক পেয়েছ নাকি?

মাকালা (উচ্চকণ্ঠে শোক প্রকাশ) : ছেলে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে শুনে মা মরাকান্না জুড়ে দিল।

মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা (বিপন্ন লোকের উপর অত্যাচার) : চাকরি গিয়ে রক্ষা নেই, জরিমানা লক্ষ টাকা- এ যে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা।

মাকাল ফল (অন্তঃসারশূন্য) : মাকাল ফল সম্পন্ন লোককে কেউ পছন্দ করে না।

ম্যাও ধরা (দায়িত্ব নেওয়া) : না বুঝে ম্যাও ধরা ঠিক না।

মোক্তার পৌঢ় মসজিদ পর্যন্ত (দিশেহারা) : জমল, খালা, কৌতুক, জিনিসটা যা দিয়েই শিরোনাম দাও, সবকিছুর শেষেই আলাপ হোক না কেন শেষ অবধারিত ঘর একই বসে মোক্তার পৌঢ় মসজিদ পর্যন্ত।

যখন-তখন অবস্থা (দুরবস্থা) : বাপের যখন-তখন অবস্থা, সেসব মায়ের বাড়ি চলে গেল।

যজ্ঞের কই (বেশ্যাপল্লীতে মদ্যপ নেশা নেই) : সুন্দর করের সঙ্গে সব যজ্ঞের কই হয় মানাবে না।

যাহা বাহান্ন তাহা তিপ্পান্ন (খুব সম্ভবনা তাদের) : কেবল এরে গাল দিস্ কেন? এও যা সেও তাই- যাহা বাহান্ন তাহা তিপ্পান্ন।

যক্ষের ধন (কৃপণের ধন) : কুড়ে যক্ষের মত তার সম্পর্কে আগলে বেরোয়।

যমের অরুচি (যে সহজে মরে না) : দুঃখ প্রাণ যমেরও অরুচি, নইলে এভাবে কেউ বাঁচে!

যম যন্ত্রণা (খুব কষ্ট) : অভাবের সংসারে বাচ্চাদের যম যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছু নেই।

যমের দোসর (নিষ্ঠুর ব্যক্তি) : লোকটা যমের দোসর, তার ছায়া না মাড়ানোই ভালো।

যমের ভুল (যার মরণ হয় না) : কাউকে সান্ত্বনা আমি কি তাহলে যমের ভুলে বেঁচে আছি?

রথ দেখা কলা বেচা (উভয়কর্ম সাধন) : অফিসের কাজে কক্সবাজার গিয়ে সমুদ্র-স্নানও করে এলাম। একই সাথে রথ দেখা কলা বেচা দুটোই হলো।

রাম ভজি কি রহিম ভজি (উভয় সংকট) : একই দিনে পড়েছে বিসিএস (প্রিলিমিনারি) আর এমএ পরীক্ষা। আমার তো রাম ভজি কি রহিম ভজি অবস্থা।

রক্তের অক্ষরে লেখা (সংগ্রামের কাহিনি) : এই সব বীর দেশপ্রেমিকের কথা রক্তের অক্ষরে লেখা থাকবে।

রগচটা (অল্পেই রাগ) : আত্মসম্মান বাঁচাতে চাইলে রগচটাদের কাছ থেকে দূরে থাকাই ভালো।

রাঙা শুক্রবার (কোনো দিনই নয়) : কবে আর ওটা আমাকে দেবে? রাঙা শুক্রবারে?

না রাম না গঙ্গা (ভালো মন্দ কিছুই না) : আমি যতই প্রশ্ন করি সে না রাম না গঙ্গা কিছুই বলে না।

Scanned with CamScanner

রাম রাজত্ব (শান্তিশৃঙ্খলাযুক্ত রাজা) : মুখে রাম রাজত্বের কথা বললেও চলছে এখন রাবণত্ব।

রামলক্ষ্মণের ছানা (গোমড়ামুখো লোক) : কী ব্যাপার, তখন থেকে রামলক্ষ্মণের ছানা হয়ে আছ যে?

রুই-কাতলা (প্রতিপত্তিশালী লোকজন) : আমরা তো চুনোপুঁটি, ধরতে চাও, তো রুই-কাতলাদের ধরো।

রাই কুড়িয়ে বেল (ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে বৃহৎ) : ধৈর্য ধরে কাজ করে যাও একদিন দেখবে রাই কুড়িয়ে বেল তবেছ।

রাঘব বোয়াল (সর্বগ্রাসী ব্যক্তি) : সমাজের রাঘব বোয়ালরাই সব লুটে খায়।

রাঙা মুলো (প্রিয়দর্শন কিন্তু গুণহীন) : এমন রাঙা মুলো দিয়ে এ কঠিন কাজ হবে না।

রাজা উজির মারা (আড়ম্বরপূর্ণ গালগল্প) : লেখাপড়ার নাম নেই কেবল রাজা উজির মারা হচ্ছে।

রাবণের গোষ্ঠী (বড় পরিবার) : রাবণের গোষ্ঠীকে পালতে গিয়েই আমার জীবন শেষ।

রাবণের চিতা (চির অশান্তি) : একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে বুড়ির বুকে রাবণের চিতা জ্বলছে।

রাশভারি (গম্ভীর প্রকৃতির) : রাশভারি লোকের সহ্যশক্তি একটু বেশিই হয়।

লবেজান করা (নাজেহাল করা) : চিড়িয়াখানায় কিছু দুষ্ট মানুষ কাঞ্চনকে লবেজান করে ছেড়েছে।

লক্কা পায়রা (ফুল বাবু) : বেকার মানুষ তুমি। অথচ লক্কা পায়রা হয়ে ঘুরে বেড়াও কেন?

লঘুপাপে গুরুদণ্ড (সামান্য অপরাধে গুরুতর শাস্তি) : সামান্য একটা ভুলের জন্যে ছেলেটাকে এমনভাবে মারলে? লঘুপাপে গুরুদণ্ড হয়ে গেল না?

লোটাকম্বল (সামান্য সংগতি) : লোটাকম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন নিরুদ্দেশ যাত্রায়।

লোহার কার্তিক (কালো সুদর্শন) : লোহার কার্তিক হলেও সমাদরযোগ্য কিন্তু নদীর পুতুল আমার প্রয়োজন নেই।

লগন চাঁদা (ভাগ্যবান) : নিজের তো আছেই, স্ত্রীর সম্পত্তিও পেয়েছে, জামাইের মত লগন চাঁদা আর কে?

লেজে গোবরে করা (বিশৃঙ্খলা করা) : যোগ্যতা না থাকলে কাজ তো লেজে গোবরে করবেই।

লেজে পা পড়া (অপমানিত হওয়া) : ওই ভালোকেই হোক, লেজে পা পড়লে কেউ তা সহ্য করে না।

লেফাফা দুরস্ত (বাইরে পরিপাটি) : ছেলেটার ঘাকুক না কেন, সে আচারে বেশ লেফাদা দুরস্ত।

ওঁড়ির সাক্ষী মাতাল (অসৎ লোকের অসৎ বন্ধু) : ওঁড়ির সাক্ষী মাতালের মতো চোরকে থানা থেকে ছাড়াতে এসেছে অন্যের পকেটমার।

শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ (ভীষণ লড়াই) : অমলের রাজনীতিতে বন্ধুত্বের চেয়ে নেতাদের শুম্ভ-নিশুম্ভের লড়াই যেন বেড়েই চলেছে।

শবরীর প্রতীক্ষা (দীর্ঘকাল ধরে প্রতীক্ষা) : তুমি ফিরে এসেছ, তোমার শবরীর প্রতীক্ষাও শেষ হল।

শালগ্রামের শোয়া বসা (নির্বিকার লোকের মনের অবস্থা) : তাঁর মনের কথা জানব কী করে? দুখেও হা-হুতাশ নেই, সুখেও হই চই নেই। শালগ্রামের শোয়া বসা বোঝা ভার।

শিবরাত্রির সলতে (একমাত্র বংশধর) : আমার ওই শিবরাত্রির সলতেকে কি দূরে যেতে দিতে পারি?

শিয়রে শমন (মৃত্যু আসন্ন) : আমার এখন শিয়রে শমন, তাই মাথারও ঠিক নেই।

শিয়ালের যুক্তি (অসম্ভব যুক্তি) : তোমার ওই শিয়ালের যুক্তি রাখো তো, কাজের কথা কিছু বলো।

শিরে সংক্রান্তি (সামনেই বিপদ) : আমার এখন শিরে-সংক্রান্তি, কিভাবে সব সামলাব তাই ভাবছি।

শুঁড় বার করা (লোভ করা) : আমার কলমটাকে অমনি শুঁড় বার করছ কেন?

শুয়োরের গোঁ (ভয়ানক) : তোমার ওই শুয়োরের গোঁ ছাড়তে হবে– নইলে আমি কথাই বলব না।

শ্মশান-বৈরাগ্য (সাময়িক বৈরাগ্য) : ও রকম শ্মশান বৈরাগ্য তো অনেকেই দেখছি, সত্যিকার ত্যাগ করতে পারে কজন?

শ্যাম রাখি না কুল রাখি (উভয়সংকট) : ঘরে গৃহিণীর অভিমান আর অফিসে বড়বাবুর র‍্যাগ। আমার এখন শ্যাম রাখি না কুল রাখি অবস্থা।

শকুনি মামা (অনিষ্টকর আত্মীয়) : শকুনি মামাদের কাছে থেকে যত দূরে থাকবে ততই মঙ্গল।

শনির দশা (দুরবস্থা) : আমার শনির দশা কবে যে কাটবে!

শাঁখের করাত (উভয় সংকট) : সাঁতা কথা বললে বোকামির চাকরি যাবে, আর গোপন করলে মনিবের ক্ষতি- এ যে শাঁখের করাত।

শাক দিয়ে মাছ ঢাকা (দোষ গোপনের বৃথা চেষ্টা) : লেখাপড়া না করে, শাক দিয়ে মাছ ঢাক কেন?

শাপে বর (অনিষ্টে ইষ্ট লাভ) : তার অপকার করতে গিয়ে বরং হাজার টাকা লাভ হলো, একেই বলে শাপে বর।

শ্রীঘর (জেলখানা) : দুর্নীতির দায়ে রাজনীতিবিদদেরও শ্রীঘরে যেতে হয়।

শিকায় তোলা (স্থগিত) : পরীক্ষা শিকায় তোলা হলে লাভ থেকে নবর্ফাইই বেশি।

ষাঁড়ের গোবর (অপদার্থ লোক) : ছেলেগুলো সব ষাঁড়ের গোবর, পড়ে পড়ে মার খায়।

ষড় পড় জ্ঞান (কাণ্ডজ্ঞান) : ষড় পড় জ্ঞান নেই যার এমন লোক হল সভাপতি!

ষোল কড়াই কানা (সম্পূর্ণ বিনষ্ট) : অপদার্থের হাতে পড়ে সংসারের ষোল কড়াই কানা হল দেখছি।

ষাটের কোলে (অধিক বয়স) : ষাটের কোলে এসেও তোমার পরকালের চৈতন্য হল না।

সাত কাণ্ড রামায়ণ শুনে সীতা কার বাপ (চরম অমনোযোগ ও নির্বুদ্ধিতার পরিচয়) : 'বনলতা সেন' কবিতা নিয়ে এতো বিস্তৃত আলোচনা শোনার পর জিজ্ঞেস করছো : বিদিশার বাড়ি কোথায়? এ যে সাত কাণ্ড রামায়ণ শুনে সীতা কার বাপের মতো প্রশ্ন!

সবেধন নীলমণি (একমাত্র সম্পদ) : পরপর তিন সন্তান মৃত্যুর পর এই অন্ধ সন্তানই মাতাপিতার কাছে সবেধন নীলমণি।

সপ্তমে চড়া (প্রচণ্ড উত্তেজনা) : এসব অনাচার দেখে তাঁর মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেল।

সবুরে মেওয়া (ধৈর্যে সুফল) : সবুরে মেওয়া ফলে মনে রেখেই দুঃখের দিন কাটাচ্ছি।

সাজ করতে দোল ফুরানো (প্রস্তুতির জন্য অত্যধিক সময় নেওয়া) : আর যাবে কখন? তোমার দেখছি সাজ করতে দোল ফুরাল।

সাপের ছুঁচো গেলা (উভয়সংকটে পড়া) : যাকে ঘরে থাকতে দিয়েছি সেই এখন অন্যের সমালোচনা করে বেড়াচ্ছে। আমার এখন সাপের ছুঁচো গেলা অবস্থা হয়েছে।

সাপকাবাব (নতুন পরিচয়) : এ নিয়ে আর কথা সাপকাবাব করি বলে বেরিয়ে লাভ নেই।

সাপের পাঁচ পা দেখা (অহংকারের কারণ) : ব্যবসায় টাকা করে সাপের পাঁচ পা দেখেছ না কি?

সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় (অকারণে দুঃখ ডেকে আনা) : এই অর্ধাঙ্গিনী বুঝি তোমার গোলাপ? তোমাকে দেখছি সুখে থাকতে ভূতে কিলায়।

সুবের পায়রা (সুসময়ের বন্ধু) : এই সুখের পায়রারা কতদিন তোমার পাশে পাশে থাকবে?

সুপুত্র-সন্ধান (খোঁজববর) : বাবার সুপুত্র-সন্ধান তার কেন ছাড়াতে হবে আমাকে।

সোনার কাঠি রুপোর কাঠি (বিত্তবানের চাহিদা) : আমাকে ও সহজে ঘাঁটাতে যাস, ওর ব্যবসার সোনার কাঠি রুপোর কাঠি যে আমার হাতে!

সোনার পাথর বাটি (অলীক বস্তু) : অনেক সাধ্যে কুলোলে নিশ্চয় তোমাকে কিন্তু তুমি যদি এখন সোনার পাথর বাটি চাও তবে তাকি অপরাধ।

স্বর্গে বাতি দেওয়া (বংশ রক্ষা করা) : ওই কুলাঙ্গার আমার স্বর্গে বাতি দেবে এমন আশা করি না।

সাক্ষিগোপাল (ব্যক্তিত্বহীন নিষ্ক্রিয় দর্শক) : সংসারে এখন সিনিয়র হয়ে, কত্তা হো সাক্ষিগোপাল মাত্র।

সাত খুন মাফ (অত্যধিক প্রশ্রয়) : বন্ধুর সাত খুন মাফ, বড় আপার কাছে অভিযোগ করে লাভ নেই।

সাত সতের (বিচিত্র রকমের) : অবু বকর নারাদিন সাত সতের কাজে জড়িয়ে থাকে।

সোনায় সোহাগা (সুন্দর মিল) : বর সুপুরুষ তদুপরি সুন্দরী, একেবারে সোনায় সোহাগা।

সের দরে (নামমাত্র মূল্যে/সস্তায়) : ঘরে এতো পুরনো পত্রিকা রেখে কী হবে? সের দরে ফেলেও হোক দাও।

Scanned with CamScanner

শুকনা মরিচ : Chili (চিলি)
সরিষা : Mustard (মাস্টার্ড)
হলুদ : Turmeric (টারমেরিক)

পোশাক-পরিচ্ছদ
CLOTHES AND GARMENTS

আলখাল্লা : Mantle (ম্যান্টল)
ওড়না : Scarf (স্কার্ফ)
কাঁথা : Quilt (কুইল্ট)
কাপড় : Cloth (ক্লথ)
কম্বল : Blanket (ব্লাঙ্কেট)
কার্পেট : Rug (রাগ)
কোট : Coat (কোট)
কোমরবন্ধ : Belt (বেল্ট)
গলাবন্ধনী : Neck-tie (নেক-টাই)
গামছা : Napkin (ন্যাপকিন)
চাদর : Wrapper (র‍্যাপার)
চটিজুতা : Slipper (স্লিপার)
ছায়া : Petticoat (পেটিকোট)
জামা : Shirt (শার্ট)
জ্যাকেট : Jacket (জ্যাকেট)
জুতা : Shoe (শু)
টুপি : Cap (ক্যাপ)
তোয়ালে : Towel (টাওয়েল)
দস্তানা : Gloves (গ্লোভস)
পোশাক : Dress (ড্রেস)
পাজামা : Trouser (ট্রাউজার)
প্যান্ট : Pant (প্যান্ট)
পাগড়ি : Turban (টার্বান)
ফিতা (পরিমাপের) : Lace (লেস)
ফিতা : Tape (টেপ)
বক্ষবন্ধনী : Bra (ব্রা)
বুট জুতা : Boot (বুট)
মখমল : Velvet (ভেলভেট)
মোজা : Stocking (স্টোকিং)
মোজা (খাটো) : Socks (সক্স)
শাড়ি : Sari (সারি)

অলংকার
ORNAMENTS

অলংকার : Ornament (অর্নামেন্ট)
আংটি : Ring (রিং)
চুড়ি : Wristlet (রিস্টলেট)
চুড়ি : Bracelet (ব্রেসলেট)

তাজ, টায়রা : Tiara (টাইয়ারা)
দুল/ছোট লকেট : Pendant (পেন্ডেন্ট)
লকেট : Locket (লকেট)
নথ : Nose ring (নোজ রিং)
বুতাম : Button (বাটন)
বালা : Bangle (ব্যাঙ্গল)
মুকুট : Crown (ক্রাউন)
মাদুলি : Amulet (আমুলেট)
হার : Necklace (নেকলেস)
হার : Chain (চেইন)

রোগ
DISEASES

অসুস্থ : Ill (ইল)
অসুস্থতা : Illness (ইলনেস)
অর্শ : Piles (পাইল্স)
আমাশয় : Dysentery (ডিসেনট্রী)
আঁচিল : Wart (ওয়ার্ট)
আঘাত : Wound (উন্ড)
ওলাওঠা : Cholera (কলেরা)
কাঁপুনি : Shivering (শিভরিং)
কাশি : Cough (কফ)
কোষ্ঠকাঠিন্য : Constipation (কনস্টিপ্যাশন)
কৃমি : Worm (ওয়ার্ম)
কুষ্ঠ : Leprosy (লেপ্রোসি)
কালাজ্বর : Black-fever (ব্ল্যাক-ফিবার)
খোস-পাচড়া : Scabies (স্কেবিস)
খিলধরা : Cramp (ক্রাম্প)
খিচুনি : Convulsion (কনভালশন)
খিচুনি : Spasm (স্পাজম)
গর্ভপাত : Abortion (এ্যাবোরসন)
গুটিবসন্ত : Small-pox (স্মল-পক্স)
গলগণ্ড : Goitre (গইটার)
ঘামাচি : Prickly-heat (প্রিকলি হিট)
ঘা : Sore (সোর)
চোখওঠা : Ophthalmia (অপথালমিয়া)
চর্মরোগ : Skin-diseases (স্কিন-ডিজিজ)
চুলকানি : Itch (ইচ)
জলবসন্ত : Chicken pox (চিকেন পক্স)

জ্বর : Fever (ফিভার)
জ্বরঘ্নো : Naphtha (ন্যাপথা)
কলসানো : Roasted (রোস্টেড)
টাক : Baldness (ব্যাল্ডনেস)
তিল : Mole (মোল)
দাঁতব্যথা : Toothache (টুথ-এক)
দাগ : Mark (মার্ক)
দাদ : Ring worm (রিংওয়ার্ম)
নালিঘা : Sinus (সাইনাস)
পীড়িত : Sick (সিক)
প্রদাহ : Inflammation (ইনফ্ল্যামেশন)
পালাজ্বর : Ague (এ্যাগু)
প্লীহা : Spleen (প্লিন)
পচা ঘা : Gangreen (গ্যাংগ্রিন)
পুঁজ : Pus (পাস)
পৃষ্ঠব্রণ : Carbuncle (কারবাঙ্কল)
পাণ্ডুরোগ : Jaundice (জন্ডিস)
প্লেগ : Plague (প্লেগ)
ফুসফুস প্রদাহ : Pneumonia (নিউমোনিয়া)
ফাঁপা : Hollow (হলো)
ফুসকুড়ি : Pimple (পিম্পল)
বিরামজ্বর : Remission (রিমিসন)
বদহজম : Indigestion (ইনডাইজেস্চন)
বমি : Vomit (ভমিট)
বহুমূত্র : Diabetes (ডায়াবেটিস)
ব্যথা : Pain (পেইন)
বাসি : Stale (স্টেল)
বিষফোড়া : Boil (বয়েল)
বেদনা : Ache (এক)
বাত : Gout (গাউট)
মাথা ধরা : Headache (হেডেক)
মেচেতা, আঁচিল : Acne (একনি)
ম্যালেরিয়া জ্বর : Malaria (ম্যালেরিয়া)
মৃগীরোগ : Hysteria (হিস্টেরিয়া)
যকৃত : Liver (লিভার)
রোগজীবাণু : Germ (জার্ম)
শোথ : Dropsy (ড্রপসি)
সর্দি : Cold (কোল্ড)
হাঁপানি : Asthma (অ্যাজমা)
হৃদরোগ : Heart diseases (হার্ট ডিজিজ)
হাম : Measles (মিজল্স)

ঔষুধ এবং চিকিৎসা
MEDICINES & TREATMENT

অম্লনাশক : Antacid (এন্টাসিড)
অস্ত্র চিকিৎসা : Surgery (সার্জরি)
অস্ত্রোপচার : Surgeon (সার্জন)
আরোগ্য : Operation (অপারেশন)
ঔষুধ : Cure (কিউর)
ওঁড়া : Drug (ড্রাগ)
চিকিৎসক : Powder (পাউডার)
চোখের মলিম : Physician (ফিজিশিয়ান)
ছেঁক : Eye-ointment (আই-ওয়েন্টমেন্ট)
টাবলেট : Fomentation (ফোমেনটেশন)
ডাক্তার : Tablet (ট্যাবলেট)
তাপমান যন্ত্র : Doctor (ডক্টর)
তরল : Thermometer (থার্মোমিটার)
দন্ত চিকিৎসক : Liquid (লিকুইড)
দন্ত চিকিৎসা : Dentist (ডেন্টিস্ট)
ধাত্রী : Dentistry (ডেন্টিস্ট্রি)
প্রলেপ : Midwife (মিডওয়াইফ)
পথ্য : Poultice (পলটিস)
পট্টি বাঁধা : Diet (ডায়েট)
পিচকারি : Dressing (ড্রেসিং)
ফোঁটা : Syringe (সিরিঞ্জ)
বোতল : Drop (ড্রপ)
বড়ি : Bottle (বোটল)
মলিম : Pill (পিল)
মাত্রা : Ointment (অয়েন্টমেন্ট)
রোগী : Dose (ডোজ)
শিশি : Patient (পেসেন্ট)
সিরাপ : Phial (ফাইল)
হাসপাতাল : Syrup (সিরাপ)
: Hospital (হসপিটাল)

পেশা
OCCUPATIONS

অধ্যক্ষ : Principal (প্রিন্সিপাল)
অধ্যাপক : Professor (প্রফেসর)
অর্থনীতিবিদ : Economist (ইকোনোমিস্ট)
আইনজীবী : Lawyer (লইয়ার)
উপদেষ্টা : Adviser (এ্যাডভাইজার)

Scanned with CamScanner

হবিষ্যে বিষাদ (আনন্দে হঠাৎ দুঃখ) : বিয়ের দিন বরযাত্রীর বাস দুর্ঘটনায় পতিত হলে বিয়ে বাড়িতে হবিষ্যে বিষাদ দেখা দেয়।

হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা (সুযোগ নষ্ট করা) : সমিতি থেকে বিনা সুদে ঋণ নিয়ে কাঞ্চনকে ব্যবসা করে স্বাবলম্বী হতে বলা হলেও বেকার ও অলস কাঞ্চন ঋণগ্রহণ করে নি। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলার জন্য একদিন তাকে দুঃখ করতে হবে।

হরিহর আত্মা (অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব) : ওরা দুজন তো হরিহর আত্মা, একজন যা করবে, অন্যজনও তাই করবে।

হনুমের ওঁড়ো (সমস্ত ব্যাপারে যে উপস্থিত) : সে তো হনুমের ওঁড়ো হয়ে সর্বত্র হাজির।

হাটে হাঁড়ি ভাঙা (গোপন কথা ফাঁস করে দেওয়া) : আমাকে চটালে কিন্তু হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেব।

হাড়ে মাসে জ্বালানো (অত্যন্ত উত্যক্ত করা) : ছেলেটা কি শুধু ওর বাপ-মাকে হাড়ে মাসে জ্বালাচ্ছে? পাড়াসুদ্ধ সবাইকে জ্বালাচ্ছে।

হাড়ে বাতাস লাগা (স্বস্তি পাওয়া) : বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সংবাদ শুনে জানি হাড়ে বাতাস লাগিয়ে বেড়াচ্ছে।

হাতে আকাশ পাওয়া (অভাবিতভাবে কিছু লাভ) : সে একটা সময় ছিল, যখন একটা কলম পেলেই মনে হত হাতে আকাশ পেলাম।

হাতে পাঁজি মঙ্গলবার (প্রকৃত প্রমাণ দেয়া) : তর্কাতর্কি করে কী হবে? হাত পাঁজি মঙ্গলবার, অভিধান খোলো, সব তর্কের অবসান হবে।

হাতির গলায় ঘণ্টা (বয়স্ক বরের বালিকা বধূ) : বাবা বেঁচে থাকলে মেয়েটাকে হাতির গলার ঘণ্টা হতে হত না।

হুঁকো-নাপিত বন্ধ করা (সমাজচ্যুত করা) : গ্রামের লোকেরা একজোট হয়ে নিরাপরাধ লোকটির হুঁকো-নাপিত বন্ধ করে দিল।

হচ্ছে হবে (দীর্ঘসূত্রিতা) : হচ্ছে হবে করে তো অনেক সময় চলে গেল, এবার কিছু একটা কর।

হদিস পাওয়া (সঠিক সংবাদ পাওয়া) : অনেক চেষ্টায় হারানো ছেলেটার হদিস পাওয়া গেছে।

হ য ব র ল (বিশৃঙ্খল) : পড়ার টেবিলটা হ য ব র ল হয়ে আছে।

হরি ঘোষের গোয়াল (বহু অপদার্থ ব্যক্তির সমাবেশ) : ছাত্রাবাসটা হয়েছে হরি ঘোষের গোয়াল।

হরিলুট (অপচয়) : পরের টাকা পেলে হরিলুট দেওয়া যায়।

হস্তিমূর্খ (ভীষণ বোকা) : সামান্য ব্যাপারটা বুঝতে পারলে না, তুমি তো একটা হস্তিমূর্খ দেখছি।

হাঁদুর বয়স (নিতান্ত শিশু) : ওই হাঁদুর বয়সের ছেলেটার সঙ্গে পারলে না?

হেস্তনেস্ত (মীমাংসা) : এ বিরোধের একটা হেস্তনেস্ত না করলে বিপদ হবে।

হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা (হেলায় সুযোগ নষ্ট করা) : এমন ভাল চাকরি ছেড়ে দিয়ে তো তুমি হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেললে!

হাতে খড়ি (শিক্ষার সূচনা) : মনি তার সন্তানের হাতে খড়িতে ভীষণ খুশি।

হাপিত্যেশ (ব্যাকুল কামনা) : তোমার জন্য হাপিত্যেশ করে আমার সমস্ত সময়টা নষ্ট হল।

হা-ঘরে (গৃহহীন) : তোমার তো হা-ঘরে হবার মতো অবস্থা ছিল না।

হাতটান (চুরির অভ্যাস) : তার হাতটানটা আর বুঝি গেল না।

হাড় হাভাতে (হতভাগ্য) : একেবারে হাড় হাভাতে মেয়ে, একে দিয়ে কোনো কিছু হবে না।

হালে পানি পাওয়া (সুবিধা করা) : রাজনীতির মাঠে সবাই কি আর হালে পানি পায়!

প্রবাদ-প্রবচন থেকে Proverbs

প্রত্যেক ভাষার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান প্রবাদ-প্রবচন। যে ভাষায় যত বেশি প্রবাদ-প্রবচন থাকবে সে ভাষা ততো বেশি সমৃদ্ধ এবং প্রাণিন। নতুন ভাষায় প্রবাদ-প্রবচন কম থাকে। কারণ প্রবাদ-প্রবচন পড়ে ওঠে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এবং মানুষের অভিজ্ঞতার আলোকে। ঐতিহ্যগতভাবেই বাংলা ভাষায় সংস্কৃত প্রবাদ-প্রবচন প্রচুর পরিমাণে প্রবেশ করেছে। কিছু হুবহু আছে, কিছু সামান্য পরিবর্তিত হয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে (যেমন : মৌনং সম্মতিলক্ষণম্ > নীরবতাই সম্মতির লক্ষণ)। ইংরেজি ভাষাতেও Proverbs আছে। যেগুলো পড়ে উঠেছে সে দেশের পরিবেশ ও সময়ের সঙ্গে মানুষের অভিজ্ঞতার সহযোগে। তাই বাংলা প্রবাদের শব্দ আর ইংরেজি Proverbs-এর word অনেকক্ষেত্রেই হয়তো মিলবে না। কিন্তু প্রবাদ-প্রবচন এবং Proverb-এর লক্ষ্য যেহেতু নির্দিষ্ট শব্দসমূহের বাইরে অনেক বেশি অর্থ প্রকাশ করা, সেহেতু এই চেতনার দিক থেকে প্রবাদ-প্রবচন এবং Proverb মিলিয়ে পড়া যেতে পারে। তবে লক্ষ করেছি, Proverbs-এ অনেক বেশি পিতৃতান্ত্রিক মনোভঙ্গি ও বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত। Proverbs-এ 'সে' বা 'তার' অর্থে সব সময় He, His ব্যবহার হয়েছে, কখনো She বা Her ব্যবহার হয় নি। আবার একটি Proverb হলো : An Ethiopian will not change his skin. দৃষ্টিভঙ্গি কতটা বর্ণবাদী হলে এ ধরনের Proverb-এর সৃষ্টি হতে পারে। সে দিক থেকে বাংলা প্রবাদ-প্রবচনসমূহ অনেক বেশি উদার দৃষ্টির পরিচয় বহন করে। এ অধ্যায়ে বাংলা প্রবাদ-প্রবচনের আলোকে সমঅর্থজ্ঞাপক ইংরেজি Proverbগুলো ইংরেজি উচ্চারণ সহযোগে সাজিয়ে উপস্থাপন করা হলো। বাংলা ভাষা ব্যবহারের সময় উপযুক্ত স্থানে প্রবাদ-প্রবচন এবং ইংরেজি ভাষা ব্যবহারের সময় উপযুক্ত স্থানে Proverb ব্যবহার করলে আমার শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে।

১. অসময়ের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু – A friend in need is a friend indeed (এ ফ্রেন্ড ইন নিড ইজ এ ফ্রেন্ড ইনডিড)।

২. অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী – A little learning is a dangerous thing (এ লিটল্ লার্নিং ইজ এ ডেনজারাস্ থিং)।

৩. অতি লোভে তাঁতি নষ্ট – All coveting all lost (অল কাভেটিং অল লস্ট)।

৪. অভিজ্ঞ শোক সহজে বোকা বনে না – An old bird is not to be caught with chaff (অ্যান্ ওল্ড বার্ড ইজ নট্ টু বি কট্ উইথ্ চাফ্)।

৫. অসির চেয়ে মসী শক্তিশালী – The pen is mighter than the sword (দা পেন ইজ মাইটার দ্যান দা সোর্ড)।

৬. অন্ধকারে ঢিল মারা – Beat about the bush (বিট্ অ্যাবাউট্ দা বুশ্)।

৭. অতিযত্নে মরণফাঁদ – Care killed the cat (কেয়ার কিল্ড দা ক্যাট্)।

৮. অনুগত বন্ধুদ্বয় – David and Jonathan (ডেভিড অ্যান্ড জোনাথন্)।

৯. অযথা বিপদের মধ্যে যাওয়া বুদ্ধিযুক্ত নয় – Discretion is the better part of valour (ডিসক্রেশন্ ইজ দা বেটার পার্ট অফ ভ্যালার্)।

১০. অসারের তর্জন গর্জনই সার – Empty vessels sound much (এম্পটি ভেসেলস্ সাউন্ড মাচ্)।

১১. অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চড়চড় করে – Every shoe fits not every foot (এভরি শু ফিটস্ নট্ এভরি ফুট্)।

Scanned with CamScanner

১২. অতি চালাকের গলায় দড়ি – Every fox must pay his skin to the furrier (এভরি ফক্স মাস্ট পে হিজ স্কিন্ টু দা ফারয়ার্)। বা To much cunning over-teaches itself (টু মাচ কানিং ওভারটিচেস ইটসেল্ফ)।

১৩. অতিলোভে তাঁতি নষ্ট – Grasp all lose all (গ্রাস্প অল লস্ অল্)।

১৪. অভ্যাসই স্বভাবে দাঁড়ায় – Habit is second nature (হ্যাবিট ইজ সেকেন্ড নেচার্)।

১৫. অসৎ পথে আয় অসৎ পথেই যায় – Ill got ill spent (ইল্ গট্ ইল্ স্পেন্ট)।

১৬. অতীতের কথা তুলে দুঃখ করে লাভ নেই – It is no use crying over spilt milk (ইট্ ইজ নো ইউজ ক্রাইং ওভার স্পিল্ট মিল্ক)।

১৭. অভাবে স্বভাব নষ্ট – Necessity hath no law or knows no law (নেসেসিটি হ্যাথ নো ল অর নোজ নো ল)।

১৮. অতি বাড় বেড়ো না ঝড়ে পড়ে যাবে; বা অতি দর্পে হতো লঙ্কা – Pride growth before destruction (প্রাইড গ্রোথ বিফোর ডিস্ট্রাকসান)।

১৯. অনিশ্চিতের আশায় নিশ্চিত পরিত্যাগ করিও না – Quit not certainty for hope (কোয়াইট নট সার্টেনটি ফর হোপ্)।

২০. "অধিকন্তু ন দোষায়" – The more, the merrier (দা মোর, দা মেরিয়ার)।

২১. অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট – Too many cooks spoil the broth (টু মেনি কুকস স্পয়েল দা ব্রথ)।

২২. অধ্যবসায়ের ফলেই সাফল্যলাভ ঘটে – Slow and steady wins the race (স্লো অ্যান্ড স্টেডি উইন দা রেস)।

২৩. অবলার মুখই বল – Arthur could not tame a woman's tongue (আর্থার কুড নট্ টেম্ এ ওম্যানস্ টাং)।

২৪. অপচয় করো না, অভাবও হবে না – Waste not, want not (ওয়েস্ট নট, ওয়ান্ট নট)।

২৫. আঙুর ফল টক – The grapes is sour (দা গ্রেপস আর সাওয়ার)।

২৬. আরম্ভ করলে আর শেষ করতে কতক্ষণ, উঠোন পেরোলেই অর্ধেক সফর – Every thing begun is half done (এভরি থিং বিগান্ ইজ হাফ ডান্)।

২৭. আকাশকুসুম রচনা করা বা অলীক কল্পনা করা – Build castles in the air (বিল্ড ক্যাসল্ ইন দা এয়ার্)।

২৮. আগে ঘর, তবে তো পর – Charity begins at home (চারিটি বিগিন্স অ্যাট্ হোম্)।

২৯. আয় বুঝে ব্যয় কর – Cut your coat according to your cloth (কাট্ ইয়র কোট্ অ্যাকরডিং টু ইওর ক্লথ্)।

৩০. আপনি শুতে ঠাঁই পায় না, শংকরাকে ডাকে– He who has nothing to spare must not keep a dog (হি হু হ্যাজ নাথিং টু স্পেয়ার মাস্ট নট কিপ এ ডগ্)।

৩১. আকাশের দিকে থুতু ফেললে আপনার গায়েই লাগে – He who spits against the wind spits against his own face (হি হু স্পিটস এগেনস্ট দা উইন্ড স্পিটস এগেনস্ট হিজ ওন ফেস্)।

৩২. আত্মনং বিদ্ধি বা নিজেকে জানো - Know thyself (নো দাইসেল্ফ)।

৩৩. আপন চরকায় তেল দাও – Oil your own machine (অয়েল ইওর ওন মেশিন)।

৩৪. আপ ভালা তো জগৎ ভালা – To the pure all things are pure (টু দা পিওর অল থিংস আর পিওর)।

৩৫. আলস্যই দারিদ্র্যের মূল – Indolence is the mother of poverty (ইনডোলেন্স ইজ দা মাদার অব পোভার্টি)।

৩৬. আমরা কাজেই বাঁচি, বয়সে নয় – We live in deeds, not in years (উই লিভ ইন ডিডস নট ইন ইয়ারস)।

৩৭. ইট মারলে পাটকেল – Tit for tat (টিট ফর ট্যাট)।

৩৮. ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয় – Where there is a will, there is a way (হোয়্যার দেয়ার ইজ এ উইল, দেয়ার ইজ এ ওয়ে)।

৩৯. ইহা বলাই বাহুল্য – It goes without saying (ইট গোজ্ উইদাউট সেয়িং)।

৪০. ঈশ্বর না করুন – God forbid (গড ফরবিড্)।

৪১. উলু (বেনা) বনে মুক্তা ছড়ানো – Cast pearls before swine (কাস্ট পার্লস বিফোর সুইন্)।

৪২. উপদেশ দেওয়ার চেয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা বেশি ভালো – Example is better than precept (এগজ্যামপেল্ ইজ বেটার দ্যান প্রিসেপ্ট)।

৪৩. উঠতি মূল পত্তনেই চেনা যায় বা সকালেই দিন বোঝা যায় – Morning shows the day (মরনিং শোজ দা ডে)।

৪৪. একাই একশো – A host in himself (এ হোস্ট ইন্ হিমসেলফ্)।

৪৫. এক পয়সা জমানো মানে এক পয়সা রোজগার করা – A penny saved is a penny earned (এ পেনি সেভড্ ইজ এ পেনি আরনড্)।

৪৬. একেবারে না হওয়ার চেয়ে দেরিতে হওয়া ভালো – Better late than never (বেটার লেট্ দ্যান নেভার)।

৪৭. এক হাতে তালি বাজে না – It takes two to make a quarrel (ইট টেকস্ টু টু মেক্ এ কোয়ারল্)।

৪৮. এক ঢিলে দুই পাখি মারা – Kill two birds with one stone (কিল্ টু বার্ডস উইথ্ ওয়ান স্টোন)।

৪৯. এক মাঘে শীত পালায় না – One swallow does not make a summer (ওয়ান শোয়ালো ডাজ নট মেক এ সামার)।

৫০. একতায় উত্থান, বিচ্ছেদে পতন – United we stand, divided we fall (ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড, ডিভাইডেড উই ফল্)।

৫১. একতাই বল – Unity is strength (ইউনিটি ইজ স্ট্রেংথ)।

৫২. কাঁচায় না পোষালে বাঁশ, পাকলে করে টাস টাস – A pot lamb makes a cross ram (এ পেট ল্যাম মেকস এ ক্রস র‍্যাম)।

৫৩. কুঁড়ে লোক জীবনে কোনোকাজ করতে পারে না – A sleeping fox catches no poultry (এ স্লিপিং ফক্স ক্যাচেস নো পোলট্রি)।

৫৪. কই মাছের প্রাণ (বড় কষ্ট সহিষ্ণু) – A cat has nine lives (এ ক্যাট হ্যাজ নাইন্ লাইভস্)।

৫৫. কথার চেয়ে কাজের দাম বেশি – Action speaks louder than words (এ্যাকশন স্পিকস্ লাউডার দ্যান্ ওয়ার্ডস)।

৫৬. কয়লা ধুলেও ময়লা যায় না – An Ethiopian will not change his skin (অ্যান্ ইথিওপিয়ান উইল নট্ চেঞ্জ হিজ স্কিন্)।

৫৭. কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরোলেই পাজি – Give a dog a bad name and hang him (গিভ এ ডগ্ এ ব্যাড নেম্ অ্যান্ড হ্যাং হিম্)।

৫৮. কাদা ঘেঁটো না – Let sleeping dogs lie (লেট স্লিপিং ডগস্ লাই)।

৫৯. কারও পৌষ মাস, কারও সর্বনাশ – Nero fiddles while Rome burns (নেরো ফিডলস হোয়াইল রোম বার্নস)।

৬০. কষ্ট করলেই কেষ্ট মেলে – No pains, no gains (নো পেনস্, নো গেনস্)।

৬১. কারণ বিনা কার্য হয় না – No smoke without fire (নো স্মোক উইদাউট ফায়ার)।

৬২. কুসঙ্গে থাকার চেয়ে একা থাকাও ভাল – Better alone than in bad company (বেটার অ্যালোন্ দ্যান, ইন ব্যাড কম্পানি)।

Scanned with CamScanner

৬৩. কর্জ নাই, কষ্টও নাই – Out of debt, out of danger (আউট অফ ডেট, আউট অফ ডেনজার)।

৬৪. কাছে তুমি পোড়ে মন, দূরে গেলে ঠনঠন – Out of sight, out of mind (আউট অফ সাইট, আউট অফ মাইন্ড)।

৬৫. কোনো বৃহৎ কার্য রাতারাতি সম্পন্ন হয় না – Rome was not built in a day (রোম ওয়াজ নট বিল্ট ইন এ ডে)।

৬৬. কার শ্রাদ্ধ কেবা করে, খোলা কেটে বালুন মরে – What is everybody's business is nobody's business (হোয়াট ইজ এভরিবডিস বিজনেস ইজ নোবডিস বিজনেস)।

৬৭. ক্ষমাই পরম ধর্ম – Forgive and forget (ফরগিভ অ্যান্ড ফরগেট)।

৬৮. ক্ষুধা পেলে বাঘও ঘাস খায় – Hunger is the best sauce (হাঙ্গার ইজ দা বেস্ট সস্)।

৬৯. গাইতে গাইতে গায়েন, বাজাতে বাজাতে বায়েন – Practice makes perfect (প্র্যাকটিস মেকস পারফেক্ট)।

৭০. গাং ডিঙোলে কুমিরকে কলা – When the danger is gone, God is forgotten (হোয়েন দা ডেনজার ইজ গন, গড ইজ ফরগটন্)।

৭১. গুজব খুব দ্রুত ছড়ায় – Rumour is a great traveller (রিউমার ইজ এ গ্রেট ট্রাভেলার)।

৭২. গোঁফ তো নয় যেন শুঁয়োপোকা – The moustache is look like caterpiller (দা মুসটাশ ইজ লুক লাইক কাটারপিল্যার্)।

৭৩. ঘোড়ার আগে গাড়ি – To put the cart before the horse (টু পুট দা কার্ট বিফোর দা হর্স)।

৭৪. ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পায় বা ন্যাড়া একবারই বেলতলায় যায় – A burnt child fears the fire (এ বার্নট্ চাইল্ড ফিয়ারস্ দ্যা ফায়ার অর ট্রেডস্ দা ফায়ার)।

৭৫. চকচক করলেই সোনা হয় না – All that glitters is not gold (অল দ্যাট গ্লিটারস্ ইজ নট গোল্ড)।

৭৬. চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে – After death comes the doctor (আফটার ডেথ কামস্ দা ডক্টর)।

৭৭. চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে – When the cat is away the mice will play (হোয়েন দা ক্যাট ইজ অ্যাওয়ে দা মাইস প্লে)।

৭৮. চোরে চোরে মাসতুতো ভাই – Birds of a feather flock together (বার্ডস্ অব এ ফেদার ফ্লক টুগেদার)।

৭৯. চাচা আপন প্রাণ বাঁচা – Every man is for himself (এভরি ম্যান ইজ ফর হিমসেল্ফ্)।

৮০. চেনা বামুনের পৈতার দরকার হয় না – Good wine needs no bush (গুড ওয়াইন নিডস নো বুশ্)।

৮১. চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা – Physician heal thyself (ফিজিসিয়ান হিল দাইসেলফ্)।

৮২. চোরকে বল চুরি করতে গৃহস্থকে বল সজাগ থাকতে – Run with the hare and hunt with the bound (রান উইদ দা হেয়ার অ্যান্ড হান্ট উইদ দা বাইন্ড)।

৮৩. চোর না শুনে ধর্মের কাহিনি – The devil would not listen to the scripture (দা ডেভিল উইল নট লিসেন টু দা স্ক্রিপচার্)।

৮৪. চালুনি বলে, ছুঁচ, তোর তলা কেন ছেঁদা – The pot calls the kettle black (দা পট কল্স দা কেটেল ব্ল্যাক)।

৮৫. চাঁদেও কলঙ্ক আছে – There are lees to every wine (দেয়ার আর লেস টু এভরি ওয়াইন)।

৮৬. জলেই জল বাঁধে – Nothing succeeds like success (নাথিং সাকসেডস লাইক সাকসেস্)।

৮৭. জোর যার মুল্লুক তার – Might is right (মাইট ইজ রাইট)।

৮৮. জীবন থাকলেই আশ থাকবে – While there is life, there is hope (হোয়াইল দেয়ার ইজ লাইফ, দেয়ার ইজ হোপ)।

৮৯. ঘুতো মেরে গরু দান – Rob Peter to pay Paul (রব পিটার টু পে পল্)।

৯০. জ্ঞানই বল – Knowledge is power (নলেজ ইজ পাওয়ার)।

৯১. জ্ঞানহীন উৎসাহ লাগামছেঁড়া ঘোড়ার মতো – Zeal without knowledge is a runaway horse (জিল উইদাউট নলেজ ইজ এ রানঅ্যাওয়ে হর্স্)।

৯২. ঝোপ বুঝে কোপ মার – Make hay while the sun shines (মেক্ হে হোয়াইল্ দা সান্ সাইনস্)।

৯৩. ঝুঁকি না নিলে লাভ হয় না – Nothing venture, Nothing have (নাথিং ভেনচার, নাথিং হ্যাভ্)।

৯৪. ঝোপ বুঝে কোপ মারো বা সময় থাকতে থাকতে কাজ গুছিয়ে নাও – As the wind blows, you must set your sail (অ্যাজ দা উইন্ড ব্লোস্ ইউ মাস্ট সেট্ ইওর সেল্)।

৯৫. টাকায় টাকা হয় – Money begets money (মানি বিগেটস্ মানি)।

৯৬. ঠাকুরঘরে কে? আমি কলা খাই নি – A guilty conscience needs no accuser (এ গিলটি কন্শ্যান্স্ নিডস্ নো অ্যাকিউসার)।

৯৭. ঠেলার নাম বাবাজি – Nothing like force (নাথিং লাইক ফোর্স)।

৯৮. ঠ্যাং থাকতে ক্যান্ নিবি লাঠি? – Fingers were made before forks (ফিংগারস্ ওএয়ার মেড্ বিফোর ফর্কস্)।

৯৯. তোমার ইচ্ছা পূরণ করার জন্য নিজেকে উপযুক্ত কর – First deserve, then desire (ফার্স্ট ডিসার্ভ, দ্যান ডিজায়ার)।

১০০. তাড়াতাড়িতে ডিমিল শাকাল হয় – Haste makes waste (হাস্টে মেকস ওয়েস্ট)।

১০১. তার সাধ্যি আছে – He can hardly keep the wolf from the door (হি ক্যান হার্ডলি কিপ দা উল্ফ ফ্রম দা ডোর্)।

১০২. তেঁই লো শিবলে গঙ্গায় বা ও হাবে নেই সে অন্যথায় নেই – On this timest On the mariners (অন দিস টাইমস্, অন দা মারিনার্স)।

১০৩. তেলা মাথায় তেল দেওয়া – Carry coal to Newcastle (ক্যারি কোল টু নিউক্যাসল্)।

১০৪. তিলকে তাল করা – To make a mountain of a molehill (টু মেক এ মাউনটেন অফ এ মোলহিল্)।

১০৫. দুঃখের পরিশেষে সুখ – Adversity often leads to prosperity (অ্যাডভার্সিটি অফেন লিডস্ টু প্রস্পারিটি)।

১০৬. দুঃখের পরে আসে সুখ – After coluds comes fair weather (আফটার ক্লাউডস্ কামস্ ফেয়ার ওয়েদার)।

১০৭. দুই গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো – Better an empty house than an ill tenant (বেটার অ্যান এম্পটি হাউস দ্যান, অ্যান্ ইল্ টেনান্ট)।

১০৮. দূরের জিনিস ভালো মনে হয় – Blue are the hills that are far from us (ব্লু আর দা হিলস্ ট্যাট আর ফর ফ্রম আস্)।

১০৯. দশের লাঠি একের বোঝা – Many a little makes a mickle (মেনি এ লিটিল মেকস এ মিকল্)।

১১০. দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি? – No paints, no gains (নো পেনস্, নো গেনস্)।

Scanned with CamScanner

১১২. দীর্ঘসূত্রীতাই সময় চুরির কারিগর – Procrastination is the thief of time (প্রোক্রাস্টিনেশন ইজ দা থিফ অফ টাইম)।

১১৩. দুশে দুটো কথা কওয়া, হাতে দুটো লাঠি শক্ত – Two heads are better than one (টু হেডস আর বেটার দ্যান ওয়ান)।

১১৪. দুজনে বন্ধুত্ব হয়, তিনজনে কলহ হয় – Two is company, three is none (টু ইজ কম্পানি থ্রি ইজ নান)।

১১৫. কাঁক থাকতে কাঁকের মহাদাম বোঝা যায় না – We never know the worth of water till the well is dry (উই নেভার নো দ ওয়ার্থ অফ ওয়াটার টিল দ ওয়েল ইজ ড্রাই)।

১১৬. ধর্মের ঢাক আপনি বাজে – Virtue proclaims itself (ভার্চু প্রক্লেইমস ইটসেল্ফ)।

১১৭. নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা – A bad workman quarrels with his tools (এ ব্যাড ওয়ার্কম্যান কোয়ারেলস্ উইথ হিজ টুলস্)।

১১৮. ন্যাটার নেই বাটপাড়ের ভয় – A beggar may sing before a pick-pocket (এ বেগার মে সিং বিফোর এ পিকপকেট)।

১১৯. নানা মুনির নানা মত – All feet thread not in one shoe (অল্ ফিট্ থ্রেড নট্ ইন্ ওয়ান শু)।

১১৯. নিজের জিনিস সকলেই ভালো দেখে বা সব গোয়ালা নিজের দই মিষ্টি বলে – All his geese are swans (অল্ হিজ গিস্ আর সোয়ানস্)।

১২০. নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা – Cut off one's nose to spite one's face (কাট অফ ওয়ানস্ নোজ টু স্পিট্ ওয়ানস্ ফেস্)।

১২১. নিজের হাতে অল্পও ভালো, পরের হাতের বেশিও কিছু নয় – A bird in the hand is worth two in the bush (এ বার্ড ইন্ দা হ্যান্ড ইজ ওয়ার্থ টুন ইন্ দ্যা বুশ)।

১২২. মাথা মুনির নানা মত – Many men, many minds (মেনি মেন, মেনি মাইন্ডস্)।

১২৩. দেশোয় মাবে দাই – One beats the bush, another catches the bird (এখানে বিটিস দা বুশ, আমাদের পাখি দা বার্ড)।

১২৪. নুন আনতে পান্তা ফুরোয় – As meat comes mustard (অ্যাজ মিটস কামস মাস্টার্ড)।

১২৫. নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো – Something is better than nothing (সামথিং ইজ বেটার দ্যান নাথিং)।

১২৬. না আঁচালে বিশ্বাস নেই (ভোজন নিমন্ত্রণ) – There's many a slip between the cup and the lip (দেয়ারস মেনি এ স্লিপ বিটুইন দ কাপ অ্যান্ড দ লিপ)।

১২৭. পরহিতার্থে কর্ম প্রতিদান চায় না – Virtue is it's reward (ভার্চু ইজ ইটস্ রিওয়ার্ড)।

১২৮. পক্ষপাতদুষ্ট লোকের নিকট সবই মন্দ – All seems yellow to the jaundiced eye (অল্ সিমস্ ইয়ালো টু দ জন্ডিসড্ আই)।

১২৯. প্রেম অন্ধ – Love is blind (লাভ ইজ ব্লাইন্ড)।

১৩০. প্রয়োজনই আবিষ্কারের প্রসূতি – Necessity is the mother of invention (নেসেসিটি ইজ দা মাদার অফ ইনভেনশন)।

১৩১. "পর্বেতো বহ্নিমান ধুমাৎ"; কারণ বিনা কার্য হয় না – Where there is smoke, there is fire (হোয়ার দেয়ার ইজ স্মোক, দেয়ার ইজ ফায়ার)।

১৩২. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাই মানুষকে দেবতা করে বা পরিচ্ছন্নতাই পবিত্রতা বা পরিচ্ছন্নতাই ইমানের অংশ – Cleanliness is next to Godliness (ক্লিনলিনেস্ ইজ নেকস্ট টু গডলিনেস্)।

১৩৩. অধ্যবসায়ই সৌভাগ্যের প্রসূতি (মূল) – Diligence is the mother of good luck (ডিলিজেন্স ইজ দা মাদার অফ গুড লাক)।

১৩৪. বানরের গলায় মুক্তোর মালা দেওয়া – Cast pearls before swine (কাস্ট পার্লস বিফোর সুইন)।

১৩৫. বিদ্যা অনন্ত, জীবন সংক্ষিপ্ত – Art is long, life is short (আর্ট ইজ লং, লাইফ ইজ শর্ট)।

১৩৬. বিয়ে করতে বড়ি, আর ঘর বাঁধতে নড়ি – Before you marry, be sure of a house wherein to tarry (বিফোর ইউ ম্যারি বি সিওর অফ এ হাউস হোয়ারইন টু ট্যারি)।

১৩৭. বলা সহজ, করা কঠিন – Easier said than done (ইজিয়ার সেড দ্যান ডান)।

১৩৮. বল্প আঁটুনি ফস্কা গেরো – Penny-wise, Pound-foolish (পেনিওয়াইজ, পাউন্ড ফুলিশ)।

১৩৯. ব্যর্থতা সাফল্যেরই ভিত্তিভূমি – Failures are but pillars of success (ফেলিওর আর বাট্ পিলারস্ অফ সাকসেস্)।

১৪০. ধীরভোগ্যা বসুন্ধরা বা ভাগ্য সাহসীকে অনুসরণ করে – Fortune favours the brave (ফরচুন ফেভার দা ব্রেভ)।

১৪১. বিন্দু জলে সিন্ধু হয় – Many drops make a shower (মেনি ড্রপস মেক এ সাওয়ার)।

১৪২. বিপদ কখনও একা আসে না – Misfortune never comes alone (মিসফরচুন নেভার কামস্ অ্যালন)।

১৪৩. "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া" (বেশি আড়ম্বরে কাজ হয় না) – Much ado about nothing (মাচ অ্যাডো অ্যাবাউট নাথিং)।

১৪৪. বিপদ আসবার আগেই সাবধান হওয়া ভালো – Prevention is better than cure (প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর)।

১৪৫. বিপদের অভিশাপ নয়, আশীর্বাদ – Sweet are the uses of adversity (সুইট আর দ ইউসেস অফ অ্যাডভারসিটি)।

১৪৬. বাবার কীর্তিকথাই পুত্র না ঘুমিয়ে আছে শিশুর নিদ্রা রূপ শিশুরই কন্যাকে – The child is the father to the man (দ চাইল্ড ইজ দ ফাদার টু দ ম্যান)।

১৪৭. বিপদের মধ্যেই গুণের পরীক্ষা হয় – Virtue thrives best in adversity (ভার্চু থ্রাইভস বেস্ট ইন অ্যাডভারসিটি)।

১৪৮. বাদুন গেল ঘর তো শাহুল ঢুকে পড় – When the cat is away the mice will play (হোয়েন দ ক্যাট ইজ অ্যাওয়ে দ মাইস প্লে)।

১৪৯. ভালোভাবে যুদ্ধ আরম্ভ করলে অর্ধেক বিজয় আসে প্রথমে – A good beginning is half of the battle (এ গুড বিগিনিং ইজ হাফ অফ দ ব্যাটল)।

১৫০. ভাগের মা গঙ্গা পায় না – An ass that is a common property (এন অ্যাস দ্যাট ইজ এ কমন প্রপার্টি)।

১৫১. ভিক্ষার চাল, কাঁড়া আর আকাঁড়া – Beggars must not be choosers (বেগারস্ মাস্ট নট বি চুজারস)।

১৫২. ভীরুরা মরার আগেই মরে বারো মরে – Cowards die many times before their deaths (কাওয়ার্ডস্ ডাই মেনি টাইমস্ বিফোর দেয়ার ডেথ্)।

১৫৩. ভয় করলে ভয় আপনি এসে পড়ে – Harm watch, harm catch (হার্ম ওয়াচ, হার্ম ক্যাচ)।

১৫৪. মাথা নেই, আবার মাথা ব্যথা – A begger can never be bankrupt (এ বেগার ক্যান্ নেভার বি ব্যাঙ্করাপ্ট)।

১৫৫. মানিকের খানিক ভালো – Brevity is the soul of wit (ব্রেভিটি ইজ দা সোল্ অফ উইট)।

১৫৬. মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন – Do or die (ডু অর ডাই)।

Scanned with CamScanner

১৫৭. মিষ্টি কথায় চিঁড়ে ভিজে না – (Fine or) Fair words butter no parsnips (ফায়ার ওয়ার্ডস বাটার নো পারস্নিপস)।

১৫৮. মহৎ লোকেরা এক রকম চিন্তা করেন – Great minds think alike (গ্রেট মাইন্ডস থিঙ্ক আলাইক)।

১৫৯. মুখে বুলি লম্বা, কাজে অষ্টরম্ভা – Great talkers are little doers (গ্রেট টকারস আর লিটল ডুয়ারস্)।

১৬০. মানুষ নিজের ভাগ্য নিজেই গড়ে – Man is the architect of his own fortune (ম্যান ইজ দা আরকিটেক্ট অফ হিজ ওন ফরচুন)।

১৬১. মানুষ মাত্রেরই ভুল হয় – None but a fool is always right (নান বাট এ ফুল ইজ অলওয়েজ রাইট)।

১৬২. মৌনং সম্মতিলক্ষণম্ বা নীরবতাই সম্মতির লক্ষণ – Silence gives consent (সাইলেন্স গিবস কনসেন্ট)।

১৬৩. মায়ের হাতে গড়া শিশুই জগতের ভাগ্যবিধাতা – The hand that rocks the cradle rules the world (দা হ্যান্ড দ্যাট রকস দা ক্রেডল রুলস দা ওয়ার্ল্ড)।

১৬৪. "মুন্সীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ" – To err is human (টু আর ইজ হিউম্যান)।

১৬৫. মরা হাতি লাখ টাকা দাম – The very ruins of greatness are great (দা ভেরি রুইনস অফ গ্রেটনেস আর গ্রেট)।

১৬৬. মুকুট না আগুনের ডালা – Uneasy lies the head that wears a crown (আনইজি লাইস দা হেড দ্যান ওয়্যারস এ ক্রাউন)।

১৬৭. মশা মারতে কামান দাগা – To break a butterfly on a wheel (টু ব্রেক এ বাটারফ্লাই অন এ হুইল)।

১৬৮. "যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ" বা যে দেশে যে বাউ – When in Rome, do as the Romans do (হোয়েন ইন রোম ডু অ্যাজ দা রোমানস ডু)।

১৬৯. যেমন কর্ম তেমনি ফল – As you make your bed, so you must lie on it (অ্যাজ ইউ মেক ইওর বেড, সো ইউ মাস্ট লাই অন ইট)। অথবা, As you sow, so you reap (অ্যাজ ইউ সো, সো ইউ রিপ্)।

১৭০. যত গর্জে, তত বর্ষে না; লঙ্কা আদৌ ঝাল বেশি– Barking dogs seldom bite (বারকিং ডগস্ সেলডম বাইট)।

১৭১. যেমনি বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল – As is the evil, so is the remedy (অ্যাজ ইজ দা ইভিল, সো ইজ দা রিমেডি)।

১৭২. যত হাসি তত কান্না, বলে গেছে রাম শর্মা – After sweetmeat comes sour sauce (আফটার সুইটমিট কামস সাওয়ার সস্)।

১৭৩. যত মত তত্তো পথ – So many ways and so many disciplines (সো মেনি ওয়েজ এ্যান্ড সো মেনি ডিসিপ্লিন)।

১৭৪. যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা – Faults are thick where love is thin (ফল্টস্ আর থিক্ হোয়্যার লাভ ইজ থিন্)।

১৭৫. যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ – Hope springs eternal in the human breast (হোপ্ স্প্রিংস্ ইটারন্যাল্ ইন্ দা হিউম্যান ব্রেস্ট)।

১৭৬. রোজ একটা ফল খাও, বদ্যির কাছে না যাও – An apple a day keeps the doctor away (অ্যান্ অ্যাপেল্ এ ডে কিপস্ দা ডক্টর অ্যাওয়ে)।

১৭৭. লাই দিলে কুকুর মাথায় ওঠে; বা বসতে দিলে শুতে চায় – Give him an inch and he'll take an ell (গিভ্ হিম্ অ্যান্ ইঞ্চ অ্যান্ড হি উইল টেক্ অ্যান্ এল্)।

১৭৮. লাভের গুড় পিঁপড়ে খায় – Ill got ill spent (ইল গট ইল স্পেন্ট)।

১৭৯. লক্ষ্মী সদাই চঞ্চলা – Riches have wings (রিচেস হ্যাভ উইঙ্গস্)।

১৮০. লড়াই করে যার সামনে – Those who live in glass should not pelt stones at others (দোজ হু লিভ ইন গ্লাস হাউসেস শুড নট পেল্ট স্টোনস অ্যাট আদার্স)।

১৮১. শয়তানকেও তার ন্যায্য পাওনা দিও – Give the devil his due (গিভ দা ডেভিল হিজ ডিউ)।

১৮২. সব ভালো, যার শেষ ভালো বা শেষ রক্ষাই রক্ষা– All's well that ends well (অল্স্ ওয়েল দ্যাট এন্ডস ওয়েল)।

১৮৩. সবুরে মেওয়া ফলে – All things come to him who waits (অল্ থিংস্ কাম টু হিম্ হু ওয়েটস্)।

১৮৪. সঙ্গ দেখে লোক চেনা যায় – A man is known by the company he keeps (এ ম্যান ইজ নো বাই দা কম্পাানি হি কিপস্)।

১৮৫. স্থিরমস্তিষ্ক না হলে উন্নতি হয় না (চঞ্চলমতি ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা বা অর্থসঞ্চয় হয় না) – A rolling stone gathers no moss (এ রোলিং স্টোন গেদারস নো মস্)।

১৮৬. সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড় – A stitch in time saves nine (এ স্টিচ্ ইন, টাইম্ সেভস নাইন)।

১৮৭. স্পষ্টাস্পষ্টি কথা বলা – Call a spade a spade (কল্ এ স্পেড্ এ স্পেড্)।

১৮৮. সস্তার তিন অবস্থা – Cheap goods are dear in the long run (চিপ্ গুডস্ আর ডিয়ার ইন্ দ্য লং রান্)।

১৮৯. সুখ-সৌভাগ্যের দিন কারও চিরস্থায়ী হয় না – Every dog has his day (এভরি ডগ্ হ্যাজ হিজ ডে)।

১৯০. স্বাবলম্বী লোকদের ঈশ্বর সাহায্য করেন – God helps those who help themselves (গড হেল্পস দোজ হু হেল্প দেমসেল্ফ)।

১৯১. সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা; সৎ হলে ফল ভালো হয় – Honesty is the best policy (অনেস্টি ইজ দা বেস্ট পলিসি)।

১৯২. সবজান্তা অষ্টরম্ভা – Jack of all trades, master of none (জ্যাক অফ অল ট্রেডস, মাস্টার অফ নান)।

১৯৩. সহিষ্ণু হও – Live and let live (লিভ আন্ড লেট লিভ)।

১৯৪. সবুরে মেওয়া ফলে – Patience is bitter, but its fruit is sweet (পেশেন্স ইজ বিটার বাট ইটস ফ্রুট ইজ সুইট)।

১৯৫. স্বাবলম্বন সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন – Self-help is the best help (সেল্ফ-হেল্প ইজ দা বেস্ট হেল্প)।

১৯৬. সুযোগ হারালে আর পাবে না – Strike the iron while it is hot (স্ট্রাইক দা আইরন হোয়াইলইট ইজ হট)।

১৯৭. স্বভাব যায় না মরলে, আর ইল্লৎ যায় না ধুলে – The leopard can't change its spots (দা লেপার্ড ক্যান্ট চেঞ্জ ইটস স্পটস)।

১৯৮. সময়েই ক্ষত অকেয় – Time cures more than the doctor (টাইম কিওরস মোর দ্যান দা ডক্টর)।

১৯৯. সকল রোগীর এক পথ্য নহে; সব রোগের এক ওষুধ নয় – What is sauce for the gander is not sauce for the goose (হোয়াট ইজ সস ফর দা গ্যান্ডার ইজ নট সস ফর দা গুজ)।

২০০. হাতি ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল – Fools rush in where angels fear to tread (ফুলস্ রাশ্ ইন্ হোয়্যার অ্যাঞ্জলস্ ফিয়ার টু ট্রেড)।

2020 5 10 15:32

Scanned with CamScanner

বাংলা থেকে ইংরেজি : প্রয়োজনীয় শব্দ

ভাষা ব্যবহার বা অনুবাদ করার জন্য বাক্যের শব্দসমূহ সম্পর্কে যেমন ধারণা থাকা দরকার, তেমনি প্রয়োজন অতিপয় অত্যাবশ্যক শব্দ জানা। সেগুলো জানা থাকলে বাংলা বা ইংরেজি যে-কোনো বাক্য বলা কিংবা লেখা সহজ হয়। শব্দই যে-কোনো ভাষার প্রাণ। বক্তব্যের মূলকথা প্রকাশ করার জন্য সে কারণে কোনো ভাষার শব্দজ্ঞান জরুরি। শব্দ জানা থাকলে ব্যাকরণের নিয়ম-শৃঙ্খলা সম্পর্কে বিস্তৃত না জেনেও কথ্যরীতিতে বক্তব্য প্রকাশে তেমন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। নিচে কিছু প্রয়োজনীয় বাংলা শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দের উচ্চারণসহ উল্লেখ করা হলো :

মানব-শরীর
HUMAN BODY

অধর	: Netherlip (নেদারলিপ)
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ	: Limb (লিম্ব)
আঙুল	: Finger (ফিঙ্গার)
আলজিহ্বা	: Uvula (ইউভিউলা)
ইন্দ্রিয়সমূহ	: Senses (সেন্সেস)
উরু	: Thigh (থাই)
কপাল	: Forehead (ফোরহেড)
কান	: Ear (ইয়ার)
কাঁধ	: Shoulder (সোল্ডার)
কনুই	: Elbow (এলবো)
কবজি	: Wrist (রিস্ট)
কপোল (গাল)	: Cheek (চিক)
কোমড়	: Waist (ওয়েস্ট)
কঙ্কাল	: Skeleton (স্কেলিটন)
কুড়কি	: Groin (গ্রোইন)
গলা	: Throat (থ্রট)
গোড়ালি	: Heel (হিল)
গোঁফ	: Moustache (মাসটাশ)
ঘাড়	: Neck (নেক)
ঘাম	: Sweat (সোয়েট)
চুল	: Hair (হেয়ার)
চক্ষু	: Eye (আই)
চোখের তারা	: Eye-ball (আইবল)
চোখের পাতা	: Eyelid (আইলিড)
চোখের ভ্রূ	: Eyebrow (আইব্রু)
চামড়া	: Skin (স্কিন)
চিবুক	: Chin (চিন)
চোখের জল	: Tear (টিয়ার)
জিহ্বা	: Tongue (টাং)
জরায়ু	: Womb (উম্ব)
জানু	: Knee (নি)
তলপেট	: Abdomen (অ্যাবডমেন)
তালু	: Palate (প্যালেট)
থুথু	: Spittle (স্পিটল)
ধমনি	: Artery (আরটারি)
দাড়ি	: Beard (বিয়ার্ড)
দাঁত	: Tooth (টুথ)
নাক	: Nose (নোজ)
নাসারন্ধ্র	: Nostril (নস্ট্রিল)
নখ	: Nail (নেইল)
নাভি	: Navel (নাভল)
নাড়িভুঁড়ি	: Bowels (বাওয়েলস)
ঠোঁট	: Lip (লিপ)
পিঠ	: Back (ব্যাক)
পেট	: Belly (বেলি)
পায়ের পাতা	: Foot (ফুট)
পাঁজর	: Ribs (রিবস)
পা	: Leg (লেগ)
পায়ের আঙুল	: Toe (টো)
বুক	: Chest (চেস্ট)
বগল	: Armpit (আরমপিট)
মানুষ	: Man (ম্যান)
মানবজাতি	: Human being (হিউম্যান বিইং)
মাথা	: Head (হেড)
মুখ	: Mouth (মাউথ)
মুষ্টি	: Grip (গ্রাইপ)
মুখমণ্ডল	: Face (ফেস)
মূত্রাধার	: Bladder (ব্লাডার)
মাংস	: Flesh (ফ্লেশ)
ভক্ষ্য পশুমাংস	: Meat (মিট)
মাথার খুলি	: Skull (স্কাল)
মাড়ি	: Gum (গাম)
মজ্জা	: Marrow (ম্যারো)
মস্তিষ্ক	: Brain (ব্রেইন)

মূত্র	: Urine (ইউরিন)
মল	: Stool (স্টুল)
মেরুদণ্ড	: Backbone (ব্যাকবোন)
লালা	: Saliva (সেলিভা)
লিঙ্গ	: Penis (পেনিস)
শিরা	: Vein (ভেইন)
শরীর	: Body (বডি)
স্তন	: Breast (ব্রেস্ট)
স্তনের বোঁটা	: Nipple (নিপল)
স্ত্রীলোক	: Woman (উম্যান)
স্নায়ু	: Nerve (নার্ভ)
হাড়	: Bone (বোন)
হাত	: Hand (হ্যান্ড)

আত্মীয়-স্বজন
RELATIONS

অভিভাবক	: Guardian (গার্ডিয়ান)
আত্মীয়	: Relative (রিলেটিভ)
একই সহচর	: Room-mate (রুমমেট)
একাধিক স্ত্রীর স্বামীর স্ত্রী	: Co-wife (কো-ওয়াইফ)
উত্তরাধিকারী	: Heir (এয়ার)
কন্যা	: Daughter (ডটার)
কাকা, মামা, চাচা	: Uncle (আঙ্কল)
কাকি, মামি, চাচি	: Aunt (আন্ট)
কাকাতো, মামাতো, খালাতো ভাই	: Cousin (কাজিন)
গুরু	: Preceptor (প্রিসেপ্টর)
ছেলেবন্ধু	: Boy friend (বয়ফ্রেন্ড)
জ্ঞাতিত্ব	: Kinship (কিনশিপ)
দুগ্ধমাতা	: Wet-nurse (ওয়েটনার্স)
দাদা/ঠাকুরদা	: Grandfather (গ্রান্ডফাদার)
দাদি/ঠাকুরমা	: Grandmother (গ্রান্ডমাদার)
নাতি	: Grand-son (গ্রান্ডসন)
নাতনি	: Grand-daughter (গ্রান্ডডটার)
পিতা	: Father (ফাদার)
প্রতিপাল্য	: Ward (ওয়ার্ড)
পথপ্রদর্শক	: Guide (গাইড)
পুত্র	: Son (সান)
প্রতিবেশী	: Neighbour (নেইবার)
বিমাতা	: Step mother (স্টেপ মাদার)
বৈমাত্রেয় ভাই	: Step brother (স্টেপ ব্রাদার)
বৈমাত্রেয় বোন	: Step sister (স্টেপ সিস্টার)
বিধবা	: Widow (উইডো)
বাবা/আব্বা	: Daddy (ড্যাডি)/Papa (পাপা)
বন্ধু	: Friend (ফ্রেন্ড)
বংশধর	: Descendant (ডিসেন্ডান্ট)
ভ্রাতা, ভাই	: Brother (ব্রাদার)
ভগ্নি, বোন	: Sister (সিস্টার)
ভাইপো	: Nephew (নেফিউ)
ভাগিনী	: Niece (নিস)
মাতা	: Mother (মাদার)
মা/আম্মা	: Maa (মা) / Mammy (মামি)
মাতাপিতা	: Parents (প্যারেন্টস)
মেয়েবন্ধু	: Girl friend (গার্লফ্রেন্ড)
শ্যালক, ভগ্নিপতি	: Brother-in-law (ব্রাদার-ইন-ল)
শালিকা, ভাবি	: Sister-in-law (সিস্টার-ইন-ল)
শত্রু	: Foe (ফো)
শত্রু	: Enemy (এনিমি)
শিক্ষক	: Teacher (টিচার)
শিশু	: Child (চাইল্ড)
শ্বশুর	: Father-in-law (ফাদার-ইন-ল)
শাশুড়ি	: Mother-in-law (মাদার-ইন-ল)
সেবক	: Waiter (ওয়েটার)
সহকর্মী	: Colleague (কলিগ)
সহপাঠী	: Class-mate (ক্লাসমেট)
স্ত্রী	: Wife (ওয়াইফ)
স্বামী	: Husband (হাজব্যান্ড)

গৃহসামগ্রী
HOUSEHOLD ARTICLES

আলমারি	: Almirah (আলমিরা)
আলমারি	: Cupboard (কাপবোর্ড)
আয়না	: Mirror (মিরর)
আলনা	: Dress-holder (ড্রেসহোল্ডার)

Scanned with CamScanner

উকিল	: Pleader (প্লিডার)
উকিল	: Advocate (এ্যাডভোকেট)
কর্মকার	: Blacksmith (ব্লাকস্মিথ)
কর্মচারী	: Employee (এমপ্লয়ী)
কর্মী	: Worker (ওয়ার্কার)
কলু	: Oilman (অয়েলম্যান)
কেরানি	: Clerk (ক্লার্ক)
কুমার	: Potter (পটার)
কৃষক	: Peasant (পেজেন্ট)
	Farmer (ফারমার)
কাস্টমস কর্মকর্তা	: Brazier (ব্রেজিয়ার)
কোষাধ্যক্ষ	: Officer (অফিসার)
ক্রয়কারী	: Treasurer (ট্রেজারার)
ক্রেতা	: Buyer (বায়ার)
কসাই	: Purchaser (পারচেজার)
গৃহশিক্ষক	: Butcher (বুচার)
গায়ক	: Tutor (টিউটর)
গ্রন্থকার	: Singer (সিঙ্গার)
গোয়ালা	: Author (অথার)
গ্রন্থাগারিক	: Milkman (মিল্কম্যান)
চাকর	: Librarian (লাইব্রেরিয়ান)
চাষি	: Servant (সার্ভেন্ট)
	: Ploughman (প্লাউম্যান)
	Cultivator (কালটিভেটর)
	Tiller (টিলার)
চিত্রকর	: Painter (পেইন্টার)
চোর	: Thief (থিফ)
চিকিৎসক	: Surgeon (সার্জন)
	Physician (ফিজিসিয়ান)
চালক	: Driver (ড্রাইভার)
জলদস্যু	: Pirate (পাইরেট)
জেলে	: Fsherman (ফিশারম্যান)
জরিপকারক	: Surveyor (সার্ভেইয়ার)
জমিদার	: Landlord (ল্যান্ডলর্ড)
ডাক্তার	: Doctor (ডক্টর)
তাঁতি	: Weaver (ওয়েভার)
দর্জি	: Tailor (টেইলর)
দালাল	: Broker (ব্রোকার)
দস্যু	: Robber (রবার)
দারোয়ান	: Guard (গার্ড)
দোকানদার	: Shop-keeper (শপ-কিপার)
দন্ত চিকিৎসক	: Dentist (ডেন্টিস্ট)
ধোপা	: Washerman (ওয়াশারম্যান)
ধোপানি	: Laundress (লন্ড্রেস)
নাপিত	: Barber (বার্বার)
নাবিক	: Sailor (সেইলর)
নায়ক	: Actor (এ্যাক্টর)
নকল লেখক	: Copy-wraor
নৈশ প্রহরী	: Night-guard (নাইট গার্ড)
নির্মাতা	: Builder (বিল্ডার)
নির্মাতা	: Maker (মেকার)
নায়িকা	: Actress (এক্ট্রেস)
নিয়ন্ত্রক	: Controller (কন্ট্রোলার)
প্রভাষক	: Lecturer (লেকচারার)
পেশাদা	: Poon (পিয়ন)
পুরোহিত	: Priest (প্রিস্ট)
পাদ্রি	: Parson (পার্সন)
প্রকাশক	: Publisher (পাবলিশার)
পাঠক	: Reader (রিডার)
প্রযোজক	: Producer (প্রোডিউসার)
প্রশিক্ষক	: Instructor (ইনস্ট্রাক্টর)
পরিচালক	: Director (ডিরেক্টর)
পরীক্ষক	: Examiner (এক্সামিনার)
প্রতিবেদক	: Reporter (রিপোর্টার)
পরামর্শক	: Consultant (কনসালটেন্ট)
পেশা	: Profession (প্রফেশন)
পাচক	: Cook (কুক)
প্রকৌশলী	: Engineer (এনজিনিয়ার)
ফেরিওয়ালা	: Hawker (হকার)
বিচারক	: Judge (জাজ)
ব্যারিস্টার	: Barrister (ব্যারিস্টার)
বাজিকর	: Juggler (জাগলার)
বক্তা	: Orator (অরেটর)
বিমানচালক	: Pilot (পাইলট)
বণিক	: Trader (ট্রেডার)
বিক্রয়কারী	: Seller (সেলার)
বক্তা	: Speaker (স্পিকার)
বিশেষজ্ঞ	: Expert (এক্সপার্ট)
ব্যাংকার	: Banker (ব্যাংকার)
ব্যবসায়ী	: Businessman (বিজনেসম্যান)
বিশ্লেষক	: Analyst (এ্যানালিস্ট)
ব্যবস্থাপক	: Manager (ম্যানেজার)
বাহক	: Courier (কোরিয়ার)
বার্তাবাহক	: Messenger (ম্যাসেঞ্জার)
ভিক্ষুক	: Beggar (বেগার)
ভ্রমণকারী	: Traveler (ট্রাভেলার)

ভূতত্ত্ববিদ	: Geologist (জি ওলজিস্ট)
ঝাড়ুদার	: Sweeper (সুইপার)
মুদি	: Grocer (গ্রোসার)
মুচি	: Cobbler (কবলার)
মণিকার	: Jeweler (জুয়েলার)
মাঝি	: Boatman (বোটম্যান)
মেষপালক	: Shepherd (শেফার্ড)
মালি	: Gardener (গার্ডেনার)
মুদ্রাকর	: Printer (প্রিন্টার)
জাদুকর	: Magician (ম্যাজিসিয়ান)
রাজমিস্ত্রি	: Mason (মাসন)
রুটিওয়ালা	: Baker (বেকার)
রাখাল	: Cowboy (কাউবয়)
রাষ্ট্রদূত	: Ambassador (অ্যাম্বাসাডর)
রসায়নবিদ	: Chemist (কেমিস্ট)
রংকর	: Dyer (ডাইয়ার)
লেখক	: Writer (রাইটার)
শিক্ষক	: Teacher (টিচার)
	Master (মাস্টার)
শ্রমিক	: Labour (লেবার)
শিকারি	: Hunter (হান্টার)
শুশ্রূষাকারী	: Nurse (নার্স)
শিল্পী	: Artist (আর্টিস্ট)
সূতার	: Carpenter (কার্পেন্টার)
স্বর্ণকার	: Goldsmith (গোল্ডস্মিথ)
সঙ্গীতবিদ	: Musician (মিউজিসিয়ান)
সুদখোর	: Usurer (ইউজারার)
সৈনিক	: Soldier (সোলজার)
সন্ন্যাসী	: Mendicant (মেনডিক্যান্ট)
সওদাগর	: Merchant (মার্চেন্ট)
সম্পাদক	: Editor (এডিটর)
সচিব	: Secretary (সেক্রেটারি)
সভাপতি	: Chairperson (চেয়ারপার্সন)
	Chairman (চেয়ারম্যান)
সাংবাদিক	: Journalist (জার্নালিস্ট)
স্থপতি	: Architect (আর্কিটেক্ট)
সংগঠক	: Organizer (অর্গানাইজার)

ব্যবসা-বাণিজ্য
TRADE AND COMMERCE

অর্থ সংক্রান্ত	: Finance (ফাইন্যান্স)
অংশীদার	: Partnership (পার্টনারশিপ)
অবাধ বাণিজ্য	: Free trade (ফ্রি ট্রেড)
অঞ্চল	: Sector (সেক্টর)
অর্থনীতি	: Economics (ইকোনোমিক্স)
অংশ	: Share (শেয়ার)
অংশীদার	: Shareholder (শেয়ারহোল্ডার)
অগ্রক্রয়	: Preemption (প্রিএম্পশন)
আর্থিক	: Fiscal (ফিসকল)
আয়	: Income (ইনকাম)
আমদানি	: Import (ইম্পোর্ট)
আমদানি শুল্ক	: Tariff (টারিফ)
ইজারা দেওয়া	: Lease (লিজ)
উৎপাদনকারী	: Producer (প্রোডিউসার)
উদ্বৃত্ত	: Surplus (সারপ্লাস)
ঋণ	: Loan (লোন)
কর্মগ্রহীতা	: Lonee (লোনি)
একমাত্র প্রতিনিধি	: Sole agent (সোল এজেন্ট)
একচেটিয়া	: Monopoly (মনোপলি)
কর্তব্য	: Duty (ডিউটি)
ক্রেতা	: Purchaser (পারচেজার)
কার্টেল	: Curtel (কার্টেল)
কমপক্ষে	: Minimum (মিনিমাম)
কর	: Tax (ট্যাক্স)
করদাতা	: Tax Payee (ট্যাক্স পেয়ি)
কৌশল	: Technology (টেকনোলজি)
খরচ	: Cost (কস্ট)
খুচরা	: Retail (রিটেইল)
খরচ	: Expenditure (এক্সপেন্ডিচার)
খাজাঞ্চি	: Treasurer (ট্রেজারার)
খসড়া	: Draft (ড্রাফট)
ক্ষতিপূরণ	: Penalty (পেনাল্টি চার্জ করা)
ক্ষতিপূরণ	: Compensation (কমপেনসেশন/ক্ষতিপূরণ দেয়া)
গুদাম	: Store (স্টোর)
ঘাটতি	: Deficit (ডেফিসিট)
ঘাটতি	: Deduction (ডিডাকশন)
চুক্তি	: Contract (কন্ট্রাক্ট)
চেক	: Check (চেক)

Scanned with CamScanner

চোরাচালান	: Smuggling (স্মাগলিং)
চাহিদা	: Demand (ডিমান্ড)
চালান	: Invoice (ইনভয়েস)
জের	: Balance (ব্যালান্স)
জোত	: Holding (হোল্ডিং)
জমা	: Deposit (ডিপোজিট)
ঝুঁকি	: Risk (রিস্ক)
তহবিল	: Fund (ফান্ড)
দোকান	: Shop (শপ)
দালাল	: Broker (ব্রোকার)
দাবি	: Claim (ক্লেইম)
দলিল	: Deed (ডিড)
দাম	: Price (প্রাইস)
দরপত্র	: Tender (টেন্ডার)
নিরীক্ষক	: Auditor (অডিটর)
নিট আয়	: Net income (নিট ইনকাম)
নিষ্কৃতা প্রদানকারী	: Grantor (গ্রান্টর)
প্রতিনিধি	: Agent (এজেন্ট)
পাইকারি বিক্রয়	: Wholesale (হোলসেল)
প্রতিযোগিতা	: Competition (কমপিটিশন)
প্রকল্প	: Project (প্রোজেক্ট)
ফেরত	: Refund (রিফান্ড)
ফেরত	: Repayment (রিপেমেন্ট)
ফেরত	: Return (রিটার্ন)
বাজার	: Market (মার্কেট)
বিক্রেতা	: Seller (সেলার)
বিমা	: Insurance (ইনসিউরেন্স)
বন্ধক	: Morigage (মর্টগেজ)
ব্যবসায়ী	: Dealer (ডিলার)
বেতন	: Salary (সেলারি)
বণিক	: Merchant (মার্চেন্ট)
বেশি হলে	: Maximum (ম্যাক্সিমাম)
বিক্রি	: Sale (সেল)
বিমার কিস্তির টাকা	: Premium (প্রিমিয়াম)
বাদ, বাট্টা	: Discount (ডিসকাউন্ট)
বন্ধ	: Lay-off (লে-অফ)
বিনিয়োগ	: Investment (ইনভেস্টমেন্ট)
পরিধিকরণ	: Extension (এক্সটেনশন)
ভাড়াটে প্রজা	: Tenant (ট্যানেন্ট)
মূলধন	: Capital (ক্যাপিটাল)
মক্কেল	: Client (ক্লাইন্ট)
মজুদ	: Stock (স্টক)
মালিকানা	: Ownership (ওনারশিপ)
মোট আয়	: Gross income (গ্রোস ইনকাম)
মূল্য	: Value (ভ্যালু)
মূল্য সংযোজন কর	: Value added tax (ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স)
মন্দা	: Depression (ডিপ্রেশন)
মুনাফা	: Dividend (ডিভিডেন্ড)
মূল্য তালিকা	: Price Schedule (প্রাইস শিডিউল)
মোট	: Gross (গ্রোস)
মালিক	: Proprietor (প্রোপ্রাইটর)
যোগান	: Supply (সাপ্লাই)
রপ্তানি	: Export (এক্সপোর্ট)
রাজস্ব	: Revenue (রেভিনিউ)
লাভ	: Profit (প্রোফিট)
লোকসান	: Loss (লস)
লেনা	: Credit (ক্রেডিট)
শ্রমিক সংঘ	: Trade Union (ট্রেড ইউনিয়ন)
সুদ	: Interest (ইন্টারেস্ট)
সম্পত্তি	: Asset (অ্যাসেট)
সংস্থা	: Corporation (করপোরেশন)
সামগ্রী	: Goods (গুডস)
সম্পদ	: Resources (রিসোর্স)
সুবিধা	: Provision (প্রভিশিয়ন)
সংরক্ষণ করা	: Reserve (রিজার্ভ)
হুন্ডি	: Bond (বন্ড)
হার	: Rate (রেট)
হ্রাস পাওয়া	: Decrease (ডিক্রিজ)

কৃষিকাজ
CULTIVATION

আগাছা	: Weed (উইড)
উর্বর	: Fertile (ফার্টাইল)
কৃষক	: Ploughman (প্লাউম্যান) Cultivator (কাল্টিভেটর) Farmer (ফার্মার)
কোদাল	: Spade (স্পেইড)
কাদা মাটি	: Muddy (মাডি)
কাস্তে	: Sickle (সিকল)
কলের লাঙ্গল	: Tractor (ট্রাকটর)
কীটনাশক	: Pesticide (পেস্টিসাইড)
চারা	: Plant (প্লান্ট)
জোয়াল	: Yoke (ইয়োক)

জলাভূমি	: Marsh (মার্শ)
নিড়ানো	: Weeding (উইডিং)
পাহাড়ি, পর্বতময়	: Hilly (হিলি)
পাকা	: Ripe (রাইপ)
বৃষ্টিপাত	: Rainfall (রেইনফল)
মৃত্তিকা	: Land (ল্যান্ড)
মই	: Soil (সয়েল)
মৌসুমি বায়ু	: Ladder (ল্যাডার)
মাটি	: Monsoon (মনসুন)
রোপণ	: Clay (ক্লে)
লাঙ্গল	: Plantation (প্লান্টেশন)
সম্পদ	: Plough (প্লাউ)
সার	: Estate (এস্টেট)
	: Fertilizer (ফার্টিলাইজার)

খেলাধুলা
GAMES AND SPORTS

ক্রীড়া	: Sports (স্পোর্টস)
ক্রিকেট	: Cricket (ক্রিকেট)
কাবাডি	: Ha-do-do (হা-ডু-ডু)
কুস্তি	: Wrestling (রেসলিং)
খেলোয়াড়	: Player (প্লেয়ার)
খেলার সাথি	: Playmate (প্লেমেট)
খেলার ব্যাট	: Bat (ব্যাট)
ঘুড়ি	: Kite (কাইট)
জাল	: Net (নেট)
ঝাঁপ, লাফ	: Jump (জাম্প)
টেনিস	: Tennis (টেনিস)
তাস	: Card (কার্ড)
দোষ	: Foul (ফাউল)
দাবা	: Chess (চেস)
দৌড়	: Run (রান)
নাটাই	: Reel (রিল)
ফুটবল	: Football (ফুটবল)
ব্যায়াম	: Exercies (এক্সারসাইজ)
মাঠ	: Ground (গ্রাউন্ড)
মাঠ (নির্দিষ্ট)	: Field (ফিল্ড)
মুষ্টিযুদ্ধ	: Boxing (বক্সিং)
মধ্যস্থতাকারী	: Referee (রেফারি)
লাটিম	: Top (টপ্)
লুডু	: Ludo (লুডু)
লাথি	: Kick (কিক)
সাঁতার	: Swimming (সুইমিং)
হকি খেলা	: Hockey (হকি)

শিক্ষা
EDUCATION

অধ্যক্ষ	: Principal (প্রিন্সিপাল)
অঙ্ক	: Sum (সাম)
অভিধান	: Dictionary (ডিকশনারি)
অনুপস্থিত	: Absent (অ্যাবসেন্ট)
আলপিন	: Copy book (কপি বুক)
ইতিহাস	: History (হিস্টরি)
উত্তর	: Answer (আনসার)
উপস্থিত	: Present (প্রেজেন্ট)
উত্তীর্ণ	: Promotion (প্রোমশন)
কাগজ	: Paper (পেপার)
কলম	: Pen (পেন)
কালি	: Ink (ইঙ্ক)
কেদারা	: Chair (চেয়ার)
গৃহশিক্ষক	: Tutor (টিউটর)
গ্রন্থকার	: Author (অথর)
গদ্য	: Prose (প্রোজ)
ঘড়ি	: Clock (ক্লক)
ঘণ্টা	: Bell (বেল)
ছুটি	: Leave (লিভ)
ছাত্র	: Student (স্টুডেন্ট)
ছবি	: Picture (পিকচার)
ছুরি	: Knife (নাইফ)
ছাত্রাবাস	: Boarding house (বোর্ডিং হাউস)
জরিমানা	: Fine (ফাইন)
তাক	: Rack (র‍্যাক)
দোয়াত	: Ink-pot (ইঙ্ক-পট)
নকশা	: Design (ডিজাইন)
ন্যাকড়া	: Duster (ডাস্টার)
নিব	: Nib (নিব)
নাম ডাকা	: Roll call (রোল কল)
পাকা খাতা	: Register (রেজিস্টার)
প্রধান শিক্ষক	: Headmaster (হেডমাস্টার)
পুরস্কার	: Prize (প্রাইজ)
পদক	: Medal (মেডেল)
পরীক্ষক	: Examiner (একজামিনার)
পরীক্ষার্থী	: Examinee (একজামিনি)
পাঠক	: Reader (রিডার)
পুস্তকালয়	: Library (লাইব্রেরি)
পুস্তক	: Book (বুক)
পেন্সিল	: Pencil (পেন্সিল)
পত্র	: Leaf (লিফ)

Scanned with CamScanner

: Poetry (পয়েট্রি)
: Lesson (লেসন)
: Text book (টেক্সট্-বুক)
: Question (কোয়েশ্চন)
: Examination (এক্সামিনেশন)
: Bench (বেঞ্চ)
: Algebra (আলজেব্রা)
: Fee (ফি)
: Subject (সাবজেক্ট)
: Science (সায়েন্স)
: Grammar (গ্রামার)
: Sentence (সেনটেন্স)
: Scholarship (স্কলারশিপ)
: Admission (অ্যাডমিশন)
: Language (ল্যাংগোয়েজ)
: Mistake (মিসটেক)
: Geography (জিওগ্রাফি)
: Globe (গ্লোব)
: Cover (কভার)
: Map (ম্যাপ)
: Punishment (পানিশমেন্ট)
: Class (ক্লাস)
: Dictation (ডিকটেশন)
: Teacher (টিচার)
: Word (ওয়ার্ড)
: Literature (লিটারেচার)
: Inspector of Schools (ইন্সপেক্টর অব স্কুলস)

ধর্ম
RELIGIONS

অলৌকিক : Miracle (মিরাকল)
আত্মা : Soul (সোল)
আস্তিক : Theist (থিস্ট)
ইসলাম ধর্ম : Islam (ইসলাম)
খোদা, ভগবান : God (গড)
গির্জা : Church (চার্চ)
গুণ : Virtue (ভারচু)
তপস্বী : Hermit (হার্মিট)
দেবী : Goddess (গডেস)
ধার্মিক : Pious (পিয়াস)
ধর্মোপদেশ : Sermon (সার্মন)
ধর্মশাস্ত্র : Scripture (স্ক্রিপ্চার)
ধর্মপ্রচারক : Preacher (প্রিচার)
ধর্মীয় অন্তবিশ্বাস : Creed (ক্রিড)
ধর্মাশ্রম : Abbey (এবি)
ধর্মযাজক : Bishop (বিশপ)
নরক, দোজখ : Hell (হেল)
নবি : Prophet (প্রোফেট)
নৈতিক : Moral (মরাল)
পবিত্র : Holy (হলি)
পাপ : Sin (সিন)
প্রার্থনা করা : Pray (প্রে)
পাপ : Vice (ভাইস)
পবিত্র কুরআন : Quran (কুরআন)
প্রতিমা : Imago (ইমেজ)
পাদ্রি : Parson (পার্সন)
প্রভু : Lord (লর্ড)
পূজা : Worship (ওরশিপ)
ফেরেশতা : Angel (এঞ্জেল)
বিশ্বাস : Credence (ক্রিডেন্স)
বিধাতা : Providence (প্রভিডেন্স)
বিশ্বাস : Faith (ফেইথ)
বাইবেল : Bible (বাইবেল)
মসজিদ : Mosque (মস্ক)
মন্দির : Temple (টেম্পল)
মন্ত্র : Charm (চার্ম)
মঠবাসী, সন্ন্যাসী : Monk (মঙ্ক)
জাকাত : Poor-tax (পোর ট্যাক্স)
রোজা/উপবাস : Fasting (ফাস্টিং)
শয়তান : Devil (ডেভিল)
শিষ্য : Disciple (ডিসাইপল)
শয়তান : Evil (ইভিল)
শপথ : Oath (ওউথ)
সর্বশক্তিমান : Almighty (অলমাইটি)
স্বর্গ / বেহেশত : Paradise (প্যারাডাইস) Heaven (হেবেন)
সৃষ্টিকর্তা : Creator (ক্রিয়েটর)
স্বর্গীয় : Divine (ডাইভিন)
সাধু : Saint (সেইন্ট)
স্বর্গীয় : Elysian (ইলিজিয়ান)
হজ্ব : Pilgrimage (পিলগ্রিমেজ)
হাদিস : Tradition (ট্রেডিশন)

আইন ও বিচার
LAW AND JUDICIAL

: Crime (ক্রাইম)
: Criminal (ক্রিমিনাল)
: Flight (ফ্লাইট)
: Slander (স্লান্ডার)
: Kidnap (কিডনপ)
: Lawyer (ল'ইয়ার)
: Lawful (ল'ফুল)
: Detention (ডিটেনশন)
: Appeal (আপীল)
: Legal (লিগাল)
: Accused (অ্যাকুসড)
: Assault (অ্যাসল্ট)
: Petition (পিটিশন)
: Suicide (সুইসাইড)
: Order (অর্ডার)
: Surrender (সারেন্ডার)
: Attorney (এটর্নি)
: Eviction (ইভিকশন)
: Alias (এলিয়াস)
: Plea (প্লি)
: Dock (ডক)
: Parade (প্যারেইড)
: Acquital (এ্যাকুইটাল)
: Pardon (পার্ডন)
: Damage (ড্যামেইজ)
: Murder (মার্ডার)
: Warrant (ওয়ারেন্ট)
: Arrest (অ্যারেস্ট)
: Frame (ফ্রেম)
: Informer (ইনফরমার)
: Merits (মেরিটস)
: Conceal (কনসিল)
: Larceny (লারসিনি)
: Hijack (হাইজ্যাক)
: Fine (ফাইন)
: Bail (বেইল)
: Interrogation (ইন্টারোগেশন)
: Deposition (ডিপজিশন)
: Forgery (ফোজারি)
: Cross (ক্রোস)
: Verdict (ভার্ডিক্ট)
: Inquiry (ইনকোয়ারি)
: Divorce (ডিভোর্স)
: Submission (সাবমিশন)
: Bummon (সামন)
: Guilt (গিল্ট)
: Accident (অ্যাকসিডেন্ট)
: Deed (ডিড)
: Offence (অফেন্স)
: Civil (সিভিল)
: Civil Court (সিভিল কোর্ট)
: Guilty (গিল্টি)
: Rape (রেপ)
: Citizen (সিটিজেন)
: Citizenship (সিটিজেনশিপ)
: Justice (জাস্টিস)
: Innocent (ইনোসেন্ট)
: Execution (এক্সিকিউশন)
: Submission (সাবমিশন)
: Minor (মাইনর)
: Solitary (সলিটারি)
: Reject (রিজেক্ট)
: Injunction (ইঞ্জাংশন)
: Robbery (রোবারি)
: Adult (অ্যাডাল্ট)
: Eye-witness (আই-উইটনেস)
: Testify (টেস্টিফাই)
: Criminal Court (ক্রিমিনাল কোর্ট)
: Judge (জজ)
: Judgement (জাজমেন্ট)
: Trial (ট্রেইল)
: Ban (ব্যান)
: Defendant (ডিফেন্ডেন্ট)
: Legalize (লিগালাইজ)
: Jury (জুরি)
: Confinement (কনফাইনমেন্ট)
: Trust (ট্রাস্ট)
: Prison (প্রিজন)
: Nulity (নালিফাই)
: Prosecutor (প্রসিকিউটর)
: Case (কেইস)
: Capital Punishment (ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট)

Scanned with CamScanner

মুলতবি : Abeyance (অ্যাবিএন্স)
মামলা : Suit (স্যুট)
রায় : Judgement (জাজমেন্ট)
শপথ : Oath (ওউথ)
শুনানি : Hearing (হিয়ারিং)
শালিস নিষ্পত্তিকরণ : Arbitration (আর্বিট্রেশন)
শাস্তি : Punishment (পানিশম্যান্ট)
শাস্তিযোগ্য : Punishable (পানিশএ্যাবল)
ষড়যন্ত্র : Conspiracy (কনসপাইরেসি)
সংবিধান : Constitution (কনস্টিটিউশন)
সংশোধন : Amendment (অ্যামেন্ডমেন্ট)
সাজা প্রদান : Convict (কনভিক্ট)
সাক্ষী : Witness (উইটনেস)
সন্দেহ করা : Suspect (সাসপেক্ট)
সাক্ষ্য : Evidence (ইভিডেন্স)
সিঁদেল চুরি : Burglary (বার্গলারি)
সিদ্ধান্ত : Decision (ডিশিসন)
সত্য ঘটনা : Fact (ফ্যাক্ট)
হাতকড়া : Handcuff (হ্যান্ডকাফ)
হত্যা : Homicide (হোমিসাইড)
হত্যা করা : Kill (কিল)

প্রতিরক্ষা
DEFENCE

অস্ত্রশস্ত্র : Arms (আর্মস)
অবরোধ : Siege (সিজ)
আণবিক বোমা : Atom bomb (অ্যাটম বোম)
আক্রমণ : Attack (এ্যাটাক)
কামান : Cannon (ক্যানন)
কামানের গোলা : Ball (বল)
ক্যাপ্টেন : Captain (ক্যাপ্টেইন)
কর্নেল : Colonel (কর্নেল)
যুদ্ধ : Battle (ব্যাটল)
গোলা : Shell (শেল)
গুপ্তচর : Spy (স্পাই)
গোলন্দাজ বাহিনী : Artillery (আর্টিলারি)
ছোরা : Dagger (ড্যাগার)
গুলি : Shot (শোট)
ছত্রভঙ্গ : Rout (রাউট)
যুদ্ধবিমান : Fighter (ফাইটার)

জয় : Win (উইন)
ঢাল : Shield (শিল্ড)
তির : Arrow (অ্যারো)
তরবারি : Sword (সোর্ড)
তাঁবু : Tent (টেন্ট)
দুর্গ : Fort (ফোর্ট)
ধনুক : Bow (বো)
নৌসেনা : Naval force (নেভাল ফোর্স)
নৌবাহিনী : Navy (নেভি)
পিস্তল : Pistol (পিস্তল)
প্রধান সেনাপতি : Commander-in-Chief (কমান্ডার ইন চিফ)
পরাজয় : Defeat (ডিফিট)
পলায়ন : Retreat (রিট্রিট)
পতাকা : Flag (ফ্লাগ)
পত্রবাহক দূত : Messenger (মেসেঞ্জার)
পদাতিক সেনাবাহিনী : Infantry (ইনফ্যান্ট্রি)
বারুদ : Powder (পাউডার)
বিস্ফোরক : Explosion (এক্সপ্লোশন)
বন্দুক : Gun (গান)
বোমা : Bomb (বোম)
বেয়নেট : Bayonet (বেয়নেট)
বর্শা : Lance (লেন্স)
বল্লম : Spear (স্পিয়ার)
বর্ম : Armour (আর্মার)
বন্দুকের গোলা : Bullet (বুলেট)
ব্রিগেডিয়ার : Brigadier (ব্রিগেডিয়ার)
বিজয় : Victory (ভিক্টরি)
বিমান বাহিনী : Airforce (এয়ারফোর্স)
বীর : Hero (হিরো)
বন্দি : Prisoner (প্রিজনার)
মেজর : Major (মেজর)
যুদ্ধাস্ত্র : War-weapons (ওয়ার-উইপনস)
যুদ্ধ : War (ওয়ার)
যুদ্ধবন্দি : War prisoner (ওয়ার প্রিজনার)
রণতরী : Fleet (ফ্লিট)
লেফটেন্যান্ট : Lieutenant (লেফটেন্যান্ট)
শিবির : Camp (ক্যাম্প)
শান্তি : Peace (পিস)
সহযোদ্ধা : Comrade (কমরেড)
সেনাপতি : Commander (কমান্ডার)
সন্ধি : Treaty (ট্রিএটি)
সৈনা : Soldier (সোলজার)

পশু
BEASTS

ইঁদুর : Mouse (মাউস)
উট : Camel (ক্যামেল)
কুকুর : Dog (ডগ)
কাঠবিড়ালি : Squirrel (স্কুইরিল)
খরগোশ : Hare (হেয়ার)
খচ্চর : Mule (মিউল)
খেঁকশিয়াল : Fox (ফক্স)
গাধা : Ass (এ্যাস)
গরু : Cow (কাউ)
ঘোড়া : Horse (হর্স)
চিতাবাঘ : Leopard (লেপার্ড)
ছাগল : Goat (গোট)
ছাগল ছানা : Kid (কিড)
জেব্রা : Zebra (জেব্রা)
টাট্টু ঘোড়া : Pony (পনি)
নেকড়ে বাঘ : Wolf (উলফ)
বিড়াল : Cat (ক্যাট)
বন মানুষ : Orang-utan (ওরাং-ওটাং)
বাঘের বাচ্চা : Cub (কাব)
ষাঁড় : Bull (বুল)
বলদ : Bullock (বুলক)
বন্য শূকর : Boar (বোর)
বাছুর : Calf (কাফ)
বাঘ : Tiger (টাইগার)
বাঘিনী : Tigress (টাইগ্রেস)
বড় ইঁদুর : Rat (র‍্যাট)
ভেড়া : Ram (র‍্যাম)
ভেড়ি : Ewe (ইউ)
ভেড়ার বাচ্চা : Lamb (ল্যাম্)
ভল্লুক : Bear (বেয়ার)
মহিষ : Buffalo (বাফেলো)
মেষ : Sheep (শিপ)
শৃগাল : Jackal (জ্যাকল)
শূকর : Hog (হগ)
শূকর ছানা : Pig (পিগ)
ষাঁড় : Ox (অক্স)
সিংহ : Lion (লায়ন)
সিংহী : Lioness (লায়নেস)
হরিণ : Deer (ডিয়ার)
হরিণ শাবক : Fawn (ফন)
হরিণী : Doe (ডো)
হরিণী : Hind (হাইন্ড)
হাতি : Elephant (অ্যালিফ্যান্ট)

পাখি
BIRDS

ইগল পাখি : Eagle (ইগল)
উটপাখি : Ostrich (অস্ট্রিচ)
কাকাতুয়া : Cockatoo (ককাতু)
কোকিল : Cuckoo (কুকু)
কাক : Crow (ক্রো)
গাং চিল : Seagull (সিগাল)
ঘুঘু : Dove (ডাভ)
চিল : Kite (কাইট)
চাতক : Skylark (স্কাইলার্ক)
চড়ুই : Sparrow (স্পারো)
তোতাপাখি : Parrot (প্যারোট)
দোয়েল : Magpie Robin (মেগপাই রবিন)
দাঁড়কাক : Rock (রুক)
দাঁড়কাক : Raven (র‍্যাভেন)
টিয়াপাখি : Parakeet (প্যারকিট)
পাখি : Bird (বার্ড)
পেঁচা : Owl (অয়োল)
পাতিহাঁস : Drake (ড্রেক)
পানকৌড়ি : Pelican (পেলিকান)
পায়রা : Pigeon (পিজিওন)
বাজপাখি : Hawk (হোক)
বুলবুলি : Nightingale (নাইটিঙ্গেল)
বাবুই : Swallow (সোয়ালো)
বাদুড় : Bat (ব্যাট)
বক : Heron (হেরন)
বাজপাখি : Falcon (ফ্যালকন)
মুনিয়া : Munia (মুনিয়া)
ময়ূর : Peacock (পিকক)
ময়ূরী : Peahen (পিহেন)
মোরগ : Cock (কক)
মুরগি : Hen (হেন)
মুরগির বাচ্চা : Chicken (চিকেন)
মাছরাঙা : Kingfisher (কিংফিশার)
রাজহংসী : Goose (গুজ)
রাজহাঁস : Gander (গ্যান্ডার)
শালিক : Martin (মার্টিন)
শকুন : Vulture (ভালচার)
সারস : Crane (ক্রেইন)
সারস : Stork (স্টোর্ক)
হাড়গিলা : Adjutant (এডজুটেন্ট)
হাঁস : Duck (ডাক)

Scanned with CamScanner

মাছ
FISHES

ইলিশ	: Hilsha (হিলশা)
কৈ মাছ	: Climbing fish (ক্লাইমিং ফিশ)
কার্প	: Carp (কার্প)
কাঁকড়া	: Crab (ক্রাব)
চিংড়ি (বড়)	: Lobster (লবস্টার)
চিংড়ি (ছোট)	: Prawn (প্রন)
চিংড়ি মাছ	: Shrimp (শ্রিম্প)
চান্দা মাছ	: Moon fish (মুন ফিশ)
তিমি	: Whale (হোয়েল)
তারা মাছ	: Star fish (স্টার ফিশ)
পুঁটি মাছ	: Smat fry (স্মল ফ্রাই)
ফলুই মাছ	: Flat fish (ফ্লাট ফিশ)
বোয়াল মাছ	: Sprawn (স্প্রন)
বাইল মাছ	: Trout (ট্রাউট)
মাগুর মাছ	: Eel fish (ঈল ফিশ)
মাছের আঁশ	: Cat fish (ক্যাট ফিশ)
মাছের কানকুয়া	: Scale (স্কেল)
মাছের ডিম	: Gill (গিল)
রুই	: Roe (রো)
লটকি মাছ	: Salmon (স্যামন)
শিল মাছ	: Dry fish (ড্রাই ফিশ)
শিং মাছ	: Seal fish (সিল ফিশ)
হাঙর	: Barbel (বার্বেল)
	: Shark (শার্ক)

কীট-পতঙ্গ
WORMS AND INSECTS

উকুন	: Louse (লাউজ)
উইপোকা	: White ant (হোয়াইট অ্যান্ট)
কেঁচো	: Earth worm (আর্থওয়ার্ম)
কুনোব্যাঙ	: Toad (টোড)
গুটিপোকা	: Silkworm (সিল্কওয়ার্ম)
গোখরা সাপ	: Cobra (কোবরা)
ছুঁচা	: Mole (মোল)
ছারপোকা	: Bug (বাগ)
জোঁক	: Leech (লিচ)
জোনাকি পোকা	: Glow worm (গ্লো ওয়ার্ম)
ঝিঁ ঝিঁ পোকা	: Cricket (ক্রিকেট)
টিকটিকি	: Lizard (লিজার্ড)
তেলাপোকা	: Oil beetle (অয়েল বিটল)
পিঁপড়া	: Ant (অ্যান্ট)
প্রজাপতি	: Butterfly (বাটারফ্লাই)
বোলতা	: Wasp (ওয়াস্প)
বেজি	: Mongoose (মঙ্গুজ)
ব্যাঙ	: Frog (ফ্রগ)
ভিমরুল	: Hornet (হর্নেট)
মশা	: Mosquito (মস্কুইটো)
মাছি	: Fly (ফ্লাই)
মৌমাছি	: Bee (বি)
মাকড়সা	: Spider (স্পাইডার)
আরশোলা	: Cockroach (কক্রোচ)
শজারু	: Hedgehog (হেজহগ)
সরীসৃপ	: Reptile (রেপটাইল)
সাপ	: Snake (স্নেক)

ফল
FRUITS

আতা	: Apple (অ্যাপল)
আনারস	: Pine apple (পাইন অ্যাপল)
আম	: Mango (ম্যাঙ্গো)
আমড়া	: Hogplum (হগপ্লাম)
আঙুর	: Grape (গ্রেপ)
কুল	: Plum (প্লাম)
কমলালেবু	: Orange (অরেঞ্জ)
কাগজিলেবু	: Citron (সিট্রন)
কাঁঠাল	: Jack fruit (জ্যাক ফ্রুট)
কিসমিস	: Raisin (রেইজিন)
কলা	: Banana (বানানা)
খেজুর	: Date (ডেট)
জাম	: Berry (বেরি)
জলপাই	: Olive (অলিভ)
ডাব	: Green coconut (গ্রিন কোকোনাট)
ডালিম	: Pome granet (পম গ্রানেট)
তাল	: Palm (পাম)
তরমুজ	: Water melon (ওয়াটার মিলন)
তেঁতুল	: Tamarind (টামারিন্ড)
নাসপাতি	: Pear (পিয়ার)
নারকেল	: Coconut (কোকোনাট)
পেয়ারা	: Guava (গুয়েভা)
পেঁপে	: Papiya (পাপিয়া)
পেস্তা	: Pistachio (পিস্টাচিও)
বাদাম	: Almond (অ্যালমন্ড)
বাদাম	: Nut (নাট)

লেবু	: Wood apple (উড অ্যাপল)
শালগমের	: Shaddock (শাডক)
লাউ	: Lichi (লিচি)
শসা	: Lemon (লেমন)
	: Cucumber (কুকুমবার)

ফুল
FLOWERS

করবী	: China box (চায়না বক্স)
করবী	: Oleander (অলিয়ান্ডার)
গন্ধরাজ	: Gardenia (গার্ডেনিয়া)
গোলাপ	: Rose (রোজ)
চাঁপা	: Marigold (মেরিগোল্ড)
চেরি	: Cherry (চেরি)
জুই	: Jasmine (জেসমিন)
জবা	: China rose (চায়না রোজ)
পলাশ	: Bastard teak (বাস্টার্ড টিক)
পদ্ম	: Lotus (লোটাস)
পার্চকী	: Crupper (ক্রোপার)
মল্লিকা	: Tulip (টিউলিপ)
মালতি	: Echits (এচিটস)
রজনীগন্ধা	: Night queen (নাইট কুইন)
শাপলা	: Lilly (লিলি)
সূর্যমুখী	: Sunflower (সান ফ্লাওয়ার)

রং
COLORS

কালো	: Black (ব্ল্যাক)
কমলা	: Orange (অরেঞ্জ)
খয়েরি লাল	: Puce (পিউস)
গাঢ় তামাটে বর্ণ	: Maroon (ম্যারুন)
গৌরবর্ণ	: Fair (ফেয়ার)
গোলাপি	: Pink (পিঙ্ক)
ছাই	: Ash (অ্যাশ)
ধূসর	: Grey (গ্রে)
নীল	: Blue (ব্লু)
নীল (পলাশ)	: Indigo (ইনডিগো)
নীল (আকাশি)	: Sky blue (স্কাই ব্লু)
ফ্যাকাশে রং	: Pale (পেল)
বাদামি	: Brown (ব্রাউন)
বেগনি	: Violet (ভাইওলাট)

গণিত
MATHEMATICS

অনুপাত	: Ratio (রেশিও)
আনুপাতিক	: Proportion (প্রোপোর্শন)
ইঞ্চি	: Inch (ইঞ্চ)
উনান	: Table (টেবল)
কলাকুল	: Rectangle (রেকট্যাঙ্গল)
কোণ	: Angle (এঙ্গল)
কৌণিক	: Simply (সিম্পলি)
ক্ষেত্রফল	: Area (এরিয়া)
গজ	: Power (পাওয়ার)
গড়	: Average (অ্যাভারেজ)
গণিতিক	: Length (লেংথ)
গতি	: Direction (ডিরেকশন)
গাণিতিক গড়	: Calculator (ক্যালকুলেটর)
চিহ্ন	: Symbol (সিম্বল)
জ্যামিতি	: Geometry (জিওমেট্রি)
ত্রিভুজ	: Tri-angle (ট্রাইএঙ্গল)
দূরত্ব	: Distance (ডিসটান্স)
দৈর্ঘ্য	: Length (লেংথ)
ধনাত্মক	: Positive (পজিটিভ)
নির্দিষ্ট	: Definite (ডেফিনিট)
পাটিগণিত	: Arithmetic (এরিথমেটিক)
পার্থক্য	: Difference (ডিফারেন্স)
পরিমাণ	: Quantity (কোয়ান্টিটি)
পদ্ধতি	: System (সিস্টেম)
পাউন্ড	: Pound (পাউন্ড)
প্রমাণ	: Proof (প্রুফ)
পরিমাপ	: Measure (মেজার)
প্রকৃত	: Real (রিয়াল)
পরিসংখ্যান	: Statistics (স্টাটিস্টিক্স)
ফাঁকা	: Space (স্পেস)
ভাগ	: Divide (ডিভাইড)
বীজগণিত	: Algebra (অ্যালজেব্রা)
বৃত্ত	: Circle (সার্কেল)
বণ্টন	: Distribution (ডিস্ট্রিবিউশন)
বাদ	: Deduct (ডিডাক্ট)
বিয়োগ	: Minus (মাইনাস)

Scanned with CamScanner

বর্গক্ষেত্র	: Square (স্কয়ার)
মূল	: Root (রুট)
মূল্য	: Value (ভ্যালু)
যোগ	: Plus (প্লাস)
যোগ	: Sum (সাম)
যুক্তিবিদ্যা	: Logic (লজিক)
যোগফল	: Summation (সামেশন)
রৈখিক	: Linear (লিনিয়ার)
রেখা	: Curve (কার্ভ)
শীর্ষবিন্দু	: Apex (এপেক্স)
শতক	: Decimal (ডেসিমল)
শতকরা	: Percent (পার্সেন্ট)
সম্পূর্ণ	: Absolute (আবসুলুট)
সংলগ্ন	: Adjacent (আডজাসেন্ট)
সংখ্যা	: Number (নাম্বার)
সংখ্যা, অঙ্ক	: Figure (ফিগার)
সমান	: Equal (ইকুয়াল)
সূত্র	: Formula (ফর্মুলা)
সমাধান	: Solution (সলিউশন)
সমীকরণ	: Equation (ইকোয়েশন)
সমান্তরাল	: Parallel (প্যারালেল)
হার	: Rate (রেট)

ধাতু এবং খনিজ পদার্থ
METALS AND MINERALS

অকটেন	: Octane (অকটেন)
আলকাতরা	: Tar (টার)
ইস্পাত	: Steel (স্টিল)
কয়লা	: Coal (কোল)
কাসা	: Bell metal (বেল মেটাল)
খনি	: Mine (মাইন)
গন্ধক	: Sulfur (সালফার)
চুন	: Lime (লাইম)
চুনি	: Ruby (রুবি)
তেল	: Oil (অয়েল)
তামা	: Copper (কপার)
দস্তা	: Zinc (জিঙ্ক)
টিন	: Tin (টিন)
ডিজেল	: Diesel (ডিজেল)
পিতল	: Brass (ব্রাস)
পারদ	: Mercury (মারকারি)
পান্না	: Emerald (এমারেলড)
পেট্রোল	: Patrol (পেট্রোল)
পাথর	: Stone (স্টোন)
মুক্তা	: Pearl (পার্ল)
মণি	: Gem (জেম)
রক্তাভ কয়লা	: Coke (কোক)
রুপা	: Silver (সিলভার)
লোহা	: Iron (আয়রন)
লবণ	: Salt (সল্ট)
সিসা	: Lead (লিড)
সোনা	: Gold (গোল্ড)

সময়, দিন ও মাস
TIMES, DAYS AND MONTHS

অপরাহ্ণ	: Afternoon (আফটারনুন)
আজ	: Today (টুডে)
আগামীকাল	: Tomorrow (টুমোরো)
আগামী মাস	: Proximo (প্রোকসিমো)
উষা	: Dawn (ডোন)
গতকাল	: Yesterday (ইয়েস্টারডে)
গোধূলি	: Dusk (ডাস্ক)
গত মাস	: Ultimo (আলটিমো)
ঘণ্টা	: Hour (আউয়ার)
তারিখ	: Date (ডেট)
দিন	: Day (ডে)
দুপুর	: Noon (নুন)
দিবালোক	: Day light (ডে লাইট)
পূর্বাহ্ণ	: Fore noon (ফোর নুন)
পরের দিন	: Morrow (মরো)
প্রত্যেক দিন	: Every day (এভরি ডে)
পক্ষ	: Fortnight (ফোর্টনাইট)
বর্তমান মাস	: Instant (ইনস্ট্যান্ট)
বছর	: Year (ইয়ার)
ভোর	: Daybreak (ডেব্রেক)
ভোর	: Morning (মর্নিং)
মধ্যাহ্ন	: Midday (মিডডে)
মুহূর্ত	: Moment (মোমেন্ট)
মিনিট	: Minute (মিনিট)
মাস	: Month (মানথ)
যুগ	: Age (এজ)
রাত	: Night (নাইট)
শতাব্দী	: Century (সেঞ্চুরি)
সূর্যাস্ত	: Sunset (সানসেট)
সময়	: Time (টাইম)
সূর্যোদয়	: Sunrise (সানরাইজ)
সেকেন্ড	: Second (সেকেন্ড)
সপ্তাহ	: Week (উইক)
সহস্রাব্দ	: Millennium (মিলেনিয়াম)
স্বর্ণযুগ	: Golden age (গোল্ডেন এজ)

পারিভাষিক শব্দ

পরিভাষা : সংজ্ঞার্থ ও বৈশিষ্ট্য

পারিভাষিক শব্দ বা পরিভাষা কী তা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিশে বাংলা অভিধান সংকলয়িতা হরপ্রসাদ রায় বলেছেন, "অভিধানে 'পরিভাষা' হচ্ছে সংকেতার্থ শব্দ। অর্থাৎ যে শব্দের দ্বারা কোনো বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয় তা পরিভাষা।" অনেক অর্থ আছে এমন যে শব্দ যদি বিশেষ প্রসঙ্গে একটি নির্দিষ্ট অর্থে প্রযুক্ত হয়, সে শব্দটি তখন পরিভাষা হয়ে শব্দ।

পরিভাষা সুনির্দিষ্ট সুনির্দিষ্ট শব্দ, তার অর্থের বিভ্রান্তি নেই, প্রসার নেই। সাধারণত এমন শব্দকে পারিভাষিক শব্দ বলা হয় যার অর্থ পরিষ্কার একটি ক্ষেত্রের সঙ্গতিতে নির্ধারিত হয়েছে এবং যা ব্যবহৃত হয়। যেমন, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদির আলোচনায় প্রয়োগ করলে অর্থবোধে সংশয় সৃষ্টি না।

শব্দ ও পরিভাষার পার্থক্য

শব্দ ও পরিভাষার মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান। পরিভাষা কোনো জ্ঞান-ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য-জ্ঞাপক একক নাম বা সংজ্ঞার্থ আর শব্দ হচ্ছে ভাষায় ব্যবহৃত যে কোনো অর্থবোধক ধ্বনি বা ধ্বনি-সমষ্টি। এক কথায়, সকল পরিভাষাই মূলত শব্দ, কিন্তু সকল শব্দই পরিভাষা নয়।

বাংলা পরিভাষা প্রণয়ন

বাংলা ভাষায় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রয়োজনে বিদেশি পারিভাষিক শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ তৈরির চেষ্টা শুরু হয় অনেকদিন আগে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বাংলায় বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলবিষয়ক পরিভাষা সংকলন ও নতুন পরিভাষা প্রণয়নের সূত্রপাত করেন। তার আগে পরিভাষা প্রণয়নের চেষ্টা নেহায়েত ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল। পরে ঢাকার বাংলা একাডেমী এ কাজ করে।

বাংলা পরিভাষা নির্মাণ-কৌশল

সাধারণত পরিভাষা নির্মিত হয় দুটো ভিন্নতর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে: জ্ঞানের চর্চাকারী যাঁরা তাঁদের প্রয়োজনে পরিভাষা নির্মাণ করেন বা করতে বাধ্য হন এবং তখন সেটা অন্যদের মধ্যে ব্যবহৃত হতে হতে এক সময় পরিভাষাটি সর্বসাধারণের কাছেও পৌঁছে যায়; সাধারণের কাছে তা কখনো গৃহীত হয়, কখনো হয় পরিত্যক্ত, তখনো সেটা অর্জন করে একটি উৎকৃষ্ট পারিভাষিক শব্দের মর্যাদা, কখনো বা শব্দটির সচেতন বর্জনের মাধ্যমে তা বিপর্যস্তের অতল গর্ভে হারিয়ে যায়। সাহিত্যিক প্রয়োজনে ভাষাও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগেও পরিভাষা সৃষ্টি হতে পারে। ফ্রান্সে ফরাসি একাডেমি এ ধরনের কাজের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে সম্মানিত একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ফরাসিরা কোন শব্দ, কোন শব্দের অর্থ, উচ্চারণ এমনকি পরিভাষা কী হবে তার জন্য পূর্ণাঙ্গ রূপে নির্ভর করে ফরাসি একাডেমির কর্তৃত্বের উপর, একাডেমি যে মতামত দেয় তা তাঁরা গ্রহণ করে গ্রন্থ নির্ঘণ্টায়। ইংরেজরা তেমনি ভাষা সম্পর্কিত অনেক প্রশ্নেরই সদুত্তর লাভের ক্ষেত্রে নির্ভর করে অক্সফোর্ডের ওপর। বাংলাদেশে 'বাংলা একাডেমী', পশ্চিমবঙ্গের 'বাংলা আকাদেমি'-এ ধরনের দুটো প্রতিষ্ঠান, যারা প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে বাংলা পরিভাষা প্রণয়নে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও নানা ধরনের প্রশাসনিক ও জ্ঞান জাগতিক পরিভাষা প্রণয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কোন কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আজকাল এগিয়ে এসেছে ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে তাদের মতামত নিয়ে।

যদি পরিভাষাটি সাধারণের কাছে সহজবোধ্য এবং ব্যবহার উপযোগী হয়ে ওঠে তবেই সেটি টিকে যায়, সেটা কোন প্রতিষ্ঠান না ব্যক্তি নির্মিত তা অবিবেচ্য। যেমন : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক সময় Advocate শব্দটির বাংলা পরিভাষা হিসেবে 'অধিবক্তা' শব্দটি প্রচলনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ ঐ শব্দটির পরিভাষা হিসেবে 'উকিল' শব্দটি সহজে গ্রহণ করায় 'অধিবক্তা' একেবারে হারিয়ে গেছে। আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর Resident এবং Non-Resident শব্দ দুটির পরিভাষা তৈরি করেছিলেন 'আবাসিক' ও 'অনাবাসিক' — এই চমৎকার

Scanned with CamScanner

দুটো পরিভাষা আমরা কিন্তু সহজেই গ্রহণ করে নিয়ে আজও তা স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যবহার করে চলেছি। সুতরাং **পরিভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে সহজবোধ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ** ভূমিকা পালন করে থাকে।

পরিভাষা তৈরির নিয়ম ও পদ্ধতি

নিয়ম : যে কোনো পারিভাষিক শব্দেরই থাকতে হয় চারটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য। সেগুলো হচ্ছে : সর্বজন স্বীকৃতি, স্বাভাবিকতা, বিশিষ্টার্থ, আড়ম্বরহীনতা। কিন্তু এই সব গুণ সম্পন্ন শব্দ তৈরি করতে হলে, যিনি পরিভাষা তৈরি করবেন, তাঁকে অবশ্যই মেনে নিতে হয় ভাষাবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলো। তাছাড়া ভাষা বিবর্তনের ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কেও পরিভাষা সৃষ্টিকারীর থাকতে হয় পরিষ্কার ধারণা। এই ধারণার সাহায্যেই তিনি নির্বাচন করবেন এমন শব্দ যা সহজেই সমাজে গৃহীত হবে। দুরূহ শব্দে পরিভাষা তৈরি হলে তা জনসাধারণের কাছে গৃহীত হয় না।

পদ্ধতি : যে কোন ভাষাতেই পরিভাষা তৈরি হয় সাধারণত দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করে। পদ্ধতি দুটি হলো— ঋণ অনুবাদ ও নির্মাণ।

১. ঋণ অনুবাদ : পুরনো, ভুলে যাওয়া কোন বাংলা শব্দকে তুলে এনে নতুন অর্থে ব্যবহার করেও পরিভাষা তৈরি করা যায়। শব্দের আগের অর্থটা জানা থাকলে বা বহাল থাকলেও ধীরে ধীরে নতুন অর্থটাই সবার কাছে পরিচিত পেয়ে, নতুন অর্থ ধারণ করে ফেলে। ঋণ অনুবাদ হতে পারে দুধরনের। সংস্কৃত বা দেশি এমন অনেক শব্দ পাওয়া যাবে যেগুলো একই অর্থে ব্যবহৃত হয়; অর্থাৎ অর্থ একটিই কিন্তু শব্দ অনেক। এ ধরনের শব্দগুলোর ভেতর থেকে একটি বেছে নিয়ে আমরা নতুন অর্থে প্রয়োগ করে গড়ে তুলতে পারি একটি পরিভাষা। 'বিজ্ঞান', 'ইতিহাস', 'পদার্থ' প্রভৃতি শব্দ এমন ধরনের ঋণ অনুবাদের উদাহরণ। বিজ্ঞান শব্দটি বোঝাত 'বিশেষ জ্ঞান'— তা সে যে কোনো জ্ঞানকেই বোঝাত কিন্তু এখন science-এর পরিভাষা হিসেবে আমরা বিজ্ঞান শব্দটির ব্যবহার করছি।

২. নির্মাণ : শব্দ নির্মাণের মত পরিভাষা নির্মাণের বেলাতেও ভাষার মূল প্রবণতা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়। বাংলা ভাষার শব্দসম্ভার থেকে উপাদান মিশিয়ে পারিভাষিক শব্দ তৈরি করা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তৎসম শব্দ হতে গৃহীত পরিভাষা– যেমন, 'গ্রন্থিছদ' [illegible] 'মুখরোধ', ম.সা.গু ('মধ্যিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক'), গ.সা.গু (গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক) ইত্যাদি শব্দ পরিভাষা হিসাবে [illegible] সুপ্রযুক্ত হয়েছে।

সর্বস্তরে বাংলা : পরিভাষা-সমস্যা

একটি ভাষার শব্দভাণ্ডারে পরিভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। পরিভাষাই ভাষা বিশেষের [illegible] সম্পদ। মাতৃভাষা বাংলাকে আমাদের জীবনের সর্বস্তরে প্রয়োগ করতে গিয়ে যে সমস্যাটা অত্যন্ত প্রবলভাবে দেখা দেয় তা হল পরিভাষা সমস্যা। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই-পুস্তক রচনা ও অফিস-আদালতে বাংলার পূর্ণ প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় পরিভাষার অভাব রয়েছে। এ সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রচুর ইংরেজি পরিভাষার বাংলা প্রতিশব্দ প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের কথা উপলব্ধি করে আমাদের বিশেষজ্ঞরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে নতুন নতুন বাংলা পরিভাষা সৃষ্টি করে চলেছেন। পরিভাষা সৃষ্টির প্রচেষ্টাকে সুশৃঙ্খল রূপ দেবার লক্ষ্যে বাংলা একাডেমি প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে পৃথক পৃথক পরিভাষা-কোষ প্রণয়ন ও প্রকাশ করে। তবে পরিভাষা-কোষের মতো একটি [illegible] সংখ্যক কতিপয় পুস্তিকা দিয়ে পরিভাষার প্রয়োজন মেটানো সবসময় সম্ভবপর নয়। আর পরিভাষা তৈরি করলেই শুধু হবে না। প্রয়োজন এর প্রচুর ব্যবহার। সভ্যতার অগ্রগতিতে যখন কোনো নতুন বস্তু নতুন কর্ম কিংবা নতুন ধারণার আবির্ভাব ঘটে, তখন তার জন্য নতুন পরিভাষার প্রয়োজন পড়ে। কালের প্রবাহে পরিভাষা প্রণয়নের বিষয়টি তাই একটি অবিরত প্রক্রিয়া।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহারিক গুরুত্বসম্পন্ন কিছু ইংরেজি পরিভাষার বাংলা প্রতিশব্দ নিচে দেওয়া হলো।

A

Abeyance	- স্থগিতাবস্থা
Abolition	- বিলোপ
Abortive Coup	- ব্যর্থ অভ্যুত্থান
Abrogation	- রদ, নিরাকরণ
Absconder	- ফেরারি, পলাতক
Abstract	- সার, বিমূর্ত
Accountancy	- হিসাববিদ্যা
Accounting	- হিসাবরক্ষণ
Acting	- ভারপ্রাপ্ত
Accused	- অভিযুক্ত
Acknowledgement	- প্রাপ্তিস্বীকার
Act	- আইন
Addendum	- পরিশিষ্ট, সংযোজন
Adjournment	- মুলতবি
Ad-hoc	- তদর্থক
Adjustment	- সমন্বয়ন
Aeronautics	- বিমান বিদ্যা
Aesthetics	- নন্দনতত্ত্ব
Affidavit	- হলফনামা
Affiliation	- সম্বন্ধীকরণ
Agenda	- আলোচ্যসূচি
Aggregate	- সমষ্টি
Agitation	- আন্দোলন
Agreement	- চুক্তি
Agronomy	- কৃষিবিদ্যা
Aid	- সাহায্য
Aircraft	- বিমান
Airways	- বিমানপথ
Alien	- বিদেশি, বহিরাগত
Allegation	- অভিযোগ
Allegiance	- আনুগত্য
Allocation	- বিভাজন
Allotment	- বরাদ্দ
Allowance	- ভাতা
Almanac	- পঞ্জিকা
Alliance	- মৈত্রীজোট
Alternate	- একান্তর
Amalgamation	- সংমিশ্রণ, সংযোজন
Ambassador	- রাষ্ট্রদূত
Appropriation	- উপযোজন
Approval	- অনুমোদন
Arbiter	- মধ্যস্থ, সালিস
Archaeology	- প্রত্নতত্ত্ব
Armoury	- অস্ত্রাগার
Arsenal	- অস্ত্রাগার
Auditor	- নিরীক্ষক
Authority	- কর্তৃত্ব, কর্তৃপক্ষ
Authentic	- প্রামাণিক, যথাযথ
Ambiguous	- দ্ব্যর্থক, অস্পষ্ট
Analysis	- বিশ্লেষণ
Ancestor	- পূর্বপুরুষ
Animal husbandry	- পশুপালন
Annexation	- সংযোজন
Anonymous	- বেনামি, অজ্ঞাতনামা
Anthropology	- নৃতত্ত্ব
Anti-Corruption	- দুর্নীতি দমন
Antonym	- বিপরীত শব্দ
Apartheid	- বর্ণবিদ্বেষ
Apology	- ত্রুটি স্বীকার
Appendix	- পরিশিষ্ট
Appointment	- নিয়োগ
Apprentice	- শিক্ষানবিস
Arrear	- বকেয়া
Article	- অনুচ্ছেদ, প্রবন্ধ
Assassination	- গুপ্তহত্যা
Assembly	- পরিষদ
Assessment	- নির্ধারণ, করনির্ধারণ
Asylum	- আশ্রয়
Attachment	- ক্রোক
Attestation	- সত্যায়ন
Auction	- নিলাম
Award	- রায়, পুরোদান
Autograph	- স্বাক্ষর, স্বলেখন
Astronomy	- জ্যোতির্বিদ্যা
Audience	- শ্রোতৃমণ্ডলী
Annexure	- সংলাগ, ক্রোড়পত্র
Autonomous	- স্বায়ত্তশাসিত, স্বশাসিত
Author	- লেখক, গ্রন্থকার
Airconditioned	- শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত

B

Backdoor	- পশ্চাৎ-দ্বার
Background	- পটভূমি
Bacteria	- জীবাণু
Badge	- তকমা
Bail	- জামিন
Balance	- বাকি, উদ্বৃত্ত, ভারসাম্য
Balanced diet	- সুষম খাদ্য
Bale	- গাঁট
Ballistic missile	- ক্ষেপণাস্ত্র
Ballot	- গোপন ভোট
Banishment	- নির্বাসন
Bank rate	- ব্যাংক হার
Bankrupt	- দেউলিয়া
Banned	- নিষিদ্ধ
Bank discount	- ব্যাংক বাট্টা
Banquet	- ভোজসভা
Barrage	- বাঁধ

Scanned with CamScanner

Barter - বিনিময়
Bond - প্রতিজ্ঞাপত্র, মুচলেকা
Bye-product - উপজাত
Balance-sheet - স্থিতিপত্র
Basin - অববাহিকা
Black-out - নিশপ্রদীপ
Blue print - প্রতিচিত্র
Bribe, bribery - ঘুষ, উৎকোচ
Beneficiary - স্বত্ব-ভোগী
Basic pay - মূল বেতন
Bench - এজলাস, বেঞ্চ
Biased - পক্ষপাতদুষ্ট
Bill of exchange - হুণ্ডি, বিনিময় পত্র
Bio data - জীবন-বৃত্তান্ত
Black money - কালো টাকা
Book keeper - হিসাবরক্ষক
Boycott - বর্জন
Branch - শাখা
Break of contract - চুক্তিভঙ্গ
Break in service - কর্মবিরতি
Break of study - অধ্যয়ন-বিরতি
Broadcast - সম্প্রচার করা
Broker - দালাল
Bureau - ব্যুরো, সংস্থা
Bureaucracy - আমলাতন্ত্র
By-election - উপনির্বাচন
By order - আদেশক্রমে
Bookpost - খোলা ডাক
Booklet - পুস্তিকা
Barrack - সেনানিবাস
Bill of Lading - বহনপত্র
Bloc - শক্তিজোট
Bona fide - প্রকৃত, বিশ্বস্ত
Brochure - পুস্তিকা
Boxing - মুষ্টিযুদ্ধ
Bonus - অধিবৃত্তি, বোনাস
Body guard - দেহরক্ষী
Bad coin - জালমুদ্রা
Book fair - গ্রন্থমেলা, বইমেলা
Bill - বিল, মূল্যপত্র
Blockade - অবরোধ

C

Cabinet - মন্ত্রিসভা
Cable - তার
Cadre - পদাদি
Calligraphy - হস্তলিপিবিদ্যা
Call money - তলবি টাকা
Calorie - তাপাঙ্ক
Campaign - প্রচারাভিযান
Campus - অঙ্গন
Canon - নীতি
Capital - পুঁজি, মূলধন
Capitalism - পুঁজিবাদ
Care-taker - তত্ত্বাবধায়ক
Cargo - জাহাজে বাহিত মাল
Cash crop - অর্থকরী ফসল
Cashier - খাজাঞ্চি
Cash register - নগদান খাতা
Casual - নৈমিত্তিক
Catalogue - তালিকা
Category - পর্যায়
Caution money - জামানত
Cease fire - যুদ্ধবিরতি
Censor - বিধায়ক
Censure - তিরস্কার
Census - আদমশুমারি
Cess - কর, উপকর
Consumer goods - ভোগ্যপণ্য
Contract - চুক্তি
Calender - ইস্ত্রি করার যন্ত্র
Convener - আহ্বায়ক
Charge - খরচ, অভিযোগ
Charter - সনদ
Chronological - কালানুক্রমিক
Circulation - প্রচারণ, সংবহন
Cistern - চৌবাচ্চা
Civil action - দেওয়ানি মামলা
Clause - দফা
Claim - দাবি
Client - মক্কেল
Cognizable - আদালতগ্রাহ্য
Coin - মুদ্রা
Cold storage - হিমাগার
Colony - উপনিবেশ
Column - স্তম্ভ
Commandant - সেনানায়ক
Commentary - ভাষ্য
Commodity - পণ্য
Complaint - অভিযোগ
Compensation - ক্ষতিপূরণ
Concession - রেয়াত, সুবিধা

Conference - সম্মেলন
Confidence - আস্থা
Confiscated - বাজেয়াপ্ত
Consignment - চালান
Constitution - সংবিধান
Copyright - গ্রন্থস্বত্ব
Counsel - কৌসুলি
Criminal law - দণ্ডবিধি
Consulate - দূতালয়
Custom house - শুল্কভবন
Consent - সম্মতি
Contractor - ঠিকাদার
Customer - ক্রেতা, গ্রাহক
Chief - প্রধান, মুখ্য
Casting Vote - নির্ণায়ক ভোট
Conspiracy - ষড়যন্ত্র
Coup d'etat - অভ্যুত্থান
Certificate - প্রত্যয়ন পত্র
Chancellor - আচার্য
Community - সম্প্রদায়, সমাজ
Civil war - গৃহযুদ্ধ

D

Dairy - গব্যশালা
Data - উপাত্ত
Dead letter - নির্বাক্য পত্র
Deadline - নির্দিষ্ট সময়সীমা
Deadlock - অচলাবস্থা
Discount - বাট্টা
Debenture - ঋণপত্র
Debit - খরচ
Deed - দলিল
Defence - প্রতিরক্ষা
Delegate - প্রতিনিধিবর্গ
Deposit - আমানত
Deputation - প্রেষণ
Determination - নির্ণয়
Devaluation - মূল্যহ্রাস
Diagram - নকশা, চিত্র
Dialogue - সংলাপ
Diploma - উপাধিপত্র
Diplomat - কূটনীতিক
Disallowance - নামঞ্জুর, নাকচ
Discrepancy - অসঙ্গতি
Discretion - স্ববিবেক, বিবেচনা
Dismissal - পদচ্যুতি
Disposal - নিষ্পত্তি
Distributor - বণ্টনকারী, পরিবেশক
Divident - লভ্যাংশ
Dockyard - পোতাঙ্গন
Domicile - স্থায়ী নিবাস
Donation - দান
Draftsman - নকশাকার
Drawee - (হুণ্ডি) গ্রাহক
Drought - খরা, অনাবৃষ্টি
Drug - ঔষধ
Dual - দ্বৈত
Duet - দ্বৈত সংগীত
Dummy - প্রতিরূপ
Duplicate - দ্বিতীয়ক, প্রতিরূপ
Duplication - অনুলিপি
Duration - স্থিতিকাল
Duty - শুল্ক, কর্তব্য
Dyarchy - দ্বৈতশাসন
Dynamic - গতিশীল
Demi-official - আধা-সরকারি
Designation - পদবি
Danger-level - বিপদসীমা
Debt - ঋণ
Demotion - পদাবনতি
Delinquency - অপরাধ
Discharge - বরখাস্ত
Disarmament - নিরস্ত্রীকরণ
Discrimination - বৈষম্য
Draft - খসড়া
Delegation - প্রতিনিধিবর্গ
Defendant - প্রতিবাদী, বিবাদি
Decentralization - বিকেন্দ্রীকরণ

E

Earned leave - অর্জিত ছুটি
Economy - অর্থব্যবস্থা
Editor - সম্পাদক
Educationist - শিক্ষাবিদ
Efficiency - কর্মক্ষমতা
Ejectment - উচ্ছেদ
Elasticity - স্থিতিস্থাপকতা
Electric - বৈদ্যুতিক
Electronics - বৈদ্যুতিন
E-mail (e-mail) - বৈ-ডাক
Electoral college - নির্বাচকমণ্ডল
Electro-magnetic - তড়িৎ চুম্বকীয়

2020/5/11 13:01

Scanned with CamScanner

Elevator - উত্তোলক
Emancipation - মুক্তি
Embankment - বাঁধ
Embargo - অবরোধ, নিষেধাজ্ঞা
Emblem - প্রতীক
Emerald - পান্না
Emergency - জরুরি
Employee - কর্মচারী
Employment - কর্মনিয়োগ, চাকুরি
Emporium - গঞ্জ, বড় দোকান
Encumbrance - দায়ভার
Endorsement - পৃষ্ঠাঙ্কন
Enforcement - বলবৎকরণ
Epitaph - সমাধিফলকে খোদাই করা উক্তি
Engineer - প্রকৌশলী
Enterprise - উদ্যোগ
Epidemic - মহামারী
Epilepsy - মৃগি
Equation - সমীকরণ
Equitable distribution - সমবণ্টন
Eradication - উচ্ছেদ
Establishment - সংস্থাপন
Estate - সম্পত্তি
Estimated value - প্রাক্কলিত মূল্য
Etiquette - শিষ্টাচার
Evacuation - উদ্বাসন
Eviction - উৎখাতকরণ
Evidence - সাক্ষ্য, প্রমাণ
Evolution - অভিব্যক্তি
Exchange - বিনিময়
Executive - নির্বাহী
Exhibition - প্রদর্শনী
Expansion - প্রসারণ
Expert - বিশেষজ্ঞ
Exploitation - শোষণ
Episode - উপকাহিনি
Eye-witness - প্রত্যক্ষদর্শী
Encyclopaedia - বিশ্বকোষ
Excise duty - আবগারি শুল্ক
Evaluation - মূল্যায়ন

F

Face value - অভিহিত মূল্য
Factory - কারখানা
Faculty - অনুষদ; কর্মদক্ষতা
Fair - সুন্দর, ন্যায্য; মেলা
Fallow land - পতিত জমি
Falls - জলপ্রপাত
Famine - দুর্ভিক্ষ
Farce - প্রহসন
Fare - গাড়ী-ভাড়া
Federation - যুক্তরাষ্ট্র; সঙ্ঘ
Ferry - খেয়া, খেয়াঘাট
Fertilizer - কৃত্রিমসার, সার
Fibre - তন্তু
Fiction - কথাসাহিত্য
File keeper - নথি রক্ষক
Film - চলচ্চিত্র
Finance - অর্থ; অর্থসংস্থান
Finger print - আঙুলের ছাপ
Fire arm - আগ্নেয়াস্ত্র
First aid - প্রাথমিক চিকিৎসা
Fiscal policy - রাজস্ব-নীতি
Footprint - পায়ের ছাপ
Foreign exchange - বৈদেশিক মুদ্রা
Foreign policy - পররাষ্ট্রনীতি
Foreman - সর্দার, কর্মনায়ক
Foreword - পূর্বকথা, ভূমিকা
Forfeit - বাজেয়াপ্ত করা
Forgery - জালিয়াতি
Formal - যথাবিধি, আনুষ্ঠানিক
Format - ফর্মা
Formula - সূত্র; সংকেত
Fortnightly - পাক্ষিক
Forward - অগ্রিম; প্রেরণ করা
Foundation - ভিত্তি, প্রতিষ্ঠান
Founder - প্রতিষ্ঠাতা
Fourth state - চতুর্থ রাষ্ট্র (সংবাদপত্র)
Framework - কাঠামো
Free harbour - অবাধ পোতাশ্রয়
Free market - খোলা বাজার
Freight - মাল ভাড়া
Frontier - সীমান্ত
Fuel - জ্বালানি
Fugitive - পলাতক
Function - কর্ম, ধর্ম
Fund - তহবিল, পুঁজি
Flora - উদ্ভিদকুল
Fauna - প্রাণিকুল
Fantasy - উদ্ভট কাহিনি
Folk song - লোকসংগীত

Fundamental - মৌলিক
Funeral - শেষকৃত্য
Furnace - চুল্লি
Free verse - মুক্ত ছন্দ
Fair price - ন্যায্যমূল্য

G

Gain - লাভ
Galaxy - ছায়াপথ
Garrison - সেনাদল
Gazetter - ভৌগোলিক অভিধান
Genealogy - বংশবিজ্ঞান
General amnesty - সাধারণ ক্ষমা
Gist - সারমর্ম
Global - বিশ্বব্যাপী
Glossary - শব্দপঞ্জি
Godown - গুদাম
Gold standard - স্বর্ণমান
Goods - পণ্য, মাল
Goodwill - সুনাম; শুভেচ্ছা
Gun-powder - বারুদ
Graduate - স্নাতক
Grafting - কলম; কলম করা
Granary - শস্যাগার
Grant - অনুদান, মঞ্জুরি
Graphic - লৈখিক, রৈখিক
Gratuity - আনুতোষিক, উপহার
Gravitation - মহাকর্ষ
Great Bear - সপ্তর্ষিমণ্ডল
Green room - সাজঘর
Gross income - স্থূল আয়
Group insurance - গোষ্ঠীবিমা
Guild - সঙ্ঘ
Gymnasium - ব্যায়ামাগার
Guide book - নির্দেশিকা
Gypsy - বেদে

H

Hand bill - ইশতেহার
Handicraft - হস্তশিল্প
Handloom - তাঁত
Haven - পোতাশ্রয়
Headland - অন্তরীপ
Hemisphere - গোলার্ধ
Hand note - হাতচিঠি
Hand-out - জ্ঞাপনপত্র
Hangar - বিমানশালা
Harbour - পোতাশ্রয়
Hard money - খাঁটি টাকা
Hoarder - মজুতদার
Horoscope - কোষ্ঠী
Hostage - জিম্মি
Humanities - মানবিক বিদ্যা
Hygiene - স্বাস্থ্যবিদ্যা
Hypothesis - প্রকল্প
Hypocrisy - কপটতা, ভণ্ডামি
Hidden tax - গোপন কর
High market - চড়া বাজার
High water - জোয়ার
Hinterland - পশ্চাদ্ভূমি
Holding Company - ইজারাদার কোম্পানি
Honorary - অবৈতনিক, সম্মানসূচক
Human Rights - মানবাধিকার
Hunger strike - অনশন ধর্মঘট
Hydrology - জলবিজ্ঞান
Hydrosphere - বারিমণ্ডল
Highway - মহাসড়ক
Hearing - শুনানি
Husing Project - আবাসন প্রকল্প
Hospitality - আতিথেয়তা
Humanity - মানবতা

I

Idealism - ভাববাদ
Identification - শনাক্তকরণ
Idiom - বাগধারা
Illegible - দুষ্পাঠ্য, অস্পষ্ট
Illiterate - নিরক্ষর
Imitation - অনুকরণ, অনুবৃত্তি
Immigrant - অভিবাসী
Impeachment - অভিসংশন
Imperialism - সাম্রাজ্যবাদ
Import - আমদানি
Imprisonment - কারাদণ্ড
Instrument - যন্ত্র
Insurance - বিমা
Integer - পূর্ণ সংখ্যা
Incidental - আনুষঙ্গিক
Income-tax - আয়কর
Index - নির্দেশক, সূচক
Industry - শিল্প
Inflation - মুদ্রাস্ফীতি

Scanned with CamScanner

Inheritance - উত্তরাধিকার
Initial pay - প্রারম্ভিক বেতন
Injunction - নিষেধাজ্ঞা
Inquiry - অনুসন্ধান; তদন্ত
Inspection - পরিদর্শন
Installation - স্থাপন
Instalment - কিস্তি
Intelligentsia - বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়
Interview - সাক্ষাৎকার
Investigation - অনুসন্ধান, তদন্ত
Invoice - চালান
Ivory - গজদন্ত, হাতির দাঁত
Interim - মধ্যকালীন, অন্তর্বর্তীকালীন

Intrusion - অনধিকার প্রবেশ
Investment - বিনিয়োগ
Irrigation - সেচ
Indoor game - অন্তরঙ্গন ক্রীড়া
Interrogation - জিজ্ঞাসাবাদ
Interpreter - দোভাষী
Informal - অনানুষ্ঠানিক

J

Jeweller - মনিকার
Joint account - যৌথ হিসাব
Joint editor - যুগ্ম সম্পাদক
Juggler - ভোজবাজিকর
Junction - সংযোগস্থল, জংশন
Jurisdiction - এখতিয়ার
Just war - ন্যায় যুদ্ধ
Jury - নির্ণায়ক বর্গ, জুরি
Juvenile delinquency - কিশোর অপরাধ
Joint property - এজমালি সম্পত্তি
Joint venture - যৌথ প্রচেষ্টা
Journal - পত্রিকা, সাময়িক পত্রিকা
Judge - বিচারক
Judgment - রায়
Judicial enquiry - বিচার বিভাগীয় তদন্ত
Jurisprudence - আইন বিজ্ঞান, ব্যবহারশাস্ত্র
Juvenile literature - কিশোর সাহিত্য
Joint estate - এজমালি সম্পত্তি

K

Key industry - মূল শিল্প
Key note - মূলভাব, মর্ম
Kidnapping - অপহরণ
Knave - দুর্বৃত্ত; প্রতারক
Knavery - প্রতারণা
Knowledge - জ্ঞান
Kit-bag - সজ্জা-পদে
Kinsman - জ্ঞাতি

L

Laboratory - পরীক্ষাগার
Labour Court - শ্রম আদালত
Labour pain - প্রসববেদনা
Labour room - প্রসব কক্ষ
Latitude - অক্ষাংশ
Lawyer - আইনজ্ঞ
Leaflet - প্রচারপত্র
Leap-year - অধিবর্ষ
Lease - ইজারা
Leave - ছুটি, অবকাশ
Lagoon - উপহ্রদ
Lake - হ্রদ
Land revenue - ভূমি রাজস্ব
Letter of credit - আকলপত্র
Lexicon - অভিধান
Life insurance - জীবনবিমা
Light house - বাতিঘর
Light year - আলোকবর্ষ
Limitation Act - তামাদি আইন
Livestock - পশুসম্পদ
Longitude - দ্রাঘিমা
Low-water - ভাটা
Legend - কিংবদন্তি
Lender - মহাজন
Liaison officer - সংযোগ অফিসার
Licence - অনুমতি পত্র
Lingua franca - মিশ্র ভাষা
Linguistics - ভাষা বিজ্ঞান
Liquid asset - চলতি সম্পত্তি
Litigation - মামলা
Livery - বৈশিষ্ট্যসূচক পোশাক
Lying-in room - সূতিকাগার, আঁতুরঘর
Liability - দায়, ঋণ, দেনা
Ledger - খতিয়ান

M

Magazine - অস্ত্রাগার; সাময়িক পত্রিকা

Magnifying glass - বিবর্ধক কাচ
Majority - সংখ্যাতরু; পূর্ণবয়স্কতা
Make up - রূপসজ্জা
Mala fide - বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ
Mammal - স্তন্যপায়ী প্রাণী
Managing Director - নির্বাহী পরিচালক
Mandate - আইনগত আদেশ
Manifesto - ইশতেহার
Map - মানচিত্র
Manuscript - পাণ্ডুলিপি
Marginal cost - উপান্ত ব্যয়
Marine - সামুদ্র, সামুদ্রিক
Marketing - বিপণন
Market value - বাজারদর
Mars - মঙ্গলগ্রহ
Marsh - বিল, জলা
Mass education - গণশিক্ষা
Mass media - গণমাধ্যম
Master plan - মহাপরিকল্পনা
Materialism - বস্তুবাদ
Mechanical - যান্ত্রিক
Mediator - মধ্যস্থ, সালিস
Manpower - জনশক্তি
Meteorology - আবহবিদ্যা
Metropolis - রাজধানী
Middleman - দালাল
Milky way - ছায়াপথ
Mint - টাকশাল
Mobile court - ভ্রাম্যমাণ আদালত
Monetary policy - মুদ্রানীতি
Memo - স্মারক
Methodology - প্রণালিবিদ্যা
Minority - সংখ্যালঘু, নাবালকত্ব
Missile - ক্ষেপণাস্ত্র
Monarchy - রাজতন্ত্র
Monsoon - মৌসুমি বায়ু
Mythology - পুরাণতত্ত্ব
Museum - প্রদর্শনশালা, জাদুঘর
Margin - উপান্ত
Merchant - বণিক
Mail - ডাক
Magnet - চুম্বক
Memorandum - স্মারকলিপি

N

Name-plate - নামফলক
Nomination - মনোনয়ন
Nominee - মনোনীত ব্যক্তি
North star - ধ্রুবতারা
Notary Public - শপথ প্রমাণক
Nursery School - শিশুবিদ্যালয়
News Editor - বার্তাসম্পাদক
Nation - জাতি
Nautical mile - নৌ-মাইল
Nebula - নীহারিকা
Nomads - যাযাবর
Nomenclature - নামকরণ
Non-aligned - জোট-নিরপেক্ষ
Non-bailable - অ-জামিনযোগ্য
Non-cooperation - অসহযোগ
Notice - বিজ্ঞপ্তি
Notification - প্রজ্ঞাপন
News Agency - সংবাদ প্রতিষ্ঠান
Nutrition - পুষ্টি
Notify - প্রজ্ঞাপিত করা
Nationalisation - রাষ্ট্রায়ত্তকরণ

O

Oath - শপথ, হলফনামা
Observatory - মানমন্দির
Occupancy right - দখলি স্বত্ব
Octroi duty - নগর শুল্ক
Opening stock - প্রারম্ভিক মজুদ
Opera House - গীতি নাট্যমঞ্চ
Ordinance - অধ্যাদেশ
Oil painting - তৈলচিত্র
Out-post - ফাঁড়ি
Oyster - ঝিনুক, শুক্তি
Optics - আলোকবিজ্ঞান
Orbit - কক্ষপথ
Ombudsman - ন্যায়পাল
Outfit allowance - সজ্জাভাতা
Ore - আকরিক
Organization - সংগঠন, সংস্থা
Osteology - অস্থিবিজ্ঞান
Overseer - উপদর্শক, তত্ত্বাবধায়ক
Obligatory - বাধ্যতামূলক
Optional - ঐচ্ছিক
Overtime - অধিকাল

2020/5/11 13:01
Scanned with CamScanner

Order cheque - বরাতি চেক
Ownership Title - মালিকানা স্বত্ব
Orion - কালপুরুষ
Oral evidence - মৌখিক সাক্ষ্য

P

Pacific Ocean - প্রশান্ত মহাসাগর
Paid up - পরিশোধিত
Painter - চিত্রকর
Paleographer - প্রত্ন-লিপিবিদ্
Palaeontology - প্রত্নজীববিদ্যা
Paper currency - পত্রমুদ্রা
Parasite - পরজীবী
Penal code - দণ্ডবিধি
Pen-friend - পত্রমিতা
Perjury - মিথ্যা সাক্ষ্য
Perpetual - শাশ্বত, অবিরাম
Partnership - অংশীদারি
Part time - খণ্ডকাল
Par value - সমমূল্য
Part timer - খণ্ডকাল কর্মী
Pass certificate - উত্তরণ পত্র
Pasport - ছাড়পত্র, পাসপোর্ট
Pathology - রোগবিদ্যা
Pawn - বন্ধকী দ্রব্য
Pay-bill - বেতন-বিল
Pension - অবসর ভাতা
Permit - অনুমতিপত্র
Pestilence - মহামারী
Philanthropist - লোকহিতৈষী
Phonetics - ধ্বনিবিজ্ঞান
Plebiscite - গণভোট
Police verification - পুলিশী প্রতিপাদন
Posthumous - মরণোত্তর
Power of attorney - মোক্তারনামা
Pre-emption - অগ্রক্রয়াধিকার
Promissory note - প্রত্যর্থপত্র
Provident fund - ভবিষ্য-তহবিল
Proctor - প্ররক্ষক
Petrology - শিলাতত্ত্ব
Petty officer - ক্ষুদে অফিসার
Philatelist - ডাকটিকিট-সংগ্রহকারী
Plaint - আর্জি
Plaintiff - বাদি, ফরিয়াদি
Plan - পরিকল্পনা
Pledge - বন্ধক
Post mortem - ময়না তদন্ত
Power-loom - যান্ত্রিক তাঁত
Preamble - প্রস্তাবনা
Probation - শিক্ষানবিসি
Protocol - চুক্তির খসড়া
Pseudonym - ছদ্মনাম
Prerogative - বিশেষ অধিকার
Public works - পূর্ত

Q

Quack - হাতুড়ে
Quantitative - মাত্রাগত, পরিমাণগত
Quotation - মূল্যজ্ঞাপন
Questionnarie - প্রশ্নমালা
Queue - সারি
Quinquennial - পঞ্চবার্ষিক
Quorum - গণপূর্তি
Quotient - ভাগফল, নির্দেশক সংখ্যা

R

Race Course - ঘোড়দৌড়ের মাঠ
Racialism - জাতিবিদ্বেষ
Ready market - চলতি বাজার
Real wages - বাস্তব মজুরি
Rainbow - রামধনু, রংধনু
Rainfall - বৃষ্টিপাত
Ransom - মুক্তিপণ
Realism - বাস্তববাদ
Rebate - বাট্টা
Recurring - আবর্তক
Registration - নিবন্ধন
Rejoinder - প্রত্যুত্তর, জবাব
Relief - ত্রাণ
Report - প্রতিবেদন
Retirement - অবসর
Roof garden - ছাদ বাগিচা
Rule of law - আইনের শাসন
Referendum - গণভোট
Regulation - প্রবিধান, নিয়ম-কানুন
Relaxation - শিথিলতা
Replica - প্রতিরূপ
Republic - প্রজাতন্ত্র
Revenue - রাজস্ব
Revenue free - লাখেরাজ, রাজস্বমুক্ত
Rural bank - গ্রামীণ ব্যাংক

Scanned with CamScanner

Undersigned	- নিম্ন স্বাক্ষরকারী
Unpaid	- অপরিশোধিত
Unprecedented	- অভূতপূর্ব
Unfairmeansz	- অন্যায় উপায়
Uniform	- ঐক্য, একরূপ
Unilateral	- একতরফা
Unofficial	- বেসরকারি
Unparliamentary	- অসংসদীয়
Uptodate	- হালনাগাদ
Urbanization	- নগরায়ন
Ursa Major	- সপ্তর্ষিমণ্ডল
Ursa minor	- শিশুমার
Universal suffrage	- সর্বজনীন ভোটাধিকার
Universal	- বিশ্বজনীন
Urban	- পৌর
Utilization	- সদ্ব্যবহার

V

Vacancy	- খালি, শূন্য
Vacation	- অবকাশ
Vagabond	- ভবঘুরে
Vague	- অস্পষ্ট
Vakalatnama	- ওকালতনামা
Valid	- বৈধ
Vertical	- উল্লম্ব, খাড়া
Vicious circle	- দুষ্টচক্র
Vocational	- বৃত্তীয়
Viva voce	- মৌখিক পরীক্ষা
Vaccination	- টিকা, টিকাদান
Vacuum	- শূন্য
Vegetarian	- নিরামিষাশী
Vendor	- বিক্রেতা
Vendee	- ক্রেতা
Verbal	- মৌখিক
Verdict	- রায়
Versus	- বনাম
Vested interest	- কায়েমি স্বার্থ
Visitor	- দর্শনার্থী, অভ্যাগত
Volunteer	- স্বেচ্ছাসেবী
Vice-chancellor	- উপাচার্য
Voucher	- রসিদ
Vibration	- কম্পন, স্পন্দন

W

Wage	- বেতন, মজুরি
Waiter	- পরিচারক
Walk-out	- সভা বর্জন
War crime	- যুদ্ধাপরাধ
Warrent	- পরোয়ানা
Windmill	- বায়ুচক্র
Withdrawal	- প্রত্যাহার
Wrestler	- কুস্তিগীর
Warship	- রণতরী
Waste land	- পতিত জমি
Water colour	- জল রং
Water fall	- জলপ্রপাত
Watertight	- জলরোধী
Water transport	- নৌপরিবহন
Weight	- ওজন
Welfare	- কল্যাণ
Will	- ইচ্ছাপত্র, উইল
Wireless	- বেতার
Witness	- সাক্ষী
Workshop	- কারখানা, কর্মশালা
Writ	- আজ্ঞালেখ, পরোয়ানা
Wit	- বুদ্ধি, রসিকতা

X

X-Ray	- রঞ্জনরশ্মি
X-mas	- ক্রিসমাস্

Y

Yard	- অঙ্গন, গজকাঠি
Yarn	- সুতা
Yawn	- হাই তোলা
Youth	- তারুণ্য, যৌবন
Year book	- বর্ষপঞ্জি

Z

Zenith	- খমধ্য, সুবিন্দু
Zone	- মেখলা, কোমরবন্ধ
Zigzag	- আঁকাবাঁকা
Zodiac	- রাশিচক্র
Zoo	- চিড়িয়াখানা

বাংলা সাহিত্য

সাধারণ আলোচনা

বাংলা সাহিত্য বাঙালি জাতির প্রাণস্পন্দনের প্রকাশ। জাতির বিবর্তনের সঙ্গে সাহিত্যেরও সৃষ্টি ঘটেছে। প্রাচীনকালের নিদর্শনরাজি থেকে আজ অবধি বাংলা সাহিত্য নানাভাবে যে পুষ্টি-সঞ্চয় করেছে, গবেষকগণ সময়ের প্রবণতা ও পরিবেশের বৈশিষ্ট্য অনুসারে তার কয়েকটি যুগ নির্ধারণ করেছেন। একেই সাহিত্যের যুগবিভাগ বলা হয়। সে বিচারে বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ এ-রকম : প্রাচীনযুগ ৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২০০; মধ্যযুগ ১২০১ থেকে ১৮০০; আধুনিকযুগ ১৮০১ থেকে আজ পর্যন্ত। এই মত বাংলার শ্রেষ্ঠ ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের। দীনেশচন্দ্র সেন, সুকুমার সেন, গোপাল হালদার, মুহম্মদ এনামুল হক প্রমুখের যুগ-সম্পর্কিত অভিমত উল্লিখিত যুগবিভাগকে সমর্থন করে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মধ্য ও আধুনিকযুগের এই সময় মেনে নিলেও, তাঁর মতে, প্রাচীনযুগের সময়সীমা : ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২০০ পর্যন্ত। তিনি এই মত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু প্রামাণিক তথ্য যথেষ্ট মেলে নি। এর প্রধান সমস্যা হলো, প্রাচীন গ্রন্থ 'চর্যা'র কোনো কবিই এত প্রাচীন ছিলেন না। তবুও তিনি তিব্বতি চর্যাপদের সূত্র ধরে শবরপাকে ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণকারী কবি বলে মনে করেন। অন্য গবেষকগণ এ মত সমর্থন করেন না। যুগের এই তিনটি ভাগের মধ্যে আবার ১২০১ থেকে ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে অন্ধকার যুগ বলে। এ-সময় তুর্কিরা বাংলা দখল করে এবং এর ফলে সামাজিক, রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাঙালির বিপর্যয় সূচিত হয়। এ যুগেই তালেবান অধিকৃত আফগানিস্তানে পৃথিবীর সর্বোচ্চ বৌদ্ধমূর্তি ধ্বংসের যে উন্মত্ততা বা মার্কিন বাহিনী অধিকৃত বাগদাদের প্রাচীন জাদুঘর ধ্বংসের যে সংবাদ পাওয়া যায়, আজ থেকে অষ্টশত বছর আগে এর রূপটি কতটুকু হিংস্র ও ভয়াবহ ছিল, তা শুধু কল্পনাই করা যেতে পারে। তাই ১২০১ থেকে ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিল বন্ধ্যা সময় বা অন্ধকার যুগ। সৃজনশীল মানুষ আত্মরক্ষার তাগিদে দেশত্যাগেই ছিলেন ব্যস্ত, সাহিত্য রচিত হবে কি! ১৩৫১ থেকে ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে মুসলিমদের কাল বলা হয়। নবযুগের শেষ ও আধুনিকযুগের সূচনালগ্নের এই শত বছরে চলেছে চলতি মানের প্রস্তুতি। এ প্রস্তুতির প্রধান পুরোহিত ছিলেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

যুগবিভাগের এই তথ্যের সঙ্গে অপূর্ণ ইঙ্গিতিত হচ্ছে উত্তরাধুনিকতার কথা। মিশেল ফুকো, এডওয়ার্ড সাইড, নরম্যন ফ্যাক্ষ প্রমুখের অনুপ্রেরণা পেয়ে বলা হচ্ছে, বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ ১৮০১ থেকে শুরু হয়ে ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে শেষ হয়েছে এবং এখন উত্তরাধুনিক যুগ চলছে। ১৯৯০-এর পর বিশ্বব্যবস্থার পরিবর্তনের কারণে মর্মগত নৈরাশ্যের শিকার হয়ে অনেকেই উত্তরাধুনিক যুগের কথা বললেও প্রকৃতপক্ষে, বাঙালি এখনো পুরোপুরি আধুনিকই হতে পারে নি।

সাহিত্য-বিষয়ক জিজ্ঞাসা

প্র : 'সাহিত্য' কথাটি কোন শব্দ থেকে এসেছে?

উ : 'সহিত' শব্দ থেকে।

প্র : এখানে 'সহিত' শব্দের অর্থ কী?

উ : হিত সহকারে বা মঙ্গলজনক অবয়।

প্র : "একের 'সহিত' অন্যের মিলনের মাধ্যমই হল সাহিত্য"—কে বলেছেন?

উ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্র : বাঙালির প্রথম উত্তরাধিকার বলতে কী বোঝায়?

উ : ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে সাহিত্যরত্ন গ্রহণ।

প্র : বাঙালির দ্বিতীয় উত্তরাধিকার বলতে কী বোঝায়?

উ : মৌখিক ধারায় আত্মপ্রকাশ।

2020/5/11 13:03

Scanned with CamScanner

প্র: বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন গ্রন্থের নাম কী?

উ: চর্যাপদ।

প্র: বাঙালি কখন থেকে কাব্য লিখতে শুরু করে?

উ: পাল আমল থেকে।

প্র: প্রাচীন বাংলার জনপদ ও অর্থনীতির পরিচয় কার গ্রন্থে প্রথম গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করা হয়েছে?

উ: ড. নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থে।

প্র: বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগের পরিচয় দাও।

উ: বাংলা সাহিত্যকে প্রধানত তিনটি যুগে বা পর্যায়ে ভাগ করা হয়। এগুলি হলো–

(১) আদি যুগ: প্রাক-তুর্কি আক্রমণ যুগ (৬৫০ থেকে ১২০০ খ্রি.)।

(২) মধ্যযুগ: তুর্কি আক্রমণ থেকে ইউরোপ প্রভাবের পূর্ব পর্যন্ত (১২০০ থেকে ১৮০০ খ্রি.)।

(৩) আধুনিক যুগ: ইউরোপ প্রভাবিত যুগ (১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বর্তমানকাল)।

এই তিন যুগের প্রধান সাহিত্যগুলি হলো–

(১) আদি যুগের সাহিত্য: আদি যুগের বাংলা সাহিত্যের একমাত্র নিদর্শন হলো 'চর্যাপদ' নামক সংকলিত কাব্যগ্রন্থ। তবে অষ্টম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী অবধি বাঙালি কবিরা সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশে যেসব ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছেন, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তার উত্তরাধিকার বর্তেছে। জয়দেবের সংস্কৃত কাব্য 'গীতগোবিন্দম্' এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

(২) মধ্যযুগের সাহিত্য: বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের বিস্তার ছয় শতাব্দী ধরে। চৈতন্যদেবকে (জন্ম ১৪৮৬ খ্রি.) মাঝখানে রেখে এই যুগকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়– প্রাক-চৈতন্য যুগ (১২০৩–১৫০০ খ্রি.) এবং উত্তর-চৈতন্য যুগ (১৫০০–১৭৬০ খ্রি.)। প্রাক-চৈতন্য যুগে রচিত হয়েছে কৃত্তিবাসি 'রামায়ণ', বড়ুচণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের বৈষ্ণব পদাবলি এবং তিনটি আদি 'মনসামঙ্গলকাব্য'। উত্তর-চৈতন্যযুগের বিচিত্র ও ঋদ্ধ সাহিত্যসম্ভারের মধ্যে বৃন্দাবনদাস, লোচনদাস, জয়ানন্দ এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-জীবন-কাব্য; জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের বৈষ্ণব পদাবলি; কাশীরাম দাসের মহাভারত; বহুসংখ্যক মনসা, চণ্ডী, ধর্ম ও অন্নদামঙ্গল কাব্য (কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, ঘনরাম চক্রবর্তী, ভারতচন্দ্র ইত্যাদি); মুসলমান কবি দৌলত কাজী ও আলাওলের কাব্যাসম্ভার এবং শাক্ত পদাবলি উল্লেখযোগ্য। ভারতচন্দ্রের মৃত্যু (১৭৬০ খ্রি.) থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে যুগসন্ধিকাল বলা হয়।

(৩) আধুনিক যুগের সাহিত্য: ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ'। এই কলেজের পাঠ্যপুস্তক রচনার মধ্য দিয়েই বাংলা সাহিত্য প্রবেশ করে আধুনিক যুগে। আখ্যানকাব্য, মহাকাব্য, নাটক, প্রহসন, গীতিকাব্য এবং সংবাদপত্র-সাময়িকপত্রের পথ ধরে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে বাংলা সাহিত্য প্রবেশ করে বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে। আধুনিক যুগের সাহিত্যকীর্তির বিকৃতির কারণে এ যুগের সামগ্রিক সাহিত্যসৃষ্টির পরিচয় প্রদান প্রায় অসম্ভব। উপন্যাস, ছোটগল্প, রম্যরচনা এবং আধুনিক রীতির কবিতা ও নাটকের সম্ভারে আজ বাংলা সাহিত্য বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ভাণ্ডার। মহাকাব্যের ধারায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত, উপন্যাসের ধারায় বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র থেকে হাল আমলের সমরেশ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, হুমায়ূন আহমেদ, কবিতায় নজরুল, সুকান্ত, জীবনানন্দ দাশ থেকে শামসুর রাহমান, জা. গোস্বামী, নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল থেকে বিজন ভট্টাচার্য, সেলিম আলদীন প্রমুখ অসংখ্য রচনাকারের নামই উল্লেখ করা যায়। সর্বযুগের বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা রবীন্দ্রনাথও তো এই আধুনিক যুগেরই ফসল।

প্র: বাংলা ভাষা বিকাশের আগে বাঙালি কবিদের সাহিত্যচর্চার বিবরণ দাও।

উ: প্রাচীন যুগের (দ্বাদশ শতাব্দী অবধি) বাংলা সাহিত্যের একমাত্র নিদর্শন হলো চর্যাপদ। এযুগের আগে অর্থাৎ বাংলা ভাষার বিকাশের আগেও যে বাঙালিরা সাহিত্যচর্চা করেছে, তার প্রমাণ রয়েছে বাঙালি-রচিত সে সময়কার সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ সাহিত্যে। নিচে এ সম্পর্কে বলা হলো–

(১) সংস্কৃত সাহিত্য: খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা দেশে সংস্কৃত ভাষা, স্মৃতি-পুরাণ, ন্যায়দর্শন, ব্যাকরণ-অভিধান বিশেষভাবে চর্চা করা হতো। তবে বাংলা দেশে বাঙালির লেখা প্রথম গ্রন্থ হলো জীবনের অভিনন্দের 'রামচরিত', যা রামচন্দ্রের লঙ্কাজয়-পরবর্তী কাহিনি অবলম্বনে রচিত (অষ্টম শতাব্দী)। দশম শতাব্দীতে রামপালের পুত্র মদনপালের অনুচর সন্ধ্যাকর নন্দী ঐ একই নামে একটি কাব্য রচনা করেন, যাতে একাধারে রামায়ণের কাহিনি এবং রামপাল ও তাঁর বংশধরদের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। কালিদাসের 'মেঘদূত' অনুসরণে লেখা লক্ষ্মণসেনের সভাকবি গোয়ীর 'পবনদূত' কাব্য দূতকাব্যগুলির ('পদাঙ্কদূত', 'ভ্রমরদূত' ইত্যাদি) মধ্যে শ্রেষ্ঠ। প্রাকৃত কাব্য-অনুসরণে লেখা গোবর্ধন আচার্যের 'আর্যাসপ্তশতী' কাব্য প্রায় সাতশো অনিন্দ্যসুন্দর কবিতার সমষ্টি। তবে, প্রাচীন যুগের শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি জয়দেব তাঁর সংস্কৃত ভাষায় রচিত রাধা-কৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক নাটকাকার 'গীতগোবিন্দম্'-এর জন্য অমর হয়ে আছেন। এ ছাড়াও বিনায়কের সংকলিত 'সুভাষিত রত্নকোষ' বা 'কবীন্দ্র-বচন-সমুচ্চয়' এবং শ্রীধরদাস সংকলিত 'সদুক্তি-কর্ণামৃত' (১২০৬ খ্রিষ্টাব্দ) নামক সংস্কৃত সংকলনে বহু সংখ্যক বাঙালি কবির কাব্যচর্চার পরিচয় পাওয়া যায়।

(২) প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ সাহিত্য: প্রাচীন যুগের কোনো বাঙালি কবির প্রাকৃত বা অপভ্রংশে ভাষায় রচিত কোনো গ্রন্থ এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। কিন্তু প্রাকৃত ভাষায় লেখা 'গাথাসপ্তশতী' এবং 'প্রাকৃত-পৈঙ্গল'–এই দুই সংকলনের বাঙালি-রচিত বেশ কিছু কবিতায় আমরা সমকালীন বাঙালি-জীবনের পরিচয় পাই। 'ডাকার্ণব', 'লোহাকোষপঞ্জিকা' প্রভৃতি অপভ্রংশ ভাষায় লেখা সংকলন গ্রন্থগুলির বেশিরভাগ লেখকই ছিলেন সহজিয়া-বৌদ্ধ বাঙালি।

প্রাচীন যুগের এই অ-বাংলা সাহিত্যের হাত ধরেই মধ্যযুগে এসে বাংলা সাহিত্য যথার্থভাবে বিকশিত হয়েছিল।

2020/5/11 13:03

Scanned with CamScanner

প্রাচীনযুগ

সংশ্লিষ্ট জিজ্ঞাসা

প্র : বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনযুগের একমাত্র নিদর্শনের নাম কী?
উ : চর্যাচর্যবিনিশ্চয় বা চর্যাগীতিকোষ বা চর্যাগীতি বা চর্যাপদ।

প্র : চর্যাপদ কিসের সংকলন?
উ : গানের সংকলন।

প্র : চর্যাপদের বিষয়বস্তু কী?
উ : বৌদ্ধ ধর্ম মতে সাধনভজনের তত্ত্ব প্রকাশ।

প্র : ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না বলতে কী বোঝায়?
উ : মেরুদণ্ডের বাঁ দিকের একটি নাড়িকে 'ইড়া' বলা হয়। মেরুদণ্ডের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত নাড়িকে 'পিঙ্গলা' এবং ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যস্থিত অপর একটি সূক্ষ্ম নাড়ির নাম 'সুষুম্না'। এই তিনটি নাড়ির মিলনস্থলে 'ত্রিবেণী' বলে। তন্ত্র সাধনায় এসব নাড়ি চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নির গুণবিশিষ্ট। তন্ত্র সাধকদের কাছে ইড়া, পিঙ্গলা আর সুষুম্না যথাক্রমে গঙ্গা, যমুনা আর সরস্বতী নামেও পরিচিত ও শ্রুতেয়।

প্র : চর্যাগুলো কারা রচনা করেন?
উ : বৌদ্ধ সহজিয়াগণ।

প্র : সহজিয়া বলতে কী বোঝায়?
উ : সহজিয়াগণ বৌদ্ধ সহজযান পন্থি। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন পরিবর্তনের ধারায় সহজিয়াদের উৎপত্তি। স্বদেহ কেন্দ্রিক সহজপন্থায় সাধনা করত বলে এদের সহজিয়া বলা হয়। সহজিয়াগণ তান্ত্রিক চিন্তা ধারার দ্বারা প্রভাবিত বলেই ধর্মসাধনায় দেহকে বাদ দেন নি। কায়িক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক কোনো পথকেই অস্বীকার করেন নি। তাঁদের মতে সমস্ত সত্তা দেহের মধ্যেই অবস্থিত, সেই সত্তাই 'সহজ'। অনেকে এই 'সহজ'-এর সঙ্গে উপনিষদের ব্রহ্ম, প্রাচীন বৌদ্ধদের নির্বাণ ধাতু, অশ্বঘোষের তথতার ঐক্য লক্ষ করেছেন। সরহপাদ বলেছেন, সহজের মধ্যে দ্বৈততা নেই, মনের অ-দ্বৈত অবস্থায় তা অনুভববেদ্য, সহজের অনুভবই সাধকের লক্ষ্য। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম এই নমুনা অর্থাৎ চর্যাপদগুলি বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায় কর্তৃক রচিত। বৌদ্ধদের মতো বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায়ও ছিল। তাঁরা বাংলায় বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। সহজিয়া সম্প্রদায়ের সঙ্গে বাউলদের চিন্তার সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

প্র : চর্যায় কত জন কবির পদ পাওয়া গেছে।
উ : এ নিয়ে মতান্তর আছে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত 'বুদ্ধতিস্ট মিস্টিক সঙ্গস' গ্রন্থে ২৩জন কবির নাম আছে। সুকুমার সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (১ম খণ্ড) গ্রন্থে ২৪ জন কবির কথা বলেছেন। সাংকৃত্যায়ন নেপাল-তিব্বতে রক্ষিত তালপাতার পুথিতে আরো কয়েকজন নতুন কবির চর্যাগীতি পেয়ে 'দোহা-কোষ (১৯৫৭) গ্রন্থে সংযোজন করেছেন। সে বিচারে এক কথায় বলা চলে, চর্যাপদের কবির সংখ্যা ২৩, মতান্তরে ২৪।

প্র : চর্যাপদে কয়টি পদ বা গান ছিল?
উ : এর সংখ্যা নিয়ে মতান্তর আছে। সুকুমার সেনের হিসাবে ৫১টি, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেছেন ৫০টি। চর্যাপদ ছিন্নাবস্থায় পাওয়া যাওয়ায় এই মতান্তরের সৃষ্টি। সুকুমার সেন তাঁর 'চর্যাগীতি পদাবলী' (প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৬) গ্রন্থেও ৫০জন কবির পদ উল্লেখ করেছেন। তার আলোচনা অংশে তাঁর বক্তব্য : "[...] মুদ্রিত পঞ্চাশটি চর্যার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। টীকাকারের কাছে মূল চর্যার পুথিতে আরো অন্তত একটি বেশি চর্যা ছিল (একাদশ ও দ্বাদশ চর্যার মাঝখানে)। এই চর্যাটির ব্যাখ্যা না থাকায় লিপিকর উহ্য করেন নাই, শুধু 'টীকা নাই' এই মন্তব্যটুকু করিয়াছেন।" এটা ধরলে পদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫১।

প্র : চর্যাপদে কোন কবি কোন কোন পদ লিখেছেন, তা উল্লেখ কর।
উ : আর্যদেবপা > পদ নং-৩১
ভাদেপা > পদ নং-৩৫
ভুসুকুপা > পদ নং- ৬/ ২১/ ২৩/ ২৭/ ৩০/ ৪১/ ৪৩/ ৪৯
চাটিল্লপা > পদ নং-৫
দারিকপা > পদ নং-৩৪
ধর্মপা > পদ নং-৪৭
ধেণ্ডণপা > পদ নং-৩৩
ধোম্বীপা > পদ নং-১৪
গুণ্ডরীপা > পদ নং-৪
জয়নন্দীপা > পদ নং-৪৬
কাহ্নপা (কৃষ্ণপা) > পদ নং- ৭/ ৯/ ১০/ ১১/ ১২/ ১৩/ ১৮/ ১৯/২৪ (পাওয়া যায় নি) / ৩৬/৪০/৪২/৪৫
কমলাম্বরপা > পদ নং-৮
কঙ্কণপা > পদ নং-৪৪
কুক্কুরীপা > পদ নং-২/২০/৪৮ (পাওয়া যায় নি)
লুইপা > পদ নং-১/২৯
মহীধরপা > পদ নং-১৬
শবরপা > পদ নং- ২৮/৫০
শান্তিপা > পদ নং- ১৫/২৬
সরহপা > পদ নং- ২২/৩২/৩৮/৩৯
তাড়কপা > পদ নং-৩৭
তন্ত্রীপা > পদ নং-২৫ (পাওয়া যায় নি)
ঢীণ্ডপা > পদ নং-১৭
বিরুপা > পদ নং-৩
(সূত্র : ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত 'বুদ্ধতিস্ট মিস্টিক সঙ্গস' : ১৯৬৬ : পৃ. ১৪৩)

প্র : কবিদের নামের সঙ্গে 'পা' যুক্ত কেন?
উ : তাঁরা পদ (কবিতা) রচনা করতেন বলে তাদের সম্মান করে পাদ বলা হতো; আজ যেমন বলা হয় কবি। পাদ > পা হয়েছে।

প্র : কোন কবি সর্বাপেক্ষা বেশি পদ রচনা করেন?
উ : কাহ্নপা। ১৩টি পদ রচনা করেন। ১২টি পাওয়া গেছে।

প্র : কোন কবি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদ লেখেন?
উ : ভুসুকুপা: ৮টি।

প্র : কোন কবি রচিত পদটি পাওয়া যায় নি?
উ : তন্ত্রীপা (না-পাওয়া পদ নং-২৫)।

প্র : চর্যাপদে কোন কোন পদ পাওয়া যায় নি?
উ : ২৪ (কাহ্নপা রচিত), ২৫ (তন্ত্রীপা রচিত), ৪৮ (কুক্কুরীপা রচিত) সংখ্যক।

প্র : চর্যাপদ গ্রন্থে মোট কয়টি পদ পাওয়া গেছে?
উ : সাড়ে ছেচল্লিশটি (একটি পদের ছেঁড়া বা খণ্ডিত অংশসহ)।

প্র : চর্যায় কোন পদটি খণ্ডিত আকারে পাওয়া গেছে?
উ : ২৩ নং পদটি। এর একটি পঙ্‌ক্তি পাওয়া গেছে। বাকি ৩ পঙ্‌ক্তি পাওয়া যায় নি এর রচয়িতা ভুসুকুপা।

প্র : চর্যার পদগুলো কোন ভাষায় রচিত?
উ : সন্ধ্যা বা সান্ধ্য ভাষায় রচিত।

প্র : সন্ধ্যা বা সান্ধ্য ভাষা কী?
উ : যে ভাষা সুনির্দিষ্ট কোন অর্থ দেয় না, যে ভাষার অর্থও একাধিক অর্থাৎ আপাত বিপরীতের মত, সে ভাষাকে পণ্ডিতগণ সন্ধ্যা বা সান্ধ্য ভাষা বলেছেন।

প্র : চর্যাপদ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত প্রথম পদটি কার লেখা? তা উল্লেখ কর।
উ : লুইপার।

পদ-১

কাআ তরুবর পাঞ্চ বি ডাল
চঞ্চল চীএ পইঠা কাল।
দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ
লুই ভণই গুরু পুছিঅ জাণ।
সজল সমাহিঅ কাহি করিঅই
সুখ দুখেতে নিচিত মরিঅই।
এড়িঅউ দ্বান্দ বান্ধ করুণ কপাটের আস
সুনু পাখ ভিড়ি লাহু রে পাস।
ভণই লুই আমহে ঝাণে দীঠা
ধমণ চমণ বেণি পিঠী বইঠা।
(মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র পাঠ অনুসারে)

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর :
কায়া তরুর মত, পাঁচটি তার ডাল,
চঞ্চল চিত্তে কাল প্রবেশ করেছে।
দৃঢ় করে নাও, মহাসুখ পরিণাম
কবি লুই বলছে, গুরুকে জিজ্ঞেস করে জানা।
সমস্ত সমাধিতে (সমর্পিত) কি করে,
সুখ দুঃখে নিশ্চিত মরা (অবস্থান)।
এড়িয়ে যাওয়া যায় দ্বন্দ্ব ও করণের পারিপাট্য,
শূন্য পাখা পাশে চেপে ধর।
লুই বলছে, আমি স্বপনে দেখেছি,
ধমণ, চমণ দুই পিঁড়িতে আমি বসে।
(নোট : দ্বন্দ = বাসনা; করুণ = ইন্দ্রিয়চেতনা।)

প্র : চর্যাপদের আবিষ্কারক কে?
উ : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে এই গ্রন্থের আধুনিক যুগ-পর্বে 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী' অংশে)।

2023/5/11 13:03
Scanned with CamScanner

প্র : তিনি কোন উপাধি প্রাপ্ত হন?

উ : মহামহোপাধ্যায়

প্র : কোথা থেকে, কত সালে চর্যা আবিষ্কার করা হয়?

উ : নেপালের রয়েল লাইব্রেরি থেকে, ১৯০৭ সালে চর্যাপদ আবিষ্কার করা হয়।

প্র : চর্যাপদ কবে, কোথা থেকে, কার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়ে জনসমক্ষে আসে?

উ : ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে (১৩২৩ বঙ্গাব্দ) কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে চর্যাপদ আধুনিক লিপিতে প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদনা করেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

প্র : চর্যাপদের রচনাকাল সম্পর্কে কে কী বলেন?

উ : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে ৯৫০ থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে পদগুলো রচিত। সুকুমার সেন সহ বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব পণ্ডিতই সুনীতিকুমারকে সমর্থন করেন।

প্র : চর্যাপদের নাম নিয়ে প্রস্তাবগুলো কী?

উ : কারো মতে গ্রন্থটির নাম, 'আশ্চর্য চর্যাচয়', সুকুমার সেনের মতে 'চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়, আধুনিক পণ্ডিতদের মতে এর নাম 'চর্যাগীতিকোষ' আর হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে 'চর্যাচর্যাবিনিশ্চয়'। তবে 'চর্যাপদ' সবার কাছে গ্রহণযোগ্য নাম।

প্র : চর্যার কবিদের মধ্যে কোন কবি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলে মনে করা হয়?

উ : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে, শবরপা (৬৮০ থেকে ৭৬০ খ্রিষ্টাব্দ)

প্র : চর্যাপদ নিয়ে গবেষকদের প্রথম দিককার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সম্পর্কে লেখ।

উ : বিজয়চন্দ্র মজুমদার ১৯২০ সালে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯২৬ সালে, ১৯২৭ সালে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ চর্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। ১৯৩৮ সালে প্রবোধচন্দ্র বাগচী চর্যার তিব্বতি অনুবাদ আবিষ্কার করেন।

প্র : চর্যাপদ নেপালে পাওয়া যাবার কারণ কী?

উ : হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর জীবনীকার সতীশ চৌধুরী লিখেছেন : 'দুর্লভ সংস্কৃত সময়ে পুথিপত্র নিয়ে বাংলার অনেক মানুষেরা নেপালে, তিব্বতে চলে গিয়েছিলেন'। এমতই সর্ববাদিসম্মত। তবে তারাপদ মুখোপাধ্যায় মনে করেন যে, এক সময়ে নেপালে বসবাসকারী বাঙালিরা বাংলা লিপিতে পুঁথি লিখতেন এবং তাই 'নেপালে বাংলা অক্ষরে লেখা লিপিকরের লেখা পুঁথির অস্তিত্ব অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়।'

প্র : চর্যাপদের মূল পাণ্ডুলিপিটি কোথায়?

উ : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পাণ্ডুলিপিটি নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগারে ফেরত দেন যথাসময়ে। ১৯৬৫ সালে নীলরতন সেন ঐ পাণ্ডুলিপি থেকে গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। গত শতকের ছয়ের দশকের মাঝামাঝি রাজদরবারের গ্রন্থাগার বন্ধ হয়ে যেটি জাদুঘরে পরিণত হয়। এর বর্তমানে নেপালের জাতীয় আর্কাইভসে নেয়া হলেও চর্যাপদের মূল এবং সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি অক্ষত নেই। হয়তো হারিয়ে গেছে।

প্র : চর্যাপদ কোন ছন্দে রচিত?

উ : এর পদগুলো প্রাচীন কোন ছন্দে রচিত তা আজ বলা সম্ভবপর নয়। তবে আধুনিক ছন্দের বিচারে এগুলো মাত্রাবৃত্ত ছন্দের অধীনে বিবেচ্য।

প্র : চর্যাপদে প্রাপ্ত বিচিত্র রকমের মানুষের পরিচয় দাও।

উ : চর্যাপদ বাঙালি সমাজের বিশ্বস্ত দলিল। এখানে কাপালিক (কাপালি), ব্রাহ্মণ (বামহন), যোগী (জোই), ডোম্বী (ডোম্বি) নানা বর্ণের মানুষের উল্লেখ আছে। তারা নানা পদে যুক্ত। যেমন : মন্ত্রী (মন্তিঅ), পণ্ডিত আচার্য (পণ্ডিআচার্য), শিষ্য (সীস) ইত্যাদি। আবার বিভিন্ন পেশায়, যেমন: মাঝি (কামলি), বেশ্যা (দারী), শিকারী (অহেরী), নেয়ে (নৌবাহী) ইত্যাদি ক্ষেত্রেও তাদের কর্মরত দেখা যায়। পদগুলোর মধ্যে মানুষের আত্মীয়-পরিজনের সম্পর্কও আছে। যেমন : মা, বাবা (বাপ), পুত্র (পূড়া), বধূ (বহুড়ি), শাশুড়ি (সাসু) ইত্যাদি।

প্র : চর্যাপদে নারীদের স্থান ও ভূমিকা সম্পর্কে লেখ।

উ : চর্যাপদের যুগে নারীরা খুবই স্বাধীন ছিল। তারা খোজায় পেশা ও সঙ্গী নির্বাচনের অধিকার রাখত। কুরুরীপা একটি পদে (২নং) লিখেছেন, পুহলধুটি বেশ ছল জানে। সে দিনের বেলায় কাকের ডাক শুনেই জয় পায়, কিন্তু রাতে প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতে যায়। কাহ্নপা একটি পদে (১০নং) জানিয়েছেন, এক ডোমিনী নগরে তাঁত ও চেঙারি বিক্রি করে। কাহ্নপার অন্য একটি পদে (১৮নং) ডোম্বীর 'ছিনালী' করার কথা আছে। ডোম্বীপাদের ১৪নং পদে নারীদের নৌকা চালনা, নৌকার জলসিঞ্চন, লোক পারাপার ইত্যাদির মতো কর্মে যুক্ত থাকার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাছাড়া নারীরা গুরুর খানও অধিকার করেছিল।

প্র : চর্যাপদের পদকর্তাদের সম্পর্কে ধারণা দাও।

উ : চর্যাপদের পদকর্তারা বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়ের ছিলেন। তাঁরা সাধন-ভজনের জন্য যে পদগুলো রচনা করেছিলেন সেগুলোই চর্যাপদ নামে অভিহিত। পদকর্তারা একত্রে বসে এই চর্যাসমূহ রচনা করেন নি, বিভিন্ন সময়ে তাঁরা বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করেছেন। কোনো কোনো পদকর্তার বয়সের পার্থক্যও শত বছর। এই পদকর্তারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থান করতেন, কেউ কেউ বাংলাদেশেও (আজকের) ছিলেন। যেমন, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মনে করেন, ভুসুকুপা বাংলাদেশের মানুষ ছিলেন।

প্র : চর্যাপদে চিত্রিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পরিচয় দাও।

উ : চর্যাপদে যে সব মানুষের উল্লেখ আছে তাদের অনেকেই দরিদ্র। এখানে আছে কাপালিক, যোগী, ডোম্বী, মাঝি, শিকারী, নৌকাবাহী ইত্যাদি। এরা সম্পন্ন মানুষ নয়। ঢেণ্ডণপা-র একটি চর্যায় (৩৩নং) আছে: 'টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী। / হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী ॥' অর্থাৎ লোকশূন্য স্থানে আমার ঘর, কোনো প্রতিবেশী পর্যন্ত নেই। আমার ঘরে খাদ্যও নেই কিন্তু প্রেমিক এস ভিড় করে। এই চর্যা থেকেই বোঝা যায়, মানুষের দারিদ্র্য তখন কতটা তীব্র ছিল।

প্র : 'চর্যাপদ'-এ নিম্নবর্গীয় মানুষের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা কেমন?

উ : 'চর্যাপদ' যাঁরা রচনা করেছিলেন তাঁদের অনেকেই নিম্নবর্ণ থেকে উঠে আসা মানুষ ছিলেন। অধ্যাপক মজুমদার তাঁর সম্পাদিত 'চর্যাপদ' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন: 'চর্যাপদের সিদ্ধাচার্যদের অধিকাংশই হয় বর্ণাশ্রমের বাইরে অন্ত্যজ শ্রেণি পর্যায়ের লোক ছিলেন কিংবা বর্ণাশ্রমের মধ্যেই নীচ সামাজিক বর্ণের প্রতিনিধি হিসাবে চিহ্নিত ছিলেন।' তাই তাঁরা মাপিতজীবন থেকে উপাদান সংগ্রহ করে চর্যা রচনা করেন এবং সেখানে নিম্নবর্গের মানুষের জীবন প্রতিফলিত হয়। এই গ্রন্থে সমাজের নিম্নতম পর্যায়ে যারা অবস্থানকারে বা অন্ত্যজ সেই মদ্যগ্রাহী, কুড়ব, চণ্ডাল, বরুড়, তক্ষণকার, ঘাটজীবী বা পাটনি, মালো এবং আরো নীচের পুক্কস, পুক্কিন, খস, খোর, কম্বোজ, যবন, শবর- এদের জীবনের পরিচয় আছে। এদের জীবনে ছিল চরম অভাব, যন্ত্রণা, বেদনা, নিঃস্বতা, শোষণ। জীবিকা ও কর্ম হিসেবে এখানে শিকার করা, মাছ ধরা, নৌকা বাওয়া, চাঙারি বোনা, দেশজ মদ্য তৈরি, তুলোধোনা, জুয়া খেলা ইত্যাদির উল্লেখ আছে। উচ্চশ্রেণির মানুষদের থেকে দূরে প্রান্তস্থানে সামান্য ঘর বেঁধে তারা বাস করতো। বিয়ের ক্ষেত্রে নিম্নবর্গের কেউ উচ্চবর্গের কাউকে বিয়ে করতে পারতো না তবে উচ্চবর্গের পুরুষের নিম্নবর্গের নারীকে বিয়েতে কোনো বিঘ্ন ছিল না। আসলে, 'চর্যাপদ' মূলত নিম্নবর্গীয় মানুষের কাব্য আর এখানে প্রাচীনকালের বাংলার সামাজিক রূপটিই প্রকাশিত।

প্র : চর্যাপদের দার্শনিকতা এবং ধর্মমত সংক্ষেপে আলোচনা কর।

উ : চর্যাপদগুলি মূলত মহাজ্ঞান ধর্মশাখার অন্তর্গত সহজযান ধর্মশাখার সাধনসংগীত। 'মহাসুখ' তাদের চরম লক্ষ্য। ভুসুকুপাদ বলেছেন 'সহজানন্দ মহাসুহ লীলে'র কথা। তান্ত্রিক বৌদ্ধমতের এই মহাসুখ হলো বস্তুজগতের সংস্পর্শহীন এক সর্বশূন্য অবস্থা। এই মহাসুখের অন্য নাম সহজানন্দ। দেহকে চারটি চক্রে অর্থাৎ নির্বাণকায়, সাম্ভোগকায়, ধর্মকায় এবং ৬ষ্ঠ-৭ম শতকের কাছাকাছি সময়ে চর্যা রচনার শেষতম ভাগে অর্থাৎ ৮ম শতাব্দীতে সহজানন্দের

Scanned with CamScanner

সন্ধান করেছেন। চর্যাপদকার লিখেছেন– "সুনে সুন মিলিআ ভবে।/সকলধাম দুইআ তবে।" মহাসুখের সঙ্গে যেমন শূন্যের যোগ, তেমনই যোগ বিজ্ঞানবাদেরও। চর্যানীতির শূন্যবাদ হলো অতিক্রমণ বিজ্ঞানবাদ। এটি সৎ অর্থাৎ অস্তিত্বসম্পন্ন। চর্যা সাধকেরা সহজসুখের ধারণাকে একটি 'বাক্‌পথাতীত তত্ত্ব' অর্থাৎ ভাষা বা প্রকাশের অতীত তত্ত্ব বলে বর্ণনা করেছেন।

চর্যাপদ বৌদ্ধধর্মের মূলগত ভাবনার অনুসারী হলেও এটা স্পষ্ট যে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মই এখানে প্রাধান্য লাভ করেছে। বাংলা দেশের অনার্য সংস্কৃতি এবং কৌম (গোষ্ঠী) জীবনই চর্যার প্রেক্ষাপটে রয়েছে। জীবনযাপনের অসহনীয়তা থেকে মুক্তির বাসনা চর্যাপদগুলিতে আছে। সেখানে যেমন বৌদ্ধধর্মের মূল আদর্শের সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে অন্যদিকে, গুরুবাদকে স্বীকার করে নিয়ে তা প্রথাগত বৌদ্ধধর্ম থেকে অনেকটাই আলাদাও হয়ে গিয়েছে। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী চর্যাসাধকদের লেখায় সে সময়ের জীবনধারার নানা প্রবণতারই যেন মিশ্রণ দেখা যায়। এই দেহতত্ত্বনির্ভর সাধনা পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারার পথিকৃৎ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

প্র : ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাসের দিক থেকে চর্যাপদের গুরুত্ব আলোচনা কর।

উ : 'চর্যাপদ' হলো বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের রচিত ধর্মীয় সংগীত। সাধনার গূঢ় তত্ত্বকে তাঁরা নানাবিধ রূপক ও সংকেতের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করেছেন এই গানগুলিতে। চর্যাপদ কিন্তু কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে বাঙালির গর্বের বস্তু হয়ে উঠেছে। তাই বাংলা ভাষার ইতিহাসে চর্যাপদের গুরুত্বের দিকটি বিচার-বিবেচনা করে দেখা দরকার।

(১) 'চর্যাপদ' যেহেতু বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন, সেজন্য বাংলা ভাষার প্রাচীন রূপ জানার ক্ষেত্রে 'চর্যাপদ'-এর ভূমিকা অপরিহার্য।

(২) 'চর্যাপদ' আবিষ্কারের ফলে বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া সম্ভব হয়েছে। 'চর্যাপদ' না থাকলে বাংলা ভাষার প্রাচীন যুগ সম্পর্কে আমরা তথ্যই অজানা থেকে যেত আর তার ফলে বাংলা ভাষার ইতিহাসও হতো অসম্পূর্ণ।

(৩) বেশ কিছু বাংলা শব্দের বিবর্তনের ধারাপথটিকে চিনে নেওয়ার জন্য এই গ্রন্থের শরণাপন্ন হতে হয়।

(৪) বাংলা কবিতার ছন্দের ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গেলে 'চর্যাপদ' অপরিহার্য। বাংলা ছন্দের গঠনের ক্ষেত্রে 'চর্যাপদ'-এর ছন্দের প্রভাবকে স্বীকার করেন ছান্দসিকরা।

(৫) বাংলা কবিতায় যে অন্ত্যমিল দেখা যায়, সেই অন্ত্যমিলেরও উৎসের উদাহরণ হলো 'চর্যাপদ'।

(৬) 'চর্যাপদ'-এ ব্যবহৃত কিছু প্রবাদ ও রূপকল্প পরবর্তীকালের বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে।

(৭) প্রাচীন বাংলার সামাজিক ইতিহাসচর্চাতে চর্যাপদ বিকল্পহীন। প্রাচীন বাংলার সমাজজীবনের বিভিন্ন পরিচয় ছড়িয়ে আছে এই গ্রন্থে।

(৮) হাজার-বারশ বছর আগেকার ধর্ম, ইতিহাস জানতে গেলেও আমাদের শরণাপন্ন হতে হবে চর্যাপদের।

চর্যাপদের কবিদের পরিচয়

কাহ্নপা

প্র : চর্যাপদের সর্বাধিক পদরচয়িতা কোন কবি?

উ : কাহ্নপা।

প্র : তিনি কয়টি ও কোনপদগুলো রচনা করেন?

উ : ১৩ টি। পদগুলো : ৭, ৯ থেকে ১৩, ১৮, ১৯, ৩৬, ৪০, ৪২, ৪৫ (২৪নং পদটি কাহ্নপা রচিত, তবে সেটি পাওয়া যায় নি)।

প্র : এই পদসমূহের বৈশিষ্ট্য কী?

উ : এই পদগুলোতে নিপুণ কবিকৃতির প্রকাশের পাশাপাশি তৎকালীন সমাজচিত্রও উদ্‌ঘাটিত।

প্র : ব্যক্তিগতভাবে কাহ্নপা কী ছিলেন?

উ : কাহ্নপা সহজিয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধযোগী। তিনি ধর্মশাস্ত্র ও সঙ্গীত শাস্ত্র উভয় দিকেই দক্ষ ছিলেন।

প্র : চর্যাপদে যে পদগুলো পাওয়া যায় নি তার কোনটি কাহ্নপার রচনা বলে মনে করা হয়।

উ : ২৪নং পদটি।

প্র : চর্যাপদে কাহ্নপা আর কী কী নাম পাওয়া যায়?

উ : কানু, কাহ্নি, কাহ্নিল, কৃষ্ণচর্য, কৃষ্ণবজ্রপাদ।

কুক্কুরীপা

প্র : কুক্কুরীপা কি মহিলা কবি ছিলেন?

উ : কোন সুনিশ্চিত প্রমাণ নেই। তবে ড. সুকুমার সেন মনে করেন, কুক্কুরীপার ভাষার সঙ্গে নারীদের ভাষার মিল আছে।

প্র : তিনি কয়টি পদ রচনা করেন ও কী কী?

উ : ২টি। ২ ও ২০ সংখ্যক। মনে করা হয়, খুঁজে না-পাওয়া ৪৮ নং পদটিও তাঁর রচনা। সে হিসেবে ৩টি।

প্র : তিনি কোন অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন?

উ : ত্রিপুরার কাছাকাছি কোন অঞ্চলের।

প্র : কোন সময় তিনি বর্তমান ছিলেন?

উ : খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতক।

প্র : তার পদ পর্যালোচনা করলে কী মনে হয়?

উ : চর্যার কুক্কুরীপাকৃত পদসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এর ভাব ইতর, ভাষা গ্রাম্য।

প্র : কুক্কুরীপা রচিত অতিপরিচিত দুটি পঙক্তি কি?

উ : দিবসহি বহুড়ী কাউহি ডর ভাই।
রতি ভইলে কামরু জাই। (পদ:২)
(অর্থাৎ দিনে বউটি কাকের ভয়ে ভীত হয় কিন্তু রাত হলেই সে কামরূপ যায়।)

ধর্মপা

প্র : ধর্মপার কখন ও কোথায় অবস্থান ছিল?

উ : খ্রিষ্টীয় নবম শতকে বিক্রমশীলায়।

প্র : তার গুরু কে ছিলেন?

উ : কাহ্নপা।

প্র : চর্যার কোন পদ তার রচনা?

উ : ৬৭ সংখ্যক পদ।

প্র : এই পদের বিশেষত্ব কী?

উ : এখানে 'অন্তিকালের' অতীতকে গভীর সোগতত্ত্বের কথা আছে।

ঢেণ্ঢণপা

প্র : ঢেণ্ঢণপা কোন সময়ের কবি ছিলেন?

উ : নবম শতকের।

প্র : তিনি পেশায় কী ছিলেন?

উ : তাঁতি।

প্র : চর্যায় তিনি কয়টি পদ রচনা করেন?

উ : একটি (৩৩ সংখ্যক)।

প্র : তার এই পদটি বিখ্যাত কেন?

উ : এই একটিমাত্র পদে বাঙালি জীবনের চিরায়ত দারিদ্র্যের ছবি চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। যেমন: 'উলত মের ঘর নাহি পড়বেষী। / হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী।' (পদ : ৩৩)
(অর্থাৎ লোক শূন্য স্থানে প্রতিবেশীহীন আমার বাড়ি। হাঁড়িতে ভাত নেই, অথচ প্রেমিক এসে ভিড় করে।)

বিরুপা

প্র : বিরুপার কখন ও কোথায় অবস্থান ছিল?

উ : মনে করা হয় অষ্টম শতকে ত্রিপুরায়।

প্র : তার গুরু কে ছিলেন?

উ : জালন্ধরীপা

প্র : চর্যাপদে অন্তর্ভুক্ত তার পদের সংখ্যা কয়টি?

উ : একটি (৩ সংখ্যক)।

প্র : এই পদে কী বর্ণিত হয়েছে?

উ : শুঁড়িবাড়ির উপযুক্ত চিত্র। বলা হয়েছে, এক শুঁড়িনী দুই ঘরে ঢুকে বাকল দিয়ে মদের পাত্র বাঁধে।

বীণাপা

প্র : বীণাপার কখন ও কোথায় অবস্থান ছিল?

উ : খ্রিষ্টীয় নবম শতকে, গৌড়ে।

প্র : তার গুরু কে ছিলেন?

উ : ভুসুকুপা।

Scanned with CamScanner

প্র : সংস্কৃতগ্রন্থ বজ্রতারিকানিষ্পন্নক্রম কার রচনা?
উ : বীণাপার।
প্র : চর্যাপদের কোন পদটি তার রচনা?
উ : ১৭ সংখ্যক
প্র : এই পদের বিশেষত্ব কী?
উ : এখানে সূর্য-চন্দ্রকে চমৎকার উপমায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

ভাদেপা

প্র : ভাদেপার কখন ও কোথায় অবস্থান ছিল?
উ : খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকে শ্রাবস্তী এলাকায়।
প্র : তার গুরু কে?
উ : জালন্ধরীপা, মতান্তরে কাহ্নপা
প্র : চর্যার কোন পদ তিনি রচনা করেন?
উ : ৩৫ সংখ্যক পদ।
প্র : এই পদের মূলকথা কী?
উ : ধর্মীয় তত্ত্বকথার বর্ণনা।
প্র : ভাদেপা রচিত পদের প্রথম দুই পঙক্তি কী?
উ : এতকাল হউঁ অছিলোঁ স্বমোহেঁ। / এবেঁ মই বুঝিল সদ্ গুরু বোহেঁ ॥ (পদ : ৩৫)
(অর্থাৎ এতকাল আমি স্বমোহে ছিলাম, এখন সদগুরু বুঝলাম।)

ভুসুকুপা

প্র : ভুসুকুপার সময় ও অবস্থান কোথায়?
উ : মনে করা হয় অষ্টম থেকে এগার শতকে ভুসুকুপা সৌরাষ্ট্রের ক্ষত্রিয় রাজপুত্র ছিলেন।
প্র : চর্যায় পদ রচনার দিক থেকে তার অবস্থান কোথায়?
উ : দ্বিতীয়।
প্র : তিনি কয়টি পদ রচনা করেন ও কী কী?
উ : আটটি। সংখ্যা : ৬, ২১, ২৩, ২৭, ৩০, ৪১, ৪৩, ৪৯।
প্র : ভুসুকু নামটির অর্থ কী?
উ : ভুসুকু প্রথম দিকে অলস ছিলেন। ভুক্তি (ভু), সুপ্তি (সু), কুটিরে (কু) অবস্থান ছাড়া কিছু করতেন না বলে তাকে 'ভুসুকু' বলা হতো।
প্র : তিনি কোন অঞ্চলের মানুষ?
উ : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ অনুমান করেছেন পূর্ববঙ্গের।
প্র : কীভাবে মনে করা যায়। তিনি পূর্ববঙ্গের?
উ : তাঁর ৪৯নং পদে পদ্মা (পদ্মাবতী) নদীর নাম আছে। 'বঙ্গাল দেশ' ও 'বঙ্গপুরী' কথা আছে।
প্র : তার রচিত পদসমূহের বৈশিষ্ট্য কী?
উ : সেখানে নাগালি জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়।
প্র : ভুসুকুপা রচিত একটি উল্লেখযোগ্য পঙ্ক্তি লেখ।
উ : অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী। (পদ : ৬)

মহীধরপা

প্র : মহীধরপার কখন ও কোথায় অবস্থান ছিল?
উ : খ্রিষ্টীয় নবম শতকে মগধ অঞ্চলে।
প্র : তিনি চর্যাপদের কোন পদটি রচনা করেন?
উ : ১৬ সংখ্যক পদ।
প্র : এই পদের বক্তব্য কী?
উ : পাপ ও পুণ্যকে দুটি শিকলের সাথে তুলনা করে তা ছিন্ন করে মহারস পান করার কথা বলা হয়েছে।

লুইপা

প্র : লুইপা কে ছিলেন?
উ : প্রবীণ বৌদ্ধসিদ্ধাচার্য ও চর্যাপদের কবি।
প্র : তিনি কোন সময় কোথায় অবস্থান করতেন?
উ : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র অনুমান : ৭৩০ থেকে ৮১০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে লুইপা জীবিত ছিলেন।
প্র : লুইপা কোন অঞ্চলের কবি ছিলেন?
উ : তিব্বতি ঐতিহাসিক লামা তারনাথের মতে, লুইপা পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গার ধারে বাস করতেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, লুইপা রাঢ় অঞ্চলের লোক।
প্র : চর্যাপদের প্রথম পদটি কার রচনা?
উ : লুইপার

প্র : এই পদের দুটি চরণ লিখ।
উ : আজ ভুসুকুর পাঞ্চা বি ভাল।
ভেলা ন্রীএ তৈলা কাপাঃ (পদ : ১)
(অর্থাৎ সেই গাছের মত, এর পাঁচটি ডাল। চঞ্চল মনে কাল প্রবেশ করে।)
প্র : চর্যায় তিনি মোট কতটি পদ লিখেছেন?
উ : দুটি (১ ও ২৯ সংখ্যক)
প্র : লুইপা রচিত কয়টি সংস্কৃতগ্রন্থের নাম পাওয়া যায়, কী কী?
উ : তিনটি। অভিসময় বিভঙ্গ, বজ্রস্বত্ব সাধন, বুদ্ধোদয়, ভগবদাভিসার, তত্ত্ব সভাব।

শবরপা

প্র : শবরপা কোন সময়ের কবি?
উ : তার জীবনকাল ৬৮০ থেকে ৭৬০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে। সেই সূত্রে শবরপা চর্যার কবিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। (মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে)
প্র : শবরপা কোন দেশের লোক ছিলেন?
উ : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে তিনি 'বাংলা দেশে'র লোক।
প্র : শবরপা কোন কবির গুরু ছিলেন?
উ : লুইপার।
প্র : তিনি কার শিষ্য ছিলেন?
উ : নাগার্জুনের।
প্র : সংস্কৃত ও অপভ্রংশ মিলে তিনি কয়টি গ্রন্থ লিখেছেন?
উ : ১৬টি
প্র : চর্যাপদের কোন পদগুলো তার রচনা?
উ : ২৮ ও ৫০ সংখ্যক
প্র : এই পদগুলোতে তিনি কী বলেছেন?
উ : এখানে কবি শূন্য, অতিশূন্য, মহাশূন্য ও প্রজ্ঞাস্বর শূন্য– এই চার শূন্যের মধ্যে তৃতীয় অর্থাৎ মহাশূন্যকে উদ্যানবটিকা বলেছেন।
প্র : শবরপা রচিত দুটি উল্লেখযোগ্য পঙ্ক্তি লেখ।
উ : উঞ্চা উঞ্চা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী। মোরঙ্গ পীচ্ছ পরিহাণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী ॥ (পদ : ২৮)
(অর্থাৎ উঁচু পর্বতে শবরী বালিকা বাস করে। তার পরিধানে ময়ূরের পুচ্ছ, গলায় গুঞ্জার মালা।)
প্র : শহীদুল্লাহ্ শবরপাকে কার গুরু বলে উল্লেখ করেছেন?
উ : লুইপার।

শান্তিপা

প্র : শান্তিপা কোন সময়ের কবি বলে মনে করা হয়?
উ : এগার শতকের।
প্র : তিনি কোথায় বাস করতেন বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে?
উ : বিহারের বিক্রমশীলায়।
প্র : তার নামে চর্যাপদের কয়টি পদ পাওয়া গেছে?
উ : ২টি (১৫ ও ২৬নং)।
প্র : বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতে তিনি কোথায় যান?
উ : সিংহল।

সরহপা

প্র : সরহপা কোন সময়ের কবি বলে মনে করা হয়?
উ : দশ থেকে এগার শতকের কবি।
প্র : তার নামে চর্যাপদে কোন কোন পদ পাওয়া গেছে?
উ : ২২,৩২,৩৮,৩৯, সংখ্যক; মোট ৪টি
প্র : তার পদের মূল বিষয় কী?
উ : শবর-শবরীর প্রেমকাহিনি এবং কতিপয় সরলতত্ত্ব কথা।

ডোম্বীপা

প্র : ডোম্বীপা কে ছিলেন?
উ : তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের রাজা ছিলেন। পরে বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন। তার অলৌকিক ক্ষমতা ছিল বলে মনে করা হয়।
প্র : ডোম্বীপার জীবৎকাল উল্লেখ কর।
উ : তিনি দীর্ঘজীবী পুরুষ ছিলেন। ৭৯০ থেকে ৮৯০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে তাঁর জীবনকাল ছিল।
প্র : ডোম্বীপার গুরু কে ছিলেন?
উ : বিরুপা।
প্র : ডোম্বীপা কোন পদ লিখেছেন?
উ : ১৪ সংখ্যক।

Scanned with CamScanner

প্র : তাঁর রচিত পদে কোন চিত্র ফুটে ওঠে?
উ : গঙ্গা ও যমুনা নদীতে নৌকা বেয়ে নেয়ার চিত্র। কড়ি ছাড়াই এখানে নদী পার হওয়া যায়।

কমলাম্বরপা

প্র : কমলাম্বরপা কার গুরু ছিলেন?
উ : জালন্ধরীপার।
প্র : তিনি কোন সময়ের কবি?
উ : খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকের প্রারম্ভের।
প্র : কবিদের দিক থেকে কোন কোন কবির কাছাকাছি?
উ : কাহ্নপার পূর্ববর্তী, কুক্কুরীপার সমকালীন।
প্র : কবি প্রকৃতপক্ষে কী ছিলেন?
উ : তিনি তক্কর নামক স্থানের রাজপুত্র ছিলেন, মতান্তরে তাঁর জন্মস্থান ছিল উড়িষ্যা।

গুণ্ডরীপা

প্র : গুণ্ডরীপা আর কোন নামে পরিচিত?
উ : গুণ্ডরীপা।
প্র : তিনি কোন সময়ের কবি?
উ : রাজা দেবপালের রাজত্বকালে (৮০৯-৮৪১) তিনি বর্তমান ছিলেন বলে মনে করা হয়।
প্র : গুণ্ডরীপা চর্যাপদের কত সংখ্যক পদের রচয়িতা?
উ : চার সংখ্যক।
প্র : গুণ্ডরীপা কি কবির সত্যিকারের নাম?
উ : এ কবির প্রকৃত নাম জানা যায় না। অনেকে মনে করেন গুণ্ডরীপা তাঁর বৃত্তি বা জাতিবাচক নাম (যেমন: এ যুগের কর্মকার বা সরকার)।
প্র : তিনি কোন অঞ্চলের মানুষ ছিলেন?
উ : তিনি বাংলার পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন বলে মনে করা হয়। কেউ কেউ তাকে বিহারের লোক বলেও অভিহিত করেন।

চাটিল্লপা

প্র : চাটিল্লপা চর্যাপদের কত সংখ্যক পদ লেখেন?
উ : পাঁচ সংখ্যক। অবশ্য অনেকে মনে করেন, পদটি তাঁর কোনো শিষ্যের রচনা। শহীদুল্লাহ্ও এ কবি সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য দিতে পারেন নি।

প্র : তিনি কোন সময়ের কবি ছিলেন?
উ : তিনি ৮৫০ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে জীবিত ছিলেন বলে মনে করা হয়।
প্র : তিনি কোথাকার মানুষ ছিলেন?
উ : দক্ষিণবঙ্গের অধিবাসী ছিলেন।
প্র : তাঁর পদে কী প্রাধান্য পেয়েছে?
উ : নদীমাতৃক অঞ্চলের উপাদান। যেমন নদী, সাঁকো, কাদা, জলের স্রোত, মাছ ধরা, খনন করা ইত্যাদি। এ সবের অনুষঙ্গে চাটিল্লপা তত্ত্বকথা ব্যক্ত করেছেন।

আর্যদেবপা

প্র : আর্যদেবপাকে অন্য কোন নামে অভিহিত করা হয়?
উ : আজদেব। কারণ তিব্বতীয় তা উল্লেখ আছে।
প্র : আর্যদেবপা কোন সময়ের কবি?
উ : শহীদুল্লাহর মতে তিনি কমলাম্বরপার সমকালীন অর্থাৎ খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকের প্রথম দিকের কবি।
প্র : তিনি কি রাজা ছিলেন?
উ : তারনাথের মতে তিনি (আর্যদেবপা) মেবারের রাজা ছিলেন।
প্র : কে তাঁকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন?
উ : গোরক্ষনাথ।
প্র : আর্যদেবপার ভাষা কি বাংলা ছিল?
উ : শহীদুল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন : 'তাঁহার ভাষা অনেকটা বাঙ্গালা বটে; কিন্তু উড়িয়া ভাষা বলাই সঙ্গত।'

দারিকপা

প্র : দারিকপার পূর্বপরিচয় কী?
উ : দীক্ষাগ্রহণের পূর্বে তিনি সালিপুত্র নামক স্থানের (কামরূপের কাছে) রাজা ছিলেন। তাঁর নাম ছিল ইন্দ্রপাল। অনেকের মতে, তিনি উড়িষ্যার অধিবাসী ছিলেন।
প্র : লুইপার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কী?
উ : শহীদুল্লাহ্ বলেছেন : দারিকপা লুইপার সাক্ষাৎ শিষ্য নন, শিষ্য পরম্পরায় একজন।

প্র : দারিকপার পদ যে বাংলা ভাষায় রচিত তার প্রমাণ কী?
উ : তাঁর ভাষা প্রাচীন বাংলা। এ ভাষাতে কর্মে 'রে', সম্বন্ধে 'এরা', সপ্তমীতে 'ত', প্রশ্নবোধক ক্রিয়ায় 'ইআ' বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়।
প্র : দারিকপার অন্যান্য গ্রন্থের নাম লেখ।
উ : তথাগতি, সপ্তম সিদ্ধান্ত ইত্যাদি।

তাড়কপা

প্র : তাড়কপা কে ছিলেন?
উ : তাড়কপা সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। এমন কি তিব্বতী ভাষায় ৮৪ মহাসিদ্ধের তালিকাতেও তাঁর নাম নেই।
প্র : এই কবিকে 'নাড়কপা' নামে কে অভিহিত করেছেন?
উ : রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন। শহীদুল্লাহ্ একে 'ভুল' বলে অভিহিত করেছেন।
প্র : তাড়কপা চর্যাপদের কোন পদ লিখেছেন?
উ : ৩৭ সংখ্যক।

কঙ্কণপা

প্র : কঙ্কণপা কোন সময়ের কবি ছিলেন?
উ : গবেষকদের মতে তিনি ৯৮০ থেকে ১১২০ খ্রিষ্টাব্দ অবধি জীবিত ছিলেন।
প্র : বৌদ্ধধর্মে দীক্ষাগ্রহণের পূর্বে তিনি কী ছিলেন?
উ : বিক্রমনগর (মতান্তরে বিক্রমপুরের) রাজা ছিলেন।
প্র : কমলাম্বরপার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কী?
উ : কঙ্কণপা তাঁর শিষ্য ছিলেন।
প্র : কঙ্কণপার লেখায় বাংলার সঙ্গে কিসের মিশ্রণ আছে?
উ : বাংলার সঙ্গে ব্যাকরণে কিছু অপভ্রংশের রূপ পাওয়া যায়।

জয়নন্দীপা

প্র : জয়নন্দীপার অন্য নাম কী?
উ : অনেকে মনে করে তাঁর নাম জয়ানন্দ।
প্র : তিনি কে ছিলেন?
উ : জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং কোনো রাজার মন্ত্রী ছিলেন।
প্র : তিনি কোন পদ রচনা করেন?
উ : ৪৬ সংখ্যক পদ।
প্র : তাঁর ভাষা কেমন?
উ : তাঁর ভাষা গৌড় অপভ্রংশের পরবর্তী আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীন রূপ।
প্র : তাঁর ভাষার সঙ্গে আর কোন কোন ভাষার নিকট সাদৃশ্য পাওয়া যায়?
উ : মৈথিলী, উড়িয়া, অসমিয়া ভাষা।

তন্ত্রীপা

তন্ত্রীপা নিয়ে তেমন তথ্য পাওয়া যায় না। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের কথা' (১৯৬৩) তন্ত্রীপা সম্পর্কে এক বাক্যে লিখেছেন : 'তন্ত্রীপাদের পদটি বৌদ্ধগানের খণ্ডিত অংশে থাকায় আমরা তাহা পাই নাই।' তিনি 'Buddist Mystic Songs' গ্রন্থে লিখেছেন এইটুকু : 'Tantripa is the author of the song no. 25. He was a disciple of Jalandharipa and afterwards of Kanhapa. In the ms. he is missing.'

2020/5/11 13:04
Scanned with CamScanner

অন্ধকারযুগ ও অন্যান্য

প্র : অন্ধকার যুগ কোন সময়কে বলে, কেন?

উ : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ১২০১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৫০ পর্যন্ত অন্ধকার যুগ হিসেবে পরিচিত। এই সময়ে বাংলা সাহিত্যের লিখিত কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। তুর্কি আক্রমণে বঙ্গীয় সমাজ ও জনজীবন বিপর্যস্ত হওয়ার কারণে মানুষ সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করতে ব্যর্থ হয়। এ সময় রচিত যে সাহিত্যকর্মের সন্ধান পাওয়া গেছে (যেমন : শূন্যপুরাণ, সেক শুভোদয়া। অবশ্য এগুলোর রচনাকাল নিয়ে মত-পার্থক্য আছে।) সেগুলো মূলত সংস্কৃত। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যুগ বিভাগ হয়েছে প্রাপ্ত নিদর্শনের ভিত্তিতে। চর্যার কবিদের অস্তিত্ব দ্বাদশ শতাব্দীর (১২০০) পূর্ব পর্যন্ত ছিল বলে মনে করা হয়। তাই দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত প্রাচীন যুগ। অন্যদিকে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য' বা 'ইউসুফ জোলেখা'র ভাষা বৈশিষ্ট্যের বিচারেই সেগুলো ১৩৫০ সালের পরের রচনা বলে প্রমাণিত। এগুলো মধ্যযুগের নিদর্শন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের মধ্যবর্তী ১২০১–১৩৫০ সাল, এই সেড়শ বছর শাসকদের তাণ্ডবে জনজীবন ছিল বিপর্যস্ত, শান্তি তিরোহিত। সমাজ ও অর্থনীতিতেও এর কুপ্রভাব পড়ে। জ্ঞানী লোকেরা দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন। এদেশে মগ দস্যু আর তুর্কি বহিরাগতদের আগমন ও কৃতকর্মের উপর দুটি বাগধারার জন্ম হয়েছে : 'মগের মুল্লুক' এবং 'তুর্কি নাচন' (এই বাগধারাটি কম ব্যবহারের কারণ কী?)। 'মগের মুল্লুক' অর্থ অরাজক দেশ, আর 'তুর্কি নাচন' অর্থ নাজেহাল অবস্থা। সারা বিশ্বের যে দেশগুলো তুর্কিদের অধিকারে গেছে, সেখানেই প্রাথমিকভাবে নাজেহাল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এদেশও তার বাইরে ছিল না। পাঠান-মোগল যুগে বাংলার এ অবস্থা উন্নতি হতে সময় লাগে। ওয়াকিল আহমদ বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত 'অন্ধকার যুগ' এর ধারণার পক্ষে নন। অবশ্য, তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন : 'প্রথমে সেন ও পরে পাঠান আমলে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক পটভূমি পরিবর্তিত হয়। সহজিয়া সম্প্রদায়ের বিলুপ্তি ঘটে। ফলে তাঁদের ধর্মসাধনা ও জ্ঞানসাধনা রুদ্ধ হয়ে যায়, সেই সাথে বাংলা সাহিত্যচর্চার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়, কেননা ঐ যুগে সহজিয়াগণই বাংলা ভাষার একমাত্র ধারক ও বাহক ছিলেন।' ('বাংলা সাহিত্যের পূর্বকথা', ২০০২ : পৃ. ৫৪) আমাদের বক্তব্য, এই রুদ্ধতার কারণেই অন্ধকার যুগের সৃষ্টি হয়েছিল। চর্যাপদের রচয়িতা সহজিয়ারা ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ অবধি পদ রচনা করেছেন, তা সেন শাসনকালের অন্তর্ভুক্ত এবং প্রাচীনযুগ বলে স্বীকৃত। অন্ধকার যুগের আলোচনায় এ সময় অন্তর্ভুক্ত করার অবকাশ নেই। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ 'প্রাচীন যুগের বাংলা সাহিত্যের ধারা' সম্পর্কে আলোচনা অন্তে এক বাক্যে একটি প্যারা লিখেছেন। বাক্যটি এই : 'মুসলমান কর্তৃক বাংলা আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের ধারা এইরূপ ছিল।' ('বাংলা সাহিত্যের কথা' : ১৩৭৩ : পৃ. ১৬) অর্থাৎ এরপর চর্যাপদের স্বাভাবিক ধারা রুদ্ধ হয়ে যায়। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মুসলমান আক্রমণ বলতে তুর্কি আক্রমণ বুঝিয়েছেন। তিনি তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে এর ব্যাখ্যা করে লিখেছেন : '১২০১ খ্রীঃ বাঙ্গালা দেশে তুর্কী আক্রমণ হয়। সমস্ত বাঙ্গালা অধিকার করিতে প্রায় ১০০ বৎসর লাগে। শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইতে আরও প্রায় ৫০ বৎসর কাটিয়া যায়। এই ১২০০ হইতে ১৩৫০ খ্রীঃ পর্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে এক শূন্য স্থান।' ('বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' : ১৯৬৮: পৃ. ৪৫)।

অন্যত্রও শহীদুল্লাহ্ একই সত্তব্য প্রদান করেছেন। 'বাংলাদেশী বাংলার আদর্শ গ্রন্থাবলি' : ভূমিকা' নিবন্ধে তিনি লিখেছেন: 'সেন রাজাদের সময় হইতে বাংলা ভাষা অনাদৃত হইয়া থাকে। মুসলমান রাজত্বের প্রথমে প্রায় সেড়শত বৎসর কাল দেশ যুদ্ধবিগ্রহের জন্য অশান্তিময় থাকায় কোনও সাহিত্য সৃষ্টি হয় নাই।' (হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত 'বাঙলা ভাষা' ২য় খণ্ড: ২০০১: পৃ. ২৮২) কুকুমার সেনও একথা বলেছেন : 'মুসলমান অভিযানের পরে বাঙ্গালা দেশে চর্যাগীতির ধারা অব্যাহত থাকে নাই।' ('বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ১ম খণ্ড : ১৯৬৩ : পৃ. ৭৪)। হুমায়ুন আজাদ লিখেছেন। '১২০০ থেকে ১৩৫০ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রচিত কোনো সাহিত্যকর্মের পরিচয় পাওয়া যায় না বলে এ-সময়টাকে ভুলা হয় অন্ধকার যুগ। পণ্ডিতেরা এ-সময়টাকে নিয়ে অনেক ভেবেছেন, অনেক আলোচনা করেছেন, কিন্তু অন্ধকার সরিয়ে ফেলতে পারেন নি। এ-সময়টির দিকে তাকালে তাই চোখে কোনো আলো আসে না, কেবল আঁধার ঢাকা চারদিক।' ('লাল নীল দীপাবলি' : ২০০১: পৃ. ২৫)

এ সময় বাংলা সাহিত্যে এক বিরাট শূন্যতা দেখা দেয়। মধ্যযুগে যে সাহিত্যধারাগুলো পাওয়া যায় এর প্রধান ধারাটি প্রাচীন যুগের সাহিত্য নিদর্শন চর্যাপদের ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। বহির্বাংলার ব্রজবুলি ভাষা ও রাধা-কৃষ্ণকথা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করে প্রাচীন যুগের পরে এক বিরাট শূন্যতার বা শূন্যতার যুগ ছিল বলেই। অনেক আলোচক সমন্বয়ের পথে এসে এই সময়কে যুগসন্ধির কাল বলেছেন। যদি যুগসন্ধির কালই হবে, তাহলে মধ্যযুগে চর্যাপদের ধারা বা এর প্রভাব থাকবার কথা। কিন্তু সেটা নেই কেন? নিশ্চয়ই ছিন্ন হয়েছিল। ওয়াকিল আহমদের উদ্ধৃতি দিয়েই এর আগে সূত্র ছিন্ন হবার কারণ দেখান হয়েছে। এ সময় বহির্বাংলার ব্রজবুলি ও রাধা-কৃষ্ণকথার প্রভাব বাংলা সাহিত্যে কেন পড়েছিল? নিশ্চয়ই শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল বলে। আসলে 'শূন্যতার পথ ধরে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এগুলো এসেছে। তাই ১২০১ থেকে ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দকে অন্ধকার যুগ বলা হয়। এ অভিমতের পক্ষে কারণসমূহ সূত্রবদ্ধ করা যায়।

১. রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা।
২. এ সময়ের মধ্যে বাংলায় রচিত কোনো সাহিত্যিক নিদর্শন না পাওয়া। (নিদর্শন অনুসারেই যুগবিভাগ করা হয়েছে।)
৩. মধ্যযুগের সাহিত্যে প্রাচীনযুগের সাহিত্যের প্রভাব বা যোগাযোগ না পাওয়া।
৪. বহির্বাংলার ব্রজবুলি ভাষা এবং রাধা-কৃষ্ণকথার ব্যাপক প্রভাব মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পরিলক্ষিত হওয়া।

প্র : অন্ধকার যুগে বাংলার কোন শাসকের রাজত্বকালে কিছুটা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ছিল?

উ : ১৩৪২ সালে ইলিয়াস শাহ্ বাংলার সিংহাসনে বসলে রাজনৈতিক স্থিতিত্বের সম্ভাবনার সূচনা ঘটে। এই রাজবংশ প্রথম পর্যায়ে ৭১ বছর রাজত্ব করে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনে সচেষ্ট হন।

প্র : ১২০১ থেকে ১৩৫০ পর্যন্ত কালের সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

উ : 'তুর্কি-বিজয়ের পরে বাংলার প্রচলিত ধর্মীয় সংস্কৃতির বড় রকমের পরিবর্তন ঘটল। রাজনৈতিক অব্যবস্থা চলতে লাগল। ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ শক্তির নেতৃত্ব চলে গেল। এই বিমূঢ় অবস্থার কোন সাহিত্য মেলেনি। তুর্কি অধিকার এবং মুসলমান ধর্মের প্রভাব-প্রতিক্রিয়ায় দেশের ভাবনায় পরিবর্তন ঘটতে লাগল। উচ্চমার্গের সংস্কৃতির সঙ্গে লৌকিক স্তরের সমন্বয় ঘটতে শুরু হল অনেক দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্য দিয়ে। নতুন নতুন দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা ঘটল। অন্যদিকে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের আদর্শ সমাজ রক্ষার প্রয়োজনে রামায়ণাদির অনুবাদের প্রয়োজন দেখা দিল। এইভাবে পরবর্তী সাহিত্যের ভিত্তি তৈরি হল এই অন্ধকার পর্বেই।'

– ক্ষেত্র গুপ্ত

2020/5/11 13:04

Scanned with CamScanner

শূন্যপুরাণ

প্র : 'শূন্যপুরাণ' ও 'সেক শুভোদয়া' কী?

উ : রামাই পণ্ডিত রচিত বৌদ্ধ ধর্মীয় তত্ত্বের গ্রন্থের নাম 'শূন্যপুরাণ'। হলায়ুধ মিশ্র রচিত পির মাহাত্ম্য-ব্যঞ্জক কাব্য 'সেক শুভোদয়া'। এর কোনটি বাংলা ভাষায় রচিত নয়। গবেষকদের মতে, এর রচনা কাল ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে।

প্র : 'শূন্যপুরাণ' সম্পর্কে লেখ।

উ : 'শূন্যপুরাণ' বিশেষভাবে ধর্মপূজাপদ্ধতি। গ্রন্থটি ৫১টি অধ্যায়ে বিভক্ত। গ্রন্থটির লেখক কে তার সুনির্দিষ্ট হদিস পাওয়া যায় নি। তবে যতটুকু ভণিতা পাওয়া যায়, তাতে মনে হয় গ্রন্থটি রামাই পণ্ডিতের। গ্রন্থটির প্রথম ৫টি অধ্যায় সৃষ্টি তত্ত্ব সম্বন্ধীয়। এই সকল সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনায় মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব লক্ষ করা যায়। বাকি সব কয়টি অধ্যায়ই বিভিন্ন ও বিচিত্র রকমের ধর্মপূজার পদ্ধতি বিশ্লেষণে পূর্ণ। গ্রন্থটি নামবিহীন অবস্থায় পাওয়া যায়। 'বিশ্বকোষ' প্রণেতা নগেন্দ্রনাথ বসু তিনটি পুথির পাঠ সংগ্রহ করে ১৩১৪ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' থেকে 'শূন্যপুরাণ' নামকরণ করে প্রকাশ করেন। এই কাব্যে 'শূন্যময় দেবতা' ধর্মঠাকুরের পূজা পদ্ধতির বর্ণনা আছে। গ্রন্থটির রচনাকাল সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ করা যায়। পণ্ডিত যোগেনচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মতে, 'শূন্যপুরাণ' এর রচনাকাল ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে। সুকুমার সেন মনে করেন যে, ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় গ্রন্থটি রচিত।

প্র : চম্পুকাব্য কাকে বলে?

উ : গদ্য ও পদ্য মিশ্রিত কাব্যকে চম্পুকাব্য বলে। 'শূন্যপুরাণ' চম্পুকাব্যের নিদর্শন।

সেক শুভোদয়া

প্র : সেক শুভোদয়া সম্পর্কে লেখ।

উ : অশুদ্ধ বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় মিশ্রিত একটি গ্রন্থ। এর রচনাকাল ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে। গদ্য-পদ্য মিলিয়ে গ্রন্থটিতে ২৫টি অধ্যায় আছে। এরপর পুথি খণ্ডিত। জাললুদ্দিন তাব্রিজি নামের এক অলৌকিক শক্তিধর মুসলমান (পির) রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভায় চমৎকার চিত্তাকর্ষক গল্প পরিবেশনের মাধ্যমে মনে বিস্ময় সৃষ্টি করে। রাজা লক্ষ্মণ সেককে পুরস্কৃত ও সংবর্ধিত করেন। বেশ কিছু বাংলা ছড়া ও বাক্যাংশ ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তবে প্রচুর সংস্কৃত ব্যবহারও আছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একে 'dog sanskrit' বলেছেন। ১৩২০-২১ বঙ্গাব্দে মণীন্দ্রমোহন বসু 'কায়স্থ' পত্রিকায় গ্রন্থটির ১৩ পরিচ্ছেদ বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশ করেন পরে ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে সুকুমার সেন সম্পাদনায় গ্রন্থটি প্রথম মুদ্রিত হয়। একে হলায়ুধ মিশ্রের রচনা বলে মনে করেন।

নিরঞ্জনের উষ্মা

প্র : নিরঞ্জনের উষ্মার পরিচয় দাও।

উ : 'শূন্যপুরাণ' নামক কাব্যগ্রন্থের অংশবিশেষ পণ্ডিতগণ 'শূন্যপুরাণের রচনাকাল নিয়ে একমত নন। ড. দীনেশচন্দ্র সেন, পণ্ডিত যোগেশ চন্দ্র রায়, ড. সুকুমার সেন প্রমুখ ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে কোনো এক সময় শূন্যপুরাণ রচিত হয়েছে বলে মনে করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'নিরঞ্জনের উষ্মা' সম্পর্কে ভূদেব চৌধুরীর অভিমত, এই অংশটুকু 'তুর্কী আক্রমণের পরবর্তী কালের রচনা।' 'নিরঞ্জনের উষ্মা' অংশের মূল প্রতিপাদ্য হলো : বর্ণ-হিন্দুরা ধর্মসেবকদের প্রতি নানা অত্যাচার ও অবজ্ঞা করেছেন। এই অনাচারে বিক্ষুব্ধ হয়ে নিরঞ্জন ধর্মঠাকুর 'যবন' মুসলমান রূপ ধারণ করে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে এবং অত্যাচার-অবজ্ঞার প্রতিশোধ গ্রহণ করে। সহদেব চক্রবর্তীর 'নিলপুরাণে' (১৭৩৫) এই কাহিনি অন্তর্ভুক্ত থাকায় সুকুমার সেনের অভিমত হলো যে শূন্যপুরাণ অন্তর্ভুক্ত 'নিরঞ্জনের উষ্মা' প্রকৃতপক্ষে সহদেব চক্রবর্তীর রচনা। কেননা, 'শূন্যপুরাণে' কমপক্ষে পাঁচজন কবির হস্তক্ষেপ ঘটেছে। এসব মতামতের কারণে নিরঞ্জনের উষ্মার রচনাকাল সুনিশ্চিত ও সুনির্দিষ্ট করে বলার উপায় নেই। তাছাড়া এই গ্রন্থে বাংলা ভাষা ব্যবহারও প্রশ্নমুক্ত নয়।

Scanned with CamScanner

প্র : মধ্যযুগের প্রথম গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

উ : বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের প্রথম কাব্য হিসেবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন স্বীকৃত। ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে (১৩১৬ বঙ্গাব্দে) বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কাঁকিলা গ্রামে ব্রাহ্মণবাড়ক বৈষ্ণবমন্ত্রজ্ঞ শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্র বংশজাত শ্রী দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির গোয়ালঘর থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথি আবিষ্কার করেন। ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে (১৩২৩ বঙ্গাব্দ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় পুথিটি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পুথির প্রথম দুটী এবং শেষপৃষ্ঠা পাওয়া যায় নি বলে এর নাম ও কবির নাম স্পষ্ট করে জানা যায় নি। কবির ভণিতায় 'চণ্ডীদাস' এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'বড়ু চণ্ডীদাস' পাওয়া যাওয়ায় এই গ্রন্থের কবি হিসেবে বড়ু চণ্ডীদাসকে গ্রহণ করা হয়। কবি বাগুলি ভক্ত ছিলেন। আবিষ্কর্তা ও সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় প্রাচীন বৈষ্ণব লেখকদের ইঙ্গিত অনুসরণ করে গ্রন্থের নামকরণ করেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। অবশ্য পুথিতে প্রাপ্ত একটি ত্রিবৃটুকে 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' লেখা থাকায় অনেকে গ্রন্থটিকে 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' নামকরণের পক্ষপাতী। বড়ু চণ্ডীদাস চতুর্দশ খ্রিষ্টাব্দের প্রারম্ভে জন্ম নিয়েছেন বলে ঐতিহাসিকদের মত। তবে কাব্যটির রচনাকাল নিয়ে মতপার্থক্য বিস্তর। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রমুখের মতে এই কাব্যের ভাষা চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীর। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'এই পুথি ১৩৫৮ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে সম্ভবত চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লিখিত।' গোপাল হালদারের মতে, 'এসব পদ রচিত হয়ে থাকবে খৃঃ ১৪৫০ থেকে খৃঃ ১৫০০-এর মধ্যে।' সুকুমার সেনের মতে, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিকাল ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধের আগে হইতে পারে না, সম্ভবত ঊনবিংশ শতাব্দীর।' পণ্ডিতগণ এসব অভিমত ব্যক্ত করেন প্রধান পুথির লিপিকে অবলম্বন করে। প্রাপ্ত পুথিটি অনুলিপিকৃত বিধায় মূলগ্রন্থের রচনাকাল নিয়ে প্রাচীনত্বে সন্দেহ নেই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে মোট ১৩টি খণ্ড রয়েছে। এগুলো হলো জন্মখণ্ড, তাম্বুল খণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, বৃন্দাবন খণ্ড, কালিয়দমন খণ্ড, যমুনা খণ্ড, হার খণ্ড, বাণ খণ্ড, বংশী খণ্ড, বিরহ খণ্ড। রাধাকৃষ্ণের প্রণয় কাহিনি মধ্যে বাঙালির লৌকিক জীবনের প্রতিবিম্ব ধরা পড়ে, তা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব।

প্র : এ গ্রন্থের নামকরণ সম্পর্কে লেখ।

উ : গ্রন্থের প্রথম দিকের পৃষ্ঠা ছিন্ন থাকায় এর নাম পাওয়া যায় নি। তবে সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ব্রজসুন্দর সান্যাল রচিত 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি' ইতিবৃত্ত আচার্যের 'বিদ্যাপতি' ও 'চণ্ডীদাস' অবলম্বনে এর নাম দেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। এতে 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ'ও বলা হয়।

প্র : গ্রন্থটি কবে প্রকাশিত হয়?

উ : ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে (১৩২৩ বঙ্গাব্দে) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

প্র : 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের লিপিকাল সম্পর্কে লেখ।

উ : 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের প্রাচীনত্ব নিয়ে নিঃসন্দেহ হলেও এর লিপিকাল নিয়ে মতান্তর আছে। সুকুমার সেন লিখেছেন : 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন [প্রাপ্ত] পুথি প্রাচীন নয় তবে ভাষায় প্রাচীনত্বের ছাপ আছে এবং কাব্যটির শিল্প অবশ্যই প্রাচীন।' প্রত্নলিপিবিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন : 'নানা প্রত্নলিপির সঙ্গে পুথির লিপির মিল দেখে মনে হয় এ পুথি চতুর্দশ শতাব্দীর লেখা।' মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ লিখেছেন : 'গ্রন্থটির লিপিকাল আনুমানিক ১৪০০ খ্রিষ্টাব্দ, বড়ু চণ্ডীদাস ইহার পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন।' সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন : 'বইখানির ভাষা খুঁটিয়ে আলোচনা করে আমার এই ধ্রুব বিশ্বাস দাঁড়িয়েছে যে, এর ভাষা ১৪০০ বা ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দের এ ধারে কিছুতেই হতে পারে না।'

প্র : 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে রাধা-কৃষ্ণের কাহিনি কতটুকু বর্ণিত?

উ : কৃষ্ণের পূর্বরাগ থেকে আরম্ভ করে প্রেমে নিমজ্জিত ও কৃষ্ণ-কাতর রাধাকে পরিত্যাগ করে কৃষ্ণের মধুরায় গমন পর্যন্ত।

প্র : 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য কয় খণ্ডের?

উ : ১৩ খণ্ডে। খণ্ডগুলো : জন্ম খণ্ড, তাম্বুল খণ্ড, দান খণ্ড, নৌকা খণ্ড, ভার খণ্ড, ছত্র খণ্ড, বৃন্দাবন খণ্ড, কালিয়দমন খণ্ড, যমুনা খণ্ড, হার খণ্ড, বাণ খণ্ড, বংশী খণ্ড, বিরহ খণ্ড।

প্র : 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের প্রতিটি খণ্ডের কাহিনি সংক্ষেপে লেখ।

উ : **জন্ম খণ্ড** : এই খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে, কৃষ্ণ ও রাধা উভয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছায় মর্ত্যে মানবরূপে জন্ম নিয়েছে। কৃষ্ণ পাপী কংস রাজাকে বধ করার জন্য দেবকী ও বসুদেবের সন্তান হিসেবে জন্ম নেয়। কিন্তু রাজপুত্র বাসুদেব গোপনে কৃষ্ণকে অনেক কষ্টসাধ্য বৃন্দাবনে রেখে আসে। সেখানেই দৈব ইচ্ছায় রাধাকে গোপ সাগর গোয়ালার স্ত্রী পদ্মার গর্ভে জন্ম নেয় রাধা। দৈব নির্দেশেই বালিকা বয়সে নবপুংসক (ক্লীব) অভিমন্যু বা আইহন বা আয়ান গোপের (ঘোষের) সঙ্গে রাধার বিয়ে হয়। আয়ান গোচারণ করতে গেলে বৃদ্ধা পিসি বড়ায়িকে রাধার তত্ত্বাবধানে রাখা হয়।

তাম্বুল খণ্ড : তাম্বুল অর্থ পান। রাধা ঘর থেকে বের হয়ে অন্য গোপীদের সঙ্গে মথুরাতে দই-দুধ বিক্রি করতে যায়। বড়ায়িও যায় তার সঙ্গে। বৃদ্ধা বড়ায়ি পথে রাধাকে হারিয়ে ফেলে এবং কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করে (রাধার রূপের বর্ণনা দিয়ে), এমন রূপসীকে দেখেছে কিনা। এই রূপের বর্ণনা শুনে রাধার প্রতি কৃষ্ণ পূর্বরাগ অনুভব করে। সে বড়ায়িকে বুঝিয়ে রাধার জন্য পান ও ফুলের উপহারসহ প্রস্তাব পাঠায়। কিন্তু বিবাহিতা রাধা সেই উপহার পদদলিত করে।

দান খণ্ড : এই খণ্ডে দই-দুধ বিক্রির জন্য মথুরাগামী রাধা ও গোপীদের পথ রোধ করে কৃষ্ণ। তার দাবি নদীর ঘাটে পারাপার-দান বা শুল্ক দিতে হবে, তা না হলে রাধার সঙ্গে মিলিত হতে দিতে হবে। রাধা কোনোভাবেই এ প্রস্তাবে রাজি নয়। এদিকে তার হাতে কড়িও নেই। সে নিজের রূপ কমাবার জন্য চুল কেটে ফেলতে চাইল; কৃষ্ণের হাত থেকে বাঁচবার জন্য বনে দৌড় দিল। কৃষ্ণ পিছু ছাড়বার পাত্র নয়। অবশেষে কৃষ্ণের ইচ্ছায় কর্ম হয়।

নৌকা খণ্ড : এরপর থেকে রাধা কৃষ্ণকে এড়িয়ে চলে। কৃষ্ণ নদীর অধিকর ঘনশ্যাম ধারণ করে। একজন পার করা যায় এমন একটি নৌকাতে রাধাকে তুলে সে মাঝ নদীতে নিয়ে নৌকা ডুবিয়ে দেয় এবং রাধার সঙ্গ লাভ করে। নদীতীরে উঠে লোকলজ্জার ভয়ে রাধা সখীদের সঙ্গে যে, নৌকা ডুবে গিয়েছে, কৃষ্ণ না থাকলে সে নিজেও মরত, কৃষ্ণ তার জীবন বাঁচিয়েছে।

ভার খণ্ড : শরৎকাল। তবুনো পসরাটি মেঁটেই মথুরাতে গিয়ে দুধ-দই বিক্রি করা যায়। কিন্তু রাধা আর বাড়ির বাইরে আসে না। শাশুড়ি বা ননদীকেও সে জাগের ঘটনাগুলো ভয়ে ও লজ্জায় খুলে বলে নি। রাধা অদর্শনে কৃষ্ণ কাতর। সে বড়ায়িকে দিয়ে রাধাকে শাশুড়িকে বোঝায়, ঘরে বসে থেকে কি হবে, রাধা দুধ-দই বেচে কড়ি পয়সা তো আনতে পারে। শাশুড়ির নির্দেশে রাধা বাইরে বের হয়। কিন্তু প্রচণ্ড রোদে কোমল শরীরে মুখ-দই বহন করতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এ সময় কৃষ্ণ ছদ্মবেশে মজুরি করতে আসে। পরে ভার বহন অর্থাৎ মজুরির বদলে রাধার আলিঙ্গন কামনা করে। রাধা এই ছদ্মবেশ বুঝতে পারে। সেও কাজ আদায়ের লক্ষ্যে মিথ্যে আশ্বাস দেয়। কৃষ্ণ আশায় আশায় রাধার পিছু পিছু ভার নিয়ে মথুরা পর্যন্ত চলে।

ছত্র খণ্ড : দুধ-দই বেচে মথুরা থেকে এবার ফেরার পালা। কৃষ্ণ তার প্রাপ্য আলিঙ্গন চাইছে। রাধা চালাকি করে বলে, 'এখনো প্রচণ্ড রোদ। তুমি আমাদের মাথায় ছাতা ধরে বৃন্দাবন পর্যন্ত চলো। পরে দেখা যাবে।' কৃষ্ণ ছাতা ধরতে লজ্জা ও অপমান বোধ করছিল। তবু আশা নিয়ে কৃষ্ণ ছাতা ধরেই চলল। কিন্তু তার আশাপূর্ণ করে নি রাধা।

বৃন্দাবন খণ্ড : রাধার বিরুদ্ধ মনোভাব কৃষ্ণকে ভাবান্তর ঘটায়। সে অন্য পথ অবলম্বন করে। নিজে কটু বাক্য বলে না, দান বা শুল্ক আদায়ের নামে বিড়ম্বনা করে না, বরং বৃন্দাবনকে অপূর্ব শোভায় সাজিয়ে তুলল। রাধা ও গোপীরা সেই শোভা দর্শন করে কৃষ্ণের উপর রাগ ভুলে যায়। তারা পরিবর্তিত কৃষ্ণ দেখতে আগ্রহ দেখায়। কৃষ্ণ সব গোপীকে দেখা দেয়।

Scanned with CamScanner

কালিয়দমন খণ্ড : যমুনা নদী বৃন্দাবনের উপর দিয়ে প্রবাহিত। সেখানে কালিয়নাগ বাস করে। তার বিষে সেই জল বিষাক্ত। কৃষ্ণ কালিয়নাগকে তাড়াতে নদীর জলে ঝাঁপ দেন। দৈব ইচ্ছায় ও কৃষ্ণের কীর্তনে কালিয়নাগ পরাস্ত হয় এবং দক্ষিণ সাগরে বসবাস করতে যায়। কালিয়নাগের সঙ্গে কৃষ্ণ যখন জলযুদ্ধে লিপ্ত তখন রাধার বিশেষ কাতরতা প্রকাশ পায়।

যমুনা খণ্ড : রাধা ও গোপীরা যমুনাতে জল আনতে যায়। কৃষ্ণ যমুনার জলে নেমে হঠাৎ ডুব দিয়ে আর ওঠে না। সবাই মনে করে কৃষ্ণ ডুবে গেছে। এদিকে কৃষ্ণ লুকিয়ে কদম গাছে বসে থাকে। রাধা ও সখীরা জলে নেমে কৃষ্ণকে খুঁজতে থাকে। কৃষ্ণ লীলাচ্ছলে রাধার চুলে রাধা হার চুরি করে আবার গাছে গিয়ে বসে।

হার খণ্ড : পরে কৃষ্ণের চালাকি বোঝা যায়। হার না পেয়ে রাধা কৃষ্ণের পালিতা মা যশোদার কাছে নালিশ করে। কৃষ্ণও মিথ্যা বলে মাকে। সে বলে, আমি হার চুরি করব কেন, রাধাতো পাড়ার সম্পর্কে আমার মামি। এদিকে বড়ায়ি সব বুঝতে পারে এবং রাধার স্বামী আয়ান হার হারানোতে যাতে রাগান্বিত বা ক্ষুব্ধ না-হয় সেজন্য বলে যে, বনের কাঁটায় রাধার গজমোতির হার ছিন্ন হয়ে হারিয়ে গেছে।

বাণ খণ্ড : মায়ের কাছে নালিশ করায় কৃষ্ণ রাধার উপর ক্রুদ্ধ। রাধাও কৃষ্ণের প্রতি প্রসন্ন নয়। বড়ায়ি বুদ্ধি দিলো, কৃষ্ণ যেন শক্তির পথ পরিহার করে মদনবাণ বা প্রেমে রাধাকে বশীভূত করে। সে মতো কৃষ্ণ পুষ্পধনু নিয়ে কদমতলায় বসে। রাধা কৃষ্ণের প্রেমবাণে মূর্ছিত ও পতিত হয়। এরপর কৃষ্ণ রাধাকে চৈতন্য ফিরিয়ে দেয়। রাধা কৃষ্ণপ্রেমে কাতর হয় এবং কৃষ্ণকে খুঁজে ফেরে।

বংশী খণ্ড : রাধাকে আকৃষ্ট করার জন্য সময়-অসময়ে কৃষ্ণ বাঁশিতে সুর তোলে। কৃষ্ণের বাঁশি শুনে রাধার রান্না এলোমেলো হয়ে যায়, মন কুমারের চুল্লির মতো পুড়তে থাকে, রাত্রে ঘুম আসে না, ভোরবেলা কৃষ্ণ অদর্শনে রাধা মূর্ছা যায়। বড়ায়ি রাধাকে পরামর্শ দেয়, সারারাত বাঁশি বাজিয়ে সকালে কদমতলায় কৃষ্ণ বাঁশি শিয়রে রেখে ঘুমায়। তুমি সেই বাঁশি চুরি কোরো। তাহলেই সমস্যার সমাধান। রাধা তাই করে। কৃষ্ণ বুদ্ধিমান। বাঁশি চোর কে তা বুঝতে তার কষ্ট হয় না। তবে কৃষ্ণকে বলে, বড়াইকে সাক্ষী রেখে রাধার কথার অবাধ্য হলে না সে কৃষ্ণকে ত্যাগ করে যাবে না, তাহলেই বাঁশি সন্ধান মিলতে পারে। কৃষ্ণ কথা দেয়, বাঁশি ফিরে পায়।

বিরহ খণ্ড : কৃষ্ণ তারপরও রাধার উদাসীন। এদিকে মধুমাস সমাগত। রাধা বিরহ অনুভব করে। মধু-নই বিক্রির ছলে কৃষ্ণকে এনে দিতে। দুধ-নই বিক্রির ছলে করে রাধা নিজেও কৃষ্ণকে খোঁজার জন্য বের হয়। অবশেষে বৃন্দাবনে বাঁশি বাজানো অবস্থায় কৃষ্ণকে পাওয়া যায়। কৃষ্ণ রাধাকে বলে, 'তুমি আমাকে অনেক সময় লাঞ্ছনা করেছো, ভার বাড়িয়েছো, মায়ের কাছে আমার নামে বিচার দিয়েছো, তাই তোমার উপর আমার মন উঠে গেছে।' রাধা বলে, 'তখন আমি বালিকা ছিলাম, আমাকে ক্ষমা করো। আমি তোমার বিরহে মৃতপ্রায়। তিথির দূরত্ব হলেও তুমি আমার দিকে তাকাও।' কৃষ্ণ বলে, 'বড়ায়ি যদি আমাকে বলে যে তুমি রাধাকে প্রেম দাও, তাহলে আমি হয়তো অনুরোধ রাখতে পারি।' অবশেষে বড়াই রাধাকে সাজিয়ে দেয় এবং রাধাকৃষ্ণের মিলন হয়। রাধা ঘুমিয়ে পড়লে কৃষ্ণ নিদ্রিতা রাধাকে রেখে কংস বধ করার জন্য মথুরাতে চলে যায়। ঘুম থেকে উঠে কৃষ্ণকে না দেখে রাধা আবার বিরহকাতর হয়। রাধার অনুরোধে বড়াই কৃষ্ণের সন্ধানে যায় এবং মথুরাতে কৃষ্ণকে গোপীর অনুরোধ করে, 'রাধা তোমার বিরহে মৃতপ্রায়। তুমি উন্মাদিনীকে বাঁচাও।' কিন্তু কৃষ্ণ বৃন্দাবনে যেতে চায় না, রাধাকে গ্রহণ করতে চায় না। কৃষ্ণ বলে, আমি সব ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু কটুকথা সহ্য করতে পারি না। রাধা আমাকে কটুকথা বলেছে। ('শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য এখানে ছিন্ন। পৃষ্ঠা পাওয়া যায় নি। তাই এ গ্রন্থ সমাপ্তি কেমন তা জানা যায় না।)

প্র : 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে গ্রামীণজীবনের কী পরিচয় পাওয়া যায়?

উ : 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য মূলত খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে লেখা। তখন বাংলায় গ্রাম ও শহরের পত্তন ঘটতে শুরু করে। বিশেষত হাট বা বেচাকেনার স্থানকে কেন্দ্র করে একদল মানুষ বাণিজ্যকেন্দ্রিক বসত গড়তে থাকে। তারপরও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রামজীবনই মুখ্য। কাব্যের ১৩টি খণ্ডে যে গ্রামের বর্ণনা, পথ বর্ণনা, দাতাপাতানিসর্গ বর্ণনা, কলহ-তামাশের কথা, তৈজসপত্রের তালিকা, ধেনুকুলের বিবরণ, সীমির কথা সবই গ্রামজীবনকেই মূর্ত করে। তাছাড়া মানুষের জীবিকার অবলম্বনও কৃষি বা কৃষিসংশ্লিষ্ট বিষয়। ফলে এ কথা বলা প্রাসঙ্গিক হবে যে, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে বাংলার গ্রামজীবনের চমৎকার পরিচয় আছে।

প্র : মধ্যযুগের বাংলায় প্রধান সাহিত্যধারা কী কী?

উ : বৈষ্ণব সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, শাক্তপদ, অনুবাদ সাহিত্য, নাথ সাহিত্য, জীবনী সাহিত্য বা চরিত সাহিত্য, লোক সাহিত্য ধারা ইত্যাদি।

প্র : মধ্যযুগের সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?

উ : ধর্মকেন্দ্রিকতাই মুখ্য, মানবতাসহ সব কিছুই গৌণ।

প্র : এই যুগে কোন সাহিত্যধারা ব্যতিক্রম? কেন?

উ : লোকসাহিত্য ধারা। কারণ, এই ধারায় ধর্ম বা দেব-দেবী নয়, মানুষের গুরুত্ব অধিক এবং তার প্রণয় ও কামনাকে মুখ্য বিবেচনা করা হয়েছে।

প্র : 'কানু ছাড়া গীত নাই' – কোন যুগে সত্য ছিল?

উ : মধ্যযুগে।

প্র : 'কানু' কে?

উ : কৃষ্ণ।

প্র : মধ্যযুগের সাহিত্যের ধারাগুলোর মধ্যে কোন ধারা পরিমাণে ও গুণে সমৃদ্ধ?

উ : বৈষ্ণব সাহিত্যধারা।

শ্রীচৈতন্যদেব ও বৈষ্ণব পদাবলি

প্র : কোন মহাপুরুষ বাংলা সাহিত্যে একটি পঙ্‌ক্তি না লিখলেও তাঁর নামে একটি যুগের সৃষ্টি হয়েছে?

উ : শ্রীচৈতন্যদেব।

প্র : চৈতন্যদেবের জন্ম ও মৃত্যু সাল লেখ।

উ : জন্ম ১৪৮৬ খ্রিষ্টাব্দ, নবদ্বীপ; মৃত্যু ১৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দ, পুরী।

প্র : শ্রীচৈতন্যদের পিতৃদত্ত নাম কী ছিল?

উ : বিশ্বম্ভর মিশ্র। ডাকনাম নিমাই।

প্র : শ্রীচৈতন্য স্মরণীয় কেন?

উ : সামন্তযুগের অনুদার মতাদর্শকে অস্বীকার করেই তিনি প্রচার করলেন জীবে দয়া, ঈশ্বরে ভক্তি এবং সকলের অধিকার। তাঁর কল্যাণেই বাঙালির স্বাজাত্যবোধ ও নিজসংস্কৃতি রক্ষিত হয়।

প্র : বৈষ্ণব সাহিত্য কত প্রকার ও কী কী?

উ : ৩ প্রকার। জীবনীকাব্য, বৈষ্ণবলগ্ন ও পদাবলি।

প্র : কার জীবনী রচনার মধ্য দিয়ে বাংলার জীবনীসাহিত্য রচনা আরম্ভ হয়?

উ : শ্রীচৈতন্যদেবের।

প্র : বাংলায় চৈতন্যদেবের প্রথম জীবনীগ্রন্থের নাম কী?

উ : বৃন্দাবন দাস রচিত 'চৈতন্য-ভাগবত'।

প্র : চৈতন্য-ভাগবতের পরিচয় দাও।

উ : বাংলা ভাষায় শ্রী চৈতন্যদেবের প্রথম জীবনী গ্রন্থ হলো বৃন্দাবন দাস রচিত 'চৈতন্য-ভাগবত'। নিত্যানন্দ প্রভুর উৎসাহে চৈতন্যদেবের মৃত্যুর (১৫৩৩ খ্রি.) পনের বছরের মধ্যেই গ্রন্থটি রচিত বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন। চৈতন্যদেবের জীবিত অনুচরদের মুখ থেকে তথ্য বৃত্তান্ত সংগ্রহ করে এই জীবনী রচিত হয়েছিলো বলে গ্রন্থটি প্রামাণিক। তবে চৈতন্যদেবকে নিয়ে ভক্ত সমাজে প্রচলিত অলৌকিক কাহিনির মিশ্রণও এতে যথেষ্ট দেখা যায়। এই গ্রন্থে স্বচ্ছ ও প্রাঞ্জল পয়ার ছন্দে কবি চৈতন্য-কথা বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন সমকালীন পূজা-অর্চনা রীতি, টোল শিক্ষাব্যবস্থার স্বরূপ, হিন্দু-মুসলিম পারস্পরিক সম্পর্ক, উভয় ধর্মীয় সমাজের পারস্পরিক প্রভাব, বৈষ্ণব সমাজের মত ও ভেদ, মানুষের স্বাভাবিক জীবনাচরণ ইত্যাদি। গোপাল হালদারের মতে, "একালে যাকে আমরা বলি Human interest মানব-রস, 'চৈতন্য-ভাগবতে' তার অভাব নেই। এখানেই এ কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব"। এটি প্রায় পঁচিশ হাজার পঙ্‌ক্তি বিশিষ্ট। তিন খণ্ডে শ্রীচৈতন্যের বাল্যকাল হতে গয়াধাম থেকে প্রত্যাগমন পর্যন্ত মোট

2020/5/11 13:04
Scanned with CamScanner

পনেরটি অধ্যায় রয়েছে এখানে। মধ্যখণ্ডে সাতাশটি অধ্যায়ে শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণ পর্যন্ত বর্ণিত। আর অন্ত্যখণ্ডে মোট কুড়িটি অধ্যায়ে ওড়িষ্যাযাত্রা মহোৎসব পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থের পদসমূহে রাধারাণীর ও উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্র : বাংলায় চৈতন্যদেবের দ্বিতীয় জীবনীগ্রন্থের নাম কী?

উ : লোচন দাসের 'চৈতন্য-মঙ্গল'।

প্র : বাংলা ভাষায় অদ্বিতীয় ও সর্বাপেক্ষা তথ্যবহুল চৈতন্যজীবনী কোনটি?

উ : কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য-চরিতামৃত' (১৬১৫)।

প্র : বাংলা সাহিত্যে কোন সময়কে চৈতন্যযুগ বলে?

উ : ১৫০০ থেকে ১৭০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

প্র : কড়চা বলতে কী বোঝায়?

উ : কড়চা কথাটির আধুনিক অর্থ দাঁড়িয়েছে দিনলিপি বা ডায়ারি। তবে মুরারি গুপ্ত ও স্বরূপ দামোদরের কল্যাণে চৈতন্যজীবনী গ্রন্থ কড়চা বলে অভিহিত হয়। তাঁরা চৈতন্যজীবন কাহিনি স্মৃতিকে পরিবেশন করে কড়চা বলে নির্দেশ করেছেন। এ কারণে কেউ কেউ চৈতন্য জীবনগ্রন্থকে কড়চা বলে অভিহিত করেন। সুকুমার সেনের মতে, "কড়চা শব্দটি আসিয়াছে প্রাকৃত 'কটকাচ্চ', সংস্কৃত 'কৃতকৃতা' হইতে। 'ভট' শব্দটি প্রাচীন অনুশাসনে 'খসড়া লেখা' (original draft) অর্থেই পাওয়া গিয়াছে। কড়চার অর্থও এই মুখপত্রির অনুরূপ-বসড়া রচনা, স্মারকলিপি, সংক্ষিপ্ত বক্তব্য।" অতএব বোঝা যাচ্ছে দিনলিখন বা বসড়া লেখা কড়চা হিসাবে অধিক পরিচিত হলেও চৈতন্যজীবনীর সংস্পর্শে সংশ্লিষ্ট হয়ে এর অর্থ ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্র : ষড়গোস্বামী বলতে কাদের বোঝায়?

উ : শ্রীচৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষ শিষ্য এবং পরম ভক্তদের মধ্যে ছয়জনকে ষড়গোস্বামী বলা হয়। এঁরা হলেন : রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, রঘুনাথ দাস গোস্বামী, গোপাল ভট্ট গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, রূপ গোস্বামী ও জীব গোস্বামী। শ্রীচৈতন্যের নির্দেশে তাঁরা বৃন্দাবনে বসবাস করে চৈতন্যভক্তির ফোনিলতাকে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকাঠামোয় ও কিছু অনুশাসন সমন্বিত ধর্মমতে রূপ দেন। যেহেতু তাঁরা বৃন্দাবনে বাস করতেন, সেহেতু তাঁদের বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীও বলা হয়। কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে ছয় গোঁসাই বা 'ষড়গোস্বামী' কথাটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় এভাবে : "শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। / শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ।/ ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন।/যাহা হৈতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ।'

প্র : 'ধূয়া' কাকে বলে?

উ : একটানা নির্দিষ্ট স্তরে একটি পদ গান করলে তাকে 'ধূয়া' বলে। শব্দটি ধ্রুবক > ধ্রুঅঅ > ধূআ > ধূয়া। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে প্রত্যেক অধ্যায়ের সূচনায় নির্দিষ্ট সুর-তাল-লয়ে গেয় একটি পদ থাকত। ওই ধ্রুব পদটিকে ধূয়া বলে।

প্র : গৌরচন্দ্রিকা কাকে বলে?

উ : রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পালাগানের ভূমিকা রূপে গৌরাঙ্গের জীবনেও অনুরূপ ঘটনার অনুবর্তন হয়েছিল তা স্মরণ করে রচিত গৌরলীলার পদকেই বলে গৌরচন্দ্রিকা।

প্র : গৌরচন্দ্রিকার শ্রেষ্ঠ পদকর্তা কে?

উ : গোবিন্দ দাস।

প্র : বৈষ্ণব পদাবলিকে কী কী পর্যায়ে ভাগ করা হয়?

উ : বৈষ্ণব পদাবলির পর্যায়গুলি হলো- পূর্বরাগ, অভিসার, মিলন, মানবিরহ, মাথুর, ভাবসম্মিলন, আক্ষেপানুরাগ, নিবেদন, প্রার্থনা প্রভৃতি।

প্র : বাংলায় বৈষ্ণবধর্ম কীভাবে প্রচারিত হয়েছিল?

উ : ভাগবতধর্ম বা প্রাচীন বৈষ্ণবধর্ম মধ্যযুগে বাংলায় প্রবেশ করেছিল। নবদ্বীপ-শান্তিপুর অঞ্চলে অদ্বৈতাদি পণ্ডিতগণ গোপনে এই ধর্মাচরণ করতেন। পরে চৈতন্যদেব এই ধর্মের নতুন তাৎপর্য দিয়ে তা সারা দেশে প্রচার করেন।

প্র : বৈষ্ণব পদাবলির প্রথম পদকর্তা কাকে বলা যায়?

উ : বাঙালি কবি জয়দেবকে বৈষ্ণব পদাবলির প্রথম পদকর্তা বলা হয়। রাধাকৃষ্ণের

প্রেমলীলা অবলম্বনে রচিত 'গীতগোবিন্দম' কাব্যটি আদি বৈষ্ণব পদাবলির নিদর্শন। তবে তা বাংলা ভাষায় নয়, সংস্কৃতে।

প্র : 'মৈথিল কোকিল' বলতে কাকে বোঝায় ও কেন?

উ : 'মৈথিল কোকিল' বলতে মিথিলার কবি বিদ্যাপতিকে বোঝায়। কোকিল যেমন সুললিত সুমধুর গান গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করে, বিদ্যাপতিও মিথিলার রাজসভার কবি ছিলেন বলে তাঁকে 'মৈথিল কোকিল' বলা হয়।

প্র : পূর্বরাগ কাকে বলে? পূর্বরাগের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা কে?

উ : রূপ গোস্বামী 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে পূর্বরাগের সংজ্ঞার্থে বলেছেন- মিলনের পূর্বে দর্শন, নাম শ্রবণ প্রভৃতি দ্বারা নায়ক-নায়িকার মনে পরস্পরের প্রতি যে অনুরাগ জন্মে, তাকে বলে পূর্বরাগ। পূর্বরাগের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা চণ্ডীদাস।

প্র : বৈষ্ণব পদাবলিতে অভিসার কাকে বলে?

উ : প্রেমিক বা প্রেমিকা যখন গোপনে কোনো একটা নির্দিষ্ট স্থানে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য যাত্রা করে, তখন তাকে অভিসার বলে। বৈষ্ণব পদাবলিতে কৃষ্ণের নিজে রাধার অভিযাত্রা নিয়েই অধিকাংশ অভিসার পদ রচিত হয়েছে।

প্র : বৈষ্ণব পদাবলিতে কতপ্রকার অভিসার আছে এবং কী কী?

উ : বৈষ্ণব পদাবলিতে আট প্রকার অভিসারের কথা বলা হয়েছে। যথা- জ্যোৎস্নাভিসার, তামসীঅভিসার, বর্ষাভিসার, দিবাভিসার, উন্মাদিকাভিসার, তীর্থযাত্রাভিসার, তীর্থযাত্রাভিসার, তীর্থযাত্রাভিসার, সঙ্কেতাভিসার।

প্র : 'বিরহ' কাকে বলে?

উ : বৈষ্ণব পদাবলিতে 'বিরহ' প্রেমেরই একটি বিশেষ পর্যায় যা পূর্ণ করে তোলে মিলনের আনন্দধারাকে। রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে সাময়িক বিচ্ছেদজনিত অবস্থাকে বিরহ বলা হয় যা বৈষ্ণব পদাবলির ভাষায় 'বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার' নামে পরিচিত।

প্র : প্রেমবৈচিত্ত্য কাকে বলে?

উ : প্রেমাবিষ্ট হৃদয়ের একটি বিশিষ্ট ভাবকে প্রেমবৈচিত্ত্য বলা হয়। প্রেমিকের নিবিড় সান্নিধ্যে থাকা সত্ত্বেও প্রেমিকার মনে হয় এই বুঝি প্রেমিক চলে যাচ্ছেন, কিংবা প্রেমিককে তিনি হারাচ্ছেন। এই সংশয়পূর্ণ অনুভূতি হল 'প্রেমবৈচিত্ত্য'।

প্র : 'মাথুর' কাকে বলে?

উ : 'মাথুর' শব্দটি এসেছে 'মথুরা' শব্দ থেকে। 'মাথুর' পদাবলি চির বিরহের আর্তিমূলক পদাবলি। কংসাসুর বধের জন্য কৃষ্ণ তার প্রিয় লীলাভূমি বৃন্দাবন ত্যাগ করে মথুরায় চলে গেলেন। রাধার সঙ্গে তাঁর আর দেখা হয় না। কৃষ্ণকে হারিয়ে রাধা বেদনার করুণ ক্রন্দনে ভেঙে পড়েছেন, এ বিষয় নিয়ে রচিত হয় মাথুর পদাবলি।

প্র : বিরহের সঙ্গে মাথুরের পার্থক্য কী?

উ : বিরহ হলো রাধাকৃষ্ণের মধ্যে সাময়িক বিচ্ছেদ আর মাথুর চিরবিচ্ছেদ। বৈষ্ণব ও মাথুর উভয় পর্যায়ের পদাবলি আছে।

প্র : 'ভাবসম্মিলন' কাকে বলে?

উ : ভাবসম্মিলন বলতে ভাবলোকের সম্মিলন বোঝায়। কৃষ্ণ রাধাকে ত্যাগ করে কংসদমনার্থে চিরতরে মথুরায় চলে যান। রাধা মনে মনে কল্পনা করে নিয়েছেন যে কৃষ্ণের সঙ্গে ভাবলোকে চলছে তাঁর নিরবচ্ছিন্ন নিত্যমিলন। একেই বলে ভাবসম্মিলন।

প্র : বৈষ্ণব পদাবলিতে 'ভণিতা' কাকে বলে?

উ : প্রাচীন কাব্যে কবিতার শেষে কবিরা নিজের নাম যোজনা করে আত্মপরিচয় দিতেন। বৈষ্ণব পদাবলিতে এই রীতি অনুসৃত। বৈষ্ণব পদাবলিতে কবি পদের শেষে নিজের নামের উল্লেখ করে যে পরিচয় দেন, তাকেই বলা হয় ভণিতা। ভণিতার সাহায্যে পদাবলির কবিকে চিনে নেওয়া যায় এবং তাঁর বৈশিষ্ট্য অনুভব করা যায়।

প্র : বৈষ্ণব পদাবলিতে নায়িকা কাকে বলে? নায়িকার কয়টি অবস্থা এবং কী কী?

উ : বৈষ্ণব পদাবলিতে কৃষ্ণের প্রধান প্রেমিকা শ্রীরাধাকে নায়িকা বলা হয়। বৈষ্ণব পদাবলিতে নায়িকার আটটি অবস্থা। যথা-অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা ও স্বাধীনভর্তৃকা।

Scanned with CamScanner

প্র : 'সমধী' নায়িকা বলতে কী বোঝায়? বৈষ্ণব রসশাস্ত্র অনুসারে এই নায়িকা কে?

উ : যে নায়িকা অন্যের থেকে স্বকীয়তায় এবং যাঁর প্রতিও যুগল আছে একমাত্র কৃষ্ণবল্লভা রাধাতে এবং যেখানে কৃষ্ণ বশীভূত, তাকে বলা হয় 'সমধী' নায়িকা। বৃন্দাবনের রাধিকা, ললিতা, বিশাখা, চন্দ্রাবলি সমধী নায়িকা, এঁদের মধ্যে রাধিকা হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ।

প্র : 'খণ্ডিতা' কী?

উ : নায়িকা সজ্জিতা করে সারারাত কুঞ্জবনে নায়কের জন্য প্রতীক্ষারত। নায়ক প্রতিনায়িকার সঙ্গসুখ নিশিযাপন করে প্রভাতে নায়িকার নিকট আগমন করলে নায়িকা অত্যন্ত কুপিতা হন। এই অবস্থাকে বলা হয় 'খণ্ডিতা'।

প্র : 'রাগানুগা ভক্তি' কাকে বলে?

উ : গোপীদের ভক্তির অনুসরণে অন্যতা যখন কৃষ্ণকে ভক্তি করেন, তাকে 'রাগানুগা ভক্তি' বলে।

প্র : সহজিয়া বৈষ্ণব দর্শন কাকে বলে?

উ : সহজিয়া বৈষ্ণব দর্শন একটি দার্শনিক মতবাদ যা সহজিয়া বৌদ্ধদর্শন থেকে জাত। সহজিয়া পন্থিগণ গুরু ও সাধনসঙ্গিনীকে রাধাকৃষ্ণ রূপে উপাসনা করেন। অনেকে বলেন- গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে বিকৃতি ঘটাবার ফলে সহজিয়া বৈষ্ণব দর্শনের উদ্ভব হয়েছিল।

মঙ্গলকাব্য

প্র : মঙ্গলকাব্য বলতে কী বোঝায়?

উ : মানুষের বিশ্বাস মতে, দেবদেবীর মাহাত্ম্য নির্ভর যে কাব্য রচনা, পাঠ ও শ্রবণ করলে নিজের, প্রতিবেশীর ও সমাজের মঙ্গল বা কল্যাণ সাধন হয় তাকে মঙ্গলকাব্য বলে। পনের থেকে আঠারো শতকের শেষ অবধি এই ধারার কাব্য বাংলায় রচিত হয়।

প্র : মঙ্গলকাব্যের প্রধান শাখা কয়টি ও কী কী?

উ : ৩টি। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল।

প্র : একটি সম্পূর্ণ মঙ্গলকাব্যে সাধারণত কয়টি অংশ থাকে?

উ : ৫টি। বন্দনা, আত্মপরিচয়া, দেবখণ্ড, মর্ত্যখণ্ড, শ্রুতিফল।

প্র : মঙ্গলকাব্যে কতজন কবির সন্ধান পাওয়া যায়?

উ : ৬২ জন।

প্র : মঙ্গলকাব্যের সাধারণ লক্ষণগুলি উল্লেখ কর।

উ : (১) প্রায় সব কবি স্বপ্নে দেবতার নির্দেশ পেয়ে কাব্যরচনা করেছেন। (২) আত্মসর্বসিদ্ধিদাতা গণেশের বন্দনা। (৩) কাব্যের অধিকাংশে ঘটনা সংস্থান অসাধারণ। (৪) মঙ্গলকাব্যের নায়িকারা সবাই শাপভ্রষ্টা দেবকন্যা। শাপান্তে স্বর্গে ফিরে যান। (৫) মর্ত্যে পূজা প্রচারে সময় দেবতাদের আচরণ মানুষের মতো।

প্র : বিষয়বস্তু অনুসারে মঙ্গলকাব্যকে কয়টি ধারায় বিভক্ত করা যায়?

উ : দুটি। একটি খাঁটি মঙ্গলকাব্যের ধারা, অপরটি পুরাণানুগ ধারা। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ও কালিকামঙ্গল প্রথম ধারায় অন্তর্ভুক্ত। অপ্রধান শ্রেণি হিসেবে শীতলামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, রায়মঙ্গল, বাসলীমঙ্গল প্রভৃতি। দ্বিতীয় ধারাটি বিষ্ণু পুরাণকেন্দ্রিক; যেমন-দেবীভাগবত, চণ্ডিকাবিজয়, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী, গৌরীমঙ্গল ও গঙ্গামঙ্গল প্রভৃতি।

প্র : মঙ্গলকাব্যের উদ্ভবের প্রেক্ষাপট কী?

উ : মঙ্গলকাব্যের অধিকাংশ দেবদেবী অনার্য গোষ্ঠীভুক্ত আদিম লোকায়ত সমাজের। বাংলার গ্রামীণ পরিবেশে ও সমাজে এঁদের উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা। অস্ট্রিকদের দেবী হচ্ছে শিবের মানসকন্যা মনসা, অনার্য কৃষি জাতির দেবী চণ্ডী হলেন শিবের পত্নী। সূর্যদেবতা হলেন কূর্মরূপী ধর্মঠাকুর।

প্র : 'সুকবি বল্লভ' কার উপাধি ছিল? তাঁর কাব্যের নাম কী ছিল?

উ : কবি নারায়ণ দেবের উপাধি ছিল 'সুকবি বল্লভ'। তাঁর কাব্যের নাম 'পদ্মাপুরাণ'।

প্র : মনসামঙ্গলের একমাত্র পশ্চিমবঙ্গীয় কবির নাম কী? তাঁর কাব্যের নাম কী? কাকে বেশি পরিচিতির কারণ কী?

উ : কবির নাম কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ। তাঁর কাব্যের নাম 'কেতকাপুরাণ'। ক্ষেমানন্দ মনসামঙ্গল সর্বপ্রথম (১৮৪৪ খ্রি.) মুদ্রণ সৌভাগ্য লাভ করে। এজন্য উনিশ শতকের বাঙালি শিক্ষিত সমাজে তাঁর সবচেয়ে বেশি পরিচিতি ছিল।

প্র : চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কোন কবিকে প্রথম 'স্বভাবকবি' বলা হয়?

উ : চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারায় কবি দ্বিজমাধবকে 'স্বভাবকবি' বলা হয়?

প্র : মঙ্গলকাব্যের মূলত প্রধান কবির নাম উল্লেখ করে শ্রেষ্ঠ কবির নাম লেখ।

উ : মঙ্গলকাব্যের মূলত প্রধান কবি রূপরাম চক্রবর্তী ও ঘনরাম চক্রবর্তী। শ্রেষ্ঠ কবি ঘনরাম চক্রবর্তী।

প্র : 'বারোশী' কাকে বলে?

উ : 'বারোশী' বলতে বোঝায় বাইশজন কবি রচিত মনসামঙ্গলের বিভিন্ন অংশের গায়েনরা কাহিনির সংকলন। কাব্যধারাটিকে বজায় রেখে বিভিন্ন কবির মনসামঙ্গলকাব্য থেকে অংশ নিয়ে পালা গাইতেন। তবে সমস্যা যে বাইশজন কবি থাকতেন এমন নয়।

প্র : ধর্মমঙ্গল কাব্য কটি পালায় বিভক্ত?

উ : ধর্মমঙ্গল কাব্য দুটি পালায় বিভক্ত–রাজা হরিশ্চন্দ্রের গল্প এবং লাউ সেনের গল্প।

প্র : মনসামঙ্গলের উদ্ভব সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

উ : মনসা দেবীর উদ্ভব সম্পর্কে কোনো সমাজের প্রজনন শক্তিপূজার কথা বলা হয়, দক্ষিণ ভারতের সর্পদেবী 'মনচা অম্মসা', বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবী জাঙ্গুলি তারা প্রভৃতির মিশ্র প্রেরণা সক্রিয় ছিল। এই সঙ্গে সিজ গাছ ও টোটেমের ব্যাপারটিও ছিল। পরে সর্পদেবী মনসা শিবের কন্যা পরিচয়ে অভিজাত সমাজে স্থান লাভ করে। অভিজাত শ্রেণির ওপর প্রান্তিক মানুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা মনসামঙ্গলের মূল কথা।

প্র : 'বারোমাসী' বা 'বারমাস্যা' কাকে বলে?

উ : 'বারোমাসী' বা 'বারমাস্যা' শব্দের অর্থ বারোমাস অর্থাৎ পুরো এক বছরের বিবরণ। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের লৌকিক কাহিনি বর্ণনায় নায়ক-নায়িকার বারো মাসের সুখ-দুঃখের বিবরণ প্রদানের রীতি দেখা যায়। একেই বারোমাসী বা বারমাস্যা বলে।

প্র : 'চৌতিশা' কী?

উ : বিপন্ন নায়ক-নায়িকা চৌত্রিশ অক্ষরে ইষ্টদেবতার যে স্তব রচনা করে, তাকে বলে 'চৌতিশা'। ব্যঞ্জনবর্ণ ('ক' থেকে 'হ') পদের আদিতে প্রয়োগ করে এই 'চৌতিশা' রচিত হতো।

প্র : মনসামঙ্গল সম্পর্কে লেখ।

উ : সাপের দেবী মনসার স্তব, স্তুতি, কাহিনি ইত্যাদি নিয়ে রচিত কাব্য 'মনসামঙ্গল'। একে 'পদ্মাপুরাণ' বলেও অভিহিত করা হয়। কাব্যগান বা কাব্যপাঠ-কাহিনি মূলত সংস্কৃত রীতিতে, শাস্ত্রীয় রাগের ভিত্তিতে এবং লৌকিক ঢঙে-সুরে গাওয়ার রেওয়াজ ছিল। সাধারণে মনসামঙ্গলের উদ্ভব সম্পর্কে নানা মিথ মনসা বিষয়ক। সতী মনসাদেবীর অলৌকিক শক্তির প্রকাশ ঘটানো কাব্যের মূল উদ্দেশ্য। এই কাহিনি তৈতন্যপূর্ব যুগ থেকে মঙ্গলকাব্য পাঁচালির মাধ্যমে বাংলার সর্ব স্তরে ছড়িয়ে পড়ে। মানুষের কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। মনসামঙ্গল মূলত লৌকিক পালা। এর কবির সংখ্যা যেমন সর্বাধিক, তেমনি মুদ্রিত পুথির সংখ্যাও বহু। কানা হরিদত্ত মনসামঙ্গলের আদি কবি। এছাড়াও বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপলাই, দ্বিজ বংশীদাস, কেতকা দাস, ক্ষেমানন্দ প্রমুখ মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেছেন।

প্র : মনসামঙ্গল কাব্য কী?

উ : দেবী মনসার পূজা, স্তুতি ও গুণকীর্তনের জন্য লিখিত। মঙ্গলকাব্যের প্রাচীনতম ধারা। পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশ এর প্রসার ছিল।

প্র : মনসামঙ্গল কাব্যের আদি কবি কে?

উ : কবি কানা হরি দত্ত।

প্র : মনসামঙ্গল কাব্যগুলোকে আর কী নামে অভিহিত করা হয়?

উ : পদ্মাপুরাণ।

প্র : মনসাবিজয় সম্পর্কে লেখ।

উ : মনসামঙ্গল কাব্য ধারাকেই মনসাবিজয় বলা হয়। চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গলের ন্যায় মনসাকে নিয়ে মনসাবিজয় রচিত হয়েছে। অনেক পণ্ডিত মনসামঙ্গল কথাটি ব্যবহার করতে চান না। সুকুমার সেন মনে করেন, 'মনসা ব্রতগীতকে মঙ্গল বলা ঠিক নয়। কেননা এই ব্রত গার্হস্থ্য মঙ্গলকর্মের জন্য করা হইত না।' মনসাকে নিয়ে ব্রত রচয়িতাদের অন্যতম বিপ্রদাস পিপলাই নিজের রচনাকে মনসামঙ্গল না বলে মনসাবিজয় বলে নির্দেশ করেছেন।

প্র : মনসাবিজয় কার রচনা, কত সালে রচিত।

উ : বিপ্রদাস পিপিলাই, ১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দে।

প্র : মনসামঙ্গল কাব্যের চরিত্র ও প্রধান কাহিনি লিখ।

উ : চাঁদ সওদাগর, বেহুলা, লখিন্দর। [illegible]

Scanned with CamScanner

দিতে অস্বীকার করায় ধর্ণিক চাঁদ সওদাগরকে মনসা দেবী ধনহারা ও তার পুত্র লখিন্দরকে সর্পদংশনে হত্যা করে পুত্র হারা করে। বেহুলা লখিন্দরের নব পতিব্রতা। পরে পুত্রের পুনর্জীবন ও ধনলাভের বরদৌলতে চাঁদ সওদাগর মনসার পূজা করতে বাধ্য হয়।

প্র : চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদি কবি কে? তিনি কোন শতকের?

উ : কবি মানিক দত্ত; চতুর্দশ শতকের কবি।

প্র : চণ্ডীমঙ্গল ধারার প্রধান কবির নাম কী? তিনি কোন শতকের?

উ : মুকুন্দরাম চক্রবর্তী; ষোল শতাব্দীর কবি।

প্র : চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের পরিচয় দাও।

উ : 'চণ্ডীমঙ্গল' চণ্ডী নামক লৌকিক-পৌরাণিক দেবীর পূজা প্রচারের কাহিনি অবলম্বনে লিখিত কাব্য সম্ভবত মানিক দত্ত এই কাব্যধারার প্রথম কবি। তিনি চৈতন্যদেবের জন্মের পূর্বেই তাঁর কাব্য রচনা করেন। চৈতন্য-উত্তর কালে দ্বিজমাধব, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, দ্বিজমাধব সেন (এঁর কাব্যের নাম সারদাচরিত) প্রমুখ চণ্ডীমঙ্গলের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেন। চণ্ডীমঙ্গলের দুটি উপাখ্যান রয়েছে। একটি ব্যাধ দম্পতি কালকেতু ও ফুল্লরার কাহিনি, চণ্ডীর বরে কালকেতুর ধনপ্রাপ্তি, নতুন রাজ্যপত্তন, ধূর্ত ভাঁড়ুদত্তের ষড়যন্ত্রে প্রতিবেশী রাজার সঙ্গে যুদ্ধ, পরাজয় ও শেষ পর্যন্ত চণ্ডীর কৃপায় হৃতরাজ্য পুনঃপ্রাপ্তি; দ্বিতীয় উপাখ্যানের নায়ক ধনপতি সদাগর, অন্যান্য প্রধান চরিত্র তার দুই স্ত্রী লহনা ও খুল্লনা।

প্র : চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রধান চরিত্রগুলো কী কী?

উ : কালকেতু, ফুল্লরা, ধনপতি, ভাঁড়ুদত্ত, মুরারি শীল প্রমুখ।

প্র : 'অভয়ামঙ্গল' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : চট্টগ্রামের কবি দ্বিজ রামদেব চণ্ডী আখ্যানকে অবলম্বনে রচনা করেন 'অভয়ামঙ্গল'। গ্রন্থটির রচনাকাল ১৬৫৩, মতান্তরে ১৬৫৭-৫৯ সাল। অভয়ামঙ্গলে দ্বিজ মাধবের সারলা চরিত্রের প্রভাব পরিলক্ষিত হলেও কাব্যটির স্বাতন্ত্র্য আছে। বিশেষ করে কবি কৃষ্ণ কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদ ও ছড়া সংযোজন করে কাব্যখানিকে অভিনবত্ব দান করেছেন। উল্লেখ্য যে কবি কঙ্কণ মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলের' অন্তর্গত অভয়ামঙ্গল।

প্র : অন্নদামঙ্গল কাব্যধারার প্রধান কবি কে?

উ : ভারতচন্দ্র রায়।

প্র : অন্নদামঙ্গল কাব্য কত খণ্ডে বিভক্ত?

উ : তিনখণ্ডে। শিবনারায়ণ, কালিকামঙ্গল, মানসিংহ-ভবানন্দ খণ্ড।

প্র : অন্নদামঙ্গলের উল্লেখযোগ্য চরিত্র কী কী?

উ : মানসিংহ, ভবানন্দ, বিদ্যা, সুন্দর, মজুমদার ইত্যাদি।

প্র : বিদ্যাসুন্দর কাব্য সম্পর্কে লেখ।

উ : কালিকামঙ্গল নামে অভিহিত কাব্যাংশকে 'বিদ্যাসুন্দর' বা 'বিদ্যাসুন্দর কাহিনি' বলে। সুকুমার সেনের মতে, গুণকর ভাঁড়ু খোঁজে, আর নারী প্রত্যাশা করে সুন্দর পতির। এই কাহিনির উপর ভিত্তি করে গত সহস্রাব্দের প্রারম্ভের তিন-চার শতক থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারত সহ পরবর্তীকালে বাংলায় বিদ্যাসুন্দর কাহিনি প্রচলন। বুদ্ধিমান কবি-প্রণয়ীর সঙ্গে রাজকন্যা-প্রণয়িনীর গোপন মিলনই হয় বাংলায় প্রচলিত কাহিনির ভিত্তি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলায় বিদ্যাসুন্দর কাহিনি ব্যাপক চর্চা হয়। কবি শেখর রতন চক্রবর্তী, গোবিন্দদাস, ভারতচন্দ্র রায় এ সময়ের উল্লেখযোগ্য কবি। রূপগুণ সম্পন্ন রাজকুমার সুন্দর দেবী কালিকার অর্চনা করে তার সন্তুষ্টির মাধ্যমে বিদুষী রাজকন্যা বিদ্যার পাণি লাভের বর পায়। রাজ অন্তঃপুরের সুড়ি মালিনীর সাহায্যে এবং নিজের ধৈর্য, সাহসিকতা ও কৃতকর্মের ফলে অবশেষে সুন্দর বিদ্যার সান্নিধ্য ও সঙ্গ লাভ করে।

প্র : ধর্ম ঠাকুরের নামে যে মঙ্গলকাব্য সৃষ্ট হয়েছে, তার নাম কী?

উ : ধর্মমঙ্গল।

প্র : ধর্মমঙ্গল ধারার প্রথম কবি কে, তার গ্রন্থের নাম কী?

উ : ময়ূরভট্ট; হাকন্দপুরাণ।

প্র : ধর্মমঙ্গল ধারার আঠারো শতকের শ্রে কবি কে?

উ : ঘনরাম চক্রবর্তী

প্র : তার রচিত গ্রন্থের নাম ও এর উপজীব্য কী?

উ : শ্রীধর্মমঙ্গল; লাউসেনের কাহিনি।

প্র : কালিকামঙ্গল কী?

উ : দেবী কালীর মাহাত্ম্যে বর্ণনামূলক গ্রন্থ।

প্র : এই মঙ্গলকাব্যকে আর কী নামে অভিহিত করা হয়?

উ : বিদ্যাসুন্দরের কাহিনি।

প্র : কালিকামঙ্গলের আদি কবি কে?

উ : কবি কঙ্ক।

প্র : বিদ্যাসুন্দর কাব্যের রচয়িতা আর দুজন কবির নামে কী?

উ : রামপ্রসাদ সেন ও সাবিরিদ খান।

রামায়ণ মহাভারত

প্র : পৃথিবীতে কয়টি জাত মহাকাব্য আছে, কী কী?

উ : দুটি। রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, এনিড।

প্র : মহাভারত কোন ভাষায় লেখা, লেখক কে?

উ : সংস্কৃত ভাষায়। মূল রচয়িতা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব।

প্র : মহাভারত প্রথম বাংলায় কে অনুবাদ করেন?

উ : কবীন্দ্র পরমেশ্বর।

প্র : তাঁর মহাভারতকে পরাগলী মহাভারত বলা হয় কেন?

উ : নবাব হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৮) চট্টগ্রাম শাসনের জন্য পরাগল খাঁ নামক এক লস্কর নিযুক্ত করেন। মহাভারতে বিচিত্র কৌশলে যুদ্ধের বর্ণনা আছে। যুদ্ধপ্রিয় পরাগল খাঁ মহাভারতের যুদ্ধকাহিনি শুনে গ্রন্থটি অনুবাদ করার জন্য পরমেশ্বর দাসকে নির্দেশ দেন। সে অনুসারে মহাভারত অনুবাদ করা হয় বলে একে পরাগলী মহাভারত বলে।

প্র : মহাভারতের অনুবাদক কে? তিনি কার পৃষ্ঠপোষকতায় মহাভারত রচনা করেন?

উ : মহাভারতের প্রথম অনুবাদক হিসাবে সঞ্জয়ের নাম অধুনা গবেষকমহলে স্বীকৃত। তবে আজ পর্যন্ত বাংলা মহাভারতের প্রাচীন ও প্রামাণ্য যে পুথিটি হস্তগত হয়েছে, সেটি কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচিত। গৌড়াধিপতি হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে মহাভারত অনুবাদে উৎসাহিত করেন।

প্র : কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতের নাম কী? এটি কোন সালে রচিত?

উ : কবীন্দ্র তাঁর কাব্যের নাম দিয়েছেন 'বিজয়পাণ্ডবকথা' অথবা 'ভারত পাঁচালী'। কাব্যটি ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত।

প্র : পরাগলী মহাভারতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য কী?

উ : মুসলমান শাসকের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত হলেও কবীন্দ্রের রচনায় ইসলামি শব্দ একেবারেই নেই বললে চলে। পরমেশ্বর কাব্যরচনার মূল লক্ষ্য থেকে চুল পরিমাণ বিচ্যুত হন নি।

প্র : 'ছুটি খাঁনী' পৃষ্ঠপোষকতায় কে মহাভারত অনুবাদ ও রচনা করেন?

উ : চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ছুটি খাঁ সভাসদ শ্রীকর নন্দীকে মহাভারত অনুবাদের নির্দেশ দেন- সেই মতো শ্রীকর নন্দী 'ভারত পাঁচালী' রচনা করেন। যা 'ছুটিখাঁনি মহাভারত' নামেও পরিচিত। কেউ কেউ বলেন, পরাগলী মহাভারতের অসম্পূর্ণ অংশ সম্পূর্ণ করেছেন শ্রীকর নন্দী। তবে গ্রন্থরচনা শেষ হবার আগেই কবীন্দ্রের মৃত্যু হয়।

প্র : কাশীরাম দাসের মহাভারতের নাম কী ছিল? রচনাকাল আনুমানিক কোন সাল বলে মনে হয়?

উ : কাশীরাম দাসের 'ভারত পাঁচালী'র রচনাকাল সম্বন্ধে যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মনে করেন ১৬০২-'০৪ খ্রিষ্টাব্দের। ১৫৮৭ খ্রিষ্টাব্দের নকল করা একখানি পুথি পাওয়া গেছে। এ ছাড়া ১৫৯৫ খ্রিষ্টাব্দের ও ১৬১৩ খ্রিষ্টাব্দের তারিখ-সংযোজিত পুথিও পাওয়া গেছে। তাই মনে হয় কবির কাব্য ষোড়শ শতকের শেষের দিকেই রচিত হয়ে থাকতে পারে।

প্র : মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কে? তিনি মহাভারতের কটি পর্ব অনুবাদ করেছিলেন?

উ : মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদকের নাম কাশীরাম দাস। তিনি গ্রন্থ রচনা শেষ করে যেতে পারেন নি। মহাভারতে আদি, সভা, বন ও বিরাট পর্ব রচনার পর তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

প্র : কাশীরামের অসম্পূর্ণ রচনা কারা সম্পূর্ণ করেন?

উ : কথিত আছে কবির অসমাপ্ত কাব্য সমাপ্ত করেন কবির পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য স্থানীয় অনেকে। ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম রচনা করেন দ্রোণপর্ব, শল্য ও নারীপর্ব সুভদ্রাহরণ

Scanned with CamScanner

নামের রচনা এবং অশ্বমেধ পর্ব রচনা করেন দ্বিজ ধনুনাথ দাস। অন্যান্য পর্বের ভণিতায় নিত্যানন্দ ঘোষ, গঙ্গাদাস সেন, গুণাধর দাস, রাজেন্দ্র দাস ও গোপীনাথ নন্দের নাম পাওয়া যায়।

প্র : কাশীরাম দাসের কাহিনির বর্ণনায় মৌলিকত্ব কোথায়?

উ : কবি রচনার সময় মূল মহাভারতের কাহিনি গ্রহণ-বর্জন করেছেন। পর্ববিভাগ ও নামকরণে স্বাধীন পথেই চলেছেন। মহাপ্রস্থান ও স্বর্গারোহণ পর্বটি একত্রে স্বর্গারোহণ পর্ব নামে চিহ্নিত হয়েছে। শ্রীবৎস-চিন্তার মধুর সম্পর্কটি কবির নিজস্ব। সুভদ্রা হরণ, পারিজাত হরণ, সত্যভামার তুলাব্রত, রাজসূয় যজ্ঞে বিভীষণের অপমান প্রভৃতি কবির নিজস্ব সৃষ্টি।

প্র : চৈতন্য পূর্ববর্তী চারজন বাঙালি মহাভারত অনুবাদকের নাম লেখ।

উ : কবীন্দ্রপরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, সঞ্জয় ও বিজয় পণ্ডিত প্রমুখ। এঁরা চৈতন্য পূর্বযুগের। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের অল্প কিছুকাল পরেই জন্মগ্রহণ করেন।

প্র : রামায়ণ কোন ভাষার কাব্য, কবি কে?

উ : সংস্কৃত ভাষার। কবি বাল্মীকি। বাল্মীকি আগে রত্নাকর নামে দস্যুবৃত্তি করতেন।

প্র : রামায়ণের প্রথম বাংলা অনুবাদ কে করেন?

উ : কৃত্তিবাস ওঝা।

প্র : কৃত্তিবাস ওঝার পরিচয় দাও।

উ : রামায়ণ বা শ্রীরাম-পাঁচালির কবি কৃত্তিবাস ওঝা। ওঝা শব্দটি বাংলায় সাপের বিষ ঝাড়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। কিন্তু সে অর্থে কৃত্তিবাস নামটির সঙ্গে ওঝা পদবিযুক্ত হয় নি। রামায়ণ গান করতেন বলে হয়তো এই পদবিটি কৃত্তিবাস নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। মৈথিলি ব্রাহ্মণদের অসমিয়া ভাষায় ওঝা বলা হয়। ওঝা এসেছে উপাধ্যায় শব্দ থেকে। ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙালি ব্রাহ্মণের ওঝা পদবি পাওয়া যায়। তারা শিক্ষক-পণ্ডিত ছিলেন। সে যাহোক, কৃত্তিবাস ওঝা রচনা, শিক্ষা, ধর্ম তথা জ্ঞানের পথের পথিক ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। কৃত্তিবাস ওঝা চৈতন্যপূর্ব যুগের কবি, শ্রীরাম-পাঁচালি তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। গঙ্গার তীরে নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে মুখুটি বংশে ১৩৯৯ মতান্তরে ১৪০৩ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। কৃত্তিবাস নিজেই তাঁর আত্মজীবনী বর্ণনা করে গেছেন। যেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন যে রবিবার শ্রীপঞ্চমী তিথিতে তাঁর জন্ম, 'কৃত্তিবাস' তাঁর পিতামহ প্রদত্ত নাম। কৃত্তিবাসের কৃতিত্ব হলো, তিনি বাংলা ভাষায় প্রথম রামায়ণ রচনা করেন। বাল্মীকির রামায়ণকে সামনে রেখেও তিনি মহাকাব্যটি অনুবাদ করে মূলের পুনরুচনাই করেন। তাঁর রামায়ণ এতোটাই জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে, ১৮০২-০৩ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের প্রতিষ্ঠাতারা তাদের নব প্রতিষ্ঠিত প্রেসে গ্রন্থটি মুদ্রণ করেছেন। 'বাল্মীকি যেমন সংস্কৃতের আদি কবি কৃত্তিবাসও তেমনি বাঙলার আদি কবি।' কৃত্তিবাসের রামায়ণে চরিত্রগুলো বাঙালি ঘরোয়া আমেজে সকলের পরিচিত হয়ে উঠেছে। মধুসূদন একটি সংশ্লোকে কবিকে 'কীর্তিবাস তুমি' বলে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন।

প্র : একমাত্র মহিলাকবি রচিত 'রামায়ণ' সম্পর্কে লেখ।

উ : চন্দ্রাবতী ছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 'মনসামঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা দ্বিজবংশী বা বংশদাস এর বিদুষীকন্যা। চন্দ্রাবতী রামায়ণ রচনা করে পুরাতন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একমাত্র মহিলাকবি হিসেবে গৌরব অর্জন করেন। তাঁর রচিত রামায়ণের রচনাকাল কত ছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় নি। তবে তাঁর পিতা সপ্তদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন। তাই, ধারণা করা হয় তার রামায়ণ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে রচিত। চন্দ্রাবতীর জীবনের কথা তেমন কিছু জানা যায় নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র একটি পালায় চন্দ্রাবতীর বিয়োগান্তক জীবন-পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকে, চন্দ্রাবতীর জীবন বৃত্তান্ত ও তার কাব্যের অস্তিত্বকে মানতে চান না। কিন্তু যে রকম ব্যাপকভাবে চন্দ্রাবতীর জীবন ও তাঁর রচিত রামায়ণ ও দস্যু কেনারামের পালা ময়মনসিংহে প্রচলিত আছে, তাতে চন্দ্রাবতীর কবি ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার করা

যুক্তিতে দেওয়া যায় না। চন্দ্রাবতী যে রামায়ণ সম্পূর্ণ বা তার অংশ বিশেষ লিখেছিলেন তার কোন পুথি পাওয়া যায় নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি সংগ্রাহক ময়মনসিংহের অধিবাসী চন্দ্রকুমার দে স্থানীয় মহিলাদের গলায় এই রামায়ণ গান শুনে তা সংগ্রহ করে নেন। মেয়েরাই এর গায়ক, এর শ্রোতা এবং গায়কেরাও অধিকাংশ স্ত্রীলোক ছিলেন। মৌখিক সংগ্রহ হলেও এটি পূর্ণাঙ্গরূপে সংগৃহীত হতে পারে নি। এছাড়াও চন্দ্রকুমার গ্রামীণ মহিলাদের কণ্ঠ থেকে এ গান সংগ্রহ করলেও এর গ্রামীণ চেহারা কোথাও বজায় থাকে নি। চন্দ্রাবতীর মধ্যে যে কবি প্রতিভা ছিল তা অস্বীকার করা যাবে না। এ কাব্যে নারীসুলভ কোমলতাটুকু বহু পুরুষ পরিমার্জনের চেষ্টা করলেও অনুভব করতে পারা যায়। এ কাব্যের সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার কাব্যটিকে ৩টি পরিচ্ছেদে ভাগ করেন।

প্র : বিভিন্ন শতকে যে-সব মুসলিম কবি কাব্যরচনা করেছেন, তাদের নাম লেখ।

উ : **পনের শতক ঃ** শাহ মুহম্মদ সগীর, জয়েনউদ্দীন (জৈনুদ্দীন)।

ষোল শতক ঃ শেখ মকীর, ঈশা আজী, শেখ ফয়জুল্লাহ, শাহ্ বরিদ খান, গৌলত উজির বাহরাম খান, মুহম্মদ কবীর, সৈয়দ সুলতান, সোনা গাজি, হাজি মুহম্মদ, ফতেহ খান, শেখ চাপু, আবজল।

সতের শতক ঃ মুহম্মদ আকিল, কাজী দৌলত, আলাওল, মাগন ঠাকুর, সৈয়দ মুর্তজা, খান পয়াস, শেখ মুত্তালিব, মুহম্মদ খান, মরদন, শরীফ শাহ, আবদুন নবী, আবদুল হাকিম, সৈয়দ মুহম্মদ আকবর, মঙ্গল চাঁদ, নওয়াজিস খান খন্দকার, আবদুল করিম খন্দকার।

আঠার শতক ঃ আলী রজা, শেখ সালী, শেরবাজ চৌধুরী, আবদুস শকুর মাহমুদ, মুহম্মদ আলী রজা, মুহম্মদ আলী, ফাজিল, নাসির, সিরতাজ, ফকির এবাব, নূহ মুহম্মদ, শমশের আলী, মুহম্মদ নাসিম, হেয়াত মামুদ, বালক ফকির, মুহম্মদ ফসীহ, শেখ মনসুর, মুহম্মদ জীবন, মুহম্মদ হাবি পণ্ডিত, ফকির গরীবুল্লাহ, সৈয়দ হামজা, শেখ ইয়াকুব।

উনিশ শতক ঃ মুহম্মদ চুহর, তমিজী, সামসুদ্দিন সিদ্দিকী, আরিফ, হামিদুল্লাহ খান বাহাদুর, কাজী হাসমত আলী চৌধুরী, নওয়াব ফয়জুন্নিসা, মালে মুহম্মদ, মুহম্মদ খাতের, মুহম্মদ দানেশ, জোনাব আলী, মুহম্মদ বক্তার খান, বেলায়েত হোসেন, আবদুল গাফফার, মনিরুদ্দিন আহাম্মদ, আবদুর রহিম, তাজউদ্দিন মুহম্মদ, আমিরুদ্দীন, দুদু শাহ।

পাঁচশ বছরে এই কজন মুসলিম কবির সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের অনেকের লেখাই উল্লেখ করার মতো নয়, ইতিহাসের খাতিরে কবির নাম উল্লেখ করা হলো মাত্র। অনেকের একটির বেশি গ্রন্থ কোনোভাবেই আলোচনার যোগ্যও নয়।

প্র : 'ইউসুফ-জোলেখা'র পরিচয় দাও।

উ : 'ইউসুফ-জোলেখা' একটি কাহিনি কাব্যগ্রন্থ; শাহ মুহম্মদ সগীর লিখেছেন। গৌড়ের সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের রাজত্বকালে (১৩৮৯-১৪০৯ খ্রিষ্টাব্দ) এ গ্রন্থ রচিত হয়েছিল বলে প্রমাণ মিলেছে। সে-বিচারে কাব্যটি পঞ্চদশ

প্র : এই ধারার কয়েকজন কবির নাম লেখ।

উ : শাহ মুহম্মদ সগীর, সৈয়দ সুলতান, আবদুল হাকিম, আলাওল, কোরেশী মাগন ঠাকুর প্রমুখ।

0/5/11 13:05

Scanned with CamScanner

শতাব্দীর প্রথম দিকের রচনা এবং শাহ মুহম্মদ সগীর বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম কবি হিসেবে গণ্য। বাইবেল ও কোরানে ইউসুফ-জোলেখার কাহিনি বর্ণিত আছে। ইরানের কবি ফেরদৌসিও (মৃত্যু ১০২৫ খ্রিষ্টাব্দ) এই নামে কাব্য রচনা করেছেন। সগীর বাইবেল পড়েনি। তিনি কোরান ও ফেরদৌসির কাছ থেকেই কাহিনিসূত্র গ্রহণ করে ইউসুফ ও জোলেখার প্রণয়কাহিনি লেখেন। তৈমুস বাদশার কন্যা জোলেখার আজিজের সঙ্গে বিয়ে হয়। ঐতিহাসিক ইউসুফের (নবি) প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে জোলেখা তাকে আকর্ষণ করে। নানা ঘটনায় ইউসুফ মিশরের অধিপতি হয় এবং তার মনেরও পরিবর্তন ঘটে। ধর্মান্তরের মধ্য দিয়ে ইউসুফ-জোলেখার মিলন হয়। সুফিরা ইউসুফকে পরমাত্মা জোলেখাকে জীবাত্মার প্রতীক বিবেচনা করেন। সগীরও তাই করেছেন। তবে বর্ণনায় প্রেমের আবহটি প্রধান হয়েছে। সগীর ছাড়া একই কাহিনি নিয়ে আবদুল হাকিম, গরীবুল্লাহ, ফকির মুহম্মদ প্রমুখ কাব্য লিখেছেন। তবে এ কাব্য শাহ মুহম্মদ সগীরই প্রথম লেখেন।

প্র : 'ইউসুফ-জুলেখা' কাব্যের সামান্য অংশ উদ্ধৃত কর।

উ : ব্যাধি এ পীড়িত মোর বিকল শরীর।
ঔষধ দর্শনে প্রাণ শান্ত নহে স্থির॥
এহেন নির্জন পুরী বিরল সম্ভোগ।
পরিহরি লজ্জা জীতি কর উপভোগ॥
না জানি কেমন আছে নিষেধ কারণ।
বুঝিলু তোমার ইচ্ছা আমার মরণ॥
('জোলেখার প্রেম নিবেদন' অংশ থেকে)

প্র : 'লায়লী মজনু' কাব্যের পরিচয় দাও।

উ : দৌলত উজির বাহরাম খান রচিত 'লায়লী মজনু'র রচনাকাল নিয়ে মতভেদ আছে। আহমদ শরীফের মতে ১৫৪৩-১৫৫৩; শহীদুল্লাহ্‌র মতে ১৬৬৯ খ্রিষ্টাব্দে রচিত। বাহরাম খান চট্টগ্রাম-অধিপতি নিজাম শাহ সুরের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন। 'লায়লী-মজনু' কাব্য পারসি কবি জামির (মৃত্যু ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দ) 'লায়লী-মজনু' কাব্যের ভাবানুবাদ। তবে কাহিনিতে স্বাধীন কল্পনা ও উপস্থাপনায় প্রচুর সংস্কৃত শব্দ, উপমা, রূপক সৃষ্টি করেছেন। গ্রন্থটি আদি রসাত্মক। আধ্যাত্মিকতার চেয়ে মানবিক প্রবৃত্তি প্রাধান্য পেয়েছে। আমিরপুত্র কয়েস বণিককন্যা লায়লার প্রেমে পাগলপ্রায় হয়। লায়লীও কয়েসকে ভালোবাসে কিন্তু তাকে বিয়ে দেয়া হয় অন্যত্র। তারপরও উভয়ের আকর্ষণ এতোই তীব্র থাকে যে, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার সমাপন ঘটে।

প্র : 'মধুমালতী' কাব্যের পরিচয় দাও।

উ : হিন্দি কবি মনবানের 'মধুমালতী' কাহিনি কথা নানা ভাষায় প্রচারিত হয়। ইহার কবীর হিন্দিতে অপরা পারসি ভাষায় এ কাব্যের কাহিনির সঙ্গে পরিচিত হয়ে রচনা করেন বাংলা 'মধুমালতী'। এর রচনাকাল ১৫৮৮ খ্রিষ্টাব্দ। এ কাহিনি ভারতীয় সূর্যভান কপিলা রাজ্যের রাজা। তার স্ত্রী কমলাসুন্দরী, পুত্র মনোহর। তার স্ত্রী সুদর্শনি। মহারসরাজ্যের পরমা সুন্দরী রাজকুমারী মধুমালতীর সঙ্গে মনোহরের সাক্ষাৎ ও প্রেমের যোগসূত্র ঘটে পরিণয়ে ষড়যন্ত্রে। এরপর মনোহর ও মধুমালতী হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই বিচ্ছেদের ফলে তাদের বিরহতাপিত অবস্থা অত্যন্ত করুণ ও সহৃদয়তার সঙ্গে কবি উঠে করেছেন। পরে তাদের পুনর্মিলন ঘটে। বোঝা যায়, সমকালে 'মধুমালতী' খুব পরিচিত কাহিনি ছিল। যে কারণে সৈয়দ হামজা, শাকের মুহম্মদ প্রমুখ একই কাহিনি নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন।

প্র : 'গুলে বকাওলী' কাব্যের পরিচয় দাও।

উ : ইজ্জতুল্লা নামক এক বাঙালি লেখক রচিত পারসি গ্রন্থ। ১৭২২ থেকে ১৭৯০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রচিত এই গ্রন্থটি বঙ্গানুবাদ করেন কবি নওয়াজিশ খান। এছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি মহম্মদ মুকিম তাঁর রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম নেন 'গুলে বকাওলী'। এই গ্রন্থে তিনি তাঁর সমসাময়িক মুসলিম কবিদের নাম উল্লেখ করে মুসলিম বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ নিয়ে আলোকপাত করেন। তারপরও নওয়াজিস খান স্বল্পকায় বিরচিত 'গুলে বকাওলী'র রচনাকাল নিয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তবে কাব্যটি যে সতের শতকের রচনা এ ব্যাপারে পণ্ডিতেরা মত দিয়েছেন। চট্টগ্রামের জমিদার বংশীয় বৈদ্যনাথ রায়ের আদেশে কবি এই কাব্য লেখেন।

'গুলে বকাওলী' প্রেমকাব্য। শর্কিস্তানের রাজা অজ। রাজকুমার তাজুল মুলুক জন্মতে পারে পরিব্রাজকন্যা বকাওলীর গুলাবে বকাওলী ফুল আছে এবং সেই ফুলের রসে পিতার অদ্ভুত দৃষ্টিভূত হবে। ফুলের সেই উদ্যানে উপস্থিত হয়ে দেখে তাজুল পূর্বে সুন্দরী পরিব্রাজকন্যা বকাওলী সেখানে নিদ্রিতাবস্থায়। ভালোলাগে শাহজাদের। সে বকাওলীর সঙ্গে আংটি বদল করে এবং একটি প্রেমপত্র লিখে আসে। বকাওলী ঘুম থেকে জেগে আংটি ও প্রেমপত্র দেখে তাজুলের সন্ধানে বের হয়। অনেক দুঃখ ও ধৈর্যের পর উভয়ের মিলন ঘটে। একই কাহিনি হিন্দি-উর্দু-পারসি ভাষাতেও আছে। কাহিনিটি সমকালে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বাংলা 'গুলে বকাওলী'তে পদ্যের সঙ্গে গদ্যের মিশ্রণ আছে। সে দিক থেকে এর রচনা অভিনব।

প্র : 'সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী'র পরিচয় দাও।

উ : সতের শতকের কবি দৌলত কাজী 'সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী' কাব্য রচনা করেন। রোসাঙ্গের অধিপতি শ্রীসুধর্মার (রাজত্বকাল ১৬২২-৩৮ খ্রিষ্টাব্দ) প্রধান আমাত্য আশরফ খানের আদেশে দৌলত কাজী এ কাব্য রচনা আরম্ভ করেন কিন্তু শেষ করার আগেই তিনি মারা যান। পরে ট্রজির সোলায়মানের আদেশে ১৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দে কবি আলাওল কাব্যের শেষাংশ রচনা করেন।

কাব্যের কাহিনি এরকম : রাজা লোর আর রূপসী রানি ময়নাবতীর সুখের সংসার। বনবিহারে গিয়ে লোর এক যোগীর কাছে অপরূপা চন্দ্রানীর সংবাদ পায়। চন্দ্রানীর স্বামী নপুংসক। লোর দেখা করে চন্দ্রানীর সঙ্গে। তাদের গোপন সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়। চন্দ্রানীর স্বামী বামনের সঙ্গে লোরেরর যুদ্ধে বামন মারা যায়। গোহারী রাজ্যের রাজা চন্দ্রানীর পিতা মোহরা লোরকে গ্রহণ করে এবং পৌত্রলাভের আশায় তাদের বিয়ে দেয়। লোর ময়নার কথা ভুলে চন্দ্রানীকে নিয়ে সংসার করে। লোর-চন্দ্রানীর এক পুত্র হয়, নাম প্রচণ্ডতপন। দিন যায়। ময়নাবতী স্বামীর বিরহেও সতীত্ব অক্ষুণ্ন রাখে। ১৪ বছর পর এক শুকপাখি ময়নাবতীর কথা লোরকে বলনা করলে পুত্র তপনের হাতে গোহারীর রাজত্ব দিয়ে লোর চন্দ্রানীকে নিয়ে ময়নাবতীর জন্য নিজরাজ্যে গমন করে। পরে দুই স্ত্রী ময়নাবতী ও চন্দ্রানীকে নিয়ে লোর জীবনযাপন করে বৃদ্ধ হয়। তার মৃত্যুর পর দুই স্ত্রী একত্র চিতারোহণ করে।

প্র : 'চন্দ্রাবতী' কাব্যের পরিচয় দাও।

উ : 'চন্দ্রাবতী' কাব্যের একমাত্র হস্তলিখিত কেরেণী মাগন ঠাকুর। এর একটি খণ্ডিত পুথি পাওয়া গেছে। কাব্যের রচনাকাল নিয়ে সংশয় আছে। তবে মাগন আরাকান রাজ্যের মন্ত্রী ও আলাওলের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাই কাব্যটি সতের শতকের। 'চন্দ্রাবতী' কাব্যের প্রাচীন উৎস জানা যায় না। মনে হয় এটা কবির স্বাধীন কল্পনা। ভদ্রাবতী নগরের রাজা চন্দ্রসেনের বীরপুত্র বীরভান। উজির সন্তুয়ের পুত্র সুত বীরভানের বন্ধু। সরম্বীপের রাজা শূলপালের সুন্দরী কন্যা চন্দ্রাবতী বীরভানের চিত্ররূপ দেখে প্রণয়াচ্ছাদিতা হয়। চন্দ্রাবতীর চিত্ররূপ দেখে বীরভান। উভয়ে একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সুত এবং চন্দ্রাবতীর সখী চিত্রাবতী এ ক্ষেত্রে সহায়তা করে। অনেক অলৌকিকত্ব, অভিনবত্ব, অনন্যতার মধ্য দিয়ে কাহিনি এগিয়ে যায়। পরে তাদের মিলন ঘটে।

প্র : 'পদ্মাবতী' কাব্যের পরিচয় দাও।

উ : মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ মুসলিম কবি আলাওল, যাঁর একাধিক গ্রন্থ বিশেষ মূল্যবান। তিনি সতের শতকের কবি। 'পদ্মাবতী' তাঁর অমর কীর্তি। বর্তমান ফরিদপুরের পাঠান শাসনকর্তা মজলিশ কুতুবের তিনি মন্ত্রী ছিলেন। স্থানান্তরে যাবার সময় পর্তুগিজদের আক্রমণে তাঁর পিতা নিহত হলেও তিনি আরাকানে নীত হন এবং মুক্তি পেয়ে আরাকান রাজপ্রাসাদে আশ্রয় পান। আরাকানের বৌদ্ধ রাজারা ও তাদের অমাত্যরা আলাওলের উপর খুশি ছিলেন। তাদের আগ্রহে আলাওল অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। 'পদ্মাবতী' হিন্দি কবি মালিক মুহম্মদ জায়সির 'পদুমাবৎ' কাব্যের অনুবাদ। অনুবাদ হলেও কবি এখানে অনেক মৌলিকতা দেখিয়েছেন।

2020/5/11 13:05
Scanned with CamScanner

আরাকানরাজ সাদ থেদোমিন্তারের রাজত্বকালে (১৬৪৫-৫২) মন্ত্রী মাগন ঠাকুরের আদেশে ১৬৫১ খ্রিষ্টাব্দে রচনা করেন।

'পদ্মাবতী'র কাহিনি-সংক্ষেপ : সিংহলের রাজা ও রানী গন্ধর্ব সেন ও চম্পাবতী। তাদের পরমাসুন্দরী কন্যা পদ্মাবতী। শাস্ত্রজ্ঞ ও সুবক্তা শুকপাখি তাদের সঙ্গী। নাম হীরামণি। হীরামণি সদাযৌবনা পদ্মাবতীর সঙ্গে অতি রসালাপ করায় গন্ধর্ব ক্রুদ্ধ হয়। হীরামণিকে হত্যার নির্দেশ দেয় সে। সময় বুঝে শুকপাখি হীরামণি পালায়। কিন্তু ব্যাধের জালে ধরা পড়ে পাখি। ব্যাধ সেটা চিতোরের এক বণিকের কাছে বিক্রি করলে হীরামণিকে নিয়ে বণিক চিতোরে চলে আসে। চিতোরের রাজা চিত্রসেনের মৃত্যুর পর রাজকুমার রত্নসেন সিংহাসনারোহণ করে। পণ্ডিত শুকপাখির সংবাদ জানতে পেরে উচ্চ দাম দিয়ে বণিকের কাছ থেকে রাজা রত্নসেন হীরামণিকে কেনে। রত্নসেন বিবাহিত; স্ত্রী নাগমতী। একদিন গোপনে নাগমতী শুককে জিজ্ঞেস করে পৃথিবীতে সর্ব সুন্দরী কে? শুক বলে, পদ্মাবতী। একথা শুনে নাগমতী ভাবে, যদি রত্নসেন একথা শোনে তাহলে সে তৎক্ষণাৎ সিংহলের উদ্দেশ্যে রওনা হবে। অতএব, হীরামণিকে মেরে ফেলাই ভালো। সে এক ধাত্রীকে নির্দেশ দেয় হীরামণিকে মেরে ফেলতে। কিন্তু ধাত্রী পাখি হত্যা না করে গোপনে রেখে দেয়। পরে রত্নসেন পাখির খোঁজ পায় এবং শুকের মুখে পদ্মাবতীর সব সংবাদ জানে। নাগমতীর আশঙ্কা অনুসারেই রত্নসেন সিংহল যাত্রা করে এবং শুকপাখির পরামর্শ মতো যোগী বেশে সেখানে পূজার ছলে মন্দিরে অপরূপা পদ্মাবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। অপরূপা পদ্মাবতীকে দেখেই রত্নসেন মূর্ছিত হয়। পদ্মাবতীও রত্নসেনকে দেখে প্রেম অনুভব করে এবং প্রেমনিদর্শন রেখে প্রাসাদে চলে যায়। রত্নসেন স্বাভাবিক হলে যেতে চায় গান্ধর্বের প্রাসাদে। কিন্তু কঠোর রাজা গান্ধর্ব যোগী বেশধারীদের ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেয় নি। শুকপাখি রত্নসেনের প্রেমপত্র পদ্মাবতীকে পৌঁছে দিলো এবং পদ্মাবতী এর উত্তরে জানালো যে, 'সিঁধ কেটে যেন রত্নসেন চোরের প্রবেশ করে। সেই কথা-সেই কাজ। কিন্তু সকাল হতেই ধরা পড়লো রাজসেনা। একজন যোগীর এ ধরনের আচরণে রাজা ক্রুদ্ধ হয় এবং রত্নসেনকে খুঁজে বের করার আদেশ দেন। মহাদেব এ সময় ব্রাহ্মণ ধারণ করে যোগীর প্রকৃত পরিচয় সিংহলরাজ গান্ধর্ব সেনকে প্রদান করেন। এ পরিচয় জেনে চিতোররাজ রত্নসেনকে মুক্ত করা হয় এবং যোগ্যপাত্র বিবেচনায় রত্নসেনের হাতে গান্ধর্ব সেন নিজকন্যা পদ্মাবতীকে সমর্পণ করে। রত্নসেন-পদ্মাবতী মিলনের দীর্ঘ বন্ধুর পথ অতিক্রম কালে শুকপাখি হীরামণি তাদের সঙ্গে ছিল। এ মিলন সম্পন্ন হলে পাখি সবার কাছ থেকে বিদায় নেয়। পদ্মাবতীর প্রথম খণ্ড এ পর্যন্ত।

দ্বিতীয় খণ্ডে আছে : দীর্ঘদিন বিরহে থেকে এক পাখি পাঠায় রত্নসেনের প্রথম স্ত্রী নাগমতী। রত্নসেন পাখির কাছে পূর্বাপর শুনে দ্বিতীয় স্ত্রী পদ্মাবতীকে নিয়ে নিজরাজ্য চিতোরে আসে। তার রাজের রাজপণ্ডিত রাঘবচেতন চাতুরির আশ্রয় নিলে রাঘবকে চাকুরিচ্যুত করে রত্নসেন। রাঘব প্রতিশোধ নেবার আশায় দিল্লির বাদশাহ আলাউদ্দিনকে গিয়ে পদ্মাবতীর রূপের বিবরণ দিলে আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণ করে। বারো বছর যুদ্ধ চলে। রত্নসেন বন্দি হলেও তার দুই সহচরের কৌশলে মুক্ত হয়। এদিকে আর এক রাজা দেবপাল পদ্মাবতীকে পেতে চায়। তার সঙ্গে রত্নসেনের যুদ্ধে দেবপাল নিহত ও রত্নসেন আহত হন। আহত রত্নসেন সাত দিন পর মারা যায়। এই শোকে তার দুই স্ত্রী নাগমতী ও পদ্মাবতীও চিতায় সহমরণ বরণ করে। এ-সংবাদ আলাউদ্দিন জানত না। সে পদ্মাবতীকে লাভ করার জন্য আবার চিতোর আক্রমণ করতে এসে পদ্মাবতীর চিতাভস্ম দেখে। এখানেই কাব্যের শেষ। 'পদ্মাবতী'তে বাস্তবতা ও কাল্পনিকতার চমৎকার মিশেল আছে। লোকসাহিত্যের মটিফ হিসেবে হীরামণি বা শুকপাখির অবতারণা। এই শুকপাখি অবশ্য সুফিবাদের প্রভাবজাত। পাখিকুল ছাড়া এর আর সবই মনুষ্য চরিত্রের মতো। পদ্মাবতীর রূপবর্ণনার অংশ আন্তরিক এবং কবির সুরদৃষ্টির পরিচায়ক। রত্নসেন-পদ্মাবতীর বিয়ের অনুষ্ঠান সামাজিকতায় পরিপূর্ণ। উভয়ের দেখাসাক্ষাৎ সুলভ হতে পারে, কিন্তু বর্ণনা বাস্তব, কাল্পনিক নয়। অতএব, বাস্তবতা ও অলৌকিকতার সংমিশ্রণে 'পদ্মাবতী' একটি চমৎকার কাব্য।

'পদ্মাবতী'র রূপবর্ণনা অংশ থেকে সামান্য

প্র : উল্লেখ কর।

উ : সুরাক সুরঙ্গ অতি রাতুল অধর।
নাজে বিম্ব বাখুলি গমন বনান্তর॥
মাণিক্য প্রবাল অতি নীরস কর্কশ।
অধরের অমিয়া প্রবে এই মহারস॥
রক্ত উৎপল লাজে জলান্তরে বৈসে।
তাম্বুল বাতুল হৈল অধর পরশে॥
আঁখিযুগ নীলোৎপল পুণ্য দরশনে।
কার ভাগ্য বশে বিধি সৃজিল যতনে॥
পুণ্য ফলে লাগে যার অধরে অধর।
সহজে অমৃত পানে হইবে অমর॥
('পদ্মাবতীর রূপবর্ণনা' থেকে)

প্র : মর্সিয়া সাহিত্য কী?

উ : কারবালা ও ইসলামি বিয়োগান্তক কাহিনি নিয়ে মূলত মুসলমানদের রচিত সাহিত্যই মর্সিয়া সাহিত্য।

প্র : মর্সিয়া সাহিত্যের আদিকবি কে?

উ : শেখ ফয়জুল্লাহ। তার গ্রন্থের নাম জয়নালের চৌতিশা (১৫৭০)

প্র : মুক্তল হোসেন কী?

উ : মুহম্মদ খান রচিত পারসি থেকে অনূদিত (১৬৪৫) বাংলা মর্সিয়া সাহিত্যগ্রন্থ।

প্র : কয়েকজন উল্লেখযোগ্য শায়েরের নাম লেখ।

উ : ফকির গরীবুল্লাহ, সৈয়দ হামজা, মোঃ দানেশ।

প্র : দোভাষী পুথি বা পুথিসাহিত্য কী?

উ : বাংলা সাহিত্যে ১৭৬০ থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত সময়কে যুগসন্ধিকাল বলে। এ সময় হিন্দু কবিয়ালদের সঙ্গে মুসলিম শায়েরদের আবির্ভাব ঘটে। এই শায়েরেরা হিন্দি-উর্দু-বাংলা মিশ্রিত এক বিশেষ ধরনের ভাষায় (ব্রজবুলির উদ্ভব কি এভাবে কৃত্রিমতা নিয়েই ঘটে নি?) কবিগান করে। অবশ্য উত্তর ভারতীয় ও বিদেশি মুসলিম অধ্যুষিত নগর-বন্দর এলাকায় মুসলিম সমাজে এ ভাষা চর্চা হয়। কলকাতা-হাওড়া-হুগলির বন্দর এলাকায় এ ভাষারীতি মুসলিমদের প্রচলিত। বিশুদ্ধ বাংলার প্রতি ঘৃণাবোধও বাঙালি মুসলিমদের নিজ ভাষায় উর্দু-আরবি-পারসি শব্দের অনুপ্রবেশে উৎসাহ দেয়। বহুক্ষেত্রেই কাহিনি গ্রহণ করেন আরবি-পারসি-উর্দু থেকে। তবে এর সঙ্গে মিশে যায় প্রচলিত বাংলা উপকাহিনি বা লোককথা। আরবি-পারসি-উর্দু শব্দবহুল মিশ্র ভাষারীতির এই ধরনের গ্রন্থকে ইংরেজ লেখক সাহেব প্রথমে 'মুসলমানী বাংলা সাহিত্য' বলে অভিহিত করেন। সুকুমার সেন বলেছেন, 'ইসলামি বাংলা সাহিত্য'। এগুলোকেই দোভাষী পুথি বা পুথিসাহিত্য বলা হয়। আঠার শতকের শেষার্ধে ফকির গরীবুল্লাহ, মৌলা হামজা প্রমুখ এই মিশ্র ভাষারীতিতে কাব্য রচনা করেন। তবে একথা সত্য, মিশ্র ভাষারীতিতে কাব্য রচিত হলেও বাংলার মানুষ মুখে এই ভাষায় কথা বলতো না।

প্র : বটতলার পুথি কী?

উ : কলকাতার বটতলা নামক স্থানে অতি সস্তা কাগজ ও মুদ্রণে যে বই ছাপা হতো, যেগুলোর কাহিনি রুচির প্রশ্নে অনেক সময়ই নিম্নরুচির বলে বিবেচিত হতো, সেগুলোকে বটতলার পুথি বলা হয়। এই পুথিসমূহের ভাষা ছিল মিশ্র, পাঠক ছিল গ্রামের খুবই অল্পশিক্ষিত মানুষ।

প্র : মার্সিয়া সাহিত্যে একজন হিন্দু কবি ও তার কাব্যের নাম লিখ।

উ : রাধারমণ গোপ। গ্রন্থ : ইমামগণের কেচ্ছা, আফন্দনামা

প্র : জঙ্গনামা কী?

উ : জঙ্গনামা হলো যুদ্ধকাব্য। মুসলিম বীরত্বক কাহিনি নিয়ে রচিত মুসলিম কবিদের রচিত গ্রন্থ।

প্র : হেয়াত মামুদ কে ছিলেন?

উ : জঙ্গনামা ধারার কবি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রংপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭২৩ খ্রিষ্টাব্দে পারসি কাব্যের অনুসরণে লেখেন জঙ্গনামা নামক গ্রন্থ।

2020/5/11 13:05
Scanned with CamScanner

প্র : 'নবীবংশ' কার রচনা?
উ : সৈয়দ সুলতান।
প্র : 'আমীর হামযা' কী?
উ : ফকির গরীবুল্লাহ রচিত জঙ্গনামা শ্রেণির কাব্য।

নাথসাহিত্য ও অন্যান্য

প্র : নাথসাহিত্য কী?
উ : বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে শিব উপাসক নাথ-যোগী ও সিদ্ধাচার্যদের রচিত সাহিত্যই নাথ সাহিত্য হিসেবে পরিচিত।
প্র : নাথ সাহিত্য প্রধান কয় ভাগে বিভক্ত, কী কী?
উ : দুই ভাগে। ১) মীন নাথ ও তার শিষ্য গোরক্ষনাথের কাহিনি ২) রাজা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস। এই দুই কাহিনি অবলম্বন করেই নাথ যোগীদের অলৌকিক গল্প পল্লবিত হয়েছে।
প্র : গোরক্ষবিজয়ের পুথি কখন ও কোথায় পাওয়া যায়?
উ : অষ্টাদশ শতকে, বাংলায় সহদেব চক্রবর্তী ও রামাই পণ্ডিতের ধর্ম পুরাণে বা অনিল পুরাণে।
প্র : গোপীচন্দ্র কাহিনির প্রথম উল্লেখ কোথায় পাওয়া যায়?
উ : জয়নীর পদুমাবতে। এ বিষয়ে প্রথম বাংলা গ্রন্থ নেপালে রচিত সপ্তদশ শতাব্দীর নাটক 'গোপীচন্দ্র নাটক'।
প্র : 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস' কার রচনা?
উ : সুকুর মামুদের।

কবিওয়ালা ও শায়ের

প্র : কবিওয়ালা ও শায়েরের উদ্ভব ঘটে কখন?
উ : আঠার শতকের শেষার্ধে ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের মুখে কলকাতার হিন্দু সমাজে কবিওয়ালা ও মুসলিম সমাজে শায়েরের উদ্ভব ঘটে।
প্র : কবিওয়ালাদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম লিখ।
উ : গোঁজলা গুই, হরু ঠাকুর, এন্টনি ফিরিঙ্গি।

মৈমনসিংহ-গীতিকা

প্র : বাংলাদেশে গীতিকা সাহিত্যের কয় ধরনের গীতিকা প্রচলিত? কী কী?
উ : তিন ধরনের। নাথ গীতিকা, মৈমনসিংহ-গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা।
প্র : মৈমনসিংহ-গীতিকা কোন অঞ্চলের গীতিকাব্য?
উ : বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জের নিম্নাঞ্চলের।
প্র : কার অনুরোধে ও কার পৃষ্ঠপোষকতায় এ গীতিকাগুলো সংগ্রহ করা হয়?
উ : ড. দীনেশচন্দ্র সেনের অনুরোধে ও স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতায়।
প্র : কে এই গীতিকাগুলো সংগ্রহ করেন?
উ : চন্দ্রকুমার দে।
প্র : মৈমনসিংহ-গীতিকা বিশ্বের কতগুলো ভাষায় মুদ্রিত হয়?
উ : ২৩টি ভাষায়।
প্র : মৈমনসিংহ-গীতিকা কার সম্পাদনায় কোথা থেকে প্রকাশিত হয়?
উ : ড. দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।
প্র : 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' কী?
উ : পূর্ব-ময়মনসিংহ অঞ্চল বলে পরিচিত, বর্তমানে সুসং (সুষং) দুর্গাপুর, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ এলাকায় লোকমুখে প্রচারিত ও প্রচলিত কবিতা ও গীতসমূহের সংকলন। অবশ্য এই গীতের কোনো কোনোটির কাহিনি পার্শ্ববর্তী (বর্তমান হবিগঞ্জ জেলা) বানিয়াচঙ্গ কেন্দ্রিক। উল্লেখ্য, বানিয়াচঙ্গ বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ গ্রাম।
প্র : ময়মনসিংহের এই গীতগুলো সংগ্রহে উদ্যোগ গ্রহণ করেন কে?
উ : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ রচয়িতাও বটেন। অধ্যাপক সেন এই গীত ও পালাগুলো সংগ্রহের জন্য স্থানীয় উদ্যোগী যুবক চন্দ্রকুমার দে-কে নিয়োজিত করেন। চন্দ্রই প্রথমে প্রাপ্ত পালাগুলি সংগ্রহ করেন। তখন কথা রেকর্ডের ব্যবস্থা ছিল না। তাই মুখে মুখে প্রচলিত গীত ও পালাগুলি অনেক ধৈর্য নিয়ে পল্লির সাধারণ মানুষের মুখ থেকে তিনি লিখে লিখে সংগ্রহ করেন।
প্র : চন্দ্রকুমার দে কে ছিলেন?
উ : তিনি গ্রামীণ পাঠশালায় সামান্য বিদ্যা অর্জন করেন। মাসিক এক টাকা বেতনে মুদির দোকানে কাজ করতেন। পরে মুদির দুটাকা বেতনে গ্রামে তহশিলদারি করেন। তখনই গ্রামের সাধারণ মানুষের সঙ্গে গভীরভাবে তার মেশার সুযোগ হয়। গ্রামের গীত ও পালা সম্পর্কে চন্দ্রর আগ্রহ জন্মে। চন্দ্রকুমার ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে নেত্রকোণার আইথর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। (চন্দ্রকুমার দে সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য এই গ্রন্থের 'চন্দ্রকুমার দে' অংশ দ্রষ্টব্য।)
প্র : 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' কে সম্পাদনা করেন এবং তা কত সালে প্রকাশিত হয়?
উ : চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত পালা ও রূপকথাসমূহ পাণ্ডিত্যপূর্ণ সম্পাদনা করে একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখেন অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন। ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' নামে সংকলনটি প্রথম প্রকাশিত হয়।
প্র : এর দু-একটি পালা প্রথম কোন পত্রিকায় ছাপা হয়?
উ : দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'সৌরভ' পত্রিকায়। পালাগুলোর প্রকাশক ছিলেন : চন্দ্রকুমার দে।
প্র : ময়মনসিংহ অঞ্চল থেকে সংগৃহীত কয়েকটি পালা ও রূপকথার নাম লেখ।
উ : ১. মহুয়া : দ্বিজ কানাই প্রণীত
২. মলুয়া : রচয়িতা অজ্ঞাত (কারো অনুমান চন্দ্রাবতীর লেখা)
৩. চন্দ্রাবতী ও জয়চন্দ্র : নয়ানচাঁদ ঘোষ প্রণীত
৪. কমলা : দ্বিজ ঈশান প্রণীত
৫. দনু কেনারাম : চন্দ্রাবতী প্রণীত
৬. দেওয়ানা মদিনা : মনসুর বয়াতি প্রণীত
৭. বিদ্যাসুন্দর : কবিকঙ্ক প্রণীত
৮. রামায়ণ : চন্দ্রাবতী প্রণীত
৯. রূপবতী : কবির নাম অজ্ঞাত
১০. কাজলরেখা। ওই
১১. দেওয়ান ভাবনা : ওই
১২. কঙ্ক ও লীলা : রচয়িতা যার জন : দামোদর, রঘুসুত, নয়ানচাঁদ ঘোষ, শ্রীনাথ পেনিতা।
প্র : 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র মূল্য নির্ধারণ কর।
উ : এই সংগ্রহের প্রতিটি পালাই অমূল্য। কথিত শিক্ষিত সমাজের বাইরে সাধারণ মানুষ সাধারণ নীতিকথার মাধ্যমে সরল ভাষা প্রয়োগ করে এগুলো রচনা ও চর্চা করেছে। এখানে কোনো দেব-দেবী সৃষ্টি বা আল্লা-খোদার মাহাত্ম্য প্রচারের চেষ্টা নেই। হিন্দুদের বল্লাল সেনীয় কৃত্রিম যুক্ত এ সমাজ। অন্যদিকে মুসলিমদের কাঠমোল্লার ফতোয়াবাজি থেকেও দূরে। বৌদ্ধ কর্মবাদ, হিন্দুর নিষ্ঠা, মুসলিম একাত্মতার সমন্বয় 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র সমাজজীবনে দেখা যায়। এ সমাজের মেয়েরা যথেষ্ট মুক্ত ও স্বাধীন ছিল। কাউকে বিয়ে না করে আজীবন কুমারীব্রত পালনের অধিকার মেয়েরা ভোগ করত। মেয়েদের স্বাধীনভাবে বিচরণের অধিকার ছিল বলে পালাগুলোতে হিন্দু ছেলে মুসলিম মেয়ে অথবা হিন্দু মেয়ে মুসলিম ছেলের প্রণয় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অবশ্য সমাজ এ ধরনের বিয়েকে সমর্থন করে নি। এই পালাগুলোর মধ্যে সাম্প্রদায়িক কোনো সংঘাতের পরিচয় নেই। বরং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল নিদর্শন এগুলো। এর ভালো চরিত্রগুলো এবং মন্দ চরিত্রগুলো সম্প্রদায় নিরপেক্ষভাবে এসেছে। তাছাড়া এখানে প্রাচীন হিন্দু ও আগত মুসলিম (পারসি / উর্দু) সংস্কৃতির চমৎকার মিথস্ক্রিয়া লক্ষ করা যায়। এর ভাষা সহজ-সরল, কথা শব্দ ও রীতি অনুসারী। গ্রামের মানুষের প্রাণের ভাষায় মনের কথা 'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় ফুটে উঠেছে। তাই বাংলা সাহিত্যের বিচারে এর মূল্য অপরিসীম।
প্র : মহুয়া পালার পরিচয় দাও।
উ : নমশূদ্রদের ব্রাহ্মণ কবি দ্বিজ কানাই ১৬৫০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে মহুয়া পালা রচনা করেন বলে অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেনের ধারণা। এই পালার কাহিনির সঙ্গে কবির ব্যক্তিগত প্রেমবঞ্চনার বেদনার সাদৃশ্য রয়েছে।

2020/5/11 13:05
Scanned with CamScanner

কাহিনি। বেদে সর্দার হুমরা ডাকাত ছিল। তার ছোট ভাই মাইদকা। কাঞ্চনপুর গ্রামের প্রান্তদেশে ছয়মাসের শিশুকন্যাকে হুমরা চুরি করে পালিয়ে যায় এবং নিজ কন্যার ন্যায় বড় করে। এই কন্যাই 'মহুয়া'। ভরযুবতী বেদে দল বামনকান্দা গ্রামে এসে উপস্থিত হয়। ওই গ্রামের জমিদার নদের চাঁদের সভায় খেলা দেখাতে গেলে মহুয়া নদের চাঁদের চোখে পড়ে। মহুয়ার রূপে মুগ্ধ হয়ে নদের চাঁদ বেদে জনকে গ্রামে থাকার জায়গা ও চাষের জমি দেয়। এক সময় মহুয়া ও নদের চাঁদ পরস্পরকে ভালোবেসে ফেলে। তাদের এ সম্পর্ক জানত মহুয়ার সখী পালং। এক সময় হুমরা বেদে এ সম্পর্কের কথা জানতে পারে এবং এ সম্পর্ক অস্বীকার করে। কেননা সে তার পালিত পুত্র সুজনের সঙ্গে মহুয়ার বিয়ের কথা ভেবেছিল। তাছাড়া হুমরার ভয় ছিল যে, নদের চাঁদকে নিয়ে করে মহুয়া যদি অন্যত্র চলে যায় তাহলে মহুয়া নাচ-গান করে যে রোজগার করে তা সে হারাবে। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের আশংকা সে অনুভব করে। তাই রাতের অন্ধকারে হুমরা তার দল নিয়ে বামনকান্দা ত্যাগ করে। ওদিকে নদের চাঁদ মহুয়ার খোঁজে দেশ ত্যাগ করে। এক সময় উভয়ের পুনর্মিলন হয়। হুমরা মহুয়ার হাতে বিষলক্ষের ছুরি তুলে দেয় নদের চাঁদকে হত্যা করার জন্য। কিন্তু মহুয়া তাকে হত্যা না করে তাকে নিয়ে পালিয়ে যায়।

পথে নদী পারাপারের জন্য তারা এক সাধু সওদাগরের নৌকায় ওঠে। সওদাগরের চক্রান্তে তার লোকেরা নদের চাঁদকে নদীতে ফেলে দেয়। সওদাগর মহুয়াকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। তখন মহুয়া বুদ্ধি করে তার মাথায় বাঁধা পাহাড়ি তক্ষকের বিষ পানের সাথে মিশিয়ে সাধুসহ অন্যদের খাওয়ায় এবং নৌকা ডুবিয়ে জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মরক্ষা করে। নদের চাঁদকে খুঁজতে খুঁজতে এক সময় এক ভাঙ্গা মন্দিরে তাকে অত্যন্ত পীড়িত অবস্থায় পাওয়া যায়। সেখানে এক সন্ন্যাসীর দেখা পেয়ে মহুয়া তার কাছে আশ্রয় চায়। কিন্তু সে সন্ন্যাসীও মহুয়াকে পেতে উদ্গ্রীব হয়। তখন মহুয়া সন্ন্যাসীকে শর্ত দেয় সন্ন্যাসী যদি নদের চাঁদকে সুস্থ করতে পারে তার প্রস্তাবে মহুয়া রাজি হবে। সন্ন্যাসী নদের চাঁদকে নিয়ে মহুয়া সন্ন্যাসীর কুটির থেকে পালায়। বনের মধ্যে সন্ন্যাসী মহুয়া ও নদের চাঁদ ঘর বাঁধে। বনের মধ্যে বাঁশির ধ্বনি শুনে মহুয়া বুঝতে পারে তার সখী পালং ধ্বনি করে তাকে সতর্ক করে দিচ্ছে যে বেদের দল এ বনে পৌঁছে গেছে। মহুয়াকে খুঁজে পেয়ে বেদে দল নদের চাঁদকে হত্যা করার জন্য। কিন্তু মহুয়া নদের চাঁদকে হত্যা না করে নিজে আত্মঘাতী হয়। আর নদের চাঁদকে বেদে দল হত্যা করে। দুজনকে এক সঙ্গে মাটিচাপা দেয়া হয়।

প্র : মহুয়া পালার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি লেখ।

উ : ১. ছয় মাসের শিশু কইন্যা পরমা সুন্দরী
রাত্রি নিশাকালে হুমরা তারে করল চুরি
নাইরে তরঃ
গলায় কলসী বাইন্ধা জলে দুবা মরা
কোথায় পাব কলসী কইন্যা কোথা পাব দড়ীঃ
তুমি হও গহীন গাঙ্গ আমি দুবা মরি

প্র : মহুয়ার পালার প্রধান কয়েকটি চরিত্রের নাম লেখ।

উ : মহুয়া, নদের চাঁদ, হুমরা বেদে, সখী।

প্র : 'মলুয়া' পালার পরিচয় দাও।

উ : মলুয়া পালাটির রচয়িতা কে তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে এ সূচনাতে মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর একটি বন্দনা আছে। তাতে অনেকে মনে করে যে, পালাটির রচয়িতা চন্দ্রাবতী।

কাহিনি : সাত ভাইয়ের এক বোন মলুয়া। ঘাটে জল আনতে গিয়ে দেখে যুবক বিনোদকে। সে কুড়া (এক প্রকার প্রাণী) শিকার করে। হালুয়া দাস হাঁড়া গ্রামে কন্যা মলুয়া। মায়ের নাম অসমা। যুবক সুদর্শন, বংশও ভালো, কিন্তু জমি নেই, দরিদ্র। তাই বিয়েতে মত দেয় না হাঁড়া ধর। বিদেশে গেলে চান্দের উপর দেবে তুষ্ট হয় এবং তাদের বরে তার ধন হয়। এবার বিয়ে হয়। বিয়ের পরে কাজি কুদৃষ্টি পড়ে মলুয়ার উপর। নেতাই ফুঁকি নামে এক প্রৌঢ়াকে দিয়ে মলুয়ার নিকাহর প্রস্তাব পাঠায় সে। ক্ষমতার ভ ও ধনের লোভ দেখায়। আরো ভ

দুর্গাবরের জন্য চান্দ বিনোদ আবার বিদেশে যায়। তখন অর্থ কষ্ট দেখা দেয় বসুধার। সে সময়ও নেতাই মলুয়াকে প্রস্তাব দেয় এবং যথারীতি প্রত্যাখ্যাত হয়। বিনোদ দেশে ফেরে। কাজি এবার প্রকাশ্যে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করে এবং বিনোদকে দেশত্যাগ করায়। কাজি মলুয়াকে তুলে নিয়ে যায় সেওয়ানের বাড়ি। সেওয়ানও দেখেই মলুয়াকে পছন্দ করে এবং পেতে চায়। কৌশল করে মলুয়া সেওয়ানকে দিয়ে কাজিকে শাস্তি দেওয়ায় এবং নিজের পত্নীত্বকে ফিরে দেখে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য। উদ্ধারের পর সতীত্বের জিজ্ঞাসায় মলুয়া নিকটাত্মীয়দের প্রশ্নের মুখোমুখি হয়। পরে বিনোদ আত্মীয়দের চাপে অন্যত্র বিয়ে করে এবং মলুয়া ওই সংসারে চাকরানী হয়ে থাকে। শিকারে গেলে বিনোদকে কালসাপে দংশন করে। সেই বিষ মলুয়ার সতীত্বের গুণে নেমে যাওয়ায় সমাজ মলুয়াকে ঘরে তোলার পক্ষে বলে। কিন্তু বিনোদের কতিপয় আত্মীয় মলুয়াকে অসতী বলে। এই দুঃখে সবার সামনে মলুয়া নদীর জলে ডুবে আত্মহত্যা করে।

প্র : 'কাজলরেখা'র কাহিনি সংক্ষেপ লেখ।

উ : কাজলরেখা কোনো পালা নয়। এটা পদ্য ও গদ্যাকারে বর্ণিত রূপকথা। এর রচয়িতা কে তা জানা যায় না।

কাহিনি : ভটিয়াল মুল্লুকের এক সওদাগরের নাম ধনেশ্বর। তার এক কন্যা কাজলরেখা ও পুত্র রত্নেশ্বর। বাজি খেলে ধনেশ্বর হতদরিদ্রে পরিণত হয়। এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব ঘটে এবং তিনি প্রীত হয়ে ধনেশ্বরকে একটি আংটি ও একটি ধর্মমতী শুকপাখি দান করে। শুকপাখির পরামর্শে সেই আংটি বিক্রি করে বিক্রিত টাকায় পুনরায় বাণিজ্য করে ধনেশ্বর পূর্বধন আবার ফিরে পায়। শুকপাখি আরো বলে যে, তার কন্যার বিয়ে হবে মৃত পুরুষের সঙ্গে। তাই কাজলরেখাকে বনবাসে রেখে আসতে হবে। শুকপাখির পরামর্শে ধনেশ্বর কন্যা কাজলকে নিয়ে বনে যায়। সেখানে এক ভাঙ্গা মন্দিরের সিঁড়িতে বসিয়ে রেখে ধনেশ্বর কন্যার জন্য পানীয় জল আনতে গেল। এমন সময় কৌতূহলবশত কাজল মন্দিরে যেতেই মন্দিরের দারোজা বন্ধ হয়ে যায়। ধনেশ্বর ফিরে এসে সেই কথা বলতে পারে না। সেই মন্দিরে ছিল এক মৃত রাজকুমার। ছোঁয়া থেকে কাজল পিতাকে ফিরবার করে সব বললে ধনেশ্বর শুকপাখির কথার যথার্থতা পায়। পিতা কন্যা কাজলকে বলে, ওই মৃত রাজপুত্রই তোমার স্বামী। ধনেশ্বর চলে এল। ধনেশ্বর চলে যাবার পর আবার সন্ন্যাসীর আবির্ভাব ঘটে এবং স্বামীর গায়ে সুই ফোটালো, তোমার তুলে ফেল। এই পাতার রস নিয়ে চোখের সুই দুটো তুলবে। তাহলে তোমার স্বামী আবার বেঁচে উঠবে। আর তুমি তোমার নিজের পরিচয় নিজের মুখে দেবে না, ধর্মমতী শুকপাখি বলে দেবে তোমার পরিচয়। নিজে দিতে গেলে তুমি বিধবা হবে। সন্ন্যাসীর কথামতো সাত দিন ধরে অনবরত কাজলরেখা কুমারের গায়ের সুই তুলে শেষ করে। স্নান করে পবিত্র হয়ে চোখের সুই দুটো তুলবে ছেবে কাজল স্নানে যায়। পুকুর পাড়ে নিজ হাতের কঙ্কণ দিয়ে কাজলরেখা এক দরিদ্রের ১৩/১৪ বছরের কন্যাকে দাসী হিসেবে ক্রয় করে। দাসীকে কাজলরেখা পূর্বাপর ঘটনা বর্ণনা করে বলে, সে যেন মন্দিরে গিয়ে অপেক্ষা করে। স্নান সমাপনান্তে সে মন্দিরে আসছে। কঙ্কণদাসী মন্দিরে এসেই কুমারের চোখে ওই পাতার রস দিয়ে চোখের সুই তুলে নেয়। এতে কুমার জীবন ফিরে পেয়ে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কঙ্কণদাসীকে বিয়ে করে। স্নান সমাপনান্তে ফিরে এলে দাসী কুমারকে বলে যে, কাজলরেখাই তার কঙ্কণদাসী। সন্ন্যাসীর কথা ভেবে কাজল কোনো প্রতিবাদ করে না, নিজের পরিচয়ও দেয় না। প্রাসাদে গিয়ে নকল রানীর কাজকর্মে নানা অসংগতি এবং কাজলরেখার কাজকর্মে সুচারুত্ব দেখে রাজকুমারের সন্দেহ হয়। নকল রানী এই সন্দেহ আঁচ করতে পেরে রাজার এক বন্ধুর সঙ্গে কাজলরেখার মিথ্যে নিশিযাপনের নাটক তৈরি করে। এতে রাজকুমার কাজলরেখাকে সন্দেহ করে ও দ্বীপে নির্বাসন দেয়। সেই দ্বীপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল কাজলরেখার পিতা ধনেশ্বরের পুত্র রত্নেশ্বর অর্থাৎ কাজলের বড় ভাই। ধনেশ্বরের মৃত্যু হলে রত্নেশ্বর পিতার মতো বাণিজ্যে প্রসার ঘটায়।

2020/5/11 13:05
Scanned with CamScanner

রত্নেশ্বর সুন্দরী যুবতী কাজলরেখাকে জোরজবরদস্তি তুলে নিয়ে যায়। আসলে রত্নেশ্বর ও কাজলরেখা দুই ভাইবোন। খুব ছোটবেলা তারা বিচ্ছিন্ন হওয়াতে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে কেউ কাউকে চিনতে পারে নি। এদিকে কাজলরেখাকে দ্বীপে নির্বাসন দিয়ে কাজলের প্রকৃত স্বামী সেই রাজকুমার বিবাগীপ্রায়। পরিচয় না জেনে রত্নেশ্বর ঘোষণা করে যে, সে এক অপূর্ব সুন্দরী সমুদ্রকন্যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছে। তবে বিয়ের আগে এই কন্যার বংশ পরিচয় ধর্মমতী শুকপাখি সবার সম্মুখে বর্ণনা করবে। এই সংবাদ প্রচারিত হলে বিভিন্ন স্থানের রাজপুত্র ও ধনাঢ্যরা রত্নেশ্বরের প্রাসাদে সমবেত হয়। সেই সমাবেশে শুকপাখি কাজলরেখার জীবনেতিহাস বর্ণনা করলে ভাইবোনের পরিচয় প্রকাশ পায়। সমাবেশে কাজলরেখার প্রকৃত স্বামী সেই সূচবিদ্ধ রাজপুত্রও উপস্থিত ছিল। সে নিজের ভুল বুঝতে পেরে কাজলরেখাকে বধূর মর্যাদায় প্রাসাদে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। শুকপাখি স্বর্গে চলে যায়। প্রকৃত কঙ্কণদাসীর জীবন্ত সমাধি হয়।

প্র: 'দেওয়ানা মদিনা' পালা সম্পর্কে লেখ।

উ: বর্তমান হুবিগঞ্জ জেলার অধীন বাংলাদেশের বৃহত্তম গ্রাম বানিয়াচঙের দেওয়ানদের সম্পর্কে এ পালা। লেখক মননুর বয়াতি। নাম ছাড়া তাঁর আর কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে তিনি যে কবিত্বশালী এবং করুণরসসৃজনে পটু ছিলেন সে প্রমাণ এখানে আছে।

কাহিনি : বানিয়াচঙের সোনাফর দেওয়ানের দুই পুত্র আলাল আর দুলাল। হঠাৎ তার স্ত্রী মরণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় এবং স্বামীকে অনুরোধ করে তার মৃত্যুর পর দেওয়ান যেন দ্বিতীয় বিয়ে না করে। কেননা সৎমা তার সন্তানদের কখনো আপন ভাবতে পারবে না। কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুর পর সংসার রক্ষার জন্য দেওয়ান আবার বিয়ে করে। সৎমা এসে ভালো মানুষীর অভিনয় করে সকলের মন জয় করে নেয়। ষড়যন্ত্র করে সৎমা আলাল-দুলালকে মেলায় পাঠায় এবং জল্লাদকে বলে ওদের হত্যা করতে পারলে জল্লাদ ২০ পুড়া জমি পাবে। আলাল-দুলাল একে

অন্যের জীবনভিক্ষা চায় জল্লাদের কাছে। জল্লাদ দুভাইকে সাধু সওদাগরের কাছে তুলে দেয়। সাধু কাজলকান্দার ইরাধর ব্যাপারীর কাছে দুভাইকে বিক্রি করে দেয়। তারা সেখানে রাখালের কাজ করে। একটি গাছের নিচে আলালকে রেখে দেওয়ান সেকেন্দার আলালকে নিয়ে যায়। আলাল দেওয়ানের বাড়ি কাজ করে দিন মাইনে নেয় না। সে জানায় একবছর মাইনে নেবে। ১২ বছর পর আলাল মাইনে হিসেবে চায় বানিয়াচং শহরে মসজিদ করার জন্য ৫০০ মানুষ আর ২০০ পেঁচা। সেকেন্দার রাজি হয়। আলাল বাড়ি করতে গেলে সৎমার শত শত বাধা আসে কিন্তু আলাল সকল অধিকারের কথা বলে যুদ্ধে জিত হয়। ওদিকে পুত্রশোকে সোনাফর দেওয়ান অর্ধমৃত। দ্বিতীয়পক্ষে তার এক পুত্র হয় এবং সেই পুত্রই দেওয়ান হয়। সৎমার রাজত্বে সংসারে অরাজক অবস্থা সৃষ্টি হয়। পিতার সঙ্গে আলালের মিলন হয়। একদা মাঠে রাখালদের মুখে নিজেদের জীবন বৃত্তান্ত শুনে সেই সূত্রে আলাল দুলালের খুঁজে পায়। আলাল দুলালকে সেখে ফিরিয়ে নিতে চাইলে দুলাল জানায় ইরাধর ব্যাপারীর মেয়ে মদিনাকে সে বিয়ে করেছে এবং সুরুজা নামে তাদের এক পুত্র সন্তান আছে। তখন দুলালকে আলাল পরামর্শ দেয় মদিনাকে তালাক দিতে। কেননা সেকেন্দার দেওয়ানের দুকন্যা মমিনা, আমিনাকে দুভাই বিয়ে করবে। দেওয়ানির লোভে দুলাল মদিনার ভাইয়ের কাছে তালাকনামা দিয়ে আলালের সঙ্গে দেশে চলে যায় এবং দেশে গিয়ে মমিনাকে আলাল ও আমিনাকে দুলাল বিয়ে করে। মদিনা সেই তালাকনামা দেখে বিশ্বাস করে না। সে স্বামীর প্রতীক্ষায় থাকে। অনেকদিন হয়ে গেলেও স্বামী না আসা ভাই ও পুত্র সুরুজকে সে দুলালের কাছে পাঠায়। দুলাল শ্যালক ও পুত্রকে ফিরিয়ে দিয়ে বলে আর কখনো যেন তারা না আসে। পুত্রের মুখে এ কথা শুনে মদিনা উন্মাদিনীর মতো হয়ে এক সময় মৃত্যুবরণ করে। ওদিকে পুত্রকে এভাবে তাড়িয়ে দিয়ে দুলাল অনুশোচনায় দগ্ধ হয়। সে মদিনাকে না জানিয়ে কাজলকান্দায় মদিনার কাছে কথা চাইতে আসে। কিন্তু মদিনার মৃত্যুতে সে সংসার বিরাগী হয়ে ফকিরি জীবন বেছে নেয়। মদিনার কবরের উপর একটি কুঁড়েঘর বানিয়ে সেখানেই দুলাল থাকে।

প্র: 'দেওয়ানা মদিনা' কোন বিষয় নিয়ে রচিত?

উ: বানিয়াচঙের দেওয়ান সোনাফরের পুত্র আলাল ও দুলালের বিচিত্র জীবনকাহিনি এবং দুলাল ও গৃহস্থকন্যা মদিনার প্রেম কাহিনি এর মূল বিষয়।

প্র: 'দেওয়ানা মদিনা'র প্রধান কয়েকটি চরিত্রের নাম লেখ।

উ: আলাল, দুলাল, মদিনা, সোনাফর।

প্র: 'দেওয়ানা মদিনা'র পালাকে আর কোন নামে অভিহিত করা হয়?

উ: আলাল-দুলালের পালা।

প্র: 'কঙ্ক ও লীলা' পালার পরিচয় দাও এবং কাহিনি লেখ।

উ: 'কঙ্ক ও লীলা' পালার রচয়িতা একজন নয়। নামোদর দাস, রঘুসুত, শ্রীনাথ বেনিয়া, নয়ানচাঁদ ঘোষ এই চারজন পালাটির রচয়িতা। 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র পালাগুলি যে লোকমুখে এবং একাধিক কবির দ্বারা পরিবর্তিত, নবসৃজিত ও নতুনত্ব পেয়েছে এর বড় প্রমাণ 'কঙ্ক ও লীলা' পালা। বন্দনা অংশ এবং শেষের 'গায়েনের নিবেদন' অংশ বাদে এই পালায় ২৩টি পর্ব আছে। পর্বগুলো পৃথক নামকরণ করা হয়েছে। যথা : ১. কঙ্কের জন্ম ও পিতামাতার মৃত্যু; ২. মুরারি চণ্ডালের গৃহে কঙ্ক; ৩. গর্গের আলয়ে; ৪. বিপদের উপর বিপদ; ৫. লীলার যৌবনে পদার্পণ; ৬. যবন পিরের আগমন; ৭. পির ও কঙ্ক; ৮. গোপন দীক্ষা; ৯. সত্যপিরের পাঁচালি; ১০. কঙ্ককে জাতিতে তোলা; ১১. কঙ্কের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণগণের ষড়যন্ত্র; ১২. গর্গের মনে ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং কঙ্ক ও লীলার প্রাণনাশের সঙ্কল্প; ১৩. সুরভির মৃত্যু; ১৪. লীলার কঙ্ককে অন্বেষণ; ১৫. গর্গের ধন্না দেওয়া ও দৈববাণী; ১৬. বিচিত্র-মাধবের গমন; ১৭. লীলার কষ্ট; ১৮. যান্ত্রাসিকী গীতি; ১৯. শোক-গাথা; ২০. পুনরায় অনুসন্ধান; ২১. জনরব; ২২. মুরারিশাহ লীলা; ২৩. শেষ দৃশ্য।

কাহিনি : বিপদুরের অধিপতি ব্রাহ্মণ ধনরাজ ও তাঁর স্ত্রী বসুমতীর পুত্র কঙ্ক। জন্মের ছয় মাসের মধ্যে কঙ্কের মাতা-পিতার মৃত্যু হয়। 'তাই প্রতিবেশীরা শিশু কঙ্ককে 'খাবুরা' (যে মানুষ খায়) বলে ঘৃণা করে। দরিদ্র মুরারি চণ্ডাল ও তাঁর স্ত্রী কৌশল্যা কঙ্ককে লালন-পালনের জন্য গ্রহণ করার কিছু দিনের মধ্যে তারা সন্তানরূপে দেখে উভয়ে মারা যায়। শিশু কঙ্কের মুখে দেখে ব্রাহ্মণ গর্গ তাকে ঘরে আনে। ঘরে তাঁর স্ত্রী গায়ত্রী খুব খুশি হয়। কারণ তাদের একটি কন্যা সন্তান আছে, নাম লীলা; ছেলে পুত্র সন্তান ছিল না। কিন্তু অল্প দিন পরে গায়ত্রীর মৃত্যু হয়। গর্গের বাড়িতে তার শিশুকন্যা লীলার সঙ্গে কঙ্ক বেড়ে ওঠে। কঙ্ক মাঠে গরু রাখে, বাঁশি বাজায়, নিজে গীত তৈরি করতে পারে, সর্বোপরি সে সুদর্শন ও বুদ্ধিমান।

অন্যদিকে লীলার (পালাতে লীলার অসাধারণ রূপবর্ণনা আছে) সৌন্দর্য ও বুদ্ধিও আকর্ষণীয়। তারা পরস্পরের প্রতি অনুরাগ পোষণ করে; যদিও গর্গ জানে যে তারা ভাইবোনের মতো বড় হচ্ছে। এমন সময় বিপ্রপুরে সাকরেদ বা শিষ্য নিয়ে এক পির স্থান গ্রহণ করে। পির কঙ্কের মধ্যে সম্ভাবনা দেখতে পায় এবং মনে করে যে, যদি কঙ্ক তার দলে যোগ দেয় তাহলে তার প্রসার খুব দ্রুত হবে। পির সফলও হয়। কঙ্ক গোপনে পিরের কাছে দীক্ষিত হয় এবং কবিত্বগুণ আছে বিধায় সত্যপিরের পাঁচালি লেখে। সত্যপিরের ভক্ত যেহেতু হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বহু মানুষ, সেহেতু কঙ্কের নামের প্রসার হয় খুব দ্রুত। পিতৃপ্রতিম গর্গ কঙ্ককে ত্যাগ না করে পুনরায় জাতিতে তোলে। এতে কষ্ট হয় গোড়া প্রতিবেশীরা। তারা কঙ্কের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে এবং গর্গকে বোঝাতে সমর্থ হয় যে কঙ্ক তার কন্যা লীলার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক গড়েছে। এতে গর্গ ক্ষিপ্ত হয়ে সিদ্ধান্ত নেয়, কঙ্ক ও লীলাকে হত্যা করে সে নিজে জ্বলন্ত আগুনে পুড়ে মরবে। কঙ্কের খাবারে গর্গ কালজর (কালকূট বিষ) প্রয়োগ করলেও লীলার বুদ্ধিমত্তায় কঙ্কের মৃত্যু হয় না; [illegible]

Scanned with CamScanner

জানতে পারে যে, গর্দা তাকে সন্দেহ করে তখন গর্দা সেশতাকী হয়। গর্দা দৈববাণীতে জানতে পারে যে তার জন্যা লীলা ও কঙ্ক নিখোঁজ। তখন গর্দা কঙ্ককে অন্বেষণে ব্যস্ত হয়। বিভিন্নমাধব নামের এক শিষ্যকে সে প্রেরণ করে কঙ্কের অন্বেষণে। অনেক খুঁজের বিভিন্ন কঙ্কের দেখা পায় না। অবশেষে লোকমুখে রটে যায় এই কথা। 'দুর্বিষহ মরুতে কঙ্ক মরিবার জ্বলে।' বিভিন্নমাধব এই সংবাদ গর্দা ও লীলাকে জানালে লীলা দেহত্যাগ করে। কিন্তু এরপর হঠাৎ একদিন কঙ্ক ফিরে আসে এবং লীলার মৃত্যু সংবাদ পায়। শোকে মোহ্যমান পিতা গর্দা অন্ত কঙ্ক অবশেষে উভয়ে একত্রে সংসার ত্যাগ করে নীলাচলে গমন করে। এই ট্রাজিক পরিণতির মধ্য দিয়েই 'কঙ্ক ও লীলা' পালা সমাপ্ত হয়েছে।

প্রধান সাহিত্যিক ও তাঁদের কর্মের পরিচয়

আবদুল হাকিম

প্র : আবদুল হাকিম কে ছিলেন?
উ : সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলিম কবি। তিনি ১৬৯০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে মৃত্যুবরণ করেন ১৬৯০-এ। সম্ভবত সুধারামে তাঁর জন্ম। পিতা শাহ রাজ্জাক।

প্র : আবদুল হাকিমের কয়টি কাব্য পাওয়া গেছে?
উ : ৫ টি। ইউসুফ জোলেখা, নসুরনামা, নসুরের মজলিশ, সত্যোত্তি সয়ফুলমুলুক, হানিফার লড়াই।

প্র : মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে রচিত প্রবাদতুল্য তাঁর পঙ্‌ক্তি দুটি কি?
উ : যে সব বঙ্গেত জন্ম নিয়ে বঙ্গবাণী।
সে সব আমার জন্ম নির্ণয় না জানি ॥

প্র : কোন কাব্যে তিনি এই প্রবাদতুল্য পঙ্‌ক্তি দুটো দিয়েন?
উ : নসুরনামা।

প্র : তিনি কেন এ ধরনের পঙ্‌ক্তি লেখেন?
উ : মধ্যযুগে মুসলমানগণ বাংলাকে নিজেদের ভাষা মনে না করে পারসি-আরবি-উর্দুকে আপন ভাষা মনে করতো। এই পরভাষাপ্রীতিকে আঘাত করার জন্য আবদুল হাকিম এ ধরনের পঙ্‌ক্তি লেখেন।

আলাওল

প্র : আলাওলের জন্মসন কবে?
উ : (আনুমানিক) ১৬০৭।

প্র : তাঁর জন্মস্থান কোথায়?
উ : জোবরা গ্রাম, হাটহাজারি, চট্টগ্রাম মতান্তরে ফতেহাবাদ পরগনা, ফরিদপুর।

প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : কবি ও পণ্ডিত। বাংলা, সংস্কৃত, পার্সি, আরবি ভাষা জানতেন।

প্র : তিনি আরাকানে কী পেশায় নিয়োজিত ছিলেন?
উ : আরাকান-রাজ উমাদারের রাজসেনার সুপ্রাহারী।

প্র : আলাওলের পিতা কী করতেন?
উ : আলাওলের পিতা ফতেহাবাদের মজলিশ কুতুবের মন্ত্রী ছিলেন।

প্র : আলাওল তাঁর কর্মজীবন কোথায় শুরু করেন?
উ : আলাওল মগরাজের সেনাবাহিনীতে চাকরি নেন।

প্র : আলাওলের সময় আরাকানের রাজা কে ছিলেন?
উ : রাজা শ্রী সুধর্মা।

প্র : আরাকানে কে আলাওলকে কাব্য রচনায় উৎসাহিত করেন?
উ : প্রধান অমাত্য মাগন ঠাকুর।

প্র : এ পর্যন্ত আলাওলের কয়টি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়?
উ : ৭টি।

প্র : গ্রন্থগুলির নাম কী?
উ : পদ্মাবতী (১৬৪৮), সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল (১৬৬৯), হপ্ত পয়কর (১৬৬৫), সিকান্দরনামা (১৬৭২), তোহফা (১৬৬৪) বা তত্ত্বোপদেশ, রাগতালনামা এবং দৌলত কাজী অসমাপ্ত গ্রন্থ সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী (১৬৫৯)।

প্র : 'হপ্তপয়কর' গ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : 'হপ্তপয়কর' সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোনো এক সময়ের রচনা। আরাকান রাজসভায় সৈয়দ আলাওল এই কাব্য রচনা করেন। সম্ভবত ১৬৬৮ এ রচনাকাল। প্রসিদ্ধ কবি নিজামির পারস্য ভাষায় বর্তমান কাব্য রচনা করে রাজপুত্র বহরাম সাতরাত্রি ধরে সাতজন পরির কাছে যে সাতটি গল্প শোনেন তার সংকলন। পারসি ও বাংলা সাহিত্যের সম্পর্কের ইতিহাসে এই গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্র : 'পদ্মাবতী' কোন গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত?
উ : কবি মালিক মুহম্মদ জায়সির হিন্দিকাব্য পদ্মাবত অবলম্বনে।

প্র : পদ্মাবতী গ্রন্থের কাহিনি-সংক্ষেপ জানার (পদ্মাবতী গ্রন্থের কাহিনি-সংক্ষেপ জানার জন্য দ্রষ্টব্য : এই গ্রন্থের 'মুসলিম-রচিত পুথিসাহিত্য' অংশ।)

পদ্মাবতীকে আলাওলের শ্রেষ্ঠ রচনা বলে কেন?
এজন্যে কবির–
১. নাগরিক শিক্ষা
২. রুচির বৈদগ্ধ্য রূপ
৩. ভাবের গভীরতা
৪. ভাষা ও অলংকার প্রয়োগে বুদ্ধিদীপ্ততার পরিচয় পাওয়া যায় বলে।

প্র : 'রক্ত উৎপল সাজে জলান্তরে বৈসে।
তাহুল রাতুল হৈল অধর পরশে।'
কোন-কাব্যে আছে?

উ : আলাওলের পদ্মাবতী গ্রন্থের রূপ বর্ণনা রয়েছে।

প্র : 'পদ্মাবতী' কোন ধরনের রচনা?
উ : ঐতিহ্যাশ্রিত রোমান্টিক প্রেমকাব্য।

প্র : সিকান্দরনামা গ্রন্থটি কার রচনা? উৎস কী?
উ : আলাওলের রচনা। উৎ-নিজামি সমবস্তুর ফারসি কাব্য ইসকান্দার নামার সরল অনুবাদ।

প্র : তাঁর মৃত্যু হয় কত সনে?
উ : ১৬৮০ খ্রিষ্টাব্দ।

এন্টনি ফিরিঙ্গি

প্র : এন্টনি ফিরিঙ্গি কে ছিলেন?
উ : অষ্টাদশ শতকের বাংলা ভাষার কবিয়াল।

প্র : তাঁর প্রকৃত নাম কী? কোন জাতি?
উ : এন্টনি হেকম্যান। তিনি পর্তুগিজ।

প্র : তাঁর সম্পর্কে লেখ।
উ : তিনি খ্রিষ্টান হলেও বাঙালি কালী সাধক হিন্দুর মত জীবনযাপন করতেন। হিন্দু বিধবাকে বিয়ে এবং কলকাতার বউবাজারে ফিরিঙ্গি কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

প্র : তাঁর বিশিষ্টতা কী?
উ : তিনি চমৎকার বাংলা কবিগান গাইতে ও গান বাঁধতে পারতেন। তাঁর একটি বিখ্যাত গান অতি মজার সাদন ভাঙ্গি যে মা
নিয়েত ফিরিঙ্গি
যদি দয়া করে কৃপা কর
হে শিব মাতঙ্গী।

প্র : তাঁর জন্ম-মৃত্যু কোন সালে?
উ : তাঁর জন্মসন জানা যায় না, মৃত্যু ১৮৩৬ খ্রি.।

উইলিয়াম জোনস, স্যার

প্র : উইলিয়াম জোনস এর জন্ম তারিখ কত?
উ : ২৮.৯.১৭৪৬।

প্র : তাঁর জন্মস্থান কোথায়?
উ : ইংলান্ড।

প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : বহু ভাষাবিদ ও এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা।

প্র : তিনি প্রাচ্যভাষা শেখেন কোথা থেকে?
উ : অক্সফোর্ড থেকে।

প্র : তিনি কত সালে পারসি ভাষায় নাদির শাহের জীবনী অনুবাদ করেন।
উ : ১৭৭০

প্র : কত সালে তিনি কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন?
উ : ১৭৮৪ সালে (আজীবন সভাপতি ও সভাপতি ছিলেন)

প্র : তিনি কোন কোন গ্রন্থ সংস্কৃত থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন?
উ : 'শকুন্তলা', 'হিতোপদেশ', জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' ইত্যাদি।

প্র : তাঁর পৃতিস্তম্ভ কোথায় আছে?
উ : কলকাতায় সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল গির্জায়।

প্র : তাঁর মৃত্যু সন কত?
উ : ১৭৯৪ খ্রিষ্টাব্দ।

কবি কঙ্ক

প্র : কবি কঙ্ক কে ছিলেন?
উ : কবিকঙ্কণ বা বিদ্যাসুন্দর কাব্যের আদি কবি। কিশোরগঞ্জের ঘাজাঙ্কর নদীর তীরবর্তী বিপ্র গ্রামে ব্রাহ্মণ ঘরে তাঁর জন্ম। পিতা গুণরাজ, মাতা গুণবতী।

2020/5/11 13:05

Scanned with CamScanner

প্র : তাঁর জীবনকাল কত?
উ : তিনি কোন সময় বর্তমান ছিলেন, এব্যাপারে নিশ্চিত করে বলা যায় না। গবেষকগণ মনে করেন, তিনি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। সুকুমার সেনের মতে কবি কঙ্ক আরও পরের কবি।
প্র : তিনি কার বাড়িতে প্রতিপালিত হন?
উ : শৈশবে পিতৃমাতৃহীন নিরাশ্রয় কঙ্ক মুরারি ও কৌশল্যা নামধেয় এক চন্ডাল দম্পতির ঘরে পালিত হন। তারাই কঙ্ক নাম রাখেন।

কানাহরি দত্ত

প্র : মনসামঙ্গল কাব্যধারার আদি কবির নাম কী?
উ : কানাহরি দত্ত।
প্র : কানাহরি দত্তের কাব্যের উদাহরণ দাও।
উ : কানাহরি দত্তের নাম পাওয়া যায় বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গলে। তাতে একটি পঙ্‌ক্তি আছে: 'হরি দত্তের গীত মত লোপ পাইল কালে।' কানাহরি দত্তের রচনা লোপ পাওয়ায় এর উদাহরণ পাওয়া যায় না। বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ বর্তমানে মনসামঙ্গলের প্রাপ্ত প্রাচীনতম পুথি।
প্র : কানাহরি দত্তের সময় কত?
উ : আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, বিজয় গুপ্তের সময় শতাব্দী পূর্বে, অর্থাৎ ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ।

কোরেশী মাগন ঠাকুর

প্র : কোরেশী মাগন ঠাকুরের জন্ম কত সালে?
উ : ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দ (আনুমানিক)।
প্র : তাঁর জন্ম কোথায়?
উ : চট্টগ্রামে।
প্র : তিনি বিখ্যাত যে রাজসভার বাঙালি কবি ছিলেন তার নাম কী?
উ : রোসাঙ্গ।
প্র : মাগন ঠাকুরের পিতার নাম কী?
উ : বড়াই ঠাকুর (আরাকানের মন্ত্রী ছিলেন)।
প্র : আলাওল কার আশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতায় 'পদ্মাবতী' (১৬৫২) কাব্য রচনা করেন?
উ : কোরেশী মাগন ঠাকুরের।
প্র : কোন কোন ভাষায় আলাওলের দক্ষতা পান্ডিত্য ছিল?
উ : বাংলা, আরবি, পারসি, হিন্দি ও সংস্কৃত ভাষায়।
প্র : আলাওলের সর্বশ্রেষ্ঠ বলিষ্ঠ (১৬৫৯) কাব্য রচনার পৃষ্ঠপোষক কে?
উ : কোরেশী মাগন ঠাকুর।
প্র : কোরেশী মাগন ঠাকুরের অন্যতম কাব্য কী?
উ : 'চন্দ্রাবতী'।
প্র : তাঁর মৃত্যু কত সালে?
উ : ১৬৬০ সালে।

কৃত্তিবাস ওঝা

প্র : কৃত্তিবাস ওঝা কে?
উ : বাল্মীকির রামায়ণের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ অনুবাদক। তাঁর এ রামায়ণকে শ্রীরাম পাঁচালিও বলা হয়। মৈথিলি ব্রাহ্মণদের অসমিয়া ভাষায় ওঝা বলা হয়। এ শব্দটি এসেছে 'উপাধ্যায়' থেকে।
প্র : কৃত্তিবাসের পদবি কী ছিল?
উ : কৃত্তিবাসের পদবি ছিল মুখোপাধ্যায়।
প্র : প্রথম বাংলা রামায়ণ অনুবাদক যে ছিলেন? তাঁর কাব্যের কাহিনি উৎস উল্লেখ কর।
উ : বাংলা রামায়ণের আদি কবির নাম কৃত্তিবাস ওঝা। কবির কাব্যের 'আত্ম-পরিচয়' অংশ থেকে তাঁর বংশ পরিচয় পাওয়া যায়। আত্ম-পরিচয় অংশে কবি বলেছেন 'আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমীপূর্ণ (পুণ্য) মাঘ মাস/তিথি মধ্যে জন্ম সইলা কৃত্তিবাস।' যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মনে করেন ১৩৮৬-১৩৯৮ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে কৃত্তিবাসের জন্ম হয়। তাই মোটামুটি ১৪০০ থেকে ১৪৭৫ খ্রিষ্টাব্দ অর্থাৎ পনের শতকের কবি তিনি। নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামের মুখুটি বংশে তাঁর জন্ম। 'কৃত্তিবাস' তাঁর পিতামহ প্রদত্ত নাম।
প্র : কৃত্তিবাসের অনূদিত রামকাহিনির নাম কী ছিল? তাঁর কাব্যের মৌলিকতা কোথায়?
উ : শ্রীরাম পাঁচালি। কৃত্তিবাসী রামায়ণের

কয়েকটি আখ্যান কবি হলেও কল্পিত। তবে কিছু মৌলিক অংশ আছে। বীরবাহুর মৃত্যু, তরণীসেনের কাহিনি, মহীরাবণ-তরীরাবণের কথা, রামের অকালবোধন, হনুমান কর্তৃক রাবণের মৃত্যুবান হরণ, মৃত্যুপথযাত্রী রাবণের কাছে রামচন্দ্রের শিক্ষা, সীতার রাবণমূর্তি অঙ্কন ও রামের সন্দেহ, লব-কুশের যুদ্ধ প্রভৃতি কৃত্তিবাসের সৃষ্টি। পরবর্তীকালে দাশরথি রায় তাঁর পাঁচালিতে এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর নাটকে এই ঘটনাক্রম গ্রহণ করেন।
প্র : কৃত্তিবাসী রামায়ণ কার উদ্যোগে কোন্ বছর সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়?
উ : শ্রীরামপুরের খ্রিষ্টান মিশনের প্রাচ্য ভাষাবিদ উইলিয়াম কেরির উদ্যোগে ক্যালকাটা খণ্ড ১৮৩২-'৩৩ খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম কৃত্তিবাসী রামায়ণ শ্রীরামপুর মিশনের প্রেস থেকে প্রথম মুদ্রিত হয়।
প্র : "কৃত্তিবাস কীর্তিবাস কবি, এ বঙ্গের অলঙ্কার।"—কৃত্তিবাস সম্পর্কে এ মন্তব্য কে করেছিলেন?
উ : এ মন্তব্য করেছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
প্র : কৃত্তিবাসী রামায়ণকে বাঙালির জাতীয় কাব্য বলা হয় কেন?
উ : বাল্মীকির শালপ্রাংশু মহাভুজ রামচন্দ্র কৃত্তিবাসের লেখনীর স্পর্শে হয়ে গেছেন—'নবজলধর শ্যাম'। তুলসীচন্দনে লিপ্ত এই বিগ্রহ আমাদের সমাজের সঙ্গে আদ্যোপান্ত মিশে আছেন। অযোধ্যার রাজপরিবার যেন বাঙালির একান্নবর্তী পরিবার, যেখানে শত দুঃখে মুখ বুজে সংসার করছেন বাঙালি কুলবধূর প্রতিরূপ জানকী সীতা। তিনি আর্যনারীর মতো সরলা নন। রাবণের ভয়ে তিনি 'কাঁপেন যেন কলার বাগুড়ি।' ভরত লক্ষ্মণ আমাদেরই সহোদর। কৌশল্যাও বাঙালি মায়ের আদলে তৈরি। 'লাজে অধোমুখি সীতা'; দেবর লক্ষ্মণকে রেঁধে খাইয়েছেন বাঙালির খাদ্য। গুহকের গৃহে ভরত যা খেয়েছেন এবং ভরদ্বাজ ঋষি বানরবাহিনীকে যেসব ভোজ দিয়ে তৃপ্ত করেছেন, সে সবই বাঙালিসমাজের লোভনীয় খাদ্যসম্ভার। ভাত, পুচি, শুক্তিপিঠে, পুলি, পায়েস, রোহিত চিতল মাছের উল্লেখ করেছেন কৃত্তিবাস। এদেশের আটচালাঘর স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। বাঙালির কাছে কৃত্তিবাসী রামায়ণ বহুলাংশে জীবনরস সমৃদ্ধ একখানি ভক্তিগ্রন্থই নয় তার ঘনিষ্ঠ জীবনের কাব্য।
প্র : কৃত্তিবাস কোন রাজার রাজসভায় উপস্থিত হয়েছিলেন বলে অনুমিত?
উ : এ বিষয়ে পন্ডিতমহলে বিতর্ক আছে। বিতর্কের কারণ কৃত্তিবাস তাঁর 'আত্মপরিচয়' অংশে জনৈক গৌড়েশ্বরের উল্লেখ করেছেন। ড. দীনেশচন্দ্র সেন ও ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতে এই গৌড়েশ্বর ছিলেন রাজা গণেশ। আবার **বসন্তরঞ্জন রায় বলেন যে ইনি গণেশপুত্র যদু বা তাঁহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ।** ড. সুকুমার সেনের মতে ইনি সুবুদ্ধি রায় বা সেন বংশীয় দনুজমাধব কিংবা চট্টগ্রামের দনুজমর্দন হতে পারেন।

গোবিন্দদাস

প্র : গোবিন্দদাস কে ছিলেন?
উ : বৈষ্ণব পদকর্তা। চৈতন্যোত্তরকালে খ্যাতি অর্জনকারী কবিদের একজন।
প্র : তিনি কোথায়, কখন জন্মগ্রহণ করেন?
উ : মুর্শিদাবাদ জেলার জগবানগোলার নিকটবর্তী তেলিয়াবুধুরি গ্রামে, আনুমানিক ১৫৩৫ খ্রিষ্টাব্দে।
প্র : কোন কবি 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' নামে খ্যাত।
উ : গোবিন্দদাস। কবি বল্লভদাস অভিধা দিয়েছিলেন-গোবিন্দের কবিত্বগুণ, গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি।
প্র : গোবিন্দদাসের আসল পদবি কী?
উ : সেন।
প্র : গোবিন্দদাস রচিত সংস্কৃত নাটকের নাম কী?
উ : 'সংগীতমাধব'।
প্র : গোবিন্দদাস কোন পর্যায়ের পদকর্তা?
উ : পূর্বরাগ, অভিসার, মান, কলহান্তরিতা,

20/5/11 13:06

Scanned with CamScanner

বাসকসজ্জা, মাথুর প্রভৃতি পর্যায়ের পদকর্তা।

প্র : কোন পদ পর্যায়ে গোবিন্দদাস শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন?

উ : অভিসার পদ পর্যায়ে গোবিন্দদাস শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। সমালোচকের মতে অভিসার পর্যায়ে তিনি রাজাধিরাজ।

প্র : গোবিন্দদাসকে কার ভাবশিষ্য বলা হয়?

উ : বিদ্যাপতি।

প্র : গোবিন্দদাস কার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন?

উ : গোবিন্দদাস বিখ্যাত বৈষ্ণব ধর্মগুরু শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

প্র : গোবিন্দদাসকে কে 'কবিরাজ' উপাধি দেন।

উ : শ্রীজীব গোস্বামী।

প্র : গোবিন্দদাসের নামে কতগুলো বৈষ্ণবপদ পাওয়া যায়?

উ : প্রায় সাড়ে চারশত।

প্র : গোবিন্দদাসের কাব্যগুরু কে ছিলেন?

উ : মিথিলার কবি বিদ্যাপতি।

প্র : পদরচনার কোন দিক থেকে গোবিন্দদাসের তুলনা মেলে না?

উ : রাধার অভিসারের পদ রচনায়।

প্র : তার রচিত পদে কোন গুণ পাওয়া যায়?

উ : অলঙ্কারচাতুর্য, ছন্দ-ঝংকার ও রস-মাধুর্য গুণ।

প্র : গোবিন্দদাস রচিত যে একটি নাটকের নাম পাওয়া যায় তা কী?

উ : সঙ্গীতসাধক।

প্র : তাঁকে কবীন্দ্র উপাধি কে প্রদান করেন?

উ : জীব গোস্বামী

প্র : গোবিন্দদাস রচিত একটি পদের অংশবিশেষ লিখ।

উ : ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়।
ঈষত হাসির তরঙ্গ-হিলোলে
মদন মুরুছা পায়।

প্র : কত সালে তার মৃত্যু হয়?

উ : আনুমানিক ১৬১৩ খ্রিষ্টাব্দে।

চণ্ডীদাস

প্র : চণ্ডীদাস কে ছিলেন?

উ : চণ্ডীদাস বৈষ্ণব কবি ছিলেন। তবে কোন সময় তা সুনিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে তিনি বাশুলি দেবীর ভক্ত ছিলেন এবং বড়ু চণ্ডীদাস থেকে পৃথক ছিলেন একথা নিশ্চিত।

প্র : চণ্ডীদাস জাতিতে কী ছিলেন? তাঁর আরাধ্য দেবতার নাম কী?

উ : চণ্ডীদাস জাতিতে ছিলেন ব্রাহ্মণ। তাঁর আরাধ্য দেবতার নাম বাশুলী বা বিশালাক্ষী।

প্র : চণ্ডীদাস কোন সময়ের কবি?

উ : চণ্ডীদাস চৈতন্যপূর্ব যুগের কবি ছিলেন।

প্র : চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকে কীরূপ ভূমিকায় স্থাপন করেছেন।

উ : চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকে সম্পূর্ণ পৌরাণিক ভূমিকায় স্থাপন করেছেন।

প্র : চণ্ডীদাসের সাধনসঙ্গিনী কে ছিলেন।

উ : চণ্ডীদাসের সাধনসঙ্গিনী ছিলেন রামী নাম্নী এক রজকিনী।

প্র : চণ্ডীদাস কোন ধরনের কবি ছিলেন?

উ : সহজিয়াপন্থী।

প্র : কোন পদপর্যায়ে চণ্ডীদাস শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন?

উ : পূর্বরাগ পর্যায়ে। তিনি এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি।

প্র : চণ্ডীদাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কী মন্তব্য করেছিলেন?

উ : 'চণ্ডীদাস সহজ ভাষায় সহজ ভাবের কবি- এই গুণে তিনি বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদের মধ্যে প্রধান কবি।'

প্র : চৈতন্য-পূর্ব যুগের দুজন বিখ্যাত পদাবলি রচয়িতার নাম কর।

উ : চৈতন্য-পূর্ব যুগের দুজন বিখ্যাত পদাবলি রচয়িতা হলেন চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি।

প্র : চণ্ডীদাস তার পদে রাধার কোন মূর্তি চিত্রিত করেছেন?

উ : প্রথম থেকেই চণ্ডীদাস রাধার বৈরাগ্যবতী তপস্বিনী মূর্তি চিত্রিত করেছেন। তাঁর রাধার চরিত্রে মর্ত্যচেতনা নেই।

প্র : চণ্ডীদাসকে কে সুদূরের কবি বলেছিলেন?

উ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চণ্ডীদাসকে সুদূরের কবি বলেছিলেন।

প্র : চণ্ডীদাস কতজন? বা চণ্ডীদাস সমস্যা কী?

উ : প্রত্যন্তে বাংলা কাব্যে অন্তত চারজন চণ্ডীদাসের কবিতা পাওয়া যায়। এরা হলেন : বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস, চণ্ডীদাস। এই চারটি নামের মধ্যে শেষ তিনটি নাম একজনের নাকি তাঁরা পৃথক কবি তা নিশ্চিত করে আজও বলা যাচ্ছে না। এই সমস্যাকেই চণ্ডীদাস-সমস্যা বলে।

প্র : চণ্ডীদাসের নামে কোন প্রেমকাহিনি প্রচলিত?

উ : বাশুলি মন্দিরের পুরোহিত চণ্ডীদাস রামী নামের এক রজকিনীর প্রেমে মুগ্ধ হন। তিনি রামীর মধ্যে রাধারূপ দেখেন। জমিদার এই প্রণয়কে অবৈধ আখ্যা দিয়ে চণ্ডীদাসকে সমাজচ্যুত ও মন্দির থেকে বিতাড়িত করে।

প্র : চণ্ডীদাসকে বাংলা ভাষার প্রথম মানবতাবাদী কবি বলা হয় কেন?

উ : তিনি 'শুনহ, মানুষ ভাই/ সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপর নাই' বলে জাত-পাতযুক্ত সমাজে প্রথম মানবতার বাণী কাব্যে ধারণ করেছেন বলে। তাছাড়া ব্যক্তিজীবনেও তিনি জাত-সংস্কারের ঊর্ধ্বে ছিলেন। অনেকে যে বলে থাকেন, মানবতার বাণী আমরা ইউরোপ থেকে পেয়েছি, চণ্ডীদাসের এই বাণী তা ভুল প্রমাণ করে।

প্র : 'আমারি বধুয়া আন বাড়ি যায় / আমারি আঙিনা দিয়া' কোন কবির রচনা?

উ : চণ্ডীদাস (দ্বিজ)

প্র : চণ্ডীদাস বৈষ্ণব কবি ছিলেন। বৈষ্ণব কী?

উ : বিষ্ণুর উপাসকদের বৈষ্ণব বলে। শ্রীচৈতন্য ঈশ্বরের বিষ্ণু অবতাররূপকে রাধা-কৃষ্ণ প্রতীকে ভক্তি করেছেন। এই মতের অনুসারীদের বৈষ্ণব বলে।

চন্দ্রাবতী

প্র : চন্দ্রাবতী কে ছিলেন?

উ : মধ্যযুগের তিনজন প্রধান মহিলাকবির একজন। অপর দুইজন চণ্ডীদাসের অনুরাগী রামী ও চৈতন্যের কৃপাপাত্রী মাধবী।

প্র : চন্দ্রাবতীর জীবনকাল কত শতাব্দী?

উ : ষোড়শ শতাব্দী।

প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জের পাতোয়ারি গ্রামে।

প্র : চন্দ্রাবতীর পিতা কে ছিলেন?

উ : মনসামঙ্গলের কবি দ্বিজ বংশীদাস।

প্র : কত খ্রিষ্টাব্দে চন্দ্রাবতী জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১৫৫০ খ্রিষ্টাব্দে

প্র : চন্দ্রাবতী রচিত কাব্যগুলোর নাম কী?

উ : মলুয়া, নসু কেনারামের পালা, রামায়ণ ইত্যাদি।

প্র : তাঁর রচিত রামায়ণ বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে কেন?

উ : লৌকিক, মানবিক ও কিছু মৌলিক উপাদান সংযোগের ফলে।

প্র : মহিলা রামায়ণকার কাকে বলা হয়?

উ : চন্দ্রাবতীকে।

প্র : তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য কী?

উ : ষোড়শ শতাব্দীর সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা তাঁর রচনায় প্রতিফলিত।

জ্ঞানদাস

প্র : জ্ঞানদাস কে ছিলেন?

উ : চৈতন্যোত্তর বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কবি।

প্র : কোথায়, কখন তিনি জন্মগ্রহণ করেন?

উ : পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার কাটোয়ায়, ষোড়শ শতাব্দীতে।

প্র : জ্ঞানদাস কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করেন?

উ : আনুমানিক ১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দে।

প্র : জ্ঞানদাস কোন সময়ের কবি?

উ : চৈতন্য উত্তর যুগের ষোড়শ শতাব্দীর কবি।

প্র : জ্ঞানদাস কার শিষ্য ছিলেন?

উ : বৈষ্ণবগুরু নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবী দেবীর শিষ্য ছিলেন।

প্র : জ্ঞানদাস কোন কবিসম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন?

উ : জ্ঞানদাস খেতুরীর বৈষ্ণব কবিসম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন।

2020/5/11 13:06

Scanned with CamScanner

প্র : খেতুরীর কবিসম্মেলনে কাদের সঙ্গে জ্ঞানদাসের পরিচয় হয়েছিল?
উ : এখানে গোবিন্দ দাস ও বলরাম দাসের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিলো?
প্র : কোন প্রাচীন কবির রচনাধারাকে অনুসরণ করে জ্ঞানদাস পদ রচনা করেন?
উ : চণ্ডীদাস। বলা হয় তিনি চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য ছিলেন।
প্র : জ্ঞানদাস কী কী বিষয়ে কবিতা লিখেছেন?
উ : শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, নৌকাবিলাস ও দানখণ্ড প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানদাস কবিতা লিখেছেন।
প্র : জ্ঞানদাস কোন কোন ভাষায়, আনুমানিক কতগুলো পদ লেখেন?
উ : বাংলা ও ব্রজবুলি ভাষায়, রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক প্রায় দুশ পদ লেখেন।
প্র : তাঁর রচিত দুটি বৈষ্ণব গীতিকাব্যের নাম লেখ।
উ : মাথুর ও মুরলীশিক্ষা
প্র : জ্ঞানদাসের পদরচনার মূল বিষয় কী?
উ : প্রেম, সৌন্দর্য ও আধ্যাত্মিকতা
প্র : পদ রচনার সময় তিনি রাধা-কৃষ্ণের কোন বয়সকে গুরুত্ব দেন?
উ : কিশোর-কিশোরী বয়সকে।
প্র : প্রণয়ের কোন কাল বা রাগ তাঁর রচনায় চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে?
উ : পূর্বরাগ
প্র : জ্ঞানদাসের একটি বিখ্যাত পদের কিছু অংশ লেখ :
উ : সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু
আনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল ॥

দৌলত উজির বাহরাম খান

প্র : দৌলত উজির বাহরাম খান এর জন্ম কোথায়? পিতা কে?
উ : ফতেহাবাদ, চট্টগ্রাম। পিতা চট্টলাধিপতির উজির মোবারক খান।
প্র : তাঁর প্রকৃত নাম কী?
উ : আসাউদ্দীন
প্র : তাঁর উপাধি কী?
উ : দৌলত উজির বাহরাম খাঁ।
প্র : তাঁর রচিত প্রথম কাব্যের নাম কী?
উ : 'জঙ্গনামা' বা 'মকুল হোসেন'
প্র : তাঁর রচিত দ্বিতীয় কাব্যের নাম কী?
উ : লায়লী মজনু (১৫৪৩-১৫৫৩)
প্র : তাঁর লায়লী মজনু কার কাব্য অবলম্বনে রচিত?
উ : পারসি কবি আবদুর রহমান জামির লায়লী মজনু (১৪৪৮)।
প্র : তিনি কী কী ভাষার পারদর্শী ছিলেন?
উ : আরবি ও পারসি ভাষা এবং ইসলাম ধর্মশাস্ত্রের মত হিন্দু ধর্মশাস্ত্র ও সাহিত্য ভাষায়।
প্র : লাইলী মজনুর মত বিশ্বখ্যাত বিরহকে নিয়ে বাংলা ভাষায় প্রথম কে কাব্য রচনা করেন?
উ : দৌলত উজির বাহরাম খান
প্র : তাঁর লাইলী মজনু কাব্যের বৈশিষ্ট্য কী?
উ : জামির কাব্যে আধ্যাত্মিকতা প্রধান ছিল, বাহরাম খার কাব্য মানবিক প্রেমের প্রধান।

দৌলত কাজী

প্র : দৌলত কাজীর জীবনকাল কত?
উ : আনুমানিক ১৬০০ থেকে ১৬৩৮ খ্রি.।
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : সুলতানপুর গ্রাম, রাউজান, চট্টগ্রাম।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : মধ্যযুগের বিশিষ্ট কবি।
প্র : তিনি কী কী ভাষায় জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন?
উ : বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দি ও ব্রজবুলি ভাষায়।
প্র : দৌলত কাজী কার উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা হিন্দি কাব্য অবলম্বনে কাব্য রচনায় উৎসাহী হয়?
উ : আরাকানের রাজা সুধর্মের সমর সচিব আশারাফ খানের।

প্র : তাঁর রচিত কাব্যের নাম কী?
উ : সতী ময়না ও লোর চন্দ্রাণী।
প্র : এই গ্রন্থের মূল কী?
উ : তিনি কবি সাধনের মৈনাসৎ নামক কাব্য।
প্র : তাঁর এ কাব্য কোন দুইটি ভাষার মিশ্রণে রচিত?
উ : বাংলা ও ব্রজবুলি।
প্র : তিনি তাঁর রচনায় কোথা থেকে অনুষঙ্গ গ্রহণে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন?
উ : রামায়ণ, মহাভারত ও বৈষ্ণব পদাবলি।
প্র : কাব্য রচনার শেষ পর্যায়ে তাঁর মৃত্যু হলে কে তা সম্পূর্ণ করেন?
উ : আলাওল (১৬৫৯)।
প্র : 'লোরচন্দ্রাণী' কাব্যটি কোন ছন্দে রচিত?
উ : পয়ার ত্রিপদী ছন্দে।
প্র : দৌলত কোন মতাবলম্বী মুসলমান ছিলেন?
উ : সুফি মতাবলম্বী।
প্র : রোসাঙ্গ রাজসভা কোথায়? এখানে চর্চিত বাংলা ভাষা গুরুত্বপূর্ণ কেন?
উ : একজন কবির কবিতা থেকে প্রসঙ্গ অবতারণা করা যেতে পারে। কবি দৌলত কাজী তাঁর 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রাণী' গ্রন্থে লিখেছেন: 'কর্ণফুলী নদী পূর্বে আছে এক পুরী / রোসাঙ্গ নগরী নাম স্বর্গ অবতারী ॥ / তাহাতে মগধ বংশক্রমে যুদ্ধাচার / নাম গিরি থুধম্মা রাজা ধন অবতার॥ / প্রতাপে প্রভাত ভানু বিখ্যাত ভুবন / পুত্রের সমান করে প্রজার পালন ॥ / দেব গুরু পুজ এ ধর্মেতে তান মন / সে পদ দর্শনে হএ পাপের মোচন ॥ / পুণ্যফলে দেখে যদি রাজার চরণ / নারকীও স্বর্গ পাএ সাফল্য জীবন ॥' দৌলত কাজী এভাবে রোসাঙ্গ নগরীর রাজা শ্রীসুধর্মার খুব প্রশংসা করে বলেছেন, এই রাজা পুত্রের মতো করে প্রজাপালন করেন। আরাকান বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে অবস্থিত এবং অতি প্রাচীনকাল থেকে সাংস্কৃতিকভাবে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত। রাজা নরমিখলা ১৪৩০ সালে লেমব্রু নদীর তীরে 'ম্রোহং' নামক স্থানে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। এই 'ম্রোহং'-এর বাঙলা সম্ভার ম্রোংরাজসভা হিসেবে পরিবর্তিত হয়ে রূপ নেয় 'রোসাঙ্গ'। পরে মগরাজা আরাকানকেই 'রোসাঙ্গ' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে বাংলা সাহিত্যে। অতএব, আরাকানেই 'রোসাঙ্গ রাজসভা'। আরাকান অঞ্চলটি বর্তমানে মিয়ানমারের 'রাখাইন স্টেট' নামে পরিচিত একটি প্রদেশ।

আরাকানের মগরাজারা ছিলেন বৌদ্ধ ছিলেন এবং ধর্মের ভিন্নতার মানুষকে পর ভাবতেন না। প্রতিভা মূল্যায়নের মাধ্যমে নিজেদের রাজকার্যে পরিপক্কতা ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মুসলমানদেরও সমাদর করতেন তারা। তারা সবাইকে স্বাধীনভাবে সাহিত্যচর্চার উৎসাহ দেন। অতীতকালে আন্তর্জাতিক সীমারেখা এতোটা প্রকট না থাকায় চট্টগ্রামের সাথে এই অঞ্চলের যোগাযোগ ছিল প্রবল। তাই বাংলা ভাষার ঢেউ পৌঁছে আরাকানেও। অরাকানে বা রোসাঙ্গ এলাকায় বাংলা সাহিত্যের দুটি ধারা লক্ষণীয়: একটি ধর্মীয় বিষয় অবলম্বনে রচিত সাহিত্য, অপরটি ধর্মনিরপেক্ষ ধারার রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান। আর এক্ষেত্রে আরাকানে বৌদ্ধ রাজাদের সমর্থন ছিল ব্যাপক। তাদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় মহাকবি আলাওল তাঁর সাহিত্যসাধনা করেছেন। মৌলিক রচনা এবং বিশেষত অনুবাদ সাহিত্যে আরাকানের বাংলাভাষী কবিদের অনন্য অবদানের কথা আমাদের জানা। আরাকানে বাংলা সাহিত্যচর্চাকারীদের মধ্যে দৌলত কাজী অন্যতম। চট্টগ্রামের রাউজান থানার সুলতানপুর গ্রামের কাজি বংশের সন্তান কবি দৌলত কাজী আরাকানে বাংলা সাহিত্যচর্চা করেন। এমনকি তিনি আরাকানে রাজসভার কাজির পদেও নিযুক্ত ছিলেন। এ কবি সাহিত্যের গতানুগতিক পথ মাড়িয়ে বাস্তবতার নিরিখে মানবীয় প্রেমকে উপজীব্য করে 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রাণী' কাব্যরচনা করেন। তিনি

2020/5/11 13:0
Scanned with CamScanner

আরাকানের রাজা থিরি থু ধম্মার (শ্রীসুধর্মা) রাজত্বকালের (১৬২২-'৩৮ খ্রি.) মধ্যেই তাঁর উজির আশরাফ খানের আদেশ ও পৃষ্ঠপোষকতায় এ কাব্য রচনা শুরু করেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর কাব্য সমাপ্ত করার আগেই মাত্র ৩৮ বছর বয়সে মারা যান। মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের অন্যতম কবি আলাওল। তিনি আরাকানে অশ্বারোহী সৈন্য পদে চাকরি করলেও আরাকানের রাজশক্তির সুনজরে আসেন এবং তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতাতেই ১৬৫১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৬৭৩ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যেই তাঁর কাব্যগুলো রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা 'পদ্মাবতী' অনুবাদ হলেও মৌলিকতার পরাকাষ্ঠায় উত্তীর্ণ। আরাকানের রাজসভায় জ্ঞানীদের ব্যাপক কদর ছিল, ধর্মের ভেদ মুখ্য ছিল না। বৌদ্ধ রাজারা উলামা, সৈয়দ, শেখ সবাইকে সম্মান দিয়ে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পদে সমাসীন করেছিলেন। আর এ কারণেই আরাকানে মুসলমানদের বিকৃতি ঘটেছে, বাংলা সাহিত্যেরও চর্চা হয়েছে সেসময়। কবি আলাওল রাজপৃষ্ঠপোষকতায় দৌলত কাজী রচিত অসমাপ্ত 'সতী ময়না লোর চন্দ্রাণী' কাব্যটি সমাপ্ত করেন। মূলত এটি কবির মৌলিক রচনা। তিনি আরাকানের রাজা থু ধম্মার শাসনামলে স্বীয় প্রধান অমাত্য মাগন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় 'সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল' রচনা শুরু করেন। আলাওল ১৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানের মুখ্য সেনাপতির আদেশ ও পৃষ্ঠপোষকতায় 'সপ্তপয়কর' কাব্য রচনা করেন। 'তোহফা' আলাওলের একটি অন্যতম বিখ্যাত ও উপদেশমূলক কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থটি ১৬৬৩-'৬৪ খ্রিষ্টাব্দে কবি আলাওল আরাকানের মহামাত্য মুহম্মদ সোলায়মানের আদেশে সৃজনশীলধারায় কাব্যানুবাদ সম্পন্ন করেন। 'সিকান্দরনামা' আলাওলের শেষ কাব্যগ্রন্থ। কবি আলাওল আরাকানের রাজা থিরি থু ধম্মার প্রধান অমাত্য নবরাজ মজলিশের আদেশ ও পৃষ্ঠপোষকতায় ১৬৭১ থেকে ১৬৭৩ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে এটি রচনা করেন। রোসাঙ্গ রাজসভার কবিদের কোরেশী মাগন ঠাকুরও 'চন্দ্রাবতী' কাব্য রচনা করেন। কবি মরদনও এ সময় কাব্যরচনা করে বাংলা সাহিত্যের বিকাশে অবদান রাখেন। আরাকান রাজসভায় প্রতাবিত কবিদের মধ্যে সপ্তদশ শতাব্দীর শক্তিশালী কবি নসরুল্লাহ খোন্দকার। এ কবির তিনটি প্রধান কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায় যথা: 'জঙ্গনামা', 'মুসার সওয়াল' ও 'শরীয়তনামা'। এ ছাড়াও অনেক কবি আছেন যাঁদের অবদানে রাজসভায় বাংলাচর্চা অব্যাহত ছিল। এসব গ্রন্থ পর্যালোচনা করলে ধর্মীয় আখ্যানের পুনর্সৃষ্টির দৃষ্টান্ততো মিলবেই উপরন্তু সমকালীন ইতিহাস, ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মিলনভাব, ভৌগোলিক অবস্থা, ছন্দ, শব্দচেতনা, মানুষের বৃত্তি সম্পর্কে অনুধাবন ইত্যাদি বহুবিষয়ে ধারণা পাওয়া যাবে। তবে, একটি জিজ্ঞাসাও ভেতরে আসবে এবং তাহলো, যেই রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যের এমন বিকাশ যে হলো, সেই রাজপৃষ্ঠপোষকতা কালক্রমে থেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাসাহিত্যচর্চা একেবারে হারিয়ে গেল, তার কারণ কী? তার কি এই সাহিত্যচর্চার মধ্যে প্রাণের জোর যোগ ছিল না? এই জিজ্ঞাসা মনে রেখে বলা দরকার, রোসাঙ্গ রাজসভায় সৃষ্ট বাংলা সাহিত্য শুধু বিষয়ে নয়, উপস্থাপনার চমৎকারিত্বেও মধ্যযুগের অমর সৃষ্টি।

দ্বিজ বংশীদাস

প্র : দ্বিজ বংশীদাসের জন্মস্থান কোথায়?
উ : পাতোয়ারি গ্রাম, কিশোরগঞ্জ।
প্র : তাঁর জীবনকাল লেখ?
উ : ষোড়শ শতাব্দী।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : কবি।
প্র : তিনি কী কী শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন?
উ : সংস্কৃত, পুরাণ, আগম, তন্ত্রাদি শাস্ত্রে।

প্র : তিনি কোন কাব্যের অন্যতম প্রধান কবি?
উ : পদ্মপুরাণ বা মনসামঙ্গল।
প্র : তিনি কখন মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন?
উ : ১৫৫৭-এ।
প্র : তিনি তাঁর কাব্যে কী দৃঢ়তার সঙ্গে অঙ্কন করেন?
উ : লেহুলার দুঃখের চিত্র ও চাঁদ সওদাগরের চরিত্রের সৃষ্টতা।
প্র : দ্বিজ বংশীদাস রচিত অন্য কাব্যগুলো কী?
উ : কৃষ্ণ গুণার্ণব, রামগীতা ও চণ্ডী।

বড়ু চণ্ডীদাস

প্র : বড়ু চণ্ডীদাস কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ছাতনা, বাঁকুড়া মতান্তরে বীরভূমের নানুর গ্রামে।
প্র : তিনি কবে জন্মগ্রহণ করেন।
উ : নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে আনুমানিক ১৩০৯ খ্রিষ্টাব্দ (বসন্তরঞ্জনের মতে)।
প্র : বড়ু চণ্ডীদাস কী রচনা করেন?
উ : তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।
প্র : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থকে অন্য কী নামে অভিহিত করা হয়?
উ : শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ। ('শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য : এই গ্রন্থের 'মধ্যযুগ' অংশ।)
প্র : এই গ্রন্থের রচনা কোন সময়?
উ : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ চতুর্দশ থেকে পঞ্চদম শতাব্দী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ কালে গ্রন্থটি রচিত বলে মনে করেন।
প্র : এই গ্রন্থের বিষয় কী?
উ : রাধাকৃষ্ণের প্রণয় বর্ণনার মাধ্যমে ঈশ্বরতত্ত্ব প্রকাশ।
প্র : এই প্রণয়ে দৈব না মানবিক গুণ প্রকাশিত?
উ : মানবিক।
প্র : রাধা ও কৃষ্ণ কীসের প্রতীক?
উ : রাধা এই জীবলোকের জীবত্মা এবং কৃষ্ণ ঈশ্বর বা পরমাত্মার প্রতীক।
প্র : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থ কয় খণ্ডে রচিত? এখানে চরিত্র কয়টি?
উ : গ্রন্থটি ১৩ খণ্ডে বিভক্ত, কাব্যে রচিত। চরিত্র তিনটি: রাধা, কৃষ্ণ, বড়াই।
প্র : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থ কে, কখন, কীভাবে আবিষ্কার করেন?
উ : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও পুথিশালার অধ্যক্ষ বসন্তরঞ্জন রায় ১৯০৯ (১৩১৬ বঙ্গাব্দ) খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কর্কিল্যা গ্রামের এক ঘুহস্থবাড়ির গোয়াল ঘর থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের একটি হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন।
প্র : গ্রন্থটির নাম শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কে রাখেন?
উ : এর আবিষ্কারক বসন্তরঞ্জন রায় নিজে।
প্র : হাতে লেখা পুথিটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় কবে, কোথা থেকে, কার সম্পাদনায়?
উ : ১৯১৬ (১৩২৩ বঙ্গাব্দ) খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।
প্র : বসন্তরঞ্জন রায়কে কী বিশেষ উপাধি দেয়া হয়, কে দেন?
উ : বিদ্বদ্ঘুড। নবদ্বীপের ভুবনমোহন চতুষ্পাঠীর অধ্যক্ষ কর্তৃক এই উপাধি প্রদান করা হয়।
প্র : বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা কে?
উ : বড়ু চণ্ডীদাস।
প্র : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বাংলার দ্বিতীয় গ্রন্থ, কোন দিক থেকে?
উ : ভাষা ও রচনাকাল।
প্র : এই গ্রন্থে কবিতার পাশাপাশি আর কোন গুণ প্রধান?
উ : নাট্যিক গুণ।
প্র : এই গ্রন্থের কবি বড়ু চণ্ডীদাসের নাম কত ভাবে পাওয়া যায়?
উ : অনন্ত চণ্ডীদাস, চণ্ডীদাস, বড়ু চণ্ডীদাস ইত্যাদি ভাবে। এর মধ্যে বড়ু তাঁর কৌলীন্য উপাধি, চণ্ডীদাস গুরুদত্ত নাম, অনন্ত প্রকৃত নাম।

2020/5/11 13:06
Scanned with CamScanner

বাংলা-বিদ্যার
মৌলিকজ্ঞান
কোষগ্রন্থ

বাংলা
ভাষা ও সাহিত্য
জিজ্ঞাসা

Scanned with CamScanner

প্র : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য থেকে চারটি পঙ্‌ক্তি লেখ।

উ : কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ-গোকুলেঃ
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদে মো আউলাইলোঁ রান্ধনঃ

প্র : বড়ু চণ্ডীদাস কবে মারা যান?

উ : আনুমানিক ১৩৯৯ খ্রিষ্টাব্দ (বসন্তরঞ্জনের মতে)।

বিজয় গুপ্ত

প্র : বিজয় গুপ্ত কে?

উ : মনসামঙ্গলের যে পুথিসমূহ পাওয়া গেছে, প্রাপ্ত এই পুথিভিত্তিক প্রাচীনতম কবি বিজয় গুপ্ত।

প্র : তাঁর পরিচয় ও জীবনকাল লেখ।

উ : বাকেরগঞ্জ (বরিশাল) (এই স্থানটি নদীর বাঁকে ছিল বলে এই নাম হয়) জেলার ফুল্লশ্রী গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা সনাতন গুপ্ত, মাতা রণচ্ছিনী দেবী। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদে তিনি জীবিত ছিলেন।

প্র : তাঁর রচিত পদ্মাপুরাণের পরিচয় দাও।

উ : মনসাদেবীর মাহাত্ম্য ব্যঞ্জক তাঁর গ্রন্থটির পাঠে নানা প্রক্ষেপ ঘটেছে। কারণ তা অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল বলে জনগণের মুখে মুখে ফিরত।

বিদ্যাপতি

প্র : বিদ্যাপতি কে ছিলেন?

উ : বৈষ্ণব কবি এবং পদসঙ্গীত ধারার রূপকার।

প্র : তিনি কোথায়, কখন জন্মগ্রহণ করেন?

উ : মিথিলার সীতামারী মহকুমার বিসফি গ্রামে আনুমানিক ১৩৭৪ খ্রিষ্টাব্দে।

প্র : তিনি কোন কোন ভাষায় পদ রচনা করেন?

উ : মৈথিলি, অবহট্‌ঠ ও সংস্কৃত ভাষায়।

প্র : তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি কী?

উ : ব্রজবুলিতে রচিত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ।

প্র : ব্রজবুলি কী? কোন স্থানের?

উ : এক প্রকার কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা। বাংলা ও মৈথিলি ভাষার মিশ্রণে এই ভাষা তৈরি হলেও এতে বেশ কিছু হিন্দি শব্দ আছে।

প্র : বাংলা ভাষার এক পঙ্‌ক্তি না লিখেও কোন কবি বাঙালিদের কাছে নমস্য?

উ : বিদ্যাপতি

প্র : বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে কোন কবির পদ চৈতন্যদেব বিশেষভাবে শ্রবণ করতেন?

উ : বিদ্যাপতির।

প্র : বিদ্যাপতি রচিত পদের কয়েকটি পঙ্‌ক্তি লেখ।

উ : এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোরঃ

প্র : বিদ্যাপতির মৃত্যুকাল?

উ : আনুমানিক ১৪৬০ খ্রিষ্টাব্দ।

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর

প্র : ভারতচন্দ্র রায়ের পরিচয় দাও।

উ : ভারতচন্দ্রের জীবনকাল ১৭১২ থেকে ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দ। তিনি আঠার শতকের মঙ্গলকাব্য ধারার শ্রেষ্ঠ কবি। পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার পাঁড়ুয়া গ্রামে জমিদার বংশে তাঁর জন্ম।

প্র : ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের মাতা-পিতার নাম ও পরিচয় দাও।

উ : মাতা ভবানী দেবী, পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ। তাঁদের পদবি মুখোপাধ্যায়। পিতা ছিলেন বর্ধমান রাজপরিবারের অধীনে হুগলির জমিদার।

প্র : তিনি কোন কোন ভাষা জানতেন?

উ : বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দি, পারসি ও আরবি।

প্র : ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের কাব্যখ্যাতি কবে থেকে আরম্ভ হয়?

উ : বর্ধমানের রাজা কর্তৃক ভারতচন্দ্রের পিতা জমিদারিচ্যুত হলে ভারতচন্দ্র এর কারণ জানতে ও প্রতিকার করতে রাজদরবারে গমন করেন। এর আগেই, যখন বয়স মাত্র পনেরো বছর, তাঁর গ্রন্থ 'সত্যনারায়ণের

পাঁচালী' (১৭২৭ খ্রিষ্টাব্দে) রচনা শেষ এবং পাঠকমহল থেকে ব্যাপক সাড়া পান।

প্র : ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কি কারাগারে গমনকারী বাংলা সাহিত্যের প্রথম লেখক?

উ : ভারতচন্দ্রই সম্ভবত বাংলা সাহিত্যের প্রথম কবি, যিনি রাজরোষে কারাগারে যান। পিতার জমিদারিচ্যুতির কারণ জানতে বিনে বর্ধমানের রাজা কর্তৃক কবি ভারতচন্দ্র কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। কবে তিনি কারাগারে যান এর ঠিক তারিখটি জানা যায় না সত্য, তবে দীর্ঘদিন পরে তিনি, ৩৯ বছর বয়সে সেখান থেকে পালাতে সক্ষম হন। এ ব্যাপারে কারাধ্যক্ষ তাঁকে সাহায্য করে। তখনই তাঁর শরীরে নানা রোগ জন্ম নেয়। বিশেষ করে বহুমূত্র (ডায়াবেটিক) রোগে তিনি পতিত হন এবং এই রোগেই মাত্র ৪৮ বছর বয়সে ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মারা যান। বর্ধমান থেকে পালিয়ে নবদ্বীপে (নদীয়া) গমন করলে তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে সেখানের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কবিকে বিভিন্ন কাব্যরচনা করতে বলেন এবং 'রায়গুণাকর' উপাধিতে ভূষিত করেন।

প্র : ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের কবিপ্রতিভার মূল্যায়ন লেখ।

উ : ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করলেও তাঁর শ্রেষ্ঠসৃষ্টি 'অন্নদামঙ্গল' ও এই কাব্যের দ্বিতীয়াংশ 'বিদ্যাসুন্দর'। সংস্কৃত, আরবি, পারসি ও হিন্দুস্তানি ভাষার মিশ্রণে আশ্চর্য নতুন এক বাগভঙ্গি ও প্রাচীন সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণে বাংলা কবিতায় নিপুণ ছন্দপ্রয়োগ ছিল তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য। তাঁর কাব্যের অনেক পঙ্‌ক্তি আজও বাংলা ভাষায় প্রবচনতুল্য। নদীয়ার রাজসভায় স্থান পাওয়া এ কবির কাব্যে ছিল বাক্‌চাতুর্য, বুদ্ধির খেলা আর পাণ্ডিত্য। সহজ-সরল কোনো অনুভূতি তাঁকে মুগ্ধ করেনি বরং তিনি সব সময় চেয়েছেন এমন বস্তু যা তাঁর পাঠককে চমকে দেবে। তাঁর কথা ছিল ধারালো, চকচকে তরবারির মতো। কবি যেন সব কিছুতেই হাত্না খুঁজে পেতেন। অসঙ্গতি দেখলেই বিদ্রুপ করতে পারতেন সবাইকে নিয়ে। মধ্যযুগের সব কবিই যখন নিজের নায়িকাকে চাঁদের মতো রূপসী বলছেন তখন ভারতচন্দ্র হাত্না করে বলছেন: 'কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা / পদনখে পড়ে আছে তাঁর কতগুলা।' মধ্যযুগের এ বর্ণনারিগার এমন অসাধ্য চমৎকার কথা বলেছেন অবিরাম। তাঁর মুখের অনেক কথা প্রবাদ হয়ে আজো প্রায়শঃ মানুষের মুখে মুখে। যেমন: 'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়?' কিংবা 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।' অথবা 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে।' 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের বৈশিষ্ট্য হলো ছন্দ ও অলঙ্কারের সুদক্ষ প্রয়োগ। ফার্সি ও সংস্কৃত ভাষায় পারঙ্গম ভারতচন্দ্র প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের বিভিন্ন ছন্দ ও অলঙ্কার সার্থকভাবে এই কাব্যে প্রয়োগ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কাব্য সম্পর্কে মন্তব্য করেন: 'রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল-গান রাজকণ্ঠের মণিমালার মতো, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনি তাহার কারুকার্য।' সমালোচক-অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে: 'অন্নদামঙ্গলকাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের অন্যতম।'

প্র : তিনি কোন রাজার সভাকবি ছিলেন?

উ : নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের।

প্র : কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশের ভারতচন্দ্র কী রচনা করেন?

উ : ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কীর্তি অন্নদামঙ্গল কাব্য (১৭৫২-'৫৩) রচনা।

প্র : কবিত্ব শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে কে তাঁকে রায়গুণাকর উপাধি প্রদান করেন?

উ : রাজা কৃষ্ণচন্দ্র

প্র : মধ্যযুগের 'শেষ বড় কবি' কাকে বলে।

উ : ভারতচন্দ্রকে

প্র : ভারতচন্দ্রকে আর কী বিশেষণে অভিহিত করা হয়?

উ : নাগরিক কবি।

Scanned with CamScanner

প্র : ভারতচন্দ্র রচিত আর একটি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম কর।
উ। সত্য পীরের পাঁচালি (১৭৩৭-৩৮)
প্র : অন্নদামঙ্গল কাব্য প্রথম কে মুদ্রিত করেন?
উ : গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য, ১৮১৬ খ্রিষ্টাব্দে।
প্র। 'না হবে প্রাসাদগুল না হবে রসাল
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল'
— কোন কবির রচনা?
উ। ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের।
প্র। 'যাবনী' কী?
উ : 'যবন' শব্দের অর্থ বহিরাগত। আরবি-পারসি ভারতবর্ষে বহিরাগত ভাষা। সে কারণে যাবনী বলে এখানে আরবি-পারসি ভাষা বোঝানো হয়েছে। পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর রচনায় 'যবন' শব্দের ব্যবহার করেছেন আরবি-পারসি ভাষার উত্তরাধিকারী মুসলমানদের বোঝাতে। কাজী নজরুল ইসলামের কবিতাতেও মুসলিম অর্থে 'যবন' শব্দের ব্যবহার আছে (দ্রষ্টব্য: 'আমার কৈফিয়ত' কবিতা)।
প্র : 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'— কার রচনা?
উ : ভারতচন্দ্রের। তিনি ঈশ্বরী পাটনী চরিত্রের মুখ দিয়ে একথা বলিয়েছেন।

'আমার সন্তান' কবিতা থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'পাটুনী' কী?
উ : হিন্দি শব্দ 'পাটনি' বাংলায় কখনো 'পাটুনী' বলে ব্যবহার হয়। এর অর্থ খেয়ামাঝি।
প্র : ঈশ্বরী পাটনী নারী না পুরুষ?
উ : এ নিয়ে কিছুটা তর্ক আছে পণ্ডিতদের মধ্যে। অনেকে তাকে পুরুষ চরিত্র বলেন। তাদের বিচারে খেয়ামাঝি পুরুষ। কিন্তু এই যুক্তিগুলোও ভেবে দেখা প্রয়োজন: ১. চর্যায় নারীদের নৌকা চালনার দৃষ্টান্ত আছে, মধ্যযুগেও সে ধারাবাহিকতা থাকা খুবই সম্ভব। ২. ঈশ্বরী নাবটীও [illegible] ৩. তাছাড়া একজন মধ্যবয়স্ক পুরুষ মতো ব্যক্তিগত চরিত্রদোষ সন্তানের সমৃদ্ধি কামনা করে তাকেতো নারী হিসেবেই বিবেচনা প্রয়োজন।
প্র : 'একা দেখি কুলবধূ'– কেন?
উ : সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র গৃহিণীরা একা পথ চলে মধ্যযুগে এমনই সামাজিকরীতি ছিল। কিন্তু ঈশ্বরী পাটনীও তার পরিচয় না খেয়া পারাপারে অসম্মত। তখন কৌশলের আশ্রয় নেয়। বলে, সম্ভ্রান্ত ভদ্র গৃহিণী বলেই সে স্বামীর নাম মুখে আনবে না। স্বামীর নাম মুখে উচ্চারণ করার রীতি বাঙালি সমাজে প্রচলিত ছিল।
প্র : অন্নপূর্ণা কে?
উ : অন্নে পূর্ণ যিনি; যিনি মানব জাতির আহার দিয়ে বাঁচিয়ে রাখেন। দেবী দুর্গার অন্নপূর্ণা।
প্র : এই কবিতায় কোন পঙ্‌ক্তি দুটো সবচেয়ে ভালোলাগতে পারে, কেন?
উ : 'প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে জোড় হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'
—এই পঙ্‌ক্তি দুটো সবচেয়ে বেশি ভালোলাগে। কারণ, এখানে নিজের প্রাপ্তির চেয়ে সন্তানের সুখ ও সমৃদ্ধির বড় ভাবা হয়েছে। এই ভাবনা চিরন্তন বাঙালি-ভাবনা। এই ভাবনাই বাঙালিকে পৃথিবীর অন্য জাতি থেকে অনন্য করেছে।
প্র : কার বাক্যে মাতা হেসে পা দুখানি সেঁউতির ওপর রাখেন?
উ : পাটুনীর (ঈশ্বরী পাটুনীর)।
প্র : রবদান কী?
উ : অভীষ্ট পূরণ করে এমন কিছু প্রদান।
প্র : ডুবন্ত লঞ্চ থেকে ছেলে রতনকে রক্ষা করে মা যখন নিজে আর বাঁচতে পারেন না– এদৃশ্য উদ্দীপকের আলোকে মা-কে 'আমার সন্তান' কবিতার কার সঙ্গে তুলনা করা যায়?
উ : পাটুনী বা ঈশ্বরী পাটুনী।

প্র : মা-এর সাথে পাটুনীর সাদৃশ্যের কারণ কী?
উ : সন্তান বাৎসল্য ও আত্মত্যাগ।
প্র : 'এ ত মেয়ে মেয়ে নয়'– কথাটি কেন বলা হয়েছে?
উ : মেয়েটির পদস্পর্শে সেঁউতী সোনা হয়ে যাওয়ায় অলৌকিক দৃশ্য দেখে। মেয়েটি সাধারণ নারী নয়, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে কথাটি বলা হয়েছে।

মানিক দত্ত

প্র : চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদি কবি কে?
উ : মানিক দত্ত।
প্র : মানিক দত্তের জীবনকাল সম্পর্কে মত দাও।
উ : দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন ত্রয়োদশ শতাব্দী। আশুতোষ ভট্টাচার্যসহ কোনো কোনো গবেষক মনে করেন মানিক দত্ত ষোড়শ শতাব্দীর কবি।
প্র : তাঁর পরিচয় কী?
উ : তিনি মালদহ জেলার ফুলহুয়া (বর্তমানে ফুলবাড়ি) অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নিজের দেয়া আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় যে, তিনি ছেলেবেলায় বিকলাঙ্গ ছিলেন। দেবী চণ্ডীর কৃপায় তিনি ভাল হন এবং কাব্য সাধনায় মনোনিবেশ করেন।

মালাধর বসু (গুণরাজ খান)

প্র : মালাধর বসুর জন্ম সন কত?
উ : ১৫শ শতকের তৃতীয় বা চতুর্থ দশকে।
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : বর্ধমান জেলার কুলিন গ্রামে।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের কবি।
প্র : তিনি তাঁর কবিত্ব শক্তির জন্য শাসমুদ্দীন ইউসুফ সাহের কাছ থেকে কী উপাধি লাভ করেন?
উ : গুণরাজ খান।
প্র : তাঁর রচিত কাব্যের নাম কী?
উ : শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
প্র : এই কাব্যে কী বর্ণিত হয়েছে?
উ : ভগবত অনুসরণে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও তাঁর লীলা।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, কবিকঙ্কণ

প্র : মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর জীবনকাল কত?
উ : আনুমানিক (১৫৪০-১৬০৪)।
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : দামুন্যা গ্রাম, বর্ধমান।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : কবি।
প্র : মেদিনীপুরের রাজা রঘুনাথ রায়ের অনুরোধে তিনি কোন কাব্য লেখেন।
উ : চণ্ডীমঙ্গল।
প্র : তাঁকে কী বলে আখ্যায়িত করা হয়?
উ : দুঃখবর্ণনার কবি।
প্র : কবি তাঁর রচনার স্বীকৃতি স্বরূপ কী উপাধি লাভ করেন?
উ : কবিকঙ্কণ।
প্র : কে এই উপাধি প্রদান করেন?
উ : রাজা রঘুনাথ রায়।
প্র : তাঁর রচনা কি কারণে স্মরণীয়?
উ : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মানব-রসের তিনি প্রথম ও একমাত্র স্রষ্টা।
প্র : আধুনিককালে জন্মালে মুকুন্দরাম কবি না হয়ে কী হতেন বলে মনে করা হয়?
উ : ঔপন্যাসিক।
প্র : মুকুন্দরাম সৃষ্ট কোন চরিত্রগুলোকে সর্বাপেক্ষা জীবন্ত বলা হয়?
উ : বেনে মুরারি শীল, দাসী দুর্বলা ও ভাঁড়ু দত্ত।

রামনিধি গুপ্ত

প্র : রামনিধি গুপ্তর ডাক নাম কী?
উ : নিধু (বাবু)

20/5/12 21:20
Scanned with CamScanner

প্র : তিনি কী কারণে বিখ্যাত?
উ : বাংলা টপ্পা সঙ্গীতের প্রবর্তক হিসেবে।
প্র : কিভাবে তিনি টপ্পা সৃষ্টি করেন?
উ : বাংলায় টপ্পা গান ছিল না। ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকুরি সূত্রে বিহারের ছাপরায় গমন এবং হিন্দুস্তানি টপ্পা শিক্ষাগ্রহণ করেন। ১৭৯৪ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় ফিরে তিনি বাংলায় টপ্পা রচনা ও পরিবেশন করেন।
প্র : তাঁর রচিত বিখ্যাত টপ্পার উদাহরণ দাও।
উ : নানান দেশের নানান ভাষা
বিনে স্বদেশী ভাষা
পুরে কি আশা?
প্র : তাঁর টপ্পা সঙ্গীত সংকলনের নাম কী?
উ : গীতরত্ন (১৮৩২)।

রামপ্রসাদ সেন

প্র : রামপ্রসাদ সেন বিখ্যাত কিভাবে?
উ : শাক্তসঙ্গীত রচনা করে।
প্র : তাঁর জন্মস্থান ও পিতার নাম?
উ : পশ্চিমবঙ্গের হালিসহরে জন্ম। পিতা রামরাম সেন। অল্প বয়সে পিতার মৃত্যুহলে তাঁকে চাকুরি করতে হয়।
প্র : তিনি কী কী ভাষা জানতেন?
উ : বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দি, পারসি।
প্র : তিনি কিভাবে শাক্তপদ রচনায় ব্রতী হন?
উ : চাকুরির অবসরকালে, পরে সার্বক্ষণিকভাবে কালীসাধনা ও পদ রচনা করেন।
প্র : শাক্তপদাবলির আদি ও শ্রেষ্ঠ কবি কে?
উ : রামপ্রসাদ সেন।
প্র : রামপ্রসাদের গানের সুর কী নামে পরিচিত?
উ : রামপ্রসাদের গানের সুর 'রামপ্রসাদি সুর' নামে পরিচিত।
প্র : রামপ্রসাদ কোন ধরনের সাধক?
উ : রামপ্রসাদ ছিলেন গৃহী ও সাধক।
প্র : রামপ্রসাদের গান শুনে কে অভিভূত হয়েছিলেন?
উ : বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা।
প্র : রামপ্রসাদের উপাধি কী? কে দিয়েছিলেন?
উ : রামপ্রসাদের উপাধি ছিল 'কবিরঞ্জন'। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই উপাধি দিয়েছিলেন।
প্র : রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীতের সংখ্যা কত?
উ : প্রায় তিনশ।
প্র : রামপ্রসাদ সেন রচিত পদগুলোকে কী বলা হয়?
উ : শ্যামা সঙ্গীত বা রামপ্রসাদী বা শাক্ত পদাবলি।
প্র : রামপ্রসাদ কী সন্ন্যাসী ছিলেন?
উ : না। তিনি অন্তরে বৈরাগ্য নিয়েছেন, কিন্তু গৃহত্যাগ করেন নি।
প্র : 'আমি কি দুরখেরে ডরাই'– কার উক্তি?
উ : রামপ্রসাদ সেনের।
প্র : রামপ্রসাদের আর একটি বিখ্যাত গান কী?
উ : মনরে কৃষি কাজ জান না
এমন মানবজমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলত সোনা।
প্র : রামপ্রসাদ সেনের জন্ম-মৃত্যু সাল কত?
উ : জন্ম ১৭২০, মৃত্যু ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দ।

শাহ মুহম্মদ গরীবুল্লাহ

প্র : শাহ মুহম্মদ গরীবুল্লাহর জন্মসন কত?
উ : ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ।
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : হুগলির হাফিজপুর গ্রামে বাদিয়া পরগনায়।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : কবি, পুথি সাহিত্যের দোভাষী।
প্র : তাঁর রচিত গ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : আমীর হামজা, সোনাভান, জঙ্গনামা, সত্যপীরের পুথি ও ইউসুফ জোলেখা
প্র : তাঁর মৃত্যু সন কত?
উ : অজ্ঞাত।

শাহ মুহম্মদ সগীর

প্র : শাহ মুহম্মদ সগীর এর জন্মসন কত?
উ : আনুমানিক ১৪-এর শেষ থেকে ১৫ শতক।

প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : কবি।
প্র : তিনি কোন অর্থে প্রাচীন কবি?
উ : মধ্যযুগে মুসলমান কবিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলে।
প্র : তাঁর রচিত কাব্যটির নাম কী?
উ : ইউসুফ জোলেখা
প্র : তিনি ইউসুফ জোলেখা কাব্য রচনায় রাজসভার কার প্রশংসায় পঞ্চমুখ?
উ : সুলতান গোছ (অর্থাৎ গিয়াসদ্দিন আযম শাহ)
প্র : তাঁর রচিত কাব্যে কী শব্দের বহুল ব্যবহার লক্ষণীয়?
উ : প্রাকৃত ভাষাপন্ন। তাছাড়া আরবি-পারসি শব্দবহুলতা।
প্র : ইউসুফ জোলেখার প্রেম কাহিনির উৎস কোথায়?
উ : ধর্মগ্রন্থ কোরানে এই কাহিনি আছে।
প্র : শাহ মুহম্মদ সগীর তাঁর গ্রন্থের কাহিনি কোথা থেকে গ্রহণ করেছেন?
উ : পারসি কবি আবদুর রহমান জামি রচিত ইউসুফ জোলেখা থেকে।
প্র : শাহ মুহম্মদ সগীর রচিত ইউসুফ জোলেখার কাহিনি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
উ : তৈমুস বাদশার কন্যা জোলেখার আজিজের সঙ্গে বিয়ে হয়। ক্রীতদাস ইউসুফের (নবি) প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে জোলেখা তাকে আকর্ষণ করে। নানা ঘটনায় ইউসুফ মিশরের অধিপতি হয় এবং তাঁর মনেরও পরিবর্তন ঘটে। ধর্মান্তরের মধ্য দিয়ে ইউসুফ-জোলেখার মিলন হয়। সুফিরা ইউসুফকে পরমাত্মা জোলেখাকে জীবাত্মার প্রতীক বিবেচনা করেন। সগীরও তাই করেছেন। তবে বর্ণনায় প্রেমের আবহটি প্রধান হয়েছে। সগীর ছাড়া একই কাহিনি নিয়ে আবদুল হাকিম, গরীবুল্লাহ, ফকির মুহম্মদ প্রমুখ কাব্য লিখেছেন।
প্র : সগীর রচিত ইউসুফ জোলেখা কাব্যে 'জোলেখার প্রেম নিবেদন' অংশ থেকে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত কর।
উ : যাদি এ নীতিত মোর বিফল শরীর।
উথব দর্শনে প্রাণ শান্ত নহে ছিরর
এহেন নির্জন পুরী বিরল সঞ্চার।
পরিহরি লজ্জা ভীতি কর উপভোগ।
না জানি কেমন আছে নিমেষ কারণ।
সুফিলু তোমার ইচ্ছা আমার মরণ।
প্র : সগীরের কাব্যে কোন বিষয়টি প্রধান?
উ : আধ্যাত্মিক প্রেমতত্ত্বের ব্যঞ্জনা নয়, মানবপ্রেমের প্রাধান্য।

সৈয়দ সুলতান

প্র : সৈয়দ সুলতানের জন্ম ও পরিচয় দাও।
উ : জীবনকাল আনুমানিক ১৫৫০ থেকে ১৬৪৮ খ্রিষ্টাব্দ। মধ্যযুগের উল্লেখযোগ্য মুসলিম কবি। চট্টগ্রামের পটিয়ার জন্ম। কবি পীর সৈয়দ হাসানের ভক্ত ছিলেন।
প্র : তিনি কোন গ্রন্থ রচনা করার জন্য বিখ্যাত? গ্রন্থ সম্পর্কে লিখ।
উ : নবীবংশ। গ্রন্থটি ১৫৮৪ সালে রচিত। হযরত মুহম্মদের জীবনীকাব্য এটি। এর দুটি খণ্ড। এখানে হিন্দু দেবদেবী ও মুসলিম পয়গম্বরের উল্লেখ থাকলেও ইসলামের মাহাত্ম্য বর্ণনাই কবির উদ্দেশ্য ছিল।
প্র : সৈয়দ সুলতানের অন্য প্রধান গ্রন্থের নাম লেখ।
উ : জ্ঞানপ্রদীপ, জ্ঞানচৌতিশা ইত্যাদি।
প্র : 'নবীবংশ' কোন কাব্যের অনুসরণে রচিত।
উ : পারসি কাব্য কাসাসুল আম্বিয়া
প্র : 'নবীবংশে'র দ্বিতীয় খণ্ডের নাম কী?
উ : রসুল চরিত। মধ্যযুগে রচিত হযরত মুহম্মদের পূর্ণাঙ্গ জীবনী হিসেবে রসুল চরিতই শ্রেষ্ঠ কাব্য।

2020/5/12 21:21
Scanned with CamScanner

আধুনিক যুগ

সাধারণ আলোচনা

বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগ অসংখ্য ক্ষণজন্মা লেখকের অবদানের ফলে সমৃদ্ধি লাভ করেছে। এর প্রথম থেকেই বাঙালিদের পাশাপাশি অনেক অবাঙালি ব্যক্তিত্ব তাঁদের মনন ও মেধা ব্যয় করেছেন। এ-সব কারণে বাংলা সাহিত্যে সমৃদ্ধি এসেছে। দেশীয় ও পাশ্চাত্য মত ও দর্শন চিন্তার অভিঘাতও লেগেছে আধুনিক সাহিত্যে। অনেকেই গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে সাহিত্যচর্চা করেছেন সত্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি হিসেবেই সাহিত্যাঙ্গনে প্রত্যেকে প্রতিষ্ঠা পাবার প্রয়াস পেয়েছেন। এই স্বাতন্ত্র্যবাদই সম্ভবত আধুনিক যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে দেখা গেছে শুধু কবিতায় সাহিত্য রচিত হতো। আধুনিককালে কবিতার পাশাপাশি গদ্যেও সাহিত্য রচিত হয়েছে। এ সময় সাহিত্য নিয়েছে নানা মাত্রায় মোড়। উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, ছোটগল্প সহ বহু কিছু সৃষ্টি হয়েছে। কাব্যাঙ্গিকেও এসেছে নতুন সুর। তাছাড়া কবিতাতেও গদ্য প্রবেশ করল, এল গদ্যকবিতা। আজ অবশ্য আধুনিক যুগ অতিক্রম করে উত্তর আধুনিক যুগে প্রবেশ করেছি বলে কেউ কেউ মনে করছেন। মর্মগত নৈরাশ্যবোধ থেকে এই **উত্তরাধুনিক যুগচেতনার** উদ্ভব বলে দাবি করেন এর বিপরীত মত পোষণকারীগণ। সাহিত্য এরকম দ্বন্দ্বের মাধ্যমেই অগ্রসর হয়।

বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের আগে যে সাহিত্য রচিত হয়েছে তা ছিল মূলত কবিতা বা পদ্য নির্ভর। উনবিংশ শতাব্দী থেকে বাংলা সাহিত্যে মূলগত যে বৈশিষ্ট্য পরিদৃষ্ট হয় তা সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করা হলো :

১. গদ্যসাহিত্যের উদ্ভব
২. সাময়িকপত্রের আবির্ভাব
৩. নাট্যসাহিত্যের জন্ম
৪. প্রবন্ধ (চিন্তামূলক) সাহিত্যের সৃষ্টি ইত্যাদি।

এ সময় প্রথাগত কবিতার বদলে কাব্যক্ষেত্রে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং পাশ্চাত্য প্রভাব অঙ্গীভূত হয়েছে। এছাড়াও সাহিত্যে চেতনাগত পরিবর্তনও পরিদৃষ্ট হয়। এগুলো হচ্ছে, প্রকৃতিবোধ, শিল্পচেতনা, সর্বোপরি অনুভূতির পরিবর্তে মানবনির্ভরতা বা মানবআধ্যাত্ম। আর এ সময় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গদ্যচর্চা শুরু হয়। এর আগেও অবশ্য গদ্যচর্চা হয়েছে। তবে তা চিঠিপত্রে বা দলিলে। কিন্তু সংবাদ, সাহিত্য বা শিক্ষাবিস্তারে গদ্যের ব্যবহার এ সময় ব্যাপকভাবে হয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে। এই প্রতিষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করে প্রাতিষ্ঠানিক বাংলা চর্চা এগিয়ে যায়।

প্র : ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কী?

উ : কলকাতার 'গড়ের মাঠ'-এর পশ্চিম প্রান্তে গঙ্গানদীর তীরে অবস্থিত একটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। ইংরেজ সিভিলিয়ানদের ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতি শিক্ষা দেবার জন্য ফোর্ট উইলিয়াম ভবনে এই কলেজ বা শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয় ১৮০০ সালে। ফোর্ট বা দুর্গটি আরো পুরোনো। ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের সর্বাধিক বিখ্যাত দুর্গ এটি। ফোর্ট উইলিয়ামের মাধ্যমেই ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের ঘাঁটি নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের সামরিক শক্তি প্রদর্শনের একটি বড়ুনিদর্শন এই দুর্গ। এটি অষ্টকোণ ও পরিখাবেষ্টিত। চারিদিকে ঢালু মৃত্তিকার বেষ্টনী, ভেতরে একটি ছোট-খাট শহর। প্রায় ১০,০০০ জন সৈনিকের বাসোপযোগী ব্যারাক, অস্ত্রশালা, গির্জা, কুচকাওয়াজের মাঠ, দোকান প্রভৃতি আছে। ভেতরে যাতায়াতের ৬টি গেট; অনুমতি ছাড়া ভেতরে যাওয়া যায় না। ইংরেজ সৈন্য চলে যাওয়ায় তাদের গির্জাগুলি এখন সভাগৃহরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজরা এই দুর্গ নির্মাণ শুরু করে। ১৭৭৩-এ ওয়ারেন হেসটিংসের শাসনকালে নির্মাণ শেষ হয়। ইংল্যান্ডের তৎকালীন রাজা ৪র্থ উইলিয়ামের নামানুসারে দুর্গের নাম হয় ফোর্ট উইলিয়াম। বাস্তবে দুটি ফোর্ট

উইলিয়াম ছিল। একটি পুরনো, অন্যটি নতুন। পুরনো দুর্গটি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সুচনাকালের সৃষ্টি। স্যার চার্লস আইয়ার এই দুর্গের নির্মাণকাজ শুরু করেন। তাঁর উত্তরসূরি জন শিয়ার্ড ১৭০১ সালে ফোর্ট উইলিয়ামের উত্তর-পূর্বাংশের দুর্গপ্রাচীর সংযোজন করেন। ১৭০২ সালে তিনি দুর্গের মধ্যভাগে বাণিজ্যকুঠি বা 'গুদামেন্ট হাউস' নির্মাণ শুরু করেন, যা ১৭০৬ সালে শেষ হয়। ১৭৫৬ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা আক্রমণ করে ফোর্ট উইলিয়াম দখল করেন এবং ইংরেজদের তাড়িয়ে দেন। পরে পলাশির যুদ্ধে ইংরেজরা জয়ী হলে উপমহাদেশে ইংরেজদের অবস্থান সংহত হতে থাকে। ১৭৮০ সালে দুর্গটি সম্প্রসারিত হয়। এর প্রায় একশ বছর পরে দুর্গটিকে আধুনিকায়ন করে অষ্টভুজাকৃতির রূপ দেওয়া হয়। গুরুত্বপূর্ণ এই দুর্গটি অদ্যাবধি ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর দুর্গ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ছিল লালদিঘির উত্তরে (বর্তমান) রাইটার্স বিল্ডিং যেখানে অবস্থিত সেখানে। কোম্পানির সাহেব কর্মচারীদিগকে দেশীয় ভাষা শিখাবার জন্য এই কলেজ স্থাপিত হয় (১৮০০)। কিন্তু এই কলেজকে কেন্দ্র করেই বাংলা ও উর্দু গদ্যসাহিত্যের জন্ম হয়েছে। এই কলেজ হতে প্রকাশিত বাংলা বইগুলো বাংলা গদ্যসাহিত্যের বিকাশে সাহায্য করে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের রচিত পাঠ্যপুস্তক এবং রাজা রামমোহন রায় ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য কতিপয় লেখকের গদ্যরচনা বাংলা গদ্যসাহিত্যের প্রথম যুগের আদর্শ ছিল। (পাদ্রী) উইলিয়াম কেরি ছিলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ। রামরাম বসু ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ছিলেন কেরির দুই প্রধান বাংলা নবিস সহকারী। রামরামের 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১) ও 'লিপিমালা' (১৮০২) এবং মৃত্যুঞ্জয়ের 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২), 'রাজাবলি' (১৮০৮), 'হিতোপদেশ' (১৮০৮) ও 'প্রবোধচন্দ্রিকা' (১৮০৩) বাংলা গদ্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে উইলিয়াম কলেজের স্মৃতি বহন করছে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের লেখা আরও কয়েকখানা বই, ' রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্র' (১৮০৫, বাংলা গদ্যে প্রথম জীবনী), চন্ডীচরণ মুন্সির 'তোতা ইতিহাস' এবং হরপ্রসাদ রায় বিরচিত 'পুরুষ পরীক্ষা' (১৮১৫)। তেঁহ নিজে লিখেছেন: 'কথোপকথন' (১৮০১) ও 'ইতিহাসমালা' (১৮১২)। এসব বই-ই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তক ছিল।

প্রধান সাহিত্যিক ও তাঁদের কর্মের পরিচয়

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

প্র : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের জন্ম কোথায়?

উ : নোয়াখালি।

প্র : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের জন্ম কত সালে?

উ : ১৯০৩।

প্র : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের পৈতৃক নিবাস কোথায়?

উ : ফরিদপুর।

প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?

উ : প্রখ্যাত সাহিত্যিক।

প্র : কর্মজীবন শুরু করেন কীভাবে?

উ : ১৯৩১ সালে মুন্সেফ রূপে।

প্র : তিনি কোন গোষ্ঠীর লেখক ছিলেন?

উ : কল্লোল গোষ্ঠীর।

প্র : যে পত্রিকা সম্পাদনার মাধ্যমে তিনি এই গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করেন তার নাম কী?

উ : কল্লোল।

প্র : কল্লোল গোষ্ঠীর লেখক ও পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে তিনি বাংলা কোন ধারা সৃষ্টিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন?

উ : তিরিশের আধুনিক ধারা।

প্র : তিনি কখন 'কল্লোল' পত্রিকা প্রকাশে সামগ্রিকভাবে দায়িত্ব পালন করেন?

উ : ১৯২৫ সালে।

2020/5/12 21:21

Scanned with CamScanner

প্র : তিনি কী কী লেখায় দক্ষতার পরিচয় দেন?
উ : গল্প, উপন্যাস, কাব্য ও জীবনীকাব্য রচনায়।
প্র : তাঁর প্রথম উপন্যাসের নাম কী এবং কত সালে প্রকাশিত হয়?
উ : 'বেদে', ১৯২৮ সালে।
প্র : 'বেদে' উপন্যাসটি কিসের জন্য আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট উপন্যাস?
উ : রচনাভঙ্গি ও বিষয়বিন্যাসের জন্য।
প্র : তাঁর অপর দুটি বিখ্যাত উপন্যাসের নাম কী?
উ : 'কাকজ্যোৎস্না (১৯৩১); 'প্রথম কদমফুল' (১৯৬১)
প্র : তিনি কী লিখে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন?
উ : 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ জীবনীগ্রন্থ (৪ খণ্ড) (১৯৫২)
প্র : তাঁর লিখিত অন্য একটি অসাধারণ স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থের নাম কী?
উ : কল্লোল যুগ (১৩৫৭)।
প্র : তিনি কী লিখে খ্যাতিমান হয়েছিলেন?
উ : ছোটগল্প লিখে।
প্র : তাঁর প্রথম ছোটগল্পের নাম কী?
উ : 'টুটা-ফুটা' (১৯২৮)
প্র : তাঁর কবিতার ভাববস্তু কি?
উ : রোমান্টিকতা ও গণচেতনা উভয়ই।
প্র : তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ কী?
উ : 'অমাবস্যা' (১৯৩০)
প্র : তাঁর অন্যান্য কবিতাগ্রন্থ কী?
উ : আমরা (১৯৩৩), প্রিয়া ও পৃথিবী (১৯৩৬) ইত্যাদি।
প্র : তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারি।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

প্র : অতুলচন্দ্র গুপ্তের জন্ম কোথায়?
উ : বিল্লাইক গ্রাম, টাঙ্গাইল।
প্র : তাঁর জন্ম কত সালে?
উ : ১৮৮৪ সালে
প্র : তিনি মূলত কি ছিলেন?
উ : সাহিত্যিক এবং আইনজীবী।
প্র : তাঁর পিতার নাম কি?
উ : উমেশচন্দ্র গুপ্ত।
প্র : তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা কী ছিল?
উ : তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে ও দর্শন শাস্ত্রে অনার্স সহ বি.এ., দর্শন শাস্ত্রে এম.এ এবং বিপন কলেজ থেকে বি. এল. ডিগ্রি লাভ করেন।
প্র : তিনি কী লিখে খ্যাতি লাভ করেন?
উ : গদ্য লিখে।
প্র : তাঁর রচিত গ্রন্থ কী?
উ : কাব্যজিজ্ঞাসা, শিক্ষা ও সভ্যতা, পথী পথে, জমির মালিক।
প্র : তাঁর রচিত রসতত্ত্বের বিশিষ্ট গ্রন্থ কী?
উ : 'কাব্যজিজ্ঞাসা' (১৯২৮)।
প্র : তিনি কোন গবেষণা গ্রন্থ লিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনাথ সেন পুরস্কার লাভ করেন?
উ : Trading with the Enemy.
প্র : তাঁর মৃত্যু হয় কত সালে?
উ : কলিকাতা, ১৯৬১।

অতুলপ্রসাদ সেন

প্র : অতুলপ্রসাদ সেনের জন্ম কোথায়?
উ : ঢাকা শহরে।
প্র : তাঁর জন্ম কত সালে?
উ : ১৮৭১ সালে।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : কবি, গীতিকার ও গায়ক।
প্র : তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা কী ছিল?
উ : ১৮৯০ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে প্রবেশিকা পাশ করেন। এর পরে বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি।
প্র : তিনি বাংলা গানে কী আমদানি করেন?
উ : সর্বপ্রথম ঠুমরি আমদানি করেন।
প্র : তিনি কী রূপে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন?
উ : সুরকার হিসেবে।
প্র : সঙ্গীত ভুবনে তাঁর বিশিষ্ট স্থান কিসের জন্য?
উ : গীতিকার ও সুরকার হিসেবে।
প্র : তাঁর রচিত গানগুলো কয় ভাগে বিভক্ত?
উ : স্বদেশি সঙ্গীত, ভক্তিগীতি, প্রেমের গান।
প্র : তাঁর কোন গানগুলো জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতা আন্দোলনে জনসাধারণের মনে প্রেরণা যোগায়?
উ : মাতৃভূমি, মাতৃভাষা ও স্বজাতির উদ্দেশে নিবেদিত গানগুলো।

প্র : তাঁর কোন গান ষাটের দশকে পূর্ব বাংলার প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকারীদের মনে উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল?
উ : 'দেশের ধরম, মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা।'
প্র : তাঁর রচিত গানের সংখ্যা কত?
উ : প্রায় দুশোটি।
প্র : তাঁর গানের সঙ্কলন কি?
উ : 'কয়েকটি গান ও নীতিতত্ত্ব' (১৯৩১)
প্র : তাঁর মৃত্যু হয় কত সালে?
উ : ১৯৩৪ সালে।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ

প্র : অদ্বৈত মল্লবর্মণ কোথায়, কত সালে জন্ম গ্রহণ করেন?
উ : গোকর্ণ গ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া; ১৯১৪ সাল।
প্র : তিনি কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেন?
উ : মালো বংশে।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : ঔপন্যাসিক।
প্র : তিনি কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?
উ : 'নবশক্তি'।
প্র : তিনি কী দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন?
উ : 'ত্রিপুরা' পত্রিকায় সাংবাদিকতা দিয়ে।
প্র : কোন পত্রিকায় তিনি বেনামে কবিতা লেখেন?
উ : 'মোহাম্মদী'।
প্র : তাঁর সুবিখ্যাত উপন্যাসটির নাম কী? তার খণ্ড কয়টি?
উ : 'তিতাস একটি নদীর নাম'; ৪ খণ্ড।
প্র : 'তিতাস একটি নদীর নাম' প্রথম কোন মাসিক পত্রিকায় কত সালে প্রকাশিত হয়?
উ : 'মোহাম্মদী' পত্রিকায়, ১৩৫২ বঙ্গাব্দে।
প্র : উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে কত খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়?
উ : ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে।
প্র : তিনি কোন উপন্যাসের মধ্যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির বলে ধীবর সমাজের কাহিনিকে তুলে এনেছেন?
উ : 'তিতাস একটি নদীর নাম'।
প্র : 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের পরিচয় দাও।
উ : 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৬) উপন্যাসে কুমিল্লাস্থ জেলার 'তিতাস' নামক নদীতীরের ধীবর (জেলে ও মৎস্যজীবী) সমাজের রীতি-নীতি, ধর্ম-সংস্কার উৎসব ও জীবনযাপনের অনবদ্য কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে। সমাজের ও অর্থনীতির পরিবর্তনের ফলে ভেঙে পড়ল, আর সমাজের বুকে বিপর্যয়ের ঢেউ লাগল, আর প্রকৃতির খেয়ালে একদিন তিতাসের ধারা তিতাসে শুকিয়ে গেল, সেই সঙ্গে শীর্ণ হয়ে এল ধীবর সম্প্রদায়ের জীবন এর যথার্থ প্রতিফলন আছে উপন্যাসে। সমাজ, সংস্কৃতি ও প্রকৃতির পরিবর্তনের মহাকাব্যিক বিস্তার এই উপন্যাসে লক্ষণীয়।
প্র : উপন্যাসটির চলচ্চিত্রায়ণ হয় কবে, কে করেন?
উ : ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে, ঋত্বিক ঘটক।
প্র : তাঁর কয়েকটি গ্রন্থের নাম লেখ।
উ : নয়াবসত, রামধনু, সালা হাওয়া ইত্যাদি।
প্র : তাঁর মৃত্যু হয়েছিল কবে?
উ : ১৬ই এপ্রিল, ১৯৫১।

'তিতাস একটি নদীর নাম' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাস বাংলা কত সালে প্রকাশিত হয় এবং কোন পত্রিকায়?
উ : ১৩৫২; 'মোহাম্মদী'।
প্র : 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে কোন বিষয়কে অবলম্বন করা হয়েছে?
উ : জেলে ও মৎস্যজীবীদের অন্ত্যজ জীবন।
প্র : কিশোরদের গ্রামের নাম কী?
উ : গোকর্ণঘাট।
প্র : 'কিন্তু কালা আখর যে কী চিজ অখন কিছু কিছু টের পাই'– এখানে 'কালা আখর' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
উ : বর্ণমালা।
প্র : 'ভোরের হাওয়ায় তার তন্দ্রা ভাঙে'- কার?
উ : তিতাস নদীর।

2020/5/12 21:21
Scanned with CamScanner

প্র : 'মনের মত মানুষ পাইলাম না'- কে মনের মত মানুষ পেলো না?
উ : জনৈক মাদো যুবক।
প্র : কোন পত্রিকায় অদ্বৈত মল্লবর্মণ প্রথম কর্ম জীবন শুরু করেন?
উ : 'ত্রিপুরা' পত্রিকা।
প্র : অদ্বৈত মল্লবর্মণ কোন কোন পত্রিকার সঙ্গে জড়িত ছিলেন-
উ : নবশক্তি, ত্রিপুরা ও মোহাম্মদী পত্রিকার সঙ্গে।
প্র : অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'সাদা হাওয়া' কোন ধরনের উপন্যাস?
উ : রাজনৈতিক।
প্র : 'ধানত এইবার খুব ফলছে।'-উক্তিটি কার?
উ : রামপ্রসাদের।
প্র : অদ্বৈত মল্লবর্মণের নাগরিক উপন্যাস কোনটি?
উ : 'সাদা হাওয়া'।
প্র : 'তোমার আমার ঘরই নাই, তার আবার মানুষ'– উপন্যাসে উক্তিটি কার?
উ : করমালীর।
প্র : 'হেই পুলা, তুই আমার নাওয়ে যাইবি? আমি খালে-বিলে জাল লইয়া ঘুরি, মাছ ধরি- মাছ বেচি, নাওয়ে রান্ধি-নাওয়ে খাই।'– উক্তিটি কার?
উ : কিশোরের।
প্র : 'সে তখন পরের বাড়ির কাঁথা সিলাই করে, আর সে সুইচের ফোড় আমার বুকে আইয়া বিন্ধে।'– কার বুকে সুচ বিঁধে?
উ : করমালীর।
প্র : বিজয় নদী তিতাস নদী থেকে কত মাইল দূরে প্রবাহিত?
উ : ১৩ মাইল।
প্র : যে বউ বাপের বাড়িতে যায়, তার এক চোখে প্রজাপতি নাচে, আরেক চোখে কী থাকে?
উ : জল।
প্র : 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্রের নাম কী?
উ : বাসন্তী।
প্র : 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের প্রধান পুরুষ চরিত্রের নাম কী?
উ : কিশোর।
প্র : বড় নৌকার মাঝিরা কার ছিপছিপে ডিঙ্গিতে নৌকা ও জাল রেখে আসে?
উ : নিকারীর ডিঙ্গিতে।

অন্নদাশঙ্কর রায়

প্র : অন্নদাশঙ্কর রায় কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৯০৪ সালের ১৫ই মার্চ ভারতের উড়িষ্যা প্রদেশের ঢেঙ্কানলে।
প্র : তাঁর পিতা-মাতার নাম কী?
উ : পিতা– নিমাইশঙ্কর রায়,
মাতা– হেমনলিনী দেবী।
প্র : তাঁর শিক্ষাজীবন কোথায় অতিবাহিত হয়?
উ : বিহারের পাটনা থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯২১)। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আই.এ. পরীক্ষায় ১ম স্থান, একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে ১ম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে বি.এ স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। পরে আইসিএস পরীক্ষায় পাস।
প্র : তাঁর কর্মজীবন সম্পর্কে লেখ।
উ : নদীয়া জেলার ম্যাজিস্ট্রেট (১৯৩৬), কুমিল্লার জজ (১৯৩৯), পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিচার বিভাগের সচিব (১৯৫০) পদে অবসরগ্রহণ।
প্র : তাঁর মূল পরিচয় কী?
উ : বাংলা ও উড়িয়া ভাষায় কবিতা রচনায় দক্ষ কবি, ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার। শতাধিক গ্রন্থের লেখক।
প্র : তাঁর প্রথম প্রকাশিত লেখার নাম কী?
উ : 'তিনটি প্রশ্ন' ('প্রবাসী', ১৯২০)।
প্র : তাঁর প্রথম কবিতাগ্রন্থের নাম কী?
উ : 'রাখী' (১৯৩২)।
প্র : তাঁর প্রথম উপন্যাসের নাম কী?
উ : 'অসমাপিকা' (১৯৩০)।
প্র : তাঁর রচিত প্রধান কবিতাগুলোর নাম লেখ?
উ : রাখী (১৯৩২), কালের শাসন (১৯৩৩), কামনা পঞ্চবিংশতি (১৯৩৪), নূতনা রাখ (১৯৪৩), লিপি, জার্নাল, ক্রীডো প্রভৃতি।

প্র : তাঁর রচিত প্রধান উপন্যাসগুলোর নাম কী?
উ : এরা দেখা দেশ (১৯৩২), অজ্ঞাতবাস (১৯৩৩), কন্যাবতী (১৯৩৪), দুঃখমোচন (১৯৩৬), মর্তের স্বর্গ (১৯৪০), অপসরণ (১৯৪২)– ভারতবর্ষ থেকে ইউরোপ পর্যন্ত প্রসারিত পটভূমিতে রচিত এশিকথর্মী এই উপন্যাস ছাড়ি তত্ত্বপ্রধান ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত তবে কিছুটি কৃত্রিম।
প্র : তাঁর রচিত প্রধান ছোটগল্পগুলোর নাম কী?
উ : প্রকৃতির পরিহাস (১৯৩৪), মন পবন (১৯৪৬), যৌবন জ্বালা (১৯৫০), কামিনী কাঞ্চন (১৯৫৪) ইত্যাদি।
প্র : তাঁর রচিত প্রধান প্রবন্ধগ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : তারুণ্য (১৯৩৭), জীবনশিল্পী (১৯৪১), দুশাবা (১৯৪৩), বিনুর বই (১৯৪৪), জীয়ন কাটি (১৯৪৯), সেশকাল পাত্র (১৯৪৯), প্রত্যয় (১৯৫১), নতুন করে বাঁচা (১৯৫৩), আধুনিকতা (১৯৫৩) ইত্যাদি।
প্র : তাঁর উল্লেখযোগ্য ভ্রমণকাহিনিগুলোর নাম কী?
উ : পথে প্রবাসে (১৯৩১), ইউরোপের চিঠি (১৯৪২) ইত্যাদি।
প্র : তাঁর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?
উ : গদ্যভাষায় রীরবলী (প্রমথ চৌধুরীর মতো) চমক ও গভীর মননশীলতা রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য।
প্র : তিনি প্রধান কী কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ : একাডেমি পুরস্কার (১৯৩২), বিদ্যাসাগর পুরস্কার (১৯৮০), আনন্দ পুরস্কার (১৯৮৩)।
প্র : তিনি কবে, কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ২৮শে অক্টোবর ২০০২, কলকাতায়।

অমিয় চক্রবর্তী

প্র : অমিয় চক্রবর্তীর জন্ম কোথায়?
উ : শ্রীরামপুর, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ।
প্র : তাঁর জন্মতারিখ কত?
উ : ১০ই এপ্রিল, ১৯০১।
প্র : তাঁর পিতার নাম কী?
উ : দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্তী।
প্র : তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা কী?
উ : পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ; দর্শন ও সাহিত্যে এম.এ. রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সচিব হিসেবে সাহিত্য শাসন এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. ফিল ডিগ্রি লাভ করেন।
প্র : তাঁর পেশা কী ছিল?
উ : অধ্যাপনা।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : একজন শীর্ষস্থানীয় আধুনিক কবি।
প্র : কাদের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল?
উ : কবি ইয়েটস, জর্জ সাঁতায়ানা, আইনস্টাইন, বার্ট্রান্ড রাসেল, আলবার্ট সোয়াইটজার প্রমুখ বিশ্বরেণ্য মনীষীর সঙ্গে।
প্র : তিনি কোন সময়ের কবি ছিলেন?
উ : ত্রিশের দশকের।
প্র : বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে তাঁর অবস্থান কোথায়?
উ : রবীন্দ্র প্রভাবিত কাব্য-ধারার বাইরে।
প্র : রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি কিভাবে যুক্ত ছিলেন?
উ : তিনি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে বহুদেশ ভ্রমণ করেছেন।
প্র : কবিতা ছাড়াও কিসে তাঁর পরিচিতি লাভ হয়?
উ : গদ্যশিল্পী হিসেবে।
প্র : তাঁর প্রকাশিত বিশেষ কাব্যগ্রন্থগুলো কী?
উ : 'খসড়া' (১৯৩৮); 'এক মুঠো' (১৯৩৯); 'মাটির দেয়াল' (১৯৪২); 'অভিজ্ঞান বসন্ত' (১৯৫০), 'অনিঃশেষ' (১৯৭৬) ইত্যাদি।
প্র : তাঁর গদ্যরচনাগুলো কী?
উ : 'চলো যাই'; 'সাম্প্রতিক'; 'পুরবাসী'; 'পথ অন্তহীন' ইত্যাদি।
প্র : 'এক মুঠো' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : অমিয় চক্রবর্তীর 'এক মুঠো' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ সালে। বিশ শতকের বিজ্ঞানের যুগে ব্যবহারিক জীবনে যেমন জটিলতা বাড়ছে, মানুষের মনেও তেমনি চিন্তার জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। আন্তর্জাতিক চেতনায় যুথধর্মের এই বৈশিষ্ট্য খুব উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হয়েছে এই কাব্যে। কবি এখানে সময়কে বিচেতনায় এনে এই সময়গত মানব-মানবীর অন্তর্গত সুখ ও সমস্যা ধরার চেষ্টা করেছেন।
প্র : 'বাংলাদেশ' কবিতাটি তিনি কোন প্রেক্ষাপটে রচনা করেন?
উ : বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে।

2020/5/12 21:21
Scanned with CamScanner

প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ : 'ইউনেস্কো পুরস্কার' (১৯৬০), 'জাতীয় ন্যাশনাল একাডেমি পুরস্কার', ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মভূষণ' উপাধি (১৯৭০) প্রাপ্ত।
প্র : কতসালে তাঁর মৃত্যু হয়?
উ : ১৯৮৬ সালে।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

প্র : আখতারুজ্জামান ইলিয়াস কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি পাইবান্ধা জেলার গোহাটি গ্রামে (মাতুলালয়ে)।
প্র : তিনি মূলত কী?
উ : কথাসাহিত্যিক
প্র : তাঁর রচিত প্রধান গ্রন্থগুলোর নাম লিখ।
উ : উপন্যাস: চিলেকোঠার সেপাই (১৯৮৭), খোয়াবনামা (১৯৯৬) ছোটগল্প: অন্য ঘরে অন্য স্বর (১৯৭৬), খোঁয়ারি (১৯৮২), দুধভাতে উৎপাত (১৯৮৫), দোজখের ওম (১৯৮৯)।
প্র : আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্প ও উপন্যাস সম্পর্কে কী বলা হয়?
উ : অনাহার, অভাব, দারিদ্র্য ও শোষণের শিকার হয়ে যারা মানবেতর জীবনযাপন করছে সে-সব অবহেলিত মানুষের জীবনাচরণ তাঁর গল্প ও উপন্যাসে উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত।
প্র : তাঁর মহাকাব্যোচিত উপন্যাস কোনটি?
উ : 'চিলেকোঠার সেপাই' ও 'খোয়াবনামা' উভয়ই।
প্র : 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসের পরিচয় দাও।
উ : উনসত্তরের (১৯৬৯) গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে রচিত আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মহাকাব্যিক উপন্যাস 'চিলেকোঠার সেপাই'। কোন বাড়ির চিলেকোঠায় বাস করেও স্বাধীনতার লক্ষ্যে গড়ে ওঠা বৃহত্তর আন্দোলনের জোয়ারে সেদিন মিলিত হয়েছিল ওসমান। জনজীবনের সমগ্রতাকে, বিশেষ করে গ্রাম ও শহরের সমস্ত মানুষকে ঔপন্যাসিক এ উপন্যাসে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। ওসমানের পিতার মৃত্যুর স্বপ্নদৃশ্য নিয়ে উপন্যাস আরম্ভ। এই ওসমান দেশবিভাগের কারণে উদ্বাস্তু হয়ে ঢাকায় এসেছে। সে এস্টেটাই বিশ্বাস এবং ছিন্নমূল যে চিলেকোঠার বাস তার জন্য যথাযথ হয়েছে। অন্তত কাজকর্মী ছাত্রনেতা, ছাত্রলীগ নেতা, শ্রমিক ও রিক্সাওয়ালা এমন কি বাড়িওয়ালার কন্যার সঙ্গে বিভিন্নভাবে তার যোগাযোগ ঘটে। ওসমান যেন ছোট ছোট কাহিনির সূত্রধর। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস মহাকবির মতো ছোট ছোট কাহিনি-পর্বকে সুখর সম্মিলনের মাধ্যমে একটি মহাকাব্যিক উপন্যাসে রূপ দিয়েছেন। এখানে ইতিবাচক রাজনীতির উপস্থাপনায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অব্যবহিত পূর্বক্ষণটি ওঠে এসেছে।
প্র : 'খোয়াবনামা'র বিষয় কী?
উ : গ্রাম বাংলার নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী মানুষের জীবনালেখ্যসহ ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, আসামের ভূমিকম্প, তেভাগা আন্দোলন, ১৯৪৩-এর মন্বন্তর, পাকিস্তান আন্দোলন ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদি ঐতিহাসিক উপাদান এ উপন্যাসে নিপুণভাবে উপস্থিত করা হয়েছে। এই উপাদানসমূহ অবলম্বন করে বাঙালির তথা মানবজীবনের সংগ্রামও এগিয়ে যাওয়াই উপন্যাসটির বিষয়।
প্র : 'অন্য ঘরে অন্য স্বর' গল্পগ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : ১৯৬৫ থেকে ১৯৭৫ সালে রচিত নিরুদ্দেশ যাত্রা, উৎসব, প্রতিশোধ, যোগাযোগ, ফেরারী, অন্য ঘরে অন্য স্বর ইত্যাদি গল্প নিয়ে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের এই গল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৬ সালে। ব্যক্তিমানুষই এই গ্রন্থের উপজীব্য বিষয়। তাছাড়া প্রথমবারের মতো পুরানো ঢাকার জনজীবন গল্পগুলোতে বিশেষত্ব পেয়েছে যা বাংলাদেশের বাংলাকথাসাহিত্যে যুক্ত করেছে এক নতুন স্বাদ ও মাত্রা।
প্র : তিনি প্রধান কোন পুরস্কার লাভ করেন?
উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৮২)।
প্র : তিনি কোন রোগে কত তারিখে মারা যান?
উ : ক্যান্সারের; ১৯৯৭ সালের ৪ঠা জানুয়ারি।

'রেইনকোট' গল্প থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'রেইনকোট' গল্পটি কত সালে প্রকাশিত হয়?
উ : ১৯৯৫ সালে।
প্র : পাকিস্তানের পাঁচের কাঁটা কী ছিল?
উ : শহিদ মিনার।
প্র : প্রিন্সিপাল আজাজ আহমদ মিলিটারির বন্ধু কর্তাদের কাছে কী নিবেদন করেছিলেন?
উ : পাকিস্তান বাঁচাতে হলে সব ভুল কলেজ থেকে শহিদ মিনার হটানোর জন্য।
প্র : মগবাজারের বাসা থেকে 'মিন্টু' কবে চলে গিয়েছিল?
উ : জুন মাসের ২৩ তারিখে।
প্র : যুদ্ধ শুরু হবার পর হুদা সাহেব কত বার বাসা পাল্টেছেলিলেন?
উ : চার বার।
প্র : কার শ্বশুর বড় গোছের রাজাকার?
উ : ওয়েলডিং ওয়ার্কশপের মালিকের।
প্র : হুদা সাহেবের মেয়ের বয়স কত ছিল?
উ : আড়াই বছর।
প্র : হুদা সাহেবের ছেলের বয়স কত ছিল?
উ : পাঁচ বছর।
প্র : স্টেট বাসগুলো কী রঙের ছিল?
উ : লাল রঙের।
প্র : আসাদ গেটে বাস থামলে সেখান থেকে কত জন লোক বাসে উঠেছিল?
উ : নয় জন।
প্র : মসজিদের ছাদ থেকে মুয়াজ্জিন সাহেব নিচে পড়ে গিয়েছিল কেন?
উ : মিলিটারিদের গুলিতে।
প্র : প্রিন্সিপালের চেয়ার দেখতে কেমন ছিল?
উ : সিংহাসন মার্কা।
প্র : কলেজের জন্য কয়টি আলমারি কেনা হয়েছিল?
উ : সর্বমোট দশটি।
প্র : মুক্তিযোদ্ধা তথা মিলিটারিদের ভাষায় মিসক্রিয়েন্টরা কী বেশে কলেজে ঢুকেছিল?
উ : কুলির বেশে।
প্র : 'সর্বনাশই তো স্বপ্ন' কথাটি কখন বলা হয়েছিল?
উ : মুন্নার।
প্র : 'সাবভার্সিভ অ্যাকটিভিটিজ' কথাটি বুঝিয়ে লেখ।
উ : 'সাবভার্সিভ অ্যাকটিভিটিজ' কথাটির অর্থ রাষ্ট্র বিরোধী কার্যক্রম। মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতাকে পাকিস্তান সরকার ও তাদের সমর্থকরা ১৯৭১ সালে উক্ত নামে অভিহিত করতো।
প্র : 'জ্যাক-অ্যাটনের হাত' কথাটির মানে কী?
উ : ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ দিবাগত রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ট্যাংক যে অমানবিক ধ্বংসযজ্ঞ ও পশুহত্যা পরিচালনা করে, সেই রাতের কথা বোঝাতে উক্ত কথাটি ব্যবহৃত হয়।
প্র : গল্পের নাম 'রেইনকোট' হবার তাৎপর্য কী?
উ : মুক্তিযোদ্ধা শ্যালকের রেইনকোট গায়ে দিয়ে সাধারণ ভীতু প্রকৃতির নুরুল হুদার ভেতর সঞ্চারিত হয় উদ্ধতা, সাহস ও দেশপ্রেম– তারই ব্যঞ্জনা প্রকাশে রেইনকোটকে প্রতীকী হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।
প্র : 'রেইনকোট' গল্পে মিলিটারি ক্যাম্প কোথায় স্থাপিত হয়েছিল?
উ : কলেজের জিমন্যাশিয়ামে।
প্র : নুরুল হুদা কেন ভ্যাবাচ্যাকা খান–
উ : ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের নতুন রূপ দেখে।
প্র : প্রিন্সিপালের পিওনের নাম কী ছিল?
উ : ইসহাক মিয়া।
প্র : মিন্টুর বোনের নাম কী?
উ : আসমা।
প্র : উর্দু বিভাগের অধ্যাপকের নাম কী ছিল?
উ : আকবর সাজিদ।
প্র : ইসহাক কোন মাসের শুরু থেকে বাংলা বলা ছেড়ে দেয়?
উ : এপ্রিল।

2020/5/12 21:21
Scanned with CamScanner

প্র : পাকিস্তানিদের জন্য প্রিন্সিপাল সিনরাত কী করতো?
উ : সোয়া-দুরুস পড়তো।
প্র : জেনারেল স্টেটমেন্ট অর্থ কী?
উ : সাধারণ বিবৃতি।
প্র : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারের বাহিনী পরাজিত হয়ে ছিল–
উ : রাশিয়ার রুশ বাহিনীর হাতে।
প্র : প্রিন্সিপাল কাকে তোয়াজ করতেন–
উ : মজিদ আকন্দকে।
প্র : মুক্তিফৌজরা কোথায় বোমা ফেলেছিল?
উ : প্রিন্সিপালের বাড়ির গেটে।
প্র : রেইনকোট পরার পরে লেখককে কেমন দেখাচ্ছিল?
উ : শ্যালক মিষ্টুর মতো।
প্র : কোথায় অর্ধেকের বেশি জায়গা স্বাধীন–
উ : রংপুর, দিনাজপুর।
প্র : নুরুল হুদা কোন বিষয়ের লেকচারার–
উ : কেমিস্ট্রির বা রসায়নের।
প্র : কত দিন ধরে বৃষ্টি চলছিল?
উ : টানা তিন দিন।
প্র : নুরুল হুদার সাথে আর কাকে মিলিটারির জিপে তোলা হয়–
উ : আব্দুস সাত্তার মৃধাকে।
প্র : রেইনকোটের ওপর চাবুকের বাড়ি নুরুল হুদার কাছে স্রেফ উৎপাত মনে হয়েছিল কেন?
উ : মুক্তিযুদ্ধার ব্যবহৃত জিনিস তাকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জিবিত করে। তাই পাকিস্তানী যখন তাকে চাবুক মারতে থাকে। তখন তার মনে হয়– এ যেন স্রেফ উৎপাত।

আনিসুজ্জামান

প্র : লেখক আনিসুজ্জামানের প্রকৃত নাম কী?
উ : এ.টি.এম. আনিসুজ্জামান।
প্র : তাঁর মাতা-পিতা-স্ত্রীর নাম কী?
উ : পিতার নাম : এ.টি.এম. মোয়াজ্জেম; মাতার নাম : সৈয়দা খাতুন; স্ত্রীর নাম : সিদ্দিকা জামান।
প্র : তিনি কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৯৩৭ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী কলকাতায়।
প্র : আনিসুজ্জামানের প্রকৃত পরিচয় কী?
উ : তিনি শিক্ষাবিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরিটাস প্রফেসর (বাংলা বিভাগ)।
প্র : তিনি কোথা থেকে কী শিরোনামে ডক্টরেট করেন?
উ : ১৯৬২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ইংরেজ আমলের বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের চিন্তাধারা (১৭৫৭-১৯১৮)' শিরোনামে। এই গবেষণাপত্রকে তিনি 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য' (১৯৬৪) নামে গ্রন্থরূপ দেন।
প্র : তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম লেখ।
উ : 'স্বরূপের সন্ধানে' (১৯৭৬); 'আমাদের শতকের বাংলা চিঠি' (১৯৮৩); 'বাঙালি নারী : সাহিত্যে ও সমাজে' (২০০০); 'কাল নিরবধি' (২০০৩) ইত্যাদি।
প্র : তিনি কী কী পদক ও পুরস্কার লাভ করেন?
উ : উল্লেখযোগ্য পদক ও পুরস্কার হলো : বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৭০); একুশে পদক (১৯৮৫); আনন্দ পুরস্কার (১৯৯৪); ভারত সরকারের পদ্মভূষণ (২০১৪)। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডি.লিট. পান ২০০৫ সালে।

'জাদুঘরে কেন যাব' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : পাশ্চাত্যদেশে কোনগুলো স্বতন্ত্র বিদ্যায়তনিক বিষয় বা শৃংখলা হিসেবে বিকশিত?
উ : জাদুঘরতত্ত্ব-মিউজিওলজি, মিউজিওগ্রাফি বা মিউজিয়াম স্টাডিজ।
প্র : পৃথিবীর বৃহত্তম জাদুঘর কোথায় স্থাপিত হয়েছিল?
উ : আলেকজান্দ্রিয়ায় (খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে)।

প্র : পৃথিবীর প্রথম জাদুঘর আলেকজান্দ্রিয়া কাকে মাবরুক হতো?
উ : পৃথিবীর প্রথম জাদুঘর আলেকজান্দ্রিয়ায় ছিল নিদর্শন-সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার। ছিল, জুলিওউস্যান ও উন্মুক্ত চিড়িয়াখানা। তবে সেখানে মূলত দর্শনচর্চা হতো।
প্র : আলেকজান্দ্রিয়া গড়ে ওঠার পেছনে কী কারণ ছিল বলে ধারণা করা হয়?
উ : আলেকজান্দ্রিয়া গড়ে ওঠার পেছনে দুটি কারণ আছে বলে ধারণা করা হয়। এক, জাদুঘরটি গড়ে উঠেছিল প্রতিষ্ঠাতার রুচিমাফিক। দুই, দর্শকেরা সেখানে যেত নিজের নিজের অভিপ্রায় অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ অংশে, কেউ কেউ হয়তো পুরোটাই ঘুরে ঘুরে দেখতো।
প্র : জাদুঘর গড়ে ওঠার ভিত্তি কী ছিল?
উ : জগতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রাচীন জিনিসের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ছিল এবং তাদের মধ্যে যারা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, তাদের ব্যক্তিগত কিংবা পারিবারিক উদ্যোগে সংগৃহীত হতে থাকে প্রাচীন নিদর্শনগুলো। এটাই জাদুঘর গড়ে ওঠার ভিত্তি।
প্র : পাশ্চাত্যে কখন প্রাচীন জিনিস সংগ্রহ শুরু হয়?
উ : ইউরোপীয় রেনেশাঁসের পর পাশ্চাত্য দেশে প্রাচীন জিনিস সংগ্রহের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। তবে, প্রাচ্যদেশে অনেক আগ থেকেই সংগ্রহ হতো বলে ধারণা করা হয়।
প্র : রাজ-রাজারা কেন প্রাচীন জিনিস সংগ্রহ করতো?
উ : রাজ-রাজাদের ক্ষেত্রে প্রাচীন জিনিস সংগ্রহ ছিল তাদের পরাক্রম, শৌর্য-বীর্য, সম্পদ ও গৌরবগাথার ঘোষণা হিসেবে তা সংগ্রহ হতো।
প্র : যৌথ কিংবা নাগরিক সংস্থান উদ্যোগে কখন প্রাচীন জিনিস সংগ্রহ করা হয় বলে মনে করা হয়?
উ : ষোল শতকের পরে।
প্র : শুরু বা সূচনা মিউজিয়াম কখন গড়ে ওঠে?
উ : ফরাসি বিপ্লবের পর রাজাকরের সাহায্যে গড়ে ওঠে শুরু বা সূচনা মিউজিয়াম।
প্র : ফ্রেঞ্চই ব্যাসেস আর উদ্ভাসিত হয় কখন?
উ : ফরাসি বিপ্লবের পর।
প্র : সেলিনম্যাসের রাজপ্রাসাদ কখন গড়ে ওঠে?
উ : রুশ বিপ্লবের পর সেলিনম্যাসের রাজপ্রাসাদ গড়ে ওঠে হার্মিতাজে।
প্র : ক্রমবর্ধমান গণতন্ত্রায়নের ফল হিসেবে চিহ্নিত করা হয় কোনটিকে?
উ : টাওয়ার অফ লন্ডন নামক ঐতিহাসিক প্রাসাদ।
প্র : সতেরো শতকে ব্রিটেনের প্রথম পাবলিক মিউজিয়াম গড়ে ওঠে কোথায়?
উ : সতেরো শতকে ব্রিটেনের প্রথম পাবলিক মিউজিয়াম গড়ে ওঠে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে।
প্র : অ্যাশমোলিয়ান মিউজিয়াম কিভাবে সৃষ্টি হয়?
উ : পিতাপুত্র দুই ট্রাডেসান্ট এবং অ্যাশমোল- এই তিনজনের সংগ্রহ নিয়ে।
প্র : ব্রিটিশ মিউজিয়াম কার তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উ : আঠার শতকে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায়। তবে, স্যার হ্যান্স স্লোন, স্যার রবার্ট কটন ও আর্ল অফ অক্সফোর্ড রবার্ট হার্লির সার্বিক সহায়তা ছিল।
প্র : জাদুঘরে সংগৃহীত বিষয় বৈচিত্র্যের চিত্র তুলে ধর।
উ : জাদুঘরের বৈচিত্র্য খুব চোখে পড়ার মতো। সে বৈচিত্র্য একদিকে যেমন সংগ্রহের বিষয়গত, তেমনি গঠনগত এবং অন্যদিকে প্রশাসনগত। বর্তমানে ভিন্নভিন্ন বিষয়ের জাদুঘর গড়ে তোলার চেষ্টা প্রবল। প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস, মানববিকাশ ও নৃতত্ত্ব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, স্থানীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি, সামরিক ইতিহাস, পরিবহণ ব্যবস্থা, বিমানযাত্রা, মহাকাশ

Scanned with CamScanner

ভ্রমণ, পরিবেশ, কৃষি, উদ্ভিদবিজ্ঞান, জীবতত্ত্ব, শিল্পকলা-তারও নানা প্রকার বিভাগ-উপবিভাগ। মৎস্যাধার ও নক্ষত্রশালাও এখন জাদুঘর হিসেবে চিহ্নিত।

প্র : প্রশাসনিক দিক দিয়ে জাদুঘরের প্রকারভেদ লেখ।

উ : প্রশাসনের দিক দিয়ে স্বতন্ত্র শ্রেণির জাদুঘরের মধ্যে রয়েছে জাতীয় জাদুঘর, স্থানীয় বা আঞ্চলিক জাদুঘর, বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর ও একান্ত বা ব্যক্তি উদ্যোগে গঠিত জাদুঘর।

প্র : বাংলাদেশে কোন কোন জাদুঘর রয়েছে?

উ : বাংলাদেশে রয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, চট্টগ্রামে আছে জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর, ঢাকার নগর জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বঙ্গবন্ধু জাদুঘর, বিজ্ঞান জাদুঘর ও সামরিক জাদুঘর।

প্র : বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর কোনগুলো?

উ : রাজশাহীর বরেন্দ্র মিউজিয়াম, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর, ঢাকার বলধা গার্ডেন। এছাড়া কিছু রয়েছে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের এলাকায় সাইট মিউজিয়াম।

প্র : জাদুঘরে কোন বিষয়কে লক্ষ করে জিনিস সংগ্রহ করা হয়?

উ : জাদুঘরে সাধারণত যা চমকপ্রদ, যা অনন্য, যা লুপ্তপ্রায়, যা বিস্ময় উদ্রেককারী – এমন বস্তু সংগ্রহ করা হয়।

প্র : 'জাদু' কোন ভাষার শব্দ?

উ : ফারসি।

প্র : জাদুঘর থেকে আমরা কী লাভ করতে পারি?

উ : বঙ্গের হাজার বছরের পুরানো ইতিহাস ও সমৃদ্ধ সংস্কৃতির নমুনা থেকে আমরা আমাদের অর্থাৎ বাঙালির আত্মপরিচয় লাভ করতে পারি।

প্র : কোন মিউজিয়ামে মিশরের পুরানো ইতিহাস ধরে রাখা হয়েছে?

উ : আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রেকো- রোমান মিউজিয়ামে ও কায়রো মিউজিয়ামে মিশরের পুরানো ইতিহাস ধরে রাখা হয়েছে।

প্র : ইউরোপীয় বসতিস্থাপনকারীদের প্রথম আগমনকালীন স্মৃতিচিহ্ন কোথায় রক্ষিত আছে?

উ : সিয়াটলে ও নর্থ ক্যারোলাইনার পূর্ব প্রান্তে আমেরিকার আদিবাসীদের নানাদিন অর্জনের নিদর্শন এবং ইউরোপীয় বসতিস্থাপনকারীদের প্রথম আগমনকালীন স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে।

প্র : ইংল্যান্ডের ইতিহাসের অনেকখানি কোথায় ধরে রাখা হয়েছে?

উ : ব্রিটিশ মিউজিয়াম এবং টাওয়ার অফ লন্ডনে ইংল্যান্ডের ইতিহাসের অনেকখানি ধরে রাখা হয়েছে।

প্র : ব্রিটিশ ভারতীয় মুদ্রার সমৃদ্ধ ভান্ড কোথায় লক্ষ করা যায়?

উ : কুয়েতের জাদুঘরে।

প্র : জাদুঘরের একটি অন্যতম কাজ কী?

উ : জাদুঘরের একটি অন্যতম প্রধান কাজ হলো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ এবং জাতিকে আত্মপরিচয়দানের সূত্র জানানো।

প্র : কোহিনুর দেখতে কোন মিউজিয়ামে সবাই ভিড় করে?

উ : টাওয়ার অফ লন্ডনে।

প্র : জাতীয় জাদুঘর থেকে আমাদের প্রাপ্তি কী?

উ : জাতীয় জাদুঘর একটি জাতিসত্তার পরিচয় বহন করে। নিজের ও জাতির স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। সংস্কৃতির সন্ধান ও আত্মবিকাশের প্রেরণা লাভ করা যায়। অন্য জাতির কীর্তির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করা যায়, ফলে আত্মসত্তা উন্নীত হয় বৃহত্তর মানবসমাজে।

প্র : জাদুঘর আমাদের কী উপকারে আসে?

উ : জাদুঘর আমাদের জ্ঞান দান করে, আমাদের শক্তি যোগায়, আমাদের চেতনা জাগ্রত করে, আমাদের মনোজগৎকে সমৃদ্ধ করে। জাদুঘর একটা শক্তিশালী সামাজিক সংগঠন। সমাজের এক স্তরে সঞ্চিত জ্ঞান

তা ছড়িয়ে দেয় জনসমাজের সাধারণ স্তরে। পণ্যতন্ত্রযানের পথও প্রশস্ত হয়। জাদুঘর কেবল জ্ঞানই ছড়িয়ে দেয় না, অনেকে ছড়িয়ে দেয় আবাসর্শ। ফলে, জাদুঘর যেমন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ভাবনার সৃষ্টি করে, তেমনি তা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনেরও কারণ ঘটাতে পারে।

প্র : হুডরোপীয় রেনেসাঁস কী?

উ : খ্রিষ্টীয় চৌদ্দ থেকে ষোল শতক ধরে হুডরোপে শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞানচর্চা ও চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে নবজাগরণের মাধ্যমে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণই হুডরোপীয় রেনেসাঁস।

প্র : ফরাসি বিপ্লব কী?

উ : হুডরোপের প্রথম বুর্জোয়া বিপ্লব। ১৭৮৯ সালের ১৪ই জুলাই ফরাসি জনগণ সেখানকার কুখ্যাত বাস্তিল দুর্গ ও কারাগার দখল করে নেয় এবং সমস্ত বন্দিকে মুক্তি দেয়। এর মাধ্যমে এই বিপ্লবের সূচনা হয়। এই বিপ্লবে নেতৃত্ব দেয় ধনিক শ্রেণি আর অত্যাচারিত কৃষকরা ছিল তাদের সহযোগী। বিপ্লবের মূল বাণী ছিল 'মুক্তি, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও সম্পত্তির পবিত্র অধিকার'। এই বিপ্লবের ফলে সামন্তবাদের উৎপাটন হয়।

প্র : রুশ বিপ্লব কী?

উ : ১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর বিপ্লবী নেতা লেনিনের রাশিয়ায় সর্বহারার দল বলশেভিক পার্টি সেখানকার জারতন্ত্রকে হটিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। এই বিপ্লবের মাধ্যমে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সমস্ত সম্পত্তি ও উৎপাদনের উপায়ের মালিক হয় জনগণ তথা রাষ্ট্র।

প্র : টাওয়ার অব লন্ডন কী?

উ : লন্ডনের টেমস নদীর উত্তর তীরবর্তী রাজকীয় দুর্গ। এর মূল অংশে রয়েছে সাদা পাথরের গম্বুজ। এটি নির্মিত হয় ১০৭৮ খ্রিষ্টাব্দে। এক সময় দুর্গটি রাজকীয় ভবন ও রাষ্ট্রীয় কারাগার হিসেবে ব্যবহৃত হতো। বর্তমানে জমকালো ও জাদুঘর হিসেবে ব্যবহৃত।

প্র : ব্রিটিশ মিউজিয়াম সম্পর্কে লেখ।

উ : প্রত্নতত্ত্ব ও পুরাকীর্তি সংক্রান্ত জাদুঘর। এটা ব্রিটেনের জাতীয় জাদুঘর। প্রতিষ্ঠাকাল ১৭৫৩। সে সময়ে ব্রিটিশ সরকার স্যার হ্যান্স স্লোন, স্যার রবার্ট কটন, আর্ল অব অক্সফোর্ড, রবার্ট হার্লি- এই তিন জন সংগ্রাহকের বই, পাণ্ডুলিপি, মুদ্রা, পুরাকীর্তি ইত্যাদির বিশাল ব্যক্তিগত সংগ্রহ ক্রয় করে এই জাদুঘর গড়ে তোলে।

প্র : হার্মিটেজ কী?

উ : সম্রাজ্ঞীর নির্জন আশ্রম।

প্র : বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘর সম্পর্কে লেখ।

উ : বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জাদুঘর হলো জাতীয় জাদুঘর। আমাদের দেশের ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, শিল্পকলা ও প্রাকৃতিক ইতিহাসের নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও গবেষণার কাজে এটা নিয়োজিত। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা জাদুঘর হিসেবে এর যাত্রা শুরু হয়। এটা বর্তমান ঢাকার সাহবাগ মোড়ে অবস্থিত।

প্র : বাংলাদেশের জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর সম্পর্কে লেখ।

উ : জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর বাংলাদেশের অন্যতম জাদুঘর। চট্টগ্রাম নগরের আগ্রাবাদে অবস্থিত এই জাদুঘরে বাংলাদেশের পঁচিশটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসহ বিদেশি পাঁচটি দেশের জাতিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন প্রদর্শিত হচ্ছে।

প্র : ঢাকা নগর জাদুঘর কোথায়?

উ : ঢাকা সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত এই জাদুঘর নগর ভবনে অবস্থিত। এটা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে। এর লক্ষ্য ঢাকা নগরের ঐতিহাসিক নিদর্শন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।

2020/5/12 21:21

Scanned with CamScanner

প্র : বঙ্গবন্ধু জাদুঘর সম্পর্কে লেখ।

উ : বঙ্গবন্ধু জাদুঘর ঢাকার ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায় অবস্থিত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতিবিজড়িত বাসভবনকে ১৯৯৭ সালে জাদুঘরে রূপান্তরিত করা হয়। এই জাদুঘরে বঙ্গবন্ধুর জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের অনেক দুর্লভ ছবি, তাঁর জীবনের শেষ সময়ের কিছু স্মৃতিচিহ্ন এবং তাঁর ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী প্রদর্শনের জন্য রাখা হয়েছে।

প্র : ঢাকা বিজ্ঞান যাদুঘর সম্পর্কে লেখ।

উ : ঢাকায় অবস্থিত এই জাদুঘরের প্রাতিষ্ঠানিক নাম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর। ১৯৬৫ সালে এটা প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে ভৌতবিজ্ঞান, শিল্পপ্রযুক্তি, তথ্যপ্রযুক্তি, মজার বিজ্ঞান ইত্যাদি গ্যালারি ছাড়াও রয়েছে সায়েন্স পার্ক, আকাশ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র, বিজ্ঞান গ্রন্থাগার ইত্যাদি। তরুণ বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবনামূলক কাজে প্রণোদনা দিয়ে থাকে।

প্র : সামরিক জাদুঘর কী?

উ : ১৯৮৭ সালে মিরপুর সেনানিবাসের প্রবেশদ্বারে এই জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে শহরের কেন্দ্রস্থল বিজয় সরণিতে এটাকে স্থানান্তরিত হয়। প্রাচীন যুগের সমরাস্ত্র, ট্যাংক, ক্রুজারসহ নানা ধরনের আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র, আঠারো শতক থেকে এ পর্যন্ত ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের কামান, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের বিভিন্ন স্মারক ইত্যাদি দেখার সুযোগ এ জাদুঘরে রয়েছে।

প্র : বরেন্দ্র জাদুঘর কোথায় এবং কেন খ্যাত?

উ : প্রাতিষ্ঠানিক নাম বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর। ১৯১০ সালে প্রতিষ্ঠিত ও রাজশাহীতে অবস্থিত। এ জাদুঘর বাংলাদেশের অন্যতম জাদুঘর। এখানে ভাস্কর্য, খোদিত লিপি, পাণ্ডুলিপি ও প্রাচীন মুদ্রার মূল্যবান সংগ্রহ রয়েছে। বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস, শিল্পকলা ও প্রত্নতত্ত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে গবেষণায় এগুলোকে আকর-উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়।

প্র : বলধা গার্ডেন কোথায় এবং কেন খ্যাত?

উ : ঢাকা মহানগরের ওয়ারীতে এর অবস্থান। এটা একাধারে উদ্ভিদ উদ্যান ও জাদুঘর। ভাওয়ালের জমিদার নরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী ১৯০৯ সালে এটা প্রতিষ্ঠা করেন। এই জাদুঘরের অনেক নিদর্শন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। বলধা গার্ডেনে দেশি-বিদেশি অনেক প্রজাতির গাছপালার আকর্ষণীয় সমাহার রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২৬ সালে এই উদ্যান পরিদর্শনে এসেছিলেন।

আনোয়ার পাশা

প্র : আনোয়ার পাশা কতসালে জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১৯২৮ সালের ১৫ই এপ্রিল।

প্র : আনোয়ার পাশার জন্মস্থান কোথায়?

উ : ভবকাই গ্রাম, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?

উ : কবি, কথাসাহিত্যিক, সমালোচক, শিক্ষাবিদ। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সিনিয়র লেকচারার।

প্র : তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগত যোগ্যতা কতটুকু ছিল?

উ : রাজশাহি সরকারি কলেজ থেকে বি এ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম. এ।

প্র : তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মগুলো কী?

উ : উপন্যাস : নীড় সন্ধানী (১৯৬৮), নিষুতি রাতের গাথা (১৯৬৮), রাইফেল রোটি আওরাত (১৯৭৩)। গল্পগ্রন্থ : নিরুপায় হরিণী (১৯৭০)। কাব্য : নদী নিয়ন্ত্রিত হলে, সমুদ্র শৃঙ্খলতা উজ্জয়িনী।

প্র : তাঁর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসের নাম কী?

উ : রাইফেল রোটি আওরাত (১৯৭৩)।

প্র : 'রাইফেল রোটি আওরাতে'র পরিচয় দাও।

উ : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখা প্রথম কয়েকটি উপন্যাসের একটি আনোয়ার

পাশা রচিত 'রাইফেল রোটি আওরাত' প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালে। আয়োজিরির যুদ্ধের পটে অগ্নুৎপাতের কথা লেখা হয়েছে। যতটা কঠিন, যুদ্ধকালে যুদ্ধের ভয়াবহতার মধ্যে বাস করে তেমনি যুদ্ধকথা লেখার জন্য চাই সাহস ও মানসিক স্থিরতা। আনোয়ার পাশা তা দেখেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এই শিক্ষক অবশ্য উপন্যাসটি লিখেছেন, কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা দেখতে পাবেন নি। ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর তাঁকে হত্যা করে পাকিস্তানিরা। শহিদ বুদ্ধিজীবীদের তালিকায় তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। শহিদ হবার আগেই তিনি এই উপন্যাস লিখে যান। 'রাইফেল রোটি আওরাত' নামটিতেই ঈর্ষণীয় গদ্য। যদিও শব্দগুলো বাংলা ভাষায় পরিচিত তবু লেখক এই তিনটি শব্দে বুকিয়েছেন পাকিস্তানি হীন মানসিকতাকে। কাফের হত্যার নামে পাকিস্তানিরা নির্বিচারে হত্যায় নেমেছিল বাঙালিদের। উপন্যাসে পাকিস্তানিদের মনোভাব ব্যক্ত আছে এভাবে: 'হাত দেওয়া যায় রোটি ও রাইফেলে। আর আওরাতের পায়ে। দুনিয়ার সেরা চিজ আওরাত, আওর রাইফেল। রোটি খেয়ে গায়ের তাকত বাড়াও, রাইফেল ধরে প্রতিপক্ষকে ক্ষতম কর, তারপর আওরাত নিয়ে ফুর্তি কর। ব্যা, এহি জিন্দেগী হ্যায়। এই ত জীবন।' উপন্যাসে বাঙালিদের মধ্যে কথিত শিক্ষিত একাংশ মনে করে 'ইসলাম মানেই পাকিস্তান আর পাকিস্তান মানেই ইসলাম।' তাদের ধারণা: পাকিস্তানের নামে শহিদ হওয়া মানেই ইসলামের নামে শহিদ হওয়া। তাদের বিবেচনায় শহিদের নামে কোনো পৃথক 'শহিদ মিনার' বানানো 'কুফরি কাম'। বানাতে হবে মসজিদ, শহিদ মিনার নয়। আনোয়ার পাশা তৎকালীন পাকিস্তানপন্থী বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষকদের আদলে সৃষ্টি করেছেন ড. খালেক ও ড. মালেক চরিত্র। ড. খালেক চূড়ান্তভাবে পাকিস্তানপন্থী আর ড. মালেক সুবিধাবাদী। আছে মুসলিম লীগের তরমুজ মিয়া, মোলায়েম খাঁনের আশীর্বাদপুষ্ট হাসেম আলী, আওয়ামি ঘরানার প্রবুদ্ধ। কিন্তু অধ্যাপক সুলীত সাহেব, কবিউপন্যাসিকদ্বয় সুলী এই উপন্যাসের অতীব গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধুর কথাও আছে এই উপন্যাসে। প্রাসঙ্গিকভাবে লেখা হয়েছে: 'এবারের একুশের ফেব্রুয়ারীতে রাজপুত্রের অনুষ্ঠানে সুলীত এখানে এসেছিলেন। কেননা অসেছিলেন, স্বয়ং শেখ সাহেব ঐ সময় আসবেন। এসেছিলেন। শালবাগে বঙ্গবন্ধুর মুজিবুর রহমান।' সুলীত শহিদের বোনের পরিবর্তনের আলোকে বঙ্গবন্ধুর সাথেই মার্চের ভাষণের প্রভাবকে উপন্যাসে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এভাবে: 'একুশে ফেব্রুয়ারীর ঠিক দুসপ্তাহ পর। রমনা রেসকোর্সে সাতই মার্চের সেই বজ্রকণ্ঠ। সেই কণ্ঠ বিধৃত শহীদ মিনারের পাদদেশে দাঁড়িয়ে আবার স্মরণ করলেন সুলীত। কাল থেকে কত বারই তা স্মরণ করলেন। সেই কণ্ঠ ইতঃপূর্বে কোনো বাঙালি শুনেছে? হয়তো কখনো শুনেছে শশাঙ্কের কণ্ঠে, হুসেন শাহের কণ্ঠে কিংবা সিরাজের সেনাপতি মোহনলালের কণ্ঠে। অতঃপর এই সেদিন নেতাজী সুভাষের কণ্ঠে। নেতাজীর প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু! তোমার প্রযত্ন ব্যর্থ হবে না। আমরা ব্যর্থ হতে দেব না। সাতই মার্চের রমনা রেসকোর্সে যারা গিয়েছিল তারা কি জীবনের মতো অন্য মানুষ হয়ে যায় নি? অন্তত সুলীত হয়েছিল।' বাঙালি যখন যুদ্ধে যুদ্ধে একাত্তরের ঘোলর দিকে এগোচ্ছিল, মনে হচ্ছিল আনোয়ার পাশা ছিলেন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন লেখক। দূরদৃষ্টি না থাকলে এমন উপন্যাস লেখা যায় না। 'রাইফের রোটি আওরাত' প্রচলিত অর্থের চরিত্রনির্ভর উপন্যাস নয়। ঘটনার প্রবহমানতাই এখানে মুখ্য। শিল্পীকে হত্যা করা গেলেও তাঁর শিল্পকে হত্যা করা যায় না- 'রাইফেল রোটি আওরাত' তার বড় প্রমাণ।

2020/5/12 21:21

Scanned with CamScanner

প্র : তিনি কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ : ১৯৭২ সালে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (মরণোত্তর) লাভ।
প্র : রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনুরাগী ভক্ত ও প্রগতিশীল চিন্তার অধিকারী আনোয়ার পাশা কবে মৃত্যুবরণ করেন।
উ : ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ার্টার্স থেকে পাক হানাদার বাহিনীর অনুগত আলবদর সদস্যরা তাঁকে ঢাকার মিরপুরের বদ্ধভূমিতে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে।

আবদুল কাদির

প্র : আবদুল কাদিরের জন্ম কত সনে?
উ : ১৯০৬ সালের ১লা জুন।
প্র : তাঁর জন্মস্থান কোথায়?
উ : আড়াই সিধা গ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : কবি, প্রাবন্ধিক, গবেষক, ছান্দসিক ও সম্পাদক।
প্র : তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা কতটুকু ছিল?
উ : তিনি অন্নদা মডেল হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আইএসসি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এ ক্লাস পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন।
প্র : তিনি প্রথমে কোথায় কর্মরত ছিলেন?
উ : কলকাতায় সওগাত পত্রিকার সম্পাদনা বিভাগে চাকুরি করেন।
প্র : তিনি কার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন?
উ : কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদের কন্যা আফিয়া খাতুনের সঙ্গে।
প্র : তিনি কাজী নজরুল ইসলামের কোন পত্রিকায় বার্তা সম্পাদক নিযুক্ত হন?
উ : দৈনিক নবযুগ পত্রিকায়।
প্র : তিনি অন্য কোন সাপ্তাহিক পত্রিকায় চাকুরি করেন?
উ : মোহাম্মদী ও অর্ধসাপ্তাহিক পয়গাম পত্রিকায়।
প্র : ১৯২৬ সালে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর নেতৃত্বে ঢাকার 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের তিনি কী ভূমিকা পালন করেন?
উ : প্রধান উদ্যোক্তাদের একজন।
প্র : মুসলিম সাহিত্য সমাজ থেকে প্রকাশিত 'শিখা' পত্রিকার তিনি কী ছিলেন?
উ : প্রকাশক ও লেখক (১৯২৭)
প্র : তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ কী?
উ : কবিতা : দিলরুবা (১৯৩৩), উত্তর বসন্ত (১৯৬৭); প্রবন্ধ : বাংলা কাব্যের ইতিকথা : মুসলিম সাধনার ধারা (১৯৪৪), কাজী নজরুল (১৯৭০), কাজী আবদুল ওদুদ (১৯৭৬), লোকায়ত সাহিত্য (১৮৮৫)।
প্র : তাঁর মৃত্যুর পরে কোন প্রবন্ধ গ্রন্থ বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়?
উ : লোকায়ত সাহিত্য (১৯৮৫)
প্র : মৌলিক রচনা ছাড়াও তিনি কী সম্পাদনা করেছেন?
উ : কাব্য মালঞ্চ, মুসলিম সাহিত্যের সেরা গল্প, নজরুল রচনাবলি (১ম খণ্ড-৫ম খণ্ড) রোকেয়া রচনাবলি, সিরাজী রচনাবলি, লুৎফর রহমান রচনাবলি, ইয়াকুব আলী চৌধুরী রচনাবলি, কাব্যবীথি ইত্যাদি।
প্র : এই সম্পাদনাকর্মের মধ্যে কোন্‌টি ব্যাপকভাবে প্রশংসিত?
উ : নজরুল রচনাবলি সম্পাদনা।
প্র : সাহিত্যকীর্তির জন্য তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক, নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক, কুমিল্লা ফাউন্ডেশন পদক, মুক্তধারা পুরস্কার লাভ করেন।
প্র : তিনি অন্য কোন বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা রাখেন?
উ : শুধু ছন্দ রচনায় নয়, ছন্দ বিচারেও তাঁর অধিকার ছিল।
প্র : তাঁর কোন গ্রন্থে বাংলাছন্দের সামগ্রিক রূপটি বিশ্লেষণ করার প্রয়াস আছে?
উ : 'ছন্দ-সমীক্ষণ'
প্র : তাঁর কাব্য প্রয়াসে কী লক্ষণীয়?
উ : মোহিতলালের ধ্রুপদী সংগঠন ও নজরুলের উদাত্ত আবেগের চমৎকার সমন্বয় সহজে লক্ষণীয়।
প্র : তাঁর মৃত্যু সন কত?
উ : ঢাকা, ১৯৮৪ সালের ১৯শে ডিসেম্বর।

প্র : আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর জন্ম কবে ও কোথায়?
উ : ১৯৩৪ সালের ১২ই ডিসেম্বর; বরিশালের ডুমুরিয়ায়।
প্র : আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের নাম কী?
উ : 'ডানপিটে শওকত' (১৯৫৩)।
প্র : 'ডানপিটে শওকত' কোন জাতীয় গ্রন্থ?
উ : শিশুতোষ গ্রন্থ।
প্র : তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থের নাম কী?
উ : বুনোশুক (১৯৫৯)।
প্র : তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসগ্রন্থের নাম কী?
উ : চন্দ্রদীপের উপাখ্যান (১৯৬০)।
প্র : আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর প্রকাশিত প্রধান গ্রন্থগুলোর নাম লেখ।
উ : গল্পগ্রন্থ : সম্রাটের ছবি (১৯৫৯), সুন্দর যে সুন্দর (১৯৬০); উপন্যাস : নাম না জানা ভোর (১৯৬২), নীল যমুনা (১৯৬৪), শেষ রাত্রির চাঁদ (১৯৭৬); সম্পাদনা : বাংলাদেশ কথা কয় (১৯৭২)।
প্র : আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর অমর-কর্ম কোন্‌টি?
উ : ভাষা আন্দোলনের শহিদের স্মরণে রচিত গান: আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো /একুশে ফেব্রুয়ারি/ আমি কি ভুলিতে পারি।
প্র : এই গানটি প্রথম কোথায় প্রকাশিত হয়?
উ : হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'একুশে ফেব্রুয়ারী' (১৯৫৩) সংকলন গ্রন্থে।
প্র : গানটির সুরকার কে?
উ : গানটির প্রথম সুরকার আবদুল লতিফ। সেই সুর পরিবর্তন করে আলতাফ মাহমুদ পরে এর সুরারোপ করেন। সেটি এখন বলবৎ আছে।
প্র : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনভিত্তিক কোন চলচ্চিত্রের কাহিনি রচনা করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন।
উ : পলাশী থেকে ধানমন্ডি (২০০৭)।

'একুশের গান' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'একুশের গান' প্রথম কোথায় ছাপা হয়?
উ : 'একুশের গান' প্রথম ছাপা হয় হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'একুশে ফেব্রুয়ারী' সংকলনে।
প্র : 'একুশে ফেব্রুয়ারী' সংকলন কত খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশ পায়?
উ : ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে।
প্র : 'একুশে ফেব্রুয়ারী' সংকলনের আর একটি পরিচয় কী?
উ : এটি ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ভাষা আন্দোলনের ওপর প্রকাশিত প্রথম সংকলন।
প্র : একুশে ফেব্রুয়ারির প্রেক্ষাপট সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে লেখ।
উ : পাকিস্তান সরকার ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারি রাত থেকে ক্রমাগত এক মাস ১৪৪ ধারা জারি করে সভা ও মিছিল নিষিদ্ধ করে। তারপরও ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গাজীউল হকের সভাপতিত্বে ছাত্ররা সভা করে এবং বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটির আহ্বায়ক আবদুল মতিনের প্রস্তাবক্রমে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত দেবার ভার উপস্থিত সাধারণ ছাত্রদের ওপর প্রদান করা হয়। সাধারণ ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে মত দেয় এবং তারপরই ১০জন করে একত্র হয়ে বহু মিছিল বের করা হয়। একে বলা হয় 'দশজনী মিছিল'। সেই মিছিলে পুলিশের লাঠিচার্জ ও গুলিবর্ষণের কারণে জব্বার, রফিক, বরকত প্রমুখ শহিদ হন।
প্র : 'রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' বলতে কী বোঝান হয়েছে?
উ : যে একুশে ফেব্রুয়ারিতে বহু মানুষের রক্ত ঝরেছে।
প্র : 'অঞ্চ-গড়া' কী?
উ : অঞ্চ দিয়ে গড়া। (তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস)
প্র : 'ছেলেহারা শত মায়ের অঞ্চ-গড়া'- এখানে 'শত' কোন ধরনের সংখ্যাশব্দ?
উ : অনির্দেশক সংখ্যাশব্দ।

2020/5/12 21:21
Scanned with CamScanner

প্র : 'অনির্দেশক সংখ্যাশব্দ' কী?
উ : যে সংখ্যাশব্দে নির্দিষ্ট সংখ্যা না বুঝিয়ে অনির্দিষ্ট সংখ্যা বোঝায়। (সেখানে 'শত' দিয়ে ১০০ বোঝান হয় নি, 'অনেক' বোঝান হয়েছে।)
প্র : এই কবিতায় 'নাগিনী' ও 'কালবৈশাখী' কারা?
উ : বাঙালির লোক-ঐতিহ্যের প্রধান সহায় 'নাগিনী' আর প্রাকৃতিক প্রচণ্ডতা 'কালবৈশাখী'। বাংলার এই দুই শক্তিকে কবি পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে জেগে উঠতে আহ্বান জানাচ্ছেন।
প্র : 'ক্রান্তি' কী?
উ : অগ্রগতি।
প্র : 'তবু তোরা পার পাবি?' –কারা?
উ : পাকিস্তানিরা।
প্র : একুশে ফেব্রুয়ারি কী রায় দিয়েছে?
উ : একুশে ফেব্রুয়ারির রায় হলো, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ন্যায় সঙ্গত এবং অত্যাচারীর পতন অনিবার্য।
প্র : 'অলকানন্দা' কী?
উ : স্বর্গের নদীর ধারা বা স্বর্গের গঙ্গা।
প্র : 'সেদিনো এমনি নীল গগনের বসনে শীতের শেষে–' এর পর কী বলা হয়েছে?
উ : কবি কল্পনা করেছেন, ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারি একটি চমৎকার দিন ছিল। সে দিন ভোরে নীল আকাশের কোনে চাঁদ তখনো দেখা যাচ্ছিল, পথের ধারে এমন সুন্দর রজনীগন্ধা ফুল ফুটেছিল, যাতে মনে হয়েছে স্বর্গের নদী বইছে পাশ দিয়ে। আর এমন সুন্দর পরিবেশেই পাকিস্তানিরা সব লন্ডভন্ড করে দেয়। গুলি করে বইয়ে দেয় রক্তগঙ্গা।
প্র : 'আঁধারের পশু' কারা?
উ : যারা ২১শে ফেব্রুয়ারিতে বাঙালিদের ওপর গুলি চালিয়েছে। এখানে পাকিস্তানিরা।
প্র : 'ওরা এদেশের নয়'– কাদের কথা বলা হয়েছে?
উ : পশ্চিম পাকিস্তানিরা।
প্র : 'দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয়'– কোন দেশ?
উ : যদিও তখন বাঙালিরাও পাকিস্তান দেশের অধিবাসী তবু ২১শে ফেব্রুয়ারি সৃষ্টির মাধ্যমে মন থেকে বাঙালিরা পৃথক হয়ে যায়। তারা নিজেদের পাকিস্তানবাসী মনে করে না, বাংলাকে পৃথক দেশ ভাবে, এখানে 'দেশ' বলতে বাংলাদেশকেই বোঝান হয়েছে।
প্র : 'জালিম' কারা?
উ : অত্যাচারীরা।
প্র : 'জালিম' কোন শব্দ?
উ : আরবি শব্দ।
প্র : 'জাগো মানুষের সুপ্ত শক্তি হাতে হাতে হাতে বাঁকে'– বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
উ : বাঙালির মধ্যে প্রতিরোধ স্পৃহা আছে। এই প্রতিরোধ স্পৃহাকে তিনি জাগ্রত করতে বলেছেন এবং পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বলেছেন ঐক্যবদ্ধ হতে।
প্র : 'একুশের গান'-এর সঙ্গে ভাবগত ঐক্য আছে এমন দুটি কবিতার উল্লেখ কর।
উ : 'কোনো এক মাকে'– আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ‖ 'কুমড়ো ফুলে ফুলে / দুয় পড়েছে লতাটা, / সজনে ডাঁটায় / ধরে গেছে গাছটা, / আর, আমি ডালের বড়ি / শুকিয়ে রেখেছি, / খোকা তুই কবে আসবি। / কবে ছুটি?' 'মৃত্তিকন্যা'– আলাউদ্দিন আল আজাদ ‖ 'মৃত্তির নিচে ভেঙেছে তোমার? ভয় কি বন্ধু, আমরা এখনো / চার কোটি পরিবার / খাড়া রয়েছি তো। যে-ভিৎ কখনো কেনো রাজন্য / পারে নি ভাঙতে / হীরার মুকুট নীল পরোয়ানা খোলা তলোয়ার / দুর্গের ঝটিকা ধূলায় চূর্ণ যে-পদপ্রান্তে / যারা বুনি ধান / গুল টানি, আর তুলি হাতিয়ার হাসর চালাই / সরল নায়ক আমরা জনতা সেই অনন্য।'

আবদুল মান্নান সৈয়দ

প্র : আবদুল মান্নান সৈয়দ কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা অগস্ট, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলায়।
প্র : তাঁর মা-বাবার নাম কী?
উ : মা: কাজী আনোয়ারা মজিদ; বাবা: সৈয়দ এ এম বদরুদ্দোজা।
প্র : তাঁর শিক্ষাজীবন সম্পর্কে লেখ।
উ : ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রবেশিকা, ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে উচ্চমাধ্যমিক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা বিষয়ে সম্মানসহ স্নাতক (১৯৬৩) ও স্নাতকোত্তর (১৯৬৪) ডিগ্রি লাভ।

প্র : কর্মজীবনে তিনি কোন কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন?
উ : তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে বাংলার সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।
প্র : তিনি প্রথমজীবনে কোন ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন?
উ : অশোক সৈয়দ।
প্র : তিনি কোন ধরনের গ্রন্থ রচনা করেছেন?
উ : কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ-গবেষণা, জীবনী, নাটক/কাব্যনাটক, স্মৃতিকথা, অনুবাদ-কবিতা, সম্পাদনা– সব ধরনের গ্রন্থ রচনাতেই তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।
প্র : তাঁর রচিত প্রধান গ্রন্থাবলির একটি তালিকা উল্লেখ কর।
উ : কবিতা: জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ (১৯৬৭), জোছনা বৌদ্রের চিকিৎসা (১৯৬৯), ও সংবেদ ও জলতরঙ্গ (১৯৭৪), কবিতা কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড (১৯৮২), পরাবাস্তব কবিতা (১৯৮২), পার্কস্ট্রিটে একরাত্রি (১৯৮৩), মাছ সিরিজ (১৯৮৪), সকল প্রশংসা তাঁর (১৯৯৩) নীরবতা গভীরতা দুই বোন বলে কথা (১৯৯৭) ইত্যাদি; ছোটগল্প: সত্যের মতো বদমাশ (১৯৬৮), চলো যাই পরোকে (১৯৭৩), মৃত্যুর অধিক লাল ক্ষুধা (১৯৭৭), নেকড়ে খুয়না আর তির পরী (১৯৯৭) ইত্যাদি; উপন্যাস: পরিপ্রেক্ষিতের দাসসাসী (১৯৭৪), পোড়ামাটির কাজ (১৯৮২), অ-তে অজগর (১৯৮২) গভীর গভীরতর অসুখ (১৯৮২), ক্ষুধা প্রেম আগুন (১৯৯৪), শ্রাবস্তীর দিনরাত্রি (১৯৯৮); প্রবন্ধ-গবেষণা: শুদ্ধতম কবি (১৯৭২), নজরুল : কবি ও কবিতা (১৯৭৭), নজরুল : কালজ কালোত্তর (১৯৮৭), আধুনিক সাম্প্রতিক (২০০১) ইত্যাদি। জীবনী: জীবনানন্দ দাশ (১৯৮৮), ফররুখ আহমদ (১৯৮৮), প্রবোধচন্দ্র সেন (১৯৯৪); নাটক/কাব্যনাটক: চাকা (১৯৮৫), কবি ও অন্যেরা (১৯৯৬); স্মৃতিকথা: স্মৃতির নোটবুক (২০০০); অনুবাদ-কবিতা: মাতাল মানচিত্র (১৯৭০), বিদেশী প্রেমের কবিতা (১৯৮৪); সম্পাদনা: জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৮৬), সুনীলানন্দ সংগ্রহ সুনির্বাচিত কবিতা (১৯৯০), অটোবায়োগ্রাফার সেলফপ্রেজের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৯৬), নজরুল (১৯৯৬) ইত্যাদি।
প্র : বৈরাচার-বিরোধী আন্দোলনে তাঁর অবস্থান কী ছিল?
উ : দেশের প্রথান কবিদের প্রায় সবাই যখন জাতীয় কবিতা পরিষদ গঠন করে তৎকালীন সেনাশাসক এইচ. এম. এরশাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা রাখেন তখন আবদুল মান্নান সৈয়দ এরশাদের আয়োজনে অনুষ্ঠিত একটি কবিতা উৎসবে একাধিকবার যোগদান করেন। তখন রাষ্ট্রপতি এরশাদ সেন। তখন সেগুলো দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হলে। জনশ্রুতি আছে, এরশাদের এই কবিতাবলির কয়েকজন কবিসাহের একজন ছিলেন আবদুল মান্নান সৈয়দ।
প্র : আবদুল মান্নান সৈয়দ কোন কোন সনক ও পুরস্কার লাভ করেন?
উ : বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮১), নজরুল পুরস্কার (১৯৯৮), নজরুল সনক (২০০১) ইত্যাদি।
প্র : তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ২০১০ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর।

আবদুল্লাহ আল মামুন

প্র : আবদুল্লাহ আল মামুন কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৯৪৩ সালের ১২ই জুলাই; জামালপুর জেলা সদরের আমলা পাড়ায়।
প্র : তাঁর প্রথম প্রকাশিত নাটক কোনটি?
উ : শপথ (১৯৬৪)।
প্র : আবদুল্লাহ আল মামুন রচিত নাটকগুলোর নাম লেখ।
উ : সুবচন নির্বাসনে (১৯৭৪), এখন দুঃসময় (১৯৭৫), এবার ধরা দাও (১৯৭৭), শাহজাদীর কাল নেকাব (১৯৭৮), চারদিকে যুদ্ধ (১৯৮৩), এখনও ক্রীতদাস (১৯৮৪), কোকিলারা (১৯৯০), মেরাজ ফকিরের মা (১৯৯৭)।
প্র : আবদুল্লাহ আল মামুন রচিত উপন্যাসগুলোর নাম লেখ।
উ : মানব তোমার সারা জীবন (১৯৮৮); আহ্

2020/5/12 21:22

Scanned with CamScanner

দেবদাস (১৯৮৯); তাহমের যৌবনকাল (১৯৯১); হায় পার্বতী (১৯৯১); এই চুনীলাল (১৯৯৩); ভাঙাপাত্তার বাবা (১৯৯৩); খলনায়ক (১৯৯৭)।

প্র : 'একশত ক্রীতদাস' নাটক সম্পর্কে লেখ।

উ : আবদুল্লাহ আল মামুন রচিত এই নাটকে ঢাকা শহরে 'পলাচিপা' বস্তির মুক্তাহত পশু মুক্তিযোদ্ধা বাকা মিয়ার পরিবারের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশের নিম্নবর্গের মানুষের অসহায় জীবনযাপনের ইতিবৃত্ত। পুরুষতান্ত্রিক, পুঁজিতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীদের উপর নির্যাতনের চিহ্নও তুলে ধরা হয়েছে।

প্র। আবদুল্লাহ আল মামুন মূলত কী হিসেবে পরিচিত?

উ : নাট্যরচয়িতা (এবং নাট্যাভিনেতা)।

প্র : তাঁর রচিত এক চরিত্রাভিনয় নাটক কোনটি?

উ : কোকিলারা (১৯৯০)।

প্র : 'কোকিলারা' নাটকের পরিচয় দাও।

উ : আবদুল্লাহ আল মামুন রচিত এক চরিত্র বিশিষ্ট নাটক। গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায় ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে। তবে ঢাকা গাইড হাউজ মিলনায়তনে ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারি প্রথম অভিনীত হয়। ফেরদৌসী মজুমদার করেন এই একক অভিনয়। নাটকে তার নাম কোকিলা। 'কোকিলারা' উৎসর্গিত হয়েছে ফেরদৌসী মজুমদারকে। এ নাটকে তিনটি পর্যায় : প্রথম কোকিলা, দ্বিতীয় কোকিলা, তৃতীয় কোকিলা। প্রথম কোকিলা সরল বালিকা, প্রেমের প্রতারণায় গর্ভে সন্তান আসে, চোর সাব্যস্ত হয়, শেষে আত্মহত্যা করে। দ্বিতীয় কোকিলা মধ্যবিত্তের সংসারে তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া স্বামীর ভোগ্যপণ্য, নিরীহ প্রাণী। তৃতীয় কোকিলা প্রতিবাদী, সমাজের অন্যায় ও অমানবিকতার বিপক্ষে সে সর্বদা সোচ্চার। বাংলাদেশের নারীদের তিনটি রূপ তিন কোকিলা। লেখক আশা করেছেন তার তৃতীয় কোকিলা বর্বরতা, কুসংস্কার ও অধর্মের লৌহ কপাটে আঘাত করেই যাবে। দেশ-বিদেশ মিলে নাটকটি শতবারেরও বেশি মঞ্চস্থ হয়েছে।

প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?

উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (নাটক); আদমজী চলচ্চিত্র পুরস্কার (পরিচালনা); আদমজী টেলিভিশন পুরস্কার (প্রযোজনা); আইয়ুব চৌধুরী সম্মাননা ইত্যাদি।

প্র : তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?

উ : শারীরিক নানা জটিলতায় হাসপাতালে কাটিয়ে ২১শে জুলাই ২০০৮ খৃস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আবদুল্লাহ আল-মুতী

প্র : আবদুল্লাহ আল-মুতীর সম্পূর্ণ নাম কী?

উ : আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন।

প্র : আবদুল্লাহ আল-মুতী কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১৯৩০ সালের ১লা জানুয়ারি সিরাজগঞ্জ জেলার ফুলবাড়িতে।

প্র : তিনি কোথা থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন?

উ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় এম.এসসি (১৯৫৩); আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি (১৯৬২) ডিগ্রি লাভ করেন।

প্র : তিনি পেশায় কী ছিলেন?

উ : আমলা। বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব পদ থেকে তিনি অবসরে যান।

প্র : তিনি মূলত কোন ধরনের লেখক হিসেবে পরিচিত?

উ : বিজ্ঞানলেখক হিসেবে।

প্র : তাঁর প্রকাশিত প্রথম বইয়ের নাম কী?

উ : এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে; প্রকাশ ১৯৫৫ সালে।

প্র : তাঁর রচিত অন্যান্য কিছু গ্রন্থের নাম লেখ।

উ : আবিষ্কারের নেশায় (১৯৬৯); বিজ্ঞান ও মানুষ (১৯৭৫); সাগরের রহস্যপুরী (১৯৭৬); তারার দেশের হাতছানি (১৯৮৪); বিজ্ঞানের বিস্ময় (১৯৮৬); শিক্ষা ও বিজ্ঞান : নতুন দিগন্ত (১৯৯১); মহাকাশে কী ঘটছে (১৯৯৭) ইত্যাদি।

প্র : তিনি কোন কোন পুরস্কার লাভ করেন?

উ : দেশের প্রধান প্রধান প্রায় সব পুরস্কারই লাভ করেন। যেমন : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭৫); ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক

কলিঙ্গ পুরস্কার (১৯৮৩); একুশে পদক (১৯৮৫); স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার (১৯৮৫) ইত্যাদি।

প্র : তিনি কবে কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?

উ : ১৯৯৮ সালের ৩০শে নবেম্বর ঢাকায়।

আবু ইসহাক

প্র : আবু ইসহাক কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১৯২৬ সালের ১লা নবেম্বর; শরিয়তপুর জেলার নড়িয়ায়।

প্র : তিনি মূলত কী হিসেবে পরিচিত?

উ : ঔপন্যাসিক হিসেবে।

প্র : পেশায় তিনি কী ছিলেন?

উ : সরকারি চাকুরে। এন.এস.আই- খুলনা বিভাগের ডেপুটি ডাইরেকটর হিসেবে ১৯৮৪ সালে তিনি অবসরগ্রহণ করেন।

প্র : তাঁর প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থের নাম ও ধরন কী?

উ : সূর্য-দীঘল বাড়ী (১৯৫৫); উপন্যাস।

প্র : 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : ১৯৫৫ সালে উপন্যাসটি প্রকাশিত। বাংলাদেশের গ্রামজীবনের বিশ্বস্ত দলিল এই গ্রন্থ। বিশেষত গ্রামীণ মুসলমান জীবনের বিশ্বস্ত এবং আন্তরিক পরিচয় সমকালীন বাংলা সাহিত্যে বিরল। প্রকাশের অব্যবহিত পর থেকে বাস্তব চিত্রণ, চরিত্রায়ণের স্বাভাবিকতা ও প্রকাশভঙ্গির ঋজুতার জন্য উপন্যাসটি সমালোচক ও পাঠকসমাজে নন্দিত হয়েছে। জয়গুনদের বাড়িটিতে রাতে কথিত ভূতের ঢিল পড়ে, সে বাড়িতে নির্ভয়ে থাকা যায় না। তাই সূর্য-দীঘল বাড়ি অমঙ্গলের প্রতীকে পরিণত হয়। উপন্যাসে গ্রামের মানুষের দারিদ্র্য, কুসংস্কার, মোড়ল ও মোল্লাদের দৌরাত্ম্য, হৃদয়হীনা শাশুড়ির বৌয়ের প্রতি অত্যাচার ইত্যাদি এমন বিশ্বস্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে, যে কারণে এটি হয়ে উঠেছে গ্রামীণ জীবনের যথার্থ উপস্থাপনা। উপন্যাসের কয়েকটি চরিত্র : জয়গুন, তার ছেলে হাসু, মেয়ে মায়মুন, শফি, ডা. রমেশ চক্রবর্তী, মোড়ল গদু প্রধান।

প্র : তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের নাম ও ধরন উল্লেখ কর।

উ : উপন্যাস- 'পদ্মার পলিদ্বীপ' (১৯৮৬), 'আল' (১৯৮৮); গল্পগ্রন্থ - 'হাজেম' (১৯৯২), 'মহাপতঙ্গ' (১৯৯৩)।

প্র : 'পদ্মার পলিদ্বীপ' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : আবু ইসহাকের দীর্ঘ সময়ব্যাপী রচিত উপন্যাস 'পদ্মার পলিদ্বীপ'। ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার মুক্তধারা থেকে উপন্যাসটি প্রকাশ পেলেও ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে আবু ইসহাক উপন্যাসটি রচনায় হাত দেন। উপন্যাসের প্রথম খোলটি অধ্যায় বাংলা একাডেমীর 'উত্তরাধিকার' পত্রিকার ধারাবাহিকভাবে মে ১৯৭৪ থেকে ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। অবশ্য তখন এর নাম ছিল 'মুখর মাটি'। এর অনেক পরে আবু ইসহাক উপন্যাসটি বত্রিশটি অধ্যায়ে সমাপ্ত করেন এবং এর নামবদল করে দেন 'পদ্মার পলিদ্বীপ'। দ্বিতীয় নামটি সাদামাটা; উপন্যাসটি না পড়েও এতে কী আছে তা বোঝা যায়। প্রথম নামটি ছিল বহুমাত্রিক সাহিত্য গুণসম্পন্ন, প্রতীকী। 'পদ্মার পলিদ্বীপ' একটি আঞ্চলিক উপন্যাস। পদ্মানদীকে বলা হয় 'কীর্তিনাশা'। কারণ চাঁদরায়-কেদাররায়-রাজবল্লভ প্রমুখ বারভূঁইয়াদের কীর্তি এ নদী ধ্বংস করেছে। এ উপন্যাসে পদ্মাতীরবর্তী চরকেন্দ্রিক অধিবাসী, তাদের চরদখল, জীবন-সংগ্রাম মুখ্য। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া (যেমন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি) যে গ্রামীণ বা চরাঞ্চলের মানুষের উপরও পড়েছিল তা এ উপন্যাসে প্রতিভাত। ফজল এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। এছাড়া এরফান মাতব্বর, আরশেদ মোল্লা, জঙ্গুলল্লা, জরিনা, রূপজান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। উপন্যাসটি গতানুগতিক। পঁচিশ বছর আগের লেখা ও বিষয়-নির্বাচন আড়াই দশক পড়ে অনিবার্যভাবেই পুরোনো হয়ে যায়। আবু ইসহাকের এ উপন্যাসেও মধ্য আশির দশকে নতুন কোনো চমক ছিল না, যেমন চমক ছিল তাঁর 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'তে।

2020/5/12 21:22

Scanned with CamScanner

প্র : বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত, তাঁর সম্পাদিত অভিধানটির নাম কী?
উ : 'সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধান' (১৯৯৩)।
প্র : তাঁর প্রাপ্ত প্রধান প্রধান পুরস্কার কী?
উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৩), একুশে পদক (১৯৯৭)।

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

প্র : আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৯৩৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি; বরিশালের শিকারিমহল্লায়।
প্র : তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের নাম ও ধরন কী?
উ : সাতনরী হার (১৯৫৫); কাব্যগ্রন্থ।
প্র : তিনি পেশায় কী ছিলেন?
উ : বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন সচিব, স্বৈরাচার এরশাদ সরকারের মন্ত্রী, এফএও-র অতিরিক্ত মহাপরিচালক। কিন্তু তাঁর পরিচয়, তিনি একজন কবি।
প্র : তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতা হলো :
উ : আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি ও কোন এক মাকে (ফুমড়ো ফুলে ফুলে নুয়ে পড়েছে লতাটা)।
প্র : আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর কাব্যগ্রন্থসমূহ:
উ : 'কখনো রং কখনো সুর' (১৯৭০), 'কমলের চোখ' (১৯৭৪), 'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি' (১৯৮১) ইত্যাদি।
প্র : 'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর এই কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৮১ সালে। গ্রন্থটিতে ৩৯টি কবিতা স্থান পেয়েছে। বাঙালি জাতিসত্তার মৃত্তিকামূলে শিকড় সন্ধান করে এ কাব্যগ্রন্থে কবি ঐক্যবদ্ধ চেতনায় সাহসী মানুষের সম্ভাবনার ছবি এঁকেছেন। এই কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতায় আছে : 'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি / আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি / তার বুকে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল-'।
প্র : তিনি কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ২০০১ সালে।
প্র : তাঁর পুরো নাম কী?
উ : আবু জাফর মুহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ খান (ডাকনাম সেন্টু)

'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : কিংবদন্তি অর্থ কী?
উ : জনশ্রুতি লোকপরম্পরায় শ্রুত ও অলিখিত বিষয় যা একটি জাতির ঐতিহ্যের পরিচায়ক। (কিংবদন্তী ও কিংবদন্তি দুটোই শুদ্ধ বানান।)
প্র : শ্বাপদ শব্দের অর্থ কী?
উ : হিংস্র মাংসাশী শিকারী জন্তু।
প্র : প্রবহমান নদী কাকে ভাসিয়ে রাখে?
উ : যে সাঁতার জানে না।
প্র : কবিতার যুক্ত শব্দগুলো কোথা থেকে উচ্চারিত হয়?
উ : জিহ্বা থেকে।
প্র : কার পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল?
উ : কবির পূর্বপুরুষের পিঠে।
প্র : কে সন্তানের জন্য মরতে পারে না?
উ : যে কবিতা শুনতে জানে না সে সন্তানের জন্য মরতে পারে না।
প্র : কর্ষিত জমির কবিতা কোনটি?
উ : প্রতিটি শস্যদানা কবিতা।
প্র : কে আজন্ম ক্রীতদাস থেকে যাবে?
উ : যে কবিতা শুনতে জানে না।
প্র : কবি কার মৃত্যুর কথা বলেছেন?
উ : গর্ভবতী বোনের মৃত্যুর কথা।
প্র : কবির পূর্বপুরুষের করতলে কী ছিল?
উ : পলিমাটির সৌরভ।
প্র : যে কবিতা শুনতে জানে না সে কিসের আর্তনাদ শুনবে?
উ : ঝড়ের।
প্র : রক্তজবার মতো প্রতিরোধের উচ্চারণকে কী বলে?
উ : কবিতা।
প্র : ভালোবাসা দিলে মা মরে যায়- বলতে বুঝিয়েছেন?
উ : দেশমাতৃকার প্রতি ভালোবাসা জাগ্রত হলে জন্মদাত্রী মা প্রায়শ তুচ্ছ হয়ে যায়।
প্র : যুদ্ধ আসে ভালোবেসে- অর্থ কী?
উ : যখন মানুষ তার অধিকার বঞ্চিত হতে থাকে/ হতে থাকে নিপীড়িত ও নির্যাতিত; তখন যুদ্ধের কোনো বিকল্প থাকে না/ তখন যুদ্ধ নিজেই যেন ভালোবেসে আবির্ভূত হয়।

আবু জাফর শামসুদ্দীন

প্র : আবু জাফর শামসুদ্দীন কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : পূর্বতন ঢাকা জেলা, বর্তমানের গাজিপুর জেলার কলিগাঁও গ্রামে ১৯১১ সালের ১২ই মার্চ।
প্র : তাঁর পিতার নাম কী?
উ : মোহাম্মদ আক্কাস আলী।
প্র : তাঁর পিতামহ নালিরুজ্জামান ভূঁইয়া কার শিষ্য ছিলেন?
উ : প্রখ্যাত কেরামত আলি জৌনপুরির শিষ্য এবং স্থানীয় প্রতিনিধি।
প্র : আবু জাফর শামসুদ্দীনের শিক্ষাজীবন কেমন ছিল?
উ : প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চশিক্ষা তাঁর ছিল না। প্রথাগত পণ্ডিতের পাঠশালায় লেখাপড়া আরম্ভ করলেও মাদ্রাসা শিক্ষা তিনি গ্রহণ করেন এবং ১৯২৯ সালে হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে আজকের ঢাকা কলেজে ভর্তি হলেও পরীক্ষা দেন নি।
প্র : অবিভক্ত ভারতে তিনি কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হন?
উ : মানবেন্দ্রনাথ রায়ের (এমএন রায়) রেডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির সঙ্গে।
প্র : পাকিস্তান আমলে তিনি কোন দলে যুক্ত হন?
উ : আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাপের সঙ্গে।
প্র : তিনি কোন বিশেষ সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন?
উ : ঐতিহাসিক কাগমারি সম্মেলনের (১৯৫৭) প্রস্তুতি কমিটির কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক ছিলেন।
প্র : আবু জাফর শামসুদ্দীনের মূল পরিচয় কী?
উ : তিনি ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষতা, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী একজন প্রগতিশীল লেখক ও সাংবাদিক।
প্র : তিনি কোন কোন পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?
উ : দৈনিক ছোলতান পত্রিকার সাব-এডিটর হিসেবে কর্মজীবন শুরু। পরে দৈনিক আজাদ, ইত্তেফাক, পূর্বদেশ ও সংবাদ পত্রিকায় বিভিন্ন পদে চাকরি।
প্র : তিনি একটি ছদ্মনামে কলাম লিখতেন, সেটা কী?
উ : দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় আবু জাফর শামসুদ্দীন মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত 'অজ্ঞাতশত্রু' ছদ্মনামে 'বৈতালিকের দপ্তরখানা' শিরোনামে কলাম লিখতেন।
প্র : আবু জাফর শামসুদ্দীনের প্রথম উপন্যাসের নাম কী?
উ : 'পরিত্যক্ত শহর' (১৯৪৭)। এটি তাঁর প্রকাশিত প্রথমগ্রন্থও।
প্র : তাঁর রচিত অন্যান্য উপন্যাসের নাম কী?
উ : ভাওয়ালগড়ের উপাখ্যান (১৯৬৩), পদ্মা মেঘনা যমুনা (১৯৭৪), সংকর সংকীর্তন (১৯৮০), সেয়াল (১৯৮৫)।
প্র : তাঁর রচিত গল্পগ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : 'জীবন' (১৯৪৮), 'রাজেন্দ্রাকুরের তীর্থযাত্রা' (১৯৭৮), 'লালঝাঁ' (১৯৮৪), 'নির্বাচিত গল্প' (১৯৮৮)।
প্র : তাঁর রচিত প্রবন্ধগ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : 'চিন্তার বিবর্তন ও পূর্বপাকিস্তানী সাহিত্য' (১৯৬৪), 'সোচ্চার উচ্চারণ' (১৯৭৭), 'লোকায়ত সমাজ ও বাঙালী সংস্কৃতি' (১৯৮৮)।
প্র : তাঁর লেখায় কোন গুণটি বেশি প্রকাশিত?
উ : তাঁর লেখায় গণমানুষের সংগ্রাম ও উন্নত মানবতাবাদের দিকটিই মুখ্য।
প্র : কোন উপন্যাস তিনটিকে তাঁর 'ত্রয়ী উপন্যাস' বলে?
উ : 'ভাওয়ালগড়ের উপাখ্যান', 'পদ্মা মেঘনা যমুনা', 'সংকর সংকীর্তন'।
প্র : তিনি কোন কোন পদক ও পুরস্কার পান?
উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৮), সমকাল সাহিত্য পুরস্কার (১৯৭৯), একুশে পদক (১৯৮৩), মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৬), ফিলিপস পুরস্কার (১৯৮৮)।
প্র : তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ১৯৮৮ সালের ২৪শে অগস্ট।

আবু রুশদ

প্র : আবু রুশদ কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৯১৯ সালের ২৫শে ডিসেম্বর; কলকাতায়।
প্র : তাঁর সম্পূর্ণ নাম কী?
উ : আবু রুশদ মতিন উদ্দিন।
প্র : তাঁর মাতা-পিতার নাম কী?
উ : আমাতুজ জোহরা ও সৈয়দ আবদুল করিম।

2020/5/12 21
Scanned with CamScanner

প্র : তিনি কোথায় লেখাপড়া করেন?
উ : কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে ইংরেজিতে স্নাতক (স.) ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।
প্র : তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের নাম ও ধরন কী?
উ : 'রাজধানীতে ঝড়' (১৯৩৯); গল্পগ্রন্থ।
প্র : তাঁর রচিত প্রধান গ্রন্থগুলোর নাম লেখ।
উ : গল্পগ্রন্থ : 'প্রথম যৌবন' (১৯৪৮), 'ডোবা হলো দীঘি' (১৯৬০), 'শাড়ি বাড়ি গাড়ি' (১৯৬১), 'মহেন্দ্র মিষ্টান্ন ভাণ্ডার' (১৯৮২), 'বিয়োগ ব্যথা' (১৯৯৬); উপন্যাস : 'এলোমেলো' (১৯৪৬), 'সামনে নূতন দিন' (১৯৫১), 'নোঙর' (১৯৬৩), 'ছুপিত দ্বীপ' (১৯৭৪)।
প্র : তিনি কোন কোন পুরস্কার লাভ করেন?
উ : একুশে পদক (১৯৮১), নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক (১৯৯২), শেরে বাংলা পুরস্কার (১৯৯২) ইত্যাদি।
প্র : তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ২০১০ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার।

আবু হেনা মোস্তফা কামাল

প্র : আবু হেনা মোস্তফা কামালের জন্মতারিখ কত?
উ : ৩.১২.১৯৩৬।
প্র : তাঁর জন্মস্থান কোথায়?
উ : গোবিন্দগ্রাম, সিরাজগঞ্জ।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : শিক্ষাবিদ, কবি, লেখক।
প্র : তাঁর পেশা কী ছিল?
উ : অধ্যাপনা।
প্র : তিনি বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক পদে যোগদান করেন কত সালে?
উ : ১৯৮৬, ১১ই মার্চ।
প্র : তিনি কী কী রচনা করে প্রভূত সুনাম অর্জন করেন?
উ : কবিতা, প্রবন্ধ, গান।
প্র : তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলির নাম কী?
উ : কাব্য। 'আপন যৌবন তৈরী' (১৯৫৬), 'যেহেতু জন্মান্ধ' (১৯৬৪), 'অন্ধকার গজল' (১৯৮৮); প্রবন্ধ-গবেষণা: 'বাংলা জগত্তর' (১৯৭৫), 'The Bengali Press and Literary Movement' (১৯৭৭), 'কথা ও কবিতা' (১৯৮১)।
প্র : সাহিত্যকর্মের জন্য তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ : আলাওল পুরস্কার (১৯৭৫), সুধন সাহিত্য স্বর্ণপদক (১৯৮৬), একুশে পদক (১৯৮৭), আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ স্বর্ণপদক (১৯৮৯), সাদাত আলি আখন্দ স্মৃতি পুরস্কার (১৯১৯)।
প্র : তাঁর মৃত্যু তারিখ কত?
উ : ২৩.৯.১৯৮৯।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন

প্র : আবুল কালাম শামসুদ্দীন এর জন্মতারিখ কত?
উ : ৩.১১.১৮৯৭।
প্র : তাঁর জন্মস্থান কোথায়?
উ : ধানিখোলা গ্রাম, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ।
প্র : তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন কত সনে?
উ : ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে।
প্র : অসযোগ আন্দোলনে কংগ্রেসের আহ্বানে কোন পরীক্ষা বর্জন করেন?
উ : বি.এ।
প্র : বাঙালি মুসলমান সমাজের কল্যাণ সাধনায় কোন পেশায় আত্মনিয়োগ করেন?
উ : সাংবাদিকতা ও সাহিত্য সাধনায়।
প্র : তিনি ১৯২৩-এ কোন পত্রিকায় সহযোগী সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন?
উ : দৈনিক মোহাম্মদী পত্রিকায়।
প্র : মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত সওগাত পত্রিকায় তিনি কোন বিভাগে কর্মরত ছিলেন?
উ : সম্পাদনা বিভাগে (১৯২৬)।

প্র : বঙ্গভাষা আকরম খাঁ প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত দৈনিক আজাদ পত্রিকার সম্পাদনা বিভাগে তিনি কবে যোগদান করেন?
উ : ৩১শে অক্টোবর, ১৯৩৬
প্র : তিনি 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকায় কত বছর সম্পাদনা করেন?
উ : দীর্ঘ বাহান্ন বছর (১৯৪০-'৬২)
প্র : তিনি কত সনে দৈনিক পাকিস্তান পরে দৈনিক আজাদ সম্পাদক নিযুক্ত হন?
উ : এই সংবাদ, ১৯৬৪।
প্র : তিনি কখন মুসলিম লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন?
উ : ত্রিশের দশকে।
প্র : বাঙালি মুসলিম সমাজকে ইসলামিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করার প্রয়াসে কলকাতায় 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' (১৯৪০) প্রতিষ্ঠা হয়। তিনি এর কোন পদে ছিলেন।
উ : সভাপতি।
প্র : মুসলিম লীগের মনোনয়নে ময়মনসিংহ জেলা থেকে বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন কত সালে?
উ : ১৯৪৬ সালে।
প্র : ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে তিনি কী ভূমিকা পালন করেন?
উ : অত্যন্ত প্রতিবাদী ভূমিকা।
প্র : ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে পূর্ববঙ্গ পরিষদে থেকে কত তারিখে তিনি পদত্যাগ করেন?
উ : ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২।
প্র : তিনি কত তারিখে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে নির্মিত প্রথম শহিদ মিনার উদ্বোধন করেন?
উ : ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২।
প্র : আয়ুব বিরোধী গণআন্দোলনের সময় সরকারের দমন নীতির প্রতিবাদে তিনি কোন খেতাব বর্জন করেন?
উ : 'সিতারা-এ খেদমত' ও 'সেতারা-এ ইমতিয়াজ' খেতাব (১৯৬০)।
প্র : ১৯৭১ এ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার পক্ষে অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে তিনি কত তারিখে বিবৃতি প্রদান করেন?
উ : ১৭ই মে, ১৯৭১।
প্র : তিনি কোন বিষয়ে বহু শিক্ষামূলক সাহিত্য রচনা করেন?
উ : সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে।
প্র : তিনি অন্য কোন বিষয়ে অধিকতর পরিচয় প্রদান করেন?
উ : বাংলা সাহিত্যের মুসলিম ধারার এবং নজরুল কাব্যের বিচার-বিশ্লেষণ ও নবমূল্যায়নে।
প্র : কাজী নজরুল ইসলামকে অকপটে প্রথম কী বলে অভিহিত করা হয়?
উ : যুগ সাবর্তক।
প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ : অনুবাদ সাহিত্যে বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭০), সাংবাদিকতা ও সাহিত্যে একুশে পদক (১৯৭৬)।
প্র : তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলি কী কী?
উ : কচিপাতা (শিশু সাহিত্য, ১৯৩২), ত্রিস্রোতা (ভূগোলিচের ত্রিনেটি গল্পের অনুবাদ, ১৯৩৯), পৃষ্টিকোণ (প্রবন্ধ সংকলন, ১৯৬১), ইলিয়ড (রম্যানুবাদ, ১৯৬৭), পলাশী থেকে পাকিস্তান (ইতিহাস, ১৯৬৮), অতীত দিনের স্মৃতি (আত্মজীবনী ও স্মৃতিচারণ, ১৯৬৮)।
প্র : তিনি কোন পত্রিকা সম্পাদনা করে জীবনের এক অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন?
উ : দৈনিক আজাদ।
প্র : তাঁর মৃত্যু তারিখ কত?
উ : ৪. ৩. ১৯৭৮।

আবুল ফজল

প্র : আবুল ফজলের জন্মতারিখ কত?
উ : ১লা জুলাই, ১৯০৩।
প্র : তাঁর জন্মস্থান কোথায়?
উ : কেঁওচিয়া গ্রাম, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : সাহিত্যিক।
প্র : তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কতটুকু?
উ : তিনি চট্টগ্রাম সরকারি নিউ স্কিম মাদ্রাসা থেকে ম্যাট্রিক (১৯২৩) এবং পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে দ্বিতীয় শ্রেণিতে এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন।

2020/5/12 21:22
Scanned with CamScanner

প্র : তাঁর প্রথম পেশা কী ছিল?
উ : স্কুলে শিক্ষকতা
প্র : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন কত সালে?
উ : ১৯শে এপ্রিল, ১৯৭৩।
প্র : তিনি রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা ছিলেন কার শাসনামলে?
উ : রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের।
প্র : তিনি কোন সংগঠনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, কত সালে?
উ : ১৯২৬ সালে গঠিত মুসলিম সাহিত্য সমাজের।
প্র : তিনি সাহিত্য সমাজের অন্যতম কর্ণধার হিসেবে কোন আন্দোলন গড়ে তোলেন?
উ : 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন।
প্র : বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের মূল কথা কী ছিল?
উ : 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।'
প্র : বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের মুখপত্র বার্ষিক পত্রিকার নাম কী ছিল?
উ : শিখা (১৯২৭)
প্র : কত সালে তিনি মুসলিম সাহিত্য সমাজের সম্পাদক হন?
উ : ১৯৩০ সালে।
প্র : শিখার কোন সংখ্যা তিনি সম্পাদনা করেন?
উ : ৫ম সংখ্যা (১৯৩১)
প্র : তিনি কী হিসেবে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেন?
উ : সমাজ ও সমকাল সচেতন প্রাবন্ধিক হিসেবে।
প্র : তিনি অন্য কীসে প্রসিদ্ধি লাভ করেন?
উ : কথাশিল্পী হিসেবে।
প্র : তাঁর সাহিত্যকর্মের প্রতিপাদ্য কী?
উ : স্বদেশপ্রীতি, অসাম্প্রদায়িক জীবনচেতনা, সত্যনিষ্ঠা, মানবতা ও কল্যাণবোধ।
প্র : তাঁর প্রধান রচনাবলির নাম কী?
উ : উপন্যাস : চৌচির (১৯৩৪), প্রদীপ ও পতঙ্গ (১৩৪৭), রাঙ্গা প্রভাত (১৩৬৪); গল্পগ্রন্থ : মাটির পৃথিবী (১৩৪৭), মৃতের আত্মহত্যা (১৯৭৮); নাটক : কায়েদে আজম (১৯৪৬), প্রগতি (১৯৫২), স্বয়ম্বরা (১৯৬৬); আত্মজীবনী : লিপিলিপি ; রেখাচিত্র (১৯৬৬); প্রবন্ধ : বিচিত্র কথা (১৩৪৭), সাধনা (১৯৬১), সাহিত্য ও সংস্কৃতি (১৯৬৫), সমকালীন জীবন (১৯৬৫), সাহিত্য ও সংস্কৃতি (১৯৭০), মানবতন্ত্র ((১৩৭৯) প্রভৃতি। দেখেছি (১৯৭৮), শেখ মুজিব । তাঁকে যেমন দেখেছি (১৯৭৯), রবীন্দ্র প্রসঙ্গ (১৯৭৯)।
প্র : তিনি কী কী পুরস্কার ও উপাধি লাভ করেন?
উ : উপন্যাসে বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬২), শ্রেসিডেন্টের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার (১৯৬৩) ও রেখাচিত্র গ্রন্থের জন্য আদমজি পুরস্কার (১৯৬৬); ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডক্টরেট উপাধি প্রদান (১৯৭৪)।
প্র : তিনি কি নামে আখ্যায়িত হন?
উ : মুক্তবুদ্ধির চিরসজাগ প্রহরী
প্র : তাঁর মৃত্যু তারিখ কত?
উ : ৪ঠা মে, ১৯৮৩।

আবুল মনসুর আহমদ

প্র : আবুল মনসুর আহমদ কতসালে জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ৩রা সেপ্টম্বর ১৮৯৮।
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ধানিখোলা গ্রাম, ময়মনসিংহ।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ।
প্র : তিনি কত সালে 'ছোলতান' ও 'মোহাম্মদী'র সহকারী সম্পাদক হন?
উ : ১৯২৩।
প্র : কত সালে তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দির দৈনিক 'ইত্তেহাদ' পত্রিকার সম্পাদক হন?
উ : ১৯৪৬ সালে, ১৯৪৮ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন।
প্র : তিনি কোন কোন আন্দোলনে সাথে যুক্ত ছিলেন?
উ : খেলাফত, অসহযোগ, স্বরাজ আন্দোলন।
প্র : তিনি আজাদী লীগের কী ছিলেন?
উ : প্রতিষ্ঠাতা নেতা (১৯৫৩-৫৮ সাল পর্যন্ত সহ-সভাপতি)।
প্র : যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি কর্মসূচির কী সাহিত্য রূপদান করেন?
উ : ২১ দফার অন্যতম প্রণেতা।
প্র : তিনি যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার কোন মন্ত্রী ছিলেন?
উ : খাদ্যমন্ত্রী (১৯৫৪)।
প্র : পাকিস্তান সরকার বেতার-টিভিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ করলে তাঁর অবস্থান কী ছিল?
উ : তিনি এই সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থননান করেন।
প্র : তিনি কোন কোন রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত ছিলেন?
উ : খেলাফত আন্দোলন থেকে দেশবন্ধুর স্বরাজ পার্টি, সেখান থেকে সুভাষ বসুর কংগ্রেস, সেখান থেকে ফজলুল হকের কৃষক-প্রজাপার্টি, সেখান থেকে মুসলিম লীগ, তারপর আওয়ামী লীগ। কিন্তু জীবনের শেষ দিকে ইসলামি গোঁড়া মতবাদী।
প্র : তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা কী?
উ : উপন্যাস : সত্যমিথ্যা (১৯৫৩), জীবনক্ষুধা (১৯৫৫), আবে হায়াত (১৯৬৮); গল্পগ্রন্থ : আয়না (১৯৩৫), ফুড কনফারেন্স (১৯৪৪), আসমানী পর্দা (১৯৬৪); রাজনীতিবিষয়ক গ্রন্থ : আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর (১৯৬৯), শেরে বাংলা থেকে বঙ্গবন্ধু (১৯৭২); স্মৃতিকথা: আত্মকথা (১৯৭৮); শিশুসাহিত্য: ছোটদের কসাসুল আম্বিয়া (১৯৪৯), গালিভারের সফরনামা (১৯৫৯)।
প্র : কাজী নজরুল ইসলাম আবুল মনসুর আহমদের কোন গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন?
উ : আয়না।
প্র : 'আবেহায়াত' উপন্যাসের পরিচয় দাও।
উ : আবুল মনসুর আহমদের 'আবেহায়াত' (১৯৬৮) উপন্যাসে গ্রামের পির পরিবারের সন্তান হামিদের ডাক্তার হিসেবে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও শহরে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে দেখা যায়। মুখে সে জনদরদি হলেও মনেপ্রাণে ধনলিপ্সু। বাইরে বিজ্ঞানমনস্ক মনে মনে গোঁড়া ভেতরে ভেতরে আধ্যাত্মিকতায় আস্থা স্থাপনকারী। বিবাহিত প্রাক্তন সংসদীয় রক্ষিতাকে স্ত্রী হিসেবে লাভ করার জন্য তাহিল খান বিজ্ঞানের খোলস ছেড়ে যখন আধ্যাত্মিকতা নির্ভর হয় তখন তার প্রকৃত রূপ মোক্ষা যায়। সমাজে হামিদের মতো লোকের অভাব নেই।
প্র : 'আয়না' গল্পগ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : হাস্যরসাত্মক গল্পের সমাহারে আবুল মনসুর আহমদ রচিত গল্পগ্রন্থ 'আয়না' ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয়েছে। হুবহু কেবলা, গো-দেওতা-কা দেশ, সাহেবে নবী, লীডারে কওম, মুজাহেদীন, বিদ্রোহী সংঘ, ধর্মরাজ্য-এই সাতটি গল্প হয়েছে বইটির মধ্যে। যার মধ্যে 'বিদ্রোহী সংঘ' ছাড়া বাকি সবগুলো গল্পেই ধর্মান্ধ ও ধর্মব্যবসায়ী কয়েকটি চরিত্রকে তীব্র ব্যঙ্গবাণে জর্জরিত করা হয়েছে। 'বিদ্রোহী সংঘ' গল্পে ডাকার 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' কে ব্যঙ্গ করে বলা হয়েছে যে, তারা আত্মিক স্বাধীনতা বা আনন্দের জন্য উচ্চকণ্ঠ, কিন্তু দেশের পরাধীনতা নিয়ে মৌনব্রত পালন করে। 'আয়না' গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি লিখেছেন : 'যে-সমস্ত মানুষ হাসে বক্রমের মুখোশ পরে আমাদের সমাজে অবাধে বিচরণ করছে, আবুল মনসুরের আয়নার ভেতরে তাদের স্বরূপ-মূর্তি বন্য ভীষণতা নিয়ে ফুটে উঠেছে।'
প্র : বাংলা সাহিত্যে তিনি কোন ধারার সাহিত্য রচনা করেন?
উ : ব্যঙ্গধারার।
প্র : সাহিত্যে তিনি কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ : ১৯৬০-এ ছোটগল্পে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ।
প্র : তাঁর মৃত্যুতারিখ কত?
উ : ১৮.৩.১৯৭৯; ঢাকা।

আবুল হাসান

প্র : আবুল হাসানের জন্মতারিখ কত?
উ : ৪ঠা অগস্ট, ১৯৪৭।

2020/5/12 21
Scanned with CamScanner

প্র : তাঁর জন্মস্থান কোথায়?
উ : মাতুলালয়, বর্ধি গ্রাম, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ।
প্র : তাঁর পৈতৃক নিবাস কোথায়?
উ : মাজিরগুর, পিরোজপুর।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : কবি ও সাংবাদিক।
প্র : তাঁর প্রকৃত নাম কী?
উ : আবুল হোসেন মিয়া।
প্র : তাঁর সাহিত্যিক নাম কী?
উ : আবুল হাসান।
প্র : তাঁর পেশা কী ছিল?
উ : সাংবাদিকতা
প্র : কোন সালে দৈনিক 'ইত্তেফাক' পত্রিকার বার্তা বিভাগে চাকরি করেন?
উ : ১৯৬৯ সালে।
প্র : তিনি কী হিসেবে খ্যাত?
উ : একজন সৃষ্টিশীল কবি হিসেবে।
প্র : কোন দিকটি তাঁর কবিতায় সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে?
উ : আত্মগত দুঃখবোধ, মৃত্যুচেতনা, বিচ্ছিন্নতা বোধ, নিঃসঙ্গচেতনা, মুক্তিমুগ্ধতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।
প্র : তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের নাম কী?
উ : কাব্যগ্রন্থ : 'রাজা যায় রাজা আসে' (১৯৭২), 'যে তুমি হরণ করো' (১৯৪৭), 'পুথক পালঙ্ক' (১৯৭৫)। তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত কাব্যনাট্য 'ওরা কয়েকজন' (১৯৮৮); গল্প সংকলন : 'আবুল হাসান গল্প সংগ্রহ' (১৯৯০)।
প্র : সাহিত্যে তিনি কী কী পুরস্কার ও পদক লাভ করেন?
উ : ১৯৭০-এ এশীয় কবিতা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান, কবিতায় মরণোত্তর বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, (১৯৭৫), বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত সাহিত্যে মরণোত্তর একুশের পদক (১৯৮২)।
প্র : তাঁর মৃত্যুতারিখ কত?
উ : ২৬শে নবেম্বর, ১৯৭৫।

আবুল হুসেন

প্র : আবুল হুসেনের জন্মতারিখ কত?
উ : ৬ই জানুয়ারি, ১৮৯৬।

প্র : তাঁর জন্মস্থান কোথায়?
উ : মাতুলালয়, শালিয়ারা গ্রাম, যশোর।
প্র : তাঁর পৈতৃক নিবাস কোথায়?
উ : কাউরিয়া গ্রাম, যশোর।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : চিন্তাবিদ ও প্রাবন্ধিক।
প্র : তাঁর পেশা কী ছিল?
উ : প্রথমে শিক্ষকতা, কলকাতা মেয়র [illegible] সহকারী শিক্ষক (১৯২০), [illegible] বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলে ১৯২১ [illegible] অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিভাগের লেকচারার।
প্র : তিনি কিসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা?
উ : ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্যসমাজ' (১৯১৯)।
প্র : তাঁরা কী আন্দোলন গড়ে তোলেন?
উ : 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন'।
প্র : আবুল হুসেন এ আন্দোলনের কী ছিলেন?
উ : প্রাণপুরুষ।
প্র : সাহিত্য-সমাজের মুখপত্র পত্রিকার নাম কী ছিল?
উ : 'শিখা' (১৯২৭-৩১)।
প্র : বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সংগঠনকে শিখা গোষ্ঠী বলা হয় কেন?
উ : এই সংগঠনের পত্রিকা 'শিখা'র নাম অনুসারে।
প্র : তিনি শিখা পত্রিকার কোন বর্ষের সম্পাদক ছিলেন?
উ : প্রথম বর্ষের (১৯২৭)।
প্র : তিনি কী হিসেবে খ্যাত?
উ : মননশীল ও যুক্তিনিষ্ঠ প্রাবন্ধিক।
প্র : তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম কী?
উ : বাংলার বলশী (১৯২৫), বাঙালি মুসলমানদের শিক্ষা সমস্যা (১৯২৬), মুসলিম কালচার (১৯২৮)।
প্র : 'বাংলার বলশী' গ্রন্থের কী নির্দেশ করা হয়েছে?
উ : কৃষকদের দুঃখ দুর্দশা চিহ্নিত করে তাদের মুক্তির পথ নির্দেশ।
প্র : তিনি রুশ বিপ্লবের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে কী কী প্রবন্ধ রচনা করেন?
উ : কৃষকের আর্তনাদ, কৃষকের দুর্দশা, কৃষি বিপ্লবের সূচনা।
প্র : তাঁর মৃত্যুতারিখ কত?
উ : ১৫ই অক্টোবর, ১৯৩৮।

আবুল হোসেন

প্র : আবুল হোসেন কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৯২২ সালের ১৫ই আগস্ট, খুলনায়।
প্র : তাঁর পেশা ও পরিচিতি সম্পর্কে লেখ।
উ : তিনি পেশায় বাংলাদেশ সরকারের কর্মকর্তা (প্রাক্তন যুগ্ম সচিব) ছিলেন। তবে কবি হিসেবেই পরিচিত।
প্র : তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থসমূহের নাম–
উ : নব বসন্ত (১৯৪০), বিরস সংলাপ (১৯৬৯), হাওয়া তোমার কি দুঃসাহস (১৯৮২), দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে (১৯৮৫), এখনও সময় আছে (১৯৯৬), রাজা রাজড়া (১৯৯৭)।
প্র : 'অরণ্যের ডাক' কী?
উ : আবুল হোসেন অনূদিত উপন্যাস। মূল জ্যাক লন্ডন রচিত 'দ্য কল অব দ্য ওয়াইল্ড'। জ্যাক লণ্ডনের প্রকৃত নাম জন গ্রিফিথ। আমেরিকান এই লেখকের বই আবুল হোসেন ১৯৫৪ সালে অনুবাদ করে প্রকাশ করেন।
প্র : তাঁর মৃত্যুতারিখ কত?
উ : ২৯শে জুন ২০১৪; ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আরজ আলী মাতুব্বর

প্র : আরজ আলী মাতুব্বর-এর জন্মতারিখ কত?
উ : ৩রা পৌষ, ১৩০৭ (১৯০০)
প্র : তাঁর জন্মস্থান কোথায়?
উ : লামচারি গ্রাম, বরিশাল।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : দার্শনিক
প্র : তাঁর পিতার নাম কী?
উ : এন্তাজ আলী মাতুব্বর।
প্র : তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কতটুকু?
উ : স্কুলে মুন্সি আবদুল করিমের মক্তবে সীতানাথ বসাকের 'আদর্শলিপি' অধ্যয়ন এবং উত্তরকালে নিজের 'সাধনায় নানা বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন।
প্র : তাঁর পেশা কী ছিল?
উ : বাল্যকালে পৈতৃক পেশা কৃষিকাজে নিয়োজিত। পরে জমি অফিসের কাজকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ।
প্র : তিনি কী হিসেবে খ্যাত?
উ : সৌকিক দার্শনিক হিসেবে।
প্র : তাঁর রচনার আবহ কী?
উ : অলঙ্কীবনের চিন্তা-চেতনা।
প্র : জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁর ধারণার কীসের পরিচয় পাওয়া যায়?
উ : প্রজ্ঞা, যুক্তিচিন্তা ও যুক্তবুদ্ধির।
প্র : তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলি কী কী?
উ : সত্যের সন্ধান (১৯৭৩), সৃষ্টি রহস্য (১৯৭৮), স্মরণিকা (১৯৮২), অনুমান (১৯৮৩) ইত্যাদি।
প্র : 'অনুমান' গ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : 'রাবণের প্রতিভা', 'কেরাটসের কীর্তি', 'ভগবানের মৃত্যু', 'আধুনিক দেবতত্ত্ব', 'মেরাজ', 'পরজাতের অবানবন্দি', 'সমাপ্তি' এই সাতটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে আরজ আলী মাতুব্বরের 'অনুমান' গ্রন্থে। বইটি প্রকাশিত হয় ১৩৯০ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে অর্থাৎ ১৯৮৩ সালে। এই গ্রন্থে আরজ আলী তাঁর বাড়ি অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের আলোকে ধর্ম ও সংস্কারে প্রতিষ্ঠিত কতিপয় ধারণার বিরুদ্ধে নিজস্ব মত ব্যক্ত করেন।
প্র : অল্প কথায় আরজ আলী মাতুব্বর সম্পর্কে কী বলা যায়?
উ : আরজ আলী মাতুব্বর বরিশালের এক দরিদ্র কৃষক পরিবারের সন্তান। সমস্ত জীবন সংগ্রাম করেছেন দারিদ্র্য এবং অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে। তিনি আনুষ্ঠানিক বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ পান নি। কিন্তু কঠিন পরিশ্রমে বিদ্যা অর্জন এবং ধর্মীয় মূঢ়তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি অর্জন করেছেন। সমকালীন সরকার তাঁর রচনার বিরোধিতা করেছে, মৌলবাদীরা তাঁর কণ্ঠরুদ্ধ করতে চেয়েছে। 'সত্যের সন্ধান' (১৯৭৩), 'সৃষ্টিরহস্য' (১৯৭৮) ও 'স্মরনিকা' (১৯৮২) তাঁর তিনটি মূল্যবান দার্শনিক গ্রন্থ। এই অসামান্য মানুষটির রচনা সমগ্র (দুই খণ্ড, ১৯৯৩, ১৯৯৫) আইয়ুব হোসেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে।
প্র : তিনি স্ব-উপার্জিত অর্থে তাঁর জন্মস্থান লামচারি গ্রামে কী প্রতিষ্ঠা করেন?
উ : আরজ মঞ্জিল পাবলিক লাইব্রেরি।

2020/5/12 21:22
Scanned with CamScanner

প্র : তিনি কী নামে প্রাথমিক মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি দেন?
উ : আরজ বৃত্তি (১৩৮৬)
প্র : তিনি কোন কলেজকে মরণোত্তর দেহদান করেন?
উ : বরিশাল শেরেবাংলা মেডিক্যাল কলেজকে।
প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ : বাংলাদেশ লেখক শিবির কর্তৃক হুমায়ুন কবির স্মৃতি পুরস্কার (১৩৮৫) ও উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীর বরিশাল শাখা কর্তৃক বরণীয় মনীষী হিসেবে সম্মাননা (১৩৯২); এছাড়া বাংলা একাডেমি কর্তৃক নববর্ষের সংবর্ধনা জ্ঞাপন (১লা বৈশাখ, ১৩৯২)।
প্র : তাঁর মৃত্যুতারিখ কত?
উ : ১লা চৈত্র, ১৩৯২ (১৯৮৫)।

আল মাহমুদ

প্র : আল মাহমুদের জন্ম কবে ও কোথায়?
উ : ১৯৩৬ সালের ১১ই জুলাই; ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মৌড়াইল গ্রামে।
প্র : লেখক আল মাহমুদের প্রকৃতনাম কী?
উ : মির আব্দুল শুকুর আল মাহমুদ
প্র : আল মাহমুদ মূলত কী?
উ : তিনি বাংলাদেশের অন্যতম কবি।
প্র : তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা কতটুকু?
উ : মাধ্যমিক পাস।
প্র : তাঁর প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
উ : সোনালী কাবিন (১৯৭৩)।
প্র : তাঁর প্রধান গ্রন্থগুলো কী?
উ : কাব্যগ্রন্থ : লোক লোকান্তর (১৯৬৩), কালের কলস (১৯৬৬), সোনালী কাবিন (১৯৭৩), অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না (১৯৮০), বখতিয়ারের ঘোড়া (১৯৮৪), দোয়েল ও দয়িতা (১৯৯৭), পাখির কাছে ফুলের কাছে, প্রেমের কবিতা, দ্বিতীয় ডাঙ্গন (২০০২); গল্পগ্রন্থ : পানকৌড়ির রক্ত (১৯৭৫), সৌরভের কাছে পরাজিত (১৯৮৩), গন্ধবণিক (১৯৮৬), ময়ূরীর মুখ (১৯৯৪); উপন্যাস : ডাহুকী (১৯৯২), উপমহাদেশ (১৯৯৩), আগুনের মেয়ে (১৯৯৫), চেহারার চতুরঙ্গ (২০০০), কাবিলের বোন (২০০১)।

প্র : 'সোনালী কাবিন' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : আল মাহমুদের কবি-প্রতিভা বিকশিত করেছিল 'সোনালী কাবিন' কাব্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থে বিভিন্ন বিষয়ের (১৯৭৩) কবিতার সঙ্গে 'সোনালী কাবিন' নামে চৌদ্দটি সনেটের সমন্বয়ে একটি সুন্দর কবিতাও অন্তর্ভুক্ত। এটিকে একটি ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থও বলা যেতে পারে। বলা যেতে পারে, বীজ কাব্যগ্রন্থ। অন্য কবিতাগুলো জাতিস্মর, পালক ভাঙার প্রতিধ্বনি, ক্যামোফ্লাজ, শোণিতে সৌরভ, কোথায় আড়ালে ইত্যাদি। পুরো কাব্যগ্রন্থটির বঞ্চিতের ক্ষোভ, শ্রমিকের ঘাম, কৃষকের পরিশ্রম গ্রামীণ আবহে উঠে এসেছে। অসাধারণ কাব্যভাষা, গীতল অনুভবযোগ্য। যৌন-প্রসঙ্গও বাদ যায় নি, তবে তা করেছেন শ্রেণিচেতনার নিরিখে। 'তারপর তুলতে চাও কামের প্রসঙ্গ যদি নারী / ক্ষেতের আড়ালে এসে নগ্ন করো যৌবন জরদ, / শস্যের সপক্ষে থেকে যতটুকু অনুরাগ পারি / তারো বেশী ঢেলে দেবো আন্তরিক রতির দরদ/সলাজ সাহস নিয়ে ধরে আছি পদ্মময় শাড়ি / তুমিও কবুল করো, এ অধমই তোমার মরদ।' মার্কসবাদীরা অনশ্য শ্রেণিচেতনার নামে রতি শক্তির এ ধরনের প্রদর্শন প্রশ্রয় দেন না। যৌবনকালে মার্কসবাদের নামে আল মাহমুদ সে স্বাধীনতা নিয়েছেন। বৃদ্ধ বয়সে অবশ্য তিনি 'ভালো' হয়ে গেছেন। কারণ তিনি লিখেছেন : 'আমার বুকের ভেতর ধর্মের কল বাতাসে নড়ে ওঠে।' 'সোনালী কাবিনে'র কবিতাগুলো রচিত হয় ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে।
প্র : আল মাহমুদ শেষ পর্যন্ত কোথায় চাকরিরত ছিলেন?
উ : আল মাহমুদ উচ্চ সার্টিফিকেটধারী নন। তাই বাংলা একাডেমির প্রুফ রিডার, চট্টগ্রামে একটি পত্রিকার সাংবাদিক ও পরে ঢাকায় জাসদ (জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল) প্রতিষ্ঠিত দৈনিক 'গণকণ্ঠ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের সুপারিশে তিনি শিল্পকলা একাডেমীর অফিসার পদে বিশেষ বিবেচনায় চাকরি লাভ করেন। পরে ওই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

প্র : বাউলিয়া-জীবনকালে তিনি কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?
উ : মাসিক গণকণ্ঠ (অধুনালুপ্ত)।
প্র : তাঁর কবিতার বিশেষত্ব কী?
উ : তাঁর কবিতায় বাংলাদেশের লোকজ ঐতিহ্য ও লোকশব্দ ব্যবহারে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।
প্র : তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ২০১১ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারি বাতে।

'লোক-লোকান্তর' কবিতা থেকে

একটুখানি জিজ্ঞাসা

প্র : লোক-লোকান্তর কবিতাটি কোন কাজের কবিতা?
উ : লোক-লোকান্তর কাব্য।
প্র : এটি কী জাতীয় কবিতা?
উ : প্রশ্নপরিচয়মূলক।
প্র : কবির চেতনার পাখিটি কেমন?
উ : ঘাসা সত্যিকার। নখ দেখতে লাল। ঠোঁট সুখে পরাগে মাখা। দুটি চোখের কোটরে কটা সুপারির বং, পা সবুজ।
প্র : কবির চেতনার রূপ পাখি কিসের ডালে বসে আছে?
উ : সবুজ অরণ্যে এক চন্দনের ডালে।
প্র : লোক থেকে লোকান্তরে কবি কী শোনেন?
উ : আহত কবির গান।
প্র : বনচারী বাতাসের তালে কী দোলে?
উ : বন্য পালতা দোলে। কবির মাথার উপরে ও নিচে এটি দোলে।
প্র : কবিতার আসন্ন বিজয় বলতে কী বুঝানো হয়েছে?
উ : কবির চেতনায় সমাজ সংসার ও ধর্ম তুচ্ছ হয়ে ভিন্নতর অভিব্যক্তি লাভ করে তখনই কবিতার জন্ম হওয়ার বিষয়টি বোঝানো হয়েছে।
প্র : কবি কেন লোক-লোকান্তরে স্তব্ধ হয়ে আছে?
উ : আহত কবির গান শোনার জন্য। অর্থাৎ সৃষ্টি কর্মের জয়ধ্বনি শোনার জন্য। যা কবিকে পৃথিবীতে অমরত্ব এনে দিতে পারে।
প্র : সুগন্ধ পরাগে মাখামাখি হয়ে আছে তার ঠোঁট- এটি কী জাতীয় উপস্থাপনা।
উ : চিত্রকল্প।

আলাউদ্দিন আল আজাদ

প্র : আলাউদ্দিন আল আজাদ কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৯৩২ সালের ৩রা মে; সরাইলী, জেলার বামনদর গ্রামে।
প্র : তাঁর পেশা ও পরিচিতি কী?
উ : পেশায় মূলত অধ্যাপক। কিন্তু বিভিন্ন সরকারের সান্নিধ্য লাভ, এমন কি স্বৈরাচারী এরশাদের সময়ও সংস্কৃতি উপদেষ্টা। তবে মূল পরিচিতি কবি হিসেবে।
প্র : প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের নাম ও ধরন কী?
প্র : জেগে আছি (১৯৫০); গল্পগ্রন্থ
প্র : তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহের নাম কী?
উ : কাব্যগ্রন্থ : মানচিত্র (১৯৬১), ভোরের নদীর মোহনায় জাগরণ (১৯৬২); গল্পগ্রন্থ: জেগে আছি (১৯৫০), ধানকন্যা (১৯৫১), যুগনান্তি (১৯৫৩), অন্ধকার সিঁড়ি (১৯৫৬), যখন সৈকত (১৯৬৭), আমার রক্ত স্বপ্ন আমার (১৯৭৫), জীবনজমিন (১৯৮৮); উপন্যাস : ভেইশ নম্বর তৈলচিত্র (১৯৬০), শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন (১৯৬২), কর্ণফুলী (১৯৬২), ক্ষুধা ও আশা (১৯৬৪), ঘসড়া কাগজ (১৯৮৬), খণ্ডশিলা (১৯৯২), বিশৃঙ্খলা (১৯৯৭) ইত্যাদি।
প্র : 'কর্ণফুলী' উপন্যাসের পরিচয় দাও।
উ : আলাউদ্দিন আল আজাদের 'কর্ণফুলী' (১৯৬২) পাহাড়-সমুদ্র ঘেরা একটি বিশেষ জনপদের উপন্যাস। আদিবাসী বাঙালিয়া, প্রেমিক দেওয়ানপুত্র (চাকমা), বাঙালি ইসমাইল, জলি, রমজান প্রমুখের জীবন যাপন ও প্রণয় উপন্যাসে বর্ণিত। ইসমাইল চোরাকারবারি, উচ্চাভিলাসী। সে আদিবাসী তরুণী বাঙালিমার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এসব নানা বিষয় উপন্যাসে আছে। উপন্যাস হিসেবে 'কর্ণফুলী'কে ব্যর্থ বলা চলে। তবে এখানে আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগের কষ্টকর চেষ্টাও আছে।
প্র : যে কবিতাটি লিখার জন্য তিনি জনপ্রিয়, তার নাম কী?
উ : স্মৃতিস্তম্ভ। (স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার/ ভয় কি বন্ধু-)

05/12 21:22
Scanned with CamScanner

প্র : 'মৃত্তিকক্ষ' কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত?
উ : মানচিত্র
প্র : তাঁর কোন উপন্যাসটি 'বসুন্ধরা' নামে চলচ্চিত্রায়িত হয়ে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করে?
উ : তেইশ নম্বর তৈলচিত্র। ১৯৭৭ সালে পুরস্কার প্রাপ্ত।
প্র : আলাউদ্দিন আল আজাদ কবে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ৪ঠা জুলাই, ২০০৯।

আশরাফ সিদ্দিকী

প্র : আশরাফ সিদ্দিকী কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৯২৭ সালের ১লা মার্চ; টাঙ্গাইলের নাগবাড়ি নামক স্থানে।
প্র : তিনি মূলত কী হিসেবে পরিচিত?
উ : লোক সাহিত্য-সংস্কৃতিবিদ হিসেবে।
প্র : তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের নাম ও ধরন কী?
উ : তালেব মাস্টার ও অন্যান্য কবিতা (১৯৫০); কাব্যগ্রন্থ।
প্র : তাঁর লোকসাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থাবলির নাম কী?
উ : লোকসাহিত্য (১৯৬৪), কিংবদন্তীর বাংলা (১৯৭৫), শুভ নববর্ষ (১৯৭৭), লোকায়ত বাংলা (১৯৮৭), আবহমান বাংলা (১৯৮৭)।
প্র : আশরাফ সিদ্দিকীর অন্যান্য গ্রন্থের নাম কী?
উ : **কাব্যগ্রন্থ :** সাতভাই চম্পা (১৯৫৩), বিষকন্যা (১৯৫৫), বৃক্ষ দাও: ছায়া দাও (১৯৮৪), দাঁড়াও পথিক বর (১৯৯০), সহস্র মুখের ভীড়ে (১৯৯৭); **গল্পগ্রন্থ :** রাবেয়া আপা (১৯৬৫), গলির ধারের ছেলেটি (১৯৮১), শেষ নালিশ (১৯৯২); **উপন্যাস গ্রন্থ :** শেষ কথা কে বলবে (১৯৮০), আরশিনগর (১৯৮৮), গুণিন (১৯৮৯)।
প্র : 'গুণিন' ছোটগল্পটি কার?
উ : হাসান আজিজুল হকের। (কিন্তু উপন্যাস আশরাফ সিদ্দিকীর)।
প্র : 'সাত ভাই চম্পা' এই নামে আর কোন কবির কাব্যগ্রন্থ আছে?
উ : কবি বিষ্ণু দে'র।
প্র : 'নতুন কবিতা' সংকলন সম্পর্কে শেষ।
উ : আবদুর রশীদ খান ও আশরাফ সিদ্দিকী যৌথভাবে পূর্ব পাকিস্তানের নবীন কবিদের প্রথম সংকলন 'নতুন কবিতা' সম্পাদনা করেন। সংকলনটি প্রকাশিত হয় ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে। এতে লিখেছিলেন : হাবীবুর রহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, শামসুর রাহমান, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আবদুর রশীদ খান, আশরাফ সিদ্দিকী, মোহাম্মদ মাহফুজ, বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, মনোজ সেনগুপ্তসহ তেরোজন কবি। সম্পাদকগণ দাবি করেছিলেন যে, সংকলনটি হবে 'সাহিত্য পথের নতুন যাত্রীদের কাব্য সৃষ্টির খতিয়ান'। কিন্তু উত্তরকাল দেখা গেছে এঁদের মধ্যে অধিকাংশই কবি হয়ে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন, অনেকে কবিতা লিখলেও স্বাচ্ছন্দ্য হারিয়েছেন।
প্র : তাঁর কোন সাহিত্যকর্ম নিয়ে চলচ্চিত্র হয়েছে?
উ : গলির ধারের ছেলেটি।
প্র : চলচ্চিত্রটির নাম?
উ : ডুমুরের ফুল।

আসকার ইবনে শাইখ

প্র : আসকার ইবনে শাইখ কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১০ই মার্চ, ১৯২৫; ময়মনসিংহের গৌরীপুরে।
প্র : তিনি মূলত কী হিসেবে পরিচিত?
উ : সাহিত্যিক। তবে নাট্যকার হিসেবে প্রসিদ্ধ।
প্র : তাঁর প্রকৃত নাম কী?
উ : (ড.) এম. ওবায়দুল্লাহ।

প্র : তিনি পেশায় কী ছিলেন?
উ : সাবেক বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক।
প্র : তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর নাম লেখ?
উ : **নাটক :** বিদ্রোহ (১৯৪৭), পদক্ষেপ (১৯৪৮), বিদ্রোহী পদ্মা (১৯৪৯), সুরঙ্গ (১৯৫১), শেষ অধ্যায় (১৯৫২), বিল ফেরো ১৯৫১), চৌরঙ্গীর ঢেউ (১৯৫৫), এপার ওপার (১৯৫৫), প্রতীক্ষা (১৯৫৭), লালন ফকির (১৯৫৯), কর্ডেলিয়ার আগে (১৯৮০), রাজপুত্র (১৯৮০), রাজা রাজ্য রাজধানী (১৯৮০), মেঘনা রাতের তারা (১৯৮১), কন্যা জায়া জননী (১৯৮৭); গানের সংকলন : নবজীবনের গান (১৯৫৯); গল্প সংকলন : কালো রাত তারার ফুল (১৯৮২); প্রবন্ধ : গবেষণা বাংলা মঞ্চ নাটকের পশ্চাৎভূমি (১৯৮৬)।
প্র : আসকার ইবনে শাইখের কয়েকটি নাটকের পরিচয় দাও।
উ : **বিদ্রোহ :** গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে ১৯৪৬ সালে রচিত, ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত। মূলত মুসলিম পাত্রপাত্রী এবং মুসলিম সমাজ পরিবেশের সামাজিক ও পারিবারিক দ্বন্দ্ব উঠে এসেছে এই নাটকে। আহমদ, আজিজ, মাহবুব, হাবিবা প্রধান চরিত্র। খানিকটা সিনেমাটিক ব্যাপার যেন: আহমদ ও আজিজ-পরিবারের দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্ব এই দুই পরিবারের ছেলে ও মেয়ে মাহবুব ও হাবিবার বিয়ের মাধ্যমে মিটে যায়।
পদক্ষেপ : ১৯৪৭ সালে রচিত, ১৯৫২ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। প্রকাশের পূর্বে এর নাম ভাবা হয়েছিল 'কংকাল'। আভিজাত্য ও বংশমর্যাদায় অন্ধ মুসলিম পরিবারের মধ্য থেকেই আসে প্রতিবাদ, অবশেষে মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। জমিদার জাফর চৌধুরী সেই বংশমর্যাদা ও আভিজাত্যে নিজপুত্র আহসান ও পালকপুত্র শহীদের দ্বারা চ্যালেঞ্জপ্রাপ্ত হয়ে ধ্বংস পায়। উল্লেখযোগ্য চরিত্র: জাফর, আহসান, শহীদ, সালাম, আমিনা।
বিদ্রোহী পদ্মা : ১৯৫২ সালে রচিত, পরের বছর প্রকাশিত। একে অনেকেই লেখকের শ্রেষ্ঠ নাটক বলে মনে করেন। পদ্মানদীর জীবনভাষ্য এই নাটকের কেন্দ্রবিন্দু। রহমত, অর্জুন, কেবর্ত, ইশান, রসিক মাস্টার, সেওয়ান, সাহেব, তরফদার ইত্যাদি এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। পদ্মার চর জেগে ওঠলে অমিদার সেটা গ্রাস করতে চায়। এজন্য কৌশলে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গাও বাঁধায় সে। অবশেষে হিন্দু-মুসলিমের বিলিত শক্তির কাছে সেই অপকৌশল ব্যর্থ হয়।
বিল বাওড়ের ঢেউ : ১৯৫৩ সালে রচিত, ১৯৫৫ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। মূলত জেলে সম্প্রদায়ের জীবনভিত্তিক নাটক। জেলেজীবনের অর্থকষ্ট ও সামাজিক সমস্যা দুটোই আছে এখানে। মহাজন নিতাই দাস কর্জের বাঁধনে সবাইকে বাঁধতে চায়। যুবক সহদেব সমবায় গঠন করে তা থেকে মুক্তির ইশারা দেয়। নিতাইয়ের মেয়ে গৌরী ভালোবাসে সহদেবকে। সংঘাতময় অবস্থার অবসান শেষে মিলন হয় তাদের।
অগ্নিগিরি : এটি ঐতিহাসিক নাটক। ১৯৫৪ সালে রচিত, ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হয়। ইংরেজ আমলে রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলে সংঘটিত কৃষকবিদ্রোহ এর কেন্দ্রীয় বিষয়। ফকির মজনু শাহ, ভবানী পাঠক, রানি ভবানী ও দেবী চৌধুরানির যৌথ সমন্বিত বিদ্রোহে উত্তরাঞ্চলে যে কৃষক জাগরণ ঘটেছিল সেখানে অসাম্প্রদায়িক চেতনার উন্মেষ ঘটে। ঐতিহাসিক ব্যক্তি নামেই এ নাটকে চরিত্রাবলির নামকরণ করা হয়েছে।
রক্তপদ্ম : ঐতিহাসিক সিপাহি বিপ্লবের (১৮৫৭) শতবর্ষে (১৯৫৭) এ নাটক রচিত এবং ১৯৬১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। নাটকটি ঐতিহাসিক কিন্তু এখানে চরিত্রাবলির প্রেমসংযোগ কম গুরুত্ব পায় নি। ইংরেজ সৈন্য সুবেদার শামসুদ্দিন এবং কানপুরের নর্তকী আজিজনের প্রেমপর্ব এই নাটকে বিশেষ গুরুত্ব পেলেও ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিপাহি-জনতার সমন্বিত প্রতিরোধই এই নাটকে প্রাধান্য পেয়েছে।

2020/5/12 21:23
Scanned with CamScanner

প্র : সাহিত্য কর্মের জন্য তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬১), একুশে পদক (১৯৮৬), ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার (১৯৮৭), টেলিশিয়ান পুরস্কার (১৯৮৯)।
প্র : তিনি কোন তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ১৮ই মে, ২০০৯।

আহমদ ছফা

প্র : আহমদ ছফা কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ৩০শে জুন, ১৯৪৩; গাছবাড়িয়া, চট্টগ্রাম।
প্র : তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া কোন পর্যন্ত?
উ : রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করে পিএইচ.ডি. গবেষণায় নাম লেখালেও ডিগ্রি অর্জন সম্ভব হয় নি।
প্র : তিনি মূলত কী হিসেবে পরিচিত?
উ : চিন্তাবিদ ও সাহিত্যিক।
প্র : তিনি কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?
উ : উত্থানপর্ব।
প্র : তাঁর প্রকাশিত উপন্যাস গ্রন্থসমূহের নাম কী?
উ : উপন্যাস : সূর্য তুমি সাথী (১৯৬৭), ওঙ্কার (১৯৭৫), একজন আলী কেনানের উত্থান পতন (১৯৮৯), মরণ বিলাস (১৯৯০), গাভি বিত্তান্ত (১৯৯৪), অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী (১৯৯৬), বিহঙ্গ পুরাণ (১৯৮৬)।
প্র : তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থগুলো কী কী?
উ : জায়মত বাংলাদেশ (১৯৭১), বুদ্ধি বৃত্তির নতুন বিন্যাস (১৯৭৩), বাঙালি মুসলমানের মন (১৯৭৬), সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস (১৯৮০) শতবর্ষের ফেরারী : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯৯৭), সাম্প্রতিক বিবেচনা : বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস (১৯৯৭), যদ্যপি আমার গুরু প্রফেসর রাজ্জাক (১৯৯৭)
প্র : 'ওঙ্কার' উপন্যাসের পরিচয় দাও।
উ : আহমদ ছফা রচিত এই উপন্যাসের নায়ক, আবু নসরের বোবা মেয়েকে বিয়ে করে। আবু নসরের সঙ্গে আইয়ুব খানের সম্পর্ক থাকায় সে এক ধরনের সুবিধা লাভ করে। আর এই ঘটনার সূত্র ধরে উপন্যাসটির কাহিনি গতি লাভ করেছে। এটি মূলত '৬৯-এর পটভূমিতে লেখা হয়েছে। আহমদ ছফার উপন্যাস 'ওঙ্কার' প্রকাশ পায় ১৯৭৫ সালে। ভারতীয় পুরাণের অনুসরণে তিনি এই উপন্যাসের নামকরণ করেছেন। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার শব্দ-বাচক 'ওঁ' ওঙ্কার। ব্রহ্মা এই জগৎ সৃজন করেছেন। বাংলাদেশও সৃষ্টি হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। এখানে মুক্তিযুদ্ধই ব্রহ্মা। আর যুদ্ধকালে যারা নানাভাবে ত্যাগ স্বীকার করেছে, রক্ত দিয়েছে, শহিদ হয়েছে- তারা যেন প্রজাপতি ব্রহ্মারই প্রতিনিধি বা অংশ। অসাধারণ শৈল্পিক দক্ষতার আশ্রয়ে ছফা ভারতীয় মিথের সঙ্গে বাংলাদেশের জন্ম-প্রক্রিয়াটিকে সম্পর্কিত করেছেন। উপন্যাসের কথকের সহধর্মিণী ও আবু নছর মোক্তারের মেয়ে বোবা। এই বোবা মেয়ের কণ্ঠ থেকে বাংলা নামটি উচ্চারণ করানোর মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক প্রতীকাশ্রয়ে এ কথাই বলেছেন, ব্যক্তির স্বাভাবিক প্রত্যাশা অনুসারেই জন্ম হয়েছে বাংলাদেশের। আবু নছর মোক্তার পাকিস্তান সরকারের অনুগত এবং সে সরকারের আদর্শ লালন করে। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের সময় মানুষের মুখে শব্দটি পর্যন্ত ছিল না। আইয়ুব খান উন্নয়নের দশক পালন করেন আর মুক্তিকামী বাঙালিদের ওপর করেন জুলুম। আবু নছরের জামাতা ও বোবা মেয়েটির স্বামীরও প্রায় একই অবস্থা। সে পলায়নকামী বাঙালি। এক দিকে বাঙালিরা রাজপথে মিছিল করে, বাঙালিদের ন্যায্য দাবি নিয়ে আলাপ আলোচনা করে, কিভাবে সমস্যার সমাধান হতে পারে এ ব্যাপারে মত দেয়- অন্য দিকে এই বোবা মেয়ের স্বামী এসব দেখেও না দেখার ভান, শুনেও না শোনার ভান করে। কিন্তু কিছু ভীরু মানুষ ছাড়া আর সবাইতো রাজপথে নেমেছিল। বাঙালির ইতিহাসে বিগত শতকের ষাটের

দশক ছিল রাজপথে জনজোয়ারের দশক। এই রাজপথে পুলিশের গুলিতে নিহত হয় আসাদ। আসাদ শহিদ হবার পর রাজপথে যেন জনজোয়ার জাগে আবার, উত্তাল নদীর মতো ফুঁসে ওঠে জনতার নদী। ঢাকা পরিণত হয় স্লোগানের নগরীতে, মিছিলের নগরীতে। নানা ধরনের স্লোগান তৈরি হয় এ সময়। সমস্বরে এই স্লোগানগুলো উচ্চারণ করে পথ অতিক্রম করে বাঙালি জনতা। কিছু ভীরু আর আপসকামী মানুষ ছাড়া সবাই ঘর ছেড়ে এ সময় বের হয়ে আসে। শিক্ষা বোর্ড হয়ে আসে ফটকের বাইরে, নারীরা জানালা খুলে মিছিলে মিশে যেতে চায়। বোবা মেয়েটিও তাই চেয়েছে। যখন তার পিতা বা স্বামীর কানে রাস্তার মিছিলের স্লোগান কোনো আবেদন সৃষ্টি করে নি, তখন একটি বোবা মেয়ে জানালার ধারে এসে ঘটিয়ে দিল এক অভাবিত ঘটনা। উপন্যাসে বলা হয়েছে: "আচানক বোবা বৌ জানলা সমান লাফিয়ে 'বাঙলা' শব্দটি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে উচ্চারণ করলো। তার মুখ দিয়ে গল গল রক্ত বেরিয়ে আসে। তারপর মেঝেয় সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে থাকে।" বোবা মেয়েটির মৃত্যু হয়। কিন্তু এ কোনো সাধারণ মৃত্যু নয়, প্রতীকী মৃত্যু। তার যে রক্তে মেঝে ভেসে যায়, সে রক্ত থেকেই উত্থান ঘটে স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের।
প্র : 'ওঙ্কার' উপন্যাস অবলম্বনে বাংলা কোন চলচ্চিত্র নির্মিত হয়?
উ : বাঙলা।
প্র : 'অলাতচক্র' কী?
উ : এটি আহমদ ছফা রচিত উপন্যাস। ১৯৮৫ সালে তৎকালীন 'নিপুণ' নামের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রথম মুদ্রিত হয়। পরে তিনি সেটি পরিমার্জন করে ১৯৯৩ সালে প্রায় নতুন করেই লেখেন। এটি মূলত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক একটি উপন্যাস। এই উপন্যাসে লেখক মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বাইরের দেশগুলোর অংশগ্রহণকে সমালোচকের দৃষ্টিতে গ্রহণ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধে সমর্থনদানকারী দেশসমূহে স্বার্থের দিকটি তিনি লেখকে চেয়েছেন। এই উপন্যাসের কয়েকটি চরিত্র : ফয়েজ, জাহিদুল, দাবিরোল প্রমুখ।
প্র : তাঁর অন্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য?
উ : গল্প : নিষিদ্ধ লোবান (১৯৬৯), অহিংসা : অন্যান্য সময় (১৯৭৪), পুরাতন সিনে সোয়া (১৯৭৫); অনুবাদ : তসলিমা (১৯৬৭), ফাউস্ট (১৯৮৬), বাঙ্ময় বাংলা সংগীত রচনাবলী; শিশুসাহিত্য : সোনা আমার কলম চাপা (১৯৬৮), গো হাঁকিম (১৯৭৭)।
প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ : লেখক শিবির পুরস্কার ১৯৭৫ (প্রত্যাখ্যান), সাদাত আলী আকন্দ পুরস্কার (প্রত্যাখ্যান), ইতিহাস পরিষদ পুরস্কার (১৯৮০)।
প্র : তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ২০০১ সালের ২৮শে জুলাই।

আহমদ শরীফ

প্র : আহমদ শরীফ কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৯২১, সুচন্দনী চট্টগ্রাম।
প্র : তিনি মূলত কী হিসেবে পরিচিত?
উ : শিক্ষাবিদ ও গবেষক।
প্র : তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : প্রবন্ধ গবেষণা : বিচিত্র চিন্তা (১৯৮৬), সাহিত্য সংস্কৃতি চিন্তা (১৯৬৯) স্বদেশ অন্বেষা (১৯৭০), জীবনে সমাজে সাহিত্যে (১৯৭০), যুগ যন্ত্রণা (১৯৭৪), কালিক ভাবনা (১৯৭৪), মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ (১৯৭৭), বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য (১ম খণ্ড ১৯৭৮, ২য় খণ্ড ১৯৮৩), ইদানীং আমরা (১৯৮৬), বাঙালির চিন্তা-চেতনার বিবর্তন ধারা (১৯৮৭), একালে নজরুল (১৯৯০), সময় সমাজ মানুষ (১৯৯৫), স্বদেশ চিন্তা (১৯৯৭), বিশ শতকের বাঙালী (১৯৯৮), বিশ্বাসবাদ বিজ্ঞানবাদ যুক্তিবাদ মৌলবাদ (২০০০); সম্পাদনা : লাইলী মজনু (১৯৫৭), মুসলিম কবির পদসাহিত্য (১৯৬১),

Scanned with CamScanner

মধ্যযুগের বাঙলা নীতিকবিতা (১৯৬১), মধ্যযুগের কাব্য সংগ্রহ (১৯৬২), রসুল বিজয় (১৯৬৪), কোরেশী মাগন ঠাকুর চন্দ্রাবলী (১৯৬৭) আলাওল বিরচিত সিকান্দারনামা (১৯৭৭), সৈয়দ সুলতান বিরচিত নবীবংশ (১৯৭৮), সৈয়দ সুলতান বিরচিত রসুল চরিত (১৯৭৮)।

প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?

উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৮), দাউদ সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৯), বাংলাদেশ লেখিকা সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮০) আলক সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৪), মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৯), একুশে পদক (১৯৯১), ডি. লিট (সম্মানসূচক) রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯৩)।

প্র : তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?

উ : ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারি।

প্র : তাঁর মৃতদেহ কী কবর দেওয়া হয়েছিল?

উ : না। মৃত্যুর আগে তিনি এক উইল করে নিজের মৃত্যু-উত্তর দেহ 'বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ'কে দান করে যান। তিনি লিখেছিলেন : 'গোটা অঙ্গ কবরে কীটের খাদ্য হওয়ার চেয়ে মানুষের কাজে লাগাই বাঞ্ছনীয়।'

আহসান হাবীব

প্র : আহসান হাবীবের জন্মতারিখ কত?

উ : ২. ১. ১৯১৭।

প্র : তাঁর জন্মস্থান কোথায়?

উ : শঙ্করপাসা গ্রাম, পিরোজপুর।

প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?

উ : কবি ও সাংবাদিক।

প্র : তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কতটুকু ?

উ : বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে আই, এ পর্যন্ত অধ্যয়ন।

প্র : তাঁর পেশা কী ছিল?

উ : সাংবাদিকতা।

প্র : তিনি কোন গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন?

উ : এরশাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে অনুষ্ঠিত এক বুদ্ধিজীবী সমাবেশে; ৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৩।

প্র : তাঁর কবিতায় কোন বিষয়টি বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়েছে?

উ : গ্রামীণ ঐতিহ্যমণ্ডিত সামাজিক গার্হস্থ্য, মধ্যবিত্ত মানুষের সংগ্রামী চেতনা ও সমকালীন যুগ-যন্ত্রণা।

প্র : তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম কী?

উ : রাত্রিশেষ (১৯৪৭)

প্র : তাঁর প্রকাশিত অন্য গ্রন্থগুলির নাম কী?

উ : **কাব্যগ্রন্থ** : ছায়া হরিণ (১৯৬২), সারা দুপুর (১৯৬৪), আশায় বসতি (১৯৭১), মেঘ বলে চৈত্রে যাবো (১৯৭৬), দু'হাতে দুই আদিম পাথর (১৯৮০), সুচেতনা কবিতা (১৯৮১), বিদীর্ণ দর্পণে মুখ (১৯৮৫); **উপন্যাস** : অরণ্যে নীলিমা (১৯৬২), রানী খালের সাঁকো (১৯৬৩); **শিশুতোষ গ্রন্থ** : ছোটদের শার্লকহোমস (১৯৫৪), বৃষ্টিপড়ে টাপুর টুপুর (১৯৭৭), ছুটির দিন দুপুরে (১৯৭৮)।

প্র : 'রাত্রিশেষ' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : আহসান হাবীবের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। প্রকাশ : এপ্রিল, ১৯৪৭; কলকাতার কমরেড পাবলিশার্স থেকে। এই কাব্যগ্রন্থে প্রহর, প্রান্তিক, প্রতিভাস, পদক্ষেপ এই চার ভাগে কবিতাগুলো বিন্যস্ত। মোট কবিতার সংখ্যা ২৮। কাব্যগ্রন্থে কবি আত্মানুসন্ধানে ব্রতী। তিনি কবিতার পথ সন্ধান করেছেন এখানে। গ্রাম ও নগর উভয় কেন্দ্রিক কবিতা এখানে আছে।

প্র : 'ছায়াহরিণ' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : গ্রন্থটি ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা থেকে প্রকাশিত। মোট কবিতার সংখ্যা ২৪। এ কাব্যে তাঁর সমাজ-সচেতনতা প্রকাশিত। ঐতিহ্যাশ্রয়ী কবি এখানে বণিক সভ্যতার রুদ্র রূপ দেখেছেন। তিনি গ্রামীণ অনুষঙ্গে স্থিত হতে চেয়েছেন।

প্র : 'সারা দুপুর' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : ১৯৬৪ সালে ঢাকা থেকে 'সারা দুপুর' প্রকাশিত। অনেকের মতে আহসান হাবীবের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। মোট কবিতার সংখ্যা ২৬। কাব্যভাষা, ঐতিহ্যান্বেষণ ও বক্তব্য প্রকাশে কবি এখানে পরিপক্ব।

প্র : 'আমি কোন আগন্তুক নই' কবিতার বিষয়বস্তু কী?

উ : 'দু'হাতে দুই আদিম পাথর' (১৯৮০) কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতা এটি। কবিতাতে শহরে মানুষের গ্রামে ফেরার কথা আছে। গ্রামীণ অনুষঙ্গসমূহ এই শহরে মানুষকে সংশ্লেষ না করলেও সেই মানুষ সাক্ষী মাঝে গ্রামীণ নানা কিছু। 'আমি কোন অভ্যাগত নই' একথা বোঝাতে শহরে মানুষ আর সাক্ষী বলছে : 'আসমানের তারা সাক্ষী, সাক্ষী এই জমিনের ফুল .....' ইত্যাদি। তাছাড়া, কবির এ কাব্যগ্রন্থের নাম বাংলা একাডেমির 'চরিতাভিধান'সহ অনেক বইয়ে 'দু'হাতে দুই আদিম পাথর' আছে। এটি ঠিক নয়। হবে 'দু'হাতে দুই আদিম পাথর'।

প্র : 'অরণ্য নীলিমা' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : গুলীয়মান মুসলমান মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের প্রতিনিধি এক তরুণ চিত্রশিল্পী ও তাঁর স্ত্রীর মনোজাগতিক সংকটকে উপজীব্য করে রচিত আহসান হাবীবের 'অরণ্য নীলিমা' উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে। এটি আহসান হাবীব রচিত একমাত্র উপন্যাস।

প্র : তিনি কোন পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক ছিলেন?

উ : অধুনালুপ্ত দৈনিক বাংলা পত্রিকার।

প্র : তিনি কী পুরস্কার লাভ করেন?

উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬১) ও একুশে পদক (১৯৭৮)।

প্র : তাঁর মৃত্যু তারিখ কত?

উ : ১০. ৭. ১৯৮৫।

'সেই অস্ত্র' কবিতা থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : আহসান হাবীবের কাব্যের মূল বৈশিষ্ট্য?

উ : গভীর জীবনবোধ ও আশাবাদ।

প্র : সেই অস্ত্র কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে?

উ : বিদীর্ণ দর্পণে মুখ।

প্র : সেই অস্ত্র কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?

উ : অন্ত্যমিলহীন অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। পর্বগুলোর বিন্যাস ও অসম।

প্র : সেই অস্ত্র কবিতায় কবির প্রত্যাশা কী?

উ : ভালোবাসা নামের মহান অস্ত্রকে পুনরায় এই মানব সমাজে ফিরে পাওয়া।

প্র : জাত্যভিমান কী?

উ : কোনো যুক্তি ছাড়াই নিজ জাতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করার অহংকারী মনোভাব।

প্র : টাইমলী সম্পর্কে কী জান?

উ : প্রাচীন গ্রিসের স্থাপত্যশোভিত এক-শহর। মানুষের হিংসা নিয়ে সৃষ্টি অস্ত্র-সম্ভার শিকার হয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে বার-বারে ধ্বংসে যাচ্ছে এই নগরী। যুদ্ধের নির্মমতার এক চিরায়ত দৃষ্টান্ত এই ট্রয়।

প্র : আমোঘ অনন্য অস্ত্র কী?

উ : ভালোবাসা।

প্র : কবির অস্ত্র ব্যাগ হলে লক্ষ্য খচিত-আকাশ থেকে কী ঝরবে না?

উ : আগুন ঝরবে না।

প্র : সেই অস্ত্র কবিতায় কবি কোন অস্ত্রের প্রত্যাশী?

উ : অবিনাশী।

প্র : সেই অস্ত্র কবিতায় কী মানুষকে সমর্পিত করে?

উ : ভালোবাসা।

প্র : অবিনাশী শব্দের অর্থ কী?

উ : শাশ্বত বা যা বিনাশ করা যায় না।

প্র : মানব বসতির বুকে কোথা থেকে আগুন ঝরবে না?

উ : নক্ষত্রখচিত আকাশ।

প্র : সেই অস্ত্র কবিতায় কবি কী ফিরে পেতে চান?

উ : শুভবোধ ফিরে পেতে চান।

প্র : ভালোবাসা কিসের লোভকে চিহ্নিত করে দেয়?

উ : আদিপত্যের লোভকে চিহ্নিত করে দেয়।

প্র : কবি ভালোবাসাকে অমোঘ অনন্য অস্ত্র বলেছেন কেন?

উ : ভালোবাসা মানুষের সকল অমঙ্গল থেকে উত্তরণের পথ দেখায় বলে একে অমোঘ অনন্য অস্ত্র বলেছেন।

প্র : 'সেই অস্ত্র' কোন ধরনের কবিতা?

উ : প্রার্থনামূলক।

প্র : এই প্রার্থনা কার কাছে?

উ : এই প্রার্থনা কোনো দৈবশক্তির কাছে নয় আত্মশক্তির কাছে।

প্র : কেন এ ধরনের কবিতা লিখলেন কবি?

উ : পৃথিবীতে যখন হিংসা, দ্বেষ, হানাহানিতে পরিপূর্ণ, যখন বিশ্বযুদ্ধ বা ধর্মযুদ্ধের নামে মানুষ হত্যা করে মানুষকে তখন নিজের মধ্যে ভালোবাসা জাগ্রত করা জরুরি। ভালোবাসাহীন মানুষ যখন পশুতে পরিণত হচ্ছে, তখন কবি ভালোবাসাকে অস্ত্র হিসেবে কামনা করছেন।

2020/5/12 21:23
Scanned with CamScanner

প্র : ভালোবাসা কেমন অস্ত্র?
উ : অমোঘ অস্ত্র– অব্যর্থ অস্ত্র। অন্য অস্ত্র ব্যর্থ হতে পারে, ভালোবাসা হৃদয়ে জায়গা হলে তা লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হবে না।

'আমি কোনো আগন্তুক নই' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : আহসান হাবীবের কিশোরপাঠ্য উপন্যাস কোনটি?
উ : 'রানী খালের সাঁকো' (১৯৬৫)।
প্র : কোন পত্রিকার সম্পাদক থাকাকালে আহসান হাবীব মৃত্যুবরণ করেন?
উ : 'দৈনিক বাংলা'।
প্র : কবি কোন বাগানকে সাক্ষী রেখে বলেছেন যে তিনি কোনো আগন্তুক নন?
উ : বাঁশবাগান।
প্র : কবি কোন নিয়মে বাংলায় থাকেন?
উ : স্বাপ্নিক নিয়মে।
প্র : কোন পাখিরা কবিকে চেনেন?
উ : মেঘ কান্ত বিকেলের পাখিরা।
প্র : কোন সময়ের ধানের মঞ্জরীকে কবি সাক্ষী মেনেছেন?
উ : কার্তিক মাসের ধানের মঞ্জরীকে।
প্র : কোন পাতার টলমলে শিশিরকে কবি সাক্ষী মেনেছেন?
উ : চিরোল পাতার টলমলে শিশিরকে।
প্র : কবি কার চিরচেনা স্বজন?
উ : অকাল বার্ধক্যে নত কদম আলীর।
প্র : কার মা কবিকে চেনেন?
উ : জমিলার মা।
প্র : কোথায় কবির হাতের স্পর্শ লেগে আছে?
উ : বৈঠায় ও লাঙলে।
প্র : কবির শরীরে কিসের গন্ধ লেগে রয়েছে?
উ : স্নিগ্ধ মাটির।
প্র : কবির অস্তিত্বে কী গাঁথা রয়েছে?
উ : ধানক্ষেত, সরু পথ এবং ধুধু নদীর কিনার।
প্র : কবি উধাও নদীর কেমনতর বালক?
উ : মুগ্ধ এক অবোধ বালক।
প্র : পুবের পুকুর– এখানে প-এর উ-কার কেন?
উ : পূর্ব লিখতে উ-কার। কিন্তু এই শব্দটি তৎসম থেকে তদ্ভব হওয়ায় পুব লিখতে উ-কার হবে।
প্র : অজ্যাগত কী?
উ : সংস্কৃত অজি উপসর্গ সহযোগে আগত + অজ্যাগত। অজি এখানে সমীপে অর্থে। অজ্যাগত অর্থ 'অতিথি হিসেবে আগত'।
প্র : আগন্তুক অর্থ কী?
উ : অতিথি।
প্র : 'স্বাপ্নিক নিয়ম' কী?
উ : স্বপ্নজাত নিয়ম। এটি কোনো লিখিত নিয়ম বা আইন নয়। মানুষ তার কল্পনা বা স্বপ্নে একই সাথে অনেক কিছুকে ধারণ করতে পারে। বহু দূরত্ব তুচ্ছ হয় তার কাছে। সুস্থ মানুষ মাত্রই স্বপ্নচারিক। একেই কবি বলছেন 'স্বাপ্নিক নিয়ম'।
প্র : 'জলজ বাতাস'?
উ : জলজ অর্থ জলে জন্মে যা। এখানে জলবাহী আর্দ্র সুশীতল গ্রামীণ বায়ুকে বোঝানো হয়েছে।
প্র : নিশিন্দা কী?
উ : এক প্রকার গাছ যাকে গুল্ম ও বৃক্ষের সংকর বলা চলে। নিশিন্দা (Vitex negundo) প্রায় সারা দেশে গ্রামগঞ্জে প্রায় অযত্নেই জন্মে। পাঁচ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয় এই গাছ। এই গাছের ছেবজ গুণ থাকায় বাত, ব্যথা, হাঁপানি, ঠান্ডাজ্বর ইত্যাদিতে ঔষধ হিসেবে ব্যহার হয়। এর পাতা ও ডাল পোকামাকড়রোধী।
প্র : উধাও নদী কেন?
উ : উধাও অর্থ নিরুদ্দেশ। নদী যেহেতু নিরুদ্দেশে ধাবিত হয়, সেহেতু বহমানতা বোঝাতে কবি লিখেছেন 'উধাও নদী'।

ইমদাদুল হক মিলন

প্র : ইমদাদুল হক মিলন কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৫; লৌহজং বিক্রমপুর।
প্র : তিনি মূলত কী হিসেবে পরিচিত?
উ : সাহিত্যিক।
প্র : তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের নাম কী?
উ : গল্পগ্রন্থ : নিরন্নের কাল (১৯৭৯), হে প্রেম (১৯৮৩), ফুলের বাগানে সাপ (১৯৮৩), আহারী (১৯৮৪), তাহারা (১৯৮৬), মর্মবেদনা (১৯৮৮), প্রেম নদী (১৯৮৮), বারো রকমের মানুষ (১৯৮৮) ইত্যাদি।

উপন্যাস : দুঃখ কষ্ট (১৯৮২), ও রাধা ও (১৯৮২), এক দেশ (১৯৮৩), প্রিয় বৃক্ষ (১৯৮৪), ভূমিপুত্র (১৯৮৫), নদী জাতি (১৯৮৭), নায়ক (১৯৮৮), পরবাসে (১৯৮৮), অপনগর (১৯৮৮), সারাবেলা (১৯৮৮), মুজনে (১৯৮৮), কথা ছিলো (১৯৮৮), বনমানুষ মনুষ্যের অভিমান (১৯৮৯), স্বপ্ন (১৯৮৯), মহাযুদ্ধ (১৯৮৯), রাজাকারতন্ত্র (১৯৮৯), কোন (১৯৮৯), কাঁসনের ফুল (১৯৯০), কালো ঘোড়া (১৯৯১), সুদূরতমা (১৯৯১), আশায় আশায় থাকি (১৯৯২), বাঁকা জল (১৯৯৩), মানুষজন (১৯৯৪), নূরজাহান (১৯৯৫), আছ তুমি হৃদয় জুড়ে (১৯৯৬), সুরক্ষিতাসু (১৯৯৭), যুবরাজ (১৯৯৭), মৌসুমি (১৯৯৮), রহস্যময়ী (১৯৯৯), তখন ছিলাম আমি (২০০০), এলো (২০০১), জ্ঞান (২০০২), কুসুমের মতো মেয়েরা (২০০৩), বন্ধুয়া (২০০৪), তুমিই (২০০৫), অপরবেলা (২০০৬) ইত্যাদি।

প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ : বিশ্ব জ্যোতিষ সমিতি পুরস্কার (১৯৮৬), হুকো সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৭) হুমায়ুন কবির সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯২), বাংলা একাডেমি পুরস্কার ১৯৯২), নাট্য সভা পুরস্কার (১৯৯৩), যায় যায় দিন পত্রিকা পুরস্কার (১৯৯৫),ঢাকা যুব ফাউন্ডেশন পদক (১৯৯৬), এসএম সুলতান পদক (১৯৯৯), শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর পদক (২০০০), জিয়া শিশু একাডেমি কমল পদক (২০০৪)।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

প্র : ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জন্মসন কত?
উ : ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দ।
প্র : তাঁর জন্মস্থান কোথায়?
উ : শিয়ালডাঙ্গা, কাঁচড়াপাড়া, পশ্চিমবঙ্গ।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : কবি ও সাংবাদিক।
প্র : তিনি কী নামে সমধিক পরিচিত?
উ : ঈশ্বর গুপ্ত নামে।
প্র : তিনি নিজের সাধনায় কোন কোন বিষয়ে পান্ডিত্য অর্জন করেন?
উ : ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষা এবং বেদান্ত, দর্শন ও তন্ত্রশাস্ত্রে।
প্র : তিনি কোন পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে খ্যাত ছিলেন?
উ : সংবাদ প্রভাকর (১৮৩১ খ্রি. সাপ্তাহিক; ১৮৩৯ খ্রি. দৈনিক)।
প্র : বাংলা ভাষার প্রকাশিত প্রথম দৈনিক পত্রিকা কোনটি?
উ : দৈনিক সংবাদ প্রভাকর (১৮৩৯)।
প্র : সংবাদ প্রভাকরের পরিচয় দাও।
উ : 'সংবাদ প্রভাকর' (১৮৩১) একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। কিছুদিনের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু ১৮৩৬ সালে পুনর্বার ছাপা হয়। ১৮৩৯ সালে বাংলা ভাষার প্রথম দৈনিকরূপে আত্মপ্রকাশ করে। সেকালের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি, যেমন জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ এখানে লিখতেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু মিত্রের সাহিত্যিক জীবনের সূচনা এই পত্রিকা নিয়েই শুরু হয়। ঈশ্বর গুপ্ত এই পত্রিকাতেই প্রাচীন কবিদের অপ্রকাশিত রচনা ও জীবনচরিত প্রকাশ করেন। ১৮৫৯-তে ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই রামচন্দ্র গুপ্ত এ পত্রিকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।
প্র : 'সংবাদ প্রভাকরে'র যে-কোনো চারজন বিশিষ্ট লেখকের নাম লেখ?
উ : 'সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদক ছিলেন কবি ঈশ্বর গুপ্ত। তিনি ছাড়া আর তিনজন বিশিষ্ট লেখক হলেন– রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং দীনবন্ধু মিত্র।
প্র : বাংলা সাহিত্যে তিনি কী হিসেবে পরিচিত?
উ : যুগসন্ধির কবি।
প্র : বাংলা সাহিত্যে যুগসন্ধিকাল কোন সময়কে ধরা হয়?
উ : ১৭৬০ থেকে ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দ।
প্র : ঈশ্বর গুপ্তকে যুগসন্ধির কবি বলা হয় কেন?
উ : ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ সূচিত হলেও বাংলা কাব্যসাহিত্যে ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে 'মেঘনাদবধ

2020/5/12 21:23

Scanned with CamScanner

কাব্য' রচিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রকৃত অর্থে আধুনিকতা আরম্ভ হয় নি। এই ষাট বছর (১৮০১-১৮৬১) কাব্যে আধুনিকতায় পৌঁছার চেষ্টা চলেছে মাত্র। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবৎকাল ১৮১২ থেকে ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দ। তিনি বড় হয়েছেন কলকাতার নাগরিক পরিবেশে। সাংবাদিকতার পাশাপাশি কবিতাচর্চায় তিনি এ সময় মধ্যযুগের দেবদেবীর কথা বা কাহিনি নির্ভর কাব্যরচনা বর্জন করে ব্যক্তি অভিজ্ঞতায় ছোট ছোট কবিতা লেখা শুরু করেন। তপ্সে মাছের মতো সামান্য প্রাণীও তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু হয়। তাঁর কবিতায় সমাজসচেতনতা বিশেষ করে মাতৃভূমির প্রতি নরদ অর্থাৎ দেশাত্মবোধ স্পষ্ট দেখা যায়। আবার কবিওয়ালাদের কাব্য ঢঙ্, পয়ার ও ত্রিপদীর ব্যবহারও তাঁর কবিতায় ব্যাপকভাবে লক্ষযোগ্য। আসলে মধ্যযুগের শেষ প্রতিনিধি ভারতচন্দ্র এবং আধুনিক যুগের প্রথম পুরুষ মাইকেল মধুসূদন- এই দুই মনীষীর মধ্যবর্তীকালে ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাব। তাঁর মধ্যে মধ্যযুগের কাব্য-বৈশিষ্ট্য ও আধুনিক যুগের সূচনা-বৈশিষ্ট্য সমানভাবে লক্ষ করা যায় বলে তাঁকে যুগসন্ধির কবি বলা হয়।

প্র : তাঁর রচনা রীতির বিশেষত্ব কী?

উ : ব্যঙ্গ বিদ্রূপ এবং দেশ ও সমাজভাবনা।

প্র : তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর নাম কী?

উ : রামপ্রসাদ সেন কৃত কালীকীর্তন (১৮৩৩), কবিবর ভারতচন্দ্র রায় ও তাঁর জীবনবৃত্তান্ত (১৮৫৫), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত কাব্যসংগ্রহ (১২৯২ বঙ্গাব্দ), কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন সম্পাদিত সংগ্রহ (১৩০৬), মণিকৃষ্ণ গুপ্ত সম্পাদিত সংগ্রহ (১৩০৮ বঙ্গাব্দ)।

প্র : তাঁর সম্পাদনায় আর কোন পত্রিকা প্রকাশিত হয়?

উ : সংবাদ রত্নাবলী (১৮৩২), সংবাদ সাধুরঞ্জন (১৮৪৭)।

প্র : তাঁর মৃত্যু তারিখ কত?

উ : ২৩. ০১. ১৮৫৯।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

প্র : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ২৬. ৯. ১৮২০: বীরসিংহ গ্রামে, মেদিনীপুর জেলায়

প্র : তাঁর পৈতৃক পদবি কী?

উ : বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্র : কোন প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি দেয়া হয়?

উ : সংস্কৃত কলেজ থেকে (১৮৩৯)।

প্র : তিনি কোন নামে স্বাক্ষর করতেন?

উ : ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা।

প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?

উ : সমাজসংস্কারক (বিধবাবিবাহ বাস্তবায়নের জন্য খ্যাত), লেখক, শিক্ষাবিদ।

প্র : তাঁর পিতার নাম কী?

উ : ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্র : ঈশ্বরচন্দ্রের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কতদূর?

উ : গ্রামের পাঠশালায় শিক্ষা সমাপ্ত করে কলকাতার সরকারি সংস্কৃত কলেজে ভর্তি এবং একাদিক্রমে বারো বছর অধ্যয়ন। ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, বেদান্ত, স্মৃতি, ন্যায় ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন।

প্র : তিনি কত সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের হেড পণ্ডিত পদে নিযুক্তি হন?

উ : ১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর।

প্র : তিনি সংস্কৃত কলেজে যোগ দেন কত সালে?

উ : ১৮৪৬ সালের ৬ই এপ্রিল।

প্র : তিনি জনশিক্ষা ও শিশুশিক্ষা প্রসারকল্পে বাঙালির জন্য কী কী গ্রন্থ রচনা করেন?

উ : বোধোদয় (১৮৫১), বর্ণপরিচয় ১ম ও ২য় ভাগ (১৮৫৫), কথামালা (১৮৫৬), আখ্যান মঞ্জরী (১৮৬৩)।

প্র : বিদ্যাসাগরের কয়েকটি মৌলিক রচনার পরিচয় দাও।

উ : অতি অল্প হইল, আবার অতি অল্প হইল, ব্রজবিলাস, বিধবা বিবাহ ও যশোরের হিন্দু ধর্মরক্ষিণী সভা, রত্ন পরীক্ষা।

এই পাঁচটি বেনামি রচনা ঈশ্বরচন্দ্র

বিদ্যাসাগরের। 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' নামে প্রথম রচনা 'অতি অল্প হইল' (১৮৭৩)। উক্ত বেনামিতে দ্বিতীয় রচনা 'আবার অতি অল্প হইল' (১৮৭৩)। এই বই দুটি বহুবিবাহ বিষয়ে তারানাথ তর্কবাচস্পতির লিখিত বক্তব্যের প্রতিবাদে লেখা, বিতর্কমূলক উত্তর-প্রত্যুত্তর। তৃতীয় রচনা 'ব্রজবিলাস' (১৮৮৫) 'কবিকুল তিলকস্য কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' বেনামিতে লেখা, নবদ্বীপের ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের বিধবা বিবাহ বিরোধী সংস্কৃত বক্তৃতাবলির উত্তর। চতুর্থ রচনা 'বিধবা বিবাহ ও যশোরের হিন্দু ধর্ম রক্ষিণী সভা' (১৮৮৪), 'কস্যচিৎ তত্ত্বান্বেষিণ' বেনামিতে বিদ্যারত্ন, ন্যায়রত্ন ও স্মৃতিরত্ন উপাধিধারী তিন পণ্ডিতের যথার্থ পরিচয় দেওয়ার উদ্দেশ্যে। পঞ্চম রচনা 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপো-সহচরস্য' বেনামিতে লেখা 'রত্নপরীক্ষা' (১৮৮৬)। এতে ভাষা নির্মাণে বিদ্যাসাগর সাধুরীতিকে কথ্যরীতিতে নিয়ে এসেছেন।

প্র : 'শকুন্তলা' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : প্রাচীন সংস্কৃত মহাকবি কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটক অবলম্বনে ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একটি আখ্যান বা উপন্যাসোপম কাহিনি লিখে নাম দেন 'শকুন্তলা'। 'শকুন্তলা'য় কাহিনি নির্মাণ ও ভাষাব্যবহারে বিদ্যাসাগর যথেষ্ট স্বাধীনতা নিয়েছেন। এখানে লেখকের সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি, আধুনিক মনোভাব, শিল্প ও পরিমিতিবোধ প্রকাশিত। চন্দ্রবংশীয় রাজা দুষ্মন্ত শিকারে এসে কণ্ব মুনির তপোবনে উপস্থিত হয়। সেখানে শকুন্তলা, প্রিয়ংবদা, অনসূয়া নামের মুনির তিন রূপবতী পালিতা কন্যার মধ্যে শকুন্তলার সঙ্গে দুষ্মন্তের বিয়ে হয়। দুষ্মন্ত চিহ্ন হিসেবে রাজ-আংটি শকুন্তলাকে দিয়ে নিজ রাজ্যে চলে আসে। রাজকার্যে ব্যস্ত দুষ্মন্ত শকুন্তলার কথা ভুলে যায়। এদিকে শকুন্তলার গর্ভে এক পুত্র সন্তান জন্ম নেয়; নাম ভরত। ভরতসহ শকুন্তলা রাজা দুষ্মন্তের প্রাসাদে এসে তাদের বিয়ের কথা বর্ণনা দিলেও রাজা তা মনে করতে পারে না। পরে দৈববাণীতে দুষ্মন্ত সব অবগত হয়ে পুত্রসহ শকুন্তলাকে সোপা স্থান দেন। মূল কাহিনি দুষ্মন্ত-শকুন্তলা বাংলা সাহিত্যে 'শকুন্তলা' তরুণ্যপূর্ণ এ-কারণে যে, এ গ্রন্থের আগে পরে রচিত এতো চমৎকার কাহিনি বা আখ্যান বর্ণনা পাওয়া যায় না। গদ্যসাহিত্য প্রতিষ্ঠার মূলে 'শকুন্তলা' একটি অসাধারণ সৃষ্টি।

প্র : তিনি কত সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং কত সালে অবৈতনিক সদস্য হন?

উ : ১৮৫৬ ও ১৮৫৮ সালে।

প্র : তিনি কোন আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন?

উ : বিধবা-বিবাহ আন্দোলন।

প্র : 'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশ করেন কত সালে?

উ : ১৮৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে।

প্র : কত সালে বিধবা বিবাহ আইনে পরিণত হয়?

উ : ২৬শে জুলাই, ১৮৫৬।

প্র : তাঁর কোন নিকটাত্মীয় বিধবা বিবাহ করেন?

উ : তাঁর পুত্র নারায়ণচন্দ্র ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে বিধবা বিবাহ করেন।

প্র : ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকার নাম কী?

উ : বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার।

প্র : 'অতি অল্প হইল' কত সালে রচিত?

উ : মে ১৮৭৩; 'কস্যচিত উপযুক্ত ভাইপোস্য' ছদ্মনামে।

প্র : তিনি কী হিসেবে খ্যাত?

উ : বাংলা গদ্যের জনক।

প্র : বাংলা গদ্যগ্রন্থবাহ সমৃদ্ধির জন্য তিনি তাঁর গদ্যে কিসের সৃষ্টি করেন?

উ : 'উচ্চবচন ধ্বনিতরঙ্গ' ও 'অনতিলম্বা ছন্দপ্রবাহ'।

প্র : বাংলা গদ্যে যতি বা বিরামচিহ্ন প্রথম স্থাপন করেন কে?

উ : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

প্র : বিদ্যাসাগর বিশুদ্ধসাহিত্যগুণসম্পন্ন পুস্তক রচনার অবকাশ পান নি কেন?

উ : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল

2020/5/12 21:25

Scanned with CamScanner

অভিপ্রেত বাংলা ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থের অভাব দূর করা। তাই শিক্ষাবিদ বিদ্যাসাগর ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলায় গ্রন্থ অনুবাদে ব্রত হয়েছিলেন। তাঁর এই প্রয়াসও ছিল শিক্ষার প্রসার এবং সমাজসংস্কারমূলক কার্যের অন্তর্ভুক্ত। সেইজন্য নিছক রসচর্চা ছেড়ে দিয়ে নিজের সারস্বত প্রতিভাকে তিনি অনুবাদকর্মে নিয়োগ করেছিলেন।

প্র : ঈশ্বরচন্দ্র বাংলা গদ্যের জনক-মন্তব্যটির যাথার্থ্য সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।

উ : বাংলা গদ্যকে গতিশীল করে প্রাণদান করেছেন বিদ্যাসাগর। এর আগে তা ছিল প্রস্তরবৎ। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতগোষ্ঠী ও রামমোহন রায়ের বাংলা গদ্যরচনার প্রাথমিক প্রয়াস অবশ্যই প্রশংসনীয়। তাঁদের গদ্যরীতিতে বহুতর অপূর্ণতার লক্ষণ ছিল স্পষ্ট। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বাংলা গদ্যে কিছুটা ছন্দ আনলেও সে গদ্যে দুরান্বয়ী দোষ থেকে গেছে। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যে সুললিত শব্দবিন্যাস, পদবিভাগ ও যতিসন্নিবেশে সুবোধ্য ও শিল্প গুণান্বিত করে তোলেন। বাংলা গদ্যের অন্তর্নিহিত ধ্বনিঝংকার ও সুরবিন্যাস তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেন এবং বাংলা গদ্যকে শ্বাসপর্ব ও অর্থপর্ব অনুসারে ভাগ করে সেখানে যতিচিহ্ন স্থাপন করেন। বিদ্যাসাগরের পরিকল্পিত সাধুভাষা তাই পরবর্তীকালের আদর্শ সাধুভাষা রূপে গৃহীত হয়। বাংলা গদ্যকে তিনি সাহিত্য গুণসম্পন্ন ও সর্বভাব প্রকাশক্ষম করেছিলেন বলেই বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের জনক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যাসাগরকে বাংলা গদ্যের 'প্রথম শিল্পী' বলে অভিহিত করেছেন।

প্র : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে লেখ।

উ : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সাহিত্যিকের চেয়ে সমাজসংস্কারক আগে। কারণ, তিনি সমাজসংস্কারের কাজে যে লেখাগুলো লিখেছেন, সেগুলো পরে সাহিত্য হিসেবে বিবেচ্য হয়েছে। সাহিত্যকর্ম ও সমাজসংস্কারের পাশাপাশি শিক্ষাবিস্তারেও তার অশেষ অবদান রয়েছে। এটিও তাঁর সমাজসংস্কার কাজের অংশ। সমাজকে অগ্রসর করতে গিয়ে তিনি সংস্কৃত শিক্ষার সংস্কার, বাংলা শিক্ষার ভিত্তিস্থাপন এবং স্ত্রীশিক্ষার পত্তন ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি সমাজ-প্রগতির সহায়ক এমন সমাজে আধুনিকতা আনতে গিয়ে বহু স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। সমাজসংস্কারের মুখ্যকর্ম করতে গিয়ে তিনি বিধবাবিবাহের পক্ষে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উপস্থাপন করে ১৮৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি-না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' শীর্ষক পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। হিন্দু রক্ষণশীল সমাজ বিধবা বিবাহের তীব্র বিরোধিতায় আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। ১৮৫৫ সালের অক্টোবর মাসে বিরুদ্ধবাদীদের অপতর্কপরতার জবাব দেয়ার জন্য একই শিরোনামে আরেকটি পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করেন। ১৮৫৫ সালের ৪ঠা অক্টোবরে বিধবা বিবাহ আইন পাস করার জন্য ভারতের ব্রিটিশ সরকারের কাছে তিনি আবেদন জানান। এই আবেদনপত্রের সঙ্গে তিনি বিধবা বিবাহ আইনের একটি খসড়াও সংযুক্ত করে দিয়েছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে বিরোধী শিবির থেকেও সরকারের কাছে বিপরীত একটি আবেদনপত্র দাখিল করা হয়। ১৮৫৫ সালের ১৭ই নবেম্বর, এক বছর পর খসড়াটি গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া কাউন্সিলে উপস্থাপিত হয়। বহুবিধ বিচার-বিশ্লেষণের পর ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক বিধবা বিবাহ আইনের খসড়াটি গৃহীত হয়। ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই গভর্নর জেনারেলের সম্মতিক্রমে এটি আইনে পরিণত হয়। ১৮৫৬ সালের ডিসেম্বরে আইনানুসারে প্রথম বিধবা বিবাহ করেন সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। বিদ্যাসাগরের উপস্থিতি ও তত্ত্বাবধানে এই বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে তার নেতৃত্বে বহু বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হয়। ১৮৭০ সালে বিদ্যাসাগর নিজের একমাত্র ছেলে নারায়ণচন্দ্রের সঙ্গে এক

বিধবা মেয়ের বিয়ে দিয়ে প্রমাণ করেন যে, পুত্র করার সব কাজেই তিনি বিধবা বিবাহ চালু। এ নিয়ে নিজ মায়ের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু মায়ের চেয়েও তিনি বড় করে দেখেছিলেন লাখ লাখ বিধবা মায়ের মুখখানা। বিধবা বিবাহ নিয়ে- এমন আইন হবার পর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধেও সরব হয়ে গেছেন। ১৮৭১ সালের জুলাই মাসে তিনি এ প্রথার বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উপস্থাপন করেন। বাঙালি নারীজাগরণের পথিকৃৎ হিসেবে বিদ্যাসাগরকেই মান্য করা হয়। শেষজীবনে তিনি বিহারের অন্তর্গত কার্মাটারে কাটান। সেখানে সাঁওতালদের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা তাঁকে মুগ্ধ করে। অবহেলিত অবস্থা দেখে তাদের জন্য তিনি একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবেই তিনি জীবনের অন্তিমদিবস পর্যন্ত সমাজসংস্কারের আন্দোলন করে গেছেন।

প্র : বিদ্যাসাগরের কয়েকটি বিখ্যাত গদ্যগ্রন্থের নাম কী?

উ : 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (হিন্দি বৈতালপৈচিসির বঙ্গানুবাদ ১৮৪৭), 'শকুন্তলা' (কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম নাটকের উপাখ্যান ভাগের বঙ্গানুবাদ, ১৮৫৪), 'সীতার বনবাস' (ভবভূতির উত্তররাম চরিত নাটকের প্রথম অঙ্কের ও রামায়ণের উত্তর কাণ্ডের বঙ্গানুবাদ, ১৮৬০), 'ভ্রান্তিবিলাস' (শেক্সপিয়রের Comedy of Errors-এর বঙ্গানুবাদ, ১৮৬৯)।

প্র : বিদ্যাসাগরের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ কোনটি?

উ : বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭)।

প্র : বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মৌলিক গদ্য রচনার নাম কী?

উ : প্রভাবতী সম্ভাষণ (১৮৯২)।

প্র : বিদ্যাসাগর রচিত ব্যাকরণগ্রন্থের নাম কী?

উ : ব্যাকরণ কৌমুদী (১ম ও ২য় ভাগ ১৮৫৩, ৩য় ভাগ ১৮৫৪, ৪র্থ ভাগ ১৮৬২ সাল)।

প্র : ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি কেমন ছিলেন?

উ : মানবতাবাদ, কর্মবাদ ইহলৌকিক চিন্তা চেতনার প্রতি আস্থাশীল একজন ক্ষণজন্মা বাঙালি।

প্র : বিধিনি অতিপক্বক (২০০৪) সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালির অতিকায় তাঁর স্থান কোথায়?

উ : অষ্টম স্থান।

প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?

উ : বিদ্যাসাগর উপাধি (১৮৩৯), বাংলার গভর্নর কর্তৃক সম্মাননা লিপি (১৮৭৭) ও ভারত সরকার কর্তৃক সিআইই উপাধিতে ভূষিত।

প্র : তাঁর মৃত্যু তারিখ কত?

উ : ২৯. ৭. ১৮৯১।

উইলিয়াম কেরী

(*নামটি বিদেশি হলেও উইলিয়াম কেরী বাংলা বই লিখেছেন এবং সেখানে তিনি ই-কার দিয়েই 'কেরী' লিখেছেন।)

প্র : উইলিয়াম কেরীর জন্মতারিখ কত?

উ : ১৭. ৮. ১৭৬১

প্র : তাঁর জন্ম স্থান কোথায়?

উ : নর্দাম্পটন শায়ার, ইংল্যান্ড.

প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?

উ : মিশনারি ও বাংলার গদ্য পাঠ্যপুস্তকের প্রবর্তক।

প্র : তিনি কার কাছ থেকে গ্রিক, ল্যাটিন ভাষা এবং বিজ্ঞান, ইতিহাস, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন?

উ : টমাস জোনস

প্র : তিনি কিভাবে বাংলা ভাষা শেখেন?

উ : ইংল্যান্ড থেকে জাহাজযোগে কলকাতায় আসতে তখন সমুদ্র পথে প্রায় ছয় মাস সময় লাগত। এই সময় জাহাজের বাঙালি খালাসিদের কাছ থেকে তিনি বাংলা শেখেন।

প্র : তিনি কতসালে ধর্ম প্রচারের জন্য ভারতে আসেন?

উ : ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে

প্র : তিনি শ্রীরামপুর ব্যাপিস্ট মিশন (যাকে শ্রীরামপুর মিশন বলে) প্রতিষ্ঠা করেন কত সালে?

উ : ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি।

প্র : তিনি কত সালে 'ম্যাথু রচিত সমাচার'-এর প্রথম পৃষ্ঠা বাংলা ভাষায় মুদ্রিত করেন?

উ : ১৮০০র ১৮ই মার্চ।

2020/5/12 21:25

Scanned with CamScanner

প্র : শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে মুদ্রিত প্রথম গদ্যগ্রন্থটির নাম কী?
উ : 'প্রথী রচিত মিশন সমাচার'। এটিই বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম গদ্যগ্রন্থ। মুদ্রিত হয় ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের অগস্ট মাসে।
প্র : তিনি কত সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন?
উ : ১৮০১-র মে মাসে (ত্রিশ বছর অধ্যাপনা করেন)। তিনি একই সঙ্গে সংস্কৃত ও মারাঠি ভাষাও পড়াতেন।
প্র : তাঁর নিজস্ব রচনা কী কী? এগুলো বিশিষ্ট কেন?
উ : কথোপকথন (১৮০১) ও ইতিহাসমালা (১৮১২)। এইগ্রন্থ দুটোতে সূচনাকালীন বাংলা গদ্যের প্রকৃতি ও প্রতিষ্ঠাপ্রয়াস লক্ষণযোগ্য।
প্র : 'কথোপকথন' গ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : একাধিক মানুষের মুখের সাধারণ কথা বা কথোপকথন বা ডায়লগ এ গ্রন্থের উপজীব্য। বাংলা লিখিত গদ্যের সূচনাকালীন নমুনা এখানে উল্লেখকৃত। স্ল্যাং বা গালিগালাজও বাদ দেয়া হয় নি। এ গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য প্রচুর।
প্র : 'ইতিহাসমালা' গ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : 'ইতিহাসমালা' (১৮১২) উইলিয়াম কেরি সঙ্কলিত বিভিন্ন বিষয়ের ১৫০টি গল্পের সংগ্রহ। আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের এটি প্রথম গল্পসংগ্রহ। গল্পগুলি বাংলাদেশের নানা অঞ্চলে প্রচলিত ছিল।
প্র : তাঁর নেতৃত্বে শ্রীরামপুর থেকে কতগুলো ভাষায় খ্রিষ্টধর্ম গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হয়?
উ : ৪০ টি।
প্র : তিনি কোন কোন ভাষায় ব্যাকরণ রচনা করেন?
উ : মারাঠি (১৮০৫), সংস্কৃত (১৮০৬), পাঞ্জাবি (১৮১২), তেলিঙ্গা (১৮১৪)। ভারতীয় ভাষায় অভিধান রচনা করেন : মারাঠা (১৮১৮), বাংলা (১৮১৮)।
প্র : তিনি কত সালে রামায়ণ সম্পাদনা করেন?
উ : ১৮০৬-১৮১০।
প্র : তিনি কিসের জন্যে অমর হয়ে থাকবেন?
উ : বাংলা গদ্যের সূচনাকালীন অবদান, বাংলা লিপির সংস্কার এবং এদেশীয় কৃষি, উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যা নিয়ে গবেষণার জন্য।
প্র : কেরী রচিত ইংরেজিতে বাংলা ব্যাকরণের নাম কী?
উ : এ গ্রামার অফ দি বেঙ্গলি ল্যাংগুয়েজ (১৮০১)।
প্র : তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা কত?
উ : অর্ধশত (প্রায়)
প্র : ভারতে আসার আগে তাঁর মূল পেশা কী ছিল?
উ : পাদুকা নির্মাণ
প্র : তিনি বাংলা গদ্যের বিকাশধারায় চিরস্মরণীয় কেন?
উ : গদ্য ও পাঠ্যপুস্তকের জন্য।
প্র : তাঁর মৃত্যু তারিখ কত?
উ : ৯ই জুন, ১৮৩৪।

এস ওয়াজেদ আলি

প্র : এস ওয়াজেদ আলির জন্মতারিখ ও স্থান?
উ : ১৮৯০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর, হুগলির শ্রীরামপুরে।
প্র : তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা কী?
উ : এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. (১৯১০) ও কেম্ব্রিজ থেকে বার এট ল (১৯১৫)
প্র : তাঁর প্রকাশিত ও সম্পাদিত ইংরেজি মাসিকের নাম?
উ : Bulletin of the Indian Rationalistic Society (১৯১৯).
প্র : তাঁর প্রকাশিত ও সম্পাদিত বাংলা মাসিকের নাম?
উ : গুলিস্তাঁ (১৩৩২)
প্র : তিনি কোন পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন?
উ : প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্রে'র।
প্র : তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের নাম কী?
উ : গল্পগ্রন্থ 'গুলদাস্তা' (১৯২৭)।
প্র : তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম কী?
উ : প্রবন্ধ : জীবনের শিল্প (১৯৪১), প্রাচ্য ও প্রতীচ্য (১৯৪৩), ভবিষ্যতের বাঙালি (১৯৪৩); গল্প : মাসুকের দরবার (১৯৩০), বাদশাহী গল্প (১৯৪৪); ভ্রমণ কাহিনি : মোটরযোগে রাঁচি সফর (১৯৪৯); ঐতিহাসিক উপন্যাস : গ্রানাডার শেষ বীর (১৯৪০)।

প্র : কোন গ্রন্থটির জন্য এস ওয়াজেদ আলি বিখ্যাত হয়ে থাকবেন?
উ : ভবিষ্যতের বাঙালি (১৯৪৩)। এই বইতে সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত দেশ গঠনের লক্ষ্যে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধকরণের কথা আছে।
প্র : কখন ও কোথায় তাঁর মৃত্যু হয়?
উ : ১৯৫১ সালের ১০ই জুন, কলকাতায়।

কাঙাল হরিনাথ

প্র : কাঙাল হরিনাথের জন্ম সন কত?
উ : ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দ।
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : কুষ্টিয়ার কুমারখালি।
প্র : তাঁর প্রকৃত নাম কী ছিল?
উ : হরিনাথ মজুমদার।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : সাহিত্যিক ও সাংবাদিক।
প্র : তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কোথায় হয়?
উ : বাল্যকালে কৃষ্ণনাথ মজুমদারের ইংরেজি স্কুলে অধ্যয়ন, অর্থাভাবে লেখাপড়া বন্ধ।
প্র : নিজ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত ভার্নাকুলার স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন কত সালে?
উ : ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে।
প্র : তিনি বিখ্যাত যে পত্রিকার সাথে জড়িত ছিলেন তার নাম কী?
উ : 'সমাচার প্রভাকর'।
প্র : ১৮৬৩-র এপ্রিল মাসে কুমারখালি থেকে তিনি যে পত্রিকা প্রকাশ করেন তার নাম কী?
উ : 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'।
প্র : 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'য় কী কী বিষয় স্থান পেত?
উ : সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ এবং নীলকর সাহেবদের শোষণের কাহিনি।
প্র : স্বরচিত গানে তিনি কোন ভণিতা ব্যবহার করতেন?
উ : কাঙাল
প্র : তাঁর মুদ্রিত গ্রন্থের সংখ্যা কত?
উ : আঠারটি।
প্র : পত্রিকা সম্পাদনা পরিচালনা করে তিনি কীসে মনোযোগী হয়েছিলেন?
উ : ধর্মভাব প্রচারের জন্য 'কাঙাল হিরিবল' ও 'দল' নামে একটি আউল সাধের দল গঠন করে গান রচনা ও পরিবেশনায় মনোযোগী হন।
প্র : তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো কী?
উ : বিজয় বসন্ত (১৮৫৯), চারু চরিত্র (১৮৬৩), কবিতা কৌমুদী (১৮৬৬), অকূল সংবাদ (১৮৭৩), বিন্দু চলনা (১৮৭৬) এবং হরিনাথ গ্রন্থাবলী (১৯০১)।
প্র : কাঙাল হরিনাথের মৃত্যু হয় কত সালে?
উ : ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল।

কাজী আবদুল ওদুদ

প্র : কাজী আবদুল ওদুদের জন্মতারিখ কত?
উ : ২৬-৪-১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দ।
প্র : তিনি কোথায় জন্ম নেন?
উ : বাগমারা গ্রাম, পাংশা, রাজবাড়ি (তৎকালীন ফরিদপুর)।
প্র : তিনি কী ছিলেন?
উ : লেখক ও চিন্তাবিদ।
প্র : ওদুদের পিতার নাম কী? তিনি কোন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন?
উ : কাজী সদীর উদ্দিন। তিনি রেলওয়ের স্টেশন মাস্টার ছিলেন।
প্র : তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবরণ দাও।
উ : তিনি ১৯১৩-তে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা, ১৯১৫ ও ১৯১৭-তে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে যথাক্রমে আই.এ ও বি.এ, এবং ১৯১৯-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম.এ পাস করেন।
প্র : তিনি ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে (ঢাকা কলেজ) বাংলার অধ্যাপক হন কত সালে?
উ : ১৯২০ সালে।
প্র : ১৯৬৫-তে নবপর্যায়ে প্রকাশিত যে পত্রিকাটির সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি হন তার নাম কী?
উ : 'তরুণ পত্র'।
প্র : বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলনকল্পে ১৯২৬-এ প্রতিষ্ঠিত যে সমিতির অন্যতম নেতা তিনি ছিলেন, তার নাম কী?
উ : মুসলিম সাহিত্য-সমাজ।

2020/5/12 21:25
Scanned with CamScanner

প্র : তিনি কোন ধরনের লেখার জন্য ঢাকার নওয়াব পরিবার কর্তৃক নিগৃহীত হন?
উ : সাহিত্য সমাজের পত্রিকা শিখা (১৯২৭) তাঁর মুক্তচিন্তা ও যুক্তি বিষয়ক বিভিন্ন লেখার জন্য।
প্র : তাঁর প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ কী?
উ : উপন্যাস। নদীবক্ষে (১৯১৮), সমাজ ও সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ : শাশ্বতবঙ্গ (১৯৫১), কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, নজরুল প্রতিভা।
প্র : 'শাশ্বতবঙ্গ' গ্রন্থ সম্পর্কে লেখ।
উ : কাজী আবদুল ওদুদ রচিত প্রবন্ধের সংকলন 'শাশ্বতবঙ্গ'। ১৯৫১ (১৩৫৮) খ্রিষ্টাব্দে গ্রন্থটি সংকলন করা হয়। এতে ইতঃপূর্বে রচিত তাঁর বেশ কয়েকটি পুস্তক / পুস্তিকা থেকে প্রবন্ধ গৃহীত হয়, কিছু নতুন প্রবন্ধ থাকে। 'শাশ্বতবঙ্গে'র প্রবন্ধগুলো ৬টি ভাগে বিভক্ত করা চলে : হিন্দু-মুসলিম সমস্যা বা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অন্বেষণ, মুসলিমদের আত্ম-অন্বেষণ, রবীন্দ্র-ভাবনা, নজরুল-মূল্যায়ন, সাহিত্য-ভাবনা, অন্যান্য মনীষী-মূল্যায়ন। প্রবন্ধগুলোতে লেখক বৃহৎ বাংলা ও ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের বুদ্ধির মুক্তি ঘটাতে চেয়েছেন এবং শিক্ষিত-সমাজের অনবধানতায় জাতির কতটুকু বিড়ম্বনা ঘটতে পারে, সে-আশঙ্কাও ব্যক্ত করেছেন। কাজী আবদুল ওদুদ অবিভক্ত বাংলা প্রত্যাশা করেছিলেন। তাই ফরিদপুরের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও, দেশ ভাগ হওয়ার পর অনুরোধ পেয়েও তিনি পূর্ববাংলা বা পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসেন নি।
প্র : 'নদীবক্ষে' উপন্যাসের পরিচয় দাও।
উ : 'নদীবক্ষে' (১৯১৮) যতটুকু উপন্যাস, তার চেয়ে বেশি সমাজচিত্র। এখানে অন্ত্যজ চাষি মুসলিম জীবনের যে নির্ভরযোগ্য উল্লেখ আছে তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও আকৃষ্ট করেছিল এবং তিনি সে কথা লিখেছিলেন। গ্রামীণ সমাজের কলহ, বিবাদ, দ্বন্দ্ব আবার মিলনের কথা চারটি কৃষক পরিবারকে কেন্দ্র করে এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এই কৃষক-পরিবারের প্রধানরা হলেন জমির শেখ, ইরফান মণ্ডল, মুখে, লালু। এখানে লালু ও মরিয়ম সাহা প্রণয়ঘটিত সম্পর্কের যে উল্লেখ আছে তা বেশ আকর্ষণীয়। 'নদীবক্ষে' উপন্যাসে কাজী ওদুদ দেখিয়েছেন গ্রামের সাধারণ মুসলিমরা ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কিন্তু তা নিয়ে বাড়া বাড়ি তাদের নেই। কেউ নামাজ না পড়লে বা ধর্মীয় রেওয়াজ মেনে না চললেও তারা 'ধর্মগেল' বলে চিৎকার করে না। লালু যে সতের বছরেও ন্যাজ পড়া শেখে নি এ ব্যাপারে গ্রামের মুসলিম সমাজের মাথা ব্যথা নেই। ধর্মীয় কেতাদুরস্ত না মানলেও এরা অসৎ নয়, কপটও নয়। কাজী ওদুদ বাংলাদেশের শাশ্বত ধর্মবোধকেই তুলে ধরেছেন এবং আচরণের কড়াকড়ির বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছেন।
প্র : 'কবিগুরু গ্যেটে'র পরিচয় দাও।
উ : 'কবিগুরু গ্যেটে' (১৯৪৬) কাজী আবদুল ওদুদ রচিত দুইখণ্ডে বিভক্ত জার্মান মহাকবি ও নাট্যকার গ্যেটের জীবন ও কর্মের আলোচনা। এই গ্রন্থে গ্যেটের নাটক 'ফাউস্টে'র রসগ্রাহী পরিচয় দেওয়া হয়েছে। বাংলা ভাষায় গ্যেটে সম্বন্ধে এটি প্রথম বই।
প্র : তাঁর মৃত্যু হয় কোথায় কবে?
উ : কলকাতা; ১৯-৫-১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দ।

কাজী ইমদাদুল হক

প্র : কাজী ইমদাদুল হকের জন্ম কবে, কোথায়?
উ : ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দের ৪ঠা নবেম্বর, খুলনায়।
প্র : তিনি কবে, কোথায় কর্মজীবন আরম্ভ করেন?
উ : ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে 'ঢাকা মাদ্রাসা'র শিক্ষক হিসেবে।
প্র : তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম লেখ।
উ : উপন্যাস : 'আবদুল্লাহ্' (১৯৩৩);
কাব্য : 'আঁখিজল' ও 'লতিকা';
প্রবন্ধ : 'প্রবন্ধমালা';
শিশুতোষগ্রন্থ : 'নবীকাহিনী'।
প্র : তিনি কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?
উ : 'শিক্ষক' পত্রিকার (১৯২০)।

প্র : 'আবদুল্লাহ্' উপন্যাসটি কোন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়?
উ : মোসলেম ভারত।
প্র : 'আবদুল্লাহ্' উপন্যাসের পরিচয় দাও।
উ : 'আবদুল্লাহ্' উপন্যাস কাজী ইমদাদুল হকের এই বিখ্যাত উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ সালে।
প্র : কাজী ইমদাদুল হকের মৃত্যু হলে অধ্যাপক কাজী ইমদাদুল হকের কাজী আনোয়ারুল কালির ইমদাদুল হকের করুণ অবলম্বনে অসমাপ্ত উপন্যাসটির বাকী ১১টি পরিচ্ছেদ রচনা করেন।
উপন্যাসটিতে চিত্রিত হয়েছে গ্রামীণ মুসলিম সমাজের শিরভক্তি, ধর্মীয় কুসংস্কার, পর্দাপ্রথা, আশরাফ-আতরাফ বৈষম্য, হীন স্বার্থপরতা, সম্প্রদায়বিদ্বেষ ইত্যাদির বিরুদ্ধে মানবতাবাদী প্রতিবাদ।
বইটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন। 'আবদুল্লাহ্ বইটি পড়ে আমি খুশি হয়েছি বিশেষ কারণে, এই বই থেকে মুসলমানের ঘরের কথা জানা গেল।' রবীন্দ্রনাথ লেখকের উদার প্রকাশভঙ্গিরও প্রশংসা করেন। শিল্পের বিচারে 'আবদুল্লাহ্' উৎকৃষ্ট উপন্যাস নয়। তবে বাংলার সামাজিক বিবর্তনের, বিশেষ করে বাঙালি মুসলমানের অগ্রযাত্রার সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতা সুচারুভাবে ফুটে ওঠায় গ্রন্থটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। কাহিনির নায়কের নামেই গ্রন্থটির নামকরণ করা হয়েছে।
প্র : তিনি কোন প্রতিষ্ঠানের অন্যতম স্থপতি ছিলেন?
উ : বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি (১৯১১)।
প্র : তিনি কবে কোথায় মারা যান?
উ : ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দের ২০শে মার্চ, কলকাতায়।

কাজী নজরুল ইসলাম

প্র : কাজী নজরুল কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : চুরুলিয়া গ্রাম, আসানসোল, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ।
প্র : তিনি কবে জন্ম নেন?
উ : ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ (২৪শে মে, ১৮৯৯ খ্রি.)।
প্র : তাঁর পিতার নাম কী?
উ : কাজী ফকির আহমদ।
প্র : তাঁর মাতার নাম কী?
উ : জাহেদা খাতুন।
প্র : নজরুলের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বর্ণনা দাও।
উ : দশ বছর বয়সে গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন প্রাইমারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৯০৯) হন। এরপর ১৯১৪ সালে ত্রিশালের দরিরামপুর স্কুলে, ১৯১৫ সালে পশ্চিমগড়ের রানিগঞ্জ শিয়ারশোল রাজস্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হন। এই স্কুল থেকে ১৯১৭ সালে দশম শ্রেণি থ্রি-টেস্ট পরীক্ষার সময় সেখানকার অসমাপ্ত রেখে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন।
প্র : কার বছর বয়সে তিনি কোথায় যোগ দেন?
উ : লেটোর দলে এবং দলে 'পালা গান' রচনা করেন।
প্র : তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ হয় কিভাবে?
উ : আসানসোল রুটির দোকানে কাজ করা অবস্থায় আসানসোল থানার দারোগা কাজী রফিজউদ্দিন তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়ে নিজের বাড়ি ময়মনসিংহের কাজি সিমলা গ্রামে নিয়ে যান এবং দরিরামপুর স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি করিয়ে দেন। ১৯১৪'র ডিসেম্বরে বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হলে কাজি সিমলা ত্যাগ করেন। পরে নিজের ইচ্ছায় শিয়ারশোল রাজস্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হন এবং এখান থেকেই থ্রি-টেস্ট পরীক্ষার সময় ৪৯ নম্বর বাঙালি পল্টনে যোগ দেন (১৯১৭)।
প্র : নজরুল বাংলাদেশের কোন সঙ্গীতের রচয়িতা?
উ : রণসঙ্গীত।
প্র : রণসংগীত হিসেবে মূল কবিতাটির কত চরণ গৃহীত?
উ : ২১ চরণ।
প্র : রণসংগীতটি কী শিরোনামে সর্বপ্রথম কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?
উ : 'নতুনের গান' শিরোনামে ঢাকার 'শিখা' পত্রিকায় ১৯২৮ (১৩৩৫) বার্ষিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরে এর নাম হয় 'চল্ চল্ চল্'।

20/5/12 21:25
Scanned with CamScanner

প্র : নজরুলের কোন গ্রন্থে এই সংগীত অন্তর্ভুক্ত আছে?
উ : 'সন্ধ্যা' কাব্যগ্রন্থে।
প্র : 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রথম কোথায় প্রকাশিত হয়?
উ : 'সাপ্তাহিক বিজলী'র ২২শে পৌষ (১৩২৮) সংখ্যায়।
প্র : নজরুল কোন দৈনিক পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন?
উ : 'সান্ধ্য দৈনিক নবযুগ' (১৯২০)-এর।
প্র : এই পত্রিকার সঙ্গে আর কোন দুজন রাজনৈতিক নেতা যুক্ত ছিলেন?
উ : কমরেড মুজফ্ফর আহমদ ও শেরে বাংলা ফজলুল হক।
প্র : তাঁর সম্পাদনায় কোন অর্ধসাপ্তাহিক পত্রিকা বের হত?
উ : 'ধূমকেতু' (১৯২২)।
প্র : ধূমকেতু পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের কোন বাণী ছাপা হয়?
উ : 'আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু / আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু—'।
প্র : কোন কবিতা প্রকাশিত হলে তিনি গ্রেফতার হন?
উ : ধূমকেতুর পূজা সংখ্যায় (২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯২২) 'আনন্দময়ীর আগমনে'।
প্র : রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোন গীতিনাট্য নজরুলকে উৎসর্গ করেন?
উ : 'বসন্ত'।
প্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তরুণ কবি নজরুলকে 'বসন্ত' গীতিনাট্য উৎসর্গ করলে অনেকেই তা মেনে নিতে পারেন নি। এর প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ কোন কথা জানিয়েছিলেন?
উ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ-প্রসঙ্গে লিখেছেন : "নজরুল ইসলাম সম্পর্কে তোমাদের মনে যেন কিছু সন্দেহ রয়েছে। নজরুলকে আমি 'বসন্ত' গীতিনাট্য উৎসর্গ করেছি এবং উৎসর্গপত্রে তাকে 'কবি' বলে অভিহিত করেছি। জানি তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এটা অনুমোদন করতে পারো নি। আমার বিশ্বাস, তোমরা নজরুলের কবিতা না পড়েই এই মনোভাব পোষণ করেছো। আর পড়ে থাকলেও রূপ ও রসের সন্ধান করো নি, অবজ্ঞাভরে চোখ বুলিয়েছো মাত্র। কাব্যে অসির ঝনঝনা থাকতে পারে না এমন তোমাদের অনুমান বটে। সমগ্র জাতির অন্তর যখন সে সুর বাঁধা, অসির ঝনঝনাও যখন সে সুরে ঝংকার তোলে, ঐকতান সৃষ্টি হয়, তখন কাব্যে তাকে প্রকাশ করবে বৈকি! আজ যদি কলমেও ঐ সুর বাজতো।"
প্র : হুগলি জেলে কর্মকর্তাদের অসদাচরণের বিরুদ্ধে নজরুল অনশন শুরু করলে রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে কী লিখে টেলিগ্রাম পাঠান?
উ : 'Give up hunger strike. Our literature claims you.'
প্র : নজরুল জেল থেকে মুক্তি পান কবে?
উ : ১৯২৩-এর ১৫ই অক্টোবর।
প্র : নজরুলের স্ত্রীর নাম কী?
উ : আশালতা সেনগুপ্ত, ডাক নাম দুলি। আদর করে ডাকা হতো দোলন বা দুলু। বিয়ের পর নজরুল তাঁর নাম পাল্টে দেন 'প্রমীলা'। (রবীন্দ্রনাথও তাঁর স্ত্রী ভবতারিণী দেবীর নাম পাল্টে দিয়ে করেছিলেন মৃণালিনী।)
প্র : আশালতা সেনগুপ্তের (প্রমীলা) সঙ্গে নজরুলের বিয়ে হয় কত তারিখ?
উ : ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল।
প্র : প্রমীলার জন্ম-মৃত্যু কবে?
উ : প্রমীলার জন্ম ১৯০৮ সালের মে মাসে, মৃত্যু ১৯৬২ সালের ৩০শে জুন। ১৯৩৯ সালে প্রমীলা অসুস্থ হন এবং ধীরে ধীরে তা গুরুতর আকার ধারণ করে। দীর্ঘ তেইশ বছর তিনি প্রায় বিছানাতেই কাটান।
প্র : নজরুল ও প্রমীলার সন্তান কতজন?
উ : তাঁদের কোনো কন্যাসন্তান নেই। প্রথম দুই পুত্র কৃষ্ণ মোহাম্মদ ও অরিন্দম খালেদ ওরফে বুলবুলের অকাল প্রয়াণের পর কাজী সব্যসাচী (১৯২৯-১৯৭৯) ও বাঁধন অনিরুদ্ধ (১৯৩১-১৯৭৪) তাঁদের দুই পুত্র বেঁচে ছিলেন। সব্যসাচী আবৃত্তিকার, তাঁর কন্যা খিলখিল কাজী; অনিরুদ্ধ সুকবি, তাঁর কন্যা অনিন্দিতা কাজী।
প্র : কাজী নজরুল ইসলাম কংগ্রেসের রাজনীতিতে যোগ দেন কখন?
উ : ১৯২৫-এ ফরিদপুর কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনে।

প্র : তাঁর সম্পাদিত 'লাঙল' পত্রিকার প্রকাশকাল কত?
উ : ১৯২৫ সাল।
প্র : নজরুলকে জাতীয় সংবর্ধনা দেয়া হয় কোথায় এবং কখন?
উ : ১৯২৮-এর ১৫ই ডিসেম্বর কলকাতার আলবার্ট হলে।
প্র : নজরুলের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের নাম কী?
উ : ব্যথার দান (প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯২২)
প্র : নজরুলের প্রথম প্রকাশিত রচনার নাম কী?
উ : বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী (প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬; সওগাত)।
প্র : নজরুলের প্রথম প্রকাশিত কবিতার নাম কী?
উ : মুক্তি (প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩২৬; বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকা)।
প্র : নজরুলের প্রথম প্রকাশিত গল্পের নাম কী?
উ : বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী (প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬)।
প্র : নজরুলের প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থের নাম কী?
উ : ব্যথার দান (প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯২২)
প্র : নজরুলের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম কী?
উ : অগ্নি-বীণা (সেপ্টেম্বর, ১৯২২)।
প্র : নজরুলের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের নাম কী?
উ : বাঁধন-হারা (১৯২৭)।
প্র : নজরুলের প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধের নাম কী?
উ : তুর্কমহিলার ঘোমটা খোলা (প্রকাশ : কার্তিক ১৩২৬)
প্র : নজরুলের প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ কোনটি?
উ : যুগবাণী (অক্টোবর ১৯২২)
প্র : নজরুলের প্রথম প্রকাশিত নাটকের নাম কী?
উ : ঝিলিমিলি (১৩৩৪, নওরোজ)।
প্র : প্রথম প্রকাশিত নাট্যগ্রন্থ কোনটি?
উ : ঝিলিমিলি (১৩৩৭)। এই গ্রন্থে মোট তিনটি নাটক আছে।
প্র : নজরুলের প্রথম নিষিদ্ধকৃত গ্রন্থ কোনটি?
উ : বিষের বাঁশি (প্রকাশ : অগস্ট ১৯২৪/ নিষিদ্ধ : ২৪শে অক্টোবর ১৯২৪)
প্র : নজরুলের মোট কয়টি গ্রন্থ নিষিদ্ধ হয়, কী কী?
উ : ৫টি। বিষের বাঁশি, ভাঙার গান, প্রলয় শিখা, চন্দ্রবিন্দু, যুগবাণী।
প্র : জেলে বসে লেখা জবানবন্দীর সাল কী?
উ : 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'। রচনার তারিখ ৭/১/১৯২৩।
প্র : অগ্নি-বীণা কাকে উৎসর্গ করা হয়?
উ : বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে।
প্র : অগ্নি-বীণার প্রথম কবিতা কোনটি?
উ : প্রলয়োল্লাস।
প্র : 'অগ্নি-বীণা' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকাশিত গ্রন্থ। 'প্রলয়োল্লাস', 'বিদ্রোহী', 'রক্তাম্বরধারিণী মা', 'আগমনী', 'ধূমকেতু', 'কামালপাশা', 'আনোয়ার', 'খেয়াপারের তরণী', 'সাত-ইল-আরব', 'খেয়াপারের তরণী', 'কোরবানী', 'মোহরম' এই বারটি কবিতার সমাহারে কলকাতার আর্য পাবলিশিং হাউস থেকে ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত। কিন্তু প্রকাশক হিসেবে নজরুলের নিজের নাম ছাপা হয়েছে। এই কাব্যের অন্যতম ও জনপ্রিয় কবিতা 'বিদ্রোহী'। 'বিদ্রোহী' কবিতার জন্য প্রথমে তাঁকে 'বিদ্রোহীর কবি' বলা হয়, পরে 'বিদ্রোহী কবি'। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর অবক্ষয় এবং ভারতের স্বাধিকার আন্দোলনের পটভূমিতে কাব্যটি রচনা করেন কাজী নজরুল ইসলাম। কাব্যটিতে কবি ভারতীয় পুরাণ এবং পশ্চিম এশীয় ঐতিহ্য ব্যবহার করেছেন দক্ষতার সঙ্গে। কবি শব্দ ব্যবহারেও রেখেছেন স্বকীয়তার ছাপ। কাব্যটির প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয় ব্রিটিশ বিরোধী বাঙালি বীরীন্দ্রকুমার ঘোষকে। উল্লেখ্য যে, অনেকে লিখে থাকেন 'অগ্নি-বীণা' ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। এ তথ্য সত্য নয়। গ্রন্থটি কোনোদিন নিষিদ্ধ হয় নি।
প্র : নজরুলের কোনটি পত্রোপন্যাসের পর্যায়ভুক্ত?
উ : বাঁধন-হারা।

2020/5/12 21:25
Scanned with CamScanner

প্র : নজরুল মস্তিষ্কের ব্যাধিতে আক্রান্ত হন কখন?

উ : ১৯৪২-এর ১০ই অক্টোবর।

প্র : নজরুলকে কবে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়?

উ : তাঁর মৃত্যুর মাত্র ছয়মাস আগে, ১৯৭৬ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি।

প্র : কবির বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থগুলো কী?

উ : 'অগ্নি-বীণা' (১৯২২), 'বিষের বাঁশি' (১৯২৪), 'ভাঙার গান' (১৯২৪), 'সাম্যবাদী' (১৯২৫), 'সর্বহারা' (১৯২৬), 'ফণি-মনসা' (১৯২৭), 'জিঞ্জির' (১৯২৮), 'সন্ধ্যা' (১৯২৯), 'প্রলয় শিখা' (১৯৩০) ইত্যাদি।

প্র : 'দোলন-চাঁপা' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : ১৩৩০ বঙ্গাব্দের আশ্বিনে (অক্টোবর, ১৯২৩) 'দোলন-চাঁপা' প্রকাশিত হয়। কবি তখন রাজবন্দি হিসেবে জেলে। ২১টি কবিতার সংকলন। প্রথম কবিতা 'আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে'। এছাড়া বেলাশেষে, পুবের চাতক, অবেলার ডাক, পূজারিনী, কবি-রানী ইত্যাদি কবিতা রয়েছে। মূলত প্রেম-প্রধান কবিতার বই। নজরুল কুমিল্লা গিয়ে ইন্দুকুমার সেনগুপ্তের বাড়িতে ছিলেন। এ সময় ইন্দুকুমারের ভ্রাতুষ্পুত্রী আশালতার সঙ্গে তাঁর প্রণয় জন্মে। আশালতার ডাকনাম ছিল দুলি। দুলিকে আদর করে দোলন ও দুলু বলে ডাকা হতো (দ্রষ্টব্য : মুজফ্ফর আহমদের স্মৃতিকথা)। দোলন বা আশালতার নামেই 'দোলন-চাঁপা' গ্রন্থের নামকরণ। এর অধিকাংশ কবিতা দোলন বা দুলি বা আশালতাকে নিয়ে। কারাদণ্ড ভোগ শেষে ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল নজরুল ও আশালতার বিয়ে হয়। বিয়ের পর নজরুল স্ত্রীর নামকরণ করেন প্রমীলা (রবীন্দ্রনাথও স্ত্রী ভবতারিণীর নাম পাল্টে দিয়ে করেছিলেন মৃণালিনী।)।

প্র : 'বিষের বাঁশী' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : ১৩৩১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণে (অগস্ট ১৯২৪) 'বিষের বাঁশী' প্রকাশ করেন কবি নিজেই। সে বছরই সরকার গ্রন্থটি নিষিদ্ধ করে। এটি নজরুলের প্রথম নিষিদ্ধকৃত গ্রন্থ। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়েছিল ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল। এ গ্রন্থের কবিতাগুলো বিদ্রোহাত্মক ও জাতি জাগরণমূলক। বধূ-বন্দনা, শিকল-পরা গান, চরকার গান, জাতের নামে বজ্জাতি, সত্য-মন্ত্র ইত্যাদি গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য কবিতা। নজরুল ইসলামের কবিতার বলিষ্ঠতা, যৌবনের উদ্দাম শক্তি, উদার মানবিকতা ও সামাজিক সচেতনতা এবং গীতি প্রতিভার সমস্ত বৈশিষ্ট্য এই কাব্যে পরিস্ফুট।

প্র : 'ভাঙার গান' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : ১৩৩১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণে (অগস্ট ১৯২৪) কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। সরকার একই বছর ১১ই নভেম্বর বইটি নিষিদ্ধ করে। ব্রিটিশ আমলে এ গ্রন্থের উপর দিয়েছিল প্রত্যাহৃত হয় নি। ১১টি কবিতা এখানে আছে। প্রতিটি কবিতাই বিদ্রোহাত্মক। জাগরণী, দুঃশাসনের রক্ত-পান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য কবিতা।

প্র : 'সাম্যবাদী' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরে নজরুলের অসাধারণ ও মানবতাবাদী কাব্যগ্রন্থ 'সাম্যবাদী' প্রকাশিত হয়। সাম্যবাদী, ঈশ্বর, মানুষ, পাপ, চোর-ডাকাত, বারাঙ্গনা, কুলি-মজুর ইত্যাদি এর উল্লেখযোগ্য কবিতা। এ গ্রন্থে কতিপয় বিপ্লবাত্মক বক্তব্য দিয়েছেন নজরুল। তিনি বলেছেন, পৃথিবীতে মানুষই সব গ্রন্থ এনেছে, কোন গ্রন্থই মানুষ আনে নি : 'মানুষেরে ঘৃণা করি / ও কারা কোরান বেদ বাইবেল চুমিছে মরি মরি / ও মুখ হইতে কেতাব-গ্রন্থ নাও জোর করে কেড়ে / যাহারা আনিল গ্রন্থ-কেতাব সেই মানুষেরে মেরে / পূজিছে গ্রন্থ ভণ্ডের দল-মূর্খরা সব শোনো / মানুষ এনেছে গ্রন্থ:-গ্রন্থ আনে নি মানুষ কোনো।'

প্র : 'সঞ্চিতা'র পরিচয় দাও।

উ : 'সঞ্চিতা' নজরুলের অনুমোদনে প্রকাশিত তাঁর কবিতার নির্বাচিত সংগ্রহ। ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশ পায়। উৎসর্গ করেন এই লিখে : 'বিশ্বকবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু'। ৭৮টি কবিতা ও গান এখানে সংকলিত। নজরুলের কবিতার ধারা বুঝবার জন্য এ সংকলনটি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, জীবিতাবস্থায় নজরুল এগুলোকেই তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যসৃষ্টি বলে অনুমোদন করে গেছেন।

প্র : 'কুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম'-এর পরিচয় দাও।

উ : ইরানের জীবনবাদী কবি ওমর খৈয়ামের রুবাই বা কবিতা অনুবাদ করেন নজরুল। ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরে 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। সৈয়দ মুজতবা আলী এর ভূমিকা লেখেন। জীবনবাদী ওমর নজরুলকে খুব আকর্ষিত করেছিলেন। এ অনুবাদে অত্যন্ত চমৎকার ভাষাভঙ্গি ব্যবহৃত। অন্যান্য অনুবাদকারের চেয়ে নজরুলের অনুবাদ অনুভূতির পরশে, যথাযথ শব্দের পারিপাট্যে উজ্জ্বল।

প্র : জীবনীকাব্যগুলো কী কী?

উ : 'চিত্তনামা' (১৯২৫) ও 'মরু-ভাস্কর' (১৯৫০)।

প্র : চিত্তনামা ও মরু-ভাস্কর কার জীবনভিত্তিক কাব্য?

উ : চিত্তনামা : দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ; মরু-ভাস্কর : হযরত মুহম্মদ।

প্র : 'চিত্তনামা' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : 'চিত্তনামা' কাব্যগ্রন্থ। ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত (১৩৩২ বঙ্গাব্দ)। ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ২রা আষাঢ় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ দার্জিলিঙে মৃত্যুবরণ করেন। এ মৃত্যুতে শোকাহত হয়ে নজরুল অর্ঘ্য, অকাল-সন্ধ্যা, সান্ত্বনা, ইন্দ্রপতন, রাজভিখারি নামে কয়েকটি কবিতা সমকালীন পত্রিকায় লেখেন। এ কবিতাগুলোতে চিত্তরঞ্জনের প্রতি কবির আবেগ মিশ্রিত শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয় এবং তিনি চিত্তরঞ্জনকে নবির সঙ্গে তুলনা করে লেখেন : 'জন্মিলে তুমি মোহাম্মদের আগে হে পুরুষবর / কোরানে ঘোষিত তোমার মহিমা হতে পয়গাম্বর।' (ইন্দ্রপতন) নজরুল চিত্তরঞ্জনকে 'হে মানব-আম্বিয়া' নামেও অভিহিত করেন। এতে গোঁড়া মুসলিমরা ক্ষেপে যায়। কবি যখন এসব কবিতা নিয়ে 'চিত্তনামা' গ্রন্থ বের করেন, তখন তাই ওই অংশগুলো বর্জিত হয়। চিত্তরঞ্জন দাশের স্ত্রী বাসন্তী দেবী ছিলেন খুবই স্নেহশীলা নারী। নজরুলের মধ্যে মাতৃস্নেহ পাবার আগ্রহ ছিল। কারণ নিজের মায়ের সঙ্গে নজরুলের সম্পর্ক ভালো ছিল না। নজরুল বাসন্তী দেবীকে মা বলে ডাকতেন।

প্র : 'মরু-ভাস্কর' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : হযরত মোহাম্মদের জীবনী-আশ্রয়ী। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ থেকে কাব্যটি রচিত হয়। ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে (১৯৫০) গ্রন্থাকারে ছাপা হয়। একাধিক ছাপটি সর্গ। ১৮টি খণ্ড কবিতা এখানে স্থান পেয়েছে। মোহাম্মদের জন্ম, শৈশব, কৈশোর, বিয়ে ইত্যাদি এখানে কবিতায় বর্ণিত।

প্র : কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাসগুলোর নাম উল্লেখ কর।

উ : 'বাঁধন-হারা' (১৯২৭), 'মৃত্যু-ক্ষুধা' (১৯৩০) ও 'কুহেলিকা' (১৯৩১)।

প্র : 'বাঁধন-হারা' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : নজরুল ইসলাম রচিত প্রথম উপন্যাস। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে (১৯২৭) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলেও ১৩২৭ বঙ্গাব্দে (১৯২১) 'মোসলেম ভারতে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পত্রিকায় প্রকাশিত এই উপন্যাসের বেশ কিছু অংশ গ্রন্থাকারে অন্তর্ভুক্ত না হয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। বর্তমান গ্রন্থের রচয়িতা তা খুঁজে পেয়ে ১৯শে মে, ২০০৬ দৈনিক 'প্রথম আলো' পত্রিকায় তা পুনঃপ্রকাশ করেন। 'বাঁধন-হারা' বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্রোপন্যাস। নুরুর সঙ্গে মাহবুবার প্রণয় এবং পরে বিয়ের উদ্যোগ অনেক দূর এগিয়ে গেলেও হঠাৎ নুরু পালিয়ে গিয়ে সৈনিক জীবন গ্রহণ করে। সৈনিক জীবন গ্রহণের পেছনে দেশ ও জাতির ক্রান্তিকালীন কোন তাগিদ ছিল না। এ প্রসঙ্গে নার্গিসের সঙ্গে কবির প্রণয় ও আকবর (মতান্তর আছে) প্রসঙ্গ মনে আসে। অনেকে মনে করেন নুরুই নজরুল। এ উপন্যাসে রাবেয়া, মাহবুবা, সাহসিকা প্রমুখ নারী চরিত্রের উল্লেখ ও তাদের পত্র বিনিময় আছে। সাহসিকা যথেষ্ট প্রতিবাদী; চিরকুমারী থেকে যে নারীদের উপর পতিত নানা অন্যায়ের প্রতিবাদ করে।

প্র : 'মৃত্যু-ক্ষুধা' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : 'মৃত্যু-ক্ষুধা' ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ (১৯৩১) মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। 'সওগাত' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয় ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ থেকে ১৩৩৬

2020/5/12 21:25

Scanned with CamScanner

বঙ্গাব্দের ফাল্গুন পর্যন্ত। দারিদ্র্য, ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষের পরিপ্রেক্ষিতে সপরিবার মেজ-বৌয়ের মুসলিম ধর্মান্তর গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। অন্যদিকে রুবি আনসারকে ভালোবাসলেও রুবির পিতা তাকে বিয়ে দেয় আইসিএস পরীক্ষার্থী মোয়াজ্জেমের সঙ্গে। মোয়াজ্জেমের মৃত্যুর পর বিধবা রুবির জীবনে নেমে আসে সমাজের বিধিনিষেধ। নারীজীবনের দুর্বিষহ অভিজ্ঞতা এবং সমাজের বাস্তবচিত্র এই উপন্যাসে তুলে ধরা হয়েছে।

প্র : 'কুহেলিকা' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে 'নওরোজ' পত্রিকায় 'কুহেলিকা' উপন্যাস প্রকাশ আরম্ভ হয়। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ পায় ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে (১৯৩১)। এ উপন্যাসে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এসেছে অত্যন্ত বড় ক্যানভাসে। উপন্যাসের নায়ক জাহাঙ্গীর বিপ্লবী স্বদেশি দলের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু তার যে প্রেমের সম্পর্ক ও নারী সম্পর্কে ধারণা তা যথেষ্ট ঋণাত্মক। জাহাঙ্গীর বলে : 'নারী কুহেলিকা'। তাহমিনা (ভূপী), চম্পা, ফিরদৌস বেগম প্রমুখ উল্লেখযোগ্য নারী চরিত্র। নারী সম্পর্কে এ উপন্যাসে বলা হয়েছে : 'ইহারা মায়াবিনীর জাত। ইহারা সকল কল্যাণের পথে মায়াজাল পাতিয়া রাখিয়াছে। ইহারা গহন-পথের কণ্টক, রাজপথের দস্যু।'

প্র : 'যুগবাণী' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : প্রবন্ধের গ্রন্থ 'যুগবাণী' ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবরে প্রকাশিত হয়। এটি নজরুলের প্রথম প্রবন্ধের বই। প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে (২৩শে নভেম্বর, ১৯২২) সরকার বইটি নিষিদ্ধ করে। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে নিষেধাজ্ঞা ওঠে যায়। নবযুগ, ধর্মঘট, সত্য-শিক্ষা, ভাব ও কাজ, জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, জাগরণী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। প্রবন্ধগুলোতে স্বদেশি চিন্তাচেতনা ও ব্রিটিশ বিরোধিতা প্রকাশিত।

প্র : 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'র মূলবক্তব্য কী?

উ : 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' কাজী নজরুল ইসলাম লিখিত একটি প্রবন্ধ। কাজী নজরুল সম্পাদিত অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' পত্রিকা ১৯২৩ সালে ব্রিটিশ সরকার নিষিদ্ধ করে। সেই পত্রিকার প্রকাশিত নজরুলের কবিতা 'আনন্দময়ীর আগমনে'ও নিষিদ্ধ হয়। নজরুলকে গ্রেপ্তার আটক করে রাখার পর তাঁর বক্তব্য জানতে চাইলে তিনি লিখিতভাবে আদালতে উপস্থাপন করেন চার পৃষ্ঠার বক্তব্য। তাই এটি 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' নামে পরিচিত। ১৯২৩ সালের ৭ই জানুয়ারি কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে বসে তিনি এই চার পৃষ্ঠার জবানবন্দি রচনা করেন। পরে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা যেমন, 'ধূমকেতু', 'প্রবর্তক', 'উপাসনা' ইত্যাদিতে ১৯২৩ সালেই তা প্রকাশিত হয়। ২৩শে নবেম্বর, ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে নজরুলকে কুমিল্লা থেকে গ্রেফতার করে কলকাতায় আনা হয়। ৭ই জানুয়ারি, ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে বিচারাধীন বন্দি হিসেবে নজরুল আত্মপক্ষ সমর্থন করে চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট সুইনহোর আদালতে জবানবন্দি প্রদান করেন। এই জবানবন্দি, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' নামে সাহিত্য-মর্যাদা পায়। ১৬ জানুয়ারি, ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে, বিচারের রায়ে নজরুল এক বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' একটি উৎকৃষ্ট সাহিত্যকর্ম, শুধু বাংলা সাহিত্যেরই নয়, পৃথিবীর যে কোনো দেশের সাহিত্যের তুলনায় এটি উৎকৃষ্টতর। 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'র শুরুতে কবি কাজী নজরুল ইসলাম উচ্চকণ্ঠে বলেছেন, 'আমার উপর অভিযোগ, আমি রাজবিদ্রোহী। তাই আমি আজ কারাগারে বন্দী এবং রাজদ্বারে অভিযুক্ত। একাধারে-রাজার মুকুট; আর ধারে ধূমকেতুর শিখা। একজন রাজা, হাতে রাজদণ্ড; অন্যজন সত্য, হাতে ন্যায়দণ্ড। রাজার পক্ষে রাজার নিযুক্ত রাজ বেতনভোগী রাজ-কর্মচারী। আমার পক্ষে সব রাজার রাজা, সব বিচারকের বিচারক, আদি অনন্তকাল ধরে সত্য-জাগ্রত ভগবান।' তিনি আরো বলেছেন, 'আমি কবি, আমি অপ্রকাশ সত্যকে প্রকাশ করার জন্য, অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তিদানের জন্য ভগবান কর্তৃক প্রেরিত। কবির কণ্ঠে ভগবান সাড়া দেন। আমার বাণী সত্যের প্রকাশিকা, ভগবানের বাণী। সে বাণী রাজ-বিচারে রাজদ্রোহী হতে পারে, কিন্তু ন্যায়বিচারে সে বাণী রাজদ্রোহী নয়, সে বাণী রাজদ্রোহী নয়। সে বাণী রাজদ্বারে দণ্ডিত হতে পারে, কিন্তু ধর্মের আলোকে, ন্যায়ের তুলাতে তা নিরপরাধ, নিষ্কলুষ, অম্লান, অক্ষয়। সত্যস্বরূপ।' কবির 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' পাঠ করে একথা বলতে হয়, লিখিত শাস্তির ভয়কে তিনি তুচ্ছ করে রাজশক্তির আড়া তুলে ধরেছেন। শাসকদের উপেক্ষা করে লেখকের স্বকর্তব্যে একনিষ্ঠতা এখানে প্রকাশিত। সত্য, শিব, সুন্দরের যে বাণী পরবর্তীকালে নজরুলের রচনায় দেখা গেছে তার সূত্রপাত এই রচনাতে আছে।

প্র : 'ঝিলিমিলি' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : তিনটি ছোট নাটকের গ্রন্থ 'ঝিলিমিলি'। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের (১৯৩০) অগ্রহায়ণে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ঝিলিমিলি, সেতুবন্ধ, শিল্পী নামের তিনটি ছোট নাটক এ গ্রন্থভুক্ত।

প্র : কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত গল্পগ্রন্থগুলোর নাম কর।

উ : 'ব্যথার দান' (১৯২২), 'রিক্তের বেদন' (১৯২৫), 'শিউলিমালা' (১৯৩১)।

প্র : 'ব্যথার দান' গল্পগ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : ছয়টি গল্প নিয়ে এ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে। এটি নজরুলের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ; প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ তো বটেই। গ্রন্থভুক্ত গল্পগুলো : ব্যথার দান, হেনা, অতৃপ্ত কামনা, বাদল-বরিষণে, ঘুমের ঘোরে, রাজবন্দীর চিঠি। শেষ গল্পটি বাদে এই গল্পগুলোর ভাষা আবেগাশ্রয়ী, বক্তব্য নরনারীর প্রেমকেন্দ্রিক।

প্র : 'রিক্তের বেদন' গল্পগ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরে প্রকাশিত হয় নজরুলের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'রিক্তের বেদন'। অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলো : রিক্তের বেদন, বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী, মেহের-নেগার, সাঁজের তারা, রাক্ষুসী, সালেক, বাঁশিয়রা, নুরুল পরিব। বাঁশিয়রা গল্পটি সমকালীন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গল্পগুলোর প্রধান বিষয় প্রেম। তবে প্রেমকে কেন্দ্র করে পারিপার্শ্বিক ঘটনা ও মনোবেদনাসমূহও উল্লেখযোগ্য। এ গ্রন্থে নারীদের বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে চিত্রায়ণ করা হয়েছে।

প্র : 'শিউলিমালা' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : 'শিউলিমালা' গল্পগ্রন্থ। পত্র-পোথরো, জিনের বাদশা, অগ্নি-পিরি, শিউলিমালা গল্পের সমন্বয়ে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশ পায় ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের কার্তিকে (১৯৩১)।

প্র : সংগীত বিষয়ক গ্রন্থাবলির উল্লেখ কর।

উ : চোখের চাতক, নজরুল গীতিকা, সুর সাকী, বনগীতি প্রভৃতি।

প্র : নজরুল ছায়াছবির সঙ্গে কবে থেকে যুক্ত হন?

উ : ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে পাইওনিয়ার ফিল্ম কোম্পানিতে যোগদানের মাধ্যমে। ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দের সূচনা পর্যন্ত এ সংশ্লিষ্টতা ছিল।

প্র : তিনি কয়টি ছায়াছবির সঙ্গে কাজ করেছেন?

উ : যতটুকু জানা যায়, নশের অধিক। এগুলো হচ্ছে : বাংলা : ধ্রুব, পাতালপুরী, গ্রহের ফের, বিদ্যাপতি, গোরা, সাপুড়ে, চৌরঙ্গী, দিকশূল, অভিনয় নয়; হিন্দি : বিদ্যাপতি, সাপেড়া, চৌরঙ্গী ইত্যাদি।

প্র : 'ধ্রুব' ছায়াছবির সঙ্গে নজরুল জড়িত কিভাবে?

উ : নজরুল 'ধ্রুব' ছায়াছবির পরিচালকের দায়িত্ব পালন ছাড়াও গান রচনা, সুরারোপ, সঙ্গীত পরিচালনা করেন। তাছাড়া তিনি এ ছায়াছবিতে নারদের ভূমিকায় অভিনয় ও চারটি গানে অংশ নেন। এ ছায়াছবির কাহিনি রচনা করেন নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ। পাইনিয়র ফিল্মের ব্যানারে ছবিটি ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি কলকাতার জ্যাউন টকি হাউজে (সিনেমা হলে) মুক্তি পায়।

প্র : কোন চলচ্চিত্রে নজরুল অভিনয় করেন?

উ : ধ্রুব। নারদের ভূমিকায়।

প্র : তিনি কোন চলচ্চিত্রে কিভাবে জড়িত ছিলেন? কয়েকটি তথ্য দাও।

উ : 'ধ্রুব' চলচ্চিত্র (মুক্তি : ১৯৩৪) :

2020/5/12 21:25
Scanned with CamScanner

পরিচালক
গীতিকার (১৭টি গান)
সুরকার (১৮টি গান)
সঙ্গীত পরিচালক
অভিনেতা (নারদ চরিত্রে)
কণ্ঠশিল্পী
'পাতালপুরী' (মুক্তি : ১৯৩৫) :
গীতিকার (৭টি গান)
সুরকার (৮টি গান)
সঙ্গীত পরিচালক
'গ্রহের ফের' (মুক্তি : ১৯৩৭) :
সঙ্গীত পরিচালক
সুরকার (৬টি গান)
বিদ্যাপতি (বাংলা : মুক্তি : ১৯৩৮) :
কাহিনি রচনা
সুরকার
গীতিকার (২টি গান)
বিদ্যাপতি (হিন্দি : মুক্তি : ১৯৩৮) :
কাহিনি রচনা
সুরকার
গোরা (মুক্তি : ১৯৩৮) :
সঙ্গীত পরিচালক
গীত রচনা (১টি গান)
সুরারোপ (১টি গান)
সাপুড়ে (মুক্তি : ১৯৩৯) :
কাহিনি রচনা
গীত রচনা (৭টি গান)
সুরারোপ (৭টি গান)
নন্দিনী (মুক্তি : ১৯৪১) :
গীত রচনা (১টি গান)
সুর রচনা (১টি গান)
চৌরঙ্গী (মুক্তি : ১৯৪২) :
গীত রচনা (৮টি গান)
সুরকার (৮টি গান)
সঙ্গীত পরিচালক

প্র : নজরুল ও মুজফ্‌ফর আহমদের যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত পত্রিকাটির নাম কী? এটি কবে প্রকাশিত হয়?

উ : নজরুল ও মুজফ্‌ফর আহমদের যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত পত্রিকাটির নাম 'দৈনিক নবযুগ', পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় ১২ই জুলাই ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে। পত্রিকাটি বেশি দিন স্থায়ী ছিল না। পরে ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে পত্রিকাটি পুনঃপ্রকাশিত হলে নজরুল এককভাবে এর সম্পাদক হন।

প্র : কাজী নজরুল ইসলামের ওপর লিখিত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি গ্রন্থের নাম লেখ।

উ : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত- 'কাজীর গল্প' (১৩৭৬, কলকাতা); আবদুল কাদির- 'বাংলাসাহিত্যে নজরুল' (১৯৭৯, কলকাতা); প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়- 'কবি নজরুল' (১৯৭৩); মুজফ্‌ফর আহমদ- 'কাজী নজরুল ইসলাম' (১৯৬৫); রফিকুল ইসলাম : 'কবি নজরুল ইসলাম : জীবন ও সাহিত্য' (১৯৯১, কলকাতা); শিশির কর- 'বিদ্রোহী নজরুল' (১৯৮৩, কলকাতা); সুফী জুলফিকার হায়দার- 'নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়' (১৯৬৪, ঢাকা); সুধীরকুমার গুপ্ত- 'নজরুল চরিতমানস' (১৩৭৬, কলকাতা), গোলাম মুরশিদ- 'বিদ্রোহী রণক্লান্ত' (২০১৮, ঢাকা)।

প্র : কার আমন্ত্রে নজরুল 'শিউলির' কবিতা লেখেন?

উ : কুমিল্লার পুস্তক প্রকাশক ও ব্যবসায়ী আলী আকবর খানের আমন্ত্রে।

প্র : আলী আকবর খানের সঙ্গে নজরুল কবে বাংলাদেশে আসেন?

উ : ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে নজরুল কুমিল্লায় আসেন আলী আকবর খানের সঙ্গে। এটি তাঁর দ্বিতীয়বার বাংলাদেশ ভূখণ্ডে আসা। এর আগে তিনি শৈশবে ত্রিশালে এসেছিলেন।

প্র : সৈয়দা খাতুনের সঙ্গে আলী আকবর খানের সম্পর্ক কী?

উ : আলী আকবর খানের বড় বোনের মেয়ে ছিলেন সৈয়দা খাতুন। অর্থাৎ মামা। সৈয়দা খাতুনের পিতা মুন্সী আবদুল খালেক।

প্র : সৈয়দা খাতুনের সঙ্গে নজরুলের প্রণয় হয় কিভাবে?

উ : নজরুল যখন আলী আকবর খানের দৌলতপুরের বাড়িতে অতিথি, সেসময় সৈয়দা খাতুনের সঙ্গে নজরুলের প্রণয়ভাব গড়ে ওঠে। দৌলতপুরে রচিত নজরুলের 'হারমানা হার' বা 'মানস-বধূ' কবিতায় এই প্রণয়ভাব প্রকাশিত। নজরুল লিখেছেন : 'মিলন মোদের স্বপন-কুলে কাঁদন-ভরা চুমায় চুমায়। / নামহারা সেই আমার প্রিয়া, তারেই চেয়ে জনম গোয়ায়।'

প্র : নজরুল ও সৈয়দা খাতুনের বিয়ের তারিখ কি নির্ধারিত হয়েছিল?

উ : তারিখ ছিল বিয়ের তারিখ।

প্র : নজরুল ও সৈয়দা খাতুনের বিয়ের আমন্ত্রণপত্র প্রকাশ হয়েছিল?

উ : কলকাতার লেখক আবদুল আজিজ আল আমান তাঁর 'নজরুল পরিক্রমা' (১৩৭৬) গ্রন্থে সেই আমন্ত্রণপত্রের বয়ান উল্লেখ করেছেন। রফিকুল ইসলামও তাঁর 'কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থে সেই বয়ান মুদ্রণ করেছেন। ত্রিপুরা জেলার দৌলতপুর (এখন কুমিল্লা জেলা) থেকে ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ২৮শে জ্যৈষ্ঠ আলী আকবর খানের নামে আমন্ত্রণপত্র মুদ্রিত হয়েছিল।

নজরুল ও সৈয়দা খাতুনের বিয়ে হয়েছিল কী?

উ : এনিয়ে এখনো পরিপূর্ণ গবেষণা হয় নি। নজরুলের সহচর ও ভক্তগণ প্রমাণ করতে চেয়েছেন বিয়ের মজলিশ থেকে উঠে নজরুল পায়ে হেঁটে দৌলতপুর থেকে কুমিল্লায় চলে যান। বিয়ের সময় বরের পক্ষে একা এ কাজ করা কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য এ প্রশ্নটি থেকে যায়। অন্যদিকে গবেষকদের একপক্ষ প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, নজরুল ও সৈয়দা খাতুনের 'আকদ' হয়েছিল। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই সেই মিলনমেলায় যবনিকা পতন ঘটে। তবে নজরুল যে তাকে একসময় ভালোবাসতেন এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। তাই ইরানি ফুল নার্গিসের নামে তিনি প্রিয়ার নামকরণ করেন। নার্গিসেরই প্রকৃতনাম সৈয়দা খাতুন।

প্র : সৈয়দা খাতুনের বিয়ে পরে কার সঙ্গে হয়?

উ : ১৯৩৭ সালে কবি আজীজুল হাকিমের সঙ্গে সৈয়দা খাতুনের বিয়ে হয়। সৈয়দা খাতুন শিক্ষিতা ছিলেন, তিনি 'তহমিনা' নামে একটি উপন্যাস লেখেন।

প্র : নজরুলকে বিদ্রোহী কবি আখ্যার কারণ কী?

উ : নজরুলের আবির্ভাবে বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম এক প্রবল প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত হয় যা তৎকালীন কবিসমাজে প্রবল উত্তীপনার সৃষ্টি করেছিল। মুক্তাবেগ বসু, জীবনানন্দ দাশ প্রমুখ কবি নজরুলের কাব্য থেকে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা লাভ করেন। 'প্রলয়শিখা', 'অগ্নি-বীণা', 'সর্বহারা' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থে নজরুলের অসাম্প্রদায়িকতা সাম্যবাদ ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। তিনি বিধাতার দেষ্ঠাচারিতার বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয়েছেন। একনিষ্ঠ তাঁকে বাংলা কাব্যসাহিত্যে বিদ্রোহী কবি বলা হয়ে থাকে। অবশ্য নজরুলকে 'বিদ্রোহী' কবি বলার ক্ষেত্রে তাঁর রচিত 'বিদ্রোহী' কবিতাটিও প্রথমদিকে ভূমিকা রেখেছে। এর আগে তিনি 'মহিলাদার নজরুল' বলে পরিচয় দিতে আগ্রহী ছিলেন। নামের আগে লিখতেনও 'মহিলদার'। 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশ হওয়ার পর নজরুলকে 'বিদ্রোহী' কবিতার কবি > বিদ্রোহীর কবি > বিদ্রোহী-কবি বলে পরিচিতজনরা অভিহিত করেছেন। পরে অবশ্য নজরুল স্বমহিমাতেই আবির্ভূত হন।

প্র : নজরুল ইসলাম প্রথম কবে ঢাকায় আসেন?

উ : ১৯২৬ সালের জুন মাসের শেষ সপ্তাহে।

প্র : কার সঙ্গে তিনি ঢাকায় এসেছিলেন এবং কেন?

উ : অবিভক্ত বঙ্গের স্বাধীন নেতা হেমন্তকুমার সরকারের সঙ্গে তিনি প্রথম ঢাকায় এসেছিলেন। এ আগমনের উদ্দেশ্য ছিল বেড়ানো।

প্র : এ সময় ঢাকায় তিনি কোথায় উঠেছিলেন?

উ : ঢাকার কাছারির নিকটবর্তী মোহিনীমোহন দাসের বাড়িতে নজরুল অতিথ্য গ্রহণ করেন।

প্র : ঢাকায় প্রকাশিত নজরুলের প্রথম লেখা কোনটি?

উ : এ ব্যাপারটি স্পষ্ট করে বলা মুশকিল। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে 'অভিযান' নামে একটি সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়। ওই পত্রিকায় 'অভিযান' নামে একটি কবিতা লেখেন নজরুল। মনে করা হয়, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এটি তাঁর প্রথম লেখা। পরে কবির 'সিন্ধু-হিন্দোল' কাব্যগ্রন্থে কবিতাটি স্থান পায়।

2020/5/12 21:26
Scanned with CamScanner

প্র : নজরুল দ্বিতীয়বার কবে ঢাকায় আসেন?
উ : ১৯২৬ সালের অক্টোবর মাসে।
প্র : এই আগমনের উদ্দেশ্য কী?
উ : রাজনীতি। কবি ঢাকা বিভাগের মুসলিম কেন্দ্র থেকে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদপ্রার্থী হন। নির্বাচনের প্রচারের জন্য এ সময় তিনি ঢাকায় আসেন।
প্র : এ সময় তিনি কোথায় উঠেছিলেন?
উ : বেচারাম দেউড়ির জনৈক মো. ইউসুফ কাদেরির বাড়িতে।
প্র : নজরুল মোট কয়বার ঢাকায় আসেন?
উ : ১৩ বার।
প্র : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নজরুল কতবার আসেন?
উ : ৫ বার।
প্র : নজরুল কবে এবং কেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম আগমন করেন?
উ : ১৯২৬ সালের ২৭শে জুন মুসলিম সাহিত্য সমাজের চতুর্থ বৈঠকে অংশগ্রহণ করার জন্য তিনি প্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে।
প্র : নজরুল কবে এবং কী কারণে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন করেন?
উ : ১৯২৭ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রথম বার্ষিকী সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। সেবারও সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয়বারও তিনি আসেন একই কারণে, সাহিত্য সমাজের সম্মেলন উদ্বোধন করতে ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে।
প্র : কবি সুস্থ অবস্থায় কবে সর্বশেষ ঢাকায় আসেন?
উ : ১৯৪০ সালের ১২ই ডিসেম্বর। সেবারও তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন।
প্র : বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে নজরুলকে কলকাতা থেকে ঢাকায় আনয়ন করা হয় কত সালে?
উ : ১৯৭২-এর ২৪শে মে। এরপর থেকে নজরুল বাংলাদেশেই ছিলেন।

প্র : ঢাকায় আসার পর নজরুলকে কোন বাড়িতে স্থান দেয়া হয়?
উ : বাকরহিত নজরুলকে ঢাকায় আনার পর ধানমন্ডির ২৮ নম্বর সড়কের ৩৩০নং নম্বর বাড়িতে স্থান দেয়া হয়। পরে এই বাড়ির নজরুল ইনস্টিটিউটে ছানান্তরিত করা হয়।
প্র : কবিকে কবে পিজি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়?
উ : ১৯৭৫ সালের ২২শে জুলাই ধানমন্ডির বাড়ি থেকে অসুস্থ নজরুলকে পিজি হাসপাতালের (বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়) ১১৭ নম্বর কেবিনে স্থানান্তরিত করা হয়। মুহূর্তের আগে এক বছর এক মাসাধিককাল তিনি এই কেবিনে চিকিৎসাধীন ছিলেন।
প্র : কবির কবিতা 'জয়দেবপুরের পথে' কখন লেখা হয়?
উ : নজরুল নির্বাচনের প্রচারের কাজে ঢাকা থেকে জয়দেবপুর যাবার সময় জ্যোৎস্না রাতে 'জয়দেবপুরের পথে' নামে একটি কবিতা লেখেন। পরে তিনি এ কবিতাটি পরিমার্জনা করে নাম দেন 'চাঁদনী রাতে'। এটি 'সিন্ধু-হিন্দোল' কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয়। কবিতাটি আবদুল কাদির তাঁর 'জয়ন্তী' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ করেন।
প্র : তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারত সরকার কর্তৃক কোন কোন পদক দেয়া হয়?
উ : যথাক্রমে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক (১৯৪৫) ও 'পদ্মভূষণ' (১৯৬০) পদক দেয়া হয়।
প্র : ডি-লিট পদক 'রবীন্দ্রভারতী' ও 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' থেকে কখন দেয়া হয়?
উ : যথাক্রমে ১৯৬৯ সাল ও ১৯৭৪ সালে।
প্র : কত সালে বাংলাদেশ সরকার কবিকে '২১শে পদক' প্রদান করেন?
উ : বাংলাদেশ সরকার 'একুশে পদক' দেন ১৯৭৬ সালে।
প্র : বিবিসির বাংলা বিভাগ কর্তৃক জরিপকৃত (২০০৪) সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় নজরুলের স্থান কত?
উ : তৃতীয়।
প্র : তাঁর মৃত্যুসাল কত?
উ : ২৯শে অগস্ট, ১৯৭৬; ১২ই ভাদ্র, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ।

'সাম্যবাদী পথ' রচনা থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : কাজী নজরুল ইসলাম কেন বাইরের ঘরে ঢুকে নন?
উ : তিনি নিজের সত্যকে চিনে ফেলেছেন বলে।
প্র : মিথ্যা সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের বক্তব্য কী?
উ : যে মিথ্যাকে চেনে সে মিথ্যামিছি তাকে ভয়ও করে না। যার মনে মিথ্যা, সেই মিথ্যাকে ভয় করে।
প্র : মিথ্যা বিনয় কিসের চেয়ে নিন্দনীয়?
উ : অহংকারের পৌরুষের।
প্র : ব্যক্তি আমি সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের বিশ্বাস কী?
উ : নিজেকে চিনলে, নিজের সত্যকে নিজের কর্মধারা মনে জানলে নিজের শক্তির উপর অটুট বিশ্বাস আসে।
প্র : প্রাবন্ধিককে স্বাবলম্বী হতে শিখিয়েছেন কে?
উ : মহাত্মা গান্ধী।
প্র : দেশের শত্রু, মিথ্যা, ভণ্ডামী দূর করতে প্রয়োজন–
উ : আত্মনের সম্মার্জনা।
প্র : কবি কোনোদিন যে কাজটা করে নি–
উ : না বুঝে বোঝার ভণ্ডামি করে অন্যের শ্রদ্ধা আর প্রশংসা লাভ।

'সাম্যবাদী' কবিতা থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'সাম্যবাদী' কবিতাটি কোন কাব্যের অন্তর্গত?
উ : 'সাম্যবাদী' কাব্যগ্রন্থের নামকবিতা। সাম্যবাদী নামক কাব্যগ্রন্থটি ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।
প্র : চার্বাক কে ছিলেন?
উ : একজন বস্তুবাদী দার্শনিক ও মুনি। তিনি বেদ, আত্মা, পরলোক ইত্যাদিতে আস্থাশীল ছিলেন না।
প্র : 'সাম্যবাদী' কবিতায় হিন্দুদের কয়টি ধর্মীয় পবিত্র স্থানের নাম আছে?
উ : চারটি। কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, গয়া।
প্র : 'সাম্যবাদী' কবিতায় বর্ণিত কোন মতটি মুসলমান, খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের নিকট সমভাবে পূণ্যস্থান হিসেবে পরিচিত?
উ : জেরুজালেম। আরবস্থ মোকাররম।
প্র : বাঁশির কিশোর পরিহাসে মহা-কাঁকা- শাঁশর কিশোর কে?
উ : হিন্দু ধর্মের অবতার শ্রীকৃষ্ণ।
প্র : শাক্যমুনি কে ছিলেন?
উ : শাক্যবংশে জন্মগ্রহণকারী গৌতমবুদ্ধ।
প্র : নীলাচল কী?
উ : নীলবর্ণের অচল বা পাহাড়। উড়িষ্যার নীলাচল জগন্নাথক্ষেত্র।
প্র : যুগান্তরের অর্থ কী?
উ : বিভিন্ন যুগে অবতীর্ণ মহাপুরুষ।
প্র : কোথায় তাজা ফুল ফোটে?
উ : পথে তাজা ফুল ফোটে।
প্র : মহাবীর প্রতিষ্ঠিত ধর্মমতাবলম্বী জাতিকে কী বলে?
উ : জৈন বলে।
প্র : পারস্যের অগ্নি উপাসকদের ধর্মগ্রন্থের নাম কী?
উ : আবেস্তা।
প্র : সকল ফেতাব ও কালের জ্ঞান কোথায় রয়েছে?
উ : মানুষের মাঝে।
প্র : ভীল কী?
উ : ভারতীয় উপমহাদেশের আদি জাতিবিশেষ।
প্র : যেখানে সব বাধা ব্যবধান এক হয়ে গেছে। কবি সেখানে সাম্যের গান গাইতে চান কেন?
উ : বিশ্বব্যাপী মানবজাতির একত্বের চেতনা মনে প্রাণে পোষণ করেন বলে যেখানে সব বাধা ব্যবধান এক হয়ে গেছে। কবি সেখানে সাম্যের গান গাইতে চান।
প্র : দেবতা ঠাকুর অমৃত হিয়ার নিভৃত অন্তরালে হাসেন কেন?
উ : মানুষ আপন অন্তরে পরম পুরুষের অবস্থান অনুভব করার চেষ্টা না করে বই পুস্তকের মৃত কঙ্কালে তাঁকে খুঁজে হয়রান হয় বলে দেবতা ঠাকুর অমৃত হিয়ার নিভৃত অন্তরালে হাসেন।

2020/5/12 21:26
Scanned with CamScanner

প্র : কোথায় সব ধর্ম ও সুপাবতার আছেন?
উ : মানুষের মধ্যেই।
প্র : দেবতা বা ঠাকুরকে মানুষ কোথায় খোঁজে?
উ : ধর্মপুস্তক বা শাস্ত্রে।
প্র : এই ধরনের অনুসন্ধানের ফলে দেবতা কী করেন?
উ : তিনি হাসেন। কারণ, নজরুল বলছেন– দেবতা রয়েছেন মানুষের অন্তরে অন্য কোথাও নয়।
প্র : মানুষের হৃদয়কে নজরুল কিসের সঙ্গে তুলনা করেছেন?
উ : মসজিদ, মন্দির, গির্জার সঙ্গে।
প্র : 'রাখাল' শব্দের প্রকৃত অর্থ কী?
উ : রাখাল বলতে গরু বা মেষের পালকদের বোঝালেও আসলে রাখ্ + আল হলো রাখাল। অর্থাৎ যিনি রাখেন বা রক্ষা করেন। সে দিক থেকে ধর্মপুরুষদেরও রাখাল হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে।

'মানুষ' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'সাম্যবাদী' কাব্যগ্রন্থ কত সালে প্রকাশিত হয়?
উ : ১৯২৫ সালে।
প্র : 'সব দেশে সব কালে ঘরে-ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।'– 'তিনি' কে?
উ : স্রষ্টা বা ঈশ্বর।
প্র : এই কবিতায় কিছু সংলাপ-পঙ্‌ক্তি ব্যবহার করা হয়েছে, তার উদাহরণ দাও?
উ : ১. 'দ্বার খোলো বাবা, খাইনি তো সাত দিন!' ২. 'ঐ মন্দির পূজারীর, হায় দেবতা, তোমার নয়!' ৩. 'না বাবা!' ইত্যাদি।
প্র : 'দেবতার বরে আজ রাজা-টাজা হয়ে যাবে নিশ্চয়!' – কেন?
উ : পুরোহিত দিবানিদ্রায় ছিলেন। তাঁর মনে দেবতার আশীর্বাদে বিপুল অর্থপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা সদাজাগ্রত ছিল। দিবানিদ্রা ও দিবাস্বপ্নে প্রায়শ বাস্তববুদ্ধি তৎক্ষণাৎ কাজ করে না। পুরোহিত তাঁর দ্বারে করাঘাত শুনে তাই মনে করেছে, দেবতা তাঁর গৃহদ্বারে এসেছেন বর দিতে; পুরোহিতগিরি ছেড়ে তিনি কোনো রাজ্যের অধিশ্বর হতে যাচ্ছেন!

প্র : 'তিমিরারি' কী?
উ : তিমির অর্থ অন্ধকার। কিন্তু তিমিরারি অর্থ কৃষ্ণপক্ষের রাত।
প্র : ফুকারি কী?
উ : ফুকার হিন্দি শব্দ, এর অর্থ চিৎকার। ফুকারি অর্থে চিৎকার করে।
প্র : ফুকারি শব্দে নজরুল একটি ঊর্ধ্ব শব্দ ('ফুকারি') ব্যবহার করেছেন, কেন?
উ : আসলে নজরুল বুঝিয়েছেন অর্থাৎ 'চিৎকার করিয়া'। ফুকারিতে ভুলে দেবার জন্য লোপচিহ্ন বিসর্গের ঊর্ধ্ব কমা ব্যবহার করেছেন। তাই শব্দটি হয়েছে ফুকারি'। আধুনিক বানানে ফুকারি লিখলে ভুল নয়।
প্র : আঙ্গারির চিন কী?
উ : রুপণ বা ব্যথিতের চিহ্ন। চিহ্ন থেকে ধ্বনিলোপের মাধ্যমে 'চিন' হয়েছে।
প্র : 'ভ্যালা হলো দেখি শেঠা' মানে কী?
উ : বিদ্রূপাত্মক বাক্য। 'ভালো' শব্দের বিকৃত ও বিদ্রূপাত্মক রূপ ভ্যালা। 'শেঠা' একটি মারাঠি শব্দ (এর মূল শব্দ), যার অর্থ উৎপাত বা ঝামেলা।
প্র : 'তব' কী?
উ : আধুনিক বাংলায় 'তোমার'। বিগত শতাব্দীর প্রথম দিকেও কাব্যভাষা হিসেবে 'তোমার' অর্থে 'তব', 'আমার' অর্থে 'মম' ইত্যাদি প্রচলিত ছিল।
প্র : 'সব দ্বার এর খোলা রবে' বলে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?
উ : স্রষ্টার ভজনালয় মন্দির, মসজিদ, গির্জা ইত্যাদি কেবল নির্দিষ্ট কিছু মানুষের হাতে জিম্মি হয়ে থাকবে না। এখানে সব শ্রেণির মানুষের সর্বরকমের অধিকার নিশ্চিত ও সমানভাবে থাকবে। ধনীরা কেবল এর সব কিছুর অধিকারী হবে, গরিবেরা থাকবে সব থেকে পেছনে– এমন যেন না হয়।

'ভাব ও কাজ' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের লেখক কে?
উ : কাজী নজরুল ইসলাম।
প্র : কাজের পূর্ব পরিকল্পনা কী?
উ : ভাব।

প্র : ভাব কে রূপ দেয়ার উপায় কী?
উ : কাজ।
প্র : 'পুষ্পবিহীন সৌরভের মতো'– এটি কী?
উ : এটি একটি উপমা। ভাষাকে সুন্দর করে বোঝাবার জন্য উপমা প্রয়োগ করা হয়। ঘুম ভাঙা কি প্রকৃত সুগন্ধ হয়? হয় না। এমন ভাবা হলে তা হবে অবান্তর উদ্ভট।
প্র : বাস্তবজগতকে উপলব্ধি করা যায় কিসের মাধ্যমে?
উ : যথাযথভাবে কাজ করার মাধ্যমে।
প্র : ভাব ও কাজের মধ্যে সম্পর্ক কী?
উ : ভাব এদের পরিপূরক।
প্র : 'ভাবপাগলা' দেশ কী?
উ : যে দেশের মানুষ শুধু কল্পনা করে চলে, কল্পনা করেই থাকে, ভাবতে ভাবতে জীবন যায় কিন্তু কাজ আরম্ভই করে না। নজরুল বাঙালিদের 'ভাবপাগলা' বলে আখ্যায়িত করেছেন।
প্র : 'কর্পূরের মতো উড়িয়া যায়'– এটি কী?
উ : এটি একটি উপমা। কর্পূর যেমন অল্পক্ষণেই বাতাসে মিশে 'নেই' হয়ে যায়, তেমনি।
প্র : কাজ সঠিক হওয়ার পূর্বশর্ত কী?
উ : কাজের আগে সঠিকভাবে ভেবে নেওয়া।
প্র : প্রত্যেকটি মানুষকে কেন ভাবা প্রয়োজন?
উ : মানুষের কল্যাণের জন্য।
প্র : ভাবের উদ্দেশ্য কী হওয়া উচিত?
উ : অন্যের কল্যাণ কামনা করা।
প্র : ভাবের দ্বারা মানুষের কী কী জাগিয়ে তোলে?
উ : যথাযথ কর্মপরিকল্পনা ও কাজের স্পৃহা।
প্র : 'কাঁসি' কী?
উ : ধাতব পদার্থ 'কাঁসা' দিয়ে নির্মিত এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র, যা হিন্দুদের পূজাতে বাজানো হয়।
প্র : আমাদের দেশের আশা ভরসার স্থল কারা?
উ : যুবকগণ।
প্র : ভাব কিসের জন্য হওয়া উচিত নয়?
উ : একটা সাময়িক সময়ের জন্য।
প্র : স্কুল-কলেজের ছাত্রদের ভাব কেমন হওয়া উচিত?
উ : দেশ ও মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা।
প্র : ভালো কাজ করার পূর্বশর্ত কী?
উ : প্রত্যেকে নিজের স্বার্থ ত্যাগ করা।
প্র : কখন ধর্ম, দেশ, সমৃদ্ধিমূলক পরিণতি?
উ : অতি ভাবের কারণে সঠিকভাবে কাজ না করলে।
প্র : কখন দেশ উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে?
উ : যখন ব্যক্তির 'স্পিরিট' ভাবপ্রবণ, উদ্যম, শক্তি জাগিয়ে কাজে প্রয়োগ করা যাবে।
প্র : কাজের আগে সঠিক পরিকল্পনা না করলে কাজের অবস্থা কেমন হবে?
উ : উদ্যমে ষাঁড়ের মতো অর্থাৎ বন্ধনমুক্ত ষাঁড় যে দিকে ইচ্ছা সেদিকে যায়। কাজের অবস্থা তেমনি হবে।
প্র : 'এই কবীর কাহ্নুপিতে পুষ্যলাগ্না পড়িয়া গিয়াছে'– এখানে 'পুষ্যলাগ্না' কী?
উ : শব্দটি আসলে 'পোয়ালাগ্না'। 'পলাল' শব্দ থেকে 'পোয়াল' শব্দ আসে, যার অর্থ আধাঁধা খড়। 'পল+আল' পলাল। নজরুল পোয়ালাগ্নাকে পুষ্যলাগ্না লিখেছেন, বুঝিয়েছেন– যাদের যেমন আলগা খড়ের গুদ বা পালা দেখা যায়, সেটা।
প্র : 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের মাধ্যমে লেখক কোন ইঙ্গিত করেছেন?
উ : দেশের উন্নতি ও মুক্তি এবং মানুষের কল্যাণের জন্য ভাবের সঙ্গে বাস্তব কাজের মিল হওয়ার উপর জোর দিয়েছেন।
প্র : হুজুগে কারা?
উ : যারা নিজ স্বার্থের জন্য সর্বদা চিন্তা করে।
প্র : 'দশচক্রে ভগবান ভূত' অর্থ কী?
উ : এটি একটি প্রবাদ। এর পেছনের গল্পটি এমন: ভগবান নামের একজন সৎলোক রাজার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হচ্ছিল। স্বার্থান্বেষীরা একদিন প্রচার করে দিলো যে, ভগবানের মৃত্যু হয়েছে। তারা ভগবানকে আর রাজপ্রাসাদে ঢুকতে দিলো না। রাজা পরিচিতদের এই প্রচার বিশ্বাস করলেন। কিন্তু রাজপ্রাসাদের ফটকে একদিন রাজা ভগবানের কণ্ঠস্বর শুনতে পান। সন্দিগ্ধ হয়ে রাজা এর কারণ জানতে চাইলে, সবাই একস্বরে বলে, সেটা ভগবানের কণ্ঠ নয়, মৃত ভগবান ভূত হয়ে এসেছে। পারিষদবর্গের এই ব্যাখ্যার পর রাজা সেটা

2020/5/12 21:26
Scanned with CamScanner

বিশ্বাস করেন। সবাই মিলে যে সত্যকে মিথ্যে করে প্রচার করতে পারে– এই প্রবাদ সে কথাই বলে।

প্র : ভেড়ার মতো পেছন ধরে চলা– বাগধারায় কী বলে?

উ : গতানুগতিকা প্রবাহ।

প্র : 'ভাবের ঘরে চুরি করিও না' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উ : 'অতি ভাব' গ্রহণ করে প্রকৃত কার্য থেকে পিছিয়ে না-পড়ার পরামর্শ। আমাদের দেশের নবীনসমাজ অতি ভাবে আবেগাপ্লুত হয়ে এমন কর্ম করে যা প্রকৃত কাজের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে পড়ে। এই অতি আবেগ বা অতি ভাবকেই 'ভাবের ঘরে চুরি' বলা হয়েছে।

'নারী' কবিতা থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'নারী' কবিতাটি নজরুল ইসলামের কোন পুস্তিকার অন্তর্ভুক্ত?

উ : 'সাম্যবাদী'।

প্র : 'সাম্যবাদী' কত খ্রিষ্টাব্দে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়?

উ : ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরে, কলকাতা থেকে।

প্র : 'সাম্যবাদী' পরে কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়?

উ : 'সর্বহারা' (১৯২৬)।

প্র : 'সাম্য' কী?

উ : সমতা।

প্র : নজরুল 'সাম্য' বলতে কী বুঝিয়েছেন?

উ : নজরুল সাম্য বলতে 'সাম্যবাদ'কে বুঝিয়েছেন।

প্র : 'সাম্যবাদ' কী?

উ : জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্কস সাম্যবাদের তত্ত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: পৃথিবীতে ধনীরা গরিবদের শোষণ করে সম্পদের পাহাড় গড়ে। তারা নারী, পুরুষের মধ্যেও বিভেদ সৃষ্টি করে। সব মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে সবাইকে সুখে রাখার তত্ত্বই সাম্যবাদ।

প্র : 'অর্ধেক তার আনিয়াছে সব, অর্ধেক তার নারী।'– কী?

উ : পৃথিবীর সব সুন্দর কিছু এবং পৃথিবীর পাপ-দুঃখ ইত্যাদিও।

প্র : এই চরণ দিয়ে নজরুল কী বোঝাতে চাচ্ছেন?

উ : নজরুল বোঝাতে চাচ্ছেন, নারী-পুরুষ মিলে এই পৃথিবীর সুন্দর কাজগুলোই শুধু করে নি, পাপ-তাপ, দুঃখ-কষ্টগুও শুধু পুরুষ মিলেই এনেছে। তাই এই পৃথিবীর সুন্দর ও অসুন্দরের কৃতিত্ব ও দায় দুজনেরই। নারী-পুরুষের, একা কারো নয়।

প্র : 'জগতের যত বড় বড় জয় ধ্রুব তার অভিযান / মাতা ভগ্নি ও বধূদের আঁচে হইয়াছে মহীয়ান।'– কিভাবে?

উ : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেই নারীদের সম্ভ্রম যুদ্ধে যাবার ইতিহাস আছে, তাদের সম্ভ্রম নষ্ট হয়েছে, তারা মুক্তিযোদ্ধাদের রক্ষা করে খাইয়েছে ইত্যাদি।

প্র : 'খুন' অর্থ কী?

উ : রক্ত (পারসি বা ফার্সি শব্দ)।

প্র : 'কোন রণে কত খুন দিল নর, লেখা আছে ইতিহাসে, / কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর, লেখা নাই তার পাশে।'– এই বক্তব্য দিয়ে নজরুল কী বুঝিয়েছেন?

উ : ইতিহাস যেহেতু পুরুষের রচনা সেহেতু ইতিহাস রচনায় পুরুষ কার্পণ্য করেছে। নারীকে অবজ্ঞার চোখে দেখে তার নিজেদের পাশে সমান মর্যাদায় নারীদের স্থান দেয় নি। যুদ্ধে একজন পুরুষের আত্মত্যাগের পেছনে একজন নারীরও যে সহায়-সম্বল ও আশ্রয় হারার ব্যাপারটি জড়িত– পুরুষ ইতিহাসকারগণ সে কথা মনে রাখেন নি।

প্র : নজরুলের এই বক্তব্যের সত্যতা এ যুগের নিরিখে দেখাও।

উ : মুক্তিযোদ্ধা তারামন বিবি বীরপ্রতীক উপাধিপ্রাপ্ত হলেও মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদানের কথা ইতিহাসে দীর্ঘ দিন অলিখিত ছিল। মুক্তিযুদ্ধের প্রায় তিন দশক পরে ময়মনসিংহের বিমলচন্দ্র দে তারামন বিবির অনুসন্ধান করে এই বীর-মুক্তিযোদ্ধাকে লোকসম্মুখে নিয়ে আসেন।

তারামন বিবির মতো অনেক নারীমুক্তিযোদ্ধার সংবাদ এ অবধি এখন আর পরদায় রাখে না, এ কথা সত্য। অন্য দিকে, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সরকার ভাতার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু যে মুক্তিযোদ্ধারা রণাঙ্গনে শহিদ হয়েছেন, তাঁদের অসহায় পরিবারের জন্য সরকারের সত্যি কি তেমন কোনো উদ্যোগ চোখে পড়ে? তাদের বিধবা স্ত্রীদের জন্য কী সাহায্য প্রদান করেছে সরকার?

প্র : 'বিজয়-লক্ষ্মী' কী?

উ : বিজয়ের অনুপ্রেরণাদাতৃ লক্ষ্মী।

প্র : 'সে-যুগ হয়েছে বাসি,'– বলে নজরুল কী বোঝাতে চেয়েছেন?

উ : নতুন যুগ সমাগত। পুরোনো ধ্যান-ধারণা ফেলে নতুনকে বরণ করতে হবে– এ যুগে নারী-পুরুষের সমান অধিকার ও মর্যাদা থাকবে।

প্র : নতুন এই যুগকে নজরুল কী বলে অভিহিত করেছেন?

উ : বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ।

প্র : 'ডঙ্কা' কী

উ : জয়ঢাক।

প্র : 'কেহ রহিবে না বন্দী কাহারও, উঠিছে ডঙ্কা বাজি।'– এই চরণে কী বোঝান হয়েছে?

উ : কেউ কারো অধিকার ক্ষুণ্ন করবে না অর্থাৎ সবাই সমান অধিকার ভোগ করবে– এই বার্তা আজ চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে।

প্র : 'পীড়ন করিলে সে-পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই।' –এই বক্তব্য দিয়ে কী বোঝান হয়েছে?

উ : কারো অধিকার খর্ব করলে বা কাউকে শোষণ করলে ভবিষ্যতে নিজের একই রকমের অধিকার হারাবার বা শোষিত হবার সম্ভাবনা থাকে।

প্র : 'পীড়ন করিলে সে-পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই।'– এই চরণটি তোমার জানা অন্য দুটো বাক্যে প্রকাশ কর।

উ : 'যারে তুমি পিছে ফেলে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।' 'ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়।'

কাজী মোতাহার হোসেন

প্র : কাজী মোতাহার হোসেনের জন্ম কত সালে?

উ : ৩০শে জুলাই, ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দ।

প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : মাতুলালয়, সন্দীপের গ্রাম, কুমারখলি, কুষ্টিয়া।

প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?

উ : সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানী।

প্র : কত সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন?

উ : ১৯২৬ সালে।

প্র : কাজী মোতাহার হোসেনের জীবনের অন্যতম কীর্তি কোনটি?

উ : ঢাকায় 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' প্রতিষ্ঠা।

প্র : তিনি কোন পত্রিকার মুখপত্র হিসেবে কাজ করেন?

উ : 'শিখা' (১৯২৭)।

প্র : তাঁর প্রথম ও বিখ্যাত প্রবন্ধ সংকলন কোনটি?

উ : 'সঞ্চয়ন' (১৯৩৭)।

প্র : প্রবন্ধ সাহিত্যে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন কত সালে?

উ : ১৯৬৬ সালে।

প্র : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানজনক 'ডক্টরেট উপাধি ও 'জাতীয় অধ্যাপক' মর্যাদায় ভূষিত হওয়ার সাল লেখ।

উ : যথাক্রমে ১৯৭৪ এবং ১৯৭৫।

প্র : তাঁর মৃত্যু হয় কত সালে?

উ : ৯ই অক্টোবর, ১৯৮১।

কামরুল হাসান

প্র : কামরুল হাসান কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১৯২১ সালের ২রা ডিসেম্বর কলকাতার তিনজিলা গোরস্থান রোডে।

প্র : তাঁর পৈতৃক নিবাস কোথায়?

উ : পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার নারেজা গ্রামে।

প্র : তিনি কোথা থেকে গ্রাজুয়েট হন? কত সালে?

উ : ১৯৪৭ সালে কলকাতা চারুকলা ইনস্টিটিউট থেকে তিনি চিত্রকলা বিষয়ে গ্রাজুয়েট হন।

2020/5/12 21:26

Scanned with CamScanner

প্র : কখন তিনি স্থায়ীভাবে এদেশে চলে আসেন?
উ : ১৯৪৭ সালে দেশভাগ হলে কলকাতা ত্যাগ করে তিনি ঢাকায় আগমন করেন।
প্র : শিল্পাচার্য জয়নুল 'বেঙ্গল স্কুলে'র সঙ্গে তিনি কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন?
উ : ঢাকা আর্ট স্কুল। পরে এটা 'চারু ও কারুকলা ইনস্টিটিউট' নাম পায়।
প্র : কর্মজীবনে তিনি কোথায় ছিলেন?
উ : ১৯৬০ সাল পর্যন্ত আর্ট স্কুলে শিক্ষকতা। ১৯৬০ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত বিসিক-এর প্রধান আর্টিস্ট হিসেবে অবসর গ্রহণ।
প্র : মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণ কীভাবে?
উ : মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুজিবনগর সরকারের তথ্য ও বেতার দপ্তরের শিল্পবিভাগের প্রধান পদে দায়িত্ব পালন। তাঁর অঙ্কিত ইয়াহিয়া খানের জানোয়ার আকৃতির মুখমণ্ডল এবং নিচে লেখা 'এই জানোয়ারকে হত্যা করুন' খুবই প্রশংসিত হয়।
প্র : তাঁর কোন স্কেচটি স্বৈরাচার এরশাদ বিরোধী আন্দোলনকে বেগবান করে?
উ : জাতীয় কবিতা পরিষদের মঞ্চে বসে আঁকা 'দেশ আজ বিশ্ববেহায়ার খপ্পরে'।
প্র : কামরুল হাসান কবে, কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ১৯৮৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি; ঢাকা।

'আমাদের লোকশিল্প' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'মসলিন' কোন ভাষার শব্দ?
উ : ফার্সি (পারসি) ভাষার।
প্র : 'মসলিন' কোন ভাষার শব্দ থেকে জাত?
উ : আরবি মরসিলি থেকে ফার্সি মসলিন জাত।
প্র : মসলিন কী?
উ : অতি কোমল ও সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্রবিশেষ।
প্র : মসলিন কাপড়ের সঙ্গে কোথাকার বস্ত্রের সাদৃশ্য কল্পনা করা হয়?
উ : সম্ভবত প্রাচীন ব্যবিলনের মসৌলে নির্মিত সূক্ষ্ম মসৃণ বস্ত্রসদৃশ ঢাকায় তৈরি হয় মসলিন বস্ত্র।
প্র : 'জামদানি' কোন ভাষার শব্দ?
উ : আরবি।
প্র : জামদানি কী?
উ : হাতে বুনে তাঁতের ফুলতোলা বিশ্ব কাপড়বিশেষ।
প্র : শহরতলি অর্থ কী?
উ : শহরের উপকণ্ঠ।
প্র : শহর কোন শব্দ?
উ : ফার্সি।
প্র : ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর : সূক্ষ্ম, শিল্প, ঐতিহ্য
উ : সূক্ষ্ম : √সূচ্ + ক্ষ
শিল্প : √শীল্ + প
ঐতিহ্য : ইতিহ + য
প্র : লোকশিল্প অর্থ কী?
উ : লোক বা সাধারণ মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট শিল্প।
প্র : কোনটি মোগল বাদশাহদের বিলাসের বস্ত্র ছিল?
উ : ঢাকার মসলিন।
প্র : জামদানি শাড়ির জন্য কোনটি প্রয়োজনীয়?
উ : আর্দ্রতা।
প্র : খাদির বৈশিষ্ট্য কী?
উ : এটি হাতে তৈরি।
প্র : কাপড়ের তৈরি পুতুলের বৈশিষ্ট্য কী?
উ : প্রতীকধর্মিতা।
প্র : কামরুল হাসানের ছবিতে কোন বিষয়ে প্রাধান্য পেয়েছে?
উ : লোকজ ঐতিহ্য।
প্র : 'আমাদের লোকশিল্প' কোন শ্রেণির রচনা?
উ : প্রবন্ধ।
প্র : খাদ্যশস্যের পরে কোন জিনিসটি এদেশের মানুষের জীবনের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে?
উ : কুটির শিল্প।
প্র : মসলিন তাঁতিরা ঢাকার অদূরে কোথায় বাস করত?
উ : ডেমরা।
প্র : মসলিন কাপড় বুনবার জন্য কারিগরি দক্ষতা ছাড়াও কোন জিনিসটি থাকা প্রয়োজন?
উ : শিল্পীমন।
প্র : মসলিন শব্দের অর্থ কী?
উ : অতি মিহি ও মসৃণ।

প্র : মসলিন কারিগরের বংশধররা আছে বলে আমরা কী শাড়ি পাচ্ছি?
উ : জামদানি।
প্র : কোন মৌসুমে সাধারণত নকশিকাঁথা সেলাই করা হত?
উ : বর্ষাকালে।
প্র : ঔপনিবেশিক বাংলাদেশের কোন কোন জেলায় বেশি আছে?
উ : ঢাকা, ডাঙ্গাইল, কুমিল্লা।
প্র : কোন নদীর তীরে জামদানি শাড়ির তাঁতশিল্প গড়ে উঠেছে?
উ : বীতলক্ষ্যা।
প্র : গ্রামবাসী যারা সুতা কাটে তাদেরকে কী বলা হয়?
উ : কাটুনি।
প্র : খাদি কাপড় কোন আন্দোলন সাফল্যের স্বাক্ষর বহন করে?
উ : বদেশি আন্দোলন।
প্র : সিলেটের কোন অঞ্চলের পরিবারের মেয়েরা নিজেদের পরিধেয় কাপড় নিজেরা তৈরি করে?
উ : মাছিমপুর অঞ্চল।
প্র : বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে কিসের বাসন পত্র এককালে বেশ প্রিয় ছিল?
উ : কাঁসা পিতলের।
প্র : কাঁসা কী?
উ : তাং ও তামার মিশ্রণে তৈরি ধাতু।
প্র : আজকালকার অতি আধুনিক গৃহসজ্জার সামগ্রী হিসাবে কোনটি ব্যবহার হতে দেখা যায়?
উ : ফুলদানি।
প্র : 'ঐতিহ্য' শব্দটির অর্থ কী?
উ : অতীত গৌরবের বস্তু।
প্র : কোনগুলো তৈরির জন্য বাংলাদেশের পালপাড়া ও কুমারপাড়ার অধিবাসীরা সারা বছর ব্যস্ত থাকে?
উ : হাঁড়ি-পাতিল।
প্র : গ্রাম্য কারিগররা সলপা, খাটি, ট্রাস, খলা ইত্যাদি কিভাবে তৈরি করেন?
উ : মাটির হাতে।
প্র : পুরাকালের মসলিন মসলিনের গায়ে যেসব নকশাদার ছট দেখা যায় তা কিসের নিদর্শন?
উ : লোকশিল্পের।
প্র : কাঠের খাট, পালঙ্ক, বাঁটি, সরঞ্জাম নকশা আঁকাকে কী বলা হত?
উ : হাসিয়া।
প্র : কোন জেলায় কাঠের নৌকার কাজ সবচেয়ে ভালো ছিল?
উ : বরিশাল।
প্র : কোন জেলার শীতল পাটি বিখ্যাত?
উ : সিলেট।
প্র : কোন জেলার মাদুর বিখ্যাত?
উ : খুলনা।
প্র : কোন এলাকার নবাব হাতির দাঁতের শীতল পাটি তৈরি করেছিলেন?
উ : ঢাকা।
প্র : আমাদের দেশের মেয়েদের সহজাত শিল্পগুণ কোনটি?
উ : কাপড়ের পুতুল তৈরি করা।
প্র : আমাদের লোকশিল্প বিদেশিদের হৃদয়ে কিভাবে সাড়া জাগাতে পারে?
উ : লোকশিল্পে আমাদের হৃদয়-মনের প্রকাশ ঘটলে।
প্র : খাদি তৈরির সুতা সাধারণত কিভাবে জোগাড় করা হয়?
উ : বাড়ির পাশে তুলার গাছ লাগিয়ে।
প্র : সোলা শিল্পের উৎকৃষ্ট সৃজনশীল নমুনা কোন জিনিসে পাওয়া যায়?
উ : পুতুল, টোপর ইত্যাদি।
প্র : কয়েকশ গজ মসলিন কাপড় কিসের মধ্যে রাখা যেত?
উ : আংটির ভিতরে।
প্র : হাতির দাঁতের শীতল পাটি কোথায় সংরক্ষিত আছে?
উ : ঢাকার জাদুঘরে।

2020/5/12 21:26
Scanned with CamScanner

প্র : হিন্দু সম্প্রদায়ের দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী ইত্যাদি মূর্তি তৈরি করে কারা?
উ : পাল ও কুমোরেরা।
প্র : 'প্রকৃতি' শব্দটির বিশেষণ রূপ কোনটি?
উ : প্রাকৃত।
প্র : কুটিরশিল্প অর্থ কী?
উ : সাধারণ মানুষের গৃহে তৈরি শিল্প। কুটির অর্থ কুঁড়েঘর। যে শিল্প গ্রামবাংলার কুঁড়েঘর বা সাধারণ মানুষের গৃহে প্রস্তুত তাকেই কুটিরশিল্প বলে। ইংরেজিতে বলে: Cottage Industry.

কামিনী রায়

প্র : কামিনী রায়ের জন্ম কত সালে?
উ : ১২ই অক্টোবর, ১৮৬৪।
প্র : তাঁর জন্ম হয় কোথায়?
উ : বাসন্ডা, বরিশাল।
প্র : তাঁর পিতা কে?
উ : ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক চন্ডীচরণ সেন।
প্র : তাঁর শিক্ষা জীবনের বিবরণ দাও।
উ : তিনি ১৮৮৬-তে কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্স সহ বি.এ. পাস করেন।
প্র : কামিনী রায়ের পেশা কী ছিল?
উ : অধ্যাপনা (বেথুন কলেজ)।
প্র : কামিনী রায়ের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ গুলোর নাম লেখ।
উ : 'আলো ও ছায়া' (১৮৮৯), নির্মাল্য' (১৮৯১), 'পৌরাণিকী' (১৮৯৭), 'গুঞ্জন' (১৯০৫), 'মাল্য ও নির্মাল্য' (১৯১৩), অশোক সংগীত (সনেট সংগ্রহ, ১৯১৪), অম্বা (নাট্যকাব্য, ১৯১৫), দীপ ও ধূপ (১৯২৯), জীবনপথে (১৯৩০)।
প্র : তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'জগত্তারিণী' পদক পান কত সালে?
উ : ১৯২৯ সালে।
প্র : তাঁর মৃত্যু তারিখ কত?
উ : ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩।

'পাছে লোকে কিছু বলে' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'পাছে লোকে কিছু বলে'– এখানে 'পাছে' শব্দটির ব্যবহৃত সম্পর্কে লেখ।
উ : এটি একটি শ্লেষ অলঙ্কার। কবি অক্ষয় রায় 'পাছে' বলতে 'পেছনে' এবং 'যদি' এই দুই অর্থে বুঝিয়েছেন।
প্র : এই ধরনের শ্লেষ অলঙ্কারকে কী বলে?
উ : অভঙ্গ শ্লেষ।
প্র : 'আপনা' কী?
উ : নিজেকে নিজে।
প্র : 'নিরমল' কী?
উ : নির্মল অর্থাৎ পবিত্র। কবিতার ছন্দের প্রয়োজনে কবি এভাবে শব্দকে হ্রস্ব বা দীর্ঘ করে নিতে পারেন।
প্র : 'একটি স্নেহের কথা / প্রশমিবে পর ব্যথা'– কবি কী বলেছেন?
উ : মানুষের সামান্য স্নেহপূর্ণ কথা বা আচরণ অনেকের মন থেকে কষ্ট লাঘব করতে পারে। কিন্তু কোনো কোনো মানুষ সে কথাটুকুও বলতে চান না, উপেক্ষা করে চলে যান। তার ধারণা, এতে অন্যরা তাকে কিছু বলতে পারে।
প্র : 'যবে' কী?
উ : যখন।
প্র : 'কোনো কোনো মানুষ আর কখন একত্র মিলতে পারেন না'?
উ : মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে যখন মানুষ কিছু করার জন্য একত্রিত হয়, তখনও সে মিলতে পারে না।
প্র : বিধাতা প্রাণ প্রদানের পরও এই ধরনের মানুষগুলো কেমন থাকে?
উ : ম্রিয়মাণ।
প্র : 'ম্রিয়মাণ' অর্থ কী?
উ : মরণাপন্ন বা কাতর।
প্র : 'শক্তি মরে ভীতির কবলে'– বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?
উ : মনের শক্তি মিথ্যে ভয়ের দ্বারা আক্রান্ত হয়।
প্র : 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতার সঙ্গে একটি বাংলা প্রবাদের হুবহু মিল দেখাও।
উ : 'বনের বাঘে খায় না, মনের বাঘে খায়।'

কালিদাস রায়

প্র : কালিদাস রায়ের জন্ম কবে ও কোথায়?
উ : কালিদাস রায় ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ৯ই জুলাই বর্ধমানের কড়ুই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
প্র : তিনি কোথায় লেখাপড়া করেন?
উ : ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে বহরমপুর কলেজ থেকে এফ.এ পাস করার পর কলকাতায় স্কটিশচার্চ কলেজে দর্শন বিষয়ে অধ্যয়ন করেন।
প্র : কোথায় চাকুরিজীবন শুরু করেন?
উ : প্রথমে বাংলাদেশের রংপুরের উলিপুর মহারাণী স্বর্ণময়ী বিদ্যালয়ে ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রথমে শিক্ষক, পরে প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সাত বছর পরে পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশপরগনা জেলার বড়িশা উচ্চবিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং পরে ব্রীশেশচন্দ্র সেনের আগ্রহে কলকাতার ভবানীপুরের মিত্র ইন্সটিটিউশনে (বিদ্যালয়) সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন।
প্র : তিনি কোনধারা কবি হিসেবে পরিচিত?
উ : রবীন্দ্রধারার কবি হিসেবে। তিনি আখ্যানধর্মী বা গল্পের মতো কবিতা লিখে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।
প্র : কালিদাস রায়ের কাব্যগুণ কেমন?
উ : তাঁর কবিতার ভাষা সহজ-সরল, অনাড়ম্বর কিন্তু হৃদয়গ্রাহী।
প্র : কালিদাস রায়ের কাব্যগ্রন্থগুলো কী?
উ : 'কুন্দ' (১৯০৮), 'কিশলয়' (১৯১১), 'পর্ণপুট' (১ম ভাগ: ১৯১৪; ২য় ভাগ: ১৯২১), ব্রজবেণু (১৯১৫), 'বল্লরী' (১৯১৫), 'ঋতুমঙ্গল' (১৯১৬), 'লাজাঞ্জলি' (১৯২৪), 'হৈমন্তী' (১৯২৪), 'পূর্ণাহুতি' (১৯৬৮) ইত্যাদি।
প্র : কাব্যগ্রন্থ ছাড়া তিনি আর কী কী বই লেখেন?
উ : প্রবন্ধগ্রন্থ: 'প্রাচীর বঙ্গসাহিত্য' , 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়'; রম্যসাহিত্যগ্রন্থ: 'চণক সংহিতা', 'ব্যঙ্গচিত্র ও চালচিত্র' ইত্যাদি।
প্র : তিনি কী কী উপাধি ও পদক-পুরস্কার লাভ করেন?
উ : ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে রংপুর সাহিত্য পরিষদ 'কবিশেখর' উপাধি প্রদান করে; ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'জগত্তারিণী পদকে'; ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে 'আনন্দ পুরস্কার'; ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্র পুরস্কার' লাভ করেন। জাতীয় শিক্ষাপরিষদ বিশ্ববিদ্যালয় সেশিক্ষায়তন উপাধি, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় 'ডি. লিট' উপাধি প্রদান করে।
প্র : তিনি কবে, কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?
উ : কলকাতার টালিগঞ্জে 'সন্ধ্যার কুলায়' (এর অর্থ 'শেষজীবনের পাখির বাসা') নামের বাসভবনে ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে নভেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

'বাবুরের মহত্ত্ব' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতা কে লিখেছেন?
উ : কালিদাস রায়।
প্র : 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতা কালিদাস রায়ের কোন কাব্যগ্রন্থভুক্ত?
উ : 'পর্ণপুট' (২য় ভাগ)
প্র : 'পর্ণপুট' অর্থ কী?
উ : পাতার ঠোঙা বা পাতা দিয়ে বানানো আধার।
প্র : ভারতের মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট কে ছিলেন?
উ : বাবুর।
প্র : কোন বানান শুদ্ধ: 'মুঘল' নাকি 'মুগল'?
উ : দুটো বানানই ঠিক। এমনকি 'মোগল' বা 'মোঘল' এই বানানেও লেখা হয়। আসলে মঙ্গোলিয়া থেকে এসে যারা ভারতের ক্ষমতায় আরোহণ করেছিল তাদের তুর্কি ভাষায় মোগল বলা হয়েছে। এরই বানানভেদ চলছে। তবে বর্তমানে 'মোগল' বানানই সর্বমান্য হয়ে উঠেছে। এই কবিতায় যেহেতু 'মোঘল' লেখা হয়েছে, সেহেতু ছাত্রছাত্রীদের এই বানানই লেখার জন্য পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে।
প্র : বাবুরের প্রকৃত নাম কী?
উ : জহিরুদ্দিন মুহম্মদ।
প্র : 'বাবুর' অর্থ কী?
উ : 'বাবুর' বা 'বাবর' অর্থ সিংহ; এটি পারসি

2020/5/12 21:26

Scanned with CamScanner

শব্দ। আমরা যে বলি 'বাবরি চুল'– এর অর্থ সিংহের কেশরের মতো দেখতে চুল।

প্র: বাবুর কত বছর বয়সে সিংহাসন লাভ করেন?
উ: ১১ বছর বয়সে।
প্র: বাবুর কখন দিল্লি দখল করেন?
উ: পানিপথের ১ম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে।
প্র: পানিপথ কোথায় অবস্থিত?
উ: ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের একটি প্রাচীন শহরের নাম পানিপথ। এই স্থানের ভারতের ইতিহাসে অন্তত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে।
প্র: ইব্রাহিম লোদি কোন বাদশা ছিলেন?
উ: পাঠান বাদশা।
প্র: পাঠান কাদের বলা হয়?
উ: পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের অধিবাসীদের হিন্দিতে পাঠান বলা হয়েছে।
প্র: উত্তর-ভারত কিভাবে বিজয় হলো?
উ: পানিপথের প্রথম যুদ্ধের মাধ্যমে।
প্র: বাবুরের মহত্তগুণ কী ছিল?
উ: তিনি ছদ্মবেশে রাতের আঁধারে প্রজাদের দুঃখ-কষ্ট দেখতে ঘুরতেন।
প্র: ইব্রাহিম লোদি কোন স্থানে বাবুরের কাছে পরাজিত হন?
উ: খানুয়ার প্রান্তরে।
প্র: খানুয়ার প্রান্তর কোথায় অবস্থিত?
উ: আগ্রার পশ্চিমে অবস্থিত একটি যুদ্ধক্ষেত্র।
প্র: প্রজারঞ্জন অর্থ কী?
উ: এখানে 'জনগণের মনস্তুষ্টি' বোঝানো হয়েছে।
প্র: 'করি' অর্থ কী?
উ: 'করি' মানে হাতি। 'করি-শুণ্ড' অর্থ হাতির শুঁড়।
প্র: 'রাজপদ' অর্থ কী?
উ: রাজার পদ অর্থাৎ 'রাজা'।
প্র: 'সঁপিনু' অর্থ কী?
উ: সমর্পণ করছি।
প্র: বাবুরের ভারত আক্রমণকালে ইব্রাহিম লোদি কোথাকার শাসক ছিলেন?
উ: পাঞ্জাবের।

প্র: বাদশা বাবুর পাগলকরেশে কার হাতির কবল থেকে রক্ষা করেন?
উ: মেথরের ছেলেকে।
প্র: রণবীর চৌহান শুকাসো অবস্থায় কাকে হত্যার করার উদ্দেশ্যে বাবুর ঘুরছিলেন?
উ: মুঘল সম্রাট বাবুরকে।
প্র: রাজপুত্র যুবককে কেন রণবীর চৌহান উপাধি দেয়া হয়?
উ: মুঘল সম্রাট বাবুরের রাজ্য বিজয়ের পর রাজপুত্রগণ কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না। এক রাজপুত্র বাবুরকে হত্যার করার জন্য খোলা তরবারি নিয়ে পাগল অবস্থায় ঘুরছিলেন তাই এই সাহসিকতার জন্য তাকে রণবীর চৌহান উপাধি দেয়া হয়।
প্র: বিদেশি পুরুষ বলতে কবি কাকে বুঝিয়েছেন?
উ: সম্রাট বাবুরকে।
প্র: যে আকুফ শব্দের অর্থ কী?
উ: যার নিজের কোন হিতাহিত জ্ঞান নেই।
প্র: রণবীর চৌহান কখন বিস্মিত হলেন?
উ: যখন বাবুর তার নিজ জীবন বাজি রেখে হাতির কবল থেকে মেথরের ছেলের রক্ষা করলেন, এই মহত্ত্ব দেখে।
প্র: বাবুর কখন রাজপুত যুবককে ক্ষমা করে দিলেন?
উ: যখন রাজপুত যুবক বাবুরের পায়ে পড়ে নিজের অপরাধ স্বীকার করলেন।
প্র: বাবুর রণবীর চৌহানকে কী হিসাবে নিয়োগ করলেন?
উ: রাজার দেহরক্ষী।
প্র: সংগ্রাম সিংহ কে?
উ: রাজপুতনার অন্তর্গত মেবার রাজ্যের অধিপতি।
প্র: 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতায় বাবুরের কী বর্ণিত হয়েছে?
উ: বাবুরের মহানুভবতা। যিনি বাবুরকে হত্যা করতে প্রতিজ্ঞ ছিলেন, তিনি যখন নিজে সে পথ থেকে সরে এসেছেন, তখনই বাবুর তাকে নিজের দেহরক্ষী হিসেবে বরণ করে নিয়ে মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন।

কায়কোবাদ

প্র: কবি কায়কোবাদের জন্ম কত সালে?
উ: ১৮৫৭ সালে।
প্র: তাঁর জন্ম কোথায় হয়?
উ: আসলা পূর্বপাড়া গ্রাম, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।
প্র: তাঁর মূলত কী ছিলেন?
উ: কবি।
প্র: কায়কোবাদের প্রকৃত নাম কী?
উ: কাজেম আল কোরেশী।
প্র: তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা কী?
উ: বালোর পৃহশিক্ষা শেষ করে ঢাকার সেন্ট গ্রোরি স্কুলে ভর্তি হন। পরে 'ঢাকা সপ্রাসা' থেকে এন্ট্রান্স পাস করেন।
প্র: কোন কোন কবির কাব্যপ্রভাব তাঁর উপর বেশি ছিল?
উ: হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেন।
প্র: তাঁর কবিত্ব শক্তির বিকাশ ঘটে কোন কাব্য রচনা করে?
উ: মাত্র তের বছর বয়সে 'বিরহ-বিলাপ' (১৮৭০) লিখে। এটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ।
প্র: তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ দুটো কী কী?
উ: নীতিকাব্য: 'অশ্রুমালা' (১৮৯৫), মহাকাব্য: 'মহাশ্মশান' (১৯০৫)।
প্র: বাঙালি মুসলমান কবিদের মধ্যে প্রথম মহাকাব্য রচয়িতা কে?
উ: কায়কোবাদ।
প্র: বাঙালি মুসলমান কবিদের মধ্যে প্রথম সনেট রচয়িতা কে?
উ: কায়কোবাদ।
প্র: আধুনিক বাংলাসাহিত্যে প্রথম মুসলিম কবি কে?
উ: কায়কোবাদ।
প্র: কায়কোবাদের প্রথম কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ: কায়কোবাদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বিরহ-বিলাপ' (১৮৭০)। তবে অনেক সমালোচকই কাব্যটির নাম 'বিরহ বিলাস' বলেছেন। কবি অবশ্য বলেছেন: 'আমি যখন বার বৎসর বয়স্ক বালক সেই সময় আমার বিরহ-বিলাপ নামক ক্ষুদ্র একখানা কাব্য প্রকাশিত হয়।' কাব্যগ্রন্থটি আজ দুষ্প্রাপ্য।

প্র: 'অশ্রুমালা' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ: কায়কোবাদের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'অশ্রুমালা' (১৮৯৬)। এই কাব্যগ্রন্থের মূল সুর প্রেম। তবে প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণবোধও এ কাব্য খুব শক্ত করা যায়। এই গ্রন্থে কোন ভণ্ড নেই, আছে মানব মনের আশা-আনন্দ-বিরহ, প্রেম-বেদনা ইত্যাদির স্বাভাবিক প্রকাশ। কবি লিখেছেন: 'আজ হয় তারে নিয়ে / বনবাসী হই / চাঁদের এ লোকালয় / এ যে বড় বিষময়।' সমাজ উপস্থাপনা ও সরলতাই এ কাব্যগ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য।
প্র: 'মহাশ্মশান' গ্রন্থটির পরিচয় দাও।
উ: কায়কোবাদের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'মহাশ্মশান' (১৯০৫)। কাব্যটি যাত্রাবাহিকভাবে মহম্মদ রওশন আলী সম্পাদিত 'কোহিনূর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ (১৭৬১) অবলম্বনে কাব্যটি রচিত। কাব্যের তিনটি খণ্ড। প্রথম খণ্ড ২৯ সর্গ, দ্বিতীয় খণ্ড ২৪ সর্গ, তৃতীয় খণ্ড ৭ সর্গ বিশিষ্ট। প্রধান চরিত্রগুলো : এব্রাহিম কার্দি, জোহরা বেগম, হিরণ বালা, আতা খাঁ, লঙ্গ, রত্নছি, সুজাউদ্দৌলা, সেলিনা, আহমদ শাহ্ আব্দালী। এই চরিত্রগুলোর মধ্যে ঐতিহাসিক-অনৈতিহাসিক দুধরনেরই আছে। চরিত্রসৃজনে হিরণ বালা শ্রেষ্ঠ। প্রেমিক আতা খাঁ নিজ পরিচয় গোপন অর্থাৎ প্রতারণার আশ্রয় নিলেও হিরণ বালা জোহরার মত ধর্মনিষ্ঠ থাকে নি। বরং আধুনিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য মানবতাবোধের আলোকে সে বলেছে : 'নিজে প্রেমময় / জগদীশ, প্রেম শ্রেষ্ঠ সর্বধর্ম হতে / হিন্দু মুসলমান করে সৃজেছে কি বিধি / জীব শ্রেষ্ঠ মানবেরে- তোমারে আমারে?' অথচ জোহরা প্রাণাধিক স্বামীর চেয়ে ধর্মকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। এব্রাহিম কার্দি বাহ্যিক কর্তব্যকর্ম করলেও স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যকর্মে ব্যর্থ। 'মহাশ্মশান' মহাকাব্য হিসেবে পরিচিত হলেও একে পরিপূর্ণ মহাকাব্য বলা যায় না। মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্যগুলো এখানে সার্বিকভাবে প্রতিফলিত নয়। একে কাহিনিকাব্য বলা চলে। মুন্সীর চৌধুরীর 'রক্তাক্ত প্রান্তরে'র কাহিনি-উৎস এই গ্রন্থ।

2020/5/12 21:26
Scanned with CamScanner

প্র : কোন ঘটনা অবলম্বনে 'মহাশ্মশান' কাব্য রচিত হয়?
উ : পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের কাহিনি অবলম্বনে।
প্র : তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের নাম লেখ।
উ : 'কুসুমকানন' (১৮৭৩), 'শিবমন্দির' (১৯২১), 'অমিয়ধারা' (১৯২৩) প্রভৃতি।
প্র : নিখিল ভারত সাহিত্য সংঘ কর্তৃক ১৯৩২-এ কোন উপাধিতলো তিনি পান?
উ : 'কাব্যভূষণ', 'বিদ্যাভূষণ' ও 'সাহিত্যরত্ন'।
প্র : তিনি কলকাতায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সম্মেলনের মূল অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কত সালে?
উ : ১৯৩২ সালে।
প্র : তাঁর মৃত্যুতারিখ লেখ।
উ : ২১শে জুলাই, ১৯৫১।

'প্রার্থনা' কবিতা থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'প্রার্থনা' কবিতার লেখক কে?
উ : কায়কোবাদ
প্র : কায়কোবাদের মতে, আমাদের কার কাছে সর্বদা প্রার্থনা করা উচিত?
উ : স্রষ্টার কাছে।
প্র : 'বিভো' কী?
উ : শব্দটি হলো 'বিভু'। এই 'বিভু'র কাব্যিকরূপ 'বিভো'। 'বিভু'র আভিধানিক অর্থ 'বিধাতা', মানে স্রষ্টা।
প্র : 'বিভো, দেহ হৃদে বল।' –এখানে 'দেহ' কী?
উ : এর অর্থ 'দাও'। প্রাগাধুনিক বাংলা কবিতায় ক্রিয়াপদে ও-এর বদলে 'হ' ব্যবহারের রীতি দেখা যায়। যেমন: 'অন্ধজনে দেহ আলো'। উনিশ শতকের বাংলা কবিতাতে কেউ কেউ এই রীতি ব্যবহার করেছেন।
প্র : স্রষ্টার কাছে কারা নিয়সম্বল?
উ : এই জগতের মানুষ।
প্র : স্রষ্টার কাছে কিভাবে প্রার্থনা করা উচিত?
উ : আঁখিতে জল ভাসিয়ে।
প্র : জীবনে মরণে, শয়নে স্বপনে একমাত্র পথের সম্বল কে?
উ : স্রষ্টা।
প্র : জীবনে সকল ক্ষেত্রে কার দুয়ারে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত?
উ : স্রষ্টার।
প্র : স্রষ্টার সৃষ্টি সকল জাতি কাকে ডাকে?
উ : সৃষ্টিকর্তাকে।
প্র : কার অফুরন্ত দয়ায় জগতের সবকিছু চলছে?
উ : স্রষ্টার।
প্র : আমাদের রিক্ত হস্তে পরম ভক্তির সঙ্গে কার কাছে প্রার্থনা করা উচিত?
উ : সৃষ্টিকর্তার।
প্র : প্রার্থনা কবিতাটি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে?
উ : কবির 'অশ্রুমালা' কাব্যগ্রন্থ।
প্র : 'প্রার্থনা' কবিতায় কবি স্রষ্টার প্রতি কেমন মনোভাব প্রকাশ করেছেন?
উ : অপার মহিমা।
প্র : গাছের পাখি, বনের ফুল স্রষ্টার সকল সৃষ্টি কাকে স্মরণ করছে?
উ : বিধাতাকে।
প্র : 'তরুলতা শিরে, তোমারি প্রসাদ'– প্রসাদ কী?
উ : প্রসাদ হলো দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত খাদ্যসামগ্রী, যা দেবতা 'গ্রহণ' করেছেন বলে মনে করা হয়। তবে এখানে ঈশ্বরের সৃষ্ট ফল-ফুল বা সৃষ্টিকে বা অনুগ্রহকে বোঝানো হয়েছে।
প্র : বিশ্বসংসার বলতে কী বুঝিয়েছেন?
উ : স্রষ্টার সৃষ্টির মহাজগতকে।
প্র : 'শোকানল'-এর সন্ধিবিচ্ছেদ কী?
উ : শোক+অনল
প্র : 'অনল' মানে কী?
উ : আগুন
প্র : 'শোকানল'কে সমাস বিচ্ছেদ করলে কী হয়?
উ : শোক রূপ অনল > শোকানল; রূপক কর্মধারয় সমাস।
প্র : 'প্রার্থনা' কবিতার মূলচেতনা কী?
উ : মূলচেতনা হলো: 'দেহ হৃদে বল' অর্থাৎ হৃদয়ে শক্তি দাও বা আত্মশক্তি চাই।

কালীপ্রসন্ন সিংহ

প্র : কালীপ্রসন্ন সিংহের জন্ম কোথায়, কবে?
উ : কলকাতার জোড়াসাঁকোয়; ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে।
প্র : তাঁর শিক্ষার পরিচয় ও পিতার নাম লেখ।
উ : এলি জমিদার নন্দলাল সিংহের একমাত্র সন্তান। নিজের ছয় বছর বয়সে পিতার মৃত্যু হয়। প্রতিষ্ঠানে এবং গৃহশিক্ষক রেখে সংস্কৃত, ইংরেজি, বাংলা ভাষা শিক্ষা লাভ করেন।
প্র : তাঁর প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নাম লেখ।
উ : বাংলা ভাষা অনুশীলনের জন্য 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' (১৮৫৩) স্থাপন; 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' (১৮৫৫) প্রতিষ্ঠা; 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ' (১৮৫৬) স্থাপন।
প্র : মধুসূদনকে কেন তিনি সংবর্ধিত করেন?
উ : বাংলা সাহিত্যে নতুন ধারার মহাকাব্য রচিত হয়েছে এটা বুঝতে পেরে 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকাশিত হওয়া মাত্র, খ্রিষ্টাব্দেই মধুসূদনকে ১৮৬১ 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র পক্ষ থেকে কালীপ্রসন্ন সিংহ সংবর্ধনা জানান।
প্র : 'নীল-দর্পণ'র জন্য তিনি জরিমানার টাকা দেন কেন?
উ : দীনবন্ধুর 'নীল-দর্পণ' (১৮৬০) ইংরেজিতে অনুবাদ করে ছাপার দায়ে প্রকাশক রেভারেন্ড লঙ্ নামক এক পাদ্রিকে (অনুবাদে লেখকের বা অনুবাদকের নাম মুদ্রিত ছিল না বলে তাদের বিচার করা যায় নি) বিচারালয় এক হাজার টাকা জরিমানা করে (১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে জুলাই)। কালীপ্রসন্ন সিংহ বিচারালয়ে উপস্থিত হয়ে নিজে সে অর্থ পরিশোধ করে পরোক্ষভাবে 'নীল-দর্পণে' ব্যক্ত বক্তব্যকে সমর্থন করেন।
প্র : কালীপ্রসন্ন যে দুটি গ্রন্থের জন্য অমর হবেন?
উ : 'হুতোম প্যাঁচার নকশা (১৮৬২), সংস্কৃত মহাভারতের গদ্য-অনুবাদ (১৮৬৬)।
প্র : 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র পরিচয় দাও।
উ : কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় (১৮৬২) অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে সে যুগের সমাজজীবনের ক্ষত নিজের মতো করে তুলে ধরেছেন। 'আলালের ঘরের দুলাল'র চার বছর পরে প্রকাশিত এ গ্রন্থে থেকে লেখক সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি নকশা উপন্যাসে সৃষ্টি করেছেন। সমস্যামূলক বক্তিগত হলো। তারপরও 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' উপন্যাসের মতোই আকর্ষণীয় সুখপাঠ্য। এর কারণ কালীপ্রসন্ন সংস্কৃতগন্ধী পণ্ডিতী আমল বদলে কথ্যভাষায় এই নকশা রচনা করেছেন। প্যারীচাঁদের আলালী ভাষার সাধু ও কথ্য উভয় বাকরীতির মিশ্র প্রয়োগ আছে। কালীপ্রসন্ন এই ভাষাকে আরো স্নিগ্ধতা ও সৌন্দর্য দান করেন। এ কাজটি সম্ভবপর হয় বাক্যের ক্রিয়াপদে সাধু ও কথ্যরীতি মিশ্রণমুক্ত করার কারণে। তিনিই প্রথম কলকাতা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার কথ্যভাষা সার্থকভাবে গ্রন্থে প্রয়োগ করেন।
প্র : কালীপ্রসন্ন অনুসৃত রীতির ভাষাকে কী বলা হয়?
উ : হুতোমী বাংলা।
প্র : তাঁর মৃত্যু হয় কোথায়, কবে?
উ : কলকাতায়; ২৪শে জুলাই, ১৮৭০।

কুসুমকুমারী দাশ

প্র : কুসুমকুমারী দাশের জন্ম কত সালে?
উ : ১৮৮২ সালে।
প্র : তাঁর জন্ম কোথায় হয়?
উ : বরিশাল।
প্র : তাঁর শিক্ষা জীবনের বর্ণনা দাও।
উ : কুসুমকুমারী দাশ কিছুকাল বরিশাল ও পরে কলকাতা বেথুন স্কুলে শিক্ষালাভ করেন।
প্র : তিনি শিশুদের জন্য যে পুস্তকটি রচনা করেন তার নাম কী?
উ : 'কবিতা মুকুল'।
প্র : তাঁর গদ্যগ্রন্থের নাম কী?
উ : 'পৌরাণিক আখ্যায়িকা'।
প্র : যে পত্রিকাগুলোতে তাঁর কবিতা প্রকাশিত হত তার নাম কী?
উ : প্রবাসী, ব্রহ্মবাদী, মুকুল প্রভৃতি।

2020/5/12 21:27
Scanned with CamScanner

প্র : কুসুমকুমারী দাশের বিখ্যাত কবিতা পঙ্‌ক্তির নাম বলো।
উ : 'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে, কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে'।
প্র : কুসুমকুমারী দাশের আর একটি বিশেষ পরিচয় কী?
উ : তিনি কবি জীবনানন্দ দাশের মাতা।
প্র : কুসুমকুমারী দাশের মৃত্যুসাল কত?
উ : ১৯৪৮।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

প্র : কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৮৩৪ সালে বৃহত্তর খুলনা জেলার সেনহাটি গ্রামে।
প্র : তিনি মূলত কী হিসেবে পরিচিত?
উ : কবি ও সাংবাদিক।
প্র : তিনি কোন গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা সম্পাদনা করেন?
উ : সাপ্তাহিক ঢাকা প্রকাশ (১৮৬১)।
প্র : ঢাকা প্রকাশ ছাড়া আর কোন কোন পত্রিকা সম্পাদনা করেন?
উ : মাসিক মনোরঞ্জিকা (১৮৬০); মাসিক কবিতা কুসুমাঞ্জলি (১৮৬১); সাপ্তাহিক বিজ্ঞাপনী (১৮৬৫); বৈভাষিকী (১৮৮৬)।
প্র : তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের নাম কী?
উ : সপ্তাবশতক (১৮৬১)।
প্র : কৃষ্ণচন্দ্র রচিত অন্যান্য গ্রন্থের নাম কী?
উ : রাসের ইতিবৃত্ত (১৮৬৮), মোহভোগ (১৮৭১)।
প্র : তিনি কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ১৯০৭ সালের ১৭ই জানুয়ারি খুলনাতে।

গিরিশচন্দ্র সেন (ভাই)

প্র : গিরিশচন্দ্র সেন কত সালে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৮৩৫ সালে বর্তমান নরসিংদী জেলার পাঁচদোনা গ্রামে।
প্র : তিনি কবে ব্রাহ্মমতে দীক্ষিত হন?
উ : কেশবচন্দ্র সেন ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রভাবে ১৮৭১ সালে ব্রাহ্মমতে দীক্ষিত হয়ে বিভিন্ন ভাষা ও ধর্ম সম্পর্কে পড়ন, পাঠনে আগ্রহান্বিত হন।
প্র : তিনি কোন কোন ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন?
উ : বাংলা, সংস্কৃত, পারসি, আরবি (অবশ্য ভাষা ও ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে শিক্ষালাভ করার জন্য তিনি লক্ষ্ণৌ যান।)
প্র : কী কারণে তিনি চিরদিন অমর হয়ে থাকবেন?
উ : বাঙালি মুসলিমদের জন্য মুসলিম ধর্মগ্রন্থ বঙ্গানুবাদ ও মহাপুরুষদের জীবনী রচনা, বিশেষত বাংলা ভাষায় কোরান শরিফ প্রথম অনুবাদের কারণে।
প্র : গিরিশচন্দ্রের কোরান অনুবাদ সম্পর্কে লেখ।
উ : কর্মটি স্পর্শকাতর, সাহসেরও। যেহেতু ধর্মের বিষয় সেহেতু সাবধানতাও বেশি। গিরিশচন্দ্র ছয় বছর (১৮৮১-'৮৬) পরিশ্রম করে নিজের বিদ্যার উপর সাহস ও দৃঢ়তা রেখে কোরানের প্রথম বঙ্গানুবাদ করেন। তাঁর এই অনুবাদ মুসলিম পণ্ডিতগণ অনুমোদন ও গ্রহণ করেন বিতর্কহীনভাবে গিরিশচন্দ্র জয়মাল্য পান। মওলানা আকরম খাঁ (পরে তিনিও কোরান অনুবাদ করেছেন) গিরিশচন্দ্রের অনুবাদের লিখিত প্রশংসা করেন।
প্র : গিরিশচন্দ্র সেনের মুসলিমদের জন্য রচিত কয়েকটি গ্রন্থ সম্পর্কে লেখ।
উ : * শেখ ফরিদুদ্দিন আত্তারের পারসি ভাষার গ্রন্থ 'তাজকেরাতুল আত্তালিয়া' অবলম্বনে 'তাপসমালা'। 'তাপসমালা' ৯৬ জন মুসলিম সাধকের জীবনচরিত।
* 'মিশকাত শরিফে'র অর্ধেক অনুবাদ করেন 'হাদিস-পূর্ব বিভাগ' নামে।
* শেখ ফরিদুদ্দিন আত্তারের 'মানতেকুহতায়ের' এবং মওলানা জালালুদ্দিন রুমির 'মসনবি শরিফ' পারসি গ্রন্থ থেকে উপাদান নিয়ে লেখেন 'তত্ত্বরত্নমালা'।
প্র : গিরিশচন্দ্র রচিত আর কয়েকটি গ্রন্থের নাম লেখ।
উ : 'হাদিস' বা 'মেসকাত মসাবিহ'; 'মহাপুরুষচরিত'; 'মহাপুরুষ মোহাম্মদ ও তৎপ্রবর্তিত এসলাম ধর্ম'; 'এমাম হাসান ও হোসায়েনের জীবনী'; 'চারটি সাধ্বী মুসলমান নারী'সহ মোট ৪২টি গ্রন্থ তিনি রচনা ও অনুবাদ করেন।
প্র : গিরিশচন্দ্র সেন সম্পর্কে কী বলা হয়?
উ : ধর্মচর্চা যে শুধু আপনধর্মের গুণকীর্তন ও রাষ্ট্রাস্ত্র বর্ণনা নয়, পরধর্ম ও মতের ভালো দিকগুলোর প্রকাশ ও উন্মোচন, গিরিশচন্দ্র তা দেখিয়েছেন। একজন অমুসলমান হয়ে গিরিশচন্দ্র বাঙালি মুসলিমদের সামনে প্রথম উপস্থাপন করলেন তাদের ধর্ম-পুস্তক, তাদের মহাপুরুষ ও শ্রদ্ধেয় নারী বা ধর্মপুরুষদের জীবনী, এ এক অনন্য দৃষ্টান্ত।
প্র : তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই অগস্ট।

গোবিন্দচন্দ্র দাস

প্র : গোবিন্দচন্দ্র দাসের জন্ম কত খ্রিষ্টাব্দে?
উ : ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে।
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : জয়দেবপুর, ভাওয়াল, গাজিপুর।
প্র : তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কতটুকু?
উ : জয়দেবপুর মাইনর স্কুল থেকে ছাত্রবৃত্তি পাস করে ঢাকা মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হয়েও শব ব্যবচ্ছেদের ভয়ে চিকিৎসা বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন।
প্র : গোবিন্দচন্দ্র দাস মূলত কী?
উ : স্বভাবকবি।
প্র : গোবিন্দচন্দ্র দাস রচিত ব্যঙ্গকাব্য কোনটি?
উ : 'মগের মুলুক'।
প্র : গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিতার কাহিনিগুলোর বিষয় কী ধরনের?
উ : নারীভক্তি, পতিপত্নীর প্রেম, ভ্রাতৃস্নেহ, সন্তান বাৎসল্য, বন্ধুপ্রীতি, গার্হস্থ্য জীবনের সুখদুঃখের কাহিনি, পল্লিজীবনের আলেখ্য, জাতীয় উদ্দীপনা ও স্বদেশপ্রেম।
প্র : তাঁর রচিত প্রধান কাব্যগ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : প্রেম ও ফুল (১২৯৪), কুঙ্কুম (১২৯৮), মগের মুলুক (১২৯৯), কস্তুরী (১৩০২), চন্দন (১৩০৩), ফুলরেণু (১৩০৩), বৈজয়ন্তী (১৩১২), শোক সান্ত্বনা (১৩১৬)।
প্র : তিনি কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ১৯১৮ সালে।

গোলাম মোস্তফা

প্র : গোলাম মোস্তফার জন্মসাল কত?
উ : ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দ।
প্র : কোথায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন?
উ : গ্রাম মনোহরপুর, পৈলকুপা, মিলাইদহ।
প্র : তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কতটুকু?
উ : কলকাতা বিপন কলেজ থেকে বি.এ. ও বি.টি ডিগ্রি লাভ।
প্র : তাঁর পেশা কী ছিল?
উ : শিক্ষকতা।
প্র : তাঁর কাব্যের প্রধান বিষয়বস্তু কী?
উ : ইসলাম ও প্রেম।
প্র : তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের পটভূমিকায় প্রচুর পরিমাণে কী রচনা করেন?
উ : ইসলামি ও পাকিস্তানি ভাবধারামূলক সঙ্গীত।
প্র : পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে তিনি কোন ভাষাকে সমর্থন করেন?
উ : উর্দু ভাষাকে।
প্র : গোলাম মোস্তফা রচিত কাব্যগ্রন্থগুলো কী কী?
উ : রক্তরাগ (১৯২৪), খোশরোজ (১৯২৯), কাব্যকাহিনী (১৯৩২), সাহারা (১৯৩৬), হাসনাহেনা (১৯৩৮), বুলবুলিস্তান (১৯৪৯), তারানা ই পাকিস্তান (১৯৫৬), বনি আদম (১৯৫৮), গীতি সঞ্চয়ন (১৯৬৮) ইত্যাদি।
প্র : তাঁর রচিত ও সমাদৃত গদ্যগ্রন্থগুলো কী কী?
উ : রসুলুল্লাহর জীবনীমূলক গ্রন্থ বিশ্বনবী (১৯৪২), ইসলাম ও জেহাদ (১৯৪৭), ইসলাম ও কমিউনিজম (১৯৪৯), আমার চিন্তাধারা (১৯৫২)।
প্র : তিনি কী কী উপাধিতে ভূষিত হন?
উ : ১৯৫২-তে যশোর সাহিত্য সংঘ কর্তৃক কাব্যসুধাকর ও ১৯৬০-এ পাকিস্তান সরকার কর্তৃক সিতারা-ই-ইমতিয়াজ উপাধিতে ভূষিত হন।
প্র : তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ১৩ই অক্টোবর, ১৯৬৪; ঢাকায়।

2020/5/12 21:27
Scanned with CamScanner

চন্দ্রকুমার দে

প্র : চন্দ্রকুমার দে-এর জন্ম সাল কত?
উ : ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দ।
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : গ্রাম রাঘবপুর, কেন্দুয়া, নেত্রকোনা।
প্র : তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কতটুকু?
উ : গ্রামীণ পাঠশালায় সামান্য বিদ্যাশিক্ষা লাভ।
প্র : সুধী সমাজে পরিচিতি লাভ করেন কিভাবে?
উ : ১৯১২ সালে ময়মনসিংহের সৌরভ পত্রিকায় লোকসাহিত্য সম্পর্কে তাঁর রচিত কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে।
প্র : তিনি কিভাবে দীনেশচন্দ্র সেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন?
উ : ১৩২০-এর ফাল্গুন সংখ্যার সৌরভে তাঁর 'মহিলাকবি চন্দ্রাবতী' শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলে তা দীনেশচন্দ্র সেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।
প্র : তিনি কিভাবে পালা সংগ্রহকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন?
উ : দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক তাঁকে মাসিক সত্তর টাকা বেতনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালা সংগ্রাহকের পদে নিযুক্তিদানের পরে।
প্র : তাঁর সংগৃহীত পালাগানগুলো কী কী?
উ : মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দেওয়ানা-ভাবনা, দস্যু কেনারাম, রূপবতী, কঙ্কলীলা, দেওয়ানা মদিনা, ধোপার পাট।
প্র : এগুলো কোন নামে প্রকাশিত হয়?
উ : মৈমনসিংহ-গীতিকা।
প্র : তাঁর সংগৃহীত পূর্ববঙ্গ গীতিকাগুলো কী কী?
উ : মাইষাল বন্ধু, ভেলুয়া, কমলারানী, দেওয়ান ঈসাখাঁ, ফিরোজ খাঁ দেওয়ান, আয়না বিবি, শ্যাম রায়, শিলাদেবী, আন্ধা বন্ধু, বহুলার বারমাসী, রতনঠাকুর, পীর বাতাসী, জিবালনি, সোনারামের জন্ম, ভারাইয়া রাজা।
প্র : গীতিকা সংগ্রহ ছাড়াও চন্দ্রকুমার দে আর কী রচনা করেছেন?
উ : কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ।
প্র : তাঁর মৃত্যু সাল কত?
উ : ময়মনসিংহ, ১৯৪৬।

জগদীশ গুপ্ত

প্র : জগদীশ গুপ্তের জন্মসন কত?
উ : কুষ্টিয়া, ২২ আষাঢ় ১২৯২ (ছন ১৮৮৬)।
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : আমলাপাড়া, কুষ্টিয়া।
প্র : জগদীশ গুপ্তের পৈতৃক নিবাস কোথায়?
উ : খোর্দ মেঘচারসি গ্রাম, ফরিদপুর।
প্র : তিনি মূলত কী?
উ : কথাসাহিত্যিক ও ছোটগল্পের বিশিষ্ট শিল্পী।
প্র : তাঁর রচিত ছোটগল্পগুলো সমৃদ্ধ কেন?
উ : গভীরজীবনবোধ, সুঠাম কাহিনিবিন্যাস ও চরিত্রচিত্রণের নৈপুণ্যের জন্যে।
প্র : জগদীশ গুপ্তের শিল্পকর্ম কেন অসাধারণ সৃষ্টি?
উ : মনোবৈকল্য ও মনোবিশ্লেষণ এবং দুঃখময়তার নিপুণ বর্ণনার জন্য।
প্র : তাঁর গল্পে কোন কারণ বিশ্লেষিত হয়েছে?
উ : সামাজিক অন্যায় অবিচারের চাইতে অদৃষ্টলিপিই দুঃখময়তার কারণ।
প্র : তাঁর রচিত গল্পগ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ: বিনোদিনী (১৯২৭), জাগের বাহিরে (১৯২৯), শ্রীমতী (১৯৩১), উদয়লেখা (১৯৩৩), শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী স্বনির্বাচিত গল্প (১৯৪৭)।
প্র : তাঁর রচিত উপন্যাসগুলোর নাম কী?
উ : অসাধু সিদ্ধার্থ (১৯২৯), রোমন্থন (১৯৩০), লঘুগুরু (১৯৩১), দুলালের দোলা (১৯২৯), নিষেধের পটভূমিকায় (১৯৫২), কলঙ্কিত তীর্থ (১৯৬০)।
প্র : তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : কলকাতা, ১৯৫৭।

জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন

প্র : জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সনের জন্মতারিখ কত?
উ : ৭ই জানুয়ারি, ১৮৫১।
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ডাবলিন, আয়ারল্যান্ড।
প্র : তিনি মূলত কী?
উ : প্রাচ্যতত্ত্ববিদ ও ভাষাতাত্ত্বিক।

প্র : তিনি কী অনুশীলনে বিশেষভাবে উৎসাহী হিলেন?
উ : ভারতীয় ভাষা শিক্ষা ও অনুশীলনে।
প্র : তিনি কোন কোন ভারতীয় ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন?
উ : সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দি, মৈথিলি, মগধি, ভোজপুরি, ছত্তিশগড়ি ও বাংলা।
প্র : রংপুরের উপভাষা সম্পর্কে তাঁর গবেষণামূলক আলোচনা কবে কোথায় প্রকাশিত হয়?
উ : ১৮৭৭-এ বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায়।
প্র : তাঁর কোন গ্রন্থটি ১৮৮১-৮২-তে এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়?
উ : বিদ্যাপতির পদাবলি সম্বলিত An Introduction to the Maithile Language of North Bihar.
প্র : তাঁর রচিত কোন গ্রন্থটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়?
উ : ১৮৮৩-৮৭-তে আট খণ্ডে প্রকাশিত হয় Seven Grammars of the Dialects and Subdialects of the Bihar Language.
প্র : তাঁর রচিত অপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম কী?
উ : Maithili Grammar for an Introduction to the Maithili Dialect of the Bihari Language of North Bihar.
প্র : তাঁর রচিত বিহারের জনজীবনের ওপর আঞ্চলিক শব্দ সম্বলিত তথ্যবহুল গ্রন্থটি কী?
উ : Bihar Peasent Life (১৮৮৫)।
প্র : ভারতে ভাষাসমীক্ষার প্রয়োজনে তাঁর তত্ত্বাবধানে কী গঠিত হয়?
উ : Linguistic Survey of India.
প্র : এই সংস্থা কী করে?
উ : সংস্থার পক্ষে ১৮৯৮-১৯০২ পর্যন্ত ভাষার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়।
প্র : তিনি কবে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন?
উ : ১৯০৩ সালে।
প্র : তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি কী?
উ : তৎকালীন ভারতে প্রচলিত ১৭৯টি ভাষা ও ৫৪৪টি উপভাষার বিবরণ সম্বলিত Linguistic Survey of India নামক ভাষাসমীক্ষামূলক গবেষণাকর্ম (খণ্ড ১১টি) প্রকাশ : ১৯০৩।
প্র : কাশ্মিরি ভাষা সম্পর্কে তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ কী কী?
উ : Essays on Kashmiri Grammar (১৮৯৯), A Manual of the Kashmiri Language (১৯১১) ও তার খসড়া প্রকাশিত A Dictionary of the Kashmiri Language (১৯১৬-১৯৩২)।
প্র : তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থগুলো কী কী?
উ : The Kashmiri Ramayana, Comprising the Sriramavataracarita and the Lava-Kusayudha Carita of Divakara Prakasa Bhatta. (১৯০০)।
প্র : তাঁর সম্পাদিত অন্য গ্রন্থ কী?
উ : হিন্দি কবি মালিক মুহাম্মদ জায়সীর পদুমাবৎ।।
প্র : তিনি কী কী সম্মানসূচক ডিগ্রি লাভ করেন?
উ : ডাবলিন, অক্সফোর্ড, পাটনা ও হালে (জার্মানি) বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সম্মানসূচক ডক্টরেট, ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত Order of Merit উপাধি গ্রহণ (১৯২৮), সিআইই উপাধি লাভ (১৮৮৪), কেসিএসআই উপাধি লাভ (১৯১২)।
প্র : তিনি কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ৭ই মার্চ, ১৯৪১।

জন ক্লার্ক মার্শম্যান

প্র : জন ক্লার্ক মার্শম্যানের জন্মতারিখ কত?
উ : ১৮ই অগাস্ট, ১৭৯৪
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ব্রডমিড, ইংল্যান্ড।
প্র : তিনি কোন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করেন?
উ : শ্রীরামপুর মিশনে।
প্র : তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিতে অবদান রাখেন কত বছর?
উ : প্রায় ত্রিশ বছরকাল।
প্র : তিনি কী কী পত্রিকা সম্পাদনা করেন?
উ : দিগদর্শন, সমাচার দর্পণ, ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া ও গর্ভনমেন্ট গেজেট।

2020/5/12 21:27
Scanned with CamScanner

প্র : 'সমাচার দর্পণে'র পরিচয় দাও।
উ : 'সমাচার দর্পণ' (১৮১৮) শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত জন ক্লার্ক মার্শম্যান সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকা। প্রথম সংখ্যার প্রকাশ ২৩শে মে, ১৮১৮। পরে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, তারিণীচরণ শিরোমণি প্রমুখ এই পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাংলা গদ্যের প্রথম যুগের ইতিহাসে এবং বাংলা সংস্কৃতির ইতিহাসে এই পত্রিকার গুরুত্ব যথেষ্ট।
প্র : তিনি কী কী ভাষায় দক্ষ ছিলেন?
উ : ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি, ফরাসি ও সংস্কৃত ভাষায়।
প্র : তিনি কী কী জনকল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন?
উ : তৎকালে রেল, টেলিযোগাযোগ ও শিক্ষা সংক্রান্ত প্রস্তাবের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন।
প্র : তাঁর রচিত গ্রন্থাদি কী?
উ : ভারতবর্ষের ইতিহাস (২খণ্ড), পুরাবৃত্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (১৮৩৩), জ্যোতিষ গোলাধ্যায়, সদ্‌গুণ ও বীর্যের ইতিহাস (১৮২৯), ঈশপস ফেবলস্, ক্ষেত্রবাগান বিবরণ, Murray's Grammar ইত্যাদি।
প্র : তিনি কত সালে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন?
উ : ১৮৫২ সালে।
প্র : তিনি কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ৮ই জুলাই, ১৮৭৭।

জসীমউদ্‌দীন

প্র : জসীমউদ্‌দীনের জন্মতারিখ কবে?
উ : ১লা জানুয়ারি, ১৯০৩।
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : মাতুলালয়, তাম্বুলখানা গ্রাম, ফরিদপুর।
প্র : তাঁর মাতা-পিতার নাম কী?
উ : আমেনা খাতুন; মৌলবি আনসার উদ্‌দীন আহমদ।
প্র : তাঁর পৈতৃক নিবাস কোথায়?
উ : গোবিন্দপুর গ্রাম, ফরিদপুর।
প্র : জসীমউদ্‌দীনকে কী বলা হয়?
উ : পল্লিকবি। তবে অনেক মনে করেন, তিনি 'আধুনিক কবি'।
প্র : তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা কী?
উ : ১৯৩১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ. ডিগ্রি লাভ।
প্র : তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকার সম্পাদক পদে নিযুক্তি লাভ করেন কবে আনুকূল্যে?
উ : ড. দীনেশচন্দ্র সেনের।
প্র : তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোথায় নিযুক্ত হন কোন বিভাগে ও কত সালে?
উ : বাংলা বিভাগে, ১৯৩৮-এ।
প্র : তিনি সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের কোন বিভাগে কর্মরত ছিলেন?
উ : প্রচার বিভাগের Additional Song Publicity Organiser পদে।
প্র : তাঁর কবি প্রতিভার বিকাশ ঘটে কখন?
উ : ছাত্রজীবনেই।
প্র : তাঁর ছাত্রাবস্থায় কোন কবিতা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্য তালিকাভুক্ত হয়?
উ : 'কবর' কবিতা।
প্র : কবর কবিতাটি প্রথম কোন পত্রিকায় ছাপা হয়?
উ : 'কল্লোল' পত্রিকায়।
প্র : 'কবর' তাঁর কোন কাব্যভুক্ত কবিতা?
উ : প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'রাখালী' (১৯২৭)।
প্র : তাঁর রচিত কবিতাগুলোতে কুশলতার সঙ্গে কী অঙ্কিত হয়েছে?
উ : গ্রামীণ জীবনের নিখুঁত চিত্র।
প্র : তাঁর কবিতাগুলোতে গ্রামীণ জীবনের নিখুঁত চিত্র যে কুশলতার সাথে অঙ্কিত হয়েছে তাতে কীসের ছাপ সুস্পষ্ট?
উ : আধুনিক শিল্প-চেতনার ছাপ।
প্র : তাঁর বিখ্যাত গাথাকাব্যগুলো কী?
উ : নক্সীকাঁথার মাঠ (১৯২৯), সোজন বাদিয়ার ঘাট (১৯৩৪), মা যে জননী কান্দে (১৯৬৩) ইত্যাদি।
প্র : 'নক্সীকাঁথার মাঠ'—এর পরিচয় দাও।
উ : 'নক্সীকাঁথার মাঠ' (১৯২৯) গ্রন্থের প্রথম অংশে আছে চাষির ছেলে রূপা ও পাশের গ্রামের মেয়ে সাজুর প্রথম পরিচয় থেকে তাদের অনুরাগের বিকাশ ও বিবাহ এবং কয়েক মাসের সুখময় জীবনের কথা। দ্বিতীয় অংশের বিষয় তাদের বিচ্ছেদ। পূর্ববঙ্গ গীতিকায় যে বর্ণনাভঙ্গি এবং ভাষারীতি; জসীমউদ্‌দীন তাকে অবলম্বন করেছেন। গ্রামীণ জীবনের মাধুর্য ও কারুণ্য, বৈচিত্র্যহীন ক্লান্তিকরতা এবং মানুষের অসহায়তা এই কাব্যের গুণকথন। আধুনিক বাংলা কাব্যের ইতিহাসে এই কাব্য এক বিশেষ স্বাতন্ত্র্য নিয়ে লেখা হয়েছিল।
প্র : 'সুচয়নী' কোন ধরনের গ্রন্থ?
উ : রবীন্দ্রনাথের যেমন 'সঞ্চয়িতা', নজরুলের 'সঞ্চিতা' জসীমউদ্‌দীনের তেমনি 'সুচয়নী'। এটি কবির নির্বাচিত কবিতার সংকলন গ্রন্থ।
প্র : তাঁর রচিত জনপ্রিয় খণ্ড কবিতার সংকলনগুলো কী কী?
উ : রাখালী (১৯২৭), বালুচর (১৯৩০), ধানক্ষেত (১৯৩৩), রূপবতী (১৯৪৬), মাটির কান্না (১৯৫৮) ও সুচয়নী (১৯৬১)।
প্র : তাঁর রচিত সুখপাঠ্য গদ্যগ্রন্থগুলো কী?
উ : যাঁদের দেখেছি ('স্মৃতিকথা ১৯৫২), ঠাকুর বাড়ির আঙিনায় ('স্মৃতিকথা ১৩৬৮), জীবন কথা (আত্মজীবনী ১৯৬৪) ইত্যাদি।
প্র : তাঁর রচিত ভ্রমণকাহিনিগুলো কী?
উ : চলে মুসাফির (১৯৫২), হলদে পরীর দেশ (১৯৬৭), যে দেশে মানুষ বড় (১৯৬৮) প্রভৃতি।
প্র : তাঁর রচিত শিশুতোষ গ্রন্থগুলো কী?
উ : হাসু (১৯৩৮), এক পয়সার বাঁশী (১৩৫৬), ডালিমকুমার (১৯৫১)।
প্র : তাঁর রচিত নাটকগুলো কী কী?
উ : পল্লীপাড় (১৯৫০), বেদের মেয়ে (১৯৫১), মধুমালা (১৯৫১), পল্লীবধূ (১৯৫৬), গ্রামের মায়া ইত্যাদি।
প্র : তাঁর রচিত একমাত্র উপন্যাসের নাম কী?
উ : বোবা কাহিনী (১৯৬৪)।
প্র : 'বোবা কাহিনী' উপন্যাসের পরিচয় দাও।
উ : জসীমউদ্‌দীন রচিত 'বোবা কাহিনী' (১৯৬৪) উপন্যাসে মহাজনী শোষণের কারণে গ্রামের প্রান্তিক চাষি আজহারের ভূমিহীন হওয়া, শহরের সুবিধাবাদী উকিল ও ভণ্ড ধার্মিক কর্তৃক মেধাবী বছির নিগ্রহ ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। উপন্যাসের কয়েকটি চরিত্র : বছির, আজহার, আরজান, রহিমুদ্দিন। উপন্যাসে কোন জটিলতা নেই। নিছক গল্প ও সাদামাটা একটি গল্প আছে উপন্যাসটিতে।
প্র : তাঁর রচিত গল্পের সংকলনের নাম কী?
উ : ডালিম গাছের সংকলনের নাম কী? (১৯৬৪), জাদুশাল (১৯৫৫), নকশির পাড় (১৯৬৪), জাদুশাল (১৯৬৮) ইত্যাদি।
প্র : তাঁর রচিত জনপ্রিয় হাস্যরসাত্মক বইয়ের নাম কী?
উ : বাঙালির হাসির গল্প।
প্র : 'নক্সী কাঁথার মাঠ' (১৯২৯) কাব্যটি কী নামে ইংরেজিতে অনূদিত ও প্রকাশিত হয়?
উ : 'The Field of the Embroidered Quilt'.
প্র : কে অনুবাদ করেন?
উ : E.M. Milford. ই. এম. মিলফোর্ড।
প্র : তিনি কোন আন্দোলনের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন?
উ : বাঙালির জাতিসত্তা বিকাশের আন্দোলনের।
প্র : তিনি কোন সমাজব্যবস্থার সমর্থক ছিলেন?
উ : সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার।
প্র : তিনি কী কী সম্মাননসূচক ডিগ্রিলাভ করেন?
উ : বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মাননসূচক ডি.লিট. ডিগ্রি ও সাহিত্য সাধনার স্বীকৃতি স্বরূপ একুশে পদক (১৯৭৬)।
প্র : তাঁর মৃত্যু তারিখ কত?
উ : ১৯৭৬-এর ১৩ই মার্চ দিবাগত রাতে অর্থাৎ ১৪ই মার্চ।
প্র : তাঁকে কোথায় সমাহিত করা হয়?
উ : ১৪ই মার্চ (১৯৭৬) ফরিদপুরের আখিকাপুর।

'রুপাই' কবিতা থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'রুপাই' কবিতাটি কে লিখেছেন?
উ : কবি জসীমউদ্‌দীন। তবে জানা থাকা দরকার, 'রুপাই' নামে এই কবির পৃথক কোনো কবিতা নেই। 'নক্সীকাঁথার মাঠ' নামে কবির যে কাব্যগ্রন্থ রয়েছে, সেখান থেকে অষ্টম শ্রেণিতে 'রুপাই' শিরোনামে খণ্ডিতাকার কবিতা সংকলিত হয়েছে।
প্র : চাষার ছেলে রুপাইয়ের রূপ এই কবিতায় কিভাবে বর্ণিত হয়েছে?
উ : রুপাইয়ের মাথার চুল লম্বা; তার মুখ ফুলের চেয়েও সুন্দর তাই ভ্রমর ভুল করে

2020/5/12 21:27
Scanned with CamScanner

তার মুখে বসে; তার মুখের মায়া কাঁচা ধানের পাতার মতো; নতুন ঘাসের ছায়ার স্নিগ্ধতা আছে তার মুখে; তার বাহু দুটো জাদি গাউছের ডগার মতো সরু; শরীরটি তমাল গাছের মতো প্রশস্ত; তার গায়ের রং ও লাবণ্য যেন মেঘের বুকে তেল মাখানো এবং সেখানে বিজলির আলো পড়েছে।

প্র : কৃষকের মুখে কখন হাসি ফোটে?

উ : যখন ফসলের ক্ষেতে কাঁচা ধানের চারা গজায়।

প্র : কাঁচা ধানের পাতার মতন কচি কাদের মুখের মায়া?

উ : রুপাইয়ের

প্র : রুপাইয়ের বাহু মুখানি কবি কিসের সাথে তুলনা করেছেন?

উ : লাউয়ের কচি ডগার সাথে।

প্র : কাদের শ্রমেই সভ্যতার ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে?

উ : কৃষকের

প্র : কবির মতে আমাদের দেশের সোনার ছেলে কারা?

উ : কৃষকরা

প্র : কৃষকের সোনার ছেলে কিভাবে এই ভুবন জয় করবে?

উ : ফসলের মাঠে সোনার ফসল ফলিয়ে।

প্র : পৃথিবীর সকল কেতাব বা গ্রন্থের লেখা কালো– কবি এই কালো কে কিসের সাথে তুলনা করেছেন?

উ : রোদে পুড়ে মাঠে কাজ করতে কৃষকের শরীরের রং কালো হয় যায়। তাই কবি কৃষকের কালো শরীরের সাথে তুলনা করেছেন।

প্র : রুপাই কবিতায় কবির মতে জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ কারা?

উ : কৃষক

প্র : কৃষকরা কিভাবে ভুলাবে সবার মন?

উ : তারা সোনার হাতে সোনার ফসল ফলিয়ে সবার মন ভুলাবে।

প্র : কবির দৃষ্টিতে কৃষক দামী বলে গণ্য হয়েছে কেন?

উ : কৃষক যেমন মাঠে সোনার ফসল ফলাতে পারে তেমনি জারি গান সারি গান গেয়ে সকল মানুষের মন জয় করতে পারে। তাই কবি তাঁর দৃষ্টিতে কৃষকদের দামী বলেছেন।

প্র : শোকগীতি কী?

উ : কারবালার শোকাবহ ঘটনামূলক গান।

প্র : 'রুপাই' কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে কী আছে?

উ : দ্বিতীয় স্তবকে আছে, কালো রঙের মাহাত্ম্য বর্ণন।

প্র : কালো রঙের কেমন উল্লেখ আছে এই কবিতায়?

উ : মানুষের চোখের তারা কালো, আর এই কালো তারা দিয়েই মানুষ জগতের সবকিছু দেখে; পবিত্র গ্রন্থগুলোও কালো কালিতে লিখিত; জন্মের আগেও কালো অন্ধকার মাতৃগর্ভে থাকে, মৃত্যুর পরও জগৎ আঁধার হয়ে যায়।

প্র : রামধনুক কী?

উ : 'রামায়ণে' রামচন্দ্রের হাতে যে ধনুক আছে তাকেই রামধনুক বলে। হালকা বৃষ্টির পর রোদ উঠলে আকাশে যে ধনুকসদৃশ বাঁকা রঙিন আলপনা দেখা যায়, সেটির নাম 'রামায়ণে'র মিথ অনুসারে 'রামধনুক' বলা হতো। অর্থাৎ ইংরেজি 'রেইনবো'ই হলো 'রামধনুক'। নজরুল, জসীমউদ্‌দীনসহ বহু কবি-সাহিত্যিক 'রামধনুক' কথাটি তাঁদের সৃষ্টিতে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু বাংলাদেশে এই 'রামধনুক' শব্দটি এখন আর ব্যবহার হয় না। একে করা হয়েছে 'রংধনু'। এর ফলে শব্দটি পৌরাণিক অর্থদ্যোতনা হারিয়ে শুধু রং-প্রকাশক হয়ে উঠেছে।

প্র : 'কালো যেজন আলো বানায়, ভুলায় সবার মন / তারির পদ-রজের রাগি লুটায় বৃন্দাবন'– এখানে কী বলা হয়েছে?

উ : এখানে কৃষ্ণের রূপকল্প তৈরি করা হয়েছে। কৃষ্ণ যেমন কালো, কিন্তু তিনি সবার মন আলো করেন, সবার মন হরণ করেন, তাঁর পায়ের ধুলো পেতে বৃন্দাবনসহ অন্যস্থানের মানুষ লুটিয়ে পড়ে, কালো বলে মোটেও হেলাফেলা করে না– রুপাইও তেমনি। অর্থাৎ রুপাইয়ের কালো রূপকে মাহাত্ম্য দেবার জন্য এখানে ভগবান কৃষ্ণের প্রসঙ্গ আনা হয়েছে।

প্র : 'সিনান্' কী?

উ : স্নান শব্দের অর্ধতৎসম রূপ। মধ্যযুগে শব্দের এই রূপটি খুব ব্যবহার হয়েছে।

(স্নান' থেকে 'সিনান্' থেকে 'সান' বা 'চান')

প্র : 'জারি গান' কী?

উ : এই গান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা পাঠের জন্য দ্রষ্টব্য: বর্তমান গ্রন্থের শেষ দিকে 'বাংলা গানের ইতিহাস' অংশ।

'পল্লিজননী' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : মাতা কার শিয়রে বসে আছেন?

উ : রুগ্ণ ছেলের শিয়রে।

প্র : ঘুমে কার চোখের পাতা ঢুলছে?

উ : মাতার।

প্র : নিবু নিবু দীপ কোথায় জ্বলে আছে?

উ : অসুস্থ ছেলের শিয়রে।

প্র : ভয়ে কার পরান দোলে?

উ : বিরহী মায়ের।

প্র : অন্ধকার রাতে কাদের গান জমাট বেঁধেছে?

উ : বুনো মশকের গান।

প্র : কঠোর পচান পাতার ঘ্রাণ কোথা থেকে আসছে?

উ : এঁদো ডোবা হতে।

প্র : কুঁড়ে ঘরে বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঘরে কী ঢুকছে?

উ : শীতের বায়ু।

প্র : শিয়রে বসে মাতা কী গুণছেন?

উ : অসুস্থ ছেলের আয়ু গুণছেন।

প্র : রুগ্ণ ছেলের গালের রক্ত কেমন?

উ : পাণ্ডুর।

প্র : নামাজের ঘরে জননী কেন মানত করে?

উ : অসুস্থ ছেলের রোগ ভালো করে দিতে।

প্র : বাঁশ বনে কোন পাখি ডাকে?

উ : কানা কুয়ো পাখি।

প্র : বাদুরের পাখার বাতাসে কী হেলে পড়ে?

উ : সুপারির বন।

প্র : রুগ্ণ বালক কার সঙ্গে খেলা করতে চায়?

উ : সমবয়সী ছেলে করিমের সঙ্গে।

প্র : কার ঝাড়া পেলে রুগ্ণ ছেলেটি ভালো হবে বলে মনে হয়?

উ : রহিম চাচার।

প্র : রুগ্ণ খোকা আর মাকে কী নয় করে রাখার অনুরোধ করে?

উ : সাতটি।

প্র : রুগ্ণ ছেলে তার মাকে সাত-সাতি দিনা করে কী রাখতে বলে?

উ : চাঁদের দোয়া বেঁধে রাখার জন্য।

প্র : অসুস্থ বালকটি কোন্না ঘরে কী রাখতে বলে?

উ : খেঁজুর গুড়ের নরা পাটালি।

প্র : অসুস্থ বালকটি কী সাজিয়ে তার সামনে রাখতে বলেছে?

উ : ফুলখুরি সিকা।

প্র : বালকটির কোঁচ ভরা কোন ফল ঝামুর ঝামুর বেজেছিল?

উ : বেদুল ফল।

প্র : দরিদ্র মাতা কোন উৎসবে ছেলেকে পুতুল কিনে দিতে পারেন নি?

উ : আড়তের উৎসবে।

প্র : দুখিনী মায়ের জ্বালা দ্বিগুণ বাড়তো কেন?

উ : ছেলের কথার উত্তর দিতে।

প্র : দুখিনী মাতা কোন সুরকে অকল্যাণের মনে করেন?

উ : ঘরের চালে হুতুমের ডাককে।

প্র : পাঁচা ডোবা থেকে কেমন করে বিরহিণী ডাক ডাকছে?

উ : ঝুরি ঝুরি।

প্র : ঝুরি'র বাচ্চা কারা চুরি করেছে?

উ : কৃষাণ-ছেলেরা।

প্র : বনে কোন ধরনের পাতা ঝরে পড়ছে?

উ : বুড়ো পাতা।

প্র : প্রদীপের তেল কার সঙ্গে যুদ্ধ করে ফুরিয়ে এসেছে?

উ : রাতের আঁধারের সঙ্গে।

প্র : 'পল্লিজননী' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত?

উ : 'রাখালী' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত।

প্র : 'কোথা সারা কার' অর্থ কী?

উ : কারো কোনো সাড়া-শব্দ নেই।

প্র : রোগগ্রস্ত অর্থে রুগ্ন, রুগ্ন নাকি রুগ্ণ কোন বানান শুদ্ধ?

উ : রুগ্ণ শুদ্ধ বানান।

প্র : 'এদো ডোবা' কী?

উ : শুপরিচ্ছন্ন ডোবা।

2025/12 21:27

Scanned with CamScanner

প্র : 'মারে' কী?
উ : মাগো এর আঞ্চলিক ব্যবহার। এটা তুচ্ছার্থে নয়।
প্র : পাতুর গাল কেন?
উ : রক্তহীন শ্বেত বর্ণ ধ-ত।
প্র : আলা রসুল কী?
উ : আল্লা > আলা: আঞ্চলিক রূপ। এর সঙ্গে রসুল যুক্ত।
প্র : কলা কুয়ো অর্থ কী?
উ : ভয়ংকর শব্দ উদ্রেগকারী এক জাতীয় নিশিপক্ষী।
প্র : 'চলে বুনো পথে জোনাকি মেয়েরা কুয়াশা কাফন ধরি' কী?
উ : এটি কবির কল্পনা। কুয়াশা পড়ছে আর জোনাকি জ্বলছে। কবি কল্পনা করছেন, মেয়ে জোনাকিরা বনের পথে চলছে এবং কাফনের কাপড় তারা ধরে আছে। এটি অমঙ্গলকর মনে হয়েছে পল্লিজননীর কাছে।
প্র : ট্যাপের মোয়া কী?
উ : শাপলা ফুল থেকে উৎপন্ন বীজ থেকে এক ধরনের বৈ। সেই বৈ দিয়ে তৈরি মোয়াকে ট্যাপের মোয়া বলে।
প্র : সাত-নরি কী?
উ : সাত প্যাঁচবিশিষ্ট। সমতুল্য: সাত-নরি হার।
প্র : হুরুমের কোলা কী?
উ : কোলা অর্থ পেটমোটা বড় মাটির জালা বিশেষ। হুরুম অর্থ সম্ভ্রান্ত, এখানে কারুকাজখচিত অর্থে। 'হুরুমের কোলা' হলো কারুকাজখচিত পেটমোটা বড় মাটির জালা।
প্র : 'এক কোঁচ ভরা বেথুল তাহার ঝামুর ঝুমুর বাজে,'– কী বোঝানো হয়েছে?
উ : ছেলেটি তার কাপড়ের (এখানে অনুমান করা যায় লুঙ্গি) কোঁচে বেথোশাক নিয়ে এসেছে এবং সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় গ্রামের নরু পথচ্যুত হয়ে শুকনো পাতার ওপর চলতে গিয়ে পাতার ঝামুর ঝুমুর শব্দ উঠেছে।
প্র : 'মোসলমানের আড়ঙ দেখিতে নাই।'– কী?
উ : কবি এখানে গ্রামে প্রচলিত একটি অন্ধবিশ্বাসকে সামনে এনে মানুষ প্রশ্নপ্রবণ থেকে রক্ষা করতে চেয়েছেন। এক সময় মৌলভিদের কেউ কেউ এটা প্রচার করতেন, মেলা বা আড়ঙ হিন্দুদের মুসলমানের জন্য নয়। অনেক অশিক্ষিত মুসলিম সরল বিশ্বাসে সে কথা মানতেন। এই বিশ্বাসটি বাস্তবতা বোঝাবার জন্য চেয়েছেন গ্রামীণ কবি এখানে কাজে লাগাতে। কিন্তু ছেলেটিও তার চেয়ে কম নয়। করিম, আজিজ গ্রামুখের উদাহরণ দিয়ে মাকে সে ঠিকই বুঝিয়েছে যে মেলা বা আড়তে যাওয়ার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক নেই।
প্র : হুতুম কী?
উ : আতঙ্ক সৃষ্টি করে ডাকা এক প্রকার প্রাণী পেচক।
প্র : 'ঘরের চালেতে হুতুম ডাকিছে, ... তাহার বাচ্চা করেছে চুরি।'– অংশটির ব্যাখ্যা কী?
উ : এই কবিতার সর্বাপেক্ষা বিকট-প্রতীক এটি। কৃষকের ছেলেরা বাচ্চা চুরি করায় মা পেচক প্রবলভাবে শোকার্ত। এই মা পেচক পল্লিজননীর প্রতীক। মা পেচক প্রথমে ঘরের চালে ডাকলে পল্লিজননী সেটাকে তাড়িয়ে দেন। কিন্তু এর কিছুক্ষণ পর এদো ডোবার ধারে বসেই সন্তানের জন্য আবার বিলাপ করতে থাকে পেচকটি। লক্ষণীয়, ঘরে মর্মবেদনায় পুড়ছেন পল্লিজননী আর বাইরে শোকে কাতর মা পেচক।

জহির রায়হান

প্র : জহির রায়হানের জন্মতারিখ কবে?
উ : ১৯শে অগস্ট, ১৯৩৫।
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : মজুপুর গ্রাম, ফেনি, নোয়াখালি।
প্র : জহির রায়হানের প্রকৃত নাম কী?
উ : মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ।
প্র : শহীদুল্লা কায়সারের সঙ্গে জহির রায়হানের সম্পর্ক কী?
উ : তাঁরা উভয়ে সহোদর (ভ্রাতা) ছিলেন।
প্র : জহির রায়হান মূলত কী?
উ : কথাশিল্পী ও চলচ্চিত্র পরিচালক।

প্র : তাঁর শিক্ষাক্ষেত্রে যোগ্যতা কতটুকু?
উ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় অনার্স ও এম.এ. পাস (১৯৫৮)।
প্র : তিনি কোন আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন?
উ : ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে।
প্র : তিনি কখন চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করেন?
উ : ১৯৫৮-র শেষের দিকে।
প্র : তাঁর প্রথম পরিচালিত ছবি কোনটি?
উ : কখনো আসে নি (১৯৬১)।
প্র : তাঁর পরিচালিত অন্য ছবিগুলো কী?
উ : তাঁর পরিচালিত অন্য ছবিগুলো হলো– কাজল (১৯৬২), কাঁচের সেয়াল (১৯৬৩), বাহানা (১৯৬৫), বেহুলা (১৯৬৬), আনোয়ারা (১৯৬৭), সঙ্গম (১৯৬৮), জীবন থেকে নেয়া (১৯৭০) ইত্যাদি।
প্র : তিনি বাংলাদেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যার যে প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করেছেন তার নাম কী?
উ : Stop Genocide.
প্র : তিনি তৎকালীন সমগ্র পাকিস্তানে প্রথম কোন রঙিন ছবি সৃষ্টি করেন?
উ : সঙ্গম (টেকনিকালার)।
প্র : তাঁর সৃষ্ট প্রথম সিনেমাস্কোপ ছবি কোনটি?
উ : বাহানা।
প্র : তাঁর কোন ছবিটি শ্রেষ্ঠ বাংলা ছবি হিসেবে নিগার পুরস্কার লাভ করে?
উ : কাঁচের দেয়াল।
প্র : তাঁর রচিত উপন্যাসগুলোর নাম কী?
উ : তুষা (১৩৬২), শেষ বিকেলের মেয়ে (১৩৬৭), হাজার বছর ধরে (১৩৭১), আরেক ফাল্গুন (১৩৭৫), বরফ গলা নদী (১৩৭৬), আর কত দিন (১৩৭৭) ও কয়েকটি মৃত্যু (১৩৮২)।
প্র : 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের পরিচয় দাও।
উ : আবহমান বাংলার জীবন ও জনপদ 'হাজার বছর ধরে' (১৯৬৪) উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য। নদী তীরবর্তী প্রকৃতির কোলে উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী বিকশিত। এর ভাষা কাব্যিক, গতিশীল ও সুখপাঠ্য। উপন্যাসে যে জীবন ও জনপদের বর্ণনা আছে তা বাঙালিদের আত্মমনন্দের। এই উপন্যাসে লেখক নিম্নবরগদের তা ফুলে ধরেছেন। তবে উপন্যাসের সার্বিকতা যেন মৃত ও বিবর্ণ।
প্র : 'আর কতদিন' উপন্যাসের পরিচয় দাও।
উ : মুক্তকালীন বাস্তবতা, শাশ্বত মানবতার আর্তি ও শান্তির পক্ষে জোরালো আবেদন নিয়ে জহির রায়হানের 'আর কত দিন' উপন্যাসটি ১৯৭০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির কাহিনি সংঘটনের বিস্তারিক বর্ণনা, কাহিনি শুরুর কোনো স্থান-কাল নির্দেশ না থাকলেও গ্রন্থটির প্রকাশকাল ও ঘটনা বিন্যাসের আলোকে বুঝতে পারা যায় যে মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ব সময়ের অস্থির সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলনমুখর প্রেক্ষাপটে আসন্ন যুদ্ধের একটি ভয়াবহ সম্ভাবনা লেখকের মনোজে উদয় হয়েছিল। শান্তি ও ভালোবাসার জন্য মানুষের চিরন্তন অন্বেষা উপন্যাসটির মূল উপজীব্য। আর উপন্যাসটির চরিত্র ইতা ও তপু শাশ্বত শান্তি ও ভালোবাসার মূর্ত প্রতীক হয়ে ওঠে।
প্র : 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসের পরিচয় দাও।
উ : বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও ১৯৫৫ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারি পালনের অভিজ্ঞতায় জহির রায়হান 'আরেক ফাল্গুন' (১৯৬৮) উপন্যাস রচনা করেন। নায়ক মুনিম, আসাদ, রসুল, সালমা চরিত্রের মতো অন্যান্য চরিত্র ইতিহাস অনুমোদিত। ১৯৫৫ সালে বর্তমান শহিদ মিনারের স্থায়ী ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ হয়ে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত চলমান আন্দোলন, জনতার সম্মিলন, ছাত্র-ছাত্রীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ, তাদের প্রেম-প্রণয় ইত্যাদি উপন্যাসটির মূলবিষয়ে। তাদের বিশ্বাস, জনতার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আগামী ফাল্গুনে আরও প্রবল হবে। তাই তাদের উচ্চারণ : আসছে ফাল্গুনে আমরা দ্বিগুণ হবো। এই উপন্যাসে বাঙালির জাতীয় ঐতিহাসিক ঘটনাকে রূপায়িত করা হয়েছে।

2020/5/12 21:27
Scanned with CamScanner

বাংলা-বিদ্যার
মৌলিকজ্ঞান
কোষগ্রন্থ

বাংলা
ভাষা ও সাহিত্য
জিজ্ঞাসা

Scanned with CamScanner

প্র : পাকিস্তানিদের জন্য প্রিন্সিপাল সিনরাত কী করতো?
উ : সোয়া-দুরুস পড়তো।
প্র : জেনারেল স্টেটমেন্ট অর্থ কী?
উ : সাধারণ বিবৃতি।
প্র : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারের বাহিনী পরাজিত হয়ে ছিল–
উ : রাশিয়ার রুশ বাহিনীর হাতে।
প্র : প্রিন্সিপাল কাকে তোয়াজ করতেন–
উ : মজিদ আকন্দকে।
প্র : মুক্তিফৌজরা কোথায় বোমা ফেলেছিল?
উ : প্রিন্সিপালের বাড়ির গেটে।
প্র : রেইনকোট পরার পরে লেখককে কেমন দেখাচ্ছিল?
উ : শ্যালক মিষ্টুর মতো।
প্র : কোথায় অর্ধেকের বেশি জায়গা স্বাধীন–
উ : রংপুর, দিনাজপুর।
প্র : নুরুল হুদা কোন বিষয়ের লেকচারার–
উ : কেমিস্ট্রির বা রসায়নের।
প্র : কত দিন ধরে বৃষ্টি চলছিল?
উ : টানা তিন দিন।
প্র : নুরুল হুদার সাথে আর কাকে মিলিটারির জিপে তোলা হয়–
উ : আব্দুস সাত্তার মৃধাকে।
প্র : রেইনকোটের ওপর চাবুকের বাড়ি নুরুল হুদার কাছে স্রেফ উৎপাত মনে হয়েছিল কেন?
উ : মুক্তিযুদ্ধার ব্যবহৃত জিনিস তাকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জিবিত করে। তাই পাকিস্তানী যখন তাকে চাবুক মারতে থাকে। তখন তার মনে হয়– এ যেন স্রেফ উৎপাত।

আনিসুজ্জামান

প্র : লেখক আনিসুজ্জামানের প্রকৃত নাম কী?
উ : এ.টি.এম. আনিসুজ্জামান।
প্র : তাঁর মাতা-পিতা-স্ত্রীর নাম কী?
উ : পিতার নাম : এ.টি.এম. মোয়াজ্জেম; মাতার নাম : সৈয়দা খাতুন; স্ত্রীর নাম : সিদ্দিকা জামান।
প্র : তিনি কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৯৩৭ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী কলকাতায়।
প্র : আনিসুজ্জামানের প্রকৃত পরিচয় কী?
উ : তিনি শিক্ষাবিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরিটাস প্রফেসর (বাংলা বিভাগ)।
প্র : তিনি কোথা থেকে কী শিরোনামে ডক্টরেট করেন?
উ : ১৯৬২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ইংরেজ আমলের বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের চিন্তাধারা (১৭৫৭-১৯১৮)' শিরোনামে। এই গবেষণাপত্রকে তিনি 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য' (১৯৬৪) নামে গ্রন্থরূপ দেন।
প্র : তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম লেখ।
উ : 'স্বরূপের সন্ধানে' (১৯৭৬); 'আমাদের শতকের বাংলা চিঠি' (১৯৮৩); 'বাঙালি নারী : সাহিত্যে ও সমাজে' (২০০০); 'কাল নিরবধি' (২০০৩) ইত্যাদি।
প্র : তিনি কী কী পদক ও পুরস্কার লাভ করেন?
উ : উল্লেখযোগ্য পদক ও পুরস্কার হলো : বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৭০); একুশে পদক (১৯৮৫); আনন্দ পুরস্কার (১৯৯৪); ভারত সরকারের পদ্মভূষণ (২০১৪)। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডি.লিট. পান ২০০৫ সালে।

'জাদুঘরে কেন যাব' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : পাশ্চাত্যদেশে কোনগুলো স্বতন্ত্র বিদ্যায়তনিক বিষয় বা শৃংখলা হিসেবে বিকশিত?
উ : জাদুঘরতত্ত্ব-মিউজিওলজি, মিউজিওগ্রাফি বা মিউজিয়াম স্টাডিজ।
প্র : পৃথিবীর বৃহত্তম জাদুঘর কোথায় স্থাপিত হয়েছিল?
উ : আলেকজান্দ্রিয়ায় (খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে)।

প্র : পৃথিবীর প্রথম জাদুঘর আলেকজান্দ্রিয়া কাকে মাবরুক হতো?
উ : পৃথিবীর প্রথম জাদুঘর আলেকজান্দ্রিয়ায় ছিল নিদর্শন-সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার। ছিল, জুলিওউস্যান ও উন্মুক্ত চিড়িয়াখানা। তবে সেখানে মূলত দর্শনচর্চা হতো।
প্র : আলেকজান্দ্রিয়া গড়ে ওঠার পেছনে কী কারণ ছিল বলে ধারণা করা হয়?
উ : আলেকজান্দ্রিয়া গড়ে ওঠার পেছনে দুটি কারণ আছে বলে ধারণা করা হয়। এক, জাদুঘরটি গড়ে উঠেছিল প্রতিষ্ঠাতার রুচিমাফিক। দুই, দর্শকেরা সেখানে যেত নিজের নিজের অভিপ্রায় অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ অংশে, কেউ কেউ হয়তো পুরোটাই ঘুরে ঘুরে দেখতো।
প্র : জাদুঘর গড়ে ওঠার ভিত্তি কী ছিল?
উ : জগতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রাচীন জিনিসের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ছিল এবং তাদের মধ্যে যারা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, তাদের ব্যক্তিগত কিংবা পারিবারিক উদ্যোগে সংগৃহীত হতে থাকে প্রাচীন নিদর্শনগুলো। এটাই জাদুঘর গড়ে ওঠার ভিত্তি।
প্র : পাশ্চাত্যে কখন প্রাচীন জিনিস সংগ্রহ শুরু হয়?
উ : ইউরোপীয় রেনেশাঁসের পর পাশ্চাত্য দেশে প্রাচীন জিনিস সংগ্রহের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। তবে, প্রাচ্যদেশে অনেক আগ থেকেই সংগ্রহ হতো বলে ধারণা করা হয়।
প্র : রাজ-রাজারা কেন প্রাচীন জিনিস সংগ্রহ করতো?
উ : রাজ-রাজাদের ক্ষেত্রে প্রাচীন জিনিস সংগ্রহ ছিল তাদের পরাক্রম, শৌর্য-বীর্য, সম্পদ ও গৌরবগাথার ঘোষণা হিসেবে তা সংগ্রহ হতো।
প্র : যৌথ কিংবা নাগরিক সংস্থান উদ্যোগে কখন প্রাচীন জিনিস সংগ্রহ করা হয় বলে মনে করা হয়?
উ : ষোল শতকের পরে।
প্র : শুরু বা সূচনা মিউজিয়াম কখন গড়ে ওঠে?
উ : ফরাসি বিপ্লবের পর রাজাকরের সাহায্যে গড়ে ওঠে শুরু বা সূচনা মিউজিয়াম।
প্র : ফ্রেঞ্চই ব্যাসেস আর উদ্ভাসিত হয় কখন?
উ : ফরাসি বিপ্লবের পর।
প্র : সেলিনম্যাসের রাজপ্রাসাদ কখন গড়ে ওঠে?
উ : রুশ বিপ্লবের পর সেলিনম্যাসের রাজপ্রাসাদ গড়ে ওঠে হার্মিতাজে।
প্র : ক্রমবর্ধমান গণতন্ত্রায়নের ফল হিসেবে চিহ্নিত করা হয় কোনটিকে?
উ : টাওয়ার অফ লন্ডন নামক ঐতিহাসিক প্রাসাদ।
প্র : সতেরো শতকে ব্রিটেনের প্রথম পাবলিক মিউজিয়াম গড়ে ওঠে কোথায়?
উ : সতেরো শতকে ব্রিটেনের প্রথম পাবলিক মিউজিয়াম গড়ে ওঠে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে।
প্র : অ্যাশমোলিয়ান মিউজিয়াম কিভাবে সৃষ্টি হয়?
উ : পিতাপুত্র দুই ট্রাডেসান্ট এবং অ্যাশমোল- এই তিনজনের সংগ্রহ নিয়ে।
প্র : ব্রিটিশ মিউজিয়াম কার তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উ : আঠার শতকে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায়। তবে, স্যার হ্যান্স স্লোন, স্যার রবার্ট কটন ও আর্ল অফ অক্সফোর্ড রবার্ট হার্লির সার্বিক সহায়তা ছিল।
প্র : জাদুঘরে সংগৃহীত বিষয় বৈচিত্র্যের চিত্র তুলে ধর।
উ : জাদুঘরের বৈচিত্র্য খুব চোখে পড়ার মতো। সে বৈচিত্র্য একদিকে যেমন সংগ্রহের বিষয়গত, তেমনি গঠনগত এবং অন্যদিকে প্রশাসনগত। বর্তমানে ভিন্নভিন্ন বিষয়ের জাদুঘর গড়ে তোলার চেষ্টা প্রবল। প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস, মানববিকাশ ও নৃতত্ত্ব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, স্থানীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি, সামরিক ইতিহাস, পরিবহণ ব্যবস্থা, বিমানযাত্রা, মহাকাশ

Scanned with CamScanner

প্র : তাঁর রচিত উপন্যাসগুলোর ভাষা কিরূপ?
উ : ভাষা ঋজু ও সাবলীল এবং কাব্যগুণমণ্ডিত।
প্র : তাঁর রচিত সুপরিচিত গল্পগ্রন্থটির নাম কি?
উ : সূর্যগ্রহণ (১৩৬২)।
প্র : তিনি আদমজি সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন কেন?
উ : 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাস রচনার জন্য (১৯৬৪)।
প্র : তিনি বাংলা একাডেমি থেকে কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ : উপন্যাসের জন্যে মরণোত্তর সাহিত্য পুরস্কার (১৯৭২)।
প্র : তিনি ছাত্রজীবনে কোন কোন পত্রিকার সম্পাদনা ও প্রকাশনার কাজে যুক্ত ছিলেন?
উ : সাহিত্য মাসিক প্রবাহ এবং ইংরেজি সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস পত্রিকা।
প্র : তিনি কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ১৯৭২-এর ৩০শে জানুয়ারি মিরপুরে নিখোঁজ হন। তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা যায় না।

'একুশের গল্প' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'একুশের গল্প' এর রচয়িতা কে?
উ : জহির রায়হান।
প্র : 'যদিও একটু আধটু তন্দ্রা আসে, তবু অন্ধকারে হঠাৎ ওর দিকে চোখ পড়লে গা হাত পা শিউরে ওঠে'– কথাটি যে রচনা থেকে নেয়া হয়েছে তার নাম কী?
উ : একুশের গল্প।
প্র : 'তুবড়ি' কি?
উ : আতশবাজি।
প্র : 'একুশের গল্প'-এর রেণু মাঝে মাঝে কী ভেজে আনতো?
উ : ডালমুট।
প্র : 'একুশের গল্প'– ছোটগল্প ব্যবহৃত Skull শব্দের অর্থ কী?
উ : মাথার খুলি।
প্র : 'টিবিয়া ফেবুলা' দু ইঞ্চি ছোট ছিল কার?
উ : তপুর।
প্র : 'এককালে মিছিলটাকে আগলে সে ওর।'– কার সম্বন্ধ?
উ : তপুর।
প্র : তপু কোন গল্পের চরিত্র?
উ : একুশের গল্প।
প্র : 'পলকহীন চোখজোড়া ঘিরে অজস্র প্রশ্ন সেমেছিলো তার।'– 'একুশের গল্প' অঙ্গুর কথা বলা হয়েছে?
উ : রেণুর।
প্র : 'ওই যে লোকটা বলছিল সে শহীদ হবে, পরশু রাতে মারা গেছে।'– কোন দেশের লেখক?
উ : আয়ারল্যান্ড। (যিনি ১৯২৫ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। 'ম্যান অ্যান্ড সুপার ম্যান', সেন্ট জোয়ান তাঁর বিখ্যাত নাটক।)
প্র : মিছিলের সময় তপুর হাতে কী ছিল?
উ : প্ল্যাকার্ড।
প্র : 'আমরাও দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলাম ওর উপর'– কার উপর?
উ : তপুর।
প্র : তপুর মা আর বউকে খবর দেবার জন্য কাকে পাঠানো হয়েছিল?
উ : রাহাতকে।
প্র : বন্ধুদের সাথে কলেজ হোস্টেলে তপুর কয় বছর ছিল?
উ : দুবছর।
প্র : 'সেকি! এর মধ্যে বিয়ে করে ফেলল মেয়েটা?'– এ উক্তি কার?
উ : নাজিমের।
প্র : বার্নাডশ কত সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান?
উ : ১৯২৫ সালে।
প্র : জহির রায়হান রচনাবলি কোন খণ্ড থেকে 'একুশের গল্প' গল্পটি চয়িত হয়েছে?
উ : দ্বিতীয় খণ্ড।
প্র : 'আরেক ফাল্গুন' কোন জাতীয় গ্রন্থ?
উ : উপন্যাস।
প্র : তপুর কী হবার সখ ছিল?
উ : সৈনিক।
প্র : 'শহরের সেরা নাচিয়ে ছিল'– কে?
উ : রুণী।
প্র : 'হয়েছে, এবার তুমি এসো। উঃ বড় বলতে শুরু করলে যেন আর ফুরোতে চায় না'– এটি কার উক্তি?
উ : রাহাতের।

প্র : 'একি, তুমি আবার কবি হলে কবে থেকে?'– এটি কার উক্তি?
উ : রাহাতের।
প্র : 'অহির রায়হান রচনাবলি' প্রকাশিত হয় কত সালে?
উ : ১৯৮১ সালে।
প্র : 'ঘিরে করবে না তো কি সারা জীবন বিধবা হয়ে থাকবে সাকি মেয়েটা।'– এটি কার উক্তি?
উ : রাহাতের।
প্র : কলেজে ভর্তি হবার কতদিন পরে তপু হেনুকে বিয়ে করে?
উ : ছয় মাসেক।
প্র : 'একুশের গল্পে' ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দগুলোর পরিভাষা লেখ।
উ : Anatomy (এনাটমি) > শরীরবিদ্যা;
Skull (স্কাল) > মাথার খুলি;
Tibia-fibula (টিবিয়া-ফেবুলা) > জঙ্ঘাস্থি ও অনুজঙ্ঘাস্থি।
Placard (প্ল্যাকার্ড) > প্রদর্শনের জন্য প্রচারপত্র।
প্র : 'কিন্তু বরাত মন্দ।'—কার?
উ : তপুর।
প্র : 'এ পথের যদি শেষ না হতো কোনদিন। অনন্তকাল ধরে যদি এমনি চলতে পারতাম আমরা।'—কথাটি যে রচনা থেকে নেওয়া হয়েছে তার নাম কী?
উ : একুশের গল্প।
প্র : 'বলে বিরক্তিতে না লজ্জায় লাল হয়ে উঠতো সে।'—সে কে?
উ : রেণু।
প্র : 'আগেতো পাটকাটি ছিল। এখন বেশ মোটাসোটা হয়েছে।'—কে?
উ : রুণী।
প্র : 'সমুদ্র গভীর জনতা ধীরে ধীরে চলতে শুরু করেছে'—প্রসঙ্গটি কোন গল্পের?
উ : একুশের গল্প।
প্র : তপুর গরম কোটটি কার কাছে ছিল?
উ : রাহাতের।
প্র : 'বলতে গিয়ে গলাটা ধরে এলো ওর।'—কার গলা ধরে এলো?
উ : রাহাতের (এটি গল্পের শেষ লাইন)।
প্র : মিছিলের সময় তপুর হাতে কোন রংয়ের লেখা প্ল্যাকার্ড ছিল?
উ : লাল রংয়ের।
প্র : 'ব্যারেজের উপর কার কীর্তিগাথা আছে।'—কার যার কীর্তিগাথা?
উ : রাহাতের।
প্র : 'তপু না মরে আমি মরলেই ভালো হতো।'—উক্তিটি কার?
উ : রাহাতের।
প্র : 'ওঁর কান্না দেখে আমার নিজের চোখে পানি এসে গিয়েছিল।'—কার কান্না দেখে?
উ : তপুর মায়ের।
প্র : বাক্যে যখন কোন শব্দ পরের পরে বসে ঐ পদের বিভক্তির কাজ করে-তখন তাকে কী বলে?
উ : অনুসর্গ।
প্র : 'সোহাগ গঞ্জন, হিপহিপে কটি, আপেল রঙের মেয়েটা প্রায়ই ওর সঙ্গে দেখা করতে আসতো এখানে।'—কে এই মেয়ে?
উ : রেণু।
প্র : চার বছর আগে তপুকে শেষবারের মতো কোথায় দেখা গিয়েছিল?
উ : হাইকোর্টের মোড়ে।
প্র : 'হাসি দিয়ে যন্ত্রণাকে ভরিয়ে রাখতো সে।'—কার সম্পর্কে বলা হয়েছে?
উ : তপু।
প্র : 'স্বপ্নালু চোখে স্বপ্ন দেখতো তার।'—কার?
উ : তপুর।
প্র : 'আমাদের জীবনটা ছিল যান্ত্রিক।'—বাক্যটি কোন রচনা থেকে নেওয়া হয়েছে?
উ : একুশের গল্প।
প্র : 'সে গর্ত দিয়ে নির্ঝরের মতো রক্ত ঝরছে তার।'—কার?
উ : তপুর।
প্র : 'কথার তুবড়ি' শব্দের অর্থ কী?
উ : অনর্গল কথা।
প্র : 'একুশের গল্পে'র মূলকথা কী?
উ : ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে এক উদ্দাম হৃদয়বান, প্রাণবন্ত তরুণ শহিদ হয়। কিন্তু পুলিশ সেই লাশ গুম করে ফেলে। তার কঙ্কাল মেডিক্যাল কলেজে পড়ুয়া এক বন্ধু আবিষ্কার করে।

2020/5/12 21:27
Scanned with CamScanner

জীবনানন্দ দাশ

প্র : জীবনানন্দ দাশের জন্মসাল কবে?
উ : ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৯।
প্র : তাঁর জন্মস্থান কোথায়?
উ : বরিশাল।
প্র : তাঁর আদি নিবাস কোথায়?
উ : পাণপাড়া গ্রাম, বিক্রমপুর।
প্র : তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কতটুকু?
উ : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে দ্বিতীয় শ্রেণিতে এম.এ. (১৯২১)।
প্র : জীবনানন্দ দাশ কোন পত্রিকার সাহিত্যপাতা সম্পাদনা করেন?
উ : দৈনিক স্বরাজ পত্রিকার সাহিত্য বিভাগ।
প্র : তাঁর রচনায় কী কাব্যময় হয়ে উঠেছে?
উ : গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যময় প্রকৃতি।
প্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনানন্দ দাশের কবিতাকে কী বলেছেন?
উ : চিত্ররূপময় কবিতা।
প্র : রবীন্দ্রনাথ কোন কবিতাগ্রন্থ পাঠ করে জীবনানন্দ দাশকে এই কথা লিখেছিলেন?
উ : ধূসর পাণ্ডুলিপি।
প্র : তাঁর রচিত কবিতায় কী কী দীপ্যমান?
উ : আধুনিক নাগরিক জীবনের হতাশা, নিঃসঙ্গতা, বিষাদ ও সংশয়ের চিত্র।
প্র : তিনি স্মরণীয় ও বরণীয় কেন?
উ : স্বচ্ছ, সুন্দর, শান্ত ও স্নিগ্ধ রোম্যান্টিক কবিতার স্রষ্টা বলে।
প্র : বিশ শতকের ষাটের দশকের বাঙালির জাতিসত্তা বিকাশের আন্দোলনে ও ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে কী তীব্রভাবে এদেশের সংগ্রামী জনতাকে অনুপ্রাণিত করেছেন?
উ : তাঁর নিসর্গবিষয়ক কবিতা।
প্র : তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলো কী?
উ : ঝরাপালক (১৯২৮), ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৯৩৬), বনলতা সেন (১৯৪২), মহাপৃথিবী (১৯৪৪), সাতটি তারার তিমির (১৯৪৮), রূপসী বাংলা (১৯৫৭) ও বেলা অবেলা কালবেলা (১৯৬১)।
প্র : জীবনানন্দ দাশকে কী কী বিশেষণে বিশেষায়িত করা হয়?
উ : ধূসরতার কবি, তিমির হননের কবি, নির্জনতার কবি, রূপসী বাংলার কবি।

প্র : জীবনানন্দ দাশের চিত্রূপময়তার পরিচয় দাও।
উ : জীবনানন্দ দাশের কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চিঠিতে লিখেছিলেন, তোমার কবিতাগুলি পড়ে খুশি হয়েছি। তোমার লেখায় রস আছে, ঋতুবৈচিত্র্য আছে এবং তাকিয়ে দেখার আনন্দ আছে। রবীন্দ্রনাথের এই পর্যবেক্ষণ জীবনানন্দ দাশের কবিতায় স্পষ্ট দেখা যায়। এই ছবি কেবলো সাদা-কালো ছবি নয়, যেন রঙিন চলচ্চিত্র। চিত্রিতের গুণে গুণান্বিত ছিলেন। উদাহরণ দেয়া যেতে পারে, যেমন: 'চরিশাশে দেয়া বিস্ময় / চৈত্রের বাতাস / কয়ের শরীরের স্বাদ যেন: / ঘাইমৃগী সারারাত ডাকে: / কোথাও অনেক বনে- সেইখানে জ্যোৎস্না আর নাই / পুরুষরহিত সব শুনিতেছে শব্দ তার।' (–ক্যাম্পে) অথবা অন্য একটি কবিতায়: 'হাতে তুলে নেবি নি কি চাষার লাঙল? / বাল্যতিতে টানিবি কি জল? / কাস্তে হাতে কতোবার যাই ঢি কি মাঠে? / মেছোদের মতো আমি কতো নদী ঘাটে / ঘুরিয়াছি;'। (–বোধ) এই দুটি উদ্ধৃতিতেই কবিতা পাঠের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের চোখে একটি করে রঙিন ছবি ভেসে উঠবে। জীবনানন্দ দাশের কবিতাকে এ কারণেই চিত্ররূপময় বলা হয়।

প্র : জীবনানন্দ দাশকে ধূসরতার কবি বলা হয় কেন?
উ : 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (১৯৩৬) নামে একটি কাব্যগ্রন্থ আছে জীবনানন্দ দাশের। কিন্তু শুধু এ কারণেই তাঁকে 'ধূসরতার কবি' বলা হয়– তা নয়। ঝরা পাতা, শিশিরে হাওয়া, উর ব্যাবিলন মিশরীয় সভ্যতা- এসবই জীবনানন্দের কাব্য-বৈশিষ্ট্য। বন্ধ্যাযুগের যথাযথ চিত্রকল্প সৃষ্টিতে জীবনানন্দের তুলনা নেই। মৃত্যুচেতনাও প্রায় প্রথম থেকেই তাঁর কবিতায় দেখা যায়। শ্মশান, মরুবালু, আলেয়া ইত্যাদি কবিতার পটভূমি মৃত্যু। এই মৃত্যুচেতনা malady of the age অর্থাৎ যুগযন্ত্রণা থেকে উদ্ভূত। জীবনানন্দ একে জীবনে ধারণ করেছিলেন। যেমন, একটি কবিতায় তিনি হতাশা ভরে বলেছেন: 'বিবর্ণ

আসের ডাক্তা কাগজের ঠোঙায় পড়ে আছে, / আমাদের সন্ততিও আমাদের নয়।' (–বিভিন্ন কোবাস) এরকমের হতাশা আর বিবর্ণের কথা আছে তাঁ বহু কবিতায়। তাঁর কবিতায় চলচ্চিত্রে আছে ধূসর বর্ণ। তাই জীবনানন্দ দাশকে ধূসরতার কবি বলা হয়।

প্র : জীবনানন্দ দাশের কবিতা যেন উপমার জাদুঘর।–তাঁর কবিতা থেকে কয়েকটি উপমার উল্লেখ কর।
উ : সংস্কৃত সাহিত্যে 'উপমা কালিদাসস্য' বলে একটি কথা আছে। বাংলা কবিতায় বলতে হয়: 'উপমা জীবনানন্দ দাশস্য'। সত্যিকার অর্থেই জীবনানন্দ দাশের কবিতা যেন উপমার জাদুঘর। নিচে কয়েকটি উপমার উল্লেখ করা হলো:
* আতার শ্রীরের মতো সোহাগ সেথায় ছিরে আছে।
* তোমার কান্নার সুরে খেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে।
* নীল আকাশে খই ক্ষেতের সোনালি ফুলের মতো অজস্র তারা।
* পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।
* উটের গ্রীবার মতো কোন-এক নিস্তব্ধতা এসে।

বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দ দাশের কবিতায় উপমা প্রয়োগ নিয়ে মন্তব্য করেছেন: 'তাঁর উপমা উজ্জ্বল, জটিল ও দূরগন্ধবহ।' অর্থাৎ জীবনানন্দ দাশের কবিতায় উপমা কেবল চিত্র বা তুলনা নয়, তারা চিন্তা। কথাটি অসঙ্গত নয়।

প্র : তাঁর রচিত প্রবন্ধগ্রন্থ কোনটি?
উ : কবিতার কথা।
প্র : 'কবিতার কথা' প্রবন্ধের একটি বিখ্যাত উক্তি কী?
উ : 'সকলেই কবি নন, কেউ কেউ কবি।'
প্র : তিনি বিশিষ্ট কেন?
উ : রবীন্দ্রবলয় ছিন্নকারী ও উত্তরকালের কবিদের উপর সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাববিস্তারী কবি হিসেবে। তাছাড়া মর্মগত, সুমিত, নিরাবেগ ও সুস্থির গদ্য লেখক হিসেবেও।

প্র : তাঁর রচিত উপন্যাসসমূহ কী কী?
উ : মাল্যবান (১৯৫৬), সতীর (১৯৫৯)।
প্র : 'কবরাশক' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : 'কবরাশক' কাব্যগ্রন্থটি জীবনানন্দ দাশের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যগ্রন্থে তাঁর ছয়টি কবিতা স্থান পেয়েছে। এই কাব্যগ্রন্থের সবগুলো কবিতা ১৯২৭ সালে রচিত। এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলোর মধ্যে রোমান্টিক ভাবালুতা ও অস্পষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো ১৯২৭ সালে রচিত হলেও এগুলো প্রকাশিত হয় ১৯৩০ সালে এক নতুন আঙ্গিকে ও পরিবর্তিত নামে। যেমন: 'কবরাশক' কবিতাটি 'কবরের হাসি' নামে প্রকাশিত হয়।
প্র : 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (১৯৩৬) জীবনানন্দ দাশের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যগ্রন্থটির মধ্যে জীবনানন্দীয় কবিতার নিজস্ব বিন্যাস, ছন্দধ্বনি, ভাষা, প্রতিমা সবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্পষ্ট প্রকাশিত। এ কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমেই আধুনিক বাংলা কবিতাসে জীবনানন্দের প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত হতে থাকে।
প্র : 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থটি (১৯৪২) আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ব্যাতনামা গ্রন্থগুলির অন্যতম। এ কাব্যের 'বনলতা সেন' কবিতাটি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা এবং জীবনানন্দের কবিতাগুলির মধ্যে জনপ্রিয়। ভারতীয় পুরাণের অনুষঙ্গে যেমন বিদিশা, শ্রাবস্তী উঠে এসেছে, তেমনি বেতের ফলের মতো বা চোখের নীড়ের মতো উপমানগুলো নির্মাণ করেছে নতুন কাব্যমণ্ডল। প্রেম ও প্রকৃতি, বহু জীবন ও হতাশা, ক্লান্তি ও অবসাদ, ইতিহাসের বিশাল অনুভূতি ও বর্তমানের ছিন্নভিন্ন অস্তিত্ব সমস্ত কিছুর সমাহার এই অপরূপ কাব্যে আলোড়নের জাল বুনন করেছে। জীবনানন্দের শ্রুতগতি ছন্দস্পন্দ, অভিনব শব্দ প্রয়োগ ও অন্বয়, রূপময় ইন্দ্রিয়ালু বাকপ্রতিমাগুলি এই কাব্যকে অসামান্য মহিমা দিয়েছে। পাখির নীড়ের মতো চোখ, শিশিরের শব্দের মতো সন্ধ্যা, অন্ধকারের মতো কালো চুল ইত্যাদি অশ্রুতপূর্ব উপমা প্রয়োগে জীবনানন্দ বাংলা সাহিত্যে এক অসাধারণ কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন।
প্র : 'রূপসীবাংলা' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : 'রূপসী বাংলা' ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত

20/5/12 21:27
Scanned with CamScanner

হয়। কবিতাগুলি লিখিত হয়েছিল বিশ বছরেরও আগে। প্রথম প্রকাশের সময় ভূমিকায় অশোকানন্দ নাশ জানান যে কবিতাগুলি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (১৯৩৬) পর্যায়ের শেষের দিকের ফসল। কবিতাগুলির গঠন সনেটের। এদের বিষয় বাংলার গ্রাম-প্রকৃতি, নদীনালা, পশু-পাখি, উৎসব, অনুষ্ঠান। জনপ্রিয়তার দিক থেকে আধুনিক বাংলা কবিতা গ্রন্থগুলির মধ্যে 'বনলতা সেন'-এর পরেই এর স্থান। 'আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে এই বাংলায়' এ কাব্যের বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি।

প্র : 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটি কোন কাব্যের অন্তর্গত? প্রকাশকাল কত? কবিতাটির সঙ্গে বিদেশি কোন কবির, কোন কবিতার মিল আছে?

উ : 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', ১৯৩৬। কবি W. B. Yeats-এর 'The falling of the leaves's' কবিতার মিল আছে।

প্র : জীবনানন্দের মৃত্যুচেতনা কী মৌলিক?

উ : পুরোপুরি মৌলিক নয়, পাশ্চাত্যের কবি রিলকের প্রভাব আছে।

প্র : 'হায় চিল' কবিতাটি কোন্ কাব্যের অন্তর্গত? এর উপর কারো প্রভাব পড়েছে কী?

উ : 'হায় চিল' 'মহাপৃথিবী' কাব্যের অন্তর্গত। এই কবিতার সঙ্গে ইয়েটস-এর 'He reproves the curlow' কবিতার মিল আছে।

প্র : 'বনলতা সেন' কবিতার উপর কার প্রভাব আছে?

উ : অ্যাডগার এলেন পো-র 'টু হেলেন' কবিতার প্রভাব পড়েছে।

প্র : পাশ্চাত্যের কোন কোন কবির দ্বারা জীবনানন্দ প্রভাবিত?

উ : ইয়েটস, বোদলেয়ার, অ্যাডগার এলেন পো।

প্র : 'মাল্যবান' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : 'মাল্যবান' (১৯৭৩) উপন্যাস। লেখা হয়েছিল সম্ভবত ১৯৪৮ সালে, প্রকাশিত হয় জীবনানন্দের মৃত্যুর অনেক দিন পরে। বাংলা সাহিত্যের মূল কাহিনি বর্ণনার ধারা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এই উপন্যাসটি। নাম্নতা জীবনের এক বিচিত্র সংগতি। সম্পর্কের জটিলতা এবং পারস্পরিক বিচিত্রতার মোদ এক ইন্দ্রিয়ময় আবেগ অসামান্য কুশলতার সঙ্গে লিখিত হয়েছে।

প্র : সম্প্রতি খুঁজে পাওয়া তাঁর আর একটি উপন্যাসের নাম কী?

উ : কল্যাণী (প্রকাশ : সেপ্ট ১৯৯৯)।

প্র : তাঁর মৃত্যু সাল কত?

উ : ২২শে অক্টোবর, ১৯৫৪।

প্র : কিভাবে তিনি মৃত্যুবরণ করেন?

উ : ট্রামের নিচে পড়ে আহত হন ও পরে হাসপাতালে মারা যান।

প্র : জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুর পর তাঁর কোন কাব্য দুটি প্রকাশিত হয়?

উ : রূপসী বাংলা (১৯৫৭), বেলা অবেলা কালবেলা (১৯৬১)।

'এই পৃথিবীতে একস্থান আছে' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : পৃথিবীর সুন্দর করুণ স্থানটি কোন ঘাসে ভরে আছে?

উ : মধুকূপী।

প্র : ভোরের মেঘে জেগে ওঠা অরুণ কোন রং ধারণ করেছে?

উ : নাটার।

প্র : সুদর্শন কখন ঘরে উড়ে যায়?

উ : সন্ধ্যার অন্ধকারে।

প্র : বরুণ এবং বারুণীর অবস্থান কোথায়?

উ : বরুণ কর্ণফুলী ও পদ্মা নদীতে, বারুণী গঙ্গাসাগরে অবস্থান করে।

প্র : বিশালাক্ষী কবিকে বর হিসেবে কী দিয়েছিল?

উ : শঙ্খমালা নামক প্রেমিকাকে।

প্র : 'এই পৃথিবীতে একস্থান আছে' কবিতায় কোন পাখির নাম আছে?

উ : শঙ্খচিল এবং লক্ষ্মীপেঁচার।

প্র : অন্ধকারে ঘাসের উপর কী নুয়ে থাকে?

উ : লেবুর শাখা।

প্র : শঙ্খমালার শরীরে কোন রংয়ের শাড়ি ছিল?

উ : হলুদ।

প্র : শঙ্খমালা পরবর্তী জীবনে নীল বাংলার কোথায় জন্মে?

উ : ঘাস আর ধানের ভেতর।

প্র : নরম বয়সের মতো হাওয়ায় চঞ্চল, সেটা কী?

উ : ঘাস।

প্র : শঙ্খচিল কিসের মতো অক্ষুট?

উ : শঙ্খচিলের মতো।

প্র : বাসের গহনের মতো।

প্র : জীবনানন্দ ঘাসের কাব্যবৈশিষ্ট্যকে কী বলেছেন?

উ : হরিৎসমুদ্র।

প্র : চিরহরিৎ ঠাকুর কী বলেছেন?

উ : হুতোম বসু জীবনানন্দ দাশকে কী বলে উল্লেখ করেন?

উ : নিসর্গতার কবি।

প্র : কেন এ পৃথিবীর অন্য কোথাও আর শঙ্খমালাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না?

উ : এই পৃথিবীর অন্য কোথাও বাংলা নামক সুন্দর দেশ নেই, এ জন্যই পৃথিবীর অন্য কোথাও আর শঙ্খমালাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

প্র : সবুজ ডাঙা বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

উ : রূপসী বাংলা।

প্র : কবির কাছে সবচেয়ে সুন্দর করুণ কী?

উ : তার জন্মভূমি।

প্র : সুন্দর আবার করুণ কেন?

উ : এটি কবিকল্পনা। দুটো আপাত বিপরীত গুণ বা বস্তুকে পাশাপাশি স্থাপন করা; যেমন : ভীষণ সুন্দর। করুণতা শুধু নেতিবাচক অর্থে নয়, বিশেষ ভালোবাসা অর্থেও। যেমন : মায়ের করুণমুখ স্মরণ করে মুক্তিযুদ্ধে যায় বীরেরা। এখানে 'করুণ' নেতিবাচক অর্থে নয় বিশেষ আবেদন সঞ্চারী ভালোবাসা অর্থে ব্যবহৃত।

প্র : 'মধুকূপী' কী?

উ : রূপে মধুধারণ করে আছে এমন। গ্রামবাংলার অনেক লতা, গুল্ম, ফুলে যে মধুরমতো মিষ্ট রস থাকে তা বোঝাতে চমৎকার এই শব্দের ব্যবহার।

প্র : 'সেইখানে শঙ্খচিল পানের বনের মতো হাওয়ায় চঞ্চল, / সেইখানে লক্ষ্মীপেঁচা ঘরনের গন্ধের মতো অস্ফুট, করুণ;' – এই দুই পঙ্‌ক্তিতে কোন অলঙ্কার আছে?

উ : দুটোতেই আছে উপমা।

প্র : 'সুদর্শন' কী?

উ : এক ধরনের ঘাসফড়িং।

প্র : 'রূপসী' কে বা কী?

উ : বাংলাদেশ।

প্র : হলুদ শাড়ি কী?

উ : সরিষার ফুল বা অন্যান্য ফুলের ফুল-ফলসহকে যোগানো হয়েছে।

প্র : 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' পঙ্‌ক্তির মূলকথা কী?

উ : চমৎকার রূপ বর্ণনা করে কবি বলেছেন, দেবী দুর্গা বর দিয়েছিলেন বলে বাংলা এতো সুন্দর হয়েছে, পৃথিবীর আর কোথাও এমন স্থান পাওয়া যাবে না।

'সেইদিন এই মাঠ' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থভুক্ত?

উ : 'সেইদিন এই মাঠ' জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থভুক্ত প্রথম কবিতা। 'রূপসী বাংলা' প্রকাশিত হয় কবির মৃত্যুর পর, ১৯৫৭ সালে। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয় 'আবহমান বাংলা, বাঙালীকে'।

প্র : এই কবিতার স্তবক-সংখ্যা কয়টি?

উ : দুটি। প্রথমটি নয় পঙ্‌ক্তি বিশিষ্ট দ্বিতীয়টি চার পঙ্‌ক্তির।

প্র : 'নদী নক্ষত্রের তল' কী?

উ : কবি কল্পনা করছেন, রাতে নক্ষত্রের ফুল ফুলে নদী সৃষ্টি হয়েছে। নক্ষত্রসমূহ ওপরে আর নিচে অর্থাৎ নদীর তলে এই পৃথিবীর মাটি, মাঠ, বাকি কিছু।

প্র : 'সোনার স্বপ্ন' কী?

উ : যে স্বপ্ন অনেক দামি।

প্র : কবিতায় 'চালতা ফুল' কেন ব্যবহার করা হয়েছে?

উ : চালতা ভারতীয় ফল। এর ফুল খুবই হালকা গন্ধ ছড়ায়। তবু ফুল হিসেবে চালতা ফুল তুচ্ছ। কবি এখানে ভারতীয়

2020/5/12 21:27

Scanned with CamScanner

আপাত তুচ্ছ একটি ফুলকে শিশিরে স্নান করানোর মাধ্যমে পল্লিপ্রকৃতির নিসর্গকে জীবন্ত করেছেন।

প্র : 'শঙ্খীপেঁচা' কী?

উ : উলুক বা পেচক হলো পেঁচা, যা একটি নিশাচর পাখি। হিন্দুপুরাণ অনুসারে ধনদেবী লক্ষ্মীর বাহন এই পেঁচা। পেঁচার বিভিন্ন প্রজাতি আছে। লক্ষ্মীর বাহনজাতীয় বিশেষ প্রজাতির পেচকই লক্ষ্মীপেঁচা।

প্র : 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতায় কোন পঙ্‌ক্তি একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে?

উ : 'সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে!'

প্র : এশিরিয়া কী?

উ : প্রাচীন নগরী। টাইগ্রিস নদীর অববাহিকায় প্রাচীন মেসোপটেমিয়ায় (বর্তমানের ইরাকের কিছু অংশ) অবস্থিত সমৃদ্ধ রাজ্য। বর্তমানে বিভিন্নমুখী আক্রমণ ও লুণ্ঠনে ধ্বংসপ্রাপ্ত।

প্র : বেবিলন কী?

উ : বেবিলন হলো প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার (বর্তমানের ইরাকের কিছু অংশ) দক্ষিণ দিকে খ্রিষ্টপূর্ব ১৮৯৪ অব্দে গড়ে ওঠা আমোরিট সাম্রাজ্যের নগরী। ইউফ্রেটাস নদী এই নগরীর মধ্যবর্তী দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমান দুই ভাগ করেছিল। এক সময় বেবিলন নগরীকে বিলুপ্ত করা হয়েছিল। পরে তা আবার পুনর্গঠন করা হয়।

'আবার আসিব ফিরে' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'আবার আসিব ফিরে' কবিতা জীবনানন্দ দাশের কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত?

উ : রূপসী বাংলা।

প্র : 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থ কত খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশ পায়?

উ : ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে; কবির মৃত্যুর (১৯৫৪) পর।

প্র : 'ধানসিড়ি' কী?

উ : একটি নদীর নাম। (বি.দ্র. নদীটির নামের বানানে চন্দ্রবিন্দু - নেই।)

প্র : 'ধানসিড়ি' কোন জেলার নদী?

উ : ঝালকাঠি জেলার নদী। বিসর্গযুক্ত 'ধানসিড়ি' ঝালকাঠি জেলার একটি নদী।

প্র : 'ধানসিড়ি' নামে কি আরো কোনো নদী রয়েছে?

উ : আছে। ভারতের আসামের গোয়ালপাড়া জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ নদীর নাম 'ধানসিড়ি'। নাগাপাহাড়ের লাঙাং পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে ৩৫২ কিলোমিটার দীর্ঘ হয়ে এটি ব্রহ্মপুত্র নদের সঙ্গে মিশেছে।

প্র : কবি বাংলাদেশকে কীসের দেশ বলেছেন?

উ : নবান্নের।

প্র : 'নবান্ন'-এর সন্ধিবিচ্ছেদ ও সমাস কী?

উ : সন্ধি: নব+অন্ন; সমাস: নব অন্ন যাহা দ্বারা হয় যে অনুষ্ঠানে= অনুক বহুব্রীহি।

প্র : 'নবান্ন' কী?

উ : এক ধরনের লোক-উৎসব। নতুন ধান ওঠার সময়।

প্র : 'হয়তো মানুষ নয়– হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে;'– কবির জন্মের এ প্রত্যাশা কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য?

উ : জীবনানন্দ আবার এই বাংলায় জন্মতে চেয়েছেন। এটা তাঁর ভাবনা। মানুষ মরে গেলে আবার জন্মগ্রহণ করে কি-না এ প্রশ্নের কোনো উত্তর জিজ্ঞেস না করে কবি-সাহিত্যিকগণ মৃত্যুর পর অবার জন্মের কথা বলেছেন। আসলে মানুষের ব্যক্তি-শরীর ধ্বংস হয়ে গেলেও জীবকুলের যেহেতু বিনাশ নেই, সেহেতু বেঁচে থাকার প্রত্যাশা থাকতেই পারে। জীবনানন্দ দাশ তো তাঁর আর একটি কবিতায় লিখেছেন: 'মানুষের মৃত্যু হয় তবুও মানব বেঁচে রয়।'

প্র : জীবনানন্দ দাশের এই ভাবনার সঙ্গে নজরুলের কোনো গানের কথা কি মিলে যায়?

উ : 'মোরা আর জনমে হংসমিথুন ছিলাম ...'।

প্র : 'ভোরের কাক' কেন?

উ : রাতের অন্ধকার দূরীভূত হওয়ামাত্র কাক প্রথম চিৎকার করে এবং সবাইকে জাগিয়ে দেয়।

প্র : 'জলাঙ্গী' কী?

উ : একটি নদীর নাম।

প্র : 'বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায়;'– 'করুণ' কোন অর্থে?

উ : নদীর ডাঙা সব সময়ই করুণ বা অসহায় থাকে। কারণ এই বুঝি তার জাহাজ এলো! তবে জলাঙ্গীর ডাঙা সবুজ থাকে– এটাই এখানকার বিশেষত্ব।

প্র : 'কুশদিন' কী?

উ : এটি এক ধরনের পোকার স্থানীয় নাম।

প্র : শঙ্খীপেঁচা কী?

উ : এক বিশেষ ধরনের পেঁচা যা লক্ষ্মী দেবীর বাহন হিসেবে থাকে। মনে করা হয়, এই পেঁচা শুভের প্রতীক।

প্র : 'হুতোমে' কী?

উ : 'হুতোমে'-এর কবিকৃত সংক্ষিপ্ত রূপ।

প্র : কপসা কী?

উ : একটি নদী। বাগেরহাট জেলার ওপর দিয়ে প্রবাহিত।

প্র : 'ডিঙা' কী?

উ : নৌকা।

প্র : 'ডিঙা' কোন শব্দ?

উ : দেশি শব্দ।

প্র : কবি সন্ধ্যার আকাশে কী উড়বে বলেছেন?

উ : সুদর্শন।

প্র : সাদা ছেঁড়া পালে কে ডিঙা বায়?

উ : কিশোর।

প্র : শঙ্খচিল কী?

উ : শুভ্র বক্ষোদেশযুক্ত চিলবিশেষ।

প্র : 'আবার আসিব ফিরে' কবিতায় মানুষ ছাড়া কয়টি প্রাণীর উল্লেখ আছে?

উ : সাতটি।

প্র : 'আবার আসিব ফিরে' কবির কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে?

উ : রূপসী বাংলা।

প্র : 'আবার আসিব ফিরে' কবিতায় মানুষের কোন দুটো কালের উল্লেখ আছে?

উ : শিশু ও কিশোর।

প্র : 'ধানসিড়ি' নদীটি কোথায়?

উ : ঝালকাঠিতে।

প্র : 'আবার আসিব ফিরে' কবিতায় কী বেশ ধারণ করে কবি এ বাংলায় ফিরে আসতে চান?

উ : শঙ্খচিল শালিকের বেশে।

প্র : 'আবার আসিব ফিরে' কবিতায় কবির সারাদিন কীভাবে কেটে যাবে?

উ : কলমির গন্ধ ভরা জলে ভেসে ভেসে।

প্র : 'আবার আসিব ফিরে' অভিধায় শঙ্খচিলের কোথায় জন্মতে?

উ : শিয়রের ঘাসে।

প্র : 'আবার আসিব ফিরে' কবিতায় শিশু বইয়ের খাল কোথায় ছড়াবে?

উ : ডাঁটের খাল।

প্র : 'আবার আসিব ফিরে' কবিতায় মাছরাঙা জীবনটিকে পাকাবে কোথায় আসবে?

উ : নীড়ে।

প্র : 'আবার আসিব ফিরে' কবিতায় 'আবার' কোন অনোজাদের প্রকাশিত হয়েছে?

উ : দেশপ্রেম।

**প্র : 'আমারই পাশে ফুটি ইতিহাসের জিজ্ঞাসা!'– কবির অভিপ্রায়ে, তিনি নদীমাতৃক এই বাংলার বিভিন্ন অনুষঙ্গ ও উপাদানের মধ্যেই জীবিত থাকবেন। এভাবে তিনি হারিয়ে যাবে তবে বাংলার শাশ্বত রূপে বাঁচার প্রয়োজনে আমাদের উচিত, এই দেশের পশু-পাখি, গাছ-পালা, নদী-হাওড়, মানুষ ও জীবজন্তুকে ভালোবাসা এবং এগুলো যেন সুন্দরভাবে বৃদ্ধি পায় সে দিকে লক্ষ রাখা।

জোতস্না মার্শম্যান

প্র : জোতস্না মার্শম্যান-এর জন্মতারিখ কত?

উ : ২০শে এপ্রিল, ১৭৬৮।

প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ওয়েস্টবেরিলি, উইলট শায়ার লন্ডন।

প্র : তাঁর কী কী ভাষায় দক্ষতা ছিল?

উ : ভারতীয় ভাষা ছাড়া গ্রিক, ল্যাটিন, হিব্রু ও সিরিয়াক ইত্যাদি।

প্র : তিনি প্রথম কোথায় কর্মরত ছিলেন?

উ : লন্ডনের পুস্তক ব্যবসায়ীর দোকানে।

প্র : তিনি যাজকতায় দীক্ষিত হন কত সালে?

উ : ১৭৯১-এ।

প্র : তিনি কখন মিশনারির কাজে ভারতে আসেন?

উ : ১৭৯৯-এ। শ্রীরামপুরের মিশনে কাজে নিযুক্ত হন।

2020/5/12 21:27

Scanned with CamScanner

প্র : তিনি কোন ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন?
উ : চিনা ভাষায়।
প্র : তিনি কেরির সহযোগিতায় কী অনুবাদ করেন?
উ : সংস্কৃত রামায়ণ।
প্র : তিনি কোন কোন পত্রিকার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন?
উ : সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ', 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' ও 'দিগ্দর্শন' পত্রিকা।
প্র : 'দিগ্দর্শন'-এর সম্পাদনা সম্পর্কে লেখ।
উ : 'দিগ্দর্শন' (১৮১৮) শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত এবং জোতয়া মার্শম্যানের পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান কর্তৃক সম্পাদিত। এখানে ছাত্রদের জন্য ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হতো।
প্র : তাঁর মৃত্যু সাল কত?
উ : ৫ই ডিসেম্বর, ১৮৩৭।

ডিরোজিও, হেনরি

প্র : ডিরোজিওর সম্পূর্ণ নাম কী?
উ : হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও।
প্র : তিনি কে ছিলেন?
উ : একজন ইউরেশীয় তরুণ কবি, যুক্তিবাদী, চিন্তাবিদ ও শিক্ষক।
প্র : তাঁর জীবৎকাল কত?
উ : ১৮০৯ থেকে ১৮৩১ (ডিসেম্বর) অর্থাৎ ২২ বৎসর।
প্র : তাঁর কর্মকাণ্ড ব্যাখ্যা কর।
উ : তিনি মাত্র সতের বৎসর বয়সে হিন্দু কলেজের (বর্তমান নাম প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়) শিক্ষক নিযুক্ত হন। পড়াতেন ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাস। প্রচলিত সংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় না দেয়া ছিল তাঁর শিক্ষার মূলকথা। ছাত্রদের নিয়ে ক্লাসের বাইরেও মুক্ত আলোচনা করতেন। তরুণ শিক্ষক হওয়ায় ছাত্ররা তাঁর সঙ্গে খুব সহজেই মিশে যেতো। সংস্কারপন্থীদের অভিযোগ ও চাপের ফলে এই ছাত্রপ্রিয় তরুণ শিক্ষককে হিন্দু কলেজ থেকে ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বরখাস্ত করা হয়।
প্র : ডিরোজিও একটি সংগঠন করেছিলেন তার নাম কী?
উ : ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সংগঠনটির নাম 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন'।
প্র : ডিরোজিওর অনুসারী মুক্তচিন্তক গোষ্ঠীকে কী বলা হয়?
উ : ইয়ংবেঙ্গল।
প্র : ডিরোজিও-র সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
উ : 'ডিরোজিও, হেনরি লুই ভিভিয়ান' (১৮০৯-১৯৩১) হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। পিতার নাম ফ্রান্সিস ও মাতার নাম সোফিয়া। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে তাঁর প্রভাব ছিল অত্যন্ত গভীর। কালীপ্রসাদ ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র, হরচন্দ্র ঘোষ, মাধবচন্দ্র মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র প্রভৃতি যুবক ছিলেন তাঁর শিষ্য। এই ছাত্রদল 'ইয়ংবেঙ্গল' নামে পরিচিত ছিল। যুক্তি ও তর্কের দ্বারা সমাজ, ধর্ম, নীতি সবকিছুকে যাচাই করে দেখার এক নতুন প্রেরণা সঞ্চার করেছিলেন ডিরোজিও তিনি ইংরেজিতে কবিতা লিখতেন। তাঁর প্রথম গ্রন্থ: The Fakeer of Jungkeera (১৯২৮)। হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁর চিন্তাধারার প্রভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁকে কর্মচ্যুত করেন। বাংলা সাহিত্যের নতুন ভাবমণ্ডল গঠনের ইতিহাসে তাঁর ছাত্রদের দান স্মরণীয়।
প্র : 'ইয়ংবেঙ্গল'-এর পরিচয় দাও।
উ : 'ইয়ংবেঙ্গল' ডিরোজিও প্রভাবিত এক তরুণ ছাত্রগোষ্ঠী। এঁদের মধ্যে প্রধান কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র ও তারাচাঁদ চক্রবর্তী। ছাত্র হিসেবে সকলেই ছিলেন প্রতিভাবান, ইংরেজি শিক্ষার প্রতি প্রবল আগ্রহী। প্রথম জীবনে হিন্দুধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধাপরায়ণ ও ঐতিহ্য সম্পর্কে অত্যন্ত সমালোচনা-মুখর। প্রচলিত হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

তাদের উৎসমূল। উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ, ধর্ম, নীতি গঠনে তাঁদের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল।
প্র : ইয়ংবেঙ্গলদের নিয়ে মধুসূদন সত্তের দিশাহারা গ্রহসেন গ্রন্থটির নাম কী?
উ : হেনরি ডিরোজিও একই সালে সভাতা?
প্র : হিন্দু কলেজের চাকুরিচ্যুতির পর তিনি যে পত্রিকার সম্পাদক হন তার নাম?
উ : বেঙ্গলি দি ইস্ট ইন্ডিয়ান।
প্র : বাংলা সাহিত্যে ডিরোজিও আলোচিত কেন?
উ : তাঁর ছাত্র ও অনুসারীবৃন্দ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূচনাতে যুক্তিশীলতা ও মানবিকতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে সাহিত্য রচনা করেন।

তসলিমা নাসরিন

প্র : তসলিমা নাসরিন কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৯৬২ সালের ২৫শে অগস্ট, ময়মনসিংহে।
প্র : তিনি মূলত কী হিসেবে পরিচিত?
উ : নারীবাদী লেখক হিসেবে।
প্র : তাঁর গ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : কবিতা : শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা (১৯৮৬), নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে (১৯৮৯), আমার কিছু যায় আসে না (১৯৯০), অতলে অন্তরীণ (১৯৯১), বালিকার গোল্লাছুট (১৯৯২), নির্বাচিত নারী (১৯৯২), বেহুলা একা ভাসিয়েছিল ভেলা (১৯৯৩) ইত্যাদি।
গদ্যগ্রন্থ : ভালোবাসো? ছাই বাসো (২০০৮)।
উপন্যাস : অপরপক্ষ (১৯৯২), শোধ (১৯৯২), ভ্রমর কৈও গিয়া (১৯৯৩), লজ্জা (১৯৯৩) ইত্যাদি।
প্রবন্ধ : নষ্ট মেয়ের নষ্ট গদ্য (১৯৯২), যাবো না কেন? যাবো (১৯৯২), ছোট ছোট দুঃখ কথা (১৯৯৪), একা (২০০৩), নারীর কোনো দেশ নেই (২০০৭) ইত্যাদি।
আত্মকাহিনি : আমার মেয়েবেলা (১৯৯৯), উতল হাওয়া (২০০১), ক (২০০৩), দ্বিখণ্ডিত (২০০৪), ৭ (২০০৫), আমি আলো দেখি, তুমি আলো দেখো চিরে দেশ (২০০৬)।
প্র : তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থের নাম কী?
উ : ফরাল দাও (১৯৯৩)।
প্র : তসলিমা নাসরিন দেশত্যাগ করেন কবে?
উ : ১৯৯৪ সালে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্র : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মগ্রহণ কত?
উ : ২৩শে অগস্ট, ১৮৯৮।
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : লাভপুর গ্রাম, বীরভূম।
প্র : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মূলত কী?
উ : তিরিশের দশকের প্রতিনিধি স্থানীয় কথাসাহিত্যিক।
প্র : তাঁর রচিত উপন্যাসগুলোতে কী নিপুণভাবে উপস্থাপিত হয়েছে?
উ : রাঢ় অঞ্চলের প্রাচীন জীবনের সামন্তিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়।
প্র : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত প্রতিনিধি স্থানীয় উপন্যাসগুলো কী?
উ : চৈতালী ঘূর্ণি (১৯৩১), ধাত্রীদেবতা (১৯৩৯), কালিন্দী (১৯৪০), জলসঘর, কবি (১৯৪২), গণদেবতা (১৯৪২), পঞ্চগ্রাম (১৯৪৩), হাঁসুলী বাঁকের উপকথা (১৯৪৭), আরোগ্য নিকেতন (১৯৫০), পঞ্চপুরুষী (১৯৫৬), রাধা (১৯৫৭) ইত্যাদি।
প্র : 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'র পরিচয় দাও।
উ : 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' (১৯৪৭) উপন্যাসে বীরভূমের কাহার সম্প্রদায়ের জীবন, তাদের সংস্কৃতি, ধর্মবিশ্বাস, আচার-আচরণ, লোককথা আঞ্চলিকতার সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। একদিকে এই সম্প্রদায়ের আত্মবিরোধ, পরিবর্তন ও বিলুপ্তি যেমন কাহিনির একটি প্রধান ধারা, আর একটি ধারা হল প্রাচীন সমাজের সঙ্গে নতুন পরিবর্তমান জগতের সংঘাত। উজ্জ্বল এর বিচিত্র চরিত্রগুলি। সেই সঙ্গে আছে এক আদিম মানবিক সংগ্রাম।

2020/5/12 21:28

Scanned with CamScanner

প্র : 'কালিন্দী' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : 'কালিন্দী' (১৯৪০) দুই বিবাদমান জমিদার বাড়ির কাহিনি। নদীর বুকে একটি চরকে কেন্দ্র করে এই দুই পরিবারের দীর্ঘস্থায়ী বিরোধ সামন্ততান্ত্রিক জীবনের কতগুলি উপাদানের প্রতি তারাশঙ্করের মমতা এবং জমিদার ও শিল্পপতির দ্বন্দ্বে জমিদারদের পরাজয়ের জন্য বেদনাবোধ উপন্যাসে স্পষ্ট।

প্র : 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : 'আরোগ্য নিকেতন' (১৯৫৩) ১৯৫২ সালে শারদীয় আনন্দবাজারে 'সঞ্জীবন ফার্মাসী' নামে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই কাহিনির নায়ক এক কবিরাজ, জীবনমশায়। তার জীবনদর্শনের সঙ্গে নব্যশিক্ষিত ডাক্তার প্রদ্যোতের আদর্শিক সংঘাত উপন্যাসে উল্লেখযোগ্য। একদিকে প্রাচীনবিদ্যা ও নবীন শিক্ষার টানাপোড়েন, অন্যদিকে জীবনমশায়ের মৃত্যুরহস্য জিজ্ঞাসা কাহিনিটিকে প্রগাঢ় করে তুলেছে। তারাশঙ্করের অন্যান্য উপন্যাসের মতো এ উপন্যাসেও রয়েছে প্রাচীন ও আধুনিক ভারতীয় দৃষ্টিতে ও পাশ্চাত্য ভাবনায় সংঘাত, সেই সঙ্গে আছে তাঁর মৃত্যু-জিজ্ঞাসা।

প্র : 'কবি' উপন্যাস সম্পর্কে লেখ।

উ : 'কবি' (১৯৪১) ডোম সম্প্রদায়ের একজন যুবকের কবি রূপে প্রতিষ্ঠা এবং দুটি নারীর সঙ্গে তার সম্পর্ক বিষয়ক উপন্যাস। আখ্যানের নিপুণ বিন্যাস, চরিত্রগুলির উজ্জ্বল উপস্থিতি এবং গানের সহজ কথার সঙ্গে জড়িত সংরাগ ও বেদনা সব মিলে এই উপন্যাসটি তারাশঙ্করের একটি শ্রেষ্ঠ রচনা। এই উপন্যাসের 'জীবন এত ছোট ক্যানে' সংলাপটি ক্লাসিক মর্যাদা পেয়েছে।

প্র : 'কবি' নামে বাংলা সাহিত্যের আরেকজন জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক উপন্যাস রচনা করেছেন, তিনি কে?

উ : হুমায়ুন আহমেদ।

প্র : 'যতিভঙ্গ' ভিন্নধর্মী উপন্যাস, কেন?

উ : 'যতিভঙ্গ' (১৯৬২) এক অবাঙালি যুবতী রৌশনকে নিয়ে লেখা। বাংলা উপন্যাসে অবাঙালি চরিত্র বিরল। সেদিক থেকে কাহিনিটি উল্লেখযোগ্য। আধুনিক নারীর জীবনজিজ্ঞাসা ও মূল্যবোধ, পুরুষকেন্দ্রিক জীবনের নানা সমস্যা এই কাহিনিতে তুলে দিয়েছে। তারাশঙ্করের সাহিত্যসৃষ্টিতে যে-ক'টি ব্যতিক্রম আছে 'যতিভঙ্গ' তার অন্যতম।

প্র : 'অভিযান' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : 'অভিযান' (১৯৪৬) উপন্যাসে মফস্বল অঞ্চলের ট্র্যাকদি ভ্রাইভারদের জীবন উপজীব্য। একদিকে ভ্রাইভারদের জীবন পর্যবেক্ষণ, অন্যদিকে মফস্বলের জীবনের আচরণের বৈচিত্র্য, জাত ও জটিল আবেগ ও প্রবল বলিষ্ঠতা এই কাহিনিকে বৈশিষ্ট্য। সত্যজিৎ রায় এই কাহিনি নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন।

প্র : তারাশঙ্করের কোন উপন্যাসকে আঞ্চলিক উপন্যাস বলা হয়। কেন বলা হয়?

উ : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, হাঁসুলীবাঁকের উপকথা, নাগিনী কন্যার কাহিনী প্রভৃতি উপন্যাসকে আঞ্চলিক উপন্যাস বলা হয়। কারণ এই সব উপন্যাসের পটভূমি রাঢ় বাংলা, বিশেষ করে বীরভূম অঞ্চলের মানবগোষ্ঠী ও তাদের সমাজের সামগ্রিক রূপ এতে অঙ্কিত হয়েছে। একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের সব পরিচয়ই এখানে আছে। যেন প্রতিটি উপন্যাসই একটি জনপদ, অঞ্চল।

প্র : কত খ্রিষ্টাব্দে কিসের জন্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অন্তরীণ হন?

উ : ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে আই.এ পাঠকালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের জন্য অন্তরীণ হন।

প্র : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত প্রথম ছোটগল্পের নাম কী? এটি কবে প্রকাশিত হয়?

উ : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত ছোটগল্পের নাম 'রসকলি'। এটি প্রকাশিত হয় ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে।

প্র : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত প্রথম উপন্যাসের নাম ও এর রচনাকাল কত খ্রিষ্টাব্দে?

উ : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত প্রথম উপন্যাসের নাম 'চৈতালী ঘূর্ণি'।

রচনাকাল ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কোন এক সময়।

প্র : 'গল্পসংগ্রহ' গল্পগ্রন্থ সম্পর্কে লেখ।

উ : 'গল্পসংগ্রহ' (১৯৩৭) এগারোটি গল্পের সংকলন। প্রত্যেকটি গল্পের পটভূমি জমিদারের প্রতাপ ও তার প্রজাবর্গের শোচনীয় রূপ। জমিদারতন্ত্রের সৃষ্টি ও অবসানের রূপ এই গল্পগুলিতে লক্ষ করা যায়।

প্র : 'অগ্রদানী' গল্প সম্পর্কে লেখ।

উ : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্পসংগ্রহে একটি 'অগ্রদানী'। গভীর পূর্ণ চক্রবর্তী রায়চৌধুরীদের আশ্রয় কৌশলে নিজস্বতাকে ভুলে দেয় শ্যামাদাস অভিনয়ের হাতে। কিন্তু সেই পুত্রের কালে মৃত্যু হলে তার শ্রাদ্ধে পিণ্ডভক্ষণ লোভী চক্রবর্তী তার ভুল বুঝতে পারে। কিন্তু নিছতির শাস্তির হাত থেকে সে রক্ষা পায় না। এরকম কাহিনিতে গল্পটি রচিত হয়েছে। গল্পটিতে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যা 'প্রবাসী' পত্রিকায়। পরে 'রসকলি' গল্পগ্রন্থে ১৯৩৮ সালে স্থান পায়।

প্র : তারাশঙ্করের ত্রয়ী উপন্যাস কোনগুলো?

উ : ধাত্রীদেবতা, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম।

প্র : 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : 'ধাত্রী দেবতা' (১৯৩৯) বঙ্গশ্রী পত্রিকায় (১৯৩৪) 'জমিদারের মেয়ে' নামে ছোট আকারে প্রথম প্রকাশিত। চার বছর পরে শনিবারের চিঠিতে 'ধাত্রী দেবতা' নামে এই উপন্যাসটি যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়। এক ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বংশকে কেন্দ্র করে দেশের সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনের নানা আন্দোলন ও পরিবর্তন এই উপন্যাসের উপজীব্য।

প্র : গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম উপন্যাস সম্পর্কে লেখ।

উ : ধাত্রীদেবতা (১৯৩৯), গণদেবতা (১৯৪৩), পঞ্চগ্রাম (১৯৪৪) মূলত একই সুরে বাঁধা। কারণ শিবনাথ নামক এক ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চরিত্রকে অবলম্বন করে তিনটি উপন্যাসই বিকশিত হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময় ও সমাজ গণদেবতা পঞ্চগ্রামে মুখ্য। এ সময় ভারতের গ্রামীণ সমাজে ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদের সঙ্গে সদ্যজাগরণের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। অবিশ্বাস মঙ্গল, তারকনাথ গাঙ্গুলী, দেবু ঘোষ, হরিদাস মিশ্র, তারকনাথ সাধু সৃষ্টি, ধর্ম, শ্রেণি উপন্যাসকে কেন্দ্রকেন্দ্রিক করেছে। এখানে ধাত্রীদেবতা উপন্যাসের সংকীর্ণতা, শ্রেণি, চৈতন্য সবই ছাড়িয়ে এসেছে। উপন্যাসে সংঘবদ্ধতা মূল সুরে এসে দেবু ঘোষ, হরিদাসকে নির্ভর করে তার এ অধ্যায়। 'পঞ্চগ্রামে'র শেষে ত্রিশূলের শ্রীহরি ঘোষ গ্রহণ করে সমাজতন্ত্রে হয়ে ওঠে। তারাশঙ্কর দেখিয়েছেন, আগত বহুল সমাজে ধর্মঘটকরা বিপ্লবীদলের কাছে পরাস্ত হবে, এটাই সময়ের দাবি।

প্র : আদিবাসী সাঁওতাল বিদ্রোহ নিয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস কোনটি?

উ : অরণ্যবহ্নি (১৯৬৬)।

প্র : বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে রচিত তাঁর উপন্যাসের নাম কী?

উ : 'একটি কালো মেয়ের কথা (১৯৭১)।

প্র : তাঁর রচিত উপন্যাসগুলোকে কী জীবনরূপে প্রকাশিত হয়েছে?

উ : মানবচরিত্রের নানান জটিলতা ও নিগূঢ় রহস্য।

প্র : তিনি আর কী হিসেবে প্রসিদ্ধ?

উ : গল্পকার হিসেবে।

প্র : তাঁর রচিত ছোটগল্পগুলো কী?

উ : রসকলি, বেদেনী, ডাকহরকরা।

প্র : তাঁর রচিত কোন কোন গল্প ও উপন্যাস অবলম্বনে সার্থক চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে?

উ : দুই পুরুষ, কালিন্দী, আরোগ্য নিকেতন, সপ্তপদী ইত্যাদি।

প্র : তিনি কী কী পুরস্কারে ভূষিত হন?

উ : সাহিত্যকৃতির জন্য শরৎ স্মৃতি পুরস্কার, জগত্তারিণী স্মৃতিপদক, রবীন্দ্র পুরস্কার, সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার ও জ্ঞানপীঠ পুরস্কার।

প্র : তিনি কী কী উপাধি লাভ করেন?

উ : পদ্মশ্রী ও পদ্মভূষণ উপাধি।

2020/5/12 21:28

Scanned with CamScanner

প্র : তিনি কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : কলকাতা: ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১।
প্র : তারাশঙ্করের মৃত্যুর পর বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের ভারতস্থ হাই কমিশনার প্রেরিত শোকবার্তায় কী বলা হয়েছে?
উ : ভারতস্থ বাংলাদেশ (প্রবাসী সরকারের) হাই কমিশনার এম. হোসেন ১৯৭১ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর লি.আর/৪৮/৭১ স্মারকমূলে এই শোকবার্তা প্রেরণ করেন: 'প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের হঠাৎ তিরোধানের সংবাদে শোকাভিভূত হলাম। সাহিত্যজগতের মুকুটমণির এই তিরোধানে তাঁর শূন্যস্থান পূরণ করতে অনেক সময় লাগবে এবং সাহিত্যক্ষেত্রেও এ ক্ষতি বিরাট। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদান ছিল অসীম। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি ও তাঁর আত্মীয়বর্গকে জানাই আমার প্রগাঢ় সমবেদনা।'

তালিম হোসেন

প্র : তালিম হোসেনের জন্ম কবে এবং কোথায় হয়?
উ : ১৯১৮ সালে নওগাঁর বদলগাছি নামক এলাকায়।
প্র : তিনি কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?
উ : ম্যাসিক মোহাম্মদী।
প্র : তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : দিশারী (১৯৫৬), শাহীন (১৯৬২), ইসলামী কবিতা (১৯৮১), নূহের জাহাজ (১৯৮৩)।
প্র : তাঁর অনুবাদকৃত গ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : স্বর্গচারণ (উপন্যাস ১৯৫৯), দানবীর এন্দ্রুর কানেগী (১৯৬২)।
প্র : তিনি কোন ধরনের সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত?
উ : ইসলামি স্বাতন্ত্র্যবাদী সাহিত্যিক হিসেবে।
প্র : তিনি কী কী পুরস্কার ও খেতাব লাভ করেন?
উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৫), সিতারা-ই-ইমতিয়াজ (১৯৭০), একুশে পদক (১৯৮২), বাংলা সাহিত্য সম্মেলন (১৯৮২), নজরুল একাডেমী পুরস্কার, চুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ (১৯৯৩)।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার

প্র : দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের জন্ম কবে?
উ : ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দ।
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : উলাইল গ্রাম, ঢাকা।
প্র : দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার মূলত কী?
উ : শিশুসাহিত্যিক ও লোক সংগ্রাহক।
প্র : তাঁর রচিত প্রবন্ধাবলি কোন কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?
উ : প্রদীপ ও সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায়।
প্র : তিনি কোন পত্রিকাটি প্রকাশ করেন?
উ : সুধা।
প্র : তিনি জমিদারির কাজে দশ বছর যাবৎ ময়মনসিংহে থেকে কী করেন?
উ : গ্রাম বাংলার লুপ্তপ্রায় কথাসাহিত্য সংগ্রহ ও তার গবেষণা।
প্র : তিনি এই লোকসংগ্রহ উপাদানগুলো কার পরামর্শে ও কীভাবে প্রকাশ করেন?
উ : দীনেশচন্দ্র সেনের পরামর্শে রসকথা, ব্রতকথা, রূপকথা ও গীতিকথা এ চার ভাগে ভাগ করে প্রকাশ করেন।
প্র : তিনি কোথায় সভাপতি নির্বাচিত হন?
উ : বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সমিতির।
প্র : তিনি পরিষদ কর্তৃক কোন পত্রিকার সম্পাদক নির্বাচিত হন?
উ : পথ নামক সাময়িকীর।
প্র : তাঁর সংগৃহীত কাহিনি নিয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো কী?
উ : ঠাকুরমার ঝুলি, ঠাকুরদাদার ঝুলি, দাদা মশায়ের থলে, ঠানদিদির থলে, খোকা বাবুর খেলা, আমাল বই, কিশোরদের মন, বাংলার সোনার ছেলে, পৃথিবীর রূপকথা ও সবুজ লেখা।
প্র : 'ঠাকুরমার ঝুলি' সম্পর্কে লেখ।
উ : 'ঠাকুরমার ঝুলি' (১৯০৭) বাংলাদেশে

প্রচলিত বিভিন্ন রূপকথার সংকলন। রূপকথার সঙ্গে এখানে উপকথার মিশ্রিত আছে। কারণ পশু-পাখির মুখ দিয়েও কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এই গল্পগুলি বলার গ্রাম্যীণ রীতি ও আমা প্রথাসহ অক্ষুণ্ন রেখে দক্ষিণারঞ্জন সম্পাদনা ও প্রকাশ করে চিরস্মরণীয় হয়েছেন।
প্র : 'ঠাকুরমার ঝুলি'র পরবর্তী খণ্ডের নাম কী?
উ : পরবর্তী খণ্ডের নাম 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' (১৯০৯)। 'ঠাকুরমার ঝুলি' ও 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' বাংলা শিশুসাহিত্য তো বটেই বাংলা লোকসাহিত্যচর্চার ইতিহাসেও অমূল্য সম্পদ।
প্র : তিনি কোন ছদ্মনামে লিখতেন?
উ : দৃষ্টিহীন।
প্র : তিনি বাংলায় কীসের পরিভাষা রচনা করেন?
উ : বিজ্ঞানের।
প্র : তিনি রূপকথা লেখক হিসেবে কার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করেন?
উ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের।
প্র : তাঁর মৃত্যু সাল কত?
উ : ১৯৫৭।

দাউদ হায়দার

প্র : দাউদ হায়দার কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি, পাবনার দোহার নামক স্থানে।
প্র : তিনি মূলত কী?
উ : লেখক।
প্র : তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের নাম কী কী?
উ : জন্মই আমার আজন্ম পাপ, এই শাওনে এই পরবাসে, আমি ভাল আছি তুমি, পাথরের পুঁথি।
প্র : দাউদ হায়দার কোথায় আছেন?
উ : তিনি জার্মানিতে অবস্থান করছেন।

দিলওয়ার

প্র : দিলওয়ার কত তারিখে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : তিনি ১৯৩৭ সালের ১লা জানুয়ারি সিলেটের সুরমা নদীর দক্ষিণে জাফলঙ্গায় জন্মগ্রহণ করেন।
প্র : তাঁর মাতা-পিতা ও স্ত্রীর নাম কী?
উ : মাতার নাম রহিমুন্নেছা, পিতার নাম মোহাম্মদ হাসান খান। তিনি দুই বিয়ে করেন। প্রথম স্ত্রী আছিদা খাতুন, দ্বিতীয় স্ত্রী ওয়াহিদা খাতুন।
প্র : তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা কী?
উ : তিনি ১৯৫২ সালে প্রবেশিকা ও ১৯৫৪ সালে সিলেট এম.সি. কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাস করেন।
প্র : তাঁর প্রথম কবিতা কোথায়, কবে ছাপা হয়?
উ : সিলেটের সাপ্তাহিক 'মূলকেরী' পত্রিকায় ১৯৪৯ সালে তাঁর প্রথম কবিতা ছাপা হয়। নাম: 'সারিবদ্ধ হে নাজরুল'।
প্র : দিলওয়ারের প্রকৃত নাম কী?
উ : প্রকৃত নাম দিলওয়ার খান। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'জিজ্ঞাসা' (১৯৫৩) দিলওয়ার খান নামেই লেখেন। এর পরে তিনি নামের শেষের 'খান' শব্দ বাদ দেন।
প্র : তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের নাম কী?
উ : ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত 'জিজ্ঞাসা' কাব্যগ্রন্থই তাঁর প্রথম গ্রন্থ।
প্র : দিলওয়ার রচিত কয়েকটি গ্রন্থের নাম লেখ।
উ : কবিতা গ্রন্থ : 'জিজ্ঞাসা' (১৯৫৩); 'ঐকতান' (১৯৬৪); 'উত্তির উল্লাস' (১৯৭২); 'রক্তে আমার অনাদি অগ্নি' (১৯৮৩)। গানের বই : 'পুবাল হাওয়া' (১৯৬৫); 'বাংলা তোমার আমার' (১৯৭২)। শিশু-সাহিত্য : 'দিলওয়ারের শতছড়া' (১৯৮৯); 'ছড়ায় অআ কখ' (১৯৯৪)।
প্র : দিলওয়ার কোন ধারার লেখক?
উ : প্রথম জীবনে তিনি জাতীয় জীবন ঘেঁষা ও বিপ্লবী লেখা লিখেছেন। পরে নিজ এলাকা সিলেটে থিতু হন এবং

2020/5/12 21:28
Scanned with CamScanner

লেখাতেও জাতীয় জীবনের ভাব কমে আসে। জাতীয় জীবনে অংশগ্রহণের চেয়ে আঞ্চলিক জীবনেই তিনি শেষ দিকে অংশ নিয়েছেন। চেতনাগত দিক থেকেও বিপ্লবীপণার চেয়ে আধ্যাত্মিকতায় তাঁই নিয়েছিলেন তিনি।

প্র : তিনি প্রধান কী কী পুরস্কার পেয়েছেন?

উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৮০), আবুল মনসুর আহমদ সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৬), লন্ডনে সিলেট সেন্টারে সংবর্ধনা (১৯৮৭) ইত্যাদি।

প্র : কবে তিনি মৃত্যুবরণ করেন?

উ : সিলেটের ভার্থখলার নিজ বাড়িতে তিনি ১০ই অক্টোবর, ২০১৩ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন।

'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কথাটি বুঝিয়ে লেখ।

উ : জাতিসত্তার শোণিত এবং অস্থি আমরা আমাদের অস্তিত্বে ধারণ করে আছি, এখানে সে কথাই আলংকারিক ভাষায় কবি ব্যক্ত করেছেন।

প্র : 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতাটি কত সালে প্রকাশিত হয়?

উ : ১৯৮১ সালে সিলেট থেকে।

প্র : 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতাটির মূল আলোচ্য বিষয় কী?

উ : সাগরদুহিতা ও নদীমাতৃক বাংলাদেশের বন্দনাই কবিতাটির মূল আলোচ্য বিষয়।

প্র : কবি কোন নদীর যৌবন কামনা করেছেন?

উ : পদ্মা নদীর।

প্র : কবি কোন নদীর প্রেম কামনা করেছেন?

উ : যমুনা নদীর।

প্র : কার কাজল বুকে পলি রয়েছে?

উ : সুরমা নদীর কাজল বুকে।

প্র : সুরমার কাজল বুকের পলিতে কী দেখা যায়?

উ : গলিত হেম।

প্র : 'গলিত হেম' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উ : গলিত হেম বলতে আমাদের দেশের পলিত সোনা মেশানো পলিমাটির কথা বলা হয়েছে। পলিমাটির উর্বরতাকে পলিত সোনার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

প্র : কিসের বুকে কবি নিরবধি পাতাতে চুলি?

উ : পদ্মা, যমুনা, সুরমা, মেঘনা, পদ্মা ও কর্ণফুলী নদীর বুকে।

প্র : জীবনের রং কেমন?

উ : অনেক বৈচিত্র্যপূর্ণ।

প্র : মুক্তমরণ কোথায় ঘুরে?

উ : মুক্তমরণ জীবনের বাঁকে বাঁকে ঘুরে।

প্র : কবি তাঁর প্রাণ স্বপ্নকে কোথায় রেখেছেন?

উ : বঙ্গোপসাগরে কবি তাঁর প্রাণ স্বপ্নকে রেখেছেন।

প্র : কবি তাঁর ক্রোধকে কিসের সঙ্গে উপমা করেছেন?

উ : ভয়াল ঘূর্ণির সঙ্গে।

প্র : কার উপমা নেই বলে কবি মত প্রকাশ করেছেন?

উ : ভয়াল ঘূর্ণির মতো কবি তাঁর ক্রোধের কোনো তুলনা নেই বলে মত প্রকাশ করেছেন।

প্র : ক্রোধে কারা জ্বলে?

উ : স্বজনরা।

প্র : 'নরদানব' বলতে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে?

উ : মানুষরূপী বিদেশি নরপিশাচদের বোঝানো হয়েছে। যারা নিজ স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশে আমাদের দেশের সম্পদকে লুটে নিচ্ছে।

প্র : 'প্রাণের জাহাজ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উ : আমাদের দেশের জনসম্পদকে প্রাণের জাহাজ বলা হয়েছে।

প্র : গণমানব কারা?

উ : গণমানব বলতে প্রান্তিক জনগণকে বোঝানো হয়েছে।

দিলারা হাসেম

প্র : দিলারা হাসেম কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১৯৩৬ সালের ২৫শে অগস্ট, যশোরে।

প্র : তিনি কী হিসেবে পরিচিত?

উ : কথাসাহিত্যিক। তবে কর্মজীবনে তিনি ছিলেন আমেরিকা (বাংলা বিভাগ), ওয়াশিংটন-এর অনুষ্ঠান ঘোষক ও বুককিপার হিসেবে।

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের নাম কী কী?

উ : উপন্যাস : ঘর মন জানালা (১৯৬৫), একদা এবং অনন্ত (১৯৭২), অবতরণ কালে (১৯৭৭), আমলকির মৌ (১৯৭৮), কাকতাড়ুয়া (১৯৮২), শঙ্খ (১৯৮৫), অনুক্ত পদাবলী (১৯৯৫), সাদর অন্তর (১৯৯৮)। গল্প : হলদে পাখীর কান্না (১৯৭৩), সিন্ধু পারের উপাখ্যান (১৯৮৮), নায়ক (১৯৯৯)। কবিতা : ফেরারী (১৯৭৭)।

প্র : 'একদা এবং অনন্ত' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : অতীতের সর্বগ্রাসী অন্ধকারে মানুষ হারিয়ে ফেলে নৈতিকতা। হারিয়ে ফেলে অভিজাত্যের গরিমা, পাপ পুণ্যের ব্যবধান। 'তবে কি সব ইচ্ছের কবর দেয়ার নামই ভাল থাকা' এই প্রশ্ন পাঠক সমাজে রেখে দিলারা হাশেমের রচিত 'একদা এবং অনন্ত' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালে। আর এই উপন্যাসটিতে ফুটে উঠেছে প্রেম, বাৎসল্য, সংস্কার, প্রীতি, ভালবাসা, ত্যাগ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা, কান্না ইত্যাদি।

প্র : 'আমলকির মৌ' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : আনন্দ, বেদনা, দুঃখ, ক্রোধ, বাস্তবতা, নিঃসঙ্গতা, প্রাপ্তি, অপ্রাপ্তির জটিল আবর্তে ঘুরপাক খাওয়া সারা, মতিন, মাজেদা, সালেহা, সকিনা ইত্যাদি চরিত্র নিয়ে দিলারা হাশেম রচনা করলেন 'আমলকির মৌ'। যা মনঃসমীক্ষণের উল্লেখযোগ্য দলিল। এই উপন্যাসটি প্রকাশ হয় ১৯৭৮ সালে।

প্র : 'আমলকি'র সঠিক বানান কী?

উ : আমলকী; তেমনি হরীতকী'।

প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?

উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭৬), শঙ্খচিল সাহিত্য পুরস্কার, উত্তর আমেরিকা কবিতা পরিষদ পুরস্কার (১৯৯৪), শিকাগো সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯৭) ইত্যাদি।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

প্র : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-এর জন্মসাল কবে?

উ : ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দ, ১৭৮৩।

প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

প্র : তিনি কী নামে পরিচিত?

উ : ডি.এল. রায়।

প্র : তাঁর আত্মজীবনীমূলক প্রথম কাব্যের নাম কী?

উ : আর্যগাথা (১৮৮২)।

প্র : তাঁর রচিত ইংরেজি কাব্যগ্রন্থের নাম কী?

উ : Lyrics of Ind.

প্র : তিনি কী কী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন?

উ : কবি, নাট্যকার ও গীতিকার।

প্র : বাংলা নাটকে তাঁর প্রথম সৃষ্টি কী?

উ : সার্থক ঘটনামূলক চরিত্র সৃষ্টিতে।

প্র : তাঁর রচিত সার্থক ঐতিহাসিক নাটক কী?

উ : সাজাহান (১৯০৯) (যেটিকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঐতিহাসিক নাটক বলা হয়ে)।

প্র : সম্রাট সাজাহানকে নিয়ে আসেই নাটক লিখেছেন। এঁদের মধ্যে প্রথম কে সাজাহানকে নিয়ে নাটক লিখেন।

উ : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

প্র : তিনি কী হিসেবে স্বদেশিকার পরিচয় দিয়েছেন?

উ : গীতিকার ও সুরকার হিসেবে।

প্র : তিনি কোন বিখ্যাত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন?

উ : পূর্ণিমা সম্মিলন (১৯০৫)।

প্র : তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো কী?

উ : আর্যগাথা (১ম ভাগ ১৮৮২, ২য় ভাগ ১৮৯৩), মন্দ্র (১৯০২), আলেখ্য (১৯০৭), ত্রিবেণী (১৯১২) ইত্যাদি।

প্র : 'ধনধান্য পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' গানটির রচয়িতা কে?

উ : ডি. এল. রায়।

প্র : এটি তাঁর কোন নাটকে ছিল?

উ : 'সাজাহান' নাটকে এই গান ছিল।

প্র : তাঁর রচিত ব্যঙ্গ কবিতাগ্রন্থ কী?

উ : আষাঢ়ে (১৮৯৯), হাসির গান (১৯০০)

2020/5/12 21:28

Scanned with CamScanner

প্র : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রচিত কাব্যনাট্যের নাম কী?
উ : পাষাণী (১৯০০)।
প্র : তাঁর রচিত ঐতিহাসিক নাটক কী কী?
উ : প্রতাপসিংহ (১৯০৩), দুর্গাদাস (১৯০৬), মেবার পতন (১৩১৫), নূরজাহান (১৯০৮), সাজাহান (১৯০৯), চন্দ্রগুপ্ত (১৯১১), সিংহল বিজয় (১৯১৬)।
প্র : 'সাজাহান' নাটকের পরিচয় দাও।
উ : 'সাজাহান' (১৯০৯) মোগল সম্রাট সাজাহানের জীবন অবলম্বনে রচিত ঐতিহাসিক নাটক। নায়কের করুণ জীবন নাটকটিকে অত্যন্ত জনপ্রিয় করেছিল। বাংলা নাট্যজগতের অন্যতম মহাসাফল্য নাটক 'সাজাহান'। সংলাপের আড়ম্বর, বাকশৈলীর বর্ণাঢ্যতা, আবেগের প্রাচুর্যতা ও ঘটনার অতি-নাটকীয়তা এই নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সম্রাট সাজাহানকে নিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালই প্রথম নাটক লেখেন।
প্র : 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের পরিচয় দাও।
উ : 'চন্দ্রগুপ্ত' (১৯১১) জনপ্রিয় নাটক। গ্রিক-ভারতীয় সম্পর্কের ইতিহাসের একটি বিশেষ মুহূর্তকে এই নাটকের পটভূমি করা হয়েছে। এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র চাণক্যের মধ্যে কাঠিন্য এবং কোমলতার বিপরীত সমাবেশ, দেশপ্রেমের উদ্দীপ্তি এবং আত্মার আড়ম্বর এই তিনদিক থেকে বাংলা নাটকের ইতিহাসে 'চন্দ্রগুপ্ত' বিশেষভাবে আলোচিত হয়।
প্র : তাঁর রচিত সামাজিক নাটকগুলোর নাম কি?
উ : পরপারে (১৯১২), বঙ্গনারী (১৩১৬), নকশা ও প্রহসন : এক ঘরে (১৮৮৯), কল্কি অবতার (১৮৯৫), বিরহ (১৮৯৭), ত্র্যহস্পর্শ (১৯০০), প্রায়শ্চিত্ত (১৯০২), পুনর্জন্ম (১৯১১), আনন্দ বিদায় (১৯১২)।
প্র : তাঁর রচিত রোমান্টিক পৌরাণিক নাটক কী কী?
উ : চন্দ্রগুপ্ত (১৯১১), সিংহল বিজয় (১৯১৬)
প্র : তাঁর মৃত্যু তারিখ কত?
উ : ১৭ই মে, ১৯১৩।

দীনবন্ধু মিত্র

প্র : দীনবন্ধু মিত্রের জন্মসাল কবে?
উ : ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দ।
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : চৌবেড়িয়া গ্রাম, নদীয়া।
প্র : তাঁর সাহিত্যজীবনের গুরু কী ছিল?
উ : কবিতা লিখে।
প্র : তিনি কার অনুপ্রেরণায় কবিতা লিখেন?
উ : ঈশ্বর গুপ্তের।
প্র : তাঁর কবিতা কোন কোন পত্রিকায় প্রকাশ পায়?
উ : সংবাদ প্রভাকর (১৯৩১), সংবাদ সাধু রঞ্জন (১৮৪৭)।
প্র : তাঁর রচিত জনপ্রিয় কাব্যগুলো কী?
উ : সুরধুনী কাব্য (১ম ভাগ ১৮৭১ ও ২য় ভাগ ১৮৭৬) ও ষাদশ কবিতা (১৮৭২)।
প্র : দীনবন্ধু মিত্র কোন রূপে সমধিক খ্যাত?
উ : নাটকার রূপে।
প্র : নীলকর সাহেবদের বীভৎস অত্যাচারে নাস্তিক নীল চাষিদের দুরবস্থা অবলম্বনে রচিত তাঁর নাটকের নাম কী?
উ : নীল-দর্পণ (১৮৬০)।
প্র : নীল-দর্পণকে বাংলাদেশের নাটক বলা হয় কেন?
উ : কারণ, নাটকটির কাহিনি মেহেরপুর অঞ্চলের, দীনবন্ধু ঢাকায় অবস্থানকালে তা রচনা করেন। নাটকটি প্রথম প্রকাশ হয় ঢাকার বাংলা প্রেস থেকে এবং প্রথম মঞ্চস্থও হয় ঢাকাতে।
প্র : নীল-দর্পণ নাটকের মাইকেল মধুসূদন দত্ত কৃত ইংরেজিতে অনুবাদের নাম কী?
উ : Nil Darpan or The Indigo Planting Mirror (1861)
প্র : মধুসূদন কোন ছদ্মনামে এই অনুবাদ করেন?
উ : A Native.
প্র : তিনি আর কী রচনা করে দক্ষতার পরিচয় দেন?
উ : প্রহসন।
প্র : ইংরেজি শিক্ষিত নব্য যুবকদের মদ্যপান ও বারবণিতা সঙ্গকে ব্যঙ্গ করে তাঁর রচিত প্রহসন কী?
উ : সধবার একাদশী (১৮৬৬)।

প্র : সধবার একাদশী নাটকের ব্যঙ্গ করে তাঁর রচিত প্রহসনের নাম কী?
উ : বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৮৬৬)।
প্র : তাঁর রচিত অপরাপর নাটকগুলোর নাম কী?
উ : জীবন তপস্বিনী (১৮৬৬), লীলাবতী (১৮৬৭), জামাই বারিক (১৮৭২), কমলে কামিনী (১৮৭৩) ইত্যাদি।
প্র : 'নীল-দর্পণ' নাটক সম্পর্কে লেখ।
উ : 'নীল-দর্পণ' (১৮৬০) নাটকটির ঘটনা, চরিত্রাঙ্কন, রচনাস্থান, প্রকাশস্থান, মুদ্রণালয়, প্রথম প্রকাশন সবই বাংলাদেশে। প্রথম প্রকাশের সময় দীনবন্ধুর নাম ছিল না। এইভাবে গ্রন্থাকারের নাম গুপ্ত রাখা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নীলকরদের অত্যাচারে পীড়িত সাধারণ কৃষক-জীবনের মর্মন্তুদ ছবি নাটকটিতে প্রকাশিত হয়। এন্ড্রুজ এবং তা প্রকাশ করেন রেভারেন্ড জেমস লঙ। নাটকের বাস্তবতা এবং চরিত্রগুলির স্বাভাবিকতার গুণের জন্য অনেকেই নীল-দর্পণকে Uncle Tom's Cabin-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। উল্লেখযোগ্য চরিত্র : গোলক বসু, সৈরিন্ধ্রী, রাইচরণ, তোরাপ, সাবিত্রী, সরলতা, ক্ষেত্রমণি ইত্যাদি।
প্র : 'সধবার একাদশী' সম্পর্কে লেখ।
উ : 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬) প্রহসন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুরাপান ও বেশ্যাসক্তি একশ্রেণির যুবকের জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। 'সধবার একাদশী' সেই সামাজিক বিপর্যয়ের কাহিনি। নায়ক নিমচাঁদের জীবনে প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও ব্যর্থতা, অধঃপতন বোধ ও আত্মগ্লানি নাটকটিতে এক গভীর মাত্রা যোজনা করেছে। চরিত্রসৃষ্টি, সংলাপ, ঘটনাপ্রবাহ, কৌতুক সবকিছুর মিলিতরূপে 'সধবার একাদশী' বাংলা সাহিত্যের একটি স্মরণীয় রচনা। এই নাটকের নায়ক নিমে দত্ত বাংলা সাহিত্যের অবিস্মরণীয় চরিত্র। বলা হয়, কেনারাম চরিত্রের মধ্য দিয়ে তৎকালীন শিক্ষিত শ্রেণির নৈতিক অবস্থান এবং বিচার ব্যবস্থার হাস্যকর পরিচয় ফুটে উঠেছে। উল্লেখযোগ্য চরিত্র : জীবনকৃষ্ণ, অটলবিহারী, নিমচাঁদ, কেশবলাল, সৌদামিনী, দাসী, অক্ষয়, ইন্দ্রাণী।
প্র : নীল-দর্পণ কে কি ঐতিহাসিক নাটক বলা যায়?
উ : নীল-দর্পণ নাটকের কাহিনিসূত্র গড়ন ঘটনাবৈচিত্র্য, মুদ্রণের নাটার স্থান, চৌধাড়া গ্রামের বিস্তৃতির বিবরণ ও সাহেবের বিস্তৃতির বিবরণ নীলকর সাহেবদের নিষ্ঠুরতে পদ্ম মেরেগাছুনি। এই নাটকের একটি ক্ষুদ্র অংশও ঐতিহাসিক। কিন্তু সেকে নাটকটি ঠিক ঐতিহাসিক নাটক বলা যায় না।
প্র : নীল-দর্পণ নাটকের কী কী ত্রুটি সমালোচকেরা নির্দেশ করে থাকেন?
উ : নীল-দর্পণ নাটকের প্রধান ত্রুটি অতি নাটকীয়তা। শেষ দৃশ্যে নবীন বসুর স্পালিশ ট্রাজেডির মতো ঔজস্ব হয় সঞ্চার করে। দ্বিতীয় ত্রুটি অন্তশ্রেণির চরিত্রগুলির সংলাপের কৃত্রিমতা, অযথা শব্দবহুল সাধুরীতির ভাষা নিতান্ত কৃত্রিম হয়ে পড়েছে।
প্র : নীল-দর্পণ নাটককে ট্রাজেডি বলা যায় কি?
উ : নীল-দর্পণ নাটক সেই অর্থে ট্রাজেডি নয়। কারণ এই নাটকে কোনো নায়ক চরিত্র ভুল-ত্রুটি হেতু দুঃখবহ পরিণতির জন্য দায়ী নয়। দর্শকচিত্তে ট্রাজেডিসুলভ pity-জাগায় না নাটকের ট্রাজিক করুণরস সৃষ্টি করতে মৃত্যুর ঘটনার বাহুল্য সৃষ্টি করে ভয়ানক রস সৃষ্টি করেছেন। একে বরং মেলোড্রামা বলা যায়।
প্র : 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র পরিচয় দাও।
উ : 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬) হাস্যরসাত্মক নাটক। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন যে এই নাটক কোনো 'জীবিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছিল।' ১৮৭২ সালে নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়। উল্লেখযোগ্য চরিত্র : নসিরাম, রতা, রাজীব, রাজমণি, কেশব, বৈকুণ্ঠ ইত্যাদি।
প্র : 'জামাইবারিক' নাটক সম্পর্কে লেখ।
উ : 'জামাইবারিক' (১৮৭২) হাস্যরসাত্মক নাটক। ১৮৭২ সালের ১৪ই ডিসেম্বর

2020/5/12 21:28
Scanned with CamScanner

কলকাতার ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, 'জামাই বারিকের দুই স্ত্রীর বৃত্তান্ত প্রকৃত।' নাটকটির ঘটনা সংস্থান, চরিত্রসৃষ্টি এবং সংলাপ রচনা বহু প্রশংসিত। এই নাটকের অন্তর্গত বিন্দুবাসিনী ও বগলার কলহ দৃশ্যটি ১৯২৬ সালে 'জেনানাযুদ্ধ' নামে প্রকাশিত হয়। উল্লেখযোগ্য চরিত্র : বিজাবরত, অভয়কুমার, কামিনী, বগলা, বিন্দুবাসিনী ইত্যাদি।

প্র : 'কমলেকামিনী' নাটক সম্পর্কে লেখ।

উ : 'কমলেকামিনী' (১৮৭৩) দীনবন্ধু মিত্রের সর্বশেষ নাটক। এই নাটকের পটভূমি কাছাড় অঞ্চল। চরিত্রগুলি সবই অভিজাত বংশীয় তবে দুর্বল। ২০ শে ডিসেম্বর ১৮৭৩ তারিখে নাটকটি ন্যাশনাল থিয়েটারে সর্বপ্রথম অভিনীত হয়। উল্লেখযোগ্য চরিত্র : রাজা, সমরকেতু, শশাঙ্কশেখর, গান্ধারী, সুশীলা, সুরবালা।

প্র : দীনবন্ধু মিত্র কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?

উ : ১লা নবেম্বর, ১৮৭৩।

দীনেশচন্দ্র সেন

প্র : দীনেশচন্দ্র সেনের জন্মতারিখ কত?

উ : ৩রা নবেম্বর, ১৮৬৬।

প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : মাতুলালয়, বগজুড়ি গ্রামে, ঢাকা জেলা।

প্র : তাঁর পৈতৃক নিবাস কোথায়?

উ : সুয়াপুর গ্রাম, ঢাকা।

প্র : তিনি পল্লিঅঞ্চলে ঘুরে ঘুরে কী সংগ্রহ করেন?

উ : প্রাচীন বাংলা পুথি ও লোককথা।

প্র : তিনি তাঁর সংগৃহীত পুঁথি থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে কী রচনা করেন?

উ : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (১৮৯৬)।

প্র : 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' মূলত কী?

উ : বাংলা সাহিত্যের সুশৃঙ্খল ও তথ্যসমৃদ্ধ ধারাবাহিক ইতিহাসমূলক গ্রন্থ।

প্র : কোনগ্রন্থ প্রকাশিত হলে পাশ্চাত্যের বহু মনীষীর কাছ থেকে তিনি ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেন?

উ : 'History of Bengali Language and literature' (১৯১১)।

প্র : তাঁর রচিত আর একটি গবেষণাগ্রন্থের নাম কোনটি?

উ : বঙ্গসাহিত্য পরিচয় (১৯১৪)।

প্র : তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে কী লাভ করেন?

উ : রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলোশিপ (১৯১৩)।

প্র : তিনি কী সম্পাদনা করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন?

উ : মৈমনসিংহ-গীতিকা (১৯২৩), পূর্ববঙ্গ গীতিকা (১৯২৬)।

প্র : কাকে নিয়োগ করে তিনি এ গীতিকাগুলো সংগ্রহ করেন?

উ : চন্দ্রকুমার দে।

প্র : এ ধরনের কাজে তিনি আর কাকে নিয়োগ করেছিলেন?

উ : কবি জসীম উদ্‌দীনকে।

প্র : 'বৃহৎবঙ্গ' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : 'বৃহৎবঙ্গ' (দুই খণ্ডে প্রকাশিত ১৯৩৫) সুপ্রাচীনকাল হতে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত সময়ের বাংলাদেশের ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস নিয়ে লিখিত গ্রন্থ। 'বৃহৎবঙ্গ' বহু তথ্য সম্বলিত এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ রচনা। নিরপেক্ষভাবে তথ্য প্রদানের জন্য গ্রন্থটি সর্বমহলে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়।

প্র : 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (১৮৯৬) বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাসগ্রন্থ। বঙ্গভাষা ও বঙ্গলিপির উৎপত্তি, সংস্কৃত-প্রাকৃত ও বাংলার সম্পর্ক, প্রাচীন বাংলা সাহিত্য, মধ্যযুগের ধর্মগোষ্ঠী ও তাদের সাহিত্যের যোগ ইত্যাদি বিষয়ের মনোজ্ঞ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে এই গ্রন্থে। ইংরেজ-পূর্ব বাংলা সাহিত্যের এমন বিশারদ এবং অনুরাগপূর্ণ ইতিহাস ইতোপূর্বে রচিত হয় নি। এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাসগ্রন্থ যেখানে সাহিত্য ও সমাজের গূঢ় সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়া হয়।

প্র : পূর্ববঙ্গ/মৈমনসিংহ-গীতিকার পরিচয় দাও।

উ : 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' পূর্ববঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চল, বিশেষত ময়মনসিংহ থেকে চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত। গীতিকাগুলি ১৯২৩ সালে 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' নামে প্রকাশিত হয়। দীনেশচন্দ্র সেন ছিলেন এর সম্পাদক। আরও কয়েকটি খণ্ড 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামে প্রকাশিত হয়। ২য় খণ্ড (১৯২৬), ৩য় খণ্ড (১৯৩০), ৪র্থ খণ্ড (১৯৩২)। এই সমগ্র গীতিকা সংকলনই 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'। এই গীতিকাগুলি Eastern Bengal Ballads নামে (১৯২৩-৩২) চারখণ্ডে ইংরেজিতে অনূদিত হয়। কাহিনিগুলির প্রাচীনত্ব যেমনই হোক, সাহিত্যিক মূল্য যথেষ্ট। এই কাহিনিগুলির বৈচিত্র্য সারল্য এবং সৌন্দর্য সম্বন্ধে সমালোচকেরা একমত। এগুলো সম্পূর্ণভাবে মানুষের কথাই বলা হয়েছে। আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ নেই। এমনকি এদের কাঠামোও মধ্যযুগের অন্যান্য কাব্য থেকে পৃথক।

প্র : তিনি কী কী ডিগ্রি, পদক ও উপাধি লাভ করেন?

উ : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ডি.লিট. ডিগ্রি (১৯২১), জগত্তারিণী স্বর্ণপদক (১৯৩১) ও ভারত সরকার কর্তৃক রায় বাহাদুর (১৯২১) উপাধি।

প্র : তিনি কোনগ্রন্থ রচনা করে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন?

উ : 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (১৮৯৬)।

প্র : তিনি কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?

উ : ২০শে নবেম্বর ১৯৩৯: বেহালার 'রূপেশ্বর' ভবনে।

দোম আন্তোনিয়ো

প্র : দোম আন্তোনিয়োর জীবনকাল কোন শতকে?

উ : ১৭শ শতকের শেষার্ধ।

প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?

উ : খ্রিষ্ট ধর্মের প্রচারক।

প্র : তাঁর পুরো নাম কী?

উ : দোম আন্তোনিয়ো দে রোজারিয়ো।

প্র : তিনি কোন রাজ্যের রাজদূত ছিলেন?

উ : তৎকালীন কপোত-কলিঙ্গ-পুর অঞ্চলের অন্তর্গত সুখসা রাজ্যের।

প্র : কার দ্বারা তিনি খ্রিষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হন?

উ : ধর্মযাজক আন্তনি কর্তৃক।

প্র : তিনি খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচারের জন্য কোথায় মিশন স্থাপন করেন?

উ : কোচাচাত্তা নামক স্থানে।

প্র : তিনি কোথাকার খ্রিষ্ট ধর্মের আদি প্রবর্তক?

উ : ভাওয়ালের।

প্র : তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম কী?

উ : 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ'।

প্র : 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : বাঙালি খ্রিষ্টান দোম আন্তোনিয়ো রচিত 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' (১৭৩৩) একটি ধর্মীয় বিতর্কমূলক গ্রন্থ। এক ব্রাহ্মণ ও রোমান ক্যাথলিকের মধ্যে ধর্মালোচনা ও হিন্দু ধর্মের অসারত্ব প্রমাণ এই কথোপকথন জাতীয় রচনার মূল বিষয়। এই পাণ্ডুলিপি বর্তমানে পর্তুগালে এভোরা শহরের জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত। গ্রন্থটি মনোএল দা আসুম্পসাঁও নামক এক পর্তুগিজ পাদ্রি কর্তৃক পর্তুগিজ ভাষায় অনূদিত হয়।

প্র : তাঁর রচিত বইটি কে সম্পাদনা করেন?

উ : সুরেন্দ্রনাথ সেন (১৯৩৭)।

প্র : এই গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য কেন?

উ : উল্লেখযোগ্য এ কারণে যে, এই গ্রন্থটি কোনো বাঙালি রচিত প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। অবশ্য বাংলা লিপিতে তখনও মুদ্রণ হয় না। তাই ১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগালের লিসবন শহরে রোমান বর্ণমালায় এই গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থের সঙ্গে আরো দুটি বাংলা গ্রন্থ রোমান লিপিতে ছাপা হয়। এগুলো হচ্ছে : মনোএল দা আসসম্পসাঁও রচিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' এবং ভোকাবুলিরও এম ইদিওমা বেলগাল্লাই পোরতুগিজ। মনোএল বাঙালি ছিলেন না।

2020/5/13 20:52

Scanned with CamScanner

নওয়াব ফয়জুন্নেসা

প্র : নওয়াব ফয়জুন্নেসা কে ছিলেন?
উ : নওয়াব ফয়জুন্নেসা ত্রিপুরার পশ্চিমাংশে (বর্তমান নাকসাম) এক সামন্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। স্বামী-কন্যা বর্তমান মুহম্মদ গাজি চৌধুরীর সঙ্গে তাঁকে তাঁর মাতা বিয়ে দেন। ফলে দাম্পত্য জীবন বিষময় ও সন্তানসহ বিবাহ বিচ্ছেদ হয়।

প্র : তাঁর জীবনকাল কত?
উ : জন্ম ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে, মৃত্যু ১৯০৩।

প্র : নওয়াব উপাধি কিভাবে পেলেন?
উ : তিনি দানশীল ছিলেন। ব্রিটিশ সরকার এজন্য তাকে নওয়াব উপাধি প্রদান করে।

প্র : এই উপাধি প্রাপ্ত নারীদের মধ্যে তার স্থান কত?
উ : বাংলাদেশে তিনি একমাত্র মহিলা যিনি এই উপাধি পান।

প্র : তাঁর একমাত্র সাহিত্যকীর্তি কী?
উ : 'রূপজালাল' নামক গ্রন্থ।

প্র : এই গ্রন্থটির ধরন কী?
উ : গদ্য ও কবিতায় রচিত আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস।

প্র : কত সালে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়?
উ : ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে।

নবীনচন্দ্র সেন

প্র : নবীনচন্দ্র সেন কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রামের নোয়াপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন।

প্র : তিনি কোথায় শিক্ষালাভ করেন?
উ : ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম স্কুল থেকে প্রবেশিকা, ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ. এ. এবং জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইন্সটিটিউশন থেকে ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে বি.এ. পাস করেন।

প্র : তাঁর কর্মজীবন সম্পর্কে লেখ।
উ : বি. এ. পাস করেই তিনি বিখ্যাত হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতা করার সুযোগ পান। তিনি ঐ বছরই অর্থাৎ ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দেই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। পরে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত করেন। ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি চাকরি থেকে অবসরগ্রহণ করেন।

প্র : ছাত্রাবস্থায় কোন পত্রিকায় তাঁর কবিতা ছাপা হয়?
উ : প্যারীচরণ সরকার সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেট'।

প্র : 'অবকাশরঞ্জনী' তাঁর কোন জাতীয় কাব্যগ্রন্থ?
উ : দেশপ্রেম ও আত্মচিন্তামূলক।

প্র : তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের নাম কী?
উ : 'অবকাশরঞ্জনী'।

প্র : 'পলাশীর যুদ্ধ' (১৮৭৫) তাঁর কোন ধরনের কাব্যগ্রন্থ?
উ : ঐতিহাসিক আখ্যান কাব্য।

প্র : তিনি যে ত্রয়ীকাব্য রচনা করেছেন সেগুলোর নাম কী?
উ : রৈবতক (১৮৮৭), কুরুক্ষেত্র (১৮৯৩), প্রভাস (১৮৯৬)।

প্র : এই তিনটি কাব্যকে ত্রয়ীকাব্য বলা হয় কেন?
উ : কারণ, এই তিনটি কাব্যের কাহিনি একই সুতোয় বাঁধা। এই তিনটি কাব্যের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ। রৈবতক-এ কৃষ্ণের আদি, কুরুক্ষেত্র-এ তাঁর মধ্য, প্রভাস-এ কৃষ্ণের অন্তর্লীলা বর্ণিত হয়েছে।

প্র : নবীনচন্দ্র কি মহাকাব্য রচনা করেছেন?
উ : ঠিক মহাকাব্য যাকে বলে সেই লক্ষ্য সামনে রেখে তিনি গ্রন্থ রচনা করেন নি। তবে, তাঁর রচিত রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস একত্রে মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্যযুক্ত।

প্র : নবীনচন্দ্র সেন রচিত আত্মজীবনীর নাম কী?
উ : আমারজীবন। এই গ্রন্থটি এই লেখক সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ইতিহাসের অন্যতম আকরগ্রন্থ হিসেবে বিবেচ্য।

প্র : নবীনচন্দ্র সেন রচিত অন্যান্য গ্রন্থের নাম উল্লেখ কর।
উ : ক্লিওপেট্রা, ভানুমতী, প্রবাসের পত্র, খৃষ্ট ও অমিতাভ, গীতা ও চণ্ডীর অনুবাদ।

প্র : মানুষ হিসেবে তিনি কেমন ছিলেন?
উ : অকপটস্বীকারোক্তিমূলক ও সমন্বয়বাদী। যিশু খ্রিস্টের জীবনী লেখার পর হযরত মুহম্মদের জীবনী লেখার ইচ্ছা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন। তবে তার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়।

প্র : তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারি।

নরেন বিশ্বাস

প্র : নরেন বিশ্বাস কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৯৫ নবেম্বর ১৯৪৫, মাকিগাতি, গোপালগঞ্জ।

প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : অধ্যাপক ও আবৃত্তিকার।

প্র : বাংলাদেশে আবৃত্তিগুরু কাকে বলা হয়?
উ : নরেন বিশ্বাসকে।

প্র : তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : অলঙ্কার অন্বেষা (১৯৭৬), কাব্যতত্ত্ব অন্বেষা (১৯৮২), প্রসঙ্গ : বাঙলা ভাষা (১৯৮৫), ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব (১৯৮৫)।

প্র : তিনি কোন গ্রন্থটি সম্পাদনা করে স্মরণীয় হয়ে আছেন?
উ : বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত 'বাংলা উচ্চারণ অভিধান' (১৯৮৯)।

প্র : তিনি কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ১৯৯৮।

প্র : মৃত্যু-উত্তর তাঁর দেহ কী করা হয়?
উ : তাঁর ইচ্ছা অনুসারে মৃত্যুর পর দেহ প্রদান করা হয় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজকে।

নাথিনিয়েল ব্রাশি হ্যালহেড

প্র : নাথিনিয়েল ব্রাশি হ্যালহেডের জন্মতারিখ কবে?
উ : ২৫শে মে, ১৭৫১।

প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ওয়েস্টমিনিস্টার, অক্সফোর্ড।

প্র : তিনি উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি কেন?
উ : বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণগ্রন্থ রচয়িতা বলে।

প্র : তাঁর ব্যাকরণের নাম কী?
উ : 'এ গ্রামার অফ দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ' (১৭৭৮)।

প্র : এই ব্যাকরণ কেমন ছিল?
উ : এটি বাংলা ভাষার প্রথম ও সম্পূর্ণ ব্যাকরণ গ্রন্থ। গ্রন্থটি মূলত ইংরেজি ভাষায় রচিত। তবে মূলায় দেখার সময় এর কিছু অংশ বাংলা লিপিতে মুদ্রিত হয়।

প্র : বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থ কোনটি?
উ : এ গ্রামার অফ দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ।

প্র : তিনি ছাত্রাবস্থায় কী কী ভাষা শিক্ষা লাভ করেন?
উ : আরবি ও পারসি ভাষা।

প্র : তিনি তৎকালীন বড় লাট ওয়ারেন হেস্টিংসের উপদেশে কী করেন?
উ : হিন্দু আইনের সংক্ষিপ্ত সার 'A Code of Gentoo Laws' অনুবাদ।

প্র : তিনি অবসর মুহূর্তে কী করতেন?
উ : কবিতা রচনা।

প্র : তাঁর রচিত বহু রচনা কোথায় প্রকাশিত হয়?
উ : 'মনিং ক্রনিকল' এ।

প্র : তিনি কত তারিখ মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৩০।

নির্মলেন্দু গুণ

প্র : নির্মলেন্দু গুণ কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ২১শে জুন ১৯৪৫, কাশবন, নেত্রকোনা।

প্র : তাঁর সম্পূর্ণ নাম কী?
উ : নির্মলেন্দু প্রকাশ গুণ চৌধুরী।

প্র : তাঁর ডাকনাম কী?
উ : রতন। প্রিয়জনেরা 'রতু' বলে ডাকেন।

প্র : তিনি মূলত কী হিসেবে পরিচিত?
উ : কবি।

প্র : তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের নাম কী কী?
উ : কবিতা : প্রেমাঙ্গের রক্ত চাই (১৯৭০), না প্রেমিক না বিপ্লবী (১৯৭২), দীর্ঘ নিবস দীর্ঘ রজনী (১৯৭৪), ও বন্ধু আমার (১৯৭৫), তার আগে চাই সমাজতন্ত্র (১৯৭৯), চাষাভূষার কাব্য (১৯৮১), পৃথিবীজোড়া গান (১৯৮২), দুঃখ হ দুঃশ্বপ্ন (১৯৮৩), ইসক্রা (১৯৮৪;

Scanned with CamScanner

মুজিব-লেনিন-ইন্দিরা (১৯৮৪), সেই কেন সেই পাখি (১৯৮৫), চিরকালের বাঁশি (১৯৮৬), সুখ কোরো না, বাঁচো (১৯৮৭), শিহরে বাংলাদেশ (১৯৯৮), ইয়াহিয়াকাল (১৯৯৮), মুক্তোফোনের কাব্য (২০০৩), চির অনাবৃতা হে নগ্নতমা (২০০৫), নিশিকাব্য (২০০৬), কামকানন (২০০৭) ইত্যাদি।

অনুবাদ কবিতা : রক্ত আর ফুলগুলি (যুগ্ম: তোহু, ১৯৮৩), রাজনৈতিক কবিতা (১৯৮৬), কাব্যসমগ্র (১৯৯২)।

ছোটগল্প : আপনদলের মানুষ (১৯৭৬), অন্তর্জলি (২০০৫)।

কিশোর উপন্যাস : কালো মেলা (১৯৮২), বাবা যখন ছোট ছিলেন (১৯৯৭)।

ভ্রমণ কাহিনি : ভলগার তীরে (১৯৮৫), গীলসাব্যাগের সঙ্গে (১৯৯৪), আমেরিকায় জুরাখেলার স্মৃতি (১৯৯৬), ভ্রমি সেশে সেশে (২০০৪)।

প্র : কাকে বাংলাদেশের কবিদের কবি বলে?

উ : নির্মলেন্দু গুণকে।

প্র : কেন নির্মলেন্দু গুণকে বাংলাদেশের কবিদের কবি বলা হয়?

উ : নির্মলেন্দু গুণ গত শতাব্দীর ষাটের দশকে কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। পরের দশকেই তাঁর কবিতা এতোটা প্রভাববিস্তারী হয়ে ওঠে যে, তরুণেরা তাঁর কবিতা দিয়ে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হন, অনেকে তাঁর কবিতা পড়েই মনে কবি হবার আকাঙ্ক্ষা বোধ করেন। বাংলাদেশের আর কোনো কবি অনুজ কবিদের ওপর এতোটা প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। গত শতাব্দীর সত্তর দশকের অনেক প্রতিষ্ঠিত কবি নির্মলেন্দু গুণের প্রভাবেই কবি হয়েছেন। পরের দশকেও এই প্রভাব অক্ষুণ্ন ছিল। আজকেও এই কবির প্রভাব অল্প-বিস্তর তরুণ কবিসমাজকে প্রভাবিত করে। তাই নির্মলেন্দু গুণকে বাংলাদেশের কবিদের কবি বলা হয়।

প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?

উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৮২), আলাওল সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮২), কবি হাসান হাফিজুর রহমান স্মৃতি পুরস্কার (১৯৯৭), আবুল মনসুর আহমদ পদক (২০০০), একুশে পদক (২০০১), কবিতা পরিষদ পুরস্কার (২০০৪)।

প্র : তিনি নিজ গ্রামে যে স্কুল স্থাপন করেন তার নাম কী?

উ : কাশবন বিদ্যানিকেতন।

প্র : কত সালে, কোথায় তাঁর অঙ্কিত ছবি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়?

উ : নির্মলেন্দু গুণ কবিতার পাশাপাশি শখবশত ছবি আঁকেন। ২০০৯ সালের জুলাই মাসে জাতীয় পাবলিক লাইব্রেরি প্রাঙ্গণে তাঁর প্রথম চিত্র প্রদর্শনী হয়।

'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হৃদয় থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : নির্মলেন্দু গুণ 'একটি কবিতা লেখা হয়' বলে কোন কবিতার কথা বুঝিয়েছেন?

উ : প্রচলিত অর্থে এটি কবিতা নয়, ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ভাষণ। কবি এই ভাষণকেই কবিতার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

প্র : 'জনসমুদ্রের উদ্যান সৈকতে' কী?

উ : সমুদ্রের তীরে যেমন গাছগাছড়ার 'বাগান থাকে, কবি জনসভায় আগত লোকসমাগমকে সেই বাগানের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাই পরে যখন তিনি বলেন: 'উদ্যানের বিরুদ্ধে উদ্যান' তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না, রেসকোর্স ময়দানের জন-উদ্যানের বদলে এবার বৃক্ষ-উদ্যানকে তিনি বোঝাচ্ছেন।

প্র : বিকেলকে কবি তন্দ্রাচ্ছন্ন ও বিবর্ণ বলছেন কেন?

উ : ১৯৭১-এর ৭ই মার্চের বিকেল জনতার হাতে ও মাথায় লাল কাপড়, বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড ও স্লোগানে মুখর ছিল। সে তুলনায় এখকার যে-কোনো দিন কবির কাছে অনেক বেশি বর্ণহীন ও আবেগহীন মনে হয়।

প্র : রেসকোর্স ময়দানকে 'ঢাকার হৃদয়' বলা হয়েছে কেন?

উ : রমনার রেসকোর্স ময়দান ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। এটি ছিল বৃক্ষশূন্য সমতল মাঠ। পুরিবীর বড় বড় নগরের মাঝখানে এমন ফাঁকা মাঠ আছে; ইংরেজিতে যাকে Esplanade বলে। নাগরিক যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে মানুষ প্রায়ই এখানের মাঠে ক্ষণিকের আশ্রয় নেয়। এটির অবস্থান হৃৎপিণ্ডের মতোই। ঢাকারও এমন মাঠ ছিল একদিন। রমনার রেসকোর্স ময়দান। কবি এই মাঠকেই তুলনা করেছেন 'ঢাকার হৃদপিণ্ড' বলে।

প্র : 'সেদিনের সব স্মৃতি'– কোন দিনের স্মৃতি?

উ : ১৯৭১-এর ৭ই মার্চের।

প্র : 'অনাগত শিশু' কে?

উ : 'অনাগত' অর্থ যার আগমন এখনো হয় নি, ভবিষ্যতের প্রজন্ম অর্থে।

প্র : এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার চরণকে পুনঃসৃজন করা হয়েছে– কোনটি?

উ : 'কথা' কাব্যগ্রন্থের 'দেবতার গ্রাস' কবিতার '... তবু, তখনি পলকে / তরীতে উঠিল জল দারুণ ঝলকে।' চরণসমূহ পুনাসৃজনের মাধ্যমে নির্মলেন্দু গুণ লিখলেন: 'তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল,।' লক্ষণীয়, নির্মলেন্দু গুণ এখানে রবীন্দ্রনাথ লিখিত ক্রিয়াপদের সামুক্ষুণ অক্ষুণ্ন রেখেছেন এবং রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের রূপটি রেসকোর্সে প্রতিবিম্বিত করেছেন। এ এক আধুনিক কাব্যকৌশল।

প্র : এই কবিতায় বিষ্ণু দে-র একটি কবিতার চরণকে পুনঃসৃজন করা হয়েছে– কোনটি?

উ : বিষ্ণু দে-র 'চোরাবালি' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'ঘোড়সওয়ার'-এ কবি কবিতা খানিকটা হতাশ। তিনি একজন নায়ককে প্রত্যাশা করছেন এই হতাশা থেকে পরিত্রাণের জন্য। নির্মলেন্দু গুণ যেন সেই নায়কের দেখা পেয়েছেন। তাই তিনি বিষ্ণু দে-র :'জনসমুদ্রে জেগেছে জোয়ার, / হৃদয়ে আমার চড়া।' এই চরণগুলোর বিপরীতে লেখেন: 'হৃদয়ে লাগির দোলা, জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার / সকল সুয়ার খোলা।' অর্থাৎ নির্মলেন্দু গুণ বিষ্ণু দে-এর মতো হতাশ নন। তাঁর হৃদয় চড়া পড়ে যায় নি, বরং আজো তাঁর খোলা দেয়াসে এটি আধুনিক কবসাকৌশলের সঙ্গে যুক্ত।

প্র : 'সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের (–অর্থ কী?

উ : ১৯৭১-এর ৭ই মার্চের আগ-পর্যন্ত অনেক বাঙালির মনে 'স্বায়ত্তশাসন' জাতি স্বাধীনতা এই দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু ১৯৭১-এর ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ও 'স্বাধীনতা' উচ্চারণের মাধ্যমে সমগ্র বাঙালির কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছু হবে না তারা।

নীলিমা ইব্রাহিম

প্র : নীলিমা ইব্রাহিম কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১১ই জানুয়ারি ১৯২১; খুলনায়।

প্র : তিনি মূলত কী হিসেবে পরিচিত?

উ : শিক্ষাবিদ।

প্র : তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর নাম কী?

উ : প্রবন্ধ-গবেষণা : শরৎ প্রতিভা (১৯৬০), বাংলার কবি মধুসূদন (১৯৬১), উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজ ও বাংলার নাটক (১৯৬৪), বাঙালী মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৯৮৭), অগ্নিস্নাত বঙ্গবন্ধুর ভস্মাচ্ছাদিত কন্যা আমি (১৯৯৫), আমি বীরাঙ্গনা বলছি (১৯৯৬)। গল্প : যমনা পার্কে (১৯৬৪)। উপন্যাস : বিশ শতকের মেয়ে (১৯৫৮), এক পথ দুই বাঁক (১৯৫৮), কেয়া বন সঞ্চারিণী (১৯৬২), বহ্নিবলয় (১৯৮৫)। নাটক : দুয়ে দুয়ে চার (১৯৬৪), যে অরণ্যে আলো নেই (১৯৭৪), রোদজ্বালা বিকেল (১৯৭৪), সূর্যাস্তের পর (১৯৭৪)। আত্মজীবনী : বিন্দু বিসর্গ (১৯৯১)।

প্র : 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৫ সালে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলার

2020/5/13 20:53
Scanned with CamScanner

যেসব নারী কোনো না কোনোভাবে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে দিনের পর দিন পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, সেইসব মুক্তাহত কয়েকজনের সত্যকাহিনিনির্ভর জীবন ইতিহাস 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি'। যাদের দুঃখের কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে তাঁরা হলেন- তারা ব্যানার্জি, মেহেরজান, বীণা, শেফা, ময়না, ফাতেমা, মীনা। তবে লেখকের বর্ণনাতে এই কাহিনি কেবল সাতজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি তা হয়ে উঠেছে দুলক্ষ মা-বোনের প্রতিনিধি। বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে বঙ্গবন্ধুর মহিমাময় ভূমিকা, হানাদার বাহিনী ও রাজাকারদের অপকীর্তি ইত্যাদি।

প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?

উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৯), জয়বাংলা পুরস্কার ভারত (১৯৭৩), লেখিকা সংঘ পুরস্কার (১৯৮৯), বেগম রোকেয়া পদক (১৯৯৬)।

প্র : তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?

উ : ২০০২ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ই জুন।

নুরুল মোমেন

প্র : নুরুল মোমেন কত তারিখে জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ২৫শে নবেম্বর, ১৯০৬।

প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : বুড়োইচ গ্রাম, যশোর।

প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?

উ : নাট্যকার।

প্র : তিনি কোন ধরনের নাট্যচরিত্র অঙ্কন করে খ্যাতি অর্জন করেন?

উ : সামাজিক সঙ্কটের পটভূমিকায় অন্তর্দ্বন্দ্ব-মূলক নাট্যচরিত্র।

প্র : তাঁর রচিত নাটকগুলোর নাম কী?

উ : রূপান্তর (১৯৪৭), নেমেসিস (১৯৪৮), যদি এমন হতো (১৯৬০), নয়া খান্দান (১৯৬২), আলোছায়া (১৯৬২) শতকরা আশি (১৯৬৭), আইনের অন্তরালে (১৯৬৭), যেমন ইচ্ছা তেমন (১৯৭০) ইত্যাদি।

প্র : নেমেসিস উল্লেখযোগ্য কেন?

উ : এক চরিত্র বিশিষ্ট এমন নাটক বাংলা সাহিত্যে কম বলে।

প্র : 'নেমেসিস' নাটকের পরিচয় দাও।

উ : নুরুল মোমেনের শ্রেষ্ঠ নাটক 'নেমেসিস'। ১৯৩৯-'৪৩ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে নুরুল মোমেন ১৯৪৪ সালে নাটকটি লেখেন এবং 'শনিবারের চিঠি' (সম্পাদক : সজনীকান্ত দাস) পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়। মঞ্চাকারে প্রকাশ পায় ১৯৪৮ সালে। নাটকটি মূল নায়ক সুরজিত নন্দী নামের এক-চরিত্র বিশিষ্ট অদৃশ্য চরিত্র হিসেবে আছে নূপেন ডেপুটি, তার কন্যা সুলতা, মানেজার শঙ্কর, অমল বাবু, ইয়াকুব প্রমুখ। নেমেসিস (Nemesis) গ্রিক দেবী। এই দেবী প্রতিহিংসার এবং মানব নিয়তি তাঁর হাতে। মানুষ ইচ্ছে করেও তা অতিক্রম করতে পারে না। এ নাটকে সুরজিত ইচ্ছা করেও ভাগ্য অতিক্রম করতে পারে নি। সুরজিতের মধ্যে ট্র্যাজেডির নায়কের দ্বন্দ্ব-সংঘাত কার্যকর। শেষে সে দুইবার খুন করে। এ নাটকে সমকালীন মুর্ষিত, মজুতদারদের পিশাচবৃত্তি ও নিরন্নের হাহাকারের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত।

প্র : নুরুল মোমেনের নাটক 'নয়া খান্দান' সম্পর্কে লেখ।

উ : 'নয়া খান্দান' নাটকটি ১৯৬১ সালে রচিত, ১৯৬২ সালে প্রকাশিত। বংশমর্যাদা ও এ নিয়ে আভিজাত্যের প্রতি শ্লেষ ব্যক্ত হয়েছে এ নাটকে। নাট্যকার দেখিয়েছেন, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের কাছে বংশমর্যাদার চেয়ে সুরুচিই বরং কাম্য। এই সুশিক্ষাই বর্তমান যুগের নতুন বা নয়া খান্দান (আভিজাত্য) হিসেবে বিবেচিত। এটি একটি কমেডি।

প্র : নুরুল মোমেনের নাটক 'আলোছায়া' সম্পর্কে লেখ।

উ : 'আলোছায়া' ১৯৬২ সালে প্রকাশিত একটি কমেডি। ভালোমন্দের প্রতীক আলোছায়া। ভালোমন্দের দ্বন্দ্ব ছিল, আছে। এর মধ্যে ভালো বা আলোর প্রভাব যার মধ্যে সে-ই স্মরণীয় হয়ে থাকবে,

কালো বা ছায়ার প্রাধান্যাধীরীরা স্মরণযোগ্য হবেন না- এটাই নাটকের মূল বক্তব্য। হাশ্মাদ জামিল, জাহানারা, সুলতান, পারভীন উল্লেখযোগ্য চরিত্র।

প্র : তিনি আর কী রচয়িতা হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন?

উ : প্রবন্ধসাহিত্য রচয়িতা হিসেবে।

প্র : তাঁর রচিত প্রবন্ধগ্রন্থ কী কী?

উ : বহুরূপ (১৩৬৫), নরসুন্দর (১৯৬১), বিচিত্রা খণ্ড (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৭০)।

প্র : তিনি রচিত নাটকের জন্য কী পুরস্কার লাভ করেন?

উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬১)।

প্র : নুরুল মোমেন কী কী পদক লাভ করেন?

উ : নুরুল মোমেন কী কী পদক লাভ করেন? পিতারা-হু-হুমতিয়াজ (১৯৬৭) ও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক একুশের পদক (১৯৭৮)।

প্র : তিনি কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?

উ : ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০।

পঞ্চানন কর্মকার

প্র : পঞ্চানন কর্মকারের জীবনকাল কত?

উ : তিনি কবে জন্মগ্রহণ করেছেন তা না জানা গেলেও ১৮০৪ খ্রিষ্টাব্দে তার মৃত্যু হয় বলে জানা যায়।

প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : মুখলি জেলার ত্রিবেণীতে।

প্র : তাঁকে কী বলা হয়?

উ : বাংলা মুদ্রাক্ষরের জনক।

প্র : কেন বলা হয়?

উ : কারণ, শ্রীরামপুরে যখন ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় তখন বাংলা মুদ্রাক্ষর ছিল না। তিনি বহুধৈর্য ও কষ্ট করে প্রতিটি বাংলা লিপি বা অক্ষরের একাধিক প্রস্থ নির্মাণ করেন এবং এতেই প্রথম বাংলা ছাপা হয়।

প্রমথ চৌধুরী

প্র : প্রমথ চৌধুরীর জন্মতারিখ কবে?

উ : ৭ই অগস্ট, ১৮৬৮।

প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : যশোরে।

প্র : তিনি কোন সাহিত্যের সৃষ্টিকর ছিলেন?

উ : ফরাসি ও ইংরেজি।

প্র : তিনি কী ছদ্মনাম ব্যবহার করে অনেক রচনা প্রকাশ করেন?

উ : বীরবল।

প্র : প্রমথ চৌধুরীকে কী বলা হয়?

উ : বাংলা গদ্যে চলিত রীতির প্রবর্তক।

প্র : চলিত রীতির তাঁর প্রথম গদ্যগ্রন্থ কোনটি?

উ : বীরবলের হালখাতা (ভারতী পত্রিকায় প্রকাশ : ১৯০২)।

প্র : তাঁর রচিত বীরবলের হালখাতা গদ্য রচনাটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?

উ : ভারতী।

প্র : তিনি কোন মাসিক পত্রিকাটি সম্পাদনা করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন?

উ : সবুজপত্র (১৯১৪)।

প্র : 'সবুজপত্র' পত্রিকার পরিচয় দাও।

উ : 'সবুজপত্র' (১৯১৪) প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত বিশিষ্ট সাহিত্য পত্রিকা। বৈশাখ ১৩২১ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং তের বছর চলে। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ও সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদনার কাজে সাহায্য করেন। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এক নূতন সাহিত্যগোষ্ঠী এবং সাহিত্যিক আদর্শ গড়ে ওঠে। এ পত্রিকাকে অবলম্বন করে চলিতরীতি বাংলাগদ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। 'সবুজপত্র' রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও ভাষারীতির আধুনিকতার বিকাশে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। এরপর থেকে রবীন্দ্রনাথ চলিতরীতির গদ্য লেখায় অধিক উৎসাহী হন।

প্র : তিনি বাংলা সাহিত্যে কী হিসেবে স্মরণীয়?

উ : চলিত ভাষার প্রবর্তক ও বিদ্রূপাত্মক প্রাবন্ধিক হিসেবে।

প্র : প্রমথ চৌধুরী রচিত প্রবন্ধগ্রন্থগুলোর নাম কী?

উ : তেল নুন লকড়ি (১৯০৬), বীরবলের হালখাতা (১৯১৬), নানাকথা (১৯১৯), আমাদের শিক্ষা (১৯২০), রায়তের কথা (১৯২৬), নানাচর্চা (১৯৩২), প্রবন্ধ সংগ্রহ (১ম খণ্ড-১৯৫২, ও ২য় খণ্ড-১৯৫৩)।

2020/5/13 20:53
Scanned with CamScanner

প্র : তিনি আর কী রচয়িতা হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন?
উ : কবিতা ও ছোটগল্প।
প্র : তিনি বাংলা কাব্যসাহিত্যে কীসের প্রবর্তক হিসেবে বিশেষ স্থান লাভ করেন?
উ : ইটালীয় সনেটের।
প্র : 'সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই স্বশিক্ষিত'।— উক্তিটি কার?
উ : প্রমথ চৌধুরীর।
প্র : তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : সনেট পঞ্চাশৎ (১৯১৩), পদচারণ (১৯১৯)।
প্র : তাঁর রচিত গল্পগ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : চার ইয়ারী কথা (১৯১৬), আহুতি (১৯১৯), নীললোহিত ও গল্পসংগ্রহ (১৯৪১)।
প্র : 'চার ইয়ারী কথা'র পরিচয় দাও।
উ : 'চার ইয়ারী কথা' (১৯১৬) প্রমথ চৌধুরীর গল্পগ্রন্থ। চারবন্ধুর প্রেমের কাহিনি। প্রত্যেকটি প্রেমই অভিশপ্ত, নায়িকা চারজন ইউরোপীয়। প্রথম নায়িকা উন্মাদ, দ্বিতীয় চোর, তৃতীয় প্রতারক, চতুর্থ নায়িকা মৃত্যুর পর তার ভালোবাসা ব্যক্ত করেছে। ভাষার চাতুর্য, পরিহাসপ্রিয়তা এবং সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ উদ্ভাসিত এই কাহিনি বাংলা ভাবালু প্রেমকাহিনির প্রতিবাদী।
প্র : তিনি আর কোন পত্রিকা সম্পাদনা করেন?
উ : বিশ্বভারতী পত্রিকা।
প্র : প্রমথ চৌধুরীর রচনায় ভাষাগত বিশেষত্ব কী– এক কথায় লিখুন।
উ : প্রমথ চৌধুরীর রচনার ভাষাগত বিশেষত্ব হলো, তীক্ষ্ণ মননশীলতা বাকচাতুর্যের চমৎকারিত্ব এবং বুদ্ধির অসিচালনা।
প্র : প্রমথ চৌধুরীর ভাষার সমালোচনা লেখ।
উ : প্রমথ চৌধুরীর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য শুধু ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম ছাড়া তিনি অন্য কোনো দিক থেকে মৌখিক ভাষার বিশেষ অনুকরণ করেন নি। ভাষার অনাবশ্যক মারপ্যাঁচ বাচনভঙ্গির অকারণ তির্যকতা ও অলংকারের চাকচিক্য তাঁর রচনায় কোথাও কোথাও চলিত ভাষাকে সাধুভাষার চেয়েও দুর্বোধ্য করে তুলেছে। সেজন্য প্রমথনাথ বিশী বলেছেন, 'প্রমথ চৌধুরীর রচনায় ব্যাকিংটারীর ঔজ্জ্বল্য আছে।'
প্র : রবীন্দ্র পরিবারের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর সম্পর্ক কী?
উ : প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভাগ্নে প্রথম সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা ইন্দিরা দেবীকে বিয়ে করেন।
প্র : তিনি কী পদক লাভ করেন?
উ : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক। উল্লেখ্য, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নিজ মাতার নামে এ পদক প্রবর্তন করেন।
প্র : তিনি কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ (১৬ই ভাদ্র ১৩৫৩); শান্তিনিকেতন।

'বইপড়া' প্রবন্ধ থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'বইপড়া' প্রবন্ধটির রচয়িতা কে?
উ : প্রমথ চৌধুরী।
প্র : 'বইপড়া' প্রবন্ধটি কোন গ্রন্থ থেকে সংকলিত?
উ : প্রবন্ধ সংগ্রহ।
প্র : 'বইপড়া' কোন ধরনের রচনা?
উ : প্রবন্ধ।
প্র : মানুষের জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ শত্রু কোনটি?
উ : বইপড়া।
প্র : উদ্বাহু কী?
উ : ঊর্ধ্বে উত্থিত বাহু = উদ্বাহু (একবচন প্রকাশ)
প্র : শব্দসমূহ বিশ্লেষণ কর : মনগঙ্গা, সোল্লাস, মন্দাগ্নি, জগদ্বিখ্যাত, নিষ্কর্মা
উ : মনগঙ্গা : মন রূপ গঙ্গা = রূপক কর্মধারয় সমাস
সোল্লাস : স + উল্লাস (উপসর্গযোগে)
মন্দাগ্নি : মন্দের অগ্নি = ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস
জগদ্বিখ্যাত : জগৎ + বিখ্যাত (সন্ধি)
নিষ্কর্মা : নিঃ + কর্মা (সন্ধি)
প্র : লেখকের মতে আত্মার মৃত্যু হয় কিভাবে?
উ : দেহের মৃত্যু দেখা যায়, আত্মার মৃত্যু দেখা যায় না। আত্মার স্বাভাবিক বিকাশ রুদ্ধ হয় তার উপর চাপিয়ে দেয়া হয় অবাঞ্ছিত বিদ্যার ভার। স্কুল-কলেজের শিক্ষা যেহেতু চাকরি লাভের দৌড় প্রতিযোগিতা, সেহেতু এ শিক্ষা লাভ করে চাকরি মেলে, চাকরির পর টাকা মেলে কিন্তু শান্তি মেলে না অনেক ক্ষেত্রেই। আত্মার জন্য চাই শান্তি। শান্তি মেলে ভালোলাগার উপাদানের সহযোগে। স্কুল-কলেজের বিদ্যাশিক্ষায় ভালোলাগার ক্ষেত্র সীমিত সেহেতু তাতে আত্মার মেহেতু পূর্ণ হতে পারে।
প্র : আমরা জাত হিসেবে কেমন নই?
উ : শৌখিন।
প্র : আমরা কী উপভোগ করতে প্রস্তুত নই?
উ : সাহিত্যের রস।
প্র : মানুষের কথিত সর্বশ্রেষ্ঠ শত্রু কোনটি?
উ : বই পড়া।
প্র : আমরা জাত হিসেবে কেমন নই?
উ : শৌখিন নই।
প্র : আমরা কিসের ফল লাভের জন্য উদ্বাহু?
উ : শিক্ষার ফল লাভের জন্য উদ্বাহু।
প্র : শিক্ষা আমাদের কী দূর করবে বলে বিশ্বাস?
উ : গায়ের জ্বালা ও চোখের জল দুটোই দূর করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।
প্র : শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ কোনটি?
উ : সাহিত্যচর্চা।
প্র : কার কোনো বাজার দর নেই?
উ : শিক্ষার। শিক্ষার ফল হাতে হাতে পাওয়া যায় না অর্থাৎ এর কোনো নগদ বাজার দর নেই।
প্র : ডেমোক্রেসি কিসের সার্থকতা বোঝে?
উ : ডেমোক্রেসি সাহিত্যের সার্থকতা বোঝে না, বোঝে অর্থের।
প্র : ডেমোক্রেসির গুরুরা কী করতে চেয়েছিলেন?
উ : ডেমোক্রেসির গুরুরা সবাইকে সমান করতে চেয়েছিলেন।
প্র : কোনটি সংক্রামক?
উ : ব্যাধি সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়।
প্র : কোন বিষয়ে অনেকেই সন্দিহান?
উ : সাহিত্যচর্চার সুফল সম্বন্ধে।
প্র : কারা একপাশে অবজ্ঞাভরে নিক্ষেপে অর্থ নন্য?
উ : যাঁরা হাজার খানা ম-ডিগ্রী সিলেবাস অর্থাৎ উচ্চশিক্ষার কথা বলা হয়েছে।
প্র : কোন জাতির মনের উঁচুতে অবনতি?
উ : যে জাতির জাতের জাতের সুখে, সে জাতির মনের উঁচুতে অবনতি।
প্র : কোন জাতি মনে বড় নয়?
উ : যে জাতি জ্ঞানে বড় নয়।
প্র : মানুষের মনের সুতো সাফাই, পাওয়া যায় কোথায়?
উ : সাহিত্যে।
প্র : কোন বিষয়কে মনগঙ্গার তোলা জল বলা হয়েছে?
উ : দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়গুলোকে মনগঙ্গার তোলা জল বলা হয়েছে।
প্র : কোনটি ছাড়া সাহিত্যচর্চার বিকল্প নেই?
উ : বই পড়া ছাড়া।
প্র : দর্শনের চর্চা কোথায় করা যায়?
উ : পাহাড়ের গুহায়।
প্র : বিজ্ঞানের চর্চা কোথায় করতে হয়?
উ : জাদুঘরে।
প্র : সাহিত্যচর্চার জন্য আমাদের কী চাই?
উ : লাইব্রেরি।
প্র : লাইব্রেরির সার্থকতাকে কিসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে?
উ : হাসপাতালের সঙ্গে।
প্র : কোন দান গ্রহণসাপেক্ষ?
উ : মনোরাজ্যের দান গ্রহণ সাপেক্ষ।
প্র : কে মনোরাজ্যের ঐশ্বর্যের সন্ধান দিতে পারেন?
উ : শিক্ষক ছাত্রকে মনোরাজ্যের ঐশ্বর্যের সন্ধান দিতে পারেন।
প্র : শিক্ষার্থীর জ্ঞান পিপাসাকে তৃপ্ত করতে পারেন কে?
উ : শিক্ষক।
প্র : যিনি সত্যিকারের গুরু তিনি কী করেন?
উ : যিনি যথার্থ গুরু তিনি শিষ্যের আত্মাকে উদ্বোধিত করেন এবং তার অন্তর্নিহিত সকল প্রচ্ছন্ন শক্তিকে ব্যক্ত করে তোলেন।

2075/13 20:53
Scanned with CamScanner

প্র : কোন মৃত্যুর রেজিস্টারি রাখা হয় না?
উ : স্নেহের মৃত্যুর রেজিস্ট্রারি রাখা হয়, আত্মার হয় না।
প্র : ফ্লাসকে কারা রক্ষা করেছিল?
উ : যারা পাস করতে পারে নি বা চায় নি, তারাই ফ্লাসকে রক্ষা করেছিল।
প্র : কারা বন্দুকের গুলি থেকে কামানের গোলা পর্যন্ত গলাধঃকরণ করতে পারেন?
উ : এক শ্রেণির ব্যক্তিরা অর্থাৎ এক শ্রেণির শিক্ষার্থী যারা সব কিছু মুখস্থ করে ফেলতে পারে।
প্র : কোন বিষয়কে গুরুদত্ত বলা হয়েছে?
উ : নানা আকারের ও নানা প্রকারের গোলা অর্থাৎ গুরু প্রদত্ত নোট প্রদানকে নির্দেশ করা হয়েছে।
প্র : প্রমথ চৌধুরী লাইব্রেরিকে কার ওপরে স্থান দিয়েছেন?
উ : হাসপাতালের ওপর।
প্র : আমাদের কোন সম্প্রদায় বাধ্য না হলে বই ধরেন না?
উ : আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়।
প্র : ছেলের বাপেরা নজির পড়েন কেন?
উ : বাধ্য হয়ে, পেটের দায়ে।
প্র : সাহিত্য সাক্ষাৎভাবে কী কাজে লাগে না?
উ : উদরপূর্তির কাজে লাগে না।
প্র : মনের দাবি রক্ষা না করলে কী বাঁচে না?
উ : মানুষের আত্মা বাঁচে না।
প্র : কোন জাতি নির্জীব?
উ : যে জাতি যত নিরানন্দ, সে জাতি তত নির্জীব।
প্র : 'সুসার' শব্দের অর্থ কী?
উ : ব্যবসায় লাভ।
প্র : দাতাকর্ণ কে ছিলেন?
উ : মহাভারতের বিশিষ্ট চরিত্র, কুন্তিপুত্র; দানের জন্য প্রবাদতুল্য মানুষ।
প্র : কাদেরকে কেতাবি মানুষ বলা হয়?
উ : কেতাব অনুসরণ করে চলে যারা।
প্র : আমাদের গায়ের জ্বালা ও চোখের জল কে দূর করবে?
: শিক্ষা।
প্র : কারা সকলকে সমান করতে চেয়েছিল?
উ : ডেমোক্রেসির গুরুরা।
প্র : কিসের সংস্পর্শে এসে আমরা ডেমোক্রেসির দোষগুলো আয়ত্ত করেছি?
উ : ইংরেজি সভ্যতার।
প্র : 'ভাঁড়ে ভবানী' কথাটির অর্থ কী?
উ : রিক্ত; শূন্য।
প্র : 'যে জাতি মনে বড় নয়, সে জাতি আসে বড় নয়;'—এটি কার উক্তি?
উ : প্রমথ চৌধুরীর।
প্র : মানুষের মনকে সরল, সচল, সবল ও সমৃদ্ধ করার ভার কার ওপর নাস্ত?
উ : সাহিত্যের।
প্র : মানুষের পুরো মনটার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় কোথায়?
উ : সাহিত্যে।
প্র : সাহিত্যের চর্চার জন্য কী দরকার?
উ : লাইব্রেরির।
প্র : সুশিক্ষিত লোক মাত্রই কেমন?
উ : স্বশিক্ষিত।
প্র : আজকের বাজারে কাদের অভাব নেই?
উ : বিদ্যাদাতার।
প্র : দাতাকর্ণ কে?
উ : মহাভারতের বিশিষ্ট চরিত্র, কুন্তিপুত্র; দানের জন্য প্রবাদতুল্য মানুষ।
প্র : যথার্থ গুরু কে?
উ : যিনি শিষ্যের আত্মাকে উদ্বোধিত করেন এবং তার অন্তর্নিহিত সকল প্রচ্ছন্ন শক্তিকে ব্যক্ত করে তোলেন, তিনিই যথার্থ গুরু।
প্র : কোন সত্য স্বীকার করতে আমরা কুণ্ঠিত হই?
উ : পাস করা ও শিক্ষিত হওয়া এক বস্তু নয়।
প্র : আমাদের স্কুল-কলেজে ছেলেদের কী করা হয়?
উ : বিদ্যা গেলানো হয়।
প্র : কোনটি সাহিত্যের সার্থকতা বোধে না?
উ : ডেমোক্রেসি।
প্র : আত্মার অপমৃত্যুতে আমরা কী করি?
উ : উৎফুল্ল হয়ে উঠি।

'কারবারি' কোন জাতীয় শব্দ?
উ : তদ্ধিত উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ। (ফারসি কার + আনি = কারবানি; অর্থ-কৃতিত্ব; কর্মকৌশল; ব্যাপারি)
প্র : বানান শুদ্ধ কর : গলধঃকরণ, সুধাবস্থা, পুর্তি।
উ : গলাধঃকরণ (সং. গল + অধঃ + √কৃ + অন; অর্থ—নিচে ফেলা); সুধাবস্থা (সং. সুধা + অবস্থা; অর্থ—সুধাপূর্ণ); পূর্তি (সং. √পূর্ + তি; অর্থ—হর্ষ; সাধন উৎসাহ। 'পূর্তি > ফুর্তি)
প্র : প্রমথ চৌধুরী স্কুল-কলেজের ওপরে স্থান দিয়েছেন কিসের?
উ : লাইব্রেরিকে।
প্র : মনের হাসপাতাল কী?
উ : লাইব্রেরি।
প্র : মুসলমান ধর্মে মানবজাতি কয়ভাগে বিভক্ত?
উ : দুই ভাগে বিভক্ত। কেতাবি ও যারা কেতাবি নয়।
প্র : কেউ পেচ্ছায় বই পড়লে তাকে কোন দলে ফেলে দেয়া হয়?
উ : নির্ম্মার দলে।
প্র : কিসে মানুষের সম্পূর্ণ মনস্তুষ্টি হয় না?
উ : উদরপূর্তিতে।
প্র : মনের দাবি রক্ষা না করলে কী হয়?
উ : মানুষের আত্মা বাঁচে না।
প্র : 'যে জাতি যত নিরানন্দ সে জাতি তত নির্জীব।'—উক্তিটি কার?
উ : প্রমথ চৌধুরীর।
প্র : আনন্দের স্পর্শে কী হয়?
উ : মানুষের মনপ্রাণ সজীব, সতেজ ও সরাগ হয়ে ওঠে।
প্র : সাহিত্যচর্চার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার অর্থ কী?
উ : জাতির জীবনীশক্তির হ্রাস করা।
প্র : আমাদের শিক্ষা আমাদের কী করেছে?
উ : নির্জীব।
প্র : ছাত্রদের নোট পড়া আর উকিলদের নজির পড়ার মধ্যে প্রমথ চৌধুরী কোন সাদৃশ্য প্রমাণ করেছেন?
উ : দুটোই পেটের দায়ে।
প্র : একজন পেশাদার আইনজীবী যেমনভাবে শ রিশোট কিশমিশ পড়েন, ঠিক একটি কাব্যগ্রন্থও কেনেন না—এর পেছনে কোন কারণ নিহিতনীল?
উ : এতে ব্যবসায়ের সুসার নেই।
প্র : 'শতাসু' শব্দের অর্থ কী?
উ : মৃত।
প্র : আমাদের দেশে কিসের বাজার দর নেই?
উ : শিক্ষার।
প্র : কোন বিষয়ে লোকদক দেশকের সঙ্গে সমরেখায় চলে না?
উ : লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠায়।
প্র : মনোরাজ্যের ঈশ্বরের সন্ধান দিতে পারেন কে?
উ : শিক্ষক।
প্র : আমাদের সাহিত্যচর্চা করা উচিত কেন?
উ : কেননা সাহিত্য হচ্ছে শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ। তাই আমাদের সাহিত্যচর্চা করা উচিত।
প্র : ডেমোক্রেসি সাহিত্যের সার্থকতা বোধে না কেন?
উ : সাহিত্যের কোনো নগদ বাজার নেই। তাই ডেমোক্রেসি সাহিত্যের সার্থকতা বোধে না।
প্র : আমাদের শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি কোথায়?
উ : সাহিত্যের দিকে নয়, অর্থের দিকে।
প্র : যে জাতি মনে বড় নয়, সে জাতি জানে বড় নয়– কে বলেছেন?
উ : প্রমথ চৌধুরী 'বইপড়া' প্রবন্ধে।
প্র : একজন শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত সব প্রচ্ছন্ন শক্তিকে জাগ্রত করতে পারেন কে?
উ : একজন শিক্ষক।
প্র : যে জাতির জ্ঞানভাণ্ডারে শূন্য সে জাতি ভাঁড়েও ভবানী– কে বলেছেন?
উ : প্রমথ চৌধুরী 'বইপড়া' প্রবন্ধে বলেছেন।
প্র : আমাদের দেশের ছেলেরা নোট পড়ে আর উকিলরা নথি পড়ে কেন?
উ : সবই পেটের দায়ে।
প্র : আমাদের জাত-মানুষ হবে কী করে?
উ : সঠিক সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে।

2020/5/13 20:53
Scanned with CamScanner

প্রেমেন্দ্র মিত্র

প্র : প্রেমেন্দ্র মিত্রের জন্মসাল কত?
উ : ১৯০৪।
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : কাশীতে।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : সাহিত্যিক ও সাংবাদিক।
প্র : তিনি প্রথম কোন পত্রিকায় কাজ করেন?
উ : কল্লোল।
প্র : তিনি কোন কোন পত্রিকায় সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেন?
উ : বাংলার কথা, বঙ্গবাণী, সংবাদ প্রভৃতি।
প্র : তিনি কোন গোষ্ঠীর লেখক ছিলেন?
উ : কল্লোল গোষ্ঠীর।
প্র : তাঁর রচিত সাহিত্যকর্মের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কী?
উ : সাধারণ মানুষের প্রতি অনুরাগ।
প্র : তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : প্রথমা (১৯৩২), সম্রাট (১৯৪০), ফেরারী ফৌজ (১৯৪৮), সাগর থেকে ফেরা (১৯৫৬), হরিণ চিতা চিল (১৯৫৯), কবলো মেঘ ইত্যাদি।
প্র : তাঁর রচিত উপন্যাসগুলোর নাম কী?
উ : পাঁক (১৯২৬), মিছিল (১৯৩৩), উপনয়ন (১৯৩৪), আগামীকাল (১৯৩৪), প্রতিশোধ (১৯৪১), কুয়াশা, প্রতিধ্বনি ফেরে, মনুদাদশ ইত্যাদি।
প্র : তাঁর রচিত গল্পগ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : পঞ্চশর (১৯২৯), বেনামী বন্দর (১৯৩০) পুতুল ও প্রতিমা (১৯৩২), মৃত্তিকা (১৯৩২), অফুরন্ত (১৯৩৫), ধূলিধূসর (১৯৪৩), মহানগর (১৯৪৩), জলপায়রা (১৯৫৭) ইত্যাদি।
প্র : তিনি কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ৩রা মে, ১৯৮৮; কলকাতা।

প্যারীচাঁদ মিত্র

প্র : প্যারীচাঁদ মিত্রের জন্মতারিখ কত?
উ : ২২শে জুলাই, ১৮১৪।
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : কলকাতা।
প্র : তিনি কী কী ভাষায় দক্ষ ছিলেন?
উ : বাংলা, পারসি ও ইংরেজি।
প্র : তিনি কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ছিলেন?
উ : প্যারীচাঁদ মিত্র অ্যান্ড সন্স।
প্র : প্যারীচাঁদ মিত্র কোন কোম্পানির হিসাবরক্ষক ছিলেন?
উ : 'বেঙ্গল টি কোম্পানি' ও 'আমাদের কোম্পানি'।
প্র : তিনি দেশোন্নতিবিধায়ক কোন কোন সমিতির গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন?
উ : জ্ঞানোপার্জিকা সভার মুদ্রণ সম্পাদক (১৯৩৮), বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটির সম্পাদক (১৮৪৩), ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য (১৮৫১), মদ্যপান নিবারণী সভার সম্পাদক (১৮৫১), বঙ্গদেশীয় সামাজিক বিজ্ঞান সভার সম্পাদক (১৮৬৭-১৮৭৫)।
প্র : চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমালোচনা করে রচিত তাঁর প্রবন্ধের নাম কী?
উ : The Zamindar and Royats.
প্র : তিনি গরিব চাষিদের রক্ষাকবচ হিসেবে প্রবর্তনের দাবি উত্থাপন করেন?
উ : পঞ্চায়েত ব্যবস্থা।
প্র : তাঁর রচিত কথিত প্রথম উপন্যাসের নাম কী?
উ : আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮)।
প্র : 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রথম গ্রন্থ 'আলালের ঘরের দুলাল।' ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে 'মাসিক পত্রিকা'য় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। কেউ বলেন, 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস গ্রন্থ। কারো মতে, উপন্যাস না, উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত। অর্থাৎ এটি সার্থক উপন্যাস কি-না এনিয়ে বিতর্ক আছে। অনেকের মতে, 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সামাজিক নকশা। এখানে দেশীয় বক্তা শিক্ষিত

ব্যক্তির পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিশৃঙ্খলা নিয়ে লেখক নিজের অভিমত প্রকাশ করেছেন। তবে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষার আলোকে উচ্চ আদর্শ সম্পন্ন জীবনগঠনকে লেখক বাস্তব জানিয়েছেন। কাহিনি বর্ণনায় কৌতুক আছে। এ গ্রন্থের গদ্যে লেখক সচেতনভাবে চলতি ভাষা প্রয়োগ করেছেন। উদ্যোগটি বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। এই গদ্যরীতি বাংলা সাহিত্যে 'আলালী রীতি' হিসেবে পরিচিত। অবশ্য প্যারীচাঁদ নিজেই উত্তরজীবনে এ রীতির চর্চা না করে সাধুরীতিতে গদ্য লেখেন। প্যারীচাঁদ মিত্র 'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্মনামে এই রচনাটি পত্রিকায় লেখেন। ধনী বিধবা বাবুরামের পুত্র মতিলাল কুসঙ্গে পড়ে এবং শিক্ষার ব্যাপারে পিতার, অবহেলা তাকে অধঃপতনে নিয়ে যায়। পিতার মৃত্যুর পর মতিলাল প্রাপ্ত সব সম্পত্তি নষ্ট করে ফেলে। পরে দুঃখের জীবনে তার বোধোদয় ঘটে এবং হৃদয়-মন পরিবর্তিত হওয়ায় সে সৎ ও ধর্মনিষ্ঠ হয়। ধূর্ত উকিল কবিদর, অর্থলোভী বাঞ্ছারাম, তোষামোদকারী রক্তেশ্বর ইত্যাদি চরিত্র জীবন্ত। তবে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলো মোকাজান মিঞা বা ঠকচাচা। চরিত্রটি ধূর্ততা, বৈষয়িক বুদ্ধি ও প্রাণময়তা নিয়ে এ গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা জীবন্ত চরিত্র। 'আলালের ঘরের দুলাল' সার্থক উপন্যাস না হলেও বাংলা ভাষায় উপন্যাস রচনার প্লাটফর্মটি তৈরি করে দেয়।

প্র : বাংলা উপন্যাস রচনার পথিকৃৎ কাকে বলা হয়?
উ : প্যারীচাঁদ মিত্রকে।
প্র : পাদ্রি লঙ সাহেব তাঁকে কী বলতেন?
উ : ফিফেল অব বেঙ্গল।
প্র : তিনি কোন ছদ্মনামে সাহিত্য রচনা করতেন?
উ : টেকচাঁদ ঠাকুর।
প্র : তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থের নাম কী?
উ : মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায় (১৮৫৯), বামারঞ্জিকা (১৮৬০), গীতাঙ্কুর (১৮৬১), যৎকিঞ্চিৎ (১৮৬৫), অভেদী (১৮৭১)।

প্র : তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ২৩শে নভেম্বর, ১৮৮৩।

কাজিমদুরেসা

প্র : কাজিমদুরেসার জন্মসাল কবে?
উ : ১৮৯৯।
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : কবটিয়া, টাঙ্গাইল।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : শিক্ষাবিদ।
প্র : তিনি কী হিসেবে সেকালে মুসলিম সমাজে স্মরণীয় ছিলেন?
উ : কৃতী ছাত্রী ও শিক্ষাব্রতী।
প্র : তিনি কোন কোন পত্রিকায় প্রবন্ধ ও গল্প রচনা করেন?
উ : শিখা ও সওগাত পত্রিকায়।
প্র : তাঁর রচিত লেখাগুলো কী?
উ : মুসলিম নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, নারী জীবনে আধুনিক শিক্ষার আঘাত, মুসলিম নারীর মুক্তি ইত্যাদি।
প্র : তিনি কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ১৯৭৭, ঢাকা।

ফররুখ আহমদ

প্র : ফররুখ আহমদের জন্মতারিখ কবে?
উ : ১০ই জুন, ১৯১৮।
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : মাজআইল গ্রাম, যশোর।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : ইসলামি স্বাতন্ত্র্যবাদী কবি।
প্র : তাঁর রচিত কবিতায় কী কী উজ্জ্বলভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে?
উ : পাকিস্তানবাদ, ইসলামি আদর্শ বিশেষত মুসলিম জাগরণ এবং আরব-ইরানের ঐতিহ্য।
প্র : তাঁর রচিত কবিতা কেন বিশিষ্ট?
উ : আরবি-পারসি শব্দের প্রয়োগ নৈপুণ্য, বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের অভিনবত্বে।
প্র : তাঁর রচিত কাহিনিকাব্যের নাম কী?
উ : হাতেমতায়ী (১৯৬৬)।

2020/5/13 20:53
Scanned with CamScanner

BCS PREPARATION

প্র : তিনি তাঁর রচিত হাতেমতাঈ গ্রন্থের জন্যে কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ : আদমজি পুরস্কার (১৯৬৬)।
প্র : তিনি 'পাখির বাসা' গ্রন্থের জন্যে কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ : ইউনেস্কো (১৯৬৬)।
প্র : তিনি আর কী কী পুরস্কারে ভূষিত হন?
উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক।
প্র : তাঁর রচিত শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থের নাম কী?
উ : সাত সাগরের মাঝি (১৯৪৪)।
প্র : 'সাত সাগরের মাঝি' গ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : বাংলাদেশের বাংলা কবিতার ধারায় চল্লিশের দশকের কবি ফররুখ আহমদের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি' (১৯৪৪)। এই কাব্যগ্রন্থে মোট উনিশটি কবিতা স্থান পেয়েছে। সাত সাগরের মাঝি নামের একটি কবিতা আছে গ্রন্থের সর্বশেষে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কবিতা : সিন্দবাদ, পাঞ্জেরি, লাশ, আউলাদ, নরিয়ার শেষরাত্রি ইত্যাদি। এ গ্রন্থের কবিতাগুলি ১৯৪৩-'৪৪ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রচিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিজপ সমাজের ছবি যেমন লাশ, আউলাদ কবিতায় পাওয়া যাবে। তবে মূলত মুসলমানদের জাগরণের লক্ষ্যে তিনি এ গ্রন্থের কবিতাগুলো লিখেছেন। সেজন্যে কবি ত্যাগ করেছেন বঙ্গীয় শব্দ ও অনুষঙ্গ, গ্রহণ করেছেন আরব্য উপন্যাস, ইরান-আরবের সংস্কৃতি ও পুরাণকথা। বাংলা প্রচলিত শব্দ পরিত্যাগ করে একাব্যে কবি বহু অপ্রচলিত আরবি-পারসি শব্দ গ্রহণ করেছেন। অনুষঙ্গের ক্ষেত্রেও এসেছে সমুদ্র বারংবার, এসেছে ঈগল পাখি, নারঙ্গির বনের সবুজ পাতা ইত্যাদি। এ কাব্যগ্রন্থ পাঠ করলে এই ধারণা হয়, কবি জন্মেছেন বাংলায়, কিন্তু তাঁর মন পড়ে আছে আরব-ইরানের মরুভূমিতে। এই কাব্যগ্রন্থের সব শব্দের অর্থ কোন বাঙালি পাঠকই বুঝবেন না। তাঁকে 'আরবি-পারসি থেকে বাংলা' অভিধান কাছে নিয়ে বসতে হবে। তবে কবিশক্তি থাকায় চমৎকার চিত্রকল্প, প্রতীক সৃজন ও কবিভাষা নির্মাণ ফররুখ আহমদ করতে পেরেছেন। তাই যথাযথ অর্থ না বুঝেও 'আফিক বিছানো শব্দ' বা 'শিশানো আবলুস' বা 'নরিয়ার হাম্বাম' শব্দবন্ধগুলো পড়তে আমাদের মন্দ লাগে না।
প্র : তাঁর রচিত কাব্যনাট্যের নাম কী?
উ : নৌফেল ও হাতেম (১৯৬১)।
প্র : তাঁর রচিত সনেট সংকলনের নাম কী?
উ : মুহূর্তের কবিতা (১৯৬৩)।
প্র : তাঁর রচিত শিশুতোষ গ্রন্থের নাম কী?
উ : পাখির বাসা (১৯৬৫)।
প্র : পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে তাঁর অবস্থান কী?
উ : বাংলা ভাষার পক্ষে।
প্র : পাকিস্তান বেতার-টিভিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার বন্ধের সিদ্ধান্তে তাঁর অবস্থান কী?
উ : তিনি বন্ধ রাখার পক্ষে ছিলেন।
প্র : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা কী?
উ : মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে ও পাকিস্তানের অখণ্ডতার পক্ষে অবস্থান।
প্র : তাঁর মৃত্যুতারিখ কত?
উ : ১৯শে অক্টোবর, ১৯৭৪।

ফয়েজ আহমদ

প্র : ফয়েজ আহমদ কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৯৩২ সালের ২রা মে, বিক্রমপুরের বাসাইলভোগ এলাকায়।
প্র : তিনি মূলত কী?
উ : সাংবাদিক ও লেখক, বিশেষ করে শিশুতোষ গ্রন্থকার।
প্র : তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের নাম কী কী?
উ : শিশু-কিশোর : হাতে খড়ি (১৯৫৪), জোনাকী (১৯৫৬), তা থিনতা (১৯৬৩), পুতলী (১৯৬৪), বোকা আইভান (১৯৭৬), বিন্দু (১৯৮৪), তুলির সাথে লড়াই (১৯৮৬), হারিয়ে যাওয়া (১৯৮৮), জুড়ি নেই (১৯৮৮), বাজনা কিসের (১৯৯০), বাছাই করা শতকে ছড়া (১৯৯০), রুদ্র ঢাকা (১৯৯০), বেছে বেছে নেয়া কবিতার খেয়া (১৯৯১), প্রতিবাদের ছড়া (১৯৯৫), তারাদের সাথে (১৯৯৫), ছুটি ছুট (১৯৯৭) ইত্যাদি। প্রবন্ধ : শিল্প থেকে লিখছি (১৯৬৭), টানে ফাঁকি (১৯৮১), মন্বন্তরের কথাবার্তা (১৯৮২), সত্যবাবু মাস্টার (১৯৮৪), চলমান রাজনীতি (১৯৮৪) ইত্যাদি।
প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭৬), একুশে পদক (১৯৯১), আজিজ সম্মাননা (১৯৯২), শিশু একাডেমি পুরস্কার (১৯৯৭)।
প্র : তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ২০শে ফেব্রুয়ারি, ২০১২।

বনফুল, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

প্র : বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : মনিহারপুর, পূর্ণিয়া, বিহার।
প্র : তাঁর জন্ম তারিখ কত?
উ : ১৯শে জুলাই, ১৮৯৯।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : কথাসাহিত্যিক।
প্র : তাঁর আদিনিবাস কোথায়?
উ : নিমাবালা, হুগলি।
প্র : তাঁর সাহিত্যিক ছদ্মনাম কী?
উ : বনফুল।
প্র : তিনি কী রচনা করে প্রথম সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেছেন?
উ : 'শনিবারের চিঠি'তে ব্যঙ্গ কবিতা ও গল্পাভি।
প্র : তিনি কোথায় কী গল্প লিখে খ্যাতি অর্জন করেন?
উ : 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'একপাতা-অরপাতা' গল্প।
প্র : তিনি কী কী রচনা করেছেন?
উ : উপন্যাস ও গল্প।
প্র : তাঁর রচিত গল্প ও উপন্যাসে কী কী নিপুণভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে?
উ : বাস্তব জীবন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র উপাদান।
প্র : তাঁর রচিত গল্পগ্রন্থের নাম কী?
উ : বনফুলের গল্প (১৯৩৬), বনফুলের আরো গল্প (১৯৩৮), বাহুল্য (১৯৪০), বিন্দু বিসর্গ (১৯৪৪), অদৃশ্যলোকে, উর্মিমালা (১৯৪৫), সপ্তমী (১৯৪৭), পূরবীন (১৯৬১) ইত্যাদি।
প্র : তাঁর রচিত উপন্যাসগুলোর নাম কী?
উ : অগ্নি (১৯৩৯), মৃগয়া (১৯৪০), তীর্থের (১৯৪০), কিছুক্ষণ (১৯৪৩), হাটে বাজারে (১৯৪৪), নির্মোক (১৯৪৭), জঙ্গম (১৯৪০), স্থাবর (১৯৪০), হাসুবন্ধ (১৯৪৮), সন্ধীর আগমন (১৯৬১) ইত্যাদি।
প্র : 'অগ্নি' উপন্যাসের পরিচয় দাও।
উ : ভারতে ১৯৪২ সালের অগাস্ট আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত। বনফুলের এই রাজনৈতিক উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ সালে। উক্ত আন্দোলনের নেতা অংশুমান উপন্যাসের নায়ক, যাকে কারাদণ্ড দেয়া হয় ইংরেজ পেশুটিকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগে। অন্য চরিত্রগুলোর মধ্যে নীহার ও তার স্ত্রী অন্যতম। নীহার কমুনিস্ট মতবাদী হয়েও ক্যাপিটালিস্ট সরকারের অধীনে চাকরি করে, এমনকি আন্দোলনকে চিহ্নিত করার জন্য গ্রামে গ্রামে তার তৎপরতা প্রদর্শন করে; শাড় করে রায় সাহেব উপাধি। কিন্তু তাতে স্ত্রী অন্তরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তার এই অনুভূতি প্রাক্তন কমরেড নীলা দত্তকে সে অবগত করে। এর মধ্যেই অংশুমানের সাথে তার পরিচয় হয়। এক পর্যায়ে তার ফাঁসির আদেশ হয়, অপরাধ পুলিশ অফিসারকে ট্রেন থেকে ফেলে খুন করা। বনফুল ছিলেন গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের সমর্থক। এই উপন্যাস রচনা করে তিনি প্রকারান্তরে কমিউনিস্টদের সমালোচনা করলেন।
প্র : তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : বনফুলের কবিতা (১৯২৯), ব্যঙ্গ কবিতা (১৯২৯), অঙ্গারপর্ণী (১৩৪০), চতুর্দশী (১৯৪৭), করকমলেষু (১৯৪৯) ইত্যাদি।
প্র : তিনি কী রচনার পথিকৃৎ ছিলেন?
উ : জীবনীনাটক রচনার।
প্র : তাঁর রচিত জীবনীনাটকগুলোর নাম কী?
উ : শ্রীমধুসূদন (১৯৩৯), বিদ্যাসাগর (১৯৪২)।

2020/5/13 20:53
Scanned with CamScanner

প্র: তিনি তাঁর রচনার জন্যে কী উপাধিতে ভূষিত হন?
উ: পদ্মভূষণ।
প্র: তিনি কত তারিখে কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?
উ: ৯ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯: কলকাতা।

'নিমগাছ' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র: চর্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ কোনটি?
উ: নিমগাছের ছাল ও পাতা।
প্র: নিম গাছের কচি পাতা কী কাজে লাগে?
উ: নিম গাছের কচি পাতা অনেকে কাঁচা খায়, কেউ বেতন সহযোগে ভেজে খায়– যকৃতের পক্ষে বেশ উপকারী বলে।
প্র: নিম গাছের কচি ডাল কী কাজে লাগে?
উ: নিম গাছের কচি ডাল অনেকেই চিবোয়, দাঁত ভালো থাকে।
প্র: নিম গাছের প্রশংসায় কারা পঞ্চমুখ?
উ: কবিরাজরা নিম গাছের প্রশংসায় কারা পঞ্চমুখ।
প্র: নিম গাছ বাড়ির পাশে জন্মালে কারা খুশি হন?
উ: বিজ্ঞরা খুশি হন।
প্র: কে নিম গাছের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকলো?
উ: এক জন কবি নিম গাছের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকলো।
প্র: কে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে চলে গেল?
উ: এক জন কবি।
প্র: নিমগাছের কী ইচ্ছা করতে লাগল?
উ: কবির সঙ্গে চলে যেতে।
প্র: নিমগাছের ইচ্ছেপূরণ হলো না কেন?
উ: মাটির ভেতর শিকড় অনেক দূর চলে গেছে বলে। অর্থাৎ সংসারের প্রতি মায়া-মমতা ও দায়িত্ববোধ সৃষ্টি হয়েছে বলে।
প্র: কবিরাজ কারা?
উ: যারা গাছগাছালি পরিশোধন করে মনুষ্যরোগের চিকিৎসা করেন।
প্র: 'নিমগাছ' কী ধরনের গল্প?
উ: 'নিমগাছ' একটি প্রতীকী গল্প।
প্র: 'নিমগাছ' গল্পটি কোন গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে?
উ: লেখক বদরুদ্দীন উমরের 'অন্যদৃষ্টিকোণ' (১৯৮৭) নামক গ্রন্থ থেকে।
প্র: নিমগাছকে কার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে?
উ: একজন গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মী মহিলার সঙ্গে।

বদরুদ্দীন উমর

প্র: বদরুদ্দীন উমর কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ: ১৯৩১ সালের ২০শে ডিসেম্বর, পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানে।
প্র: তিনি মূলত কী হিসেবে পরিচিত?
উ: অধ্যাপক এবং রাজনীতিক।
প্র: তিনি কোন সাময়িকী সম্পাদনা করেন?
উ: সংস্কৃতি।
প্র: তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ: প্রবন্ধ-গবেষণা : সাম্প্রদায়িকতা (১৯৬৬), সংস্কৃতির সাম্প্রদায়িকতা (১৯৬৮), পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (১৯৭০), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ (১৯৭৪), যুদ্ধপূর্ব বাঙলাদেশ (১৯৭৪), যুদ্ধোত্তর বাঙলাদেশ (১৯৭৬), ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (১৯৮০), বঙ্গভঙ্গ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি (১৯৮৭), বাঙলাদেশের মধ্যবিত্ত ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি (১৯৮৯), দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ (২০০৬) ইত্যাদি।
প্র: 'সংস্কৃতির সংকট' গ্রন্থটির লেখক কে?
উ: বদরুদ্দীন উমর।
প্র: তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ: বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭২, প্রত্যাখ্যান), ইতিহাস পরিষদ পুরস্কার (১৯৭৪, প্রত্যাখ্যান)।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্র: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মতারিখ কবে?
উ: ২৬শে জুন, ১৮৩৮ (১৩ই আষাঢ়, ১২৪৫)।
প্র: তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ: কাঁঠালপাড়া গ্রাম, চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।
প্র: তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ: উপন্যাসিক ও বাঙালির নবজাগরণের প্রথমতম অগ্রদূত।
প্র: তিনি প্রথম কোন পত্রিকায় কবিতা লিখে সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন?
উ: সংবাদ প্রভাকরে।
প্র: তাঁর রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম কী?
উ: ললিতা তথা মানস (১৮৫৬)।
প্র: তাঁর রচিত প্রথম বাংলা উপন্যাসের নাম কী?
উ: দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫)। এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস।
প্র: তাঁর রচিত দ্বিতীয় উপন্যাসের নাম কী?
উ: কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬)।
প্র: 'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ'।–এই সংলাপ সম্পর্কে কী বলা হয়?
উ: কপালকুণ্ডলার এই সংলাপকে বলা হয়– বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোমান্টিক সংলাপ।
প্র: এই উপন্যাসের আর একটি উল্লেখযোগ্য বাক্য কী?
উ: 'তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?'
প্র: ত্রয়োদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশের রাজনৈতিক পটভূমিকায় তাঁর রচিত উপন্যাসের নাম কি?
উ: মৃণালিনী (১৮৬৯)।
প্র: সামাজিক সমস্যার আলোকে তাঁর রচিত উপন্যাসগুলোর নাম কী?
উ: বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮)।
প্র: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ মূলক উপন্যাস কোনটি?
উ: রজনী (১৮৭৭)।
প্র: তাঁর রচিত কোন উপন্যাসে বিপ্লব সাধন ও বীরত্ব ফলাফল করেছে?
উ: রাজসিংহ (১৮৮২), আনন্দমঠ (১৮৮২)।
প্র: তাঁর রচিত কোন উপন্যাস ঐতিহাসিক উপন্যাসিক হয়ে কোন ধর্মের ব্যাখ্যা করেছে?
উ: দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪), সীতারাম (১৮৮৭)।
প্র: বাংলা উপন্যাসের জনক বলা হয় কাকে?
উ: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে।
প্র: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বাংলা উপন্যাসকে জনক বলা হয় কেন?
উ: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বাংলা উপন্যাসের জনক বলার কারণ হলো, বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম পাশ্চাত্যরীতি অবলম্বন করে একটি পরিপূর্ণ আখ্যান রচনা করেন। উপন্যাস একটি পাশ্চাত্য শিল্প-ধারণা। এখানে একটি ক. পূর্ণ থাকবে; খ. আখ্যানবস্তুর দেশকালগত অবস্থান ও পরিবর্তন দেখা যাবে; গ. চরিত্রের গঠন ও বিবর্তন, পরিণতি ও পরিব্যাপ্তি থাকবে; ঘ. সময় ও স্থানের ঐক্য থাকবে। এই বিচারে বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের আগে কেউ সর্বাঙ্গ সার্থক উপন্যাস লিখতে পারেন নি। 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' ও 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাস-ব্যাটাইয়ের মাপকাঠিতে সর্বাঙ্গ সার্থক নয়। 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) রচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক উপন্যাস রচনার স্বাক্ষর রাখেন। এরপর তিনি সে ধারাকে বেগবান করেন এবং একের পর এক সার্থক উপন্যাস রচনা করে চলেন বলে বঙ্কিমচন্দ্রকে বাংলা উপন্যাসের জনক বলা হয়।
প্র: বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী উপন্যাস বলা হয় কোনগুলোকে?
উ: আনন্দমঠ (১৮৮২), দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪), সীতারাম (১৮৮৭)।
প্র: 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাস সম্পর্কে লেখ।
উ: 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬) বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্যাস। এতে নিগূঢ় ভাবসঙ্গতির জন্য 'রোমান্স' বলা যায়। অরণ্যে এক কাপালিক-পালিতা নারী কপালকুণ্ডলাকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসের কাহিনি গড়ে

Scanned with CamScanner

BCS PREPARATION

উঠেছে। সামাজিক সংস্কারের সঙ্গে অপরিচিতা এই নারীর নবকুমারের সঙ্গে বিয়ে এবং কপালকুণ্ডলার সমাজবন্ধনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব এই কাহিনির মূল ঘটনা। কুপালকুণ্ডলার মধ্যে যে রহস্য সেই রহস্য উপন্যাসটিই উপন্যাসের প্রধান বিষয়। কাহিনিতে একদিকে আছে সম্রাট জাহাঙ্গিরের সমরকার আগ্রার নগর ও খুশপত্তা এবং অন্যদিকে অরণ্য ও সমুদ্র। প্রকৃতির সৌন্দর্য ও রহস্যময়তা, কপালকুণ্ডলার চরিত্র, কাহিনির ট্র্যাজিক পরিণতি এই তিনটি কারণে উপন্যাসটি বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম স্মরণীয় রচনা। বঙ্কিমের জীবৎকালেই এই উপন্যাসের আটটি সংস্করণ হয়। অনেকের মতে এটি বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্র: কুপালকুণ্ডলা, নবকুমার, কাপালিক ইত্যাদি। গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই উপন্যাসের একটি নাট্যরূপ দেন (১৮৭৩) এবং মনোমোহন মুখোপাধ্যায় এই উপন্যাসের একটি উপসংহার উপন্যাস রচনা করেন এবং নামকরণ করেন 'মৃন্ময়ী' (১৮৭৪)।

প্র: 'মৃণালিনী' উপন্যাস সম্পর্কে লেখ।

উ: 'মৃণালিনী' (১৮৬৯) ত্রয়োদশ শতাব্দীর বাংলাদেশ ও তুর্কি আক্রমণ এর ঐতিহাসিক পটভূমিতে রচিত। মগধের রাজপুত্র হেমচন্দ্রের সঙ্গে মৃণালিনীর প্রণয় এবং দেশরক্ষার জন্য হেমচন্দ্রের সংকল্প ও ব্যর্থতার সঙ্গে এক রহস্যময়ী নারী মনোরমার কাহিনি এ উপন্যাসের মূল কথাবস্তু। বঙ্কিমের দেশাত্মবোধ এবং ইতিহাস জিজ্ঞাসার প্রথম প্রকাশ এই উপন্যাসে। ঐতিহাসিক ঘটনার অন্তরালে হেমচন্দ্র-মৃণালিনী এবং পশুপতি-মনোরমার প্রেমকাহিনি এই উপন্যাসে প্রধান হয়ে উঠেছে। ইতিহাসের উপাদান নিয়ে এখানে জীবনকে মুখ্য করা হয়েছে।

প্র: 'বিষবৃক্ষ' শ্রেষ্ঠ উপন্যাস কেন?

উ: 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত সামাজিক উপন্যাস। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় সমস্যার সঙ্গে বিধবা বিবাহ, পুরুষের একাধিক বিবাহ তার কুফল, দৈতিকতার দ্বন্দ্ব, নারীর আত্মকর্তৃত্ব ও অধিকারবোধ প্রভৃতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বাংলা উপন্যাসে বিষবৃক্ষের প্রভাব অত্যন্ত গভীর। চরিত্রায়ণে ঘটনা সংস্থানে এবং জীবনের কঠিন সমস্যার সন্ধানে 'বিষবৃক্ষ' বাংলা সাহিত্যের অনন্য উপন্যাস। কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক আগে কোন লেখক এ জাতীয় বিষয় নিয়ে উপন্যাস রচনার চেষ্টা পর্যন্ত করেন নি। বালবিধবা কুন্দনন্দিনীর প্রেম ও কুন্দনন্দিনী বিকাশকে তৎকালীন সমাজ যে প্রশ্রয় দেয় নি, এ উপন্যাস তার প্রমাণ। লেখক এ উপন্যাসে করেছেন, কুন্দর কাহিনি পাঠ করার পর ঘরে ঘরে অমৃত ফলবে অর্থাৎ এ ধরনের প্রণয়াকাঙ্ক্ষা রহিত হবে। বঙ্কিমচন্দ্র যা চেয়েছেন সেটি মুখ্য নয়। বঙ্কিমচন্দ্র যে সমস্যার যে যথার্থ রূপায়ণ করতে পেরেছেন এটাই আসল। 'বিষবৃক্ষ' আজও বাংলা শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলোর একটি।

প্র: 'ইন্দিরা' গল্প না উপন্যাস?

উ: 'ইন্দিরা' (১৮৭৩) ছোট উপন্যাস (নভেলা), অনেকে বলেন বড়ো গল্প। ১৮৭২ সালে 'বঙ্গদর্শনে' প্রথম প্রকাশিত এবং 'উপকথা' (১৮৭৭) গ্রন্থে সংকলিত। ১৮৯৩ সালে পুনর্লিখিত এবং পরিবর্ধিত হয়। এই কাহিনিটি উত্তমপুরুষের বয়ানে রচিত। কৌতুক-পরিহাসপূর্ণ উপভোগ্য কাহিনি 'ইন্দিরা'। অনেকের মতে, বঙ্কিমচন্দ্রের কালে শিল্পমাধ্যম হিসেবে ছোটগল্পের অস্তিত্ব ছিলো না বলে তিনি একটি গল্পের বিষয়কে উপন্যাসে রূপ দিতে গিয়েছেন। তাঁদের মতে, 'ইন্দিরা' বাংলা ছোটগল্পের ইঙ্গিত, সূচনার বার্তাবহ।

প্র: 'যুগলাঙ্গুরীয়' সম্পর্কে লেখ।

উ: 'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৪) ছোট আখ্যান। কেউ বলে থাকেন নভেলা বা ছোট উপন্যাস, কেউ বলেন বড় গল্প। বঙ্কিম একে বলেছেন উপকথা। প্রাচীন পটভূমিকায় একটি প্রেম কাহিনি। ছোটগল্প শিল্পমাধ্যমটি ওইকালে থাকলে

'যুগলাঙ্গুরীয়' একটি গল্প হতে পারত। 'ইন্দিরা'র পর এই আখ্যানে বঙ্কিমচন্দ্র আবার একই ফর্মটিকে অনুসরণ করেন।

প্র: 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাস সম্পর্কে লেখ।

উ: 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫) প্রথমে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। প্রতাপ ও শৈবলিনীর বাল্যপ্রণয় এবং সেই প্রেমের করুণ পরিণতি এই উপন্যাসের প্রধান কাহিনি। প্রেম, দাম্পত্য আদর্শ, সমাজের শাসন, সতীত্ব ইত্যাদি এই কাহিনিতে বিশেষভাবে সমস্যায়িত হয়েছে। এই উপন্যাসের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ বঙ্কিমের নীতি ও প্রত্যাদৃষ্টতা। কেননা, লেখক এখানে 'তবে যাও প্রতাপ, স্বর্গধামে' বলে নায়ককে পরলোকের পথ দেখিয়েছেন। উপন্যাসটির পটভূমি ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠা এবং মির কাসিমের সঙ্গে ইংরেজদের সংগ্রাম। ইতিহাসাশ্রয়ী ঘটনার সঙ্গে গার্হস্থ্য জীবনের কাহিনির রূপায়ণ ঘটেছে বলে মির কাসিম-দলনি বেগমের সঙ্গে চন্দ্রশেখর-প্রতাপ-শৈবলিনীর আখ্যান রচিত হয়েছে এই উপন্যাসে।

প্র: 'রজনী' কী প্রকৃত উপন্যাস?

উ: 'রজনী' (১৮৭৭) উপন্যাসের নায়িকা রজনীর সঙ্গে স্কট লিটন প্রণীত 'দি লাস্ট ডেস অফ পম্পেই' নামক উপন্যাসের নিডিয়া চরিত্রের কিছুটা ঐক্য আছে। বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর জবানবন্দিতে এই উপন্যাস রচিত। এই রীতিটিও যে বঙ্কিম ইংরেজ ঔপন্যাসিক কার্লিনস অনুসরণে করেছেন তা তিনি ভূমিকায় জানিয়েছেন। বাংলা উপন্যাস গড়ে তুলবার জন্য এভাবেই পাশ্চাত্যের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমের অধিকাংশ উপন্যাসের মতোই এখানেও প্রেম ও আদর্শের সংঘাতই কাহিনির মূল উপজীব্য। 'রজনী'কে প্রকৃত উপন্যাস না বলে রোমান্স বলা হয়ে থাকে। কারণ এখানে বেশ কল্পদৃশ্যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।

প্র: 'কৃষ্ণকান্তের উইল' কী?

উ: 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮) বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং সমকালে বিতর্কিত উপন্যাস। এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিধবা নারী রোহিণীকে অবলম্বন করে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই শিল্পবোধ ও নৈতিক আদর্শের দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন। উপন্যাসিকের জীবদ্দশায় এই গ্রন্থের চারটি সংস্করণ হয়। প্রধান চরিত্র: রোহিণী, গোবিন্দলাল, ভ্রমর।

প্র: 'সীতারাম' উপন্যাস সম্পর্কে লেখ।

উ: 'সীতারাম' (১৮৮৭) বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশেষ উপন্যাস। সীতারাম একটি ঐতিহাসিক চরিত্র। উপন্যাসে ঐতিহাসিক কিছু ঘটনাও আছে। মূলত এটি এক ব্যক্তির পারিবারিক জীবনের এবং আদর্শের ট্র্যাজেডি। বঙ্কিমের ধর্মচিন্তা এই উপন্যাসের গঠনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তবে চরিত্রসৃষ্টির নৈপুণ্য এবং কাহিনির বর্ণনা কুশলতায় বঙ্কিমের প্রতিভার ছাপ স্পষ্ট। তাঁর 'আনন্দমঠ', দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম'কে 'ত্রয়ী' উপন্যাস বলা হয়।

প্র: 'আনন্দমঠ' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ: ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিকায় সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ছায়া অবলম্বনে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছে ১৮৮২ সালে। উপন্যাসটিতে প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে দাঁড়িয়েছে 'স্বদেশপ্রতি, স্বজাতি ও স্বধর্মপ্রীতি'। এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র 'স্বদেশ বলতে বঙ্গভূমিকে, আর ধর্ম বলতে হিন্দু ধর্মকে বুঝিয়েছেন। বন্দে মাতরম্ গান দ্বারা বুঝিয়েছেন ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের দীক্ষা। উল্লেখ্য যে এটি কোন ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। এর ঘটনা কল্পিত কিন্তু অবিশ্বাস্য নয়। চরিত্রগুলি আদর্শায়িত। মন্বন্তরের বর্ণনা নিখুঁত, সাধারণ গ্রামীণ জীবনের আখ্যান বাস্তব। সর্বোপরি প্রেম এবং আদর্শের দ্বন্দ্ব এই উপন্যাসের কাহিনিকে নিবিড়তা দিয়েছে। কিন্তু এই উপমহাদেশের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে এ উপন্যাসের মূল্য অসামান্য। বঙ্কিমচন্দ্র রচিত এই গ্রন্থের 'বন্দে মাতরম্' গানটির ভূমিকা যেমন ঐতিহাসিক, তেমনি ঐতিহাসিক এই

20/5/13 20:54

Scanned with CamScanner

উপন্যাসের প্রভাব। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত The Abbey of Bliss (1907) এবং শ্রী অরবিন্দ Ananda Math (1910) নামে উপন্যাসটির ইংরেজি অনুবাদ করেন। এটি মূলত বাঙ্ময়ানুগ রোমান্সধর্মী উপন্যাস। এই গ্রন্থে রচিত গানের 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি পরবর্তীকালে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনকারীদের অত্যন্ত প্রিয় ও উদ্দীপক স্লোগান হিসেবে গৃহীত হয়। এই গ্রন্থ থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় স্বসম্প্রদায়প্রীতি লক্ষ করা যায়।

প্র : বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধে'র পরিচয় দাও।

উ : 'বিবিধ প্রবন্ধ' (১ম খণ্ড ১৮৮৭, ২য় খণ্ড ১৮৯২) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত প্রবন্ধাবলি। প্রথম খণ্ডের বিষয়বস্তু মূলত সাহিত্যকেন্দ্রিক। বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাসে এই প্রবন্ধগুলির ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে ধর্ম, সমাজ, ইতিহাস বিষয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ আছে। এই প্রবন্ধগুলোতেও বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধ রচনার নির্দিষ্ট পথে বাংলা প্রবন্ধের গুরুত্বপূর্ণ পথ সূচনা করলেন। **'বিবিধ প্রবন্ধ' (১৮৯৫) নামে ভূদেব মুখোপাধ্যায়েরও একটি প্রবন্ধ সংকলন আছে।**

প্র : বঙ্কিমচন্দ্রের কোন গ্রন্থে গদ্যকবিতার বৈশিষ্ট্য আছে বলে মনে করা হয়?

উ : 'গদ্যপদ্য বা কবিতাপুস্তক' (১৮৯১)। ১৭৭৮-এ প্রকাশিত 'কবিতাপুস্তক' নামক পদ্যসংগ্রহের সঙ্গে কয়েকটি গদ্যরচনা যুক্ত করে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। অনেকের মতে এই গ্রন্থের কোনো কোনো গদ্যরচনায় গদ্য কবিতার পূর্বাভাস লক্ষ করা যায়। সে বিবেচনায় এই গ্রন্থটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

প্র : 'সাম্য' গ্রন্থটি কেন গুরুত্বপূর্ণ?

উ : 'সাম্য' (১৮৭৯) গদ্যগ্রন্থ। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'সাম্য' বিষয়ক তিনটি এবং 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের কিছু অংশ নিয়ে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ইউরোপীয় সাম্যচিন্তার ধারার ইতিহাস এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজ ও অর্থনীতির প্রগতিশীল চিন্তা প্রকাশিত। তবে সমগ্র জীবনে **বঙ্কিমচন্দ্র 'সাম্য' গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রণ করেন নি।** বঙ্কিমচন্দ্রের আগে বাংলা ভাষায় সাম্যবাদী চিন্তার এ ধরনের গ্রন্থ প্রকাশ হতে দেখা যায় না। এ ঐতিহাসিক কারণেও 'সাম্য' গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ। এই গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধগুলোতে সমাজে সাম্যপ্রতিষ্ঠা কামনা এবং ভূস্বামীদের দুঃখের কারণ হিসেবে অর্থনৈতিক শোষণকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্র : 'কমলাকান্তের দপ্তর' কোন ধরনের গ্রন্থ?

উ : 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত বিভিন্ন মেজাজের গদ্য ঢঙে লেখা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ। **কমলাকান্ত নামক এক চরিত্রের জবানিতে প্রবন্ধগুলি লিখিত।** ফলে এদের মধ্যে একটি ক্ষীণ আখ্যানগত এবং চরিত্রগত ঐক্য আছে। কমলাকান্ত নামক আফিমখোর, খ্যাপাটে কিন্তু চিন্তাশীল ও কল্পপ্রতিভাসম্পন্ন চরিত্রটি বঙ্কিমের অনন্য সৃষ্টি। মনে করা হয়, কমলাকান্ত আফিম খেলেই দিব্যদৃষ্টি ফিরে পায়। তার কবিত্ব, দেশপ্রেম, দার্শনিকতা, ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপশক্তি সমস্তই একাধারে এই গ্রন্থে ঘনীভূত। প্রসন্ন গোয়ালিনী কমলাকান্তের অনুষঙ্গী চরিত্র। বঙ্কিমচন্দ্র যে কত মহৎ গদ্যশিল্পী এ গ্রন্থে তা বোঝা যায়। তৎসম শব্দের স্থাপত্যধর্মী ঘনত্ব পরিত্যাগ করে এ গ্রন্থে তিনি পেলব গদ্যশৈলী নির্মাণ করেছেন। অনেকের মতে, কমলাকান্তের দপ্তর বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

প্র : বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম রচিত উপন্যাসের নাম কী?

উ : রাজমোহনস ওয়াইফ। ইংরেজিতে লেখা। প্রকাশ : ১৮৬৪ সালে 'Indian Field' পত্রিকায় ও ১৯৩৫ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়।

প্র : তিনি কী হিসেবে খ্যাত?

উ : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের সমন্বয় সাধনকারী হিসেবে।

প্র : তিনি বাংলা ভাষার সমালোচনায় কোন ধারার পথ প্রদর্শক?

উ : তুলনামূলক সমালোচনা ধারার।

প্র : তিনি কী কী বিষয়ের উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করেছেন?

উ : ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ভাষা, সমাজ ইত্যাদি।

প্র : তাঁর রচিত প্রবন্ধগুলোর নাম কী কী?

উ : লোকরহস্য (১৮৭৪), কমলাকান্তের দপ্তর (১৮৭৫), বিবিধ সমালোচনা (১৮৭৬), (১৮৭৫), কৃষ্ণচরিত্র (১৮৮৬), সাম্য (১৮৭৯), ধর্মতত্ত্ব অনুশীলন (১৮৮৮) ইত্যাদি। বক্তৃতা

প্র : বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কোন গ্রন্থটি বাজার থেকে প্রত্যাহার করে নেন?

উ : সাম্য (১৮৭৯)।

প্র : বঙ্কিমচন্দ্রের ছদ্মনাম কী?

উ : কমলাকান্ত।

প্র : বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম কীর্তি কী?

উ : বঙ্গদর্শন (১৮৭২) পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা।

প্র : বঙ্কিমচন্দ্রকে বাদ দিয়ে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার চারজন বিশিষ্ট লেখকের নাম লেখ।

উ : বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রথম প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাবধারার মিলন ঘটিয়েছিলেন। তিনি ছাড়া এই পত্রিকার বিশিষ্ট চারজন লেখক হলেন–সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

প্র : বাংলা ভাষায় ভ্রমণ সাহিত্যের প্রথম রচয়িতা কে? ভ্রমণ কাহিনিটির নাম কি?

উ : বাংলা ভাষায় ভ্রমণ সাহিত্যের প্রথম রচয়িতা বঙ্কিমভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'পালামৌ' (১৮৮০)। ছোটোনাগপুরের বিশেষ অঞ্চলের ভ্রমণকাহিনি।

প্র : পালামৌ স্থানটি কেমন?

উ : গ্রন্থে বলা হয়েছে: 'পালামৌ সহর নহে, একটি প্রকাণ্ড পরগণামাত্র। সহর সে অঞ্চলেই নাই, নগর দূরে থাকুক, তথায় একখানি গণ্ড গ্রামও নাই, কেবল পাহাড় ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ।' অন্যত্র বলা হয়েছে: 'পাহাড়, জঙ্গল, বাঘ এই লইয়াই পালামৌ'।

প্র : 'পালামৌ' কতটি কিস্তিতে কোথায় প্রথম প্রকাশ পায়?

উ : 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার ১২৮৭ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় আরম্ভ, ১২৮৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায় সমাপ্ত হয়। সঞ্জীবচন্দ্রের জীবদ্দশায় (১৮৮৪-১৮৮৯) এটি পুস্তকাকারে প্রকাশ পায় নি।

প্র : 'পালামৌ' কিভাবে জনসম্মুখে আসে?

উ : সঞ্জীবচন্দ্রের মৃত্যুর পর (১৮৮৯) বঙ্কিমচন্দ্র 'সঞ্জীবনী সুধা' নাম দিয়ে সঞ্জীবচন্দ্রের রচনাবলি প্রকাশ করেন। সেখানেই 'পালামৌ' প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। বহু পরে ১৩৫১ বঙ্গাব্দে কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রথম স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে 'পালামৌ' প্রকাশ করে।

প্র : 'পালামৌ' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য কী?

উ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'পালামৌ' নিয়ে তীর্থ আলোচনা করেছেন। এর এক পর্যায়ে তিনি বলেছেন: "পালামৌ ভ্রমণবৃত্তান্তের মধ্যে সৌন্দর্যের প্রতি সঞ্জীবচন্দ্রের যে একটি অকৃত্রিম সজীব অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে এমন সচরাচর বাঙ্গলা লেখকদের মধ্যে দেখা যায় না।"

প্র : 'পালামৌ'-এ ব্যবহৃত কয়েকটি বাক্য আমাদের ও প্রবাদপ্রতিম হয়ে উঠেছে। কোনগুলো?

উ : ১. 'বঙ্গবাসীদের কেবল মাঠ দেখা অভ্যাস, মৃত্তিকার সামান্য স্তূপ দেখিলেই তাহাদের আনন্দ হয়'। ২. 'বঙ্গবাসীমাত্রই সজ্জন; বঙ্গে কেবল প্রতিবাসীরাই দুরাত্মা, যাহা নিন্দা শুনা যায় তাহা কেবল প্রতিবাসীর।' ৩. 'মনুষ্য বৃদ্ধ না হইলে সুন্দর হয় না।' ৪. 'যাহার ভাগ্যে কঠিন পাষাণ, পাষাণই তাহার অবলম্বন'। ৫. 'বন্যেরা বনে সুন্দর; শিশুরা মাতৃক্রোড়ে'। ৬. 'এক দিন আপনার অহঙ্কারে আপনি হাসিব'। ৭. 'যে হারে, সেই রাগে'।

প্র : 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক কে ছিলেন? পত্রিকাটি কত সালে প্রকাশিত হয়?

উ : 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পত্রিকাটি ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

20/5/13 20:54

Scanned with CamScanner

প্র : বঙ্কিমচন্দ্রের পরে কে বঙ্গদর্শন সম্পাদনা করেছিলেন?

উ : বঙ্কিমচন্দ্রের পরে বঙ্গদর্শন সম্পাদনা করেছিলেন তাঁর অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

প্র : বঙ্কিমচন্দ্র কোন্ কোন্ ইউরোপীয় দার্শনিকের মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

উ : বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম জীবনে ইউরোপীয় দার্শনিক কোঁতের চিন্তাধারার সমর্থক ছিলেন। এছাড়াও রুশো, বেন্থাম ও মিলের সামাজিক মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

প্র : কমলাকান্তের দপ্তর কোন্ বিদেশি লেখকের কোন্ গ্রন্থের দ্বারা অনুপ্রাণিত।

উ : বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তর ইংরেজ সাহিত্যিক ও সমালোচক ডি-কুইন্সির *Confession of an English Opium Eater*-এর আদলে রচিত।

প্র : বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ রচনার মূলে কী উদ্দেশ্য ছিল?

উ : বঙ্কিমচন্দ্র জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বিবিধ বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করে বাঙালি জাতিকে চিন্তা ও মননশীলতায় দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। বাঙালি জাতি, বাংলা ভাষা ও স্বদেশিক ঐতিহ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু ও সচেতন করাও তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

প্র : বঙ্কিমচন্দ্রের চারটি ইতিহাস আশ্রয়ী রোমান্সধর্মী উপন্যাসের নাম লেখ।

উ : দুর্গেশনন্দিনী কপালকুণ্ডলা, চন্দ্রশেখর ও রাজসিংহ।

প্র : বঙ্কিমচন্দ্রের খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস কোনটি?

উ : বঙ্কিমচন্দ্রের খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস রাজসিংহ।

প্র : বঙ্কিমচন্দ্রের দুটি তত্ত্বমূলক উপন্যাসের নাম লেখ।

উ : বঙ্কিমচন্দ্রের দুটি তত্ত্বমূলক উপন্যাস : আনন্দমঠ ও দেবীচৌধুরাণী।

প্র : বঙ্কিমচন্দ্রের দুটি সামাজিক উপন্যাসের নাম লেখ।

উ : বঙ্কিমচন্দ্রের দুটি সামাজিক উপন্যাসের নাম 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮)।

প্র : বঙ্কিমচন্দ্রের রজনী উপন্যাসটি কোন্ ইংরেজি উপন্যাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে রচিত?

উ : বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' উপন্যাসটি ইংরেজ ঔপন্যাসিক লিটন রচিত The Last Days of Pompeii অবলম্বনে রচিত।

প্র : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাস্টিস শব্দ গ্র্যাজুয়েট কে?

উ : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

প্র : বাংলা উপন্যাস রচনায় তাঁর প্রথম সৃষ্টি কী?

উ : শিল্পসম্মত সার্থক উপন্যাস।

প্র : তিনি সাহিত্যের রসাস্বাদনের কার থেকে কী আখ্যা লাভ করেন?

উ : সাহিত্যসম্রাট।

প্র : তিনি হিন্দু ধর্মানুরাগীদের কার থেকে কী আখ্যা লাভ করেন?

উ : ঋষি।

প্র : তিনি কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?

উ : ৮ই এপ্রিল, ১৮৯৪ (২৬শে চৈত্র, ১৩০০) রবিবার।

'বিড়াল' রচনা থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : আহার প্রস্তুত না হওয়ায় কমলাকান্ত ইঁদুর হাতে নির্মীলিতলোচনে কী ভাবছিলেন?

উ : আমি যদি নেপোলিয়ান হইতাম, তবে ওয়াটারলু জিতিতে পারিতাম কি না।

প্র : প্রথম উদ্যমে কমলাকান্ত ডিউকে কি বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল?

উ : ইতঃপূর্বে যথোচিত পুরস্কার দেয়া গিয়েছে, এক্ষণে আর অতিরিক্ত নয়।

প্র : প্রসন্নর দুগ্ধ মার্জার কর্তৃক উদরসাৎ করার সময়ে কমলাকান্ত কী করছিল?

উ : ওয়াটার্লুর মাঠে ব্যূহ রচনায় ব্যস্ত ছিল।

প্র : 'কেহ মরে বিল ছেঁচে, কেহ খায় কই'। মার্জার কিভাবে কথাটা ভাবছিল?

উ : মনে মনে হেসে।

প্র : বিড়ালের পান করা দুধ সম্পর্কে কমলাকান্তের ভাবনা কী ছিল?

উ : দুধ আমার বাপেরও নয়, দুধ মঙ্গলার, দুহিয়াছে প্রসন্ন।

প্র : কমলাকান্ত কোন মার্জারকে মারতে নেপোলিয়ন বিড়াল দুধ খাইলে না মারলে মনুষ্যকুলে কুলাঙ্গার খলকুলে পরিচিত হইবে উপরন্তু কে অসুরক্ষ বলে বিবেচিত হইবে।

প্র : কমলাকান্ত কিভাবে বিড়ালকে মারতে নেপোলিয়নের সঙ্গে তুলনা করেছিল?

উ : পরাক্রান্ত হইতে। 'হস্ত হইতে উল্কা নামাইয়া, তাহা দ্বারা অরিকুল ধ্বংস করে'।

প্র : মার্জারের বক্তব্য কমলাকান্ত কিভাবে গ্রহণ করেছিলেন?

উ : নিরুপায় হইয়া।

প্র : মার্জার মানব সম্প্রদায়কে কী কী উপদেশ দিয়েছিল?

উ : মানুষ, চতুষ্পদের কাছে শিক্ষানবীশ ব্যতীত তোমাদের জ্ঞানোন্নতির উপায়ান্তর দেখি না। আমি তোমার ধর্মরক্ষার মূলীভূত কারণ। অতএব আমাকে প্রহার করিয়া, আমার প্রশংসা কর। আমি তোমার ধর্মের সহায়।

প্র : সাধু ও চোর সম্পর্কে মার্জারের ভাবনা কী ছিল?

উ : যাহারা বড় বড় সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া ওঠেন, তাঁহারা অনেক চোর অপেক্ষা অধার্মিক। অধর্ম চোরের নয়, চোরে যে চুরি করে, সে অধর্ম কৃপণ ধনীর। চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শত গুণে দোষী। চোরের দণ্ড হয়। চুরির মূল যে কৃপণ, তাহার দণ্ড হয় না কেন?

প্র : ছোটলোকের দুঃখে দুখী হওয়া প্রসঙ্গান্তরে বিড়ালের ভাবনা কী?

উ : আমার মতো দরিদ্রের ব্যাথায় ব্যথিত হওয়া, লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। যে কখনো অন্ধকে মুষ্টি ভিক্ষা দেয় না। সেও একটা বড় রাজা ফাঁপরে পড়িলে রাত্রে ঘুমায় না সকলেই পরের ব্যাথায় ব্যথিত হইতে রাজি। তবে ছোটলোকের দুঃখে কাতর! ছি কে হইবে?

প্র : মানবসমাজ সম্পর্কে বিড়ালের আপেক্ষা কী?

উ : তেল মাখায় তেল দেয়া মনুষ্য জাতির রোগ-দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না। যে খাইতে বলে বিরক্ত হয় তার জন্য আয়োজন কর, আর যে খাওয়ার কাছে তাকে ডেকেই আর পাও।

প্র : মার্জারের কাছে কার মূল্য নেই?

উ : যে বিড়াল নিজের বিপদকে ভাল করে বুঝাবার, বুঝার নিকট মুষ্টি আদির সহোদর বা মূর্খ ধনীর পরমবন্ধু সেনোরাডের স্থানীয় হয়ে থাকে।

প্র : চোর ও অর্থের সম্পর্কে বিড়ালের আবনা কী?

উ : চোরের দণ্ড আছে, নির্লজ্জার কি দণ্ড নাই? দরিদ্রের আমার সংসারের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন?

প্র : দরিদ্রেরা কেন পৃথিবীতে আসে নাই?

উ : অন্যায়রে ঘরে যাবার জন্য নয়। এটি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবিশেষ।

প্র : কমলাকান্ত মার্জারের কোন বিষয়টি সহ্য করতে পারত না?

উ : বিড়ালের সোশিয়ালিস্টিক কথা।

প্র : সমাজ সম্পর্কে মার্জারের ভাবনা কী?

উ : আমি যদি খাইতে না পাইতাম, তবে সমাজের উন্নতি নিয়া কি হবে?

প্র : বিচারকদের সম্পর্কে বিড়ালের বক্তব্য কী?

উ : চোরকে ফাঁসি দাও। তাহাতে আমার আপত্তি নাই। যে বিচারক চোরকে সাজা দিবেন। তিন দিন আগে তিনি উপবাস করিবেন।

প্র : তিন দিন না খেয়ে থাকলে কমলাকান্তকে কার ঘরে আবিষ্কার সম্ভব?

উ : নসীরাম বাবুর ভাণ্ডার ঘরে।

প্র : আফিঙের মহিমা বোঝাতে কমলাকান্ত বিড়ালকে কোন বই পড়তে বলেন?

উ : নিউম্যান ও পার্কারের গ্রন্থ, কমলাকান্তের দপ্তর।

প্র : 'প্রেতবৎ' কী?

উ : প্রেতের মতো। এটি একটি উপমা।

প্র : 'পাষাণবৎ কঠিন' কী?

উ : পাষাণের মতো কঠিন। একটি উপমা।

প্র : মার্জার কোন শব্দ?

উ : তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ।

প্র : 'মার্জারসুন্দরী' কী?

উ : এখানে যে বেড়ালের কথা বলা হয়েছে তা মাদিবেড়াল। তাই লেখক একে 'সুন্দরী' বলে অভিহিত করেছেন।

Scanned with CamScanner

প্র : 'কেহ মরে বিল হেঁচে, কেহ খায় কই'– কী?
উ : এটি একটি প্রবাদ। এর অর্থ কেউ কষ্ট করে কেউ কষ্ট না করেই তার ফল ভোগ করে।

প্র : 'মঙ্গলা' কী?
উ : এই প্রবন্ধে উল্লেখ নেই। তবে যে গরুর দুধ নিয়ে এতো কাণ্ড সেই গরুটির নাম মঙ্গলা। নামটি যথাযথ। কারণ, গরুকে মানবের জন্য মঙ্গলময় বিবেচনা করা হয়।

প্র : 'প্রসন্ন' কে?
উ : মঙ্গলার মালিক গোয়ালিনী প্রসন্ন। এই নামটিও যথাযথ। এই গোয়ালিনী কমলাকান্তের বা লেখকের প্রতি সদাপ্রসন্ন ছিল।

প্র : মার্জারীর স্বজাতিমণ্ডল কী?
উ : বিড়ালকুল বা বিড়ালদের মধ্যে।

প্র : 'দিব্যকর্ণপ্রাপ্ত' কী?
উ : এটি এই প্রবন্ধের গুরুত্বপূর্ণ চাবিশব্দ। কমলাকান্তকে প্রাবন্ধিক নেশামুক্ত করেন এবং নেশামুক্ত হলে সে সমাজের সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে। বলা হচ্ছে, ঈশ্বর তাকে দিয়ে এগুলো বলাচ্ছেন। আসলে ব্রিটিশ আমলে সরকারের একজন আমলা হিসেবে সরকার ও সমাজের সমালোচনা করা বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে কঠিন ছিল। তাই তিনি নেশা ও দিব্যত্বের আড়ালে সে কাজটি করেন।

প্র : বিড়ালের বক্তব্য মূলত কী?
উ : এটি সমতা বা সাম্যের বক্তব্য। বঙ্কিমচন্দ্র আমলা ও ধনী হলেও তিনি সমাজের অসমতা দেখে কাতর ছিলেন। 'সাম্য' বলে তাঁর একটি গ্রন্থও আছে। বিড়াল মূলত সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের মৌলিক চাহিদা নিবৃত্তির কথা ইঙ্গিতে বলেছে।

প্র : বড় রাজার জন্য ফাঁপর বা শিরোমণি / ন্যায়ালংকারের জন্য সমাদর দিয়ে লেখক কী বুঝিয়েছেন?
উ : বুঝিয়েছেন মানুষ সব সময় তার অপেক্ষা ধনে ও ক্ষমতায় যিনি অগ্রগণ্য বা ধর্মের কাণ্ডারী তাদের সমাদর করে– গরিবদের নয়। মানুষ ক্ষমতাবান ও ধর্মের ধ্বজাধারীদের মনোরঞ্জনের জন্য ব্যস্ত থাকে কিন্তু সাধারণের দিকে দৃষ্টি দেয় না।

প্র : এই প্রবন্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাক্য লেখ।
উ : 'খাইতে দাও– নহিলে মুষ্টি আঘাত দেখ।' এ বাক্য থেকেই কালক্রমে ক্ষোভের ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। 'কেউ খাবে তো কেউ খাবে না, তা হবে না তা হবে না।'

প্র : 'আফিং' কী?
উ : ভেষজ নেশাবস্তু। ঘুমের ঔষধ আবিষ্কার হবার আগে অনিদ্রাজনিত রোগে অল্প পরিমাণে আফিং সেবন বিধেয় ছিল। আফিং অধিক গ্রহণে মানুষ নেশাগ্রস্ত হয়।

প্র : কমলাকান্তের ধমকের মর্মার্থ কী?
উ : বিড়ালকে কমলাকান্ত ধমক দিয়ে সাম্যবাদের মূল কথাটি কৌশলে প্রকাশ করে দিয়েছে।

প্র : নসীরাম কে?
উ : কমলাকান্তের দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র।

প্র : 'একটি পতিত আত্মাকে অন্ধকার হইতে আলোতে আনিয়াছি'– বলে কী বোঝানো হয়েছে?
উ : কমলাকান্তের চেতনার দুয়ার খুলে গেছে বিড়ালের কথায়। তাই সে বিড়ালকে নিজের খাদ্যে ভাগ দিতে সম্মত হয়েছে আর সে হয়ে উঠেছে অন্য মানুষ। এই চেতনার উদয়ই প্রবন্ধের লক্ষ্য।

প্র : 'দেখিনু সেদিন রেলে ... ... মার খায়ে দুর্বলা?'– এই কবিতাংশে কী ধরা পেয়েছে?
উ : শ্রেণিবৈষম্য, সাম্যবাদিতা ও মানবিকতা।

প্র : 'দেখিনু সেদিন রেলে ... ... মার খায়ে দুর্বল' এই কবিতার চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে–
উ : 'তোমরা মনুষ্য, আমরা বিড়াল, প্রভেদ কী?' বাক্যে।

প্র : গ্রন্থে নাজমার গল্প দিয়ে তৈরি উদ্দীপকে নাজমা ও বিড়ালের বিপন্নতা কোন দিক থেকে?
উ : নাজমা পরিবারের সদস্যদের কথা ভাবে আর বিড়াল বিড়ালকুলের কথা চিন্তা করে। নাজমার চেয়ে বিড়ালের চিন্তা ব্যাপকতর।

প্র : সমাজের কাজ কি নীতি ও ধর্মবিরোধী?
উ : 'কল্পিত নীতি ও শাস্ত্রে এই কর্ম গর্হিত' বলার 'মূলে' যেখানে মানুষের অস্তিত্ব ও অধিকারের প্রশ্ন আছে তাই তা নীতি ও ধর্মবিরোধী নয়।

রশেদ আলী মিয়া

প্র : রশেদ আলী মিয়ার জন্মতারিখ কবে?
উ : ১৫ ডিসেম্বর, ১৯০৬।

প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : দেলদার গ্রাম, পাবনা।

প্র : তিনি প্রথম কোন পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে যোগ দেন?
উ : হালদান দর্পন (১৯২৫)।

প্র : তাঁর সম্পাদিত পত্রিকাগুলোর নাম কী?
উ : কিশোর পরাগ, শিশুবার্ষিকী, জ্ঞানের আলো।

প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : কবি, ঔপন্যাসিক ও শিশুসাহিত্যিক।

প্র : তিনি তাঁর কবিতায় কী বর্ণনায় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন?
উ : প্রকৃতির সৌন্দর্য।

প্র : তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : মনোনতির চর (১৯৩২), অনুরাগ (১৯৩২) ইত্যাদি।

প্র : তাঁর রচিত শিশুতোষ গ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : চরের জামাই (১৯২৭), মৃগপরী (১৯৩৭), চাঁদনী বউ (১৯৫৯), রূপকথা (১৯৬০), কুঁড়বরণ কন্যা (১৯৬০)।

প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ : বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬২) ও প্রেসিডেন্ট পুরস্কার (১৯৬৫)।

প্র : তিনি কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ১৭ই জুন, ১৯৭৯; রাজশাহি।

বিজন ভট্টাচার্য

প্র : বিজন ভট্টাচার্য কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : বানখানপুর, ফরিদপুর।

প্র : তিনি কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৯০৬।

প্র : তিনি কিসের প্রধান পুরোধিক ছিলেন?
উ : নবনাট্য আন্দোলনের।

প্র : এই আন্দোলনকে আর কী নামে অভিহিত করা হয়?
উ : গণনাট্য বিপ্লোভ।

প্র : গণনাট্য ও নবনাট্য আন্দোলন কী?
উ : গণনাট্য আন্দোলন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে সারা পৃথিবী জুড়েই শুরু হয়েছিল এক ধরনের বিশৃঙ্খলা এবং অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত এক অবস্থা। এই দুরবস্থা তার চরম রূপ লাভ করে ১৯২৯ সালে। তখন বিশ্বজোড়া আর্থিক মন্দার চাপসিকে শুরু হয় চুরি, ডাকাতি, পকেটমার ইত্যাদি নানা সামাজিক অপরাধ। এই সুযোগে স্বদেশপ্রেমের মুখোশে ইতালি, জার্মানি, স্পেন, গ্রিস প্রভৃতি দেশে শুরু হয় একনায়কতন্ত্র বা স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্ট সাম্রাজ্যবাদ। লেখক, বুদ্ধিজীবী ফ্যাসিস্ট ন্যায় অনেক বিশ্ববিদিত ব্যক্তি এইসব ফ্যাসিস্ট শক্তির হাতে নিহত হন। রবীন্দ্রনাথ, রোমা রোঁলা, আন্দ্রে জিঁদ প্রমুখ দার্শনিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তি এই অমানবিক শক্তির বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ করতে থাকেন। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ভারতে গণনাট্য সংঘ বা গণনাট্য আন্দোলনের জন্ম হয়। কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক মঞ্চ হিসেবে গড়ে তোলা হয় IPTA (Indian People's Theatre Association)। স্থাপিত হয় ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখক-শিল্পী সংঘ। সেই সময় প্রতিষ্ঠিত গণনাট্য সংঘে যে আদর্শগুলি মেনে চলত সেগুলি হলো–

(১) নাটকে থাকবে বাস্তব সমস্যার রূপায়ণ ও জনগণের সম্মিলিত প্রতিবাদ-প্রতিরোধের পথ।
(২) ব্যক্তি এখানে শ্রেণির প্রতিভূ হয়ে নাটকে চিত্রিত হবেন।
(৩) ব্যক্তিনায়কের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করবে গোষ্ঠীর প্রতি চিন্তা।
(৪) আনন্দবিধানের সঙ্গে সঙ্গেই শিল্পের উদ্দেশ্য হবে জনগণের সমস্যার মূল কারণ খুঁজে বের করে পরিবর্তনের উপায় সম্পর্কে তাদের সচেতন করিয়ে দেওয়া।

Scanned with CamScanner

(৫) হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি রক্ষা বিষয়েও নাট্যকারকে সচেতন থাকতে হবে।
(৬) আমজনতার অংশগ্রহণকে স্পর্শ করার জন্য নাটকে থাকবে লোকসংগীত বা লোক-উৎসবের ঘটনা।

নাট্যকার তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার' বা বিজন ভট্টাচার্যের 'দেবীগর্জন' নাটকে IPTA-র সাহিত্যাদর্শের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

নবনাট্য-আন্দোলন : গণনাট্যের পরবর্তী পর্যায় হলো নবনাট্য-আন্দোলন। নবনাট্যের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে হলে নবনাট্যের অন্যতম পথিকৃৎ গঙ্গাপদ বসুর কথাতেই বলতে হয়–'সৎ মানুষের নতুন জীবনবোধের এবং নতুন সমাজ ও বলিষ্ঠ জীবনগঠনের মহৎ প্রয়াস যে সুলিখিত নাটকে শিল্প সুষমায় প্রতিফলিত, তাকেই বলতে পারি নবনাট্যের নাটক এবং এইরকম নাটক নিয়ে মঞ্চে সমাজ সচেতন শিল্পীর মতো রিয়ালিটির যে অন্বেষণ তাকেই বলতে পারি নবনাট্য আন্দোলন।' বস্তুতপক্ষে, নাটক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়ে গণনাট্যের সঙ্গে নবনাট্যের কোনো বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা না গেলেও একটি বিষয়ে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখা গিয়েছিল। সেটি হলো, নবনাট্যের দলগুলি বিশেষ কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শের মধ্যে নিজেদের গণ্ডিবদ্ধ করতে চান নি। নবনাট্যের সূত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হলেন নাট্যাচার্য শম্ভু মিত্র ('চাঁদবণিকের পালা'), তৃপ্তি মিত্র ('বিদ্রোহিণী'), উমানাথ ভট্টাচার্য ('ছারপোকা') প্রমুখ। বিজন ভট্টাচার্য গণনাট্য থেকে নবনাট্যের অন্যতম সূচনাকারী ছিলেন।

প্র : কোন নাটক রচনা করে তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন?
উ : নবান্ন (১৯৪৪)।
প্র : 'নবান্ন' নাটকের বিষয়বস্তু লেখ।
উ : 'নবান্ন' (১৯৪৪) পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় কৃষক জীবনের দুঃখ দুর্দশা ও জীবন সংগ্রামের কাহিনি অবলম্বনে রচিত নাটক। নবনাট্য আন্দোলনের পথিকৃৎ বিজন ভট্টাচার্য এই নাটকের মাধ্যমে বাংলা নাট্যধারায় গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রাখেন। তাই এই নাটকটিকে বাংলা নাট্য আন্দোলনের ইতিহাসে যুগান্তকারী বলা চলে। অনেকে দীনবন্ধুর 'নীল-দর্পণ'-এর সঙ্গে এর তুলনা করেছেন। এ নাটকটি ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ ১৯৪৪ সালে মঞ্চস্থ অভিনয় করেন। তখন থেকেই 'নবান্ন' নতুন বাংলা নাটকের অগ্রদূত রূপে গণ্য হয়। পঞ্চাশের মন্বন্তর, সমকালীন রাজনীতি আন্দোলন, মেহনতি মানুষের চাহিদা ইত্যাদির প্রেক্ষাপটে গ্রামীণ যুবক সমাজের দুঃখ-দুর্দশা, তাদের সংঘবদ্ধ সফলতা-ব্যর্থতা ইত্যাদি এই নাটকের মূল সুর।

প্র : তাঁর রচিত অপরাপর নাটকের নাম কী?
উ : জনপদ (১৯৪৫), কলঙ্ক (১৯৪৬), মরাচাঁদ (১৯৪৬), অবরোধ (১৯৪৭), গোত্রান্তর (১৯৬০)। (টীকা: 'গোত্রান্তর' ছোটগল্পের লেখক সুবোধ ঘোষ)।
প্র : তাঁর রচিত নাটকের উপজীব্য কী?
উ : সমাজের নিচের তলার মানুষের জীবনচিত্র।
প্র : নাট্য রচনায় কোন মতবাদকে তিনি প্রাধান্য দেন?
উ : মার্কসবাদকে।
প্র : তিনি কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ১৯শে জানুয়ারি, ১৯৭৮: কলকাতা।

বিপ্রদাশ বড়ুয়া

প্র : বিপ্রদাশ বড়ুয়া কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
প্র : তাঁর মাতা-পিতার নাম কী?
উ : মাতার নাম সুষমা বড়ুয়া; পিতার নাম অরুণ কুমার বড়ুয়া।
প্র : তাঁর পিতা পেশায় কী ছিলেন?
উ : ডাক্তার।

প্র : তিনি কবে, কোথা থেকে প্রাথমিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন?
উ : ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে রাঙামাটি (সরকারি) উচ্চবিদ্যালয় থেকে।
প্র : তিনি কবে, কোথা থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন?
উ : ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম সিটি কলেজ থেকে।
প্র : তিনি কবে, কোথা থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন?
উ : ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম কলেজ থেকে বাংলায় স্নাতক ডিগ্রি এবং পরের বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।
প্র : তিনি কোথা থেকে চাকরিতে অবসর গ্রহণ করেন?
উ : বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর সহকারী পরিচালক হিসেবে অবসরগ্রহণ করেন।
প্র : বিপ্রদাশ বড়ুয়া রচিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের নাম লেখ।
উ : উপন্যাস: অচেনা (১৯৭৫), ভয় ভালোবাসা নির্বাসন (১৯৮৮), মুক্তিযোদ্ধারা (১৯৯১), প্রবল গৌতম (১৯৯৬), ইয়াসমিন (১৯৯৯), অশ্রু ও আগুনের নদী (২০০৬); ছোটদের উপন্যাস: রোবট ও কুল কোটানোর রহস্য (১৯৯৮), জাদুমানিক স্বাধীনতা (১৯৯২), রাতের রেলগাড়িতে ছায়াপথে ভ্রমণ (২০০০); ছোটগল্প: মুক্তজয়ের গল্প (১৯৮৫), গাছটিল (১৯৮৬), স্বপ্নমিছিল (১৯৮৯), আমি মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করি (১৯৯১), বনের ভেতরে অদ্ভুত রেস্তোরাঁ (২০০০); প্রবন্ধগ্রন্থ: কবিতায় বাক্‌প্রতিমা (১৯৭৬); নাটক: কুমড়োলতা ও পাখি (১৯৯৭); শিশুসাহিত্য: সূর্য লুঠের গান (১৯৮০), বনের উপর টাগ (১৯৯৩); জীবনী: বিদ্যাসাগর (১৯৮৮), পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন (১৯৯৭); প্রকৃতিবিষয়ক: কাছের পাখি দূরের পাখি (১৯৭৯), নদী মেঘলা বাংলাদেশ (১৯৯৪), পাখির ভুবন (২০০২); ভ্রমণ-গ্রন্থ: অপরূপ মায়ানমার (২০০৩), মায়াবি জাপান (২০১০), ভূস্বর্গ ভ্রমণ: বাংলাদেশ (২০১১)।

প্র : বিপ্রদাশ বড়ুয়া কী কী পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেন?
উ : কথাশিল্পী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮২), আন্তর্জাতিক মুহম্মদ সম্মাননা (১৯৮৫), অমরী ব্যাংক শিশুসাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৯, ১৯৯২, ১৯৯৮), বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯১), অতীশ দীপঙ্কর স্বর্ণপদক (১৯৯৭)।

'মধুর পথে' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'মধুর পথে' ভ্রমণকাহিনিটি লিখেছেন কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত?
উ : 'অপরূপ মায়ানমার'।
প্র : অপরূপ মায়ানমার কত খ্রিষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়?
উ : ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দে।
প্র : 'অপরূপ মায়ানমার' কোন ধরনের গ্রন্থ?
উ : ভ্রমণকাহিনি।
প্র : টেকনাফ কোথায় অবস্থিত?
উ : বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার একটি উপজেলার নাম টেকনাফ। এই উপজেলার পূর্ব দিকে নাফ নদী এবং নদীর অপর প্রান্তে মায়ানমার দেশ অবস্থিত। নাফ নদীর নাম থেকে এ স্থানের নাম 'টেকনাফ' হয়েছে। টেকনাফ থানায় বিখ্যাত 'মাথিনের কূপ' আছে। এই মাথিনের কূপ নিয়ে আছে কিংবদন্তি এবং গ্রন্থ।
প্র : 'মায়ানমার'-এর পূর্বনাম কী?
উ : বার্মা।
প্র : ব্রিটিশ যুগ বলতে কী বোঝান হয়েছে?
উ : যে সময় ব্রিটিশেরা এ অঞ্চল শাসন করেছে।
প্র : পাদরি কারা?
উ : খ্রিষ্টীয় ধর্ম প্রচারকদের পাদরি বলে।
প্র : সপ্তদশ শতাব্দী কোন সময়?
উ : ১৬০১ থেকে ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।
প্র : পর্তুগিজ কারা?
উ : পর্তুগাল দেশের অধিবাসী।
প্র : পর্তুগিজরা বসত-অঞ্চলকে কী বলতো?
উ : ব্যান্ডেল।

2020/5/13 20:54
Scanned with CamScanner

প্র : চট্টগ্রামের ব্যান্ডেল রোড কাদের স্মৃতি বহন করছে?
উ : চট্টগ্রাম অঞ্চলে এক সময় পর্তুগিজরা বসত স্থাপন করেছিল– সেই স্মৃতি বহন করছে।
প্র : 'খাঁচা-ছাড়া পাখির মতো উড়াল দিলাম।'– এটা কী?
উ : এটা একটি উপমা।
প্র : আরাকানের বর্তমান নাম কী?
উ : রাখাইন রাজ্য।
প্র : রাখাইন রাজ্য-এর রাজধানীর নাম কী?
উ : সিত্তিওয়ে।
প্র : আরাকান অর্থাৎ বর্তমানের রাখাইন রাজ্যের কোন দিকে বাংলাদেশ অবস্থিত?
উ : আরাকান অর্থাৎ বর্তমানের রাখাইন রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম দিকে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিভাগ অবস্থিত।
প্র : আন্দামান কী?
উ : আন্দামান বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জ। এই দ্বীপগুলোর প্রায় সবই ভারতের অন্তর্ভুক্ত, ছোট্ট একটি-দুটি মায়ানমারভুক্ত।
প্র : 'আন্দামান সাগর' কী?
উ : আন্দামান সাগর হলো ভারত মহাসাগরভুক্ত সেই জলরাশি যা বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে, মায়ানমারের দক্ষিণ দিকে, থাইল্যান্ডের পশ্চিম দিকে এবং আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের পূর্ব দিকে অবস্থিত।
প্র : ফেনি নদী কোনটি?
উ : এটি বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশ এবং ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়া একটি নদী।
প্র : দৌলত কাজী ও আলাওল কে ছিলেন?
উ : এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য এই গ্রন্থের দৌলত কাজী ও আলাওল অংশ দ্রষ্টব্য।
প্র : শুক্লপক্ষ কী?
উ : পূর্ণিমার চাঁদের উদয় থেকে অবসান পর্যন্ত সময়।
প্র : কৃষ্ণপক্ষ কী?
উ : অমাবস্যার পর থেকে পূর্ণিমার চাঁদের উদয় পর্যন্ত সময়।
প্র : কুমারী কাকে বলে?
উ : অবিবাহিতা নারী।
প্র : পানীয়ের পসরা কী?
উ : পানযোগ্য বিভিন্ন তরল। যেমন: নানা ফলের রস ইত্যাদি।
প্র : প্রৌঢ় কারা?
উ : যারা যৌবন ও বার্ধক্যের মাঝামাঝি অবস্থাপ্রাপ্ত।
প্র : পাইক্যা কী?
উ : তিন চাকার রিক্সা জাতীয় ইঞ্জিন চালিত পরিবহন।
প্র : অনাথ কাকে বলে?
উ : এতিমকে।
প্র : পরখ করা কী?
উ : পরীক্ষা করা। (পরীক্ষা > পরখ)
প্র : 'দেখি উঁচু-নিচু চষা জমির মতো তোশক।'– এটা কী?
উ : এটা একটি উপমা।
প্র : পটুয়াখালি কোথায় অবস্থিত?
উ : বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত পটুয়াখালি আটটি উপজেলা নিয়ে গঠিত একটি জেলা। এটি বরিশাল বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। পটুয়াখালিকে 'সাগরকন্যা' বলা হয়।
প্র : রাখাইন কারা?
উ : একটি জাতি-বিশেষ। বাংলাদেশের কক্সবাজার, পটুয়াখালি জেলাতে এদের কিছু বসতি আছে। মায়ানমারে ব্যাপক সংখ্যক রাখাইন বাস করে।
প্র : 'পূর্বপুরুষের বাড়ি চট্টগ্রামের রাউজানে। আমার পাশের থানা।'– লেখক কোন থানার অধিবাসী?
উ : রাঙ্গুনিয়া থানার।
প্র : চাকমা, মারমা কারা?
উ : বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের পাহাড়ি দুই জনগোষ্ঠী।
প্র : বড়ুয়া কারা?
উ : মূলত চট্টগ্রামের সমতলে বাসকারী বাংলা ভাষী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠী।
প্র : ধানি লঙ্কা কী?
উ : ধানের মতো ছোট কিন্তু প্রচুর ঝাল বিশিষ্ট এক প্রকার মরিচ।
প্র : মহাথেরো কে?
উ : বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রধান গুরু।

প্র : মহাথেরো কোন ভাষার শব্দ?
উ : পালি ভাষার। বাংলায় মহাথেরোকে 'মহাস্থবির' বলে।
প্র : চীবর কী?
উ : বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পরিধানযোগ্য সেলাইবিহীন বস্ত্রখণ্ড।
প্র : চীবর সাধারণত কোন রঙের হয়?
উ : লাল বা লালের কাছাকাছি রঙের।
প্র : 'চ্যা' কী?
উ : মায়ানমারের মুদ্রানামের আঞ্চলিক উচ্চারণ।
প্র : মায়ানমারের মুদ্রার প্রকৃত নাম কী?
উ : ক্যাত (kyat)।
প্র : প্যাগোডা কী?
উ : বৌদ্ধমন্দির বা বৌদ্ধদের প্রার্থনাগৃহ।
প্র : ভাসমান দোকান কী?
উ : যে দোকান স্থায়ী নয়– অস্থায়ী এবং চাকার গাড়ির ওপরে স্থাপিত।
প্র : পুরকসহ খাওয়া কী?
উ : আনন্দের সঙ্গে আহার করা।
প্র : রোহিঙ্গা কারা?
উ : রোহিঙ্গাদের বোঝানো হচ্ছে।
প্র : 'বয়' কারা?
উ : খাবারের দোকানে পরিবেশনকারী হিসেবে যারা কাজ করে তাদের কথ্য ভাষায় 'বয়' বলে।
প্র : 'মহিলারা চিরস্বাধীন।'– এই বাক্য দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে?
উ : মায়ানমারে নারী স্বাধীনতা আছে ব্যাপক। নারীরা দোকানের মালিক, ভাসমান দোকান পরিচালনা, বাজারে দ্রব্য বিক্রি– সব কিছু করে, পুরুষেরা এতে কোনো আপত্তি বা বিপত্তি ঘটায় না।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্র : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : মাতুলালয়, মুরারিপুর গ্রাম, চব্বিশ পরগনা।
প্র : তিনি কবে জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : ঔপন্যাসিক।
প্র : শরৎচন্দ্র পরবর্তী বাংলা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে জনপ্রিয় কে ছিলেন?
উ : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
প্র : তাঁর রচিত সাহিত্য অখণ্ড ও অবিচ্ছিন্ন সত্তায় কী ধারণ করেছে?
উ : প্রকৃতি ও মানব জীবন।
প্র : তাঁর ভাষা কীরূপ?
উ : মধুর ও কাব্যধর্মী।
প্র : তাঁর রচিত ছোটগল্পগুলোর মধ্যে কী পরিস্ফুট হয়?
উ : গীতিকবির ব্যক্তিত্ব।
প্র : তাঁর রচিত উপন্যাসগুলোর নাম কী?
উ : পথের পাঁচালী (১৯২৯), অপরাজিত (১৯৩১), দৃষ্টি প্রদীপ (১৯৩৫), আরণ্যক (১৯৩৮), আদর্শ হিন্দু হোটেল (১৯৪০), দেবযান (১৯৪৪), ইছামতী (১৯৪৯), অশনি সংকেত (১৯৫৯) ইত্যাদি।
প্র : 'পথের পাঁচালী'র পরিচয় দাও।
উ : 'পথের পাঁচালী' (১৯২৯) বিভূতিভূষণের প্রথম উপন্যাস এবং অনেকের মতে শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। প্রথম প্রকাশিত হয় 'বিচিত্রা' পত্রিকায়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় সজনীকান্ত দাসের রঞ্জন প্রকাশালয়, কলকাতা থেকে। এই কাহিনির পটভূমিতে আছে বাংলাদেশের গ্রাম ও তার পরিচিত মানুষের জীবন। এর প্রধান অংশই হলো একটি শিশুর চৈতন্যের জাগরণ, মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে তার পরিচয়। প্রত্যেকটি আপাততুচ্ছ বিষয় ও ঘটনা নিয়ে আসে রহস্য ও সৌন্দর্যের আভাস, সবই মূল্যবান ও আনন্দময়। এই আনন্দ 'পথের পাঁচালী'র প্রাণ। এর তিনটি ভাগ : বল্লালী বালাই, আমআঁটির ভেঁপু, অক্রূর সংবাদ। উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড 'অপরাজিত' (১৯৩১)। 'পথের পাঁচালী'র নায়ক বালক অপু। দ্বিতীয় অংশে অপুর কৈশোর ও যৌবনের কাহিনি। 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' অবলম্বনে সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। 'পথের পাঁচালী'র উল্লেখযোগ্য চরিত্র : অপু, দুর্গা, ইন্দির ঠাকরুন, সর্বজয়া। 'পথের পাঁচালী' নিয়ে

2020/5/13 20:55
Scanned with CamScanner

রবীন্দ্রনাথের উচ্চমূল্য আছে। 'এই বইখানিতে পেয়েছি যথার্থ গল্পের স্বাদ। এর থেকে শিক্ষা হয় নি কিছুই। দেখা হয়েছে অনেক যা পূর্বে এমন করে দেখি নি।'

প্র : 'অপরাজিত' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'পথের পাঁচালী'র পরিপূরক কথাশিল্প হিসেবে রচনা করেন তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'অপরাজিত'। উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে মাসিক 'প্রবাসী'তে প্রথম প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয় ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে (১৯৩১)। উপন্যাসটির প্রথমে নামকরণ করা হয়েছিল 'অলোক সারথী'। সর্বজয়ার মৃত্যু হলে অপুর জীবন স্বাভাবিক নিয়মেই অন্যদিকে মোড় নেয়। গড়ে উঠে অপর্ণার সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক। অল্পকালের ব্যবধানে অপর্ণার মৃত্যু, লীলার আত্মহত্যা অপুর মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। নিজ পুত্র শিশু কাজলকে মাতামহের বাড়িতে রেখে অপু নিরুদ্দেশ হয়ে যায় অজানার পথে। একদিন ফিরেও আসে। দীর্ঘকাল পরে ফিরে এসে সে দেখে নিজপুত্র কাজলকে। অপু কাজলের নিষ্পাপ মুখে আবিষ্কার করে নিজের হারিয়ে যাওয়া শৈশব, দিদি কিশোরী দুর্গাকে আর তাদের প্রিয় গ্রাম নিশ্চিন্দিপুরকে। উপন্যাসে বলা হয়েছে, মানুষ সব ভুলতে পারে, ত্যাগ করতে পারে কিন্তু তার স্মৃতির শৈশব আর নিজের গ্রামীণ নিসর্গ প্রকৃতির আহ্বান উপেক্ষা করতে পারে না; এই আহ্বান পরাভব মানে না কোনো কিছুর কাছে।

প্র : 'আরণ্যক' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : 'আরণ্যক' (১৯৩৯) রচনার আগে কর্মসূত্রে বিভূতিভূষণ কিছুকাল ভাগলপুর নিকটবর্তী এক বনাঞ্চলে থাকতেন। সেই বনভূমি ও তার সঙ্গে যুক্ত অরণ্যচারী অজস্র মানুষের সংস্পর্শের অভিজ্ঞতাই এই উপন্যাসের ভিত্তিভূমি। মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্কের টানাপোড়েন, বহু বিচিত্র মানুষের চরিত্র, তাদের দুঃখ-দারিদ্র্য, আশা ও আনন্দ এই কাহিনির উপজীব্য। উপন্যাসটি ডায়েরিরীতিতে উত্তমপুরুষের জবানিতে রচিত। অরণ্যের সৌন্দর্য, ভয়ালতা, অরণ্যবাসীর বিশ্বাস ও সংস্কার এবং আদিমজাতা এবং অনার্য সমাজের দ্বন্দ্বের এমন তীব্র কাহিনি বাংলা উপন্যাসে এই প্রথম। উল্লেখযোগ্য চরিত্র : জমুনী, বনোয়ারী, দোবরু পাণ্ডা, দুষ্টু সিং, শাদু ইত্যাদি।

প্র : 'ইছামতী' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত শেষ উপন্যাস 'ইছামতী' প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালে। এটি রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করে। ইছামতী নদীর তীরবর্তী গ্রামের মানুষের জীবনকথা এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ভবানী বাঁড়ুজ্যে কিংবা তার পুত্রত্রয় তিলু, বিলু, নীলু লেখকের নিজের অভিজ্ঞতায় দেখা মানুষ, একান্ত অন্তরঙ্গ ভাবমূর্তিতে এদেরকে তিনি গড়ে তুলেছেন। গয়া মেম অন্যতম উল্লেখযোগ্য চরিত্র। রাজারাম দেওয়ান পরম সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ, কিন্তু ইংরেজের চাকরিতে প্রতিষ্ঠিত হতে ছলচাতুরি ও জোচ্চুরি করেছে। ইংরেজ শাসকের প্রভাবে কৃষিনির্ভর বাঙালির মনে যে বাণিজ্য-চেতনা জাগে নালুপাল যেন তারই প্রতীক। প্রচলিত সংস্কার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে নারী জাগরণের প্রতিনিধি নিভা রিনী। নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আছে এ উপন্যাসে। একটি ঐতিহাসিক পটভূমিকায় নদীতীরবর্তী সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে উপন্যাসটি চিহ্নিত।

প্র : 'দেবযান' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : 'দেবযান' (১৯৪৪) প্রেততত্ত্ব ও পারলোকতত্ত্ব-ভিত্তিক উপন্যাস। এই উপন্যাস রচনার জন্য বিভূতিভূষণ সর্বাধিক কাল ধরে পরিকল্পনা করেছিলেন। অবাস্তব ও অধিবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি এর কাহিনি ও চরিত্রবিন্যাসের নিয়ামক। 'দৃষ্টিপ্রদীপ' (১৯৩৫) উপন্যাসে এ ধরনের চিন্তা প্রথম প্রকাশ পায়।

প্র : 'অশনি সংকেত' উপন্যাস সম্পর্কে লেখ।

উ : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিষময় ফল ১৩৫০ বঙ্গাব্দের দুর্ভিক্ষ। আর এই দুর্ভিক্ষের

জন্মান গ্রাস গ্রাম বাংলায় কিভাবে বিস্তার লাভ করেছে তার নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেন এই উপন্যাসটি। এটা প্রথম প্রকাশ হয় ১৯৫৯ সালে। তবে পুস্তকাকারে প্রকাশের পূর্বে ১৯৪৪-৪৬ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে মাসিক 'মাতৃভূমি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'অশনি সংকেত'র পটভূমি বিভূতিভূষণের স্বগ্রাম বারাকপুর এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ও কলিকাতা মহকুমা শহর। আর উপন্যাসের চরিত্রগুলো জীবন্ত, বাস্তবধর্মী ও স্বাভাবিক। 'অনঙ্গবৌ' নামে চরিত্রটি বাঙালির প্রতিদিনের সুখ-দুঃখময় সংসারে খুঁজে পাওয়া যায়। এই উপন্যাসটিকে সত্যজিৎ রায় একই নামে চলচ্চিত্রে রূপদান করেন। অনঙ্গবৌ চরিত্রে অভিনয় করেন বাংলাদেশের চিত্রাভিনেত্রী ববিতা, গঙ্গারাম চরিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

প্র : 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : বিভূতিভূষণের বাস্তব অভিজ্ঞতার মানুষ, 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' এর প্রধান চরিত্র হাজারি ঠাকুরের অপূর্ণ স্বাদ ও আকাঙ্ক্ষাকেই উপন্যাসে রূপদানের প্রয়াস করা হয়েছে। নিজের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল স্বরূপ নিজে যেমন প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন ঠিক তেমনিভাবে লাভ করেছেন মানুষের ভালোবাসা। আর এর উপর ভিত্তি করে রচিত এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৪০ (১৩৪৭) খ্রিষ্টাব্দে।

প্র : 'অনুবর্তন' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : বিভূতিভূষণের 'অনুবর্তনে' (১৯৪২) ব্যক্তি অভিজ্ঞতার রূপায়ণ ঘটেছে। এখানে গ্রামের মানুষের মধ্যে যে দলাদলি ও স্বার্থপ্রিয়তা দেখা যায় তা বিভূতিভূষণের নিজ চোখে দেখা। ক্ষেত্রবাবু, নারানবাবু, যদুবাবু, ছাত্র চুনি, যদু মুখুজ্জে ইত্যাদি প্রাণবন্ত ও উজ্জ্বল চরিত্র। এর মধ্যে যদু মুখুজ্জে নিজে ভালো খেয়ে বেঁচে থাকার জন্য স্ত্রীর প্রতি অবিচার করে, ছাত্রদের জন্য বরাদ্দ অর্থ আত্মসাৎ করে, আবার নিজের পাপের জন্য ভগবানের কাছে ক্ষমাও চায়। দেশে আর [illegible] হয়ে ওঠে। বিভূতিভূষণের অন্যান্য [illegible] এই যদু মুখুজ্জে।

প্র : 'পথের পাঁচালী' উপন্যাস অবলম্বনে যে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে তা কে পরিচালনা করেন?

উ : সত্যজিৎ রায়।

প্র : 'পথের পাঁচালী'র সিরিজ আর কয় খণ্ড কোন উপন্যাসে?

উ : 'অপরাজিত' (১৯৩১)।

প্র : এই উপন্যাসের প্রধান কয়েকটি চরিত্রের নাম লেখ।

উ : অপু, সর্বজয়া, হরিহর, অপর্ণা।

প্র : ঋত্বিক ঘটক তাঁর কোন উপন্যাস নিয়ে চলচ্চিত্র তৈরি করেন?

উ : 'অশনি সংকেত'।

প্র : তাঁর রচিত ছোটগল্পগ্রন্থের নাম কী?

উ : মেঘমল্লার (১৯৩১), মৌরীফুল (১৯৩২), যাত্রাবদল (১৯৩৪), বিধুবদল (১৯৩৮)।

প্র : তাঁর রচিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের নাম কী?

উ : তৃণাঙ্কুর (১৯৪৩)।

প্র : তাঁর রচিত পথের পাঁচালী উপন্যাসটি কোন কোন ভাষায় অনূদিত হয়েছে?

উ : ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায়।

প্র : তিনি কোন উপন্যাসের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন?

উ : ইছামতী (১৯৪৯)।

প্র : তাঁর কোন উপন্যাসে অরণ্যচারী মানুষের জীবন প্রাধান্য পেয়েছে?

উ : 'আরণ্যক' (১৯৩৮)।

প্র : বিভূতিভূষণের উপন্যাসে কী গুরুত্বের সঙ্গে এসেছে?

উ : প্রকৃতি ও দরিদ্র মানুষের জীবন।

প্র : তিনি কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?

উ : ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৫০।

'আহ্বান' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'আহ্বান' গল্পের মূল প্রতিপাদ্য কী?

উ : মানুষের স্নেহ-মমতা-প্রীতির যে বাঁধন তা ধনসম্পদে নয়, হৃদয়ের নিবিড় স্পর্শেই

2020/5/13 20:55

Scanned with CamScanner

প্র : 'দুজনে হঠাৎ ধার্মিক হয়ে উঠলাম।'– তাহলে কি তারা অধার্মিক ছিল?

উ : এখানে বোঝান হয়েছে, তাদের মনে ধর্ম ও নীতিবোধ জেগে উঠল। ধর্ম ও নীতিজ্ঞান বলে পরের দ্রব্য অন্যায়ভাবে ভোগ করা পাপ; পরের জিনিস পরকে বুঝিয়ে দেয়াই কর্তব্য। মানুষ নিজেকে ধার্মিক বলে পরিচয় দিয়েও অনেক সময় অপরের জমি ও অন্য দ্রব্য ভোগ করে। এটা অন্যায় এবং অধর্মের কাজ।

প্র : 'বিচুলি' কী?

উ : বিচালি > বিচুলি অর্থ ধানের খড়।

প্র : 'বিচুলি' কোন শব্দ?

উ : 'দেশি' শব্দ।

প্র : 'নাটমন্দির' কী?

উ : 'নাট' অর্থ 'নাট্য ও গীতি' আর 'মন্দির' অর্থ 'ঘর'। নাটমন্দির হলো দেবমন্দিরের সম্মুখের সেই ঘর, যেখানে দেবদেবীর উদ্দেশে কীর্তন, নাচ বা গান করা হয়।

প্র : 'বাদলা নেমে গিয়েছে' কী?

উ : বর্ষা শুরু হয়ে গেছে।

প্র : 'বোষ্টম' কী?

উ : বৈষ্ণবদের কথ্যভাষায় বোষ্টম বলে। (বৈষ্ণব > বোষ্টম) এঁরা সাধারণত হরিনাম গেয়ে গেয়ে জীবন অতিবাহিত করেন।

প্র : বৈষ্ণব কারা?

উ : যারা রাধাকৃষ্ণের আরাধনা করেন, শ্রীচৈতন্য দেবের অনুসারী এবং অহিংস।

প্র : 'শুনহ মানুষ ভাই, / সবার ওপরে মানুষ সত্য, / তাহার ওপরে নাই।'– কার কথা?

উ : চণ্ডীদাসের।

প্র : চণ্ডীদাস কী ছিলেন?

উ : বৈষ্ণব কবি।

প্র : 'আমাদের প্রথম ও শেষ প্রস্তাব' বলতে কী বোঝাচ্ছে?

উ : একমত হওয়া প্রস্তাব বোঝাচ্ছে। যদিও বাক্স ফেরতের প্রস্তাব তাদের প্রথম প্রস্তাব ছিল না। প্রথম প্রস্তাব ছিল এর তালা ভেঙে পাওয়া টাকা দিয়ে সন্দেশ খাওয়ার। যেহেতু এখন তারা সবাই একমত যে, মালিকের হাতে বাক্সটি ফেরত দেওয়া হবে– সে কারণেই জোর বোঝাতে 'আমাদের প্রথম ও শেষ প্রস্তাব' কথাটির ব্যবহার হয়েছে।

প্র : 'লেখ-বাদল' কী?

উ : বাদল নামের একজন, সে লেখে এবং যার হাতের লেখা সুন্দর।

প্র : 'ভালো নাম' কী?

উ : কথ্য ভাষায় যাকে 'ভালো নাম' বলে তা আসলে 'পোশাকি নাম'। এই পোশাকি নাম স্কুল, কলেজ, চাকরি ইত্যাদিতে ব্যবহার হয়। মানুষের ডাকনামও থাকতে পারে। মা, বাবা, বাল্যবন্ধুরা এই ডাকনামে ডাকেন। অনেক লেখক 'লেখক-নাম' ব্যবহার করেন; যেমন– শেখ আজিজুর রহমানের লেখক-নাম 'শওকত ওসমান'। লেখক-নামকে প্রচলিত কথায় ছদ্মনামও বলা হয়।

প্র : 'চণ্ডীমণ্ডপ' কী?

উ : চণ্ডী হলেন দুর্গা। মণ্ডপ হলো ছাদ বা চালাযুক্ত স্থান। দুর্গা যেহেতু বড় পূজা সেহেতু চণ্ডীমণ্ডপ বেশ বড় স্থান। গ্রামে এক-দুই বাড়িতেই চণ্ডীমণ্ডপ ছিল। দুর্গা পূজা বাদে এখানে গ্রামের বড় বড় সভা-সমাবেশও হতো। সে বিচারে আজকের কমিউনিটি সেন্টারের ধারণাটি আসলে চণ্ডীমণ্ডপেরই পরিবর্তিত রূপ।

প্র : 'অম্বর' অর্থ কী?

উ : 'অম্বর'-এর দুটো অর্থ আছে: অম্বর অর্থ বস্ত্র; অম্বর অর্থ আকাশ।

প্র : 'কাপালি' কারা?

উ : এক জনগোষ্ঠী– যারা শ্মশান, নদী বা সমুদ্রতীরে তন্ত্রসাধনা করেন।

প্র : 'কুমোর' কী?

উ : 'কুমার'-এর কথ্য রূপ। 'কুমার' শব্দের একাধিক অর্থ আছে। এর একটি অর্থ হলো: যারা মাটির কাজ করে তারা কুমার বা কুমোর। এই গল্পে মাটি কেটে কুয়ো বানিয়েছে ভাদুই কুমোর।

প্র : 'দণ্ডবৎ হই' অর্থ কী?

উ : মাটিতে দণ্ড বা লাঠির মতো লম্বা হয়ে শুয়ে আপনাকে শ্রদ্ধা জানাই।

প্র : 'কল্যাণ হোক' অর্থ কী?

উ : তোমার মঙ্গল সাধিত হোক (আশীর্বাদ স্বরূপ)।

প্র : 'আজ্ঞে' কী?

উ : 'আজ্ঞা' থেকে 'আজ্ঞে'। অর্থ 'অনুমতি'। এখানে 'সম্মতিসূচক ধ্বনি'। বর্তমানে

2020/5/13 20:55
Scanned with CamScanner

আমরা আজের বদলে 'হ্যাঁ', 'হুরেরে', 'জি' ব্যবহার করি।

প্র : 'সুরবস্থা'-এর সন্ধিবিচ্ছেদ কর।
উ : সুর + অবস্থা

প্র : 'জাতি' মাস কোনটা?
উ : জ্যৈষ্ঠ মাসকে কথ্যভাষায় অনেকে জাতি মাস বলে।

প্র : জ্যৈষ্ঠ > জাতি শব্দটি কিভাবে হয়েছে?
উ : তৎসম থেকে তদ্ভব।

প্র : 'অদেষ্ট' কী?
উ : অদৃষ্ট > অদেষ্ট। অর্থ ভাগ্য।

প্র : 'পড়ে পাওয়া' গল্পের পাঠের মূল উদ্দেশ্য কী?
উ : শিক্ষার্থীদের মধ্যে কর্তব্য পরায়ণতা ও নৈতিক চেতনার সৃষ্টি।

প্র : 'পড়ে পাওয়া' কী?
উ : এটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বিখ্যাত কিশোরগল্প।

প্র : এই গল্পটি কোন গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?
উ : নীলগঞ্জের ফলমান সাহেব।

প্র : এ গল্পে কিশোররা কুড়িয়ে পাওয়া অর্থ সম্পর্কে নিয়ে কিসের পরিচয় দেয় নি?
উ : লোভের।

প্র : তবে তারা কিসের পরিচয় দিয়েছে?
উ : তাদের বয়সের চেয়েও অনেক বেশি দায়িত্বশীলতার।

প্র : এ গল্পে লেখক কী দেখিয়েছেন?
উ : ছোট হলে কি হবে, তাদের নৈতিক অবস্থানও বেশ দৃঢ়।

প্র : এ গল্পে ঐক্য চেতনার সাথে সাথে কিসের পরিচয়ের প্রকাশ ঘটেছে?
উ : তাদের উন্নত মানবিক বোধের।

প্র : তাদের চারিত্রিক বিবেচনার সাথে সাথে কোন জিনিস পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে?
উ : তীক্ষ্ণ বিবেচনাবোধ।

প্র : এ গল্পে কী ফুটে উঠেছে?
উ : দরিদ্র অসহায় মানুষের প্রতি ভালোবাসার চিত্র।

প্র : কাপালিক কাদেরকে বলা হয়?
উ : তান্ত্রিক সম্প্রদায়।

প্র : আড়ি বলতে এখানে কি বুঝানো হয়েছে?
উ : ধান, পাট ইত্যাদি মাপার বেতের ঝুড়ি।

প্র : পরপাঠ বিদায় বলতে কী বুঝায়?
উ : তৎক্ষণাৎ বিদায়।

প্র : 'পড়ে পাওয়া' গল্পে কোন সম্বন্ধের অর্থ বলা হয়েছে?
উ : কালবৈশাখীর।

প্র : এ গল্পে কতজন বন্ধুর নাম উল্লেখ আছে?
উ : পাঁচ জন।

প্র : বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে বড় কে?
উ : বিধু।

প্র : বন্ধুরা নদীর ঘাটে কী করতে যায়?
উ : স্নান করতে।

প্র : বৈশাখ মাসে কোন দিকে মেঘ জমলে ঝড় ওঠে?
উ : পশ্চিম দিকে।

প্র : বইয়ে 'কালবৈশাখী'র ঝড় মানেই কী?
উ : আম কুড়ানোর সময়।

প্র : কাদের মাঠের বাগানের আম বেশ বিখ্যাত?
উ : বাড়ুয্যেদের। (বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথ্যভাষায় এই বলে)

প্র : বাড়ুয্যেদের বাগানের কোন আম বিখ্যাত?
উ : চাঁপাতলীর।

প্র : সব বন্ধুর মনের শঙ্কা দূর করল কে?
উ : বিধু।

প্র : সব বন্ধু কান পেতে মেঘের আওয়াজ কেমন টের পেল?
উ : গুড়গুড়।

প্র : 'পড়ে পাওয়া' গল্পে আম কিসের মতো ঝরছে?
উ : শিলাবৃষ্টির মতো।

প্র : ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির ধ্বনি কেমন ছিল?
উ : চড় চড়।

প্র : সবশেষে নদীর পথ দিয়ে ফিরছিল কারা?
উ : লেখক ও বাদল।

প্র : তারা দুজন বাক্সটি কোন অবস্থায় পেল?
উ : তালাবন্ধ।

প্র : 'পড়ে পাওয়া' গল্পে কাঁটা রয়েছে কোন গাছের ডালে?
উ : সাঁইবাবলার।

প্র : কে কে পুকুরের বিকট গরমের পর নদীর ঘাটে নাইতে গিয়েছে?
উ : বিধু, সিধু, দিনু ও বাদল।

প্র : কোন দিকের আকাশে ঝাঁপ গুড়গুড় মেঘের আওয়াজ?
উ : দূর পশ্চিম আকাশে।

প্র : কোন মাসে পশ্চিম দিকে মেঘের আওয়াজ হয়?
উ : বৈশাখ মাসে।

প্র : কেন তারা জলে নামলে না?
উ : কালবৈশাখী ঝড় হবে বলে।

প্র : কে লেখকের সব সংশয় দূর করেছিল?
উ : বিধু।

প্র : গ্রাম করছে কিসের মতো?
উ : শিলাবৃষ্টির মতো।

প্র : কে কে সন্ধ্যার অন্ধকারে নদীর ধারে পথ দিয়ে বাড়ি ফিরছে?
উ : লেখক ও বাদল।

প্র : কোন গাছের ডালে পথ ভর্তি?
উ : কাঁটাওয়ালা সাঁইবাবলার ডালে।

প্র : কে একটা জিনিসের সঙ্গে হোঁচট খেল?
উ : বাদল।

প্র : এ ধরনের টিনের বাক্সকে পাড়াগাঁ অঞ্চলে কী বলে?
উ : ক্যাশ টিনের ক্যাশ বাক্স।

প্র : এ বাক্সে কোন গাঁয় টাকা কড়ি রাখে?
উ : পাড়াগাঁয়।

প্র : টিনের ক্যাশ বাক্সের সাথে লেখক ও বাদল কোথায় বসে?
উ : তেঁতুলতলায়।

প্র : আমগুলো একপাশে কী অবস্থায় পড়ে রইল?
উ : অনাদৃত।

প্র : কোথায় ভূত আছে?
উ : তেঁতুলতলায়।

প্র : বাক্সটি কার হতে পারে?
উ : কোনো গরিব লোকের।

প্র : কে কে হঠাৎ ধার্মিক হয়ে উঠলো?
উ : বাদল ও লেখক।

প্র : কোথায় এক গুপ্ত মিটিং বসলো?
উ : বাদলের ডাঙা নাটমন্দিরের কোণে।

প্র : কোন মাসের প্রথম দিক?
উ : জ্যৈষ্ঠ।

প্র : কোন মাসের কালাম ফোটে আসছে বললো?
উ : বৃষ্টির।

প্র : কার হাতের লেখা সুন্দর?
উ : বাদলের।

প্র : কয়টা কাগজে লিখে নদীর ধারে গাছে মেরে লেখরা হলো?
উ : তিনখানা।

প্র : কিসের আঠা দিয়ে মেরে লেখরা হলো?
উ : বেলের আঠা দিয়ে।

প্র : তিনদিন পর কে এলো?
উ : কালোমতো লোক এলো।

প্র : লেখকদের নদীতে কী এলো?
উ : ঈষণ বন্যা।

প্র : কয়টা শব্দ ভেসে থেকে দেখা গেল?
উ : দু-একটা শব্দ।

প্র : কে সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছে?
উ : অবরপুর চরের কাপালিরা।

প্র : কোন মাসে কাপালি নিরীহ খোলায় হাট থেকে আসছিল?
উ : গত জষ্টি মাসে বা জ্যৈষ্ঠ মাসে।

প্র : ডবল টিনের বাক্সে কী রয়েছে?
উ : প্রায় আড়াই শো টাকার গয়না ও নগদ টাকা পঞ্চাশটি।

প্র : কে এই ব্যাপার দেখে অনেক অবাক হয়ে গেল?
উ : লেখকের বাবা।

প্র : বিকট গরমে সকলে নদীর ঘাটে কেন গিয়েছিল?
উ : নাইতে বা স্নান করতে বা গোসল করতে।

প্র : বিধু, সিধু, নিধু, দিনু ও বাদলের দলের মধ্যে কার বয়স বেশি ছিল?
উ : বিধুর।

প্র : সকলে কান খাড়া করে কী শুনতে পেয়েছিল?
উ : মেঘের আওয়াজ।

প্র : কোন মাসে পশ্চিম আকাশে মেঘ ডাকে?
উ : বৈশাখ।

প্র : কালবৈশাখী মানে কী?
উ : বৈশাখ মাসের প্রচণ্ড ঝড়।

প্র : ঝড়ের সময় পশ্চিম দিক থেকে কী উড়ে আসতে লাগল?
উ : কালো মেঘের রাশি।

Scanned with CamScanner

প্র : কে সবচেয়ে বিজ্ঞ?
উ : বিধু।
প্র : কী পড়ে পথ থেকে গিয়েছিল?
উ : ডালপালা।
প্র : বাদল কিসের সাথে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল?
উ : টিনের বাক্স।
প্র : টিনের বাক্সে কী রাখা হয়?
উ : টাকাকড়ি।
প্র : টিনের বাক্স নিয়ে তারা কোথায় বসে পড়ে?
উ : তেঁতুলতলায়।
প্র : 'নীচে কেঁপে মরছি এ কথাটি কে বলে?
উ : বাদল।
প্র : কে তালা ভাঙার কথা বলেছে?
উ : বাদল।
প্র : বাদলদের বাড়ির কোথায় বাক্সটি রাখা হয়?
উ : বিচুলিগাদায়।
প্র : বর্ষার দিন আকাশ কেমন দেখায়?
উ : মেঘাচ্ছন্ন।
প্র : কোন ফুল থেকে বর্ষার হাওয়ার সাথে মিষ্টিগন্ধ ভেসে আসে?
উ : চাঁপাফুল।
প্র : নরহরি বোষ্টমের ডোবায় কী ডাকছে?
উ : ব্যাঙ
প্র : কার আদেশে মিটিং বসে?
উ : বিধুর।
প্র : তাদের সকলের প্রথম ও শেষ প্রস্তাব কী ছিল?
উ : বাক্স ফেরত দেওয়া।
প্র : বিধু ঘুড়ির মাপে কী কেটে আনতে বলেছিল?
উ : কাগজ।
প্র : তারা কাগজে লিখে কোথায় কাগজ লাগাল?
উ : নদীর ধারে রাস্তায়।
প্র : 'ইলিরুমীয়ন' কে?
উ : গল্পের কথক। এটি তাঁর নামের বিকৃত উচ্চারণ। মনে হয়, এখানে প্রকৃত নাম 'ইন্দ্রভূষণ' বোঝানো হয়েছে। তবে এটি 'বিভূতিভূষণ' নাম নয়।
প্র : 'সুদ্ধ' কী?
উ : সুদ্ধ অর্থ সমেত। 'শুদ্ধ' আর 'সুদ্ধ' দুই শব্দ, দুই অর্থ।

প্র : বিষ্ণু দে কোথায়, কবে জন্মগ্রহণ করেন?
উ : কলকাতা, ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : কবি, প্রাবন্ধিক ও চিত্র সমালোচক।
প্র : তিনি কোন সাহিত্যগোষ্ঠীর লেখক?
উ : কল্লোল সাহিত্যগোষ্ঠীর লেখক।
প্র : তিনি কোন পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর একজন ছিলেন?
উ : পরিচয় (১৯৩১ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত)
প্র : তাঁর প্রকাশিত অপর পত্রিকার নাম কী?
উ : সাহিত্যপত্র (১৯৪৮)।
প্র : বিষ্ণু দের প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম কী?
উ : কবিতা : উর্বশী ও আর্টেমিস (১৯৩২), চোরাবালি (১৯৩৭), সাত ভাই চম্পা (১৯৪৪), তুমি শুধু পাঁচিশে বৈশাখ (১৯৫৮), স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ (১৯৬৫), সেই অন্ধকার চাই (১৯৬৫), রবিকরোজ্জ্বল নিজদেশ (১৯৮০)।
প্র : 'উর্বশী ও আর্টেমিস' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : বিষ্ণু দে রচিত এই কাব্যগ্রন্থে দেশি ও বিদেশি মিথের প্রয়োগ আছে। সনেট রোমান্টিকতার বিরোধী বিষ্ণু দে-র প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উর্বশী ও আর্টেমিস' প্রকাশিত হয় ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি ঐতিহ্য সচেতন ব্যক্তি ছিলেন বলে আর্টেমিসের চিত্রকল্পের সঙ্গে উর্বশীর চিত্রকল্পের পাশাপাশি স্থান দিয়েছেন। গ্রন্থটির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কবিতা হলো : উর্বশী, উর্বশী ও আর্টেমিস, প্রেম, হে, পলায়ন, রাত্রিশেষ ইত্যাদি।
প্র : তাঁর কাব্য-বৈশিষ্ট্য কী?
উ : তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মিথের সঙ্গে বাস্তবতার সংমিশ্রণ ঘটান। তাছাড়া মার্কসীয় মতবাদকে নিজের মতো গ্রহণ করে প্রয়োগ করেন।
প্র : তাঁর রচিত প্রবন্ধগুলোর নাম কী?
উ : সাহিত্যের ভবিষ্যৎ (১৯৬৮), রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা (১৯৬৬)।

প্র : তাঁর রচিত অনুবাদ সাহিত্যের নাম কী?
উ : এলিয়টের কবিতা (১৯৫০)।
প্র : তিনি সাহিত্য রচনার জন্য কী কী পুরস্কার ভূষিত হন?
উ : ১৯৫৫-তে সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার ও ১৯৭২-এ জ্ঞানপীঠ পুরস্কার।
প্র : তিনি তাঁর রচনার কী উপস্থাপনার ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেন?
উ : মার্কসীয় তত্ত্বকে জীবনাবেগ ও শিল্পসম্মত রূপে।
প্র : কবে, তিনি কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৮২।

বিহারীলাল চক্রবর্তী

প্র : বিহারীলাল চক্রবর্তী কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : নিমতলা, কলকাতা।
প্র : তিনি কত তারিখে জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ২৩শে মে, ১৮৩৫।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : কবি।
প্র : তিনি কী কী মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন?
উ : পূর্ণিমা (১৮৫৯), সাহিত্য সংক্রান্তি (১৮৬৩), অবোধ বন্ধু (১২৭৫)।
প্র : তিনি বাংলা সাহিত্যের কীসের স্রষ্টা?
উ : আধুনিক গীতিকবিতার।
প্র : বিহারীলাল চক্রবর্তী রচিত কবিতায় প্রথম বিশুদ্ধভাবে কী প্রকাশিত হয়?
উ : কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি ও গীতোচ্ছ্বাস।
প্র : তিনি গীতিকবিতার ক্ষেত্রে কী হিসেবে খ্যাত?
উ : রবীন্দ্রনাথের গুরু হিসেবে।
প্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে বাংলা গীতিকবিতার ধারার কী বলে আখ্যা দিয়েছেন?
উ : ভোরের পাখি।
প্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে বাংলা গীতিকবিতার ধারার ভোরের পাখি বলার কারণ কী?
উ : বিহারীলালই প্রথম বাংলায় ব্যক্তির আত্মলীনতা, ব্যক্তিগত অনুভূতি ও গীতোচ্ছ্বাস সমাসোক্ত-অতিমা অবলম্বন করে বাংলা কবিতাকে সহজ এক প্রকাশ দান করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অগ্রণী। তাই তাঁকে 'ভোরের পাখি' বলা হয়েছে।
প্র : তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : বঙ্গসুন্দরী (১৮৭০), নিসর্গসন্দর্শন (১৮৭০), বন্ধুবিয়োগ (১৮৭০), সারদামঙ্গল (১৮৭৯), সাধের আসন (১৮৮২), বাউলবিংশতি (১৮৮৪), সঙ্গীত শতক (১৮৮৮), বঙ্গসুন্দরী (১৮৭০), নিসর্গসন্দর্শন (১৮৭০), বন্ধু বিয়োগ (১৮৭০), প্রেম প্রবাহিণী (১৮৭০) ও সারদা মঙ্গল (১৮৭৯)।
প্র : 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : বিহারীলালের প্রথম সার্থক গীতিকবিতার গ্রন্থ 'বঙ্গসুন্দরী' (১৮৭০)। এ কবিতা কবি বলেছেন। 'সর্বাগ্রে হৃদ করে মন / নিজ যেন মনের মতন / চতুর্দিকে বালাখানা / উহ কি ফুলের ছড়া / অট্টালিকে পাতন / রবীন্দ্রনাথ এ-প্রসঙ্গে বলেছেন। 'আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম যেন হর কবির নিজের কথা প্রকাশ পাইয়াছে।' গ্রন্থটির প্রথম সর্গ উপহার, দ্বিতীয় সর্গ নারীবন্দনা, তৃতীয় সর্গ সুরবালা, চতুর্থ সর্গ চিরপরাধীনা, পঞ্চম সর্গ কল্পনাসুন্দরী, ষষ্ঠ সর্গ বিষাদিনী, সপ্তম সর্গ প্রিয়তমা, অষ্টম সর্গ অভাগিনী নামকরণ করা হয়েছে।
প্র : 'সারদামঙ্গল' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : বিহারীলালের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'সারদামঙ্গল' ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত। এটি পাঁচ সর্গে ত্রিপদী দীর্ঘ স্তবকময় লালিত্যপূর্ণ ভাষায় রচিত। কাব্যের প্রথম সর্গে কবির মনোজগতে এক কাব্যলক্ষ্মীর আবির্ভাব, দ্বিতীয় সর্গে হারানো আনন্দ লক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে কবির মানসভ্রমণ, তৃতীয় সর্গে কবিচিত্তের দ্বন্দ্ব, চতুর্থ সর্গে হিমালয়ের উদার প্রশান্তির মধ্যে কবিচিত্তের আশ্বাস লাভ, পঞ্চম সর্গে হিমালয়ের পুণ্যভূমিতে কবির আনন্দ উপলব্ধির চিত্র পাওয়া যায়। 'সারদামঙ্গল' কাব্য সম্পূর্ণরূপে জীবনবাদিত, বিশেষ সৌন্দর্যধ্যান। শেলির মতো বিহারীলাল তাঁর প্রিয়তমার মধ্যে সারদাকে অন্বেষণ করেছেন এবং দীর্ঘ বিরহের পর হিমাদ্রিশিখরে ভাব-সম্মিলনের চিত্র অঙ্কন করে কবি কাব্যের পরিসমাপ্তি টেনেছেন।

2020/5/13 20:55
Scanned with CamScanner

প্র : 'সাধের আসন' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : বিহারীলালের শেষ কাব্যগ্রন্থ 'সাধের আসন'কে (১৮৮৯) 'সারদামঙ্গল' কাব্যের পরিশিষ্ট বলা যায়। কোনো এক সম্ভ্রান্ত কিশোরী নারী কবির 'সারদামঙ্গল' কাব্য পাঠ করে নিজ হাতে একটি আসন বুনে কবিকে উপহার দিয়েছেন। সেখানে ওই নারী কবিকে প্রশ্ন করেছেন, তুমি কাকে ধ্যান কর? এর উত্তর স্বরূপ বিহারীলাল 'সাধের আসন' লিখেছেন। শুরুই করেছেন এভাবে : 'দেয়াই কাহারে দেবী নিজে আমি জানি নে / কবিতার বাল্মীকির ধ্যান-ধনে চিনিনে।' এ কাব্যের সূচনাতে কবির রোম্যান্টিক মনোবৃত্তি প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু কাব্যের শেষে তা মিস্টিসিজমে রূপান্তরিত। উপসংহার ছাড়া 'সাধের আসন' কাব্য দশ সর্গ বিশিষ্ট। এর প্রথম সর্গ মাধুরী, দ্বিতীয় সর্গ গোধূলি ও নিশীথে, তৃতীয় সর্গ প্রভাত ও যোগেন্দ্রবালা, চতুর্থ সর্গ নন্দনকানন, পঞ্চম সর্গ অমরাবতীর প্রবেশ পথ, ষষ্ঠ সর্গ ভূমি, সপ্তম সর্গ মায়া, অষ্টম সর্গ শশিকলা, নবম সর্গ আসনদাত্রী, দশম সর্গ পতিব্রতা নামকরণ করা হয়েছে। অনেকের মতে, এই কাব্যে কবি তাঁর মানসলক্ষ্মীর সন্ধান পেয়েছেন এবং এটাই তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য।

প্র : সর্বদা হহু করে মন/ বিশ্ব যেন মরুর মতন– কোন কবির লেখা?

উ : বিহারীলালের।

প্র : বিহারীলাল চক্রবর্তীর রচনার ঐতিহাসিক গুরুত্ব কী?

উ : সৌন্দর্যপিয়াসী প্রকৃতি প্রেমিক কবি বিহারী লাল চক্রবর্তীর কবিতায় সমাজ সমকাল ও সমকালীন সমস্যাবলি ততোটা প্রাধান্য পায় নি। কিন্তু কবিতার চরণে ছন্দে ঢেউ তুলেছে নূপুর-নিক্বণ। মনের মাধুরী মিশিয়ে প্রকৃতির রস পান করেছেন যেভাবে, সেই-মুগ্ধতার প্রকাশ ঘটেছে তার কবিতায়। নগরবাসের অভিজ্ঞতা কঠিন আবরণে আচ্ছন্ন করতে পারে নি তাঁর সলজ্জ সরস মানসভূমিকে।

প্র : তাঁর মৃত্যুতারিখ কত?

উ : ২৪শে মে, ১৮৯৪; কলকাতা।

প্র : বুদ্ধদেব বসুর জন্মসাল কবে?

উ : ৩০শে নবেম্বর, ১৯০৮।

প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : কুমিল্লা।

প্র : রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা সাহিত্যে কাকে সব্যসাচী লেখক বলা হয়?

উ : বুদ্ধদেব বসুকে।

প্র : তিনি মূলত কী কী ছিলেন?

উ : কবি, কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার, ব্যাখ্যাকার, অনুবাদক ও সম্পাদক।

প্র : তিনি বাংলাদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন?

উ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, ইংরেজিতে।

প্র : জগন্নাথ হলের ছাত্র অবস্থায় তিনি একটি পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন যা আজও বের হয়। তার নাম কী?

উ : বাসন্তিকা।

প্র : তাঁর সম্পাদিত পত্রিকাগুলোর নাম কী?

উ : প্রগতি (১৯২৭-২৯) ও কবিতা (১৩৪১-৪৭)।

প্র : হুমায়ুন কবিরের সাথে তাঁর সম্পাদিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা কোনটি?

উ : চতুরঙ্গ।

প্র : তাঁর রচিত কবিতাগ্রন্থের নাম কী?

উ : মর্মবাণী (১৯২৫), বন্দীর বন্দনা (১৯৩০), কঙ্কাবতী (১৯৩৭), দময়ন্তী (১৯৪৩), যে আঁধার আলোর অধিক (১৯৫৮), মরচেপড়া পেরেকের গান (১৯৬৬), একদিন চিরদিন (১৯৭১), স্বাগত বিদায় (১৯৭১) ইত্যাদি।

প্র : 'কঙ্কাবতী' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : 'কঙ্কাবতী' (১৯৩৭) বুদ্ধদেব বসুর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যের কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯২৯-৩৪ এবং প্রধান বিষয় প্রেম। সংগীতময় ভাষা এবং উচ্চারণের সংক্ষেপের জন্য কাব্যগ্রন্থটি সমকালে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

প্র : 'কঙ্কাবতী' উপন্যাসটি কার?

উ : অন্নদাশঙ্কর রায়।

প্র : 'দময়ন্তী' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : 'দময়ন্তী' (১৯৪৩) কাব্যগ্রন্থে সংকলিত

কবিতাগুলি ১৯৩৫-৪২ সালের মধ্যে রচিত হয়। এই কাব্যের মধ্যে বুদ্ধদেবের কবিতার একটি পরিণতবল লক্ষ করা যায়। কবিতা একটি পরিণতবল লক্ষ করা যায়। কবির মতে, এ কাব্যে বাচনভঙ্গি ও ছন্দের যৌথিক মিলন ঘটেছে।

প্র : 'কবিতা' পত্রিকার পরিচয় দাও।

উ : 'কবিতা' (১৩৩৫) বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত পত্রিকা। এ পত্রিকা শুধু কবিতা এবং কবিতা বিষয়ক আলোচনার জন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই ঢাকা থেকে হরিশঙ্কর জলবিদে শতাব্দীতে একটি কবিতা পত্রিকার সূত্রপাত হয়। কিন্তু তা অল্প সময়ের মধ্যেই বিলুপ্ত হয়। তিন দশক ধরে 'কবিতা' পত্রিকা বাংলা কবিতার গতিপ্রকৃতির পরিচয় যেমন ধরে রেখেছে, তেমনই গড়ে তুলতে চেয়েছে বিশেষ রুচি ও আদর্শ। প্রথম কয়েক বছর এর সম্পাদনায় যুক্ত ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সমর সেন। বাংলাদেশের সবচে প্রধান কবি 'কবিতা'র সঙ্গে কোনো-না-কোনোভাবে যুক্ত ছিলেন। 'কবিতা'র শততম সংখ্যা ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষায় প্রকাশিত হয়। ১৯৬১-তে 'কবিতা' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়।

প্র : তাঁর রচিত উপন্যাসগুলোর নাম কী?

উ : সাড়া (১৯৩০), সানন্দা (১৯৩৩), নালাময় (১৯৩৪), পরিক্রমা (১৯৩৮), কালো হাওয়া (১৯৪২), তিথিডোর (১৯৪৯), নির্জন স্বাক্ষর (১৯৫১), মৌলিনাথ (১৯৫২), নীলাঞ্জনের খাতা (১৯৬০), রাত ভরে বৃষ্টি (১৯৬৭) ইত্যাদি।

প্র : 'তিথিডোর' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : 'তিথিডোর' (১৯৪৮) উপন্যাস প্রথম শ্রাবণ, করুণ রঙিন পথ, যবনিকা কম্পমান এই তিনখণ্ডে বিভক্ত বাঙালি মধ্যবিত্ত শিল্পিত স্বভাব নর-নারীর জীবনযাপনের মনোরম ও মধুর কাহিনি এ উপন্যাসে বর্ণিত। কাহিনির মূল উপজীব্য প্রেম ও যৌবনের বন্দনা। এই কাহিনির গীতল ভাষা ও কাব্যময়তা এবং এর শেষাংশে প্রযুক্ত 'চৈতন্যপ্রবাহ'-ধর্মী বর্ণনাভঙ্গি দেখা যায়।

প্র : 'একদা তুমি প্রিয়ে' উপন্যাস সম্পর্কে লেখ।

উ : পলাশ ও রেবার মধ্যে যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তাই 'তুমি' ধরে উপন্যাসের অঙ্গে এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়। রেবা নতুনভাবে প্রেমের অভিষেক করতে চায় কিন্তু পলাশ বুঝতে পারে তা সম্ভবপর নয়। এরকম একটি কাহিনি নিয়ে বুদ্ধদেব বসুর রচিত 'একদা তুমি প্রিয়ে' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ সালে।

প্র : বুদ্ধদেব বসুর কবিমানসিকতা সম্পর্কে কী বলা যায়?

উ : বুদ্ধদেব বসুর কবিতাগুলির বাচনভঙ্গির বক্রতা এবং আবাগত দুর্বোধ্যতা নেই। রোমান্টিকতার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর বেশি বয়সের রচনাগুলিতে। বুদ্ধদেবের রচনাতেই সর্বপ্রথম কাব্যরীতিতে কথ্যরীতির সংমিশ্রণ দেখা যায়। সৌরভিক কাহিনি প্রসঙ্গ বা চিত্রকল্প নির্মাণেও কবি যথেষ্ট সাবধানতা দেখিয়েছেন। দ্রৌপদীর শাড়ি নামক কঙ্কাবতী নীতের প্রার্থনা প্রভৃতি কাব্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সকল কারণে সমকালীন কবিদের মধ্যে বুদ্ধদেবের জনপ্রিয়তা অনেক বেশি।

প্র : বুদ্ধদেব বসুকে নাগরিক কবি বলা যেতে পারে। কেন?

উ : বুদ্ধদেবের কাব্যে সমাজচেতনা বিশেষভাবে প্রকাশ না পেলেও বাস্তবতাদিতা ও নাগরিক চেতনা প্রকাশে সর্বগ্রহণ্য। এ জন্যই তাঁকে নাগরিক কবি বলে অভিহিত করা যেতে পারে। তাঁর কবিতায় নগর উঠে এসেছে মানুষের অভিজ্ঞতার আলোকে। আগে যে অভিজ্ঞতা মানুষ প্রকাশ করে নি বুদ্ধদেব তা প্রকাশ করেন। বিশেষ করে ব্যাতের নগর এবং এর বাস্তবতা তুলে ধরতে বুদ্ধদেবই আগ্রহী করেন পরবর্তীকালের কবিদের।

প্র : তাঁর রচিত গল্প গ্রন্থগুলোর নাম কী?

উ : অভিনয়, অভিনয় নয় (১৯৩০), রেখাচিত্র (১৯৩১), হাওয়া বদল (১৯৪৩) ইত্যাদি।

2020/5/13 20:55
Scanned with CamScanner

প্র: কয় ভাই, কয় বোন?
উ: এক ভাই, দুই বোন।
প্র: কানাইয়ের অবস্থান কত?
উ: কানাই মেঝো।
প্র: ছোকানু নামের কী অর্থ করা যায়?
উ: ছোট কানু > ছোকানু অর্থাৎ আদুরে।
প্র: পৌরাণিক কানাই কে?
উ: কৃষ্ণ।
প্র: 'উনুন' কি?
উ: চুলা (যেখানে আগুন জ্বেলে রান্না করা হয়)।
প্র: 'উনুন' শব্দটি কোথা থেকে এসেছে?
উ: সংস্কৃত 'উদ্‌স্থান' শব্দ থেকে।
প্র: 'পইঠা' কী?
উ: সোপান বা সিঁড়ি। এখানে নৌকার প্রান্ত বোঝাচ্ছে।
প্র: 'পইঠা' শব্দটি কোথা থেকে এসেছে?
উ: সংস্কৃত 'প্রতিষ্ঠা' শব্দ থেকে 'পইঠা' শব্দটি এসেছে।
প্র: 'সূর্য লুকোলো–' মানে কী?
উ: সূর্য ডুবলো।
প্র: কানাইয়ের দায়িত্ব-জ্ঞানের কতটুকু পরিচয় আছে?
উ: কানাই খুবই দায়িত্বশীল। বোন ছোকানুর চোখে যখন ঘুম আসে তখন সে জেগে থাকতে চায়। গল্প শুনতে শুনতে তারও যখন ঘুম পায় তখন সে মাঝিকে বলে, তার বোন খুবই ভিতু, সে যেন ঘুমন্ত ছোকানুকে দেখে রাখে। ঝড় এলে কানাই নিজেকে ডাকতে বলেছে, তবু বোনের ঘুম যেন না ভাঙানো হয়– এই তার নিবেদন।

বেনজীর আহমদ

প্র: বেনজীর আহমদ কত সালে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ: ১৯০৩, নরসিংদীর ধানুয়ায়।
প্র: তিনি কী ছিলেন?
উ: কবি ও সম্পাদক।
প্র: তিনি কত সালে কোন পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন?
উ: ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে, নওরোজ পত্রিকা।
প্র: তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের নাম কী?
উ: বন্দীর বাঁশী ও বৈশাখ (১৯৬২)।
প্র: রাজনৈতিকভাবে তিনি কোন মতে বিশ্বাসী ছিলেন?
উ: পাকিস্তান আন্দোলনে বিশ্বাসী ছিলেন। আয়ুবি মৌলিক গণতন্ত্রের সুযোগে ঢাকা-৬ থেকে এমএলএ হন।
প্র: পাকিস্তানে রবীন্দ্রসঙ্গীত বিতর্কে তাঁর অবস্থান কী?
উ: তিনি রবীন্দ্রসাহিত্যের বিরোধী ছিলেন। ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দের ২২শে জুন পাকিস্তান সরকার বেতার টেলিভিশনে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার বন্ধ ঘোষণা করলে বেনজীর আহমদ এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন।
প্র: তিনি কী ধরনের কবি ছিলেন?
উ: মুসলিম পুনর্জাগরণবাদী কবি।
প্র: তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার পান কত সালে?
উ: ১৯৬৪-তে, কবিতায়।
প্র: তার মৃত্যুতারিখ কত?
উ: ১২ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৩।

মনোএল দা আসসুম্পসাঁউ

প্র: মনোএল দা আসসুম্পসাঁউ কে ছিলেন?
উ: একজন খ্রিষ্টান ধর্মযাজক।
প্র: তিনি কোন দেশের বাসিন্দা?
উ: পর্তুগালের। জাতিতে ছিলেন পর্তুগিজ।
প্র: বাংলা সাহিত্যে তাঁর নাম স্মরণ করা হয় কেন?
উ: কারণ তিনি বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ রচয়িতা।
প্র: মনোএলের ব্যাকরণ কী?
উ: মনোএলের আগে কেউ বাংলা ভাষার ব্যাকরণ লেখেন নি। ১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন শহরে রোমান লিপিতে মনোএল দুটি বাংলা গ্রন্থ রচনা ও মুদ্রণ করেন। গ্রন্থ দুটি হলো : 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' এবং 'ভোকাবুলিরও এম ইদিওমা বেনগল্লা ই পোরতুগিজ'। এর মধ্যে দ্বিতীয়টি অর্থাৎ 'ভোকাবুলিরও এম ইদিওমা বেনগল্লা ই

2020/5/13 20:5
Scanned with CamScanner

পোরতুগিজ' মূলত অভিধান গ্রন্থ। তবুও এই গ্রন্থেই মনোএল অতি সংক্ষেপে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ একটি অধ্যায়ে সংযোজন করেন। এটাকেই মনোএলের ব্যাকরণ বলে এবং এ কারণেই তিনি বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ রচয়িতা হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

প্র : 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে'র পরিচয় দাও।

উ : 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' (১৭৩৩) মনোএল দ্য আসসুম্পসাঁউ নামক পর্তুগিজ খ্রিষ্টান মিশনারি কর্তৃক রচিত বাংলা গদ্যগ্রন্থ। ১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দে লিসবন শহর থেকে রোমান লিপিতে মুদ্রিত হয়। গুরুশিষ্যের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে খ্রিষ্টধর্মের মহিমা কীর্তন এই গ্রন্থের লক্ষ্য।

মমতাজ উদদীন আহমদ

প্র : মমতাজ উদদীন আহমদ কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১৯৩৫ সালের ১৮ই জানুয়ারি, পশ্চিমবঙ্গের মালদহে।

প্র : তিনি মূলত কী হিসেবে পরিচিত?

উ : নাট্যকার।

প্র : তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর নাম কী?

উ : **নাটক :** হৃদয় ঘটিত ব্যাপার স্যাপার, স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা, কী চাহ শঙ্খচিল, প্রেম বিবাহ সুটকেস, রাজা অনুস্বারের পালা, সাত ঘাটের কানাকড়ি, রাক্ষুসি, এই সেই কণ্ঠস্বর, পুত্র আমার পুত্র, হাস্য লাস্য ভাষ্য, বটবৃক্ষের ধরমকরম, ভালোবাসার দশ নাটক, ওহে তস্কর।

উপন্যাস : সজল তোমার ঠিকানা, এক যে জোজো এক যে মধুমতী।

প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?

উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার, শিশু একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, আলাওল সাহিত্য পুরস্কার, বাচসাস চলচ্চিত্র, টেলিভিশন ও চিত্রনাট্য পুরস্কার, একুশে পদক (নাটক ১৯৯৭), শেলটেক পুরস্কার (২০০৫)।

'সুখী মানুষ' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'শাড়ী' ও 'নাড়ী' শব্দের অর্থের পার্থক্য কী?

উ : 'শাড়ী' অর্থ রক্তবাহী শিরা বা ধমনী। 'নারী' অর্থ স্ত্রীলোক।

প্র : 'সুবর্ণ' শব্দের অর্থ কী?

উ : সোনা।

প্র : 'ব্যারাম' শব্দের অর্থ কী?

উ : অসুখ।

প্র : 'ব্যারাম' শব্দটি কিভাবে গঠিত হয়েছে?

উ : বিদেশি উপসর্গযোগে। ফার্সি উপসর্গ 'বে' + আরাম' = বেআরাম > বেয়ার > ব্যারাম।

প্র : 'মূর্খ' এবং 'মুখ্য' শব্দের অর্থের কী?

উ : 'মূর্খ' অর্থ জ্ঞানহীন; 'মুখ্য' অর্থ প্রধান। লক্ষণীয়: একটি বানানে ম-এর উ-কার, অন্যটিতে উ-কার।

প্র : 'বাঘের চোখ আনা' বলতে কী বোঝায় হয়েছে?

উ : সুকঠিন কর্ম সম্পাদন। এটি একটি বাগধারা।

প্র : 'জবরদস্তি' অর্থ কী?

উ : 'অত্যাচার'।

প্র : 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু' কী জাতীয় প্রয়োগ?

উ : এটি একটি প্রবাদ।

প্র : 'ব্যামো' কী?

উ : ব্যাধি বা রোগ।

প্র : 'ব্যামো' কোন শব্দ?

উ : সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ।

প্র : 'ফতুয়া' কী?

উ : ক্ষুদ্রাকৃতির গলাকাটা জামাবিশেষ।

প্র : 'ফতুয়া' কোন শব্দ?

উ : আরবি শব্দ।

প্র : 'বনে যে কাঠ কাটে'– এককথায় তাকে কী বলে?

উ : কাঠুরিয়া বা কাঠুরে।

প্র : 'কবিরাজ' বলতে কাদের বোঝায়?

উ : আগে তৃণ বা গাছগাছরা ঔষধ হিসেবে প্রদান করে অনেকে রোগের চিকিৎসা করতেন। এই পদ্ধতিকে আয়ুর্বেদ বা

গণ্য করতেন। সেসব আসের সাহের মধ্যে চিকিৎসকের সন্ধান করতেন এবং তার প্রয়োগ অনেকে পার্শ্বফলদায়ক।

প্র : 'আলেপের যুদ্ধ' কোন গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : কবি নবাসেবক সালের এই গ্রন্থের বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে। বইটি মূলত রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক। লেখক রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য তুলে ধরেছেন গ্রন্থটিতে। এই পুস্তকটি তিন অধ্যায়ে বিভক্ত আছে। প্রথম অধ্যায়ের নাম 'প্রাণের মাঝে সুখা আছে' দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম 'কবিতার মৃত্যু' এবং তৃতীয় অধ্যায়ের নাম 'আনন্দের মৃত্যু নেই'।

প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?

উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৮৩), জেবুন্নেসা-মাহবুব উল্লাহ পুরস্কার (১৯৯৪), আলাওল সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯৫)।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

প্র : মধুসূদন দত্তের জন্মতারিখ কত?

উ : ২৫শে জানুয়ারি, ১৮২৪।

প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : সাগরদাঁড়ি, যশোর।

প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?

উ : কবি ও নাট্যকার।

প্র : তিনি কোন কোন ভাষায় দক্ষ ছিলেন?

উ : বাংলা, ইংরেজি, গ্রিক, ল্যাটিন, সংস্কৃত, হিব্রু, পারসি, জার্মান, ইটালিয়ান, তামিল ও তেলেগু।

প্র : তাঁর রচিত ও প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থের নাম কী?

উ : Captive Ladie (১৮৪৯; ইংরেজিতে লেখা)। (Captive অর্থ বন্দি)।

প্র : মধুসূদন রচিত ও প্রকাশিত প্রথম বাংলা গ্রন্থের নাম কী?

উ : শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯) নাটক।

প্র : তাঁর রচিত প্রহসনগুলোর নাম কী?

উ : একেই কি বলে সভ্যতা (১৮৬০) ও বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০)।

প্র : যারা এই চিকিৎসা করতেন তাদের কবিরাজ বলা হতো। তখন আজকের মতো ডাক্তার ছিল না। এখনো খুব অল্প সংখ্যক কবিরাজ আমাদের দেশে দেখতে পাওয়া যায়।

'সুখী মানুষ'কে 'নাটিকা' বলা হয়েছে।

প্র : 'নাটিকা' কী?

উ : 'নাটিকা' একটি ছোট নাটক। ছোট 'সুখী মানুষ' একটি ছোট নাটক বলে ছোট নাটিকাকে 'নাটিকা' বলা হয়।

মহাদেব সাহা

প্র : মহাদেব সাহা কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১৯৪৪ সালের ৫ই অগস্ট, সিরাজগঞ্জে।

প্র : তিনি কী হিসেবে পরিচিত?

উ : কবি ও সাংবাদিক।

প্র : তিনি কোন পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেন?

উ : দৈনিক ইত্তেফাকের সহ-সম্পাদক।

প্র : তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর নাম কী?

উ : **কবিতা :** এই গৃহ এই সন্ন্যাস (১৯৭২), মানব এসেছি কাছে (১৯৭৩), কী সুন্দর গ্রন্থ (১৯৭৮), তোমার পায়ের শব্দ (১৯৮২), ফুল কই শুধু অস্ত্রের উল্লাস (১৯৮৩), আমি ছিন্ন ভিন্ন (১৯৮৬), (১৯৮৪), তোমার জন্য অন্ত্যমিল (১৯৯৬), ভুলি নাই তোমাকে রুমাল (১৯৯৬), অন্তহীন নৃত্যের মহড়া (১৯৯৭)। **প্রবন্ধ :** আনন্দের মৃত্যু নেই (১৯৮৪), মহাদেব সাহার কলাম (১৯৯২), কবির দেশ ও অন্যান্য ভাবনা (১৯৯৯)।

প্র : 'এই গৃহ এই সন্ন্যাস' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : মহাদেব সাহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ। প্রকাশিত হয় ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে। এতে রয়েছে মোট ৪২টি কবিতা। কবিতাগুলোতে স্থান পেয়েছে সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা, স্বদেশের করুণতম ট্র্যাজেডি, শৈশব স্মৃতি, মানুষের জীবন সংগ্রাম ইত্যাদি। তাছাড়া ব্যক্তির অনুভূতি ও অস্তিত্ববাদী বেদনার চিত্র অঙ্কনে কবি চিত্রকল্পের আশ্রয় নিয়েছেন। এ কারণে জিরাফের ভয়ঙ্কর

2020/5/13 20:55
Scanned with CamScanner

প্র : তিনি আর কী কী বাংলা নাটক রচনা করেন?
উ : পদ্মাবতী (১৮৬০), কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১)।
প্র : 'বীরাঙ্গনা কাব্য' গ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : 'বীরাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬২) পত্রকাব্য। পত্রকাব্যে এ ধরনের কাব্য বাংলা সাহিত্যে এটাই প্রথম। রোমান কবি পাবলিসাস ওভিডিয়াস ন্যাসো সংক্ষেপে ওভিদের 'হেরোইদাইদস' কাব্যের অনুসরণে এই গ্রন্থ রচিত। এখানে মোট এগারটি পত্র আছে। দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা, দশরথের প্রতি কৈকেয়ী, সোমের প্রতি তারা, নীলধ্বজের প্রতি জনা প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পৌরাণিক নারীরা মধুসূদনের হাতে যেন আধুনিক মানুষ হিসেবে পুনর্জাগরিত হয়ে নিজেদের প্রণয়-কামনা ইত্যাদি প্রকাশ করতেও কুণ্ঠিত নয়। এই গ্রন্থ রচনার জন্য সমকালে মধুসূদন নিন্দিত হয়েছিলেন।
প্র : 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক সম্পর্কে লেখ।
উ : 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) নাটকের কাহিনি উইলিয়াম টডের 'রাজস্থান' নামক গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। এই নাটকে মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ট্রাজেডি রচনা করেন। এজন্য নাটকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই নাটকের উল্লেখযোগ্য চরিত্র হলো : কৃষ্ণকুমারী, মদনিকা, ভীম-সিংহ, জগৎসিংহ, ধনদাস প্রমুখ। ১৮৬১ সালে প্রকাশিত হলেও নাটকটি রচিত হয়েছিল ১৮৬০ সালে। রচনার প্রায় সাত বছর পর এ নাটক 'শোভাবাজার থিয়েটারে' ১৮৬৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথম অভিনীত হয়।
প্র : 'কৃষ্ণকুমারী' কোন জাতীয় নাটক?
উ : বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ট্রাজেডি নাটক।
প্র : মহাভারতের সুন্দ ও উপসুন্দ কাহিনিকে অবলম্বন করে তাঁর রচিত কাহিনির নাম কী?
উ : তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য (১৮৬০)।
প্র : তাঁর রচিত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গীতিকাব্যের নাম কী?
উ : ব্রজাঙ্গনা (১৮৬১)।
প্র : তাঁর রচিত অমর মহাকাব্যের নাম কী?
উ : মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১)।
প্র : মেঘনাদবধ কাব্যের কাহিনি কোন মহাকাব্য থেকে গৃহীত হয়েছে?
উ : সংস্কৃত মহাকাব্য রামায়ণ।
প্র : 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র পরিচয় দাও।
উ : সংস্কৃত মহাকাব্য 'রামায়ণে'র সুত্র অবলম্বনে কাহিনি অবলম্বন করে মধুসূদন দত্ত ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসের মধ্যে 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনা করেন। গ্রন্থটি ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দেই প্রকাশ পায়। এটা মধুসূদনের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। "তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য (১৮৬০) তাঁর প্রথম এবং বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র বিস্তৃত পটভূমির মধ্যে নানা ধরনের চরিত্র এবং নানা রসের সমাবেশ ঘটেছে। কবি কাব্যের প্রথম দিকে বীররসের কথা বললেও এই কাব্যে করুণরসই প্রধান। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত সিপাহি বিদ্রোহের স্বাধীনতামন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে রাবণকে নায়ক ও রামকে খলনায়ক করে মধুসূদন রচনা করে এই স্বাধীনতাভিলাষী কাব্য। নয় সর্গে সম্পূর্ণ 'মেঘনাদবধ কাব্যে' বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ থেকে মেঘনাদ-হত্যা, প্রমীলার চিতারোহণ পর্যন্ত মোট তিন দিন দুই রাতের ঘটনা বর্ণিত। এ কাব্যের ট্রাজেডি সৃজন হয়েছে নায়ক রাবণ চরিত্রকে অবলম্বন করে। কবি মিল্টনের 'প্যারাডাইস লস্ট' মহাকাব্যে শয়তান যেমন দুর্জয় বাসনা ও ঋজুতা প্রদর্শন করে, মধুসূদনও রাবণকে দিয়ে সে কাজ করিয়েছেন। ভাব-ভাষা ও শব্দ ব্যবহারে কবি বিদেশি ক্লাসিক রীতি আয়ত্ত করে তা বাংলায় ব্যবহার করেছেন। কাব্যের বিভিন্ন সর্গে বীরত্ব, অভিমান, আক্ষেপ ইত্যাদি প্রকাশিত। কয়েকটি প্রধান চরিত্র : রাবণ, মেঘনাদ, লক্ষ্মণ, রাম, প্রমীলা, বিভীষণ, সীতা, সরমা ইত্যাদি।
প্র : 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সর্গগুলোর নাম লেখ।
উ : প্রথম সর্গ > অভিষেক
দ্বিতীয় সর্গ > অস্ত্রলাভ
তৃতীয় সর্গ > সমাগম
চতুর্থ সর্গ > অশোক বন
পঞ্চম সর্গ > উদ্যোগ
ষষ্ঠ সর্গ > বধ
সপ্তম সর্গ > শক্তিনির্ভেদ
অষ্টম সর্গ > প্রেতপুরী
নবম সর্গ > সৎক্রিয়া।
প্র : মেঘনাদবধ কাব্যের কাহিনির বিস্তার কোন ঘটনা থেকে কোন ঘটনা পর্যন্ত?
উ : মেঘনাদবধ কাব্যে মহাটি সর্গে সম্পূর্ণ, কাহিনিবৃত্তান্ত– বীরবাহুর নিধন সংবাদ থেকে মেঘনাদের হত্যা এবং প্রমীলার মৃত্যু ও চিতারোহণ পর্যন্ত। এই মহাকাব্যে মোট তিনদিন ও দুরাত্রির ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।
প্র : মেঘনাদবধ কাব্যে মধুসূদন কোন কোন পাশ্চাত্য কবি ও কাব্য থেকে ঋণ গ্রহণ করেন?
উ : মেঘনাদবধ কাব্য রচনায় মধুসূদন কবি ভার্জিলের ইনিড। দান্তের ভিভাইন কমেডি, হোমারের ইলিয়াড ও মিল্টনের প্যারাডাইস লস্ট থেকে বহু কাহিনিসূত্র ও চরিত্রাদর্শ অনুসরণ করেছিলেন।
প্র : মেঘনাদবধে চরিত্র সৃষ্টিতে মধুসূদন পাশ্চাত্যের কোন কবির চরিত্রের ঋণিকটা প্রভাব স্বীকার করেছিলেন?
উ : চরিত্র সৃষ্টিতে মধুসূদন ইংরেজ কবি মিল্টনের প্যারাইডাস লস্ট-এর চরিত্রের আংশিক প্রভাব স্বীকার করেছিলেন।
প্র : ব্রজাঙ্গনা কাব্যে কোন শ্রেণির কবিতা সংকলিত হয়েছে? কবি কাব্যটিকে কয় খণ্ডে বিভক্ত করার পরিকল্পনা করেছিলেন? এই কাব্যে রাধা সম্পর্কে কবি কী বলেছেন?
উ : ব্রজাঙ্গনা কাব্যের কবিতাগুলি ওড্ (ode)-জাতীয় গীতিকবিতা। মধুসূদন কাব্যটিকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করে রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন, বিরহ ও মিলন। তবে 'মিলন' খণ্ডটি তিনি লিখে যেতে পারেন নি। এই কাজে রাধা সম্পর্কে মধুসূদন বলেছেন রাধা হলেন 'Poor Old Mrs. Radha of Braja'. (ব্রজের হতভাগিনী নায়িকা রাধা)
প্র : মেঘনাদবধ কাব্যের সহজ বর্ণনার মধুসূদন কোন্ বিদেশি কবির কোন কাব্যের অনুসরণ করেছিলেন?
উ : মেঘনাদবধ কাব্যের সহজ বর্ণনার মধুসূদন কবি ভার্জিলের ইনিড এবং দান্তের Divine comedy-তে বর্ণিত নরকের চিত্র অনুসরণ করেছিলেন।
প্র : মাইকেল মধুসূদন দত্তের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির নাম ও প্রকাশকাল লেখ।
উ : মাইকেল মধুসূদন দত্তের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল : পদ্মাবতী- প্রকাশকাল ১৮৫৯, বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ- প্রকাশকাল ১৮৬০, একেই কী বলে সভ্যতা?-প্রকাশকাল ১৮৬০, শর্মিষ্ঠা- প্রকাশকাল ১৮৬০, পদ্মাবতী- কাব্য-প্রকাশকাল ১৮৬০, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য-প্রকাশকাল ১৮৬০, মেঘনাদবধ কাব্য-প্রকাশকাল ১৮৬১, কৃষ্ণকুমারী- প্রকাশকাল ১৮৬১, বীরাঙ্গনা কাব্য-প্রকাশকাল ১৮৬২, ইংরেজি গ্রন্থ : The Captive Ladie- ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দ।
প্র : মধুসূদন কেন বাংলা নাটক রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন?
উ : মধুসূদন দেখেছিলেন বাংলায় মৌলিক নাটক রচনার অভাব রয়েছে। ইংরেজি ও সংস্কৃত নাটকের অক্ষম অনুবাদ খণ্ড জমিদারদের পৌষিন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হতো। তাই মধুসূদন বলেছিলেন- "অলীক কুনাট্যরঙ্গে মজে লোক রাঢ়দেশে। নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।" তাই তিনি নিজে বাংলা নাটক লেখায় হাত দেন এবং তাঁর নাটক মঞ্চস্থ হলে অসাধারণ দর্শকপ্রিয়তা লাভ করে।
প্র : তিনি বাংলা কাব্য সাহিত্যে কিসের স্রষ্টা?
উ : অমিত্রাক্ষর ছন্দের।
প্র : বাংলা ভাষায় কী রচনায় তাঁর কৃতিত্ব প্রথম?
উ : চতুর্দশপদী কবিতাবলি (১৮৬৬); সনেট।
প্র : তিনি কার অনুকরণে চতুর্দশপদী কবিতাবলি বা সনেট রচনা করেন?
উ : ইতালীয় কবি পেত্রার্ক এবং শেকসপিয়র।
প্র : তিনি হোমারের 'ইলিয়াড'-এর উপাখ্যান অবলম্বন করে বাংলা গদ্যে কী রচনা করেন?
উ : হেক্টরবধ (১৮৭১)।

2020/5/13 20:58
Scanned with CamScanner

প্র : 'হেকটরবধ' গ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : 'হেকটরবধ' (১৮৭১) হোমারের 'ইলিয়াড' মহাকাব্যের প্রথম কয়েকটি সর্গের গদ্যে রচিত বঙ্গানুবাদ। মধুসূদন রচনাটি ১৮৬৭তে শুরু করেন কিন্তু অসমাপ্ত অবস্থাতেই ১৮৭১ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তা প্রকাশিত হয়। হোমারের রচনা মূল গ্রিক থেকে বাংলায় অনুবাদের এটিই প্রথম প্রচেষ্টা। গ্রন্থটি ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করা হয়েছিল।

প্র : মধুসূদনের প্রপিতামহের নাম কী?
উ : রামকিশোর দত্ত।
প্র : মধুসূদন কবে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন?
উ : ১৮৪৩ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি। তাঁর বয়স তখন ১৯ বৎসর।
প্র : তিনি মাদ্রাজের উদ্দেশ্যে কলকাতা ত্যাগ করেন কত বছর বয়সে?
উ : ২৪ বৎসর বয়সে।
প্র : মধুসূদন রেবেকা মেকটাভিসকে কত তারিখে বিয়ে করেন?
উ : ১৮৪৮ সালের ৩১শে জুলাই।
প্র : মধুসূদন কিভাবে অধ্যয়ন করে ভাষা শিখেছেন?
উ : 'সকালে দুঘণ্টা পড়েন গ্রিক, দুপুরের পর দুঘণ্টা গ্রিক, বিকেলে তিন ঘণ্টা তেলেগু ও সংস্কৃত, সন্ধ্যে বেলায় দুঘণ্টা ল্যাটিন আর রাতের বেলায় তিন ঘণ্টা ইংরেজি- মোট বারো ঘণ্টা।' (সূত্র: গোলাম মুরশিদ রচিত 'আশার ছলনে ভুলি', পৃ. ১২১)
প্র : মধুসূদন সম্পাদিত (মাদ্রাস থেকে প্রকাশিত) পত্রিকাগুলোর নাম?
উ : Eurasian এবং Madras Hindu Chronicle. সহকারী সম্পাদক হিসেবে: Madras Spectator.
প্র : মধুসূদনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থের নাম কী?
উ : যোগীন্দ্রনাথ বসু রচিত 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত' (১৮৯৩)।
প্র : মধুসূদনের সৃষ্টির মাহেন্দ্রক্ষণ বলা হয় কোন সময়কে?
উ : মাদ্রাজ থেকে ১৮৫৬ সালের প্রথম দিকে কলকাতায় ফিরে ১৮৬২ সালের মাঝামাঝি সময়ে মধুসূদনের বিলেত গমনের পূর্ব পর্যন্ত।

প্র : এমেলিয়া হেনরিয়েটা সফে কবির সম্পর্ক কী?
উ : বিবাহিত মধুসূদনের সঙ্গে হেনরিয়েটার প্রণয় ছিল। কবি ১৮৫৬ সালে মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় এলে রেবেকা ও তাঁদের চার সন্তানের সঙ্গে মধুসূদনের সাময়িক বিচ্ছিন্ন হয়। কবি রেবেকাকে আনুষ্ঠানিক ডিভোর্স দেন নি। এ সময় মাদ্রাজ থেকে কবির আহ্বানে হেনরিয়েটা কলকাতায় আসেন এবং স্বামী-স্ত্রীর মতো একত্র বসবাস করেন। হেনরিয়েটার সঙ্গে কবির ধর্মমতে বা অন্য কোনোভাবে বিয়ে হয় নি। (সূত্র: 'আশার ছলনে ভুলি')
প্র : ১৮৬২ সালে কেন মধুসূদন ইংল্যান্ড যান?
উ : ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য।
প্র : তিনি কি ব্যারিস্টার হতে পেরেছিলেন?
উ : তিনি ব্যারিস্টার হয়ে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তবে বাইর পেশায় ভালো করতে পারেন নি।
প্র : 'শর্মিষ্ঠা' মধুসূদনের উল্লেখযোগ্য নাটক কেন?
উ : 'শর্মিষ্ঠা' মধুসূদন দত্তের প্রথম প্রকাশিত বাংলা নাটক। কলকাতার পাইকপাড়ার রাজাদের অনুপ্রেরণায় বেলগাছিয়া থিয়েটারের জন্য মধুসূদন দত্ত ১৮৫৮ সালে নাটকটি রচনা করেন। ১৮৫৯ সালের জানুয়ারি মাসে রাজাদের অর্থানুকূল্যে 'শর্মিষ্ঠা' প্রকাশিত ও ১৮৫৯ সালের তরা সেপ্টেম্বর সেটা বেলগাছিয়া থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়। পাশ্চাত্যরীতিতে বাংলা নাটক রচনার চেষ্টা এই নাটকের মধ্যে বিশেষভাবে সফলতা পায়। মধুসূদন পত্রে 'শর্মিষ্ঠা'র ইংরেজি অনুবাদও করেন। এই নাটক রচনায় পুরাণের কাহিনি অবলম্বন করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য চরিত্র: যযাতি, দেবযানী, শর্মিষ্ঠা, মাধব, পূর্ণিমা, রাজমন্ত্রী প্রমুখ।
প্র : 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য সম্পর্কে লেখ।
উ : মাইকেল মধুসূদন দত্তের চার সর্গে রচিত কাব্য। ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে রচিত ও সে বছরই মে মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। সৌন্দর্য প্রতিমা তিলোত্তমাকে নিয়ে সুন্দ-উপসুন্দের দ্ব

এই কাব্যের উপজীব্য। বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ হলো 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য। অবশ্য কবি তাঁর 'পদ্মাবতী' (১৮৬০) নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম প্রয়োগ করেছিলেন। কিন্তু সম্পূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যই প্রথম।

প্র : 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' গ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০) প্রহসন। প্রথমে এ প্রহসনের নাম ছিল 'নব শিবমন্দির'। এক লম্পট জমিদারের অত্যাচার-ব্যবহার ও দরিদ্র প্রজাদের ঘারা রচিত শিক্ষা এই উপভোগ্য প্রহসনের মূলকাহিনি। এর গঠন ও বিষয়বস্তুর প্রভাব পরবর্তী বাংলা নাটকে খুবই স্পষ্ট। বেলগাছিয়া থিয়েটারে মঞ্চায়নের জন্য মধুসূদন যে দুটো প্রহসন রচনা করেন তার একটি 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'। পরে প্রভাবশালীদের প্ররোচনায় এর কোনোটি মঞ্চস্থ হতে পারে নি। ক্ষুব্ধ মধুসূদন জানিয়েছিলেন যে, প্রহসন লেখার ব্যাপারে তাঁর 'ডানা ভেঙ্গে গেছে'। পরে সত্যি মধুসূদন আর কোনো প্রহসন লেখেন নি। উল্লেখযোগ্য চরিত্র : ভক্তপ্রসাদ, পঞ্চানন বাচস্পতি, গদাধর, পুঁটি, ফতেমা, ভণ্ডী, হুনিফ গাজি প্রমুখ।

প্র : 'একেই কি বলে সভ্যতা' সম্পর্কে লেখ।
উ : 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনে তৎকালীন নব্যবঙ্গীয় সম্প্রদায়ের সুরাপান এবং ইংরেজ অনুকরণের প্রতি ব্যঙ্গ করা হয়েছে। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনয়ের জন্য মধুসূদন যে দুটো প্রহসন রচনা করেন 'একেই কি বলে সভ্যতা' তার একটি। অন্যটি 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'। সত্যের যথাযথ উল্লেখ থাকায় প্রভাবশালীদের প্ররোচনায় দুটো প্রহসনের একটিও শেষ পর্যন্ত ওই মঞ্চে মঞ্চস্থ হয় নি। মাইকেল মধুসূদন দত্ত নবলব্ধ ইংরেজি শিক্ষাভিমানী যুবকদের উচ্ছৃঙ্খলতা ও অনাচারের কথা বর্ণনা করতে রচনা করেন দুই অঙ্ক বিশিষ্ট নাটক 'একেই কি বলে সভ্যতা'। প্রথমবার ১৮৬০ সালে। সাতক্ষীরে উল্লেখযোগ্য চরিত্র নবদুর্গাদাস, ভক্তিলতা, বাবাজী, নিতাইদিদি, কর্তাবাবা, ফলিলতা, গোয়াবাবী ইত্যাদি। এটি মূলত ইডেনেলেস পদের মধ্য দিকটি পরিবর্তন হয়েছে। সাটাশাহের বিবেচনার এ ধরনের সাটায়নে প্রহসন বলা হয়।

প্র : 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' সম্পর্কে লেখ।
উ : 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত ১০২টি সনেটের সংকলন। মধুসূদনের আগে বাংলা সাহিত্যে বা সনেটগ্রন্থ রচিত হয় নি। সে কিন্তুর বাংলা সনেটের আদি গ্রন্থ এটি। গ্রন্থটি ১৮৬৬ সালের ১লা জানুয়ারি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। কবিতাগুলি প্রবাসে রচিত। সনেটগুলির কয়েকটি পেত্রার্কের আদর্শে এবং বেশির ভাগ শেক্সপিয়রীয় আদর্শে রচিত। সনেটগুলির বিষয়বস্তু বিচিত্র। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য কবিদের উদ্দেশে বন্দনা, বাংলাদেশের নদী, বৃক্ষ, পল্লীর, পালাপার্বণ এবং আত্মজীবনের সুখ-দুঃখ। বঙ্গভাষা, কপোতাক্ষ নদ, আশা ইত্যাদি বিখ্যাত সনেট এই গ্রন্থভুক্ত। মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর উভয়বিদ ছন্দের চতুর্দশ পঙ্‌ক্তিতে রচিত কবিতাগুলোকে এটি।

প্র : মধুসূদন দত্তকে কী বলা হয়?
উ : বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী কবি। কারণ সাহিত্যিক ও সামাজিক বিদ্রোহ তিনিই প্রথম করেন।
প্র : তিনি কোথায় প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ করেন।
উ : পদ্মাবতী নাটকে (দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে)
প্র : মধুসূদন পোশাকে বিদ্রোহী কীভাবে?
উ : মধুসূদন বাঙালি হিন্দু বা মুসলিমের পোশাকের পরিবর্তে বাঙালিদের মধ্যে প্রথম পাশ্চাত্য পোশাক হিসেবে প্যান্ট-কোট-টাই পরেন।
প্র : মধুসূদনের অসম্পূর্ণ নাটকের নাম কী?
উ : সুলতানা রিজিয়ার বীরত্বপূর্ণ কাহিনি নিয়ে ইংরেজি অসম্পূর্ণ নাটক রিজিয়া।

Scanned with CamScanner

প্র : মধুসূদন আর একটি মহাকাব্য লিখতে চেয়েছিলেন কোন কাহিনি নিয়ে?
উ : কারবালার কাহিনি।
প্র : মধুসূদন দত্তের অবদান সম্পর্কে এক বাক্যে কী বলা যায়?
উ : বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী লেখক; প্রথম আধুনিক কবি; প্রথম আধুনিক নাট্যকার; অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক; বাংলা সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতার প্রথম রচয়িতা; সার্থক ট্রাজেডির প্রথম রচয়িতা; প্রথম প্রহসন রচয়িতা; পুরাণকাহিনির ব্যত্যয় ঘটিয়ে আধুনিক সাহিত্যরস সৃষ্টির প্রথম শিল্পী; পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যধারার সংমিশ্রণে নতুন ধরনের মহাকাব্য রচয়িতা।
প্র : তিনি কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ২৯শে জুন, ১৮৭৩; কলকাতা।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতাটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের কোন কাব্য থেকে নেয়া হয়েছে?
উ : মেঘনাদবধ কাব্যের বধো নামক ৬ষ্ঠ সর্গের ৫২০-৫৭০ চরণ।
প্র : ৬ষ্ঠ সর্গের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কী?
উ : লক্ষ্মণের হাতে অন্যায় যুদ্ধে অসম সাহসী বীর মেঘনাদের মৃত্যু।
প্র : বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ অংশে কোন নাটকীয় ভাষ্য সংকলিত হয়েছে?
উ : খুল্লতাত বিভীষণকে প্রত্যক্ষ করে দেশপ্রেমিক নিরস্ত্র মেঘনাদের প্রতিক্রিয়া।
প্র : 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কোন ছন্দে রচিত?
উ : ১৪ মাত্রার অমিল প্রবহমান যতিস্বাধীন অক্ষরবৃত্ত ছন্দে।
প্র : অরিন্দম, রাবণি কাকে বলা হয়েছে?
উ : রাবণের জ্যেষ্ঠপুত্র মেঘনাদকে। তাকে বাসবত্রাসও বলা হয়। মেঘনাদের অন্য নাম ইন্দ্রজিৎ।
প্র : কুম্ভকর্ণ কে?
উ : রাবণের মধ্যম সহোদর।
প্র : মৃগেন্দ্রকেশরী, শব্দের অর্থ কী?
উ : কেশরযুক্ত পশুরাজ সিংহ।
প্র : মেঘনাদ কোথায় যজ্ঞ করেছিলেন?
উ : নিকুম্ভীলা যজ্ঞাগারে।
প্র : রাবণ ও বিভীষণের মাঝে সম্পর্ক কিরূপ?
উ : সহোদর ভাই।
প্র : মেঘনাদের ঠাকুরমা বা দাদির নাম কী?
উ : নিকষা।
প্র : 'শূলিশম্ভুনিভ' শব্দের অর্থ?
উ : শূলপাণি মহাদেবের মতো।
প্র : সৌমিত্রি কে?
উ : লক্ষ্মণ। সুমিত্রা নামক মাতার গর্ভে জন্ম বলে তাঁর এই নাম।
প্র : 'হায় তাত উচিত কি তব একাজ' বলার বোঝানো হয়েছে–
উ : বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতা।

'কপোতাক্ষ নদ' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার রচয়িতার নাম কী?
উ : মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
প্র : 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতাটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে গৃহীত?
উ : চতুর্দশপদী কবিতাবলী।
প্র : 'কপোতাক্ষ নদ' কোন জাতীয় কবিতা?
উ : সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা।
প্র : 'কপোতাক্ষ নদ' রচনাকালে কবি কোথায় অবস্থান করছিলেন?
উ : ফ্রান্সে।
প্র : 'সতত হে নদ তুমি পড় মোর মনে'— এ পঙ্‌ক্তিতে 'হে নদ' বলে কবি কোন নদকে সম্বোধন করেছেন?
উ : কপোতাক্ষ।
প্র : স্বদেশের প্রতি নিজের হৃদয়ের কাতরতা প্রকাশ করতে গিয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্ত কাকে মাধ্যম হিসেবে কামনা করেন?
উ : শৈশব-স্মৃতিবাহী কপোতাক্ষ নদকে।
প্র : কবি 'মায়া-মন্ত্রধ্বনি' বলতে কী বুঝিয়েছেন?
উ : কপোতাক্ষের কলধ্বনিকে।
প্র : 'ভাষির ছলনে' অর্থ কী?
উ : ভুলের ছলনায়।
প্র : 'সুফ-প্রোকরণী তুমি জন্মভূমি-স্তনে।'— এখানে কবি স্বদেশকে কী হিসেবে কল্পনা করেছেন?
উ : মা।
প্র : 'ধুর্ত' কোন ধরনের শব্দ?
উ : তৎসম।
প্র : কপোতাক্ষের স্রোতধারাকে কবি কিসের সাথে তুলনা করেছেন?
উ : মাদুরঙ্গ।
প্র : কে প্রজ্ঞারূপে সাগরকে 'বারি রূপ কর' দেয়া?
উ : কপোতাক্ষ নদ।
প্র : 'আর কি হে হবে দেখা?'—উদ্ধৃতাংশে কী ভাব প্রকাশ পেয়েছে?
উ : অনিশ্চয়তা।
প্র : 'বঙ্গজ জনের' বলতে কাদের কথা বুঝানো হয়েছে?
উ : বঙ্গবাসীর।
প্র : 'বঙ্গজ জনের কানে, সখে, সখা-রীতে নাম তার',—এ পঙ্‌ক্তিতে 'নাম তার' বলতে কার নামের কথা বলা হয়েছে?
উ : মাইকেল মধুসূদন দত্তের।
প্র : প্রবাসে বসে কবি কিভাবে কপোতাক্ষ নদের নাম নিয়েছেন?
উ : রসের সংগীতে।
প্র : 'নিশা' শব্দের কয়েকটি প্রতিশব্দ লেখ।
উ : রজনী, রাত্রি, যামিনী, বিভাবরী, নিশীথিনী, শর্বরী, ক্ষণদা।
প্র : 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতা রচনাকালে কবি কোন দেশে ছিলেন?
উ : ফ্রান্সে।
প্র : 'কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?' – এ উক্তিতে কবির কোন ভাব প্রকাশ পেয়েছে?
উ : অনুরাগ।
প্র : প্রবাস জীবনে ফাস্টফুড খেতে খেতে মায়ের হাতের পিঠা খাবার বাসনার মধ্যে এ কবিতার কোন দিকটির মিল আছে?
উ : স্নেহাদরের কাতরতা।
প্র : প্রবাসে যখন মায়ের হাতের পিঠার কথা ভোলা যায় 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার কোন চরণটির সঙ্গে সাদৃশ্য পাওয়া যায়?
উ : 'এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?'
প্র : সনেটে অষ্টকে কী থাকে?
উ : কবিতার ভাবের পরিণতি থাকে।
প্র : সনেটে ষষ্টকে কী থাকে?
উ : কবিতার মূলভাবের প্রবর্তনা।
প্র : 'স্নেহের তৃষ্ণা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
উ : স্নেহ-কাতরতাকে বোঝানো হয়েছে।
প্র : পাঠ্যাংশে প্রদত্ত উদ্দীপকে প্রতিফলিত অনুভূতি এই কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ করে ধরা যায়?
উ : বাংলার নদীতীরবর্তী জেলো অঞ্চলের মানুষ ডিঙি নৌকা পেয়ে আনন্দিত হয়। যাবার পর স্বজনশূন্যতায় দিন কাটায়। মধুসূদন দত্তও প্রবাসে গিয়ে এই দেশ, ভাষা, মানুষের সঙ্গ কামনায় কাতর হয়েছেন। আমেরিকায় গিয়ে উদ্দীপকের বক্তার যেমন নদী সাঁতারের কথা মনে হয়েছে, বাড়ি ফিরে আসার কথা তার মনে জেগেছে– মধুসূদনেরও কপোতাক্ষ নদ এবং তার পারিপার্শ্বিক অনুষঙ্গকে মনে করে স্মৃতিকাতর হয়েছেন।
প্র : উদ্দীপক ও 'কপোতাক্ষ নদ'-এর মূলভাব কী?
উ : স্মৃতিকাতরতা। এই স্মৃতিকাতরতা নদীকেন্দ্রিক হলেও তা আসলে স্বদেশপ্রেমের সঙ্গেই যুক্ত। মানুষ যে পরিবেশে জন্ম নেয় ও বেড়ে ওঠে তাকে যে সহজে সে ভুলতে পারে না; সেখান থেকে তাকে সরিয়ে নিলে সে যে সুস্থ থাকে না– উদ্দীপক ও 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় সে কথাই বলা হয়েছে।

'বঙ্গভূমির প্রতি' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'মাইকেল' কী?
উ : ইংরেজিতে 'মাইকেল' (michael) শব্দটি হিব্রু 'মিখাইল' (mikha'el) শব্দ থেকে এসেছে। 'কে ঈশ্বর পছন্দ করেন?' –এমন প্রশ্নের উত্তর ছিল: 'মাইকেল'। ইংরেজিভাষী খ্রিষ্টানদের কেউ কেউ নামের আগে 'মাইকেল' ব্যবহার করেন। সে-সূত্রেই ধর্মান্তর গ্রহণের পর মধুসূদনের নামের অংগে 'মাইকেল' ব্যবহৃত হয়।

Scanned with CamScanner

প্র : মাইকেল মধুসূদন দত্তের কোথা থেকে 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতাটি গ্রহণ করা হয়েছে?

উ : মধুসূদন রচনাবলির 'নানা-কবিতা' সিরোনামের সংগ্রহ থেকে।

প্র : মধুসূদন এই কবিতাটি কি কোনো গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন?

উ : না।

প্র : মধুসূদন তাঁর এ কবিতার সূচনাতে একজন কবির একটি কাব্য-পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করেছেন। সে কবির নাম কী?

উ : বায়রন।

প্র : বায়রনের সেই কাব্য-পঙ্‌ক্তিটি কি?

উ : 'My native Land, Good night !'

প্র : 'রেখো, মা, দাসেরে মনে,'– এখানে 'মা'কে?

উ : কবির জন্মভূমি। কবি জন্মভূমিকে 'মা' বলে সম্বোধন করছেন।

প্র : 'পদে' কী?

উ : পায়ে। ('পদ'-এর একাধিক অর্থ আছে: ব্যাকরণের 'পদ', খাবার টেবিলের 'পদ' ভিন্ন অর্থজ্ঞাপক।)

প্র : 'সাধিতে' অর্থ কী?

উ : সম্পাদন করতে বা পূরণ করতে।

প্র : 'সাধিতে' শব্দটি কিভাবে গঠিত হয়েছে?

উ : সাধিত + এ।

প্র : 'পরমাদ' কী?

উ : ভুল।

প্র : 'পরমাদ' শব্দটি কিভাবে গঠিত?

উ : 'প্রমাদ' শব্দের অপভ্রংশ 'পরমাদ'।

প্র : 'মনঃকোকনদ' কী?

উ : কোকনদ অর্থ লাল পদ্মফুল। মন রূপ লালপদ্ম।

প্র : 'মধুহীন করও না গো তব মনঃকোকনদে'– এটা কোন অলঙ্কার?

উ : শ্লেষ অলঙ্কার।

প্র : কিভাবে শ্লেষ অলঙ্কার?

উ : এখানে 'মধুহীন' বলতে মিষ্টিহীন ও মধুসূদনবিহীন এই দুই অর্থই প্রকাশিত।

প্র : 'জীব-তারা' কোন সমাস?

উ : জীবন রূপ তারা = রূপক কর্মধারয়।

প্র : 'দেহ-আকাশ' কোন সমাস?

উ : দেহ রূপ আকাশ = রূপক কর্মধারয়

প্র : 'প্রবাসে, দৈবের বশে, / জীব-তারা যদি খসে / এ দেহ-আকাশ হতে, / নাহি শোক তাহে।'– এখানে কবি কী বোঝাতে চাচ্ছেন?

উ : তিনি তখন বিদেশে অবস্থানরত। সেই বিদেশে যদি তাঁর দেহ রূপ আকাশ থেকে জীবন রূপ তারা বা নক্ষত্রের পতন ঘটে– তবু তাঁর কোনো কষ্ট থাকবে না।

প্র : 'চিরস্থির কবে নীর, / হায় রে, জীবন-নদে?'– অর্থ কী?

উ : কবি জীবনকে নদ বা নদীর সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, কার জীবন-নদীতে চিরদিন পানি থাকে? ('নীর' অর্থ জল বা পানি।)

প্র : শমন কে?

উ : মৃত্যুর দেবতা বা যম।

প্র : 'জন্মিলে মরিতে হবে, / অমর কে কোথা কবে,'– এই চরণদ্বয়ের দ্বারা কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

উ : কবি দৈহিক মৃত্যুর কথা বলেছেন। জন্মগ্রহণকারীর যে মৃত্যু অনিবার্য সে কথাই বলা হয়েছে। এই চরণদ্বয় প্রবাদ হিসেবে গৃহীত।

প্র : 'গলে' কী?

উ : বের হয়ে আসা অর্থে।

প্র : 'মক্ষিকাও গলে না গো'–অর্থ কী

উ : মাছিও বেরিয়ে আসতে পারে না।

প্র : 'অমৃত-হ্রদ' কী?

উ : অমৃত রূপ হ্রদ।

প্র : হ্রদ কাকে বলে?

উ : চারি দিকে স্থল মাঝখানে জল– এ রকম বৃহৎ স্থানকে হ্রদ বলে।

প্র : 'যাচিব' কী?

উ : 'যাচঞা করিব' বা প্রার্থনা করবো।

প্র : 'সেবে'– কী?

উ : 'সেবা করে', এখানে 'স্মরণ করে' অর্থে।

প্র : 'জন্মদে' কী?

উ : জন্মদাত্রী বা মাতা।

প্র : 'কহ, গো, শ্যামা জন্মদে!'-এখানে জন্মভূমিকে কী কী নামে অভিহিত করা হয়েছে?

উ : এখানে শ্যামল জন্মভূমিকে 'শ্যামা' রূপে অভিহিত করা হয়েছে। তাছাড়া তাকে 'মাতা' বলেও সম্বোধন করা হয়েছে।

প্র : 'বর' অর্থ কী?

উ : বাসনা।

প্র : 'দেহ' বলতে কী বোঝান হয়েছে?

উ : 'দেহ' পরনীয়, পুরোনো বাংলায় ক্রিয়ার 'ধাত' । 'য়' যুক্ত করা লিঙ্গ ছিল, যেমন: শেষে 'হ' যুক্ত করা লিঙ্গ ছিল, যেমন: 'অঙ্গনে দেহ আলো'।

প্র : 'বরদে' অর্থ কী?

উ : 'বরদে' অর্থ বর বা আশীর্বাদদাত্রী। 'বরদে' অর্থ যিনি সুন্দর আশীর্বাদদান করেন।

প্র : 'বাসনে' অর্থ কী?

উ : মনের একান্তে।

প্র : 'তামসে' কী?

উ : পদ্মফুল।

প্র : এই কবিতার শেষে কবির অভিপ্রায় কী?

উ : কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত জন্মভূমিকে মা সম্বোধন করে বলছেন, তিনি যেন দেশের মানুষের স্মৃতির জলে বসন্ত, শরৎ কতু নির্বিশেষে মধুপূর্ণ পদ্মফুলের মতো ফুটে থাকতে পারেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্র : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মতারিখ কবে?

উ : ১৯শে মে, ১৯০৮।

প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : দুমকা, সাঁওতাল পরগনা, বিহার।

প্র : তাঁর পিতৃদত্ত নাম কী?

উ : প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক নাম মানিক।

প্র : জন্মপত্রিকায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম কী?

উ : অন্নদাচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?

উ : কথাসাহিত্যিক।

প্র : তাঁর রচিত প্রথম গল্পের নাম কী এবং তা কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?

উ : অতসী মামী; বিচিত্রা পত্রিকা (পৌষ সংখ্যা ১৩৩২)

প্র : যৌনাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে উদর পূর্তির সমস্যা ভিত্তিক তাঁর রচনার নাম কী?

উ : পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬)।

প্র : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসসমূহের নাম কী?

উ : জননী (১৯৩৫), দিবারাত্রির কাব্য (১৯৩৫), পুতুলনাচের ইতিকথা (১৯৩৬), পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬), সহরতলী (১৯৪১), অহিংসা (১৯৪১), সহরবাসের ইতিকথা (১৯৪৬), সোনার চেয়ে দামী (১৯৪১), স্বাধীনতার স্বাদ (১৯৪১), অরোগ্য (১৯৫৩) ইত্যাদি।

প্র : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের নাম কী?

উ : 'জননী' (১৯৩৫)।

প্র : 'জননী' উপন্যাস সম্পর্কে লেখ।

উ : 'জননী' (১৯৩৫) নারীর জননী-জীবনের নানা স্তর এবং সন্তানের সঙ্গে জননীর সম্পর্কের সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ মূলক উপন্যাস। চরিত্র ও কাহিনির নির্মোহ বাস্তব রূপায়ণ এই উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য।

প্র : 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) উপন্যাস ১৯৩৪ সাল থেকে 'পূর্বাশা' পত্রিকার ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। পদ্মা তীরবর্তী জীবন-জীবিকা এর মূলকাহিনি। সম্ভবত এটি প্রথম বাংলা উপন্যাস, যেখানে আদ্যন্ত কথোপকথনে পূর্ববঙ্গীয় উপভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকৃতি ও মানুষের হাতে নির্যাতিত একটি গোষ্ঠীজীবনের ছোটো ছোটো সুখদুঃখ ভালোবাসা হিংসা অসহায়তা ও আত্মরক্ষার তীব্র জৈবিক ইচ্ছার কাহিনি, গরিব মানুষের বেঁচে থাকার আগ্রহ ও সংগ্রামের সাহস, সেই সঙ্গে হোসেন মিঞা নামক এক রহস্যময় ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি উপন্যাসটিকে বাংলা সাহিত্যে অমরত্ব দিয়েছে। উল্লেখযোগ্য চরিত্র : কুবের, কপিলা, মালা, ধনঞ্জয়, গণেশ, শীতলবাবু, হোসেন মিঞা। কুবের-কপিলার আন্তঃসম্পর্ক ও উপন্যাসটির ভিন্নমাত্রা সংযোজন করেছে।

প্র : 'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন :

2020/5/13 20:58

Scanned with CamScanner

'সাহিত্যিকেরও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা প্রয়োজন।' 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় সেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ আছে। উপন্যাস আজ হয়েছে বজ্রাঘাতে নিহত হারু ঘোষের বর্ণনা দিয়ে। নায়ক শশী ডাক্তার বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও মড়াস্পর্শ অনুচিকিৎসহ একরকম নানা কুসংস্কার তার মধ্যে কার্যকর। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলের নাগরালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অন্তর্গত টানাপোড়েন ও অস্তিত্ব সংকট শশী চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। কুসুম বৃষ্টিতে ভিজে তার কাছে এলেও শশী নিশ্চুপ থাকে। লোকায়ত ভাষায় অনুভব প্রকাশ করে কুসুম। উচ্ছল এই নারী এক সময় অন্তর্গতভাবে সবকিছুতে অগ্রহ হারায়। তাই কুসুমের আত্মিক মৃত্যু ঘটে। অন্যদিকে সেনদিদির সঙ্গে শশীর পিতা গোপালের সম্পর্ক, যাদব পণ্ডিত ও তার স্ত্রীর ইচ্ছামৃত্যু ইত্যাদি উপন্যাসটিকে বহুবিচিত্র করেছে। 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় পুতুল বলতে এই মানুষগুলোকেই বোঝানো হয়েছে, যারা চারিত্রিক দৃঢ়তা নিয়ে দাঁড়াতে পারে না; পুতুলের মতো অন্যের অল্প ধাক্কাতেই চালিত হয়।

প্র : 'অমৃতস্য পুত্রা' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : ১৯৩৮ সালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পারিবারিক ও দাম্পত্য সমস্যামূলক এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। বিত্তবান বীরেশ্বরের দ্বিতীয়বার পাণিগ্রহণ, প্রথম বধূর স্বামীগৃহ ত্যাগ, তাদের সন্তান শ্যামলালের বিবাহ, অতঃপর শ্যামলালের পুত্র অনুপমের সঙ্গে বীরেশ্বরের সাক্ষাৎ এবং তার টাকাতে অনুপমের বিলেতে যাওয়া ইত্যাদি ঘটনাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। যার তাৎপর্য হলো আদর্শবান পিতার সন্তানের আদর্শচ্যুতি। উল্লেখ্য যে অনুপম চরিত্রটি দিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক জীবনবোধের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন।

প্র : 'সহরতলী' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : 'সহরতলী' (১৯৪১) নিম্ন মধ্যবিত্ত ও শ্রমিকশ্রেণির মানুষের জীবনের কাহিনি ও সেইসঙ্গে প্রবৃত্তির নিরাবরণ প্রকাশের উপন্যাস, মানুষের আচরণের শঠিকতা ও কপটতা, ঈর্ষা ও ইন্দ্রিয়াসক্তির স্বাভাবিক এখানে আছে। যশোদা চরিত্রটির শঠিক ব্যক্তিত্ব ও আত্মসম্ভ্রম বাংলাসাহিত্যে একটি ব্যতিক্রমী নারীচরিত্র হিসাবে স্বীকৃত।

প্র : 'আরোগ্য' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সচেতনমূলক উপন্যাস 'আরোগ্য' (১৯৫৩)। এই উপন্যাসে তিনি মানুষের জীবন ও মন বিশ্লেষণ করেছেন। মার্কসীয় জ্ঞানের ফলে তিনি উপলব্ধি করেছেন সামাজিক কারণেই মানুষ মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়।

প্র : 'অহিংসা' উপন্যাস সম্পর্কে লেখ।

উ : মানুষ যে অজ্ঞাতসারেই অনেক অহিংস কাজ করে অথবা হিংসার সঙ্গে অহিংসে মানুষের মধ্যে জড়িত থাকতে পারে এই বিষয় নিয়ে রচিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অহিংসা' (১৯৪১)। উপন্যাসটিতে প্রকাশ হয়েছে আশ্রমিক ব্যবসার কাহিনি। যেখানে উল্লেখযোগ্য চরিত্র হয়ে কাহিনিকে গতিময় করেছে বিপিন সদানন্দ, মহেশ চৌধুরী ও মাধবী ইত্যাদি চরিত্র।

প্র : তাঁর রচিত গল্পগ্রন্থগুলোর নাম কী?

উ : অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প (১৯৩৫), প্রাগৈতিহাসিক (১৯৩৭), মিহি ও মোটা কাহিনী (১৯৩৮), সরীসৃপ (১৯৩৯), বৌ (১৯৪৩), সমুদ্রের স্বাদ (১৯৪৩) ইত্যাদি।

প্র : তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থের নাম কী?

উ : 'অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প' (১৯৩৫)।

প্র : 'আত্মহত্যার অধিকার' গল্পের পরিচয় দাও।

উ : একটি দরিদ্র পরিবারের লাঞ্ছিত জীবন কাহিনি নিয়ে রচিত 'আত্মহত্যার অধিকার' গল্পটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প' গল্পগ্রন্থের অন্যতম বিখ্যাত গল্প। এখানে গরিব নীলমণির যে কষ্টের কাহিনি বিবৃত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে তার যুবতী মেয়ে শ্যামা কষ্টকে দলিত করে, যেভাবে তার জীবনের রস আস্বাদনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, গল্পে

লেখক আসক্তিকেই বড় করে দেখানো হয়েছে। লেখকের ভাব পরিকল্পনায় প্রতিফলিত হয়েছে যে, এই অসমবিন্যস্ত কাম ও জীবনে সবাই অনুস্থ ও বিপর্যস্ত। শ্রষ্টার সৃষ্টির অসমতার প্রতি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সচেতনী দৃষ্টি এখানে বক্রও ব্যঙ্গাত্মক শিল্পরীতিতে চিত্রিত হয়েছে। শ্রষ্টা নিজে কেন সমাজে এমন অসাম্য সৃজন করলেন, সেই প্রশ্নও করেছেন তিনি।

প্র : 'পুতুল ও পাচি' তাঁর কোন গল্পের পাত্র-পাত্রী?

উ : প্রাগৈতিহাসিক।

প্র : প্রতি চরিত্রটি নজরুলের কোন উপন্যাসে পাওয়া যায়?

উ : মৃত্যু-ক্ষুধা।

প্র : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোন পত্রিকার সহ-সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন?

উ : বসুশ্রী (১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত)।

প্র : তিনি কত সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন?

উ : ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে।

প্র : তিনি প্রগতি লেখক সংঘের কী ছিলেন?

উ : তিনি নির্বাচিত যুগ্ম-সম্পাদক (১৯৪৬)।

প্র : মানিক সাহিত্য সম্পর্কে কী বলা হয়?

উ : শরৎচন্দ্র ও কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের পর বাংলা সাহিত্যে বস্তুতান্ত্রিকতা ও মনোবিশ্লেষণ মানিক সাহিত্যে সবচেয়ে বেশি প্রতিফলিত।

প্র : পদ্মানদীর মাঝি নিয়ে কে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন?

উ : গৌতম ঘোষ।

প্র : শশী ও কুসুম কোন উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী?

উ : পুতুলনাচের ইতিকথা।

প্র : তিনি কত তারিখে মারা যান?

উ : ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৫৬; কলকাতা।

'মসি-পিসি' গল্প থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : রহমানের শারীরিক গড়ন কেমন?

উ : আধপাকা চুল, রোগা শরীর।

প্র : সালকির সঙ্গে ফটিকটী ঘরে আসা সত্ত্বেও বৌটি কেমন?

উ : ফটিকটী ঘরদোরে কেমন?

প্র : 'এক ঝড় সোনার মেয়ে'। মেয়েসোক কাপে ঘরে একটা পুরুষ মানুষ নেই, বিপদ-আপদ ঘটে গেলে ভাবনাটি কার?

উ : কৈলাসের।

প্র : কৈলাসের গোপন খবর ফটিক কিসের নামাজ?

উ : খুনসুটি।

প্র : সন্ধান তো আছে একটা মানুষের- এখানে কার সন্ধানের কথা বলা হয়েছে?

উ : অতর।

প্র : পেটে শকিয়ে শাদি ফটা খেকে, কলকেপোড়া ছাঁকা খেতে মেয়েকে স্বামীর বাড়ি পাঠাবে না কে?

উ : মাসি।

প্র : আলহাদির কোন মুখের ছাপে বুড়ো রহমান তার মেয়েকে খোঁজে?

উ : ফ্যাকাশে।

প্র : জন্ত বৌকে নেয়ার জন্য কী প্রস্তুতি নেয়?

উ : মামলা করার।

প্র : বছরের পর পর ঘরে মাসি-পিসির সম্বন্ধ ছিল কতো?

উ : রূপোর টাকা আর আধুলি সিকি।

প্র : বাপের বাড়িতে আসার সময় আলহাদির অবস্থা কেমন ছিল?

উ : মরমর।

প্র : গলা কেটে রক্ত দিয়ে সে ধার শোধ করা যদি বা সম্ভব, অন্ন দেয়ার ক্ষমতা কোথায় পাবে- কার সম্পর্কে বলা হয়েছে।

উ : আলহাদির বাবা-মা।

প্র : গাঁয়ের বাবু বাসিন্দারা নগদ পয়সার জন্য কী বেঁচতে দেয়?

উ : বাগানের জিনিস।

প্র : আলহাদির বাবা মার সম্পত্তি কার ভোগ-দখলে গেছে-

উ : গোকুলের।

প্র : নিজেকে তার ছাঁচড়া, নোংরা, নর্দমার মতো লাগে- কার?

উ : আলহাদির।

2020/5/13 20:58
Scanned with CamScanner

প্র : মাসি-পিসিকে কাস্তারি বাড়ি ধরে নিয়ে যেতে রাজে কারা আসে?
উ : কানাই তৌকিদার।
প্র : মাসি-পিসিকে অর্থেক জীবন কী করতে বাস বলে তাদের বিশ্বাস?
উ : সরকার বাবুর সঙ্গে বাজারের তোলা নিয়ে কগড়া করতে।
প্র : কোটি বাঁধা বাবরি চুলওয়ালা মাস্টার ফাঁকে জ্যোৎস্না পড়েছে কার?
উ : বৈদ্যের।
প্র : যুদ্ধের জন্য মাসি-পিসি কিভাবে প্রস্তুতি নেয়?
উ : গামলার জলে কাঁথা-কম্বল চুবিয়ে রাখে, বাটি দা, হাতের কাছে রাখে।

'পদ্মানদীর মাঝি' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'পদ্মানদীর মাঝি'কে বলা হয়–
উ : আঞ্চলিক উপন্যাস।
প্র : স্বচ্ছনীলাভ মণির মতো কিসের চোখ?
উ : ইলিশ মাছের।
প্র : 'বাদলা দিনের ঝড় জানান দিয়া আহে'।– 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে এই উক্তি কে করেছিলো?
উ : হোসেন মিয়া।
প্র : 'ঈশ্বর থাকেন ঐ গ্রামে, ভদ্র পল্লীতে'– উক্তিটির উপন্যাসের নাম–
উ : পদ্মানদীর মাঝি।
প্র : হোসেন মিয়া কোন উপন্যাসের চরিত্র?
উ : পদ্মানদীর মাঝি।
প্র : হোসেন মিয়ার বাড়ি কোথায়?
উ : নোয়াখালি অঞ্চলে।
প্র : 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে অবলম্বন হলো–
উ : জেলে জীবন।
প্র : 'পদ্মানদীর মাঝি'র প্রকাশকাল–
উ : ১৯৩৬ সাল।
প্র : 'আমি একা ফিরা্যা আইলাম গো মামা, সব কটারে গাঙের জলে ভাসাইয়া দিয়া আমি একা ফিরা্যা আইলাম।'– একথা কে বলেছে?
উ : রাসু।
প্র : 'বিদ্যুদবার কর্ত্তা সেগুন মালু।'– 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে উক্তিটি কার?
উ : হারু জ্যাঠার।
প্র : 'কুবের বাই ছাড়ান দাও'।–'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে উক্তিটি কার?
উ : জহর মাঝির।
প্র : পদ্মানদীর মাঝি কে?
উ : কুবের।
প্র : 'পদ্মানদীর মাঝি'র কেন্দ্রীয় চরিত্র কোনটি?
উ : কুবের।
প্র : 'কাইল চাইরে নামবে? হালার মাছ ধইরা জুত নাই।'– উক্তিটি কার?
উ : ধনঞ্জয়।
প্র : 'পদ্মানদীর মাঝি'তে নৌকা ও জালের মালিক কে?
উ : ধনঞ্জয়।
প্র : কুবের মাঝির বাড়ি কোথায় ছিল?
উ : কেতুপুর গ্রামে।
প্র : মাছ ধরার সময় কুবের প্রথম কার সঙ্গে কথা বলেছিলো?
উ : যদু।
প্র : গণেশকে কে চিড়া কিনতে পাঠিয়েছিল?
উ : ধনঞ্জয়।
প্র : 'ই-আজকি জাড়; কুবের।'– এই বাক্যে 'জাড়' শব্দের অর্থ কী?
উ : শীত।
প্র : 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটিতে তিন মাঝি কুবের, ধনঞ্জয় আর গণেশ যে নৌকায় মাছ ধরতে বেরিয়েছিলেন সেটির মালিক কে?
উ : ধনঞ্জয়।
প্র : কেতুপুর গ্রামের কোন দিকে জেলে পাড়া?
উ : পূর্ব দিকে।
প্র : বাংলাদেশের কোন নদীকে 'কীর্তিনাশা' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে?
উ : পদ্মা নদীকে।
প্র : 'একখানা গীত ক দেখি কুবির।'– কে বলেছে?
উ : গণেশ।
প্র : 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে কোন চরিত্রকে সমগ্র বাংলা সাহিত্যের অভিনব চরিত্র হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে?
উ : হোসেন মিয়া।

প্র : 'বাদলা আকাইছে'– উক্তিটি কে কাকে বলেছে?
উ : কুবের, শীতলকে।
প্র : হোসেন মিয়া লোকটি কেমন?
উ : বয়স্কায়।
প্র : কুবের কত বছর বয়স হতে মাছ ধরছে?
উ : ১২ বছর বয়স হতে।
প্র : 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসটি কার লেখা?
উ : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের।
প্র : 'হা শীত সা তর মাথা'– উক্তিটি কার?
উ : কুবেরের।
প্র : ময়নাদ্বীপ থেকে রাসু পালিয়ে এসেছিল কোন মাসে?
উ : ফাল্গুন মাসে।
প্র : কুবেরের অনুগত ব্যক্তি কে?
উ : গণেশ।
প্র : কুবেরের মেয়ের নাম–
উ : গোপী।
প্র : হোসেন মিয়া কুবেরের জন্য কত টাকার ঋণ দিয়েছিল?
উ : একুশ টাকা দশ আনা।
প্র : রসুলের বাড়ি কোথায়?
উ : মাদুরচর।
প্র : 'আজ্ঞা সমুদ্র কত বড়– পদ্মার চেয়েও বড় বুঝি'– কে বলেছে?
উ : যুবী।
প্র : কপিলা কোন ধরনের চরিত্র?
উ : রহস্যময়ী।
প্র : কুবের ও কপিলার সম্পর্কের মধ্য দিয়ে লেখক কোন তত্ত্বের প্রয়োগ দেখিয়েছেন?
উ : ফ্রয়েডীয় যৌনচেতনাতত্ত্ব।
প্র : রাসুকে কোন দ্বীপে নেয়া হয়েছিল?
উ : ময়নাদ্বীপে।
প্র : ময়নাদ্বীপের দৈর্ঘ্য কত?
উ : এগার মাইল।
প্র : কপিলার স্বামীর নাম কী?
উ : শ্যামাদাস।
প্র : কপিলার শ্বশুরবাড়ি কোথায়?
উ : আকুরটাকুর।
প্র : 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের কাহিনি কে নিয়ন্ত্রণ করে?
উ : হোসেন মিয়া।
প্র : 'যে মানুষে আলোআসে, সে কাজের সাথী না- পালটির গাছক কে?
উ : গণেশ।
প্র : 'কি ক্ষতি ফুলসমাসের ঘাকে রাঙা খাইলেগা'– কে বলেছে?
উ : কুবের।
প্র : উপন্যাসে কোন অঞ্চলের ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে?
উ : পদ্মাপাড়ের আঞ্চলিক ভাষা।
প্র : মেজকর্তা অনন্ত ভাদুকন্যার কোন ভাবের সন্ধান পেয়েছিল?
উ : হাঁসের।
প্র : হোসেন মিয়ার পকেট থেকে কুবের কত চুরি করেছিল?
উ : আধুলি, কয়েকটা সিকি, একটা আনি।
প্র : 'জান দিয়া তোমাকে সবল করি, আসে আজ তোমরা আধার দিলা?'– কে বলেছে?
উ : হোসেন মিয়া।

'তৈলচিত্রের ভূত' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পটি কবে, কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?
উ : মাসিক 'মৌচাক' পত্রিকায় ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে।
প্র : ভাস্কর পরাশর-এর নামটি কোথা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে?
উ : পরাশর পৌরাণিক চরিত্র। তিনি সুবিখ্যাত ঋষি, ব্যাসদেবের পিতা ও ধর্মশাস্ত্রের সংকলনকারী।
প্র : 'নগেন' শব্দটি কিভাবে এসেছে?
উ : নগ + ইন্দ্র = 'নগেন্দ্র' থেকে সংক্ষিপ্ত হয়ে হয়েছে 'নগেন'। 'নগ' অর্থ পাহাড় বা পর্বত; আর নগেন্দ্র অর্থ পাহাড়-পর্বতের রাজা 'হিমালয়'। 'নগেন' অর্থেও তাই বোঝান হয়েছে।
প্র : নগেনের কী একটু উল্লাস?
উ : চাউনি।
প্র : 'বেচারি' অর্থ কী?
উ : নিরুপায় ও ভাগ্যহীন ব্যক্তি।

2020/5/13 20:58
Scanned with CamScanner

প্র : 'বেতাল' কোন শব্দ?
উ : পারসি বা ফার্সি শব্দ।
প্র : 'উইল' কী?
উ : এক ধরনের দলিল। এই দলিলে দলিলকারীর অভিব্যক্ত-ইচ্ছা ব্যক্ত থাকে। যেমন: কোনো ব্যক্তি যদি মনে করেন, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সম্পদের কোনো অংশ কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পাবে, সে ইচ্ছা তিনি 'উইলে'র মাধ্যমে ব্যক্ত করতে পারেন। এমন কি, মৃত্যুর পর নিজের চোখ বা অস্থি যদি কোনো হাসপাতালকে দান করতে চান, সে কথাও 'উইল' করে যেতে পারেন। 'উইল' সাধারণত গোপন থাকে।
প্র : 'প্রেতাত্মা' কী?
উ : মৃতের আত্মা। হিন্দু, মুসলিম, খ্রিষ্টান ধর্মে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। হিন্দু ধর্মে মৃত মানুষের আত্মাকে 'প্রেতাত্মা' বলে।
প্র : 'পরলোকগত' কী?
উ : স্বর্গত বা মরহুম।
প্র : 'শ্রাদ্ধের দিন' কবে?
উ : হিন্দু ধর্ম অনুসারে মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তি কামনা করে যে অনুষ্ঠান করা হয় তাকে শ্রাদ্ধ বলে। সাধারণত মৃত্যুর এগার বা তের বা ত্রিশ দিন পরে আদ্যশ্রাদ্ধ করা হয়; এক বৎসর পর বাৎসরিক শ্রাদ্ধও অনেকে করেন। আদ্যশ্রাদ্ধকে মুসলিম শাস্ত্রের 'চল্লিশা'র সঙ্গে খানিকটা তুলনা করা চলে।
প্র : 'তৈলচিত্র' কী?
উ : তেলরঙে আঁকা কোনো ছবি। ইংরেজিতে ওয়েল-পেইন্টিং (Oil-painting) বলে।
প্র : 'আত্মগ্লানি'-র সমাস কী?
উ : আত্মার গ্লানি = ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস।
প্র : 'খাপছাড়া' বলতে কী বোঝান হয়েছে?
উ : অস্বাভাবিক।
প্র : 'খাপছাড়া' নামে একটি শিশুতোষ গ্রন্থের রচয়িতা কে?
উ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
প্র : 'মাসিকপত্র' কী?
উ : কিছু পত্রিকা, যেগুলো এক মাস অন্তর প্রকাশিত হয়।
প্র : 'কস্মিনকাল' কী?
উ : এটা সংস্কৃত 'কস্মিন্‌কাল' শব্দের বাংলা রূপ। কস্মিন্‌কাল: কোনোকালে। এর বর্তমান রূপ হচ্ছে: কোনোকাল। এখন 'কোনোকাল'-এর বদলে ভোর প্রচলিত। এর অর্থে 'কস্মিনকাল' কথাটি ব্যবহার হয়।
প্র : 'মড়া' আর 'মরা'-র কোনো পার্থক্য আছে?
উ : আছে। 'মড়া' হলো মৃতদেহ আর 'মরা' হলো মৃত্যুবরণ করা। মড়ার পর 'দেহ' বা মৃতদেহের মতো বিছানায় শুয়ে ছিল।
প্র : 'মটকার পাঞ্জাবি' কী?
উ : মোটা তসরের কাপড়ের পাঞ্জাবি। যেমন পাঞ্জাবি হয়, তেমনি তসর এক জাতীয় কাপড়। মোটা তসরকে মটকা বলে।
প্র : 'শাল' কী?
উ : দামি পশমির গায়ের চাদর।
প্র : 'শাল' কোন শব্দ?
উ : 'শাল' একটি পারসি বা ফার্সি শব্দ।
প্র : 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্প থেকে এমন একটি শব্দ লেখ যেখানে ৎ-এর ওপর হেফ (ˇ) আছে।
উ : 'ভর্ৎসনা'।
প্র : 'ইতস্তত' শব্দের অর্থ কী?
উ : এখানে- সেখানে। (ইতস্ অর্থ এখানে; ততস্ অথ সেখানে।)
প্র : '...অদ্ভুত অথচ সত্য ভূতের গল্প শোনা যায়...'। –এখানে 'অদ্ভুত' আর 'ভূত' বানানে উ-কার / উ-কারের পার্থক্য কী?
উ : 'অদ্ভুত' বানানে 'উ-কার' আর 'ভূত' বানানে 'উ-কার'। মনে রাখা প্রয়োজন: 'অদ্ভুত' আর 'ভূতুরে' বানান দুটো ছাড়া সব 'ভূত' বানানে উ-কার। যেমন: উদ্ভূত; সম্ভূত; ভূতপূর্ব; অভূতপূর্ব; অনুভূত ইত্যাদি।
প্র : 'অশরীরী' অর্থ কী?
উ : যার শরীর নেই। এখানে ভূত কল্পনা করা হয়েছে।
প্র : 'উজ্জ্বল' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কী?
উ : উৎ + জ্বল = উজ্জ্বল।
প্র : 'জ্বলজ্বল' শব্দের অর্থ কী?
উ : উজ্জ্বল।

প্র : 'পরশ' নামের অর্থ কী?
উ : পরম ঈশ্বর।
প্র : 'পরশ' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কর।
উ : পর + রশ।
প্র : 'তড়িতাহত' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কর।
উ : তড়িৎ + আহত।
প্র : 'তড়িৎ' অর্থ কী?
উ : বিদ্যুৎ।

'মমতাদি' থেকে
গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : মমতাদির বয়স কত ছিল?
উ : তেইশ বছর।
প্র : মমতাদির কপালে ক্ষতটা কেমন ছিল?
উ : আলাজে পরা একটি টিপের মতন।
প্র : মমতাদিরা কোথায় থাকতো?
উ : জীবনময়ের গলির ভেতর সাতাশ নম্বর বাড়ির এক তলায়।
প্র : মমতাদির মাইনে কত ছিল?
উ : পনের টাকা।
প্র : 'ভাবিস না তোকে খুব ভালোবাসবে।'– উক্তিটি কার?
উ : লেখকের মায়ের।
প্র : কত দিন পর মমতাদি লেখকের সঙ্গে ভাব করল?
উ : সপ্তাখানেক পরে।
প্র : মমতাদি, তাকে কী বলে ডাকতে বলেছিল?
উ : দিদি।
প্র : মমতাদি এক বার লেখককে কেন বেশি আদর করেছিলেন?
উ : স্নেহে নয়, নিজের গর্ব প্রতিষ্ঠার জন্য।
প্র : লেখক মমতাদির গালে কয়টি দাগ দেখতে পেয়েছিলেন?
উ : গালে তিনটি দাগ দেখতে পেয়েছিলেন।
প্র : মমতাদির স্বামীর চাকরি কবে হয়েছিল?
উ : ইংরেজি মাসের পয়লা তারিখ থেকে।
প্র : মমতাদি কয়টি কমলালেবু কিনেছিল?
উ : দুটি।
প্র : মমতাদির ঘরে ভাঙা টেবিল কিসের জোরে দাঁড়িয়ে আছে?
উ : আগাগোড়া দড়ির ব্যান্ডেজের জোরে কোনোমতে দাঁড়িয়ে আছে।
প্র : মমতাদির ঘরে প্রেসিডেন্ট উলসন সেন্টারের গার্ডের ঘরে কী ছিল?
উ : কফকসো নাই।
প্র : মমতাদির ছেলের বয়স কত ছিল?
উ : পাঁচ বছর।
প্র : 'মমতাদি' গল্পটি কোন গ্রন্থের অন্তর্গত?
উ : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সরীসৃপ' (১৯৩৯) গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।
প্র : 'অপ্রস্তুত' শব্দের অর্থ কী?
উ : অপ্রস্তুত।

মামুনুর রশীদ

প্র : মামুনুর রশীদ কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৯৪৮ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি, টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে।
প্র : তিনি মূলত কী হিসেবে পরিচিত?
উ : নাট্যকার হিসেবে।
প্র : তাঁর প্রকাশিত নাটকের নাম কী?
উ : ওরা কদম আলী (১৯৭৮), ওরা আছে বলেই (১৯৮০), মে দিবস (১৯৮১), ইবলিশ (১৯৮২), এখানে নোঙর (১৯৮৬), পিনিপিস (১৯৮৫), সমতট (১৯৯০), পাখর (১৯৯৩), তোবেদেক (১৯৯৭) ইত্যাদি।
প্র : 'ওরা কদম আলী' নাটকের পরিচয় দাও।
উ : ১৯৭৮ সালে 'ওরা কদম আলী' প্রকাশের মধ্য দিয়ে মামুনুর রশীদের আবির্ভাব ঘটে নাট্যকার হিসেবে। শোষিত-নিপীড়িত, বঞ্চিত মানুষের জন্য নাটক লিখতে গিয়ে তিনি নাটকে নিয়ে এসেছেন প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ চেতনা। আর বঞ্চিত, শোষিত মানুষের শ্রেণি সংগ্রামের রূপকার হিসেবে মামুনুর রশীদের 'ওরা কদম আলী' নাটক সমকালীন বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ধারায় যুক্ত করেছেন বিশিষ্ট মাত্রা। গরিব ও মেহনতি মানুষের ব্যক্তিক প্রতিবাদ সামষ্টিক রূপ কিভাবে পরিগ্রহ করে কদম আলী নামের একটি বোবা চরিত্রের মধ্য দিয়ে এ নাটকে তা দেখানো হয়েছে। তবে কদম আলীদের 'ওরা' ভাবা হয়েছে। 'আমরা' ভাবতে পারেন নি লেখক।

20/5/13 20:58
Scanned with CamScanner

বাংলা-বিদ্যার
মৌলিকজ্ঞান
কোষগ্রন্থ

বাংলা
ভাষা ও সাহিত্য
জিজ্ঞাসা

Scanned with CamScanner

প্র : তিনি কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৮২), আদমজী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯০)।

মাহমুদুল হক

প্র : মাহমুদুল হক কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৯৪০ সালে, ঢাকায়।
প্র : তাঁর প্রকাশিত উপন্যাসগুলোর নাম কী?
উ : অনুর পাঠশালা, নিরাপদ তন্দ্রা, জীবন আমার বোন, কালো বরফ চিৎকার কাবুল, খেলাঘর, মাটির জাহাজ, অপরীরী।
প্র : 'খেলাঘর' কোন ধরনের উপন্যাস?
উ : মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক।
প্র : 'জীবন আমার বোন' সম্পর্কে লেখ।
উ : মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস 'জীবন আমার বোন' প্রথম প্রকাশ পায় ১৯৭৬ সালে; এর লেখক মাহমুদুল হক। জাহিদুল কবির খোকা নামের এক আপাত নির্লিপ্ত ও জীবন-পলাতক মানুষকে কেন্দ্রে স্থাপন করে মাহমুদুল হক উপন্যাসটি লিখেছেন। দেশে যখন রাজনৈতিক উত্তালতা; বঙ্গবন্ধুর দোকান লুট; জেল ভেঙে কয়েদিদের পলায়ন; অবাঙালিরা বাংলা থেকে পুঁজি নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে পলায়নপর; ইয়াহিয়া-ভুট্টোর রাজনৈতিক আপোসের ভান; বাঙালিদের গর্জে ওঠা; জাতীয় পরিষদের অধিবেশন প্রেসিডেন্ট কর্তৃক স্থগিত ও লাঠিসোটা নিয়ে এর বিরুদ্ধে বাঙালির প্রতিবাদ; বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের পর বাংলার মুক্তিকামী মানুষের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেয়া– এই উত্তাল সময়টাই তুলে ধরা হয়েছে উপন্যাসে। উপন্যাসের একটি চরিত্র মুরাদ বলেছে: 'প্রত্যেকটা দিন এখন ইতিহাসের এক একটি পাতা; আমরা এক একজন এক একটা সাক্ষী হয়ে থাকবো।' মুরাদ আছে, রহমান আছে, ইয়াসিন আছে– সবাই কমবেশি আন্দোলন-সংগ্রাম সংশ্লিষ্ট, শুধু জাহিদুল কবির খোকা ছাড়া। খোকা মনে করে আন্দোলন-সংগ্রাম হলো ভূতের মতো। এই 'ভূত' কোনোভাবেই যেন তার ঘাড়ে না চুকতে পারে, এব্যাপারে সে সচেতন। উপন্যাসে বলা হয়েছে: ১৯৬৯ সালের যুদ্ধের সময় চোর-ডাকাতও মুর্দি-ফকির ছেড়ে দেশপ্রেমিক হয়ে গিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের সূচনাকালে একজন মানুষ এমন নির্লিপ্ত থাকে কী করে! খোকা সাধারণ চরিত্রটি উত্তাল ঢাকায় থাকবে, ঢাকা ছাড়বে না, আবার আন্দোলন-সংগ্রামে যাবে না। খোকা চরিত্রের এই যখন অবস্থান, এরই মধ্যে নেমে আসে কালো রাত। পাকিস্তানিরা আক্রমণ করে বাঙালিদের। মুক্তিযুদ্ধ আরও জোরদার হয়। খোকার বন্ধুরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। রহমান শহিদ হয়, ইয়াসিন পঙ্গু হয়, ইয়াসিন থাকে গেরিলা যুদ্ধে। জাহিদুল কবির খোকা এই অবস্থাকেও স্বপ্ন বলে। সে উচ্চারণ করে: 'স্বপ্নের ভিতর দেখতে দেখতে আমরা আরেক স্বপ্ন বয়ে যাই।' বাস্তবতাকে সে স্বপ্ন ভাবে। অথচ মুক্তিযুদ্ধকালে এমন অনেক বাঙালি ছিল যারা পলায়নপর, দায়িত্ব পালনে অনীহ। জাহিদুল কবির খোকা তেমনি একটি চরিত্র। এই চরিত্রটি ব্যক্তির সম্পর্কের ক্ষেত্রেও পালিয়ে বেড়িয়েছে। নীলা ভাবির সঙ্গে তার সম্পর্ক এর বড় প্রমাণ। বোনের ক্ষেত্রেও সে দায়িত্ব পালন করে নি। উপন্যাসে জাহিদুল কবির খোকা কাব্যমিশ্রিত বক্তব্য দেয়, স্বপ্ন দেখে, বড় দেখায় কিন্তু পাঠককে তৃপ্ত করে না। এ যেন, রোম যখন পুড়ছিল, রাজা নিরো তখন বাঁশি বাজাচ্ছিল– ঠিক তেমনি নিরু। উপন্যাসটি থেকে বাঙালি পাঠক এই শিক্ষাই নেয় যে, অস্তিত্বের লড়াইয়ে যখন দেশ ও জনতা, তখন নির্লিপ্ততার আরেক নাম আত্ম-অবমাননা বলেই পরিত্যাজ্য।

প্র : তিনি কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭৭)।
প্র : তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ২০০৮ সালের ১৯শে জুলাই, রোববার দিবাগত রাত আড়াইটা; সে হিসেবে ২০শে জুলাই।

মীর মশাররফ হোসেন

প্র : মীর মশাররফ হোসেন কোথায়, কবে জন্মগ্রহণ করেন?
উ : কুষ্টিয়া জেলার লাহিনীপাড়া গ্রামে, ১৩১৭ বঙ্গাব্দের ১৮৪৭।
প্র : তাঁর পরিচয় কী?
উ : তিনি উপন্যাসিক, নাট্যকার ও পত্রিকাসম্পাদক।
প্র : তিনি কোন দুটি পত্রিকার সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করেন?
উ : কলকাতার সংবাদ প্রভাকর (১৮৩১) এবং কুমারখালির গ্রামবার্তা প্রকাশিকা (১৮৬৩)।
প্র : তাঁর সাহিত্যগুরু কে?
উ : কাঙাল হরিনাথ।
প্র : মশাররফ হোসেন সম্পাদিত পত্রিকা দুটো কী কী?
উ : আজীজনেহার (১৮৭৪) ও হিতকরী (১৮৯০)।
প্র : মশাররফ হোসেনের প্রথম গ্রন্থ কী?
উ : রত্নবতী (১৮৬৯)।
প্র : রত্নবতী রচনা করায় মশাররফ কী পেলেন?
উ : তিনি মুসলিমদের মধ্যে প্রথম গদ্যগ্রন্থ রচয়িতার মর্যাদা পেলেন।
প্র : 'রত্নবতী' গ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : মীর মশাররফ হোসেন রচিত প্রথম গ্রন্থ। এটি কোন মুসলিম রচিত প্রথম বাংলা গদ্যগ্রন্থ হিসেবে ঐতিহাসিকভাবে মূল্যবান। এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ২রা সেপ্টেম্বর ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে, কলিকাতা থেকে। লেখক নাম-পৃষ্ঠায় গ্রন্থটিকে 'কৌতুকাবহ উপন্যাস' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এটি রূপকথা জাতীয় শিক্ষামূলক একটি দীর্ঘ গল্প। রাজপুত্র সুকুমার ও মন্ত্রীপুত্র সুমন্তের মধ্যে 'ধন বড় না বিদ্যা বড়'-এ বিতর্ক এবং বিতর্কের সমাধানই 'রত্নবতী'র মূল বিষয়।
প্র : মশাররফ হোসেন রচিত একমাত্র প্রহসন সম্পর্কে লেখ।
উ : 'এর উপায় কি?' মীর মশাররফ হোসেন রচিত একমাত্র প্রহসন। উদ্দীপকের এক প্রেমিক সেক সে জীর প্রতি অবহেলা দেখিয়ে মদ ও পতিতাবৃত্তিতে আসক্ত হয়ে নানা ধরনের অন্যায় ও অনুচিত কাজ করে। নিবন্ধিত হয়েছিল- সেখক এই প্রহসনে সে কথা এমনই ঘটনায় তুলে ধরেছেন। স্বামী রামকান্ত, স্ত্রী সুকেশী, কন্যা নয়নতারা, ইয়ার সদল প্রমুখ নয় উদ্যোগেলো চরিত্র। প্রহসনটি প্রকাশ পায় ১৮৭৫ সালে, দ্বিতীয় প্রকাশ ঘটে সালে। সমকালে সমালোচনা হয়েছিল। এই প্রহসনে মধুসূদন সরকে একেই কি বলে সভ্যতা? প্রভাব রয়েছে।
প্র : 'বসন্তকুমারী নাটক' কবের পরিচয় দাও।
উ : মীর মশাররফের 'বসন্তকুমারী নাটক' (১৮৭৩)-এর বিষয়বস্তু ঐতিহ্য। রাজা বীরেন্দ্র সিংহের যুবতী স্ত্রী রেবতী সপত্নী-পুত্র নরেন্দ্র সিংহকে প্রেম নিবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হয় এবং ষড়যন্ত্র শুরু করে। এর পরিণামে সমগ্র রাজপরিবারটি ধ্বংসে হয়ে যায়। তিনটি অঙ্ক, নাটকীয় প্রস্তাবনাসহ তেরটি দৃশ্য; প্রস্তাবনায় একটিসহ সর্বমোট আটটি গান রয়েছে নাটকটিতে। নামকরণে মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'-এর প্রভাব আছে।
প্র : 'জমীদার দর্পণ' নাটকের পরিচয় দাও।
উ : অত্যাচারী ও চরিত্রহীন জমিদার হাসেমআলীর অত্যাচার এবং অধীনস্থ প্রজা আবু মোল্লার গর্ভবতী স্ত্রী মুরাদ্রোহাকে ধর্ষণ ও হত্যার কাহিনি 'জমীদার দর্পণ' (১৮৭৩)-এর মূল ঘটনা। মশাররফ হোসেন লিখেছেন, নাটকটির 'কিছুই সাজানো নয়, অবিকল ছবি তুলে ধরা হয়েছে প্রচলিত সমাজের। ওই সময় মুসলিমগণ বাংলা চর্চায় এগিয়ে এসেছে কমই। এই পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় নাটকটির প্রশংসা করে লিখেছেন, 'অনেক হিন্দুর প্রণীত বাঙ্গালার অপেক্ষা এই মুসলমান লেখকের বাঙ্গালা পরিশুদ্ধ'। নামকরণে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল-দর্পণে'র প্রভাব যেমন প্রবল, নাটকটির ঘটনাবিন্যাসেও এর কম ছায়া পড়ে নি।

2020/5/13 20:58
Scanned with CamScanner

প্র : 'বিষাদ-সিন্ধু' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : মশাররফ হোসেনের খ্যাতি মূলত এ গ্রন্থটির জন্যেই। 'বিষাদ-সিন্ধু' (১৮৮৫-৯১) একটি ইতি- স আশ্রিত উপন্যাস। হাসান ও হোসেনের সঙ্গে দামেস্ক অধিপতি মাবিয়ার একমাত্র পুত্র এজিদের কারবালা প্রান্তরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এবং ইমাম হাসান-হোসেনের করুণ মৃত্যুকাহিনি 'বিষাদ-সিন্ধু' গ্রন্থে বর্ণিত মূল বিষয়। মূল ঘটনার ঐতিহাসিক সত্যতা থাকলেও গ্রন্থটিতে ইতিহাসের অন্ধ অনুসরণ করা হয় নি। 'বিষাদ-সিন্ধু' উপন্যাসটি 'মহরম পর্ব' (১৮৮৫), 'উদ্ধার পর্ব' (১৮৮৭) ও 'এজিদ-বধ পর্ব' (১৮৯১) এই তিনটি পর্বে সম্পন্ন হয়েছে। গ্রন্থটি উপক্রমণিকা ও উপসংহারসহ মোট তেষট্টিটি 'প্রবাহ' অর্থাৎ অধ্যায় নিয়ে লিখিত। তন্মধ্যে 'মহরম পর্বে' উপক্রমণিকা ও ছাব্বিশটি প্রবাহ, 'উদ্ধার পর্বে' ত্রিশটি প্রবাহ, 'এজিদ-বধ পর্বে' পাঁচটি প্রবাহ ও উপসংহার-অংশ রয়েছে।

প্রথমত ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত স্পর্শকাতর কাহিনি সাধারণ মুসলিম পাঠকের কাছে এর জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ। দ্বিতীয়ত 'বিষাদ-সিন্ধু'র জাদুকরী রচনাগুণের জন্যে সাহিত্যরসিকজনের কাছেও গ্রন্থটি আদরণীয়। জয়নাবের রূপে বিমোহিত এজিদ এবং এই রূপতৃষ্ণার পরিণামে বহু মানুষের বিপর্যয় ও ধ্বংসের যে কথকতা বর্ণিত হয়েছে তা গ্রন্থটিকে সর্বজনীন করে তুলেছে। 'বিষাদ-সিন্ধু'র কাহিনিতে অ্যান্টি-এস্টাব্লিশমেন্ট চেতনা মূলত মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' থেকেই মশাররফ হোসেন গ্রহণ করেছেন।

প্র : 'গো-জীবন' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : মীর মশাররফ হোসেনের 'গো-জীবন' (১৮৮৯) একটি প্রবন্ধ পুস্তিকা। প্রবন্ধটির মূল বক্তব্য হলো, কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে যে কোনো কারণেই হোক গো-হত্যা অনুচিত। স্বীয় বক্তব্যের সমর্থনে লেখক ধর্মগ্রন্থ এবং প্রাত্যহিক-বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে নানা যুক্তি ও তথ্য পরিবেশন করেছেন। হিন্দু ও মুসলমান যে দু ধর্মাবলম্বীদের ঐক্যবদ্ধ করার মশাররফ হোসেন এ প্রবন্ধ তৎকালে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রতিক্রিয়ার জন্য সেন্ড। 'আখবারে এসলামিয়া' (১৮৮৪) প্রতিবাদ প্রকাশ করে এবং লেখকের মামলাতে জড়িয়ে পড়তে হয়। অবশেষে মৌলবাদী মুসলিমদের প্রবল চাপের মুখে তিনি 'গো-জীবন' প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন।

প্র : 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : 'উদাসীন পথিক' এই ছদ্মনামে মশাররফ হোসেন ব্যক্তিগত জীবনের শতাব্দীর স্বীয় পারিবারিক ইতিহাস ও সমকালীন বাস্তব ঘটনার চিত্র তুলে ধরেছেন এ গ্রন্থে। 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' (১৮৯৮) কে প্রকৃতপক্ষে উপন্যাস কিংবা আত্মজীবনীমূলক রচনা এর কোনোটাই বলা যায় না। বরং বলতে হয়, বাস্তব ও কাল্পনিক ঘটনার মিশেল উপন্যাসধর্মী সাহিত্যিক উপস্থাপনা। এতে লেখকের পারিবারিক ইতিবৃত্ত বর্ণনা এবং নিজ মাতা-পিতাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ হতে দেখা যায়। উদাসীন পথিকের মনের কথায় হিন্দু-মুসলমানের যে মিলন-বাসনা আছে, তার গভীর তাৎপর্য স্বীকার করতে হয়।

প্র : 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' (১৯০০) মশাররফ হোসেনের কর্মজীবন নির্ভর আত্মজীবনীমূলক রচনা। লেখক ব্যঙ্গের মাধ্যমে সমাজের অন্যায়, অনাচার, সামাজিক দুর্নীতি এবং সেই সমাজভুক্ত মানুষগুলোর নৈতিক অধঃপতন, মনুষ্যত্ব ও হৃদয়হীন আচরণ তুলে ধরেছে এ গ্রন্থে। লেখক নিজেকে 'ভেড়াকান্ত' নামে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া আলকাতরা সাগর, কটা পেস্কার, জয়ঢাক, ছিড়িয়া খাদুর, অরাজকপুর, নচ্ছারপুর, জমাবাজার

ইত্যাদি নামকরণের মধ্যেও লেখকের ব্যঙ্গের তীব্রতা লক্ষ করা যায়। এই ব্যঙ্গ সমাজের নির্বিশেষে, সকল কলুষ ও অনিয়মের বিরুদ্ধে। গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর প্রভাব লক্ষ করা যায়।

প্র : 'আমার জীবনী' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : 'আমার জীবনী' বার খণ্ডে সমাপ্ত। এগুলো পৃথকভাবে ১৯০৮ থেকে ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়। মীর মশাররফ হোসেনের আত্মজীবনমূলক রচনা 'আমার জীবনী'। কিন্তু গ্রন্থটিতে তাঁর পরিপূর্ণ জীবন কাহিনি বর্ণিত হয় নি। লেখকের জীবনের মাত্র আঠার বছরের ঘটনা ও কার্যক্রম এতে তুলে ধরা হয়েছে। যে বিচারে আত্মজীবনীটি অসমাপ্ত।

প্র : 'কুলসুম জীবনী' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : 'কুলসুম জীবনী' (১৯১০) গ্রন্থটিকে লেখক 'আমার জীবনীর জীবনী কুলসুম জীবনী' নামে অভিহিত করেছেন। এটি মশাররফ হোসেনের দ্বিতীয় স্ত্রী বিবি কুলসুমকে কেন্দ্র করে লিখিত। গ্রন্থটিতে লেখক বিবি কুলসুম সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। যেহেতু বিবি কুলসুম ও লেখক একে অপরকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন, সেহেতু বিবি কুলসুম প্রসঙ্গে বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক স্বাভাবিকভাবেই নিজের কথা বলেছেন। এদিক থেকে 'কুলসুম জীবনী' 'আমার জীবনী' গ্রন্থের পরিপূরক বলা চলে। এ কারণে 'আত্মজীবনী' না হয়েও গ্রন্থটি মশাররফ হোসেনের আত্মজীবনী-নির্ভর রচনার অন্তর্ভুক্ত।

প্র : তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা কোনটি?

উ : 'বিষাদ-সিন্ধু' (১৮৮৫-৯১) উপন্যাস।

প্র : 'গো-জীবন' (১৮৮৯) কেমন রচনা?

উ : প্রবন্ধগ্রন্থ। এই গ্রন্থ রচনার দায়ে তাঁকে মামলায় জড়িয়ে পড়তে হয়।

প্র : মীরের দুটি উল্লেখযোগ্য নাটকের নাম লেখ।

উ : 'বসন্তকুমারী' (১৮৭৩) ও 'জমীদার দর্পণ' (১৮৭৩)।

প্র : মীরের অন্যান্য নাটকগুলো হলো–

উ : 'বেহুলা গীতাভিনয়', 'টালা অভিনয়'।

প্র : মশাররফ হোসেন কোন সালে লিখতেন?

উ : গাজী মিয়াঁ।

প্র : 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' (১৯০০) কী ধরনের গ্রন্থ?

উ : আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসোপম রচনা।

প্র : মশাররফের দুটি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের নাম লেখ।

উ : 'আমার জীবনী' (১৯১০), 'কুলসুম জীবনী' (১৯১০)।

প্র : মীর মশাররফ হোসেনের বিশিষ্টতা কিসে?

উ : বিষয়ে নয়, বক্তিব্য সমকালে ভিন্ন পদশৈলীর জন্যই তিনি বিশিষ্ট।

প্র : মীর মশাররফ হোসেন সম্পাদিত পত্রিকার পরিচয় দাও।

উ : মীর মশাররফ হোসেন সম্পাদিত মাসিক 'আজীজন নেছার'। এই পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ সালে। মুসলমানদের সাহিত্যচর্চার জন্য পত্রিকা প্রকাশ ও সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে পত্রিকাটির যাত্রা শুরু হলেও মুসলমান পরিচালিত পত্রিকার লেখক ও পাঠকের অভাব সহ বিভিন্ন কারণে পত্রিকাটি বেশি দিন চলে নি। মনে করা হয়, মশাররফ হোসেন তাঁর প্রথম স্ত্রীর নামে এই পত্রিকার নামকরণ করেছিলেন। এই পত্রিকাটি বিলুপ্ত হলে তিনি 'হিতকরী' (১৮৯০) নামে অন্য একটি পক্ষাদ্বৃ পাক্ষিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

প্র : মীর মশাররফের মৃত্যুতারিখ কত?

উ : ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর।

'জমীদার দর্পণ' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'জমীদার দর্পণ' কত বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়?

উ : ১২৮০ বঙ্গাব্দে।

প্র : 'এগুলোন একটিও মানুষ না। এগুলোনের শরীরে যে গোস্তপিণ্ড দেখে আছে সেগুলোন মানুষের গোস্ত না। কুকুরের গোস্ত।'– কার সংলাপ?

উ : সিরাজ আলীর।

2020/5/13 20:58

Scanned with CamScanner

প্র : 'জমীদার দর্পণ' নাটকে অঙ্ক ও দৃশ্যসংখ্যা কত?
উ : তিন অঙ্ক আর ন্যাটি দৃশ্য।
প্র : কোন শতকের মুসলমান শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ছিলেন মীর মশাররফ হোসেন?
উ : ঊনবিংশ শতক।
প্র : 'তোমাকে আমি জেলের ঘাটি টালিয়ে ছাড়ব।'– কাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে-
উ : ফল্গু।
প্র : 'আপনি গরীবের বাপ-মা হুজুর'– কে উক্তিটি করেছে?
উ : আবু মোল্লা।
প্র : 'এরা টাকার লোভে দিনকে রাত আর রাতকে দিন করে।'– কারা করে?
উ : দারোগারা।
প্র : আবু মোল্লার কয় বিঘা জমি ছিল?
উ : দশ বিঘা।
প্র : 'হায় বিধি, পাকা আম দাঁড় কাকে খায়।'– কার সম্পর্কে বলা হয়েছে।
উ : নুরুন্নেহার সম্পর্কে।
প্র : 'বাঘে ছুঁলে সাত ঘা, আর জমিদারে ছুঁলে আঠারো ঘা'– উক্তিটি কার?
উ : জিতু মোল্লার।

মুনীর চৌধুরী

প্র : মুনীর চৌধুরীর জন্মসাল কবে?
উ : ২৭শে নবেম্বর, ১৯২৫।
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? পৈতৃক নিবাস কোথায়?
উ : মানিকগঞ্জ, ঢাকা; পৈতৃক নিবাস নোয়াখালি জেলায়।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : শিক্ষাবিদ, নাট্যকার, সমালোচক ও বাগ্মী।
প্র : ভাষা আন্দোলনের উপর রচিত তাঁর বিখ্যাত নাটকের নাম কী?
উ : 'কবর' (প্রকাশ : ১৯৬৬)।
প্র : 'কবর' কবে, কোথায় রচিত ও অভিনীত?
উ : ১৯৫৩ সালে ঢাকা জেলে রচিত ও রাজবন্দিদের দ্বারা অভিনীত।
প্র : কার অনুরোধে তিনি এই নাটক লেখেন?
উ : সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক বশেশ লাহিড়ীর অনুরোধে। ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রাক্কালে বন্দি বশেশ লাহিড়ী দাশগুপ্ত অন্যান্য মুনীর চৌধুরীকে অনুরোধ করেন, যদি জেলখানায় রাতের অন্ধকার অভিনয়যোগ্য করে একটি নাটক লিখা হয়। সে অনুসারেই 'কবর' নাটক রচিত। জেলে প্রথম অভিনীত।
প্র : তাঁর উদ্ভাবিত বাংলা টাইপ রাইটার-এর নাম কী?
উ : মুনীর অপটিমা।
প্র : তাঁর রচিত অন্যান্য প্রধান নাটকের নাম কী?
উ : রক্তাক্ত প্রান্তর (১৯৬২), চিঠি (১৯৬৪), কবর (১৯৬৬), দণ্ডকারণ্য (১৯৬৯), পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য (১৯৬৯)।
প্র : 'দণ্ডকারণ্য' গ্রন্থে কয়টি নাটক আছে?
উ : তিনটি (দণ্ড, দণ্ডধর, দণ্ডকারণ্য)।
প্র : রক্তাক্ত প্রান্তরের কাহিনি কোনগ্রন্থ থেকে নেয়া?
উ : কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান'।
প্র : তাঁর রচিত অনুবাদ নাটকগুলোর নাম কী?
উ : কেউ কিছু বলতে পারে না (১৯৬৭), রূপার কৌটা (১৯৬৯), মুখরা রমণী বশীকরণ (১৯৭০)।
প্র : তাঁর রচিত প্রবন্ধগ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : মীর মানস (১৯৬৫), তুলনামূলক সমালোচনা (১৯৬৯), বাংলা গদ্যরীতি (১৯৭০)।
প্র : 'রক্তাক্ত প্রান্তর'-এর পরিচয় দাও।
উ : 'রক্তাক্ত প্রান্তর' (১৯৬২) মুনীর চৌধুরী প্রথম পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের (১৭৬১) ঘটনা অবলম্বনে তিন অঙ্ক বিশিষ্ট এই নাটকটি রচিত। অবশ্য ইতিহাস থেকে তিনি কাহিনি গ্রহণ করেন নি, গ্রহণ করেছেন কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান' (১৯০৫) গ্রন্থ থেকে। 'রক্তাক্ত প্রান্তর' ঐতিহাসিক নাটক নয়,

ইতিহাস-আশ্রিত নাটক। এ নাটকে অনেক অনৈতিহাসিক চরিত্রের সমাবেশ আছে। আতা খাঁ, হিরণবালা, অমর চরিত্র ঐতিহাসিক নয়। নাটকে আছে : রাজনৈতিক মুসলিম যোদ্ধা ইব্রাহিম কার্দি মুসলিম শিবিরে চাকরি না পেয়ে মারাঠাদের কর্তৃক সমাদৃত হয় এবং চাকরি পায়। যুদ্ধ শুরু হলে ইব্রাহিম কার্দির স্ত্রী জোহরা মদ্দুবেশ ধারণ করে এসে স্বামীকে মুসলিম শিবিরে ফিরিয়ে নিতে চেষ্টা করে। বিশ্বাসঘাতকতা হবে বিবেচনা করে ইব্রাহিম কার্দি স্ত্রীকে ফিরিয়ে দেয় এবং জীবন দিয়ে মারাঠাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। অন্যদিকে জোহরা ধর্মের জন্য স্বামীসঙ্গ ত্যাগ করে, কিন্তু হিরণবালা মুসলিম প্রেমিককেই গ্রহণ করে। নাটকের নায়ক ইব্রাহিম কার্দি। তার জীবনের ট্র্যাজেডি নাটকটিকে ট্র্যাজিক করে তোলে।

প্র : 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটক রচনার প্রেক্ষাপট লেখ।
উ : ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার 'ন্যুরো অব ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন' (বিএনআর) নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল সাম্প্রদায়িক হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ইতিহাস থেকে মুসলিম উপাদান, মুসলিম মিথ, মুসলিম ব্যক্তিত্বদের জীবন ও কর্ম অবলম্বনে 'সাহিত্য' রচনা করা। এই এ্যাসাইনমেন্টের ভিত্তিতেই মুনীর চৌধুরী 'রক্তাক্ত প্রান্তর' (১৯৬২) লেখেন। তবে এ নাটকে তিনি যুদ্ধবিরোধী বাণীও প্রচার করেছেন। উল্লেখ্য, মুনীর চৌধুরী ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তান সরকারের দেয়া 'সিতারা-ই-ইমতিয়াজ' খেতাব গ্রহণ করেন। অবশ্য ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে খেতাবটি বর্জন করেছিলেন।

প্র : 'কবর' নাটকের পরিচয় দাও।
উ : 'কবর' (১৯৫৩) মুনীর চৌধুরীর একাঙ্ক নাটক। বাংলা ভাষা আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত এই নাটকে মুনীর চৌধুরী ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তান সরকার অর্থাৎ জেলে বন্দি করে। জেলে থাকা অবস্থায় তিনি রাজনৈতিক বন্দিদের উপর নির্যাতনের ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। মুনীর চৌধুরীকে এমনটি নাটক লিখতে বলেন, যা জেলখানাতেই রাজবন্দিরা অভিনয় করবেন। বশেশ লাহিড়ী মুনীর চৌধুরীকে গোপনে চিঠি লেখে এই লিখে : 'এমনি ধরনের নাটক লিখবে। মনে রাখবে রাত ১০টার পর জেলের বাতি নিভিয়ে দেবে। শতাধিক ভেন্টিলেটরে অভিনয় করা যায় এ ধরনের নাটক লিখবে। মনে রাখবে রাত ১০টার আগেতে যেন নাটকটি করা চলে আর মেয়ে চরিত্র এমনভাবে থাকে, যেন পুরুষদের দ্বারা তা অভিনয় করা চলে।' সেই অনুরোধ রক্ষা করে মুনীর চৌধুরী 'কবর' নাটক লেখেন এবং ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে কারান্তরালে রাজবন্দিরা তাকে অভিনয় করেন। উল্লেখ্য, এ নাটকে মুনীর চৌধুরী কোন নারী চরিত্রই রাখেন নি।

প্র : 'কবর' কোন নাটকের অবলম্বনে রচিত? এর কাহিনি লেখ।
উ : মার্কিন নাট্যকার Irwin Shaw রচিত Bury The Dead (১৯৩৬) নাটকের অনুসরণে এদেশীয় ঘটনা কেন্দ্র করে 'কবর' নাটক লেখা হয়েছে। সমাধি থেকে মানুষের আত্মার পুনরুত্থান ঘটে Bury The Dead নাটকে। 'কবর' নাটকে মিছিলে পুলিশ গুলিবর্ষণ করে শহরে কারফিউ দিয়ে লাশ গুম করতে গভীর রাতে কবরস্থানে নিয়ে যায়। পুলিশ ইন্সপেক্টর হাফিজ এবং নেতা (নাটকে তার নাম নেই) যৌথভাবে এ দায়িত্ব নেয়। কিন্তু লাশগুলো ছিন্নভিন্ন দেখে তারা ধর্মীয় প্রথা অনুসারে কবরস্থ না করে একত্র মাটিচাপা দেবার সিদ্ধান্ত হয়। এতে বাধা দেয় গোর-খোদক। কবরস্থানে আশ্রয় নেয়া আরেক স্বজনহারা পাগল মূর্খ ফকিরও প্রতিবাদ জানায়। বলে : এ

20/5/13 20:58

Scanned with CamScanner

লাশগুলো আশ্চর্যজনকভাবে। এরা এভাবে কবরে যাবে না। লাশগুলোও তখন উঠে দাঁড়াবে এবং বলে : আমরা কবরে যাবো না। এসব দেখে মন্যাশ ইন্সপেক্টর ও নেতা ভয় পেয়ে যায়। 'কবর' একুশের পটভূমিতে রচিত প্রথম বাংলা নাটক।

প্র : 'মানুষ' সম্পর্কে লেখ।

উ : 'মানুষ' (১৯৪৭) এক দৃশ্য বিশিষ্ট মুনীর চৌধুরীর নাটক। ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে নাটকটি রচিত। এক হিন্দু তরুণ ডাক্তার আত্মরক্ষার জন্য এক মুসলিম বাড়িতে প্রবেশ করে। সে বাড়িতে একজন অসুস্থ, অন্য একজন দাঙ্গায় মারা গেছে। ডাক্তার রোগীকে চিকিৎসা দেয়। এ সময় হিন্দু ডাক্তারের খোঁজে মুসলিম দাঙ্গাকারীরা ঘরে প্রবেশ করে। তখন গৃহকর্ত্রী মশারির নিচে অসুস্থ সন্তানের পাশে ডাক্তারকে আড়াল করে তার জীবন রক্ষা করে। এভাবেই মানুষ বা মানবতা বড় হয়ে দেখা দেয়। মানুষ নাটকের চরিত্রাবলি : ফরিদ, জুলেখা, বাবা, মা, ডাক্তার।

প্র : 'মুখরা রমণী বশীকরণ' নাটক সম্পর্কে লেখ।

উ : মুনীর চৌধুরী উইলিয়াম শেক্সপিয়রের *The Taming of The Shrew* (দি টেমিং অব দি শ্রু) অনুবাদ করেন 'মুখরা রমণী বশীকরণ' নামে (১৯৭০)। এটি সর্বাংশে কমেডি। পাঁচ অঙ্ক বিশিষ্ট। পদুয়া নামক স্থানের এক ধনী ব্যাপ্তিস্তার দুই কন্যা ক্যাথেরিনা ও বিয়াঙ্কা। ক্যাথেরিনা খুবই মুখরা নারী, বিয়াঙ্কা সুন্দরী। ভেরোনা নামক স্থানের যুবক পেট্রুশিও ক্যাথেরিনার দর্প চূর্ণ করে তার পাণিগ্রহণ করে। মুনীর চৌধুরী নিজেই বলেছেন : কাহিনিটি স্থূল। কিন্তু এতে যে হাস্যরস আছে তা সতেজ, সরস ও উপভোগ্য।

প্র : মুনীর চৌধুরীর নাটক 'দণ্ডকারণ্য' সম্পর্কে লেখ।

উ : 'দণ্ড', 'দণ্ডধর', 'দণ্ডকারণ্য' নামে তিনটি নাটক একত্রীকৃত করে ১৯৬৬ সালে 'দণ্ডকারণ্য' নামে গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। 'দণ্ড' একাঙ্ক কমেডি; ১৯৬০ সালে রচিত। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টিকারী উপাদান এক চোর দণ্ড বা লাঠির সাহায্যে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেলে সহসাই শান্তি আসে। এই সন্দেহ এবং লাঠির ব্যবহার নিয়ে হাস্যরসাত্মক নাটক 'দণ্ড'। এক ধনিক দম্পতি (নাম নেই) এবং মঞ্চের পেশাদার এক চোরচরিত্র– এই তিন চরিত্রের একাঙ্ক নাটক 'দণ্ড'। 'দণ্ডধর' ১৯৬৩ সালে রচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অনুষ্ঠান আয়োজন, সেই আয়োজন করতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রেম-অনুরাগ বা বিরোধ সৃষ্টি, একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের ভূমিকা ইত্যাদি 'দণ্ডধর' নাটকের বিষয়। আমিন, জাহানারা, রোকেয়া, অধ্যাপক এই নাটকের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। এটি একাঙ্ক কমেডি নাটক। 'দণ্ডকারণ্য' ১৯৬৫ সালে রচিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নাট্যকলার সংমিশ্রণে 'দণ্ডকারণ্য' রচিত হয়। একবার অরণ্য আবার নগর– পর্যায়ক্রমে চলতে থাকা এই দ্বিমাত্রিক মঞ্চসজ্জা সমকালে আকর্ষণীয় ছিল। পৌরাণিক আবহে রাম, লক্ষ্মণ, শূর্পণখা, সীতা ইত্যাদি চরিত্রকে মঞ্চে নিয়ে আসেন নাট্যকার। আবার সমকালের সঙ্গে তিনি যোজন এর যোগসূত্র। মুনীর চৌধুরী এ একাঙ্ক নাটকে ভারতীয় মিথকে সমকালীন জীবনবাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়েছেন।

প্র : তাঁর রচনাগুলোর জন্য তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?

উ : রক্তাক্ত প্রান্তর নাটকের জন্য বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬২), মীর মানস গ্রন্থের জন্য দাউদ পুরস্কার (১৯৬৫), সিতারা-ই-ইমতিয়াজ (খেতাব, ১৯৬৬)।

প্র : তাঁর মৃত্যুসাল কত?

উ : নিখোঁজ ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৭১।

'রক্তাক্ত প্রান্তর' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : প্রথম বাংলা রঙ্গমঞ্চের নাম ছিল–
উ : বেঙ্গল থিয়েটার।

প্র : 'রক্তাক্ত প্রান্তর' এর পটভূমি ছিল–
উ : পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ (১৭৬১)।

প্র : 'রক্তাক্ত প্রান্তর' কত অঙ্ক, কত দৃশ্যের নাটক?
উ : তিন অঙ্ক, আট দৃশ্য।

প্র : 'রাসুল মরে গেলে পচে যায়। বেঁচে থাকলে বদনাম।'– 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকে উক্তিটি কে করেছেন–
উ : নবাব সুজাউদ্দৌলা।

প্র : 'রক্তাক্ত প্রান্তর' এর লেখকের পেশা কী ছিল?
উ : অধ্যাপনা।

প্র : 'জোহরা' কার স্ত্রী?
উ : ইব্রাহিম কার্দির।

প্র : 'তারা ঘুমুচ্ছে ঘুমাক। কাল থেকে ঘুমের পালা কখন আসবে কে জানে।'– 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকে কে এই উক্তি করেন?
উ : জরিনা বেগম।

প্র : 'যত বড় ক্ষতি ততো বড় লাভ– এই তো জগতের নিয়ম।'– এ উক্তি কার?
উ : নজীবদৌলার।

প্র : 'আমরা হচ্ছি পাহারাদার। টুলি-পরা কদ্দুর বলদ।'–'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকে উক্তিটি কার?
উ : বশিরের।

প্র : 'এই শিবিরে তোমার আমার মাঝখানে আমার পিতার লাশ শুয়ে আছে।'– 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকে উক্তিটি কার?
উ : জোহরার।

প্র : 'রক্তাক্ত প্রান্তর' কোন ধরনের নাটক?
উ : ইতিহাস আশ্রিত।

প্র : 'হয়তো নারী মাত্রেই এ দুর্বলতার শিকার। স্নেহকে শৃঙ্খলে পরিণত করে। ভালবাসাকে মোহে, বন্ধনকে শিকারে।'– কে কাকে বলেছে?
উ : নজীব জরিনাকে।

প্র : 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকে আমরা কোন জন?
উ : ঐতিহাসিকতা, ঐতিহ্যে ও মূল্যবোধে চেতনা।

প্র : মুনীর চৌধুরী কোন গ্রন্থ থেকে 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকের সাহায্য ও তথ্য নিয়েছেন?
উ : কাছাকোনাল রচিত 'ময়াশগল' থেকে।

প্র : 'আমি পরীক্ষা করতে আসিনি, বরং করতে এসেছি।'– উক্তিটি কার?
উ : জোহরা বেগমের।

প্র : কোন কলেজে মুনীর চৌধুরী অধ্যাপক হিসেবে প্রথম যোগদান করেন?
উ : রাজশাহীর বি.এল. কলেজে।

প্র : সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উপর ভিত্তি করে মুনীর চৌধুরীর কোন নাটক রচিত হয়?
উ : 'মানুষ'।

প্র : পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ হয় কত সালে?
উ : ১৭৬১ সালে।

প্র : কোন যুদ্ধে মারাঠারা জয় লাভ করে?
উ : উদয়গড়ের যুদ্ধে।

প্র : 'তুমি পশু সে সেবতা– কার উদ্দেশ্য এ উক্তি করেছেন?
উ : নিলীপ।

প্র : 'আমার পক্ষে অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত উদাসীন থাকা অসম্ভব।'– কার উক্তি?
উ : নজীবউদ্দৌলা।

প্র : 'আমি কাপুরুষ'– কে বলে?
উ : ইব্রাহিম কার্দি।

প্র : 'মানুষের রক্তে পিয়াস মেটায় মানুষ'– কার উক্তি।
উ : রহিমের।

প্র : 'তাদের মরা চোখও মনুষ্যত্বের জ্বলকে ভুলবে না'– কাদের চোখ?
উ : বিউলির প্রান্তরে মৃত মারাঠা সৈনিকদের।

প্র : 'বাঘ তুমি এত কাণ্ড করতে পারবে আর আমি হাসতে পারবো না'– কে হাসতে পারবে না?
উ : হিরণ বালা।

প্র : 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটক রচনার জন্য তিনি কোন পুরস্কার লাভ করেন?
উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার।

প্র : 'নিজের নিয়তিকে আমি নিজের হাতেই গড়ে নেওয়ার পক্ষপাতী।'– কার উক্তি?
উ : নজীবউদ্দৌলার।

2020/5/13 20:59
Scanned with CamScanner

প্র : 'যা দেখেছি তা অবর্ণনীয়। লাশের ওপর লাশ।'– কে দেখেছে?
উ : আহমদ শাহ আবদালি।
প্র : 'জয় পরাজয় যাই হউক, মৃত্যু ভিন্ন আমার মুক্তির অন্য কোন পথ নেই।'– কে বলেছে?
উ : ইব্রাহিম কার্নি।
প্র : 'অন্ধকারটা খাঁটি, অকৃত্রিম। আলোটাই সত্য, আলোটাই স্থায়ী।'– কে বলেছে?
উ : জোহরা।
প্র : 'জোহরাকে নয়ন ভরে দেখে নিলাম। আসুক জরা, আসুক মৃত্যু, আর ভয় করি না।'– কার উক্তি, কার উদ্দেশে?
উ : ইব্রাহিম কার্নির। জোহরার উদ্দেশে।
প্র : আত্তা খাঁ কোন হিন্দু নাম নিয়ে পরিচয় গোপন করে?
উ : অমরেন্দ্র বাল্লালি।
প্র : 'আমি অস্ত্রধারী সৈনিক, আক্রমণ ভিন্ন অন্য ভাষা আমার কাছে দুর্বোধ্য।'– কে বলেছে?
উ : জোহরা / মনু বেগ।
প্র : যতো হিন্দু আর যতো মুসলমান এই যুদ্ধে প্রাণ দেয় পাক-ভারতের ইতিহাসে তেমন আর কোনোদিন হয় নি।– কোন যুদ্ধে?
উ : পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ (১৭৬১)।

মুস্তাফা মনোয়ার

প্র : মুস্তাফা মনোয়ার কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর ঝিনাইদহ জেলার মনোহরপুর গ্রামে।
প্র : তাঁর পিতার নাম কী?
উ : গোলাম মোস্তফা।
প্র : গোলাম মোস্তফা কে ছিলেন?
উ : একজন কবি ছিলেন।
প্র : মুস্তাফা মনোয়ার কোন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন?
উ : নারায়ণগঞ্জ (সরকারি) হাই স্কুল।
প্র : ম্যাট্রিক পাস করার পর তিনি কোথায় ভর্তি হন?
উ : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্কটিশচার্চ কলেজে, বিজ্ঞান শাখায়।
প্র : কার পরামর্শে তিনি বিজ্ঞান শাখা পরিত্যাগ করে চারুকলায় ভর্তি হন?
উ : সৈয়দ মুজতবা আলীর পরামর্শে তিনি কলকাতা আর্ট কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে তিনি স্নাতক হন।
প্র : কোথায় তিনি অধ্যাপনা করেন?
উ : ঢাকা চারুকলা কলেজে। এই কলেজে এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত একটি অনুষদ।
প্র : তিনি কোন কোন প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন?
উ : বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি।
প্র : তিনি কত খ্রিষ্টাব্দে 'একুশে পদক' লাভ করেন?
উ : ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে।
প্র : ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে কয়েক বছর তিনি কোন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন?
উ : বাংলাদেশ শিশু একাডেমির।
প্র : মুস্তাফা মনোয়ারের পরিচয় কী?
উ : তিনি চিত্রশিল্পী ও গণমাধ্যম-ব্যক্তিত্ব।
প্র : জনপ্রিয় মিনা কার্টুনের নির্মাতা কে?
উ : মুস্তাফা মনোয়ার।

'শিল্পকলার নানাদিক' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে'– গানটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন পর্যায়ের গান?
উ : পূজা পর্যায়ের।
প্র : গানটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত কর।
উ : 'আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে, / দিনরজনী কত অমৃতরস উথলি যায় অনন্ত গগনে ॥ / পান করে রবি শশী অঞ্জলি ভরিয়া– / সদা দীপ্ত রহে অক্ষয় জ্যোতি– / নিত্য পূর্ণ ধরা জীবনে কিরণে ॥ / বসিয়া আছ কেন আপন-মনে, / স্বার্থনিমগন কী কারণে? / চারিদিকে দেখো চাহি হৃদয় প্রসারি, / ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ মানি / প্রেম ভরিয়া লহো শূন্য জীবনে ॥'
প্র : এই গানটির মর্মার্থ কী?
উ : এই গানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানবের উদ্দেশে বলেছেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আনন্দের

পথটি রয়েছে। সূর্য, চন্দ্র সেই আনন্দে অবগাহন করে নিজেরা উজ্জ্বল হয়। মানুষ কেন ক্ষুদ্র স্বার্থের কথা চিন্তা করে নিজেকে নিজে ঘরের মধ্যে বন্দি হয়ে আছে? স্বার্থ, লোভ, দুঃখ ইত্যাদির কথা ভুলে গিয়ে বৃহৎ উন্মুক্ত করে মানুষ যদি জীবপ্রেম নিয়ে অন্য জীব তথা মানুষের কাছে আসে, তাহলেই তার জীবন আনন্দে পরিপূর্ণ হতে পারে।

প্র : আনন্দ কী?
উ : আনন্দ এক প্রকার অনুভব। এই অনুভব মানুষের একান্তই ব্যক্তিগত। তবে আনন্দ দুই প্রকার। সৎ কর্ম বা চিন্তা থেকে জাত আনন্দ এবং অসৎ কর্ম বা অসৎ চিন্তা থেকে জাত আনন্দ। সৎ কর্ম বা চিন্তা থেকে জাত আনন্দকে 'সদানন্দ' বলে। এই আনন্দই মানুষের প্রার্থিত।
প্র : আনন্দকে কিভাবে বোঝা যায়?
উ : রূপ- রস- শব্দ- স্পর্শ- গন্ধ ইত্যাদির সাহায্যে, ইন্দ্রিয়সমূহের সাহায্যে।
প্র : ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়সমূহ কোনগুলো?
উ : চোখ, কান, জিভ, নাক, ত্বক।
প্র : শিল্পী কে?
উ : যিনি শিল্প সৃজন করেন তিনিই শিল্পী।
প্র : শিল্প কী?
উ : ইংরেজিতে ইন্ডাস্ট্রি (industry) ও আর্ট (art) বলে দুটো শব্দ আছে। দুটোর অর্থই শিল্প। এখানে শিল্প বলতে আর্ট (art)কে বোঝান হচ্ছে। আর্ট বা শিল্পের কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞার্থ নেই। তবে মানবমনে সংবেদনশীল অনুভব সৃজনের মাধ্যমে সদানন্দধারা প্রবাহের উৎসকে শিল্প বলা যেতে পারে। সে দিক থেকে প্রকৃত গল্প, কবিতা, গান, নাচ, নাটক, ছবি, চলচ্চিত্র সবই শিল্প হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

প্র : 'শিল্পকলা' কী?
উ : 'কলা' শব্দটিরও নানা অর্থ আছে। এর একটি অর্থ দক্ষতা, নৈপুণ্য বা বিদ্যা। যখন 'কলা' শব্দটি 'শিল্প' শব্দের সঙ্গে বসে তখন তা শিল্পের দক্ষতা বা নৈপুণ্য বোঝায়। যেমন: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজনই। কিন্তু তাঁর মুখমণ্ডল যে শিল্পীরা এঁকেছেন কোনোটার সঙ্গে কি কোনোটার মিল আছে? এমন কি রবীন্দ্রনাথ যে নিজের 'আত্মপ্রকৃতি' এঁকেছেন সেগুলোও ভিন্ন ভিন্ন। এতটা বৈসাদৃশ্যের এই যে বিচিত্র রকম– এই বৈচিত্র্যতা সৃষ্টি হয়েছে 'কলা'র কারণে।
প্র : 'চিত্রকলা' কী?
উ : ছবি আঁকার এবং ছবি সম্পর্কে জানার কলা বা বিদ্যা।
প্র : 'ভাস্কর্য' কী?
উ : পাথর বা ধাতবাদি খোদাই করে অথবা মূর্তি-সিমেন্ট নিশ্রিত করে মূর্তি নির্মাণ। ইংরেজিতে একে 'ভাস্কর্যের (sculpture) বলে।
প্র : 'নৃত্যকলা' কী?
উ : বিভিন্নভাবে নাচবার এবং নাচ সম্পর্কে জানা ও ধারণা গ্রহণের কলা বা বিদ্যা।
প্র : 'সংগীতকলা' কী?
উ : বিভিন্নভাবে গান গাইবার এবং গান সম্পর্কে জানা ও ধারণা গ্রহণের কলা বা বিদ্যা।
প্র : 'অভিনয়কলা' কী?
উ : বিভিন্নভাবে অভিনয় করার এবং অভিনয় সম্পর্কে জানা ও ধারণা গ্রহণের কলা বা বিদ্যা।
প্র : 'স্থাপত্য' কী?
উ : এখানে স্থাপত্যশিল্পকে বোঝান হয়েছে। ঘর-বাড়ির নির্মাণ কাজকে 'স্থাপত্যশিল্প' বলে। যেমন: ময়মনসিংহে শহরের কোনো কোনো প্রাচীন দালানে চিনা স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায়।
প্র : পুরাকাল কী?
উ : প্রাচীনকাল।
প্র : 'পুরা' শব্দটি কিভাবে এসেছে?
উ : পূর্ব > পুরব > পুরা। (তৎসম > অর্ধতৎসম > তদ্ভব)
প্র : ছন্দ কী?
উ : সহজ ভাষায় বলতে, ছন্দ হলো গতির ভাব। মানুষের চলবার গতি সব সময় এক থাকে না, কবিতারও এক থাকে না, কথা বলারও এক থাকে না। এই গতিভিন্নতাই হলো ছন্দ। ইংরেজিতে একে metre বলা হয়। (*বাংলা কবিতার ছন্দ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য: এই গ্রন্থের 'ছন্দ-প্রকরণ' অধ্যায়।)

2020/5/13 20:59
Scanned with CamScanner

প্র : 'তোমাদের এখন সুন্দরের নিয়ম জানতে হবে না, সুন্দর দেখলেই সুন্দর বলবে।'– এই বাক্য দিয়ে লেখক কী বুঝিয়েছেন?

উ : শিল্প নিয়ম মেনে সৃষ্টি করতে হয় ঠিকই কিন্তু শিল্প উপভোগ করতে নিয়ম মানতে হয় না। বরং সুন্দরকে সুন্দর বলে মেনে নেওয়া শেখাটাই আগে দরকার। সে সুন্দর যদি অপরের গুণে, কথায়, আচরণে, বক্তব্যে, জীবনযাপনে প্রকাশ পায় তা হলেও যেন সহজে মেনে নেওয়ার মানসিকতা তৈরি হয়। এতে নিজের অসুন্দরগুলো ক্রমে ক্রমে একদিন হারিয়ে যাবে এবং আমরা সবাই সুন্দর হয়ে উঠবো।

প্র : নন্দনতত্ত্ব কী?

উ : সুন্দরকে জানার জন্য যে জ্ঞান তাকেই নন্দনতত্ত্ব বলে।

প্র : নন্দনতত্ত্বের আরেক নাম কী?

উ : সৌন্দর্যতত্ত্ব।

প্র : 'তত্ত্ব' অর্থ কী?

উ : স্বরূপ বা কাঠামো।

প্র : 'নন্দনতত্ত্ব'-এর ইংরেজি কী?

উ : Aesthetics (ইস্‌থিটিকস্)

প্র : 'যে কাজ সকলকে আনন্দ দেয় খুশি করে–' সে কাজ কেমন?

উ : সে কাজ 'সুন্দর'।

প্র : প্রয়োজন এবং সুন্দরের সমন্বয় করা যায় কিভাবে?

উ : প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজন মেটানো এবং সৌন্দর্যের কখনো সমন্বয়ের অভাব দেখা দিতে পারে। যেমন, আঁকার কাজে একটি পেন্সিল আমার প্রয়োজন। সাদামাটা একটি পেন্সিল হলেও আঁকাটা চলে। আবার খুবই সুদৃশ্য দামি পেন্সিল বাজারে আছে– তা কেউ কিনে তার লেখনীদানিতে সাজিয়ে রাখতে পারে। এ দুয়ের সমন্বয় হতে পারে, প্রাত্যহিক আঁকার কাজে অপেক্ষাকৃত কম দামি কিন্তু একটু সুন্দর পেন্সিল কেনা। এজন্য যা করতে হবে তা হলো, দু-একটি দোকানে খোঁজ নেওয়া। এর জন্য সময় দিতে হবে, খোঁজার মানসিকতাও থাকতে হবে। এভাবে সময় প্রদান ও মানসিকতার সংযোগে প্রয়োজন ও সুন্দরের সমন্বয় ঘটানো যায়।

প্র : প্রয়োজন এবং সুন্দরের সমন্বয় আসলে জরুরী হয় কোনটি?

উ : সুন্দর।

প্র : কেন সুন্দর জরুরী হয়?

উ : কারণ তখন প্রয়োজন মিটলো, এটা সবার থাকে না– মনে থাকে সুন্দরকে।

প্র : প্রয়োজনের কাজ কিসের মধ্যে লীনভাবে?

উ : শরীরের মধ্যে।

প্র : প্রয়োজনের কাজের বাইরে যা– তা কি?

উ : তা-ই সুন্দর।

প্র : তাহলে সুন্দর কি অপ্রয়োজনীয়?

উ : অপ্রয়োজনেরও প্রয়োজন আছে। সবার অপ্রয়োজন না থাকলে প্রয়োজনটা বোঝা যায় না।

প্র : ছবি আঁকাকে কী শেখা বলে?

উ : দেখা শেখা।

প্র : 'বিষয়বস্তু' কী?

উ : যার ওপর বস্তুটি মূলত নির্ভরশীল। যেমন, 'গ্রাম'-এর বিষয়বস্তু মানুষ, নদী, গরু, পাখি, ধানক্ষেত ইত্যাদি। 'বিদ্যালয়'-এর বিষয়বস্তু হলো– ভবন, শিক্ষার্থী, শিক্ষক ইত্যাদি। এই বিষয়বস্তু দিয়ে গ্রাম বা বিদ্যালয়ের একটি রচনাও লেখা যাবে, একটি ছবিও আঁকা যাবে আবার নক্সা করা বা সিমেন্ট জমিয়ে একটি ভাস্কর্যও নির্মাণ করা যাবে।

প্র : চিত্রকলার মাধ্যম কী?

উ : কালি, কলম, জল-রং, প্যাস্টেল রং, তেল মিশ্রিত রং ইত্যাদি।

প্র : প্যাস্টেল রং কী?

উ : প্যাস্টেল একটি ইংরেজি শব্দ (pastel), যার অর্থ চিত্রাঙ্কনে ব্যবহৃত রঙিন খড়ি (চক)। এই রঙিন খড়িকে প্যাস্টেল রং বলে।

প্র : জল-রং কী?

উ : সামান্য জল মেশালে যে রং সহজেই আঁকার উপযোগী হয় তাকেই জল-রং বলে।

প্র : পুরাতন পুঁথি কী?

উ : যখন কাগজ আবিষ্কার হয় নি তখন মানুষ তালপাতা বা গাছের বাকলে নানা রকমের কালি ব্যবহার করে লিখতো। সেগুলো এখনো কোথাও কোথাও রক্ষিত আছে। এগুলোকেই পুরাতন পুঁথি বলা হচ্ছে।

প্র : সংস্কৃতি বা কালচার কী?

উ : সংস্কৃতির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো কালচার (culture)। কোনো অঞ্চলের মানুষের প্রথা, আচরণ, পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, জীবনযাপন প্রণালি, ধর্ম ইত্যাদির সম্মিলনকেই এক কথায় সংস্কৃতি বা কালচার (culture) বলে।

প্র : 'কালি কলম মন, লেখে তিন জন'– এটা কী?

উ : প্রবাদ।

প্র : 'কালি' দিয়ে কী বোঝায়?

উ : দেশের ঐতিহ্যের বহু বছরের স্রোতধারা।

প্র : 'কলম' দিয়ে কী বোঝায়?

উ : শিল্পসৃষ্টির বর্তমান সরঞ্জাম; যেমন– সাহিত্যিকের জন্য কলম, খাতা, চিত্রশিল্পীর জন্য রং, তুলি, ক্যানভাস ইত্যাদি।

প্র : 'মন' দিয়ে কী বোঝায়?

উ : বর্তমান যুগরুচির সঙ্গে 'কালি' বা ঐতিহ্যের সম্মিলন করার মানসিকতা।

প্র : 'কালি কলম মন, লেখে তিন জন'– দিয়ে লেখক কী বোঝাতে চেয়েছেন?

উ : যে অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ অতীত ঐতিহ্য থাকবে, শিল্পীদের জন্য প্রয়োজনীয় ও আধুনিক উপাদান থাকবে এবং শিল্পীদের অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক ভাবনার মিলন করার ইচ্ছা ও দক্ষতা থাকবে– সে অঞ্চলে অমর শিল্প সৃষ্টি হবে।

প্র : আমাদের দেশ কি 'কালি কলম মন, লেখে তিন জন'-এর শর্ত পূরণ করে?

উ : করে।

প্র : তাহলে আমাদের দেশে আর কী প্রয়োজন?

উ : শিল্পকলাচর্চার ধারা অব্যাহত রাখা।

মুহম্মদ আবদুল হাই

প্র : মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের জন্ম কবে, কোথায়?

উ : ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে নবেম্বর, পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে।

প্র : তিনি কত সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে লেকচারার হিসেবে যোগ দেন?

উ : ১৯৪৯ সালে।

প্র : লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কী নিয়ে গবেষণা করেন?

উ : ধ্বনিবিজ্ঞান।

প্র : তিনি কোন পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন?

উ : ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে থেকে প্রকাশিত 'সাহিত্য পত্রিকা'র (তখন ত্রাসাসিক) প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক।

প্র : কোন গ্রন্থটি রচনার জন্য তিনি 'ধ্বনিবিজ্ঞানী'?

উ : ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব (১৯৫৪)।

প্র : কোন গ্রন্থ রচনার জন্য তিনি সমালোচিত?

উ : সৈয়দ আলী আহসানের সঙ্গে 'আধুনিক সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (১৯৬৮) গ্রন্থ লিখে। কেননা, এ গ্রন্থে সম্প্রদায়গত দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ করা হয়েছে। লেখকদের যথাযথ মূল্যায়ন করা হয় নি। নামসর্বস্ব মুসলিম লেখকদের নিয়ে অতিকথা ও অতি উচ্ছ্বাস আছে। আর গুরুত্বপূর্ণ অমুসলিম লেখকদের সম্পর্কে আছে নির্লিপ্ততা।

প্র : তাঁর বিখ্যাত ভ্রমণ-গ্রন্থের নাম লেখ।

উ : 'বিলাতে সাড়ে সাতশ দিন' (১৯৫৮)।

প্র : পাকিস্তান সরকার রেডিও-টিভিতে রবীন্দ্র সংগীত প্রচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে এ বিষয়ে তাঁর অবস্থান কী?

উ : ১৯৬৭ সালে পাকিস্তান সরকার রেডিও-টিভিতে রবীন্দ্র সংগীত প্রচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে তিনি এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন।

প্র : তিনি কত সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার পান?

উ : ১৯৬১ (প্রবন্ধ ও গবেষণার জন্য)।

প্র : তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে লেখ।

উ : ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা জুন ঢাকা মতিঝিলবাগের রেলক্রসিংয়ে কাটা পড়ে তিনি মারা যান। অনেকে মনে করেন, কর্মক্ষেত্রে উদ্ভূত বিশেষ অবস্থার কারণে তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন।

মুহম্মদ এনামুল হক

প্র : মুহম্মদ এনামুল হকের জন্ম কত সালে?

উ : ১৯০২।

প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : বখতপুর গ্রাম, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

20/5/13 20:59
Scanned with CamScanner

প্র: তাঁর রচিত সাহিত্যকর্মগুলো কী কী?
উ: চট্টগ্রামী বাঙ্গালার রহস্যভেদ, আরাকান রাজসভার বাঙ্গালা সাহিত্য, বঙ্গে সুফী প্রভাব, ব্যাকরণ মঞ্জরী, মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, মনীষা মঞ্জুষা (১ম ও ২য় খণ্ড)।
প্র: তিনি তাঁর রচনাগুলোর জন্যে কী কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ: বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৪), প্রেসিডেন্ট পুরস্কার (১৯৬৬), সিতারা ই ইমতিয়াজ পুরস্কার (১৯৬৬), একুশে পদক (১৯৭৯), শেরে বাংলা সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮০), মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮১)।
প্র: তিনি কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?
উ: ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৮২; ঢাকা।

'বাংলা নববর্ষ' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র: 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের রচয়িতার নাম কী?
উ: মুহম্মদ এনামুল হক।
প্র: 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধটির মূল নাম কী?
উ: 'বাংলা নববর্ষ বা পয়লা বৈশাখ'।
প্র: 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধটি লেখকের কোন গ্রন্থের অন্তর্গত?
উ: 'মনীষা মঞ্জুষা'। ('মনীষা মঞ্জুষা' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড থেকে 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধটি সংকলিত।)
প্র: 'ট্রেডিশন' বলতে কী বোঝায়?
উ: ঐতিহ্য; দীর্ঘদিন ধরে চলে এসেছে এমন রীতি।
প্র: 'নববর্ষ' মানে কী?
উ: নতুন বছরের আগমন উপলক্ষে অনুষ্ঠিতব্য উৎসবের প্রথম দিন।
প্র: পৃথিবীর সব নতুন বছর কী একই সময়ে আরম্ভ হয়?
উ: না।
প্র: পৃথিবীময় চালু ছিল বা আজো চালু আছে কী?
উ: অব্দ বা বছর।
প্র: 'নববর্ষ উপলক্ষে প্রতিপালিত অনুষ্ঠানগুলোকে মোটামুটি কয়ভাগে ভাগ করা যায়?
উ: দুভাগে। (সর্বজনীন অনুষ্ঠান ও স্থানীয় অনুষ্ঠান)
প্র: বাংলা নববর্ষের 'সর্বজনীন অনুষ্ঠান' বলে চিহ্নিত করা হয় কোন অনুষ্ঠানকে?
উ: যে সমস্ত অনুষ্ঠান 'স্থান' ও 'শ্রেণি' সংক্রান্ত নয়।
প্র: 'আল্লা মেঘ দে, পানি দে' বলে চাষারা কোন অঞ্চলের মানুষ?
উ: উত্তরবঙ্গের।
প্র: 'চৈত্র মাসে শস্য বুনলে সে শস্য জন্ম না।'—এটি কী ধরনের ধারণা?
উ: লৌকিক ধারণা।
প্র: উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর জেলায় বৈশাখ মাসে সবচেয়ে বড় মেলা কোথায় বসে?
উ: নেকমর্দানে।
প্র: 'পুণ্যাহ' শব্দের মৌলিক অর্থ কী?
উ: পুণ্য কাজ অনুষ্ঠানের পক্ষে জ্যোতিষ শাস্ত্রানুমোদিত প্রশস্ত দিন।
প্র: জমিদার কর্তৃক প্রজাদের কাছ থেকে নতুন বছরে খাজনা আদায় করার প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানসূচক দিনকে কী বলা হয়?
উ: পুণ্যাহ।
প্র: 'ঐতিহ্য' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত?
উ: সংস্কৃত।
প্র: 'হালখাতা' কী?
উ: পয়লা বৈশাখের একটি সর্বজনীন আচরণীয় রীতি। নতুন বাংলা বছরের হিসাব পাকাপাকিভাবে টুকে রাখার জন্য ব্যবসায়ীদের নতুন খাতা খোলা এক আনুষ্ঠানিক উদ্যোগ।
প্র: বাঙালির কোন দুটি অনুষ্ঠান একই অনুষ্ঠানের ওপিঠ-এপিঠ?
উ: পুণ্যাহ ও হালখাতা।
প্র: পৃথিবীব্যাপী নর-নারী নববর্ষে কী অনুভব করে?
উ: জীবন ধারনের একটা কালচক্র সম্পূর্ণ আবর্তিত এবং আর একটা কালচক্র সবে আবর্তনোদ্যত।
প্র: নববর্ষের অনুষ্ঠানে কীসের প্রাধান্য লাভ করে?
উ: আশা, নিরাশা, আনন্দ, উল্লাস অথবা ধর্ম।
প্র: বাংলাদেশের চাষীরা বৈশাখ মাসে কোন জাতের ধান চাষ করে?
উ: আমন।

প্র: পয়লা বৈশাখ বাঙালিকে কিসের আহ্বান জানায়?
উ: প্রতিবছর সুখ-দুঃখ ভুলে নতুনের আহ্বান।

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন

প্র: মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের জন্মসন কত?
উ: ৫ই জানুয়ারি, ১৯০৪।
প্র: তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ: ফুলবাড়িয়া, পাবনা।
প্র: তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ: লোকসাহিত্য বিশেষজ্ঞ, লেখক ও শিক্ষাবিদ।
প্র: তিনি কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?
উ: মাসিক মাহেনও (১৯৪৯)।
প্র: তিনি কী ছিলেন?
উ: বাংলা লোকসাহিত্য সংগ্রাহক।
প্র: তাঁর লোক সংগীতের সংকলন গ্রন্থের নাম কী?
উ: হারামণি (১ম–১০ম খণ্ড)।
প্র: হারামণি নামটি দেন কে?
উ: রবীন্দ্রনাথের কাছে গেলে তিনি মনসুর উদ্দীনের সংগ্রহের এই নাম দেন।
প্র: তাঁর অন্য প্রকাশিত গ্রন্থগুলো কী?
উ: শিরনী (১৯৩১), ধানের মঞ্জুরী (১৯৩৩), আখরবাতী (১৯৩৮), বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা (১৯৬৬) ইত্যাদি।
প্র: তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ: বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৫) ও একুশে পদক (১৯৮৩)।
প্র: তিনি কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?
উ: ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭।
প্র: শিক্ষকতা জীবনে তাঁর সাথে আর কোন কোন প্রতিষ্ঠান যুক্ত ছিল?
উ: শিক্ষকতা জীবনে তাঁর নাম আরও দুটি প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হয়েছিল। সেগুলো হলো— সাহিত্য সংসদ, বাংলা একাডেমি ও পাকিস্তান।
প্র: তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ: ভাষাবিদ, ভাষাবিজ্ঞানী, গবেষক ও শিক্ষাবিদ।
প্র: তাঁর গবেষণা কর্মগুলো কী কী?
উ: সিদ্ধা কাহ্নপার দীক ও দোহা, বাঙলা সাহিত্যের কথা, বৌদ্ধ মর্মবাণী গান, ভাষাতত্ত্ব : ভাষা ও সাহিত্য, বাংলা ব্যাকরণ, বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত।
প্র: তাঁর রচিত প্রথম পুস্তকগুলোর নাম কী?
উ: ইকবাল (১৯৪৫), আমাদের সমস্যা (১৯৪৯), বাংলা আদব কি তারিখ (১৯৫৭), Essays of Islam : Traditional culture in East Pakistan.
প্র: তাঁর রচিত অনুবাদগ্রন্থগুলো কী?
উ: দীওয়ানে হাফিজ (১৯৩৮), অমিয় শতক (১৯৪০), জবাইয়াত ই ওমর খায়াম (১৯৪২)।
প্র: কার পরামর্শে তিনি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে ভর্তি হন?
উ: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পরামর্শ মেনে শহীদুল্লাহ্ তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগে ভর্তি হয়ে ১৯১২ সালে এম.এ. পাস করেন। আশুতোষবাবু শহীদুল্লাহ্কে জার্মানিতে যাবার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করে দেন। দুঃখের বিষয়, স্বাস্থ্যগত কারণে তিনি সে সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন নি।
প্র: আশুতোষ ভট্টাচার্য শহীদুল্লাহ্র জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন– কথাটি সত্যি?
উ: শহীদুল্লাহ্কে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগে ভর্তি করানোর অনুপ্রেরণা, জার্মানিতে বৃত্তির ব্যবস্থা করা ছাড়াও আশুতোষবাবু শহীদুল্লাহ্র জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বদল করিয়েছিলেন। ১৯১২ সালে এম.এ. পাস করে শহীদুল্লাহ্ বঙ্গবাসী স্কুলে শিক্ষকতা নিয়েছিলেন। ১৯১৪ সালে আইনে স্নাতক হয়ে তিনি শিক্ষকতা ছেড়ে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন। ১৯১৯ সালে

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

প্র: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র জন্মতারিখ কবে?
উ: ১০-৭-১৮৮৫।
প্র: তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ: পেয়ারা, চব্বিশ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ।
প্র: তাঁর পিতা ও মাতার নাম কী?
উ: মফিজউদ্দীন আহমদ ও হুরুন্নেসা।

2020/5/13 20:59
Scanned with CamScanner

আশুতোষ ভট্টাচার্য শহীদুল্লাহ্‌কে ডেকে এনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎকুমারী লাহিড়ী গবেষণা-সহায়ক (রিসার্চ এসিসটেন্ট) পদে নিয়োগদান করেন। সেই সূত্রেই পরে তিনি আবার শিক্ষকতায় ফিরে আসেন। আশুতোষবাবুর এই নিয়োগ শহীদুল্লাহ্‌র জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্র : তিনি কবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে যোগ দেন?

উ : ১৯২১ সালের ২রা জুন।

প্র : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত কিভাবে?

উ : ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে একই বছর এর 'সংস্কৃত ও বাংলা' বিভাগের (তখন এভাবেই বিভাগের নাম ছিল) লেকচারার হন। ১৯৪৪ সালে তিনি রিডার পদে (বর্তমান মান সহযোগী অধ্যাপক) থাকা অবস্থায় অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৪৮ সালে সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক হিসেবে আবার যোগদান এবং ১৯৫৪ পর্যন্ত একই পদে তিনি কর্মরত ছিলেন। ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত ফরাসি ভাষার খণ্ডকালীন শিক্ষক ছিলেন। ১৯৬৭ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৪০ সালে তিনি ফজলুল হক মুসলিম হলের প্রথম প্রভোস্ট হন। ১৯৫৩-'৫৪ শিক্ষাবর্ষে তিনি ছিলেন কলা অনুষদের নির্বাচিত ডিন।

প্র : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত কিভাবে?

উ : ১৯৫৫ সালে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ ও কলা অনুষদের ডিন ছিলেন। ১৯৫৮ সালে করাচিতে যাবার আগ পর্যন্ত তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ছিলেন।

প্র : বাংলা একাডেমি প্রকাশিত কোন অভিধানের তিনি প্রধান সম্পাদক?

উ : বাংলা একাডেমি আঞ্চলিক ভাষার অভিধান।

প্র : 'আমরা হিন্দু বা মুসলমান হয়ে জন্মাবার তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি।' পাকিস্তান আমলে এই উক্তি কার কে?

উ : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌।

প্র : তাঁর সংকলিত ও সম্পাদিত দুটি গ্রন্থের নাম কী?

উ : পদ্মাবতী (১৯৫০), প্রাচীন পুঁথির নবী (১৯৫২), গল্প সংকলন, দুই খণ্ড প্রকাশিত আঞ্চলিক ভাষার অভিধান।

প্র : তিনি কী কী পত্রিকা সম্পাদনা করেন?

উ : আঙুর (১৯২০), দি ডন (১৯২৬), বঙ্গভূমিক (১৯৩৭), তরুমীর (১৯৪৭)।

প্র : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর নামে একটি হাস্টাবাস রয়েছে—এর পূর্ব নাম কী?

উ : ঢাকা হল।

প্র : বিবিসির জরিপকৃত (২০০৪) সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় তাঁর স্থান কত?

উ : ষোড়শ।

প্র : তিনি কী কী সম্মানজনক পদ ও পদকে করেন?

উ : প্রথম ইমেরিটাস প্রফেসর পদ (১৯৬১), প্রাইড অব পারফরম্যান্স এবং নাইট অ দি অর্ডারস অব আর্টস অ্যান্ড লেটার্স পদ

প্র : তিনি কোন সম্মান গ্রহণ করতে পারেন কেন?

উ : পাকিস্তান সরকার অনুমতি না দেওয়া ১৯৬২ সালে তিনি ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ কালচারাল রিলেশন (আইসিসিআর)-এ দেওয়া সম্মান গ্রহণ করতে পারেন নি।

প্র : শেষজীবনে তিনি কী চর্চা করতেন?

উ : শেষজীবন শুরু হওয়ার আগেই, মধ্যজীব থেকে তিনি ভাষাতত্ত্বচর্চা বাদ দি ইসলামচর্চা ও তা প্রসারে আত্মনিয়ো করেছিলেন।

প্র : তিনি কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?

উ : ১৩ই জুলাই, ১৯৬৯।

'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধ থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'পল্লিসাহিত্য' কোন জাতীয় রচনা?

উ : প্রবন্ধ। (১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে কিশোরগ জেলায় 'পূর্ব ময়মনসিংহ সাহি সম্মিলনী'র একাদশ অধিবেশনে

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ সভাপতি হিসেবে যে অভিভাষণ দেন তারই পুনর্লিখিত রূপ 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধটি।)

প্র : ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে পল্লিসাহিত্যের সংগ্রহ ও সংরক্ষণ জরুরি কেন?

উ : জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঠিক পরিচয় প্রদানের জন্য।

প্র : 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে লেখক কী আবেদন জানিয়েছেন?

উ : পল্লিসাহিত্যকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার।

প্র : পল্লির পরতে পরতে কী ছড়িয়ে আছে?

উ : সাহিত্য।

প্র : ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে কতজন মনীষীর নাম উচ্চারণ করেছেন?

উ : ছয় জন।

প্র : কোন কোন মনীষীর নাম 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে?

উ : ড. দীনেশচন্দ্র সেন, রোঁমা রোঁলা, শেকসপিয়র, দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (যদিও এ নামটি সরাসরি নেই, তাঁকে বলা হয়েছে বিশ্ববরেণ্য কবিসম্রাট), মনসুর বয়াতি।

প্র : ড. দীনেশচন্দ্র সেন কী সংগ্রহ করেছিলেন?

উ : মৈমনসিংহ-গীতিকা।

প্র : রোঁমা রোঁলা কে?

উ : ফরাসি দেশের কালজয়ী সাহিত্যিক ও দার্শনিক। (রোঁমা রোঁলার (১৮৬৬-১৯৩৯) অমূল্য কীর্তি 'জাঁ ক্রিস্তফ'। এ গ্রন্থের জন্য তিনি ১৯১৫ খ্রি. সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান)

প্র : 'মদিনা বিবি' কে?

উ : মৈমনসিংহ-গীতিকায় অন্তর্ভুক্ত লোকগাথা 'দেওয়ানা-মদিনা'র নায়িকা।

প্র : কার মতো পল্লিকবি শহুরে চক্ষুর অন্তরালে পল্লিতে আত্মগোপন করে আছে?

উ : মনসুর বয়াতি।

প্র : পল্লির অচেনা-অজানা কবিদের গাথা সংগ্রহ করে প্রকাশ করলে কী হত বলে প্রাবন্ধিক মনে করেন?

উ : দেখা যেত মুসলমানও সাহিত্য সম্পদে কত ধনী।

প্র : 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে কোন কোন উপমহাদেশের আদর্শ রচনা উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে?

উ : আলাওয়ালের আদর্শ রচনা, আরাকান ও চট্টগ্রাম দরবার।

প্র : আধুনিক শিক্ষার কবলাশ্রয়ে বিসর্জিত অতীত হারিয়ে যাচ্ছে কী?

উ : পল্লির উপকথাগুলো।

প্র : একালের শিক্ষিত জননী তার সন্তানকে কিসের গল্প শোনান না?

উ : রাবাল আর পিঠা গাছের কথা, তাকক-পুরীর দুরন্ত রাজকন্যার কথা বা পক্ষিরাজ ঘোড়ার কথা শোনান না।

প্র : আধুনিক কালের শিক্ষিত জননী তার সন্তানকে কী ধরনের গল্প শোনান?

উ : আরব্য উপন্যাসের গল্প কিংবা Lamb's Tales from Shakespeare-এর গল্পের অনুবাদ।

প্র : বাংলার সমস্ত রূপকথা সংগৃহীত হলে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার কী দেখা দেবে?

উ : বাংলার নিভৃত কোণের কোনো গল্প ভারতীয় উপমহাদেশের অন্য প্রান্তে কিংবা উপমহাদেশের বাইরে সিংহল, সুমাত্রা, কাম্বা, কম্বোডিয়া প্রভৃতি স্থানে তা প্রচলিত আছে।

প্র : 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে কোন কোন উপমহাদেশের নাম উল্লেখ করা হয়েছে?

উ : এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা।

প্র : Folklore Society কী?

উ : যে সমিতি লোকশিল্প ও গান, উৎসব-অনুষ্ঠান ও খেলাধুলার উপাদান সংগ্রহ করে এবং প্রচারের জন্য নানা কাজ করে থাকে। এ সমিতি লোকসাহিত্য সংরক্ষণ ও গবেষণার কাজে নিয়োজিত।

প্র : Folklore Society-এর উদ্ভাবক কে?

উ : উইলিয়াম থমস।

প্র : Folklore Society সর্বপ্রথম কোথায় গঠিত হয়?

উ : লন্ডনে। (১৮৪৮ সালে লন্ডনে Folklore Society সর্বপ্রথম গঠিত হয়।)

প্র : 'ঠাকুরমার ঝুলি'র সংগ্রাহক কে?

উ : দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার।

Scanned with CamScanner

প্র : 'হাউ, ঘাউ, খাঁউ মানুষের গন্ধ পাঁউ'-এর সঙ্গে ইংরেজি কোন বুলির সাদৃশ্য পাওয়া যায়?

উ : Fi, fie, foh, fum! I smell the blood of a British man.

প্র : 'দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা নেই'— এটি কী?

উ : প্রবাদ।

প্র : 'কলা কয়ে না কোটো পাত / তাতেই কাপড় তাতেই ভাত'— এটি কার কথা?

উ : খনার।

প্র : জাতির পুরনো ইতিহাসের অনেক গোপন কথা কোথায় খুঁজে পাওয়া যায়?

উ : প্রবাদ বাক্য, ডাক ও খনার বচনে।

প্র : কোন প্রবাদ বাক্যটি পাদুয়ার কথা মনে করিয়ে দেয়?

উ : পিঁড়েয় বসে পেঁড়োর খবর।

প্র : খনা কে?

উ : প্রাচীন ভারতের প্রখ্যাত মহিলা জ্যোতিষী। তাঁর প্রকৃত নাম দীলাবতী। বাংলাদেশের জলবায়ু নির্ভর কৃষিতত্ত্ব বিষয়ে উপদেশমূলক খনার ছড়াগুলো অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত বলে ধারণা করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্গত বারাসাত মহকুমার দেউলি গ্রামে তাঁর নিবাস ছিল বলে জনশ্রুতি আছে।

প্র : 'পাদুয়া' কী?

উ : প্রাচীন বঙ্গের রাজধানী।

প্র : ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে 'সরস প্রাণের জীবন্ত উৎস' বলতে কী বুঝিয়েছেন?

উ : প্রবাদবাক্য, ডাক ও খনার বচন, ঘুমপাড়ানী গান এবং খোকা-খুকির ছড়াকে।

প্র : কখন কপাটি খেলার প্রচলন ছিল?

উ : যখন ফুটবল, ব্যাটবলের নামও কারো জানা ছিল না।

প্র : পল্লির মাঠে-ঘাটে কী ছড়িয়ে আছে?

উ : জারি, ভাটিয়ালি, রাখালি, মারফতি গানের অফুরন্ত ভাণ্ডার।

প্র : আজকাল বাংলা সাহিত্য বলে যে সাহিত্য চলছে তা কোন ধরনের সাহিত্য?

উ : পনের আনা শহুরে সাহিত্য।

প্র : ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ শহুরে সাহিত্যকে সাধুভাষায় কী বলেছেন?

উ : নাগরিক সাহিত্য।

প্র : কোন সাহিত্যে জেলে-মাঝি, মুটে-মজুর, কৃষকের কথা নেই?

উ : নাগরিক সাহিত্যে।

প্র : পাড়াগাঁয়ের জীবন কাদের কাছে অজানা রাজ্য?

উ : শহরে লোকদের।

প্র : 'বাসাম' অর্থ কী?

উ : বইয়ের খণ্ড। ইংরেজি Volume।

প্র : Proletariat সাহিত্য কী?

উ : অত্যাচারিত শ্রমজীবী মুমূর্ষু মানুষের সাহিত্য।

প্র : 'অবোধদর্শন' অর্থ কী?

উ : গ্রন্থের দেখা ও শোনার মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা।

প্র : ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন কে?

উ : বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষক ও সাধক। তিনিই সর্বপ্রথম 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে বাংলাদেশের লোকসাহিত্যের গৌরব ও মর্যাদা সাহিত্যের দরবারে তুলে ধরেন। (এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য বর্তমান গ্রন্থে 'দীনেশচন্দ্র সেন' অংশ)।

প্র : 'মৈয়মনসিংহ-গীতিকা'র সংগ্রাহক কে?

উ : চন্দ্রকুমার দে।

প্র : 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র সংগ্রাহক ও সম্পাদকের নাম কী?

উ : চন্দ্রকুমার দে ও ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন।

প্র : 'রামায়ণী কথা', 'জড়ভরত', 'বেহুলা' গ্রন্থগুলোর লেখক কে?

উ : ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন।

প্র : সাহিত্যের এক অমূল্য খনি কোথায় লুকিয়ে আছে?

উ : গ্রামবাংলার মায়েদের বুকের কোনে।

প্র : ময়মনসিংহের মদিনা বিবির সৌন্দর্যে কে মুগ্ধ হয়েছিলেন?

উ : পশ্চিমের সাহিত্যরসিক রোমাঁ রোলাঁ।

প্র : রোমাঁ রোলাঁ কে ছিলেন?

উ : ফরাসি নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, শিল্পচর্চাকারী। ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল। তিনি মহাত্মা গান্ধী, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী লিখেছিলেন। শেষজীবনে রোমাঁ রোলাঁ আন্তর্জাতিকতায় আস্থাশীলতায় ভরপুর এবং ভারতীয় অধ্যাত্মভাবে তাঁকে পরমভাবে প্রভাবিত করে।

প্র : আধুনিক শিক্ষার কর্মনাশা স্রোতে অতল গর্ভে কী তলিয়ে যাচ্ছে?

উ : পল্লির লোককথা তলিয়ে যাচ্ছে।

প্র : পল্লিকবিদের শিক্ষিত জননীরা সন্তানকে আর রাখালের পিঠা গাছের কথা, রূপসুন্দরীর ঘুমন্ত রাজকন্যার কথা বা পক্ষিরাজের ঘোড়ার কথা শোনান না তাই এগুলো স্রোতের অতল গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে।

প্র : রচিত পুরান ইতিহাস অনেক গোপন কথা কথা মধ্যে লুকিয়ে আছে?

উ : প্রবাদ বাক্য এবং ডাক ও খনার বচনে।

প্র : নাগরিক সাহিত্য কী?

উ : শহরে সাহিত্য।

প্র : 'Proletarian' সাহিত্য কী?

উ : ধনবানদের সাহিত্যকে প্রলেতারিয়েত সাহিত্য বলে।

প্র : পল্লিসাহিত্য কেন আজ ধ্বংস হচ্ছে?

উ : সময়-রুচির পরিবর্তনের কারণে।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

প্র : মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের জন্মসন কত?

উ : আনুমানিক ১৭৬২।

প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?

উ : লেখক। পরে উইলিয়াম কেরীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী।

প্র : তাঁর রচিত গ্রন্থাবলির নাম কী?

উ : বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২), হিতোপদেশ (১৮০৮), রাজাবলী (১৮০৮), বেদান্তচন্দ্রিকা (১৮১৭) ও প্রবোধচন্দ্রিকা (১৮১৩)।

প্র : 'বত্রিশ সিংহাসন' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার অনূদিত কাহিনি সংকলন।

শাসন সালের [illegible]

প্র : তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম কী?

উ : বাংলা ভাষায় [illegible]

প্র : কার্যকর পুঁথিতে [illegible]

প্র : তিনি কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?

উ : ১৮২৯।

মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরী

প্র : মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরীর জন্ম কত সালে?

উ : ১৮৩৩।

প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : কাঞ্চনপুর, নোয়াখালি।

প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?

উ : শিক্ষাবিদ।

প্র : তিনি কোন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?

উ : বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন।

প্র : তাঁর রচিত পদ্যগ্রন্থগুলোর নাম কী?

উ : সংস্কৃতি-কথা (১৯১৮), সদ্ভাব (১৯২৩) ও সুখ (১৯২৮)।

প্র : তিনি সংস্কৃতি সম্পর্কে মন্তব্যসহ ও মানববাণী সংজ্ঞার্থ দেন কোন গ্রন্থে?

উ : সংস্কৃতি-কথা।

প্র : মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরীর সংস্কৃতি-ভাবনার পরিচয় দাও।

উ : মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরী সংস্কৃতি ও শিক্ষা এ দুটো বিষয় নিয়ে ভেবেছেন। তবে সংস্কৃতি নিয়েই তিনি ভেবেছেন বেশি। শিক্ষা সম্পর্কেও তাঁর প্রচুর বিবেচনা এক অর্থে সংস্কৃতি-ভাবনার অঙ্গ। শিক্ষার উপযোগিতা ও অন্তর-সাধন দুটোই তিনি ভেবেছেন। শিক্ষাগ্রহণ করে মাছ-ভাত জোগাড়ের ব্যবস্থা করতে হবে বটে কিন্তু মনুষ্যত্বের বিকাশ ব্যবস্থা করতে নয়। মনুষ্যত্বের বিকাশ বলতে তিনি বোঝাতেন সুসংস্কৃত হওয়াকে আর এটাই তাঁর সংস্কৃতিভেতনা। তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধের বইয়ের নাম 'সংস্কৃতি-কথা'; আর এখানের প্রথম প্রবন্ধের নামও ঐ একই। এই একটি প্রবন্ধ বুঝে পড়লে সংস্কৃতি

Scanned with CamScanner

নিয়ে বাঙালির আর অন্য কোনো পাঠ নেওয়ার দরকার নেই। 'সংস্কৃতি' বলতে সমাজবিজ্ঞান বা নৃবিজ্ঞানে যা বোঝানো হয় মোতাহের হোসেন চৌধুরী সেই প্রচলিত কথা বলে নি। তিনি বলেছেন, কোনো সমাজের সংঘশ্চাঠীর সামষ্টিক কর্মকাণ্ডেই সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটে। নিষ্ঠাকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং বলেছেন, নিষ্ঠার সঙ্গে সাধনা করলেই সংস্কৃতি উপভোগের ক্ষমতা জন্মে। আর নিষ্ঠার জন্য চাই উন্নত রুচিবোধ সৃষ্টি। ধর্মকে তিনি 'পুরো' সংস্কৃতি বলেন নি, বলেছেন সংস্কৃতির 'অঙ্গ'। তাই তাঁর বক্তব্য, ধার্মিক হওয়া মানে আংশিক সংস্কৃতিমান হওয়া; আর সংস্কৃতিমান হওয়া মানে পুরো ধার্মিক হওয়া। পাকিস্তানের যে সময় তিনি এই বক্তব্য উল্লেখ করেছিলেন, কালের বিচারে তা ছিল যথেষ্ট সাহসী। আর তাঁর সংস্কৃতি-ভাবনা আজকের বন্ধ্যা সময়ে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়।

প্র : তিনি আর কী রচনায় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন?

উ : কবিতা রচনায়।

প্র : তাঁর মৃত্যু তারিখ কবে?

উ : ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬।

'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধ থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : সংসারটা আজ কিসে পরিপূর্ণ?

উ : স্থূলবুদ্ধি ও জবরদস্তিপ্রিয় মানুষে।

প্র : জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে না তুলে অন্যের ক্ষতি মানুষ কেন করে?

উ : প্রেম ও সৌন্দর্যের স্পর্শ লাভ করে নি বলে। এজন্য এরা নিষ্ঠুর ও বিকৃতবুদ্ধি।

প্র : প্রাবন্ধিক জীবনের সার্থকতা কোথায় খুঁজেছেন–

উ : বৃক্ষের মাঝে।

প্র : তপোবনপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ জীবনের গতি খুঁজেছেন কোথায়?

উ : নদীর গতিতে। উল্লেখ্য তিনি নদীকেই মনুষ্যত্বের প্রতীক ভেবেছেন।

প্র : মানুষের জীবনের সাধনা কী হওয়া উচিত নয়?

উ : অনাবরত ধেয়ে চলা।

প্র : বৃক্ষের মাঝে রবীন্দ্রনাথ কী দেখেছেন?

উ : অন্তরের সৃষ্টি ধর্ম।

প্র : বৃক্ষ বৃদ্ধি ছাড়া আর কিসের ইঙ্গিত দেয়?

উ : প্রশান্তির। শান্ত ও সহিষ্ণুতার সে জীবনের ভার বহন করে।

প্র : 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধটি কোন গ্রন্থ থেকে নেয়া?

উ : 'সংস্কৃতি' কথা।

প্র : অহংকার কাদের প্রদান দেবতা?

উ : বিচার বিবেচনা ও চিন্তা চেতনাহীন লোকদের।

'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধটির রচয়িতার নাম কী?

উ : মোতাহের হোসেন চৌধুরী।

প্র : 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধটি প্রবন্ধকারের কোনগ্রন্থ থেকে সংকলিত?

উ : 'সংস্কৃতি-কথা'।

প্র : 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক মানুষের জীবনকে কীসের সঙ্গে তুলনা করেছেন?

উ : দোতলা ঘরের সঙ্গে।

প্র : জীবসত্তার ঘর থেকে মানবসত্তার ঘরে উঠবার মই কী?

উ : শিক্ষা।

প্র : 'ক্ষুৎপিপাসা'র ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর।

উ : ক্ষুধা ও পিপাসা — দ্বন্দ্ব সমাস।

প্র : 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক কোনটিকে অভিনন্দনযোগ্য মনে করেছেন?

উ : অন্নচিন্তার নিগড় থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টাকে।

প্র : প্রচুর অন্নবস্ত্র পেলে আলো-হাওয়ার যন বঞ্চিত মানুষ কোন স্থানকে স্বর্গতুল্য মনে করে?

উ : কারাগারকে।

প্র : অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্যের চেয়েও মুক্তি বড়' — এই বোধটি কিসের পরিচায়ক?

উ : মানুষের মনুষ্যত্বের বলে প্রাবন্ধিক মনে করেন।

প্র : কোথায় মুক্তি নেই?

উ : যেখানে চিন্তার, বুদ্ধির ও আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা নেই।

প্র : কিসের জন্য মনুষ্যত্বের সাধনা ব্যর্থ হওয়া অসম্ভব নয়?

উ : অন্নবস্ত্রের দুশ্চিন্তায়।

প্র : অর্থচিন্তায় ব্যস্ত মানুষ কী অর্জনে অক্ষম?

উ : প্রকৃত মনুষ্যত্ব।

প্র : প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জনে সক্ষম নয় কারা?

উ : অর্থচিন্তায় ব্যস্ত মানুষ।

প্র : 'লেফাফাদুরস্তি আর শিক্ষা এক কথা নয়।' — উক্তিটি কার?

উ : মোতাহের হোসেন চৌধুরীর।

প্র : 'লেফাফা' অর্থ কী?

উ : চিঠি আবৃত করার খাম।

প্র : 'লেফাফাদুরস্তি' অর্থ কী?

উ : বাইরে ঠিকঠাক ভেতরে ফাঁকা।

প্র : শিক্ষার আসল কাজ কী?

উ : মূল্যবোধ সৃষ্টি।

প্র : 'জ্ঞান' কী?

উ : মূল্যবোধ সৃষ্টির উপায়মাত্র।

প্র : কিসের মাধ্যমে মূল্যবোধ তথা মনুষ্যত্ব লাভ করা যায়?

উ : শিক্ষার।

প্র : কিসের ফলে মানুষের আত্মিক মৃত্যু ঘটে?

উ : লোভের ফলে।

প্র : অন্নচিন্তা মানুষের কোন সত্তার অন্তর্ভুক্ত?

উ : জীবসত্তা।

প্র : 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক শিক্ষার কী রকম সুফল প্রত্যাশা করেছেন?

উ : ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক।

প্র : সহজে দানাপানি পাওয়ার লোভে বাঁচায় বন্দি না হওয়াটা কোন সত্যকে প্রমাণ করে?

উ : অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্যের চেয়ে মুক্তি বড়।

মোহাম্মদ মজমদার চৌধুরী

প্র : মোহাম্মদ মজমদার চৌধুরীর জন্ম কবে?

উ : ২২শে জুলাই, ১৯০১।

প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : পটিলাপুর, বেলঘরিয়া, চব্বিশ পরগনা।

প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?

উ : অধ্যাপক ও লেখক।

প্র : তিনি কী হিসেবে সুনাম অর্জন করেন?

উ : প্রাবন্ধিক ও গবেষক হিসেবে।

প্র : তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর নাম কী?

উ : বাংলা বানান ও লিপি সংস্কার, রবি পরিক্রমা, রঙ্গিন আবং, Colloquial Bengali, সাহিত্যের নবরূপায়ণ।

প্র : তিনি কী কী পুরস্কার ও পদক লাভ করেন?

উ : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সার আশুতোষ স্বর্ণপদক ও রবীন্দ্র বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন।

প্র : তাঁর মৃত্যুতারিখ কবে?

উ : ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ নিখোঁজ হন।

মোহাম্মদ আকরম খাঁ

প্র : মোহাম্মদ আকরম খাঁর জন্মতারিখ কবে?

উ : ৭ই জুন, ১৮৬৮।

প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : হাকিমপুর, চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।

প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?

উ : সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ।

প্র : কত সালে তাঁর সম্পাদনায় 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়?

উ : ১৯০৩।

প্র : তাঁর সম্পাদিত দুটি স্বল্পস্থায়ী দৈনিক পত্রিকার নাম কী?

উ : উর্দু দৈনিক 'জামানা' (১৯২০) ও দৈনিক সেবক (১৯২১)।

প্র : তাঁর সাংবাদিক জীবনের কীর্তি কী?

উ : 'আজাদ' পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা (১৯৩৬, সালের ৩১শে অক্টোবর থেকে)।

Scanned with CamScanner

প্র : তিনি কোন কোন ভাষায় বুৎপন্ন ছিলেন?
উ : আরবি, উর্দু, পারসি ও সংস্কৃত ভাষায়।
প্র : রবীন্দ্রবিতর্কে তাঁর অবস্থান কী?
উ : তিনি রবীন্দ্রবিতর্কে পাকিস্তান সরকারের পক্ষাবলম্বন করেন।
প্র : তাঁর রচিত গদ্যগ্রন্থগুলো কী কী?
উ : হজরত মোহাম্মদ-এর জীবনী 'মোস্তফা চরিত' (১৯২৩), 'মোসলেম বাংলার সামাজিক ইতিহাস' (১৯৬৫) ইত্যাদি।
প্র : তিনি কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ১৮ই অগাস্ট, ১৯৬৮।

মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী

প্র : মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরীর জন্ম তারিখ কত?
উ : ১৮ই কার্তিক ১২৯৫ (১৮৮৮)।
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : তৎকালীন ফরিদপুর বর্তমান রাজবাড়ি জেলার পাংশার মাগরাডাঙ্গা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
প্র : তিনি কোথায় লেখাপড়া করেন?
উ : রাজবাড়ি সূর্যকুমার ইন্সটিটিউট থেকে এন্ট্রান্স পাস; কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : সাহিত্যিক ও সাংবাদিক।
প্র : তিনি কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?
উ : মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'কোহিনূর'।
প্র : তিনি কোন সমিতির প্রতিষ্ঠাতাদের একজন ছিলেন?
উ : বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি (৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯১১)।
প্র : তাঁর রচনার মূল উপজীব্য কী ছিল?
উ : ইসলামি দর্শন ও সংস্কৃতি। কিন্তু হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি।
প্র : কর্মজীবনে তিনি কী ছিলেন?
উ : শিক্ষক এবং সাংবাদিক।
প্র : তাঁর সম্পাদিত পত্রিকাগুলোর নাম কী?
উ : মাসিক 'কোহিনূর'; মাসিক 'সাহিত্যিক' (কবি গোলাম মোস্তফা সহযোগে)।
প্র : তাঁর সৃষ্টিতালি কেমন ছিল?
উ : ইসলামের প্রতি তিনি ছিলেন সরল। এ সরল নিয়েই হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলা না উর্দু এই বিতর্কে তিনি বাংলার পক্ষাবলম্বন করেন।
প্র : তাঁর রচিত গ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : 'ধর্মের কাহিনী' (১৯১৪), 'সুরেন্দ্র-মুকুট' (১৯১৮), 'শান্তিধারা' (১৯১৯), 'অশ্রু-মুকুট' (১৯২২)।
প্র : তিনি কবে কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ১৯৪০ সালের ১৫ই ডিসেম্বর, ফরিদপুরে।

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

প্র : মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ২৮শে ভাদ্র ১৩০৩ (১৮৯৬) বসাদে সাতক্ষীরা জেলার বাঁশদহ গ্রামে।
প্র : তাঁর পিতার নাম কী?
উ : মুনশী মোহাম্মদ ইব্রাহিম।
প্র : তিনি কোন পর্যন্ত লেখাপড়া করেন?
উ : স্থানীয় স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস করে কলকাতা বঙ্গবাসী কলেজে ভর্তি হন। সাংবাদিকতার জন্য লেখাপড়া ছাড়েন।
প্র : তিনি কোন কোন পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?
উ : সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, দৈনিক মোহাম্মদী, দি মুসলমান; দৈনিক সেবক, সাপ্তাহিক খাদেম, সাপ্তাহিক সওগাত, দ্বিমাসিক সাম্যবাদী। এসব পত্রিকা তখন কলকাতা থেকে বের হতো। ওয়াজেদ আলী কলকাতাতেই অবস্থান করতেন।
প্র : কত সালে তিনি কলকাতা থেকে বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে চলে আসেন, কেন?
উ : ১৯৩৫ সালে। চলে আসার একটি কারণ, মোহাম্মদী ও আজাদ পত্রিকার সম্পাদক মওলানা আকরম খাঁর সঙ্গে তিনি আশরাফ-আতরাফ বিষয়ে দ্বন্দ্বে জড়িত

পড়েছিলেন। আকরম খাঁ ছিলেন খুবই রক্ষণশীল ব্যক্তি। অন্য কারণ, নিজের খারাপ নয়।
পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বিতর্কে তাঁর অবস্থান কী?
উ : তিনিই রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে মত দেন।
প্র : বোম্বাই ওয়াজেদ আলীর পরিচয় কী?
উ : তিনি মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী লেখক। ইসলামিক আদর্শ, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ তিনি লালন করতেন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তাঁর প্রিয় নেতা ছিলেন।
প্র : তাঁর রচিত গ্রন্থাবলির নাম লেখ :
উ : মহামানুষ মুহম্মদ (১৯৪০); মরুভাস্কর হজরত মোহাম্মদের জীবনী, ১৯৪১); হজরত মোহাম্মদ (ছোটদের জন্য জীবনী, ১৯৪৮); কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (১৯৪৯); মণিচয়নিকা (১৯৫১)।
প্র : কবে, কোথায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ১৯৫৪ সালের ৮ই নবেম্বর, সাতক্ষীরার বাঁশদহে।

মুহম্মদ (স.) থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী রচিত 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধটি লেখকের কোন গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত?
উ : মরু ভাস্কর (১৯৪১)।
প্র : 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় কী?
উ : মানুষ হিসেবে হযরত মুহম্মদ (স.)-র বৈশিষ্ট্যের আলোচনাই এ প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য।
প্র : মদিনায় আঁধার ঘনিয়ে এল কেন?
উ : হযরত মুহম্মদ (স.)'র মৃত্যুর কথা প্রচারিত হওয়ায়।
প্র : 'রে বলিবে হযরত মরিয়াছেন, তাহার মাথা যাইবে।'—উক্তিটি কার?
উ : হযরত ওমরের।
প্র : হযরত মুহম্মদ (স.)-এর সহাধ্যায়ীর পেশা পর্যন্ত কে ছিলেন?
উ : আবু বকর।
প্র : হযরত আবু বকর মুহূর্তে মুসলমানদের কী বুঝিয়ে ছিলেন?
উ : হযরত মুহম্মদ রসুল, তিনি মানুষ, তিনিও জীবন-মৃত্যুর অধীন।
প্র : হযরত মুহম্মদ (স.) কিভাবে বন্ধুদের মন আকর্ষণ করেছিলেন?
উ : মানবীয় গুণাবলি দ্বারা।
প্র : হযরত মুহম্মদ (স.) আবাল্য কেমন ছিলেন?
উ : আল-আমিন-বিশ্বস্ত, বিশ্বাসী, সত্যবাদী।
প্র : হযরতকে দেখে মানুষ অবাক হয়ে যেত?
উ : তাঁর অসাধারণ যোগ্যতা, দৃষ্টি, বিচারশক্তি ও বলিষ্ঠ দেহ দেখে।
প্র : মক্কা থেকে মদিনা হিজরতের সময় হযরত যে কুটিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন সেই কুটির-স্বামীর নাম কী?
উ : আবু আইয়ুব।
প্র : আবু আইয়ুবের স্ত্রীর নাম কী?
উ : উম্মে আইয়ুব।
প্র : শত্রুর নিষ্ঠুরতম নির্যাতন কার জন্যের পৌরুষপাটে আহত হয়ে ফিরে যেত?
উ : হযরত মুহম্মদ (স.)।
প্র : 'তিনি দীর্ঘ নন, খর্ব নন, কৃশ নন—এই 'তিনি' কে?
উ : হযরত মুহম্মদ (স.)।
প্র : 'এদের জান দাও প্রভু, এদের ক্ষমা কর।'—এটি কার উক্তি?
উ : হযরত মুহম্মদ (স.)।
প্র : হযরত মুহম্মদ (স.) পাপী মানুষকে কী করতেন?
উ : ভালোবাসতেন।
প্র : হযরত মুহম্মদ (স.) কোথায় সত্য প্রচার করতে গিয়ে ভীষণ পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন?
উ : তায়েফে।
প্র : 'মানুষের দ্বারে দ্বারে সত্যের বাণী বহন করা আমার কাজ।'—কার কাজ?
উ : হযরত মুহম্মদ (স.)।

Scanned with CamScanner

প্র : 'তানঈম' কোথায় অবস্থিত?
উ : মৌলি আরবের দক্ষিণাঞ্চলের একটি উর্বর প্রদেশ।
প্র : 'তোমার পরাজয় যদি নিয়তি প্রসূত, হীন আমি, তুচ্ছ আমি, নির্বল আমি, তাহা বহন করিবার শক্তি আমায় দাও।'—উক্তিটি কার?
উ : হযরত মুহম্মদ (স.)।
প্র : 'বিপদবারণ তুমি, অশরণের শরণ তুমি'— 'তুমি' বলতে কার কথা বলা হয়েছে?
উ : সৃষ্টিকর্তা; আল্লাহ।
প্র : মক্কাবাসীরা কাদের হত্যা করার জন্য ঘাতক পাঠিয়েছিল?
উ : হযরত মুহম্মদ (স.) এবং হযরত আবু বকরকে।
প্র : ইসলাম ও মুসলিমের চিহ্ন মুছে ফেলতে চেয়েছিল কারা?
উ : মক্কার বাসিন্দা এবং তাদের মিত্রজাতিরা।
প্র : কোন কোন যুদ্ধে মক্কাবাসীরা পৃথিবী থেকে ইসলামের চিহ্নটুকু পর্যন্ত মুছে ফেলতে চেয়েছিল?
উ : বদর, ওহোদ ও আহযাব (খন্দক)-এর যুদ্ধে।
প্র : কোন যুদ্ধে হযরতের মৃত্যু সম্ভাবনায় মক্কাবাসীরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিল?
উ : বয়বরের যুদ্ধে।
প্র : কোন সন্ধিতে মুসলমানদের কাঁধে ঘোর অপমানের শর্ত চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল?
উ : হুদায়াবিয়া সন্ধিতে।
প্র : খালিদ কে?
উ : হযরত মুহম্মদ (স.)-এর জীবিতকালে ইসলামের প্রখ্যাত বীর যোদ্ধা ও সেনাপতি।
প্র : 'সাফা' কোথায়?
উ : কাবার নিকটে অবস্থিত একটি ছোট পাহাড়।
প্র : সাফা পর্বতের পাশে বসে হযরত মুহম্মদ (স.) কী করছিলেন?
উ : সত্যান্বেষী মানুষকে দীক্ষা দান করেছিলেন।
প্র : 'আমি রাজা নই, সম্রাট নই, মানুষের শত্রু নই।'— এটি কার উক্তি?
উ : হযরত মুহম্মদ (স.)-এর।
প্র : 'আমি এমন এক নারীর সন্তান, সামান্য শুষ্ক মাংসেই ছিল যাঁহার নিত্যকার আহার্য।'— এখানে 'এমন এক নারী' বলতে কার কথা বলা হয়েছে?
উ : হযরত আমিনার।
প্র : 'তিনি অন্ধকে ঘৃণা করিয়াছেন'— এখানে 'তিনি' কে?
উ : হযরত মুহম্মদ (স.)।
প্র : 'দারিদ্র্য' কোন পদ?
উ : বিশেষ্যপদ।
প্র : 'আয়েশা' কে?
উ : হযরত আবু বকর (রা)-এর কন্যা, হযরত মুহম্মদের (স.) অন্যতম সহধর্মিণী।
প্র : 'তিতিক্ষা' শব্দের অর্থ কী?
উ : সহিষ্ণুতা, ক্ষমতা।
প্র : 'তাই মানুষের একজন হইয়াও তিনি দুর্লভ'—এ বাক্যে কার কথা বলা হয়েছে?
উ : হযরত মুহম্মদ (স.)।
প্র : মানুষের মনের রাজা হয়েও হযরত মুহম্মদ মাথায় কিসের মুকুট পরলেন?
উ : দারিদ্র্যের কণ্টক-মুকুট।
প্র : হযরত মুহম্মদের (স.) বিশেষ গুণাবলি কাকে আকর্ষণ করেছিল?
উ : বিবি খাদিজাকে।
প্র : 'কুসুমকোমল'-এর ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ।
উ : কুসুমের ন্যায় কোমল = উপমান কর্মধারয়।
প্র : হযরত মুহাম্মদ (স.) মক্কার কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন?
উ : মক্কার বিখ্যাত কোরেশ বংশে।
প্র : হযরত মুহাম্মদ (স.) মক্কা হতে মদিনায় হিযরতের পথে কোথায় আশ্রয় নিয়েছিলেন?
উ : এক পরহিতব্রতী দম্পতির কুটিরে।
প্র : পরহিতব্রতী অর্থ কী?
উ : পরের উপকারে যারা নিয়োজিত থাকে।

প্র : মুসলিম ধর্মমতে, এই পৃথিবীতে ইসলামের বাহক ও সত্যের প্রচারক কে ছিলেন?
উ : হযরত মুহাম্মদ (স.)
প্র : কখন হযরত মদিনায় চলে গেলেন?
উ : যখন কুরেশ (স.)-এর উপর কোরেশরা নির্যাতন চালাতে শুরু করল আর কোথা গেল, তারা সত্যকে গ্রহণ করবে না।
প্র : বিবি আয়শার মর্মভেদী বিলাপ কাসের প্রতি?
উ : সমস্ত মানুষের প্রতি।
প্র : 'খলে-আমিন' শব্দের অর্থ কী?
উ : বিশ্বস্ত, প্রিয়ভাষী, সত্যবাদী।
প্র : 'জীবন-নদী'র সমাস কী?
উ : জীবন রূপ নদী— রূপক কর্মধারয় সমাস।

মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন

প্র : মোহাম্মদ নজিবর রহমানের জন্ম কত সালে?
উ : আনুমানিক ১৮৬০।
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : চরকেতৈল, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : ঔপন্যাসিক।
প্র : তাঁর জনপ্রিয় উপন্যাসের নাম কী?
উ : 'আনোয়ারা' (১৯১৪) তাঁর প্রথম ও জনপ্রিয় উপন্যাস।
প্র : 'আনোয়ারা' উপন্যাসের পরিচয় দাও।
উ : 'আনোয়ারা' (১৯১৪) শিল্পসম্মত উপন্যাস নয়। তবে মুসলিম মধ্যবিত্তের বিকাশের চিত্র আছে এখানে। কৃষিনির্ভর অর্থনীতি থেকে ব্যবসা, চাকরি ইত্যাদিতে মুসলিমদের প্রবেশের সূচনাকালীন কথকতা থাকায় এর সমাজতাত্ত্বিক মূল্য কম নয়। তাছাড়া এ সময় মুসলিমরা যে ইংরেজি পড়াশোনাও আরম্ভ করেছে সে চিত্রও এখানে আছে। নামাজের জন্য অজু করতে গিয়ে তরুণী আনোয়ারা কোরান পাঠরত নুরল এসলামকে দেখে। আনোয়ারা সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করে এমন

মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন

প্র : মোহাম্মদ নাসির উদ্দিনের জন্মতারিখ কবে?
উ : ওরা অগ্রহায়ণ, ১২৯৫।
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : পাইকারদি, চাঁদপুর।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : সাময়িকপত্রের সম্পাদক।
প্র : তাঁর জীবনের প্রধান কীর্তি কী?
উ : সচিত্র মাসিক 'সওগাত' প্রকাশ (অগ্রহায়ণ ১৩২৫) ও সম্পাদনা।

Scanned with CamScanner

প্র : লেখা প্রকাশের পাশাপাশি সওগাতে তিনি কী করেন?
উ : পোড়া মুসলিম সমাজের অন্ধ সংস্কার উপেক্ষা করে তিনি পত্রিকাতে কবি-সাহিত্যিক এমনকি বিদুষী নারীদের ছবি প্রকাশ করেন।
প্র : 'সওগাত' নামটি কে নির্বাচন করেন?
উ : নাসিরউদ্দিন একাধিক নাম নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে গেলে তিনি এ নামটি নির্বাচন করেন।
প্র : তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি কী?
উ : সচিত্র সাপ্তাহিক মহিলা-সাহিত্যপত্র 'বেগম' (১৩৫৪) প্রকাশ।
প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ : বাংলা একাডেমির সম্মাননা পুরস্কার (১৯৭৫), একুশে পদক (১৯৭৭), স্বাধীনতা পুরস্কার ও ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন পুরস্কার।
প্র : কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের পুরস্কৃত করার জন্য তিনি কী প্রবর্তন করেন?
উ : নাসির উদ্দিন স্বর্ণপদক (১৯৭৬)।
প্র : তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ, সওগাত যুগে নজরুল ইসলাম ইত্যাদি।
প্র : তাঁর মৃত্যুতারিখ কবে?
উ : ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪০১ (২১শে মে, ১৯৯৪); ঢাকা।

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ

প্র : মোহাম্মদ বরকতুল্লাহর জন্মতারিখ কবে?
উ : ২রা মার্চ, ১৮৯৮।
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ঘোড়াশাল, সাজাদপুর, সিরাজগঞ্জ।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : গদ্যশিল্পী।
প্র : তাঁর রচিত বিখ্যাত গদ্যগ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : 'পারস্য প্রতিভা' (১ম খণ্ড ১৯২৪, ২য় খণ্ড ১৯৩২) ও 'মানুষের ধর্ম' (১৯৩৪)।
প্র : পাকিস্তানে রবীন্দ্রসংগীত বিতর্কে তাঁর অবস্থান কী?
উ : তিনি বেতার ও টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধের পাকিস্তানি সিদ্ধান্তের পক্ষে মত দেন।
প্র : তাঁর রচনার জন্য কী কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৮), নরসিংদির স্রষ্টা হযরত মোহাম্মদ মহসীন জন্য দাউদ পুরস্কার (১৯৬৩), সিতারা-ই-ইমতিয়াজ উপাধি (১৯৬২) ও রোসেটি এওয়ার্ড পারফরমেন্স পদক (১৯৭৩)।
প্র : তাঁর মৃত্যু তারিখ কবে?
উ : ২রা নবেম্বর, ১৯৭৪।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

প্র : মোহাম্মদ মোজাম্মেল হকের জন্ম কত সালে?
উ : ১৮৬০।
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : বাউইপাছি গ্রাম, শান্তিপুর, নদীয়া।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : কবি ও গদ্যশিল্পী।
প্র : তাঁর সম্পাদিত পত্রিকার নাম কী?
উ : মোসলেম ভারত (১৩২৭)।
প্র : কোন পত্রিকার মাধ্যমে কাজী নজরুল ইসলাম ব্যাপকভাবে সাহিত্যচর্চা আরম্ভ করেন?
উ : মোসলেম ভারত।
প্র : তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : 'কুসুমাঞ্জলি' (১২৮৮), 'অপূর্ব দর্শন' (১২৯২), 'হজরত মহাম্মদ' (১৩১০), 'জাতীয় ফোয়ারা' (১৩১৯)।
প্র : তাঁর রচিত গদ্যগ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : 'মহর্ষি মনসুর' (১৩০৩), 'ফেরদৌসী চরিত' (১৩০৫) ইত্যাদি।
প্র : তাঁর রচিত উপন্যাসগুলোর নাম কী?
উ : 'জোহরা' (১৩২৪), 'দরাফ খান গাজী (১৩২৬) ইত্যাদি।
প্র : তিনি কী উপাধি লাভ করেন?
উ : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক 'কাব্যকণ্ঠ' উপাধি।
প্র : তিনি কোথায়, কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : শান্তিপুর, ৩০শে নবেম্বর, ১৯৩৩।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

প্র : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৩৫৫ বঙ্গাব্দের ৩০শে শ্রাবণ, গাংগোরের বাড়ি নামক এলাকায়।
প্র : তিনি কী হিসেবে পরিচিত?
উ : শিক্ষাবিদ, কবি ও নীতিকার।
প্র : তাঁর প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম কী?
উ : প্রবন্ধ-গবেষণা : 'আধুনিক বাংলা কবিতাকে মুসলিম জীবন ও চিন্তা' (১৯৬২), 'আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক ১৮৫৭-১৯২০ (১৯৭০), বাংলা কবিতার ছন্দ (১৯৭০), সাহিত্যে উচ্চতর গবেষণা (১৯৭৮), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের ইতিহাস ১৯২১-৮১ (১৯৮২), আধুনিক বাংলা কবিতা : প্রাসঙ্গিকতা ও পরিপ্রেক্ষিত (১৯৮৫)। কবিতা : দুর্লভ দিন (১৯৬১), শব্দিত আলোক (১৯৬৮), বিপন্ন বিষাদ (১৯৬৮), প্রতনু প্রত্যাশা (১৯৭৩)। সঙ্গীত : অনির্বাণ (১৯৬৭), নির্বাচিত গান (১৯৮৪)।
প্র : তাঁর দুটো জনপ্রিয় গানের পঙ্‌ক্তি কী?
উ : আমার দেশের মাটির গন্ধে এবং অশ্রু দিয়ে লেখা এ গান।
প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (কবিতা : ১৯৭২), জহির রায়হান চলচ্চিত্র পুরস্কার (১৯৭২-৭৩), বিশ্ব সাহিত্য উন্নয়ন বন্ধু, বিশ্ব উন্নয়ন সংসদ, ভারত (১৯৮৩), বৃহত্তর যশোর সমিতি পুরস্কার (২০০৪)।
প্র : তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ৩রা সেপ্টেম্বর, ২০০৮ সালে।

মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

প্র : মোহাম্মদ লুৎফর রহমান কত সালে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৮৮৯ সালে বর্তমান মাগুরা জেলার গারনাদুয়ালি গ্রামে।
প্র : তাঁর পৈতৃক নিবাস কোথায়?
উ : মাগুরা জেলার তালিকান্দা গ্রামে।
প্র : তাঁর পিতার নাম কী?
উ : সরদার মহম্মদ আলী।
প্র : তিনি আর কী নামে পরিচিত?
উ : তাঁকার লুৎফর রহমান। [illegible] 'লুৎফর' নামে লিখতেন। 'লুৎফর' নামে তাঁর ছেলের তালেমা নয়।
প্র : তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা কথায়?
উ : মাগুরা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস করে ভর্তি মহসিন কলেজে পড়তে যান, কিন্তু কলেজে অবস্থানের বদলে দিন অনেক পরে হোমিওপ্যাথিক এইচএমএস পাস করে হোমিও ডাক্তারিতে নিয়োজিত হন।
প্র : লুৎফর রহমান সমাজসেবামূলক কাজের জন্য কোন কোন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন, কোথায়?
উ : 'সাহিত্যিক বিদ্যালয়' এবং 'সাহিত্য বৈঠক' কলকাতায়।
প্র : এ প্রতিষ্ঠান দুটোর সভাপতি কারা ছিলেন কাকে?
উ : রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনকে।
প্র : লুৎফর রহমান কোন কোন পত্রিকা সম্পাদনা করেন?
উ : বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা; সহচর; নারীশক্তি।
প্র : প্রকাশকালসহ লুৎফর রহমান রচিত গ্রন্থাবলির নাম লেখ :
উ : প্রবন্ধগ্রন্থ : উচ্চজীবন (১৯১৯); মহৎজীবন (১৯২৬); উন্নতজীবন (১৯২৭); মানবজীবন (১৯২৭); সত্যজীবন (১৯৪০)।
উপন্যাস : পথহারা (১৯১৯); বায়স্কোপ (১৯১৯); প্রীতি উপহার (১৯২৭)।
শিশুসাহিত্য : রানী হেলেন (১৯৩৪) ইত্যাদি।
প্র : মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের সাহিত্যসাধনার লক্ষ্য কী ছিল?
উ : মানুষের নৈতিক চেতনাজাগ্রত ও উন্নত করাই ছিল তাঁর সাহিত্যরচনার লক্ষ্য। তাঁর প্রবন্ধাবলি সহজবোধ্য কিন্তু গভীর ভাবযুক্ত।

Scanned with CamScanner

প্র : তিনি কী হিসেবে খ্যাত?
উ : চিন্তাশীল ও যুক্তিবাদী প্রাবন্ধিক হিসেবে।
প্র : তিনি কবে, কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?
উ। ১৯৩৬ সালের ৩১শে মার্চ নিজ নিবাস মাতকার হাজিপুর গ্রামে।

মোহিতলাল মজুমদার

প্র : মোহিতলাল মজুমদারের জন্মতারিখ কবে?
উ : ২৬শে অক্টোবর, ১৮৮৮।
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : জাঁচড়াপাড়া, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : বিশিষ্ট কবি, প্রাবন্ধিক ও সাহিত্য সমালোচক।
প্র : তাঁর পেশা কী ছিল?
উ : অধ্যাপনা।
প্র : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগে তিনি অধ্যাপনা করেন?
উ : বাংলা বিভাগে।
প্র : তিনি কোন ছদ্মনামে লিখতেন?
উ : সত্যসুন্দর দাস।
প্র : তিনি কোন পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন?
উ : বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গদর্শন'।
প্র : মোহিতলালের কবিতা বিশিষ্ট কোন দিক থেকে?
উ : তিনি সাহিত্যের আদর্শানুসারে বাংলায় চমৎকারভাবে আরবি, পারসি শব্দের প্রয়োগ ঘটাতে সক্ষম হন। মোহিতলালের কবিপ্রতিভার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো দেহবাদ-ভোগবাদ। তাঁর কবিস্বভাবের মর্মমূলে ছিল ঘোর বাস্তববাদ। তিনি বস্তুজগৎ ও বাস্তবের পূজারী। কবিতার আঙ্গিক সম্বন্ধে তিনি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তার কথায়- 'Form বলিতে রচনার একটি পরিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতা বোঝায়- ভাষা যেমন গাঢ়বন্ধ হইবে, কবিতার গঠনও তেমনই সুসম্বদ্ধ ও আকার সুপরিকল্পিত হইবে।'
প্র : মোহিতলালের কবিতার প্রধান বিষয় কী?
উ : মোহিতলালের কবিতার প্রধান বিষয় প্রেম দেহাশ্রয়ী, কামকে স্বীকার করেই [illegible] স্বীকৃতি তিনি দিয়েছেন। প্রথমে তাঁর কবিতায় রবীন্দ্রবিরোধী ভাব থাকলেও পরে রবীন্দ্র অনুসারী ভাবও ধরা পড়ে।
প্র : তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : স্বপন পসারী (১৩২৮), বিস্মরণী (১৩৩০), স্মরগরল (১৩৪৩), বিস্মরণী (১৩৫৮), হেমন্ত [illegible] (১৩৪৮)।
প্র : তাঁর রচিত প্রবন্ধ সমালোচনাগ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : আধুনিক বাংলা সাহিত্য (১৩৩৪), সাহিত্যকথা (১৩৪৫), কবি শ্রীমধুসূদন (১৩৫৮), ইত্যাদি।
প্র : নজরুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কেমন ছিল?
উ : মোহিতলালই 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় নজরুলের কবিতার প্রথম একটি সুদীর্ঘ আলোচনা করে নজরুলের প্রতি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরে তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশেষ ভালো ছিল না।
প্র : তাঁর মৃত্যুতারিখ কবে?
উ : ২৬শে জুলাই, ১৯৫২।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

প্র : যতীন্দ্রমোহন বাগচীর জন্মতারিখ কত?
উ : ২৭শে নবেম্বর, ১৮৭৮।
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : জামশেরপুর, নদীয়া।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : কবি।
প্র : তাঁর সম্পাদিত পত্রিকাগুলোর নাম কী?
উ : মানসী, পূর্বাচল ও যমুনা পত্রিকার।
প্র : তাঁর কবিমানসের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?
উ : পল্লিপ্রীতি।
প্র : তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : লেখা (১৯০৬), রেখা (১৯১০), অপরাহ্ণ (১৯১৫), নীহারিকা (১৯২৭), মহাভারত (১৯৩৬) ইত্যাদি।
প্র : তাঁর মৃত্যুতারিখ কত?
উ : ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮।

প্র : রণেশ দাশগুপ্তের জন্ম কবে, কোথায়?
উ : ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি; আসামের শিলচরে।
প্র : তিনি কিভাবে রাজনীতিতে আসেন?
উ : তিনি ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া ক্রিশ্চিয়ান কলেজে পড়ার সময় সশস্ত্র গোপন দলে যোগদানের মাধ্যমে।
প্র : কোথায় তাঁর কর্মজীবন আরম্ভ হয়?
উ : ঢাকায় দলিলীকিশোর গুহ সম্পাদিত 'সোনার বাংলা' পত্রিকায় (এই পত্রিকায় শামসুর রাহমানের প্রথম কবিতা ছাপা হয়) সহকারী সম্পাদক হিসেবে (১৯৩৮)।
প্র : তিনি কোন সংগঠনের প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন?
উ : ঢাকায় 'প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘ' প্রতিষ্ঠায় (১৯৩৯-৪০)। তাছাড়া এই সংঘের মুখপত্র 'ক্রান্তি' প্রকাশের ক্ষেত্রে।
প্র : রণেশ দাশগুপ্ত কোন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?
উ : বামপন্থী রাজনীতি। এ কারণে তিনি বহুবার জেল খেটেছেন, বিনা বিচারে আটক থেকেছেন।
প্র : তিনি ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির কী ছিলেন?
উ : নির্বাচিত (১৯৫৭) ওয়ার্ড কমিশনার। শাঁখারি বাজার-তাঁতি বাজার-ইসলামপুর ছিল তাঁর এলাকা।
প্র : রণেশ দাশগুপ্ত রচিত প্রবন্ধগ্রন্থগুলোর নাম লেখ।
উ : উপন্যাসের শিল্পরূপ (১৯৫৯), শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে (১৯৬৬), আলো নিয়ে আলো জ্বালা (১৯৭০), আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপ (১৯৮৬), মুক্তিধারা (১৯৮৯), সাম্যবাদী উত্থান প্রত্যাশা : আত্মজিজ্ঞাসা (১৯৯৪)।
প্র : তাঁর কোন গ্রন্থটি পাকিস্তানি শাসনামলেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে 'রেফারেন্স বুক' হিসেবে স্বীকৃতি পায়?
উ : উপন্যাসের শিল্পরূপ।
প্র : 'উপন্যাসের শিল্পরূপ' গ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : রণেশ দাশগুপ্তের প্রবন্ধের বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালে। ২৬টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত গ্রন্থটিতে উপন্যাসের উদ্ভব ও বিকাশ, আদিক ও গঠন, বিষয় ও ভাষা, সাহিত্যের সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে উপন্যাসের সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয় নিয়ে মার্কসীয় দৃষ্টিতে আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া বাংলা উপন্যাসের অগ্রগতিমূলক ধারা নির্ণয় করাটি পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবাঙ্গসুন্দর উপন্যাসগুলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের বাংলা প্রবন্ধের ধারায় এই গ্রন্থটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত। পাকিস্তানি শাসনামলেই এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে রেফারেন্স গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত হয়। মার্কসীয় নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপন্যাস বিচারের এমন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ বাংলাদেশে আর লিখিত হয় নি। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি একে আরো সমৃদ্ধ করেন।
প্র : 'আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপ' গ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : রণেশ দাশগুপ্ত রচিত প্রবন্ধগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮৬ সালে। বইটিতে সংকলিত প্রবন্ধগুলোর মধ্যে দস্তয়েভস্কি, টলস্টয়, পাবলো নেরুদা, লিওনি মুকাচ, শলোকভের সাহিত্য ও কাব্য আলোচনা পাঠকের চিন্তাকে প্রসারিত করে। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন সেন, সোমেন চন্দ, মুনীর চৌধুরী, শহীদুল্লা কায়সারের সাহিত্য আলোচনার মধ্য দিয়ে লেখক রণেশ দাশগুপ্ত বাংলা সাহিত্যের পাঠকের জন্য নতুন দিক নির্দেশনা ও ভাবনার জগতকে প্রসারিত করেছেন।
প্র : তাঁর অনুরোধ রক্ষা করে কে, কোন বিখ্যাত নাটকটি লেখেন?
উ : মুনীর চৌধুরী রচিত কবর (রচনা : ১৯৫৩, প্রকাশ : ১৯৬৬)।
প্র : তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা নবেম্বর কলকাতায়। ৬ই নবেম্বর ঢাকার শ্যামপুর শ্মশানঘাটে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

Scanned with CamScanner

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১৮৬১ সালের ৭ই মে, ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ, কলকাতার জোড়াসাঁকো নামক স্থানের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে।

প্র : তিনি মূলত কী হিসেবে পরিচিত ছিলেন?

উ : বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা: সব্যসাচী লেখক, কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, প্রাবন্ধিক, দার্শনিক, সঙ্গীত রচয়িতা, সুরস্রষ্টা, গায়ক, চিত্রশিল্পী, অভিনেতা, সমাজসেবী ও শিক্ষাবিদ।

প্র : তাঁর পিতামহ, পিতামহী এবং পিতা ও মাতার নাম কী?

উ : পিতামহ ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, পিতামহী দিগম্বরী দেবী এবং পিতা ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মাতা সারদা দেবী।

প্র : রবীন্দ্রনাথ মাতা-পিতার কততম সন্তান?

উ : তিনি মা-বাবার চতুর্দশ সন্তান ও অষ্টম পুত্র। রবীন্দ্রনাথেরা পনের ভাইবোন ছিলেন।

প্র : তাঁদের পরিবারটি কোন বংশের ছিল?

উ : পিরালি ব্রাহ্মণ বংশের।

প্র : তিনি কত বছর বয়সে কবিতা রচনা করতে আরম্ভ করেন?

উ : আট বছর।

প্র : কত বছর বয়সে তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় এবং তা কোন পত্রিকায়?

উ : ২৫/২/১৮৭৪ সালে অমৃতবাজার পত্রিকায়। তখন তার বয়স তের বৎসর।

প্র : কবিতাটির নাম কী ছিল?

উ : হিন্দুমেলার উপহার।

প্র : রবীন্দ্রনাথ কত সালে ইংরেজি সাহিত্য পাঠের উদ্দেশ্যে প্রথম ইংল্যান্ডে যান?

উ : ১৮৭৮ সালে।

প্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম কী?

উ : কবি-কাহিনী (প্রকাশকাল : ১৮৭৮)

প্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম কী?

উ : বনফুল (প্রকাশকাল : ১৮৮০)

প্র : রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত নাটকের নাম কী?

উ : বাল্মীকি প্রতিভা (প্রকাশকাল : ১৮৮১) (রবীন্দ্রনাথের 'রুদ্রচণ্ড' নাটক আছে। তবে সামান্য নাটকীয়তা আছে মাত্র। রুদ্রচণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৮১ সালে)।

প্র : রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের নাম কী?

উ : বৌঠাকুরাণীর হাট (প্রকাশকাল ১৮৮৩)।

প্র : রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত ছোটগল্পের নাম কী?

উ : ভিখারিনী (১৮৭৪)।

প্র : 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' কি রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচনা?

উ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর আত্মজীবনী 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন : 'বেলাশেষে যখন কবিতা লিখিতাম তখন বাগানের প্রান্তে একটি শিশু-নারিকেল গাছের তলার মাটিতে পা ছড়াইয়া বসিয়া খাতা ভরাইতে ভালোবাসিতাম। এটাকে সে কবিজনোচিত বলিয়া বোধ হইত। কুশীয় কঙ্করশয্যায় বসিয়া রৌদ্রের উত্তাপে পৃথ্বীরাজের পরাজয় বলিয়া একটা বীররসাত্মক কাব্য লিখিয়াছিলাম। তাহার প্রচুর বীররসেও উক্ত কাব্যটাকে বিনাশের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। তাহার উপযুক্ত বাহন সেই বাঁধানো ডায়ারিটিও জ্যেষ্ঠা সহোদরা নীলখাতাটির অনুসরণ করিয়া কোথায় গিয়াছে তাহার ঠিকানা কাহারো কাছে রাখিয়া যায় নাই।' এখানেই প্রথম জানা গেল 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়ে'র নাম। রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য ধরেই কেউ কেউ বলেন যে 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' তাঁর প্রথম রচনা। কিন্তু এর আগেও যে রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখেছেন তার ইঙ্গিত এই উদ্ধৃতিতেই আছে (হারিয়ে যাওয়া নীলখাতায়) সে কথা তারা ভুলে যান। রবীন্দ্রনাথের হারিয়ে যাওয়া সেই ডায়েরি ও নীলখাতা পাওয়া গেলে বোঝা যেত, কোনটি তাঁর প্রথম রচনা। তাই খুঁজে না পাওয়া লেখাগুলোকে বিবেচনায় আনা উচিত নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচনা কোনটি তা নির্ধারিত হবে তাঁর প্রাপ্ত লেখাগুলোর নিরিখে।

প্র : 'কবি-কাহিনী' সম্পর্কে লেখ।

উ : 'কবি-কাহিনী' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। এটি একটি কাব্যগ্রন্থ। 'ভারতী' পত্রিকায় পৌষ-চৈত্র, ১২৮৪ বঙ্গাব্দ (১৮৭৮ খ্রি.) সংখ্যায় এর কবিতাগুলি ছাপা হয়। ১৮৭৮ সালেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে গ্রন্থকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় আরম্ভ হয়। চার সর্গে বিধৃত এই নাতিদীর্ঘ কাব্যের নায়ক এক কবি এবং নায়িকা নলিনী। নলিনীর মৃত্যুর পর নায়ক কবির বিশ্বপ্রেমের উপলব্ধিতে কাব্যের পরিসমাপ্তি। মনে করা হয়, এ কাব্যের নায়ক রবীন্দ্রনাথ নিজেই। কবিতার কাহিনিতে নাটকীয়তা নেই। অমিত্রাক্ষর ছন্দের রচনা। তবে বিন্যাস পয়ার ও ত্রিপদী উভয় ধরনের।

প্র : 'বনফুল' কাব্য সম্পর্কে লেখ।

উ : গ্রন্থ হিসেবে 'বনফুল' কাব্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় প্রকাশিত গ্রন্থ (প্রকাশ: ১৮৮০)। প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'কবি-কাহিনী' (প্রকাশ: ১৮৭৮)। তবে 'জ্ঞানাঙ্কুর' ও 'প্রতিবিম্ব' নামক দুটি পত্রিকায় 'বনফুল' গ্রন্থের কবিতা ১৮৭৬ সালেই প্রকাশ পায়। তাই কেউ কেউ 'বনফুল'কে রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কাব্য বলে থাকেন। গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে পত্রিকায় প্রকাশের উপর নির্ভর করে 'বনফুল'কে রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কাব্য বলা গেলেও প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ কিন্তু বলা যাবে না। তাছাড়া 'বনফুল'কে সুকুমার সেন নির্ভেজাল কাব্য না বলে, বলেছেন 'কাব্যোপন্যাস'। একই সঙ্গে তাঁর মন্তব্য: 'বনফুলের প্লটের আরম্ভে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর উদাসিনীর অনুসরণ আছে। কমলা-ভূমিকায় শকুন্তলার ছাপ আছে। ভাব-ভাষা-অলঙ্কারে মাঝে মাঝে দ্বিজেন্দ্রনাথের বিহারীলালের এবং মধুসূদনের প্রতিধ্বনি আছে।' গ্রন্থটি আট সর্গ বিশিষ্ট। মিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। বিজয়, কমলা, নীরদ, নীরজা এ কাব্যের উল্লেখযোগ্য পাত্রপাত্রী।

প্র : 'বৌঠাকুরাণীর হাট' এর সম্পর্কে লেখ।

উ : 'বৌঠাকুরাণীর হাট' রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে 'ভারতী' পত্রিকায় এটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাসের পরিচয় বহন করে। রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসের পরিচয় দিয়ে লেখেছিলেন (১৯০৬) গ্রন্থের ভূমিকায়। উপন্যাসের শুরুতে চরিত্রগুলোর নাম ও বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া থাকায় এর সঙ্গে ঐতিহাসিকতার যোগ পাওয়া যায়। এর সঙ্গে ইতিহাসের সরাসরি সম্পর্ক নেই। চরিত্রগুলোর নাম, বসন্ত রায়, উদয়াদিত্য, বিভার সম্পর্ক রবীন্দ্রনাথের শৈশবকালে, ইতিহাসের মাতৃবিয়োগ ইত্যাদির রবীন্দ্রনাথ সৌদামিনী দেবীর কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। 'বৌঠাকুরাণীর হাট' সেই ঘুমের সুষমা আছে। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয় সৌদামিনী দেবীকে। এই উপন্যাসের কাহিনি অবলম্বনে পরে রবীন্দ্রনাথ 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৯) নামে নাটক রচনা করেন।

প্র : 'করুণা' কি রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস?

উ : 'করুণা' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা প্রথম উপন্যাস, কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস নয় (প্রথম উপন্যাসগ্রন্থের নাম 'বৌঠাকুরাণীর হাট')। মাসিক 'ভারতী' পত্রিকায় এক বছরের ধারে (আশ্বিন-ফাল্গুন ১২৮৪-৮৫) 'করুণা' উপন্যাসটি ছাপা হয়। এটি রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তেও এই রচনার কোনো উল্লেখ করেন নি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 'রবীন্দ্র রচনাবলী'তে (১৯৬১) 'করুণা' প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। সাতাশ পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত এই উপন্যাস। উল্লেখযোগ্য চরিত্র: মহেন্দ্র, মোহিনী, রজনী।

প্র : বাংলা ছোটগল্পের জনক বলা হয় কাকে?

উ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে।

প্র : রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধগ্রন্থ কোনটি?

উ : বিবিধপ্রসঙ্গ (১৮৮৩)।

Scanned with CamScanner

প্র : রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের লেখা কয়টি নাটকে অভিনয় করেন?

উ : ১৩টি।

প্র : আর্জেন্টিনার কোন মহীয়সীকে রবীন্দ্রনাথ বিজয়া নাম দেন?

উ : ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো।

প্র : তাঁকে রবীন্দ্রনাথ কী উৎসর্গ করেন?

উ : পূরবী (১৯২৫) কাব্য।

প্র : রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ বিদেশযাত্রা কোন দেশে, কবে?

উ : সিংহল, ১৯৩৪ সালে।

প্র : প্রথমজীবনে রবীন্দ্রনাথের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কবিতা কোনটি?

উ : নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ (আজি এ প্রভাতে রবির কর/ কেমনে পশিল প্রাণের' পর)।

প্র : হিন্দু-মুসলিম মিলনের লক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ কোন উৎসবের সূচনা করেন?

উ : রাখিবন্ধন।

প্র : ভবতারিণী দেবীর সঙ্গে কত সালে তাঁর বিয়ে হয়?

উ : ১৮৮৩, ৯ই ডিসেম্বর।

প্র : রবীন্দ্রনাথের শ্বশুর বাড়ি কোথায়?

উ : বাংলাদেশের খুলনায়।

প্র : রবীন্দ্রনাথ ভবতারিণী দেবীর নাম পাল্টে কী রাখেন?

উ : মৃণালিনী দেবী।

প্র : রবীন্দ্রনাথ-মৃণালিনীর কয় সন্তান ছিল?

উ : ৫ জন। দুই পুত্র, তিন কন্যা।

প্র : রবীন্দ্রনাথের বৌঠান জ্যোতিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরী দেবী কত তারিখে আত্মহত্যা করেন?

উ : ১৯-৪-১৮৮৪।

প্র : কবিপত্নী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হয় কত সালে?

উ : ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন মাত্র ৪১ বছর।

প্র : রবীন্দ্রনাথ কত সালে ব্রাহ্ম সমাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন?

উ : ১৮৮৪ সালে।

প্র : তাঁর 'রাজর্ষি' উপন্যাস কোন পত্রিকায় বের হয়?

উ : 'বালক' পত্রিকায়।

প্র : কবি কত সালে 'শান্তিনিকেতনে' স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন?

উ : ১৯০১ সালে।

প্র : কত সালে কবি শান্তিনিকেতনে 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' নামে একটি আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন?

উ : ১৯০১ সালে।

প্র : কত সালে 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়?

উ : ১৯২১ সালে।

প্র : 'গীতাঞ্জলি' কাব্য কত সালে প্রকাশিত হয়?

উ : ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে।

প্র : গীতাঞ্জলি অবলম্বনে Song Offerings কত সালে প্রকাশিত হয়।

উ : ১৯১২ সালের নবেম্বরে, ইংল্যান্ডে।

প্র : Song Offerings-এর ভূমিকা লেখেন কে?

উ : ইংরেজ কবি W. B. Yeats.

প্র : রবীন্দ্রনাথ কোন গ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন?

উ : বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কার দেয়া হয় না। রবীন্দ্রনাথ এই পুরস্কার অর্জন করেন ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি' বা Song Offerings গ্রন্থের জন্য।

প্র : কবি কত সালে নোবেল পুরস্কার পান?

উ : ১৯১৩ সালের নবেম্বর মাসে।

প্র : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কত সালে তাঁকে ডি.লিট. উপাধি প্রদান করে?

উ : ১৯১৩ সালের ২৬শে ডিসেম্বর।

প্র : শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পদক চুরি হয় কবে?

উ : ২৪শে মার্চ, ২০০৪ দিবাগত রাতে।

প্র : ব্রিটিশ সরকার কত সালে তাঁকে নাইটহুড বা 'স্যার' উপাধি প্রদান করেন?

উ : ১৯১৫, ৩রা জুন।

প্র : তিনি কবে, কেন তা বর্জন করেন?

উ : পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের (১৩/৪/১৯১৯) প্রতিবাদে ১৯১৯ সালের এপ্রিলে।

প্র : অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে কত সালে ডি.লিট. উপাধি প্রদান করে।

উ : ১৯৪০-এর ৭ই অগস্ট।

প্র : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে কত সালে ডি.লিট. উপাধি দেয়া হয়?

উ : ১৯৩৬ সালে।

প্র : রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিভাণ্ডারের সংখ্যা কত?

উ : কাব্যগ্রন্থ ৫৬টি, গীতিপুস্তক ৪টি, ছোটগল্প ১১৯টি, নাটক ২৯টি, উপন্যাস ১২টি, ভ্রমণ-কাহিনি ৩টি, চিঠিপত্রের বই ১৩টি, গানের সংখ্যা ২২০২টি এবং অঙ্কিত চিত্রাবলি প্রায় ২৫০টি।

প্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম রচনা সংকলনের নাম কী?

উ : 'পাখিকা' (১৮৯৯)। এলাহাবাদের ইন্ডিয়ান প্রেস থেকে পাঁচকড়ি মিত্র কর্তৃক মুদ্রিত এবং শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। প্রথম সংস্করণে ১৩০টি কবিতা ছিল। ১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথের ২০০টি কবিতা বেছে দেবার জন্য বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে একটি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় ৩২০ জন পাঠক যোগ দেন। তাঁদের ভোট সংখ্যা কবিতাগুলির জনপ্রিয়তার সূচক। ১৯২৫ সালের সংস্করণ এই লোকপ্রিয়তা অনুসারে সংকলিত হয়।

প্র : রবীন্দ্রনাথের প্রধান কাব্যগ্রন্থগুলোর নাম কী?

উ : মানসী (১৮৯০), সোনার তরী (১৮৯৪), চিত্রা (১৮৯৬), চৈতালী (১৮৯৭), কল্পনা (১৯০০), ক্ষণিকা (১৯০০), গীতাঞ্জলি (১৯১০), বলাকা (১৯১৬), পূরবী (১৯২৫), পুনশ্চ (১৯৩২), পত্রপুট (১৯৩৬), সেঁজুতি (১৯৩৮), শেষলেখা (১৯৪১)।

প্র : 'প্রভাতসঙ্গীত' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : 'প্রভাতসঙ্গীত' (১৮৮৩) একটি কাব্যগ্রন্থ। এখানে মোট একুশটি কবিতা আছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'প্রভাতসঙ্গীত আমার অন্তর প্রকৃতির প্রথম বহির্মুখী উচ্ছ্বাস।' এই গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য কবিতা : নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ।

প্র : 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে লেখ।

উ : 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬) সম্পর্কে বলা হয়, এইগ্রন্থের বিষয়বিচিত্র, ভাবসুস্পষ্ট, ভাষা সুদৃঢ়, ছন্দ মধুর। তারুণ্যের উচ্ছলতা, নারীদেহের প্রতি মুগ্ধতা ও মৃত্যুর রহস্যময়তার প্রতি আকর্ষণ-এই ত্রিবিধ লক্ষণ কবিতা লিখেছেন, "নূতন আবেগে এই কবিতাগুলি সহসা যেন সবলে কণ্ঠ করল।[...] আমার বয়সের এই সন্ধিটা অক্ষরকে পূর্ণিমা দিয়ে ঘুমন্ত নূতন শক্তি নিতে পেরেছি।' 'মানসী'রই ঘুমের ঘোর সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে গেল।" মানসীর কবিতাগুলো দুই ভাগে বিভক্ত। একদিকে অতীত জীবনের পিছুটানমূলক কবিতা, অন্যদিকে নবযৌবনের নিরুদ্ধ কর্মউদ্যমের খরনীতি। 'নিষ্ফল কামনা' এই গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য কবিতা। এছাড়াও আছে দুরন্ত আশা, ভুলভাঙা, বৃহদ্ধনি, সুরদাসের প্রার্থনা, মেঘদূত, অহল্যার প্রতি, আত্মসমর্পণ ইত্যাদি কবিতা।

প্র : 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে লেখ।

উ : 'চিত্রা' (১৮৯৬) যেন কবির স্বপ্নলোকের রূপক থেকে সাধারণ জীবনের প্রাত্যহিকতায় অবতরণ। উর্বশী, বিজয়িনী, জীবনদেবতা, স্বর্গ হইতে বিদায়, ১৪০০ সাল 'সুরসদন' দুই বিঘা জমি, এবার ফিরাও মোরে প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের বহুবিখ্যাত কবিতা এই কাব্যের অন্তর্গত। একগুচ্ছ কবিতায় বাস্তবমুখিতা, আরেকগুচ্ছ কবিতায় নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যের অভিসার-এই দুই ভিন্নমুখী সুর 'চিত্রা' কাব্যের প্রধান

Scanned with CamScanner

বৈশিষ্ট্য। 'চিত্রা'র শেষ কবিতা শিলাইদহে প্রকাশ করা হয়েছে যে, হৃদয়বেদন কবিসত্তাকে জীবনদেবতা ঘর ছাড়া করে স্বপ্ন-অভিসারের মধ্যে নিয়ে নিয়ে সবজীবনলোকে জীবনস্মৃতিনী রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন।

প্র : 'আরোগ্য' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : রবীন্দ্রনাথের এই কাব্যটি প্রকাশিত হয় ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে (১৯৪১)। এই কাব্যে কোন কবিতার নাম নেই, সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে কবি এই কবিতাগুলো মুখে মুখে রচনা করেছেন এবং তা কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নি। এটি তেত্রিশটি কবিতার সংকলন। কবিতাগুলি ১৯৪০-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯৪১-এর ফেব্রুয়ারির মধ্যে রচিত। কবিতার ভাষা অলঙ্কারহীন, ছন্দ ধীরগতি এবং চিত্রগুলি পরিচিত জীবনের। এই ক্ষুদ্রাকৃতি কবিতাগুলি কবিপ্রতিভার করুণ অস্তিমকালের আলোক রশ্মিতে দীপ্তিময়।

প্র : 'কণিকা' কোন ধরনের গ্রন্থ?

উ : 'কণিকা' (১৮৯৯) ১১০টি ছোটো ছোটো পদ্যের সংকলন। অধিকাংশ কবিতাই নীতিমূলক, সংস্কৃত কাব্যের সুভাষিতাবলির আদর্শে রচিত। এই কবিতাকণাগুলোতে কবির তাত্ত্বিক দৃষ্টির প্রকাশ ঘটেছে।

প্র : 'উৎসর্গ' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : ৪৬টি কবিতার সংকলন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'উৎসর্গ' (১৯১৪)। রবীন্দ্রনাথের বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কবিতা এই কাব্যগ্রন্থটিতে সংযুক্ত হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : আমি চঞ্চল হে: তোমার পাছে সহজে বুঝি, সবটাই মোর ঘর আছে ইত্যাদি।

প্র : 'ক্ষণিকা' গ্রন্থ সম্পর্কে লেখ।

উ : 'ক্ষণিকা' (১৯০০) কাব্যগ্রন্থ। জীবনের আপাত-তুচ্ছ মুহূর্তগুলির প্রতি গভীর ভালোবাসা, যৌবনের উল্লাস ও চটুলতা, এই কাব্যের মূল সুর। ছন্দের সাবলীলতা ও ক্ষিপ্রতা এই কাব্যের কবিতাগুলির বিশেষ বৈশিষ্ট্য। উল্লেখযোগ্য কবিতা : ক্ষণিকা, যথাসময়, বোঝাপড়া, অচেনা, বিদায়, সেকাল, উদাসীন, শেষ ইত্যাদি। এই গ্রন্থের কবিতাগুলো রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য কবিতার চেয়ে স্বতন্ত্র।

প্র : 'কথা ও কাহিনী' সম্পর্কে লেখ।

উ : 'কথা ও কাহিনী' (১৯০০) কাব্যগ্রন্থ। 'কথা' (১৮৯৯) ও 'কাহিনী' (১৯০০) নামে দুটি স্বতন্ত্রকাব্য একত্রে এই কাব্য গঠিত হয়েছে। 'কথা ও কাহিনী' প্রথম অংশে বৌদ্ধ অবদান এবং ইউরোপের বিভিন্ন গ্রন্থ 'রাজস্থানে'র কয়েকটি কাহিনী অবলম্বনে রচিত কবিতা আছে। দ্বিতীয় অংশে আছে লেখকের মৌলিক কবিতা। দেবতার গ্রাস, পুরস্কার, আবেদন, কর্ণ-কুন্তী সংবাদ, গান্ধারীর আবেদন প্রভৃতি কাহিনি এই অংশের অন্তর্ভুক্ত।

প্র : 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : 'খেয়া' (১৯০৬) পঞ্চাশটি কবিতার সংকলন। এ সংকলনের কবিতাগুলির মধ্যে ক্লান্তি ও বিষাদের সুর প্রকাশ পেয়েছে। গ্রন্থটি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুকে উৎসর্গ করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কবিতা হলো : পথের শেষ, শেষ খেয়া, ঘাটেরপথ, বিদায়, দীঘি, আগমন, বৈশাখে, জাগরণ ইত্যাদি। খেয়া কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিতে জীবনের ব্যথাবেদনার ও বিচিত্র অনুভবের মধ্যে চরম শ্রেয়োলাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত। এ গ্রন্থের বেশ কিছু কবিতায় আধ্যাত্মিকতা আছে।

প্র : 'মহুয়া' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : 'মহুয়া' (১৯২৯) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত কাব্যগ্রন্থ। সবকটি কবিতাই প্রেমবিষয়ক। রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের প্রেমের কবিতার মধ্যে একদিকে যেমন তৃপ্ত, অন্যদিকে তেমনি সংরাগ প্রকাশিত। 'মহুয়া' নামের কবিতায় সেই সংরাগের পরিচয় আছে এভাবে :

'তরল যৌবনচিহ্ন মজ্জায় রাখিয়াছিলি ভরে।
কানে কানে কহি তোরে।
বধূরে যেদিন পাবো ডাকিব মহুয়া নাম ধরে।'

মহুয়ার কবিতাগুলিকে বলা যায় রবীন্দ্রনাথের নারীবন্দনা। নারীর মাধুর্য ও লাবণ্য এই কাব্যগ্রন্থে বহুভাবে বর্ণিত হয়েছে।

প্র : 'শ্যামলী' কোন ধরনের গ্রন্থ?

উ : 'শ্যামলী' (১৯৩৬) কাব্যগ্রন্থ। এ গ্রন্থের নাম দেয়া হয়েছে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের মাটির ঘরের নামে। এটি মোট বাইশটি কবিতার সংকলন। এগুলো কাব্যগ্রন্থের বিশেষ উদাহরণ। 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থ চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ', 'এপিওগ্রাফ', 'শেষ সপ্তক' প্রভৃতি পরিচিতি পর্যায়ের বা কবিতাগুলি এ কাব্যের অন্তর্ভুক্ত। রবীন্দ্র-কাব্যজীবনের শেষ পর্বের নিরলঙ্কারী ভাষা, উদাসীনতা ও জীবনের প্রতি আসক্তির বিরোধী অনুভূতি 'শ্যামলী' কাব্যের বৈশিষ্ট্য।

প্র : 'নবজাতক' কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে লেখ।

উ : 'নবজাতক' (১৯৪০) কাব্যগ্রন্থ, যেখানে জীবন সায়াহ্নে কবি ধ্বংসের অপচয় দেখে ব্যথিত হৃদয়ে প্রশ্ন করেছেন, 'কেন'? এই কাব্যের কবিতাগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'এরা বসন্তের ফুল নয়, এরা হচ্ছে পৌঢ় ঋতুর ফসল, বাইরে থেকে রস তোলাবার দিকে এদের ঔদাসীন্য।' রক্ত ও সভ্যতার আবর্জনার উপর এবং দেশের মূঢ়তা ও বিদেশের ক্রূরতার প্রতি কবির ভর্ৎসনা ও ধিক্কার আছে এ গ্রন্থের কবিতায়। আছে ধর্মকে পদদলিত করে মিথ্যের শক্তিতে সব শাসন করার বিরুদ্ধে শ্লেষ। এ গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য কবিতা: বুদ্ধজন্ম, হিন্দুস্থান, রাজপুতনা, কেন ইত্যাদি।

প্র : 'সেঁজুতি' কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে লেখ।

উ : 'সেঁজুতি' (১৯৩৮) কাব্যগ্রন্থে মোট বাইশটি কবিতা রয়েছে। অধিকাংশ কবিতাই কবির মৃত্যু সম্পর্কিত ভাবনা ও পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা নিয়ে রচিত। এর আগে কবি রোগে ভুগেছেন। রোগমুক্তির পর কবিদৃষ্টিতে রূপের জগতে আপনার রূপ যেন নতুন করে দেখা দিলো।

প্র : 'আকাশ-প্রদীপ' গ্রন্থ সম্পর্কে লেখ।

উ : 'আকাশ-প্রদীপ' (১৯৩৯) একটি কাব্যগ্রন্থ। অধিকাংশ কবিতায় শৈশবস্মৃতি এবং জীবন সায়াহ্নের অনুভূতির প্রকাশ, 'গোধূলিতে নামল আঁধার' কবিতাটিকে কাব্যগ্রন্থের মূলসুর বলা হয়। এই কাব্য সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে উৎসর্গ করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যেসব আধুনিক কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টিকে কালবারিত বলে মনে করতেন তাদের উদ্দেশে কিঞ্চিৎ কটাক্ষ আছে এ গ্রন্থে।

প্র : 'শেষ সপ্তক' সম্পর্কে লেখ।

উ : 'শেষ সপ্তক' (১৯৩৫) কাব্যগ্রন্থ। এতে অধিকাংশ কবিতাই গদ্যছন্দে রচিত। এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পের কিছুটা আত্মীয়তা আছে। এই কাব্যের কবিতাগুলিতে সহজ ও সরল ভাষায় সেই চিরন্তন আত্মজিজ্ঞাসার ভাবনা ও রবীন্দ্রজীবনের শেষ পর্বের বিশ্লেষণ ও কাব্যের, অষ্টার সৌন্দর্যের পূর্ণতা, উত্তর জীবনের ক্ষুব্ধ ও ক্ষুব্ধ স্তরে ব্যাপ্ত।

প্র : 'সন্ধ্যাতারা' কী?

উ : 'সন্ধ্যাতারা' (১৯৩১) রবীন্দ্রনাথের ক্ষুদ্র কবিতার সংকলন। কবিতাগুলি কালানুক্রমিকভাবে সজ্জিত। 'সন্ধ্যাতারা' কাব্যগ্রন্থ থেকে কবিতাগুলি এসে সংকলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এই পরবর্তী সংস্করণে অনেক নিখাদ কবিতা পরিত্যাগকেরা এতে কিছু নতুন কবিতা যোগ করেছেন এবং এই সংগ্রহ 'শেষলেখা' পর্যন্ত বিস্তৃত করেছেন। 'সন্ধ্যাতারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় সংকলিত গ্রন্থ।

প্র : 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থ গুরুত্বপূর্ণ কেন?

উ : 'পুনশ্চ' (১৯৩২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গদ্যছন্দে রচিত প্রথম ও সার্থক কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'অসংকুচিত গদ্যভঙ্গিতে কাব্যের অধিকারকে অনেকদূর বিস্তৃত দেওয়া সম্ভব এই আমার বিশ্বাস এবং সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলি লিখেছি।' এই কাব্যের অর্ধপৃষ্ঠা বিশিষ্ট একটি ভূমিকা লেখেন কবি। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ইতিহাসে তথা আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাসে এই কাব্যের ভূমিকা বৈপ্লবিক। গদ্যকবিতার অসংকোচ প্রতিষ্ঠা হলো এই কাব্যে। উল্লেখযোগ্য কবিতা : ছোটো, শেষ চিঠি, ক্যামেলিয়া, সাধারণ মেয়ে, বাঁশি, খ্যাতি ইত্যাদি।

প্র : 'পরিশেষ' গ্রন্থ সম্পর্কে লেখ।

উ : 'পরিশেষ' (১৯৩২) কাব্যগ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের কাব্যের সর্বত্র যে বিষাদ গভীর অতীতচারিতা,

Scanned with CamScanner

পারিপার্শ্বিক খুঁটিনাটির প্রতি অনুরাগ, জাবনের প্রসাদগুণের প্রতি নির্মোহ ও প্রীতিদের প্রতি আন্তরিক নিরাসক্তির দ্বন্দ্ব, 'শান্তিগীত' কাব্যেও তা ফুটে উঠেছে।

প্র : **'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে লেখ।**

উ : 'গীতাঞ্জলি' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৭টি গানের সংকলন। গানগুলি ১৯০৮ ও ১৯০৯ সালে রচিত এবং ১৯১০ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। এগুলো সহজ ভাষায়, সাবলীল ছন্দে লিখিত। 'গীতাঞ্জলি'র গানগুলো মূলত কবিতা। ভাবধারার দিক থেকে কবিতাগুলোকে ৫ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন : ঈশ্বরকে না-পাবার বেদনা; নিজের অহংকার ত্যাগ ও হৃদয় নির্মল করে সহনশীলতা প্রদর্শন; ঈশ্বরের ক্ষমাশীলতার স্মৃতি; দরিদ্র-দীন-হীন-পতিতের মধ্যে ঈশ্বরকল্পনা; অসীম-সসীমের লীলাতত্ত্ব। 'গীতাঞ্জলি'র মূলসুর বিশেষের নয়। বিশ্বের বিশালতা ও প্রকৃতির সৌন্দর্য থেকে উৎসারিত এক অধ্যাত্মবোধের সঙ্গে এই বিশ্বাসযুক্ত। 'গীতাঞ্জলি'র সম্পূর্ণ অনুবাদ যদিও Song Offerings (১৯১২) নয়, তবু এই গ্রন্থের অধ্যাত্মভাব, প্রকৃতি, প্রেম সৌখধারায় ইংরেজি গ্রন্থে প্রবহমান। Song Offerings গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন (১৯১৩)।

প্র : **'উৎসর্গ' কোন ধরনের গ্রন্থ?**

উ : 'উৎসর্গ' (১৯১৪) একটি কাব্যগ্রন্থ। ১৯০৩-'০৪-এ মোহিতচন্দ্র সেন যখন বিষয় অনুসারে ভাগ করে রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্পাদনা করেছিলেন তখন রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য একটি প্রবেশক কবিতা রচনা করেন। সেই কবিতাগুলির সঙ্গে পরে আরও ২৪টি কবিতা যোগ করে 'উৎসর্গ' কাব্য রচিত হয়। বলা হয়, রচনাকাল হিসেবে 'উৎসর্গ' 'স্মরণ' ও 'শিশু' কাব্যগ্রন্থের সমসাময়িক, ভাবের দিক থেকে 'নৈবেদ্য' ও 'খেয়া' কাব্যের মাধ্যমিক। 'উৎসর্গে'র কবিতাগুলির অধিকাংশে কবি স্বরূপের পুনরাত্মপ্রকাশ লক্ষ করা যায়।

প্র : **'স্ফুলিঙ্গ' কী ধরনের গ্রন্থ?**

উ : 'স্ফুলিঙ্গ' (১৯৪৫) ছোট ছোট কবিতার

সংকলন। এর অনেক কবিতা রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন পত্রিকা স্বাক্ষর সংগ্রহের খাতা বা আলবাম থেকে সংগৃহীত। সাধারণ ও আপাত কবিতা-কণিকাগুলি রবীন্দ্রনাথ বিশাল কাব্যজগতে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

প্র : **'শেষলেখা' কী?**

উ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর প্রকাশিত তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ (১৯৪১)।

প্র : **'শেষলেখা' গ্রন্থের পরিচয় দাও।**

উ : 'শেষলেখা' (১৯৪১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থের নামকরণ রবীন্দ্রনাথ করে যেতে পারেন নি। অধিকাংশ কবিতা জীবনের শেষ কয়েকদিনের রচনা। কয়েকটি শেষ মুখে মুখে রচিত। অনুভূতির গভীরতা ও জীবন সম্বন্ধে দার্শনিক জিজ্ঞাসার নিদর্শন আছে 'দুঃখের আঁধার রাতি বারেবারে' কিংবা 'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি' প্রভৃতি কবিতায়। এই কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শনের মধ্যেও চরমভাবে ইহজাগতিকতা প্রকাশিত। তিনি লিখেছেন :

'রূপ-নারানের কূলে
জেগে উঠিলাম;
জানিলাম এজগৎ
স্বপ্ন নয়।'

প্র : **তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস কোনগুলো?**

উ : চোখের বালি (১৯০৩), গোরা (১৯১০), যোগাযোগ (১৯২৬), চতুরঙ্গ (১৯১৬), ঘরে-বাইরে (১৯১৬), চার অধ্যায় (১৯৩৪), মালঞ্চ (১৯৩৪)।

প্র : **'গোরা' উপন্যাস সম্পর্কে লেখ।**

উ : 'গোরা' (১৯১০) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বৃহত্তম এবং অনেকের মতে সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। 'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৯০৮ থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের ধর্মান্দোলন, স্বদেশপ্রেম এবং নারীমুক্তি চিন্তার পটভূমিকায় এই আখ্যান গড়ে উঠেছে। এই উপন্যাসের নায়ক গোরা সিপাহি বিপ্লবের সময় নিহত এক আইরিশ দম্পতির সন্তান। কিন্তু সে বড় হয় হিন্দু ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদয়াল ও আনন্দময়ীর

Scanned with CamScanner

সাহিত্যিকেরা যখন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেই মনোভাব নিয়ে কবিতা লেখেন। নিজেকে আধুনিকদের আকাঙ্ক্ষিত এক বাকরীতির সৃষ্টিতে পর্যন্ত অনাগ্রহী করে তোলেন। 'শেষের কবিতা' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক স্মরণীয় গ্রন্থ। অমিত, লাবণ্য, কেতকী, শোভনলাল প্রমুখ এই উপন্যাসের চরিত্র। উপন্যাসের কবিতায় বাক্য আজ প্রবাদের মর্যাদা পেয়েছে। যেমন : ফ্যাশনটা হলো মুখোশ, স্টাইলটা হলো মুখশ্রী। সুকুমার সেন বলেছেন : 'বৈষ্ণব সাধনার পরকীয়াতত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের কবিমানসে যেভাবে রূপান্তর লাভ করিয়াছিল শেষের কবিতায় তাহার পরিচয় পাই।' 'কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও'– এই কবিতা দিয়ে উপন্যাসটি শেষ হয়েছে।

প্র : 'মালঞ্চ' উপন্যাস সম্পর্কে লেখ।

উ : 'মালঞ্চ' (১৯৩৪) উপন্যাসে এক মৃত্যু পথযাত্রী নারী ও তার স্বামীর কাহিনি আছে। কবিত্বময় ভাষায় গড়ে উঠেছে এ উপন্যাস। সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যুপথবর্তী হয়েও নীরজা তার স্বামী আদিত্যর ওপর অগ্রহ ও প্রত্যাশা একটুও কমায় না। অসুখে নিজে শয্যাশায়িনী হলেও স্বামীকে অযথা সন্দেহ করতে থাকে সে। উপন্যাসে ফুলবাগান আছে– এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। নীরজা ও আদিত্য এই ফুলচাষ করত। বিয়ের দশ বছর পর নীরজা-আদিত্যের ঘরে সন্তান আসার সম্ভাবনা হলেও সে সন্তান জন্মের আগেই মৃত্যুবরণ করে। ফলে মা নীরজাও মৃত্যুপথযাত্রী হয়। ফুল ব্যবসায়ী আদিত্য ফুলবাগান দেখভাল করার জন্য সংসারে আনে দূরসম্পর্কিত বোন সরলাকে। সরলা নীরজার গড়া ফুলবাগানের কর্ত্রী হয়ে ওঠায় তা অসুস্থ নীরজার ঈর্ষার কারণ হয়। সে স্বামীকেও সরলাকে দিয়ে সন্দেহ করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এ ছোট উপন্যাসে মূলত নীরজা চরিত্রের বিকার, সন্দেহ, প্রতিজ্ঞা ও অক্ষমতা ফুটিয়ে তুলেছেন। মালঞ্চে নীরজারই প্রধান ভূমিকা। তার তুলনায় আদিত্য, রমেন বা সরলার ভূমিকা গৌণ।

প্র : 'চার-অধ্যায়' কোন ধরনের উপন্যাস?

উ : 'চার-অধ্যায়' (১৯৩৪) একটি রাজনৈতিক উপন্যাস। অসহযোগ আন্দোলনের পর বাংলায় নতুন করে যে হিংসাত্মক বিপ্লব প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছিল, 'চার-অধ্যায়' উপন্যাসে তার তত্ত্ববিশ্লেষণ এবং বিপ্লবের মূল্য নির্ধারণের চেষ্টা আছে। আসলে সন্ত্রাসবাদের সমালোচনা করে এই কাহিনি রচিত। সন্ত্রাসবাদীদের নেতা ইন্দ্রনাথ একদিকে যেমন অতিমানবিক গুণ সম্পন্ন অন্যদিকে সে নিষ্ঠুর ও মানবতাশূন্য। চার নির্দেশে অতীন ও এলার প্রেমের সমাপ্তি এই উপন্যাসের মুখ্য কাহিনি। সমকালীন বিপ্লবপন্থী আন্দোলনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিরূপ মনোভাব এই উপন্যাসের মূল সুর। উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্র : অতীন, এলা, ইন্দ্রনাথ। চার-অধ্যায়ের কাহিনির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'জলিবার' গল্পের সম্পর্ক আছে।

প্র : রবীন্দ্রনাথের কোন গল্পটি উপন্যাসধর্মী, কোন উপন্যাসটি ছোটগল্পধর্মী?

উ : নষ্টনীড় উপন্যাসধর্মী ছোটগল্প, চতুরঙ্গ ছোট গল্পধর্মী উপন্যাস।

প্র : রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য নাটকের নাম লেখ।

উ : বিসর্জন (১৮৯১), রাজা (১৯১০), ডাকঘর (১৯১২), অচলায়তন (১৯১১), চিরকুমার সভা (১৯২৬), রক্তকরবী (১৯২৬), তাসের দেশ (১৯৩৩) ইত্যাদি।

প্র : 'বিসর্জন' নাটক সম্পর্কে লেখ।

উ : 'বিসর্জন' (১৮৯০) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মঞ্চসফল এবং জনপ্রিয় নাটকগুলির অন্যতম। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই নাটকের প্রধান দুটি চরিত্র রঘুপতি ও জয়সিংহের ভূমিকায় বিভিন্ন সময়ে অভিনয় করেন। উদার ধর্মবোধ এবং সংকীর্ণ ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে দ্বন্দ্ব যেমন এই নাটকের প্রধান উপকরণ, তেমনই বিশ্বাসের উষ্মতা এবং মানব সম্পর্কের নিবিড়তা এই নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই নাটকটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। নাটকে শুধু আত্মবিসর্জনে সমস্যার সমাধান খোঁজা হয় নি, তার চেয়েও কঠোর ত্যাগের মধ্য দিয়ে বিরোধের অবসান প্রদর্শিত হয়েছে।

...নাটকের সমস্যা হলো : 'কেন এর আগমন নাই পায়ে পথ।' 'রাজর্ষি' উপন্যাসের প্রথমাংশ নিয়ে বিসর্জনের নাটকের পরিকল্পিত হয়। উল্লেখযোগ্য চরিত্র : রঘুপতি, জয়সিংহ, অপর্ণা, নক্ষত্র, গোবিন্দমাণিক্য।

প্র : 'বিসর্জন' নাটকে রবীন্দ্রনাথ কোন চরিত্রে অভিনয় করেন?

উ : রঘুপতি, ১৯২৩-এ জয়সিংহের ১৯৩০-এ রঘুপতি।

'রক্তকরবী'র পরিচয় দাও।

উ : 'রক্তকরবী' (১৯২৬) মণিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা ও অর্জুনের পৌরাণিক প্রণয়-কাহিনি অবলম্বনে রচিত রবীন্দ্রনাথের একটি নাটক। এটি **অমিত্রাক্ষর ছন্দে** রচিত। কাহিনির পরিকল্পনা সম্পূর্ণ বাস্তবিক এবং মহাভারতের কাহিনি থেকে স্বতন্ত্র পথক। মদনের বরে চিত্রাঙ্গদা এক বছরের জন্য অসামান্য রূপলাবণ্যের অধিকারী হন। অর্জুন সেই রূপসী চিত্রাঙ্গদার প্রতি আকৃষ্ট হন। শেষ পর্যন্ত অর্জুন চিত্রাঙ্গদার যথার্থ পরিচয় লাভ করেন। এই নাটকে নারীর মর্যাদা ও প্রাধান্য প্রধান হয়ে উঠেছে। রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ একই কাহিনি অবলম্বনে 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য (১৯৩৬) রচনা করেন। চিত্রাঙ্গদায় নাম-চরিত্রের মধ্যে নারীর আত্মজাগরণের যে প্রকাশ ঘটেছে তা আধুনিক নারীবাদীদের কথিত দৃঢ়তার চেয়েও ব্যাপক। উভয় ক্ষেত্রে নারীর আত্মসম্মান ও বীরত্ব উভয়ই গুরুত্ব পেয়েছে।

'মুক্তধারা' সম্পর্কে লেখ।

উ : 'মুক্তধারা' (১৯২২) প্রথমে নাম ছিল 'পথ'। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দেশ ও জাতিপ্রেমের নামে মনুষ্যত্বের সাহায্যে মানবতাত্ত্বিকে বাঁচান এবং এই অত্যাচারী শক্তির বিরুদ্ধে অপরাজিত মানুষের বিদ্রোহ এই নাটকের কেন্দ্রীয় কথাবস্তু। নাটকের প্রথম দৃশ্যে ধনঞ্জয় বৈরাগীর নেতৃত্বে সাধারণ মানুষের বিদ্রোহ, গান্ধীচরিত্র অসহযোগ আন্দোলনের কথা মনে করিয়ে দেয়। নাটকের পটভূমিতে আছে একটি পথ। তার ওপর দিয়ে জনতার অবিরাম স্রোত। তার মধ্যে ভৈরবদের গর্জনের শিবেছে, রাজশক্তির যন্ত্রবন্দনার গান, সন্তানহীন নারী-পুরুষের আর্তনাদ, ধনঞ্জয়ের গান নাটকে এক গভীরতা ও প্রত্যাশাকে ধ্বনীভূত করেছে। অবশেষে প্রবল গর্জনে মুক্তধারার কালোচ্ছ্বাসে নাটক উপনীত

'রক্তকরবী' নাটকের পরিচয় দাও।

উ : 'রক্তকরবী' (১৯২৬) পৌরাণিক রাজ উপন্যাসের কাহিনি অবলম্বনে রচিত এই নাটকেই ধনঞ্জয় বৈরাগী, এই আবির্ভাব। 'রক্তকরবী' রবীন্দ্রনাথের শেষ মনস্তাত্ত্বিক নাটক। নাটকটি পাশ্চাত্যের। ঔপনিবেশিক পুঁজির প্রতিরোধ নির্ভর প্রচার করা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিত যায় ধনঞ্জয় বৈরাগীর কথা ও কাজে। রবীন্দ্রনাথ এ সময় বহু নাটক ও উপন্যাস সংস্পর্শে এসেছিলেন। সেই প্রভাব ধনঞ্জয় বাউলের মধ্যে আছে। অন্য চরিত্রগুলো, সুরমা, উপন্যাসিকা, বিদ্যা ইত্যাদি। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের নতুন ও পরিবর্তিত সংস্করণ 'পরিত্রাণ' (১৯২৯) নাটক।

প্র : 'মুক্তধারা' নাটকের মূলকথা কী?

উ : 'মুক্তধারা' (১৯২২) প্রথমে নাম ছিল 'পথ'। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দেশ ও জাতিপ্রেমের নামে মনুষ্যত্বের সাহায্যে মানবতাত্ত্বিকে বাঁচান এবং এই অত্যাচারী শক্তির বিরুদ্ধে অপরাজিত মানুষের বিদ্রোহ এই নাটকের কেন্দ্রীয় কথাবস্তু। নাটকের প্রথম দৃশ্যে ধনঞ্জয় বৈরাগীর নেতৃত্বে সাধারণ মানুষের বিদ্রোহ, গান্ধীচরিত্র অসহযোগ আন্দোলনের কথা মনে করিয়ে দেয়। নাটকের পটভূমিতে আছে একটি পথ। তার ওপর দিয়ে জনতার অবিরাম স্রোত। তার মধ্যে ভৈরবদের গর্জনের শিবেছে, রাজশক্তির যন্ত্রবন্দনার গান, সন্তানহীন নারী-পুরুষের আর্তনাদ, ধনঞ্জয়ের গান নাটকে এক গভীরতা ও প্রত্যাশাকে ধ্বনীভূত করেছে। অবশেষে প্রবল গর্জনে মুক্তধারার কালোচ্ছ্বাসে নাটক উপনীত

'তপতীর খাতা' সম্পর্কে লেখ।

'তপতীর খাতা' (১৮৮৭) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জনপ্রিয় কৌতুক নাটক। এক রমণীর কেন্দ্র। তাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে নানা ধরনের কৌতুকময় ঘটনা। সংলাপের দৃষ্টি এবং আচরণের নাটকীয়তা নাটকটির জনপ্রিয়তার মূলে। নাটকটির কোনো কোনো চরিত্রে লেখকের মাঝে মাঝে চরিত্রের ছায়াপাত ঘটেছে।

'শ্যামাসব' নাটকের পরিচয় দাও।

'শ্যামাসব' (১৯০৮) একটি নাটক। কালের পটভূমিকায় এই নাটকের

Scanned with CamScanner

হয়েছে চরম মুহূর্তে। পাশ্চাত্য সভ্যতা, তার সঙ্গে সঙ্কীর্ণ জাতীয় স্বার্থ চেতনা ও বণিকবুদ্ধি মিলে যে পীড়ন যন্ত্র চালিয়েছে, এর বিরুদ্ধে মানুষের অন্তর্বুদ্ধি ও কল্যাণচেতনা একদিন জাগ্রত ও জরী হবে। মানুষ যন্ত্রের দাস না হয়ে যন্ত্র মানুষের দাস হবে। এটাই 'মুক্তধারা'র মূলকথা।

প্র : 'ডাকঘর' নাটক সম্পর্কে লেখ।

উ : 'ডাকঘর' (১৯১২) রূপক সাংকেতিক নাটক। ঘরের মধ্যে বন্দি এক রুগ্ণ বালক অমল এই নাটকের নায়ক। সুদূর নিপাসিত চিত্ত অমলের ধারণা, সে একদিন বাইরের জগতে যাবে, একদিন তার নামে রাজার চিঠি আসবে। বিষয়ী লোকেরা তার কথায় পরিহাস করত। কিন্তু একদিন সত্যি সত্যি রাজা এলেন। অপরূপ সংলাপ, প্রকৃতি ও জীবনের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা, এক সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতা এবং সংকেতময়তা এই নাটকটির সার্থকতার মূলে। একটি শিশুকে কেন্দ্র করে এমন গীতিময় নাটক রচনা সাহিত্যে বিরল। রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেছেন : 'এর মধ্যে গল্প নেই। এ গদ্য লিরিক।' নাটকের উল্লেখযোগ্য চরিত্র: অমল, ঠাকুর্দা, সুধা, সৈওয়ালা ইত্যাদি।

প্র : 'বসন্ত' গ্রন্থ সম্পর্কে লেখ।

উ : 'বসন্ত' (১৯২৩) গীতিনাট্য। এই নাটকের বিষয় যৌবনের প্রতীক ঋতুরাজ বসন্তের জয়গান। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থ কাজী নজরুল ইসলামকে উৎসর্গ করেন। কারণ নজরুলও বাংলার জীবনে বসন্ত তথা যৌবন এনেছিলেন। বসন্ত ঋতুনাট্যে গানের প্রাধান্য, গল্প বলতে আছে অতি সামান্য কিছু। সমৃদ্ধির সার্থকতা শুধু প্রাচুর্যে নয়, সেই সঙ্গে চাই ত্যাগের নিরাসক্তি- বসন্তের মর্মকথা এটাই।

প্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তরুণ কবি নজরুলকে 'বসন্ত' গীতিনাট্য উৎসর্গ করলে অনেকেই তা মেনে নিতে পারেন নি। এর প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ কোন কথা জানিয়েছিলেন?

উ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ-প্রসঙ্গে লিখেছেন : "নজরুল ইসলাম সম্পর্কে তোমাদের মনে যেন কিছু সন্দেহ রয়েছে। নজরুলকে আমি 'বসন্ত' গীতিনাট্য উৎসর্গ করেছি এবং উৎসর্গপত্রে তাকে 'কবি' বলে অভিহিত করেছি। জানি তোমাদের কেউ কেউ এটা অনুমোদন করতে পার নি। আমার বিশ্বাস, তোমরা নজরুলের কবিতা না পড়েই এই মনোভাব পোষণ করেছো। আর পড়ে থাকলেও রসের সন্ধান করো নি, অন্ধসংস্কার তোমাদের বুলিয়েছো মাত্র। কাজী অসির ঝনঝনায় থাকতে পারে না এসব তোমাদের অজানা বটে। সমগ্র জাতির অন্তর বেদনার সঙ্গে বাঁধা, অগ্নির ঝনঝনায় গগন পবন ঝংকার তোলে, ঐকতান সৃষ্টি হয়, উঠে কাব্যে তাকে প্রকাশ করবে বৈকি। আজ যদি আজ তরুণ হতাম, তাহলে আমার কলমেও ঐ সুর বাজতো।"

প্র : 'রক্তকরবী' সম্পর্কে লেখ।

উ : 'রক্তকরবী' (১৯২৬) রবীন্দ্রনাথের একটি সাংকেতিক নাটক। ১৩৩০ বঙ্গাব্দে আশ্বিন সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত। মানুষের প্রবল লোভ কিভাবে প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য ও স্বাভাবিকতাকে অস্বীকার করে মানুষকে নিছক যন্ত্রে ও উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপকরণে পরিণত করে এবং তার বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদ কিভাবে ধারণ করে তারই রূপায়ণ এই নাটক। রবীন্দ্রনাথ ভূমিকায় লিখেছেন, 'ধনরূপ পুরুষের প্রবল শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্ন করে আনছে। কিন্তু সংগ্রহের লুব্ধ চেষ্টার তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য সেখান থেকে নির্বাসিত'। বন্দিনী নিপীড়িত মানুষের মাঝখানে দেখা দিয়েছে আনন্দের দূত রূপে। রঞ্জন বিদ্রোহের বাণী বহন করে এনেছে। শেষ পর্যন্ত জয় হয়েছে মানুষের প্রাণশক্তি। বাইরে বেরিয়ে এসেছে জালের আড়াল থেকে যক্ষপুরী রাজা। 'রক্তকরবী'তে ধনের উপর ধান্যের, শক্তির উপর প্রেমের এবং যন্ত্রের উপর জীবনের জয়গান গাওয়া হয়েছে।

প্র : 'তাসের দেশ' গুরুত্বপূর্ণ কেন?

উ : 'তাসের দেশ' (১৯৩৩) রূপক নাট্য। রবীন্দ্রনাথের নিজেরই 'এক আষাঢ়ে গল্প' নামক গল্পের কাহিনি এই নাটকের ভিত্তিভূমি। রাজপুত্র এবং সদাগর পুত্র এক অপরিচিত দ্বীপে এসে পৌঁছেছে, তারা

প্রেমে জীবন শাসিত হয় সাত্ত্বিক নিরাবরণতায়, মুক্তি ও হৃদয়হীন শাসনতন্ত্রের আনুগত্যে। রাজপুত্র এবং সদাগর এই নিয়মশাসিত জীবনের মধ্যে এনেছে বিদ্রোহ। এই নাটকটি উৎসর্গ করা হয় সেতাংশু সুভাষচন্দ্র বসুকে। এই রূপক নাটক লিখে উপনিশেশ শাসিত ভারতবাসীদের জাতৃত্ব ঘোচানোর জন্য একজন সে-রকম মুক্তিপ্রত্ত রূপী রাজপুত্রের আগমনকে কামনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্র : 'চণ্ডালিকা' সম্পর্কে লেখ।

উ : 'চণ্ডালিকা' (১৯৩৩) নাটক। এর কাহিনি গড়ি শার্দুল-কর্ণাবদান থেকে গৃহীত। প্রকৃতি একটি চণ্ডালী কন্যা, সে কিভাবে তার মায়ের সাহায্যে লৌদ্ধ সন্ন্যাসী আনন্দকে প্রলোভিত করেছিল সেই কাহিনিকে রবীন্দ্রনাথ এক নতুনমাত্রা দিয়েছেন। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ যেমন এই কাহিনির প্রধান সুর তেমনি এর মধ্যে আছে সংরাগের প্রকাশ ও তার সংযমের সুষমা। ১৯৩৮ সালে রবীন্দ্রনাথ এই নাটকটিকে নৃত্যনাট্যে রূপ দেন। কথা ও সুরের সমন্বয়ে 'চণ্ডালিকা' রবীন্দ্রনাথের অন্যতম সৃষ্টি।

প্র : 'চিরকুমার সভা' সম্পর্কে লেখ।

উ : 'চিরকুমার সভা' (১৯২৬) কৌতুক নাটক। রবীন্দ্রনাথ ১৯০০-'০১ সালে 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' নামে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় একটি আখ্যান রচনা করেন। 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' ১৯০৮ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। 'চিরকুমার সভা' পরিহাস-উজ্জ্বল গীতবহুল মঞ্চসফল নাটক। ১৯২৬ সালে 'প্রজাপতির নির্বন্ধ'কে 'চিরকুমার সভা' নামে নাট্যরূপ দেয়া হয়। একদল যুবকের বিয়ে না-করার প্রতিজ্ঞা এবং পরে প্রতিজ্ঞাভঙ্গের কৌতুককর কাহিনি নিয়ে এ নাটক রচিত।

প্র : 'নটীর পূজা' গ্রন্থ সম্পর্কে লেখ।

উ : 'নটীর পূজা' (১৯২৬) একটি নাটক। 'কথা ও কাহিনী'র অন্তর্গত পূজারিণী কবিতাটির আখ্যান অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ এই নাটক রচনা করেন। মূল কাহিনিটি বৌদ্ধগ্রন্থ থেকে গৃহীত। গান ও নৃত্য সমন্বিত নাটক 'নটীর পূজা'।

প্র : 'জীবনস্মৃতি' সম্পর্কে লেখ।

উ : 'জীবনস্মৃতি' (১৯১২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত আত্মজীবনী। এখানে রবীন্দ্রনাথের বাল্যকাল থেকে পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত কালের কাহিনি ও স্মৃতি বর্ণনা করা হয়েছে। বর্ণিত কালানুক্রমিক বিবরণের পরিবর্তে ছোটো ছোটো ঘটনা, চিত্র, চরিত্রের সাহায্যে অতীত স্মৃতির উদ্ধার, অভিজ্ঞতার সঞ্চয় বিশ্লেষণে পরিণত হয়ে সহজ সুন্দর আখ্যান বর্ণিত। কৌতুক ও কবিত্বে পাশা বর্ণনা অতিক্রম এটি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম উপাদেয়। আত্মজীবনী রচনার প্রচলিত রীতি ছেড়ে রবীন্দ্রনাথ এ গ্রন্থে নতুন ধারা সৃষ্টি করেন।

প্র : 'কালান্তর' কোন ধরনের গ্রন্থ?

উ : 'কালান্তর' (১৯৩৭) রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষীয় রাজনৈতিক সমস্যা বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধের সংকলন। পরবর্তী সংস্করণে আরও নতুন প্রবন্ধ (যেমন: সভ্যতার সংকট, ১৯৪১) অন্তর্ভুক্ত হয়। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতের বিশ্লেষণে সামগ্রিক পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।'

প্র : 'সভ্যতার সংকট' পাঠ করা প্রয়োজন কেন?

উ : 'সভ্যতার সংকট' (১৯৪১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সর্বশেষ গদ্যরচনা। এই ক্ষুদ্র কিন্তু অসামান্য প্রবন্ধে ইউরোপীয় সভ্যতা ও ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের তীব্র সমালোচনা ও মানবতার প্রতি গভীর আস্থা প্রকাশিত। 'ঐ মহামানব আসে' গানটি এই পুস্তিকার অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া এখানেই তিনি বলেছেন : 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব।' রবীন্দ্রনাথকে বুঝবার জন্য এ প্রবন্ধটি অবশ্য-পাঠ্য।

প্র : 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থ সম্পর্কে লেখ।

উ : 'বিশ্বপরিচয়' (১৯৩৭) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থ। মূলত কিশোর-কিশোরীদের জন্য রচিত হলেও বয়স্কদের উপভোগ্য। এখানে রবীন্দ্রনাথ বহু পরিভাষা প্রস্তুত করেন এবং বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গের উপযোগী ভাষারীতির প্রবর্তন

Scanned with CamScanner

করেছেন। জাতীয়তা এবং রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচিন্তার নিদর্শন হিসাবে গ্রন্থটি মূল্যবান। রবীন্দ্রনাথের অবিসংবাদে তথ্যই কবিশিল্পীর অবলম্বন ছিল না, সেই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক-দার্শনিকের সন্ধান তথ্য ও তত্ত্বদৃষ্টি ছিল, বিশ্বপরিচয় তার প্রমাণ।

প্র : 'মানুষের ধর্ম' কী?

উ। 'মানুষের ধর্ম' (১৯৩৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ধর্মচিন্তা বিষয়ক প্রবন্ধগ্রন্থ। ১৯৩২ সালে রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তমলুক স্মৃতি বক্তৃতাগুলোই এর মূল লেখা। তাঁর ধর্মচিন্তা, বিশেষ করে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম বিষয়ে তাঁর বীতরাগ এবং উদার মানবিক-আধ্যাত্মিকতাবোধের কবিতুময় প্রকাশ এই বক্তৃতা তথা লেখাগুলোর মূল বৈশিষ্ট্য।

প্র : 'পঞ্চভূত' গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ কেন?

উ : 'পঞ্চভূত' (১৮৯৭) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত প্রবন্ধগ্রন্থ। এই প্রবন্ধগুলি সাধনা পত্রিকায় 'পঞ্চভূতের ডায়ারি' নামে ছাপা হয়। ক্ষিতি, অপ্তেজস্বিনী, দীপ্তি, সমীর ও গগন এই পাঁচটি চরিত্রের মধ্যে আলোচনার রীতিতে মূলত তত্ত্ব বিষয়ক সমস্যার সরস ও গভীর বিশ্লেষণ। রবীন্দ্র গদ্যরচনায় এই গ্রন্থটি বিশিষ্ট স্থান দাবি করে। পত্রিকায় প্রকাশের সময় লেখকের নাম ছাপা হতো: 'লেখক ভূতনাথ বাবু'। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় পত্রিকার কিছু অংশ বর্জিত হওয়ায় এর অন্তরঙ্গতা কমেছে। এই গ্রন্থের 'গদ্য ও পদ্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ পদ্যছন্দের উৎপত্তি বিষয়ে যে মন্তব্য করেছেন, আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান এখন সে কথাই বলছে। আসলে পঞ্চভূতের 'ডায়েরি'র মধ্যে সহজ সরল ভাষায় মনোহর ভঙ্গিতে অনেক গভীর কথা আছে।

প্র : 'জাভাযাত্রীর পত্র' সম্পর্কে লেখ।

উ : 'জাভাযাত্রীর পত্র' (১৯২৬) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত পত্র-সংকলন। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ এই পত্রগুলি লিখেছিলেন। তবে ব্যক্তিগত চিঠি বলতে যা বোঝায় এগুলি তা নয়। নতুন দেশের মানুষ ও সমাজ সম্পর্কে,

পথচলাকালীন কবির নানা চিন্তার ঘটেছে এখানে। এই গ্রন্থটিকে প্রবন্ধ বলা চলে।

প্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধগ্রন্থের নাম লেখ।

উ। পঞ্চভূত (১৮৯৭), বিচিত্রপ্রবন্ধ (১৯০৭), সাহিত্য (১৯০৭), মানুষের ধর্ম (১৯৩৩), কালান্তর (১৯৩৭), সভ্যতার সংকট (১৯৪১) ইত্যাদি।

প্র : 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারাব না' কোন প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এ কথা বলেছেন?

উ : 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে।

প্র : ধ্বনিবিজ্ঞানের ওপর লেখা রবীন্দ্রনাথের নাম কী?

উ : শব্দতত্ত্ব (১৯০৯)।

প্র : রবীন্দ্রনাথের গল্পগ্রন্থসমূহ সম্পর্কে লেখ।

উ : রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্পসংগ্রহের নাম 'ছোটগল্প' (১৮৯৩)। পরে প্রকাশিত হয় পরপর চারটি গল্পগ্রন্থ : 'কথা-চতুষ্টয়' (১৮৯৪), 'বিচিত্র গল্প' দুই খণ্ড (১৮৯৪), 'গল্প দশক' (১৮৯৫)। ১৯০০ সালে এই পাঁচটি গ্রন্থের গল্প ও নতুন লিখিত কিছু গল্প নিয়ে প্রকাশিত হয় 'রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ' নামে একটি গ্রন্থ। এরপর সাময়িক পত্রে লিখিত চারটি গল্প নিয়ে প্রকাশিত হয় 'গল্প চারিটি' (১৯১১) নামে গ্রন্থ। ১৯১৬ সালে 'গল্প সল্পক' নামে একটি বই প্রকাশিত হয়। এই গল্পগুলি 'সবুজপত্র' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। পরে প্রকাশিত দুটি গল্প ও দুটি কবিকা 'পাঁচ নম্বর' নামে ১৯২০ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। ১৯৩৭ সালে 'সে' প্রকাশিত হয়। শেষজীবনে লেখা তিনটি গল্প প্রকাশ পায় 'তিনসঙ্গী' (১৯৪০) নামের গ্রন্থে। আর ১৯৪১ সালে অন্য কিছু গল্প নিয়ে বের হয় 'গল্পসল্প' নামের গ্রন্থ। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য, চরিত্রচিত্রণের কুশলতা, গঠনের সুষমা, রচনার ব্যঞ্জনাধর্মিতা সমস্ত দিক থেকে রবীন্দ্রগল্প বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তাঁর গল্পে বাঙালির সুখদুঃখবিরহমিলনপূর্ণ জীবনের ছবি প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে বাংলা ছোটগল্পের জনক বলা হয়।

প্র : রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলি কোন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে?

উ : রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলি 'গল্পগুচ্ছ'-এর তিন খণ্ডে সংকলিত হয়েছে।

প্র : রবীন্দ্রনাথের চারটি সমাজসমস্যামূলক ছোটগল্পের নাম লেখ।

উ : রবীন্দ্রনাথের সমাজসমস্যামূলক ছোটগল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য চারটি ছোটগল্প– 'দেনাপাওনা', 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা', 'মাস্টারের বন্ধু' ও 'অনধিকার প্রবেশ'।

প্র : জীবনের শেষপর্বে রবীন্দ্রনাথ যে আশ্চর্য বুদ্ধিদীপ্ত গল্পগুলি লিখেছিলেন সেগুলির নাম লেখ।

উ : রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষপর্বে আধুনিক নরনারীর মনস্তত্ত্ব নিয়ে যে কয়টি বুদ্ধিদীপ্ত ছোটগল্প রচনা করেছেন সেগুলি হলো : রবিবার, শেষকথা ও ল্যাবরেটরি।

প্র : রবীন্দ্রনাথ রচিত চারটি অতিপ্রাকৃত রসের ছোটগল্পের নাম লেখ।

উ : রবীন্দ্রনাথ রচিত চারটি অতিপ্রাকৃত রসের ছোটগল্প : ক্ষুধিত পাষাণ, নিশীথে, মণিহারা ও কঙ্কাল।

প্র : পণপ্রথা নিয়ে রচিত রবীন্দ্রনাথের একটি প্রসিদ্ধ ছোটগল্পের নাম লেখ। এই গল্পের উপসংহার কী ঘটেছে?

উ : পণপ্রথা নিয়ে রচিত রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ গল্প 'দেনাপাওনা'। গল্পটির উপসংহারে রামসুন্দর মিত্রের আদরের কন্যা হতভাগ্যা নিরুপমার মৃত্যু বর্ণিত হয়েছে এবং তার স্বামীর বিবাহের সংবাদ জানানো হয়েছে।

প্র : রবীন্দ্রনাথের শেষপর্বের ছোটগল্পগুলির একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর এবং এই পর্যায়ের দুটি গল্পের নাম লেখ।

উ : রবীন্দ্রনাথের শেষপর্বের ছোটগল্পগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য সময়ের প্রাসঙ্গিকতা মেনে মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে নরনারীর সম্পর্কের বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণ। এই পর্যায়ের দুটি গল্প : রবিবার ও ল্যাবরেটরি।

প্র : 'তিনসঙ্গী' গল্প সংকলনে কটি গল্প আছে? গল্পগুলির নাম লেখ।

উ : রবীন্দ্রনাথের তিনসঙ্গী গল্প-সংকলনে তিনটি গল্প আছে–রবিবার, শেষকথা ও ল্যাবরেটরি।

প্র : 'সে' কোন সালের গ্রন্থ?

উ : 'সে' (১৯৩৭) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত গল্পগ্রন্থ। উনিশ শতকের সমাজ ও অসমবয়সের বিপদ নিয়ে লেখা গল্পগুলি রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের লেখা। 'কাবুলিওয়ালা' ও 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের কবিতাময় পরিবেশ ও গল্পগুলির শেষে চমকপ্রদ সমাপ্তির জন্যে এগুলি বিশেষ আলাদা।

প্র : 'পোস্টমাস্টার' ছোটগল্প রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয় কী?

উ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পল্লীজীবনের পটভূমিতে লেখা কয়েকটি ছোটগল্প সম্পর্কে 'মানসসুন্দরী' (১৩২৯) প্রবন্ধে মন্তব্য করেছিলেন, "সাধারণত গদ্য আলোচনা সমাজজীবনের চিত্র, পল্লীর ঘরোয়া কথোপোকথন। তাহাই 'পোস্টমাস্টার', 'সমাপ্তি', 'মুক্তি' প্রভৃতি গল্পে। তাহাতে লোকালয়ের গদ্য কাব্যের দৃশ্যগুলি কতদূর যথা সম্ভব ফুটিয়া হইয়াছে।" 'পোস্টমাস্টার' 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ১২৯৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশ লাভ করে। গল্পে চরিত্র তিনটি– পোস্টমাস্টার, রতন ও প্রকৃতি। গল্পটিতে প্রকৃতি কেমন স্বাভাবিক ও ভৌগোলিক পরিবেশ বহন করে গল্পের প্রধান দুটি চরিত্রের আবেগকে নিয়ন্ত্রিত করেছে এবং গল্পের অন্তর্গতি পরিণতিতে অনেক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। পোস্টমাস্টার আর রতন– এ দুটি চরিত্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিরাট ফারাক। এই ফারাকটি গল্পের বাকবিন্যাসে এবং উপস্থাপনায় পরিষ্কার। আবার বয়সেও পোস্টমাস্টার ছিল পূর্ণ যুবক আর রতন নিতান্তই বালিকা। তবে, গল্পের মধ্যেই রতনের মনোগত পরিবর্তনটি হয় এবং সে বালিকার কোঠা অতিক্রম করে। নবীন ভালোবাসার যে ধীরে ধীরে অগ্নিশলাকার মতো প্রজ্বলিত হয় রতন তার প্রমাণ। আর পুরুষের ভালোবাসা নিয়ন্ত্রিত বৈদ্যুতিকবাতির মতো, সুইচের ওঠানামায় তার মাত্রাফের হয়। তাই বালিকা থেকে নারীতে পরিণত হওয়া রতন নিজের অব্যক্ত ভালোবাসার অপমানে কাতর। অপরপক্ষে পোস্টমাস্টার তার

Scanned with CamScanner

তাদেরকে কাজ না-খুলেই একটি তথ্যকণিকা অভিযান করে দেন। এই গানে 'পথিকীতে কে কাহার'– জাতীয় সঙ্গীতকার রচনা করে রবীন্দ্রনাথ স্বরং 'মাহি তত্ত্ব মাহি উপদেশ' এই ধারণা অস্বীকার করেন। আসলে, 'পোস্টমাস্টার' ছোটগল্পে প্রকৃতির আবাসে মনস্তাত্ত্বিক গোপনের মনোযোগের একাশ ঘটেছে তবে তা যে তৎকালে আধিক কাঠামো নিরপেক্ষ ছিল না– এই রবীন্দ্রদর্শনটি ছোটগল্পে পরিষ্কার।

প্র : 'ছিন্নপত্র' কাকে লেখা চিঠির সমাহার?

উ : প্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে লেখা। ছিন্নপত্র প্রকাশ : ১৯১২।

প্র : ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে কার বিবাহ হয়?

উ : প্রমথ চৌধুরীর। পরে তিনি ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী হন।

প্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী গ্রন্থের নাম লেখ।

উ : জীবনস্মৃতি (১৯১২)।

প্র : রবীন্দ্রনাথ কাজী নজরুলকে কোন গ্রন্থ উৎসর্গ করেন?

উ : বসন্ত (প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩২৯, ১৯২৩) গীতিনাট্য।

প্র : কাজী নজরুল রবীন্দ্রনাথকে কী উৎসর্গ করেন?

উ : নজরুলের কাব্যরচনার শ্রেষ্ঠ সমাহার 'সঞ্চিতা'।

প্র : রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্যসংকলনের নাম কী?

উ : 'সঞ্চয়িতা'।

প্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন কোন পত্রিকা সম্পাদনা করেন?

উ : সাধনা (১৮৯৪), ভারতী (১৮৯৮), বঙ্গদর্শন (১৯০১), তত্ত্ববোধিনী (১৯১১)।

প্র : বাংলা সাহিত্যে প্রথম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের নাম কী?

উ : চোখের বালি (১৯০৩)।

প্র : চোখের বালির প্রধান চরিত্রের নাম?

উ : মহেন্দ্র, আশা, বিহারী, বিনোদিনী প্রমুখ।

প্র : রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা রচনা কোন গ্রন্থ দিয়ে শুরু?

উ : পুনশ্চ।

প্র : রবীন্দ্রনাথের কোন গান স্বাধীনতাসংগ্রামে জাতীয় সঙ্গীত?

উ : আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি– গানের প্রথম ১০ পঙ্‌ক্তি।

প্র : এই গানটি রবীন্দ্রনাথের কোন গ্রন্থভুক্ত?

উ : গীতবিতানের স্বদেশিকান অংশভুক্ত।

প্র : এই গানটি রবীন্দ্রনাথের কোন পর্যায়ের গান?

উ : স্বদেশ পর্যায়ের।

প্র : এই গানের সুরকার কে?

উ : রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। (এই গানে বাউল গানের হরকরার সুরের প্রভাব পড়েছিল।)

প্র : বাংলাদেশের কোনো রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে এই সঙ্গীতের কত পঙ্‌ক্তি বাদ্যযন্ত্রে বাজানো হয়?

উ : ৪ পঙ্‌ক্তি।

প্র : এই সঙ্গীত প্রথম কোথায়, কত সালে প্রকাশিত হয়?

উ : বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ১৩১২ (১৯০৫) সালে।

প্র : 'আমার সোনার বাংলা' গান রচনার প্রেক্ষাপট বর্ণনা কর।

উ : বঙ্গভঙ্গ ছিল ব্রিটিশদের কাছে ভারতভাগের টেস্ট-কেস। রবীন্দ্রনাথ ভারতের কোনো রকম বিভক্তি চান নি। তাই তিনি ব্রিটিশদের 'বঙ্গভঙ্গ' প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করেন এবং এর প্রতিক্রিয়ায় দেশ বিষ্ণু দেশাত্মবোধক গান লেখেন। 'আমার সোনার বাংলা' এর একটি। বঙ্গভঙ্গ বিরোধীরা যখন তাদের আন্দোলনের সঙ্গে ধর্মের সম্পৃক্ততা করে, তখনই রবীন্দ্রনাথ এ কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেন।

প্র : রবীন্দ্রনাথের কোন গানটি ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে?

উ : জনগণমন অধিনায়ক জয় হে, ভারতভাগ্যবিধাতা।

প্র : রবীন্দ্রগল্পে কোন বিষয় প্রধানভাবে এসেছে?

উ : পদ্মাপারের মানুষের জীবনচিত্র এবং সাধারণ মানুষের সুখদুঃখ, বিরহমিলন।

প্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কে প্রথম 'বিশ্বকবি' অভিধায় অভিষিক্ত করেন?

উ : পণ্ডিত রোমান ক্যাথলিক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।

প্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গান আছে, 'কেন যেন মনের সাধি নিয়ে সাধি কে আধারে...'। এখানে 'চাদি' শব্দটার মানে কেন, 'কালো' গায় কেন?

উ : এই গানটি নয় সুনোগো, রবীন্দ্রনাথ এখানে ব্যবহার করেছেন লালে হয়তো এখানো এর ব্যাকরণ আছে। আসলে এটি কোনো প্রচলিত গান না। কাজী নজরুল ইসলামও 'মামুদ' কবিতায় ব্যবহার করেছেন। 'মোল্লা-পুরুত লাগানোছে তার সকল মুখাগে চাদি'। তিনিও 'কালো' ব্যবহার করেন নি। আসলে কালোর খরিতরে কবিরা শব্দকে নিজের মতো করে ব্যবহার করেন, রবীন্দ্রনাথও তাই করেছেন। তিনি 'চাদি'র সাথে 'রাত'র যে পেলব শব্দমোজনা করেছেন তাতে তাঁর নীতিকবিতাটি অধিকতর নরম ও গ্রহণযোগ্য হয়েছে। এখানে অন্য কোনো দর্শন না খোঁজাই শ্রেয়। তবে, আমি ব্যক্তিগতভাবে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, গভীর গ্রামীণ জনপদে অনেকে তালাকে চাদি বলে অভিহিত করে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ যেহেতু পতিসরে ছিলেন, সেহেতু সেখান থেকেও রবীন্দ্রনাথ শব্দটি গ্রহণ করতে পারেন। আমার এই খোঁজ নিয়ে জানার ওপর যদি সিদ্ধান্ত নিয়ে বসি তাহলে কিন্তু নজরুলের ব্যাপারটি মিলছে না। অতএব, কাব্যকলার প্রয়োজনেই কবীন্দ্রনাথ, নজরুল দুজনেই তালার বদলে 'চাদি' ব্যবহার করেছেন– এটি মেনে নেয়াই ভালো।

প্র : বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ পরিচালিত জরিপে (২০০৪) সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় রবীন্দ্রনাথের স্থান কোথায়?

উ : দ্বিতীয়।

প্র : কোন বাঙালি প্রথম গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ ও গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করেন?

উ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্র : এর জন্য নিজ পুত্রকে তিনি কী করেন?

উ : এ জন্য তিনি পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমেরিকার আরবানায় ইলিয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান কৃষি ও পশুপালন বিদ্যায় প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে।

প্র : মৃত্যুর পরে রবীন্দ্রনাথের কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়?

উ : মৃত্যুর পর 'রবীন্দ্রনাথের ছড়া' (১৯৪১) ও 'শেষলেখা' (১৯৪১) প্রকাশিত হয়।

প্র : পাক্ষিক সাহিত্য পত্রিকা 'সাহিত্য' সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে রবীন্দ্রনাথ কোন সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন?

উ : 'সাধনা' সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে রবীন্দ্রনাথ 'পরিচয়' সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন।

প্র : রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি মেয়ের গল্পের নাম লেখ।

উ : রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি মেয়ের গল্প হলো– একরাত্রি, মধ্যবর্তিনী, মধ্যবর্তিনী, পুত্রযজ্ঞ, শেষের রাত্রি, নিশীথে, সম্পত্তি।

প্র : রবীন্দ্রনাথের একটি করে কাব্যনাট্য, রূপকনাট্য ও মুক্তধারাটার নাম লেখ।

উ : কাব্যনাট্য– গান্ধারীর আবেদন; রূপকনাট্য– গোড়ায় গলদ; মুক্তধারা– রক্তকরবী; রূপকনাট্য– অচলায়তন।

প্র : রবীন্দ্রনাথ চিত্রকর্ম আরম্ভ করেন কবে ও কিভাবে?

উ : ষাটোত্তর বয়সে; লেখার কালিকুটি থেকে।

প্র : তিনি তাঁর নিজের আঁকা ছবিগুলোকে কী বলেছেন?

উ : শেষ বয়সের গিয়া।

প্র : রবীন্দ্রনাথের ঠৈলিক নাম কী?

উ : টু ডেন তান। অবশ্য বলে রাখা ভালো, কোনো মানুষেরই দেশ বা ভাষাভেদে নাম বদলাতে পারে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে চায়নাতে ব্যাপারটি অন্যভাবে ঘটে। টু ডেন তান অর্থ মেঘমন্দ্রিত প্রভাত। রবীন্দ্রনাথ (রবি+ইন্দ্র+নাথ)-এর অর্থগত ধারণা থেকে চিনদেশে কবির এ নামকরণ করেন মৈইজিং বুদ্ধিজীবীদের সংস্থা ত্রিসেন্ট মুন সোসাইটি। রবীন্দ্রনাথের ৬৩তম জন্মোৎসব উপলক্ষে এই নামকরণ হয়।

প্র : ইউরোপীয় সভ্যতার তথাকথিত বিকৃতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত কী?

উ : রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন দেশের স্ব-সংস্কৃতি ও নিজস্ব সভ্যতার বিলোপ ঘটিয়ে ইউরোপীয় সভ্যতার বিকৃতিকে, নিরুৎসাহিত ও সমালোচনা করে লিখেছেন: 'য়ুরোপের বাইরে আত্মীয়মণ্ডল য়ুরোপীয় সভ্যতার মশালটি আলো দেখাবার জন্যে নয়, আগুন লাগাবার জন্যে।' (-কালান্তর)

প্র : রবীন্দ্রনাথ কোন সময় থেকে নিজের নামের আগে 'শ্রী' লেখা ত্যাগ করেন?

উ : ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাস থেকে (আগস্ট ১৯৩২)। (সূত্র: প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, ৩য় খণ্ড)।

Scanned with CamScanner

প্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কয়টি ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন?

উ : নয়টি। এগুলো হলো : ভানুসিংহ ঠাকুর; অকপটচিত্ত ভাস্কর; অজ্ঞাতকালী পাকড়াশী; নিকষমুনা অট্টাচার্য; নবীনকিশোর শর্মণঃ হরীচরণ দেবশর্মাঃ; রাণীবিনোদ বিদ্যাবিনোদঃ শ্রীমতী কবিরাঃ শ্রীমতী মহামা।

প্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোনো চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন কি?

উ : 'চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথের অভিনয় : তপতী নাটকের অংশগ্রহণ' শিরোনামে ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর অমৃতবাজার পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হলেও বিদেশে চলে যাওয়ায় রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ছবির শুটিংয়ে অংশ নেওয়া সম্ভবপর হয় নি। তবে মুভি ক্যামেরার সেই প্রাথমিক যুগেও রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে পরিচালিত ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের 'বঙ্গভঙ্গ বিক্ষোভ' ধারণ করা এবং একই বছর ২১ ও ২২শে অক্টোবর কলকাতার ক্লাসিক থিয়েটারে সেই প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর (৭ই অগস্ট ১৯৪১) পর তাঁর অন্তিমযাত্রার দৃশ্যও মুভি ক্যামেরাতে ধারণ করে প্রামাণ্য চিত্র তৈরি হয়। তাছাড়া শান্তিনিকেতনে থাকাকালে বিভিন্ন মনীষীদের সঙ্গেও কবির কিছু দৃশ্য ধারণ করা আছে। বিদেশেতো মুভি ক্যামেরায় রবীন্দ্র-উপস্থিতি আছেই। ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে জার্মানিতে তিনি 'দি চাইল্ড' (শিশুতীর্থ) আবৃত্তি করেন। সবাক মুভিতে সেটি পরে পরিবেশিত হয়।

প্র : রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রথম চলচ্চিত্রায়ণ কোনটি?

উ : রবীন্দ্র-ছোটগল্প 'মানভঞ্জন' অবলম্বনে তাজমহল ফিল্ম কোম্পানির ব্যানারে নরেশ মিত্রের পরিচালনায় একই নামে একটি চলচ্চিত্র ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে মুক্তি পায়। এ চলচ্চিত্রের সূচনাতে গল্পকার রবীন্দ্রনাথকে পর্দায় দেখানো হয়েছে।

১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে 'মানভঞ্জন' গল্প অবলম্বনে মধু বসুর পরিচালনায় দ্বিতীয় চলচ্চিত্রায়ণ হয়। এর উদ্যোক্তা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন।

প্র : অপ্রীলতার অভিযোগে রবীন্দ্র-গল্পের কোন চলচ্চিত্র নিষিদ্ধ হয়?

উ : শিশির ভাদুড়ীর পরিচালনায় রবীন্দ্র-ছোটগল্প 'বিচারক' চলচ্চিত্রায়িত হয়ে ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে মুক্তি পায়। মুক্তির পরপরই অশ্লীলতার কারণে ছবিটি নিষিদ্ধ হয়। উল্লেখ্য, এটি ছিল গল্পের দ্বিতীয় চিত্ররূপ।

প্র : রবীন্দ্রনাথ পরিচালিত নাট্যচিত্র কোনটি?

উ : নীতিন বসুর ক্যামেরায় রবীন্দ্রনাথ নিজের লেখা 'নটীর পূজা'র সবাক নাট্যচিত্র পরিচালনা করেন ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে। এতে অংশ নেয় শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা। নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে এ নাট্যচিত্রের শুটিং হয়। উল্লেখ্য, ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় মুক্তি পায় প্রথম বাংলা সবাকচিত্র 'জামাইষষ্ঠী'।

প্র : হিন্দি কোন চলচ্চিত্রের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ?

উ : 'অচ্ছুৎ কন্যা'। ছবিটি ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে মুক্তি পায়।

প্র : রবীন্দ্র-উপন্যাসের কোন চলচ্চিত্রে নজরুল সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন?

উ : রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাস অবলম্বনে ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে একই নামে মুক্তি পায় একটি চলচ্চিত্র। এ ছবির একটি গান রচনা, একটি গানের সুর দেওয়া ছাড়াও ছবিটির সার্বিক সঙ্গীত পরিচালনা করেন কাজী নজরুল ইসলাম।

প্র : রবীন্দ্রনাথ কি বিজ্ঞাপনের মডেল হয়েছিলেন?

উ : আজকের ভাষায় তাঁকে 'মডেল' বলা যেতেই পারে। ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর কলকাতার কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে স্থাপিত একটি প্রেক্ষাগৃহের উদ্বোধন করেন রবীন্দ্রনাথ। প্রেক্ষাগৃহের নাম 'রূপবাণী' ('টকি ফিল্ম'-এর অনুসরণে) রবীন্দ্রনাথের দেওয়া। প্রেক্ষাগৃহটি উদ্বোধনের আগে কলকাতার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের ছবি এবং হস্তলেখা সম্বলিত মুদ্রিত করে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। এতে ছাপা ছিল : "কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের প্রেক্ষাগৃহের নামকরণ করিবেন 'রূপবাণী'।—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (স্বাক্ষর)"। বিজ্ঞাপনটি তৎকালে সুধীমহলে আগ্রহ ও ওৎসুক্যের সৃষ্টি করেছিল।

প্র : রবীন্দ্রনাথ সাজাদপুরে কখন আসেন?

উ : ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে, জমিদারি পরিদর্শনে।

প্র : রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে কত সালে কুষ্টিয়ার শিলাইদহ আসেন?

উ : ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে।

প্র : এ সময় তিনি কোন কাব্য রচনা করেন?

উ : সোনার তরী।

প্র : রবীন্দ্রনাথ কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?

উ : ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই অগস্ট অনুসারে ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২শে শ্রাবণ, দুপুর ১২টা ১০ মিনিটে।

রবীন্দ্রনাথ ও ঢাকা

প্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত বার ঢাকায় আসেন?

উ : ২ বার।

প্র : কোন কোন সালে রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় আসেন?

উ : ১৮৯৮ সালে প্রথমবার; ১৯২৬ সালে দ্বিতীয়বার।

প্র : রবীন্দ্রনাথকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আনার ব্যাপারে কে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন?

উ : জগন্নাথ হলের তৎকালীন প্রভোস্ট এবং পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাঙালি উপাচার্য ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার।

প্র : কত তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম বক্তৃতা দেন; কোথায়?

উ : ১৯২৬ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি; কার্জন হলে।

প্র : এই বক্তৃতার শিরোনাম কী ছিল?

উ : The Meaning of Art.

প্র : কত তারিখে তিনি দ্বিতীয় বক্তৃতা দেন?

উ : ১৯২৬ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি।

প্র : রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বক্তৃতার শিরোনাম কী ছিল?

উ : The Rule of the Giant.

প্র : এই বক্তৃতা কোন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়?

উ : বাগান হলে।

প্র : উক্ত বক্তৃতামালার আয়োজন কে সম্পাদন করেন?

উ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ড. জি এইচ ব্রাউন।

প্র : কত তারিখে রবীন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের সংবর্ধনায় যোগ দেন?

উ : ১৯২৬ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি।

প্র : উক্ত সংবর্ধনায় ছাত্রদের দেয়া প্রশ্নমালার শেষে কী প্রার্থনা ছিল?

উ : 'আশীর্বাদ করুন,— তোমার স্পর্শে যেন এই মুসলিম হলের অন্তরে চিরদিন রস ও নবনব কর্মপ্রেরণা সঞ্চার করে।'

প্র : রবীন্দ্রনাথকে মুসলিম হলে দেয়া এই সংবর্ধনার সংবাদ সমকালীন কোন দুটি সংবাদপত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব নিয়ে প্রকাশিত হয়?

উ : 'দি মুসলমান' এবং 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য়।

প্র : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের ছাত্রদের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ কোন গীতিকবিতা রচনা করেন?

উ : বাসন্তিকা নামের গীতিকবিতা।

প্র : গীতিকবিতাটির প্রথম পঙ্‌ক্তি চারটি কী?

উ : এই কথাটি মনে রেখো/তোমাদের এই হাসি খেলায়/আমি এ গান গেয়েছিলেম/ জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়।

প্র : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে কী ডিগ্রি প্রদান করে?

উ : ডক্টর অব লিটারেচার (ডি.লিট.)।

প্র : কত তারিখে, কিভাবে এই ডিগ্রি প্রদান করা হয়?

উ : ১৯৩৬ সালের ২৯শে জুলাই, বিশেষ সমাবর্তনের মাধ্যমে।

Scanned with CamScanner

প্র : রবীন্দ্রনাথ কি এই সমাবর্তনে উপস্থিত ছিলেন?
উ : না। রবীন্দ্রনাথ এই সমাবর্তনে উপস্থিত ছিলেন না।
প্র : রবীন্দ্রনাথকে যখন ডি.লিট. ডিগ্রি দেয়া হয়, তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কে ছিলেন?
উ : এ. এফ. রহমান।

'সুভা' গল্প থেকে
গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : সুভাষিণীকে আদর করে সবাই কী ডাকত?
উ : সুভা।
প্র : সুভাষিণীর আর কত ভাই বোন ছিল?
উ : সুভাষিণীর কোন ভাই ছিল না। তবে তার আর দুই বোন ছিল।
প্র : তার বড় দুই বোনের নাম কী?
উ : সুবেশিনী ও সুহাসিনী।
প্র : সুভাষিণী নামটি কে রাখে?
উ : সুভাষিণীর বাবা তার বড়ো দুই বোনের নামের সাথে মিল রেখে ছোট মেয়েটির নাম সুভাষিণী রাখে।
প্র : সুভাষিণী কেমন প্রকৃতির মেয়ে?
উ : বোবা।
প্র : সুভাকে তার মা কিভাবে দেখতেন?
উ : নিজের ত্রুটিস্বরূপ। আগেকার দিনে মেয়ের ত্রুটিকে মা নিজের দোষ হিসেবে মনে করতেন।
প্র : সুভার পিতার নাম কী?
উ : বাণীকণ্ঠ।
প্র : সুভার চোখ দুটো কেমন ছিল?
উ : সুদীর্ঘ পল্লববিশিষ্ট বড়ো বড়ো দুটি কালো চোখ ছিল।
প্র : সুভা কিভাবে তার মনের ভাব প্রকাশ করত?
উ : ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমে।
প্র : সুভার চোখের ভাষা কেমন ছিল?
উ : অসীম উদার এবং অতলস্পর্শ গম্ভীর, অনেকটা স্বচ্ছ আকাশের মতো।
প্র : সুভার গ্রামের নাম কী?
উ : চন্ডীপুর।
প্র : বোবা মেয়েটি কার সাথে মনের ভাব প্রকাশ করত?
উ : নদীতীরে এসে নদীর প্রকৃতির সাথে মনের ভাব প্রকাশ করত।
প্র : বোবা মেয়েটির সাথে নদীর কেমন মিতালি ছিল?
উ : নদীপ্রকৃতির সাথে গভীর মিতালি ছিল।
প্র : সুভার অন্তরঙ্গ বন্ধু কারা ছিল?
উ : গোয়ালের দুটি গাভী সর্বশী ও পাঙ্গুলি।
প্র : সুভার মন খারাপ হলে কারা সান্ত্বনা দিত?
উ : তার দুই বন্ধু সর্বশী ও পাঙ্গুলি।
প্র : সুভা কাদের বেশি ভালোবাসত?
উ : গরুদের।
প্র : প্রতাপ কে ছিল?
উ : সুভার গ্রামের গোঁসাইদের ছেলেটির নাম প্রতাপ।
প্র : প্রতাপের প্রধান শখ কী ছিল?
উ : ছিপ ফেলে মাছ ধরা।
প্র : প্রতাপ আদর করে সুভাকে কী বলে ডাকত?
উ : সু।
প্র : সুভা নদীতীরে তেঁতুলতলায় বসলে তার দিকে কে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত?
উ : প্রতাপ।
প্র : প্রতাপ নদীর জলে জাল ফেলে বসে থাকলে সুভা তার জন্য কি নিয়ে আসত?
উ : সুভা তার নিজ হাতে সাজিয়ে একটি করে পান নিয়ে আসত।
প্র : প্রতাপের কাছে পাতালপুরীর রাজকন্যা কে ছিল?
উ : সু অর্থাৎ সুভাষিণী।
প্র : সুভার কলকাতা যাবার দিন স্থির হলে কিভাবে তার বাল্যসঙ্গীদের কাছ থেকে বিদায় নিল?
উ : খাইয়ে দিল। তারপর সে যেহেতু বোবা ছিল তাই চোখ দিয়েই কথা বলতে লাগল। লেখক লিখেছেন : যেন দুচোখে কথা ভরে সখীদের মুখের দিকে সে কথা বলতে লাগল। তখন তার দুই চোক দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।
প্র : বিদেশ যাত্রার উদ্যোগ হলে সুভার মন কেমন হতে লাগল?
উ : কুয়াশা-ঢাকা প্রভাতের মতো সুভার সমস্ত হৃদয় অশ্রুবাষ্পে একেবারে ভরে গেল।
প্র : বিদেশ বলতে এখানে কি বোঝানো হয়েছে?
উ : কলকাতা।
প্র : স্রোতস্বিনী কিসের সমার্থক শব্দ?
উ : নদীর।
প্র : কন্যাভারগ্রস্ত পিতামাতা অর্থ কী?
উ : আগেকার সমাজে এমন কথা প্রচলিত ছিল। যে পিতামাতার বিবাহযোগ্যা কন্যাসন্তানের বিয়ে হয় না তাদের কন্যাভারগ্রস্ত পিতামাতা বলা হতো। কন্যারা স্বাবলম্বী হওয়ায় এমন শব্দের প্রচলন এখন প্রায় উঠে যাচ্ছে।
প্র : 'সুভা' গল্পটি কোন গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?
উ : গল্পকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গল্পগুচ্ছ' নামক গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।
প্র : 'সুভা' গল্পে সুভার প্রতি লেখকের কেমন আচরণ ফুটে উঠেছে?
উ : বাক্‌প্রতিবন্ধী কিশোরী সুভার প্রতি লেখকের

এসব চিত্রগুলো ভালোবাসা ও মমত্ববোধ
ফুটে উঠেছে।
যে রহস্যময় হাসি সুপর- এককথায় বলে।
প্র :
উ : মুগ্ধাসিনী।

'অপরিচিতা' ছোটগল্প থেকে
গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র :
উ : সাতাশ বছর।
প্র :
উ : 'সেই ইতিহাসটুকু আকারে ছোটো, তাহাকে ছোটো করিয়াই লিখিত।'– কোন ইতিহাস?
প্র : অনুপমের বিয়ে ভেঙ্গে যাবার ইতিহাস।
উ : ছেলেবেলায় অনুপম পন্ডিতমহাশয়ের
প্র : বিদ্রূপের পাত্র হয়েছিলেন কেন?
সুন্দর চেহারার জন্য। অনুপমকে শিমুল ফুল
উ : ও মাকাল ফলের সাথে তুলনা করা হয়।
'মুমূর্ষুতে তিনি যে হাঁফ ছাড়িলেন সেই তাঁর
প্র : প্রথম অবকাশ'– কে?
অনুপমের পিতা, ওকালতি করে প্রচুর অর্থ
উ : উপার্জন করেছিলেন।
প্র : অনুপম নিজের কিসের সঙ্গে তুলনা করতেন?
উ : অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোটো ভাই এর সঙ্গে।
প্র : অনুপমের মামার পরিচয় দাও?
উ : অনুপমের চেয়ে তার মামা ৬ বছরের বড় ছিলেন। লেখকের সংসারকে তিনি ফলফুল বালির মতো নিজের অন্তরে শুষে নিয়েছেন, আকর্ষ পাকা লোক হওয়ায় সংসারে তিনি ছিলেন গর্বের। লেখক বলেছিলেন– 'মামা যদি মনু হতেন তবে তিনি হাবড়ার পুল পার হওয়াটাকে তাঁর সংহিতায় একেবারে নিষিদ্ধ করে দিতেন।'
প্র : অনুপমের মনে বিয়ের আশা কে জাগিয়েছিল?
উ : বন্ধু হরিশ, যে কানপুরে কাজ করে হরিশ মানুষটা ছিল রসিক। সেই বলেছিল– 'ওহে মেয়ে যদি বল একটি খাসা মেয়ে আছে।'
প্র : বিয়ের চিন্তা মাথায় আসায় অনুপমের কী অবস্থা হয়েছিল?
উ : 'হৃদয় তখন বিশ্বব্যাপী নারীরূপের মরীচিকা দেখিতেছিল আকাশে তাহার দৃষ্টি, বাতাসে তাহার নিঃশ্বাস তরুমর্মরে তাহার গোপন কথা।'
প্র : কল্যাণীর পারিবারিক অবস্থা কেমন ছিল?
উ : একসময় এদের বংশে লক্ষ্মীর মঙ্গলঘট ভরা ছিল। এখন তা শূন্য বললেই হয়। অথচ তলায় সামান্য আছে। দেশে বংশমর্যাদা রক্ষা করা সহজ নয় বলে পশ্চিমে গিয়ে বাস করছিলেন।
প্র : বিনুদার পরিচয় দাও?
উ : বিনুদা অনুপমের পিসতুতো ভাই। তার রুচি

2020/5/14 23:53

Scanned with CamScanner

ভীম ও তার স্ত্রী কবি নয়নকে সেবায় তুষ্ট করে নয়ন্তী নামে এক কন্যা লাভ করেন। নল ও নয়ন্তী প্রেমে পড়েন। ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও যম দেবতা বাধা দেয়। একদিনকলি পুষ্কর কলিকে পরাজিত করে নল নয়ন্তীকে পান। তিনি ছিলেন বৈদর্ভি।

'ঐকতান' কবিতা থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'ঐকতান' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে?
উ : 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থের ১০ সংখ্যক কবিতা।
প্র : কবিতাটি কবির মৃত্যুর কত মাস আগে প্রকাশিত হয়?
উ : কবির মৃত্যুর চার মাস আগে ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের পহেলা বৈশাখ গ্রন্থাকারে এবং তার আগে ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যার 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশ পায়।
প্র : 'ঐকতান' কবিতাটিতে মূলত কী প্রকাশিত হয়েছে?
উ : জন্মদিনের স্থিতপ্রজ্ঞ কবির আত্মসমালোচনা, কবি হিসেবে নিজের অপূর্ণতার স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকারোক্তি।
প্র : 'ঐকতান' কবিতাটি কোন ছন্দে, কত পর্বে রচিত?
উ : প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত ছন্দে। কবিতাটিতে ৮+৬ এবং ৮+১০ মাত্রার পর্বই অধিক তবে ৯ মাত্রার প্রসম পর্ব এবং ৩ ও ৪ মাত্রার অপূর্ণপর্বে ব্যবহৃত হয়েছে।
প্র : জ্ঞানের দীনতা কবি কিসের দ্বারা পূর্ণ করেন?
উ : ভিক্ষালব্ধ ধন দ্বারা। এই কথাটি প্রতীকী। তিনি অন্য মনীষীদের কাছে ঋণী একথা বুঝিয়েছেন।
প্র : কৃত্রিম পদ্যে কী ব্যর্থ হয়?
উ : গানের পসরা।
প্র : 'ঐকতান' শব্দের অর্থ কী?
উ : বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সমন্বয়ে সৃষ্টসুর।
প্র : 'ঐকতান' কবিতার কবি নিজেকে কী পরিচয় দিয়েছেন?
উ : পৃথিবীর কবি।
প্র : কবির সাহিত্য সাধনা কেন পূর্ণতা পায় নি?
উ : স্বরসাধনায় বহুতর ফাঁক রয়ে গেছে বলে।
প্র : 'ঐকতান' কবিতায় কবি কী স্বীকার করেছেন?
উ : জীবনের সুরের অপূর্ণতা।
প্র : জীবন সংসার কাদের ওপর নির্ভর করে চলে।
উ : শ্রমজীবী মানুষের উপর।
প্র : কবি সমাজের উচ্চ মঞ্চের কোথায় বসেছেন?
উ : সংকীর্ণ বাতায়নে।
প্র : কবি জীবনের সাথে কী যোগ করতে বলেছেন?
উ : জীবন। উচ্ছ্বাস জীবনের সাথে জীবন যোগ না হলে কৃত্রিম পদ্যে গানের পসরা ব্যর্থ হয়।
প্র : কার সুখে সুখে নক্ষত্রের স্তব্ধ করে আছে বিশ্ব সম্মুখে?
উ : মূক ধাত্রী। অর্থাৎ যারা নিজেদের কথা বলতে পারে না।
প্র : 'আমার সুরের অপূর্ণতা' বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?
উ : সকল শ্রেণির মানুষের সুখ-দুঃখের কবি তাঁর কাব্যে গানে তুলে ধরতে পারেন নি। আমার সুরের অপূর্ণতা বলতে কবি এ বিষয়টিই বোঝাতে চেয়েছেন।
প্র : 'কীর্তি' কী?
উ : বড় কাজ। এই শব্দের সম-উচ্চার্য কতিপয় শব্দ সম্পর্কে সচেতনতা জরুরি : কৃতী = সাফল্য লাভকারী বা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; কৃতি = কর্মবীর; কৃতি = বাঘের চামড়া; কীর্তন = কর্মীর গান।
প্র : এই কবিতার প্রথম চাবি-কথা কোন্‌টি?
উ : 'আমি পৃথিবীর কবি'। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ নিজেকে ভাবলোকের নয় মাটি ও মানুষের কবি বলে দাবি করছেন।
প্র : এই কবিতার নামকরণের সঙ্গে কবির আত্মক্ষোভ কোথায়?
উ : কবি বলছেন, পৃথিবী হলো মানুষ, প্রকৃতি, পশুসহ বিভিন্ন সৃষ্টির মিলনক্ষেত্র। তিনি চেষ্টা করেছেন তাঁর রচনায় এসব ধারণ করতে। কিন্তু সব পারেন নি। এই আত্মসমালোচনার ফলে বেরিয়ে আসা ব্যর্থতা মূল্যায়ন করে কবির আত্মক্ষোভ জেগেছে।
প্র : কেন এই ব্যর্থতা?
উ : কবি বলেছেন : 'বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াজালি জীবনযাত্রার'। অর্থাৎ অভিজাত সমাজ ও বংশে জন্মগ্রহণ করার জন্য তিনি চাইলেও অনেক ক্ষেত্রে সব পেরে ওঠেন নি।
প্র : এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কাদের জয়গান গেয়েছেন?
উ : চাষি, তাঁতি, জেলে অর্থাৎ শ্রমজীবী মানুষের।
প্র : সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে কী করা দরকার?
উ : 'জীবনে জীবন যোগ করা।'
প্র : শেষ বয়সে লেখা 'ঐকতান' কবিতায় কবির উপলব্ধি কী?
উ : তাঁর কবিতা বিচিত্র পথে গেলেও সর্বত্রগামী হয় নি। অর্থাৎ পৃথিবীর সব কিছু ধারণ করা সম্ভবপর হয় নি তাঁর পক্ষে। (অবশ্য এটি তাঁর বিনয়ভাষ্য মাত্র। পৃথিবীর সব কিছু কেইবা এক জীবনে ধারণ করতে পারেন!)

...রূপের অপূর্ণতা দূর করার জন্য কবি কাদের ...করেন?
...প্রাজ্ঞজনদের– যারা তাঁর ...এবং সঙ্গে থাকবেন না, ...অভিজাতদের সঙ্গে।
...পাশাপাশি কেন?
...বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সমন্বিত ...সুর ও বহুকণ্ঠের গানমন্ত্র ...তেমনি থাকবে একতারার ...ক্ষুদ্র ও আপাতভাবে ...বাদ্যযন্ত্রও। অর্থাৎ অভিজাত-...সকলের সমন্বয় থেকে ঐক্যশক্তির ...এই কবিতার নামকরণ হয়েছে ...

...অভিষেক' কবিতা থেকে ...পূর্ণ জিজ্ঞাসা

...রাজা, গোরু মন্ত্রী কে?
...চৌরকথার এক অনবদ্য সৃষ্টি হবু ...গোরু মন্ত্রী। এই দুটি নাম যেমন ...তেমনি প্রতীকী। এর মধ্য ...পূর্ণ, তেমনি প্রতীকী। এর মধ্য ...লেখক তাঁদের বক্তব্য তুলে ...
...অর্থ কী?
...ভাগ করে।
...খুশি হলো খুশ কথার অর্থ কী?
...শব্দটি মরে যাওয়া ব্যবহৃত হয়েছে।
...ভাবতে যেন মরে গেল।
...দের নিদ্রা নাই' অর্থ কী?
...সনসাদের ঘুম নেই।
...কি ঠিক প্রয়োগ?
...মানেই, চোখের জল, এতে আর ...বিত্তি 'জল' লেখার প্রয়োজন নেই ঠিক, ...কবিতার ছন্দের খাতিরে কবিগণ এমন ...করতে পারেন। এমন ব্যবহারকে ...বলে।
...থেকে পা দুটি যুক্তরাখার প্রধান ...কী?
...
...অভিষেক কবিতায় রাজার দৃষ্টি কোন ...ছিল?
...থেকে পা দুটিকে রক্ষা করার ...
...ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সারা রাত্র কী ভাবত?
...ধুলা লাগাবে কেন পায়?
...রাজ্য থেকে কী প্রতিকার করতে ...ছিল?
...মাঝে পা ফেলা মাত্র যেন মলিন ...পা দুটিতে না লাগে।
...যখন বললো, তার পায়ে যেন ধুলা ...এর প্রতিকার করতে হবে, তখন কী ...?
...ঘামে গা ভেসে গেল, পণ্ডিতদের ...শুকিয়ে গেল, সভাসদদের রাতে ঘুম ...আসা চোখ গেল, খাড়া কাজে আর হাত ...হয়ে গেল এই ভেবে যে, কখন ...করতে না পারলে তাদের ...
প্র : রাজার সাথে কী যায়?
উ : ...
...শব্দ কী?
উ : নদীর তীরে বসবাসকারী এক প্রকার ...একে 'নদিয়া'ও বলে। অন্য ...একত্রে বলে নদ-নদী বা নদ-...নদ-নদী বিষয়ে আলাদা ...করবেন।
প্র : ধুলা দূর করতে সকলে মিলে কী কীভ করল?
উ : সাতটি সমুদ্রের পানি এনে ...ঢালা।
প্র : কীভাবে ধুলা কমে যাওয়ার সময় ধুলা রাজার কোমলে এসে পড়ল?
উ : রাজার মুখে ও বুকে।
প্র : ধুলার কারণে দেশের অবস্থা কী হলো?
উ : দেশটা সর্বনাশের কিনারায় এসে গেল।
প্র : মশক কী?
উ : 'মশক' মানে মশা। কিন্তু আর একটি শব্দ 'মশক' হলো চামড়াদির জল বা পানি নেবারনের পাত্র বিশেষ। এটি পাটনি শব্দ।
প্র : 'ভিস্তি' কী?
উ : পারসি শব্দ 'বিহিশ্‌ত' থেকে বাঙলায় 'ভিস্তি' শব্দ ব্যবহার চালু হয়েছিল। যারা 'মশক' নিয়ে পানিবহন করে তাদের 'ভিস্তি' বলে।
প্র : 'ভিস্তি' অর্থ কী?
উ : লোকা।
প্র : 'হেরিল' অর্থ কী?
উ : দেখিল'। 'হেরা' অর্থ 'দেখা'।
প্র : 'সন্ধ' কী?
উ : 'সন্ধ' 'সন্দেহ' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ।
প্র : সকল জ্ঞানী-গুণী মিলে ফরাস পণ্ডিতকে কিভাবে ধুলা বন্ধ করতে চাইল?
উ : মানুর দিয়ে পৃথিবী ঢেকে দিয়ে।
প্র : মানুর দিয়ে পৃথিবী ঢেকে দিয়ে রাজার সন্দেহ হলে সবাই কী করতে চাইল?
উ : চর্ম দিয়ে পৃথিবী মুড়ে দিতে চাইল।
প্র : 'শূল' কী?
উ : শলাকাকৃতি অস্ত্র।
প্র : 'মন্ত্রী কহে, আমারো ছিল মনে। কেমনে বেটা পেরেছে সেটা জানতে।' –এই চরণ দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে?
উ : চাটুকারেরা সব সময় অন্যের কৃতিত্ব স্বহস্তগত করার চেষ্টায় থাকে।
প্র : 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতাটি কোথা থেকে নেয়া হয়েছে?
উ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে।

2020/5/14 23:54

Scanned with CamScanner

'দুই বিঘা জমি' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'দুই বিঘা জমি' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

উ : 'কাহিনী' কাব্যগ্রন্থের। এই কাব্যগ্রন্থটি ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পরে রবীন্দ্রনাথের 'কথা' কাব্যগ্রন্থের সহযোগে 'কথা ও কাহিনী' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ পায়।

প্র : রবীন্দ্রনাথ কত তারিখে 'দুই বিঘা জমি' লেখেন?

উ : ১৩০২ বঙ্গাব্দের ৩১শে জ্যৈষ্ঠ।

প্র : 'ভুই' কী?

উ : ভূমি।

প্র : 'ভুঁই' শব্দটি কিভাবে এসছে?

উ : সংস্কৃত 'ভূমি' শব্দ থেকে (ভূমি > ভুই)।

প্র : 'উপেন্দ্র' কে?

উ : 'উপেন্দ্র' থেকে কথ্য ভাষায় হয়েছে 'উপেন'। উপেন্দ্র হলেন দেবরাজ ইন্দ্রের ভ্রাতা (তাই তিনি উপ+ইন্দ্র=উপেন্দ্র)। রবীন্দ্রনাথ নামমাহাত্ম্যের ক্ষেত্রে কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। দেখিয়েছেন, দেবরাজের ভাইয়ের নামে নাম যার তারও কি করুণ দশা!

প্র : 'ভূস্বামী' কী?

উ : ভূমির মালিক (ভূ+স্বামী)।

প্র : 'পাণি' কী?

উ : 'পাণি' অর্থ হাত। লক্ষণীয়, 'পানি' অর্থ জল।

প্র : 'সপ্ত পুরুষ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উ : সাত প্রজন্ম। আসলে এটা এক, দুই করে সাত প্রজন্ম নয়। বহুকালধরে অর্থে।

প্র : 'সে মাটি সোনার বাড়া'– 'বাড়া' কী?

উ : অধিক। (বৃদ্ধি > বাড়া > বাড়)

প্র : 'লক্ষ্মীছাড়া' কী?

উ : অপদার্থ।

প্র : ক্রূর হাসি– কী?

উ : নির্দয়ের হাসি বা হিংস্রের হাসি।

প্র : 'ডিক্রি' কী?

উ : বাদি-প্রতিবাদির দেনা-পাওনা সম্পর্কে আদালতের হুকুম।

প্র : 'ডিক্রি' কোন শব্দ?

উ : ইংরেজি শব্দ (decree)।

প্র : 'এ জগতে হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি– / রাজার হস্ত করে সদা কাঙালের ধন চুরি।'– এই বক্তব্য রবীন্দ্রনাথ কী বুঝিয়েছেন?

উ : রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়েছেন: ধনীরা আরো ধনী হতে চায়। এ কারণে তারা আরো গরীব সাধারণ মানুষকে শোষণ করে। এই শোষণের মাধ্যমেই নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করতে তারা তৎপর থাকে।

প্র : 'মোহগর্ত' কী?

উ : মোহ অর্থ অজ্ঞান বা ভ্রান্তি। 'মোহগর্ত' অর্থ মোহের গর্তে অর্থাৎ অজ্ঞানতার তলদেশে।

প্র : 'মনে ভাবিলাম মোরে ভগবান রবিদেব না মোহগর্তে, / তাই লিখি লিখ বিশ্বলিখিন দুবিঘার পরিবর্তে।'– এই চরণদ্বয় দিয়ে রবীন্দ্রনাথ কী বোঝাতে চেয়েছেন?

উ : গরিব মানুষেরা ধনীদের অত্যাচারে এক সময় সম্পদ রক্ষায় হাল ছেড়ে দেয় এবং তখন তারা মনে করে এটা ঈশ্বর বা খোদার ইচ্ছা। তাই ঈশ্বর বা খোদার নাম নিয়ে নিজের সম্পদের স্বত্ব সে তাগ করে। এখানেও উপেন নিজের সম্পদ হারিয়ে মনে করছে, ঈশ্বর তার দুবিঘা জমির পরিবর্তে এই বিশ্ব জগতের বিপুল জমি তাকে দান করেছেন। এই বক্তব্য তুলে ধরে আসলে রবীন্দ্রনাথ এই ধরনের মানসিকতার বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছেন।

প্র : 'সন্ন্যাসী' কারা?

উ : যারা সংসার ত্যাগ করে ঈশ্বরের সাধনায় ভিক্ষার অন্নে জীবন ধারণ করেন।

প্র : 'সাধুর শিষ্য' কী?

উ : পরম ধার্মিক লোকের অনুসারী।

প্র : 'হেরিলাম' কী?

উ : 'হেরা' অর্থ দর্শন করা। হেরিলাম অর্থ দর্শন করিলাম। এই শব্দটি দেশি শব্দ হলে এটি কাব্যে ব্যবহার হয়। সাম্প্রতিক কাব্যে অবশ্য এই শব্দ বর্জিত হয়েছে।

প্র : 'মনোহর ধাম' কী?

উ : মনোহর অর্থ সুন্দর; ধাম অর্থ গৃহ।

প্র : 'ভ্রমি' কী?

উ : ভ্রমণ করি।

প্র : কত বছর পর তার পূর্বপুরুষের ভিটায় ফিরেছিল?

উ : পনেরো বছর পর।

প্র : 'জনম জনম সুন্দরী মম জননী জন্মভূমি।' – এর পর রবীন্দ্রনাথ কী বর্ণনা করেছেন?

উ : এর পর কয়েক পঙ্‌ক্তি রবীন্দ্রনাথ বাংলার রূপ বর্ণনা করেছেন। সেখানে প্রকৃতি ও মানুষের যে আকর্ষণীয় চিত্রটি আছে তা যেন এই বাংলাদেশেরও। এই বর্ণনায় শুধু একটি নদীর নাম পাল্টে দিলেই তা হুবহু বাংলাদেশের বর্ণনা হয়ে যায়।– সেটা কী?

উ : পদ্মা।

প্র : 'কুমোর' কারা?

উ : যারা মাটির কাজ করে তাদের কুমার বলে। কুমার থেকে কুমোর।

প্র : 'কৃষাণের' কী?

উ : কৃষাণ আতুর বা কাতর।

প্র : 'পহুলি' কোন ধরনের শব্দ?

উ : প্রকৃত শব্দ। বর্তমান রূপ 'পৌছলাম'।

প্র : 'ধিক ধিক ওরে, শত ধিক তোরে, নিলাজ কুলটা ভূমি!'– এই পঙ্‌ক্তিতে উপেনের কী প্রকাশিত হয়েছে?

উ : ক্ষোভ। তাই সে জন্মভূমিকে নির্লজ্জ ও বংশের কাঁটা বলে অভিহিত করছে।

প্র : কেন?

উ : কারণ ভূমির স্বভাবই এই– যে যেভাবে ব্যবহার করে ভূমি নীরবে তা করতে দেয়, কোনো প্রতিবাদ করে না।

প্র : উপেনের এ ক্ষোভ প্রকাশকে মূল্যায়ন কর।

উ : আবেগের দিক থেকে উপেনের এ ক্ষোভ প্রকাশকে সমীহ করা গেলেও এ কথা বলতে হয়, উপেন কেন জমিদারের অত্যাচারের প্রতিবাদ করে নি, দুবিঘার পরিবর্তে বিশ্বনিখিল লাভ করল– এই তৃপ্তি নিয়ে কেন সে স্বেচ্ছায় গ্রাম ছাড়া হলো?– রবীন্দ্রনাথ উপেনের এ ধরনের কর্মের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন নি।

প্র : 'বিবাগী' কী?

উ : সন্ন্যাসী।

প্র : 'সেই সুদূর দক্ষ মধুর, পাঠশালা পলাশন–' এখানে 'পাঠশালা' কোথাকে কোন বিশেষিত?

উ : অপাদানে পূর্ণ বিভক্তি।

প্র : "অবিশ্যি যার অন্য কী থেকোয় ফিরে পাব সে জীবনে। / সকাল বাকাশ ঘেরি পাস পাখা সুদাইতো গাছে,"– এই চরণদ্বয়ের মধ্যে অর্থ-সম্পর্ক দেখাও।

উ : এখানে মানব ও প্রকৃতির অনুষঙ্গিক একাত্মতা লক্ষণীয় মানুষের হতাশা, পরের চরণে প্রকৃতির চির নিয়মান মিলনিমেশ একাকার হয়ে গেছে।

প্র : যমদূত প্রায়– কী?

উ : মৃত্যুর দেবতা যমের দূতের মতো।

প্র : 'সপ্তম সুর' কী?

উ : গানের সর্বোচ্চ সুর। 'এখানে উচ্চাঙ্গের কথা' অর্থে।

প্র : 'পাঠিগাছ'– এখানে 'গাছ' কী?

উ : এটি পদাশ্রিত এক বচন নির্দেশক 'গাছ'র সংক্ষিপ্ত রূপ। এক বচনে সচিব সঙ্গে 'গাছা' বা 'গাছ' বলতে পারে। এ রকম উদাহরণ অনেক আছে: ছড়ি বা ফিতার সঙ্গে বসে 'গাছি'।

প্র : 'পারিষদ' কী?

উ : সঙ্গী-সাথী।

প্র : 'আমি শুনে হাসি ঐশ্বিজ্ঞানে ভণ্ডি, এই ছিল মোর ঘটে–' এই বক্তব্য দিয়ে কী বোঝান হয়েছে?

উ : ভূস্বামী বাবু যখন উপেনকে সাধু ভেবে চোর বলে অভিহিত করছে তখন সভোষ অপলাপ শুনে উপেনের হাসি আসছে, আবার চোখ ভরে আসছে জলও। উপেন ভাবছে, এই চোর ডাক তাকে শুনতে হবে– এই ভাগ্য তার ছিল?

প্র : 'ঘট' কী?

উ : ভাগ্য।

প্র : 'তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটা'– উপেনের এই মন্তব্যে কী প্রকাশিত হয়েছে? রবীন্দ্রনাথই-বা কী বুঝিয়েছেন?

উ : দুর্বলের মুখে নীতিকথা প্রকাশিত হয়েছে। শুধু নীতিকথা দিয়ে যে ভূস্বামী বাবুর হাত থেকে উপেন জমি রক্ষা করতে পারে নি,

20/5/14 23:55

Scanned with CamScanner

রশীদ করীম

প্র : রশীদ করীম কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১৯২৫ সালের ১৮ই জানুয়ারি, গুনগুতায়।

প্র : তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর নাম কী?

উ : উপন্যাস : উত্তম পুরুষ (১৯৬১), প্রদোষ শামাদা (১৯৮৩), আমার যত গ্লানি (১৯৭৩), সোনার শাখর বাটি, বড়ই নিঃসঙ্গ, লাল্‌বাঈ ইত্যাদি। প্রবন্ধ : আর এক দৃষ্টিকোণ, মনের গহনে তোমার মুরতিখানি।

প্র : 'উত্তম পুরুষ' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : রশীদ করীমের এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সালে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র শাকেরকে ঘিরে সেলিনা, অনিমা, শেখর, মুশতাক, সলিল, চন্দ্রা, নিহার ভাবি, নিশির এ রকম অসংখ্য চরিত্র আবর্তিত হয়েছে। এদের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতায় কোথাও কোথাও শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে। আধুনিক মননশীলতা, পরিশীলতা, আঙ্গিক, অভিজাতার নির্লিপ্ত বর্ণনায় পাঠকের পাঠতৃষ্ণার নিবারণ হয়।

প্র : 'আমার যত গ্লানি' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সামাজিক, রাজনৈতিক ও ব্যক্তিক অস্থিরতাকে আশ্রয় করে রশীদ করীম উপন্যাসটি রচনা করেন। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালে। গ্রন্থটিকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যায় না কারণ ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো ছাড়া বাকি সবই কল্পনাপ্রসূত। উপন্যাসের

প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?

উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৮৪), একুশে পদক (১৯৮৫), আদমজী পুরস্কার (১৯৯১), সাহিত্য (২০০১)।

প্র : তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?

উ : ২০১১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর।

রামরাম বসু

প্র : রামরাম বসু কোথায়, কবে জন্মগ্রহণ করেন?

উ : হুগলি জেলার চুঁচুড়ায়, ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে।

প্র : তিনি স্মরণীয় কেন?

উ : বাংলা গদ্যের প্রাথমিক যুগের অন্যতম লেখক হিসেবে।

প্র : তিনি কোন ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন?

উ : পারসি ভাষায়। এই ভাষা শেখার জন্য প্রথম জীবনে সুশ্রিম কোর্টের সাথে দোভাষী উইলিয়াম চেম্বার্সের অধীনে কাজ করেন।

প্র : তিনি উইলিয়াম কেরীকে কোন ভাষা শেখান?

উ : বাংলা ভাষা (১৭৯৩ থেকে ১৭৯৬ পর্যন্ত)।

প্র : তিনি কেরী সাহেবের কী হিসেবে পরিচিত হন?

উ : কেরী সাহেবের মুন্সি।

প্র : কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি অল্প জড়িত ছিলেন?

উ : ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ।

প্র : তিনি রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১) গ্রন্থটি কেন লিখেন?

উ : ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তকের অভাব দূর করার জন্য।

প্র : বাংলা ভাষায় প্রথম মুদ্রিত মৌলিক গ্রন্থ কোনটি?

উ : রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র।

তাঁর প্রথম একটি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম লেখ।

প্র : তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?

উ : ৭ই ১৮১৩।

রামমোহন রায়

প্র : রামমোহন রায় কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১৭৭২ সালে, হুগলির রাধানগর নামক গ্রামে (মুলতি তাঁর শিতার নামে)।

প্র : তাঁর পিতার নাম কী ছিল?

উ : রামকান্ত রায়।

প্র : তিনি মুলত কী হিসেবে পরিচিত ছিলেন?

উ : তিনি ধর্মসংস্কারক, ধর্ম-সংস্কারক, চিন্তাবিদ ও বহুভাষাবিদ পন্ডিত।

প্র : তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কতটুকু?

উ : তিনি গ্রামশিক্ষায়ের পাঠশালায় হাতেখড়ি দেন, পাটনায় আরবি ও পারসি এবং কাশীতে সংস্কৃত শিক্ষাগ্রহণ করেন।

প্র : আরবি ও পারসি ভাষায় লিখিত তাঁর প্রথম রচনা 'তুহফাৎউল মুয়াহ্‌হিদীন' প্রকাশিত হয় কত সালে?

উ : ১৮০৩ সালে।

প্র : এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু কী?

উ : একেশ্বরবাদ।

প্র : তিনি কত সালে একেশ্বরবাদ ধর্মমত অনুসারে অনুবাদ ও ভাষ্যসহ বেদান্তসূত্র ও তৎসমর্থক উপনিষদ প্রকাশে ব্রতী হন?

উ : ১৮১৫–১৮১৯ সালে।

প্র : একেশ্বর উপাসনার উদ্দেশ্যে তিনি কী প্রতিষ্ঠা করেন?

উ : আত্মীয়সভা নামের সংগঠন, ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দে।

প্র : একেশ্বরবাদের উপর ভিত্তি করে রামমোহন যে ধর্মমত প্রবর্তন করেন তার নাম কী?

উ : ব্রাহ্মধর্মমত।

প্র : কোন মত প্রকাশের জন্য রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের সঙ্গে তাঁর বিরোধ প্রকট হয়ে ওঠে।

উ : হিন্দুধর্মে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনাই প্রকৃষ্ট– এই মত।

প্র : তিনি কত সালে একটি সভা স্থাপন করেন?

উ : ১৮১৫ সালে।

প্র : তিনি কত সালে আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠা করেন?

উ : ১৮১৫ সালে।

প্র : তাঁর প্রতিষ্ঠিত সর্ব প্রথমিক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সভার নাম কী?

উ : ৪-১১-১৮২১ তারিখে।

প্র : তাঁর সম্পাদিত পত্রিকাসমূহের নাম কী?

উ : ইংরেজি ভাষা ও ইতিহাস বিষয়ক ত্রৈমাসিক ম্যাগাজিন 'ব্রাহ্মন সেবধি' (১৮২১), বাংলায় 'সমাচার কৌমুদী' (১৮২১) ও পারসি ভাষায় 'মীরাত-উল-আখবার' (১৮২২)।

প্র : 'বেদান্তগ্রন্থ'-এর পরিচয় দাও।

উ : 'বেদান্তগ্রন্থ' (১৮১৫) রামমোহন রায় কর্তৃক ব্রহ্মসূত্রের অনুবাদ ও টীকা। বাংলাদেশের ইতিহাসে রচনাটির ঐতিহাসিক মূল্য অসামান্য। পৌত্তলিকতা যে হিন্দু ধর্মের মূল কাঠামো নয়, তা প্রমাণ একমাত্র তন্ত্র ও উপনিষদ। এ প্রমাণ উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। এই গ্রন্থ প্রকাশের পর ইংরেজি শাসনের প্রথম দিকে প্রবল বাকবিতণ্ডা হয়।

প্র : তিনি বিদেশে 'রাজা' উপাধি পান?

উ : দিল্লির বাদশাহ কর্তৃক, ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে।

প্র : ইংল্যান্ড গমনকারী প্রথম বাঙালি কে?

উ : রাজা রামমোহন রায় (১৮৩১)।

প্র : তিনি কত সালে ফরাসি সম্রাট লুই ফিলিপ কর্তৃক সংবর্ধিত হন?

উ : ১৮৩২ সালে।

20/5/14 23:55

Scanned with CamScanner

প্র : তাঁর লিখিত গ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : বেতালপঞ্চবিংশতি (১৮৩১), বেতালপঞ্চবিংশতি (১৮৩২), শকুন্তলা (১৮৩৭), জীবনচরিত (১৮৪৯), সীতার বনবাস (১৮৬০), বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৭১), বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৭৩), বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৭৩), আখ্যানমঞ্জরী (১৮৬৩), বোধোদয় (১৮৫১), কথামালা (১৮৫৬), চরিতাবলী (১৮৫৬), ভ্রান্তিবিলাস (১৮৬৯), অতি অল্প হইল (১৮৭৩), আবার অতি অল্প হইল (১৮৭৩), ব্রজবিলাস (১৮৮৪), প্রভাবতী সম্ভাষণ (১৮৮৪), রত্নপরীক্ষা (১৮৮৭), ভূগোল (১৮৮৭), জীবনচরিত (১৮৮৭), বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৭৩), সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৩), বর্ণপরিচয় (১৮৫৫), ব্যাকরণ কৌমুদী (১৮৫৮), ঋজুপাঠ (১৮৫১), মেঘদূত (১৮৫৭), ঋজুপাঠ (১৮৬৬), সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা (১৮৫১), সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা (১৮৬৬), সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা (১৮৭৮), সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা (১৮৮৪), সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা (১৮৮৫), সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা (১৮৮৬), সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা (১৮৮৭), সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা (১৮৮৮), সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা (১৮৮৯), সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা (১৮৯০), সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা (১৮৯১), সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা (১৮৯২), সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা (১৮৯৩), সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা

প্র : তাঁর সব রচনাতে সমাজ-জীবনের কোন বোধটি উৎসারিত?

উ : নেতনাবোধ।

প্র : রোকেয়ার কয়েকটি গ্রন্থের নাম লেখ?

উ : মতিচুর (১ম খণ্ড-১৯০৪, ২য় খণ্ড-১৯২২), অবরোধবাসিনী (১৯৩১) ও Sultana's Dream.

প্র : 'অবরোধবাসিনী' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : 'অবরোধবাসিনী' (১৯৩১) রোকেয়ার একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। কতগুলি ঐতিহাসিক ও চাক্ষুষ সত্য ঘটনার হাসি-কান্না নিয়ে এই গ্রন্থের কাহিনি রচিত। নকশাধর্মী ছোট ছোট রচনাগুলির মধ্যে ফুটে উঠেছে অবরুদ্ধ নারীর মর্মান্তিক জীবনকথা। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তাঁর এই গ্রন্থে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, লক্ষ্ণৌ, লাহোর, পাঞ্জাব, দিল্লি ও আলিগড়ের সম্ভ্রান্ত ও উচ্চশিক্ষিত মুসলমান পরিবারে পর্দার নামে অবরোধের অমানবিক ঘটনার ৪৭টি চিত্র তুলে ধরেছেন। রোকেয়া নিজে এগুলোকে 'ঐতিহাসিক ও চাক্ষুষ সত্য ঘটনার হাসিকান্না' বলে অভিহিত করেছেন। এই লেখাগুলো কলকাতার মাসিক 'মোহাম্মদী'র মহিলা পাতায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত। ১৯৩১ সালে রোকেয়ার এই সৃষ্টিকর্ম 'অবরোধবাসিনী' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

প্র : তাঁর উপন্যাসের নাম কী?

উ : পদ্মরাগ (১৯২৪)।

প্র : 'পদ্মরাগ' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : 'পদ্মরাগ' (১৯২৪) রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন রচিত উপন্যাস। আসলে একে উপন্যাস না বলে উপন্যাসোপম গদ্য-আখ্যায়িকা বলাই ভালো। কেননা উপন্যাসের গাঁথুনি এখানে নেই, শিল্প হিসেবেও অসফল। তবে 'পদ্মরাগে'র মূল্য অন্যত্র। প্রথমত কোনো মুসলিম নারীর রচনা; দ্বিতীয়ত মুসলিম সমাজের অন্তঃস্থিত ক্লেদকে এমনভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যা কোনো হিন্দু লেখকের পক্ষে সম্ভব ছিল না; তৃতীয়ত অসাম্প্রদায়িকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আছে এ জন্যে। পরিচয় ও নিদিকার লেখচিত্র আছে এখানে। উপন্যাসটির কাহিনি-ভাবের আভাস এখন 'তারিণীভবন'কে কেন্দ্র করে 'পদ্মরাগে' বলা হয়েছে যে, হিন্দু-মুসলিম-খ্রিস্টান একই মাতৃগর্ভজাত। একটি চমৎকার গল্প আছে এ গ্রন্থের অন্তরালে। এক মুসলিম দম্পতি পাশ্চাত্য সভ্যতার কাছে এলো শিক্ষা নিতে। দেশে তাদের নিজের হিন্দু গুরুর কাছে নিয়ে গেলেন। সেই হিন্দুগুরু আবার তাদের নিয়ে গেলেন নিজের মুসলিম গুরুর কাছে। এভাবে বোঝানো হলো প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে সম্প্রদায়জ্ঞান থাকে না। জ্ঞানের আলোতে কূপমণ্ডূকতা দূর করতে হয়। 'পদ্মরাগ' উৎসর্গ করা হয় রোকেয়ার জ্যেষ্ঠভ্রাতা আবুল আসাদ ইব্রাহিমকে।

প্র : কোন কোন পত্রিকায় তাঁর লেখাগুলো প্রকাশিত হয়?

উ : নবনূর, সওগাত, মোহাম্মদী ইত্যাদি পত্রিকায়।

প্র : বিবিসির জরিপকৃত (২০০৪) সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় তাঁর স্থান কত?

উ : ষষ্ঠ।

প্র : তিনি কোন আন্দোলনের পথিকৃৎ?

উ : মুসলিম নারীমুক্তি আন্দোলনের।

প্র : তাঁর কবে মৃত্যু হয়?

উ : ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৩২।

'চাষার দুক্ষু' রচনা থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : আমাদের সভ্য হতে সভ্যতর হতে কতদিন সময় লেগেছে?

উ : দেড়শত বছর।

প্র : যে বলে বাঙালি সভ্য নহে সে কী?

উ : নিমকহারাম।

প্র : 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় কী?

উ : চাষার দারিদ্র্য।

প্র : 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধে কোন রাগধারার উল্লেখ আছে?

উ : ধান ভানতে শিবের গীত।

প্র : কুল নিশের কর্মচারীরা কত কেজি পেয়ে লবণ চালো?

উ : সর্বোচ্চ ৫০০-৭০০।

প্র : পদ্মা তার বসুন্ধরা যার"—এ উক্তিটির ব্যক্তিকে কিভাবে সম্মান দেখানো হয়েছে?

উ : সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ।

প্র : পুরীকে সর্বশান্ত করেছে কোন মহাযুদ্ধ?

উ : দুটোপোর যুদ্ধ।

প্র : লেখিকা তার শাশ্যকালের কোন ঘটনার কথা বলেছেন—

উ : ঢাকায় ৮ সের সরিষার তৈল ছিল, আর ঢাকায় ৪ সের ঘি।

প্র : কৃষক কন্যা জমিরন দুই গন্ডা পয়সার তেলের জন্য রাজবাড়ি আসিত ঘটনাটা কোন সময়ের?

উ : তখন টাকায় ৮ সের সরিষার তৈল ছিল।

প্র : 'সের' কী?

উ : পরিমাপক পদ্ধতি। কিছুকাল আগেও বাংলাদেশে 'সের' হিসেবে চাল, তেল ইত্যাদি ওজন হতো। ১৬ ছটাকে ১ সের; ৪০ সেরে ১ মণ এমন হিসেব ছিল।

প্র : কত বছর পূর্বেও দুই সের খেসারির জন্য কৃষক তার কন্যা বিক্রি করত?

উ : ৩০/৩২ বছর পূর্বে।

প্র : পঁচিশ বছর পূর্বে উড়িষ্যার অন্তর্গত কলিকা রাজ্যের অবস্থা কেমন ছিল?

উ : কৃষকরা পান্তা ভাতের সাথে লবণ ব্যতীত অন্য উপকরণ সংগ্রহ করতে পারত না।

প্র : রাত-ভায়া সমুদ্রের তীরবর্তী লোকেরা কী করত?

উ : সমুদ্রের জলে চাউল ধুয়ে ভাত রেঁধে খেত।

প্র : রংপুরের লোকদের বস্ত্রাদি কেমন ছিল?

উ : পুরুষেরা বহু কষ্টে স্ত্রীলোকদের জন্য ৮-৯ হাত কাপড় সংগ্রহ করে নিজেরা কৌপিন পড়ত।

প্র : কৃষক নারীর তৈরি পোশাকের নাম কী?

উ : এন্ডি (একখানি এন্ডি কাপড় ৪০ বছর টিকে যেত)।

প্র : অসভ্য থেকে সভ্য হবার বাইরের নিদর্শন কী?

উ : 'শির দিয়ে বাঁকা তাজ
ঢেকে রাখে টাক।'— এটি ব্যঙ্গার্থে বলা হয়েছে।

প্র : চাষার দারিদ্র্য দূর করার উপায় কী?

উ : ঘরে ঘরে চরকা ও গ্রামে গ্রামে পাঠশালা স্থাপন।

লালন সাঁই

প্র : লালন সাঁইয়ের জন্ম কবে এবং কোথায়?

উ : ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দ (১২৭৯ বঙ্গাব্দ), হরিশপুর গ্রাম, মিলনিয়া, মহেশপুর (ঝিনাইদহ) কুমারখালি, কুষ্টিয়ার।

প্র : তিনি মৃণাত কী হিসেবে পরিচিত ছিলেন?

উ : তাঁর জন্ম কোন পরিবারে?

প্র : লালনের পিতৃপ্রদত্ত নাম কী?

উ : লালনচন্দ্র কর।

প্র : তিনি কার কাছে দীক্ষিত পরিচিত হন?

উ : সিরাজ সাঁইয়ের কাছে। তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন বলে লালনের নামের সঙ্গে সাঁই যুক্ত হয়।

প্র : তিনি কোথায় আখড়া স্থাপন করেন?

উ : কুষ্টিয়ার ছেউরিয়া গ্রামে।

প্র : তাঁর শিক্ষা কতটুকু?

উ : হিন্দু মুসলিম শাস্ত্র সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান অর্জন।

প্র : তিনি কোন গান লিখে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন?

উ : বাউল সংগীত।

প্র : তাঁর গান কোন শিল্পগুণ সমৃদ্ধ?

উ : অধ্যাত্মভাব, মর্মস্পর্শী রসব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ।

প্র : তাঁর রচিত গানের সংখ্যা কত?

উ : সহস্রাধিক।

প্র : লালনের গান কে প্রথম সংগ্রহ করেন?

উ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্র : রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক কতগুলো গান সর্বপ্রথম সংগ্রহ করা হয়?

উ : ২৯৮টি (২০টি গান তত্ত্বকর্তৃক 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়)।

প্র : বাঙালি বিদ্বৎসমাজের কাছে লালনকে পরিচিত করার প্রথম কৃতিত্ব কার?

উ : রবীন্দ্রনাথের।

প্র : লালনের একমাত্র যে স্কেচটি প্রচলিত সেটা কে অঙ্কন করেন?

উ : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

Scanned with CamScanner

প্র : লালন গান কেন বাংলা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে সমানভাবে জনপ্রিয়?

উ : লালন গান সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিমুক্ত সর্বজনীন ভাবরসে কক্ষ বলে।

প্র : তাঁর কোন গানগুলো বাউল সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ?

উ : 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি', 'বাড়ির কাছে আরশি নগর', 'আমার ঘর খানায় কে' বিভাজ করে' ইত্যাদি।

প্র : বিভিন্ন জরিপকৃত (২০০৪) সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় তাঁর স্থান কত?

উ : ৯নাশ।

প্র : লালন সাঁইজির মৃত্যু হয় কত সালে?

উ : ১লা কার্তিক, ১২৯৭, শুক্রবার; ১৭ই অক্টোবর, ১৮৯০।

'মানবধর্ম' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'মানবধর্ম' কি লালন লিখিত কবিতা?

উ : লালনের লেখা কোনো কবিতা পাওয়া যায় নি। লালন মুখে মুখে গান বাঁধতেন এবং তাতে সুর দিয়ে গাইতেন। তাঁর অনুসারীরা এই গানগুলো নিজেরা গাইতেন এবং মুখে মুখে প্রচার করতেন। 'মানবধর্ম' আসলে লালনের গাওয়া একটি গান। যেহেতু প্রত্যেক গানই কবিতা, সেহেতু এই গানটিও এক অর্থে কবিতা-গীতিকবিতা।

প্র : 'সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে।'- পঙ্‌ক্তি দিয়ে কী বোঝান হয়েছে?

উ : কায়স্থ লালনচন্দ্র কর যখন সিরাজ সাঁইয়ের আশ্রয়ে বিশেষ তত্ত্বমূলক গান শিক্ষা গ্রহণ করেন তখন স্থানীয় লোকেরা লালনের জাত ও ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। লালন একথা জানতেন বলেই তাঁর গানে তিনি এ প্রসঙ্গ অবতারণা করেছেন।

প্র : আজ লালনের ধর্ম নিয়ে সাধারণ মানুষের বক্তব্য কী?

উ : ঠিক উল্টো। আগে যেমন কেউ লালনকে নিজ ধর্মভুক্ত বলে মানতে চাইতেন না, আজ তারাই লালনকে নিজ ধর্মের প্রমাণ বলে প্রমাণ করতে চাইছেন। হিন্দুরা বলছেন লালন হিন্দু, মুসলিমরা লালন তিনি মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। আসলে লালন এ দুয়ের কোনোটি নন।

প্র : 'লালন কয়, জেতের কী রূপ, দেখলাম না এ নজরে ।'- দিয়ে কী বোঝান হয়েছে?

উ : লালন বুঝিয়েছেন, জাত বলে কিছু আছে কি-না, তা তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনে দেখতে পান নি। মানুষ নিজেই জাত-ইত্যাদির নামে দিনরাত নিজেকে আটকে থাকে। এই জাতের পরিচয় দিয়ে নিজেরাও বুঝতে পারে না।

প্র : 'মালা' বলতে লালন কী বুঝিয়েছেন?

উ : 'জপমালা'। তুলসী বা রুদ্রাক্ষের জপমালা তৈরি করে হিন্দুরা ভগবানের নাম জপ করে। তাই একে 'জপমালা' বলে।

প্র : 'তসবি' কী?

উ : মুসলমানরা যে দানা বা গুটিসমেত মালা নিয়ে খোদার নাম জপ করে তাকে তসবি বলে।

প্র : 'তসবি' কোন শব্দ?

উ : আরবি শব্দ।

প্র : 'যাওয়া কিংবা আসার বেলায়' বলতে কী বোঝান হয়েছে?

উ : জন্ম কিংবা মৃত্যুকালে।

প্র : 'জেতের চিহ্ন' বলতে কী বোঝান হয়েছে?

উ : জাতের চিহ্নকে। যেমন, হিন্দুদের ছিল জপমালা, পৈতা, তিলক, টিকি ইত্যাদি; মুসলিমদের চিহ্ন তসবি, চোখে সুর্মা, টুপি, দাড়ি ইত্যাদি।

প্র : 'গর্তে গেলে কূপজল কয়, / গঙ্গায় গেলে গঙ্গাজল হয়, / মূলে এক জল, সে যে ভিন্ন নয়, / ভিন্ন জ্ঞানায় পাত্র-অনুসারে ।'- কবিতার এ স্তবকে কী বলা হয়েছে?

উ : মানুষ সবাই সমান। হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ করলে হিন্দু বলে, মুসলিম ঘরে জন্ম নিলে মুসলিম বলে, খ্রিষ্টান ঘরে জন্ম নিলে খ্রিষ্টান বলে। আসলে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সবাই মানুষ- সবাই এক জাতি। বৃষ্টির পানি যেমন, কুয়োতে পড়লে কুয়োর পানি বলি; গঙ্গানদীতে পড়লে পবিত্র পানি বলি; ধানখেতে পড়লে সে পানিকে সাধারণ পানি বলি এবং তা দিয়ে হালকা কবি- তেমনি মানুষও জন্মের কারণে এই সমাজে ভিন্ন ভিন্ন জাত-পাত হয়। প্রভু কিন্তু সাধু, মানুষই তার 'আসল পরিচয়'।

প্র : 'গঙ্গাজল' কী?

উ : গঙ্গা নদীর পানি। গঙ্গা হিমালয় পর্বত থেকে সারাবারি নেমে এসেছে বিধায় এর পানিকে পবিত্র জ্ঞান করা হয়।

প্র : 'জাগৎ বেড়ে জাতের কথা,'- 'বেড়ে' কী?

উ : বেষ্টন করে বা জুড়ে।

প্র : 'ফাতা' কী?

উ : এটি একটি আরবি শব্দের কথ্যরূপ।

প্র : 'ফাতহ্' (আরবি) শব্দের অর্থ বিজয় বা গৌরব। এখানে 'গৌরব' অর্থে ফাতহ্ > ফাতা ব্যবহার হয়েছে।

প্র : 'সাত বাজার' কী?

উ : সব মানুষ।

প্র : 'লালন সে জেতের ফাতা / বিকিয়েছে সাত বাজারে ।'- অর্থ কী?

উ : লালনের জাতের গৌরব নেই, তিনি তা সব মানুষের মধ্যে নিশিয়ে দিয়েছেন।

শওকত আলী

প্র : শওকত আলী কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১৯৩৬ সালের ১২ই জানুয়ারি, দিনাজপুরে।

প্র : তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর নাম কী?

উ : উপন্যাস : পিঙ্গল আকাশ (১৯৫৩), যাত্রা (১৯৭৬), প্রদোষে প্রাকৃতজন (১৯৮৪), দক্ষিণায়নের দিন (১৯৮৫), কূলায় কালস্রোত (১৯৮৬), পূর্বরাত্রি পূর্বদিন (১৯৮৬), যেতে চাই (১৯৮৮), ওয়ারিশ (১৯৮৯), বাসর মধুচন্দ্রিমা (১৯৯০), উত্তরের খেপ (১৯৯২), হিসাবনিকাশ (১৯৯৮), দলিল (২০০১), উপরে ছাপ (২০০২) ইত্যাদি। গল্প : উনুল বাসনা (১৯৬৮), লেলিহান স্বাদ (১৯৭৮), তন হে লক্ষিন্দর (১৯৮৮), বাবা আপনে যান (১৯৯৪)।

প্র : শওকত আলীকে কিসের কথাশিল্পী বলা হয়?

উ : এই উপন্যাসে বাংলা কথা সাহিত্যের সমাজ ও অর্থনৈতিক দিক তুলে ধরা হয়েছে।

প্র : 'ওয়ারিশ' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : 'ওয়ারিশ' শওকত আলী রচিত একটি উপন্যাস। এতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তীকালের সমাজের অবক্ষয়ের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই উপন্যাসে দুটি পরিবারকে কেন্দ্র করে কাহিনি গড়ে উঠেছে। একটি হলো মুসলিম পরিবার, অন্যটি হিন্দু পরিবার। এই উপন্যাসের সময় ধরা হয়েছে বাংলা সালের ১৩৭৭ থেকে ১৪০৭ সাল পর্যন্ত। মানুষের মধ্যে পারস্পরিক অসম্মান ও অবিশ্বাস ছিল চরমে। উপন্যাসে কোনো একক ব্যক্তিকে নায়ক করা হয় নি। প্রাকৃতজন অর্থাৎ বাজারের লোকজন সমষ্টিগতভাবে এই উপন্যাসে নায়ক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। উপন্যাসটির ভাষা এর প্রধান সম্পদ। সপ্তাহ বিশেষে লক্ষ্যে একাধিক শব্দভাণ্ডার অনুসরণ করায় ভাষারূপ উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে। এর ফলে পাঠক উপন্যাসটি পাঠকালে অনুভব যেন লক্ষণ সেনের এই সময়ে ফিরে যান।

প্র : 'ওয়ারিশ' উপন্যাস সম্পর্কে লেখ।

উ : শওকত আলী রচিত 'ওয়ারিশ' (১৯৯১) উপন্যাসটি মহাকালিক ব্যাপ্তি আছে। অতীত থেকে বর্তমান হয়ে ভবিষ্যতের দিকে যেতে হয়। এরই নাম মানব সভ্যতার ইতিহাস, যাকে বলা যায় ক্রমবিকাশ। আর কথাশিল্পী শওকত আলী কালজু চরিত্রের মাধ্যমে উপন্যাসে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির ধারাবাহিকতাই প্রকাশ করেছেন অনবদ্য গদ্যশৈলীতে।

প্র : 'উত্তরের খেপ' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : ট্রাক ড্রাইভার বাবা ও বিহারি মায়ের সন্তান হায়দারের সাথে বিয়ে হয় বড়লোকের নাতনি মরিয়মের। কিন্তু কিছু দিন পর আবার মরিয়মের বিয়ে হয় এক অসচ্চরিত্র, কুচক্রীর সঙ্গে। এরকম

2020/5/14 23:55
Scanned with CamScanner

পরিস্থিতিতে তৃতীয় চরিত্র মিঠুকে দাঁড় করিয়ে এক প্রগতিশীল কাহিনি নির্মাণ করে শওকত আলী রচনা করেন 'উত্তরের খেপ' (১৯৯২) উপন্যাসটি। এ উপন্যাসটি আমাদের গ্রামীণ বাস্তবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

প্র : 'ঘাসু' কী ধরনের রচনা?

উ : 'ঘাসু' (১৯৭৬) মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস।

প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?

উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৮), আদমজী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৯), একুশে পদক (১৯৯০)।

প্র : তিনি কবে, কখন মৃত্যুবরণ করেন?

উ : ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি বৃহস্পতিবার সকাল ৮:১৫ মিনিটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

শওকত ওসমান

প্র : শওকত ওসমান কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১৯১৭ সালের ২রা জানুয়ারি; হুগলি।

প্র : শওকত ওসমানের প্রকৃত নাম কী?

উ : শেখ আজিজুর রহমান।

প্র : তিনি মূলত কী হিসেবে পরিচিত?

উ : কথাসাহিত্যিক।

প্র : তাঁর কোন রচনাটি ১৯৪৬ সালে দৈনিক আজাদের সাহিত্য সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়?

উ : উপন্যাস 'বনি আদম'।

প্র : গ্রন্থাকারে প্রকাশিত তাঁর প্রথম পুস্তক কোনটি?

উ : জননী (১৯৬১)।

প্র : শওকত ওসমানের 'জননী' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : সন্তানের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য একজন মা (গোপনে) যে কোনো পথ অবলম্বন করতে পারে শওকত ওসমানের 'জননী' (১৯৬১) উপন্যাসে সে কথাই ব্যক্ত। পটভূমি পশ্চিমবঙ্গের মহেশডাঙ্গা। দরিয়া-বিবি সেই পল্লি-জননী যে সন্তান মোনাদিকে আর্থিক সহায়তা দেবার জন্য ইয়াকুবের শয্যাসঙ্গিনী হয়। ইয়াকুবের ঔরসে তার গর্ভে সন্তান এলো তবু গর্ভস্থ সন্তানকেও দরিয়া অসীম মমতায় সকল দুঃখ সহ্য করে নিরাপদে জন্মদানের মাধ্যমে আদর্শ জননীর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এই মূলকাহিনির পাশাপাশি উপন্যাসে এসেছে মুসলিম সমাজের শরিয়তি দ্বন্দ্ব, নিওনানের স্বার্থপরতা, গ্রামের দরিদ্র মানুষের পারস্পরিক ঝগড়া ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নিদর্শন। উল্লেখযোগ্য চরিত্র : দরিয়া-বিবি, আজহার, মোনাদি, ইয়াকুব, চন্দ্রকোটার প্রমুখ।

প্র : কোন গ্রন্থ রচনার জন্য তাঁকে আদমজি পুরস্কার দেয়া হয়?

উ : ক্রীতদাসের হাসি।

প্র : 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি' (১৯৬২) উপন্যাসটিতে প্রতীকাশ্রয়ে তৎকালীন পাকিস্তানিদের বিরূপ শাসনের সমালোচনা করা হয়েছে। বাগদাদের বাদশা হারুন অর রশিদ অত্যাচারী। সে ক্রীতদাস তাতারি ও বাঁদি মেহেরজানের প্রণয়ে বাধা সৃষ্টি এবং তাতারিকে গৃহবন্দি ও অত্যাচার করে। তাতারি আমৃত্যু বাদশা হারুনের নির্যাতনের প্রতিবাদ করে যায়। এখানে তাতারি বাঙালি জনতার এবং বাদশা হারুন আইয়ুব খানের প্রতীক। তাতারির হাসি উপন্যাসে বাঙালির স্বাধীনতার প্রতীক হয়ে উঠেছে। এটি শওকত ওসমানের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে স্বীকৃত।

প্র : 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসের রূপকার্থ ব্যাখ্যা কর।

উ : শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি' (১৯৬২) উপন্যাসটি ১৯৬১ সালে রচিত এবং এতে তৎকালীন সামরিক শাসক আইয়ুব খানের সমালোচনা করা হয়েছিল রূপক-প্রতীকের আশ্রয়ে। আইয়ুবীয় সামরিক শাসনে পীড়িত পূর্ব-পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের আত্মিক প্রতিবাদের শব্দরূপ এই উপন্যাস। মধ্যপ্রাচ্যের কাহিনির আধারে এই উপন্যাসে তৎকালীন

পাকিস্তানকেই তুলে ধরা হয়েছে। উপন্যাসের চরিত্রগুলো এ-প্রসঙ্গে বেশ চিহ্নিত করা যায়। যেমন: বাদশা হারুন হলেন পাকিস্তানের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ; তাতারী হলেন পাকিস্তানের সাধারণ জনতা; মেহেরজান হলেন বাংলার স্বাধীনতা, যা তাতারি থেকে পাকিস্তানিশক্তির কাছে বার বার হাতবদল হয়েছে ইত্যাদি। এভাবে মুক্তিকামী প্রতীকায়ন করে বাঙালির স্বাধীনতার স্পৃহাই রূপকাশ্রয়ে ব্যক্ত হয়েছে উপন্যাসে।

প্র : তাঁর লেখা দুটো মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস নিয়ে আলোচনা কর।

উ : শওকত ওসমানের 'জাহান্নম হইতে বিদায়' বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বছর রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ। ১৯৭১ সালে লেখক এই গ্রন্থ রচনা করেন। অবশ্য তখন তিনি কলকাতায় অবস্থান করছিলেন এবং তাই বইটি বের হয় কলকাতার প্রবল পাবলিশার্স থেকে। এই উপন্যাসটি প্রকাশ পেলে তা পাঠ করে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি পাঠকসহ সেখানে অবস্থানকারী বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী শরণার্থী বাঙালিরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আশাবাদী হয়ে ওঠেন। প্রচলিত ধারার উপন্যাসের মতো এই উপন্যাসের নায়ক কোন ব্যক্তি নয়, নায়ক হলো সময় বা যুদ্ধকাল। যে সময় সোনার বাংলাকে শ্মশানে পরিণত করেছিল পাকিস্তানিরা, সে সময় শিল্পীর কণ্ঠে ভেসে ওঠে এমন গান: সোনায় মোড়ানো বাংলাকে আমার শ্মশান বানালো কে? ইয়াহিয়া তোমায় আসামির মতো জবাব দিতে হবে। কী অসীম সাহস শিল্পীর! ঔপন্যাসিক শওকত ওসমানও তাই করলেন। উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র গাজী রহমানের অভিজ্ঞতায় শওকত ওসমান তুলে ধরেছেন যুদ্ধকালীন পাকিবর্বরতা। গাজী রহমান যুদ্ধকালের সাহসী মুক্তিযোদ্ধা নয়। বরং সে সময় নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে পথে নামে সে। এক সময় দেশের সীমান্ত পেরিয়ে নিরাপদ

বোধ করে নিজে। কিন্তু [illegible]
পাঠক জানতে পারে, সাজানো [illegible]
থেকেই মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে [illegible]
করছে। ১৯৭১ সালের [illegible]
পূর্ববাংলে বঙ্গবন্ধুকে [illegible]
তাঁকে পাকিস্তান [illegible]
সে সময় সাধারণ [illegible]
ছিল যে, বঙ্গবন্ধু [illegible]
এবং দেশেই আসেন। [illegible]
গেরিলা কায়দায় তিনি [illegible]
করছেন। গাজী রহমান [illegible]
জানেন না যে, বঙ্গবন্ধু [illegible]
গ্রেফতার এড়িয়ে গেরিলা কায়দায় [illegible]
পরিচালনা করছেন– এটা মনে করে [illegible]
নৌকার মাঝি গাজী রহমানকে তিরস্কার করে। উপন্যাসে আছে: "বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হয়েছেন এ ধারণার জন্য গাজী রহমানকে সে বোকাই মনে করে ও তিরস্কার করতেও ছাড়ে না। সে বলে, 'হাজুর, আপনে লিখাপড়া মানুষ এ কথা জানেন না?' এই সাংলাপেই বোঝা যায়, বঙ্গবন্ধু গণমানুষ ছিলেন এবং তাঁর ওপর সাধারণ মানুষের আস্থা ছিল পর্বতের মতো অটল। তবুও কারণে শেষে বিভ্রান্তি গাজী রহমানের স্বপ্নজগতে প্রবেশ ঘটে। স্বপ্নে গাজী রহমান জল্লাদের হত্যাগৃহে হাজির হন। আসলে যুদ্ধকালীন বাংলাদেশ ও জল্লাদের হত্যাগৃহ এখানে সমার্থক হয়ে ওঠে। জল্লাদগৃহ থেকে স্বপ্ন দেখে পালিয়ে বাঁচতে চান গাজী! তন্দ্রা ছুটে যায় তার। তখন অবশ্য সে সীমান্ত অতিক্রম করে নিরাপদ আশ্রয়ে। এই উপন্যাসে পলায়নপর মধ্যবিত্তের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এডভোকেট রেজা আলী, রামপন্থী নেতা কিরণ রায় প্রমুখ কয়েকটি চরিত্র আছে এই উপন্যাসে।

দুই সৈনিক :

শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক উপন্যাস 'দুই সৈনিক' প্রকাশ হয় ১৯৭৩ সালে। ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ-পরবর্তী কোনো দিনের অনূর্ধ্ব পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে সংঘটিত একটি ঘটনার বর্ণনারূপ 'দুই

2020/5/14 23:55

Scanned with CamScanner

সৈনিক' উপন্যাস। প্রত্যক্ষযুদ্ধবিবর্জিত উপন্যাসে যে বাস্তবতা মুর্তে উঠেছে এতে ঘতোটা সমাজসত্য রয়েছে তার চেয়ে বেশি রয়েছে রাজনৈতিক আদর্শগত চেতনা। পাকিস্তানপন্থী 'মৌলিক গণতন্ত্রী চেয়ারম্যান' হাজি মখদুম মুখা ইসলাম বিপন্নতার কথা বলে মূলত পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা করতে চায়। সে কৌশলে প্রচার করে কমিউনিস্ট, আওয়ামী লীগের লোকজন, হিন্দুরা আর ভারত হলো পাকিস্তানের শত্রু। ২৫শে মার্চের রাতের পর মখদুম হাজির আসল রূপ প্রকাশ পায় এবং সে সরাসরি বাঙালিদের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা করে। শুধু তাই নয়, পাকবাহিনীকে ফেরেব্তা বলেও প্রচার করে সে। সায়ীদ মাতব্বর মখদুম মুধার সহচর ও সমমানসিকতা সম্পন্ন। সে-ও বাঙালি হয়ে পাকবাহিনীকে সহযোগিতা করে। চেয়ারম্যান মখদুম হাজিকে সে বলে: 'মুধাসাব, দ্যাশে ইসলামী আর কিছু থাইকব না, এই আওয়ামী লীগ যদি শাসন চালায়। হিন্দু রবি ঠাকুররে নিয়া কী মাতামাতি! ওতবা, নাইজোবিল্লাহ্। তৌবা।' মখদুম হাজি এতোটাই পাকিস্তানপন্থী ছিল যে, গ্রামে পাকবাহিনী টহল দেবার সময় সে নিজ বাড়িতে তাদের আতিথ্য গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। শুধু তাই নয়, নিজকন্যা সাহেলী ও চামেলীকে দিয়ে মেজর হাকিম ও ক্যাপটেন ফৈয়াজকে খাবার পরিবেশন করায় সে। শহরে থেকে লেখাপড়া করার কারণে সাহেলী ও চামেলী আওয়ামী লীগের রাজনীতি ও দেশ স্বাধীন করার অন্দোলন সম্পর্কে সম্যকভাবে জ্ঞাত ছিল। বলা চলে, পাকিস্তানপন্থী পিতার সন্তান হয়েও তারা মুক্তিযুদ্ধপন্থী। অবশ্যই এমন উদাহরণ সে সময় প্রচুর ছিল। উপন্যাসে দেখা যায়, মখদুম হাজির বাড়িতে খাদ্যগ্রহণের আগে প্রচুর মদ্যপান করে পাকিস্তানী সৈন্যরা। এক পর্যায়ে মেজর হাকিম ও ক্যাপটেন ফৈয়াজ মখদুমের কন্যদ্বয়কে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয় এবং

মখদুম হাজি তাতে সম্মতও হয়। কিন্তু বিয়ের আগে সে নর ডয়ার পিতাদের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে মেজর ও ক্যাপটেন তৎক্ষণাৎ সাহেলী ও চামেলীকে নিয়ে করতে চায়। মখদুম হাজি বুঝতে পারে, এটা বিয়ে নয়, বিয়ের নামে সম্ভ্রম। এবার তার পিতৃত্বজনা জাগ্রত হয় এবং সে এর বিরোধিতা করে। কিন্তু তার বিরোধিতায় কোনো কাজ হয় না। মেয়েদের সামনে অপদস্থ হয়া তার দুই কন্যা। মেয়েরা তা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে। পিতা ও পাকিস্তানের সেবক বলে পরিচিত হাজি মখদুম মুধা। এই উপন্যাসে মখদুম মুধার মায়ের চরিত্র আছে, নাম 'রুহি বিবি'। চরিত্রটি সবল নয়। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে বিবেকের ভূমিকায় সে অবতীর্ণ হয়। এই চরিত্রের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের নামে যারা বাড়াবাড়ি করেছে, যারা নারীদের অসম্মান করেছে বা ভূমি দখল করেছে তাদের উদ্দেশে বলানো হয়েছে: 'পাকিস্তান বানাইছিলি না? তহন হিন্দু মাইয়াদের উপর জুলুম অইলে কইতিস অমন দুএকড়া হয়। অহন দ্যাখ অল্লার ইনসাফ আছে কি না।' পাকবাহিনীর মেজর হাকিম ও ক্যাপটেন ফৈয়াজ এই দুইজনকে অবলম্বন করেই উপন্যাসের নামকরণ 'দুই সৈনিক'। শওকত ওসমান এই উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বহু ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনাংশ উল্লেখ করেছেন মাত্র।

প্র : তাঁর প্রকাশিত প্রধান গ্রন্থের নাম কী?

উ : **প্রবন্ধ** : সংস্কৃতির চড়াই উৎরাই (১৯৮৫), মুসলিম মানসের রূপান্তর (১৯৮৬)। **উপন্যাস** : ক্রীতদাসের হাসি (১৯৬২), সমাগম (১৯৬৭), চৌরসন্ধি (১৯৬৮), রাজা উপাখ্যান (১৯৭০), জাহান্নাম হইতে বিদায় (১৯৭১), দুই সৈনিক (১৯৭৩), নেকড়ে অরণ্য (১৯৭৩), পতঙ্গ পিঞ্জর (১৯৮৩), রাজসাক্ষী (১৯৮৫), জলাংগী (১৯৮৬), পুরাতন খঞ্জর (১৯৮৭)। **গল্প:** পিঁজরাপোল (১৩৫৮), জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প (১৩৫৯), প্রস্তর ফলক (১৩৭৪), শুভ্রপুষ্প (১৩৭৫), শ্রেষ্ঠ গল্প (১৩৭৪), জাল যদি তব সঙ্গে (১৩৭৫), প্রতিদ্বন্দ্বী (১৯৯০) ইত্যাদি। **নাটক** : আমলার মামলা (১৯৪৯), তখত ও তালাক (১৯৫৩), বাগদাদের কবি (১৩৫৯), পূর্ণ স্বাধীনতা যুধ (১৯৯০)। **শিশুতোষ** : ওটেন ঘন্টিদার (১৯৮০), তারা দুই সহোদর (১৯৪৪), ফুলে সোশালিস্ট জন্ম (১৩৭৩)।

প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?

উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬২), জনমজি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৬), একুশে পদক (১৯৮৩), ফিলিপস পুরস্কার (১৯৯১)।

প্র : কোন গ্রন্থের জন্য তিনি ফিলিপস পুরস্কার লাভ করেন?

উ : 'ক্রীতদাসের প্রতিদ্বন্দ্বী' গল্পগ্রন্থের জন্য।

প্র : শওকত ওসমানের কালোত্তীর্ণ উপন্যাস কোনটি? এর ধরন কী?

উ : ক্রীতদাসের হাসি। প্রতীকাশ্রয়ী উপন্যাস।

প্র : ক্রীতদাসের হাসির ইংরেজি অনুবাদ কোথা থেকে প্রকাশিত হয়?

উ : এসমান জামালকৃত জননী (ইংরেজিতেও একই নাম রাখা হয়েছে) অক্সফোর্ড (১৯৯৩) ও কবীর চৌধুরীকৃত এ ড্রেড লাফস (১৯৭৬) দিল্লি থেকে প্রকাশিত হয়।

প্র : তিনি কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?

উ : ১৯৯৮ সালের ১৪ই মে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্র : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১৮৭৬ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৩ই ভদ্র ১২৮৩, হুগলির দেবানন্দপুর গ্রামে।

প্র : তিনি মূলত কী হিসেবে পরিচিত?

উ : অপরাজেয় কথাসাহিত্যিক।

প্র : তাঁর পিতার নাম কী ছিল?

উ : মতিলাল চট্টোপাধ্যায়।

প্র : তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কতটুকু?

উ : তিনি ভাগলপুর দুর্গাচরণ এম.ই স্কুল থেকে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৮৮৭), টি.এন. জুবলি স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস (১৮৯৪), এরপর দারিদ্র্যের জন্য লেখাপড়া চালু দি।

প্র : তিনি কত সালে ঔনিকার কর্পোরেস রেঙ্গুনে গমন করেন?

উ : ১৯০৩ সালে।

প্র : শরৎচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত শব্দের নাম কী?

উ : মন্দির।

প্র : তিনি 'মহিলা' শব্দের জন্য কোন পুরস্কার লাভ করেন?

উ : ভূবলীন পুরস্কার (১৯০৩)।

প্র : 'ভারতী' পত্রিকায় কোন উপন্যাস প্রকাশিত হলে তাঁর সাহিত্য খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে?

উ : বড়দিদি (১৯০৭)।

প্র : শরৎচন্দ্র এক মহিলা ন্যামেও লিখেছেন, সেটি কী?

উ : অনিলা দেবী। (দ্র. নামীর মূল্য)

প্র : তাঁর কথাসাহিত্যে কোন বিষয়টি উজ্জ্বলভাবে রূপায়িত হয়েছে?

উ : পাশ্চাত্য ও সমাজজীবনের প্রতিচ্ছবি।

প্র : শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে কোন সমস্যের চিত্র অসাধারণভাবে শিল্প কুশলতার সাথে অঙ্কিত?

উ : মানুষের অন্তরে তার ধর্মীয় ও সামাজিক বিশ্বাস-সংস্কারের সঙ্গে প্রণয়াকাঙ্ক্ষার যে নিরন্তর দ্বন্দ্ব।

প্র : কোন উপন্যাসটিকে লেখকের আত্মজৈবনিক বলা হয়?

উ : শ্রীকান্ত।

প্র : শ্রীকান্ত কত খণ্ড?

উ : ৪ খণ্ড। প্রকাশ : ১৯১৭, ১৯১৮, ১৯২৭, ১৯৩৩।

প্র : তাঁর প্রকাশিত অন্য উপন্যাসগুলোর নাম কী?

উ : পরিণীতা (১৯১৪), বিরাজ বৌ (১৯১৪), পণ্ডিত মশাই (১৯১৪), পল্লী সমাজ (১৯১৬), দেবদাস (১৯১৭), চরিত্রহীন (১৯১৭), দত্তা (১৯১৮), গৃহদাহ (১৯২০), বামুনের মেয়ে (১৯২০), দেনা পাওনা (১৯২৩), পথের দাবী (১৯২৬), শেষ প্রশ্ন (১৯৩১), বিপ্রদাস (১৯৩৫) ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

প্র : 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ। 'শ্রীকান্ত' শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনিক উপন্যাস। এর চারটি খণ্ড। ১ম খণ্ড ১৯১৭, ২য় খণ্ড ১৯১৮, ৩য় খণ্ড ১৯২৭, ৪র্থ খণ্ড ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১ম খণ্ড মাসিক 'ভারতবর্ষে' (১৯১৩-'১৭) 'শ্রীকান্তের প্রথম কাহিনী' নামে প্রকাশ পায়। লেখকের নাম মুদ্রিত হয় 'শ্রীশ্রীকান্ত শর্মা'। ২য় ও ৩য় খণ্ড 'ভারতবর্ষে' প্রকাশ পায়। তবে ৪র্থ খণ্ড প্রথম প্রকাশিত হয় 'বিচিত্রা' পত্রিকায়। ১ম খণ্ডে বালক শ্রীকান্তের নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গল্পটি। খণ্ডটি যখন শেষ হয় তখন শ্রীকান্তের মনে হলো : 'বন্ধু যেন শত্রু কাহাকে টানে না, দূরেও ঠেলিয়া দেয়।' এই খণ্ডের উল্লেখযোগ্য চরিত্র : শ্রীকান্ত, ইন্দ্রনাথ, অন্নদাদিদি, রাজলক্ষ্মী (পিয়ারী)। ২য় খণ্ডে যুবক শ্রীকান্তের লেঙ্গুন যাত্রার জীবন্ত উপস্থাপনা আছে। এই অংশে শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর আন্তরিকতা অন্যদের সম্মুখে প্রকাশ হয়ে পড়ে। এইখণ্ডের উল্লেখযোগ্য চরিত্র : শ্রীকান্ত, অভয়া, রোহিণী, গুরুদেব, রাজলক্ষ্মী। ৩য় খণ্ডে অসুস্থ শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর অক্লান্ত সেবায় সুস্থ হলেও তাদের মধ্যে আবার দূরত্ব সৃষ্টি হয়। শ্রীকান্ত তাই রেঙ্গুনে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। যাবার আগে রাজলক্ষ্মীর কাছে বিদায় নিতে এসে দেখে রাজলক্ষ্মীর সন্ন্যাসিনীর বেশ। এখণ্ডের উল্লেখযোগ্য চরিত্র : শ্রীকান্ত, গহরজান, সুনন্দা, কুশারী, রাজলক্ষ্মী। ৪র্থ খণ্ডে শ্রীকান্তের সঙ্গে পুটুর বিয়ের দিন ধার্য, রাজলক্ষ্মীর সন্ন্যাসিনীর বেশ ত্যাগ করে সাধারণ পোশাক গ্রহণ, কমললতা কর্তৃক শ্রীকান্তকে ভালোবাসার কথা ব্যক্ত ও মৃত্যুপথযাত্রী গহরকে সেবা করার কাহিনি আছে। উপন্যাসটি শেষ হয় কমললতার নিরুদ্দেশ যাত্রার মধ্য দিয়ে। এখণ্ডের উল্লেখযোগ্য চরিত্র : শ্রীকান্ত, ঠাকুর্দা, পুটু, গহর, কমললতা, রাজলক্ষ্মী।

প্র : 'শ্রীকান্ত' প্রথম খণ্ড (১৯১৭) উপন্যাসের সূচনা 'বাঙালী ও মুসলমান ছাত্রদের ফুটবল ম্যাচ'-এর বর্ণনা দিয়ে। এ নিয়ে শরৎচন্দ্রের অনেক বিরূপ সমালোচনা করা হয়। প্রকৃত ঘটনা কী?

উ : শরৎচন্দ্র বাস্তবধর্মিষ্ঠ লেখক। বাস্তবতার হুবহু অনুকৃতি তাঁর লেখার প্রাণ। বাস্তবতা

উদ্রেকের কমলাতও [illegible]
কুলীনদেরও তিনি খুঁজে [illegible]
ও মুসলমান' ছাত্রদের [illegible]
প্রকৃত বাস্তবতা অনুসন্ধান [illegible]
রাজনীতি বিশ্লেষণের [illegible]
অধ্যাপক ড. সাধনকুমার [illegible]
অমলের দিয়ে। দিগন্তচুম্বি, [illegible]
তিনি বুকতে চেয়েছেন [illegible]
'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে [illegible]
লিখলেন। এ-প্রসঙ্গে [illegible]
অভিমতটি তাঁর পর্যবেক্ষণ। [illegible]
বাঙলার সামাজিক [illegible]
বাঙালি হিন্দু বাঙালি [illegible]
বহির্ভাগত ভাবত। [illegible]
বাঙালি মুসলমানের [illegible]
ভেবে আরব-ইরান-তুরানের [illegible]
ভাবতে আলোড়ন, সর্বনাশ [illegible]
মনোভাব বর্তমান কালেও [illegible]
হয়ে যায় নি। শরৎচন্দ্র এই [illegible]
সত্যের বিশ্বস্ত উপস্থাপন [illegible]
এছাড়া এ বিষয়ে আরও একটি [illegible]
প্রয়োজন। 'শ্রীকান্ত' প্রথম [illegible]
প্রথম দিককার এই গল্প [illegible]
পটভূমিকায়। তৎকালীন [illegible]
মুসলিমরা প্রকৃতই বাঙালি [illegible]
অধিকাংশই উর্দুভাষী, কিছু [illegible]
ভোজপুরী। আর অধিকাংশ [illegible]
বাঙালি হিন্দু। ফলে শরৎচন্দ্রের [illegible]
এই সামাজিক সত্যটির [illegible]
নয়, অস্বাভাবিক নয়।' (সূত্র কথাসাহিত্যে বাস্তবতা : শরৎচন্দ্র ও প্রেমচন্দ, ১৯৯৭, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ১২৫)।

প্র : 'অনুরাধা সতী ও পরেশ' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : 'অনুরাধা সতী ও পরেশ' (১৯৩৪) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত তিনটি গল্পের সংগ্রহ। 'অনুরাধা' ভারতবর্ষে, 'সতী' বঙ্গবাণীতে এবং 'পরেশ' 'শরতের ফুল' নামক সাময়িকীর পূজাবার্ষিকীতে প্রকাশিত হয়। তিনটি রচনারই বিষয় প্রেম এবং পারিবারিক দ্বন্দ্ব। 'সতী' গল্পটি শরৎচন্দ্রের ব্যতিক্রম। এক সতীসাধ্বী কিন্তু

[illegible]
[illegible]
[illegible]

জন্যায়। এর পরিচালক ছিলেন সন্তোষ লীলা বংশাণী। উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্র : দেবদাস, পার্বতী (পারু), চন্দ্রমুখী, চুনিলাল, ধর্মদাস। চলচ্চিত্রে পার্বতী চরিত্রে ঐশ্বর্য রাই, চন্দ্রমুখী চরিত্রে মাধুরী দীক্ষিত, দেবদাস চরিত্রে শারুখ খান অভিনয় করেন।

প্র : 'নারীর মূল্য' সম্পর্কে লেখ।

উ : 'নারীর মূল্য' (১৯২৩) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত নারীর সামাজিক অধিকার ও সমাজে নারীর স্থান সম্পর্কিত মূল্যবান নিবন্ধ গ্রন্থ। 'অনিলা দেবী' ছদ্মনামে 'যমুনা' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। অনিলা দেবী শরৎচন্দ্রের বড়দিদির নাম।

প্র : 'নিষ্কৃতি' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : 'নিষ্কৃতি' (১৯১৭) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত ক্ষুদ্র উপন্যাস। এর প্রথমাংশ 'ঘরজামাই' নামে 'যমুনা' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে বিরোধ ও শেষ পর্যন্ত সম্প্রীতি এই কাহিনির উপজীব্য। উল্লেখযোগ্য চরিত্র : গিরিশ, রমেশ, সিদ্ধেশ্বরী, শৈলজা প্রমুখ। ১৯৪৪ সালে Deliverance নামে দিলীপকুমার রায়ের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

প্র : 'পথের দাবী' কোন ধরনের উপন্যাস?

উ : 'পথের দাবী' (১৯২৬) রাজনৈতিক উপন্যাস। স্বদেশি বিপ্লবীদের হাতে হাতে থাকত। কাহিনির পটভূমিকা ব্রহ্মদেশ। এক গুপ্ত বিপ্লবী দলের নায়ক সব্যসাচী এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। কারো কারো মতে সব্যসাচী চরিত্রে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর ছায়াপাত ঘটেছে। নিঃসন্দেহে এই কাহিনিতে ব্রিটিশ শাসনের তীব্র সমালোচনা এবং সশস্ত্র বিপ্লবকে আন্তরিক সমর্থন আছে। গ্রন্থটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে **সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়।** নান্দনিক মানদণ্ডে 'পথের দাবী' উৎকৃষ্ট সাহিত্য কিনা এ নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে। কিন্তু ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে এ উপন্যাস উদ্দীপকের ভূমিকা রাখে। 'আমি বিপ্লবী, ভারতের স্বাধীনতাই আমার একমাত্র কামা, আমার একটিমাত্র সাধনা।' এই বক্তব্য ছিল উপন্যাসের শেষে। ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে এই গ্রন্থ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় ১৩২৯-এর ফাল্গুন সংখ্যা থেকে 'পথের দাবী' ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয়।

প্র : 'পল্লীসমাজ'-এর পরিচয় দাও।

উ : 'পল্লীসমাজ' (১৯১৬) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত একটি জনপ্রিয় উপন্যাস। বাংলার পল্লীজীবনের নীচতা ও ক্ষুদ্র রাজনীতির পটভূমিকায় এক আনর্শবাদী যুবক-যুবতীর সম্পর্ক ও বিশেষ করে তাদের অভিশপ্ত প্রেমকাহিনি এই উপন্যাসের মূল বিষয়। ১৯১৫ সালে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এর নাট্যরূপ 'রমা' (১৯২৮) বাংলা রঙ্গমঞ্চে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। প্রধান চরিত্র : রমা, রমেশ, বেণী, বলরাম।

প্র : শরৎচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'বড়দিদি'র পরিচয় দাও।

উ : 'বড়দিদি' (১৯১৩) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত প্রথম মুদ্রিত উপন্যাস। এই উপন্যাসটি সরলা দেবী সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশকালে বাংলা সাহিত্যে আলোড়নের সৃষ্টি করে। প্রথমে এর নাম ছিল 'শিশু'। শরৎ উপন্যাসের প্রধান আকর্ষণ, নারীচরিত্রের সংযম ও মাধুর্য, শাস্ত্রশাসিত জীবন ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তির মধ্যে টানাপোড়েন এবং সহজ সাবলীল ভাষা-সবই এখানে পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত। উল্লেখযোগ্য চরিত্র : সুরেন্দ্রনাথ, ব্রজরাজ, মাধবী, প্রমীলা। বড়দিদি 'মাধবী'র নাম।

প্র : 'বিন্দুর ছেলে ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি' ও 'পথনির্দেশ' এই তিনটি গল্পের সংকলন 'বিন্দুর ছেলে ও অন্যান্য গল্প' (১৯১৪)। এই গল্পগুলি 'যমুনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রত্যেকটি গল্পে শরৎচন্দ্রের আখ্যান রচনার স্বাভাবিক নৈপুণ্য আছে গল্পগুলি শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয় রচনার অন্যতম।

'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

'বিরাজ বৌ' (১৯১৪) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত জনপ্রিয় এবং পুস্তক আকারে দ্বিতীয় প্রকাশিত উপন্যাস। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৩ সালে। বাঙালি গৃহস্থ জীবনের প্রায় ছবি এবং বাঙালি নারীর মমত্ব ও করুণার রূপায়ণের জন্য এই উপন্যাস ভাবাকুলতা সত্ত্বেও অভিনন্দিত হয়। মুখ্যত বিরাজ বৌয়ের নানা সমস্যা এ উপন্যাসের বিষয়।

'মেজদিদি' গল্পগ্রন্থের পরিচয় দাও।

'মেজদিদি' (১৯১৫) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মেজদিদি' (১৯১৪), 'দর্পচূর্ণ' (১৯১৪) ও 'আঁধারে আলো' (১৯১৪) এই তিনটি গল্পের সংকলন। 'মেজদিদি' শরৎচন্দ্রের অন্যতম জনপ্রিয় রচনা। তিনটি রচনাই চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে। এই গ্রন্থে নারীর মহত্ত্বের পাশাপাশি 'স্বামীর কাছে স্ত্রীর অহংকার সাজে না' এই বক্তব্যও প্রকাশিত।

'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

'শেষপ্রশ্ন' (১৯৩১) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত বিতর্কপ্রধান ও সমস্যামূলক উপন্যাস। শরৎচন্দ্রের মূল উপন্যাস ধারা থেকে এটি কিছুটা পৃথক। উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্র কমল। বাস্তব অপেক্ষা আদর্শের দ্বারা এই চরিত্র রূপায়িত হয়েছে। কমল কোনো সংস্কার ও ঐতিহ্যকে স্বীকার করে না, জীবনে কোনো কিছুকেই তর্কাতীত ও শাশ্বত বলে মানে না। সম্পূর্ণ নূতন ধরনের নারীচরিত্র রচনার জন্য এই উপন্যাস স্মরণীয়।

'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

'বিরাজ বৌ' (১৯১৪) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত জনপ্রিয় এবং পুস্তক আকারে দ্বিতীয় প্রকাশিত উপন্যাস। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৩ সালে। বাঙালি গৃহস্থ জীবনের প্রায় ছবি এবং বাঙালি নারীর মমত্ব ও করুণার রূপায়ণের জন্য এই উপন্যাস ভাবাকুলতা সত্ত্বেও অভিনন্দিত হয়। মুখ্যত বিরাজ বৌয়ের নানা সমস্যা এ উপন্যাসের বিষয়।

'মেজদিদি' গল্পগ্রন্থের পরিচয় দাও।

'মেজদিদি' (১৯১৫) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মেজদিদি' (১৯১৪), 'দর্পচূর্ণ' (১৯১৪) ও 'আঁধারে আলো' (১৯১৪) এই তিনটি গল্পের সংকলন। 'মেজদিদি' শরৎচন্দ্রের অন্যতম জনপ্রিয় রচনা। তিনটি রচনাই চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে। এই গ্রন্থে নারীর মহত্ত্বের পাশাপাশি 'স্বামীর কাছে স্ত্রীর অহংকার সাজে না' এই বক্তব্যও প্রকাশিত।

'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

'শেষপ্রশ্ন' (১৯৩১) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত বিতর্কপ্রধান ও সমস্যামূলক উপন্যাস। শরৎচন্দ্রের মূল উপন্যাস ধারা থেকে এটি কিছুটা পৃথক। উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্র কমল। বাস্তব অপেক্ষা আদর্শের দ্বারা এই চরিত্র রূপায়িত হয়েছে। কমল কোনো সংস্কার ও ঐতিহ্যকে স্বীকার করে না, জীবনে কোনো কিছুকেই তর্কাতীত ও শাশ্বত বলে মানে না। সম্পূর্ণ নূতন ধরনের নারীচরিত্র রচনার জন্য এই উপন্যাস স্মরণীয়।

প্র : 'শেষের পরিচয়' উপন্যাস সম্পর্কে লেখ।

উ : 'শেষের পরিচয়' (১৯৩৯) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস। বিলাস, বিজয়া, রমা প্রভৃতি চরিত্র এবং তাদের মানবিক সম্পর্কের জটিলতা এবং মানুষ, কালবিশ্ব ঘটনাপ্রবাহের বিশেষ জনপ্রিয় করেছিল। উপন্যাসটিকে 'বিলাস' 'বিচিত্রা' পত্রিকায় সময় হয়। শরৎচন্দ্রের জীবদ্দশায় প্রকাশিত সর্বশেষ উপন্যাসগ্রন্থ।

'বিরাজ বৌ' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

প্র : শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলি সাধু চরিত্র সম্পর্কে মন্তব্য কর।

উ : শরৎ-উপন্যাসগুলিতে সাধুর যে বর্ণাঢ্যরূপ থেকেই সর্বোপরি। সুইট্র অভিমান ও বাঙিত্বের পরিচয় মিলেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সর্বত্যাগী এক সন্ন্যাসিনী মূর্তি। প্রেমের অনুকূলতার যে সাধু সন্ন্যাসীটিকে আঘাত করে, সন্ধানান্তরে যে সাধুটিকে শতধারায় প্লাবিত, বাঙিগত জীবনে নিষ্ঠা উপবাস, ব্রত, ছোপের উপকরণ থেকে আত্মবঞ্চনার বিচিত্র নানান আছে এখানে।

প্র : তাঁর কোন গল্পগুলো শ্যাম?

উ : মহেশ, বিলাসী, সতী, মামলার ফল ইত্যাদি ছোটগল্প এবং রামের সুমতি (১৯১৪), মেজদিদি (১৯১৫), বিন্দুর ছেলে (১৯১৪), ছবি (১৯২৩), ইত্যাদি তাঁর সুখপাঠ্য রচনা।

প্র : বিলাসী গল্পে ন্যাড়া চরিত্রের মধ্যে কার ছায়াপাত ঘটেছে?

উ : শরৎচন্দ্রের নিজের।

প্র : তাঁর কোন উপন্যাস সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়?

উ : 'পথের দাবী'।

প্র : তাঁর প্রথম গ্রন্থগুলির নাম কী?

উ : তরুণের বিদ্রোহ (১৯২৯) এবং যমুনা ও সাহিত্য (১৯২৩)।

প্র : শরৎচন্দ্র কোন কোন উপন্যাস মৃত্যুর পূর্বে অসমাপ্ত রেখে যান?

উ : 'শেষের পরিচয়' (ভারতবর্ষে প্রকাশিত

Scanned with CamScanner

হয়), 'আগামীকাল' (বিচিত্রা পত্রিকায়), 'জাগরণ' (বসুমতী পত্রিকায়)। এর মধ্যে 'শেষের পরিচয়' অধিকতর বিস্তৃত ছিল।

প্র : শরৎচন্দ্র কয়টি ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন?

উ : সাতটি। এগুলো হলো। অনিলা দেবী; অপরাজিতা দেবী; শ্রী চট্টোপাধ্যায়; অনুরূপা দেবী; পরশুরাম (পরশুরাম রাজশেখর বসুরও ছদ্মনাম। সাহিত্যসমাজে রাজশেখর বসুই এ নামে অধিক পরিচিত।); শ্রীকান্ত শর্মা; সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?

উ : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক (১৯২৩) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট. (১৯৩৬) উপাধি লাভ। উল্লেখ্য, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁর মাতার নামে জগত্তারিণী পদক প্রবর্তন করেন।

প্র : তিনি কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?

উ : কলকাতা: ১৬ই জানুয়ারি ১৯৩৮; ২রা মাঘ ১৩৪৪।

'অতিথির স্মৃতি' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'অতিথির স্মৃতি' গল্পটির লেখক প্রদত্ত নাম কী?

উ : 'দেওঘরের গল্প'।

প্র : 'রেঙ্গুন' কোথায় অবস্থিত?

উ : বাংলাদেশের পূর্ব-দক্ষিণ দিকে অবস্থিত মায়ানমার দেশের রাজধানী ইয়াংগুন। ইয়াংগুনকে আগে রেঙ্গুন বলা হতো।

প্র : 'ভাগ্যান্বেষণে' অর্থ কী?

উ : অর্থ রোজগার ও বেঁচে থাকার প্রয়োজনে।

প্র : শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন বা ইয়াংগুনে কোন সময় পর্যন্ত অবস্থান করেন?

উ : ১৯০৩ থেকে ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।

প্র : 'দেওঘর' কোথায় অবস্থিত?

উ : ভারতে। ভারতের ঝাড়খণ্ড রাজ্যের (আগে বিহার রাজ্যের) সাঁওতাল পরগণা বিভাগের একটি জেলার নাম দেওঘর।

প্র : দেওঘর কেন বিখ্যাত?

উ : এখানে বিখ্যাত বিদ্যানাথ শিব মন্দির আছে। হিন্দুদের কাছে নামসা ৭১ তীর্থপীঠের একটি এই দেওঘর। সাঁওতাল এলাকা বলে অনেকে অবজ্ঞাপূর্ণ করতেও আসেন।

প্র : দেওঘর আর কী কী নামে পরিচিত?

উ : বিদ্যানাথ ধাম, বাবা ধাম ইত্যাদি।

প্র : 'দেওঘর' কী ধরনের শব্দ?

উ : হিন্দি।

প্র : দেওঘর-এর আভিধানিক অর্থ কী?

উ : দেব-দেবীদের গৃহ।

প্র : ব্যাধ কাদের বলে?

উ : পশুপাখি শিকার করে জীবনযাপনকারী এক দল মানুষ। এরা বংশ পরম্পরায় এই পেশায় নিয়োজিত থাকে।

প্র : এ যুগেও কি ব্যাধ আছে?

উ : আছে– তবে এর মাত্রা কমেছে। বিল বা হাওড় থেকে পাখি শিকারকারী, অতিথি পাখি নিধনকারী বা সুন্দর বনে হরিণ হত্যাকারীদের আধুনিক ব্যাধ বলা যায়।

প্র : মধ্যবিত্ত কাদের বলে?

উ : সাধারণত ধনসম্পদের বিচারে মানুষকে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যাদের প্রচুর টাকা আছে তারা উচ্চবিত্ত, যাদের ঘরে টাকার জন্য অভাব লেগেই থাকে তারা নিম্নবিত্ত আর যারা অভাবে থাকে না কিন্তু টাকা উদ্বৃত্তও রাখতে পারে না– কোনো মতে দিন অতিবাহিত করে, তাদের মধ্যবিত্ত বলে।

প্র : বামুনঠাকুর কে?

উ : রান্নাকারী বা পাচক।

প্র : 'ওদের দোর খোলার শব্দেই অতিথি ছুট পালালো।'– বাক্যটি দিয়ে শরৎচন্দ্র কী বোঝাতে চেয়েছেন?

উ : শরৎচন্দ্র বোঝাতে চেয়েছেন যে, কুকুরকে মানুষ তুচ্ছজ্ঞান করলেও তার অনুভূতি

কাছে। লেখকের ঘরের দরজায় যে কুকুর প্রতিদিন আগমন করে সে কুকুরই চরকাবাকরদের আগমনে দৌড়ে পালিয়ে যায়। কারণ এই চাকরবাকরেরা তাকে প্রহার করে, খাদ্য প্রদান করে না। 'হরু, ওর চেয়ে তুচ্ছ জীব শহরে আর নেই।'– এটি কোন ধরনের বাক্য? এই বাক্য দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে?

উ : বিস্ময়সূচক বাক্য। এই বাক্যটি দাঁড়ি (।) দিয়ে সমাপ্ত করলে এর প্রকৃত অর্থ প্রকাশ পেত না। এই বাক্যে কুকুরের মতো আপাত তুচ্ছ জীবের মমত্ববোধের মাঝে প্রকাশিত হয়েছে। যেখানে বকশিশ পেলেই চাকরেরা ফিরে গেছে, সেখানে কোনো রকমের প্রতিদানের আশা না করে একটি আপাত তুচ্ছ প্রাণী এসেছে লেখকের অবধি এবং রেলগাড়ি চলে যাবার পরও পথের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। প্রাণীকুলে বিষয়-সম্পর্কের ঊর্ধ্বেও যে মনোগত সম্পর্ক আছে, এই তার প্রমাণ।

প্র : 'অতিথির স্মৃতি'র মতো আর অন্তত দুটো গল্পের নাম লেখ।

উ : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'আদরিণী' এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালা পাহাড়'।

প্র : 'বেরিবেরির আসামি' বলা হয়েছে কেন?

উ : গল্পে বেরিবেরি রোগীদের পা ফোলার কথা আছে। পা ফুলে গেলে চলাচল শ্লথ হয়ে যায়। আসামিদের চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য পায়ে শেকল বা বেড়ি পরিয়ে দেয়া হয়। বেরিবেরির সঙ্গে বেড়ির ধ্বনিগত সাদৃশ্যও আছে। তাই লেখক আলঙ্কারিক কারণে রোগীদের বেরিবেরির আসামি বলেছেন। এটা তাদের প্রতি লেখকের কোনো শ্লেষ না, তাঁর শিল্পীসুলভতার প্রকাশ।

প্র : ক্ষুধা আহরণ কী?

উ : 'ক্ষুধামান্দ্য' বলে একটি রোগ আছে। এ রোগে আক্রান্তদের আহারে প্রবৃত্তি হয় না ও খেতে ইচ্ছে করে না। হজম শক্তিও কমে যায় বলে। এ রোগের মোকাবেলার জন্য ডাক্তার ঔষধের সঙ্গে পরামর্শ দেন কঠিক পরিমাণ করার যা খাবার। এই গল্পে ক্ষুধা অন্বেষণ বলতে ঐটাকে বা তাদের সেই অর্থে সেবন বলতে হয়েছে।

প্র : সেবন্তিকা কী ধরনের শব্দ?

উ : অর্ধ-তৎসম শব্দ।

প্র : 'প্রত্যুত্তর'-এর সন্ধিবিচ্ছেদ কর।

উ : প্রতি+উত্তর।

প্র : 'বাবুরা সবাই নির্বিকারচিত্ত'– কথাটি কী বোঝানো হয়েছে?

উ : কোনো ঘাওয়াতেই আপত্তি নেই এবং ভূত খায়।

প্র : 'মালির বউ' কে কী বলা হয়?

উ : মালিনী।

প্র : 'খবরদারি' কী?

উ : তত্ত্বাবধান বা দেখাশোনা।

প্র : 'খবরদারি' কোন শব্দ থেকে এসেছে?

উ : 'খবর' শব্দ থেকে। (খবর+দার+ই)

প্র : 'খবর' কোন শব্দ?

উ : আরবি শব্দ।

প্র : 'সুদুখে' কোন ধরনের শব্দ?

উ : ভাব্য শব্দ। মূলশব্দ 'সদুখে'।

প্র : 'ফটক' কী?

উ : সদর দরজা বা মূল গেট।

প্র : 'ফটক' কী শব্দ?

উ : হিন্দি।

প্র : 'মধ্যাহ্ন' বানানে কোন 'ন' আছে?

উ : 'ন'। বানান সতর্কতা: পূর্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন। পূর্বাহ্ন ও অপরাহ্ন বানানে 'ণ' আর মধ্যাহ্ন বানানে 'ন' আছে (ণ-ত্ব বিধি অনুসারে)।

শহীদ কাদরী

প্র : শহীদ কাদরী কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১৯৪২ সালের ১৪ই অগস্ট, কলকাতায়।

প্র : তিনি মূলত কী?

উ : স্বাধীন বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় আধুনিক কবি।

2020/5/14 23:56
Scanned with CamScanner

প্র : শহীন কাদরী কোথায় জিলেন?
উ : শহীন কাদরী কলকাতায় পাকাপাটে অভ্যস্থান করেন। ১৯৫৭ সালের আগে তিনি সেখানেই সেখাপড়া শুরু করেন। এরপর ঢাকাতে এসে বসবাস করেন। ১৯৭৮ সালে তিনি বিদেশে চলে যান। আমেরিকা হয়ে থেকে আমেরিকায় স্থিত হন। মৃত্যুর পর তাঁর ইচ্ছা অনুসারে ঢাকাতে সমাধিস্থ করা হয়।

প্র : তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের নাম কী কী?
উ : কবিতা : উত্তরাধিকার (১৯৬৭), রোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা (১৯৭৪), কোথাও কোন ক্রন্দন নেই (১৯৭৮), আমার দুঃখগুলো পৌষে লাও (২০০৭)।

প্র : 'উত্তরাধিকার' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : বাংলা কবিতার পঞ্চাশ দশকের সর্বোজ্জ্বল সম্ভাবনা ও সাফল্য দেখা যায় শহীন কাদরীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উত্তরাধিকার'-এ (১৯৬৭)। এতে ৪০টি কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ কাব্যের পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে তিনি নুপ্যমান বস্তুকে দেখেছেন প্রবল অন্তরঙ্গে, মননের শাসনে ও আবেগের প্রাবল্যের যৌথ প্রচেষ্টায়। বাংলাদেশের বাংলা কবিতা সত্যিকার অর্থেই আধুনিকতার ঊর্ধ্বাভিমুখী হয় তাঁর এ কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে।

প্র : তিনি কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭৩)।

প্র : শহীন কাদরী কবে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ২০১৬ সালের ২৮শে আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে মারা যান।

শহীদুল জহির

প্র : শহীদুল জহির কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৯৫৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর ঢাকায়।

প্র : তাঁর প্রকৃত নাম কী?
উ : মো. শহীদুল হক।

প্র : তিনি কোন পেশার স্থায়ী পরিচয় দিতেন?
উ : শিক্ষকতার।

প্র : কোন প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি ডাক্তার ও ডাক্তারকোর্স হন?
উ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায়।

প্র : তিনি শেষ অবধি কোথায় অধ্যাপক ছিলেন?
উ : পার্বত্যচট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তাবলাম্বর সচিব (অতিরিক্ত সচিব)।

প্র : শহীদুল জহির কী হিসেবে পরিচিত?
উ : কথাসাহিত্যিক।

প্র : শহীদুল জহির রচিত গল্পগ্রন্থ ও উপন্যাসগুলোর নাম কী?
উ : গল্পগ্রন্থ : পাখাপাখি (১৯৮৫); ঘুঘুডাঙ্গার মানুষ ও অন্যান্য গল্প (২০০৩); ঘুঘু নদীর হাওয়া ও অন্যান্য গল্প (২০০৪)।
উপন্যাস : জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা (১৯৮৮); সে রাতে পূর্ণিমা ছিল (১৯৯৮); মুখের দিকে চেয়ে দেখি (২০০৬)।

প্র : 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' উপন্যাস সম্পর্কে কী বলা যায়?
উ : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি ভিন্নমাত্রার উপন্যাস। টানাসেন্স থেকে প্রবন্ধের বই বলে অনেকে ভুলও করে পারেন। গতানুগতিক উপন্যাসের ধর নেই। নিস্তব্ধতা অন্তে। নৈরূপ ওয়ানস্টপের পর এ অঞ্চলের উপন্যাসে অস্তিত্ববাদের এতো বেশি প্রভাব আর কারো উপন্যাসে নেই। একই সঙ্গে ম্যাজিক রিয়ালিজম বা জাদু বাস্তবতাসহ উত্তরাধুনিক চেতনার সংমিশ্রণ আছে। উপন্যাসটি বাংলাদেশের বাংলা সাহিত্যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের চেয়েও এতে দর্শনের প্রয়োগ ও কর্মের নতুনত্বের কারণে।

প্র : তিনি কবে কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?
উ : মাত্র ৫৫ বছর বয়সে ২৩শে মার্চ ২০০৮, ঢাকায়।

শহীদুল্লা কায়সার

প্র : শহীদুল্লা কায়সারের জন্ম কবে, কোথায়?
উ : ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২৭; ফেনিতে।

প্র : শহীদুল কী হিসেবে পরিচিত?
উ : সাংবাদিক ও সাহিত্যিক।

প্র : তাঁর মায়ের নাম কী ছিল?
উ : তাঁর মায়ের নাম ছিল শহীদুল্লাহ।

প্র : তাঁর পিতার নাম কী ছিল?
উ : মুনীরুদ্দিন।

প্র : কবির ছাত্রজীবনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কী?
উ : কবির ছাত্র ছিলেন।

প্র : তিনি কোন রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন?
উ : তিনি ষাটের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। ফরাসি-লেনিনবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ছাত্রজীবনেই সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬৯ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।

প্র : তিনি কোন দল গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন?
উ : তিনি পাকিস্তান প্রাদেশিক কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য নির্বাচিত হন কত সালে?
উ : ১৯৬১ সালে।

প্র : কত সালে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান করেন?
উ : ১৯৫২ সালে।

প্র : তিনি প্রথম কত সালে গ্রেফতার হয়ে জেলে যান?
উ : ১৯৫২ সালে।

প্র : তিনি কোন পত্রিকায় যোগদানের মধ্যদিয়ে সাংবাদিকতার পেশা গ্রহণ করেন?
উ : সাপ্তাহিক ইত্তেফাক (১৯৪৯)।

প্র : তিনি কত সালে দৈনিক সংবাদের সহকারী সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন?
উ : ১৯৫৮ সালে।

প্র : তিনি কোন শিরোনামে উপসম্পাদকীয় রচনা করেন?
উ : 'রাজনৈতিক পরিক্রমা', 'বিচিত্র কথা'।

প্র : তাঁর উপন্যাসে বাঙালি জীবনের কোন দিকটি উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত?
উ : বাঙালি জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সংগ্রামী চেতনা।

প্র : তিনি কোন দুটি উপন্যাস লিখে খ্যাত হন?
উ : সারেং বৌ (১৯৬২), সংশপ্তক (১৯৬৫)।

প্র : 'সারেং বৌ' উপন্যাসের পরিচয় দাও।
উ : 'সারেং বৌ' (১৯৬২) উপন্যাসে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলের বিশেষ চিত্র আছে। এখন সমাজ ও গ্রাম সমাজের সব শ্রেণি ও পেশার মানুষ উপন্যাসে ঠাঁই পেয়েছে। ঐ এলাকার মানুষের জীবনযাপন, সংস্কার, বিশ্বাস, ভাষা, ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি সবই এ উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। এ উপন্যাসের কাহিনি বিন্যাসে ও চরিত্র চিত্রণে লেখক যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। এ উপন্যাসে সমাজের নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষের জীবনযাপন তুলে ধরা হয়েছে।

প্র : 'সংশপ্তক' উপন্যাসের পরিচয় দাও।
উ : সংশপ্তক শব্দটি মহাভারতের। এর অর্থ যোদ্ধা, যে ক্রৈবিনের উদ্দেশ্য শপথ করে যুদ্ধে নামে। শত্রুকে হত্যা বা শহীদুল্লা কায়সার এ শব্দের তাৎপর্য ধারণ করেই বিহীন বিপ্লবীর অর্থেই পূর্ববর্তী কাল থেকে বাঙালির মুক্তি আন্দোলনের পূর্বাপর অর্থে বাংলাদেশ সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তন ও রূপান্তর উপন্যাস 'সংশপ্তক' (১৯৬৫) ধারণ করেছেন। 'সংশপ্তক' তাই মহাকাব্যিক উপন্যাস বলা হয়। হিন্দু-মুসলিম সম্মিলিত জীবনযাপন, অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধ এ উপন্যাসের অন্যতম বর্ণিত বিষয়। এখানে ঢাকা ও কলকাতার নাগরিক পরিবেশের সঙ্গে বাকুলিয়া ও তালতলি গ্রামের গ্রামীণ পরিবেশের প্রভাকে সমগ্র বাংলাদেশের জীবনযাপন তুলে ধরা হয়েছে। বিপ্লবের

2020/5/14 23:56
Scanned with CamScanner

দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি প্রাসঙ্গিকভাবেই উপন্যাসে এসেছে। উল্লেখযোগ্য চরিত্র : রাবেয়া খাতুন (রানু), জাহেদ, সেকেন্দার, মালু, হুরমতি, লেকু, রমজান, রামদয়াল ইত্যাদি। এ উপন্যাসে বাংলার জনগণ সংশপ্তকের মতো সর্বদা সংস্কৃতি, সম্প্রীতি ও মনুষ্যত্ব রক্ষায় সংগ্রামশীল।

প্র : 'রাজবন্দীর রোজনামচা' নামক তাঁর স্মৃতিকথা কবে প্রকাশিত হয়?

উ : ১৯৬২ সালে।

প্র : তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তের নাম কী?

উ : 'পেশোয়ার থেকে তাসখন্দ' (১৯৬৬)।

প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?

উ : আদমজি পুরস্কার (১৯৬২), বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬২) (দুটোই সারেং বৌ উপন্যাসের জন্য)।

প্র : তিনি কত সালে কিভাবে নিখোঁজ হন?

উ : ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর পাক হানাদার বাহিনীর এদেশীয় দোসর আলবদর বাহিনীর সদস্যগণ তাঁর ঢাকার কায়েতটুলির বাসভবন থেকে তাঁকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এরপর তাঁর আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নি।

শামসুজ্জামান খান

প্র : শামসুজ্জামান খান কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর মানিকগঞ্জ জেলার সিঙ্গাইর উপজেলার চারিগ্রামে।

প্র : তাঁর মা-বাবার নাম কী?

উ : মা শামসুন্নাহার খানম; বাবা আবদুর রহমান খান।

খ্রিষ্টাব্দে জগন্নাথ কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক, ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় সম্মানসহ স্নাতক, ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।

প্র : কর্মসূত্রে তিনি কোথায় কোথায় সংযুক্ত ছিলেন?

উ : ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বিক্রমপুর হরগঙ্গা কলেজের প্রভাষক, সেখান থেকে আসেন জগন্নাথ কলেজে প্রভাষক হিসেবে, থাকেন ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। জগন্নাথ কলেজ থেকে যোগ দেন ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখান থেকে ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে চলে আসেন বাংলা একাডেমির উপপরিচালক পদে। পরে তিনি জাতীয় জাদুঘর ও বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হন।

প্র : তিনি কোন কোন প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক হন?

উ : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, জাতীয় জাদুঘর, বাংলা একাডেমি।

প্র : তাঁর রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনগুলো?

উ : প্রবন্ধগ্রন্থ: নানা প্রসঙ্গ (১৯৮৩), গণসঙ্গীত (যৌথ : ১৯৮৫), মাটি থেকে মহীরুহ (১৯৯৪), রঙ্গলক্ষ্মীর সঙ্গে আলাপ ও প্রাসঙ্গিক কথকতা (১৯৯৫), ফোকলোরচর্চা (২০০৬); রম্য-রচনা: ঢাকাই রঙ্গরসিকতা (২০০১), গ্রামবাংলার রঙ্গরসিকতা (২০০৪), গ্রামবাংলার রঙ্গ গল্প (২০০৬); শিশু-সাহিত্য: দুনিয়া মাতানো বিশ্বকাপ (১৯৮৭)।

প্র : তিনি কোন কোন পুরস্কার ও পদকে ভূষিত হন?

উ : অগ্রণী ব্যাংক পুরস্কার (১৯৮৭), কালুশাহ পুরস্কার (১৯৮৭), দীনেশচন্দ্র সেন

Scanned with CamScanner

হয়। এটি এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত একটি অনুষদ। আগে এটি কলেজ ছিল, পরে ছিল ইন্সটিটিউট।

প্র : মঙ্গল শোভাযাত্রা কী?

উ : শোভাযাত্রা অর্থ সুন্দর করে সেজে, বহু বর্ণিল আয়োজনে মিছিল করা। মানুষের মঙ্গল কামনা করে যখন এমন মিছিল করা হয় এবং সেখানে গান, বাদ্য, আনন্দ-উল্লাস থাকে তখন তাকে মঙ্গল শোভাযাত্রা বলে।

প্র : 'আবহমান' কী?

উ : 'আ' একটি উপসর্গ। 'আ' দিয়ে বোঝায় দীর্ঘতর কিছু বা পর্যন্ত। যা দীর্ঘ দিন ধরে 'বহমান' তাই 'আবহমান'।

প্র : 'ঐতিহাসিক'-এর প্রকৃতি-প্রত্যয় কী?

উ : ইতিহাস + ইক (বা সংস্কৃত ষ্ণিক)।

প্র : 'পণ্ডিত'-এর সন্ধিবিচ্ছেদ কর।

উ : পণ্ড + ইত (জ্ঞাত অর্থে)।

প্র : আকবর কে ছিলেন?

উ : ভারতের তৃতীয় মোগল সম্রাট।

প্র : আকবরের সম্পূর্ণ নাম কী?

উ : জালালুদ্দিন মুহম্মদ আকবর।

প্র : আকবরের জন্ম-মৃত্যু সন কত?

উ : জন্ম: ১৪ই অক্টোবর, ১৫৪২ খ্রিষ্টাব্দ; মৃত্যু: ২৭শে অক্টোবর, ১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দ।

প্র : আকবর কত দিন দিল্লির সম্রাট ছিলেন?

উ : ৪৯ বছর ২৭৩ দিন। (১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারি সিংহাসনে আরোহন করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত সম্রাট ছিলেন।)

প্র : হিজরি সন কী?

উ : 'হিজরি' আরবি শব্দ; এসেছে 'হিজরত' বা গমন থেকে। যিশু খ্রিষ্টের জন্মের ৬২২ বছর পরে হজরত মুহম্মদের মক্কা ত্যাগ করে মদিনায় গমনের (হিজরতের) রাত থেকে যে বছর বা সন গণনা করা হয় সেটাই বিশ্বে (মূলত মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোতে) হিজরি সন হিসেবে পরিচিত।

প্র : হিজরি কী ধরনের সন?

উ : চান্দ্র সন। চাঁদ দেখার ওপর ভিত্তি করে এই সন গণনা করা হয়।

প্র : সূর্য দেখার ওপর ভিত্তি করে যে সন গণনা করা হয়, তাকে কী বলে?

উ : সৌর সন।

প্র : 'দিন-ই-ইলাহি' কী?

উ : ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আকবর 'দিন-ই-ইলাহি' নামে একটি ধর্মমত প্রবর্তন করেন। তিনি মনে করতেন, সব ধর্মেই মহৎ চিন্তা আছে। শুধু এই মহৎ চিন্তাগুলোকে একত্রিত করে একটি ধর্মমত দাঁড়িয়ে হতে পারে। একেই তিনি নাম দিলেন 'দিন-ই-ইলাহি'। ১৫৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ফতেহপুর সিক্রিতে 'এবাদতখানা' (প্রার্থনাগৃহ) নামে একটি বিশাল ঘর নির্মাণ করেন। এখানে সবধর্মের লোকেরা প্রার্থনা করার সুযোগ পায়।

প্র : 'ইলাহি সন' কী?

উ : আকবর 'দিন-ই-ইলাহি' প্রবর্তন করার পর (১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে) একই বছর তৎকালে প্রচলিত চান্দ্র সন হিজরির বদলে সারা ভারতে যে নতুন সৌর সন চালু করেন তাকেই বলা হয় 'ইলাহি সন'।

প্র : 'ইলাহি সন' বাংলায় আছে কী?

উ : অনেকে মনে করেন, এই 'ইলাহি সনই বঙ্গ অঞ্চলে 'বাংলা সন' বা 'বঙ্গাব্দ' নামে পরিচিতি পায়। ভারতের অন্যত্র এই সন-গণনা ক্রমে লুপ্ত হয়ে যায়।

প্র : 'পুণ্যাহ' কী?

উ : নবাবি ও জমিদারি যুগে বৎসরের সূচনায় প্রজাদের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে খাজনা আদায়ের অনুষ্ঠানকে পুণ্যাহ বলা হতো।

প্র : 'পুণ্যাহ'-এর সন্ধিবিচ্ছেদ কর।

উ : পুণ্য + অহ।

প্র : 'অহ' অর্থ কী?

উ : দিবস বা দিন।

প্র : 'হালখাতা' কী?

উ : নববর্ষের একটি অনুষ্ঠান।

প্র : 'হালখাতা' শব্দটি কীভাবে গঠিত হয়েছে?

উ : আরবি শব্দ 'হাল' অর্থ বর্তমান, আর আরবি শব্দ 'খত্' থেকে ফার্সি 'খাতা'- যার অর্থ লিখিত পত্র বা এমন কিছু। 'হালখাতা' বলতে বর্তমান পত্র বা বর্তমান খাতা বোঝায়।

প্র : 'হালখাতা' কোন সমাস?

উ : খাতা হাল করা হয় যে অনুষ্ঠানে- অনুক বহুব্রীহি। (কারণ, এখন 'হালখাতা' একটি

অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে, সেখানে খাতা হাল করা হোক বা না-হোক।)

প্র : 'বৈশাখী মেলা' কী?

উ : বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে বিভিন্ন স্থানে যে মেলা বসে তাকে বৈশাখী মেলা বলে। তবে, এখন এই মেলা বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে না-হয়ে বৈশাখ মাসেরই অন্য কোনো দিন বা সপ্তাহব্যাপী হয়ে থাকে।

প্র : 'বিশাল মেলাও পরিণত হতো।'– এই বাক্য দিয়ে কী বোঝান হয়েছে?

উ : বৈশাখী বা এই ধরনের মেলায় বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, গোত্রের নারী-পুরুষ-শিশু একত্রিত হয়। বিভিন্ন অঞ্চল থেকেও মানুষ এসে মেলাতে অংশ নেয়। এর ফলে বিভিন্ন মানুষের সাক্ষাৎ মেলে, কথা হয়, পরস্পরে আনন্দ লাভ করে এবং এতে সামাজিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পায়।

প্র : 'কবিগান' কী?

উ : আঠার শতকে কলকাতায় উদ্ভূত এবং সে-সময় বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠা প্রশ্ন-উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক গান। এই গানের দুটো পক্ষ থাকে, এক পক্ষ অন্য পক্ষকে গানের মাধ্যমে ঘায়েল করার চেষ্টা করে। উনিশ ও বিশ শতকে এই গানের ধারা গ্রামবাংলায় জনপ্রিয়তার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িয়ে পড়ে।

প্র : আঠার, উনিশ, বিশ শতক কোন কোন সময়?

উ : আঠার শতক: ১৭০১– ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত; উনিশ শতক: ১৮০১– ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত; বিশ শতক: ১৯০১– ২০০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।

প্র : 'যাত্রা' কী?

উ : চার দিক খোলা মঞ্চে অভিনীত এক প্রকার নাটক।

প্র : 'কীর্তন' কী?

উ : রাধাকৃষ্ণের তত্ত্ব বিষয়ক গান। জীবপ্রেমই যে গানের মূল সুর।

প্র : 'গম্ভীরা গান' কী?

উ : শিবের গাজন গান। সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজশাহি ও মালদহ অঞ্চলে সামাজিক সমস্যাও এই গানের বিষয় হয়ে উঠেছে।

প্র : 'নবান্ন' কী?

উ : নতুন ধান আসার আগের অপেক্ষা সুখের সময়টা হলো কার্তিক মাস। অগ্রহায়ণ মাসে নতুন ধান ঘরে তোলা হয়। অগ্রহায়ণ বা নতুন ধান ঘরে তোলাকে নবান্ন বলে।

প্র : 'নবান্নোৎসব' কী?

উ : নবান্নোৎসব, অর্থাৎ নবান্নকে ঘিরে যে উৎসব হয়ে থাকে, তাকেই নবান্নোৎসব বলে। এ উৎসব পালন করা হয় মূলত ধান ঘরে তোলার আনন্দে।

প্র : 'সর্বজনীন' কী?

উ : সবার জন্য হিতকর বা সবার অংশগ্রহণযোগ্য।

প্র : 'বর্ষা' খেলা কী?

উ : বর্ষাশালী পুরুষের এক ধরনের বুদ্ধি খেলা।

প্র : 'বর্ষী' শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় কী?

উ : বর্ষ + ইন (ষ্ঠিন্)।

প্র : 'বর্ষী' অর্থ কী?

উ : বর্ষশালী বা শক্তিশালী।

প্র : চৈত্র মাসের শেষ দিনকে কী বলা হয়?

উ : চৈত্র-সাক্রান্তি।

প্র : 'আমনি' কী?

উ : একটি লোক-অনুষ্ঠান।

প্র : 'বৈসুক' কোন জাতি গোষ্ঠীর নববর্ষ উৎসব?

উ : ত্রিপুরা ও তঞ্চঙ্গা জাতি।

প্র : কিভাবে বৈসুক পালিত হয়?

উ : সাধারণত চৈত্র মাসের শেষ দিন ত্রিপুরারা তাদের দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য গরাইয়া নামের এক ধরনের নৃত্য করে। এই নৃত্য যে বাড়ি থেকে বের হয় সেই গ্রাম প্রদক্ষিণ করে আবার সে বাড়িতেই শেষ হবার নিয়ম। নতুন বছরে ফসল ভাল হোক, সবাই মঙ্গলে থাকুক- এই প্রার্থনা করা হয়।

প্র : 'সাংগ্রাই' কোন জাতি গোষ্ঠীর নববর্ষ উৎসব?

উ : মারমা জাতির।

প্র : কিভাবে সাংগ্রাই পালিত হয়?

উ : মারমারা এ উৎসবে পরস্পরের প্রতি পানি ছিটিয়ে পুরাতন সব জরা ও জঞ্জাল ধুয়ে দেয়। পরে পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করে পবিত্র মনে নাচ-গানের আয়োজন করে।

Scanned with CamScanner

প্র : 'বিজু' কোন জাতি গোষ্ঠীর নববর্ষ উৎসব?

উ : চাকমা জাতির।

প্র : কিভাবে বিজু পালিত হয়?

উ : চাকমা সমাজে চৈত্র মাসের শেষ দুই দিনকে ফুলবিজু ও মূলবিজু বলা হয়। আর পহেলা বৈশাখকে তারা বলে গয্যাপয্যা দিন। এই তিন দিনব্যাপী বিজু উৎসব পালিত হয়। মূলত বৌদ্ধ মন্দিরে প্রার্থনা, প্রদীপ প্রজ্বলন, অতিথিদের আপ্যায়ন, জীবনসাথী অন্বেষণ এবং সবার মঙ্গল কামনা করে বিজু পালিত হয়।

প্র : 'বৈসাবি' কী?

উ : আজ একত্রভাবে পাহাড়িরা যে নববর্ষ উৎসব পালন করে তাকেই 'বৈসাবি' বলে। মূলত বৈসুব-এর বৈ; সাংগ্রাই-এর সা; বিজু-র বি নিয়ে বৈসাবি গঠিত।

প্র : ঠাকুর পরিবার কোনটি?

উ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবার। এই পরিবারটি অনেক আগে থেকেই খুব প্রভাবশালী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঠাকুরদাদা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরতো বটেই, রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়-স্বজনেরাও বাংলা ও বাঙালি সংস্কৃতির জন্য মহৎ কর্মাবলি সম্পন্ন করে বিশ্বের বুকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

প্র : শান্তিনিকেতন কোথায়?

উ : ভারতের বীরভূম জেলায় অবস্থিত। রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানে ভূমি কিনেছিলেন। পরে রবীন্দ্রনাথ সেখানে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা (১৯২১) করেন।

প্র : 'বাংলা একাডেমি' কী?

উ : বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি বিকাশে গবেষণাসহ বিভিন্ন কাজ করার প্রতিষ্ঠান। (এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানতে দ্রষ্টব্য: এই গ্রন্থের শেষ দিকে প্রদত্ত 'বাংলা একাডেমি সম্পর্কে তথ্যাবলি'।)

প্র : 'যমুনা এলাকা' বলতে কী বোঝায়?

উ : সুবিশাল যমুনা পার্ক অঙ্গন এবং তার আশেপাশে।

প্র : আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কারা?

উ : বালক থেকে বৃদ্ধ এবং সব বয়সের নারীরা একত্রে।

শামসুদ্দীন আবুল কালাম

প্র : শামসুদ্দীন আবুল কালাম কোথায়, কবে জন্মগ্রহণ করেন?

উ : বরিশালের নলছিটি থানার কামদেবপুর গ্রামে; অগস্ট ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে।

প্র : তাঁর প্রকৃত নাম কী?

উ : আবুল কালাম শামসুদ্দীন।

প্র : তিনি কেন নাম পরিবর্তন করেন?

উ : ওই সময় আবুল কালাম শামসুদ্দীন নামে এক রাজনীতিবিদ, সম্পাদক (দৈনিক আজাদের) ও সাহিত্যিক ছিলেন। তাই তিনি ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে নিজের নাম 'শামসুদ্দীন আবুল কালাম' বলে পত্র-পত্রিকায় ঘোষণা করেন।

প্র : তাঁর রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ছিল কী?

উ : ছাত্রজীবনে তিনি কলকাতায় রিভলিউশনারি সোশালিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত থেকে ব্রিটিশ বিরোধী রাজনীতি করেন।

প্র : তিনি কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?

উ : 'মাহেনও'

প্র : তিনি কোন দেশে স্থায়ীভাবে অবস্থান করেন?

উ : ইতালি (রোম শহরে)।

প্র : তাঁর কয়েকটি গল্পগ্রন্থের নাম লেখ।

উ : অনেক দিনের আশা (১৯৫২), ঢেউ (১৯৫৩), পথ জানা নাই (১৯৫৩), দুই হৃদয়ের তীর (১৯৫৫), শাহের বানু (১৯৫৭), পুঁই ডালিমের কাব্য (১৯৮৭)।

প্র : তাঁর কয়েকটি উপন্যাসগ্রন্থের নাম লেখ।

উ : [illegible] (১৯৫৫)

Scanned with CamScanner

প্র : 'বিহু' কোন জাতি গোষ্ঠীর নববর্ষ উৎসব?
উ : চাকমা জাতির।
প্র : কিভাবে বিহু পালিত হয়?
উ : চাকমা সমাজে চৈত্র মাসের শেষ দুই দিনকে ফুলবিহু ও মূলবিহু বলা হয়। আর পরেরা বৈশাখকে তারা বলে গধ্যাপন্যা দিন। এই তিন দিনব্যাপী বিহু উৎসব পালিত হয়। মূলত বৌদ্ধ মন্দিরে প্রার্থনা, প্রদীপ প্রজ্বলন, অতিথিদের আপ্যায়ন, জীবনদাত্রী অন্বেষণ এবং সবার মঙ্গল কামনা করে বিহু পালিত হয়।

প্র : 'বৈসাবি' কী?
উ : আজ একত্রভাবে পাহাড়িরা যে নববর্ষ উৎসব পালন করে তাকেই 'বৈসাবি' বলে। মূলত বৈসুক-এর বৈ, সাংগ্রাই-এর সা: বিজু-র বি নিয়ে বৈসাবি গঠিত।

প্র : ঠাকুর পরিবার কোনটি?
উ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবার। এই পরিবারটি অনেক আগে থেকেই খুব প্রভাবশালী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঠাকুরদাদা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরতো বটেই, রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়-স্বজনেরাও বাংলা ও বাঙালি সংস্কৃতির জন্য মহৎ কর্মাবলি সম্পন্ন করে বিশ্বের বুকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

প্র : শান্তিনিকেতন কোথায়?
উ : ভারতের বীরভূম জেলায় অবস্থিত। রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানে ভূমি কিনেছিলেন। পরে রবীন্দ্রনাথ সেখানে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা (১৯২১) করেন।

প্র : 'বাংলা একাডেমি' কী?
উ : বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি বিকাশে গবেষণাসহ বিভিন্ন কাজ করার প্রতিষ্ঠান। (এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানতে দ্রষ্টব্য: এই গ্রন্থের শেষ দিকে প্রদত্ত 'বাংলা একাডেমি সম্পর্কে তথ্যাবলি'।)

প্র : 'বিশ্ববিদ্যালয়' বলতে কী বোঝান হয়েছে?
উ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বোঝান হয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে।

প্র : 'তমনা এলাকা' বলতে কী বোঝান হয়েছে?
উ : সুবিশাল রমনা পার্ক অঙ্গন এবং তার আশেপাশে।

প্র : আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কারা?
উ : বালক থেকে বৃদ্ধ এবং সব বয়সের নারীরা একত্রে।

শামসুদ্দীন আবুল কালাম

প্র : শামসুদ্দীন আবুল কালাম কোথায়, কবে জন্মগ্রহণ করেন?
উ : বরিশালের নলছিটি থানার কামদেবপুর গ্রামে; আগস্ট ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে।

প্র : তাঁর প্রকৃত নাম কী?
উ : আবুল কালাম শামসুদ্দীন।

প্র : তিনি কেন নাম পরিবর্তন করেন?
উ : ওই সময় আবুল কালাম শামসুদ্দীন নামে এক রাজনীতিবিদ, সম্পাদক (নৈতিক আজাদের) ও সাহিত্যিক ছিলেন। তাই তিনি ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে নিজের নাম 'শামসুদ্দীন আবুল কালাম' বলে পত্র-পত্রিকায় ঘোষণা করেন।

প্র : তাঁর রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ছিল কী?
উ : ছাত্রজীবনে তিনি কলকাতায় রিভলিউশনারি সোশালিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত থেকে ব্রিটিশ বিরোধী রাজনীতি করেন।

প্র : তিনি কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?
উ : 'মাহেনও'

প্র : তিনি কোন দেশে স্থায়ীভাবে অবস্থান করেন?
উ : ইতালি (রোম শহরে)।

প্র : তাঁর কয়েকটি গল্পগ্রন্থের নাম লেখ।
উ : অনেক দিনের আশা (১৯৫২), ঢেউ (১৯৫৩), পথ জানা নাই (১৯৫৩), দুই হৃদয়ের তীর (১৯৫৫), শাহের বানু (১৯৫৭), পুঁই ডালিমের কাব্য (১৯৮৭)।

প্র : তাঁর কয়েকটি উপন্যাসগ্রন্থের নাম লেখ।
উ : আলমগড়ের উপকথা (১৯৫৪), কাশবনের কন্যা (১৯৫৪), কাঞ্চনমালা (১৯৬১), জায়জঙ্গল (১৯৭৩), সমুদ্র বাসর (১৯৮৬), কাঞ্চনগ্রাম (১৯৯৮)।

'কাশবনের কন্যা' উপন্যাসের উপকথা' উপন্যাসের পরিচয় দাও।
শামসুদ্দীন আবুল কালামের 'আলম শামসুদ্দীন আবুল কালামের 'কাশবনের কন্যা' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৫৪ সালে। এখানে সামন্তবাদ ও ধনতন্ত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং ধনতন্ত্রের স্বপ্নের ফলে গণচেতনার বিকাশ কীভাবে ব্যাহত হয়েছে তা দেখানো হয়েছে।

'কাশবনের কন্যা' উপন্যাসের পরিচয় দাও।
শামসুদ্দীন আবুল কালামের 'কাশবনের কন্যা' (১৯৫৪) উপন্যাসে গ্রামকে এমনভাবে তুলে আনা হয়েছে যে, দুঃখ-দারিদ্র্য থাকলেও গ্রামই সুখের স্বর্গ, সমস্ত বৈভবের আধার। উপন্যাসে বরিশাল অঞ্চলের প্রকৃতি, লোকজীবন, গ্রামীণ বিশ্বাস ফটোগ্রাফিকভাবে চিত্রায়িত। নিবারণ, হোসেন, জোবেদা, মেহেরজান প্রমুখের মুখের আঞ্চলিক কথা, লোকসঙ্গীত, প্রচলিত লোকবচন ইত্যাদির ব্যবহার উপন্যাসটিকে সুখপাঠ্য ও বিশ্বস্ত করেছে। 'কাশবনের কন্যা' গুরুত্বপূর্ণ এ কথা যে, এ উপন্যাসে ঔপন্যাসিক রোমান্টিক মনোভঙ্গিতে এমন এক গ্রাম, গ্রামের মানুষ ও পরিবেশ তুলে এনেছেন, যা দুঃখ অতিক্রমকারী, সুখস্বপ্ন আশা সঞ্চারী।

'জায়জঙ্গল' উপন্যাসের পরিচয় দাও।
সুন্দরবনের জনবিরল বনজঙ্গলঘেরা পরিবেশে 'জায়গঙ্গল' (১৯৭৩) উপন্যাস রচিত। সে দিক থেকে এটিকে আঞ্চলিক উপন্যাস বলা চলে। উপন্যাসের একটি চরিত্রও সুন্দরবন অঞ্চলের নয়, উপন্যাসের পটভূমিই কেবল সুন্দরবন। তবে এ অঞ্চলের বর্ণনা দিতে ঔপন্যাসিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। যে মানুষগুলোর চিত্র এ উপন্যাসে আছে তারা সেটেলার; জনসংখ্যা ও দারিদ্র্যের চাপে তারা পিতৃপুরুষের নিবাসভূমি পরিত্যাগ করে সমুদ্রতীরবর্তী শ্বাপদসংকুল সুন্দরবন অঞ্চলে বাস করতে বাধ্য হয়েছে। লাঠিয়াল জয়নাল শেখ এমন একটি চরিত্র যে লাঠিয়ালি পেশায় আস্থা রাখতে না পেরে এ অঞ্চলে এসেছে। সেখানে সে বসবাস শুরু করে। ধীরে ধীরে সে হয়ে ওঠে জোতদার-এজিদিরা এক উত্তরসূরি। 'জায়জঙ্গল' এর আদি, মধ্যবর্তী অন্ত, বহুমান শেষ, বিস্তার উপন্যাসের ঘটনা উপন্যাসের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ন হয়েছে। তবে শেষের মৎস্যশিকার, লাশ বিক্রয়-প্রক্রিয়া, জমু-টোরা ইত্যাদির অবতারণা আজলিকতা প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন।

প্র : 'সমুদ্র বাসর' উপন্যাসের পরিচয় দাও।
উ : বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলের সমুদ্রতীরবর্তী জনজীবনকেন্দ্রিক উপন্যাস 'সমুদ্র বাসর'। একে আঞ্চলিক উপন্যাস বলা যায়। কাশবনপুরের জেলে সবনাথ, রতিকান্ত, দেবনাথ, শ্রীহরি সাগর ও অন্যান্য মোহনায় জীবন বাজি রেখে মাছ ধরে। এক দিন তারা সন্ধান পায় নতুন জেগে ওঠা চরের। সবনাথ ও নবনে জলায় একটি গোষ্ঠীর দলপতি মুজফফর মিঞাকে। সবনাথ মনে করেছিল মুজফফর মিঞা এই সংবাদের কথা তাকে পুনর্বসতি করবে। চরের নবন ঘটে নি। এই অঞ্চলকেন্দ্রিক মানুষের জীবন পরিচর্যা উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয়। মনু মল্লিক ও করিমন এ উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য চরিত্র। এছাড়া নিবু, ইউসুফ সুজা, জরিনা, মোনালসা, মতলব সর্দার, পনি মিঞা, সবনাথ, রতিকান্ত, সুজাত আলি, সোনাবৌ, চান্দু প্রমুখ রয়েছে। উপন্যাসে আঞ্চলিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য মতো কতিপয় অন্ধ-বিশ্বাসের উল্লেখ আছে। যেমন: কুমির-ব্রত, লাসবরণের উৎসব ইত্যাদি। উপন্যাসটি ১৯৪৭-'৪৮ খ্রিষ্টাব্দে রচিত। ১৯৮০-'৮১ খ্রিষ্টাব্দে এর অংশবিশেষ পুনর্লিখিত হয় এবং ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার পুথিঘর লিমিটেড থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়।

প্র : শেষজীবনে সাহিত্য ছাড়া আর কোন মাধ্যমে তিনি কাজ করেন?
উ : চলচ্চিত্র।

Scanned with CamScanner

প্র : সাহিত্যে অবদানের জন্য ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কোন পুরস্কার লাভ করেন?
উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার।
প্র : তিনি কবে, কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি, ইত্তালিক বোমে। তাঁকে ঢাকায় সমাহিত করা হয়।

শামসুর রাহমান

প্র : শামসুর রাহমান কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৯২৯ সালের ২৪শে অক্টোবর মাতুলালয় ঢাকার (পুরানো ঢাকার) মাহুতটুলিতে। (সূত্র : বাংলা একাডেমি লেখক অভিধান। ১৯৯৮) পারিবারিক হিসেবে তাঁর জন্ম ২৩শে অক্টোবর।
প্র : তাঁর পৈতৃক নিবাস কোথায়?
উ : বর্তমান নরসিংদী জেলার বায়পুরার পাড়াতলি গ্রামে।
প্র : তাঁর মা-বাবার নাম কী?
উ : মা : আমেনা বেগম
বাবা : মুখলেসুর রহমান চৌধুরী।
প্র : তাঁর স্ত্রীর নাম কী?
উ : জোহরা রাহমান (বেগম)।
প্র : শামসুর রাহমানের প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া কতটুকু?
উ : ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার পোগেজ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের শেষে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে। তিন বছর পড়েও অনার্স পরীক্ষা দেন নি। পরে বিএ (পাস) ডিগ্রি অর্জন করেন। আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে এমএ ভর্তি হন। কিন্তু এমএ-র প্রথম বর্ষ পরীক্ষায় পাস করলেও ফাইনাল পরীক্ষা দেন নি।
প্র : শামসুর রাহমানের ডাক নাম কী?
উ : বাচ্চু।
প্র : মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি একটি ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন। সেটি কী?
উ : মজলুম আদিব।
প্র : তিনি মূলত কী হিসেবে পরিচিত?
উ : আধুনিক কবি; যিনি রোম্যান্টিকতার সঙ্গে সমাজমনস্কতার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে নতুন কাব্যধারার জন্ম দিয়েছেন।
প্র : শামসুর রাহমানের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলির নাম লেখ।
উ : কবিতা : মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর ৩০টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য : প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে (১৯৬০), রৌদ্র করোটিতে (১৯৬৩), বিধ্বস্ত নীলিমা (১৯৬৭), বন্দী শিবির থেকে (১৯৭২), এক ধরনের অহংকার (১৯৭৫), শুশ্রূষাহীন দুঃখ শোকসভা (১৯৭৭), বাংলাদেশ খুব ন্যাংটো (১৯৭৭), উল্টট উটের পিঠে চলছে স্বদেশ (১৯৮২), যে অন্ধ মুন্সেফী কাঁদে (১৯৮৪), অবিরল জলাভূমি (১৯৮৬), এক ফোঁটা কেমন অনল (১৯৮৬), তাঁর বাংলাদেশের হৃদয় (১৯৮৮), বুক হরিণের হাড় (১৯৯৩), উজাড় বাগানে (১৯৯৫), হেমন্ত সন্ধ্যায় কিছুক্ষণ (১৯৯৭), সৌন্দর্য আমার ঘরে (১৯৯৮), স্বপ্নে ও দুঃস্বপ্নে বেঁচে আছি (১৯৯৯), তবু হৃদয়ের ধ্বনি (২০০০), হৃদপদ্মে জ্যোৎস্না দোলে (২০০১), ভস্মস্তূপে গোলাপের হাসি (২০০২), ভাঙাচোরা চাঁদ মুখ কালো করে ধুঁকছে (২০০৩), কৃষ্ণপক্ষে পূর্ণিমার দিকে (২০০৪), গোরস্থানে কোকিলের করুণ আহ্বান (২০০৫), অন্ধকার থেকে আলোয় (২০০৬), না বাস্তব না দুঃস্বপ্ন (২০০৬)। উপন্যাস : মোট ৪টি উপন্যাস লিখেছেন: অক্টোপাস (১৯৮৩), অসুখ আঁধার এক (১৯৮৫), নিয়ত মন্বন্তর (১৯৮৫), এলো সে অবেলায় (১৯৯৪)। প্রবন্ধ : আমৃত্যু তাঁর জীবনানন্দ (১৯৮৬), কবিতা এক ধরনের আশ্রয় (২০০২)। আত্মস্মৃতি : স্মৃতির শহর (১৯৭৯), কালের ধুলোয় লেখা (২০০৪)।
এগুলো ছাড়াও তিনি ৯টি শিশু-কিশোর সাহিত্যগ্রন্থ, ৩টি অনুবাদ কাব্যগ্রন্থ, ৩টি অনুবাদ নাটকগ্রন্থসহ কলামগ্রন্থ, নিবন্ধগ্রন্থ ইত্যাদি মিলে শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন।
প্র : 'বন্দী শিবির থেকে' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : শামসুর রাহমানের খ্যাতি ও পরিচিতি এর আগে থেকে কিছুটা থাকলেও প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করে তাঁর 'বন্দী শিবির থেকে'

অন্তর্ভুক্ত কবিতা মুক্তিযুদ্ধকালে প্রবাসে বাংলাদেশে এপ্রিল-ডিসেম্বর, ১৯৭১ সময়ে রচিত। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কলকাতা থেকে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। কালানুক্রমিকতার শুরুতে 'পূর্বাপর' শিরোনামে একটি ভূমিকা কবি তাঁর কালান্তরচনার ব্যাখ্যান করে কবি তাঁর কালান্তরচনার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছেন। ৩৮টি কবিতা গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখযোগ্য কবিতা। তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা, স্বাধীনতা তুমি, মধুস্মৃতি, রক্তাক্ত প্রান্তরে যুদ্ধকালীন আবেগ ও প্রত্যাশা ব্যক্ত। এছাড়া উপসর্গ করা হয়েছে ১৯৭১ সালের শহিদদের উদ্দেশে।
প্র : 'অনিঃশেষ নগ্ন পদধ্বনি' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : শামসুর রাহমানের নবম কাব্যগ্রন্থ এটি। প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালে। কাব্যগ্রন্থটিতে মোট ৪৬টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। কবিতাগুলোতে আছে স্বপ্নলোক, প্রতিবেশ ও সমকালের অন্তর্গত নানা অনুষঙ্গ, নিঃসঙ্গতা, ব্যর্থতা, যুদ্ধোত্তর হতাশা ইত্যাদি বিষয়। গ্রন্থটিতে টানা গদ্যে লেখা কবিতা যেমন আছে তেমনি আছে অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার।
প্র : 'এক ধরনের অহংকার' কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে লেখ।
উ : শামসুর রাহমান রচিত ৫২টি কবিতার সংকলন এই কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালে। কাব্যগ্রন্থটিতে প্রেম-কাম, নিসর্গ-প্রকৃতি, আশা-নিরাশার দ্বৈরথে বিদীর্ণ। কবির আত্মবিশ্লেষণ, একই সঙ্গে শৈশব ও বাল্য, যৌবন ও বার্ধক্য প্রভৃতি বিষয় এখানে চিত্রিত হয়েছে।
প্র : 'উল্টট উটের পিঠে চলছে স্বদেশ' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : ২৩টি কবিতার সমাহারে শামসুর রাহমানের এই কাব্যগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সালে। কবিতাগুলোতে আছে কবির স্বদেশ চেতনার পরিচয়, দুঃসময়ে দীর্ণ হৃদয়ের হাহাকার ও অস্থিরতা এবং

প্র : তাঁর দুটি বিখ্যাত কবিতার নাম লেখ।
উ : 'স্বাধীনতা তুমি', 'তুমি আসলে ছায়া ও কায়া'।
প্র : শামসুর রাহমানের কবিতীর্থ সম্পর্কে লেখ।
উ : রেডিও পাকিস্তানে অনুষ্ঠান ঘোষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু। পরে তিনি মর্নিং নিউজের সহ-সম্পাদক (১৯৫৭), দৈনিক পাকিস্তানের সহকারী সম্পাদক (১৯৬৫), দৈনিক বাংলার সম্পাদক (১৯৭৭), দৈনিক ইনকিলাব প্রতিষ্ঠাকালীন গণআন্দোলনে একাত্ম হয়ে চাকরি ছেড়ে স্বতন্ত্র ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে সরকার পতিত হলে দৈনিক বাংলা থেকে পদত্যাগ।
প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ : আদমজি পুরস্কার (১৯৬২), বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৯), একুশে পদক (১৯৭৭), স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৯১)।
প্র : তিনি কবে, কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।
প্র : তাঁকে কবে, কোথায় সমাহিত করা হয়?
উ : কবির ব্যক্ত ইচ্ছানুসারে বনানী সমাধিক্ষেত্রে মা আমেনা বেগমের সমাধির মধ্যে ১৮ই জুলাই, ২০০৬ কবিকে সমাহিত করা হয়।

'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে?
উ : নিজ বাসভূমি।

Scanned with CamScanner

প্র : ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ কবিতাটি কি জাতীয় কবিতা?
উ : সংগ্রামী চেতনার কবিতা, দেশ প্রেমের কবিতা, গণজাগরণের কবিতা।
প্র : কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
উ : গদ্যছন্দে ও প্রবহমান ভাষায়।
প্র : 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় বর্ণমালাকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে?
উ : নক্ষত্রের সঙ্গে।
প্র : 'আবার ফুটেছে ন্যাংটা কৃষ্ণচূড়া থরে থরে শহরের পথে'– চরণটি আমাদের জাতীয় জীবনের কোন দিকটি তুলে ধরে?
উ : ভাষা আন্দোলন।
প্র : শহরের পথে থরে থরে কী ফুটেছে?
উ : কৃষ্ণচূড়া ফুল ফুটেছে।
প্র : সালামের চোখ আজ কী?
উ : আলোচিত ঢাকা।
প্র : বরকত কোথায় বুক পাতে?
উ : ঘাতকের থাবার সম্মুখে বুক পাতে।
প্র : সালামের হাত থেকে কি ঝরে?
উ : অবিনাশী বর্ণমালা।
প্র : কৃষ্ণচূড়াকে কাদের রক্তের বুদ বুদ মনে হয়?
উ : শহিদের।
প্র : থরে থরে কৃষ্ণচূড়া কোথায় ফুটেছে?
উ : শহরের পথে ফুটেছে।
প্র : কোন ফুল সুতিগন্ধে ভরপুর?
উ : কৃষ্ণচূড়া ফুল।
প্র : পথঘাট কোন রঙে ছেয়ে গেছে?
উ : যে রং সন্ত্রাস আনে, সে রঙে পথঘাট ছেয়ে গেছে।
প্র : কার অশ্রুজলে ফুল ফোটে?
উ : মায়ের অশ্রুজলে।
প্র : 'অশ্রু' তো চোখের জল। এখানে 'অশ্রুজল' কি ভুল?
উ : না, এটাকে বলে 'আর্থপ্রয়োগ'। লেখকেরা জেনেশুনে কখনো এমন শব্দ প্রয়োগ করেন।
প্র : হরিৎ উপত্যকা অর্থ কী?
উ : সবুজ উপত্যকা। আর উপত্যকা হলো দুই পর্বতের মধ্যবর্তী সমতল ভূমি।
প্র : কোথায় দিনরাত ভুলুণ্ঠিত?
উ : ঘাতকের আস্তানায় দিনরাত ভুলুণ্ঠিত।
প্র : সারাদেশ ঘাতকের অভয় আস্তানা– কেন একথা বলা হয়েছে?
উ : পাকিস্তানীবাহিনীর অত্যন্ত পাশবাচারণকে বোঝানো হয়েছে।
প্র : 'ন্যাংটা' কী?
উ : 'দেখা'-এর উচ্চারিত রূপ। শামসুর রাহমান শব্দের উচ্চারণকে অনেক সময় কবিতায় ব্যবহার করেছেন। তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থের নাম : 'বাংলাদেশ ন্যাংটা ন্যাংটা'।
প্র : 'সালামের হাত থেকে নক্ষত্রের মতো / ঝরে অবিরত অবিনাশী বর্ণমালা'– এটি কোন অলঙ্কার?
উ : উপমা।
প্র : কৃষ্ণচূড়া ফুল 'সুতিগন্ধে ভরপুর' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
উ : এই স্মৃতি হলো আন্দোলনও সংগ্রাম পরবর্তী রক্তদানের স্মৃতি– যা পরে ইতিহাস হয়েছে। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনাকেই এখানে বোঝানো হয়েছে।
প্র : ১৯৬৯ সাল এক কথায় কী কারণে উল্লেখযোগ্য?
উ : গণঅভ্যুত্থানের কারণে।
প্র : 'সেই ফুল আমাদেরই প্রাণ' কেন?
উ : কৃষ্ণচূড়ার ফুলকে বায়ান্নের শহিদের রক্তের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কবিতার প্রথমে। একুশের শহিদের রক্তকে বাঙালির প্রাণচেতনা হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে।
প্র : আনন্দের রৌদ্র, দুঃখের ছায়া কী?
উ : আনন্দকে কাব্যব্যঞ্জনায় রোদের উজ্জ্বলতা আর দুঃখকে ছায়ার অন্ধকারাচ্ছন্নতার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : রক্তগঙ্গা কী?
উ : সরাসরি হিমালয় পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশে যাওয়া নদী বলে এই নদী বেগবান ও বৃহৎ। স্বাধীনতার জন্য

'কবির রক্তমান' বোঝাতে এখানে রক্তগঙ্গা শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।
প্র : 'রক্তগঙ্গা' কী?
উ : 'রক্তগঙ্গা' আছে এই শাশন-এর কথা। হিমালয় পর্বতের সন্নিকটে শাশন একটি নদীর নাম। এই নদী দেশের সন্নিকটে পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচারকে বোঝানো

এগিয়ে নিয়ে যান। বাংলার লোকসাহিত্যের অন্যতম কেরামতি হলো সমঝদারবান। আবদুল করিম এই সমঝদারদেরকে নিজের বিশ্বাস ও বোধের দ্বারা আরো সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করেন এবং বাংলার লোকগানে নতুন মাত্রা সংযোজন করেন। যে কারণে তাঁর গান শ্রবণ ও হাসন রাজার গানের চেয়ে পৃথকতা লাভ করে। শ্রবণ ও হাসনের গানে আধ্যাত্মিকতা যেখানে প্রধান আবদুল করিমের গানে প্রাধান্য ইহজাগতিকতা।

প্র : কী কারণে এবং কবে তিনি প্রথম বিদেশে যান?

উ : ১৯৬৮ সালে মুক্তাঙ্গনে গান গাওয়ার জন্য। এটাই তাঁর জীবনের প্রথম বিদেশ সফর।

প্র : মৃত্যুর আগে তিনি কোন গান শুনতে চেয়েছিলেন?

উ। চিকিৎসা চলাকালে হাসপাতালে আবদুল করিমের সঙ্গে সার্বক্ষণিক থাকা একমাত্র ছেলে শাহ নূর জালাল বলেন, 'বাবা শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন। টানা চার দিন চিকিৎসার পর খানিক সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। বুধবার [৯-৯-২০০৯] তিনি খাওয়া-দাওয়াও করেন। আস্তে আস্তে কথাবার্তা বলছিলেন। একপর্যায়ে গান শুনতে চাইলে বাবার শিষ্য বাউল বশিরউদ্দিন নিজের লেখা একটি গান গেয়ে শোনান। এ গান শুনে তিনি হাসেন। পরে তিনি তাঁর প্রিয় গান 'কোন মেস্তরি নাও বানাইছে কেমন দেখা যায়...' শুনতে চাইলে বশির এ গান যখন গান, তখন তাঁর চোখ বেয়ে পানি ঝরছিল।

শিষ্য বশিরউদ্দিন বলেন, 'এই হাসি-কান্নার পর তিনি নির্লিপ্ত হয়ে পড়েন। আর কোনো সাড়া শব্দ শোনা যায় নি। কোনো কথাও বলেন নি।'

প্র : তিনি কী কী পুরস্কার পেয়েছেন?

উ : প্রায় দেড়শতাধিক পদক-পুরস্কার সহ ২০০১ সালে একুশে পদক।

প্র : তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?

উ : ২০০৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর শনিবার, সকাল ৭.৪৫ মিনিটে; সিলেটে।

প্র : সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১৮৩৪ সালের ২৭শে জুন ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির নৈহাটির কাঁঠালপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন।

প্র : তাঁর পিতার নাম কী?

উ : তাঁর পিতা ডেপুটি কালেক্টরেট (ডিসি) যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

প্র : তাঁর সহোদরদের নাম কী?

উ : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর সহোদর ভাই ছিলেন।

প্র : কর্মজীবনে তিনি কী ছিলেন?

উ : কর্মজীবন শুরু করেছিলেন বর্ধমান জেলার কমিশনার অফিসের কেরানি হিসেবে। পরে ডেপুটি মেজিস্ট্রেট হন।

প্র : তিনি কোন গ্রন্থ লিখে প্রথম খ্যাতি অর্জন করেন?

উ : 'Bengal Ryots : Their Rights and Liabilites' (১৮৬৪) নামের গ্রন্থ লেখে।

প্র : তিনি কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?

উ : বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ১২৮৪ থেকে ১২৮৯ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত। আর সম্পাদনা করেন 'ভ্রমর' নামের মাসিক পত্রিকা (১২৮১–১২৮২) বঙ্গাব্দ।

প্র : সঞ্জীবচন্দ্রের জনপ্রিয় গ্রন্থের নাম কী?

উ : 'পালামৌ'।

প্র : 'পালামৌ' কী?

উ : এটি বিহারের একটি স্থান। চাকরিসূত্রে তিনি যখন বিহারে ছিলেন, সেই সময়ের ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা তিনি লেখেন পরিণত বয়সে। তার নাম দেন 'পালামৌ'।

প্র : 'পালামৌ' কবে, কোন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ পায়?

উ : ১২৮৭ থেকে ১২৮৯ বঙ্গাব্দের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রথম এই ভ্রমণকাহিনি প্রকাশ হয়।

প্র : 'পালামৌ' সম্পর্কে কী বলা যায়?

উ : 'পালামৌ' সঞ্জীবচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা। ছোটনাগপুরের আদিম গিরিদরী অরণ্যানী ও আরণ্যক পশু ও মানব লেখকের

পালামৌ থেকে
গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

লেখক কবে পালামৌ গিয়েছিলেন?
লেখকের পূর্বে।
পালামৌ অঞ্চলের বৃত্তান্ত লিখবার জন্য লেখকের কতজন বন্ধু তাকে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করেছিলেন?
দুই-তিন জন।
বন্ধুরা পালামৌ এর বৃত্তান্ত লেখবার জন্য অনুরোধ করলে লেখক তাদের কি করতেন?
উপহাস করতেন।
লেখক পালামৌ এর বৃত্তান্ত কখন লিখতে বসিয়াছিলেন?
তাঁর বৃদ্ধ বয়সে।
বৃদ্ধ বয়সের রোগ কোনটি?
গল্প করা।
বৃদ্ধ গল্প করে কখন?
কেউ শুনলেও বা না শুনলেও।
'অনেক দিনের কথা লিখতে বসিয়াছি'– কোন রচনার অংশ?
পালামৌ।
অনেক দিনের কথা লিখতে বসায় লেখক কোন সমস্যায় পতিত হন?
তিনি সব কিছু স্মরণ করতে পারেন না।
'পূর্বে লেখক পর্বত কুসুমিত কানন' কোন চোখে দেখতেন?
যুবক বয়সের চোখে।

প্র : বৃদ্ধ বয়সে পূর্বত লেখকের নিকট কিরূপ?

উ : অরণ্যময়।

প্র : বৃদ্ধ বয়সে লেখক বন্ধুকে কিরূপ অনুরোধ করেন?

উ : কষ্টস্বীকার।

প্র : অধিবাসীরা কেমন কথাটা বলে তার কাছে শ্রবণ চাহে?

উ : সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে।

প্র : লেখক কী আশা করে পালামৌতে যাত্রা শুরু করেন?

উ : ইংলিশ ট্রাঁসিয়া কোম্পানির ডায়েরীটি ছাড়া করে।

প্র : লেখক রলিনসন হতে পালামৌতে অধম যাত্রা শুরু করেছিলেন?

উ : মাঘি দেড় প্রহরে।

প্র : প্রাতে গন্তব্যকর নদীর কোন পাশের পল্লি দেখেছিল?

উ : পূর্ব পাড়ে।

প্র : নদীটি কিরূপ আবৃতি বিশিষ্ট ছিল?

উ : ক্ষুদ্র।

প্র : নদীটিতে লেখকের ভ্রমণকালে কতটুকু পানি ছিল?

উ : অল্পমাত্রা পানি।

প্র : সকলে বরাক নদী কিভাবে পার হয়েছিল?

উ : হেঁটে।

প্র : ডাক গাড়িটিকে কিভাবে নদী পার করানো হলো?

উ : ঠেলে।

প্র : কুলিকে ডাকতে কে গিয়েছিল?

উ : গাড়ওয়ান।

প্র : লেখকের গাড়িটি ঘেরাও করেছিল কারা?

উ : কুলিদের কিছু ছেলে-মেয়ে।

প্র : কুলিদের বালক-বালিকারা কি বলে লেখকের সামনে ভিক্ষার করছিল?

উ : সাহেব একটি পয়সা সাহেব একটি পয়সা।

প্র : লেখকের সামনে হাত পাতার অর্থ কে জানতো না?

উ : একটি দুই বছরের শিশু।

প্র : 'সকলে হাত পাতিয়াছে দেখিয়া সেও হাত পাতিল।'– উক্তিটি কার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

উ : দুই বছরের শিশুটির ক্ষেত্রে।

2020/5/14 23:
Scanned with CamScanner

প্র : শিশুটির ফেলে দেওয়া পয়সা কুড়িয়ে নেওয়ার এক বালকের সাথে কার ঝগড়া বাধল?

উ : শিশুটির জমিদার।

প্র : ঝগড়া চলাকালীন লেখকের গাড়ি কোথায় গিয়ে উঠেছিল?

উ : ধরাকর নদীর ওপর পাড়ে।

প্র : দুই-একটি ক্ষুদ্র পাহাড় কোথা থেকে দেখা যায়?

উ : ধরাকর নদী থেকে।

প্র : বঙ্গবাসীদের অজ্ঞান কোনটি?

উ : কেবল মাঠ দেখা।

প্র : মৃত্তিকার সামান্য স্বল্প লেখলে কারা আনন্দিত হয়?

উ : বঙ্গবাসীরা।

প্র : একটি সুন্দর পর্বতের কাছ দিয়ে গাড়ি কখন যাচ্ছিল?

উ : অপরাহ্নে।

প্র : পর্বতের কাছ দিয়ে গাড়ি যাওয়ার ফলে কোন দৃশ্য দেখা যাচ্ছিল?

উ : পর্বতস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরের ছায়ার দৃশ্য।

প্র : লেখক গাড়ি থামিয়ে কোথায় যাওয়ার অভিব্যক্তি গাড়োয়ানের কাছে প্রকাশ করেছিলেন?

উ : একটি পর্বতের নিকট।

প্র : কোনটি বাঙালির পক্ষে খুব কঠিন?

উ : পর্বত সম্বন্ধে দৃঢ়রূপ স্থির করা।

প্র : পরদিবসে প্রায় দুই প্রহরের সময় লেখক কোথায় পৌঁছেছিলেন?

উ : ম্যাজারিবাগ।

প্র : লেখকের খাওয়ার ব্যবস্থা কার বাড়িতে হয়েছিল?

উ : একজন সম্ভ্রান্ত বঙ্গবাসীর বাড়িতে।

প্র : লেখককে দেখিয়ে বাড়ির সকলে কিভাবে অগ্রসর হয়েছিল?

উ : সাদরে অগ্রসর হয়েছিল।

প্র : বাটির কর্তা কে ছিলেন?

উ : না চিনে লেখক যার অভিবাদন সর্বাগ্রে গ্রহণ করেছিলেন।

প্র : লেখক যে বাড়ির অতিথি হিসেবে গিয়েছিল সে বাড়ির লোকসংখ্যা কত ছিল?

উ : ৩০০ জন।

প্র : বৃদ্ধের কোন জিনিসটি লেখক তার জীবনে অতি অল্প দেখেছেন?

উ : প্রসন্নব্যঞ্জক গুণ।

প্র : বৃদ্ধের 'তালিকাত্ত' লোকটির নাম স্মরণ কারণ কোনটি?

উ : সরস পঞ্চাশতে বেশি হয়েছিল।

প্র : লেখক বৃদ্ধকে প্রথম বারের মতো কিরূপ দেখে?

উ : সুন্দর দেখে।

প্র : সে সময় লেখকের বৃদ্ধকে সুন্দর দেখা ধর্মসঙ্গত ছিল না কেন?

উ : লেখক যুবক ছিলেন।

প্র : লেখক নিজে বৃদ্ধ বিধায় সব বৃদ্ধকে তার কি মনে হয়?

উ : সুন্দর।

প্র : কোনটির আবশ্যকতা অনেকে বোঝেন না?

উ : দিবা রাত্র ছাত্রদের কাছে শিক্ষক গাধার আবশ্যকতা।

প্র : ধরটিতে এক কাঁদি সুপক্ক মর্তমান রম্ভা বা কলা কিভাবে ছিল?

উ : দোদুল্যমান।

প্র : প্রতিদিনের কলার ব্যয় ব্যবদ খরচ কোথায় লেখা হয়ে থাকে?

উ : তলার কাঁদিতে ঝোলানো কাগজে।

প্র : কলা ব্যয় হওয়ার হিসাব রাখাকে অনেকে কোন চোখে দেখে?

উ : ছোট চোখে।

প্র : 'কলাকাঁদির হিসাব দেখে'– লেখকের অনুভূতি কেমন ছিল?

উ : চমৎকৃত হয়েছিলেন।

প্র : ক্ষুদ্র দৃষ্টির লোকেরা কী করে থাকেন?

উ : কেবল সামান্য বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। অন্য বিষয় দেখতে পায় না।

প্র : লেখক কাদের প্রশংসা করেন না?

উ : যারা বড় বিষয় মোটামুটি দেখেন এবং সূক্ষ্ম বিষয় যাদের দৃষ্টিতে পড়ে না লেখক তাদের প্রশংসা করেন না।

প্র : সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কাদের প্রশংসা করেন?

উ : যাঁরা বৃহৎ এবং সূক্ষ্ম একত্রে দেখে কাজ করে।

প্র : লেখক পালামৌকে কেমন বসবাসের স্থান মনে করেছিল?

উ : সুখের।

লেখক ভাবনায় পালামৌ শহরটি কেমন?

প্রশ্নকারে লেখকের নিকট কোন বিষয়টি অজ্ঞাত ছিল?

পালামৌ শহর না একটি প্রকাণ্ড পালামৌ।

পালামৌ অঞ্চলে কোন দুইটি জিনিস নেই?

পালামৌ অঞ্চলটি কিসে পরিপূর্ণ?

পালামৌ ও জঙ্গল পরিপূর্ণ।

পালামৌতে পৌঁছানোর জন্য লেখক রাস্তা ছেড়ে কেন চলেন?

পালামৌয়ের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে।

পালামৌয়ে প্রবেশের পর লেখকের কোন কথা মনে হচ্ছিল?

নদী ও গ্রাম কিছু না থাকার ভুল।

পালামৌ পরগনায় কোনটি সংখ্যাতীত?

পাহাড়।

পালামৌকে লেখক কিসের সাথে তুলনা করেছেন?

বিগলিত নদীর সংখ্যাতীত তরঙ্গ।

পালামৌতে পাহাড় দেখে কে চমৎকৃত হয়েছিল?

পাহাড় দেখে লেখক চমৎকৃত হয়েছিল।

'সেটি একশিলা, সমুদয়ে একখানি প্রস্তর। তাহাতে একেবারে কোথাও কণামাত্র মৃত্তিকা নেই, সমুদয় পরিষ্কার ঝরঝর করিতেছে।'– উক্তিটি কার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

চমৎকৃত পাহাড়ের ক্ষেত্রে।

পাহাড়টির ফাটা স্থানে কোন গাছ জন্মগ্রহণ করেছে?

অশ্বত্থ গাছ।

লেখকের নিকট অশ্বত্থগাছটিকে রসিক পাষাণ মনে হয়েছিল কেন?

নীরস পাষাণ থেকে রস গ্রহণ করায়।

রসিক অশ্বত্থগাছটিকে হঠাৎ লেখকের পাষাণ মনে হলো কেন?

কেননা নীরস পাষাণ হইতেও রস গ্রহণ করে।

শাল তাল তমাল হিন্তোল ইত্যাদি কিসের বর্ণনায় লেখক শুনেছিলেন?

বন বর্ণনায়।

প্র : শালটি অন্যান্য বৃক্ষদের কাছে কী?

উ : শালটি সুবিধে এনা তাদের কোনো ভেদ নেই।

প্র : শাল গাছের জন্য প্রার্থনা কোথায়?

উ : প্রবন্ধের শেষে।

প্র : কার্ষ্ণ অধীর আগ্রহে লেখকের দিকে কেমন তাকিয়েছিল?

উ : বিস্ময়ের।

প্র : বনের কাষ্ঠ কুঠার আসে লেখক অস্ত্র কোথায় দেখেছিলেন?

উ : মেদিনীপুরে।

প্র : সুকুমারিত পত্র বনের পথে ধাবিতে দেখে মুগ্ধ পাওয়া যায় কিসহারে?

উ : গলার ঘণ্টার আওয়াজে অনুসারে।

প্র : প্রান্তর ছিন্নর কেমন অর্থ প্রকাশ করেন?

উ : কাহাকাটার আওয়াজ অনুসারে।

প্র : অল্প বিলাসেই লেখক কিসের দেখা পেলেন?

উ : অর্বাচীন তৃণাবৃত একটী ক্ষুদ্র প্রান্তরের।

প্র : প্রান্তর রম্য হয়ে ওঠার কারণ কী?

উ : পর্বত ছায়ার আসনে।

প্র : প্রান্তরটিতে কি দেখতে পাওয়া যায়?

উ : দু একটি মধু বা গৌরাদুড়।

প্র : প্রান্তরে চলে ও চরার পরিবর্তে কী দেখা যায়?

উ : প্রান্তরের পরিচারকদ্বয়।

প্র : কোলবালকেরা যে মহিষ চড়াচ্ছিল তারা কেমন ছিল?

উ : কৃষ্ণবর্ণ কান্তি।

প্র : কোলবালকরা গলায় কিসের মালা পড়েছে?

উ : পুঁতির।

প্র : ধুকপুকিয়ে পরিবর্তে তারা কী পড়েছে?

উ : গোল আরশি।

প্র : কারা ধড়া পরিধান করেছে এবং কানে বনফুল দিয়েছে?

উ : কোলবালকেরা।

প্র : যারা কলকাতায় বা ঢা বাগানে যায় তারা কেমন প্রকৃতির ছিল?

উ : কুৎসিত প্রকৃতির।

প্র : লেখকের চোখে ঘনশি কোলরা কেমন?

উ : রূপবান।

প্র : 'বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে' উক্তিটি কোথা থেকে গৃহীত?

উ : 'পালামৌ' রচনা থেকে।

20/5/14 23:59

Scanned with CamScanner

প্র : প্রান্তরের পরের গ্রামে কতটি পুরুষ পরিবার বাস করে?
উ : ৩০-৩২টি।
প্র : সকলের বাড়ি দেখতে কেমন?
উ : পর্ণকুটির।
প্র : লেখকের পাশকি দেখতে কারা ছুটে এসেছিল?
উ : যাবতীয় স্ত্রীলোক।
প্র : যুবতীরা কিরূপ কালো ছিল?
উ : আবলুসের মতো।
প্র : যুবতীদের কটিদেশে কি জড়ানো?
উ : ক্ষুদ্র কাপড় জড়ানো।
প্র : ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বনফুল ও বড় বনফুল যুবতীরা কোথায় কোথায় পরিধান করেছিল?
উ : কর্ণে ও মাথায়।
প্র : যুবতীরা পরস্পর কাঁখ ধরাধরি করে কি দেখতে শুরু করেছিল?
উ : লেখককে।
প্র : বাংলার পথেঘাটে বৃদ্ধার সংখ্যা অধিক হলেও পালামৌতে কাদের সংখ্যা অধিক?
উ : যুবতীদের।
প্র : কোলরা অধিক বয়সী হলেও কেমন থাকে?
উ : যুবতী।
প্র : কোলরা কখন বৃদ্ধ হয়?
উ : বয়স আশির অধিক হলে।
প্র : পরিশ্রমী বেশি বিধায় কোল যুবতীরা কী করে?
উ : গৃহের কাজ ও কৃষিকাজ তারাই করে।
প্র : কোল পুরুষেরা কেন বঙ্গবাসী নারীদের মতো বৃদ্ধ হয়ে যায়?
উ : আলস্যের কারণে।
প্র : কোল নারীরা কেমন প্রকৃতির?
উ : শ্রমহেতু চিরযৌবনা।
প্র : মানুষের মধ্যে পশু পাখিদের কোন নিয়মটি রক্ষিত?
উ : পুরুষজাতিই বলিষ্ঠ ও সুন্দর।
প্র : কোল পুরুষদের উল্লেখযোগ্য কাজ কী?
উ : সন্তান রক্ষা করা ও চাটাই বুনা।
প্র : কোলদের মধ্যে কারা বলিষ্ঠ ও সুন্দর?
উ : স্ত্রীজাতিরা।
প্র : কোন পুরুষদের গায়ে খড়ি উঠছে?
উ : বয়ঃপ্রাপ্তদের।
প্র : পুরুষদের মুখে কোন জিনিসটির অভাব?
উ : হাসির।
প্র : তাদের জীবনী শক্তি কমে এসেছে?
উ : বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষদের।
প্র : বীরদর্পে কে পাহাড়ের দিকে যাচ্ছিল?
উ : একটি যুবক।
প্র : স্ত্রীলোকগুলো কিভাবে যুবার সাথে যাচ্ছিল?
উ : সাহিতে সাধিতে।
প্র : স্ত্রীলোকগুলো কেন নিরস্ত হয়ে এক পাশে দাঁড়িয়েছিল?
উ : লেখকের উপস্থিতিতে।
প্র : লেখকের প্রশ্নের জবাবে যুবা সগর্বে কী বলেছিল?
উ : 'আমি বাঘ মারিতে যাইতেছি, এই মাত্র আমার গোরুকে বাঘ মারিয়াছে।'
প্র : বালকের সঙ্গে যাওয়ার ইচ্ছা লেখক কিভাবে প্রকাশ করেছিলেন?
উ : কিঞ্চিত অপ্রতিভ হয়ে।
প্র : লেখক ভীতু হলেও কী ভয় পেতেন না?
উ : বাঘ-ভালুক।
প্র : বৃদ্ধ শিকারিরা লেখককে কোথায় যেতে নিষেধ করেছিলেন একাকী?
উ : পাহাড়ে।
প্র : যুবক কেন বাঘ মারার পূর্বে জল গ্রহণ করবে না বলেছে?
উ : ব্রাহ্মণ সন্তান বলে।
প্র : কারা নিজের ছায়া দেখে অনেক সময় ভয় পায়?
উ : সৈনিক পুরুষরা।
প্র : নিজের ছায়া দেখে ভয় পেলেও সৈনিক পুরুষেরা কী করে থাকে?
উ : রণক্ষেত্রে গিয়ে রণ করে।
প্র : যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে পুরুষ সৈনিকদের মনে কী আসে না?
উ : গুলি কিংবা তরবারি তার অঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হবে কি না।
প্র : আদিমকালের সব পুরুষেরা সাহসী ছিল কেন?
উ : ফলাফল জ্ঞান না থাকায়।
প্র : সভ্যতার সাথে সাথে কীসের ভাগ কমে যায়?
উ : সাহসের ভাগ।

প্র : পোশাক কোল ভাল হলে কী হয়?
উ : সাহস অন্তর্হিত হয়।
প্র : প্রকৃতির দিকে?
প্র : পাহাড়ের পথে লেখকের কার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল?
উ : কিছু কোল কন্যার সাথে।
প্র : লেখককে নাচ দেখার জন্য কে আমন্ত্রণ করেছিল?
উ : সর্দারপত্নী বয়োজ্যেষ্ঠা।
প্র : সর্দারপত্নী বয়োজ্যেষ্ঠার মাথায় কী ছিল?
উ : পুষ্প কলস।
প্র : পৃথিবীর সব জাতি কোনক্ষেত্রে কোলদের থেকে পেছনে?
উ : হাসি ও নাচের দিক দিয়ে।
প্র : লেখক কখন নাচ দেখতে গিয়েছিল?
উ : সন্ধ্যায়।
প্র : গ্রামের সব যুবক কোথায় এসে একত্র হয়েছিল?
উ : মটরুকের নিচে।
প্র : তারা খোপায় কয়টি চিরুনি দিয়েছিল?
উ : দুই থেকে তিনটি।
প্র : সকলের দেহচঞ্চল কেন?
উ : বয়সের দোষে।
প্র : সবাই কিভাবে নিজের বলবীর্য দেখেছিল?
উ : নৃত্যাভিনয়ে।
প্র : কারা বৃক্ষমূলে উচ্চ মৃন্ময়-মঞ্চের উপরে জড়বৎ বসে ছিল?
উ : বৃদ্ধরা।
প্র : বৃদ্ধদের জানু কী ছাড়িয়ে গিয়েছিল?
উ : স্তন।
প্র : বৃদ্ধদের পাশে কে গিয়ে বসেছিল নাচ দেখতে?
উ : লেখক।
প্র : কারা দলে দলে এসে যুবাদিগের প্রতি উপহাস আরম্ভ করেছিল?
উ : গ্রাম্য যুবতীরা।
প্র : লেখক কিসের কিছুই বুঝতে পারছিল না?
উ : উপহাসের।
প্র : কখন বড় হাসির ঘটা পড়ে গিয়েছিল?
উ : যুবতীরা যখন যুবকদের প্রতি উপহাস করছিল।
প্র : নৃত্য দেখতে আসা যুবক ও যুবতীর সংখ্যা কত?
উ : যুবক ১২-১৩ জন ও যুবতী প্রায় ৪০ জন।
প্র : যুদ্ধপক্ষম যুবতী একত্রে হাসলে কি হয়?
উ : হাসলের সঙ্গম।
প্র : যুবতীরা কিভাবে ঊর্ধ্বমুখী হয়?
উ : হাত ধরে অর্ধশয়ানাবস্থা থেকে উঠে বসে।
প্র : সব যুবতীর শরীরের বস্ত্র কেমন ছিল?
উ : সলমা উড়ু ও পাথরে কাজ।
প্র : সলমার মাথায় ও কানে কী ছিল?
উ : কনকফুল।
প্র : কখন যুবতীদের সঙ্গে আসল সেরেস্তাদার?
উ : যুবতীদের হাসিতে।
প্র : তাদের আসল সা জেলাসেও যুবতীরা কী হয় না?
উ : ঢলে না, গেলে না, হাসে না।
প্র : সূর্য অস্তে হাসে কে সন্ধ্যে থেকে কাঁদতে কাঁদতে কাঁদে একটি ঝাঁঝের 'মহড়া' আরম্ভ করলো?
উ : একজন বৃদ্ধ।
প্র : যুবতীদের সুরের শ্রেষ্ঠ কোথায় গেয়ে দাদারে দাদল?
উ : নিদালীর পাহাড়ে।
প্র : যুবতীরা যখন তাদের নাচে নাচিল তখন তাদের বনফুলের কি পরিবর্তন হচ্ছিল?
উ : একবার উঠছিল, একবার নামছিল।
প্র : ফুলগুলোর মধ্যে দুই একটি মধ্যে যুবতীদের কোথায় পড়েছিল?
উ : স্কন্ধে।
প্র : দুই তিন আষাঢ় হু হু করে কী স্থগিল?
উ : আগুন।
প্র : অগ্নির আলোকে নর্তকীদের কেমন দেখাচ্ছিল?
উ : আরো কালো।
প্র : নর্তকীরা কিভাবে 'চিহিয়া' পড়ছিল?
উ : ফুলের পাপড়ির মতো।
প্র : ফুলের পাপড়ির মতো নর্তকীদের ঠোঁটে পড়া দেখে কে, কে হেসেছে?
উ : আকাশের চাঁদ ও বটমূলের অন্ধকারে বসে লেখক।
প্র : সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর স্মৃতিচারণামূলক ভ্রমণকাহিনি কোনটি?
উ : পালামৌ।
প্র : সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কার সহোদর?
উ : সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের।
প্র : তিনি কোন কোন বিষয়ে নিজের ঈর্ষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন?
উ : ইংরেজি, বিজ্ঞান ও ইতিহাসে।

Scanned with CamScanner

প্র : সঞ্জীবচন্দ্র জীবদ্দশায় কী ছিলেন?
উ : ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।
প্র : 'মাধবীলতা' ও 'জলপ্রতাপ চাঁদ' সঞ্জীবচন্দ্রের কী ধরনের রচনা?
উ : উপন্যাস।
প্র : মুক মুকি অর্থ কী?
উ : লবেজান।
প্র : 'ধড়া' অর্থ কী?
উ : ধুতি।
প্র : 'পেনাল কোড' দ্বারা কী নির্দেশ করে?
উ : ফৌজদারি মামলার দণ্ডবিধি।
প্র : পালামৌ স্থানটি কেমন?
উ : গ্রন্থে বলা হয়েছে: 'পালামৌ সহর নহে, একটি প্রকাণ্ড পরগনামাত্র। সহর সে অঞ্চলেই নাই, নগর দূরে থাকুক, তথায় একখানি গণ্ডগ্রামও নাই, কেবল পাহাড় ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ।' অন্যত্র বলা হয়েছে: 'পাহাড়, জঙ্গল, বাঘ এই লইয়াই পালামৌ'।
প্র : 'পালামৌ' কোথায় প্রথম প্রকাশ পায়?
উ : 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায়। ১২৮৭ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় আরম্ভ, ১২৮৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায় সমাপ্ত হয়। সঞ্জীবচন্দ্রের জীবৎকালে (১৮৩৪-১৮৮৯) এটি পুস্তকাকারে প্রকাশ পায় নি।
প্র : 'পালামৌ' কিভাবে জনসম্মুখে আসে?
উ : সঞ্জীবচন্দ্রের মৃত্যুর পর (১৮৮৯) বঙ্কিমচন্দ্র 'সঞ্জীবনী সুধা' নাম দিয়ে সঞ্জীবচন্দ্রের রচনাবলি প্রকাশ করেন। সেখানেই 'পালামৌ' প্রথম গ্রন্থস্থ হয়। এর বহু পরে ১৩৫১ বঙ্গাব্দে কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রথম স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে 'পালামৌ' প্রকাশ করে।
প্র : 'পালামৌ' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য কী?
উ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'পালামৌ' নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এর এক পর্যায়ে তিনি বলেছেন: "পালামৌ' ভ্রমণবৃত্তান্তের মধ্যে সৌন্দর্যের প্রতি সঞ্জীবচন্দ্রের যে একটি অকৃত্রিম সজীব অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে এমন সচরাচর বাংলা লেখকদের মধ্যে দেখা যায় না।"
প্র : 'পালামৌ'-এ কয়েকটি বাক্য মন্তব্যসহ ও প্রবাদপ্রতিম হয়ে উঠেছে। কোনগুলো?
উ : ১. 'বঙ্গবাসীদের কেবল মাছ খেয়া অভ্যাস, মৃত্তিকার সামান্য গন্ধ দেখিলেই তাহাদের আনন্দ হয়'।
২. 'বঙ্গবাসীমাত্রই সজ্জন; বঙ্গে কেবল প্রতিবাসীরাই দুরাত্মা, যাহা লিখা গুনা যায় তাহা কেবল প্রতিবাসীর।'
৩. 'মনুষ্য বৃদ্ধ না হইলে সুন্দর হয় না।'
৪. 'যাহার ভাগ্যে কঠিন পাষাণ, পাষাণই তাহার অবলম্বন'।
৫. 'বন্যেরা বনে সুন্দর; শিশুরা মাতৃক্রোড়ে'।
৬. 'এক দিন আপনার অহঙ্কারে আপনি হাসিব'।
৭. 'যে হারে, সেই রাগে'।

সতীনাথ ভাদুড়ী

প্র : সতীনাথ ভাদুড়ীর জন্ম কবে, কোথায়?
উ : ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর, বিহার প্রদেশের পূর্ণিয়া নামক স্থানে।
প্র : তিনি কোন রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন?
উ : আইনে ডিগ্রি নিয়ে পূর্ণিয়াতে ওকালতি করেন। পরে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে কংগ্রেস দলে যোগ দেন এবং ওকালতি ত্যাগ করেন। ১৯৪০-'৪২ পর্যন্ত রাজনীতির দায়ে জেলে ছিলেন। উল্লেখ্য ১৯৪২ সালে ব্রিটিশ-বিরোধী 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলন হয়। দলের সঙ্গে মতের মিল না হলে ১৯৪৪ সালে কংগ্রেস পরিত্যাগ এবং এ সময় থেকে ব্যাপকভাবে সাহিত্যচর্চা আরম্ভ করেন।
প্র : তিনি কী হিসেবে পরিচিত?
উ : ঔপন্যাসিক। তাঁর উল্লেখযোগ্য দুটো উপন্যাস : জাগরী (১৯৪৬) ও ঢোঁড়াইচরিত মানস (দুই খণ্ড: ১৯৪৯, ১৯৫১)।

'জাগরী' উপন্যাস সম্পর্কে লেখ।
'জাগরী' (১৯৪৬) সতীনাথ ভাদুড়ীর প্রথম উপন্যাস, ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট-আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত। আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি শিক্ষিত সমাজ এই উপন্যাসটিকে অভ্যর্থনা জানান। বক্তব্যপ্রধান, চরিত্রসৃষ্টি ও বিশ্লেষণে- সমস্ত দিক থেকেই এই গ্রন্থটি একটি অনাস্বাদিত পূর্ব উপন্যাসরূপে স্বীকৃত। রাজনীতির আবর্তে চক্রায়িত এক পরিবার- মাতা, পিতা ও দুই পুত্র। এক পুত্রের সাজোর পর আরেক পুত্রের মুক্তিলাভের ঘটনা নিয়ে গ্রন্থটি চরিত্রের স্বপ্রোদ্ভাসিত মধ্য দিয়ে উপন্যসিত হয়েছে।
'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসের পরিচয় দাও।
'ঢোঁড়াই চরিত মানস' দুই খণ্ডে প্রকাশিত (১ম খণ্ড ১৯৪৯, ২য় খণ্ড ১৯৫১)। বিহারের শহর জিরানিয়া, তার থেকে কিছু দূরে তাঙমাটুলি। তাঙমাদের বৃত্তি ধরামি অর্থাৎ ফুলোর ঝালি ডালা। তারা জাতে ডোম। তবে পাশেই ধাঙড়টুলি। এই পরিবেশে পিতৃহীন, মাতৃপরিত্যক্ত ঢোঁড়াই বড়ো হয়। এই তাঙমা ঢোঁড়াইকে লেখক গড়ে তুলেছেন রামচন্দ্রের নতুন সংস্করণ করে। স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষপর্ব এর কালপরিধি। সমাজের নিম্নতম স্তরে রাজনৈতিক চেতনা কিভাবে প্রবেশ করে দলে দেয় মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, পরিবর্তিত করে এক ঢোঁড়াইকে 'রামায়ণজী'তে, তার এক অসাধারণ আখ্যান এই গ্রন্থ। এই কাহিনিতে অন্তর্লীন হয়ে আছে তুলসীদাসের রামচরিতমানস। রাজনীতি ও সমাজ পরিবর্তন ও সমাজের অন্ত্যজ মানুষের বিশ্বস্ত রূপায়ণ এবং রামচরিমানসের সঙ্গে আধুনিক কাহিনির অন্তর্বয়ন এই তিনদিক থেকে এই আখ্যান বাংলা সাহিতের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির অন্যতম।
কোন উপন্যাসের জন্য তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন?
'জাগরী'; ১৯৫০ সাল।
তিনি কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?
১৯৬৫ সালে।

সত্যেন সেন
সত্যেন সেনের জন্মসন কত?
১৯২৭।
তাঁর জন্ম কোথায়?
তিনি মুন্সিগঞ্জ কী ছিলেন?
মহকুমা হাকিম।
তিনি কোন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?
কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।
তাঁর রচনার মধ্যে কোন বিষয়গুলি লক্ষণীয়?
সমাজ, রাজনীতি, সমকালীন ও অতীত ইতিহাস, মার্কসবাদের শ্রেণি সংগ্রাম ও গণমুক্তির দৃষ্টিতে গভীর সমন্বয় ও উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত।
তিনি কোন সাংস্কৃতিক সংগঠন গঠিত করেন?
'ইউনিটি' (১৯৬৮)।
তাঁর প্রথম গ্রন্থটির নাম কী?
উপন্যাস : ফেরারি বহ্নি (১৯৬৩), অভিশপ্ত নগরী (১৯৬৫), শাদের সন্ধান (১৯৬৬), জন্মভার মৃত্যুপ্রাত (১৯৭৩), পদচিহ্ন (১৯৭৫), আলবেরুনী (১৯৭৬), সাত নম্বর ওয়ার্ড (১৯৭৬), মহাবিদ্রোহের কবিগুরু (১৯৮৮), সংগ্রামে বাংলাদেশ (১৯৭১), বাংলাদেশের কৃষকের সংগ্রাম (১৯৭৩), শিশু সাহিত্য : শতবর্ষের (১৯৭৪), অভিযাত্রী (১৯৭৬)।
প্র : 'আলবেরুনী' উপন্যাসের পরিচয় দাও।
উ : ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত সত্যেন সেন রচিত জীবনভিত্তিক উপন্যাস 'আলবেরুনী'র পাণ্ডুলিপি লিখেছিলেন জেলে বসে। বন্দী তিনি লিখেছেন হাজার বছর আগে ভবিষ্যৎ-সন্ধানে আসা অরব সাগরের নাবিকদের দেশ খোরাজমের উচ্চমানের শহরের বাসিন্দা, গণিতবিদ, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষানুরাগী ও দেশপ্রেমিক অবু রায়হান বিন আহমদ আলবেরুনীকে নিয়ে। গ্রন্থটিতে লেখক আলবেরুনীকে দেশ-কাল, জাতীয়তা ও ধর্মের সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে মুক্ত করে দিয়ে,

Scanned with CamScanner

বাংলা-বিদ্যার
মৌলিকজ্ঞান
কোষগ্রন্থ

বাংলা
ভাষা ও সাহিত্য
জিজ্ঞাসা

Scanned with CamScanner

এক মানবতাবাদী শক্তি হিসেবে অঙ্কন করেছেন।

প্র : সত্যেন সেনের 'অভিশপ্ত নগরী' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : বাইবেলের 'বুক অব দা প্রফেট : যেরেমিয়া খণ্ড' অবলম্বনে অভিশপ্ত নগরী (১৯৬৭) রচিত। বাংলাদেশের বাংলা সাহিত্যে সত্যেন সেনই প্রথম ব্যক্তি যিনি বাইবেলের কোনো কাহিনিকে আশ্রয় করে উপন্যাস রচনা করেন। তবে এটা কোন ধর্মকথার প্রলম্বিত রূপ নয়। বাইবেলের কাহিনিকে আশ্রয় করে রাজতন্ত্র ও পুরোহিততন্ত্রের মধ্যে ক্ষমতায় দ্বন্দ্ব এবং সেই দ্বন্দ্বে মেহনতি মানুষের প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ রূপায়ণে সত্যেন সেন সফল। উপন্যাসে যেরেমিয়া, রাজা যিহোয়াকিম, নেবুকাডনাজার প্রমুখ ঐতিহাসিক চরিত্রের উল্লেখ আছে। জীবনের প্রবহমান ধারা রূপ দিতে গিয়ে মহাকাব্যিক ভাষারীতি ও অলঙ্কার গৃহীত হয়েছে এই উপন্যাসে।

প্র : 'পাপের সন্তান' উপন্যাস সম্পর্কে লেখ।

উ : 'অভিশপ্ত নগরী'র দ্বিতীয় খণ্ড হিসেবে পরিকল্পিত 'পাপের সন্তান' (১৯৬৯) শুধু সত্যেন সেনেরই সেরা সৃষ্টি নয়, বাংলা ভাষায় লিখিত একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এ উপন্যাসের জন্য লেখক আদমজি পুরস্কার (১৯৭০) লাভ করেন। 'অভিশপ্ত নগরী'তে যিরুজালেম নগরী পতনের কথা আছে। 'পাপের সন্তানে' সেই পতনের প্রায় পঞ্চাশ বছর পরের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত। এই দীর্ঘ সময়ে ইহুদিদের সঙ্গে অন্য ধর্ম-জাতির অনেকেরই বিয়ে এবং সন্তান জন্মের ঘটনা ঘটে। পরজাতি স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণকারী ইহুদি সন্তানদের পাপের সন্তান আখ্যা দিয়ে তাদের ধ্বংস কামনা করা হয়। এই উপন্যাসের প্রধান পাত্র-পাত্রী মিকা ও শদরা ধর্মীয় ও সামাজিক এই বিধি নিষেধ অতিক্রম করে নীলনদের তীরে এসে নতুন পৃথিবী গড়ে তুলতে চায়। এই নতুনের প্রতি ইঙ্গিতই উপন্যাসের মূল কথা।

প্র : তাঁর রচিত পাপের সন্তান ও অভিশপ্ত নগরী উপন্যাস দুটি বিখ্যাত কেন?

উ : এই উপন্যাস দুটোর কাহিনি গৃহীত হয়েছে বাইবেল থেকে। বাংলাদেশে বাইবেল থেকে কাহিনি নিয়ে উপন্যাস রচনা এই প্রথম।

প্র : তিনি কী পুরস্কার লাভ করেন?

উ : উপন্যাসে বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭০), একুশে পদক (মরণোত্তর, ১৯৮৬)।

প্র : তাঁর মৃত্যু সাল কত?

উ : ৫ই ডিসেম্বর ১৯৮১; শান্তিনিকেতন।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

প্র : সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জন্মসন কত?

উ : ১৮৮২।

প্র : তাঁর জন্মস্থান কোথায়?

উ : নিমতাগ্রাম, কলকাতা।

প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?

উ : কবি।

প্র : প্রথম জীবনে তিনি কোন পেশায় জড়িত ছিলেন?

উ : ব্যবসায়।

প্র : তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কতটুকু?

উ : এন্ট্রান্স (১৮৯৯), এফ.এ (১৯০১)।

প্র : তাঁর কবিতার ভাববস্তু কী?

উ : দেশাত্মবোধ, শক্তির সাধনা ও মানবতার বন্দনা।

প্র : তাঁর বহুল প্রচলিত কবিতার নাম কী?

উ : 'মেথর'।

প্র : তাঁর কবিতা সমৃদ্ধ কিভাবে?

উ : ছন্দের ঝঙ্কারে।

প্র : তিনি কী হিসেবে খ্যাত?

উ : 'ছন্দের রাজা' ও 'ছন্দের জাদুকর' হিসেবে।

প্র : তাঁর রচিত বিখ্যাত কাব্যগুলোর নাম কী?

উ : সবিতা (১৯০০), সন্ধিক্ষণ (১৯০৫), বেণু ও বীণা (১৯০৬), কুহু ও কেকা (১৯১২), অভ্র আবীর (১৯১৬), হসন্তিকা (১৯১৯), বেলা শেষের গান (১৯২৩), বিদায় আরতি (১৯২৪), কাব্য সঞ্চয়ন (১৯৩০)। **অনুবাদকাব্য** : তীর্থরেণু (১৯১০), মণি মঞ্জুষা (১৯১৫)।

প্র : তাঁর মৃত্যুসন কত?

উ : ২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৯২২।

প্র : তাঁর মৃত্যুর পর রচিত 'সত্যেন-প্রয়াণ' কবিতা কে লেখেন?

উ : কাজী নজরুল ইসলাম।

'ঝর্ণার গান' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'ঝর্ণার গান' কবিতায় ঝর্ণাকে কবি কী হিসেবে উপস্থাপন করেছেন?

উ : পুরুরের প্রত্যাশায় যারা থাকেন তাদের পোক্তাকারী মানুষ হিসেবে; বিশেষভাবে বললে, 'নারী' হিসেবেও বলা যায়।

প্র : 'ডালচিনি' কী?

উ : 'দারুচিনি'র সামান পার্থক্যে 'ডালচিনি' হয়। মসলারূপে ব্যবহৃত সুগন্ধ ও স্নিগ্ধঝালস্বাদের গাছের ডালবিশেষ।

প্র : 'দুপুর-ভোর' অর্থ কী?

উ : দুপুর ভরে বা সারা দুপুর।

প্র : ঝর্ণার সারা গায়ে পুলক কেন?

উ : আনন্দে।

প্র : 'বিজন দেশ, কূজন নাই' অর্থ কী?

উ : জনহীন এলাকা, পাখির ডাকও নেই।

প্র : যখন 'বিজন দেশ, কূজন নাই' তখন ঝর্ণা কী করে?

উ : একা একাই নিজের পায়ে তাল বাজায়, একাই গান গায়, একাই চলে।

প্র : ঝর্ণা যখন এভাবে নির্ভার হয়ে চলে তখন পাহাড় কী করে?

উ : চোখ পাকিয়ে ভয় দেখায়।

প্র : ঝুম-পাহাড় কী?

উ : ঘন গাছপালা বিশিষ্ট নিঃশব্দ পাহাড়।

প্র : 'কোন গিরির হিম ললাট / ঘামল মোর উদ্ভবে'– অর্থ কী?

উ : ঝর্ণার উদ্ভব কোনো পাহাড় থেকে। কবি কল্পনা করছেন, পাহাড়ের কপাল ঘেমে উঠে সেই ঘাম থেকে ঝর্ণার উদ্ভব। অসাধারণ কল্পনা!

প্র : 'বুলবুলির বোল সাধি' অর্থ কী?

উ : বুলবুলি পাখির মতো কথা বলি।

প্র : কালসার কী?

উ : এক বিশেষজাতের হরিণ। এই জাতের হরিণের শিরদাঁড়ায় কালো রঙের দাগ থাকে।

প্র : ডালচিনি কী?

উ : 'ডালচিনি আর দারুচিনি একই। যার ডাল চিনির মতো (মিষ্টি অর্থে)। দারুচিনিও 'তাই'। দারু অর্থ কাঠ। যে দারু বা কাঠ চিনির মতো।

প্র : এই কবিতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ কোনটি?

উ : 'নিম্নে যাই, জলহে পাই ..... আমরা যাই তার পাশেই।' কারণ, এখানে শুধু প্রাকৃতিক ঝর্ণার কথা বলা হয় নি, সত্য ও সুন্দরের অন্বেষণের কথাও বলা হয়েছে। যে মানুষের কাছে সত্য সুন্দরের জন্য তৃষ্ণা অর্থাৎ সত্য, সুন্দর, মনুষ্যত্ব ইত্যাদির জন্য আকুতি সে কষ্ট করবে। আর যে পড়া, নষ্ট, অসুন্দরের পেছনে থাকে, তাকে কষ্ট করতে হয় না। এখানে 'ঝর্ণার জল' দিয়ে সুন্দর আর 'পাতকুয়ার জল' দিয়ে অসুন্দরকে বোঝানো হয়েছে।

সমর সেন

প্র : সমর সেনের জন্ম কত সালে?

উ : ১০ই অক্টোবর, ১৯১৬।

প্র : তাঁর জন্মস্থান কোথায়?

উ : বাগবাজার, কলকাতা।

প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?

উ : কবি। তাঁকে আধুনিক যুগের নাগরিক কবি বলা হয়?

প্র : তাঁর কবিতায় কোন দিকটি বলিষ্ঠভাবে রূপায়িত হয়েছে?

উ : নগর জীবনের ক্লেদ ও গ্লানি, মধ্যবিত্ত জীবনের সংকট, সংশয়, নীতিহীনতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা এবং সংগ্রামী গণচেতনা।

প্র : তিনি কার কাব্যধারার বিপরীতে কবিতা লিখেন?

উ : রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারার বিপরীতে।

প্র : তিনি কোন সাহিত্যের একজন দক্ষ অনুবাদক?

উ : রুশ সাহিত্যের।

প্র : তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলোর নাম কী?

উ : কয়েকটি কবিতা (১৯৩৭), গ্রহণ ও অন্যান্য কবিতা (১৯৪০), নানাকথা

Scanned with CamScanner

(১৯৮২), কোলাহল (১৯৮৩), তিন পুরুষ (১৯৮৪), সমাধি থেকের কবিতা (১৯৮৫), শতাব্দীর (১৯৮৬)।

প্র : তাঁর মৃত্যুসন কত?
উ : ১৯৮৭।

সমরেশ বসু

প্র : সমরেশ বসু কত সনে জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১১ই ডিসেম্বর, ১৯২৪।
প্র : তাঁর জন্মস্থান কোথায়?
উ : বাজানগর গ্রাম, বিক্রমপুর-মুন্সিগঞ্জ।
প্র : তাঁর উপন্যাসের মূল বিষয় কী?
উ : প্রান্তজীবন, সমাজের বিকৃতরূপ উন্মোচন ইত্যাদি।
প্র : তাঁর গ্রন্থসমূহের নাম কী?
উ : গঙ্গা (১৯৫৫), প্রজাপতি (১৯৬৭), বিবর (১৯৬৫), শ্রীমতী ক্যাফে (১৯৫৪), বিটি রোডের ধারে (১৯৫৩), দেখি নাই ফিরে ইত্যাদি।
প্র : 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাসের পরিচয় দাও।
উ : 'উত্তরঙ্গ' (১৯৫১) উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে পাটকল শুরু হওয়া এবং তার সঙ্গে জড়িত শ্রমিক শ্রেণির জীবন নির্ভর উপন্যাস। ফরাশডাঙার নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চলের সুখদুঃখ, সমাজের পরিবর্তনের কাহিনির এক বিশ্বস্ত পরিচয় এখানে আছে।
প্র : 'জগদ্দল' উপন্যাসের পরিচয় দাও।
উ : 'জগদ্দল' (১৯৬৬) উপন্যাসের মূল উপজীব্য বাংলাদেশে শিল্পায়নের ইতিহাস ও তার সঙ্গে জড়িত অর্থনৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের সঙ্গে পরিবর্তিত সমাজের টানাপোড়েন। এটা পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার জগদ্দল অঞ্চলের চটকলের প্রতিষ্ঠা এবং কারখানা সংলগ্ন জনপদের আখ্যান। 'উত্তরঙ্গ' নামক উপন্যাসের এটি পরবর্তী খণ্ড বলা চলে। উত্তরঙ্গের কাল ছিল আঠাশো ষাট থেকে আশি-বিরাশি, জগদ্দলের কাল শুরু হয়েছে তারপর থেকে। ইউরোপীয় ও ভারতীয় বহু চরিত্রের সমাবেশ এখানে।

বাংলা উপন্যাসের এই ধরনের [illegible] এবং অভিজ্ঞতার [illegible] মতো, 'জগদ্দল'ও [illegible] রচনা।

প্র : 'গঙ্গা' উপন্যাসের পরিচয় দাও।
উ : 'গঙ্গা' (১৯৫৭) অভিজাতের এবং মধ্যশ্রেণীর [illegible] জীবনযাপনের [illegible] এবং সামাজিক [illegible] স্থির, নির্দিষ্ট মানদণ্ডের [illegible] এক বিপরীত [illegible] আছে বাস্তব তথ্যের [illegible] মানবিক উপলব্ধি। 'গঙ্গা' [illegible] শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির [illegible]
প্র : 'বিবর' উপন্যাসের পরিচয় দাও।
উ : 'বিবর' (১৯৬৫) উপন্যাসে [illegible] ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও বিচ্ছিন্নতাবোধে [illegible] মূল্যবোধের প্রতি অনির্ভরতা ও [illegible] পুণ্যবোধের অভিশাপে এই কাহিনিটিকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। সমকালে নিন্দিত এবং পরে প্রশংসিত অভিনন্দিত এই উপন্যাস সমরেশ বসুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা।
প্র : 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে' উপন্যাস সম্পর্কে লেখ।
উ : ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে 'কালকূট' ছদ্মনামে সমরেশ বসুর উপন্যাস রচনার সূত্রপাত। একই সঙ্গে তিনি মার্কসবাদ থেকে ঝুঁকলেন অধ্যাত্মবাদের দিকে। দীর্ঘ বছর প্রয়াগের ত্রিবেণী সঙ্গমে যে কুম্ভমেলা হয় এবং সেখানে ভারতবর্ষের সকল প্রান্তের মানুষের যে সমাবেশ ঘটে, সেই মিলনমেলাই উপন্যাসটির বিষয়বস্তু। যা তাতে অভিব্যক্ত হয়েছে মানুষের বিশ্বাসে সংকট থেকে উত্তরণের আকুতি।
প্র : তাঁর উপন্যাসে কোন দিকটি দৃশ্যমান?
উ : মানুষের শাশ্বত বেদনা, গ্লানি, মনুষ্যত্বের দায় এবং সংকল্প।
প্র : তিনি কোন ছদ্মনামে লিখতেন?
উ : কালকূট।

[illegible] অভিযোগে তাঁর কোন [illegible] বিরুদ্ধে মামলা রুজু।
[illegible] উপন্যাসের বিষয়বস্তু কী?
[illegible] : অট্টালিকা আর পাশে বিস্তার [illegible]
[illegible] হয় যি।
[illegible] কী কী পুরস্কার লাভ করেন?
[illegible] পুরস্কার (১৯৫৭), সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার (১৯৮৭)।
[illegible] কত সনে মৃত্যুবরণ করেন?
[illegible] ১২ই মার্চ, ১৯৮৮।

সরদার জয়েনউদ্দীন

প্র : সরদার জয়েনউদ্দীনের জন্মসন কবে?
উ : ১৯১৮।
প্র : তাঁর জন্মস্থান কোথায়?
উ : রাজাবাড়ি গ্রাম, পাবনা।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : প্রাবন্ধিক ও ঔপন্যাসিক।
প্র : তাঁর গল্প উপন্যাসে কোন দিকটি নিষ্ঠার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে?
উ : সত্তরদশীন সমাজের সঙ্কট, মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, গ্রামীণ সমাজের প্রবহমান মানুষের দুঃখ-বেদনা এবং জমিদার, জোতদার ও মহাজনদের শোষণ-নিপীড়নের চিত্র।
প্র : তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের নাম কী?
উ : উপন্যাস : আদিগন্ত (১৯৫৯), অনেক সূর্যের আশা (১৯৬৭), বেগম শেহরালী দীর্ঘা (১৯৬৮), রোদের ঢেউ (১৯৭৫) ইত্যাদি। ছোটগল্প : নয়ন ঘুলি (১৯৫২), ঘরস্রোত (১৯৫৫), বেলা ব্যানার্জির প্রেম (১৯৬৮), অষ্টপ্রহর (১৯৭৩)।
প্র : 'আদিগন্ত' উপন্যাসের পরিচয় দাও।
উ : সরলা ও মেহের বয়াতির প্রেমের কাহিনি বর্ণনার ভেতর দিয়ে পল্লিসমাজের জটগুলো অনাবৃতভাবে প্রকাশিত হয়েছে সরদার জয়েনউদ্দীন রচিত 'আদিগন্ত' উপন্যাসে। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে। গ্রামের পির খোরশেদ আলি, বৈষ্ণব কন্যা সরলার সঙ্গে মুসলমান মেহেরের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। খোরশেদ উভয়ের ধর্মের দোহাই দেয়। কিন্তু সরলার প্রতি কাম অনুভব

[illegible] কোলাহল, সমাধির [illegible] কন্যা কোলাহল [illegible] সমাধির [illegible] হাতের [illegible] লিপি [illegible] কাহিনি [illegible] উপন্যাসটি [illegible] উপন্যাসটি [illegible]
প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৮৭), আদমজি পুরস্কার (১৯৮৭)।
প্র : তাঁর মৃত্যুসন কত?
উ : ১২শে ডিসেম্বর, ১৯৮৭।

সাঈদ আহমদ

প্র : সাঈদ আহমদ কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : শিক্ষাসনদ অনুসারে ১৯২১ সালের ১লা জানুয়ারি তাঁর জন্ম। জন্মস্থান পুরাতন ঢাকার ইসলামপুরের আশপাশ এলাকা।
প্র : তাঁর প্রতিষ্ঠাভিত্তি শিক্ষা কোন পর্যন্ত?
উ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্স্নাতক সম্পর্ক বিষয়ে দ্বিতীয়শ্রেণির বেশ ভালো ফল অর্জন ইংরেজিসহ থেকে দ্বিতীয়শ্রেণিতে।
প্র : তিনি কোন পদে অবসর নিয়েছেন?
উ : বাংলা সরকারের সচিব পদ থেকে অবসর নিয়েছেন।
প্র : তাঁর রচিত নাটকসমূহের নাম কী?
উ : কালবেলা (১৯৬২), তাইতো (১৯৬৪), তৃষ্ণার্ত (১৯৬৯), প্রতিদিন একদিন (১৯৭৫), শেষ নবাব (১৯৮৭)।
প্র : তিনি বাংলাদেশের নাটকে কোন ধারার প্রবর্তক?
উ : আবসার্ডধারা।
প্র : কিভাবে তিনি আবসার্ড ধারার প্রতি আকৃষ্ট হন?
উ : ১৯৫৪ সালে লন্ডনে স্যামুয়েল বেকেটের নাটক দেখে তিনি আবসার্ড ধারার প্রতি আকৃষ্ট হন।

Scanned with CamScanner

প্র : 'নট আই' কী?
উ : সাঈদ আহমদ রচিত ইংরেজি নাটক। ১৯৫৭ সালে পাকিস্তানে অবস্থানকালে তিনি এটি রচনা করেন। নাটকটি প্রশংসিতও হয়। কিন্তু এর পাণ্ডুলিপি তিনি নিজেই ছিঁড়ে ফেলেন।
প্র : তাঁর 'কালবেলা' নাটক কোন পরিপ্রেক্ষিতে রচিত?
উ : পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৬০ সালে সংঘটিত হয় প্রবল ঘূর্ণিঝড়। এই ঝড়কে পটভূমি করে পরের বছরই সাঈদ আহমদ রচনা করে ইংরেজি নাটক 'দ্য ফিংক'। এটি করাচিতে মঞ্চায়ন করে আমেরিকান এক নাট্যদল। পরে ঢাকায় মঞ্চায়ন হয় করাচি ও র‍্যাওয়ালপিন্ডিতে। এই নাটক 'কালবেলা' নামে বাংলায় অনূদিত হয়ে ঢাকায় মঞ্চায়ন হয় ১৯৬২ সালে।
প্র : তাঁর 'তৃষ্ণায়' নাটক কোন ইংরেজি নাটকের অনুবাদ?
উ : 'দ্য সারভাইবেল'।
প্র : অ্যাবসার্ডধর্মী নাটকের বাইরে সাঈদ আহমদের অন্য নাটকগুলো কী?
উ : অ্যাবসার্ড ধারার বাইরে এসে ১৯৭৫ সালে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিয়ে লেখেন 'প্রতিদিন একদিন' নাটক। তাঁর রচিত শেষ নাটক 'শেষ নবাব' (১৯৮৭) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনালোকে রচিত।
প্র : নাট্যগ্রন্থ ছাড়া তিনি আর কী লিখেছেন? কী করতেন?
উ : নাটকের পাশাপাশি তিনি সঙ্গীত ও শিল্প-সমালোচক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। এসব বিষয়ে তাঁর প্রকাশিত বইসমূহ : আর্ট ইন বাংলাদেশ, পেইন্টিং ইন বাংলাদেশ, ফাইভ পেইন্টিংস অব বাংলাদেশ, কনটেম্পোরারি আর্ট, কনটেম্পোরারি আর্ট অব বাংলাদেশ। 'বিশ্বনাটক' নামে দীর্ঘদিন একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান তিনি পরিকল্পনা ও উপস্থাপনা করেন বাংলাদেশ টেলিভিশনে।
প্র : তিনি কোন কোন পুরস্কার লাভ করেন?
উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭৫), জার্মানির ট্রাস্টেল অ্যাওয়ার্ড (১৯৮৩), করাচি সরকারের সর্বোচ্চ লিভিংস্টন ডি অনার (১৯৯৩), ঢাকার ডিসির এসেনা বিসেসার্স এন্ড কো.।
প্র : তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ২০১০ খ্রিস্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে পাঁচটায় ঢাকার লেক সার্কাস এইড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায়। তিনি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত ছিলেন।

সানাউল হক

প্র : সানাউল হকের জন্ম কবে, কোথায়?
উ : মে ২৩, ১৯২৪; চাটিয়া গ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : কবি।
প্র : তাঁর কবিকল্পনার অনুভূতি কী ছিল?
উ : প্রেম, নিসর্গ, স্বদেশ ও বিশ্ব নিয়ে মানসিক কল্পনা অনুভূত।
প্র : তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : নদী ও মানুষের কবিতা (১৯৫৯), সমুদ্র অনন্যা (১৯৬২), সূর্য অন্তরে (১৯৬৫), বিচূর্ণ আর্শিতে (১৯৭৩), পরিণী শব্দিনী (১৯৭৬), উত্তীর্ণ পথরাগে (১৯৮৪), রম্যরচনা: বন্দর থেকে বন্দরে (১৯৮৪)।
প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৮৪), ইউনেস্কো পুরস্কার (১৯৮৯), একুশে পদক (১৯৮৩)।
প্র : তাঁর মৃত্যুসন কত?
উ : ৪ঠা মে, ১৯৯৩।

সিকান্দার আবু জাফর

প্র : সিকান্দার আবু জাফরের জন্মসন কবে?
উ : ১৯১৯।
প্র : তাঁর জন্মস্থান কোথায়?
উ : তেঁতুলিয়া গ্রাম, খুলনা (বর্তমানে সাতক্ষীরা)।

তিনি মূলত কী ছিলেন? (সাংবাদিকতা, নাটকার ও সাহিত্য সমালোচনা)
তাঁর নিবাস কোথায়।
তাঁর নিবাসের নাম কী ছিল?
তিনি কোন ধরনের মানুষ ছিলেন? (সমাজমনস্ক ও প্রগতিশীল হাশেমী।)
তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কতটুকু? (ম্যাট্রিক পাস, ১৯৩৬।)
তাঁর পেশা কী ছিল?
তাঁর সহধর্মিণী কে?
তিনি কোন কোন পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন? (দৈনিক ইত্তেফাক, সহযোগী সম্পাদক (১৯৫০); দৈনিক মিল্লাত, সহযোগী সম্পাদক (১৯৫৪); মাসিক সমকাল সম্পাদক (১৯৫৭)।
তিনি কোন পত্রিকা সম্পাদনা করে স্মরণীয় হয়ে আছেন? (মাসিক সমকাল। (এ-প্রসঙ্গে আরো জানার জন্য দ্রষ্টব্য এই বইয়ের 'বাংলা পত্র-পত্রিকা' অংশ।)
তাঁর রচিত সংগ্রামের বিখ্যাত গান কোনটি? (আমাদের সংগ্রাম চলবেই, জনতার সংগ্রাম চলবেই।)
তাঁর রচিত গ্রন্থাবলির নাম কী?
কবিতা : প্রসন্ন প্রহর (১৯৬৫), হৈমবৃষ্টিতে (১৯৬৫), তিমিরান্তক (১৯৬৫), কবিতা (১৩৭২), বৃশ্চিকলগ্ন (১৯৭১) ইত্যাদি। নাটক : শকুন্ত উপাখ্যান (১৯৫৮), সিরাজউদ্দৌলা (১৯৬৫), মহাকবি আলাওল (১৯৬৫)। উপন্যাস : মাটি আর অশ্রু (১৯৪২), জয়ের পথে (১৯৪২), পূরবী (১৯৪৪), নদী কাহিনী (১৯৫১)।
সিকান্দার আবু জাফরের 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটকের পটভূমি ও পরিচয় দাও।
সিরাজউদ্দৌলা নাটকের পটভূমিতে ঐতিহাসিক সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়। পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা ১৪৯৮ সালে ভারতের কালিকট বন্দরে এসেছিল দেশ আবিস্কার করার নেশায়। তারই পথ ধরে ইংরেজদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে আসে বাণিজ্য করতে। মোগল সম্রাট আরঙ্গজেবের আমলে এই কোম্পানি ভারতের সুবায় বন্দরে বাণিজ্যকুঠি নির্মাণের অনুমতি পায়। এখানে তারা তথা ফল-পণ্য-কোম্পানি নিজেদের আমদানি-রপ্তানি করত। বাংলার নবাবদের মনোযোগ হয় পড়ে বাংলার সমৃদ্ধ আগরতলার ও তার পর ফরুকশিয়ার নির্দেশ দিয়ে ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইংরেজদের সঙ্গে এক আদ্যন্তই বাণিজ্যচুক্তি করেন। চুক্তির প্রধান শর্ত ছিল মুলত ইংরেজদের শুল্ক : * ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মাত্র তিন হাজার টাকা বার্ষিক রাজস্ব দানের পরিবর্তে সারাদেশ বিনা শুল্কে বাণিজ্য করতে পারবে। * কলকাতার আশপাশের ৩৮টি গ্রামের জমিদারির সনদ কোম্পানি পাবে। * কোম্পানির কোনও ছাড়াপত্রে কোনও রকম অনুচ্ছাতে শুল্ক গ্রহণকে কোনও যাবে না। * কোম্পানির মালপত্র চুরি হলে সরকার তা ফেরত দেবার চেষ্টা করবে। * কোম্পানি মুর্শিদাবাদের টাকশালে নিজস্ব টাকা তৈরি করবে। * এ দেশীয় কর্মচারীদের বিচার করার অধিকার কোম্পানির থাকবে। কিন্তু অতিলর্ডি খাঁর আমলে ইংরেজদের অবাধ কার্যক্রমের বিষয় বাঁধাপ্রাপ্ত হয়। নবাব সিরাজের ক্ষমতারোহণের কালে এই সম্পর্ক জটিল আকার ধারণ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই সংঘটিত হয় পলাশির ঐতিহাসিক যুদ্ধ। ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন, মুর্শিদাবাদের পলাশি প্রান্তরে সেই রক্তক্ষয়ী দিন। বাঙালি জাতির ইতিহাসে স্বাধীনতার সূর্য প্রায় দুশ বছরের জন্য অস্তমিত হবার দিন। ইংরেজদের সৈন্যসংখ্যা তিন হাজার। নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার পক্ষে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য। নবাবের পক্ষে মির মর্দান, ফরাসি বীর সাঁফ্রে, মোহনলালের মত ছোটখাট সেনাপতিরা প্রাণপণে লড়াই করল দেশমাতার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য। বিশাল সৈন্যবাহিনী সেনাপতি মিরজাফর আলি খাঁ নির্দেশে নিষ্প্রাণ পুতুলের মতো স্থির দাঁড়িয়ে থাকল। পলাশির প্রান্তরে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব

Scanned with CamScanner

সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ঘটল। সিরাজ আবারো আশায় বুক বেঁধে পাটনায় রওনা দিয়ে পথের মধ্যেই ধরা পড়লেন। তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো। মিরজাফরের পুত্র মিরনের নির্দেশে মোহাম্মদি বেগের দ্বারা নবাবকে হত্যা করা হলো। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব নিহত হলে অঞ্চলগুলো স্বাধীনতা হারায়। ইংরেজের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা বণিকবৃত্তি থেকে রাজক্ষমতায় পৌঁছায়। ইংরেজরা এদেশের শাসক হয়ে ওঠে। যদিও ক্লাইভের হাতের পুতুল নবাব মিরজাফর মসনদে বসে কিন্তু সেটা আসলে প্রহসন মাত্র। সংবেদনশীল কবি, নাট্যকার, সিকানদার আবু জাফর এই পটভূমিকে ব্যবহার করে 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটক রচনা করেন। ১৯৫১ সালে ডিসেম্বর মাসে নাটকটি রচিত এবং ১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসে ইসমাইল মোহাম্মদের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়। ১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসে আবার অভিনীত হওয়া ছাড়াও এ নাটক বাংলা একাডেমী এবং পাকিস্তান সরকারের জাতীয় পূনর্গঠন সংস্থার অর্থানুকূল্যে ১৯৬৩ সালে ঢাকাতে অভিনীত হয়। নাটকটি বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয় ডিসেম্বর ১৯৬৫ (পৌষ ১৩৭২) সালে। এটি বিষয়গুণে ঐতিহাসিক এবং রসবিচারে ট্র্যাজেডিধর্মী নাটক।

এই নাটকে উল্লেখযোগ্য চরিত্র উনত্রিশটি। এছাড়াও রয়েছে দশের অধিক অপ্রধান চরিত্র। স্বল্পসময়ের জন্য মঞ্চে উপস্থিত চরিত্র নিয়ে মোট চরিত্র সংখ্যা প্রায় চল্লিশটি। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হলো নায়ক সিরাজ। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের মধ্যে রয়েছে মিরজাফর, আলিবর্দি, ক্লাইভ, জন জেফায়ানা হলওয়েল, লুৎফুন্নিসা, ঘসেটি বেগম, আমিনা বেগম, উমিচাঁদ, ওয়াটসন, জগৎশেঠ মহতাবচাঁদ, গভর্নর রোজার ড্রেক, মানিকচাঁদ, মোহনলাল, মোহাম্মদি বেগ, মিরন, রাইসুল জুহালা (নারায়ণ সিং / নারায়ণ দাস), রাজবল্লভ, [illegible] প্রমুখ। 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটকে [illegible] শর প্রান্তরে প্রহসনের যুদ্ধ শেষে পালিয়ে লোকসংগ্রহ করতে গিয়ে গুপ্তচরের হাতে ধরা পরে কারাবন্দি হন সিরাজ এবং তাঁর মাতাপিতার কাছে পাঠিত একজন আত্মীয়সম ঘাতক মিরনের হাতে নিহত হন। এই নাটকে নাট্যকার তেইশ বছর বয়সী সিরাজের প্রতি যথেষ্ট আন্তরিকতা প্রদর্শন করে সিরাজচরিত্রের দুর্বলতাসমূহ উল্লেখ করেন নি। একই বিষয় নিয়ে রচিত নাটকে সিরাজের চরিত্রে অন্য দোষগুণ কামুকতা, লাম্পট্য, পরশ্রীকাতরতা, অসহিষ্ণুতা, ভীরুতা, কাপুরুষতা, মদ্য ও নেশায় আসক্তি, অকর্মণ্যতা, নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছেন। কিন্তু সিকানদার আবু জাফরের সিরাজ দেশপ্রেমিক, সাহসী, ধৈর্যশীল, বীরযোদ্ধা, প্রজাবান, কর্তব্যপরায়ণ, বলিষ্ঠচিত্ত, তেজস্বী, নয়ন, প্রজাপালক, নিঃস্বার্থ, পরার্থপর, উদার, সরল, মহৎপ্রাণ, দৃঢ়চরিত্র, নীতি আসক্তিহীন, কর্তব্যপরায়ণ দেশপ্রেমী।

প্র : কত সনে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন?

উ : ১৯৬৬।

প্র : তাঁর মৃত্যুতারিখ কত?

উ : ৫ই অগস্ট, ১৯৭৫।

'আশা' কবিতা থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'আশা' কবিতায় কবি কোথায় সুখ খুঁজে পেয়েছেন?

উ : দরিদ্র মানুষের মনের মাঝে।

প্র : 'নিশুত' অর্থ কী?

উ : শব্দটি 'নিশুতি'; মানে 'মধ্যরাত'। কবিতার ছন্দের জন্য শব্দটি কবি নিজের মতো করে নিয়েছেন।

প্র : কবি কখন কোথায় হারিয়ে যেতে চেয়েছেন?

উ : গভীর নিশুত রাতে শান্তির ঘুমে বিভোর দরিদ্র মানুষের মধ্যে।

প্র : কাদের মনে দুরাশার গ্লানি ও সংশয় নেই?

উ : যাদের বিত্ত নেই কিন্তু চিত্ত আছে।

Scanned with CamScanner

প্র : তাঁর পৈতৃক নিবাস কোথায়?
উ : কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ।
প্র : তাঁকে কী বলা হয়?
উ : কিশোরকবি।
প্র : তাঁর কবিতায় কোন দিকটি বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ পায়?
উ : শোষিত মানুষের জীবন-যন্ত্রণা, বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের ঝঙ্কার।
প্র : তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম কী?
উ : ছাড়পত্র (১৩৫৪), ঘুম নেই (১৩৫৭), পূর্বাভাস (১৩৫৭), অভিযান (১৩৬০), হরতাল (১৩৬৯) ও গীতিগুচ্ছ (১৩৭২)।
প্র : 'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : 'ছাড়পত্র' (১৯৪৭) কবির মৃত্যুর তিনমাস পর প্রকাশিত হয়। এটি বাংলা রাজনৈতিক কবিতার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থের অনেক কবিতা বলিষ্ঠ উচ্চারণে এবং মৌলিক চিত্রকল্প সৃষ্টিতে অসামান্য। 'এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি / নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার'- এই পঙ্‌ক্তিগুলো কাব্যটিকে মহিমান্বিত করেছে।
প্র : পঞ্চাশের মন্বন্তর উপলক্ষ করে তিনি কোন সাহিত্য সংকলন সম্পাদনা করেন?
উ : আকাল।
প্র : 'আকাল'-এর পরিচয় দাও।
উ : 'আকাল' (১৯৪৩) একটি সংকলন। পঞ্চাশের মন্বন্তর এই সংকলনের কবিতাগুলির মূল প্রেরণা। বিভিন্ন পত্রিকা থেকে সংকলন ও সম্পাদনা করে এই কবিতাগুচ্ছের একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখেছিলেন সুকান্ত। ১৯৬৬ সালে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকাসহ এর নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এটি ছিল সুকান্তের জীবিতাবস্থায় প্রকাশিত একমাত্র গ্রন্থ।
প্র : 'এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি'—কে বলেছেন?
উ : কবি সুকান্ত।
প্র : সুকান্ত কত বছর বয়সে কিভাবে মারা যান?
উ : ২০ বৎসর ৯ মাস বয়সে যক্ষ্মা রোগে।
প্র : তাঁর মৃত্যুতারিখ কবে?
উ : ২৯শে বৈশাখ, ১৩৫৪।

'রানার' কবিতা থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : রানার কবিতাটি কার কাছে উৎসর্গ করে শিখেছেন?
উ : শ্রমজীবী মানুষদের।
প্র : রানার কারা?
উ : ডাক হরকরা (যারা ব্যবসার কাজে প্রেরিতের চিঠিপত্র পৌঁছে দেয়)।
প্র : 'রানার' কী?
উ : 'রানার' কথাটি এখন ইংরেজিতে ঢুকে গেছে। এখন 'পোস্টম্যান' বা 'পিয়ন' বিলিকারী চাপু আছে। আগে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এনে একই পার্শ্বি বাপদের কাছে চিঠি পৌঁছে দিতেন। চিঠির ছিটে রানার। এখন এসব কাজ একদিকে পড়ে করেন। রানাররা যখন চিঠিগুলো নিয়ে চলতেন তখন তাদের হাতে বাঁশ ও বাঁশের হেরিকেনসহ একটি বাক্স ও কাঁধে ঝোলা থাকতো। হেরিকেন থাকত পথ দেখার জন্য, বাক্স থাকত চিঠিপত্র জন্য। আর বাঁশটা থাকত আত্মরক্ষার চলমান অস্ত্রটু জানান দেবার জন্য।
প্র : দুর্বার অর্থ কী?
উ : যা নিবারণ করা যায় না।
প্র : লণ্ঠন অর্থ কী?
উ : হেরিকেন বা তেল দিয়ে চালিত হয় আবৃত দীপশিখা। এটি ইংরেজি শব্দ 'Lantern' থেকে এসেছে। তাই এতে ঠ-এর সাথে ন হবে, ণ হবে না।
প্র : রানারদের চোখে-মুখে কী ছিল না?
উ : ক্লান্তি।
প্র : রানার কিভাবে ছুটে চলেছেন?
উ : দুর্গম পথ হোক, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া হোক– তারা কাজের প্রয়োজনে অবিরাম ছুটে চলেছে।
প্র : রানারের কাছে পৃথিবীটা কালো 'বোঝা' মনে হয় কেন?
উ : অভাবের তাড়নায়।
প্র : 'ঘরে তার প্রিয়া একা শয্যায় বিনিদ্র রাত জাগে।' –এই পঙ্‌ক্তি দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে?
উ : রানারেরা ব্যক্তিগত সুখ বিসর্জন দিয়ে

সমাজকর্ম করে। তাদের খোঁজ রাখারও কেউ নেই। প্রিয়া তাদের মঙ্গল কামনা করে হাত জোড়ে।
প্র : বন্ধুর অন্তরে চেয়েও রানার সুর্য ওঠাকে বেশি ভয় পায় কেন?
উ : রানারদের কারণে। এই পঙ্‌ক্তিটি প্রতিবাদের সৃষ্টি। রানারের ব্যাগে কারো জন্য অর্থের টাকা থাকায় তা লুট হবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সে ভয়ের চেয়েও সমাজ চিঠি সূর্য ওঠার আগেই যাতে পৌঁছে দেওয়া যায়, সেই কর্তব্যবোধই তাড়িত করে রানারকে।
প্র : রানার রাতের আঁধারে কিভাবে ছুটে চলেছে?
উ : রাতের লণ্ঠন আর ঘণ্টা ঠনঠন করে।
প্র : রানারদের বোঝা টানার দিন শেষ হবে না কেন?
উ : আর্থিক অভাব অনটনের কারণে। আর এ সমাজ শ্রমজীবীদের শ্রমের প্রকৃত মূল্য দিতে চায় না বলে।
প্র : ভোরের আকাশে সহানুভূতির চিঠি নিয়ে রানার কোথায় ছুটে চলেছে?
উ : সুর্য পথে।
প্র : কষ্টের কালিমা দূরীভূত হয়ে রানারদের কখন সুখের সোনালি আলো দেখা দেবে?
উ : যখন কাজের মাধ্যমে এই পৃথিবীকে তারা জয় করতে পারবে।
প্র : সোনালির আলোয় পথ চলেছে কে?
উ : রানার।
প্র : রাত শেষ হয়ে সূর্য উঠবে কবে?
উ : কষ্টের কালিমা দূরীভূত হয়ে যখন রানারদের সুখের সোনালি আলো দেখা দেবে।
প্র : রানার ভোরে কোথায় পৌঁছে যায়?
উ : নতুন খবর আনতে।
প্র : রানার পেছনে ফিরে তাকানোর সময় পায় না কেন?
উ : প্রিয়জনের কাছে যথাসময় খবর পৌঁছে দেওয়া তার কাছে জরুরি। তাই পেছনে ফিরে তাকানোর সময় পায় না।
প্র : 'রানার' কবিতায় কী প্রকাশ পেয়েছে?
উ : নিপীড়িত গণমানুষের প্রতি কবির গভীর মমতা।
প্র : 'মেসে' শব্দ দিয়ে কবিতাকে কী বোঝানো হয়েছে?
উ : 'মেস'-এ, অর্থাৎ ডাকে। ইংরেজি 'Mail'কে বাংলায় দেখা হয়েছে।
প্র : 'রানার' কবিতায় শেষ স্তবকে কী উল্লেখ করা হয়েছে?
উ : সমস্ত প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে, ঝঞ্ঝা কাটিয়ে শ্রমজীবীদের জীবনধারায় নতুন প্রভাত আনা অর্থাৎ বিপ্লবের কথা বলা হয়েছে।

'আঠারো বছর বয়স' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে?
উ : ছাড়পত্র (১৯৪৭)।
প্র : কবি সুকান্তের পারণায় সব অন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণ করে কোন বয়স?
উ : ১৮ বছর।
প্র : 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটির স্তবক সংখ্যা-
উ : আট।
প্র : 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
উ : মাত্রাবৃত্ত।
প্র : 'প্রাণ দেওয়া-নেওয়া ঘুলিটা থাকে না শূন্য'- পঙ্‌ক্তিটির রচয়িতা-
উ : সুকান্ত ভট্টাচার্য।
প্র : 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় 'আঠারো' শব্দের কতবার ব্যবহার আছে?
উ : নয়বার।
প্র : 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় 'আঠারো বছর' কথাটি কতবার ব্যবহৃত হয়েছে?
উ : সাতবার।
প্র : সুকান্ত ভট্টাচার্যের মৃত্যুর সাল কোনটি?
উ : ১৯৪৭ সাল।
প্র : 'ছাড়পত্র' কাব্য গ্রন্থটি কত খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়?
উ : ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে (মূল বই ১৮৪৮)।
প্র : 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি রচিত-কত মাত্রায়?
উ : ৬ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে।

2020/5/15 21:0

Scanned with CamScanner

প্র : সুকান্ত ভট্টাচার্যের পৈতৃক নিবাস কোন জেলায়?
উ : বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলায়।
প্র : সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থের নাম কী?
উ : আকাল (সুকান্তের জীবিতাবস্থায় একমাত্রগ্রন্থ)।
প্র : 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার মূল বৈশিষ্ট্য।
উ : * যৌবনের উজীপনা * সাহসিকতা * দুর্বার গতি।
প্র : 'তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা'- এখানে যন্ত্রণাগুলো কী?
উ : * অন্যায়। * অত্যাচার। * সামাজিক বৈষম্য।
প্র : 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় প্রতি চরণে মাত্রা সংখ্যা কত?
উ : ১৪।
প্র : আঠারো বছর বয়সে কী উঁকি দেয়?
উ : দুঃসাহস।
প্র : আঠারো কীসের প্রতীক?
উ : যৌবনের, প্রতিবাদের, আত্মপ্রত্যয়ের।
প্র : 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার শেষ পঙ্‌ক্তি কী?
উ : 'এদেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।'
প্র : 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় 'এ বয়স' শব্দটির ব্যবহৃত হয়েছে কয়বার?
উ : ১২ বার।
প্র : 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় 'আঠারো বছর বয়স' শব্দটি আছে কয় বার?
উ : ৪ বার।
প্র : তিনি ফ্যাসিবিরোধী শিল্পী সংঘের পক্ষে কোন কাব্যগ্রন্থটি সম্পাদনা করেন?
উ : 'আকাল' (১৯৪৩)।
প্র : বিপদের মুখে আঠারো বছর বয়সের প্রকৃতি কেমন?
উ : অগ্রণী।
প্র : আঠারো বছর বয়স বেদনায় কাঁপে—
উ : থরোথরো।
প্র : আঠারো বছর বয়সে কী নেই?
উ : ভয়।
প্র : আঠারো বছর বয়স কী জানে না?
উ : কাঁদা।
প্র : দুঃসাহস, অসহ্য, ক্ষত-বিক্ষত, অন্তর্দাহ শব্দগুলোর উচ্চারণ শেষ।
উ : দুশশাহাস, অশোজকো, কিকখতো, অয়োনদাহি। ৭+৬
প্র : আঠারো বছর বয়স শব্দগুচ্ছে কী আছে চাঁদ?
উ : পাথর।
প্র : আঠারো বছর লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে কী বয় বলে করে?
উ : কালো।
প্র : 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার চরণে মাত্রা বিন্যাসের ধরন কী?
উ : ৬+৬+২।
প্র : 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার শব্দের সংখ্যা কয়টি?
উ : ৩২টি।
প্র : কবিতায় পঞ্চম স্তবকে লাইন সংখ্যা কয়টি?
উ : ৪টি।

'প্রার্থী' কবিতা থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'প্রার্থী' কবিতা সুকান্ত ভট্টাচার্যের কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত?
উ : 'ছাড়পত্র'
প্র : 'ছাড়পত্র' কত খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়?
উ : ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে।
প্র : 'প্রতীক্ষা' অর্থ কী?
উ : অপেক্ষা বা সবুর।
প্র : 'প্রতীক্ষা'-এর সন্ধিবিচ্ছেদ কর।
উ : প্রতি+ঈক্ষা।
প্র : 'প্রার্থী' কবিতায় সূর্যের জন্য প্রতীক্ষার সঙ্গে কিসের তুলনা করা হয়েছে?
উ : ধানকাটার অপেক্ষায় থাকা কৃষকের চঞ্চল চোখের।
প্র : এই তুলনা করার মধ্যে সুকান্তের কী প্রকাশ পেয়েছে?
উ : কবিতার সঙ্গে শ্রমজীবী কৃষক-শ্রমিকে সম্পৃক্ত করার মানসিকতা।
প্র : 'রোদ্দুর' কী?
উ : রৌদ্র।
প্র : এই কবিতায় 'আমরা' বলতে কবি কাদের বোঝাচ্ছেন?
উ : নবিত্র মানুষদের– যাদের গরম কাপড় কিনবার সামর্থ্য নেই, যাদের কাঁচা বাড়ি, পাকা বাড়ি নেই।
প্র : 'রাস্তায় ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।'– এই 'উলঙ্গ' ছেলে কারা?
উ : এদের 'পথশিশু' বলে। কবি কবিতার স্বার্থে এখানে 'ছেলে' বললেও আসলে এটা ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে, সব অনাথ পথশিশুকেই বোঝান হচ্ছে।
প্র : 'জ্বলন্ত' সন্ধিবিচ্ছেদ কর।
উ : জ্বল+অন্ত।
প্র : 'অগ্নিপিণ্ড' কী?
উ : আগুনের গোলাকার কিছু বা আগুনের দলা।
প্র : 'জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড' কী?
উ : যে আগুনের দলা জ্বলছে।
প্র : 'একদিন হয়তো আমরা প্রত্যেকেই এক একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডে / পরিণত হবো' –এই বক্তব্য নিয়ে কী বোঝান হচ্ছে?
উ : কবিতার কথক একজন দরিদ্র মানুষ। তিনি বলছেন, এমন একদিন আসবে যে দিন গরিব মানুষগুলো সূর্যের মতোই অগ্নিপিণ্ডে পরিণত হয়ে নিজেরা জড়তামুক্ত হবে। এর ফলে সব বৈষম্য দূর হলে গরিব মানুষের জন্য উত্তাপের অভাব হবে না।
প্র : 'প্রার্থী' কবিতার মর্মার্থ কী?
উ : সভ্যতার সূচনায় আছে অগ্নি, আর অগ্নির আধার সূর্য। শীতে বস্ত্রহীন দরিদ্র মানুষেরা তাই সূর্যের কাছে উত্তাপ প্রত্যাশী। শুধু সাময়িক উত্তাপই নয়, সূর্যের কাছ থেকে জ্বলে ওঠার প্রেরণাও তারা কামনা করে। জ্বলে উঠেই তারা ধ্বংস করতে চায় সামাজিক জড়তাকে, প্রতিষ্ঠা করতে চায় সাধারণ মানুষের অধিকার।

সুকুমার রায়

প্র : সুকুমার রায়ের জন্মসন কবে?
উ : ৩০শে অক্টোবর, ১৮৮৭।
প্র : তাঁর জন্মস্থান কোথায়?
উ : মাসুয়া গ্রাম, কিশোরগঞ্জ।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : শিশুসাহিত্যিক।
প্র : তাঁর পিতার নাম কী?
উ : উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।
প্র : সত্যজিৎ রায় সুকুমার রায়ের কী?
উ : পুত্র।
প্র : তিনি কিভাবে শিশুদের মন জয় করতেন?
উ : অনুপম ভাষায় গল্প, নাটক, কবিতা ও প্রবন্ধ লিখে।
প্র : তাঁর সেবা কোন বইগুলো বাংলা শিশুতোষ সাহিত্যের অমর সৃষ্টি?
উ : আবোল তাবোল (১৯২৩), হ.য.ব.র.ল (১৯২৬), পাগলা দাশু (১৯৩০), বহুরূপী (১৯৪৪), খাই খাই (১৯৩৩) ইত্যাদি।
প্র : তিনি অন্য কী হিসেবে খ্যাত?
উ : সুগায়ক ও সুরশিল্পী হিসেবে।
প্র : তাঁর মৃত্যু হয় কত সনে?
উ : ১৯২৩।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

প্র : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর, কলকাতায়।
প্র : তাঁর মাতা-পিতার নাম কী?
উ : ইন্দুমতী বসুমল্লিক, (দার্শনিক) হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
প্র : তাঁর শিক্ষাজীবন কোথায় শুরু হয়?
উ : কাশীতে হিন্দি বলয়ে। তিনি সংস্কৃত, হিন্দি, ইংরেজি পড়তেন। এমন কি ঘরে মায়ের সঙ্গেও হিন্দিতে কথা বলতেন। যে-কারণে বাঙালির সন্তান হয়েও তাঁকে পরে বাংলা শিখতে হয়।
প্র : তিনি কোন কোন পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?
উ : নব-পর্যায় 'সবুজপত্র' (প্রকাশনা সহযোগী : ১৯২৭); দৈনিক ফরওয়ার্ড (সম্পাদকীয় কর্মী : ১৯২৮); ত্রৈমাসিক পরিচয় (সম্পাদক : ১৯৩১); দি স্টেটসম্যান (সহকারী সম্পাদক : ১৯৪৪); দি মাঞ্চিয়ান গুয়ে (সম্পাদনা সহযোগী : ১৯৪৪)।

Scanned with CamScanner

প্র : কোন পত্রিকা সম্পাদনা করে তিনি অমর হয়ে আছেন?
উ : ত্রৈমাসিক 'পরিচয়' (১৯৩১)। তিনি একাদিক্রমে ১২ বছর এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যচর্চায় পত্রিকাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

প্র : তাঁর স্ত্রীর নাম লেখ।
উ : প্রতি বসু (বিয়ে : ২২/৭/১৯২৪; বিচ্ছেদ : বৎসরাধিক কাল পর); রাজেশ্বরী দত্তরায় (বিয়ে : ২৯/৫/১৯৪৩)।

প্র : সুধীন্দ্রনাথ রচিত গ্রন্থের নাম লেখ।
উ : কাব্যগ্রন্থ : তন্বী (১৯৩০), অর্কেস্ট্রা (১৯৩৫), ক্রন্দসী (১৯৩৭), উত্তর ফাল্গুনী (১৯৪০), সংবর্ত (১৯৫৩), প্রতিধ্বনি (১৯৫৪), দশমী (১৯৫৬); অনুবাদ-কাব্যগ্রন্থ : প্রতিধ্বনি (১৯৫৪); প্রবন্ধগ্রন্থ : স্বগত (১৯৩৮), কুলায় ও কালপুরুষ (১৯৫৭)।

প্র : তিনি কোন কাব্যগ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করেছেন?
উ : তন্বী (১৯৩০)। উৎসর্গপত্রে লিখেছেন : 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রীচরণে অর্ঘ্য। ঋণশোধের জন্য নয়, ঋণস্বীকারের জন্য।'

প্র : 'অর্কেস্ট্রা' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত রচিত কাব্যগ্রন্থ। ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত কবির এই দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থে স্থান পেয়েছে মোট ২৫টি কবিতা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবিতা হচ্ছে- 'হৈমন্তী', পণ্ডশ্রম, কস্মৈ দেবায়ঃ, সঞ্চয়, মহাসত্য, দ্বন্দ্ব, ভবিতব্য, মহাশ্বেতা, অপচয়, শাশ্বতী, বিস্মরণী, অর্কেস্ট্রা ইত্যাদি। প্রায় সবগুলোই প্রেমের কবিতা। প্রেমের নায়ক ভোগসর্বস্বতার শেষ পর্যায়ে ক্লান্তি বোধ করেছেন। ভেবেছেন দেহজ মিলনে যে তৃপ্তি, তারও এক সময় অবসান ঘটে, কিন্তু স্মৃতি বড় নির্মম। কিছুতেই মন থেকে বিগত মিলনের আনন্দের স্মরণিকা শেষ হয়ে যায় না। আসলে 'অর্কেস্ট্রা' কাব্যের সর্বত্রই সুধীন দত্তের এই স্মৃতি রোমন্থন দেখা

'একটি কথার ঝিলা ঘর ঘর ঘুরে
ভর করেছিল সাতটি অমাবাকার্যা'।

প্র : সুধীন্দ্রনাথ দত্তের স্বাতন্ত্র্য কোথায়?
উ : প্রথমত তিনি আধুনিকতাবাদী সমালোচকদের একজন (অন্য চারজন : জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে)। অন্যদের সঙ্গেও তাঁর পার্থক্য হলো, তিনি ক্লাসিক ভাষারীতির সঙ্গে সাম্প্রতিক কাব্যরীতির সংমিশ্রণে কবিতায় বিশিষ্টতা এনেছেন। তাঁর গদ্য স্বাপতাবর্তী, সুসংবেদ্ধ, ঋজু।

প্র : তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দের ২০শে জুন।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্র : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম কবে, কোথায়?
উ : ২৬শে অক্টোবর, ১৮৯০; পশ্চিমবঙ্গের হাওড়ায়।

প্র : তিনি মূলত কী?
উ : বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ ভাষাবিজ্ঞানী।

প্র : তাঁর কর্মজীবন কোথায় শুরু হয়?
উ : ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজির লেকচারার পদে।

প্র : লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি কী অর্জন করেন?
উ : ফোনেটিক্সে ডিপ্লোমা ও ডি.লিট।

প্র : তিনি কী কী ভাষা জানতেন?
উ : বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত, হিন্দি, উর্দু, প্রাকৃত, পারসি, আইরিশ, গোথিক, জার্মান ইত্যাদি।

প্র : সুনীতিকুমারের বিখ্যাত গ্রন্থের নাম কী?
উ : অরিজিন এন্ড ডেভলেপমেন্ট অফ বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ (১৯২৬)।

প্র : সংক্ষেপে এই গ্রন্থকে কী বলে?
উ : ODBL

প্র : রবীন্দ্রনাথ সুনীতিকুমারের প্রশংসা কিভাবে করেন?
উ : 'শেষের কবিতা' গ্রন্থে সুনীতিকুমারের স্বীকৃতি আছে। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ তাঁকে [illegible] উপাধি দেন।

প্র : সুনীতিকুমার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা কত?
উ : বিভিন্ন ভাষায় ৩৮০টি।

প্র : তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম লিখ।
উ : বেঙ্গলি ফোনেটিক রিডার্স (১৯২৮), বাঙলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা (১৯২৯), সরল ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৯৩৫), ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড লিটারেচর অফ মডার্ন ইন্ডিয়া (১৯৬৩) ইত্যাদি।

প্র : তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ২৯শে মে, ১৯৭৭; কলকাতায়।

সুফিয়া কামাল

প্র : সুফিয়া কামাল কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৯১১ সালের ২০শে জুন, বরিশালের শায়েস্তাবাদে।

প্র : তাঁর পৈতৃক নিবাস কোথায়?
উ : কুমিল্লায়।

প্র : তাঁর মাতা-পিতার নাম কী?
উ : মাতা- সৈয়দা সাবেরা খাতুন; পিতা- সৈয়দ আবদুল বারি।

প্র : রোকেয়ার সঙ্গে তাঁর কবে সাক্ষাৎ হয়?
উ : ১৯১৮ সালে কলকাতায়।

প্র : কবে, কার সঙ্গে তাঁর প্রথম বিয়ে হয়?
উ : মামাত ভাই সৈয়দ নেহাল হোসেনের সঙ্গে, ১৯২৩ সালে।

প্র : তখন তিনি কী নামে পরিচিত হন?
উ : সুফিয়া এন. হোসেন।

প্র : তাঁকে কী বলা হয়?
উ : জননী সাহসিকা।

প্র : তিনি মূলত কী হিসেবে পরিচিত?
উ : কবি।

প্র : তাঁর রচিত প্রথম গল্পের নাম কী?
উ : সৈনিক বধূ। রচনা হয় ১৯২৩ সালে। বরিশালের 'তরুণ' পত্রিকায় প্রকাশ পায়।

প্র : কার অনুপ্রেরণায় তিনি অভিজাত সৈয়দ বংশের মুসলিম নারীদের পোশাকের পরিবর্তে চরকায় কাটা সুতোর শাড়ি পরিধান আরম্ভ করেন?
উ : ১৯২৫ সালে বরিশালে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর দেখা হলে গান্ধীর অনুপ্রেরণায় তিনি এই সাধারণ পোশাক পরিধান আরম্ভ করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি অনাড়ম্বর পোশাকে অভ্যস্ত ছিলেন।

প্র : সুফিয়ার স্বামী সৈয়দ নেহাল কবে কিভাবে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ১৯৩২ সালে যক্ষ্মা রোগে।

প্র : কত সালে কার সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয়বার বিয়ে হয়?
উ : ১৯৩৯ সালে চট্টগ্রাম নিবাসী লেখক কামালউদ্দীন আহমদের সঙ্গে। এরপর থেকে তিনি 'সুফিয়া কামাল' নাম গ্রহণ করেন।

প্র : সুফিয়া কামাল কোন পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন?
উ : 'বেগম' (১৯৪৭) পত্রিকা।

প্র : তিনি কোন মহিলা সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও নেতৃত্ব দেন?
উ : মহিলা সংগ্রাম পরিষদ (১৯৬৯)। আজ এর নাম বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ।

প্র : তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলির নাম কী?
উ : কবিতা : সাঁঝের মায়া (১৯৩৮), মন ও জীবন (১৯৫৭), উনায় পৃথিবী (১৯৬৪), অভিযাত্রিক (১৯৬৯), মোর যাদুদের সমাধি পরে (১৯৭২), মায়া কাজল (১৯৯১) ইত্যাদি। গল্প : কেয়ার কাঁটা (১৯৩৭)। শিশুতোষ : ইতল বিতল (১৯৬৫), নওল কিশোরের দরবারে (১৯৮২)। আত্মজীবনী : একালে আমাদের কাল (১৯৮৮)। ডায়েরি : একাত্তরের ডায়রী (১৯৮৯)।

প্র : তিনি কোন ধরনের কবি?
উ : রবীন্দ্র কাব্যধারার গীতিকবিতা রচয়িতা।

প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬২), মোনিন পুরস্কার, রাশিয়া (১৯৭০), একুশে পদক (১৯৭৬), বেগম রোকেয়া পদক (১৯৯৬), স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৯৭) ইত্যাদি।

প্র : কবে, কোথায় তাঁর মৃত্যু ঘটে?
উ : ১৯৯১ সালের ২০শে নভেম্বর, ঢাকায়।

Scanned with CamScanner

'তাহারেই পড়ে মনে' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি প্রকাশিত হয়—

উ : ১৯৩২ সালে।

প্র : 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি লেখা কোন ছন্দে?

উ : অক্ষরবৃত্ত ছন্দে।

প্র : 'কেয়ার কাঁটা' কোন জাতীয় গ্রন্থ?

উ : গল্প।

প্র : মাঘের সন্ন্যাসী কোন ঋতু?

উ : শীত ঋতু।

প্র : 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় কোন পত্রিকায়?

উ : মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায়।

প্র : 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার মাত্রার পর্ব কেমন?

উ : আট ও দশ।

প্র : বেগম সুফিয়া কামালের পৈতৃক নিবাস কোথায়?

উ : কুমিল্লায়।

প্র : 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার বক্তব্য–

উ : কবিজীবনের খ্যাতির অন্তরালে বেদনাকে স্মরণ।

প্র : কবিতাটিতে উল্লেখ আছে এমন দুটি ফলের নাম লেখ।

উ : * বাতাবি নেবু
* আম

প্র : 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় বসন্ত বন্দনায় কবির বিমুখতার কারণ কী?

উ : প্রিয়বিয়োগ।

প্র : 'তরী তার এসেছ কি?' কোন কবিতার অংশ?

উ : তাহারেই পড়ে মনে।

প্র : 'তাহারেই পড়ে মনে, ভুলিতে পারিনা কোন মতে'– কবির কাকে মনে পড়ে?

উ : শীত ঋতুকে।

প্র : 'কুহেলি উত্তরীতলে মাঘের সন্ন্যাসী'-এর অর্থ কী?

: শীতকে সন্ন্যাসীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই সন্ন্যাসী কুয়াশার (কুহেলি) চাদরের (উত্তরী) নিচে যেন বসে আছেন।

প্র : 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার স্তবক ও লাইন সংখ্যা কয়টি?

উ : স্তবক সংখ্যা ৫টি, লাইন সংখ্যা ৩০টি।

প্র : কবিতায় কোন দুটি বাংলা মাসের নাম উল্লেখ রয়েছে?

উ : মাঘ ও ফাগুন (ফাল্গুন)।

প্র : কবিতায় উল্লেখকৃত বাংলা ঋতুর নাম কী?

উ : বসন্ত।

প্র : কবিতায় 'তাহারেই পড়ে মনে' শব্দটি কয়বার রয়েছে?

উ : ১ বার।

প্র : 'পুষ্পারতি' শব্দের অর্থ কী?

উ : ফুলের বন্দনা বা নিবেদন।

প্র : 'কুহেলি' শব্দের অর্থ কী?

উ : কুয়াশা; কুজ্ঝটিকা।

প্র : 'উত্তরী' শব্দের অর্থ কী?

উ : চাদর; উত্তরীয়।

প্র : সুফিয়া কামালের স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেন কবে মৃত্যুবরণ করেন?

উ : ১৯৩২ সালে।

প্র : 'তাহারেই পড়ে মনে, কবিতার দুটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য কী?

উ : নাটকীয়তা ও সংলাপনির্ভরতা।

প্র : 'মিনতি' সংকরজাতীয় শব্দটি কোন কোন শব্দযোগে গঠিত?

উ : সংস্কৃত বিনতি এবং আরবি মিনত শব্দযোগে।

প্র : 'অর্ঘ্য' ও 'অর্ঘ' শব্দ দুটির অর্থগত পার্থক্য কী?

উ : 'অর্ঘ্য' শব্দের অর্থ পূজার উপকরণ এবং 'অর্ঘ' শব্দের অর্থ মূল্য।

'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : সুফিয়া কামালের 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতা তাঁর কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?

উ : 'উদাত্ত পৃথিবী'

প্র : 'উদাত্ত পৃথিবী' কাব্যগ্রন্থ কত খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়?

উ : ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে।

প্র : মৌসুমি কী?

উ : ঋতুভিত্তিক।

প্র : মৌসুমি কোন শব্দ?

উ : মৌসুম আরবি শব্দ; তার সঙ্গে 'ই'-প্রত্যয়যুক্ত হয়েছে।

প্র : 'মৌসুমি ফুল' কোনগুলো?

উ : শিউলি, কদম ইত্যাদি। যেমন, শিউলি ফুল শরৎ মৌসুমে ফোটে; কদম ফুল ফোটে বর্ষা মৌসুমে ইত্যাদি।

প্র : 'মৌসুমি ফুলের গান মোর কণ্ঠে জাগে নাকো আর / চারদিকে শুনি হাহাকার।' –এই বক্তব্য দিয়ে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

উ : কবি বোঝাতে চেয়েছেন, এক সময় প্রতি ঋতুতে নানা ধরনের ফুল দেখা যেত, সেই ফুলের গন্ধ পাওয়া যেত, অনেক ফুলে মধুও থাকত। কিন্তু এখন গাছপালা নির্বিচারে নিধন করার কারণে চারি দিক শূন্য মনে হয়– হাহাকার জাগে প্রাণে।

প্র : ক্ষুধার্ত ও ভয়ার্ত শব্দদ্বয়ের সন্ধিবিচ্ছেদ কর।

উ : ক্ষুধা + ঋত ; ভয় + ঋত ।

প্র : কারো কণ্ঠে আর গান নেই বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

উ : আগে গ্রামে নানা ঋতুতে নানা ধরনের ফসল হতো; বিভিন্ন গাছে ফুটত বিভিন্ন ফুল ও ফল। সেই ফসল কাটা বা ফল পাড়ার সময় অনেকে গান গাইত, নাচত; নবান্নে উৎসব হতো। এখন সেগুলো আর নেই– গাছ কেটে ভূমিকে প্রায় মরুভূমি করা হয়েছে বা দালান তোলা হয়েছে। এসব কথা মনে করেই কবি দুঃখ করে বলছেন, এখন ফুল-ফসল নেই, কারো কণ্ঠে গানও নেই।

প্র : মাটি চায় অরণ্যের দিকে– কোন মাটি?

উ : বৃক্ষহীন ঊষর মাটি।

প্র : কেন এভাবে অরণ্যের দিকে চায়?

উ : কারণ অরণ্যের মাটিতে সুনিবিড় ছায়া, সুশীতল স্নিগ্ধতা, আর স্নেহের অমিয় ধারা বহমান। সেখানে গেলে প্রাণ জুড়ায়।

প্র : কবি 'অরণ্য কন্যারা' বলেছেন কেন?

উ : কন্যারাই স্নেহশীলা। কন্যারাই মাতা হয়ে, ধাত্রী হয়ে, বধূ হয়ে পৃথিবী ধারণ ও সমৃদ্ধিতে সবচেয়ে বেশি সময় দেয়। কবিকল্পনায় তাই অরণ্য এসেছে কন্যা হয়ে।

প্র : 'মর্মরে মর্মরে ওঠে বাজি'– 'মর্মর' কী?

উ : শুকনো পাতার শব্দ।

প্র : 'মর্মর' কী ধরনের শব্দ / পদ?

উ : অনুকার শব্দ। বাক্যে ব্যবহার হলে অনুকার অব্যয় পদ।

প্র : 'বৃক্ষের ... বহ্নিজ্বালা'। –বৃক্ষের আবার বহ্নিজ্বালা কী?

উ : এটি বিশেষ কবিকল্পনা। কবি এখানে বৃক্ষকে মানব বা অন্য জীবের মতো জীবন্ত সত্তা ভেবেছেন। আর ভেবেছেন, মানুষের মতো গাছেরও বুকে অনেক কষ্ট, তার কথাতে সেই কষ্টের প্রকাশ।

প্র : 'কঙ্কণ' কী?

উ : কঁকন বা এক প্রকার চুড়ি।

প্র : মুমূর্ষু কারা?

উ : মৃত্যু পথযাত্রী। (দ্রষ্টব্য: মুমূর্ষু বানান সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।)

প্র : কবি অরণ্য কন্যাদের কী করতে বলছেন?

উ : –মুমূর্ষুকে প্রাণদান;
–ফুলের ফসল আনয়ন;
–ক্ষুধার্তের জন্য খাদ্য আনয়ন;
–আত্মার আনন্দ;
–যারা অন্ধকারে আছে, যারা নিদ্রাহীন অবস্থায় আছে তাদের জন্য প্রভাতের মুঠি মুঠি আলো আনয়ন।

প্র : 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার মূল সুর কী?

উ : চারি দিকে পরিবেশ, বিশেষ করে অরণ্য-প্রকৃতি ধ্বংসের লীলা চলছে। এতে পৃথিবীর মানুষ ফল-ফুল-শস্যহীন হয়ে নিরানন্দময় পরিবেশের শিকার। কবি অরণ্যের গাছপালাকে কন্যা হিসেবে অভিহিত করে কামনা করেছেন, তারা যেন মানুষের মনে চেতনার সঞ্চার করে চতুর্দিকে খাদ্যের সংস্থান ও অপার আনন্দের ব্যবস্থা নেয়– মানুষকে অস্তিত্ব 'বিপন্নতার হাত থেকে রক্ষা করে।

Scanned with CamScanner

সেলিনা হোসেন

প্র : সেলিনা হোসেন কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১৯৪৭ সালের ১৪ই জুন, রাজশাহীতে।

প্র : তিনি মূলত কী?

উ : কথাশিল্পী।

প্র : তাঁর উপন্যাসের মূলবিষয় কী?

উ : অবরুদ্ধ সমাজে মুক্তচিন্তা ও মানুষের মুক্তির আকুতি।

প্র : তাঁর প্রকাশিত প্রধান গ্রন্থগুলোর নাম কী?

উ : **প্রবন্ধ** : স্বদেশে পরবাসী (১৯৮৫), একাত্তরের ঢাকা (১৯৯০), নির্ভয় করো হে (১৯৯৮), মুক্তা করো ভয় (২০০২), ঘর পোড়ন্তির রাজনীতি (২০০৭)।

গল্প : উৎস থেকে নিরন্তর (১৯৬৯), পরজন্ম (১৯৮৬), মানুষটি (১৯৯৩), মতিজানের মেয়েরা (১৯৯৫), অনুচ্চা পূর্ণিমা (২০০০), একালের পাণ্ডাবুড়ি (২০০২), নারীর রূপকথা (২০০৭)।

উপন্যাস : জলোচ্ছ্বাস (১৯৭২), হাঙর নদী গ্রেনেড (১৯৭৬), মগ্ন চৈতন্যে শিস (১৯৭৯), যাপিত জীবন (১৯৮১), নীল ময়ূরের যৌবন (১৯৮৩), পোকামাকড়ের ঘরবসতি (১৯৮৬), নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি (১৯৮৭), কালকেতু ও ফুল্লরা (১৯৯২), ভালোবাসা প্রীতিলতা (১৯৯২), গায়ত্রী সন্ধ্যা (১ম খণ্ড ১৯৯৪; ২য় খণ্ড ১৯৯৫; ৩য় খণ্ড ১০০৬), লারা (২০০০), কাঠকয়লার ছবি (২০০১), ঘুমকাতুরে ঈশ্বর (২০০৪), অপেক্ষা (২০০৭), পূর্ণছবির মগ্নতা (২০০৮), যমুনা নদীর মুশায়রা (২০০৯) ইত্যাদি।

প্র : 'পোকামাকড়ের ঘরবসতি' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : 'পোকামাকড়ের ঘরবসতি' (১৯৮৬) উপন্যাস। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে নদীর মধ্যে শাহপরিদ্বীপ নামক এক ছোটো দ্বীপের মানুষের, বিশেষ করে মাঝিদের সংগ্রামী জীবনের বাস্তব রূপায়ণ।

প্র : 'উৎস থেকে নিরন্তর' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : এটি সেলিনা হোসেনের লেখা প্রথম গল্পগ্রন্থ, প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালে। গৈরিক বাসনা, বৈশাখী গান, রতি বিলাস, মানস্টার, কাপ্তার তৃতীয় দিন, সোনালি ঘোটা সকাল, খেয়াঘাট ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে গ্রন্থটি। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখা গল্পগ্রন্থেই সেলিনা হোসেন নিজস্ব স্বাক্ষর পরিচয় দেন। তাঁর আলোচনা করেছেন পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা, নারী-পারিবারিক পরিমণ্ডলের আঙ্গন ইত্যাদি তাঁর গল্পের বিষয়।

প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?

উ : মুহাম্মদ এনামুল হক স্বর্ণপদক (১৯৮৬), বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৯৬), আলাওল সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯৭), সিলিপস্ পুরস্কার (১৯৯৮), সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯৪), অগ্রণী চলচ্চিত্র পুরস্কার (১৯৯৭)।

সেলিম আল দীন

প্র : সেলিম আল দীনের প্রকৃত নাম কী?

উ : মইনুদ্দিন আহমেদ।

প্র : তাঁর মাতা-পিতার নাম কী?

উ : মাতা-ফিরোজা খাতুন, পিতা-মরহুম উদ্দিন আহমেদ।

প্র : তিনি কত সালে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর তৎকালীন নোয়াখালি জেলার (বর্তমান জেলা) সোনাগাজির সেনেরখিল গ্রামে। (সূত্র : বাংলা একাডেমি লেখক অভিধান। ১৯৯৯ : পৃষ্ঠা ২০৯)

প্র : কর্মজীবনে তিনি কোন প্রতিষ্ঠানে সম্পৃক্ত ছিলেন?

উ : ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপক, পরে একই প্রতিষ্ঠানে নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের প্রারম্ভকালীন অধ্যাপক।

প্র : তিনি কোনো নাট্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কী?

উ : তিনি ঢাকা থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

প্র : সেলিম আল দীনের কয়েকটি গ্রন্থের নাম লেখ।

উ : **নাট্যগ্রন্থ** : সর্প বিষয়ক গল্প ও অন্যান্য (১৯৭৩); বাসন (১৯৮২); কেরামতমঙ্গল (১৯৮৩); কীর্তন খোলা (১৯৮৫); হুমতামীর ফ্যান্টাসি (১৯৮৫); ঢাকা (১৯৯০); দৈবেতী কন্যার মন (১৯৯২); কলপতরু (১৯৯২); একটি আরবা রূপকথা (১৯৯৫); হাতহদাই (১৯৯৭); নিমন্ত্রণ ইত্যাদি।

গবেষণা গ্রন্থ : মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য (১৯৯৭)

প্র : সেলিম আল দীনের নাট্যচর্চা কীভাবে আরম্ভ হয়?

উ : সেলিম আল দীন কবিতায় লিখতেন। কিন্তু ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর রচিত 'নীল নয়তারা' 'তাহিতি ইত্যাদি' নাটকটি টেলিভিশন ও বেতারে প্রচার হলে তাঁর নাট্যচর্চার কথা জানাজানি হয়। একই বছর জাকসু মঞ্চস্থ করে 'জন্ডিস ও বিবির খেলুন' এবং নাট্য প্রতিযোগিতাতেও নাটকটি প্রথম পুরস্কার পায়। ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে ডাকসু নাট্যচক্র তাঁর লেখা 'এক্সপ্রেসিভ ও মূল সমস্যা' মঞ্চস্থ করলে নাটকার হিসেবে সেলিম আল দীন সবার পরিচিতি পান। লক্ষ করার বিষয়, স্বাধীনতা-উত্তরকালে নাটকের নামকরণে যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছিল, সেলিম আল দীনও সে বৈশিষ্ট্য তাঁর নাটকে ধারণ করেছিলেন।

প্র : 'মুনতাসীর ফ্যান্টাসি' নাটকের বক্তব্য কী?

উ : প্রথমেই বলা দরকার রচনাকালে নাটকের নাম 'মুনতাসীর ফ্যান্টাসি' থাকলেও কয়েক বছর পর নাটাকার এর নাম থেকে 'ফ্যান্টাসি' শব্দটি বাদ দেন। এই নাটকে বিশ শতকের আশির দশকের স্বৈরশাসকের কবল থেকে দেশের কিছুই যে রক্ষিত হচ্ছিল না, সেই চিত্র উপস্থাপিত। হাস্যরসের মাধ্যমে সেলিম আল দীন দেখিয়েছেন সেনা ও স্বৈরশাসকেরা দেশের প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সঙ্গে শুভবোধ ও সংস্কৃতিকেও ধ্বংস করে।

প্র : 'হাতহদাই' নাটকের সম্পর্কে লেখ।

উ : বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে যে বিরাট সম্ভাবনা আছে 'হাতহদাই' এর উদাহরণ। নাটকটি নোয়াখালির আঞ্চলিক ভাষায় রচিত। 'হাতহদাই' মান বাংলায় অর্থ দাঁড়ায় 'সাত সদাই' বা সাত রকমের সওদা বা বস্তু কিছু। এই নাটকে নোয়াখালি অঞ্চলের এক গ্রামের মৌলবির মুখের আঞ্চলিক ভাষায় যে কথা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে সে কথা সন্নিবেশিত।

প্র : সেলিম আল দীনের কোন নাটকের নাম ব্যক্তি ছিল?

উ : 'নিমন্ত্রণ' নাটকের ব্যক্তি। নাটকটি মঞ্চায়নের আগে যখন শুধু কথা হয় তখন এটা ছিল আট ঘণ্টা ব্যাপী। সেলিম আল দীনের ইচ্ছে ছিল নাটকটি পুরোটাই মঞ্চে রাখার। তাহলে মঞ্চে নাটকে একটি নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হয়। গ্রুপ থিয়েটের কর্তৃপক্ষ প্রথমে রাজি হয়েছিলেন, তাই হবে। যে দিন নাটক মঞ্চায়ন হবে, সেদিন আট ঘণ্টায় কয়েকটা বিরতি নিয়ে তা সম্পন্ন করা হবে। বিরতির ফাঁকে খাবার ও ইনস্টের বিনোদনের ব্যবস্থা থাকবে। কিন্তু সব কিছু বিবেচনার পরে সে চিন্তা পরিত্যাগ করে নাটকটি দুই ঘণ্টায় নামিয়ে আনা হয়।

প্র : 'ধাবমান' নাটকের কাহিনি উল্লেখ কর।

উ : নেত্রকোনার নিরিশিরি-সুগাপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ও সোমেশ্বরী নদী এর আখ্যানের পটভূমি। বাঙালি ও গারোদের হাজার বছরের সংঘাত-সংঘর্ষ-সমন্বয়ের প্রক্রিয়ার ব্যাপক অঘটনের মধ্য দিয়ে চলতে থাকে প্রান্ত এলাকায় বাসরত দুই জাতির মানুষের সমন্বয়ের ক্রিয়া, সম্পর্কসহ অবস্থানের প্রস্তুতি। এ সংস্কৃতি মানব প্রকৃতি ও জগতের প্রকৃত ছন্দরীতিতে নির্মিত। জাতি-ধর্ম-বর্ণ লীন হয়ে যায় এ সংস্কৃতির ছন্দোময় স্রোতে। এ রকম প্রেক্ষাপটে সোহরাব নামের এক মহিষকে নিয়ে ধাবমান নাটকের ঘটনা গড়ে ওঠে। নাটকে দেখা যায়, নহবত-সুবতীর গৃহপালিত নারী-মহিষ (হামেলা) এক অপরাহ্নে নিখোঁজ হয়। গর্ভবতী হয়ে হামেলা কদিন পর ফিরে আসে। পারোরা এই ভেবে আনন্দিত হয় যে, দেবতা তুষ্ট হয়ে আর এক দেবতা-মহিষ উপহার হিসেবে পাঠাচ্ছেন। যথাসময় জন্ম নেয় এক মিশমিশে কালো মহিষ-শাবক 'সোহরাব'। সোহরাব তার অঞ্চলে বলশালী ও যুদ্ধে অপরাজেয় মহিষ হিসেবে খ্যাতি পায়। নহবত-সুবতীর পশু সন্তান

Scanned with CamScanner

একাক শব্দ দেখে সোহরাবকে জবাই করে ফোক দিলে তার শত্রুর দূর হয়ে যাবে। এহরব-দুলতী সন্তানের আকাঙ্ক্ষা জাগানো সোহরাবকে উৎসর্গ করতে সম্মত হয়। কিন্তু জবাই হওয়ার পূর্ব-মুহূর্তে শামাস ফিরে এসে সোহরাব নামের মহিষ। অবশেষে খুন হওয়ার নির্মিত্তে সোহরাব নিজের গলা বাড়িয়ে দেয় উদ্যত ছুরির নিচে।

প্র : **'হরণজ' কোন প্রেক্ষাপটে রচিত নাটক?**

উ : মানিকগঞ্জ জেলার হরণজ নামক স্থানে ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত প্রলয়ংকরী টর্নেডোর অভিজ্ঞতা নিয়ে ১৯৯২-এ সেলিম আল দীন 'হরণজ' নাটক লেখেন। টর্নেডো-পরবর্তী সর্বপ্রথম উচ্চারণের একটি গ্রামের মানুষ ও প্রকৃতি ও প্রাণিজগতের নানান স্তরে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলার অদ্ভুতপূর্ব চিত্রই এ নাটকের উপজীব্য। এতে প্রায় আদিবাসিক বিস্ফোরণকল্প ঝড়ের অভিজ্ঞতায় তাদের ভ্রমণ শেষাবধি যেন হয়ে ওঠে আকৃতির জগত থেকে নিষ্কাশিত বিশ্বে অভিপ্রয়াণ।

প্র : **'নিমজ্জন' নাটকের কাহিনি কী?**

উ : বিশ্ব-গণহত্যার ঘটমান কাহিনি ও দৃশ্যচিত্রের সমন্বয়ে 'নিমজ্জন'-এর কাহিনি গড়ে উঠেছে। বিশ্ব পরিভ্রমণ শেষে এক আগন্তুক মৃত্যুশয্যায় শায়িত বন্ধুর কাছে আসবে বলে ত্রিনদীর মোহনায় গড়ে ওঠা এক শহরে এসে উপস্থিত হয়। বন্ধুটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক। রাজনৈতিক মতবাদের জন্য ব্লাক ডেথ স্কোয়াড অব কারাজার লোকেরা নির্যাতনের পর তার মেরুদণ্ডে পেরেক ঠুকে দিয়েছিল। আগন্তুক ট্রেন থেকে স্টেশনে নেমে একে এক দেখতে পায় এক কুলির ঝুলন্ত লাশ, অদ্ভুতদর্শন এক বৃদ্ধ, স্টিমারে হলোকাস্ট, নাড়িভুড়ি বেরিয়ে আসা এক রূপসী নারী– তাকে যতবার কবরে শোয়ান হয় ততোবার সে মৃত্যু থেকে উঠে আসে। আগন্তুক বরফের ভেতরে একান্নটি শিশুর লাশ, আট কি নয় বছরের গায়িকা এক শিশুকে ধর্ষণের পর তার জিভ কেটে নেয়া, কান্দহারের মমি, মাদ্রিদের গণহত্যা, চিলির কবি পাবলো নেরুদার ফিন্দেমুন্দোর শোকগীতি, স্টেডিয়াম গ্যালারিতে ব্যাঙ খেতে চাওয়ার অপরাধে কোটে খুন, তিন উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন টিএনটির বিস্ফোরণে খোল কিংসাডিটার পর্যন্ত নগরটার ঘরে যাওয়া শহরটির জন্য নিমজ্জন লাভ এবং পরিশেষে মৌর আগমন ঘটে দিয়ে এ নাটকের অন্তিম নামাদল সমাপ্তি হয়।

প্র : **'পুত্র' নাটকের পরিচয় দাও।**

উ : সেলিম আল দীন পুত্র ব্যবসায়ী এক দম্পতির অবিশ্রান্ত বিলাপ ও পুত্রহন্তার এ নাটকে রূপায়িত করেছেন। মাহমুদ সিরাজ ও তার স্ত্রী যমুনা পারের অসহায় তাদের পুত্র মানিক আমগাছে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। নিষ্ঠুরভাবে ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন লাশ নাটকের শুরুতে আমগাছটি কেটে ফেলা হয়। এ ঘটনার দুবছর পর এক পীরের কাছে ইচ্ছা পেতে এক দম্পতি আমগাছটি শিশুর নিয়ে আগুন জ্বালায়। এক দিকে পুত্র নিঃশেষ হয়ে আসতে থাকে আম গাছটি শিকড়, অন্য দিকে মা-বাবার অন্তর পুত্র হারানোর যন্ত্রণা যেন দ্বিগুণ যন্ত্রণায় জ্বলতে থাকে। মৃতপুত্রের অপূরণীয় সব ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষাকে স্মরণ করতে করতে এক সময় গাছের শিকড়কেও পুত্র ভাবতে থাকে তারা। নাটকের শেষাংশে দেখা যায়, নতুন সন্তানের তীব্র কামনায় স্ত্রী আবছা স্বামীকে তালাক দিয়ে ফিরে যায় ফেলে আসা যমুনার তীরে।

প্র : **'জুলান' নাটকের পরিচয় দাও।**

উ : উরুক গোত্রের অধিবাসীরা বরা অজন্মার মুখোমুখি। তাই তারা এলন পর্বতের ওপারে জুলান পর্বতে চলে যাবে। তাদের যেতে হবে জন্মভিটা ছেড়ে। সেই বেদনায় মন ভেঙে যায়। স্বপ্নময় চোখও জ্বলে সমান তালে। কিন্তু স্বপ্নে দেখেছে গোত্রপতি পুরুত এক রজনী সন্ধ্যেয়ার তাকে বলি দেবে শামাসের উদ্দেশে। বজ্রাহতের মতো মুষড়ে পড়ে ইশতার ও প্রেমিক বীর গামেশ। কিন্তু গোত্রবাসীর কল্যাণার্থে প্রেমিকও উৎসর্গ করে প্রেমিকাকে। অতঃপর স্মৃতিতাড়িত হয়

দুজন। প্রেমের পূর্ণবিকাশ ঘটলে ফেলনা জাগে বলে। বুঝতে পারে পুরুতের ষড়যন্ত্র। পালাবে তারা, শালিয়ে যাবে দূরে, বহু দূরে– যেখানে শামাসের নির্মম প্রভাবশেষ নেই। পুরুতের জোগাড়িন্দা, হানাহানি আর রক্তপাত নেই। প্রচণ্ড বেগে ঘোড়া ছুটে চলে। হায়! মৃগোপুসের মরুপথে পুরুতের লোকেরাও তবে সেকেছে রণনাদে। রক্তাক্ত পথ, ইশতার ও পুরুতের মৃত্যু হয়ে যায় জুলানের পথ।

নাট্যসাহিত্যে সেলিম আল দীন বিশিষ্ট কেন?

তিনি তাঁর নাটকে নিজের গবেষণা ও উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে বাংলার লোককে উপাদানকে ব্যবহার করে বাংলাদেশের নাটমঞ্চের পুরোনো ধ্যান-ধারণাকে ভেঙে দিয়েছেন। তাঁর শিল্পচিন্তার নাম ছিল 'কথানাট্য'। প্রতিটি নাটকে কবিতা, গান, গল্প ও নাট্যের সমন্বয় ঘটিয়েছেন সেলিম আল দীন। তিনি লোকজ উপাদানের সঙ্গে মিথ বা পুরাণকেও অসাধারণভাবে ব্যবহার করেছেন।

প্র : **তিনি কোন কোন নাটক শেষ করে যেতে পারেন নি?**

উ : 'হাড়-হাব্বিড' নামের একটি নাটক পরিকল্পনার মাত্র এক তৃতীয়াংশ তিনি লিখেছিলেন। সেটি সমাপ্ত করার আগেই সেলিম আল দীন মৃত্যুবরণ করেন।

প্র : **তাঁর প্রথম প্রকাশিত বাংলা প্রবন্ধের নাম কী?**

উ : 'নিগ্রো সাহিত্য'। ১৯৬৮ সালে দৈনিক পাকিস্তান সাময়িকীতে প্রকাশিত।

প্র : **টেলিভিশনে প্রচারিত সেলিম আল দীনের প্রথম নাটক কোনটি?**

উ : 'ঘুম নেই'। ১৯৭০ সালে বাংলাদেশ টেলিভিশনে এই নাটক প্রচারিত হয়। প্রযোজক ছিলেন আতিকুল হক চৌধুরী।

প্র : **সেলিম আল দীন কী কী পুরস্কার পান?**

উ : একুশে পদক, বাংলা একাডেমি পুরস্কার, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, কথকতা সাহিত্য পুরস্কার, টেনাসিনাস পুরস্কার, নান্দীপট পদক ইত্যাদি।

প্র : **তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?**

উ : ১৯ জানুয়ারি ২০০৮ : জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

সৈয়দ আলী আহসান

প্র : **সৈয়দ আলী আহসান কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?**

উ : ১৯২২ সালের ১৬শে মার্চ, সাতক্ষীরার কলিয়া নামক স্থানে।

প্র : **তিনি মূলত কী হিসেবে পরিচিত?**

উ : অধ্যাপক ও লেখক।

প্র : **তিনি কর্মজীবনে কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন?**

উ : ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

প্র : **তিনি কোন দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেছেন?**

উ : জাহাঙ্গীরনগর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

প্র : **তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য কী?**

উ : ভাববস্তুতে ঐতিহ্য সচেতনতা, সৌন্দর্যবোধ ও দেশপ্রীতি।

প্র : **তাঁর প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো কী?**

উ : **কাব্যগ্রন্থ :** অনেক আকাশ (১৯৫৯), একক সন্ধ্যায় বসন্ত (১৯৬৬), সহসা সচকিত (১৯৬৫), উচ্চারণ (১৯৬৮), আমার প্রতিদিনের শব্দ, সমুদ্রই যাবো।
প্রবন্ধ-গবেষণাগ্রন্থ : মজরুল ইসলাম (১৯৫৭), কবিতার কথা (১৯৫৭), কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা (১৯৬৮), আধুনিক বাংলা কবিতা : শব্দের অনুষঙ্গে (১৯৭০), রবীন্দ্র কাব্যবিচারের ভূমিকা (১৯৭৪), কবি মধুসূদন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, সততা স্বাগত, শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য, পদ্মাবতী।
অনুবাদগ্রন্থ : হুইটম্যানের কবিতা, ইত্রিপাল।
আত্মজীবনী : আমার সাক্ষ্য (১৯৯৪)।

প্র : **তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?**

উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৭), সুফী মোতাহার হোসেন স্বর্ণপদক (১৯৬৭),

Scanned with CamScanner

এতদ্ব্যতীত নকশা (১৯৮৩), মধুমুদ্রণ স্বর্ণপদক (১৯৮৫) ও নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক।

প্র : কিভাবে মৃত্যুবরণ করেন?

উ : ২৩শে জুলাই ২০০২ সালে।

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী

প্র : ইসমাইল হোসেন কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই জুলাই, সিরাজগঞ্জ। (মতান্তরে ৫ই আগস্ট, ১৮৭৯)

প্র : তাঁর পিতার নাম ও পেশা কী?

উ : আব্দুল করিম খন্দকার (১৮৫৬–১৯২৪)। পেশায় ডেপুটি চিকিৎসক।

প্র : তাঁর মাতার নাম কী?

উ : নূরজাহান খানম।

প্র : সিরাজী কি তাঁর পিতৃপ্রদত্ত নামের অংশ?

উ : না। সিরাজগঞ্জে জন্মেছিলেন বলে নামের শেষে 'সিরাজী' যুক্ত করেন। তিনি 'শিরাজী' বানানও লিখতেন। প্রথম দিককার বইতে তাঁর নামের সঙ্গে 'শিরাজী' যুক্ত থাকত।

প্র : তাঁর রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে লেখ।

উ : প্রথম জীবনে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনা লালন করতেন। বঙ্গভঙ্গের বিশেষ করে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ ও বাগ্মী নেতা ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫–'১১) বিরোধী আন্দোলনে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯১২-'১৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে তিনি মুসলিম ধর্মীয় চেতনায় অধিক পরিমাণে প্রভাবিত হতে থাকেন এবং পরে সম্পূর্ণভাবে মুসলিম পুনর্জাগরণবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন।

প্র : তাঁর সাহিত্যচর্চার পরিচয় দাও।

উ : ইসমাইল হোসেন সিরাজীর গদ্য বঙ্কিমচন্দ্রের মতো সংস্কৃতবহুল, কবিতা মধুসূদনের মতো ক্লাসিক রীতির।

উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ : অনল প্রবাহ (১৯০০), উচ্ছ্বাস (১৯০৭), উদ্বোধন (১৯০৭), স্পেনবিজয় কাব্য (১৯১৪);

উপন্যাস : তারা-বাঈ (১৯০৮), রায়নন্দিনী (১৯১৮), ফিরোজা বেগম (১৯২৩);

প্রবন্ধ : স্বজাতি প্রেম (১৯০৯), তুর্কিনারী জীবন (১৯১৩), স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা (১৯১৬), তমদ্দুন ও তরক্ক প্রসঙ্গ (১৯২০)।

প্র : 'অনল প্রবাহ' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী মুসলিম জাগরণমূলক কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হয় ১৯০০ সালে। এ গ্রন্থে তার জন্ম থেকে শুরু করে ১৯০০ সাল পর্যন্ত রচিত ৪৩টি কবিতা স্থান পেয়েছে। জাতীয়তাবোধ উদ্ভাসিত হয়েছে এ গ্রন্থের বাণীতে। মুসলমানদের অতীত গৌরব অধঃপতন বাক্ত করে ইংরেজদের শোষণ ক্ষোভ ও ক্রোধ প্রকাশ করা হয়েছে কাব্যটিতে। 'অনল প্রবাহে' কবি হয়েছেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আবাহন' কবিতা 'বিলাপ' ইত্যাদি কবিতার সুস্পষ্ট ছাপ আছে। ১৩১৫ বঙ্গাব্দে (১৯০৮ খ্রি.) পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয়। প্রথম সংস্করণে কবিতা ছিল মাত্র নয়টি। এগুলো হচ্ছে : অনল-প্রবাহ, তূর্যধ্বনি, মৃত্যুঞ্জয়ী, বীর-পূজা, অভিযাত্রী, ছাত্রগণের প্রতি, মাবক্কো-সমর, অশ্রু, আগমনে, নীরবতা, আমীর-উজীর, ১৯০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাজদ্রোহী বাংলা সরকার গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করে এবং ১১৭, ১২৪ (ত), ১৫৩ ধারা অনুসারে গ্রন্থকারের প্রতি ফেরারানা জারি করেন। পরে পাসপোর্ট সিরাজীকে ধরিয়ে দেবার জন্য ৫০০ টাকা পুরস্কার ঘোষিত হয়। ব্রিটিশ-বিদ্বেষ ও প্রচারণার অভিযোগে ১৯১২ সালে ১৫ মে তিনি কারামুক্ত হন। তাঁর রচিত 'কারাদণ্ড ভোগ করে ১৯১২ সালের ১৫ কাহিনী' মূলত এ জেল-জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে রচিত।

প্র : 'স্পেনবিজয় কাব্য' সম্পর্কে লেখ।

উ : ইসমাইল হোসেন সিরাজী মহাকাব্য লিখতে চেয়েছিলেন। 'স্পেনবিজয় কাব্য' (১৯১৪) মুসলিম বীর তারেক ও স্পেন সম্রাট রডারিকের সংগ্রামের বর্ণনার মাধ্যমে মুসলিমদের বীরত্বপূর্ণ অধ্যায় নতুন করে তুলে ধরা হয়েছে। বৈশিষ্ট্যের বিচারে এটি পূর্ণাঙ্গ মহাকাব্য হয় নি।

প্র : 'রায়নন্দিনী' উপন্যাস সম্পর্কে দেখ।

উ : বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম এবং বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রতিক্রিয়ায় সিরাজী 'রায়নন্দিনী' লেখে

স্পেনবিজয়ী'তে একটি প্রমত্ত আছে, যুদ্ধপূর্ণ যুবক জগৎ সিংকে দেখে মুগ্ধ নারী আয়েষা মুগ্ধ হয়। এইটুকুর প্রতিক্রিয়ায় সিরাজী পুরো উপন্যাস লিখে ফেলেন। 'রায়নন্দিনী'তে কন্যা স্বর্ণময়ীকে নিয়ে গুপ্ত প্রণয়ের কন্যা স্বর্ণময়ীকে নিয়ে গুপ্ত ধর্মান্তর নয়, ইসলামধর্ম গ্রহণ করিয়ে করানো হয়। উপন্যাস প্রমাণ 'রায়নন্দিনী' ব্যর্থ। তবে হিসেবে প্রতিক্রিয়ার ইতিহাসে এই নামটি স্মরণ করতে হয়। 'উপন্যাসটির শেষ বাক্য : স্বজন উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ-পরিবার জন্মশঃ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন।'

প্র : তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?

উ : ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই জুলাই।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

প্র : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই অগস্ট চট্টগ্রামের হোলশহরে।

প্র : তিনি কী হিসেবে পরিচিত?

উ : কথাসাহিত্যিক।

প্র : হাতে লেখা কোন পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করেন, কখন?

উ : ফেনি স্কুলের ছাত্রাবস্থায় (১৯৩৬) 'ভোরের আলো' নামের পত্রিকা।

প্র : তাঁর প্রকাশিত প্রথম গল্পের নাম কী? কোথায় বের হয়?

উ : 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'। ঢাকা কলেজ ম্যাগাজিনে।

প্র : ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত তিনি কোন পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন?

উ : কলকাতার দৈনিক স্টেটসম্যান; সহকারী সম্পাদক পদে।

প্র : মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবস্থান কী ছিল?

উ : মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি প্রবাসে ইউনেস্কোতে কর্মরত থাকার সময় স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে বিশ্ব জনমত গড়ার ক্ষেত্রে কাজ করেন।

প্র : তাঁর স্ত্রী কে?

উ : ফরাসি নাগরিক এ্যান মেরি (বিয়ে : ১৯৫৬)।

প্র : তাঁর রচনাসমূহ কী?

উ : উপন্যাস : লালসালু (১৯৪৮), চাঁদের অমাবস্যা (১৯৬৩), কাঁদো নদী কাঁদো (১৯৬৮), দি আদার লিংকন (ইংরেজি অনুবাদ, রচনা ১৯৭১); **গল্পগ্রন্থ :** নয়নচারা (১৯৬১), দুই তীর ও অন্যান্য গল্প (১৯৬৪)। নাটক : বহিপীর (১৯৬৪), তরঙ্গভঙ্গ (১৯৬৬), সুড়ঙ্গ (১৯৬৪), উজানে মৃত্যু (১৯৬৬)।

প্র : ওয়ালীউল্লাহ্র সাহিত্য সম্পর্কে কী বলা যায়?

উ : গভীর জীবনবোধ, অন্তর্দৃষ্টিকের বহুমুখী অনুসন্ধানস্পৃহা ও সংস্কারকামী মনের অভিব্যক্তিময় তাঁর সাহিত্য সমৃদ্ধ। তাঁহাড়া তিনি ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনের শ্রেণীগত দ্বন্দ্বীয় ও সামাজিক কুসংস্কার, মূল্যবোধের বিপর্যয়, মানসিক স্খলন ও পতনের আলেখ্য উজ্জ্বলভাবে অঙ্কন করেছেন।

প্র : 'লালসালু' উপন্যাসের মূলবিষয় কী?

উ : ধর্ম নিয়ে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থকারীদের স্বরূপ উন্মোচন এবং নারী জাগরণের প্রেক্ষাপটে সমাজচেতনা।

প্র : 'লালসালু' উপন্যাস সম্পর্কে লেখ

উ : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচিত উপন্যাস। ১৯৪৮ সালে কলকাতা থেকে গ্রন্থকারে প্রকাশিত। এই উপন্যাসে একদিকে যেমন বাংলার গ্রামজীবনের বাস্তব প্রকৃতি ধরা পড়েছে তার সৌন্দর্য, মাধুর্য ও কঠোরতা নিয়ে; তেমনই রূপায়িত হয়েছে অসংখ্য গ্রামীণ মানুষের জীবন। নোয়াখালি অঞ্চল থেকে মজিদ নামের একটি কৃতচরিত্র পারোপাহাড়ি অঞ্চলে গিয়ে সেই এলাকার মানুষকে ধর্মের নামে কীভাবে শোষণ করে, সেই বাস্তব চিত্র আছে উপন্যাসটিতে। ধর্ম ব্যবসায়ী মজিদ অর্থ ও প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে অল্পবয়সী দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করে। সে গ্রামের মোড়লদেরও প্রভাবিত করে। পাশের গ্রামে অন্য পিরের আগমন হলে, নিজের দাপট খর্ব হবে বিবেচনায়, তাকে মারধর দিয়ে উচ্ছেদ করে। এদেশে মজিদের মতো চরিত্র আজো গ্রামে ও শহরে প্রচুর। তবে স্বল্পবয়সী স্ত্রী জমিলা কর্তৃক সে লাঞ্ছিত হয়, মাজারের গায়ে পা লেগে থাকে

Scanned with CamScanner

জমিদার। উপন্যাসে জমিদার বিদ্রোহিনী, নাস্তিকদের নায়ক। 'লালসালু'র একটি বহুমাত্রিক ও কাব্যধর্মী উপন্যাস। উল্লেখযোগ্য চরিত্র: মজিদ, খালেক ব্যাপারি, জমিলা, রহিমা, আমেনা, আক্কাস, তাহেরার বাপ, হাসুনির মা। ঔপন্যাসিক কথাকারদের উপন্যাস করে লিখেছেন। 'খোদার গেরেমে বুক করে না তলাব সেই খুশা বলে।' উপন্যাসটি 'Tree Without Fibers' নামে অনূদিত হয়ে (১৯৬৭) খ্যাতি অর্জন করে।

প্র : 'লালসালু'র ইংরেজি অনুবাদের নাম কী?

উ : 'ট্রি উইথ আউট রুটস' (১৯৬৭)।

প্র : 'লালসালু'র ফরাসি অনুবাদের নাম কী?

উ : লা অবরে সামস মাইলেমে (১৯৬১)।

প্র : কে উপন্যাসটির ফরাসি অনুবাদ করেন?

উ : ওয়ালীউল্লাহ্‌র পত্নী আন মেরি।

প্র : 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'চাঁদের অমাবস্যা' (১৯৬৪) উপন্যাসে আরেফ আলী নামের এক স্কুল মাস্টারকে অবলম্বন করে মানুষের অন্তর্জীবনের জটিলতা উন্মোচন প্রসঙ্গে সামন্ত-সমাজ প্রভাবিত গ্রামীণ জীবনের নানা অসঙ্গতি তুলে ধরেছেন। গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্য কাদের (যে গ্রামে নরবেশ বলে খ্যাত) গভীর রাতে এক যুবতীকে বাঁশঝাড়ে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ ও হত্যা করে। এই ঘটনা হঠাৎ দেখে ফেলে ওই পরিবারে আশ্রিত নিম্নবিত্তের স্কুল শিক্ষক আরেফ আলী। এখন আরেফ কী করবে? সে কি সবাইকে জানিয়ে দেবে সত্য ঘটনা? যদি জানায় তাহলে তার আশ্রয়চ্যুতি ঘটবে, নিজের উপরও চেপে যেতে পারে সে অপরাধ! আর না বলেও সে মনে মনে অস্থির হয়ে যায়। আরেফের মনোগত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই এই উপন্যাসের মৌল প্রতিপাদ্য বিষয়।

প্র : 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'কাঁদো নদী কাঁদো' (১৯৬৮) উপন্যাসে মুক্তফা, তবারক, খোদেজা, বদর শেখ, খেদমতুল্লা, কালু মিয়া ইত্যাদি চরিত্রের নামে গ্রামীণ ও কুসুমডাঙ্গার শহরকে পরিবেশ করা হয়েছে। কিন্তু ধারণের ক্ষেত্রে [illegible] উচ্চশিক্ষা নিতে শহরে বিভিন্ন [illegible] চাকরিজীবন চাকরি ও পরিস্থিতি [illegible] মানসিক দ্বন্দ্বে পরিণত হয়। [illegible] খোদেজা আত্মহত্যা করলে মুক্তফা [illegible] যে, মৃতের আত্মা তাকে অনুসরণ করে। [illegible] মুক্তফাও আত্মহত্যা করে। অবশেষে বাকল নদীতে চর পড়ায় মাঝির [illegible] মাস্টার খতির, ডাক্তার বোরহান [illegible] সকিনা, মোসলেহ উদ্দিন [illegible] কতিপয় হয়। এ উপন্যাসে [illegible] আচার- সর্বস্বতা, বিজ্ঞানের [illegible] অন্ধবিশ্বাস, বাস্তবতার নামে [illegible] ইত্যাদির বিরুদ্ধাচারণ দেখা যায়। উপন্যাসে ব্যক্তির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ [illegible] সামাজিক অভিজ্ঞানে বর্ধিত হয়েছে। এই হয়ে উঠেছে সামাজিক জীবনবাদী [illegible] প্রতীক। উপন্যাসে শুধু বিষাদক্লিষ্ট নয় প্রকরণেও নতুনত্ব পরিলক্ষিত হয়।

প্র : 'দি আগলি এশিয়ান' উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ কে, কী নামে করেন?

উ : শিবব্রত বর্মণ অনুবাদ করেন 'অসুন্দর এশীয়' (২০০৬) নামে।

প্র : 'দি আগলি এশিয়ান' সম্পর্কে লেখ।

উ : উপন্যাসে পূর্ববঙ্গের রাজধানী শহর (যদিও নেয়া হয় নি) কেন্দ্র করে রাজনীতিতে আমেরিকার হস্তক্ষেপ, সেনাবাহিনীকে দিয়ে সামরিক আইন জারি, সাধারণ মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার খর্ব করা, দেশে সাম্যবাদী উত্থান প্রচেষ্টা ব্যর্থ করা ইত্যাদি প্রধান হয়ে উঠেছে। সামরিক আইন জারি করিয়ে সেনাবাহিনী নিয়ে নিজেদের সমর্থনপুষ্ট পুঁজিবাদীদের কাজ লাগিয়ে মার্কিন দেশ তখন এশিয়ার প্রতিটি দেশেই নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে ব্যস্ত ছিল। এশিয়ার এই কদর্য রূপকেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ এ উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। এই উপন্যাসে নানাতি ও প্রধানমন্ত্রী কাদের শোষক শ্রেণির প্রতিনিধি ও মার্কিন সমর্থক। মার্কিন সাংবাদিক জনসনকে কাদের বলে যে, সে দেশে শিল্পায়ন চায় না। এতে মানুষ অধিকার সচেতন হয়ে উঠবে। কাদের কঠোর হয়ে গণতান্ত্রিক দাবির আন্দোলন থামাতে

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতাদের হত্যা করে। কিন্তু এক পর্যায়ে সেনাবাহিনীর ইয়াহিয়া কাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করতে বাধ্য হয় এবং মার্কিন গভীরভাবে 'তাদের আর একজন অনুগত মুক্তাদিরকে ক্ষমতায় বসিয়ে সেনাবাহিনী তাকে দেশে দেয়। মুক্তাদির প্রধানমন্ত্রী হয়ে দেশে সামরিক আইন জারি করে। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবদুল জেন শাটেল, তিনি নামের এক বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীসহ অসংখ্য মানুষ এর নানামুখী প্রতিবাদ করে। উল্লেখ্য ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে এজাতেই আইয়ুব খান ক্ষমতা দিয়েছিলেন এবং ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে একইভাবে ইয়াহিয়া ক্ষমতা গ্রহণ করেন। আসলে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দেই ওয়ালীউল্লাহ্‌ ১৯৭১-এর পূর্বপর্যন্ত বাঙালির সংগ্রামসমূহ এই উপন্যাসে ধারণ করেছেন শুধু তাঁর অন্তর্দৃষ্টির গুণে। উপন্যাসটি চলমানতার মার্কিনবিরোধী। উইলিয়াম জে লেডেরার ও ইউজিন বারডিক যৌথভাবে রচিত মার্কিন উপন্যাস 'দি আগলি আমেরিকান' (১৯৫৮) এর প্রভাব এ উপন্যাস রচনার সময় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ওপর পড়েছিল।

প্র : 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের পরিচয় দাও।

উ : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র এই গল্পটি 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' (১৯৬৫) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। দেশভাগের সময় কলকাতা থেকে কিছু সংখ্যালঘু মুসলমান এদেশে এসে একটি বাড়িতে আশ্রয় নেয়। বন্দিদের মধ্যেই তারা জানতে পারে বাড়িটি এদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের পরিত্যক্ত। এ বাড়ির লোকেরাও প্রাণভয়ে ভারতে পালিয়ে গেছে। বাড়িতে একটি তুলসী গাছ আবিষ্কার হয়। এরকম কাহিনি নিয়েই গল্পটি সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। গল্পটির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে মানুষের নিজস্ব জীবন যখন বিপন্ন ও অর্থহীন, তখন তার পারিপার্শ্বিক অনুষঙ্গসমূহও হয়ে পড়ে গুরুত্বহীন। দেখা যায় দেশবিভাগের নির্মম পরিণতিতে সর্বস্বান্ত মানুষের মানবিক মূল্যবোধও পরিস্থিতির কাছে জিম্মি।

প্র : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাটক 'বহিপীর' সম্পর্কে লেখ।

উ : [illegible] এক তরুণীকে [illegible] ও বাবা নিয়ে সেয় বুড়ো এক পিরের [illegible]। এই পির বইয়ের ভাষা অর্থাৎ সাধুবাংলায় কথা বলেন বলে তাকে পরিবেশিত বলে অভিহিত করা হয়েছে। পিরের কথা হলো, বইয়ের ভাষায় বা সাধুবাংলায় কথা বলেন নানা রকমের আঞ্চলিকতাসহ ব্যবসায়ের তার কথা বুঝতে অসুবিধা ও শ্রোতাদের অসুবিধা হবে না। নাটকে তাদেরকে সে পির করলেও তারা 'কবুল' বলে নি। সবাই ছোট এক ডাঙাচরা ভাইকে নিয়ে পালিয়ে নদীর ঘাটে আসে সে। রেশমপুরের জমিদার হাতেম খাঁ খোদেজা ও পুত্র হাশেমকে নিয়ে নৌকাপথে ঢাকায় আসছিলেন। নদীর ঘাটে তাহেরাকে দেখে সে তাকে বজরায় তুলে নেয়। এদিকে বহিপির তার ভুতা হকিকুল্লাকে নিয়ে তাহেরাকে খুঁজতে নৌকাযোগে বের হয়। তাদের নৌকা জমিদার হাতেমের বজরার সঙ্গে ধাক্কা লেগে মুর্মটনা ঘটার আগেই হাতেম বহিপির ও তার ভুতাহে খাঁয় বজরায় তুলে জীবন বাঁচায়। নাটকীয়তা এখানেই যে, একই বজরার দুই কামরায় বহিপির ও তাহেরার অবস্থান কিন্তু কেউ তা জানে না এবং তাদের পারস্পরিক পরিচয়ও জমিদার-পরিবারের কাছে অজানা। তবে অল্প সময় পরেই সে পরিচয় জানা হয়ে যায় এবং বহিপির তাহেরাকে নিজের আস্তানায় নিতে চায়। এ ব্যাপারে সে নানা কৌশল প্রয়োগ করেও ব্যর্থ হয়। অবশেষে হাশেম ও তাহেরা নবজীবনের পথে বের হলে নতুনের জয়গাথা রচিত হয় এই নাটকে। নাটকটি লেখকের 'লালসালু' উপন্যাসের সঙ্গে মিলিয়ে পড়া যেতে পারে। এখানেও ধর্মকে ভণ্ডবহিপির ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করে। বহিপির> মজিদ, তাহেরা>জমিলা, হাতেম>খালেক ব্যাপারি, আমেনা>খোদেজা, হাশেম> আক্কাস এভাবে প্রতিতুলনা করে 'বহিপীর' ও 'লালসালু' পাঠ করা যেতে পারে। নাটক ও উপন্যাসটির বক্তব্য-বিষয় মূলত একই। ১৯৫৫ সালে 'বহিপীর' রচিত এবং ১৯৬৫ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত।

Scanned with CamScanner

প্র : সৈয়দ ওয়াশীউল্লাহর নাটক 'তরঙ্গভঙ্গ' সম্পর্কে লেখ।

উ : 'তরঙ্গভঙ্গ' (১৯৬৯) পাশ্চাত্যরীতি অনুসারী এবসার্ডধর্মী অভিনব নাটক। মৌলবি আবদুস সাত্তার দেওলাপুরী বিচারকের কাছে সত্তর ঊর্ধ্বে-পঁচিশ বছর বয়সী পুত্রবধূ আছেমার বিরুদ্ধে শিশু ও স্বামী হত্যার অভিযোগ আনে। অভাবের তাড়নায় অসুস্থ স্বামী মুমূর্ষুর শেষকে ডিবিৎসা করাতে না পেরে সে দুমুঠো বিষ পান করিয়ে স্বামী হত্যা করে। আর চারটি শিশুর আহার সংস্থান করতে না পেরে ছোটটিকেও সে মেরে ফেলে। বিচারক এর বিচার করতে বসেন। কিন্তু এ নাটকের একটি সংলাপ: 'জেবেছিলেন জজ সাহেব ঘুমিয়েছিলো? না, জজ কখনো ঘুমায় না। তার চোখে ঘুম নেই।' এ সংলাপের মধ্য দিয়েই বিচারের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পায়। আর তাই মামলা দেড়মাস মুলতবি ছিল কেন– প্রশ্ন ওঠে। বলা হয়: জজ সাহেব আসামির ফাঁসি দেবেন না, রায়ও দেবেন না? আসলে অস্তিত্বের সংকটে নিপতিত মানুষের অন্তর্গত আর্তনাদ শব্দরূপ পেয়েছে এই নাটকে। কাঠগড়ায় অবনত দৃষ্টির আমেনা, জামাতচেতনার প্রতীক হয়ে ওঠা ভাঙাপাত্র নিয়ে বসে থাকা ভিখারিণী, জীবন সম্পর্কে সম্যকভাবে অবগত না থাকা এক যুবক, বাদি মৌলবি আবদুস সাত্তার দেওলাপুরীসহ আদালতের উকিল, সাক্ষী মতলুব আলী, বিচারক ইত্যাদি এই নাটকের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র।

প্র : সৈয়দ ওয়াশীউল্লাহর নাটক 'উজানে মৃত্যু' সম্পর্কে লেখ।

উ : 'উজানে মৃত্যু' (১৯৬৬) নাটকের মুখ্য বিষয় আধুনিক সভ্যতার অন্তঃশূন্যতা, এর ক্লান্তিকর পথপরিক্রমা, নিরাশাবাদী ভাব কিন্তু সুখের জন্য অসীম প্রতীক্ষা, যা শেষ হবার নয়। এটি একটি এবসার্ড নাটক। এবসার্ড শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, জীবনের এলোমেলো ভাব প্রকাশিত হবে শিল্পের শরীরে। তাই এবসার্ড নাটকে থাকবে সংলাপ ও পাত্রপাত্রীর আপাত সমন্বয়হীনতা। কিন্তু এর গভীরে প্রবাহিত থাকবে পরিত্রাণের অন্তঃশীলা। নৌকাবাহক, সাদা পোশাক পরিহিত ব্যক্তি, কালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তি– এই তিন প্রতীকচরিত্রকে কেন্দ্র করে নাটকটি সৃষ্টি করা হয়েছে। নৌকা উজানে দেওয়া জন্য না যাওয়ার কারণ। নৌকাবাহক হয়ে তার বর্তমান দশাও অন্যের কারণে। কিন্তু বিশ শতকের এই যুগ বহুদূর পানে কারেই এগিয়ে যেতে হবে। মাঝিদ আবাহ নদী ও নৌকার অনুষঙ্গে ভরা নাটকটি রচিত হলেও তা আসলে বিশ শতাব্দীর মানবিক অবস্থাকেই ধারণ করে।

প্র : সৈয়দ ওয়াশীউল্লাহর নাটক 'সুড়ঙ্গ' সম্পর্কে লেখ।

উ : 'সুড়ঙ্গ' (১৯৬৪) নাটকে মানুষের চেতনার গভীরস্থ লোভ, লালসা, ঘৃণা, ঈর্ষাকে নাটকার রূপকাশ্রয়ে তুলে ধরতে গিয়ে এবসার্ড নাট্যধারাকে অনুসরণ করেছেন। তাই অনেক সময়ই সংলাপে সামঞ্জস্যহীনতা, অস্পষ্টতা ও নাটকে রহস্যময়তা পরিদৃষ্ট হয়। ঘোড়শী বালেয়া নিজের বিয়ে ঠিক হওয়ার পর আমার ত্যাগ করে। সবাই ভাবে বিয়েতে অমত তার। কিন্তু বালেয়া জানায় বরে তার আপত্তি নেই। তাহলে কেন বালেয়ার এ অবস্থা? শুরু হয় রহস্যময়তা! বালেয়ার ঘরের আলমারির নিচে থাকা গুপ্তধনের সংবাদে তার চাচাতো ভাই কলিমসহ তিনজন যুবক রাতদিন সুড়ঙ্গ কাটতে ব্যস্ত। মাটির সুড়ঙ্গ নাকি মনের সুড়ঙ্গ– রূপকটি এখানেই।

প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?

উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬১), আদমজি পুরস্কার (১৯৬৫), একুশে পদক (১৯৮৩)।

প্র : তাঁর মৃত্যু হয় কত তারিখে?

উ : ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর; প্যারিসে।

সৈয়দ মুজতবা আলী

প্র : সৈয়দ মুজতবা আলী কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর পিতার (সাবরেজিস্ট্রার) কর্মস্থল তৎকালীন শ্রীহট্ট অর্থাৎ আজকের সিলেটে।

প্র : তাঁর পৈতৃক নিবাস কোথায়?

উ : বর্ধমান জেলার উদয়পুর গ্রামে।

প্র : তিনি কোন কোন ভাষা জানতেন?

উ : বাংলা, উর্দু, সংস্কৃত, ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, পারসি, আরবি ও ইতালীয় ভাষা।

প্র : বিশ্বভারতী থেকে তিনি কত সালে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন?

উ : ১৯২৮ সালে।

প্র : তাঁর উল্লেখযোগ্য ভ্রমণকাহিনির নাম লেখ।

উ : 'দেশে বিদেশে' (১৯৪৯)।

প্র : 'দেশে বিদেশে'র পরিচয় দাও।

উ : 'দেশে বিদেশে' গ্রন্থে বিশেষত তাবুলে অবস্থান ও বিভিন্ন দেশে বিশেষের ভ্রমণ করে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তার পরিচয় আছে এই গ্রন্থে। এর ভাষা সহজ, উপস্থাপনায় সাবলীলতা ও আন্তরিক মেজাজ আছে। রাজনৈতিক ঝোড়ো হাওয়া, সাধারণ মানুষের জীবন, সাংস্কৃতিক জীবনের নানা পরিচয়, অপরিচিত দেশের নানা বৈশিষ্ট্য সব ফুটে উঠেছে এক অপূর্ব আন্তরিক ভঙ্গিতে। গ্রন্থটির রচনাশৈলী অসাধারণ বলে প্রথম গ্রন্থেই মুজতবা আলী পাঠকহৃদয় জয় করেন।

প্র : তাঁর রচিত দুটো উপন্যাসের নাম লেখ।

উ : অবিশ্বাস্য (১৯৫৪), শবনম (১৯৬০)।

প্র : তাঁর রচিত রম্য-রচনার নাম লেখ।

উ : পঞ্চতন্ত্র (১৯৫২), ময়ূরকণ্ঠী (১৯৫২)।

প্র : পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : সৈয়দ মুজতবা আলীর 'পঞ্চতন্ত্র' (১৯৫২) দুই পর্বে বিভক্ত ব্যক্তিগত প্রবন্ধ সংকলন। প্রথম পর্বে ৩৪, দ্বিতীয় পর্বে ৩১, মোট ৬৫টি রচনার সংকলন। উল্লেখযোগ্য রচনা বই কেনা, মোপাসাঁ, চেখভ-রবীন্দ্রনাথ, বিদেশে, মেশোদিনী, অনুবাদ সাহিত্য, অর্থাৎ অর্থাৎ ইত্যাদি। এইসব প্রবন্ধ 'নবসুমতী' ও 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধগুলোর মধ্যে মুজতবা আলীর বিশেষ ও সরস গদ্যশৈলীর পরিচয় মেলে। তাছাড়া বিচিত্র বিষয় শ্রীতির নিদর্শন পাওয়া যায়। গ্রন্থটিকে রম্যসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

প্র : তাঁর রচিত ছোটগল্পগ্রন্থের নাম লেখ।

উ : চাচা-কাহিনী (১৯৫২), টুনি মেম (১৯৬৪)।

প্র : সৈয়দ মুজতবা আলী চাকরি জীবনে অবদানগ্রহণ করেন কোথা থেকে?

উ : ১৯৪৩ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার (সহযোগী অধ্যাপক) হিসেবে।

প্র : তিনি কাজী নজরুল ইসলামের কোন গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন?

উ : কবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম।

প্র : তিনি কবে, কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?

উ : ১৯৭৪ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি, ঢাকায়।

'প্রবাস বন্ধু' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : অধ্যক্ষ জিবাব সাহেব কোন দেশের অধিবাসী ছিলেন?

উ : ফ্রান্সের।

প্র : বাজামোল্লা গ্রামটি কোথায়?

উ : আফগানিস্থানের রাজধানী কাবুলের আড়াই মাইল দূরে।

প্র : এই রচনায় 'আফগানিস্থান' লেখা হয়েছে 'আফগানিস্তান' নয় –কেন?

উ : আফগানিস্তানের স্থান অর্থে 'আফগানিস্থান' ঠিক আছে। 'স্তান' উর্দু শব্দ।

প্র : আবদুর রহমান কে ছিলেন?

উ : অধ্যক্ষ জিবাব সাহেবের কাজের লোক।

প্র : 'ডাবর' কী?

উ : বড় পাত্র।

প্র : ভীমসেন কে?

উ : পঞ্চপাণ্ডবের এক ভ্রাতা। সাধারণত তিনি ভীম নামেই পরিচিত।

প্র : পল্টন কী?

উ : 'Platoon' থেকে পল্টন শব্দের উদ্ভব। এর অর্থ সেনাদের মধ্যে দলবিশেষ।

প্র : পাগমানের পাহাড় কত দূরে?

উ : কাবুলের অনতিদূরে। কাবুল থেকে চার/পাঁচ কিলোমিটার দূরে।

প্র : আবদুর রহমান কী কী ভালো রাঁধতে জানত?

উ : পোলাও, কুর্মা, কাবাব, ফালুদা।

প্র : পাগমান পাহাড়টি কোথায়?

উ : খাজামোল্লা গ্রামে।

Scanned with CamScanner

প্র : শালদহ পাহাড়ে কি পাওয়া যায়?
উ : কয়লা।
প্র : আবদুর রহমান লেখকের জন্য রাতের খাবারের কী কী তৈরি করলো?
উ : মুলোসহ তোফায়া, কোফতা পোলাও, আস্ত মুরগি রোস্ট।
প্র : শালদহ নামক স্থানটি কোথায় অবস্থিত?
উ : উত্তর আফগানিস্থানে।
প্র : কাবুলে শীতকালের অবস্থা কেমন হয়?
উ : বরফের তলায় রাস্তা ঢাকা পড়ে যায়, মাঠ পথ পাহাড়, নদী গাছপালা সব ঢাকা পড়ে যায়, ক্ষেতে-খামারে কাজ বন্ধ থাকে, কোনো কাজকর্ম নেই, বাড়ি থেকে বেরোনো যায় না।
প্র : আবদুর রহমানকে লেখক নরদানব বলেছেন কেন?
উ : শারীরিক গঠনের জন্য।
প্র : আবদুর রহমানের চরিত্রের মধ্যে লেখক কী খুঁজে পেয়েছেন?
উ : সরলতা, স্বদেশপ্রেম, অতিথিপরায়ণতা।
প্র : 'প্রবাস বন্ধু' রচনার লেখকের কী অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়?
উ : বাংলাদেশের নিকট-প্রতিবেশী দেশ আফগানিস্থান ভ্রমণের আংশিক অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়।
প্র : 'প্রবাস বন্ধু' রচনা কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে?
উ : সৈয়দ মুজতবা আলীর 'দেশ-বিদেশ' গ্রন্থের পঞ্চদশ অংশ থেকে।

সৈয়দ শামসুল হক

প্র : সৈয়দ শামসুল হক কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৯৩৫ সালের ২৭শে ডিসেম্বর; কুড়িগ্রামে।
প্র : তিনি মূলত কী হিসেবে পরিচিত?
উ : লেখক।
প্র : তাঁকে কী সব্যসাচী লেখক বলা যায়?
উ : বাংলা সাহিত্যে সব্যসাচী লেখক বলতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বোঝায়। কারণ তিনি সাহিত্য ও শিল্পের সমস্ত ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। আধুনিক যুগে বুদ্ধদেব বসুকেও সব্যসাচী লেখক বলা চলে।

যদিও তিনি রবীন্দ্রনাথের মতো সাহিত্যের সবদিকে অবদান রাখতে পারেন নি। সৈয়দ শামসুল হক তাঁদের মতোই অবশ্যই সব্যসাচী লেখক এবং ইতিহাস ক্ষেত্রে তাঁর কয়েকজন অনুসারীও রয়েছে। নিজেও চেষ্টা করছেন। আসল কথা, তাঁর প্রথম শিক্ষকের গ্রন্থগুলো সৈয়দ শামসুল হকেরই সহোদরের লক্ষ্মীবাজারস্থ সবসাচী প্রকাশনী থেকে প্রকাশ পায়। এরপর থেকে সৈয়দ শামসুল হক গল্প, কবিতা, উপন্যাসের সঙ্গে বাংলা সিনেমার জন্য চিত্রনাট্যও লিখছিলেন।

প্র : তাঁর কথাসাহিত্যে যৌনতার অভিযোগ কী সত্য?
উ : তিনি কথাসাহিত্যে চরম যৌনতা আমদানি করেছেন। ষাটের ও সত্তরের দশকে যখন বাংলাদেশের বাংলা কথাসাহিত্যে যৌনতা ছিল খুবই লজ্জার ও অপমানের বিষয়, সে সময়ই তিনি বহু যৌনগন্ধী কাহিনি লেখেন। তাঁর 'খেলারাম খেলে যা' উপন্যাসকে 'পিন-আপ-নভেল' বলা হয়। হুমায়ুন আজাদ এ ধরনের উপন্যাসকে 'অপন্যাস' বলেছেন।

প্র : তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : **কবিতা :** একদা এক রাজ্যে (১৯৬১), বৈশাখে রচিত পঙ্‌ক্তিমালা (১৯৭০), পরানের গহীন ভিতর (১৯৮০), বেজল শহরের জন্য কোরাস (১৯৮৯), কানে কাননে তোমারই সন্ধানে (১৯৯০), আমি জন্মগ্রহণ করিনি (১৯৯০) ইত্যাদি।
কাব্যনাট্য : পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় (১৯৭৬), নুরুলদীনের সারা জীবন (১৯৮২), এখানে এখন (১৯৮৮)।
প্রবন্ধ : হৃৎকলমের টানে (১৯৯১)।
গল্প: তাস (১৯৫৪), শীত বিকেল (১৯৫৯), আনন্দের মৃত্যু (১৯৬৭), প্রাচীন বংশের নিঃস্ব সন্তান (১৯৮২), জলেশ্বরীর গল্পগুলো (১৯৯০)।
উপন্যাস : এক মহিলার ছবি (১৯৫৯), অনুপম দিন (১৯৬২), সীমানা ছাড়িয়ে (১৯৬৪), খেলারাম খেলে যা (১৯৭৯), নীল দংশন (১৯৮১), স্তব্ধতার অনুবাদ

(১৯৮৭), সৃষ্টি ও বিশ্লোটীগণ (১৯৮৯), প্রেমে (১৯৮৯), তুমি সেই তরবারী (১৯৯১), অন্য এক আলিখান, এক মুঠো রোদ্দুর, আলোর জন্য, রাজার পুতুরী।
নাটক : আওয়াজ পাওয়া যায়'
কাব্যনাটোর পরিচয় দাও।
সৈয়দ শামসুল হক রচিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কাব্যনাট্য 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়'।এটি রচিত হয়েছে ১লা মে থেকে ১৩ই জুন, ১৯৭৫; লন্ডনের হ্যাম্পস্টেড শহরে, আর প্রকাশ পেয়েছে ১৯৭৬ সালে। এর কাহিনিতে আছে: তখন ১৯৭১ সাল, চারদিকে মুক্তিযুদ্ধ; উদ্বেগ আর উত্তেজনা ছোট-বড় সবার মধ্যে। একদিকে গ্রামের নারী-পুরুষ এসেছেন মাতব্বরের কাছে। তাদের চোখে-মুখে উৎকণ্ঠা। গত রাতেও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন তার সঙ্গে দেখা করেছে জানিয়ে সবাইকে আশ্বাস দেয় মাতব্বর। সে পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর ভরসা রাখতে বলে সবাইকে। গ্রামবাসীরা সহজ-সরল, কিন্তু তারা আশ্বস্ত হতে পারে না মাতব্বরের কথায়। যুদ্ধে অংশ নেবার ইচ্ছে জাগে কারো কারো, তবে তা প্রকাশ করে না। এভাবে নানা ঘটনার ঘনঘটায় এগিয়ে যায় নাটকের কাহিনি। একসময় ঘর থেকে বের হয় মাতব্বরের মেয়ে। সবার সামনে সে বলে, পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন দেখা করতে আসে নি, বাবা জোর করে তাকে ঐ রাতে ক্যাপ্টেনের হাতে তুলে দিয়েছিল। পরে সেই বীরাঙ্গনা আত্মাহুতি দেয়। অবশ্য নিস্তার মেলে নি রাজাকার মাতব্বরের। নিজের পাইকের হাতেই নির্মমভাবে মারা পড়ে সে। এ সময় পাইক বলেন: 'আপনার কোনো ইমান ছিল না।' কাব্যনাট্যের চরিত্রগুলো হচ্ছে: মাতব্বর,' পির সাহেব, মাতব্বরের মেয়ে, পাইক, গ্রামবাসী, তরুণদল ও মুক্তিযোদ্ধারা। নাটকটিতে কোনো দৃশ্য-বিভাজন নেই। নাটকটির কোনো খণ্ড খণ্ড বিষয় নয় তারই প্রতীকে একটানা কাহিনি স্রোত বয়ে চলেছে এখানে। গ্রামবাসীর সংলাপ দিয়ে এটির শুরু। এটিও ইঙ্গিতবহ: গণমানুষ দিয়েই মুক্তিযুদ্ধের সূচনা। এ নাটকের গ্রামবাসী গ্রিক নাটকের মতো কোরাসের ভূমিকায় অবতীর্ণ । কাব্যনাট্যটির শেষে সংলাপে আছে: 'আছে দরকার। আছে জরুরি কারণ।[...] মানুষ সড়ক দিয়া মাথা তুইলা যাওয়া এমন সম্ভাবনার মধ্যে যাপনাত

নীলদর্শনও আছে কাব্যনাট্যটিতে আর তাহলো, বাঙালি নারীর প্রতীক বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনীর বিষপানে আত্মাহুতি। নারীর এই যন্ত্রণা নাটকের শরীরে প্রোথিত। এর কারণে পাঠক-দর্শকের হৃদয় দ্রবিত। এই সম্ভাবনা আর যন্ত্রণার মধ্যেই কাব্যনাট্যটির সাফল্য নিহিত আছে।

প্র : 'নূরলদীনের সারাজীবন'-এর পরিচয় দাও।

উ : বাঙালির কাছে প্রায় বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ইতিহাসবিদ সুপ্রকাশ রায় তাঁর 'ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম' পুস্তকে এবং সুধাংশু শাস্ত্র তাঁর 'বাংলার বীর বিদ্রোহী' বইতে এই বীর বিদ্রোহীকে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর নাম নূরুলউদ্দিন। ইতিহাসের অন্ধকার পৃষ্ঠা থেকে নূরুলউদ্দিনের বিস্তারিত পরিচয় খুব একটা উদ্ধার করা যায় না। শুধু এটুকুই জানা যায় যে, তিনিই প্রথম রংপুরের কৃষকদের সংঘবদ্ধ করেছিলেন এবং তিনি তাদের নিয়ে সশস্ত্র বিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ইতিহাসে প্রায় বিস্মৃত এই কৃষকনেতাকে বইয়ের পাতা থেকে কল্পনা মিশিয়ে বাঙালির সামনে নতুন করে তুলে ধরেন সৈয়দ শামসুল হক। তিনি নূরুলউদ্দিনকে আখ্যায়িত করেন নূরলদীন নামে। আর তাঁর নামেই লেখা হয় 'নূরলদীনের সারাজীবন' কাব্যনাট্য (১৯৮২)। সৈয়দ শামসুল হক তাঁর 'নূরলদীনের সারাজীবন' কাব্যনাটকের ভূমিকাতে লিখেছেন: 'ঐতিহাসিক সুপ্রকাশ রায় নামটি লিখেছেন নূরুলউদ্দিন, আমি ব্যবহার করেছি নূরলদীন- রংপুরের সাধারণ মানুষেরা যেমনটি উচ্চারণ করবে।' রংপুরের বুকে নূরুলউদ্দিন যে বিপ্লবের লাল আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, তাকে নির্বাপিত করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে। আর যাকে কেন্দ্র করে এই বিদ্রোহ, সেই শাসককে রংপুর ছেড়ে পালাতে হয়েছিল। জনগণের চূড়ান্ত জয় হয়তো হয় নি সেদিন, কিন্তু এই সাময়িক জয়ও

ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে সগৌরবে। আর সেটাই মূলে যুগে যুগে সাধন এবং প্রেরণা যুগিয়েছে ভবিষ্যতের গণবিদ্রোহ এবং জন-আন্দোলনকে। দেখানে আছে অগ্নিগিরার অমিত আভাস, আছে দেশের মাটির গন্ধের সাথে মিশে থাকা মাতাল এক অনুভূতি, আছে অসীম পূর্ণিমায় রক্তলোলুপ হায়েনার হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য গণনবিদীর কণ্ঠে জেকে ওঠা, একাবে: "সমস্ত নদীর অশ্রু অবশেষে ব্রহ্মপুত্রে মেশে। / নূরলদীনের কথা যেন সারা দেশে। / পাহাড়ী ঢলের মত নেমে এসে সমস্ত ভাসায়। / অভাগা মানুষ যেন জেগে উঠে আবার ও আশায় / যে, আবার নূরলদীন একদিন আসিবে বাংলায়, / আবার নূরলদীন একদিন কাল পূর্ণিমায় / দিবে ডাক, 'জাগো, বাহে, কোনঠে সবায়?" এই নূরলদীন ইতিহাসের মানুষ কিন্তু তাঁর অনেক কিছুই শামসুল হকের কল্পনা। সৈয়দ হক এই কাব্যনাট্যের চরিত্র নিয়ে লিখেছেন: 'ইতিহাস থেকে আমি পেয়েছি নূরলদীন, দয়াশীল ও শুভলাভকে, কল্পনায় আমি নির্মাণ করে নিয়েছি আকাস, আঘিয়া, লিসবেথ, উমসন ও মরিসকে। নূরলদীনের আত্মা ও প্রেরণা আমি ইতিহাসের ভেতর থেকে সংগ্রহ করেছি, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও মানসিক সংকট আমি সম্ভবপরতার ক্ষেত্র থেকে আবিষ্কার করে নিয়েছি।' ১৪টি দৃশ্যে কাব্যনাটকটি রচিত। রংপুরের শহর, হাম ও বনাঞ্চল এর স্থান। এর কাল ১১৮১ বাংলা সন। প্রস্তাবনা সূত্রধর দিয়ে শুরু হয়েছে: 'নিলক্ষা আকাশ নীল, হাজার হাজার তারা ঐ নীলে অগণিত আর।' এই প্রস্তাবনার পর লালকোরাস, নীলকোরাস ও নূরলদীনের কণ্ঠ দিয়ে প্রথম দৃশ্যের সূচনা হয়। পর্যায়ক্রমে নূরলদীনকে সাধারণ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠার ও চরিত্রটি বিকশিত করার নাট্যিক কৌশল গ্রহণ করতে দেখা যায়। পঞ্চম দৃশ্য থেকে কুঠিয়ালদের আবির্ভাব ঘটে নাটকে। ৯ম দৃশ্যে নূরলদীনের পিতৃস্মৃতি পারিবারিক

উপস্থাপিত হয়েছে। নবম দৃশ্যে রোহিনীর সুপারজাইআর মতিস বলেছেন, নূরলদীনকে হিন্দুরাও দেবতার মতো পূজা করে। অথচ সে অনেক মুসলিমের শত্রু। এই দৃশ্যে বিদ্রোহ দমনের কথা শোনা যায়। যুদ্ধের আশঙ্কায় বিচলিত দেখা যায় নূরলদীনের স্ত্রী আঘিয়াকে দশম দৃশ্যে। দ্বাদশ দৃশ্যে ধ্বনি শোনা যায়, 'জয় নবাব নূরলদীন'। ধৈর্য ধরে আন্দোলন করার আহ্বান আসে নেতার কাছ থেকে চতুর্দশ দৃশ্যে। আর রচিত হয় ইতিহাস। যুগে যুগে এ রকম নেতাদের আবির্ভাবের সম্ভাবনা উচ্চকিত হয় সংলাপে। 'এক এ নূরলদীন ঘরি চলি যায়, / হাজার নূরলদীন আসিবে বাংলায়।' এই নূরলদীন বাঙালির জননায়কদের ধারাবাহিক প্রতিনিধি হয়ে ওঠেন।

প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?

উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৬), আলমজি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৯), আলাওল সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৩), একুশে পদক (১৯৮৪) ইত্যাদি।

প্র : তিনি কবে, কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?

উ : ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর, ঢাকায়।

'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : মানুষের জটিল জীবনপ্রবাহ এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ কার সাহিত্যকর্মের মূল প্রবণতা?

উ : সৈয়দ শামসুল হকের।

প্র : নিলক্ষা শব্দের অর্থ কী?

উ : দৃষ্টিসীমা অতিক্রমী। নিলক্ষা আকাশের রং নীল।

প্র : 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে' কোন কাব্যনাটকের অংশ বিশেষ?

উ : নূরলদীনের সারা জীবন।

প্র : নূরলদীন কী বলে ডাক দিয়েছিল?

উ : জাগো, বাহে, কোনঠে সবায়।

প্র : কত সালে নূরলদীনের ডাকে মানুষ জেগে উঠেছিল?

উ : ১১৮৯ বঙ্গাব্দে বা ১৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দে।

প্র : নূরলদীন আবার কবে ডাক দিবেন বলে সকলে মনে করে?

উ : কাল পূর্ণিমায়।

প্র : অভাগা মানুষ কার আশায় জেগে ওঠে?

উ : নূরলদীনের আশায়।

প্র : নূরলদীনের বাড়ি কোথায় ছিল?

উ : রংপুরে।

প্র : কবিতায় জোৎস্নার সাথে কী করে পড়ে?

উ : পূর্ণিত মুখ।

প্র : নূরলদীনের কথা সারা দেশে কিসের ঢলের মতো নেমে আসে?

উ : পাহাড়ি ঢলের মতো।

প্র : এ কবিতায় কত হাজার লোকলাশের কথা বলা হয়েছে?

উ : উনসত্তর হাজার।

প্র : অতীত হঠাৎ কোথায় হানা দেয়?

উ : বন্ধ দরজায়।

প্র : মরা আশ্বিনায় নূরলদীন কিভাবে দেখা দেয়?

উ : দীর্ঘ দেহ নিয়ে।

প্র : কবির দৃষ্টিতে ব্রহ্মপুত্র নদে কী এসে মিশেছে?

উ : সমস্ত নদীর অশ্রু।

প্র : এ কবিতায় বর্ণিত কবির দেহ থেকে রক্ত ঝরে পড়ে কোথায়?

উ : ইতিহাসের পৃষ্ঠায়।

প্র : নূরলদীন কিসের প্রতীক?

উ : প্রতিবাদের।

'আমার পরিচয়' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : কবি বাংলার আলপথ নিয়ে কত বছর ধরে চলেন?

উ : হাজার বছর ধরে চলেন।

প্র : কোমল পলিমাটির ভেতর কবি কিসের চিহ্ন রেখে যান?

উ : চলার চিহ্ন ফেলে রেখে যান।

প্র : কবি কিসের অক্ষরের ভেতর থেকে এসেছেন?

উ : চর্যাপদের অক্ষরের ভেতর থেকে।

প্র : কবি কার ভিতার বহর থেকে এসেছেন?

উ : সওদাগরের ভিতার বহর থেকে।

Scanned with CamScanner

প্র : কবি কোন গ্রাম থেকে এসেছেন?
উ : বৈবর্তের বিদ্রোহী গ্রাম থেকে।
প্র : কবি কোন চিত্রশালার ভেতর থেকে এসেছেন?
উ : পালযুগ নামে চিত্রশালার ভেতর থেকে।
প্র : কবি কোন বিহার থেকে এসেছেন বলে মত প্রকাশ করেছেন?
উ : পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহার থেকে।
প্র : কবি কোন মন্দিরের বেদি থেকে এসেছেন?
উ : জোড়বাংলার।
প্র : কবি কোন মসজিদ থেকে এসেছেন?
উ : বতেশ্রভূমে সোনা মসজিদ।
প্র : কবি কোন সার্বভৌম নেতাদের থেকে এসেছেন?
উ : সার্বভৌম বারো ভুঁইয়া নেতাদের থেকে।
প্র : কবি কোন দীঘি থেকে এসেছেন?
উ : কমলার দীঘি।
প্র : কবি কোন পালা থেকে এসেছেন?
উ : মহুয়ার পালা থেকে।
প্র : কবি কোন গ্রন্থদ্বয় থেকে এসেছেন?
উ : 'গীতাঞ্জলি' ও 'অগ্নি-বীণা' থেকে।
প্র : কবি কোন নেতাদ্বয় থেকে এসেছেন?
উ : ফুলিরাম ও সূর্য সেন।
প্র : কবি কোন চিত্রশিল্পীদ্বয় থেকে এসেছেন?
উ : জয়নুল আবেদিন ও অবন ঠাকুর।
(অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর > অবন ঠাকুর)
প্র : কবি কোন লালপথ থেকে এসেছেন?
উ : রাষ্ট্রভাষার লাল রাজপথ থেকে।
প্র : কবির আগমন কোন বজ্রকণ্ঠ থেকে?
উ : জয়বাংলার বজ্রকণ্ঠ।
প্র : কবির আগমন কোন যুদ্ধ থেকে?
উ : একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ।
প্র : বাঙালি জাতির বীজমন্ত্র কোনটি?
উ : সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।
প্র : কবি কী মুছে দিয়ে সাম্যের ছবি আঁকতে চান?
উ : সব বিভেদের রেখা মুছে দিয়ে।
প্র : চর্যাপদ কী?
উ : বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-ঐতিহ্যের প্রথম নিদর্শন।
প্র : চাঁদ সাগরের কাহিনি কোন কাব্যগ্রন্থে আছে?
উ : মঙ্গলকাব্যে।

প্র : কার শাসনের মধ্য দিয়ে পাল যুগের সূচনা হয়?
উ : ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে রাজা গোপালের শাসনের মধ্য দিয়ে।
প্র : পাল রাজত্ব কত বছর টিকে ছিল?
উ : প্রায় চারশত বছর।
প্র : পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার কোথায় অবস্থিত?
উ : বর্তমানে নওগাঁ জেলার বদলগাছি সদরদীঘি পাহাড়পুর গ্রামে।
প্র : কে পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার আবিষ্কার করেন?
উ : স্যার কানিংহাম।
প্র : রাজা ধর্মপালের রাজত্বকালের বিস্তৃতি কত?
উ : ধর্মপালের রাজত্বকাল ছিল ৭৭৭-৮১০ খ্রিষ্টাব্দ।
প্র : পাহাড়পুর বিহারের অপর নাম কী?
উ : সোমপুর বিহার।
প্র : সোনামসজিদ কোথায় অবস্থিত?
উ : চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলায় অবস্থিত মধ্য সোনামসজিদকে বোঝায়।
প্র : 'দেউল' শব্দের অর্থ কী?
উ : দেবালয়।
প্র : 'কমলার দীঘি' পালাটি কোন গ্রন্থের অন্তর্গত?
উ : মৈমনসিংহ গীতিকার অন্তর্গত।
প্র : 'মহুয়ার পালা' পালাটি কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত?
উ : মৈমনসিংহ গীতিকার অন্তর্গত।
প্র : তিতুমির কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : চব্বিশ পরগনা জেলার হায়দরপুর গ্রামে ১৭৮২ সালে।
প্র : তিতুমিরের পুরো নাম কী?
উ : মীর নিসার আলী।
প্র : তিতুমির কিভাবে শহিদ হন?
উ : ১৮৩১ সালের ১৯শে নভেম্বর ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করে তিনি শহিদ হন।
প্র : হাজি শরিয়তউল্লাহ কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : মাদারীপুর জেলার শিবচর থানার শামাই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
প্র : হাজি শরিয়তউল্লাহর আন্দোলন কী নামে পরিচিত?
উ : ফরায়েজি আন্দোলন নামে পরিচিত।

প্র : হাজি শরিয়তউল্লাহ কিসের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন?
উ : ইংরেজ আমলে করে সকল কৃষকদের শোষণে সোচ্চার হন।
প্র : ফরিদপুর কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ফুলিরাম বসু ১৮৮৯ সালে মেদিনীপুর জেলার মৌলনি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
প্র : ফুলিরাম কাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন?
উ : ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে।
প্র : ফুলিরাম কাকে মারতে চেয়েছিলেন?
উ : অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে গিয়ে ভুলবশত দুইজন ইংরেজ মহিলাকে হত্যা করেন।
প্র : ফুলিরাম কিভাবে মারা যান?
উ : ১১ই আগস্ট, ১৯০৮ এই মহান বিপ্লবীর ফাঁসির আদেশ কার্যকর হয়।
প্র : সূর্য সেন কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : মাস্টার দা সূর্য সেন ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার নোয়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
প্র : সূর্য সেন কাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলন করেন?
উ : ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে।
প্র : সূর্য সেন কত সালে চট্টগ্রামকে ইংরেজমুক্ত করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন?
উ : ১৯৩০ সালে।
প্র : শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন কে ছিলেন?
উ : জয়নুল আবেদিন বাংলাদেশে শিল্পকলা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ, বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী।
প্র : জয়নুল আবেদিন কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৯১৪ সালে কিশোরগঞ্জ জেলার কেন্দুয়া থানায়।
প্র : অবন ঠাকুর কে ছিলেন?
উ : বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রাতা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
প্র : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৯২০ সালে ফরিদপুর জেলার, বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

প্র : 'আমার পরিচয়' কবিতাটি কবির কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?
উ : সৈয়দ শামসুল হকের 'বিশেষ করিয়া মনুষ্য' নামক গ্রন্থ থেকে।
প্র : বাংলার আলপথ দিয়ে হাজার বছর ঢলা কেন?
উ : জাতি হিসেবে বাঙালির জাঁকড়া হাজার বছরেরও আগে। সে সময় অনাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির যে প্রমাণ পাওয়া যায় তা রাজপথনির্ভর বড় ছিল না, ছিল আলপথ সমৃদ্ধ অপেক্ষাকৃত সরু। বাঙালি সেই আলপথ ধরেই আজ রাজপথে এসে পৌঁছেছে।
প্র : হেরোশত নদী কোন?
উ : বাংলা নদীমাতৃক দেশ। অসংখ্য নদী পরিবেষ্টিত হওয়ায় 'হেরোশত নদী' বলা হয়েছে। এটি 'অতিশয়োক্ত অলংকার'।
প্র : জোড়বাংলার মন্দির-বেদি কী?
উ : এটি একটি বিশেষ ধরনের মন্দিরস্থাপত্য। প্রায় ছয়শ বছর আগে মল্লরাজা প্রথম রঘুনাথ সিংহ এই ধরনের মন্দির নির্মাণ করেন। এই মন্দির পরস্পর সংযুক্ত দুটি দোচালা কুটিরের সমন্বয়ে গঠিত বলে একে জোড়-বাংলা মন্দির বলে। মন্দিরগাত্রে 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' থেকে কাহিনি, সামাজিক জীবনযাত্রা, শিকারের দৃশ্য টেরাকোটা অলঙ্করণে সমৃদ্ধ। মন্দির সংযুক্ত আশের মাঝখানে একটি চারচালা ছোট শিখর-ঘর বিদ্যমান। উত্তরবঙ্গের ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুরে চারশ বছরের পুরোনো একটি শিবমন্দির আছে, যা জোড়বাংলা পদ্ধতিতে তৈরি। উল্লেখ্য, লেখক সৈয়দ শামসুল হকের জন্মস্থান কুড়িগ্রাম জেলার অদূরবর্তী হরিপুরের এই মন্দির।
প্র : আউল-বাউল কী?
উ : বাউল বাংলার নিজস্ব দর্শন। 'বাহুকুল' থেকে 'বাউল' শব্দের উদ্ভব। চাঁদবাম ও মাধবী এই দর্শনের প্রবক্তা; বীরচন্দ্র নামের এক বৈষ্ণব একে জনপ্রিয় এবং পরে লালন সাঁই একে লোকপ্রিয় করেন। বাউলগণ এক বিশেষ দর্শনের মানুষ।

Scanned with CamScanner

হিন্দু চৈতন্যদেবের বৈষ্ণববাদ ও মুসলিমদের সুফিবাদের সমন্বয় এই বাউলদের মধ্যে অনেকে পেয়ে থাকেন। এই মতবাদীরা সংসারবিষয়ে 'আওলানো' (এলোমেলো) ভাব পোষণ করেন বলে সংসারীরা অভিযোগ করে তাদের অনেককে আউলও বলেন। তাই আউল-বাউল প্রায় সমার্থক শব্দজোড়ে পরিণত হয়েছে। অনেকে মনে করেন, কর্তাভজা নামের বিশেষ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আউলচাঁদ বা আউলেচাঁদ নামের একজন সাধক। তিনি নদীয়ার উলাগ্রামের মহাদেব দাস নামের এক বারুই পানব্যবসায়ীর গৃহে প্রতিপালিত হন। তার অনুসারীরাই আউল। আউল ও বাউল এই সম্প্রদায় মিলেই আউল-বাউল।

প্র : 'গীতাঞ্জলি' ও 'অগ্নি-বীণা' কী?

উ : 'গীতাঞ্জলি' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত গ্রন্থ। এ গ্রন্থের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন। 'অগ্নি-বীণা' কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। (এ দুটি গ্রন্থ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য: এই বইয়ের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম অংশ।)

প্র : 'শুধাও' কী?

উ : 'জিজ্ঞেস করো'। শুধাও কবিতায় ব্যবহার হয়, গদ্যে নয়। তাই এ ধরনের শব্দকে 'কাব্যভাষা' বলে।

প্র : বীজমন্ত্র কী?

উ : হিন্দুধর্মে মন্ত্র ও বীজমন্ত্র বলে দুটো ধারণা আছে। মন্ত্র প্রকাশ্যে উচ্চারণযোগ্য, অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বা দীর্ঘ। কিন্তু বীজমন্ত্র প্রকাশ্যে উচ্চারণযোগ্য নয় ও হ্রস্ব। বীজমন্ত্রকে প্রাণমন্ত্রও বলা হয়।

প্র : 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'– কার উক্তি?

উ : মধ্যযুগের বাঙালি কবি চণ্ডীদাসের।

প্র : সাম্য কী?

উ : 'সমতা'। সাম্যবাদ একটি রাজনৈতিক মতবাদ। জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্কস এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা।

সোমেন চন্দ

প্র : সোমেন চন্দর জন্মসন কত?

উ : ২৪শে মে, ১৯২০।

প্র : তাঁর জন্মস্থান কোথায়?

উ : বালিয়া গ্রাম, পলাশ, নরসিংদী।

প্র : তাঁর পূর্ণ নাম কী?

উ : সোমেন্দ্র কুমার চন্দ।

প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?

উ : সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ।

প্র : তাঁর অন্য কি পরিচয়?

উ : তিনি ঢাকার প্রগতি লেখক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা।

প্র : তাঁর গ্রন্থসমূহের নাম কী?

উ : সংকেত ও অন্যান্য গল্প (১৯৪৩), বনস্পতি ও অন্যান্য গল্প (১৯৪৪), সোমেন চন্দের গল্পগুচ্ছ (১৯৭৩)।

প্র : সোমেন চন্দের একটি উল্লেখযোগ্য গল্পের নাম লিখ।

উ : ইঁদুর।

প্র : 'ইঁদুর' ছোটগল্পটির পরিচয় দাও।

উ : জীবনের পরতে পরতে যে বাস্তবের অনুশীলন প্রতিনিয়ত আমরা চর্চা করে চলেছি, আমাদের শাণিত বোধ যেখানে আটপৌরে সমাজব্যবস্থার কাছে অসহায় সেখানে একটি ইঁদুরের সংগ্রাম সেই মানুষের বিরুদ্ধে। এরকম পটভূমিকায় সোমেন চন্দের এক অসাধারণ গল্প ইঁদুর বাংলা ছোটগল্পের ধারায় 'ইঁদুর' খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদ জানিয়েছেন, 'ইঁদুর' গল্প পড়েই তিনি কথাসাহিত্য রচনার অনুপ্রেরণা লাভ করেন।

প্র : তাঁর মৃত্যু হয় কিভাবে?

উ : ফ্যাসিবাদ সমর্থকদের হাতে ছুরিকাহত হয়ে তিনি নিহত হন।

প্র : তাঁর মৃত্যুসন কত?

উ : ৮ই মার্চ, ১৯৪২।

স্বর্ণকুমারী দেবী

প্র : স্বর্ণকুমারী দেবীর জন্মসন কবে?

উ : ২৮শে অগস্ট, ১৮৫৫।

Scanned with CamScanner

হাসান আজিজুল হক

প্র : হাসান আজিজুল হক কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১৯৩৯ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি, পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানে।

প্র : তিনি মূলত কী হিসেবে পরিচিত?

উ : কথাসাহিত্যিক।

প্র : তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর নাম কী?

উ : **গল্প :** শীতের অরণ্য (১৯৬৪), আত্মজা ও একটি করবী গাছ (১৯৬৭), জীবন ঘষে আগুন (১৯৭৩), নামহীন গোত্রহীন (১৯৭৫), পাতালে হাসপাতালে (১৯৮১), আমরা অপেক্ষা করছি (১৯৮৯), রোদে যাবো (১৯৯৫)। **উপন্যাস :** বৃত্তায়ন (১৯৯১), শিউলি (২০০৬), আগুনপাখি (২০০৬), সানিত্রী উপাখ্যান (২০১৩)। **প্রবন্ধ:** কথাসাহিত্যের কথকতা (১৯৮১), অপ্রকাশের ভার (১৯৮৮), কথা লেখা কথা (২০০২)। **মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক :** একাত্তর– কয়তলে ছিন্নমাথা। **সম্পাদনা :** অসীমান্তিক (১৯৯৮)।

প্র : 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' গল্পগ্রন্থ সম্পর্কে লেখ।

উ : দেশ বিভাগের ফলে সৃষ্ট ব্যক্তিচরিত্রের নৈতিক স্খলন সাম্প্রদায়িকতা এবং সংশ্লিষ্ট কারণে সৃষ্ট চরম হতাশা ও দারিদ্র্য, উত্তেজক পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে রচিত হয় আত্মজা ও একটি করবী গাছ, পরবাসী, সারাদুপুর, অন্তর্গত নিষাদ, মারী, উটপাখি, সুখের সন্ধানে, আমৃত্যু আজীবন এই আটটি গল্প। হাসান আজিজুল হকের এই আটটি গল্পের সমাহারে সমৃদ্ধ 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' গ্রন্থটি। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬৭ সালে। বাংলাদেশের বাংলা ছোটগল্পের ধারায় এই গল্পগ্রন্থটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্র : 'আমরা অপেক্ষা করছি' গল্পগ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : হাসান আজিজুল হক রচিত 'আমরা অপেক্ষা করছি' গ্রন্থটি মিনি মাগনার, চুমকুড়ি হাওয়া নেই, মাটির তলার মাটি, সমুখে শান্তি পারাবার, পাব্লিক সার্ভেন্ট, অচিন পাখি- এই কয়েকটি গল্প নিয়ে

প্রকাশিত হয় ১৯৮৯ সালে। [illegible]
জীবনের ছিন্ন, দারিদ্র্যের কষাঘাতে [illegible]
নর-নারীর [illegible]
ছোবলে সন্ধানহারা [illegible]
বিষয় গল্পগুলোতে [illegible]

প্র : 'আগুনপাখি' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : 'আগুনপাখি' হাসান আজিজুল [illegible]
পৈতৃক নিবাস বর্ধমানের একটি [illegible]
অঞ্চলকে কেন্দ্র করে গড়ে [illegible]
এলাকার মানুষের সংগ্রামী জীবন [illegible]
নিভেদকামী রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িকতার [illegible]
যথাযথ রূপায়ণ। এর মধ্য দিয়েই লেখক [illegible]
জীবনের নেতিবাচকতা পরিহার করে [illegible]
ইতিবাচকতার সন্ধান করেছেন। [illegible]
উপন্যাসটিতে প্রধানত চারিত্র-নাম নেই, [illegible]
তবে সব চরিত্রই বোঝা যায়। এগুলো [illegible]
ত্রিমাত্রিক এবং দ্বন্দ্বসংকুল। মেঘ বহু [illegible]
চরিত্রটি উপন্যাসের মূল এবং সমস্ত [illegible]
প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সুসংবদ্ধতার প্রতীকে [illegible]
পরিণত।

প্র : হাসান আজিজুল হকের 'সাবিত্রী উপাখ্যান' উপন্যাসে কী আছে?

উ : হাসান আজিজুল হকের উপন্যাস 'সাবিত্রী উপাখ্যান' প্রকাশ পায় তাঁর উপন্যাস 'আগুন পাখি'র (২০০৬) সাত বছর পর ২০১৩ সালে। বিশেষ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সমাজমনস্ক উপন্যাস এটি। উপন্যাসটি একটি সত্য ঘটনা অবলম্বন করে লেখা। একটি পত্রিকাকে প্রকাশনা-পর্বে লেখক বলেন: '১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন হয়েছে। ভারতে প্রথম একটি নির্বাচন হচ্ছে। ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি ও জাতীয় কংগ্রেস কোয়ালিশন করার চেষ্টা করেছে। তাদের চেষ্টা সফল হয় নি। ওদিকে জমিদারি ও মহাজনি প্রথা উঠে যাচ্ছে। সমাজে তখন একটি পরিবর্তনের বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া দেখা দিয়েছে। সে সময়ই বীরভূম এলাকায় একটি ঘটনা ঘটে। ব্রাহ্মণবংশীয় এক নারী ধর্ষিতা হয়েছিল। সে ঘটনায় উচ্চ ও নিম্নবর্ণের হিন্দু ও মুসলমানদের নামে মামলা হয়। ঘটনাটি তখন বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে।

[illegible] সময়টির পাশাপাশি সামাজিক, অর্থনৈতিক পটভূমিতে নারীর অবস্থানকে তুলে ধরতে চেয়েছি। একে রাজনৈতিক উপন্যাস বলা যাবে না। অতীত থেকে এই শাশ্বতিককাল অবধি নারীর যে চিরন্তন অবস্থান, উপন্যাসটিতে সে বিষয়ই প্রধান হয়ে এসেছে।'

প্র : 'অসীমান্তিক' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : হাসান আজিজুল হক সম্পাদিত 'অসীমান্তিক' বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৮ সালে। এই গ্রন্থে প্রকাশিত গল্প থেকে উঠে আসে তিনটি অঞ্চলের জীবনের পরিপূর্ণ দিক, যা পাঠকের কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের উৎস। এই অর্থে বইটি অত্যন্ত মূল্যবান। এই গ্রন্থে ওই তিন অঞ্চলের গল্পের সমকালীন ধারাও স্পষ্ট হয়।

প্র: তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?

উ: আদমজি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৭), বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭০), আলাওল পুরস্কার (১৯৮৩), অগ্রণী ব্যাংক পুরস্কার (১৯৮৪), আনন্দ পুরস্কার (২০০৭)।

হাসান হাফিজুর রহমান

প্র: হাসান হাফিজুর রহমানের জন্মসন কত?

উ: ১লা জুন, ১৯৩২।

প্র: তাঁর জন্মস্থান কোথায়?

উ: জামালপুর।

প্র: তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কতটুকু?

উ: ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক (১৯৪৬), আই.এ (১৯৪৮), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. (১৯৫১), বাংলায় এম.এ (১৯৫৫)।

প্র: তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন কেন?

উ: তাঁর সম্পাদনায় ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হয় ভাষা আন্দোলনভিত্তিক প্রথম সাহিত্য [illegible]

[illegible]

প্র : তাঁর সম্পাদনায় [illegible]

উ : [illegible]

প্র : তিনি কী হিসেবে [illegible]

উ : [illegible]

প্র : সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি কীসের [illegible] পরিচয়ে?

উ : [illegible]
মানুষের সমাজে [illegible]

প্র : তাঁর প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম কী?

উ : বিপুল সম্ভব (১৯৬৩)।

প্র : তাঁর প্রকাশিত অন্য গ্রন্থগুলোর নাম কি?

উ : **কবিতা :** আর শব্দাবলি (১৯৬৮), অক্ষর শরৎের মতো (১৯৬৯), সমস্ত উদাস সকাল (১৯৭২), শোকার্ত তরবারি (১৯৮৭)। **প্রবন্ধ :** আধুনিক কবি ও কবিতা (১৯৬৫), মূল্যবোধের জন্য (১৯৭৩), সাহিত্য প্রসঙ্গ (১৯৭৩), আত্মপরিচয় সন্ধান (১৯৭৭)। **গল্প :** আরো কৃতি মৃত্যু (১৯৭০)।

প্র : হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'একুশে ফেব্রুয়ারী' সম্পর্কে লেখ।

উ : ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে বাংলা ভাষার জন্য ঢাকায় যে আন্দোলন করা হয় তার স্মরণে ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে হাসান হাফিজুর রহমান 'একুশে ফেব্রুয়ারী' নামে একটি সংকলন সম্পাদনা করেন। এর প্রকাশক ছিলেন মোহাম্মদ সুলতান। সম্পাদক ও প্রকাশক উভয়েই বামপন্থি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সংকলনে কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, গান, নকশা, ইতিহাস শিরোনামে ৬টি বিভাগে মোট ২২ জন লেখক লিখেছেন। এই সংকলনেই প্রথম প্রকাশিত হয় আবদুল গাফফার চৌধুরী রচিত 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' গানটি। প্রকাশের তিন সপ্তাহের মধ্যে পাকিস্তানের তৎকালীন সরকার সংকলনটি বাজেয়াপ্ত করে।

Scanned with CamScanner

'বাংলা ভাষার জন্মকথা' নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'ভাষা' কিসের মতো জন্ম নেয় না?
উ : প্রাসাদ বা গাছপালার মতো।
প্র : 'এখন আমরা যে বাংলা ভাষা বলি, এক হাজার বছর আগে তা ঠিক এমন ছিল না। এক হাজার বছর পরও ঠিক এমন থাকবে না।'—একথা দিয়ে লেখক কী বুঝিয়েছেন?
উ : বাংলা ভাষা পরিবর্তনশীল, স্থির নয়।
প্র : ভাষার ধর্ম কী?
উ : ভাষার ধর্ম হলো বদলে যাওয়া।
প্র : ভাষার কী মানুষের মুখে মুখে বদলে যায়?
উ : ভাষার ধ্বনি।
প্র : মানুষের মুখে মুখে ভাষার ধ্বনি বদলের সাথে আর কী ঘটে?
উ : বদলে যায় শব্দের, বদল ঘটে অর্থের।
প্র : বাংলা ভাষা কিভাবে জন্মলাভ করেছে?
উ : পূর্ববর্তী ভাষার ধ্বনি-শব্দ-অর্থ বদলে বদলে।
প্র : কোন ভাষার বেশি শব্দ বাংলায় ব্যবহার হয়?
উ : সংস্কৃত ভাষার।
প্র : সংস্কৃত ভাষাকে বাংলা ভাষার জননী বলার কারণ কী ছিল?
উ : যেহেতু বাংলায় অনেক বেশি সংস্কৃত শব্দ আছে, তাই অনেকে মনে করেছেন সংস্কৃত ভাষাই বাংলা ভাষার জননী বা মা। আর বাংলা সংস্কৃত ভাষার দুষ্টু মেয়ে।
প্র : কোন শতকে একদল লোক মনে করেন যে, সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক আসলে দূরের সম্পর্ক?
উ : উনিশ শতকে।
প্র : সংস্কৃত সমাজের কোন শ্রেণির মানুষের ভাষা ছিল?
উ : সমাজের উঁচু শ্রেণির মানুষের ভাষা। তা মুখের ভাষাও ছিল না।
প্র : মানুষেরা সে সময় কোন ভাষায় কথা বলতো?
উ : নানা রকমের প্রাকৃত ভাষায়।
প্র : একদল লোক বাংলা ও প্রাকৃতের সম্পর্ক নিয়ে কী ভাবতো?
উ : সংস্কৃত থেকে নয়, প্রাকৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব।
প্র : মাগধী প্রাকৃতের কোনো পূর্বাঞ্চলীয় রূপ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম— এমত প্রথম কে দেন?
উ : একজন বিদেশি, তাঁর নাম জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন।
প্র : বাংলা ভাষা ও বিকাশের বিস্তৃত ইতিহাস প্রথম কে রচনা করেন?
উ : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
প্র : কোন দুই মহাদেশের বিভিন্ন ভাষার ধ্বনি-শব্দ-বাক্যে গভীর মিল দেখা যায়?
উ : এশিয়া ও ইউরোপের।
প্র : ইউরোপ থেকে পূর্বভারত-বাংলাদেশের ভাষাগুলোর একটি ভাষাবংশের নাম কী দেয়া হয়?
উ : ইন্দো-ইউরোপীয় বা ভারতী-ইউরোপীয় ভাষাবংশ।
প্র : ভারতীয় আর্যভাষা কোন ভাষাবংশের শাখা?
উ : ইন্দো-ইউরোপীয়।
প্র : প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার দৃষ্টান্ত কোথায় পাওয়া যায়?
উ : ঋক বেদে।
প্র : ঋক বেদ কোন সময়ের রচনা?
উ : আনুমানিক ১০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ।
প্র : বেদের শ্লোকগুলো কেমন?
উ : পবিত্র
প্র : বেদ কিভাবে প্রচারিত হয়েছে?
উ : মুখস্থের মাধ্যমে।
প্র : বেদের ভাষা দুর্বোধ্য হবার কারণ কী?
উ : কারণ হাজার হাজার বছর সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে মুখের ভাষা বদলে যায়।
প্র : বেদের ভাষার নাম কী?
উ : বৈদিক ভাষা।
প্র : কারা বৈদিক ভাষা বিধিবদ্ধ করে মানসম্পন্ন করেন?
উ : ব্যাকরণবিদগণ।
প্র : এই ভাষার নাম কী দেয়া হয়?
উ : সংস্কৃত
প্র : সংস্কৃত ভাষা কেমন?
উ : বিধিবদ্ধ, পরিশীলিত, শুদ্ধ ভাষা।
প্র : সংস্কৃত ভাষা কখন বিধিবদ্ধ হয়েছিল?
উ : খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দের আগেই।

2020/5/15 21:22
Scanned with CamScanner

প্র : বিশ্বের কোন্ কোন্ দেশেই আধুনিক আর্যভাষার কয়টি স্তর পাওয়া যায়?
উ : তিনটি
প্র : প্রথম স্তরটির নাম কী?
উ : বৈদিক বা বৈদিক সংস্কৃত।
প্র : বৈদিক ভাষার সময় কাল কত?
উ : খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ অব্দ থেকে ৮০০।
প্র : বৈদিক ভাষার পরের স্তরটি কী?
উ : সংস্কৃত
প্র : বাকরণবিদ পাণিনির হাতে সংস্কৃত ভাষা কখন নিখুঁত রূপ পায়?
উ : খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দের দিকে।
প্র : প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা কাকে বলে?
উ : বৈদিক ও সংস্কৃতকে।
প্র : মধ্যভারতীয় আর্যভাষা কোন কোন ভাষাকে বলে?
উ : প্রাকৃত ভাষাগুলোকে।
প্র : প্রাকৃত ভাষার কথ্য ও লিখিত রূপ কোন সময় পর্যন্ত প্রচলিত থাকে?
উ : খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।
প্র : প্রাকৃত ভাষাগুলোর শেষ স্তরের নাম কী?
উ : অপভ্রংশ
প্র : অপভ্রংশ ভাষা হিসেবে কেমন?
উ : খুব বিকৃত হয়ে যায়।
প্র : বিভিন্ন অপভ্রংশ থেকে উৎপন্ন ভাষাগুলোর নাম কী?
উ : বাংলা, হিন্দি, গুজরাটি, মারাঠি, পাঞ্জাবি।
প্র : পূর্বমাগধী অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব– কে মনে করেন?
উ : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
প্র : একই সূত্রে আর কোন দুটো ভাষার জন্ম?
উ : আসামি ও উড়িয়া।
প্র : মৈথিলি, মাগধী, ভোজপুরিয়া ভাষার সঙ্গে খানিকটা মিল কেন বাংলা ভাষার?
উ : কারণ, মাগধী প্রাকৃতের অন্য দুটি শাখা থেকে এগুলো উৎপন্ন।
প্র : প্রাকৃত বাংলাকে গৌড়ী প্রাকৃত নাম দেন কে?
উ : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্।
প্র : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র মতে, কিভাবে বাংলা ভাষার উৎপত্তি ঘটে?
উ : গৌড়ী প্রাকৃতের পরিবর্তে অবহট্ঠ থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি ঘটে।

হুমায়ুন কবির

প্র : হুমায়ুন কবিরের জন্মসন কত?
উ : ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯০৮।
প্র : তাঁর জন্মস্থান কোথায়?
উ : কোমরপুর গ্রাম, ফরিদপুর।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : লেখক ও রাজনীতিবিদ।
প্র : তাঁর পিতার নাম কী?
উ : খান বাহাদুর কবিরুদ্দিন আহমদ।
প্র : তাঁর গ্রন্থ সমূহের নাম কী?
উ : প্রবন্ধ : ধারাবাহিক (১৯৪০), শরৎ সাহিত্যের মূলতত্ত্ব (১৯৪২), বাংলার কাব্য (১৯৪৫), মার্কসবাদ (১৯৫১), শিক্ষক ও শিক্ষার্থী (১৯৫৭)। কাব্য : স্বপ্নসাধ (১৯২৮), সাথী (১৯৩০), অষ্টাদশী (১৯৩৮)। উপন্যাস : নদী ও নারী (১৯৪৫)।
প্র : তিনি কোন পত্রিকা সম্পাদনা করে স্মরণীয় হয়ে আছেন?
উ : 'চতুরঙ্গ'।
প্র : তাঁর মৃত্যুতারিখ কত?
উ : ১৮ই অগস্ট, ১৯৬৯।

হুমায়ূন আহমেদ

প্র : হুমায়ূন আহমেদ কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলা, বর্তমানে নেত্রকোনার কুতুবপুরে ১৯৪৮ সালের ১৩ই নবেম্বর কৃষ্ণপক্ষের শনিবার রাত ১০-৩০ মিনিটে।
প্র : তাঁর মাতা-পিতার নাম কী?
উ : আয়েশা বেগম ও ফয়জুর রহমান।

প্র : তিনি মূলত কী হিসেবে পরিচিত?
উ : কথাসাহিত্যিক।
প্র : তিনি কোন বিষয়ের উপর পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন?
উ : পদার্থবিজ্ঞানে কোয়ান্টাম।
প্র : তিনি কোথায় কর্মজীবন আরম্ভ করেন?
উ : ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌরবদায়ের সহযোগী পদে কর্মজীবন আরম্ভ করেন। পরে যোগ দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিভাগে।
প্র : তাঁর লেখা প্রথম উপন্যাস কোনটি এবং এটি কত সালে প্রকাশিত হয়?
উ : 'নন্দিত নরকে', ১৯৭২ সনে।
প্র : 'নন্দিত নরকে' ছাড়া তাঁর অপর সাহিত্যকর্ম কোনটি?
উ : 'শঙ্খনীল কারাগার'।
প্র : হুমায়ূন আহমেদ-এর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছায়াছবি কোনটি?
উ : 'আগুনের পরশমণি'।
প্র : 'আগুনের পরশমণি' কয়টি শাখায় জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করে?
উ : আটটি শাখায়।
প্র : 'আগুনের পরশমণি' ছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য ছায়াছবিগুলো কী?
উ : 'শ্রাবণ মেঘের দিন' ও 'দুই দুয়ারী'।
প্র : নজিক ও এন্টি নজিক নিয়ে কাজ করা তাঁর দুটি চরিত্র কী?
উ : মিসির আলী ও হিমু।
প্র : তাঁর প্রকাশিত প্রধান গ্রন্থগুলো কী?
উ : নীল অপরাজিতা, প্রিয়তমেষু, জয়জয়ন্তী, দূরে কোথাও, এই সব দিনরাত্রি, মধুরাক্ষী, মহাপুরুষ, নিশিকাব্য, সম্রাট, দুই দুয়ারী ইত্যাদি।
প্র : তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস কোনগুলো?
উ : নন্দিত নরকে, শঙ্খনীল কারাগার, আগুনের পরশমণি, জোছনা ও জননীর গল্প।
প্র : 'আগুনের পরশমণি' উপন্যাস সম্পর্কে লেখ।
উ : 'আগুনের পরশমণি'তে ঢাকায় গেরিলা অপারেশনের দুঃসাহসিক বর্ণনা,

তাকে গ্রামে আসতে নিষেধ করেন। অনিলের বোন অতীতকে নিজের আশ্রয়ে রেখেছেন বলে তাকে সান্ত্বনা দেন তিনি। এই চিঠি পাবার পর ৭ই জ্যৈষ্ঠ অনিল আর ঘরে লুকিয়ে থাকে না, বেরিয়ে পড়ে গ্রামের উদ্দেশ্যে। পথে বিদেশি সাংবাদিকদের সঙ্গে দেখা হয় এবং সেখানে সে সাক্ষাৎকার দেয়। বলে: দেশের অবস্থা ভালো নয়। এখানে কেউ হাসে না। দেশটা যেন কবরখানা বা শ্মশানে পরিণত হয়েছে। একদিকে রাস্তায় পাকিস্তানি সৈন্যরা চলে, অন্য দিকে সে বিদেশি সাংবাদিকদের এমন সাক্ষাৎকার দেয় যে গ্রামে তার পিতাকে পাকিস্তানি সৈন্যরা হত্যা করেছে। আসলে অনিল বাগচীর ভেতরের মানুষটি জেগে ওঠে, যে ভয় ভরের ঊর্ধ্বে। সে তার অফিসে যায়। এই অফিসের বিহারি বসকে অনিলের পিতা একদিন চিঠিতে জানিয়েছিল যে, তার পুত্রের গুণ হলো সততা, দোষও সততা। এই অফিসে বিহারি বস কোম্পানির লাভক্ষতি নিয়ে চিন্তায় মগ্ন আবার গ্রামে যাবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অনিলের নিরাপত্তার কথাও সে ভেবেছে। অনিল গ্রামে যাবে বলে টাঙ্গাইলের বাসে চেপে বসে। সহযাত্রী পায় আইয়ুব আলী নামের একজনকে, যিনি স্ত্রী ও চার সন্তান নিয়ে শ্যালকের বিয়ে উপলক্ষে টাঙ্গাইলে যাবেন বলে বসে চেপেছেন। আইয়ুব আলী খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝে ফেলেন যে, তার সহযাত্রীটি হিন্দু। তাই আইয়ুব আলী অনিল বাগচীকে পরামর্শ দেন এই বলে যে, অনিল বাগচী যেন নিজের নাম অনিল না বলে মহসীন বলে। বাসে চলতে চলতে আইয়ুব আলী ও তার পরিবারের সঙ্গে অনিল বাগচীর পরিচয় জমে যায়। একদিকে যুদ্ধকালীন ভয়াবহ অবস্থা, আতঙ্কিত অন্যান্য যাত্রী, রাস্তায় নানা রকমের চেকপোস্ট অতিক্রম অন্যদিকে পিতার হত্যা-সংবাদ ও বোনের অন্যের বাড়িতে আশ্রয়ের খবর পেয়ে গ্রামে ফিরবে বলে অনিলের মধ্যে চালা উত্তেজনা- সব মিলিয়ে উপন্যাসটি ভিন্ন মাত্রা পায়। সৃষ্টি করে। এরই মধ্যে অনেক পথ অতিক্রম হয়। অবশেষে একটি চেকপোস্টে গাড়ি থেকে নামতে হয় সবাইকে। নাম-পরিচয় জানতে চাইলে আইয়ুব আলীর পরামর্শ উপেক্ষা করে অনিল তার আসল নামই বলে। কিন্তু জিজ্ঞাসাসূচক জবাবে আওয়ামী লীগের কর্মী নয়, মুক্তিবাহিনীর সদস্যও নয়। আইয়ুব তাকে মুসলিম বলে বাঁচাতে চায়। কিন্তু আত্মীকন সততার ওপর নির্ভরকৃত অনিল নিজের পরিচয় গোপন করে না। পাকবাহিনীর সদস্যরা আইয়ুবকে বাঁচায় কিন্তু অনিলকে হত্যা করে। মৃত্যুর সময় সে নিজের গ্রামকে মনে করে, মনে করে পিতাকে, বোনকে, শৈশবকে, কৈশোরকে আর বাংলার অপরূপ সৌন্দর্যকে। এভাবেই অনিল বাগচীর একদিন সমাপ্ত হয় চিরতরে কিন্তু বাংলাদেশে একদিন উদিত হয় স্বাধীনতার সূর্য।

প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?

উ : লেখক শিবির পুরস্কার (১৯৭৩), মাইকেল মধুসূদন পদক (১৯৮৭), বাচসাস পুরস্কার (১৯৮৮), একুশে পদক (১৯৯৪), শেলটেক পুরস্কার (২০০৭)।

প্র : তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?

উ : ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ২০১২ খ্রিষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই।

'নিয়তি' গল্প থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : হুমায়ুন আহমেদের শৈশবের অদ্ভুত স্বপ্নময় কিছুদিন কোথায় কেটেছে?

উ : জগদলে।

প্র : জগদলে দিনগুলো লেখকের কাছে আনন্দময় ছিল কেন?

উ : কারণ সেখানে কোনো স্কুল ছিল না। তাই কোনো পড়াশোনার যন্ত্রণা নেই। সেজন্য দিনগুলো খুব আনন্দময় ছিল।

প্র : মহারাজার বসতবাড়িটি কোথায় ছিল?

উ : জগদলে।

প্র : মহারাজা বসতবাড়ি ছেড়ে কোথায় গিয়েছিল?

উ : 'মুর্শিদা' (ভারত)। কারণ, ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল মুসলিমদের থাকার জন্য।

প্র : একসময় বাড়িটি কারা দখল নেয়?

উ : পাকিস্তান সরকার।

প্র : লেখকের বাবা মহারাজার রুচি দেখে মুগ্ধ হতো কেন?

উ : কারণ মহারাজার বসতবাড়িতে বিচিত্র রকম বই ছিল।

প্র : আর কোন কারণে লেখকের বাবা মহারাজের প্রশংসা করেছেন?

উ : মহারাজ নিজ বাড়িতে জেনারেটর স্থাপন করে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করেছিলেন, আমন্ত্রণপত্র ও অন্যান্য কাজের জন্য ছোট ছাপাখানা বসিয়েছিলেন বলে।

প্র : জগদলে বিকেলের দিনগুলো লেখকের কাছে রোমাঞ্চকর ছিল কেন?

উ : প্রতিদিন বিকেলে বাবা কাঁধে গুলি ভরা বন্দুক নিয়ে বলতেন– চল বনে বেড়াতে যাই।

প্র : কাঁধে বন্দুক নিতেন কেন?

উ : কারণ, বন থেকে প্রায়ই বাঘ বের হতো।

প্র : জগদল কেন কুখ্যাত ছিল?

উ : কারণ ঐ অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রভাব বেশি ছিল।

প্র : ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক কী ছিল?

উ : বায়োকেমিক ঔষধ আর কুইনাইন।

প্র : লেখক তার তিন ভাইবোন সহ রোদ পায়ে মাখতেন কোথায়?

উ : রাজবাড়ির মন্দিরের চাতালে বসে।

প্র : মহারাজার অবশিষ্ট কুকুরের নাম কী ছিল?

উ : বেঙ্গল টাইগার।

প্র : শাহীন কে?

উ : লেখকের ছোট ভাই

প্র : শাহীন কি দেখে আনন্দ পেল?

উ : সাপ দেখে।

প্র : বেঙ্গল টাইগারের চামড়া কতে পড়ল কেন?

উ : সাপের কামড়ে।

প্র : বেঙ্গল টাইগারকে কে মেরে ফেলল?

উ : লেখকের বাবা বন্দুক নিয়ে গুলি করে মেরে ফেললেন।

প্র : কিশোরবেলার লেখকের কাছে সেলফ পৃথিবীর দ্বিতীয়বার মানুষ আকে মনে হতো?

উ : লেখকের শালাকে। কারণ যে কুকুর তার ছেলেকে বাঁচাল সে কুকুরকে তিনি মেরে ফেললেন।

প্র : 'উচ্চক' কী?

উ : নির্দেশিত জাতীয় একরকম ঘাস।

প্র : নির্দিষ্ট শব্দটি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে?

উ : বর্ণিত কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ 'আমার ছেলেবেলা' থেকে।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্র : হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কত সনে জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১৭ই এপ্রিল ১৮৩৮।

প্র : তাঁর জন্মস্থান কোথায়?

উ : গুলিটা রাজবল্লভ গ্রাম, হুগলি।

প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?

উ : মহাকাব্যের কবি।

প্র : তাঁর পেশা কী ছিল?

উ : আইন ব্যবসা। প্রথমে শ্রীরামপুর, পরে হাওড়ায় মুন্সেফ পদে কর্মসম্পাদন। অবশেষে কিছুকাল স্বাধীনভাবে কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা।

প্র : বাংলা মহাকাব্যের ধারায় তাঁর দান কেমন?

উ : তিনি মহাকাব্যের মধ্য দিয়ে তৎকালীন ইংরেজ শাসিত ভারতীয়দের, বিশেষ করে বাঙালি শিক্ষিত মহলে স্বদেশপ্রেমের উত্তেজনা সৃষ্টি করেন।

Scanned with CamScanner

প্র : মধুসূদনের পরবর্তীকালে সর্বাধিক খ্যাতিমান কবি কে ছিলেন?

উ : হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্র : তাঁর কাব্য গ্রন্থগুলোর নাম কী?

উ : চিন্তাতরঙ্গিণী (১৮৬১),
বীরবাহু (১৮৬৪),
কবিতাবলী (খণ্ড কবিতার সংকলন, ১৮৭০),
আশাকানন (১৮৭৬),
ছায়াময়ী (১৮৮০),
দশমহাবিদ্যা (১৮৮২),
চিত্তবিকাশ (১৮৯৮)।

প্র : হেমচন্দ্র রচিত মহাকাব্যের নাম কী?

উ : বৃত্রসংহার (১ম খণ্ড ১৮৭৫, ২য় খণ্ড ১৮৭৭)।

প্র : 'বৃত্রসংহার' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : 'বৃত্রসংহার' (১৮৭৫-৭৭) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত জনপ্রিয় আখ্যান কাব্য। মহাকাব্য হিসেবে পরিচিত। দুই খণ্ডে (১ম খণ্ড ১-১১ সর্গ, ২য় খণ্ড ১২-১৫ সর্গ) প্রকাশিত হয়। বৃত্রাসুরের স্বর্গজয় ও দধীচির অস্থিনির্মিত বজ্র দ্বারা ইন্দ্রের বৃত্র বধ ও স্বর্গরাজ্য পুনরুদ্ধার এই কাব্যের আখ্যান ভাগ। পৌরাণিক কাহিনির নূতন ব্যাখ্যা ঊনবিংশ শতাব্দীর জীবনজিজ্ঞাসা, অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার ইত্যাদি ব্যাপারে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র অনুসারী। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই কাব্য অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ এ কাব্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

প্র : তাঁর রচিত এবং সমকালে প্রশংসিত খণ্ডকবিতাগুলোর নাম লেখ।

উ : 'জীবন-সঙ্গীত' (লংফেলোর 'The Psalm of life' এর বঙ্গানুবাদ), 'ভারতসঙ্গীত', 'ভারতবিলাপ', 'গঙ্গার উৎপত্তি', 'পদ্মের মৃণাল', ভারত-কাহিনী', 'অশোকতরু', 'কুলীন কন্যাগণের আক্ষেপ' ইত্যাদি।

প্র : হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহৎ কাব্য কি?

উ : হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৯০৩) প্রথম কাব্য 'চিন্তাতরঙ্গিণী' ১৮৬১ সালে প্রকাশিত হয়।

প্র : হেমচন্দ্রের আখ্যান কাব্য কোনটি?

উ : হেমচন্দ্রের আখ্যান কাব্য 'বীরবাহু' ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

প্র : হেমচন্দ্রের অন্যান্য কাহিনি ও বর্ণনাধর্মী কাব্যগুলি কী কী?

উ : হেমচন্দ্রের অন্যান্য কাহিনি ও বর্ণনা ধর্মী কাব্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'আশাকানন' (১৮৭৬), 'ছায়াময়ী' (১৮৮০), 'দশমহাবিদ্যা' (১৮৮২)।

প্র : হেমচন্দ্রের মহাকাব্য কোনটি?

উ : হেমচন্দ্রের মহাকাব্য বৃত্রসংহার (দুই খণ্ডে ১৮৭৫ ও ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত)।

প্র : 'চিন্তাতরঙ্গিণী' কোন্ ঘটনা অবলম্বনে রচিত?

উ : 'চিন্তাতরঙ্গিণী' প্রতিবেশী এক বন্ধুর আত্মহত্যার ঘটনা অবলম্বনে রচিত।

প্র : হেমচন্দ্রের আশাকানন কোন্ জাতীয় কাব্য?

উ : হেমচন্দ্রের 'আশাকানন' রূপক কাব্য, দশটি কল্পনায় কাব্যটি বিন্যস্ত।

প্র : ছায়াময়ী কাব্যটি কার অনুসরণে লেখা?

উ : 'ছায়াময়ী' কাব্যটি দান্তের ডিভাইন কমেডিয়ার অনুসরণে লেখা।

প্র : হেমচন্দ্রের দশমহাবিদ্যা কাব্যটি বিখ্যাত কেন?

উ : কবি 'তন্ত্রসারে' গ্রন্থে উদ্ধৃত ধ্যানমন্ত্র থেকে কালী, তারা, ষোড়শী, ছিন্নমস্তা প্রমুখ দেবীর রূপমূর্তি গ্রহণ করলেও তিনি দেবীর দশটি রূপের মধ্যে মানব সভ্যতার দশটি রূপের মধ্যে মানব সভ্যতার দশটি বিভিন্ন স্তরের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন।

প্র : তাঁর মৃত্যু তারিখ কত?

উ : ২৪শে মে, ১৯০৩।

বাংলা ভাষার সাহিত্যিকদের ছদ্মনাম

প্রকৃত নাম	ছদ্মনাম / লেখক-নাম
নীহারিকা দেবী	
অনুপমা দেবী	
প্রভাশংকর রায়	
অবদুর রেজা	
মুহম্মদ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ	শহীদুল্লা কায়সার
প্রবুদ্ধ ফজল	শমসের উল আজান
গাজী হোসেন মিয়া	আবুল হাসান
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	বসাচিৎ উপসুক্ত ভাইপো
এম. ওবায়দুল্লাহ	আসকার ইবনে শাইখ
রাজেম আল কোরেশী	কায়কোবাদ
কাজী নজরুল ইসলাম	নূফ: নুরুল ইসলাম। (এটি কাজী নজরুলের ঠিক সে অর্থে ছদ্মনাম নয়, তবে নজরুল 'বাঁধন-হারা' উপন্যাস এবং দু-একটি আত্মজৈবনিক রচনায় এই নাম ব্যবহার করেছেন।)
কালিকানন্দ	অবধূত
কালীপ্রসন্ন সিংহ	হুতোম পেঁচা
কামিনী রায়	জনৈক বঙ্গমহিলা
রাকৃতচন্দ্র চক্রবর্তী	জরাসন্ধ
জসীমউদ্‌দীন	জসীমউদ্দীন মোল্লা
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	হাবু শর্মা
দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার	দৃষ্টিহীন
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	সুনন্দ
নীহাররঞ্জন গুপ্ত	দাদাভাই; বাণভট্ট
প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	নলিক বন্দ্যোপাধ্যায়

Scanned with CamScanner

প্রমথ চৌধুরী
হেমেন্দ্র মিত্র
প্যারীচাঁদ মিত্র

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
বিমল ঘোষ
বিমল মিত্র

মইনুদ্দিন আহমেদ
মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়
মণীশ ঘটক
মানিকজ্ঞানান
মধুসূদন মজুমদার
মহাশ্বেতা দেবী
মাইকেল মধুসূদন দত্ত
মীর মশাররফ হোসেন
মোহাম্মদ জাহিরুল্লাহ
মোহিতলাল মজুমদার
মোঃ শহীদুল হক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রাজশেখর বসু
রোকনুজ্জামান খান

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শম্ভু মিত্র
শেখ আজিজুর রহমান

সতীনাথ ভাদুড়ী
সমরেশ বসু
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
সুভাষ মুখোপাধ্যায়
সোমেন চন্দ
সৈয়দ মুজতবা আলী

হরিনাথ মজুমদার

ধীরবল
কৃত্তিবাস ভদ্র; লেখরাজ সামন্ত
টেকচাঁদ ঠাকুর

কমলাকান্ত
বনফুল

যাযাবর
কুচিৎ প্রৌঢ়
মৌমাছি
জাবালি

সেলিম আল দীন
শংকর
যুবনাশ্ব
হায়াৎ মামুদ
দৃষ্টিহীন
সুমিত্রা দেবী
এ নেটিভ
গৌড়তটবাসী মশা; উদাসীন পথিক; গান্ধী শিং
জহির রায়হান
কৃত্তিবাস ওঝা; সত্যসুন্দর দাস
শহীদুল জহির

ভানুসিংহ ঠাকুর
পরশুরাম
দাদাভাই

অনিলা দেবী
প্রসাদ দত্ত; শ্রী সঞ্জীব; সুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
শওকত ওসমান

চিত্রগুপ্ত
কালকূট
নীল উপাধ্যায়; নীল লোহিত; সনাতন পাঠক
সুবচনী
ইন্দ্রকুমার সোম
প্রিয়দর্শী; ওমর খৈয়াম; মুসাফির; সত্য পীর

কাঙাল হরিনাথ

বাংলা পত্র-পত্রিকা

পৃথিবীর প্রথম সংবাদপত্র ১৫৬০ খ্রিষ্টাব্দে জার্মান থেকে প্রকাশিত হয়। ১৭০২ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ড থেকে বের হয় বিশ্বের প্রথম দৈনিক পত্রিকা। ভারতের প্রথম সংবাদপত্র ইংরেজি ভাষায় কলকাতা থেকে ১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারি প্রকাশিত হয়। নাম : বেঙ্গল গেজেট; সম্পাদক : জেমস অগাস্টাস হিকি। এরপর কলকাতা থেকে 'ক্যালকাটা গেজেট' (ফেব্রুয়ারি, ১৭৮৪)সহ মদ্রাজ, বোম্বে ইত্যাদি স্থান থেকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন ভারতে ব্রিটিশ সরকার ১৭৯৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রথমে মদ্রাজ, পরে অন্যান্য স্থানে পত্র-পত্রিকায় প্রথম সেন্সর প্রথা চালু করে।

বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাসে ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দ খুবই উল্লেখযোগ্য। কারণ এ বছর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এগুলো হলো: 'দিগ্দর্শন', 'সমাচার দর্পণ', 'বাঙ্গাল গেজেট'। হুগলি জেলার শ্রীরামপুরের খ্রিষ্টান মিশনারিরা সেখান থেকেই ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে দিগ্দর্শন নামে একটি বাংলা মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে। এর সম্পাদক ছিলেন : জন ক্লার্ক মার্শম্যান। এই পত্রিকায় ধর্মীয় নানা নীতিকথা ও উপদেশ প্রকাশ হতো। এর মাস খানেকের মধ্যেই খ্রিষ্টান মিশনারিরা সমাচার দর্পণ নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করে। এর সম্পাদনার দায়িত্বও দেয়া হয় জন ক্লার্ক মার্শম্যানকে। 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশের সামান্য আগে বা পরে (মতান্তর আছে) রামমোহন রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় বাঙ্গাল গেজেট নামে সার্বিক অর্থেই একটি বাংলা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি সাপ্তাহিক ছিল। আর একটি তথ্য, এই পত্রিকা বাংলা ও বাঙালিদের তো বটেই, কোনো ভারতীয় ভাষায়, ভারতীয়দের সম্পাদনায় ও পরিচালনায় প্রকাশিত প্রথম পত্রিকার সম্মান দাবি করে। অবশ্য পত্রিকাটি দীর্ঘস্থায়ী হয় নি এবং এর কোনো নিদর্শনও মেলে নি। সমকালীন ব্যক্তিবর্গের লেখা থেকে পত্রিকা সম্পর্কে সামান্য তথ্যই পাওয়া যায়।

একই বছর ২রা অক্টোবর সিল্ক কটিয়ানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ক্যালকাটা জার্নাল। উল্লেখ্য, ১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দের ১লা মে পত্রিকাটি দৈনিক হিসেবে প্রকাশিত হয় এবং তাও করে ভারতের প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র হবার গৌরব। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত সম্বাদ প্রভাকর (১৮৩৯, জুন ১৪ থেকে দৈনিক হিসেবে প্রকাশ পায়)।

প্র : 'বেঙ্গল গেজেট'-এর পরিচয় দাও।

উ : ১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় ভারতের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র জেমস অগাস্টাস হিকি সম্পাদিত 'বেঙ্গল গেজেট'। পত্রিকাটিতে মূলত বিজ্ঞাপন, বিদেশি ইংরেজি পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি, সংবাদদাতাদের বিবরণধর্মী লেখা ছাপা হতো। 'পোয়েটস্ কর্নার' বলে একটি বিশেষ অংশ ছিল। প্রকাশের প্রথম মাস দশেক কোন রাজনৈতিক বিবাদপূর্ণ লেখা প্রকাশিত হয় নি। পরে প্রশাসনের বিপক্ষে কিছু লেখা বের হলে ১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর ফোর্ট উইলিয়াম থেকে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে ডাকঘর মারফত পত্রিকা বিতরণ বন্ধ করা হয়। পরে হিকি মামলায় জড়িয়ে পড়েন। ১৭৮২ খ্রিষ্টাব্দে হিকির ছাপাখানা আটক ও বিক্রি করে দেওয়া হলে ভারতবর্ষের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্রের অপমৃত্যু ঘটে।

প্র : 'দিগ্দর্শন' পত্রিকার পরিচয় দাও।

উ : ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বাংলা মাসিকপত্র হিসেবে হুগলি জেলার শ্রীরামপুর মিশনারিদের পক্ষ থেকে 'দিগ্দর্শন' প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক ছিলেন জন ক্লার্ক মার্শম্যান। সংবাদ অপেক্ষা ধর্মীয় নীতিকথা ও শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তথ্য পরিবেশনই এখানে প্রাধান্য পেতো। ২৬টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে এই পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। নীতি ও ধর্ম শিক্ষা প্রচার করায় তৎকালীন সরকার এই পত্রিকার উপর সদয় ছিল। সে অর্থে 'দিগ্দর্শন'

2020/5/15 21:
Scanned with CamScanner

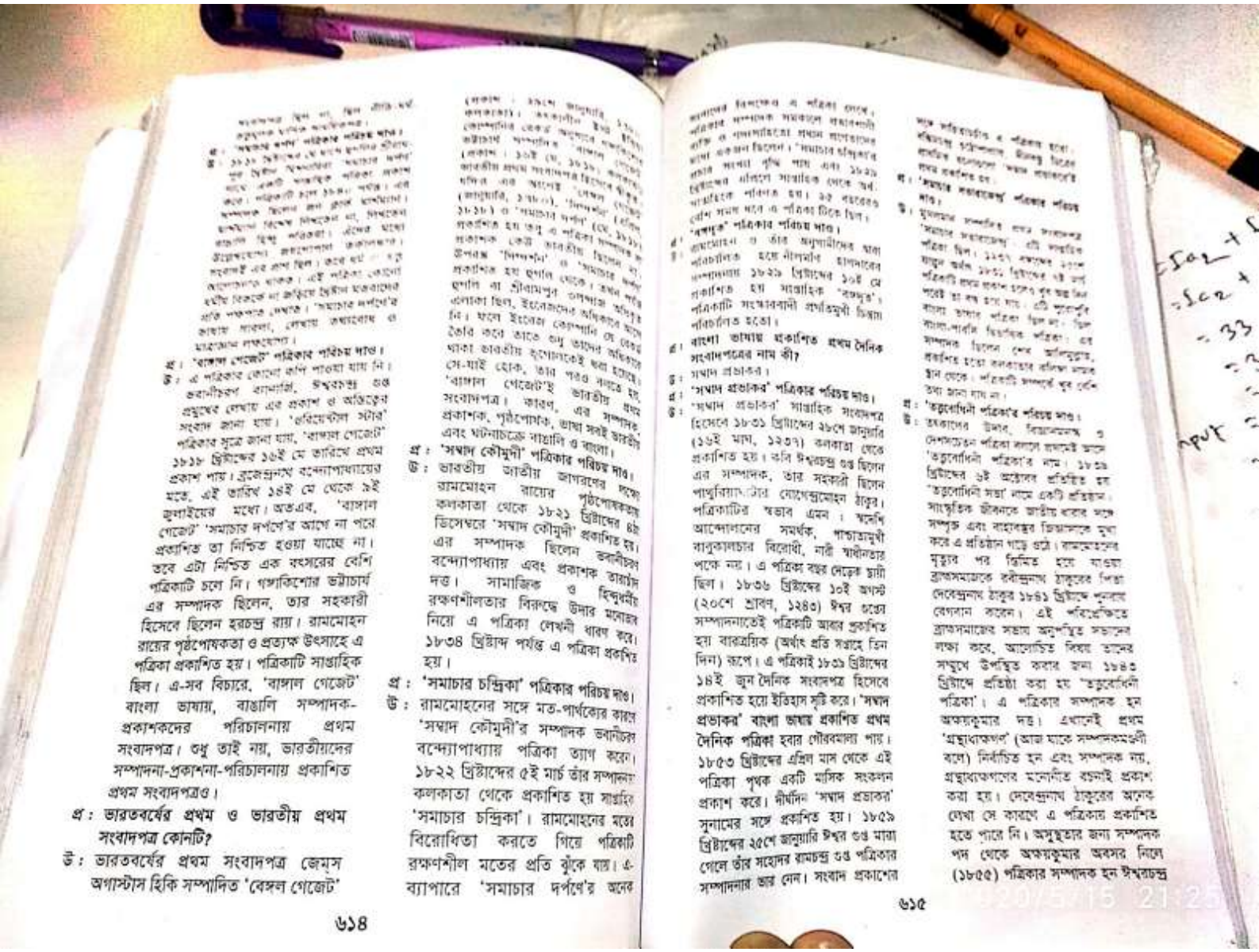

বিদ্যালয়ের। অক্ষয়কুমারের সম্পাদনাকাল (১২ বছর)। পত্রিকার স্বর্ণযুগ। বিজ্ঞান ও শিল্প বিষয়ক আলোচনাই তত্ত্ববোধিনীকে জাতীয় বিষয়ক আলোচনাই তত্ত্ববোধিনীকে

বাঙালি মুসলিমদের মাতৃভাষা সচেতনতা এবং হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ছাপা হয় পত্রিকাটিতে। বিভিন্ন সময়ে 'হিতকরী' টাইপোগ্রাফিতে মুদ্রণায়িত হয় এবং এক বছরের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা থেকে 'হিতকরী'র দ্বিতীয় পর্যায় না পর্যন্ত প্রকাশনা শুরু হবে বলে বিজ্ঞাপনে জানা যায়। তখন নিজস্ব ধারায় নতুন প্রণালীতে পত্রিকাটি নিখুঁত মুসলমানিত্বভাবে বাহির হইবে।' মীর মশাররফ হোসেন ও এস এ এম মহসিন রওশন আলীর যুগ্ম সম্পাদনায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হওয়ার কথা। কিন্তু 'খাঁটি নিখুঁত মুসলমানিত্বভাবে'র পত্রিকাটি পরবর্তীকালে আদৌ প্রকাশিত হয়েছিল কি-না তা আজ জানা যায় না।

প্র : 'সাধনা' পত্রিকার পরিচয় দাও।

উ : ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্র-ভ্রাতুষ্পুত্র সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় 'সাধনা' প্রকাশিত হয়। মূলত ঠাকুরবাড়ি ঘেঁষা লেখকদের দ্বারা পরিচালিত। তবে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এ পত্রিকার প্রাণ। রবীন্দ্র-প্রতিভা বিকাশ ও প্রকাশের ক্ষেত্রে 'সাধনা' পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পত্রিকা প্রকাশের তিন বছর পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে 'সাধনা' পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন।

প্র : 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার পরিচয় দাও।

উ : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে মাসিক 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার মাধ্যমে বাংলা গদ্যের প্রভূত উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে বঙ্কিমচন্দ্র একটি শক্তিশালী লেখকগোষ্ঠী গড়ে তোলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনা করেন। অনেক দিন বিরতির পর পত্রিকাটি এক আবার প্রকাশিত হচ্ছে। প্রকাশ করছে পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা জেলার নৈহাটি থেকে 'বঙ্কিমচন্দ্র রিসার্চ সেন্টার' কর্তৃপক্ষ। বিভিন্ন জন সম্পাদনা করছেন।

প্র : 'সবুজপত্র' পত্রিকার পরিচয় দাও।

উ : ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে মাসিক 'সবুজপত্র' প্রম চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। বাংল

গদ্যরীতির বিকাশে এই পত্রিকার গুরুত্ব অপরিসীম। সাধু গদ্যরীতির বদলে চলিত গদ্যরীতি এই পত্রিকা ব্যবহার ও প্রতিষ্ঠা করে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই পত্রিকায় লেখার সূত্রপাত করেন। প্রমথ চৌধুরীর অনুপ্রেরণায় চলিত গদ্যরীতির আলোচনা এবং পরে তা চর্চা করেন। সাহিত্যজগতে এই পত্রিকা 'সবুজপত্র গোষ্ঠী' তৈরি করতে সক্ষম হয়।

প্র : 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার পরিচয় দাও।

উ : কবি মোজাম্মেল হকের সম্পাদনায় কলকাতা থেকে ১৩২৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ (১৯২০) মাসে মাসিক 'মোসলেম ভারত' প্রকাশিত হয়। প্রথম বছর নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হলেও পরের বছর অনিয়মিতভাবে প্রকাশ হয়। সব মিলিয়ে মাত্র ১৭টি সংখ্যা বেরিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বাণী পত্রিকার প্রতি সংখ্যার সূচনাতে মুদ্রিত হতো। 'মোসলেম ভারত' নজরুলের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশে প্রধান সহায়ক হয়েছে। প্রতি সংখ্যায় নজরুলের একাধিক রচনা এখানে মুদ্রিত হয়। নজরুলের কামাল পাশা, মোহরম, সাত ভাই চম্পা, বিদ্রোহী, বাঁধন-হারা (উপন্যাস, কিস্তিতে) ইত্যাদি নানা ধরনের লেখা এই পত্রিকার পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে।

প্র : 'ধূমকেতু' পত্রিকার পরিচয় দাও।

উ : ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে 'ধূমকেতু' কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন এর সম্পাদক। রবীন্দ্রনাথ পত্রিকার সাফল্য কামনা করে লেখেন। 'আয় চলে আয় রে ধূমকেতু / আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু / দুর্দিনে এই দুর্গশিরে / উড়িয়ে দে তোর বিজয়কেতন।' ব্রিটিশ বিরোধী রচনা এখানে ছাপা হতো। নজরুলের কবিতা 'আনন্দময়ীর আগমনে' এ পত্রিকায় প্রকাশ হলে কবিতা ও পত্রিকা উভয়ই ব্রিটিশ সরকার নিষিদ্ধ করে। এজন্য নজরুলকে এক বছর কারাবাসও করতে হয়।

প্র : 'কল্লোল' পত্রিকার পরিচয় দাও।

উ : ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে আধুনিক লেখকদের সাহিত্যিক মুখপত্র হিসেবে কলকাতা থেকে মাসিক 'কল্লোল' প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক ছিলেন দীনেশরঞ্জন দাশ। রবীন্দ্র-প্রেরণাকে অবিচলে অবিচলে 'কল্লোল' হিসেবে অনুপম সাহিত্যের সুলভ ক্ষেত্রে এ পত্রিকার সূচনা অনিবার্য। সাত বছর ও পত্রিকা টিকে ছিল। সাত বছর ঢেউনা, ইউরোপীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুবচিত্ত, তথা সাহিত্যের প্রভাব এই পত্রিকার লেখকদের উপর কার্যকর ছিল। লেখককুল বয়সে তরুণ, সৃষ্টিতে বৃদ্ধপ্রাণী। অতিবাস্তবের দেশপ্রেম, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সুকুমার রায়, মনিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ ছিলেন এই পত্রিকার নিয়মিত লেখক। পত্রিকাটি কয়েকজন লেখকগোষ্ঠী দ্বারা চালাতে সক্ষম হয়। পরবর্তী তরুণ লেখকদের উপর এই পত্রিকা ও লেখার প্রভাব কম ছিল না।

প্র : 'কালিকলম' পত্রিকার পরিচয় দাও।

উ : কলকাতা থেকে ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে মাসিক 'কালিকলম' সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। যে ঢেউনা ও সাহিত্যবোধ থেকে 'কল্লোল' প্রকাশিত হয়েছিল, 'কালিকলম'ও একই বোধ সম্পন্ন পত্রিকা ছিল। তবে পত্রিকাটি দীর্ঘায়ু হতে পারে নি। 'কল্লোল' ও 'কালিকলমে'র লেখককুল ছিল মূলত একই।

প্র : 'প্রগতি' পত্রিকার পরিচয় দাও।

উ : ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিকপত্র 'প্রগতি'। সম্পাদক ছিলেন বুদ্ধদেব বসু ও অজিতকুমার দত্ত। বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার বাতাস প্রবাহিত হলে ঢাকা যে তাতে শিথিল ছিল না, 'প্রগতি'র প্রকাশ তার প্রমাণ। কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি একই সঙ্গে উল্লেখিত হওয়ার যোগ্য তিনটি নাম। বাংলাদেশে আধুনিক সাহিত্যের বিকাশে এ পত্রিকার অবদান কম নয়।

প্র : 'শিখা' পত্রিকার পরিচয় দাও।

উ : ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'সাহিত্য সমাজ'। পরে সংগঠনটির নামকরণ হয় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'। এ প্রতিষ্ঠানের স্লোগান ছিল : 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।' জ্ঞানের শিখা

020/5/15 21:25

Scanned with CamScanner

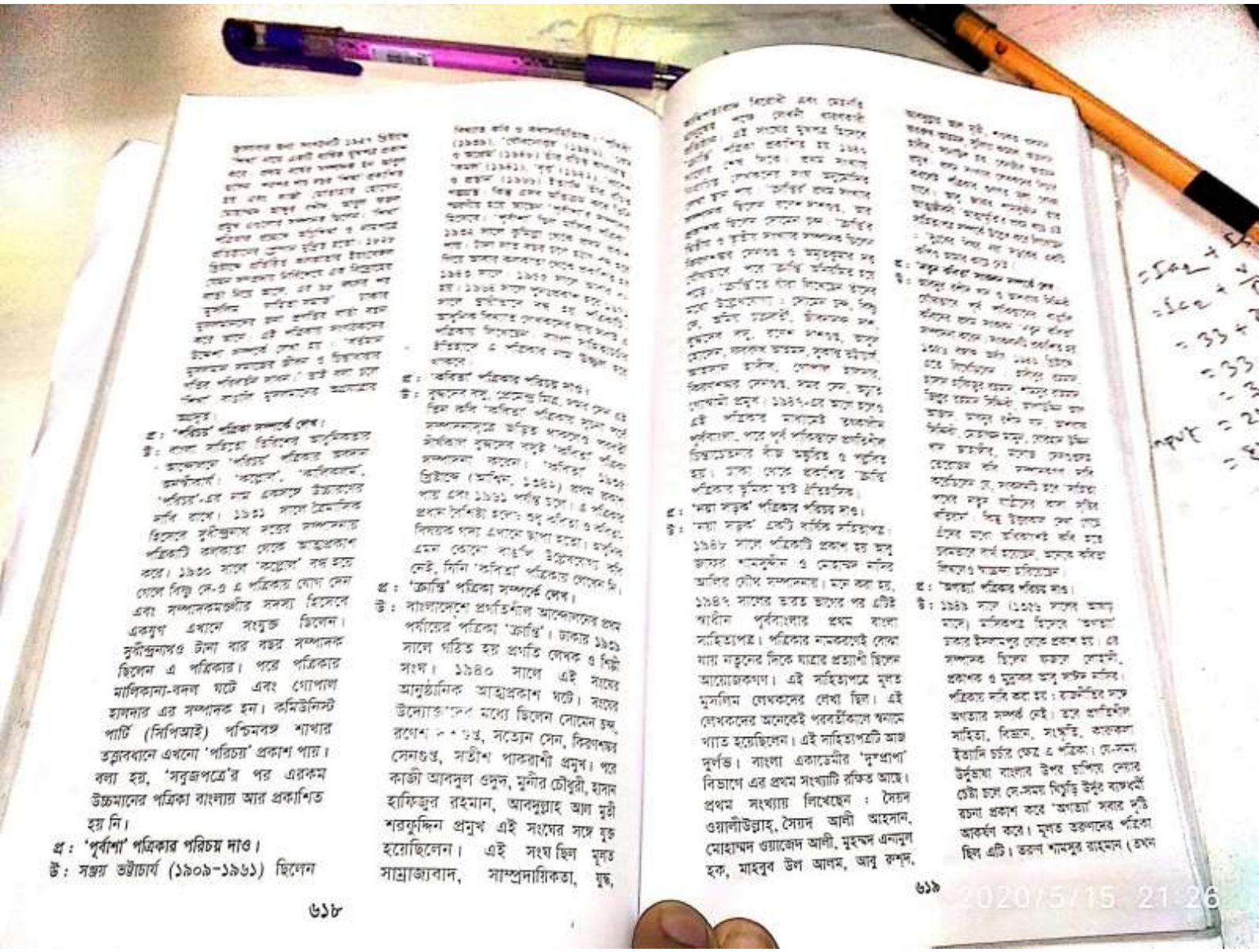

প্র : 'পরিচয়' পত্রিকা সম্পর্কে লেখ।

উ : বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয়ের অনুশীলনের ক্ষেত্রে 'পরিচয়' পত্রিকার অবদান অনস্বীকার্য। 'কালান্তর', 'অগ্নিবীণা', 'পরিচয়'-এর নাম একসূত্রে উচ্চারণের দাবি রাখে। ১৯৩১ সালে ত্রৈমাসিক হিসেবে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনায় পত্রিকাটি কলকাতা থেকে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৩০ সালে 'কল্লোল' বন্ধ হয়ে গেলে বিষ্ণু দে-ও এ পত্রিকায় যোগ দেন এবং সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হিসেবে একযুগ এখানে সংযুক্ত ছিলেন। সুধীন্দ্রনাথও টানা বার বছর সম্পাদক ছিলেন এ পত্রিকার। পরে পত্রিকার মালিকানা-বদল ঘটে এবং গোপাল হালদার এর সম্পাদক হন। কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই) পশ্চিমবঙ্গ শাখার তত্ত্বাবধানে এখনো 'পরিচয়' প্রকাশ পায়। বলা হয়, 'সবুজপত্রে'র পর এরকম উচ্চমানের পত্রিকা বাংলায় আর প্রকাশিত হয় নি।

প্র : 'পূর্বাশা' পত্রিকার পরিচয় দাও।

উ : সঞ্জয় ভট্টাচার্য (১৯০৯-১৯৬১) ছিলেন

প্র : 'কবিতা' পত্রিকার পরিচয় দাও।

উ : বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমর সেন এই ত্রিয়া কবি 'কবিতা' পত্রিকার সূচনা পর্বে সম্পাদনামণ্ডলে অন্তর্ভুক্ত থাকলেও পরবর্তী সংকটকাল বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। 'কবিতা' ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে (আশ্বিন, ১৩৪২) প্রথম প্রকাশ পায় এবং ১৯৬১ পর্যন্ত চলে। এ পত্রিকার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো: শুধু কবিতা ও কবিতা-বিষয়ক গদ্য এখানে ছাপা হতো। চতুর্থদশ এমন কোনো বাঙালি ইন্টেলেকচুয়াল কবি নেই, যিনি 'কবিতা' পত্রিকায় লেখেন নি।

প্র : 'ক্রান্তি' পত্রিকা সম্পর্কে লেখ।

উ : বাংলাদেশে প্রগতিশীল আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের পত্রিকা 'ক্রান্তি'। ঢাকায় ১৯৪১ সালে গঠিত হয় প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ। ১৯৪৩ সালে এই সংঘের আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ ঘটে। সংঘের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন সোমেন চন্দ, রণেশ দাশগুপ্ত, সত্যেন সেন, বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত, সতীশ পাকড়াশী প্রমুখ। পরে কাজী আবদুল ওদুদ, মুনীর চৌধুরী, হাসান হাফিজুর রহমান, আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দিন প্রমুখ এই সংঘের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। এই সংঘ ছিল মূলত সাম্রাজ্যবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, যুদ্ধ,

প্র : 'নতুন কলম' পত্রিকার পরিচয় দাও।

উ : 'নতুন সড়ক' একটি বার্ষিক সংকলনগ্রন্থ। ১৯৪৮ সালে পত্রিকাটি প্রকাশ হয় অনু জাফর, শামসুদ্দিন ও মোহাম্মদ মনির আলির যৌথ সম্পাদনায়। মনে করা হয়, ১৯৪৭ সালের ভারত ভাগের পর এটিই স্বাধীন পূর্ববাংলার প্রথম বাংলা সাহিত্যপত্র। পত্রিকার নামকরণেই যেন নায়া সড়কের দিকে যাত্রার প্রত্যাশী ছিলেন আয়োজকগণ। এই সাহিত্যপত্রে মূলত মুসলিম লেখকদের লেখা ছিল। এই লেখকদের অনেকেই পরবর্তীকালে খ্যাতনামা খ্যাত হয়েছিলেন। এই সাহিত্যপত্রটি আজ দুর্লভ। বাংলা একাডেমীর 'দুষ্প্রাপ্য' বিভাগে এর প্রথম সংখ্যাটি রক্ষিত আছে। প্রথম সংখ্যায় লিখেছেন : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, সৈয়দ আলী আহসান, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, মুহম্মদ এনামুল হক, মাহবুব উল আলম, আবু রুশদ,

প্র : 'সবুজ বাংলা' সাময়িকী সম্পর্কে লেখ।

উ : আবদুল হকের কথা ও আবদুল মতিনের সৌজন্যে এর সম্পাদনায় পত্রিকার প্রথম সংখ্যা 'নবারুণ' নামে ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়। ১৯৫৬ সালে 'সবুজ বাংলা' নামে এটি আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৫৭ সালে আবদুল হক ও আবদুল মতিন পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫৮ সালে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৬৫ সালে আবদুল হক ও আবদুল মতিনের সম্পাদনায় পত্রিকাটি আবার প্রকাশ পায়। ১৯৬৬ সালে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৬৭ সালে আবদুল হক ও আবদুল মতিনের সম্পাদনায় পত্রিকাটি আবার প্রকাশ পায়। ১৯৬৮ সালে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৬৯ সালে আবদুল হক ও আবদুল মতিনের সম্পাদনায় পত্রিকাটি আবার প্রকাশ পায়। ১৯৭০ সালে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৭১ সালে আবদুল হক ও আবদুল মতিনের সম্পাদনায় পত্রিকাটি আবার প্রকাশ পায়। ১৯৭২ সালে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৭৩ সালে আবদুল হক ও আবদুল মতিনের সম্পাদনায় পত্রিকাটি আবার প্রকাশ পায়। ১৯৭৪ সালে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৭৫ সালে আবদুল হক ও আবদুল মতিনের সম্পাদনায় পত্রিকাটি আবার প্রকাশ পায়। ১৯৭৬ সালে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৭৭ সালে আবদুল হক ও আবদুল মতিনের সম্পাদনায় পত্রিকাটি আবার প্রকাশ পায়। ১৯৭৮ সালে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৭৯ সালে আবদুল হক ও আবদুল মতিনের সম্পাদনায় পত্রিকাটি আবার প্রকাশ পায়। ১৯৮০ সালে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৮১ সালে আবদুল হক ও আবদুল মতিনের সম্পাদনায় পত্রিকাটি আবার প্রকাশ পায়। ১৯৮২ সালে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৮৩ সালে আবদুল হক ও আবদুল মতিনের সম্পাদনায় পত্রিকাটি আবার প্রকাশ পায়। ১৯৮৪ সালে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৮৫ সালে আবদুল হক ও আবদুল মতিনের সম্পাদনায় পত্রিকাটি আবার প্রকাশ পায়। ১৯৮৬ সালে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৮৭ সালে আবদুল হক ও আবদুল মতিনের সম্পাদনায় পত্রিকাটি আবার প্রকাশ পায়। ১৯৮৮ সালে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৮৯ সালে আবদুল হক ও আবদুল মতিনের সম্পাদনায় পত্রিকাটি আবার প্রকাশ পায়। ১৯৯০ সালে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৯১ সালে আবদুল হক ও আবদুল মতিনের সম্পাদনায় পত্রিকাটি আবার প্রকাশ পায়। ১৯৯২ সালে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৯৩ সালে আবদুল হক ও আবদুল মতিনের সম্পাদনায় পত্রিকাটি আবার প্রকাশ পায়। ১৯৯৪ সালে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৯৫ সালে আবদুল হক ও আবদুল মতিনের সম্পাদনায় পত্রিকাটি আবার প্রকাশ পায়। ১৯৯৬ সালে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৯৭ সালে আবদুল হক ও আবদুল মতিনের সম্পাদনায় পত্রিকাটি আবার প্রকাশ পায়। ১৯৯৮ সালে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৯৯ সালে আবদুল হক ও আবদুল মতিনের সম্পাদনায় পত্রিকাটি আবার প্রকাশ পায়। ২০০০ সালে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

প্র : 'জাগরণ' পত্রিকার পরিচয় দাও।

উ : ১৯৪৯ সালে (১৩৫৬ সনের শ্রাবণ মাসে) মাসিকপত্র হিসেবে 'জাগরণ' ঢাকার ইসলামপুর থেকে প্রকাশ হয়। এর সম্পাদক ছিলেন ফজলে লোহানী, প্রকাশক ও মুদ্রাকর আবু সফিক সরকার। পত্রিকায় লেখা করা হয়: রাজনীতির সঙ্গে জাগরণের সম্পর্ক নেই। তবে প্রগতিশীল সাহিত্য, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, কারুকলা ইত্যাদি চর্চার ক্ষেত্রে এ পত্রিকা। সে-সময় উর্দুভাষা বাংলার উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা চলে সে-সময় বিশুদ্ধ উর্দুর বাড়াবাড়ি রচনা প্রকাশ করে 'জাগরণ' সরকার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মূলত তরুণদের পত্রিকা ছিল এটি। তরুণ শামসুর রাহমান (তখন

Scanned with CamScanner

প্র : 'পূর্বমেঘ' পত্রিকার পরিচয় দাও।

উ : ঢাকা থেকে দ্বিভাষিক সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশ ও তা টিকিয়ে রাখা যখন কঠিকর ছিল, সে সময়ই রাজশাহি থেকে 'পূর্বমেঘ' (১৯৮০) নামে সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশ হয় এবং এক দশকের বেশি সময় টিকে থাকে। বন্ধাব্দের হিসেবে ১৩৮৭ থেকে ১৩৯৮ পর্যন্ত 'পূর্বমেঘের' আয়ুষ্কাল। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ও মুস্তাফা নূরউল ইসলাম এবং প্রকাশক ছিলেন এ. আর. মল্লিক। উচ্চমার্গীয় সাহিত্যালোচনার পাশাপাশি সৃজনশীল রচনার সমাদর ছিল এ পত্রিকায়। ঢাকা থেকে বেরোলে 'সমকাল' (১৯৫৭) প্রকাশ হচ্ছে, ঠিক সে-কালেই রাজশাহি থেকে 'পূর্বমেঘ' প্রকাশ দেশে সাহিত্যচর্চার ইতিবাচক উত্তরণকে চিহ্নিত করে।

প্র : 'স্বাক্ষর'-এর পরিচয় দাও।

উ : বাংলাদেশের ইতিহাসে উত্তাল ষাটের দশকে যে-কয়েকটি লিটল ম্যাগাজিন ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল, 'স্বাক্ষর' এতলোর একটি। ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে 'স্বাক্ষর'

প্র : 'কণ্ঠস্বর' সম্পর্কে লেখ।

উ : বাংলাদেশের বাংলা সাহিত্যে বিশ শতকের ষাটের দশকে বেশ কটিএটি বিখ্যাত ম্যাগাজিন বা ছোট-কাগজ প্রকাশিত হয়। সাহিত্য ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সূচি করে এর মধ্যে 'কণ্ঠস্বর' অন্যতম। ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে লিটল ম্যাগাজিন হিসেবে প্রকাশিত হলেও পরে তা নিয়মিত সাহিত্যপত্র রূপে এক দশকের বেশি সময় ধরে প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক ছিলেন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রধানত সাহিত্যচর্চা থেকে মুক্তিপ্রয়াসী লেখকদের সমাদর করা হতো এই পত্রিকায়। এ-প্রসঙ্গে 'কণ্ঠস্বরে'র ৩য় সংখ্যায় লেখা হয় : "সাহিত্যকে যারা অনুভব করে চলে শতদলে, শতপথে, বিচ্ছিন্ন যাত্রায়, আদিকের জটিলাক্ষরে, চিত্রল লিপিতে সরণীতে; কাটু স্বাদে ও লোনা স্বাদে সততায় শ্রদ্ধায়, বিশ্বয়ে, অভিভূতিতে পাপে: মহত্ত্বে ও রিরংসায়, উৎকণ্ঠায় আলিঙ্গনে, 'কণ্ঠস্বর' সেই পক্ষপাতবিরল তরুণদের পত্রিকা।'

প্র : নামগুলোর পাশে, প্রকাশকালসহ অবশ্যই উল্লেখযোগ্য পাঁচটি পত্রিকার নাম লেখ :

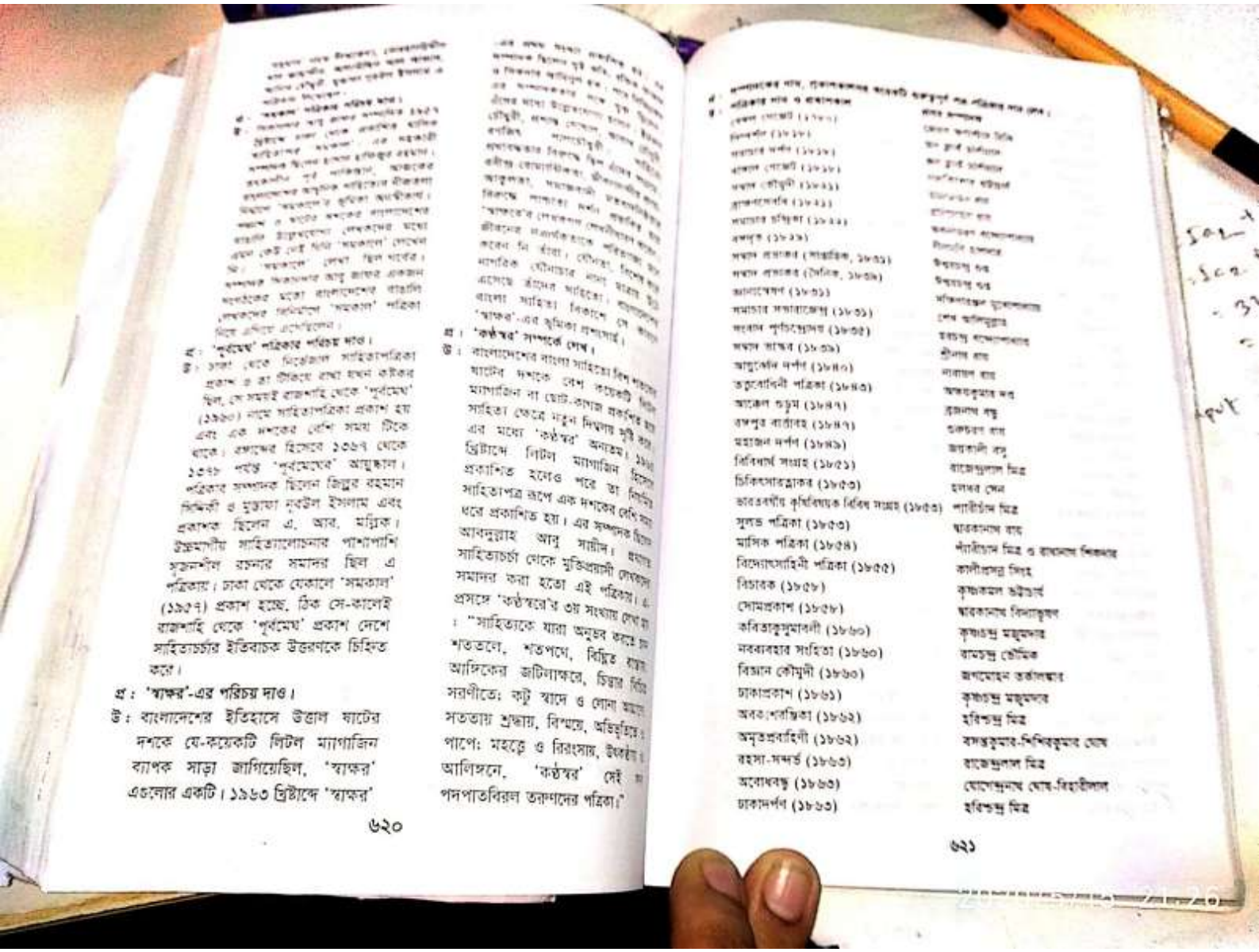

Scanned with CamScanner

বামাবোধিনী পত্রিকা (১৮৬৩)
গ্রামবার্তা প্রকাশিকা (১৮৬৩)
হিতসাধক (১৮৬৮)
অমৃতবাজার (১৮৬৮)
অবলাবান্ধব (১৮৬৯)
মিত্রপ্রকাশ (১৮৭০)
সঙ্গীত চিত্তবিনোদ (১৮৭০)
বঙ্গদর্শন (১৮৭২)
মধ্যস্থ (১৮৭৩)
সাধারণী (১৮৭৩)
আর্যদর্শন (১৮৭৪)
বান্ধব (১৮৭৪)
আজীজন নেহার (১৮৭৪)
ভারতমিহির (১৮৭৫)
চিত্রকর (১৮৭৬)
ভারতী (১৮৭৭)
বীণা (১৮৭৮)
বালকবন্ধু (১৮৭৮)
নিরামিষভোজী বালক (১৮৭৯)
পরিদর্শক (১৮৮০)
বঙ্গবাসী (১৮৮২)
সখা (১৮৮৩)
সঞ্জীবনী (১৮৮৩)
নব্যভারত (১৮৮৩)
পাক প্রণালী (১৮৮৩)
অশ্রুকুত ইন্দ্রজাল (১৮৮৪)
নবজীবন (১৮৮৪)
আলোচনা (১৮৮৪)
প্রচার (১৮৮৪)
আখবারে এসলামীয়া (১৮৮৪)
বালক (১৮৮৫)
আহমদী (১৮৮৬)
অনুসন্ধান (১৮৮৭)
ক্রীড়া ও কৌতুক (১৮৮৮)
সুধাকর (১৮৮৯)
চিত্রদর্শন (১৮৯০)
জন্মভূমি (১৮৯০)
সাহিত্য (১৮৯০)

উমেশচন্দ্র দত্ত
কাঙাল হরিনাথ
শশীভূষণ সরকার
শিশিরকুমার ঘোষ
দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়
হরিশ্চন্দ্র মিত্র
উমাচরণ সেন ও যোগেন্দ্রনাথ বসু
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
মনোমোহন বসু
অক্ষয়চন্দ্র সরকার
যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কালীপ্রসন্ন ঘোষ
মীর মশাররফ হোসেন
অনাথবন্ধু গুহ
প্রতাপচন্দ্র রায়চৌধুরী
দ্বিজেন্দ্রলাল ঠাকুর
রাজকৃষ্ণ রায়
কেশবচন্দ্র সেন
বলরাম লাহিড়ী
বিপিনচন্দ্র পাল
জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়
প্রমদাচরণ সেন
দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়
দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী
বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়
গিরীন্দ্রলাল ঘোষ
অক্ষয়চন্দ্র সরকার
গগনচন্দ্র হোম
রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
মোহাম্মদ নইমুদ্দীন
জ্ঞানদাম্বিনী দেবী
আবুল হামিদ খান ইউসুফজায়ী
দুর্গাদাস লাহিড়ী
শশিশেখরেশ্বর রায়
শেখ আবদুর রহিম
বিহারীলাল রায়
নীরদচন্দ্র বসু ও পঞ্চানন তর্করত্ন
সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

মুকুল (১৮৯০)
হিতকরী (১৮৯১)
সংবাদ (১৮৯১)
ইসলাম প্রচারক (১৮৯১)
দাসী (১৮৯২)
নিহার (১৮৯২)
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (১৮৯৪)
মুকুল (১৮৯৫)
মৌচাক (১৮৯৫)
প্রসূনকী (১৮৯৬)
বীণাবাদিনী (১৮৯৭)
প্রদীপ (১৮৯৭)
কোহিনূর (১৮৯৮)
প্রবাসী (১৯০১)
নবনূর (১৯০৩)
বাসনা (১৯০৮)
মোহাম্মদী (সাপ্তাহিক, ১৯০৮)
মোহাম্মদী (দৈনিক, ১৯২২)
মোহাম্মদী (মাসিক, ১৯২৭)
ভারতবর্ষ (১৯১৩)
গবুজপত্র (১৯১৪)
নারায়ণ (১৯১৪)
আল এসলাম (১৯১৫)
একটা মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা (১৯১৮)
সওগাত (মাসিক, ১৯১৮)
সওগাত (সাপ্তাহিক, ১৯২৮)
আসুর (কিশোর মাসিক, ১৯২০)
মোসলেম ভারত (১৯২০)
নবযুগ (দৈনিক, ১৯২০)
দৈনিক সেবক (১৯২১)
ধূমকেতু (১৯২২)
কল্লোল (১৯২৩)
সাম্যবাদী (১৯২৩)
যুগবাণী (১৯২৪)
লাঙল (১৯২৫)

কালিকলম (১৯২৬)
গণবাণী (১৯২৬)

মীর মশাররফ হোসেন
কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য
মুকুন্দদাস চাতুর
মোঃ রেয়াজুদ্দীন আহমদ
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
শেখ আবদুর রহিম
বজলীকান্ত গুহ
শিবনাথ শাস্ত্রী
গিরিশচন্দ্র ঘোষ
যোগেশচন্দ্র মুস্তফী
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
মহম্মদ রওশন আলী
রামেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সৈয়দ এমদাদ আলী
শেখ ফজলল করিম
মোহাম্মদ আকরম খাঁ
মোহাম্মদ আকরম খাঁ
মোহাম্মদ আকরম খাঁ
জলধর সেন ও অমৃতলাল বিদ্যাভূষণ
প্রমথ চৌধুরী
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ
মোহাম্মদ আকরম খাঁ
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও মোজাম্মেল হক
মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন
মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
মোজাম্মেল হক
কাজী নজরুল ইসলাম ও মুজাফ্ফর আহমদ
মোহাম্মদ আকরম খাঁ
কাজী নজরুল ইসলাম
দীনেশরঞ্জন দাশ
মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী
মকবুল হোসেন চৌধুরী
প্রধান পরিচালক- কাজী নজরুল ইসলাম
সম্পাদক - মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়
প্রেমেন্দ্র মিত্র
মুজাফ্ফর আহমদ (কমরেড)

2020 5/15 21:26

Scanned with CamScanner

দৈনিক ইত্তেফাক (১৯৫৮)
প্রাপ্তি (১৯২৭)
শিখা (১৯২৭)
নওরোজ (১৯২৭)
পরগাম (১৯২৮)
জয়ন্তী (১৯৩০)
পরিচয় (১৯৩১)
পূর্বাশা (১৯৩২)
কবিতা (১৯৩৫)
দৈনিক আজাদ (১৯৩৫)
ক্রান্তি (১৯৪০)
দৈনিক নবযুগ (১৯৪৩)
নয়া সড়ক (১৯৪৮)
প্রগতি (১৯৪৯)
সমকাল (১৯৫৭)
পূর্বমেঘ (১৯৬০)
ফারুক (১৯৬৫)
রঙ্গধর (১৯৬৫)
কালবেলা (১৯৬৫)
স্বদেশ (১৯৬৯)
শিল্পকলা (১৯৭০)

সাজ্জাদুজ্জামান ইমামবাদী
দুখমের বসু ও অজিত দত্ত
আবুল হাসেম
মোহাম্মদ আবদুল-উল হক
অনু মোহাম্মদী
আবদুল কাদির
দুর্গাদাস দত্ত
সন্তোষ গুহঠাকুর
দুখমের বসু
মোহাম্মদ আবদুল হাই
হবেশ সাকদের
কাজী নজরুল ইসলাম
অনু আবদুর শাকুরউদ্দীন ও মোহাম্মদ শহিদ উল্লা
অজাদে মোহাম্মদী
নিকোলাস অনু আবদুর
জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ও দুখমের বসুরই ইংরেজি
ফজিল আজাদ ও নিকোলাস অনুদিত হয়
আবদুল্লাহ অনু সাইদ
জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত
আহমদ ছফা
আবদুল মান্নান সৈয়দ ও আবদুল মৌলিম

৫। বাংলা গানের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে যা জান লেখ।

উ: [illegible]

Scanned with CamScanner

যে ধারাটি আবহমানকাল বাংলা প্রাচীন জনজীবনকে মুগ্ধ করে রেখেছিল তা 'মঙ্গলগীতি'। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শিবমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, কালিকামঙ্গল প্রভৃতি কাব্যগুলি বিভিন্ন কবি তথা গীতিকারের হাতে ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। প্রতিটি মঙ্গলগীতিতেই অজস্র রাগরাগিণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। সেই যুগে শ্রোতাদের আনন্দলাভের একমাত্র উপকরণ ছিল মঙ্গলগীত। এক সন্ধ্যা থেকে শুরু করে মাসাধিককাল কোনো-কোনো মঙ্গলকাব্য গীত হতো। বিজয়গুপ্ত, নারায়ণ দেব, কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী, রূপরাম চক্রবর্তী, ঘনরাম চক্রবর্তী, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র প্রমুখ এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি ও গীতিকার।

প্র : বাংলা গানের ইতিহাসে 'পাঁচালি' ছান লেখ।

উ : আগে মঙ্গলকাব্যগুলোকেই পাঁচালি বা পাঁচালিপ্রবন্ধ বলে অভিহিত করা হতো। পরবর্তীকালে দীর্ঘ আখ্যানমূলক কাব্যই 'পাঁচালি' নামে পরিচিত। 'পাঁচালি' শব্দটি 'পথগাল' শব্দের সঙ্গে সম্পর্কিত। বাংলায় পাঁচালি বলতে আমরা বুঝি দেবমাহাত্ম্যসূচক কাহিনিমূলী গান। বাংলা পাঁচালির শ্রেষ্ঠ কবি দাশরথী রায় (১৮০৬-'৫৬)। ইনি প্রথমে কবিওয়ালাই ছিলেন। তাঁর আগে পাঁচালির নিদর্শন বিশেষ নেই। দাশরথী রায়ের পাঁচালি সাধারণ মানুষের মধ্যে লোকশিক্ষা, সাহিত্যরচনা, সমাজচিন্তা এবং ধর্মবোধ জাগিয়ে তুলেছে। তাঁর পরে পাঁচালির পদ্ধতিতে কিছু পরিবর্তন হয়েছে। দাশরথীর পর পাঁচালিকারদের মধ্যে নাম করেছিলেন ঠাকুরদাস মুখ (১৮০১-'৬৬), রসিক রায় (১৮২০-'৯২), নবমোহন রায় (১৮৩১-'৬৬) প্রমুখ। পাঁচালিতে একজন গায়েন থাকেন। তিনি নায়িকার ভঙ্গিতে আবৃত্তি, ছড়া, গান দ্বারা মূল কাহিনি বিবৃত করেন। এ ধরনের পালায় বেলা, কাঁশি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারও ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দী এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে পাঁচালি গায়ক পায়ে নূপুর পরে, হাতে চামর দুলিয়ে বা ঘুঙুর বাজিয়ে গান উপস্থাপন করতেন।

প্র : 'শাক্তপদাবলি' গানের ইতিহাসে লেখ ভূমিকা লেখ।

উ : শাক্তপদ বা শাক্তগান সাধারণ শ্যামা গান। আগমনী-বিজয়া গানে তার অন্তর্ভুক্ত আকুলতার প্রকাশ পায়। শাক্তগানে বিষয় শ্যামা, কালী বা উমাকে কেন্দ্র করে। এই গানের মূল রস বাৎসল্য ও শান্ত। শাক্ত সাধকদের কাছে মা আরাধ্যা দেবতাও মা, দেবতার কাছে মা কল্পিত। এই পদগুচ্ছিতে ছন্দ বৈচিত্র্য ও অলংকারের আতিশয্য নেই, সেই সঙ্গীত পারিপাট্য। এগানে আছে ভক্তের অন্তরের আকুতি এবং ভক্তের সহজ-সরল আবেদন। এ যেন আলাপের সুর, গেরস্থালির কথা। তাই এত গভীর আবেগ, অনুরাগ, অভিমান আর আত্মনিবেদনে পূর্ণ। শাক্তগীতিকে আনাদে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যায় : ১. ভক্তিরসাত্মক বা তত্ত্বমূলক গান; ২. উমাসংগীত বা আগমনী নিজয়া গান। ভক্তিরসাত্মক বা তত্ত্বমূলক পদগুলি 'ভক্তের আকুতি', 'অপরূপ রূপ' প্রভৃতি পর্যায়ে সন্নিবেশ করা হয়েছে। সেখানে মাতৃপদকে মোক্ষ নিবেদন করে ভক্তেরা তাঁদের হৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন।

প্রথম পর্যায়ে দেবীমূর্তি ভক্তগণের অন্তর আকৃতি জানিয়ে তাঁকে নিয়ে যায় আত্মনিবেদনের পথে। দ্বিতীয় পর্যায়ে কন্যা উমা পাহাড়ি পরিবারের কন্যারূপে পরিচিত। মা মেনকার আঁচরে বসবাসে একবার কন্যা উমা মাত্র তিন দিনের জন্য পিতৃগৃহে আসেন। মায়ের চিত্ত তখন আনন্দে আপ্লুত। আবার পিতৃগৃহ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে মা মেনকা বিষাদ-মন্থর তাবাক্রান্ত। এই চিরায়ত বাঙালি ঘরের কাহিনিই এখানে কাব্যরূপ লাভ করেছে। তাই আগমনী বিজয়া পর্যায় আমাদের ঘরের কথা, আঁতের কথা। শাক্তপদের সর্বশ্রেষ্ঠ রচয়িতা ছিলেন রামপ্রসাদ সেন। তিনি একাধারে ভক্তসাধক ও কবি। তিনি তাঁর নিজস্ব ঢঙে শাক্তপদ গাইতেন। তা পরে রামপ্রসাদী সুর নামে বাংলায় প্রসিদ্ধতা পেয়েছে। এছাড়াও অপর বিখ্যাত শাক্তপদকর্তা ছিলেন কমলাকান্ত ভট্টাচার্য। তিনিও বহু শাক্তপদ রচনা করেন।

প্র : বাংলা গানের ইতিহাসে 'কীর্তন'-এর স্থান লেখ।

উ : বাংলার ধর্মসাধনার ইতিহাসে কীর্তনের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। কীর্তন শব্দের অর্থ হলো গুণকীর্তন। ঈশ্বরের নাম, লীলা ও গুণ সুর, তাল ও বাদ্যযন্ত্রের সহযোগে ঈশ্বরের নামগান করাকে কীর্তন বলে। কীর্তনের মাধ্যমে প্রকাশ করাই ভক্তির মূল। কীর্তন বলতে তাই ঈশ্বর বিষয়ক গানকেই বোঝায়। বিশেষত শ্রীকৃষ্ণলীলা বিষয়ক গানকে যে গান, তাই কীর্তন। শ্রীচৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩)। তিনি কীর্তনকে নিজস্ব রূপ দান করেন। শ্রীচৈতন্যদেব কীর্তনকে দুটি পদ্ধতিতে ভাগ করেন- ১. নামকীর্তন, ২. রসকীর্তন বা লীলাকীর্তন। নামকীর্তনে ঈশ্বরের নামগান ও কথার কথাই প্রধান। আর লীলাকীর্তনে তাঁর রূপ-গুণ ও বিচিত্র লীলার বর্ণনাই প্রধান হয়ে ওঠে। নামকীর্তন বা লীলাকীর্তন যাই হোক, ভক্ত গলাগল তালে, বিভঙ্গ সুরে, বিবিধ ভঙ্গিমাতে উপযুক্ত গায়কির মাধ্যমে, ভাব বজায় রেখে প্রকাশ করতে হয়। কথাটা তা কীর্তন পদবাচ্য হবে না। কীর্তনের পাঁচটি অঙ্গ- কথা, মৌহা, রূপক, তুক ও ছুটি। কীর্তন গানের প্রধানতম প্রচরণাপী, অষ্টপ্রহরব্যাপী অথবা চব্বিশপ্রহরব্যাপীও হতে পারে। বাংলাদেশে যে সমস্ত লীলাকীর্তনের চল আছে তা নিতান্ত কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে রচিত। যার বেশিরভাগ বৃন্দাবন লীলা। এছাড়াও রয়েছে গৌরচন্দ্রিকা, অনুলীলা, নৌকালীলা, রসকলীলা, পূর্বরাগ, অভিসার, মিলন বা মাথুর ইত্যাদি। কীর্তনে মোট ৬৪টি রস আছে। রস অর্থে যা শুনলে যা চিন্তা করলে অন্তর আনন্দে পূর্ণ হয়ে ওঠে। বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস থেকে শুরু করে চৈতন্য-পরবর্তী পদাবলি রচয়িতাদের পদাবলিগুলিই কীর্তনের প্রধান অবলম্বন।

প্র : বাংলা গানের ইতিহাসে কবিওয়ালাদের অবদান সম্পর্কে যা জান লেখ।

উ : অষ্টাদশশতকে কবি গানের ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে। এর অব্যবহিত পর থেকেই বাংলা গানে কবিওয়ালাদের অবির্ভাব। বিশেষ করে শান্তিপুর দ্বন্দ্ব (১৭৫২) পরবর্তী সময়ে তা বিশেষ প্রসার লাভ করে। এই দ্বন্দ্ব বছরমান ছিল ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে কবি ঈশ্বরগুপ্ত তাঁকে নূতন বছর পর্যন্ত। বাঁধন তাঁর আগে এবং পরে বহু শতাব্দী ধরেই কবিগানের একটি ক্ষীণ ধারা বাংলার সাহিত্যিক জীবনে সচল ছিল। এই পর্যন্ত বাংলার দুগদ্ধক্ষন, তাই কবিগানের উদ্ভব আর বিকাশের কতকগুলি বিশেষ কারণ আছে। বিশেষত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাঙালির বিরাট পরিবর্তন এই সময় ঘটেছিল। কবিওয়ালাগণ সাহিত্য বাংলা কবিতার বিষয় গ্রহণ করলেও কোনো দেশনির্ভরতা বা অর্থানুকূল্যকে তাঁদের সৃষ্টিতে আসেনি। তাঁরা আত্মানুকূল্যকে বর্জন করেছিলেন। পরিবর্তে প্রতিফলন সৃষ্টি, মানসতাবাস এবং নির্ভিত্র মানসিক যোগকে। তাঁরা আসরে ঔদ্ধত সুরে সুরে গান বলতে করতেন। বিপক্ষের সাথে ছন্দ এবং সুর বজায় রেখে 'লড়াই' চালিয়ে যেতেন, যাকে চলিত ভাষায় 'কবির লড়াই' বলা হয়। আসরে উপস্থিত শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করা এবং নিজের তথা নিজের দলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করাই এই গানের মূল উদ্দেশ্য ছিল। একেকে বছলাংশে শ্রোতাদের চাহিদা অনুযায়ে কবিওয়ালারা গান বাঁধতেন। এই ধারার প্রাচীনতম কবি গোঁজলা গুঁই। তিনি ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক। তাঁর শিষ্য রঘুনাথ দাস। রঘুনাথের শিষ্যদের মধ্যে রাসু, নৃসিংহ ও হরু ঠাকুর কবিওয়ালা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান। এই হরু ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন ভোলাময়রা। অপর শিষ্য রামপ্রসাদ ঠাকুর। তবে কবিওয়ালা হিসেবে সর্বাধিক জনপ্রিয় হয়েছেন এন্টনি ফিরিঙ্গি বা এন্টনি ফিরিঙ্গি।

Scanned with CamScanner

প্র : টপ্পা, যাত্রাগান, পক্ষীর গান সম্পর্কে আলোচনা কর।

উ : উত্তর ভারতীয় রাগসংগীতে ধ্রুপদ, খেয়াল ও ঠুংরির সঙ্গে টপ্পাও একটি বিশিষ্ট শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। 'টপ্পা' শব্দের অর্থ লম্ফ। এর গতি এবং তান উল্লম্ফনযুক্ত হওয়াতেই এইরূপ নামকরণ বলে অনেকে মনে করেন। টপ্পার দুটি স্তবক বা তুক–স্থায়ী ও অন্তরা। এর সঙ্গে দ্রুত খেয়ালের গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। টপ্পায় ভৈরবী, খাম্বাজ, দেশ, সিন্ধু, কাফি, ঝিঁঝিট, পিলু, বারোঁয়া প্রভৃতি রাগ ব্যবহৃত হয়। এটি মূলত করুণরসাত্মক প্রণয়সংগীত।

বাংলায় অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ থেকে টপ্পার প্রচলন। রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু) বাংলা টপ্পার পথিকৃৎ হিসেবে স্বীকৃত। তবে বাংলা টপ্পা সর্বতোভাবে পাঞ্জাবি টপ্পার অনুকরণ নয়। একে বাঙালির প্রকৃতি ও রুচি অনুযায়ী বিন্যাস করা হয়েছে। এতে দ্রুত তানের পরিবর্তে আন্দোলনযুক্ত তান ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলায় টপ্পার আবেদন অত্যন্ত মধুর ও গভীর। উনবিংশ শতাব্দীতে বহু সংগীতজ্ঞ সুললিত, অপূর্ব টপ্পা রচনা করে গেছেন। এঁদের মধ্যে রাধামোহন সেন, কালিকা মির্জা, শ্রীধর কথক, দাশরথী রায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও আগমনী গান, শ্যামাসংগীত, ভক্তিরসাশ্রিত গানে টপ্পার বিশেষ প্রভাব পড়েছে।

যাত্রাগান : বাংলাদেশে 'যাত্রাগানে'র উদ্ভব ষোড়শ শতাব্দীতে। 'যাত্রা' শব্দের অর্থ নির্বিঘ্নে দীর্ঘপথ অতিক্রম করা। বাংলা ভাষায় শব্দটির একটি বিশেষ যোগরূঢ় অর্থ দাঁড়িয়েছে– উৎসব-অনুষ্ঠানে কোনো গ্রথিত কথাবস্তুর গীত-নৃত্য-সংলাপ সহযোগে অভিনয়। বিশেষ এক মণ্ডপে সমবেত হয়ে দেব-মাহাত্ম্যমূলক সংগীত, নৃত্য ও নাট্য। তখন থেকেই যাত্রার পালাগানকে 'যাত্রা' বা 'যাত্রাগান' বলা হয়। 'গীতগোবিন্দ' অনেকটা যাত্রাগানের আকারেই রচিত। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'ও সেই যুগের কৃষ্ণযাত্রা পালা। এছাড়া চণ্ডীযাত্রা, মনসামঙ্গল, কংসবধ, যযাতি যজ্ঞ ইত্যাদি নিয়েও যাত্রাগান রচিত হয়েছে। 'কৃষ্ণযাত্রা' রচয়িতা হিসেবে কৃষ্ণকমল গোস্বামীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গোপাল উড়ে ও মধুসূদন কিন্নর যাত্রাগানের জগতে এখনও প্রসিদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের গানেও যাত্রাগানের প্রভাব দেখা যায়। যাত্রাগানের মধ্যে সুসাহিত্যের উপাদান ও অভিজাত সংগীতের নিদর্শন লক্ষ করা যায়। সেই সময় সমাজে কৃষ্ণযাত্রা থেকে শুরু করে সবরকম যাত্রাগানই একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। জনচিত্তে তা গ্রহণযোগ্যও হয়েছিল। বর্তমানে আর যাত্রাগানের প্রচলন নেই।

পক্ষীর গান : উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে কলকাতায় নাচ-গানের আসরে সুকণ্ঠ গায়ক হিসেবে রূপচাঁদ পক্ষীর ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়েছিল। সংগীত রচয়িতা রূপচাঁদ শাস্ত্ররসাত্মক সংগীত এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রুপাত্মক সংগীত সৃষ্টিতে সমান দক্ষ ছিলেন। তাঁর রচিত সমস্ত সংগীতই 'পক্ষী' বা 'খগরাজ' ভণিতাযুক্ত। তিনি 'পক্ষীর জাতিমালা' নামে শখের পাঁচালি দল তৈরি করেন। সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে তিনি গান বাঁধতেন। আগমনী-বিজয় গান, বাউল গান, দেহতত্ত্বের গান, টপ্পা গান রচনাতেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। তাঁর গানে বাংলা ও ইংরেজি শব্দের মিশ্রণ ঘটেছে। তাঁর দলের সদস্যরা নানারকম পাখির স্বর অনুকরণ করে নিজ নিজ নামগ্রহণ করতেন। তাই তাঁর দলকে 'পক্ষীর দল' বলা হয়। রূপচাঁদ খুবই আমোদপ্রিয় ও রসিক পুরুষ ছিলেন। 'পক্ষী' উপাধিকারী বলে তাঁর গাড়িটি কতকটা খাঁচার আকারের ছিল। তিনি সেই গাড়ি চড়ে শহরের ধনাঢ্য ব্যক্তিদের বাড়িতে উপস্থিত হতেন। তিনি প্রচুর সংগীত রচনা করেছেন। গঙ্গার পোল, রেল, বিধবাবিবাহ ইত্যাদি প্রসঙ্গেও তিনি সংগীত রচনা করেছেন। বাগবাজারে শিবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এই দলের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রূপচাঁদ জীবিত ছিলেন।

Scanned with CamScanner

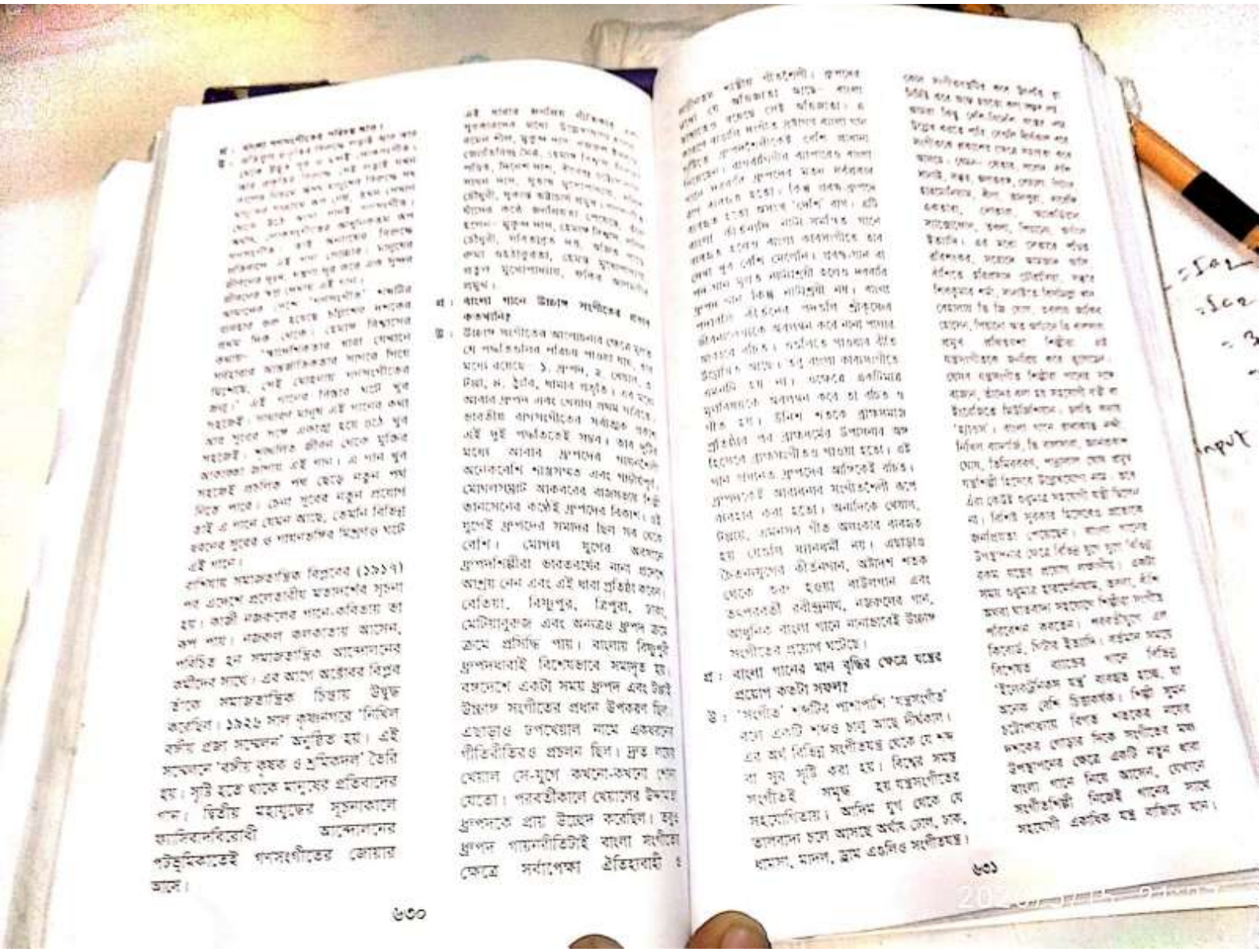

Scanned with CamScanner

পরবর্তীকালে এই ধারা বাংলা গানে চালু আছে।

প্র : বাংলা গানের ধারায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান সংক্ষেপে আলোচনা কর।

উ : বাংলা গানের ধারায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) এক অবিস্মরণীয় নাম। রবীন্দ্র-সংগীত সময়ের সাথে সাথে সমসাময়িক হয়ে উঠেছে। বাঙালিসমাজে এই গানের গ্রহণযোগ্যতা চিরকালীন। বাংলার মানুষের আনন্দ দুঃখ, প্রেম, প্রতিবাদ, প্রকৃতিমুগ্ধতা, দেশপ্রেম, ঈশ্বর উপলব্ধি- সমস্ত কিছুর প্রকাশ যাকে আশ্রয় করে- তা রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর গান। হতাশাপূর্ণ জীবনে আলোর পথ দেখায় তাঁর গান। আর সব গানের থেকে এ গান আলাদা, অনন্য। স্বাধীন দুটি পৃথক রাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'। ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত 'জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে'। এছাড়া শ্রীলংকার জাতীয় সংগীত মূলত রবীন্দ্রনাথের গানের সুরানুবর্তনে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাঁর গানের মোট সংখ্যা দেড় হাজারের কিছু বেশি। তাঁর দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অবশ্য রবীন্দ্রনাথের অল্প কিছু গানে সুর দিয়েছিলেন। অনেকগুলোর সুর করেছেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবি নিজেও সুর সংযোজন করেছেন বেশ কিছু। রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর গান সম্পর্কে বলেছেন- 'আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনের সৃষ্টির প্রথম রহস্য, আলোকের প্রকাশ, আর সৃষ্টির শেষ রহস্য, ভালোবাসার অমৃত'। রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছেন বাংলা গানের বিষয়বিন্যাসের প্রচলিত রীতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে গিয়ে। নতুনত্ব এনেছেন শুধু বিষয়ে নয়, গানের গঠনেও। যা পুরোপুরি নতুন। গান সৃষ্টির সাথে সাথে তৈরি করেছিলেন একদল দীক্ষিত ছাত্রছাত্রী যাঁরা পরম্পরাবাহী হয়ে আজও তাঁর গানকে উজ্জীবিত রেখেছে প্রথম দিনের মতন। বাঙালি সমাজের গানের রুচিও তৈরি করে দিয়ে গেছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন, সাহিত্য সংগীতের জন্য পুনরাবৃত্তিতে নয়, গানকে টিকে থাকতে হলে নিত্য নতুন সৃষ্টির মাধ্যমে। তবু তাঁর গান পরম্পরাহীন নয়। ভারতীয় প্রাচীন সংগীত ধারার মাঝে তা সংযোগনাহী। তিনি 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমালা', খুব করলেন গীতিরসে, লৌকিক সুর কাঠামো আর তার অরূপ বাণী দিয়ে। ধ্রুপদ, খামার, খেয়াল, ঠুমরির সাথে পাশ্চাত্যের সুরধারাও এসে মিশেছে তাঁর গানে, আর আছে আমাদের লোকগীত কীর্তন। সবটাই উপলব্ধি করা যায় কিন্তু নির্দিষ্ট করা মানে না কিছুতেই। সমন্বয়বাদী মানসিকতা এটাই অনন্যতা। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য এবং গীতিনাট্যগুলিতেও নতুন উদ্যোগগোপা গান রয়েছে যা নিঃশেষ তাৎপর্যনাহী। নাটক বা সিনেমার গান হিসেবেও আজ রবীন্দ্রসংগীতের জনপ্রিয়তা সর্বাধিক।

প্র : বাংলা গানের ধারায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অবদান সংক্ষেপে আলোচনা কর।

উ : বাংলার এক ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণে দ্বিজেন্দ্রলাল (১৮৬৩-১৯১৩) সৃষ্টি করেছেন তাঁর নাটক এবং গানগুলি। যা আজও মহলাংশে প্রাসঙ্গিক ও জনপ্রিয়। সেই যুগে তাঁর রচিত নাটকগুলি সারা ভারতবর্ষেই প্রদর্শিত হতো। ইতিহাসভিত্তিক সেই সমস্ত নাটকগুলির প্রয়োজনে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন প্রচুর গান। যার বেশিরভাগই ছিল দেশপ্রেমমূলক। তার সাথে রয়েছে বেশ কিছু প্রেম, প্রকৃতি ও আধ্যাত্মিক ভাবনার গানও। তাঁর নাটকগুলির বিপুল জনপ্রিয়তার মূলে ছিল আদর্শবাদ এবং যুগের চাহিদা অনুসারী মঞ্চ উপস্থাপনা। তাঁর গানের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তিনি সেই সময়ের সুর ধরতে পেরেছিলেন। সেই সুর এনেছিলেন তাঁর গানে। 'সাজাহান' নাটকের 'ধন ধান্য পুষ্পে ভরা' গানটি প্রায় জাতীয় সংগীত পর্যায়ের হয়ে উঠেছিল। 'প্রতাপসিংহ' নাটকের 'ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে',

Scanned with CamScanner

আছে সৌন্দর্যবোধ, ঈশ্বরানুভূতি আর ব্যক্তি-হৃদয়ের আকুতি।

প্র : চারণকবি মুকুন্দ দাসের কবিখ্যাতিজ্ঞা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

উ : বাংলা গানের চারণকবি মুকুন্দ দাস (১৮৭৮–১৯৩৪) ছিলেন অবিভক্ত বাংলার বরিশালের অধিবাসী। মুকুন্দ দাস দরকের শিখা। অন্যদিকে মুকুন্দ দাস যাত্রার গান লিখতেন। তা শুনে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত মুগ্ধ হন। মুকুন্দ দাস গ্রামে গ্রামে দেশপ্রেমমূলক গান গেয়ে বক্তৃতেজ, অভিনয় করতেন যাত্রাপালায়। জলরঞ্জন মজুমদার সম্পাদিত 'মাতৃপূজা' সংকলনে তাঁর একটি গান– 'ছিল ধান গোলাভরা, শ্বেত ইদুরে করল সারা'। এ গানের জন্য তিনি ব্রিটিশ সরকারের হাতে গ্রেফতার হন এবং তাঁর তিন বছর কারাদণ্ড ও জরিমানা হয়। অসহযোগ এবং আইন-অমান্য আন্দোলনের সময় তিনি যাত্রাপালা ও গান দিয়ে দেশের মানুষকে মাতিয়ে তোলেন। তাঁর 'মাতৃপূজা' নামক যাত্রাপালাটি ওই যুগে জনপ্রিয় হয় দেশের তরুণদের কাছে। তাঁর রচিত কয়েকটি গ্রন্থ– সাধনসংগীত, ব্রহ্মচারিণী, পল্লীসেবা, সাথী প্রভৃতি। বাংলা গানের এই ভিন্ন ধারার গীতিকার সারাজীবনে অজস্র পুরস্কার পেয়েছিলেন। কিন্তু তা ছাপিয়ে তিনি বাঙালি সংগীত শ্রোতার কাছে আজও প্রিয় হয়ে আছেন তাঁর অপূর্ণ গানগুলির জন্য। মুকুন্দ দাস বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হলেও তাঁর সাধনসংগীতে আছে পদাবলি ও শ্যামাসংগীতের অপূর্ব সমন্বয়। তিনি সারাজীবন কোনো সম্প্রদায়ভুক্ত হননি। নিয়মিত কীর্তনের আসরেও যোগ দিতেন। লিখতেন 'বরিশাল হিতৈষী' পত্রিকায়। বিদেশি বর্জন উপলক্ষে রচিত তাঁর গানগুলি প্রতিবাদী মানুষের মনে ঢেউ তোলে। তাঁর গান আজও আধুনিক। বাংলা গানের ইতিহাসে তাঁর আসন চিরকাল উজ্জ্বল থাকবে।

প্র : বাংলা সংগীতের ধারায় কাজী নজরুল ইসলামের অবদান আলোচনা কর।

উ : একাধারে প্রেমিক কবি এবং বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯–১৯৭৬) বাংলা গানের জগতে এক যুগান্তর এনেছিলেন। তাঁর গানে সুরারোপ করেছেন। আকাশে 'অগ্নি-বীণায়' ঝঙ্কার তুলে 'মুক্তকেশর' মতো তাঁর রচিত 'নজরুল গীতি' নামে পরিচিত ছিল। নজরুল নিজেও এই আলোচনাসভেন। এখন বাংলাদেশে সেগুলো 'নজরুল সংগীত' বলা হয়। কবি এই পরিবর্তনটি করেছেন তাদের জন্য এই প্রবাদই বলেই : 'মায়ের ওরে মায়ের জন্য এই দেশি।' তাঁর কবিতা এবং গানগুলিতে ভাব টিবিদ্রোহী সত্তার দুর্বল ঘোষণা পাই। অন্যদিকে, বহু গানে তাঁর রোমান্টিকতা, আবেগমুগ্ধতার আভাস আছে। তাঁর চিন্তার আর প্রকাশভঙ্গিতে ছিল এক নতুন নিরন্ধন্দল, এক বিদ্রোহের ঝঙ্কার। তাঁর রচনাগুলি স্থবির সমাজের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল। তাঁর বিরন্ধতা শুধু বিষয়ের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, তা ছিল প্রকাশগত এবং সুরের ক্ষেত্রেও। গানের ভাষাকে গতি আর দ্যুতি দেবার জন্য তিনি শব্দবন্ধনের পরীক্ষানিরীক্ষাও করেছেন। তিনি অজস্র আরবি, পারসি, উর্দু শব্দ ব্যবহার করেছেন গানে। রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসে সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রায় ভিন্ন মেরুতে পৌঁছেছিলেন নজরুল। তাতে সবচেয়ে খুশি হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। নজরুলকে তিনি উৎসর্গ করেছিলেন 'বসন্ত' নাটকটি। জীবনানন্দ দাশ নজরুল সম্পর্কে বলেছেন– 'বাংলার এ মাটি থেকে জেগে, এ মৃত্তিকাকে সত্যিই ভালোবেসে আমাদের দেশে ১৯ শতকের ইতিহাস প্রান্তিক শেষ নিঃসংশয়বাদী কবি নজরুল ইসলাম।' তাঁর 'কারার ঐ লৌহ কপাট' অথবা 'দুর্গমগিরি কান্তার মরু' গানগুলি ছিল সে সময়ের বিপ্লবীদের জীবনসংগীত, তিনি মূলত 'ভাঙার গান' গেয়েছেন। যে ভাঙনের পথেই আসবে নতুন দেশ, নতুন জাতি, নতুন এক সমাজব্যবস্থা।

প্র : মুকুন্দ দাস চৌধুরীর মূল্যায়ন আলোচনা কর।

উ : বাংলা গানে নতুন আবেগের সঞ্চারী মুকুন্দ দাস চৌধুরী (১৯১২–১৯৯৭)। ভারতীয় সংগীতধারা সম্পর্কিত 'মাসিক পত্রে তাকে লিখেন অপূর্ব সৃষ্টি কৌশল উদ্ভাবন করেন তিনি। ছয়-সাত দশকের বাংলা গান তাঁর নতুন সুর আর কথার জাদুতে আচ্ছন্ন ছিল। ১৯৪৪-এ তিনি যুক্ত হন গণনাট্য সংঘের সাথে। তাঁর গানে সমকালীন বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন আর রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের প্রভাব গভীরভাবে লক্ষ করা যায়। আজন্ম বিদ্রোহী চেতনের বিচার উপলক্ষে তিনি রচনা করেছেন 'বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা আজ জেগেছে সেই জনতা'। ঐতিহাসিক নৌবিদ্রোহের সমর্থনে লিখেছেন– 'ঢেউ উঠছে, কারা টুটছে'। তাঁর রচিত 'আজ নয়া গুনগুন গুঞ্জন প্রেমে। চাঁদ ঝুলা জোছনার গান আর নয়– ওগো প্রিয় মোর, খোলো বাহুডোর। পৃথিবী তোমারে যে চায়' গানটির বক্তব্য অনুধাবন করলে তাঁর সমকালের চাহিদা সমাজতান্ত্রিক বোধের উজ্জীবন, মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ঐকান্তিক ইচ্ছার কথা বোঝা যায়। তিনি গানের সুরারোপ কথার সাথে উপযুক্ত করে তুলেছিলেন গানের সুরকে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বা সুকান্ত ভট্টাচার্যের বেশকিছু কবিতায় সুরারোপ করে সেগুলিকে গান হিসেবে কালজয়ী করে নিয়েছেন সলিল চৌধুরী। হিন্দি আধুনিক গান, সিনেমার গান রচনাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন তিনি। তাঁর সমকালীন সমস্ত খ্যাতনামা ভারতীয় সংগীতশিল্পীই তাঁর রচিত ও সুরারোপিত গান গেয়েছেন। বাংলা গানকে একক প্রচেষ্টাতেই তিনি নিয়ে গেছেন সম্পূর্ণ নতুন পথে, যে পথ চির-আধুনিক।

প্র : লোকগান বলতে কী বোঝ? এর বিষয় বৈচিত্র্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

উ : প্রতিকূল প্রকৃতির বিপরীতে দাঁড়িয়ে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আদিম যুগ থেকে মানুষ সংঘবদ্ধ হয়েছে। তার এই সংঘবদ্ধ জীবন থেকে উদ্ভব ঘটে লোকসংগীত। এই এই কথা সুরের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে লোকগান। লোকগানের নানা বিষয়বস্তুর এই সামগ্রিক পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা বলতে পারি, বাংলা ঋতুভিত্তিক অঞ্চলভিত্তিক উৎসবভিত্তিক পালাগান, জারিগান, সারিগান, ভাটিয়ালি, অনুষ্ঠানের বাবহৃত গান, উপলক্ষ, অভিনয়, সংগীত ও কথোপকথনের বাবহৃত লাচাড়ি, দু-গোষ্ঠীর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের গান, লোকক্রীড়া-লোকসংগীত-লোককলাকর্ম ইত্যাদির বাবহার ছিল। অর্থাৎ বলা যেতে পারে, পল্লির সমাজজীবনে যে গান প্রচলিত ধারে নূপে সুপে রচিত হয়ে মুখে মুখেই প্রচার লাভ করে, তা-ই লোকগান। যেমন– বাংলাদেশের ও পশ্চিমবঙ্গের লোকগানের সবগুলি ধারা আছে, সেগুলিকে আমরা মূলত চারটি অঞ্চলে ভাগ করতে পারি। যেমন– ১. পূর্বাঞ্চল বা পূর্ববঙ্গ, ২. উত্তরাঞ্চল বা উত্তরবঙ্গ, ৩. পশ্চিমাঞ্চল বা মালভূমি অঞ্চল, ৪. দক্ষিণাঞ্চল বা দক্ষিণবঙ্গ। এদের মধ্যে পূর্ববঙ্গের মূল ধারাটি ভাটিয়ালি, তা ছাড়াও সারি, জারি, ধামাইল, বিয়ের গান, মুর্শিদি, মারফতি, পালাগান ইত্যাদি। তবে পূর্ববঙ্গের সব গানের মধ্যে মূলত ভাটিয়ালি সুরের প্রাবল্য। উত্তরবঙ্গের প্রধান ধারাটি ভাওয়াইয়া। এছাড়াও এই অঞ্চলে আমরা পাই ছাঁটকা, ঝিকরো, দীঘলনাশা, জাগগান, মনসার গান, রাজবংশী সম্প্রদায়ের নিজস্ব কিছু অন্যান্য অনুষ্ঠানমূলক গান। পশ্চিমাঞ্চল বা মালভূমি অঞ্চলের গানের মূলধারাটি ঝুমুর। তা ছাড়াও ভাদু, টুসু, ভাদুর বাউল, কুর্মিগান, ঝাপু গান, ছড়া গান ইত্যাদির প্রচলন আছে। আর দক্ষিণবঙ্গের ধারাগুলির মধ্যে মূলধারাটি– কবিগানের গান। তাছাড়াও রয়েছে দক্ষিণরায়ের গান, দাঁড়ারের গান, অষ্টক গান, দক্ষিণবঙ্গের ভাটিয়ালি গান ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যভাগে মুরশিদাবাদ অঞ্চলে আলকাপ,

Scanned with CamScanner

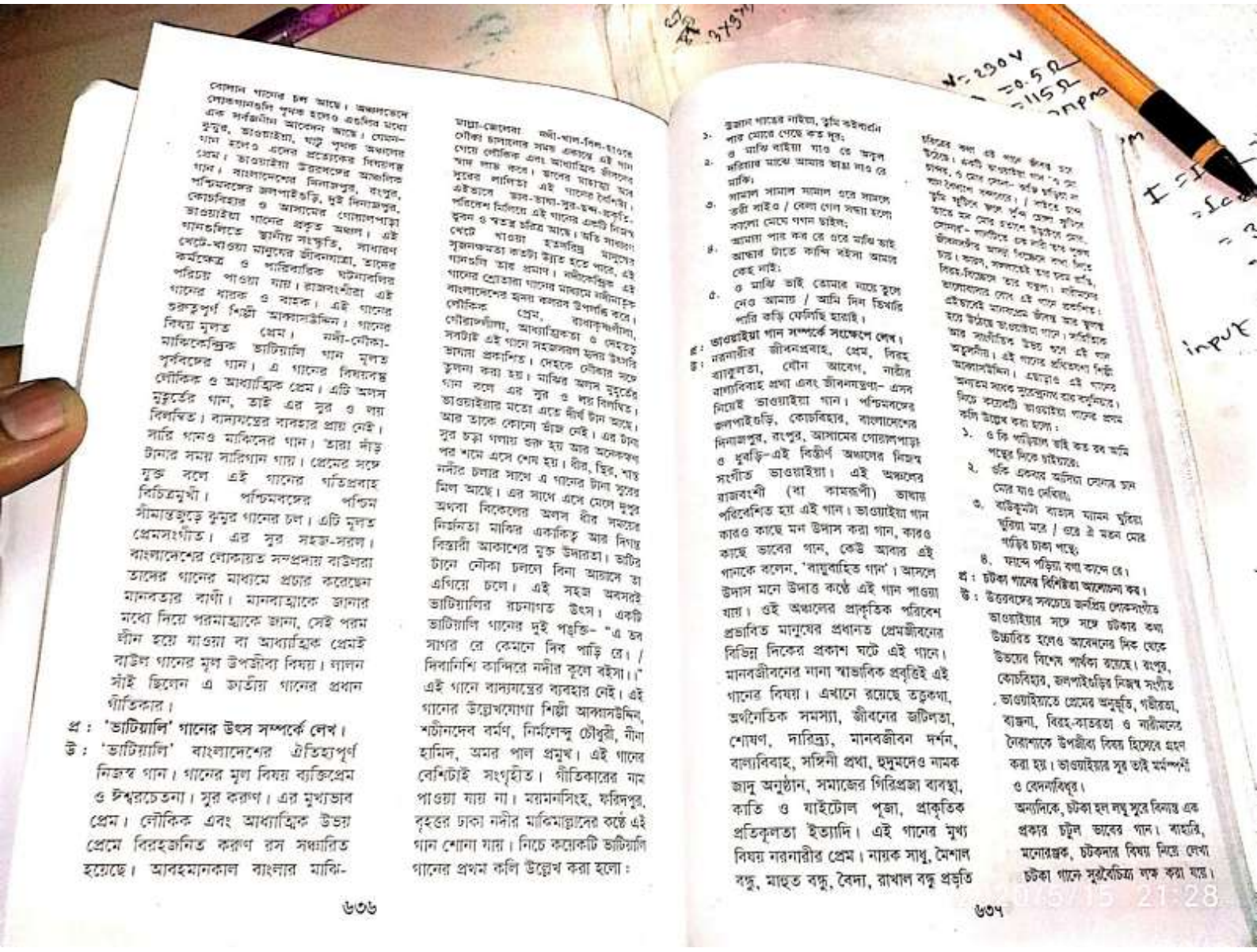

দোতারা গানের চল আছে। অঞ্চলভেদে গোকগানগুলি পৃথক হলেও এগুলির মধ্যে এক সর্বজনীন আবেদন আছে। যেমন– দুলুয়া, ভাওয়াইয়া, ঘাটু পৃথক অঞ্চলের গান হলেও এদের প্রত্যেকের বিষয়বস্তু প্রেম। ভাওয়াইয়া উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক গান। বাংলাদেশের দিনাজপুর, রংপুর, পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি, দুই দিনাজপুর, কোচবিহার ও আসামের গোয়ালপাড়া ভাওয়াইয়া গানের প্রকৃত অঞ্চল। এই গানগুলিতে স্থানীয় সংস্কৃতি, সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের জীবনযাত্রা, তাদের কর্মক্ষেত্র ও পারিবারিক ঘটনাবলির পরিচয় পাওয়া যায়। রাজবংশীরা এই গানের ধারক ও বাহক। এই গানের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী আব্বাসউদ্দিন। গানের বিষয় মূলত প্রেম। নদী-নৌকা-মাঝিকেন্দ্রিক ভাটিয়ালি গান মূলত পূর্ববঙ্গের গান। এ গানের বিষয়বস্তু লৌকিক ও আধ্যাত্মিক প্রেম। এটি অলস মুহূর্তের গান, তাই এর সুর ও লয় বিলম্বিত। বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার প্রায় নেই। সারি গানও মাঝিদের গান। তারা দাঁড় টানার সময় সারিগান গায়। প্রেমের সঙ্গে যুক্ত বলে এই গানের গতিপ্রবাহ বিচিত্রমুখী। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম সীমান্তজুড়ে কুমুর গানের চল। এটি মূলত প্রেমসংগীত। এর সুর সহজ-সরল। বাংলাদেশের লোকায়ত সম্প্রদায় বাউলরা তাদের গানের মাধ্যমে প্রচার করেছেন মানবতার বাণী। মানবাত্মাকে জানার মধ্যে দিয়ে পরমাত্মাকে জানা, সেই পরম লীন হয়ে যাওয়া বা আধ্যাত্মিক প্রেমই বাউল গানের মূল উপজীব্য বিষয়। লালন সাঁই ছিলেন এ জাতীয় গানের প্রধান গীতিকার।

প্র : 'ভাটিয়ালি' গানের উৎস সম্পর্কে লেখ।

উ : 'ভাটিয়ালি' বাংলাদেশের ঐতিহ্যপূর্ণ নিজস্ব গান। গানের মূল বিষয় ব্যক্তিপ্রেম ও ঈশ্বরচেতনা। সুর করুণ। এর মুখ্যভাব প্রেম। লৌকিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় প্রেমে বিরহজনিত করুণ রস সঞ্চারিত হয়েছে। আবহমানকাল বাংলার মাঝি-মাল্লা-জেলেরা নদী-খাল-বিল-হাওর-গৌরা চলাচলের সময় একাকিত্ব জীবনের গেয়ে লৌকিক এবং আধ্যাত্মিক ঘাম ঝরায় করে। তাদের মাঝারা মধ্য দূরের লালিত্য এই গানের বৈশিষ্ট্য। এইভাবে জল-ভাসা-সুর-ছন্দ-প্রকৃতি-পরিবেশ মিলিয়ে এই গানের একটি নিজস্ব ধরন ও স্বতন্ত্র আবির আছে। অতি সাধারণ খেটে খাওয়া হতদরিদ্র মানুষের সৃজনক্ষমতা কতটা ঝাঁঝ হতে পারে, এই গানগুলি তার প্রমাণ। নদীকেন্দ্রিক এই গানের শ্রোতারা গানের মাধ্যমে নদীমাতৃক বাংলাদেশের মনের কলরব উপলব্ধি করে। লৌকিক প্রেম, রাধাকৃষ্ণলীলা, গৌরাঙ্গলীলা, আধ্যাত্মিকতা ও দেহতত্ত্ব সবটাই এই গানে সহজাতরূপ মনের উৎসারি ভাষায় প্রকাশিত। দেহকে নৌকার সঙ্গে তুলনা করা হয়। মাঝির অসীম মুহূর্তের গান বলে এর সুর ও লয় বিলম্বিত। ভাওয়াইয়ার মতো এতে দীর্ঘ টান আছে। আর তাকে কোনো ভাঁজ নেই। এর টান সুর চড়া গলায় জল হয় আর অনেকক্ষণ পর শমে এসে শেষ হয়। ধীর, স্থির, শান্ত নদীর চলার সাথে এ গানের টানা সুরের মিল আছে। এর সাথে এসে মেলে দূরত্ব অথবা বিচ্ছেদের অসীম ধীর সমতার নির্জনতা মাঝির একাকিত্ব আর বিগত বিস্তারী আকাশের মুক্ত উদারতা। তটির টানে নৌকা চলতে বিনা আয়াসে তা এগিয়ে চলে। এই সহজ অবসরই ভাটিয়ালির রচনাগত উৎস। একটি ভাটিয়ালি গানের দুই পঙ্‌ক্তি– "এ ভর সাগর রে কেমনে দিব পাড়ি রে। / নিবানিশি কান্দিরে নদীর কূলে বইসা।।" এই গানে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার নেই। এই গানের উল্লেখযোগ্য শিল্পী আব্বাসউদ্দিন, শচীনদেব বর্মণ, নির্মলেন্দু চৌধুরী, নীনা হামিদ, অমর পাল প্রমুখ। এই গানের বেশিটাই সংগৃহীত। গীতিকারের নাম পাওয়া যায় না। ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বৃহত্তর ঢাকা নদীর মাঝিমাল্লাদের কণ্ঠে এই গান শোনা যায়। নিচে কয়েকটি ভাটিয়ালি গানের প্রথম কলি উল্লেখ করা হলো :

১. কুজান গাঙের নাইয়া, তুমি কইলাবান
পার মোরে যেতে কত দূর;

২. ও মাঝি বাইয়া গাও রে অকুল
দরিয়ার মাঝে আমার আছা লাও রে
মাঝি।

৩. সামাল সামাল সামাল ওরে সামালে
তরী সাইও / বেলা গেল সন্ধ্যা হলো
কালো মেঘে গগন ছাইল;

৪. আমায় পার কর রে ওরে মাঝি ভাই
আছার ঢাতে কাশি বইসা আমার
কেহ নাই;

৫. ও মাঝি ভাই তোমার নায়ে তুলে
নেও আমায় / আমি দিন ভিখারি
পারি কড়ি ফেলিছি হারাই।

প্র : ভাওয়াইয়া গান সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

উ : নরনারীর জীবনপ্রবাহ, প্রেম, বিরহ, ব্যাকুলতা, যৌন আবেগ, নারীর বাল্যবিবাহ প্রথা এবং জীবনসঙ্গিনী– এসব নিয়েই ভাওয়াইয়া গান। পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, বাংলাদেশের দিনাজপুর, রংপুর, আসামের গোয়ালপাড়া ও ধুবড়ি–এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের নিজস্ব সংগীত ভাওয়াইয়া। এই অঞ্চলের রাজবংশী (বা কামরূপী) ভাষায় পরিবেশিত হয় এই গান। ভাওয়াইয়া গান কারও কাছে মন উদাস করা গান, কারও কাছে ভাবের গান, কেউ আবার এই গানকে বলেন, 'বায়ুবাহিত গান'। আসলে উদাস মনে উদাত্ত কণ্ঠে এই গান পাওয়া যায়। ওই অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রভাবিত মানুষের প্রধানত প্রেমজীবনের বিভিন্ন দিকের প্রকাশ ঘটে এই গানে। মানবজীবনের নানা স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই এই গানের বিষয়। এখানে রয়েছে তত্ত্বকথা, অর্থনৈতিক সমস্যা, জীবনের জটিলতা, শোষণ, দারিদ্র্য, মানবজীবন দর্শন, বাল্যবিবাহ, সঙ্গিনী প্রথা, হুদুমদেও নামক জাদু অনুষ্ঠান, সমাজের গিরিপ্রজা ব্যবস্থা, কাতি ও মাইটোল পূজা, প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা ইত্যাদি। এই গানের মুখ্য বিষয় নরনারীর প্রেম। নায়ক সাধু, মৈশাল বন্ধু, মাহুত বন্ধু, বৈদা, রাখাল বন্ধু প্রভৃতি চরিত্রের কথা এই গানে উঠে আসে। এগুলি ভাওয়াইয়া গানে 'ও' ধ্বনি দিয়ে শুরু হয়। এই গানে সোজা-সরল কথা বলার ভঙ্গি আছে। এই গানে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র খঞ্জনি, দোতারা, সারিন্দা, বাঁশি, হারমোনিয়াম, তবলা, ঢোল, করতাল। ভাওয়াইয়া গানে বিরহ-বিচ্ছেদের সুর করুণ। সাধারণত এইভাবেই মানবপ্রেম জীবন্ত হয়ে ফুটে ওঠে ভাওয়াইয়া গানে। সাধারণত আর সামাজিক উৎস থেকে এই গান অনুপ্রাণিত। এই গানের প্রধান শিল্পী আব্বাসউদ্দিন। এছাড়াও এই গানের অন্যতম সার্থক সুরস্রষ্টা বলা যায়। নিচে কয়েকটি ভাওয়াইয়া গানের প্রথম কলি উল্লেখ করা হলো :

১. ও কি পাড়িয়াল ভাই কত রব আমি
পছের দিকে চাইয়ারে;

২. ভরি একবার আসিয়া সোনের চান
মোর যাও দেখিয়া;

৩. বাউকুমটা বাতাস যামন ঘুরিয়া
ঘুরিয়া মরে / ওরে ঐ মতন মোর
পরিরে চাকা পাছে;

৪. ফাগুন পড়িয়া বলা কাদে রে।

প্র : টটকা গানের বিশিষ্টতা আলোচনা কর।

উ : উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে জনপ্রিয় লোকসংগীত ভাওয়াইয়ার সঙ্গে সঙ্গে টটকার কথা উচ্চারিত হলেও আবেদনের দিক থেকে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। রংপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ির নিজস্ব সংগীত ভাওয়াইয়াতে প্রেমের অনুভূতি, গভীরতা, ব্যঞ্জনা, বিরহ-কাতরতা ও নারীমনের হতাশাকে উপজীব্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা হয়। ভাওয়াইয়ার সুর তাই মর্মস্পর্শী ও বেদনাবিধুর।

অন্যদিকে, টটকা হল লঘু সুরে বিন্যস্ত এক প্রকার চটুল ভাবের গান। বাহারি, মনোরঞ্জক, চটকদার বিষয় নিয়ে লেখা টটকা গানে সুকৌতুকের লক্ষ করা যায়।

Scanned with CamScanner

জীবনযাপনের নানা ঘটনা ও দৃশ্যকে বিষয় করে এই গান রচিত। ভাওয়াইয়া ও ঠুমরী গানের শিল্পী আব্বাসউদ্দিন তাঁর লেখায় ভাওয়াইয়া ও ঠুমরী গানের পার্থক্য নির্দেশ করেছেন এইভাবে– 'ভাওয়াইয়া টানা সুরের গান, শিল্পীর গলা ছেড়ে ছেড়ে গায় গানের সময়, সুরের বৈচিত্র্যও বেশি। রচনার দিক থেকে এ গান বিরহমূলক, উত্তরবঙ্গের প্রকৃতি যথাযথভাবে ধরা পড়ে এ গানে, বিস্তৃত নিস্তব্ধ মাঠ, অনন্ত পাড়ি পাহাড়ের খাঁজ যেন এ গানের সুরে রূপ পায়। ঠুমরী দ্রুত তালের গান।' লোকভাব প্রকাশে, সুরবিন্যাসে, গাকারবন্ধ রচনায় কিংবা উচ্চারণ ভঙ্গি এবং গানের রীতির ক্ষেত্রে মিল লক্ষ করা যায়। ভাওয়াইয়ায় যেখানে বিরহজনিত বেদনা ও হতাশা, ঠুমরীর সেক্ষেত্রে মিলনাকাঙ্ক্ষাজনিত প্রেমের আর্তি ও আকুলতা প্রকাশ পায়। একটি উদাহরণ দেয়া যাক : এই গান রংপুরের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে প্রায় দেড়শ বছর আগে তৎকালীন ডিসি স্যার জর্জ গিয়ারসন্ সংগ্রহ করেছিলেন। এখানে নববিবাহিতা স্ত্রী মায়া যাবার পর যুবক স্বামী তার নিনিমা বা নানিকে রংপুর ও কোচবিহারের কথ্যভাষায় বলছে : 'আবো নাও দারীটা মরিয়া মুরছে / হইছে হানি আনার ঘরত পড়ি থাকুম/ পড়ে চোখের পানি।'

প্র : বাংলা সারিগানের পরিচয় দাও।

উ : সারিগান সংগ্রামপ্রবৃত্তিজাত মৌলিক আবেগ প্রকাশক কর্মসংগীত। নৌকার মাঝি– যারা বৈঠা টানে আর নৌকা চালায়, তারাই এই গানের ধারক-বাহক। এই গানের মূল উদ্দেশ্য– একঘেয়ে কাজের ভার কিছুটা লাঘব করা আর মনের আনন্দ প্রকাশ। এ জাতীয় গানে ছেলেরাই গায়ক। কাজের ছন্দে ছন্দে তারাই সমবেত কণ্ঠে এ গান গায়। জীবিকার সঙ্গে সম্পর্কিত বলে এ গানের ধারা আজও বহমান। যুগে যুগে এ গান রচিত হয়েছে। এই শতাব্দীর সূচনা থেকে অধিকাংশ সারিগান নৌকা বাইচের পালাকে সংযুক্ত হয়েছে। সবশ্রীকালে ফল-সেচাইদের কর্মসংগীত হিসেবে এই পালের পালকার গুরু হয়। কাজের সাথে গান আর গান গেয়ে গেয়ে কাজ- এর মাধ্যমে সারিগি জাতি জীবনকে সহজ ও স্বাগতম করেছে। সারিগান আসলে প্রমজীবী গোষ্ঠীর একান্ত হলের এক জনসমিকতা সেশবাণী। ভারতীয় গীতিধারার প্রসঙ্গে আর্তি ও মার্তি, আত্মিকতা, আত্মনিষ্ঠতা, একতানতা, একতারী, আলাপচারিতা, পরিচয় লাভ একতাগুরুত্ব উদ্ভাসিত হয়। রবীন্দ্রনাথ আর নজরুল দুই দিক দিয়ে গীতিকারই সারিগানের সুরে গান সৃষ্টি করেছেন। এ গানে তালের গভীরতা নেই, আছে নিসর্গের বৈচিত্র্য। প্রধানত পাঁচটি উৎস থেকে বিষয় সংগ্রহ করে সারিগান রচনা করা হয়। যেমন– ১. পৌরাণিক : রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ, ২. ঐতিহাসিক : নিমাইসন্ন্যাস প্রসঙ্গ, ৩. লৌকিক : লৌকিক প্রেম ও জীবন, ৪. আধ্যাত্মিক : দেবতত্ত্ব ও মরমীয়াবাদ, এবং ৫. ব্যঙ্গকৌতুক : আক্রমণ ও রঙ্গব্যঙ্গিকতা। তবে এই গানে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ জাগতিক ও মানবিক আবেগ-আকাঙ্ক্ষার রূপক হিসেবেই ব্যবহৃত। সে দিক থেকে এ গান সম্পূর্ণ ইহজাগতিক। সারিগান তালপ্রধান। প্রধানত দাদরা ও কাহারবা–এই দুটি তালে গাওয়া যায়। বদরপিরের নামে রচিত সারিগান আছে। একটি সারিগানের দুই পঙ্‌ক্তি–"এমন রঙের নাও বানাইয়াছে কে, মন-মাঝি যে, রঙরাজ দেখাইয়া দে মোরে।।" নিচে কয়েকটি সারিগানের উদাহরণ দেয়া হলো:

১. যাত্রা করাইয়া মোরে দেগ নন্দরানি / আমি কালিদহে যাবো আমি কালিদহে যাবো;
২. সাজায়া চলে গো সখি যমুনার জলে বংশীধারী আছে না কদম তলে;
৩. জ্যৈষ্ঠ না আষাঢ় মাসে গাঙ্গে ন্যা পানি গো আইলিনা যমুনার জলে।

প্র : ঝুমুর গান সম্পর্কে লেখ।

উ : লোকগানের সব থেকে আকর্ষণীয় দিক তার স্বতঃস্ফূর্ততা আর অকৃত্রিম সুর। বিশেষ করে ঝুমুর গানে এই সুরের মূর্ছনা এক

অপূর্ব আবেশ সৃষ্টি করে। মুখ্যতঃ [illegible] পশ্চিম মেদিনীপুর, বিহার, [illegible] পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, আসামের কিছু অঞ্চল, [illegible] ঝুমুর নামক লোকসংগীত। [illegible] কৃষ্ণলীলার সেমই সব ঝুমুরে গাওয়া হয়। [illegible] ঝুমুর মূলত লোকসংগীত। তাই যখন [illegible] লোকসমাজে জীবনের এই গান [illegible] নারী-পুরুষের প্রেম সকলের মনোরম। [illegible] পুরুষের ভাই এক মুক্তিকাঙ্ক্ষী, কখনো আবার এ [illegible] দার্শনিকতামূলক গান। আবহমানকাল [illegible] লোকসংগীতের পরিপোষকতাও অনস্ত। এ [illegible] ঝুমুরের ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। অনাদিকাল [illegible] কুর্মী, ওরাওঁ, সাঁওতাল, কুমিজ, মুণ্ডা, হো, [illegible] বাউরি, ভাড়ি, বাজোয়ার প্রভৃতি আদিবাসীদের সমাজে ঝুমুর প্রাণের সম্পদ। তাঁরা এ গান মাদল, দামসা, ধামসা, ধুড়কি, খোল, ডেবসেপোট, সহযোগে গায়। ঝুমুরের সুরের সাথে সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ একদম মিলে যায়। লালমাটি, পাথর, ডেউসেলানো জমি, কাশফুল, শাল, কুসুম, শিমুল, মহুয়া আর পলাশ। আর রয়েছে টিলা, পাহাড়ি নদীর বাঁক। প্রাথমিকভাবে ঝুমুরকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়– ১. লৌকিক ও ২. নববারি। প্রয়োগগত দিক থেকে ঝুমুর ছয় প্রকার– ১. নাচনি নাচের ঝুমুর, ২. টাঁড় ঝুমুর, ৩. ছৌ নাচের ঝুমুর, ৪. খেমটা নাচের ঝুমুর, ৫. করম নাচের ঝুমুর, ৫. পাতা নাচের ঝুমুর। গানে অধ্যাত্মভাবনা যেমন আছে, তেমনি আছে সামাজিক রীতিনীতি, জীবনযাপন চিত্র, অভাব, লড়াইয়ের আহ্বান, পুরাণ, রাজনীতি, ইতিহাস, আর সব ছাপিয়ে প্রেম। সে প্রেম লৌকিক এবং তাতে দেহেরই প্রাধান্য। ষোড়শ শতকে প্রাচীন সংগীতবিষয়ক গ্রন্থ 'সংগীত দামোদর'-এ ঝুমুর এবং সংজ্ঞাদান প্রসঙ্গে শৃঙ্গার রসের আধিক্যের কথাই বলা হয়েছে। একটি ঝুমুর গানে দেখি– 'চোখে চোখে ইশারাতে আর মনের কথা বলি তোমাকে, / রসিক যে জন বুঝবে সে জন আমার মনের বেদনা। / ও হামার যৌবন-জ্বালা বড়ো জ্বালা বঁধু বিধেছে মদনা।।' উল্লেখযোগ্য ঝুমুর পদকর্তা জগৎ কবিরাজ, পদাধর চৌধুরী,

আড়াই হাজার গান রচনা করেন। একাধিপত্যে তাঁর গানে মুগ্ধ ছিলেন। তিনি সর্বশব্দালঙ্কারমুক্ত এক অনাবিষ্কৃত সাধক। তাঁর গানে পাই– 'সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে, লালন কয় জাতের কীরূপ দেখলাম না এই নজরে।' তাঁর একটি বিখ্যাত গান– 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায় / ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতাম তাহার পায়।'

প্র : জারিগান সম্পর্কে আলোচনা কর।

উ : মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে শোকবিহ্বল মহরম মাসেই জারিগানের ব্যবস্থা হতো– এতে মানসিকভাবেও শ্রোতা-দর্শক-দল প্রস্তুত থাকতো। উন্মুক্ত বৃক্ষ বা শামিয়ানার নিচে হওয়া জারিগানে সাধারণত দুইটি দল থাকতো একদল পরিশ্রান্ত হলে অন্যদল গাইত। প্রধান জবিয়ালের পায়ে নূপুর, হাতে লগ, কখনও পালে হাত দিয়ে (বাজনা বন্ধ) গান করত– কখনও মধ্যে বসা বয়াতির চারদিকে চক্রাকারে ঘুরে বাজনা বাজাত দোহারগণ– বয়াতি গানের মাধ্যমে নানা অসঙ্গতি করে জারিদলকে এগিয়ে নিত। শোকের মহরম মাসেই এই জারিগান শুনে বৃক্ষ-বৃক্ষদের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠত। বীরবল, হাসান, কাসেমের অপরূপ বিশেষণে তৈরি এবং অপূর্ব উপস্থিত বুদ্ধি বলে স্বতঃস্ফূর্ত উৎসারিত এই গান লোকায়ত বাংলা এবং লোকমানসের অন্যতম কাছের সামগ্রী, অসাধারণ জনপ্রিয়। জারিগানেও বক্তব্য অংশ লক্ষ করা যায়। মহরম মাস ছাড়া অন্যসময়ে সোনাভান, হাবেমতাই, বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনি নিয়ে জারিগানের আসরে গান তৈরি হতে দেখা যায়। নজীর প্রতাপ প্রাধান্যহীন ছিল না। তার কলমে নজীর ভূমিকায় কিশোরদের অংশগ্রহণে তা লোকরঞ্জক হয়ে উঠেছিল। আবদুর রহমান বয়াতি জারিগানের উল্লেখযোগ্য শিল্পী। তাঁর পরিবেশনার একটি জারিগানের উদাহরণ দেয়া হলো : 'সে কথাটি বলে গেল রাজা দিয়ে যায় / কত ছিল পাথারে সমান পানি যায় / সঙ্গে পাদর মাছ মাছে পায় / পানি হল দুইদিন আগে আছি মরতে চাই / হাসান জননী আমার কাছে যাই।'

প্র : জারিগান সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

উ : বাংলার মুসলমান সমাজের একান্ত উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ গান হলো জারিগান। শিয়া সম্প্রদায়ের অনুসারী মহরমপর্ব পালনকে ঘিরেই জন্ম নিয়েছে বলে করেন : মহরমের ঊনিশ দেখার সঙ্গে সঙ্গে জারিগানের সঙ্গে শুরু হয় জারিগান, চলে প্রায় দশদিন। সাধারণত এক-একটি দল ১২-২০ জন কিশোর ও তরুণ এই দলে অংশ নেয়। দলের প্রধান গিদি, ঢিমি গান করেন, কিন্তু নাচে অংশ গ্রহণ করেন না। গায়কদের অন্তর্ভুক্তবিশেষে বয়াতি, জোগালি- ইত্যাদি নাম হয়ে থাকে। গানে ও নাচে অংশ গ্রহণকারীদের 'সাইল', 'দোহার' বলা হয়। সাধারণত প্রতিদলের থাকে দুটি, শর্ত বা দোহি, হাতে ও মাথায় লাল জমাল জড়িয়ে জারিয়ালরা নেচে থাকে। কেউ কেউ পায়ে নূপুর বাঁধে। কোনও বয়াতি চটি নামক চামড়ার তৈরি জুতাও ব্যবহার করে, দোহাররা হাতেরটি সোজা মুসলিমবাদ্যে 'কাসিয়া' বলেও কথিত হয়ে থাকে। জারিগান বৃত্তাকার রেখায় হয়ে থাকে। মূল গায়েন প্রধানত কারবালার কারবালার পাথা পাদ, দোহারেরা দিশার গড়ন পেয়ে তাকে সহায়তা করে। শোকার্তভাব ফুটিয়ে তোলাই জারিগান ও জারিনাচের মূল লক্ষ্য। উৎসবে সে দিনে তৃতীয় কোনো সময়ে ব কারবালায় বিচ্ছিন্ন মানুষ সমাগমে না- গান অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় থাকে।

প্র : বাংলা সঙ্গীতবিষয়ক গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : বাংলা সঙ্গীতবিষয়ক গ্রন্থ বলতে ও প্রথমেই 'দুর্গাপদ'-এর নাম করতে হ কারণ এটি বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে রচিত হ বলিতে। প্রতিটি পদের পূর্বে রাগ-রাগি নাম লেখা ছিল। এখন সংগ্রহ বইখানাও মূল্যবান সঙ্গীতবিষয়ক। দ্বি

দিয়ে গীতিকা' তো মূলক গীতিনাট্য– সবে না কোনো আকারে আমাদের কাছে পরিচিত পাই। কিন্তু সঙ্গীতবিষয়ক গ্রন্থ বলতে আমাদের একদিন বলতে হয় 'গানের বই'-এর এসেছিল। ১৮৩১ সালে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস কর্তৃপক্ষের শিক্ষাদের জন্য এই এদেশ 'গানের বই'। সম্ভবত সেই শুরু। তারপর খ্রিষ্টান্দে গীতসংকলনগুলির সাহিত্যমূল্য কিন্তু না থাকলেও ঐতিহাসিক মূল্য কিছুটা থাকে। খ্রিষ্টধর্মের প্রভাবাধীনে মঞ্চেচড়ে এরা হিন্দুধর্মের প্রচার যেমন সংকলনগুলিতে দেখা যেতে থাকল, তেমনি সাধারণভাবে প্রচলিত হিন্দুধর্মের নানা মতের ও পথের সংরক্ষণও দেখা গেল

গীত-সংকলনে। বৈষ্ণবগান, শাক্তগান, ব্রহ্মসংগীতের বেশ কয়েকটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে। তখন ব্রহ্মসংগীতের সবচেয়ে বড় সংকলন ছিল বেচারাম চট্টোপাধ্যায় সংকলিত ৩ খণ্ডে 'সঙ্গীত মুক্তাবলী'। ক্রেমস লঙ একটি বইয়ের উল্লেখ করেছেন। বইটির নাম 'পিরের গান'। লেখক ও প্রকাশকাল অনুল্লেখিত। মুসলিম সম্প্রদায়ের গানের আর কোনো সংকলন বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায় নি। নিধুবাবুর গানের এক সংকলনগ্রন্থ বেরিয়েছিল ১৮৩৭ সালে জয়গোপাল তর্কের সম্পাদনায়। বইয়ের নাম 'গীতরত্ন'। কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব রসসাগর ৩ খণ্ডে সর্বজনপ্রিয় সঙ্গীত সংকলন 'সঙ্গীত রসার্ণব'

(১৮৮৯) প্রকাশ করেছিলেন। আদর্শ সঙ্গীত সংকলনের পথ-প্রদর্শকের সর্বাগ্রে স্থান করেছিল বইটি। ১৮৬৩-তে বাঙালি হিন্দু জমিদার বালোয় তাঁদের গান নিয়ে সম্মেলন শুরু করেছিলেন 'সঙ্গীত সুধাকর'। বিভিন্ন জমির রচনা সংকলন তাঁরা প্রকাশ করেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সেন মাস ১৮৮৯-এ। বইটির নাম 'সঙ্গীত তরঙ্গ'। ১৮৭৩ সালে বের হলো বাংলা ভাষায় প্রথম সঙ্গীতবিষয়ক সচিত্র মাসিক পত্রিকা 'সঙ্গীত কিরণমালা'। সম্পাদনা করলেন উমাচরণ সেন ও যোগেন্দ্রনাথ বসু। তবে সবচাইতে ছাপিয়ে গিয়েছিলেন নবেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ)। বছর পাঁচেকের মধ্যে নবেন্দ্রনাথ বৈষ্ণবচরণ বসাকের সঙ্গে যুগ্মভাবে সংকলন করলেন ৯৭৯ পৃষ্ঠার এক সুবৃহৎ গ্রন্থ 'সঙ্গীত কল্পতরু'। প্রকাশকাল ১৮৮৭-র নবেম্বর মাস। দেড় টাকা দামের ঐ বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপতে হলো মাত্র চার মাস তেতে না যেতে। পৃষ্ঠা বেড়ে হলো ৫৮৪। নাম আড়াই টাকা। তবুও ১১০০ কপি চার মাসের মধ্যেই নিঃশেষিত। ঐ বছর জুলাই মাসে ৩য় সংস্করণ ছাপতে হলো। দাম কমল দেড় টাকায়। এরপর তো গানের বইয়ের আর শেষ নেই। একটি গানের বইতো নোবেলই ছিনিয়ে আনল। 'গীতাঞ্জলি' তার নাম; লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

2020/5/15 21:28
Scanned with CamScanner

বাংলা একাডেমি ও একুশে বইমেলা সংক্রান্ত তথ্যাবলি

'Academy' একটি বিদেশি শব্দ। তাই একাডেমি বানানে ই-কার হবে। ২০১৩ সালে জাতীয় সংসদে পাসকৃত বাংলা একাডেমি আইনে একাডেমি বানান ই-কার (ি) গৃহীত হয়েছে। আগে 'বাংলা একাডেমী'– এই বানান লেখা হতো।

প্র : বাংলা একাডেমিকে কী বলা হয়?
উ : জাতির মননের প্রতীক।
প্র : বাংলা একাডেমি কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উ : ১৯৫৫ সালের ৩রা ডিসেম্বর।
প্র : কোথায় একাডেমির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়?
উ : ঢাকার রমনায় বর্ধমান হাউজের সামনে।
প্র : বর্তমানে বাংলা একাডেমি কোথায় অবস্থিত?
উ : ঢাকার ৩, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ-এ।
প্র : বর্ধমান হাউজ কী?
উ : বর্ধমানের তৎকালীন রাজা কর্তৃক নির্মিত বাড়ি। বর্তমানে এটা বাংলা একাডেমির কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
প্র : বাংলা একাডেমির 'উদ্বোধন-ভাষণ' কে পাঠ করেন?
উ : পূর্ববাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার।
প্র : কত তারিখে পূর্ববাংলা সরকার বাংলা একাডেমির 'প্রিপারেটরি কমিটি' গঠন করে আদেশ জারি করেন?
উ : ১৯৫৫ সালের ২৬শে নবেম্বর।
প্র : বাংলা একাডেমির প্রধানকে প্রথমে কী বলা হতো?
উ : স্পেশাল অফিসার বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।
প্র : কে প্রথম স্পেশাল অফিসার হিসেবে নিযুক্ত হন?
উ : মুহম্মদ বরকতউল্লাহ।
প্র : পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদে 'দি বেঙ্গলি একাডেমি অ্যাক্ট' কত সালে গৃহীত হয়?
উ : ১৯৫৭ সালের ৩রা এপ্রিল।
প্র : কত তারিখ থেকে উক্ত আইন বলবৎ হয়?
উ : ১৯৫৭ সালের ১০ই জুলাই থেকে।
প্র : কত তারিখে কাজিদের প্রথম নিয়োগ অনুষ্ঠিত হয়?
উ : ১৯৫৮ সালের ২৬শে মার্চ।
প্র : বাংলা একাডেমি কয়টি বিভাগ নিয়ে কাজ শুরু করে?
উ : ৪টি।
প্র : বিভাগগুলো কী কী?
উ : গবেষণা বিভাগ, অনুবাদ বিভাগ, সংকলন বিভাগ, প্রকাশনা বিভাগ।
প্র : বাংলা একাডেমিতে সভাপতি পদ সৃষ্টি হয় কখন ও কীভাবে?
উ : ১৯৬০ সালের ২৬শে জুলাই পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর 'দি বেঙ্গলি একাডেমি (অ্যামেন্ডমেন্ট) অর্ডিন্যান্স' জারির মাধ্যমে।
প্র : বাংলা একাডেমির সঙ্গে কোন প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় করা হয়, কবে?
উ : কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড; ১৯৭২ সালে।
প্র : বাংলা একাডেমির প্রধান নির্বাহী হিসেবে মহাপরিচালকের পদ সৃষ্টি করা হয় কবে, প্রথম মহাপরিচালক কে?
উ : ১৯৭২ সালে; প্রফেসর মনসুরুল ইসলাম।
প্র : বাংলা একাডেমি বর্তমানে কয়টি বিভাগে বিভক্ত হয়ে কাজ করছে?
উ : ৪টি বিভাগ এবং গ্রন্থাগার একটি পূর্ণ বিভাগের মর্যাদায়।
প্র : বিভাগ ৪টি কী?
উ : গবেষণা, সংকলন ও লোকজ বিভাগ; ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও পত্রিকা বিভাগ; পাঠ্যপুস্তক বিভাগ; প্রতিষ্ঠানিক, পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ।
প্র : বাংলা একাডেমির প্রথম সভাপতি কে?
উ : মওলানা আকরম খাঁ; ১৯৬১ সাল।
প্র : বাংলা একাডেমি বাংলা বানান অভিধানের সম্পাদক কে?
উ : জামিল চৌধুরী।
প্র : বাংলা একাডেমি ঐতিহাসিক অভিধানের সম্পাদক কে?
উ : মানজুরুর রহমান।
প্র : বাংলা একাডেমি বাংলা সাহিত্যকোষের সম্পাদক কে?
উ : সেলিনা হোসেন ও নুরুল ইসলাম।
প্র : বাংলা একাডেমি আঞ্চলিক ভাষার অভিধানের সম্পাদক কে?
উ : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও অন্যান্য।
প্র : উপন্যাসিক আবু ইসহাক বাংলা একাডেমিতে একটি অভিধান সম্পাদনা করেছেন। তার নাম কী?
উ : বাংলা একাডেমি সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধান।
প্র : বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত নজরুল রচনাবলি কে সম্পাদনা করেন?
উ : আবদুল কাদির।
প্র : বাংলা একাডেমি সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান-এর সম্পাদক কে?
উ : আহমদ শরীফ।
প্র : বাংলা একাডেমি থেকে কয়টি সাময়িকী ও পত্রিকা বের হয়?
উ : ৬টি
প্র : 'উত্তরাধিকার' কী ধরনের সাময়িকী?
উ : সৃজনশীল সাহিত্য ত্রৈমাসিক। ২০০৯ থেকে মাসিক হিসেবে প্রকাশ পায়।
প্র : 'বাংলা একাডেমি পত্রিকা' কোন ধরনের?
উ : গবেষণামূলক ত্রৈমাসিক।
প্র : 'বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান পত্রিকা' কোন ধরনের?
উ : 'বিজ্ঞান গবেষণামূলক বান্মাসিক'।
প্র : 'The Bangla Academy Journal' কোন ধরনের?
উ : ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত গবেষণামূলক বাণ্মাসিক পত্রিকা।
প্র : 'ধানশালিকের দেশ' কোন ধরনের পত্রিকা?
উ : ত্রৈমাসিক কিশোর সাহিত্য পত্রিকা।
প্র : বাংলা একাডেমির মাসিক পত্রিকার নাম কী?
উ : 'লেখা'।
প্র : কবে বাংলা একাডেমি চত্বরে নজরুল মঞ্চ উদ্বোধন করা হয়?
উ : ২০০৩ সালের ২৫শে জুন।
প্র : বাংলা একাডেমিতে সম্প্রতি পুস্তকক্ষ কোথায়?
উ : কাজী নজরুল ইসলাম মার্কায় এসে বর্তমান মাটিতে বর্তমান বাতিলাশ করেন। বর্তমান মাটিতে একটি কক্ষকে 'নজরুল পুস্তকক্ষ' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।
প্র : বাংলা একাডেমি কোন কোন বার্ষিক সাহিত্যিক পুরস্কার প্রদান করে থাকে?
উ : 'বাংলা একাডেমির বার্ষিক অনুষ্ঠানমালা' পূর্ব নির্ধারিত। এই প্রতিষ্ঠান বার্ষিক সাহিত্যিকদের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীন বন্ধুমিত্র হোসেন, কায়কোবাদ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমেন্দ্র সাধারণের হোসেন, জসীম উদ্দীন, কাজী নজরুল ইসলাম, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ স্মরণে বার্ষিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। তবে প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে বইমেলার অনুষ্ঠানে যে আলোচনা হয়, সেখানে অন্যদের নিয়েও আলোচনার সুযোগ থাকে।
প্র : ১৯৯১ থেকে ২০০০ পর্যন্ত এক দশকের বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্তদের নাম লেখ।
উ : ১৯৯১ : বিশ্বনাথ বসুমা ও হাবীবুল্লাহ সিরাজী
১৯৯২ : ইমদাদুল হক মিলন ও মুনতাসীর মামুন
১৯৯৩ : বশীর আলহেলাল ও আখলাক শ্রাবন চৌধুরী
১৯৯৪ : ওয়াকিল আহমদ ও সিকদার আমিনুল হক
১৯৯৫ : সৈয়দ আবুল মকসুদ ও শাহরিয়ার কবির
১৯৯৬ : মঈনুল আহসান সাবের ও সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
১৯৯৭ : কেউ পুরস্কার পান নি
১৯৯৮ : সন্‌জীদা খাতুন ও মঞ্জু সরকার
১৯৯৯ : নাসরীন জাহান
২০০০ : কেউ পুরস্কার পান নি।

দ্রষ্টব্য : এই দশ বছর কাউকে বিষয়ভিত্তিক পুরস্কার না দিয়ে 'সামগ্রিক অবদানের জন্য' পুরস্কার প্রদান করা হয়।

Scanned with CamScanner

প্র : বাংলা একাডেমির বই মেলার প্রবর্তক কে?
উ : চিত্তরঞ্জন সাহা।
প্র : চিত্তরঞ্জন সাহা কে এবং কিভাবে তিনি এতো বড় মেলার প্রবর্তক হলেন?
উ : চিত্তরঞ্জন সাহা ছিলেন গ্রন্থপ্রকাশক, শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবক। ১৯২৭ সালের পহেলা জানুয়ারি তিনি নোয়াখালি জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কৈলাশচন্দ্র সাহা ছিলেন কাপড় ব্যবসায়ী। চিত্তরঞ্জন চৌমুহনী কলেজ থেকে বিএ পাস করার পর পিতার লাভজনক কাপড়ের ব্যবসা না করে পুস্তক ব্যবসা আরম্ভ করেন। নিজে লেখাপড়া করার সময় বইয়ের অভাব বোধ করেন বলে পাকিস্তানে ছাত্রছাত্রীদের জন্য নোটবই ছাপা ও বিক্রির জন্য চৌমুহনীতে 'পুঁথিঘর' নামে বইয়ের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ১৯৫৬ সালে তিনি ঢাকায় এসে ব্যবসা আরম্ভ করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর গ্রামের বাড়ি ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান পাকিস্তানপন্থীরা পুড়িয়ে দিলে তিনি কলকাতায় আশ্রয় নেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কলকাতায় তিনি সূচনা করেন প্রবাসী বাঙালি লেখকদের লেখা নিয়ে গ্রন্থ প্রকাশ। শওকত ওসমান, আবদুল গাফফার চৌধুরী, সত্যেন সেন প্রমুখ বাংলাদেশি লেখকদের লেখা প্রকাশ করতে গিয়ে ১৯৭১ সালেই 'মুক্তধারা' নামে একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন তিনি। তাই 'মুক্তধারা'ই বাংলাদেশের প্রথম সৃজনশীল গ্রন্থ প্রকাশনাপ্রতিষ্ঠান। সেই যুদ্ধকালেও 'মুক্তধারা' থেকে বত্রিশটি বই তিনি প্রকাশ করতে সক্ষম হন, যা মুক্তিযুদ্ধেরই অংশ। দেশ স্বাধীন হলে ১৯৭২ সালে বাংলা একাডেমি একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে সাত দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই সংবাদ পেয়ে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে মাদুর পেতে চিত্তরঞ্জন সাহা বসে যান সেই বইমেলা। [illegible] বিক্রি হয়। তখন [illegible] অমর ভাণ্ডার [illegible] প্রতি বছর একুশে [illegible] সাহা বাংলা একাডেমি [illegible] ১৯৭২ সালে 'মুক্তধারা' [illegible] কিতাবঘর', 'বাস [illegible] নিয়ে বসে। সেখানেই [illegible] বই ব্যবসায়ীরা ১৯৭৮ [illegible] নিজেরাই যে যার বসে [illegible] একাডেমি চত্বরে বসতে [illegible] শৃঙ্খলা বিধান করার [illegible] বাংলা একাডেমি [illegible] একটি নীতিমালা প্রণয়ন [illegible] সালে বাংলা একাডেমির [illegible] মনজুর মওলার সময় [illegible] আনুষ্ঠানিক নাম প্রদান [illegible] একুশে গ্রন্থমেলা'। ১৯৮৪ [illegible] বাংলা একাডেমির [illegible] আরম্ভ হয় আজকের বইমেলা।
প্র : চিত্তরঞ্জন সাহা আর কী করেন?
উ : তিনি শুধু পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক ছিলেন না, ছিলেন জ্ঞানরাজ্য বিস্তারে নীরব কর্মী। লেখকদের জন্য 'মুকুরে পুরস্কার', 'একুশে সাহিত্য পুরস্কার' তিনি প্রদান করতেন। 'বইয়ের খবর' ও 'সাহিত্যপত্র' নামে দুটো পত্রিকা প্রকাশ করেও তিনি লেখকদের লেখা প্রকাশের ক্ষেত্রনির্মাণ করেন। তাঁর স্ত্রী বিজলীপ্রভা সাহা ছিলেন 'সাহিত্যপত্র'-এর সম্পাদক।
প্র : তাঁর কর্মের স্বীকৃতি কিভাবে মিলেছে?
উ : অনেক পুরস্কার ও পদক তিনি লাভ করেন। ২০০৫ সালে পান রাষ্ট্রীয় একুশে পদক।
প্র : কবে চিত্তরঞ্জন সাহা মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ২০০৭ সালের ২৬শে ডিসেম্বর নিজস্ব চিত্তরঞ্জন সাহা ঢাকার একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

ভাষাশহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

২১শে ফেব্রুয়ারি : ১৯৫২

প্র : কোন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা?
উ : বাংলাদেশ।
প্র : কত খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষ ভাগ হয় ও পাকিস্তানের জন্ম হয়?
উ : ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে।
প্র : সর্বপ্রথম মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষার্থে কোথায় ও কবে আন্দোলন হয়?
উ : এক সময়ের পূর্ব পাকিস্তান বর্তমান বাংলাদেশে, ১৯৫২ সালে।
প্র : কি নিয়ে পাকিস্তানে ভাষা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল?
উ : কয়াদিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের শিক্ষা সম্মেলনে গৃহীত হয় একমাত্র উর্দু হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা- এ নিয়েই ভাষা সমস্যাটি দানা বাঁধে।
প্র : পাকিস্তানের ভাষা সংগ্রাম কেন শুরু হয়েছিল?
উ : মোট জনসংখ্যার অধিক সংখ্যক হলেই বাঙালি অথচ পাকিস্তান সরকার বাংলা ভাষাকে উৎখাত করে উর্দুভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল।
প্র : রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের প্রথম সভা কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
উ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে।
প্র : কোন দিনটি বিশ্বমাতৃভাষা (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা) দিবস হিসেবে স্বীকৃত হয়?
উ : ২১শে ফেব্রুয়ারি।
প্র : মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষার্থে প্রথম কবে, কোথায় মানুষ শহিদ হন?
উ : ১৯৫২-র ২১শে ফেব্রুয়ারি, প্রথম ঢাকায় বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় মানুষ শহিদ হন।
প্র : মাতৃভাষা বাংলার জন্য ২১শে ফেব্রুয়ারি কতজন শহিদ হন, তাঁদের নাম কী?
উ : একুশের শহিদের সংখ্যা- (১) অজানা জব্বার (২) রফিক উদ্দিন আহমেদ (৩) আবদুল সালাম (৪) অজানা বরকত (৫) শফিউর রহমান। তাঁদের মতোদের পুলিশ গুলিতে শিয়েছিল, তাঁদের নাম জানা যায় নি।
প্র : ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে কত বাংলাদেশ কত তারিখ ছিল?
উ : ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের ৮ই ফাল্গুন।
প্র : বাংলাদেশের কোথায় এবং কবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়?
উ : ঢাকার সেগুন বাগিচায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২০০১ সালের ১৪ই মার্চ, বুনিয়াদিবর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়।
প্র : কে এই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন?
উ : তাহিসাবের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনান।
প্র : 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলতে পারি'- গানটির কথা ও সুরকার কে?
উ : গানটি লেখেন আব্দুল গাফফার চৌধুরী। গানটির সুরকার আলতাফ মাহমুদ।
প্র : 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি'- (ক) গানটির প্রথম সুরকার ও শিল্পী কে? (খ) কোথায় প্রথম গানটি গাওয়া হয়?
উ : (ক) গানটির প্রথম সুরকার ও শিল্পী আবদুল লতিফ (খ) ঢাকা কলেজের মতুল হলে ইউনিয়নের অভিষেক অনুষ্ঠানে গানটি প্রথম গাওয়া হয়।

Scanned with CamScanner

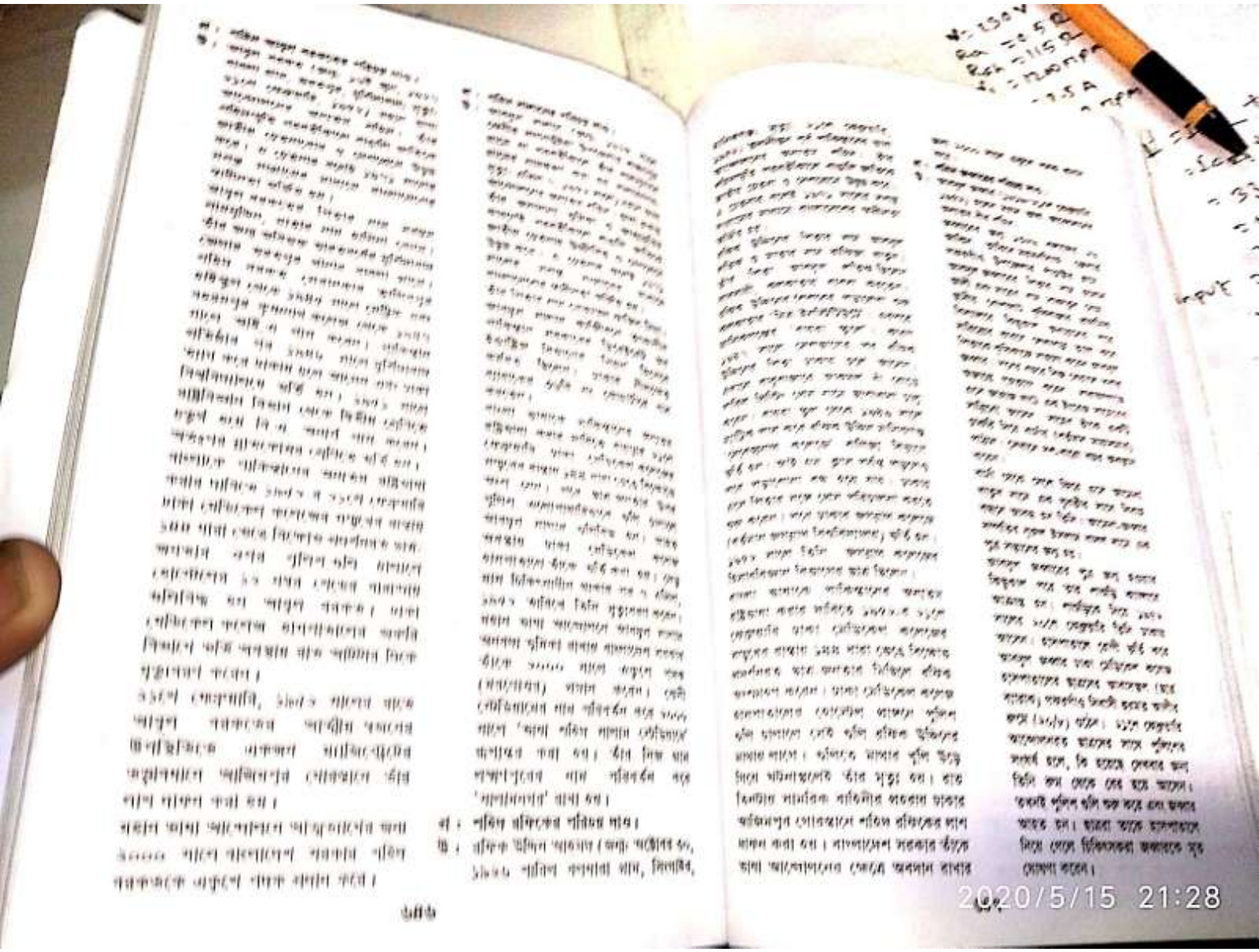

2020/5/15 21:28

Scanned with CamScanner

মহান ভাষা আন্দোলনে অসামান্য ভূমিকা রাখায় আবদুল জব্বারকে রাষ্ট্রীয়ভাবে সরকার ২০০৪ সালে একুশে পদক (মরণোত্তর) প্রদান করেন।

প্র : শহিদ শফিউরের পরিচয় দাও।

উ : শফিউর রহমান (জন্ম জানুয়ারি ২৮, ১৯১৮ – মৃত্যু ফেব্রুয়ারি ২২, ১৯৫২) মহান ভাষা আন্দোলনের অমরতম শহীদ। শফিউর রহমান বর্তমানে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার কোন্নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাহবুবুর রহমান ছিলেন ঢাকার পোস্ট এন্ড টেলিগ্রাফ অফিসের সুপারিনটেনডেন্ট। কলকাতা গভর্নমেন্ট কমার্শিয়াল কলেজ হতে আই.কম. পাস করে শফিউর রহমান চব্বিশ পরগনা সিভিল সাপ্লাই অফিসে কেরানির চাকরি গ্রহণ করেন। ১৯৪৫ সালে কলকাতার তমিজউদ্দিনের কন্যা আকিলা খাতুনের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। দেশ বিভাগের পর পিতার সঙ্গে ঢাকায় এসে ঢাকা হাইকোর্ট হিসাব রক্ষণ শাখায় কেরানি পদে যোগ দেন।

১৯৫২-র ২২শে ফেব্রুয়ারি সকাল দশটার দিকে ঢাকার রঘুনাথ দাস লেনের বাসা থেকে সাইকেলে চড়ে অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা হন শফিউর। সকাল সাড়ে দশটার দিকে নওয়াবপুর রোডে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে পূর্বদিনের পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশ পুনরায় গুলিবর্ষণ করে। পুলিশের গুলি শফিউর রহমানের পিঠে এসে লাগে। আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়। তাঁর শরীরে অস্ত্রোপচার করা হয়। অস্ত্রোপচার সফল না হওয়ায় ঐদিন সন্ধ্যা সাতটায় মৃত্যুবরণ করেন। কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে ২২শে ফেব্রুয়ারির মধ্যরাতে আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয়। তাঁর কবরের পাশেই রয়েছে পূর্বদিনের শহিদ আবুল বরকতের কবর। ২০০৫ সালে তৎকালীন বাংলাদেশ

সরকারের পক্ষ থেকে শফিউর রহমানকে একুশে পদক (মরণোত্তর) প্রদান করা হয়।

প্র : ভাষাসৈনিক ভাষা আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা কী?

উ : বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলনের নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ভাষা আন্দোলনের সময় তখনকার অবস্থান ছিল বর্তমান মেডিকেল কলেজে। সেখানকার আমতলাটি ছিল তখনকার সমস্ত ছাত্র আন্দোলন ও সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু। বর্তমানে ঢাকা মেডিকেলের ডাকসাঁই বিভাগের সামনের ঐতিহাসিক ১৪৪ ধারা ভাঙার স্মারক পোস্টটি ১৯৭২ সালের ভাষা আন্দোলনের উজ্জ্বল সাক্ষ্য হয়ে আছে। ১৯৫১ সালে বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কর্মীপরিষদ গঠিত হয়। ১৯৫২ সালের ২৭শে জানুয়ারি ঢাকায় পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ঘোষণা করেন। বাঙালির মুখের ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি। ৩০শে জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ছাত্রদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় ঢাকার সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ৩১শে জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠিত হয় 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'। এই পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি কর্তৃক ঘোষিত ৪ঠা ফেব্রুয়ারির ধর্মঘটের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে। ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস ঘোষিত হলে ২০শে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় নুরুল আমিন সরকার ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা

সংগ্রাম কমিটি' সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা পরিষদের সহযোগী হিসাবে কাজ করে যাবে। একুশে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করবে। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সকালে সাধারণ ছাত্রসমাজ আমতলায় সমবেত হবেন সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ঐতিহাসিক ছাত্রসভার আহ্বায়ক করে। সভায় ১৪৪ ধারা অমান্য করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ছাত্ররা পরিষদ ভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শনের চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। পরিণতিতে ২১শে ফেব্রুয়ারি অপরাহ্নে গুলি চালায় তৎকালীন পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর পোষিত সেনা বাহিনী। এর ফলে মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের কাছে প্রথম দফায় গুলিতে জব্বার ও রফিক এবং ২য় দফায় গুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবুল বরকত নিহত হন। এছাড়াও গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন সালাম। আহত হন অনেকেই। মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসই ছিল রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ক্যানভাস আর এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা ছিল সেই ক্যানভাসের বস্তুবড়া অমর চিত্র। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও এর ছাত্রছাত্রীরা ছাড়া ভাষা আন্দোলনের কোনো ছবিই অঙ্কিত হতে পারে না। তাই বলা চলে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হলো রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূতিকাগার।

প্র : একুশের প্রথম শহিদ কাকে বলা হয়?

উ : একুশের প্রথম শহিদ রফিক উদ্দিন আহমদ। তিনি ছিলেন মানিকগঞ্জের আবদুল লতিফের বড় ছেলে। তাঁর মায়ের নাম রাফিজা খাতুন। সিংগাইর উপজেলার পারিল গ্রামে ছিল তাঁদের বাড়ি। ১৯৫২ সালে রফিকের বয়স হয়েছিল ২৬ বছর। পুলিশের লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাসের কারণে ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ব্যারাকে আশ্রয় নেওয়ার সময় তাঁদের সঙ্গে ছিলেন রফিক। গুলিতে তাঁর মাথার খুলি উড়ে গিয়ে তখনই মারা যান তিনি। আজিমপুর কবরস্থানে অসংরক্ষিত এলাকায় দাফন করা হয় শহিদ রফিকের মরদেহ।

20/5/15 21:29

Scanned with CamScanner

মাথা প্রতি হয়েছিল দুই টাকা আট আনা। হাতের লেখা কপি করে সংকলনটি প্রকাশের টাকা জোগাড় করেছিলেন হাসান হাফিজুর রহমান। এটি প্রকাশিত হওয়ার পর প্রকাশকের অজান্তেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত সংকলনটিকে ঐতিহাসিক করে সংকলন। পরে ১৯৫৬ সালে অকাউন্ট রহমান খান, হুমায়ুন কবীর, খাকাডাকে ডেমোক্রেসি প্রভাতফেরি করা হয়।

কিন্তু এই সংকলনের আগে ঢাকার মাদুছ সম্পাদিত 'ওরা প্রাণ দিল' সংকলন ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বের হয় বলে কলকাতা থেকে। মনীকুজ্জামান বাঙ্গালী নেতা প্রথম নকশী 'সংকলনী' হইনামে কলকাতার ২০ বি বালিগঞ্জ সেকেন্ড রোড বেরু প্রকাশনী থেকে 'ওরা প্রাণ দিল' নামে এই সংকলন সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। এতে লেখেন বিমলচন্দ্র ঘোষ, সৈয়দ আবুল হুদা, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, মুহম্মদ বশীর (তিনি হাসান হাফিজুর রহমানের সংকলনেও যুক্ত ছিলেন), নিতা বসু, তালিমা বেগম প্রমুখ। লেখকদের অনেকেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাসিন্দা। সেদিক থেকে একুশের প্রথম সংকলন কিন্তু 'ওরা প্রাণ দিল'। তবে পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত প্রথম সংকলন 'একুশে ফেব্রুয়ারী'। সংকলনটির প্রচ্ছদ এবং এর কিছু লেখা ২০০৮ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি দৈনিক 'প্রথম আলো' পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। এই সংকলনে দাবি করা হয়, মাতৃভাষার দাবিতে শহিদ হয়েছেন ছাব্বিশ জন, আহত হয়েছেন একশ পঁচিশ জন, বন্দি হয়েছেন দুশ জন। সংকলনটির মূল্য ছিল চার আনা।

প্র : একুশের প্রথম স্মরণিকা সম্পর্কে লেখ।

উ : ঢাকা কলেজ ছাত্রাবাসের পক্ষ থেকে ১৯৫৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত চার পৃষ্ঠার পুস্তিকা শহিদের স্মরণে একুশের প্রথম স্মরণিকা। শুরুতেই আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ভয় নাই ওরে ভয় নাই/নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।' পরে কাজী নজরুল ইসলামের 'মন্দী থাকো ধীন অপমান ধীকারে যে ধীন কখনো শিশুকাকে মাথা নত করো না কারো অত্যাচার'।

স্মরণিকায় ছিল 'আন্দোলনের কথা' ও 'মুসলিম নাই বক্তব্য' একুশের কথা' শিরোনামের দুটি ছোট নিবন্ধ। তারা কোন ছাত্রাবাসের পক্ষ থেকে জানীয় জীবনে চিরস্মরণীয় একুশে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার সংগ্রামে যাঁরা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন সেই বীর শহীদদের অকুণ্ঠ উৎসর্গ করা হয় এই স্মরণিকা। এটিতে একটি আবেদনও ছিল। 'নিজে পড়িয়া অপরকে পড়িতে দিন।'

প্র : শহিদ মিনার ধ্বংসের প্রতিবাদে লেখা কবিতা কোনটি?

উ : ১৯৫২ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি পুলিশের হাতে প্রথম শহিদ মিনার ধ্বংসের প্রতিক্রিয়ায় কবি আবদুল্লাহ আল মুতী বয়না করেন 'স্মৃতিস্তম্ভ' নামের কবিতা। তখন শহিদ মিনারকে 'স্মৃতিস্তম্ভ' বলা হতো। বাংলা দিয়েই এর নামকরণ হয়েছিল। এই কবিতাটির কয়েকটি চরণ– 'স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার? ভয় কি বন্ধু আমরা এখনো/চারকোটি পরিবার/ ঝাড়া রয়েছি তো। যে-ভিৎ কখনো কোনো রাজনা/ পারেনি ভাঙতে।'

প্র : একুশের প্রথম কবিতা কোনটি?

উ : একুশের প্রথম কবিতা লেখেন মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী। কবিতার নাম 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি'। তখন তিনি প্রগতিশীল মাসিক সীমান্তর সম্পাদক এবং চট্টগ্রামের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন।

২২শে ফেব্রুয়ারি ১৭ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকায় ছাপা হয় 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি'। বইটির দাম রাখা হয় দুই আনা। ওই দিনই চট্টগ্রামের লালদিঘি ময়দানের জনসভায় রাজনৈতিক কর্মী হারুনুর রশীদ কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনান। কবিতাটি ছাপানোর সময় চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লার কোহিনুর প্রেসে হামলা চালায় পুলিশ। কিন্তু প্রেসের কর্মীরা

...সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ...ব্দুল হক গোপনে কপি গোপন করে ফেলতে সক্ষম হন। পুলিশ চলে গেলে আবার নতুন করে কপি ছাপার কাজ। সকালের মধ্যে পুস্তিকাটি প্রকাশ করে সরকার, কবির ...ত্বে আছে অপরাধে কোরিয়ুল হোসেন ...ন্দোলন সাবের আহমেদ চৌধুরী ও লেখক ...ক্তিকার চৌধুরী হারুনুর রশীদকে দীর্ঘ ...করতে হয়।

একুশের প্রথম গান কোনটি?

উ : একুশের প্রথম গান রচনা করেন আবদুল গাফফার চৌধুরী। গানটির প্রথম চরণ– 'ওলব না, ওলব না, একুশে ফেব্রুয়ারি ওলব না। এটি সে সময় ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। 'দূর হটো আই দুনিয়াওলালো, দুনিয়ুস্তান হামারা হায়'– জনপ্রিয় এ বিপ্লবীগান থেকে নেওয়া হয় গানটির সুর। ১৯৫৩ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি অরমানিটোলা ময়দানে আয়োজিত এক জনসভায় গানটি প্রথম গাওয়া হয়। এ সম্পর্কে গাজীউল হক তাঁর স্মৃতিচারণায় বলেছেন, 'সভায় শেখ মুজিবুর রহমানের অনুরোধে ভাষা আন্দোলনের ওপর লেখা গানটি আমাকে গেয়ে শোনাতে হয়। সময়ের প্রয়োজনেই গানটি লিখেছিলাম।'

একুশের প্রথম গান ও গানের রচয়িতা সম্পর্কে আবদুল গাফফার চৌধুরী বলেন, 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' রচনার আগেই গাজী ভাই (গাজীউল হক) লিখেছিলেন 'ভুলবো না ভুলবো না'। এটা ছিল তখনকার দিনে রাজপথের গান। সবাই এ গান গাইত।

একুশের প্রভাতফেরির প্রথম গান কোনটি?

১৯৫৩ সালে প্রথম শহিদ দিবসের প্রথম প্রভাতফেরিতে গাওয়া হলো 'মৃত্যুকে যারা তুচ্ছ করিল/ভাষা বাঁচাবার তরে/আজিকে স্মরিও তারে।' গানটির রচয়িতা প্রকৌশলী মোশারেফউদ্দিন আহমদ। ১৯৫৩ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি রাতে লেখা হয়েছিল এ গান। হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ লিখেছেন, 'সেই সংগীতই হয়ে ওঠে অমর

...একুশের প্রথম পাঠক কোনটি?

...'কবর'। তাদা আবদুল্লাহ জাহীর হাসান ...অপরাধে ১৯৫২ সালে ফেব্রু কাফতার ছিলেন। তখন কারাগারে ও পুলিশ চৌধুরীবাড়ি, আলফ সেবক-সংগঠক রণাঙ্গন লালদিঘি ময়দান থেকে পুলিশ চৌধুরীকে তাদা আবদুল্লাহ-আল-নাটক লিখে দেওয়ার অনুরোধ করে একটি চিরকুট পাঠান। পরিচয় দিয়ে রাজবন্দিরাই নাটকটি সবার মধ্যাজ্ঞা ও আলোর ব্যবস্থা করা না। তাই মুনীর চৌধুরীকে রাত নাটকটি এমনভাবে লিখতে হবে, যাতে খুব সহজে জেলেই এটি অভিনয় করা যায়। আর নারী চরিত্র যেন না থাকে। মুনীর চৌধুরী '৫৩ সালের ১২ই জানুয়ারি নাটকটি লিখে শেষ করেন। এই সময়ের ২১শে ফেব্রুয়ারি, রাত ১২টার জেলকক্ষগুলোর বন্দি সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর হ্যারিকেনের আলো-আঁধারিতে মঞ্চস্থ হয় 'কবর'। অভিনয় করেন যাঁরা নলিনী দাস, অরুণ রায় প্রমুখ।

প্র : একুশের প্রথম উপন্যাস কোনটি?

উ : অমর একুশের ওপর লেখা প্রথম উপন্যাস 'আরেক ফাল্গুন'। শহিদ নিবন্ধ পাঠক, একুশের মিটিং-মিছিল, সংগ্রামী হাত, শহিদ মিনার নির্মাণসহ একুশের স্মৃতিবিজড়িত নানা ঘটনাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটি লিখেছেন জহির রায়হান। পঞ্চাশের দশকেই এটি পত্রিকায় ছাপা হয়, বই আকারে বের হয় '৬৯ সালে। (এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত জহির রায়হান অংশে)।

2020/5/15 21:29

Scanned with CamScanner

প্র : একুশের ইতিহাস নিয়ে প্রথম বই কোনটি?

উ : ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির রক্তাক্ত ঘটনার মাত্র তিন মাস পর ভাষা আন্দোলন ও একুশের ইতিহাস নিয়ে লেখা হয় ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস। গ্রন্থটির সম্পাদক অধ্যাপক (পরে প্রিন্সিপাল) আবুল কাসেম। '৫২ সালের জুন মাসে 'আমাদের প্রেস' থেকে মুদ্রিত এবং তমদ্দুন লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত হয় এ বই। প্রথম সংস্করণে প্রিন্টার্স লাইনে লেখা আছে—প্রকাশনায় হাসান ইকবাল, ১৯ নম্বর আজিমপুর রোড, ঢাকা। মুদ্রণে এন আর জামালী, 'আমাদের প্রেস' ১৯ আজিমপুর রোড, ঢাকা। প্রাপ্তিস্থান তমদ্দুন লাইব্রেরি, ১৯ আজিমপুর, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৫২। দাম চার আনা। দুই কভারসহ মোট ৪০ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটির সাইজ ৭.৫ ইঞ্চি বাই ৫ ইঞ্চি। বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে এবং তৃতীয় সংস্করণ ১৯৬৯ সালের মার্চে।

প্র : 'শহিদ মিনারে'র পূর্ব নাম কী ছিল?

উ : ১৯৫২ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি রাতে শহিদদের স্মরণে ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে নির্মিত হয়েছিল 'শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ।' পুরোনো ফটোগ্রাফে এটা প্রমাণিত। তাছাড়া আলাউদ্দিন আল আজাদ এটি ধ্বংসের প্রতিবাদে 'স্মৃতিস্তম্ভ' নামে কবিতাও লেখেন। 'স্মৃতি' ও 'স্তম্ভ' দুটোই বাংলা ভাষীদের শব্দ। পরে পাকিস্তান আমলেই 'শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ' কে 'শহিদ মিনার' নামে অভিহিত করা হতে থাকে। বাংলা শব্দের বদলে এর সঙ্গে যুক্ত হয় আরবি শব্দ। বাংলা ভাষার জন্য অবদানকারীদের স্মরণে নির্মিত স্থাপনার নামে একটিও বাংলা শব্দ অবশিষ্ট থাকে না। এর তারিখও ৮ই ফাল্গুন এর বদলে ২১শে ফেব্রুয়ারি হিসেবে পরিচিতি পায়।

প্র : প্রথম শহিদ মিনার সম্পর্কে লেখ।

উ : শহিদ মিনার প্রথমে ছিল ১১ ফুট লম্বা বিশিষ্ট একটি স্তম্ভ। ২১শে ফেব্রুয়ারি শহীদ হাবিবের মেডিকেল কলেজের ছাত্রনেতা গোলাম মওলা ও তাঁর সহযোগীদের উদ্যোগে স্তম্ভটি রাতারাতি গড়ে তোলে প্রায় ৩০০ মানুষ। এদের বেশির ভাগই ছিলেন মেডিকেলের ছাত্র। তখন এর নাম ছিল 'শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ'। এই স্তম্ভের মূল নকশা করেছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র বদরুল আলম। কারিগরি আর হাতে হিবে করা শীত উপেক্ষা করে তৈরি করা এই শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ দেখতে পরদিন ভিড় জমায় শত শত মানুষ। ফুল থেকে শুরু করে টাকা-পয়সা পর্যন্ত অনেক কিছুই দান করতে থাকে তারা। নাম না-জানা এক নারী দান করেন তাঁর গলার হার।

বর্তমান শহিদ মিনার নির্মাণের স্থান নির্বাচন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল ১৯৫৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি। এর নকশা প্রণয়ন ও পরিকল্পনা করেন শিল্পী হামিদুর রহমান। একটা প্রশস্ত ভিত্তিভূমি ও পাঁচটি উচ্চমিনার নিয়ে এই শহিদ মিনারের সৌধ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সাদা পাথরের ভিত্তিভূমি পার হয়ে মিনারের পাদদেশে গিয়ে জনগণ শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন শহিদদের উদ্দেশে। আর পাঁচটি মিনারের পরিকল্পনা করা হয় মা ও সন্তানের মানব বন্ধনের কথা ভেবে। প্রথম বড় মিনারটি মায়ের রূপ আর তার দুপাশে রয়েছে মায়ের চার সন্তান। এ যেন মায়ের মমতার ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে সেই সন্তানেরা। শহিদ মিনারের এই শান্ত সৌম্য অভিব্যক্তি জাতীয় ইতিহাসের একটি অন্যতম স্মারক। ভাষা শহিদদের এই স্মৃতিফলকটি ১৯৭১ সালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আবারো গুঁড়িয়ে দেয়। ১৯৭২ সালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে ঐ ভগ্ন শহিদ মিনারেই পালিত হয় প্রথম শহিদ দিবস।

১৯৭৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি থেকে শহিদ মিনারটির স্তম্ভ পুনর্নির্মাণ এবং জাতীয় সংসদে এর সম্প্রসারণ করা হয়।

প্র : প্রথম শহিদ দিবস সম্পর্কে লেখ।

উ : ১৯৫৩ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি প্রথমবারের মতো পালন করা হয় শহিদ দিবস। ওই দিন বিভিন্ন স্তরের ও শ্রেণির মানুষ বিশেষ করে মহিলা শ্রমিক পায়ে ও সুবিন্যস্তভাবে পরিচালিত দীর্ঘ শোভাযাত্রা নিয়ে শহর প্রদক্ষিণ করে। সঙ্গে সঙ্গে নগরবাসী আজিমপুর কবরস্থানে গিয়ে শহিদদের আত্মার শান্তি কামনা করে ও কবরে পুষ্পমালা অর্পণ করে। বেলা ১২টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হয় শোভাযাত্রীরা। ১২টার সময় সেখান থেকে সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে বের হয় তারা। শোভাযাত্রীরা শোকজ্ঞাপক কালো পতাকা, কালো ব্যাজ ধারণ করে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'রাজবন্দিদের মুক্তি চাই' প্রভৃতি স্লোগান সহকারে অগ্রসর হতে থাকে।

প্র : একুশের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে প্রথম প্রকাশ্য জনসভা কোনটি?

উ : একুশের শহিদদের স্মরণে ১৯৫২ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি গায়েবানা জানাযার পর একটি সংক্ষিপ্ত সভা হয়। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন যুবলীগের যুগ্ম সম্পাদক মহম্মদ এমাদুল্লাহ। সভাপতির ভাষণে তিনি দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান। সভাপতির ভাষণের আগে একমাত্র অলি আহাদই এ সভায় বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, 'নুরুল আমীন সরকারের হত্যার জবাব দিব ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মারফত, মাতৃভাষা বাংলাকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার দ্বারা।'

প্র : একুশের ঘটনার প্রতিবাদে আইন পরিষদ থেকে পদত্যাগকারী প্রথম সদস্য কে?

উ : ১৯৫২ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি দৈনিক 'আজাদ' সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন পূর্বক পরিষদের সদস্য পদে ইস্তফা দেন। সভার ও পরিষদের সিদ্ধান্তের কপি একটি টাইপে ঠিক করে, 'বাংলাকে পরিষদের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করি দাবির ভিত্তিতে উদ্ভূত গুলিবর্ষণে অতি পরিষদ অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে আমি সরকারের অবিবেচনা, যে নৃশংস ও ন্যাক্কারজনক গুলিবর্ষণ চালিয়ে সরকার, তাহাতে ছাত্রসহ অনেক নিরস্ত্র নাগরিক নিহত ও আহত হইয়াছেন, তাহার প্রতিবাদে আমি পরিষদের সদস্যপদ হইতে ইস্তফা দিতেছি।' অতঃপর এ ব্যাপারে তাঁদের দৃঢ়তা এবং মনের সাহস ও অকপট স্বীকৃতির এই পরিচয়ের সমতুল্য স্বীকৃতে চেয়ে আমি লজ্জাজনক বলে মনে করি। অতঃপর কালাম শামসুদ্দিনই প্রথম সদস্য, যিনি একুশের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে আইন পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন।

প্র : একুশের স্মরণে প্রথম বিশেষ সংখ্যা কোনটি?

উ : একুশে ফেব্রুয়ারির গুলি ও ছাত্রহত্যার প্রতিবাদে ২২শে ফেব্রুয়ারি সারা দেশে হরতাল পালিত হয়। ঐই দিন বিভিন্ন আবার গুলি চালায় পুলিশ। হরতাল হয় বহু ছাত্র-জনতা। একুশের এই রক্তাক্ত ঘটনার পর ২৩শে ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সৈনিক'-এর শহীদ সংখ্যা। সকালে পত্রিকা হকারের মাত্র দুই ঘণ্টার মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যায় এক হাজার কপি এবং পরে পুনর্মুদ্রণ করা হয়। এটাই ছিল ভাষা আন্দোলনের অমর শহিদদের স্মরণে কোনো পত্রিকার প্রথম বিশেষ সংখ্যা।

প্র : একুশে স্মরণে প্রথম মিছিল কোনটি?

উ : ১৯৫২ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি বাদের জানাজা শেষে সমবেত হাজার হাজার ছাত্র, শ্রমিক, সরকারি-বেসরকারি কর্মচারীসহ সর্বস্তরের জনগণ বিশাল মিছিল নিয়ে হাইকোর্টের পথ ধরে নবাবপুর রোডের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'খুনি নুরুল আমিনের বিচার চাই', 'খুনের বদলে খুন

2025/5/15 21:29

Scanned with CamScanner

চাই' ইত্যাদি স্লোগান দিতে দিতে মিছিলটি হাইকোর্টের গেটের সামনে উপস্থিত হলে বিপুলসংখ্যক পুলিশ তাদের পথ রোধ করে। মিছিলটি সেক্রেটারিয়েটের পাশ দিয়ে আবদুল গণি রোড ধরে অগ্রসর হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মিছিল গণি রোডের দিকে মোড় নিতে শুরু করা মাত্র পুলিশ একই সঙ্গে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ ও লাঠিচার্জ শুরু করে। মিছিলকারীদের অনেকেই এ সময় ফজলুল হক হল, কার্জন হল, ঢাকা হলসহ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ও হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে আশ্রয় গ্রহণ করে।

প্র : কে প্রথম একুশের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে আইন পরিষদে প্রথম বক্তব্য দেন?

উ : ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বেলা সাড়ে তিনটায় পূর্ববঙ্গ পরিষদের অধিবেশন শুরু হয়। মাত্র ঘণ্টা কয়েক আগে ছাত্রদের ওপর গুলি চালনার প্রতিবাদে অধিবেশন সেদিনের জন্য স্থগিত রাখার দাবি জানান আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ। তিনি বলেন, 'জনাব স্পিকার সাহেব, প্রশ্নোত্তরের পূর্বে আমি আপনার কাছে একটা নিবেদন করতে চাই। যখন দেশের ছাত্ররা, যারা আমাদের ভাবী আশা-ভরসাস্থল, পুলিশের গুলির আঘাতে জীবনলীলা সাঙ্গ করছে, সেই সময় আমরা এখানে বসে সভা করতে চাই না। প্রথমে ইনকোয়ারি তারপর হাউস চলবে।' একুশে ফেব্রুয়ারি ছাত্রহত্যার প্রতিবাদে এটাই ছিল আইন পরিষদে প্রথম বক্তব্য।

প্র : পাকিস্তান গণপরিষদে কে প্রথম বাংলায় বক্তৃতা করেন?

উ : ১৯৫২ সালের ১২ আগস্ট সব ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলায় বক্তৃতা শুরু করেন। পশ্চিম পাকিস্তানি গণপরিষদ সদস্যরা নানা উপহাস করে এ সময় তর্কবাগীশকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে। কিন্তু উপহাস উপেক্ষা করেই তর্কবাগীশ বাংলায় বক্তব্য দেন। বাংলায় বক্তৃতা রেকর্ড করার জন্য এই সময় আইনসভার কোণে যন্ত্রপাতি রাখা হয়। মাওলানা তর্কবাগীশ পেশ করেছিলেন স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণের সব পদ্ধতির জন্য লোক নিয়োগ করা হয়।

প্র : একুশের প্রথম ইশতেহার কোনটি?

উ : একুশে ফেব্রুয়ারি গুলিবর্ষণের পর এই দিনই পাকিস্তানের অভিষ্টনিধি শাসক সরকারের বর্বর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে পূর্ববঙ্গ কমিটি 'অন্যায়ারী যুদ্ধম অভিযান' পূর্ববঙ্গব্যাপী তুমুল ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তুলুন' শীর্ষক একটি ইশতেহার প্রচার করে। সাইক্লোস্টাইল করা এ ইশতেহারই ছিল একুশের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে প্রথম ইশতেহার।

১৯শে মে : ১৯৬১

প্র : ১৯৬১ সালের ভাষা আন্দোলন কী?

উ : ভারতের আসাম রাজ্যের বরাক উপত্যকার শিলচর জেলায় ১৯৬১ সালের ১৯শে মে বাংলাকে রাজ্যভাষা করার দাবিতে বিএসএফের গুলিতে ১১জন বাঙালি প্রাণ দেন। সেখানের রাজ্য সরকার শুধু অহমিয়া ভাষাকে রাজ্যভাষা করার ঘোষণা দেবার কারণে এই আন্দোলন হয়। শিলচর বাংলাদেশের সিলেট জেলার পূর্ব সীমান্ত সংলগ্ন।

প্র : মাতৃভাষা প্রেমী হিসেবে সারা ভারতে বরাক উপত্যকার নাম ছড়িয়ে পড়ার কারণ কী?

উ : মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার্থে বরাকের সন্তানেরা হাসিমুখে প্রাণ বলি দিয়েছিলেন।

প্র : বরাক উপত্যকার নিখিল আসাম বাংলাভাষা ও অন্যান্য অনঅসমিয়া ভাষা সম্মেলন কোথায় কবে হয়েছিল?

উ : শিলচর, ১লা, ২রা ও ৩রা জুলাই ১৯৬০ সালে।

প্র : উক্ত সম্মেলনে সভাপতির পদ কে গ্রহণ করেছিলেন?

উ : চপলাকান্ত ভট্টাচার্য।

প্র : একমাত্র অসমিয়া ভাষাকে রাজ্য ভাষা করে বিধানসভায় কবে বিলটি গৃহীত হয়?

উ : ২৪শে অক্টোবর, ১৯৬০ সালে।

প্র : ভাষা বিলের প্রতিবাদে নিখিল আসাম বাঙালী সম্মেলন কোথায় ও কবে হয়?

উ : হোজাই, ৫ই-৬ই নভেম্বর, ১৯৬০ সালে।

প্র : আসাম রাজ্য ভাষাবিল কবে রাজ্যপালের অনুমোদন পায়?

উ : ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৬০ সালে।

প্র : রাজ্যভাষা প্রশ্নে উপত্যকার প্রথম জনসম্মেলন কোথায় কবে অনুষ্ঠিত হয়?

উ : আসামের তরিমপাতে। ৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৬১ সালে।

প্র : বরাক উপত্যকার কোন কোন সালে ভাষা সংগ্রাম হয়েছিল?

উ : ১৯৬১, ১৯৭২, ১৯৮৬, ১৯৯৬ সালে।

প্র : বরাক উপত্যকার শহিদ দিবসগুলি উল্লেখ কর।

উ : (১) ১৯শে মে, ১৯৬১, (২) ১৭ই আগস্ট, ১৯৭২ (৩) ২১শে জুলাই, ১৯৮৬ (৪) ১৬ই মার্চ, ১৯৯৬।

প্র : ১৯৬১-র ভাষা সংগ্রামের শহিদ কজন? এবং তাদের নাম কী?

উ : শহিদ ১১ জন। তাদের নাম- (১) কমলা ভট্টাচার্য (২) শচীন্দ্রচন্দ্র পাল (৩) চণ্ডীচরণ সূত্রধর (৪) কুমুদরঞ্জন দাস (৫) কানাইলাল নিয়োগী (৬) সুকোমল পুরকায়স্থ (৭) সুনীল সরকার (৮) হীতেশ বিশ্বাস (৯) তরণী দেবনাথ (১০) বীরেন্দ্র সূত্রধর (১১) সত্যেন্দ্র দেব।

প্র : মেহেরোত্রা কমিশন কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গঠন করা হয়েছিল?

উ : শিলচর রেল স্টেশনে সত্যাগ্রহীদের উপর পুলিশের গুলিচালনার পরিপ্রেক্ষিতে।

প্র : ১৯৬১-র সংশোধিত ভাষা আইনটি কী ছিল?

উ : বরাক উপত্যকার সর্বস্তরের কাজকর্মে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হবে।

প্র : বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় প্রথম মহিলা শহিদ কে?

উ : শহিদ কমলা ভট্টাচার্য।

প্র : 'অসমীয়া অফিসার্স ল্যাঙ্গুয়েজ এক্ট' কবে পাশ হয়েছিল?

উ : ১৯৬০ সালে।

প্র : ১৯৬১-র ভাষা আন্দোলনে অসমাপ্তকারী সংগঠনগুলোর নাম কী?

উ : কাছাড় পলাশগ্রাম পরিষদ, কাছাড় ভাষা সংগ্রাম সমিতি, হাফলং সম্মেলন কেন্দ্র কার্বিআংলং শাখা ও হাফলংবাসীর নাম।

প্র : ১৯শে মের প্রকাশ্য শহিদের স্মৃতির উদ্দেশে স্থাপিত শহিদ মিনারটি কোথায় অবস্থিত?

উ : শিলচর শহীদবাগে।

প্র : ১৯৬১ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় আসামের মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন?

উ : বিমলা প্রসাদ চালিহা।

প্র : আসামের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী কোন সালের কোন মাসের কত তারিখে আসাম বিধানসভায় ভাষা-বিল পাশ করেন?

উ : ১৯৬০ সালের ২৪শে অক্টোবর।

প্র : ১৯৬০ সালের অক্টোবর মাসে আসাম বিধানসভায় উপস্থাপিত ভাষা বিলের মূল কথা কী ছিল?

উ : আসামের একমাত্র রাজ্যভাষা হবে অসমীয়া।

প্র : ১৯৬০ সালের এই ভাষা বিলের প্রতিবাদে কাছাড় ছাড়া আর কোথায় সেদিন 'কালো দিবস' পালিত হয়?

উ : সেদিন শুধু কাছাড়েই নয়, শিলচর শহীদ লেফ্‌টেন্যান্টের সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয় এবং ৪০ হাজার নর-নারী শিলচরের পথে পথে মিছিল করে বিক্ষোভ দেখায়।

প্র : প্রস্তাবিত ভাষাবিলের প্রতিবাদে অবিভক্ত কাছাড় জেলায় কোন দিনটি 'সর্বত্র দিবস' রূপে পালিত হয়?

উ : ১লা বৈশাখ, ১৪ই এপ্রিল, ১৯৬১।

প্র : ১৯৬১ সালের ভাষা আন্দোলনের সময়কার আসামের মুখ্যমন্ত্রী বিমলা প্রসাদ চালিহা কোন নির্বাচন কেন্দ্র থেকে বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন?

উ : বরাক উপত্যকার করিমগঞ্জ নির্বাচন কেন্দ্র থেকে।

2020/5/15 21:29
Scanned with CamScanner

প্র : আসামের প্রথম রাজ্যভাষা কোনটি?
উ : অসমীয়া।
প্র : অসম ভাষা কবে আইনে রূপান্তরিত হয়?
উ : ১৯৬০ সালের ১৬ ই অক্টোবর 'অসম ভাষা বিল' আইনে রূপান্তরিত হয়। আইনে বলা হয় অসমীয়া ভাষাই সমগ্র আসামের সরকারি ভাষা।
প্র : কাছাড় জেলা গণসংগ্রাম পরিষদের দ্বিতীয় সম্মেলন কবে কোথায় হয়?
উ : ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৬১ সালে। করিমগঞ্জে।
প্র : ১৯শে মে-র গুলিচালনার পর কমিশনের বিচারক কে ছিলেন?
উ : আসাম হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি গোপালজি মেহরোত্রা।
প্র : মেহরোত্রা তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট সরকারের নিকট কবে দাখিল করা হয়?
উ : ১০ই এপ্রিল, ১৯৬২ সালে।
প্র : উনিশে মে-র পরবর্তী বেসরকারি তদন্ত কমিশনে কে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন?
উ : নির্মল চন্দ্র চ্যাটার্জি (এন-সি-চ্যাটার্জি)।
প্র : উনিশে মে-র প্রথম কবিতা কোনটি? কবির নাম কী?
উ : কবি গোলাম কিবরিয়ার 'উনিশের কবিতা।'
প্র : উনিশের প্রথম সংকলন গ্রন্থ কোনটি?
উ : উনিশের উত্তরাধিকার। সম্পাদক– অনন্ত দেব, মৃণালকান্তি বিশ্বাস, মিলন উজ্জিল লস্কর, ইমান উজ্জিল বুলবুল, তৈমুর রাজা চৌধুরী।
প্র : উনিশের প্রবন্ধ সংকলন কোনটি?
উ : কালোকোল। সম্পাদক কানু আইচ।
প্র : উনিশের কাব্য সংকলন?
উ : উনিশ আত্মস্থান হও– কবি অনুরূপা বিশ্বাস।
তেমন করার নেই মোহ্ উনিশে মে – কবি করুণারঞ্জন ভট্টাচার্য।
মাতৃভূমি বাংলা ভাষা, মা – নির্মলকান্তি লস্কর।
প্র : উনিশের তথ্যনিষ্ট ইতিহাস গ্রন্থ?
উ : 'বরাক উপত্যকার ভাষা সংগ্রাম' – দেবব্রত পুরকায়স্থ।

'ভারতের বাংলাভাষা সংগ্রাম' – দেবব্রত কানু আইচ।
প্র : উনিশের স্মৃতিস্তম্ভ?
উ : 'ভাষাশহিদ' – লেখক পরিচয়ে শ্রী চৌধুরী।
প্র : একুশটির ভাষা সংগ্রামের কবিতাগুলি কোন সংস্থা কুড়িয়ে হাতে আছে?
উ : কাছাড় জেলা শান্তি পরিষদ।
প্র : একুশটির ভাষা সমস্যার সমাধানে কেন্দ্র বাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হস্তক্ষেপ করেন? কি ভাবে?
উ : পণ্ডিতজীর মুখ্যমন্ত্রী ড. বিধানচন্দ্র রায়, ত্রিপুরা ফর্মুলার মাধ্যমে। সংবিধানের ৩৪৭ ধারা সংশোধনের দাবি।
প্র : একুশটির ভাষা সমস্যা সমাধানে কোন সূত্রকে মেনে নেওয়া হয়?
উ : শাস্ত্রী সূত্র বা শাস্ত্রী ফর্মুলা।
প্র : সংক্ষেপে সংশোধিত শাস্ত্রী ফর্মুলা কী?
উ : শাস্ত্রী ফর্মুলার মূল বক্তব্য– (১) সমতুল্য পরিষদের কৃত্যাত ধারা উঠিয়ে দেওয়া। (২) কাছাড়ে বাংলা ভাষার প্রচলন। (৩) রাজধানীর সাথে কাছাড়ের (বর্তমান বরাক উপত্যকায়) পত্রালাপ বাংলায়। (৪) গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার এম.এ. পড়ার সুযোগ। (৫) সাধ্যমতো বঙ্গ কবচ প্রয়োগ। (৬) কাছাড় সংক্রান্ত সকল বিল, অর্ডিনেন্স নোটিশ বাংলা ভাষায় প্রচারিত হবে।
প্র : আসাম বিধানসভার কবে বাংলা বিল সংশোধন হয়?
উ : ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬১।

১৭ই অগস্ট : ১৯৭২

প্র : ১৯৭২-এ আবার ভাষা আন্দোলন হবার কারণ কী?
উ : ১৯৬১ সালের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর বরাক উপত্যকার জন্য বাংলা ভাষা সরকারি স্বীকৃতি লাভ করলেও ১৯৭২-এ উচ্চতরে শিক্ষার মাধ্যম একমাত্র অসমিয়া এই নির্দেশ জারি করার প্রতিবাদে বাহাত্তর সালের বাংলা ভাষা আন্দোলন শুরু হয়।

প্র : ১৯৭২-এর ভাষা আন্দোলনের শহিদ কে?
উ : শহিদ নিরঞ্জন গুরুকে শান্তু চক্রবর্তী।
প্র : ১৯৭২ সালের কত তারিখে শান্তু চক্রবর্তী শহিদ হন?
উ : ১৯৭২ সালের ১৭ই অগস্ট।
প্র : মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষা অধিকারের রক্ষায় সেমিনের সেই গুরুত্বপূর্ণ সভার সভাপতিত্ব কে করেন?
উ : হাইলাকান্দি পুরানভাব তখনকার মহাপতি হরিদাস দেব।
প্র : বাহাত্তরের শহিদ শান্তু চক্রবর্তীর জন্ম ও মৃত্যুর তিনটি তাৎপর্যবাহী কেন?
উ : তাঁর জন্ম ও মৃত্যু একই তারিখে ১৯৪৯ এর ১৭ই অগস্ট তার জন্ম হয় এবং মৃত্যু হয় ১৯৭২ এর ১৭ই অগস্ট।
প্র : ১৯৭২ সালে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কোন কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রীকে আসামে পাঠিয়েছিলেন?
উ : পররাষ্ট্র বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী কৃষ্ণচন্দ্র পন্থ (কে. কি. পন্থ)।
প্র : কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কে. সি. পন্থের সঙ্গে আলাম সরকার, সংগ্রাম পরিষদ এবং ছাত্রযুব সংগ্রাম পরিষদের কোথায়, কবে বৈঠক হয়েছিল?
উ : শিলংয়ে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই ও ১৮ই এপ্রিল।
প্র : কে. সি. পন্থের সমাধান সূত্রে কারা স্বাক্ষর করেছিলেন?
উ : মুখ্যমন্ত্রী শরৎচন্দ্র সিংহ, সাংসদ মইনুল হক চৌধুরী, মন্ত্রী মহীতোষ পুরকায়স্থ, শিক্ষামন্ত্রী হরেন্দ্রচন্দ্র তালুকদার, সাংসদ নীহাররঞ্জন লস্কর, বিধায়ক বিধনাথ উপাধ্যায়, সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুল জলিল চৌধুরী, সংগ্রাম পরিষদের সম্পাদক তারাপদ ভট্টাচার্য এবং সদস্য অধ্যাপক যতীন্দ্র মোহন দে ও মতিলাল জাড়াপিরার। ছাত্র-যুব সংগ্রাম পরিষদের সম্পাদক সুনীল রায় এবং সদস্য আব্দুল কাদুম চৌধুরী।
প্র : বরাক, কোথায় কে. সি. পন্থের সমাধান সূত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল?
উ : ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল শিলং-এ।
প্র : আসামের উচ্চশিক্ষা 'ভাষা বিল' এবং উপরের ক্ষুরে শিক্ষার আসার কী?
উ : একমাত্র ইংরেজি ভাষা।
প্র : আসামের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নাম কী?
উ : (ক) গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে (খ) তিজপুর বিশ্ববিদ্যালয়, (গ) আসাম বিশ্ববিদ্যালয় শিলচর (ঘ) ডেব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়াও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, জোরহাট এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেকনলজি, (এন. আই. টি.) শিলচরের নাম উল্লেখ্য।
প্র : বরাক উপত্যকার বাংলা ভাষা সংগ্রামের অমর শহিদ বলতে কাকে বুঝি?
উ : শহিদ নিরঞ্জন গুরুকে শান্তু চক্রবর্তী।
প্র : ১৯৭২-এ আসামের মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন?
উ : শরৎচন্দ্র সিংহ।
প্র : অমর শহিদ শান্তু চক্রবর্তীর শেষকৃত্য কোথায় সমাপন হয়?
উ : শিলচর শ্মশানঘাটে।

২৪শে জুলাই : ১৯৮৬

প্র : বরাক উপত্যকা ছাত্র যুব সংগ্রাম কমিটির কবে এবং কোথায় জন্ম হয়?
উ : ১৯৮২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর, শিলচরে জন্ম হয়।
প্র : বরাক উপত্যকার '৮৬ আন্দোলনকারী সংগঠনের নাম কী ছিল?
উ : বরাক উপত্যকা সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি।
প্র : এই কমিটির মুখ্য আহ্বায়ক কে ছিলেন?
উ : শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন কর।
প্র : কোন কোন মূল দাবি নিয়ে '৮৬য়ে বরাক উপত্যকার বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক আন্দোলনকারী সংগঠনের জন্ম হয়?
উ : 'সেবা' ভাষা সর্বস্তরে বিরুদ্ধে ও কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে দাবিতে।
প্র : 'সেবা' ভাষা সর্বস্তরে কী জারি করা হয়েছিল?
উ : অসমীয়া ভাষা-চর্চাসেবং

2020/5/15 21:29
Scanned with CamScanner

অসমীয়া ভাষায় বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে।

প্র : ১৯৮৬র আন্দোলনের আহ্বায়ক কমিটির দাবিগুলো কী ছিল?

উ : (১) বরাকে একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়। (২) ভাষা সার্কুলার প্রত্যাহারের দুই দফা দাবির ভিত্তিতে আন্দোলনের কার্যসূচি গৃহীত হয়।

প্র : ১৯৮৬ সালে আসামের মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন?

উ : প্রফুল্ল কুমার মহন্ত।

প্র : '৮৬তে করিমগঞ্জের স্বেচ্ছাসেবক সেবিকাদের স্লোগান কী ছিল?

উ : কালো ব্যাজ পরা স্বেচ্ছাসেবক সেবিকাদের মুখে আওয়াজ ছিল – 'গো ব্যাক প্রফুল্ল কুমার মহন্ত', 'বাংলা ভাষা ফিরিয়ে দাও, নইলে তুমি চলে যাও'। 'সেবা সার্কুলার মানছি না, মানব না'।

প্র : কবে সেবা সার্কুলার স্থগিত ঘোষণা করা হলো?

উ : ১৯৮৬ সালের ১৫ই অগস্ট।

প্র : '৮৬র ২১শে জুলাই করিমগঞ্জে গুলির খবরে শিলচরে তার প্রতিক্রিয়া কিরূপ হলো?

উ : শিলচরে সেদিন স্বতঃস্ফূর্তভাবে দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়, জনজীবন স্তব্ধ হয়ে পড়ে। শহরের বিভিন্ন এলাকায় উত্তেজনা ও বিভিন্ন ছোটখাট ঘটনাও ঘটে। শহরে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়।

প্র : ১৯৮৬র ২১শে জুলাইর প্রতিবাদ কবে এবং কোথায় ঐতিহাসিক মিছিল হয়েছিল?

উ : ১৯৮৬র ২৪শে জুলাই সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির জেলা কমিটির আহ্বানে পুলিশি গুলি ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রায় বিশ হাজার লোকের এক মৌন ঐতিহাসিক মিছিল বেরিয়েছিল।

প্র : ১৯৮৬-র আন্দোলনের শহিদ কজন? তাদের নাম কী? কোথায়, কবে শহিদ হয়েছিলেন।

প্র : দফা কার্যসূচি নিয়ে কবে সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি মিছিল নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন?

উ : ১৭ই এপ্রিল ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে তৃণা আহ্বায়ক মিছির লাল রায় সহ ৪০ জনের এক প্রতিনিধিদল দিল্লি গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন।

প্র : সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির এই স্মারকলিপি প্রদান কার্যকরী না হওয়ায় কমিটির পরবর্তী পদক্ষেপ কী ছিল?

উ : ভারতের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করা।

প্র : সাংসদে বরাকে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিলটি কবে পাস হয়েছিল এবং তা আবার স্থগিত হলো কেন?

উ : বিল পাস হয় ১৯৮৮ তে। আসাম সরকার এই বিলের সম্মতি জানান নি বলে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে আইনি বাধা হয়ে থাকল।

প্র : বরাকে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রসঙ্গে আসাম সরকারের সঙ্গে সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির কবার আলোচনা হয়?

উ : তিনবার। প্রথমবার : ১৯৮৮র ২১শে মে। শিলচর সার্কিট হাউসে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল কুমার মোহন্তের সঙ্গে। সেই আলোচনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। ২য়বার : দিসপুরে আলোচনা হয় সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির সঙ্গে। সরকারের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন মন্ত্রী ললিত রাজঘোয়া এই আলোচনা ব্যর্থ হয়। ৩য়বার : মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল কুমার মোহন্ত সংগ্রাম সমন্বয় কমিটিকে ১৯৯০ সালের মার্চ দিসপুরে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

প্র : ৩য়বারের আলোচনার প্রস্তাবগুলি কী ছিল?

উ : প্রস্তাবগুলো ছিল– বরাকে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিলকে আসাম সরকার কর্তৃক সম্মত জানানো, এর জমির ব্যবস্থা করা, বরাকে বন্যা নিয়ন্ত্রণে সচেতন হওয়া, বেহাল রাস্তাঘাট মেরামত করা, সেবা ভাষা সার্কুলার ভবিষ্যতে জারি করা না হয়। আন্দোলনকারীর উপর সাজানো

Scanned with CamScanner

খ্রি.), (২) শহিদ সলিল সিংহ (কেংকুরী ১৯৯৫ খ্রি.), (৩) শহিদ সুদেষ্ণা সিংহ (পাথারকান্দি ১৯৯৬ খ্রি.)।

প্র : কত তারিখে শহিদ সুদেষ্ণা শহিদ হন?

উ : ১৬ই মার্চ ১৯৯৬ সালে।

প্র : কত তারিখে শহিদ সলিল সিংহ শহিদ হন?

উ : ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৯৫ সালে।

প্র : সুদেষ্ণা সিংহ কোথায় শহিদ হন?

উ : পাথারকান্দির বিলবাড়ি নামক স্থানে।

প্র : পুলিশ কেন সেদিন কলকলিঘাটে (বিলবাড়ি) গুলি চালিয়েছিল?

উ : বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে কলকলিঘাটে (বিলবাড়ি) জনতা রেল অবরোধ করেছিল বলে।

প্র : শহিদ রাজবাবুর শহিদ হবার কারণ কী?

উ : 'মণিপুরী' পত্রিকার মাধ্যমে মণিপুরী জাতির অধিকারের আলোচনায় সোচ্চার ছিলেন এবং যে মাতৃভাষা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর অধিকাংশ শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে উদ্ভূত সেই মণিপুরী জাতিকে পার্বত্য জাতি বলে সরকারি ঘোষণার প্রতিবাদে সোচ্চার হন, ফলে মণিপুরী একাংশ তাতে বিক্ষুব্ধ হন। তার পরিচালিত 'মণিপুরী' পত্রিকায় (১৯৩০ খ্রি.) এই বিষয়ে বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। পত্রিকার কাজ শেষ করে রাতে বাড়ি ফেরার পথে অজ্ঞাত আততায়ীদের হাতে নিহত হন (১৯৩৪)। উল্লেখ্য সমগ্র বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজের উদ্যোগে শহিদ শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁকে বিষ্ণুপুর মণিপুরীরা প্রথম ভাষা-শহিদ বলে মনে করে থাকে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

প্র : অষ্টম শতকে বিশ্বে কতগুলো ভাষার অস্তিত্ব ছিল বলে মনে করা হয়?

উ : প্রায় ২০ হাজার।

প্র : বর্তমানে বিশ্বে কতগুলো ভাষা রয়েছে?

উ : বর্তমানে বিশ্বে সাড়ে ছয় হাজার ভাষা রয়েছে। তবে স্থাবলম্বী ভাষা আড়াই হাজারের বেশি নয়। আমরাই ভাষা মরার খোরাক, যে আমাদের বলা ও সুন্দরভাবে লেখার উপাদান বা দিশি আছে।

প্র : একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা দেওয়ার জন্য জাতিসংঘের মহাসচিবকে পত্র দেওয়া ব্যাপারটি প্রথম কে কে আনেন?

উ : রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম।

প্র : রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম কে?

উ : রফিকুল ইসলাম বুদ্ধিজীবী নিয়ন্ত্রী হিসেবে আর আবদুস সালামের বাড়ি ফিরে চট্টগ্রামে। উভয়ে চাকরি ও কর্মসূত্রে কানাডার ভ্যাঙ্কুভারে অবস্থান করছিলেন। সংগঠনের দিক থেকে তাঁরা ছিলেন সেখানকার বঙ্গবন্ধু পরিষদের রফিকুল ইসলাম ছিলেন বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি আর আবদুস সালাম ছিলেন উপদেষ্টা। কানাডায় তাঁরা একটি 'বাংলা বিদ্যালয়' খোলার পরিকল্পনা করেন এবং তখনই তাঁদের মনে আসে যে, পৃথিবী থেকে বহুভাষা হারিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা করা হলে মানুষ নিজেদের মাতৃভাষার প্রতি মনোযোগী হবে।

প্র : একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ঘোষণা করার অনুরোধ জানিয়ে কে কবে কার কাছে প্রথম পত্র দেবেন?

উ : রফিকুল ইসলাম জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনানের কাছে ১৯৯৭ সালের ৯ই জানুয়ারি প্রথম পত্র লেখেন।

প্র : সেই পত্রের কোনো উত্তর কি এসেছিল?

উ : ১৯৯৮ সালের ২৩শে জানুয়ারি কফি আনান রফিকুল ইসলামকে এক পত্রে জানান যে, এধরনের প্রস্তাব কোনো ব্যক্তির পক্ষ থেকে এলে গ্রহণ করা হয় না। কোনো রাষ্ট্র বা সরকারের কাছ থেকে এমন প্রস্তাব এলেই তা কেবল বিবেচনার যোগ্য হয়।

প্র : 'দ্য মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ লাভার্স অব দ্য ওয়ার্ল্ড' কী?

উ : এটি ১৯৯৮ সালে কানাডায় গঠিত একটি সংগঠন। রফিকুল ইসলাম কফি আনানের কাছে থেকে চিঠি (১৯৯৮) পাবার পর কানাডার সমমনা সদস্যদের নিয়ে এই সংগঠন গড়েন। এখানে বিশ্বের সাতটি প্রান্তের মানুষ ছিল। যাঁরা এই সংগঠনের সদস্য ছিলেন, তাঁরা হলেন : আলমাস জিনজুন (ফিলিপিনো ভাষা), কবমেন ফ্রিডেবাল (ফিলিপিনো ভাষা), জেসন রবিন (ইংরেজি ভাষা), সুজান ছয় জিনস (ইংরেজি ভাষা), ডা. কেলফিন চাও (কেন্টনিজ ভাষা), নাজনিন ইসলাম (বেঙ্গলি ভাষা), রেমেটা মার্টিনস (জার্মান ভাষা), করুণা জোশী (হিন্দি ভাষা) এবং বাংলা ভাষী আবদুস সালাম ও রফিকুল ইসলাম। 'দ্য মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ লাভার্স অব দ্য ওয়ার্ল্ড'-এর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কে কে হন?

উ : সভাপতি হন রফিকুল ইসলাম আর সাধারণ সম্পাদক হন ফিলিপাইনের আলবার্ট জিনজুন।

প্র : এই সংগঠনের নামে জাতিসংঘের মহাসচিবের কাছে কবে দাবি উত্থাপন করা হয়?

উ : ১৯৯৮ সালের ২৯শে মার্চ এই সংগঠনের সদস্যদের স্বাক্ষরে ও সংগঠনের নামে জাতিসংঘের মহাসচিবকে আবার চিঠি দেয়া হয় যাতে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার অনুরোধ করা হয়। সেখান থেকে পরামর্শ প্রদান করা হয় যে, প্রস্তাবটি জাতিসংঘে না দিয়ে তার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ইউনেস্কোতে যেন পাঠানো হয়। কারণ এ জাতীয় বিষয় নিয়ে সেই সংস্থাই কাজ করে। সে অনুসারে ১৯৯৯ সালের ২৩শে জুন ইউনেস্কোতে আবেদন করা হয়।

প্র : একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ঘোষণা করার পেছনে কোন দেশগুলোর প্রত্যক্ষ সমর্থন ও দাবি ছিল?

উ : বাংলাদেশ, ভারত, কানাডা, হাঙ্গেরি ও ফিনল্যান্ড।

প্র : বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ইউনেস্কোতে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল কেন?

উ : কোনো ব্যক্তি বা সংগঠন থেকে প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না, প্রস্তাব আসতে হবে কোনো দেশের পক্ষ থেকে- এটাই নিয়ম। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্রস্তাব পাঠানো হয়। কারণ বাংলাদেশ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের দিক থেকে সমৃদ্ধ। এ দেশের ভাষাকে কেন্দ্র করে রক্ত ঝরেছে। এদেশের ভাষা নিয়ে যাঁরা কাজ করছেন, তাঁদের অনেকেই বিদেশে আছেন। তাঁদের অনেকেই বাংলাদেশের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করছেন। তাঁদের মাধ্যমে বাংলাদেশের পক্ষে প্রস্তাব পাঠানো সহজ হবে বলে এবং বাংলাদেশ ভাষা আন্দোলনের ঐতিহ্যের কারণে প্রস্তাবটি বাংলাদেশ থেকে পাঠানো হয়।

প্র : কত তারিখে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পায়?

উ : ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কোর জেনারেল কনফারেন্সে ১৮৮টি দেশের প্রতিনিধি দিবস আন্তর্জাতিক একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেন।

প্র : বাংলাদেশ ছাড়া আর কোন কোন দেশ এর সহ-প্রস্তাবক ছিল?

উ : ভারত, ইতালি, ইন্দোনেশিয়া, রাশিয়া, ইরান, ওমান, আইভরিকোস্ট, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, ইসরাইল, পাকিস্তান, চিলি, শ্রীলঙ্কাসহ ২৭টি দেশ।

প্র : কবে থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত হয়?

উ : ২০০০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি থেকেই

প্র : 'দ্য মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ লাভার্স অব দ্য ওয়ার্ল্ড' ও রফিক-সালাম কি কোন পদকে ভূষিত হিসেবে?

উ : ২০০১ সাল 'দ্য মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ লাভার্স অব দ্য ওয়ার্ল্ড' সংগঠনটি একুশে পদক এবং ২০১৬ সালে রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম স্বাধীনতা পদক লাভ করেন। ২০১৩ সালের ২০শে আগস্ট রফিকুল ইসলাম মারা যাওয়ায় তিনি পান মরণোত্তর স্বাধীনতা পদক।

2025/5/15 21:29

Scanned with CamScanner

খনার বচন

জন্ম থেকেই কথাটাদের মাথায় শব্দটি 'খনা' সেঁটেছে। বাংলা ও রাজ্যালির লোক-অনুবাদে এই নামটি আজ অজীব শব্দিত। লোকসাহিত্যের নানান প্রাচীনতম কাব্যকলাপে তাঁর বচন ছড়া-প্রবাদের আকারে প্রচলিত। তাঁকে নিয়ে লোকমুখে নানা গল্প, খনা ছিলেন জীবন্ত চরিত্র। তবু খনা কী, খনা ছিলেন কী—এ নিয়ে বিতর্ক আছে। তাঁর সম্পর্কে অনেকগুলো ভিন্নমতই প্রচলিত আছে। তবে সবগুলোতে তিনি একজন বিদুষী নারী হিসেবে উঠে এসেছেন। তাঁর জন্ম নিয়েও নানা মত আছে। কোনো কোনো বইয়ে তাঁকে সিংহলের রাজকন্যা বলা হয়েছে। আবার কোথাও তিনি সিংহলের রাজপুত্রী। তাঁর স্বামী মিহির ছিলেন উজ্জয়িনীর রাজসভার একজন সভাসদ। এবং তাঁর শ্বশুর ছিলেন বিখ্যাত জ্যোতিষী বরাহমিহির। বরাহমিহির ছিলেন রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাসদ। তিনি ও তাঁর পুত্র মিহির দুজনেই ছিলেন জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শী। এবং এ কারণে তাঁরা রাজসভায় বিশেষ সম্মান পেতেন। এমনকি বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে তাঁদের পারিবারিক সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল। এমনকি বিক্রমাদিত্য নিজে তাঁর পুত্রের জন্মকুণ্ডলি তৈরি করেছিলেন। এবং তাঁর জন্মের পর তিনি নিজে এসে শিশুটিকে আশীর্বাদ করে যান। এসব কারণে বরাহমিহির ও তাঁর পরিবার

২৯. এক মাসে তিন গ্রহণ।
মতে রাজা কি দেওয়ান ॥
৩০. একে তে নাদুনী বুড়ি,
তার উপর চোখের বাড়ি।
৩১. ওল কচু মান
তিন-ই সমান।
৩২. কচু বনে ছড়ালে ছাই,
খনা বলে তার সংখ্যা নাই।
৩৩. কপালে নাই ঘি,
ঠনঠনকালে হবে কি!
৩৪. কাচায় না নোয়ালে বাঁশ,
পাকলে করে ঠাস ঠাস।
৩৫. কার্ত্তিকের উনজলে।
খনা বলে ঘুনো ফলে ॥
৩৬. কানা মেঘের দৃষ্টি
সর্বত্র নয় বৃষ্টি।
৩৭. কানার ছাতা বুধের মাথায়
ক্ষেতের ফসল রাখবে কোথায়?
৩৮. কাঁচা রোপা শুকায়
ভুইয়ে ধান ভুইয়ে লুটায়।
৩৯. কাল ধানের ধরা পিঠা,
মা'র চেয়ে মাসি মিঠা।
৪০. কী করো শ্বশুর মিছে খেটে
ফাল্গুনে এঁটে পোত কেটে
বেড়ে যাবে ঝাড় কি ঝাড়
কলা বইতে ভাঙে ঘাড়।
৪১. কী করো শ্বশুর লেখা জোখা,
মেঘেই বুঝবে জলের রেখা।
কোদাল কুঙুলে মেঘের গাঁ,
মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা।
কৃষককে বলোগে বাঁধতে আল,
আজ না হয় হবে কাল।
৪২. কুয়ো হয় আমের ভয়
তাল তেঁতুলের কিবা ভয়!
৪৩. কৃষক ক্ষেতের বান্ধ আইল,
বৃষ্টি হইবে আইজ কাইল।
৪৪. খনা ডেকে বলে যান
রোদে ধান ছায়ায় পান।
৪৫. খনা বলে চাষার পো
শরতের শেষে সরিষা রো।
৪৬. খনা বরে, শোনো কৃষকগণ
হাল লয়ে মাঠে বেরুবে যখন
শুভ দেখে করবে যাত্রা
না হলে কাজে আসবে না।
ক্ষেতে দিয়ে করো দিক নিরূপণ,
পূর্বদিক হতে চাল চালন।
৪৭. খনা বলে, শুন জন
শাশুড়ির পেটে মুগা খুন।
৪৮. খনা বলে, শুনে যাও
নারিকেল মূলে ছিটা দাও
গাছ হয় তাজা মোটা
তাড়াতাড়ি ধরে গোটা।
৪৯. খনা বলে, শোনো ভাই
তুলায় তুলা অধিক পাই।
৫০. খরা ভুয়ে চালবি জল
সতরা বছর পাবি ফল।
৫১. খাঁদা নাকে আবার নথ।
৫২. খিলে লক্ষ্মী খিলে ধান।
ভুসে ঘুনে ভাড়ার বান্ধ।
৫৩. গরু ছাগলের মুখে বিষ।
চারা না খায় বাবিস দিস।
৫৪. গরু-জরু-ক্ষেত-পুতা,
চাষির বেটার মূল সুতা।
৫৫. গরুর মুখে ঘাস পানি।
হাল গুষ্টি পরে জানি।
৫৬. গাছ-গাছালি ঘন রোবে না
গাছ হবে তাতে ফল হবে না।
৫৭. গাছে গাছে আগুন জ্বলে
বৃষ্টি হবে খনায় বলে।
৫৮. গরু জরু ধান
এই তিনে চাষার মান।
৫৯. গাই বুড়ো আঁতে, বলদ বুড়ো দাঁতে।
৬০. গরুর মুখে দিয়ে ঘাষ
তার পরে করবে চাষ।
৬১. গাজর, গন্ধি, সুরী
তিন বোধে দূরী।
৬২. গাই দিয়ে বায় হাল।
দুঃখ তার চিরকাল ॥
৬৩. গাই পালে মেয়ে,
দুধ পড়ে বেয়ে।
৬৪. গাঙ দেখলে মুত আসে,
নাঙ দেখলে হাস আসে (নাঙ মানে স্বামী)।
৬৫. গাঁ গড়ানে ঘন পা।
যেমন মা তেমন ছা।

৬৬. সো নারিকেল সেচে যো
আধা টুকরা কাঁঠাল তো।
৬৭. সোবর দিয়া কর গভন,
জলে সরিষা পাতলা পাই,
৬৮. স্নেহে স্নেহে তাপাস পাই।
ঘরের কোনে মবিচ আছ লাল মরিচ ধরে,
৬৯. তোমার কথা মনে হলে চোখের জল পড়ে।
৭০. ত্রি হাত অন্তর এক হাত খাই।
তারা গাড়ো চারা ভাই।
৭১. থালা গোবর বাঁশে ছাই।
লক্ষের বাণিজ্য বসে পাই।
৭২. টাঁসে মুখে যাবে পয়ায়
তার ধান-ঠেইলো না যায়।
৭৩. টানের সভার মধ্যে তারা।
৭৪. বর্ষে পানি মুষল ধারা।
৭৫. চন্দি আর চষা মাটি
এ দুয়ে হয় দেশ খাঁটি।
৭৬. চাষে মূলা তার
অর্ধেক তুলা তার
বিনা চাষে পান।
৭৭. চালায় চালায় কুমুড় পাতা
লক্ষী বলেন আছি তথা।
৭৮. চাষা পাঁজি মশা।
৭৯. চৈত্র মাসে পাঁচ শনি পায়।
নারের মুত্র গড়াগড়ি যায়।
৮০. চৈতে লাগাইলে আলা।
বৈশাখে লাগাইলে আধা।
৮১. চৈতে বৃষ্টি নাশে রিষ্টি
চাষার ক্ষেতে শুভদৃষ্টি।
৮২. চৈত্রে দিয়া মাটি
বৈশাখে কর পরিপাটি।
৮৩. চৈতের কুয়া আমের ক্ষয়।
তাল তেঁতুলের কিবা হয়।
৮৪. চৈত্রে কুয়া ভাদ্রে বান
নর মুত্র গড়াগড়ি যান।
৮৫. চৈত্রেতে খর খর;
বৈশাখেতে ঝড় পাথর
জ্যৈষ্ঠতে তার ফুটে;
তবে জানবে বর্ষা বটে।
৮৬. চোরের মার বড় গলা
লাফ দিয়ে খায় গাছের কলা।
৮৭. ছালের কান লাম্বা শুকর জান।
বেড়ালের ইঁদুর ধরে শর্বজান।
৮৮. ছায়া আলো ছাতার বল
সদা আলো দিবের বল।
৮৯. ছাতার বলে বুলবুলায় যুদ্ধ।
কিন্তু তাতে নইলো যুদ্ধ ॥
৯০. জাওলা আছে।
ছায়া আছে।
৯১. জ্যেষ্ঠে খরা, আষাঢ়ে ভরা
শাসোর তার সঙ্গে লা করা।
৯২. জ্যৈষ্ঠতে তারা মৃগী
তবে জানবে বর্ষা ভারী।
৯৩. জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ,
তিন না জানে বরাহ।
৯৪. জাতের গরু ছিনতা কালা।
৯৫. ভাল নিড়ান সাজন আলি
তাতেও দিও লালা শালি।
৯৬. ডাক ছেড়ে বলে রাবণ
কলা রোবে আষাঢ়-শ্রাবণ।
৯৭. ডাক দিয়ে বলে মিহিরের স্ত্রী,
শোন পতির পিতা,
ভদ্র মাসে জলের মধ্যে নতুন বধূনাম।
রাজ্য নাশে, গো নাশে, হয় অপঘাত বল,
হাতে কাটা পুথি ফেরে ফিরলেও না পাত
ধনে।
৯৮. ডাকে পাখি না ছাড়ে বাসা
উড়িয়ে বসে খারে কাঁদি আশা,
ফিরে যায় নিজালয় না পায় দিশা
খনা ডেকে বলে সেই সে ঈশ।
উড়ে পাখি যায় না, তখনি কেন যায় না ॥
৯৯. ভাদ্রিনে ফলী বামে শিয়ালে।
'অদ্রিনে মদ্রিনে' বলে গোয়লী ॥
তবে জানিবে যাত্রা ফলালী ॥
১০০. তামাক ক্ষেতে গোবর সার,
তামাক বাড়ে বেজায় বাড়।
১০১. তাল বাড়ে ঠেঁপে
খেজুর বাড়ে ঝোপে।
১০২. তেলা মাথায় ভালো তেল,
শুকনো মাথায় ভাঙো বেল।
১০৩. তিন নাড়ায় সুপারি গোনা,
তিন নাড়ায় নারকেল টোনা,
তিন নাড়ায় শ্রীফল বেল,
তিন নাড়ায় গেরস্থ চেল।

2020/5/15 21:30

Scanned with CamScanner

১০২. তরল, তেঁতুল, তুল
কিসে বাজ নিধুল।
১০৩. কৈথ বারো, স্বল্পক্ষয় মাসের বারো দিন
একজ কাজিয়া তাবে সমকে কারো হীন
এতে তপ্ত, দুইয়ে লাভ, কিসে শত্রুক্ষয়
চতুর্থতে কাপালিক, পঞ্চমে সহায়
ষষ্ঠে মৃত্যু, শূন্য হলে পায় বহু সুখ
খনা বলে ঘরে কভু নাহি সুখ।
১০৪. তিন মাঝে মাঝে খিল।
১০৫. তিন শত ষাট কলা ওয়ে,
থাক পেরুছ ঘরে শুয়ে।
১০৬. তিন শাওনে ধান
এক আশ্বিনে ধান।
১০৭. থাক দুখ দিতে
ঢালমু দুখ মাঘ মাসের শীতে।
১০৮. ছেলে বলদ না বয় হাল,
তার দুঃখ সর্ব্বকাল।
১০৯. দশে মিলে করি কাজ
হারি জিতি নাহি লাজ।
১১০. দাতার নারিকেল, বষিলের বাঁশ,
কমে না বাড়ে বারো মাস।
দিন থাকতে বাঁধে আল।
তবে খায় তিন শাল ॥
বারো পুত তেরো নাতি।
তবে করো ঘোড়া খেতি ॥
১১১. দিনের মেঘে ধান,
রাতের মেঘে পান।
১১২. দক্ষিণ ছেড়ে উত্তর বেড়ে।
ঘর করগে পোতা জুড়ে।
১১৩. দ্বাদশ অঙ্গুলি কাঠি। সূর্য মণ্ডলে দিয়া দিঠি।
রবি কুড়ি সোমে ষোল। পঞ্চদশ মঙ্গলে ভাল।
বুধ বৃহস্পতি এগার বার। শুক্র শনি চৌদ্দ তের ॥
হাঁচি জেঠি পড়ে যাবে। অষ্ট গুণে লভ্য হবে।
১১৪. ধান ধন বড় ধন, আর ধন নাই।
সোনা রূপা কিছু কিছু আর সব ছাই।
১১৫. নদীর ধারে পুঁতলে কচু
কচু হয় তিন হাত উঁচু।
১১৬. নারিকেল গাছে নুনে মাটি,
শীঘ্র শীঘ্র বাঁধে গুটি।
১১৭. নিজের খেলাম আমিত্বই,
পরের খেলাম ঠিকুরী খাই।
১১৮. নদীর জল খেলাম ভরসা,
জাতের মেয়ে ঘরলাম ভরসা,
যে পাইছা পাইছে ঘর,
যাপে খুতে কীর্তন।
১২০. নক্ষত্রা মধ্যান ভালো পাই।
১২১. সাতের কাছেতের বর যাই।
১২২. নাই ধান। নিড়ুয়ে অল।
পালি তুমলে ফাতরে
১২৩. ফলন বাড়ে ঘিতলে।
১২৪. পাতলা তিল খুব সহিষ্ণু।
ফলে বেশি পুরান আশে।
১২৫. পুকুরেতে পানি রহি, পাড়া দেখে ঘাস।
যার কথা মনে করি সেই দেশে বাস।
১২৬. পারে না ল ফলাইতে
উইঠা থাকে বিয়ান বাইছে।
১২৭. পরের বাড়ির পিঠা
যাইতে বড়ই মিঠা।
১২৮. পূর্ব আষাঢ়ে দক্ষিণা বয়
সেই বৎসর বন্যা হয়।
১২৯. পাঁচ রবি মাসে পায়,
ঝরা কিংবা খরায় যায়।
১৩০. পূর্ণিমা অমাবস্যায় যে ধরে হাল,
তার দুঃখ হয় চিরকাল।
তার বলদের হয় বাত
তার ঘরে না থাকে ভাত।
খনা বলে আমার বাণী,
যে চষে তার হবে জানি।
১৩১. পান লাগালে শ্রাবণে,
খেয়ে না কুলায় রাবণে।
১৩২. পশ্চিমের ধনু নিত্য খরা
পূর্বের ধনু বর্ষে ঝরা।
১৩৩. পৌষ গরমি বৈশাখ জাড়া।
প্রথম আষাঢ়ে ভরবে গাড়া ॥
খনা বলেন শোন হে স্বামী
শ্রাবণ ভাদর নাইকো পানি ॥
১৩৪. পৌষের কুয়া বৈশাখের ফল
যদিন কুয়া তদিন জল।
শনির সাত মঙ্গলের তিন।
আর সব দিন দিন ॥
১৩৫. পোষের শীত মোঘের গায়।

১৩৬. ফাল্গুনে না রুলে বল,
শেষে হয় গণ্ডগোল।
১৩৭. ফাল্গুনে আট, চৈত্রেও আট,
সেই তিল গায়ে কাট।
১৩৮. বিশ হাত কবি ফাঁক
আম কাঁঠাল পুঁতে রাখ।
ঘন ঘন গাছ হবে না,
গাছ হবে তো ফল হবে না।
১৩৯. নার পুত, তের নাতি
তবে কর কুশার ক্ষেতি।
১৪০. বিপদে পড় নহে ভগ্ন
অভিজ্ঞতায় হলে জয়।
১৪১. বামুন বাদল বান
দক্ষিণা পেলেই যান।
১৪২. ব্যাঙ ডাকে ঘনঘন
শীঘ্র হবে বৃষ্টি জানো।
১৪৩. বাঁশের ধারে হলুদ দিলে
খনা বলে দ্বিগুণ বাড়ে?
১৪৪. বারো বছরে ফলে তাল
যদি না লাগে গরু নাল।
১৪৫. বৎসরের প্রথম ঈশানে বয়,
সে বৎসর বর্ষা হবে খনা কয়?
১৪৬. বৈশাখের প্রথম জলে,
আশু ধান দ্বিগুণ ফলে।
১৪৭. বাড়ির কাছে ধান পা,
যার মার আগে ছা।
চিনিস বা না চিনিস,
খুঁজে দেখে কিনিস।
১৪৮. বিনা বাতাসে বর্ষে তুলা
কোথা রাখবি ধান।
১৪৯. বাপ-বেটায় চাষ চাই।
তৎ অভাবে সোদর ভাই।
১৫০. বুড়ো গরু চোরা ধান
যে বেচে সে সেয়ান।
১৫১. বৈশাখ জ্যৈষ্ঠকে চমন রোদ।
শাঁখা শাড়ি খেলা বেলিয়া নাও।
১৫২. বৈশাখে কাজলা, জ্যৈষ্ঠকে কাজলা।
আষাঢ়ে রোদয়া, শ্রাবণে শাজলা।
১৫৩. বৈশাখী রোদ আখাড়ী রোদ।
আগের হয় না ধান রোদ ॥
১৫৪. অনেকে চরি অধিকলের চরি,
বলাই রোদ সব শরি।
১৫৫. ছাই রেখার ঘুমালে পরি,
তিল রেখার গেরিস্ত।
১৫৬. অনেক করে কলা রোপন অবশেষে মরিল
অনল।
১৫৭. ভাই বন্ধো খন, বন্ধের বীজন
অতিশ শুষক হয় নাতীর কালে।
১৫৮. ভরা হাতে শূন্য আসো খনি অবতরে যায়
আগে হাতে গিয়ে আসো খনি ভাতে মাত
মধ্য হাতে আছা আসো খনি মধ্যতে যায়
শেষে হাতে ভাইলে আসো খনি গিতে চায়
শূন্য হাতে খোলা আসো মাথা তুলে চায়
হাসা হাতে কাঁচা আসো খনি কাঁদে নীত
১৫৯. ভাদ্র আশ্বিনে মহে ঈশান,
কাঁদে কোলাহলে নাহে কৃষাণ।
১৬২. মধু মাসের ত্রয়োদশ দিনে খনি কয়
শনি।
সে বৎসর শস্যহানি, খনা বলে শনি।
১৬৩. মস্তক গরু, ফলুক ধান।
বছর বছর কিনে জন।
১৬৪. মাঠে গিয়ে আগে দিক নিরূপণ।
পূর্ব দিক হাতে কর হাল চালন।
১৬৫. মঙ্গলে উষা বুধে পা
যথা ইচ্ছা তথা যায়।
১৬৬. মা মরা সয়, শন পড়া সয় না।
১৬৭. মাছের কিন মাও।
গরুর কিন ছাও ॥
১৬৮. মাঘে উঠিল উগনি
বৃষ্টি হবে ফাল্গুনি।
১৬৯. মাঘ মাসে বর্ষে দেবা
রাজা ছেড়ে প্রজার সেবা।
১৭০. মাঘে মুখী, ফাল্গুনে চুষি,
চৈতে লতা, বৈশাখে পাতা।
১৭১. মাসে মাসে করে সেওয়া।
রাজা ছাড়ে প্রজার সেবা।
১৭২. মূলার ডুই তুলা।
কুশারের ডুই খুলা ॥

Scanned with CamScanner

১৭৩. মেঘ করে রাতে হয় জল।
করে মাঠে যাওয়াই বিফল ॥
১৭৪. মঙ্গলবারে যাত্রা নিষেধ হয় দেইবার,
রবিবারে যাত্রা করলে, মৃত্যুতুল্য দুঃখবার,
সোম, শুক্র শুভ বার,
বুধ, বৃহস্পতি মধ্যম,
১৭৫. মেয়ে কষ্ট খাটে,
১৭৬. ছেলে কষ্ট খাটে।
১৭৭. বিনাশে মেলা।
না মিললে একলা একলা জলা।
মাঘের মাটি হাঁড়ির কাটি,
ফাল্গুনের মাটি সোনা,
চৈতের মাটি যেমন তেমন,
বৈশাখের মাটি সোনা।
১৭৮. যদি না হয় আগনে বৃষ্টি
তাহলে না হয় কাঁঠালের সৃষ্টি।
যদি না হয় আগুনে পানি,
কাঁঠাল হয় টানাটানি।
১৭৯. যে না শোনে ধনার বচন
সংসারে তার চিত্ত পচন।
১৮০. যদি বর্ষে মাঘমুনে
তিনা কাটন দিগুণে।
১৮১. যদি বর্ষে মঘরে
ধান হবে টিকরে।
১৮২. যদি হয় চৈতে বৃষ্টি
করে হবে ধানের সৃষ্টি।
১৮৩. যদি বর্ষে মাঘের শেষ
ধন্যি রাজা পুণ্যি দেশ।
১৮৪. যদি থাকে বন্ধুতে মন
গাহ সাঁতরাইতে কতক্ষণ।
১৮৫. যা আদীবে বাকা তাই পাইবে।
মুই তুদি আমাকে কাত্রাল হাবাইবে।
১৮৬. খুশরে খাইছে ভূতে,
বাপারে মারে পুতে।
১৮৭. যাও পাখি বলো তারে
সে যেন ভোলে না মোরে।
১৮৮. যদি হয় সুজন
এক পিঁড়িতে নয় জন।
যদি হয় কুজন
নয় পিঁড়িতে নয় জন ॥
১৮৯. যদি হয় সুজন, তেতুল পাতায় নজন।
১৯০. যদি ঝরে কাত্তি।
সোনা য়াত্তি য়াত্তি ॥
১৯১. যদি রোয়ে ফাগুনে কলা,
তব হয় মাশ মশলা।

১৯২. যে চলা কয় সেই ঘরে।
পরের পানে চাইয়া না কিরে।
পরে না পায় ঘরে পরে।
কলম লাউ কয় হয়রানি।
পরের পিছে ইশকানি।
সিধাসুজ কথা না কয়।
১৯৩. ইচ্ছে থাকে টাকা ধারলে যেন।
১৯৪. যার কাছে হাল তার কাছে গরু।
১৯৫. কলা করে ছুত সেটার।
যে যে কামের সে সে কাজ।
তাঁর সন্তানে সে সে সাজে।
যে দিলে হয় সেলের সাজী।
১৯৬. অবশ্য বাহু হয়না শক্তি।
যে কাঠিকাপাক হয় সাপনের উপায়ে
সাধনা সফল হয়, তবে জোতিপ্রাপ্তে।
নদনা ভালো শক্তিশালী বন্ধুত্বতা হয়,
ধনা কয়ে মিহিরের, পরিচয় সংশয়।
১৯৭. যে দেশে নাই পন্ডত জোতিষ।
সেতুদি সপন হয়ে উধা।
১৯৮. যেমন তেমন চন
মই দিয়া ঘর।
১৯৯. হাল ধারবে চাষ দিব।
সময় হাতেতে ধরে দিব।
২০০. রোদে ধান, ছায়ায় পান।
২০১. লম্বা পান, সাদে পান।
জানিলে মন্ত্র পাঁচে বাপ।
যদি ভুত ধরে না দেবে মন্ত্র।
অবশ্য ইহারে পেয়ে অনেক।
২০২. লক্ষণে না খুঁজলে মাটি
মই না দিলে পরিপাটি,
ফলন হয় না কদাচারি।
২০৩. লাউ গাছে মাচায় জল,
যেনো মাটিতে ফল ফলে।
২০৪. শুক্লপক্ষে যখন তুলে,
হালায় হালদার টাকা গনে।
২০৫. শুন বাপু চাষার বেটা।
বাঁশের আড়ে দিও ধানের টিটা।
টিটা দিলে গাছের গোড়ে।
দুই কুড়া দুই বাড়বে ঝাড়ে।
২০৬. শকের দ্বিগুণ একের উন।
তিথি নক্ষত্র বারে গুণ।
বসু শতে হরিয়া গাই।
আয়ু প্রমাণ সেই পাই।
কিসের তিথি কিসের বার।

২০৭. জল ঢালি কোদাল কোপাও
ধানে ধানে থাকিও
ধান থাকিলে পুজা হলে
পুরী হইবে কাঞ্চন।
২১১. ধনের লক্ষ সুজন দুর্জন
ধনের লক্ষে পরিচয় হয়
ধনের লক্ষে জ্ঞান।
২১২. সুখীতে সুখের সোহাগ, ধনের খনি
ধনের লক্ষণে বিদ্যার খনি।
২১৩. সোনার ও সুখের না দিন হয়
ধন থাকিলে পাও ধন।
২১৪. সুখীর ঘরে লক্ষ লক্ষ
অধীন ঘরে পাক দুঃখ।
২১৫. ধনের ধনের সুখী
ধনের ধনের দুঃখী।
২১৬. ধনীর কলহই সুখ।
সুখে থেকো চাষার পুত্র।
২১৭. ধনের ধনের দুঃখী
ধন থাকিলে সুখের সুখী।
২১৮. ধনের ধনের দুঃখী
সুখে থেকো চাষার পুত্র।
২১৯. ধনের ধনের দুঃখী
ধন থাকিলে সুখের সুখী।
২২০. ধনের ধনের দুঃখী
সুখে থেকো চাষার পুত্র।
২২১. সকল পশু জানীরাই
জীবন পাবে তাই তাই।
২২২. ধনীর কলহই সুখ।
সুখে থেকো চাষার পুত্র।
২২৩. ধন হারে, ঘিন বিদারে
জ্ঞান লাভারে ঘরে পুত্র।
২২৪. সকল পশু জানীরাই
জীবন পাবে তাই তাই।
২২৫. ধনীর ধনের কলহই সুখ।
সুখে থেকো চাষার পুত্র।
২২৬. সেন দিয়ে ধরে চাষ,
ধরে ধরতি ধরে ধান।
২২৭. ধরে পুকুর বৃহদের ঘি,
তবে হইবে ধন এতটা জী।
২২৮. ধনের কলহ, সুখের
ঘিন দিন ধরে ধরে।
২২৯. সেন ধেমনের সোনা
ধরে ধরতি ধরে ধরে ধরে সোনা।
২৩০. ধরিলে পুত্র চাকরে ধন
ধর পুত্রে মনের ধন।
২৩১. ধনের কলা, ধরের ধনন।
২৩২. ধনো সোনা ধরিলে ধনন,
ধরিয়া সোনা ধরিলে ধরিলে।
২৩৩. ধরে নারায় দুরে পরি
লক্ষী ধরে চলাচল অরি।
২৩৪. ধরিবের পিছে পাও।
মুক্তমের দুরে নাও।
২৩৫. ধনে ধুলা করি পন্য।
পুত্রি পরিবার লাভ বিভিন্ন।
২৩৬. ধরি নিকটির ধন পাবে
ভোজনে উপরে বা দানে।

Scanned with CamScanner

বিবাহে বিবাদে আর অন্ন পরিমাণে ॥
এই সপ্ত কর্মে হাঁচি আদি সুশোভন।
অন্য কর্মে শুভ নাহি হয় কদাচন ॥
বৃদ্ধ শিশু অথবা কফের যে হাঁচি।
যত্নপূর্বকের হাঁচি কদাচ না বাছি ॥
গোধনের হাঁচি হয় মৃত্যুর কারণ।
জ্যোতিষ বচনে ইহা অবশ্য বারণ।
দিকের নির্ণয় করি বুঝহ সুবুদ্ধি।
পূর্বদিকে অগ্নিকোণে হৈলে ভয় হয়।
দক্ষিণেতে অগ্নিভয় জানিহ নিশ্চয় ॥
নৈঋতে কলহ লাভ পশ্চিমেতে ভাব।
বায়ুকোণে নব-বস্ত্র গন্ধ জয় লাভ ॥
উত্তরে টিকাটিকি হাঁচি স্ত্রী-লাভ কারণ।
ঈশাণে হৈলে মৃত্যু কে করে ধারণ ॥

২৪০. হাঁচি জোটি পড়ে যবে,
অষ্ট ওণ তার লজ্জা না হবে।
২৪১. হাঁচি টিকটিকির বাধা।
যে না মানে সে গাধা।
২৪২. ক্ষেতে নাই ধান
উড়ে যায় চাষার প্রাণ।
২৪৩. ক্ষেতের কোনা,
বাণিজ্যের সোনা।
২৪৪. ক্ষেত আর পুত।
যত্ন বিনে যমদূত ॥

স্বাহ্য, খাদ্য ও পুষ্টিবিষয়ক

২৪৫. অধিক খেতে করে আশ,
এর নাম বুদ্ধি নাশ।
২৪৬. আগে তিতা, শেষে মিঠা।
২৪৭. আলো হাওয়া বেঁধ না,
রোগ ভোগে মরো না।
২৪৮. আঁতে তিতা দাঁতে নুন,
উদর ভরো তিন কোন।
২৪৯. আহারান্তে চোখে জল,
দৃষ্টি শক্তির বাড়ে বল।
২৫০. আগে খাবে মায়ে,
তবে পাবে পোয়ে।
২৫১. আম নিম জামের ডালে
দাঁত মাজও কুতুহলে।
২৫২. আম লাগাই জাম লাগাই
কাঁঠাল সারি সারি
বারো মাসের বারো ফল
নাচে জড়াজড়ি?
২৫৩. আম খেয়ে খায় পানি,
পেঁদি বলে আমি ন জানি।
২৫৪. আমড়া চালতা আম-ম
অবাল বৃদ্ধ আল।
২৫৫. আঁতে পিতে দেয়,
নিতিা নিতিা খেয়ো।
২৫৬. আশ্বিনে বাদে বাড়ে কার্তিকে যায়
যে নর মাসে সে তর পায়।
২৫৭. উনা আতে ঘুনা বল,
অতি আতে রসাতল।
২৫৮. কলা-রুমা কেটো না আত,
তাতে কাপড় তাতেই আত।
২৫৯. কচি পাঁঠা বুড়া মেষ
দধির আগা ঘোলের শেষ।
২৬০. খালি পেটে পানি খায়
যার যার বুঝে খায়।
২৬১. খালি পেটে কুল,
ভরা পেটে মূল।
২৬২. খায় না খায় সকাল নায়
হয় না হয় দুবার যায়
তাঁর কড়ি কি বৈদ্যে পায়?
২৬৩. খেয়ে মুতে হেগে খায়
তাঁর বাড়ি বৈদ্যে না যায়।
২৬৪. খেয়ে হাগে রাতে জাগে
সে মানুষ কোন কাজে লাগে?
২৬৫. খেতে বসলে কিসের দায়,
পাকনা ধান কি জলে যায়।
২৬৬. খানা খায় করে শব্দ,
অলক্ষী খুশি লক্ষী রুদ্ধ।
২৬৭. খেয়ে উদাইম্যা ভাত,
শইল করে উৎপাত।
২৬৮. গরার পিঠে তুললে হাত।
গিরছে কছু পায়া না ভাত ॥
২৬৯. ঘোল কুল কলা,
তিনে নাশে গলা।
২৭০. চৈতে গিমা তিতা,
বৈশাখে নালিতা মিঠা,
জৈষ্ঠে অমৃতফল,
আষাঢ়ে মৈ,
শাওনে দৈ।
ভাদরে তালের পিঠা,
আশ্বিনে শশা মিঠা,
কার্তিকে খৈলসার ঝোল,
অগ্রানে ওল।
পৌষে কাছি,
মাঘে তেল,
ফাল্গুনে পাকা বেল।

২৭১. এত বিদ্যে তুলে গণ,
যে আসে তারই আত।
২৭২. জল খেয়ে ফল খায়
দম ধরে আয় আয়।
২৭৩. ঠেরে চালতা,
বৈশাখে নালিতা,
আষাঢ়ে দৈ,
শাওনে শশা মিঠা,
ভাদ্রে তালের পিঠা।
আশ্বিনে ওল,
কার্তিকে কৈয়োর ঝোল।
২৭৪. তপ্ত অঙ্গে ঠান্ডা দুধ,
যে খায় সে নির্বোধ।
২৭৫. তাল, তেঁতুল নই।
২৭৬. তেতা বলে ঔষধ কই?
তেল তামাকে পিত্ত নাশ,
ঘি হয় তা বারো মাস।
তেল মাখবে ধাব্যা ধাব্যা
চিৎ হয়ে শোবে বাব্যা
খাল দেখে পারবে পাত
তবে খাবে কাল সমনের ভাত।
২৭৭. তিল, তিসি, তাল, মাখনা
খায় নির্মলে হয় জোয়ানা।
২৭৮. তিনশ ষাট কাড়ু কলা রুয়ে
থাকলা চাষি মাচায় শুয়ে,
তিন হাত অন্তর এক হাত খাই
কলা পুতাগে চাষা ভাই।
২৭৯. তেতো তিতা চুকা ঝাল।
এই চার পুরুষের কাল।
২৮০. দক্ষিণ দুয়ারী ঘরের রাজা,
খুব দুয়ারী তাহার প্রজা।
পশ্চিম দুয়ারীর মুখে ছাই,
উত্তর দুয়ারীর খাজনা নাই।
(টীকা: এর ভিন্নপাঠ আছে ২৪ নম্বরে।)
২৮১. দুগ্ধ শ্রম গংগা বারি,
এ তিন উপকারী।
২৮২. দিনে বালিশ। রাতে চালিশ।
২৮৩. নিম-নিসিন্দা তেঁতুলগাছ
ঘরে রোপ না কোন কাল
২৮৪. নিম নিসিন্দা যথা,
মানুষ কি মরে তথা।
২৮৫. নিত্যি নিত্যি ফল খাও,
বদ্যি বাড়ি নাহি যাও।
২৮৬. নিত্যে উঠ খেয়ে গণ,
তাঁর মুখে চিকণ।
২৮৭. পূবে হাঁস পশ্চিমে হাঁস উত্তরে গোরু
(গরু)
দক্ষিণে ছেড়ে ঘর কখনো সুখ পাবে।
২৮৮. পুই, পড়, ছেড়,
তিন আমলার ঢেকো
২৮৯. প্রাতঃকালে উঠে যে পানে চায় জল,
তাহার ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা বসতি করে।
২৯০. ঘর আছে আসবাব নাই,
রোগ আসে এসো ভাই।
২৯১. বাদুর বাসের বাঁশ
এই তিনে বাস্তু নাশ।
২৯২. ভাদ্রো মাসে বাড়ো ফল,
না খেলে যায় রসাতল।
২৯৩. বেল খেয়ে খায় জল,
ঘি (ঘৃত) খায় বলবান।
২৯৪. বেল খেয়ে যায় শনি,
ঘির বলে বইলাম আমি।
২৯৫. বক বকুল চাঁপা,
তিন পুতরানা বাপ্য।
২৯৬. বিয়ানে খায় আদা নুন
পেটের আগুন যায়ে ঘিগুন।
২৯৭. ভোরের হাওয়া
লাখ টাকার দাওয়া।
২৯৮. মাসে মাসে বৃদ্ধি, ঘৃতে বৃদ্ধি বল
দুগ্ধে দীর্ঘ বৃদ্ধি, শাকে বৃদ্ধি মল।
২৯৯. মানুষ মরে যাতে,
গাছলা সারে তাতে।
পাতলা সরায় গাছলা সারে,
গোলুলা দিতে মানুষ মারে।
৩০০. মুড়ি আর মুড়ি।
সকল রোগের গুড়ি।
৩০১. যত জ্বালে ব্যঞ্জন মিষ্টি,
তত জ্বালে ভাত নষ্ট।
৩০২. যে একবার হাগে সে সুখী
যে দুইবার হাগে সে ভোগী।
যে তিনবার হাগে সে রোগী ॥
৩০৩. শাক অমল পান্তা,
তিনো অসুখের হন্তা।
৩০৪. সকালে সোনা,
বিকালে সোনা।
৩০৫. সকাল শোয় সকাল ওঠে,
তাঁর কড়ি না যৈদ্যে লোটে।

2020/5/15 21:30
Scanned with CamScanner

সংখ্যাসূচক বাংলাজ্ঞান

বাংলা পঠন-পাঠনকালে সংখ্যাশব্দ ব্যবহার করে অনেক প্রতীতি জানতে হয়। সেই প্রতীতিগুলোর গূঢ়ার্থ কী, তা আজকের আধুনিকযুগে বিস্মৃতির প্রায় অতল গর্ভে তলিয়ে গেছে। অথচ একদা সেই প্রতীতিগুলো নিয়ন্ত্রণ করতো মানুষের জীবনগতিকে। মানুষের বোধ, বিশ্বাস, নির্ভরতা আবর্তিত হতো এগুলো নিয়ে। এমুগেও নানা কবিতা, কথকতা, গদ্যরচনা ইত্যাদিতে এই প্রতীতিগুলো অবলীলায় ব্যবহার হয়। নিচে সংখ্যাশব্দ ব্যবহার করে বাঙালির জীবনে পরিচিত কতিপয় প্রতীতি তুলে ধরা হলো :

দুই

দুই পক্ষ : কৃষ্ণপক্ষ; শুক্লপক্ষ
(পক্ষ বলতে এখানে মাসের অর্ধ বা মাসার্ধ বোঝানো হয়েছে। চাঁদের হিসেবে প্রতিপদ থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত কৃষ্ণপক্ষ আর প্রতিপদ থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত শুক্লপক্ষ। প্রতিটিতে পঞ্চদশ বা পনের তিথি করে ধরা হয়। এই পনের ও পনের তিরিশ তিথিতে মাস পূর্ণ হয়ে থাকে।)

দুই

অয়ন : উত্তরায়ণ; দক্ষিণায়ন
(অয়ন অর্থ গমন, গতি, জন্ম। এখানে সূর্যের উত্তর থেকে দক্ষিণে এবং দক্ষিণ থেকে উত্তরে গমনকে বোঝায়। উত্তর থেকে দক্ষিণে গমনকে দক্ষিণায়ন; দক্ষিণ থেকে উত্তরে গমনকে উত্তরায়ণ বলে। বাংলা বছরের ১১ই পৌষ থেকে ৬ মাস উত্তরায়ণ এবং অবশিষ্ট ৬ মাস দক্ষিণায়ন হিসেবে গণনা করা হয়।)

তিন

ত্রিকাল : ভূত; বর্তমান; ভবিষ্যৎ
(যেকাল অতীত হয়েছে তা ভূতকাল। ভূতকাল আবার ত্রিবিধ : অদ্যতন, অনদ্যতন, পরোক্ষ। যেকাল চলমান তাকে বর্তমানকাল বলে। বর্তমানকাল চতুর্বিধ : সবৃজোপাত্ত, সৃতিহীন, নিত্যবৃত্ত, সামীপ্য। যেকাল সম্পূর্ণরূপে ভবিষ্যৎকাল। ভবিষ্যৎকাল ত্রিবিধ : অনাদ্য, সুরভব্যা।)

ত্রিসন্ধ্য : পূর্বাহ্ণ; মধ্যাহ্ন; সায়াহ্ন

ত্রিকুল : মাতৃকুল; পিতৃকুল; শ্বশুরকুল

ত্রিধারা : মন্দাকিনী; অলকানন্দা; ভোগবতী
(শাস্ত্রে আছে, গঙ্গার একধারা স্বর্গে, একধারা মর্ত্যে, একধারা পাতালে গিয়েছে।)

ত্রিপিটক : সূত্র; বিনয়; অভিধর্ম
(বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ। এই গ্রন্থ ত্রিপিটক তিন খণ্ডে রচিত।)

ত্রিফলা : হরীতকী; আমলকী; বহুড়া বা বিভীতকী
(এই তিন ফল একত্র ও নিয়মিত ভক্ষণে বায়ু দীর্ঘায়ু পেয়ে থাকে।)

ত্রিবর্ণ : ভারতীয় ঐতিহ্যে তিনের চমৎকার সম্মিলন আছে। তিনের সম্মিলনকে ত্রিবর্ণ বলা যেমন। ধর্ম-অর্থ-কাম; সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ; অগ্ন্যুৎপাত-বৃষ্টি; উৎপত্তি-স্থিতি-ধ্বংস ইত্যাদি।

ত্রিবেণী : গঙ্গা; যমুনা; সরস্বতী
(বেণী অর্থ নদী। ভারতের উত্তর অঞ্চলের প্রয়াগে উল্লিখিত তিননদীর মিলিত ধারা ত্রিবেণী।)

ত্রিভুবন : স্বর্গ; মর্ত্য; পাতাল

ত্রিরত্ন : বুদ্ধ; ধর্ম; সংঘ
(বৌদ্ধ ধর্ম মতে এই তিন পবিত্র আধার।)

ত্রিশক্তি : কালী; তারা; ত্রিপুরা
(পুরাণমতে তিন দেবীর সম্মিলিত শক্তি।)

ত্রিব্যঞ্জন বা গরমমসলা : দারুচিনি, লবঙ্গ; ছোট এলাচ

চার

চতুর্বর্গ : ধর্ম; অর্থ; কাম; মোক্ষ
(এগুলোকে পুরুষার্থ বোঝায়। একজন পুরুষের এই চতুর্বর্গই পূরণ করা প্রয়োজন।)

চতুর্দাম : রামনাম; বৈদ্যনাথ; জগন্নাথ; কাজল; কৃষ্ণকুম (দারুর ক্ষেত্রগুলি পক্ষ 'ক'-এর ব্যবহার প্রাচীনকাল থেকেই সমাদৃত হয়ে আসছে।)

পক্ষ 'ম' : মাঘ; মাঘে; মদ; মুদ্গ; মৈথুন
(কাম ভোগলালী জীবনে আলঙ্কারিক পক্ষ 'ম' হে আমোদি থাকেন। সদ্য হয়, পক্ষ 'ম' কথাসের পর তৈরি করে।)

পঞ্চবাণ বা পঞ্চশর : সম্মোহন; উন্মাদন; শোষণ; তাপন; স্তম্ভন
(পুরাণ অনুসারে কামদেব এই পাঁচটি বাণের অধিকারী। উল্লিখিত পঞ্চবাণ ছাড়াও অন্য পাঁচটি বাণের নাম পাওয়া যায়। যেমন : অরবিন্দ; অশোক; চূত; নবমল্লিকা; নীলোৎপল। এগুলো ফুলের নামে। পঞ্চশরই পঞ্চবাণ।)

পঞ্চগঙ্গা : ভাগীরথী; গোমতী; কৃষ্ণবেণী; পিনাকিনী; কাবেরী

পঞ্চনদ : শতদ্রু; বিপাশা; ইরাবতী; চন্দ্রভাগা; বিতস্তা (ঝিলাম)
(পাঞ্জাবকে পঞ্চনদ বলা হয়। কারণ পাঞ্জাব দিয়ে উল্লিখিত পাঁচটি নদী প্রবাহিত হয়েছে।)

পঞ্চনদী : কিরণা; ধৃতপাপা; সরস্বতী; গঙ্গা; যমুনা
(এই পাঁচটি নদীকে সৌভাগ্য ও পুণ্যবারিময় বলে মনে করা হয়।)

পঞ্চধান্য : শালি; ব্রীহি; শূক; শিম্বি; ক্ষুদ্র
(ধানের পাঁচটি প্রকার। এ ধানগুলো খুবই প্রার্থিত বলে মনে করা হয়।)

পঞ্চবটী : অশ্বত্থ; বট; বিল্ব; আমলকী; অশোক
(দণ্ডকারণ্যস্থ বিশেষ বন। পাঁচ প্রকার বৃহৎ বৃক্ষ বা বটের সমাহার আছে যে বনে। রামায়ণে রামচন্দ্র সীতাকে নিয়ে পঞ্চবটী বনে বনবাসে গিয়েছিলেন।)

পঞ্চরত্ন : নীলকান্ত; হীরক; পদ্মরাগ; মুক্তা; প্রবাল

পঞ্চভূত : ক্ষিতি; অপ্; তেজঃ; মরুত; ব্যোম
(ক্ষিতি অর্থ পৃথিবী; অপ্ অর্থ পানি বা জল; তেজঃ অর্থ দীপ্তি বা তাপ; মরুত অর্থ বায়ু আর ব্যোম অর্থ নভোমণ্ডল।)

পঞ্চগব্য : দুগ্ধ; দধি; ঘৃত; গোমূত্র; গোবর

পাঁচ

পঞ্চ 'ক' : কেশ; কাঙ্গি (চিরুনি); কঙ্কন (চুড়ি);

Scanned with CamScanner

(গরু প্রাচীনকাল থেকেই অতি উপকারী প্রাণী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। দুধ-দৈ-ঘি পঞ্চামৃতের তিনটিই গরু থেকে মেলে। দুধ-দৈ-ঘি ছাড়াও গোবরে জমিতে উর্বরতা বৃদ্ধির সার এবং গোমূত্র আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অনুসারে রোগের ঔষধ হয়ে থাকে।)

পঞ্চগুণ : রূপ; রস; গন্ধ; স্পর্শ; শব্দ

পঞ্চতিক্ত : নিম; গুলঞ্চ; বাসক; পলতা; কন্টকারী

('স্বানে তেতো কিন্তু দেহের রোগ নিরাময়ে অব্যর্থ ভেষজ। কন্টকারী হলো বৈঁচি গাছ, পলতা হলো পটলের পাতা।)

পঞ্চশস্য : ধান; যব; মাষ; তিল; মুগ

পঞ্চামৃত : দধি; দুগ্ধ; ঘৃত; মধু; চিনি

পঞ্চপল্লব : আম; অশ্বত্থ; পাকুড়; বট; যজ্ঞডুমুর

পঞ্চপাণ্ডব : যুধিষ্ঠির; ভীম; অর্জুন; নকুল; সহদেব

('মহাভারতে' বর্ণিত পাণ্ডুপুত্র এই পাঁচজন। পিতার নাম পাণ্ডু বলে তাঁদের পাণ্ডব বলা হয়।)

পঞ্চকন্যা : অহল্যা; তারা; মন্দোদরী; কুন্তী; দ্রৌপদী

(অহল্যা ব্রহ্মার মানসকন্যা, গৌতম ঋষির স্ত্রী ও শতানন্দের মা। তারা হলেন কিষ্কিন্ধ্যার রানি ও হনুমান বালীর স্ত্রী। মন্দোদরী অর্থ কোমল বা মন্দ উদর বিশিষ্টা। তিনি রাবণের স্ত্রী। উপরের তিনজনই 'রামায়ণ'র চরিত্র। কুন্তী 'মহাভারতে'র চরিত্র ও পাণ্ডুর স্ত্রী। তিনি একাধারে কর্ণ ও অর্জুনের মাতা। দ্রৌপদী পঞ্চপাণ্ডবের স্ত্রী। মহাকাব্যের প্রবাদপ্রতিম এই পঞ্চনারী বা পঞ্চকন্যা। আদর্শ ও কর্তব্যে চূড়ান্ত দক্ষতার পরিচয় দেয়ায় তাঁরা প্রাতঃস্মরণীয়।)

পঞ্চোপচার : গন্ধ; পুষ্প; ধূপ; দীপ; নৈবেদ্য

(উপচার অর্থ প্রার্থনার অনুষদ। প্রার্থনাকালে এই পঞ্চ-উপচার যুক্ত থাকলে প্রার্থনা ও পরিবেশ যথার্থ হয়।)

পঞ্চায়ুধ : তরবারি; শক্তি; ধনুক; ধর্ম; পরশু (কুঠার)

(আয়ুধ অর্থ অস্ত্র। যুদ্ধকালে এই পঞ্চায়ুধের ব্যবহার করা গেলে জয় অবশ্যম্ভাবী ছিল।)

পঞ্চ ইন্দ্রিয় : চক্ষু; কর্ণ; জিহ্বা; নাসিকা; ত্বক (ইন্দ্রিয়কে ইংরেজিতে সেন্স বলে। এই পাঁচ ইন্দ্রিয় দিয়ে মানুষ পৃথিবীর অপরূপত্ব গ্রহণ করে।)

পঞ্চজীর্ণ : গাভী; গঙ্গা; প্রজাপতি; পুরুষ; কুকুরের উদাসীন ব্যাদ

(পঞ্চবায়ুকে পঞ্চব্যাপও বলে। ঘনত্বে যাদের প্রাণবায়ু, তাদের থাকে অপানবায়ু, দাঁড়ালে সমানবায়ু, কণ্ঠে থাকে উদানবায়ু, আর সর্বাঙ্গব্যাপী থাকে ব্যানবায়ু।)

পঞ্চমুক্তি : সাষ্টি; সারূপ্য; সালোক্য; সামীপ্য; নির্বাণ

(ঈশ্বরের ক্ষুদ্র ঐশ্বর্যশালী হয়ে মোক্ষপ্রাপ্তি হলো সাষ্টি। সারূপ্য হলো ঈশ্বরের ক্ষুদ্র রূপ ধারণ। আকার দোষ। সহ লোক হলো সালোক্য। সহ যোগ বা অভেদ হলো সাযুজ্য আর পরমপদ হলো নির্বাণ।)

পঞ্চমুন : সৌবর্চল; সৈন্ধব; বিট; রৌমিল; সামুদ্র (উদ্ভিদ, খনি, সমুদ্রজাত এবং মানবসৃষ্টি ইত্যাদি পাঁচ প্রকারের লবণের সমাহার পঞ্চমুন বা পঞ্চলবণ।)

পঞ্চসুগন্ধিক : কর্পূর; কক্কোল; লবঙ্গ; জায়ফল; জাতিফল

(কর্পূর গাছ থেকে আহরণ করা হয়। এটি ঔষধি ও সুগন্ধের জন্য ব্যবহার হয়। জাতিফল হলো জায়ফল। শুবাক সুপারি। কক্কোল সুগন্ধবিশেষ।)

পাঁচফোড়ন : মৌরি; মেথি; জিরে; ঔঁদুনি; কালো জিরে

পাঁচ মহাসাগর : প্রশান্ত; ভারত; উত্তর (সুমেরু); দক্ষিণ (কুমেরু); আটলান্টিক মহাসাগর।

ছয়

ষড়ঋতু : গ্রীষ্ম; বর্ষা; শরৎ; হেমন্ত; শীত; বসন্ত

ষড়ঙ্গ : দধি; দুগ্ধ; ঘৃত; গোমূত্র; গোময় বা গোবর; গোরোচনা

(গোরোচনা হলো গরুর মস্তিষ্কজাত বিশেষ প্রাকৃতিক রং; গোমূত্র আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে রোগ নিরাময়ের ঔষধ; গোময় সার এবং প্রথম তিনটি

বস্তুর বিশেষণে বিশেষ্য।)

ষড়রিপু : কাম; ক্রোধ; লোভ; মোহ; মদ; মাৎসর্য

(ষোলআনা অর্থ পরিপূর্ণতা বা সব। তার মতো, ষড়রিপুর সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু।)

ষড়ঙ্গ : মূলাধার; স্বাধিষ্ঠান; মণিপুরক; অনাহত; বিশুদ্ধ; আজ্ঞা

ষোড়শ : যজ্ঞ; ব্যাজন; অধ্যয়ন; অধ্যাপন; দান; প্রতিগ্রহ

(ষোড়শ অর্থ পূজা; যাজন অর্থ পৌরোহিত্য; অধ্যয়ন অর্থ পড়ালেখা; অধ্যাপন অর্থ পড়ানোর কাজ; দান অর্থ উদ্দেশ্য ত্যাগ করে কিছু প্রদান; প্রতিগ্রহ হলো দানগ্রহণ। বলা হয়, ব্রাহ্মণের মানুষগুলো এই ষটকর্মে নিষ্ঠাবান হলে ব্রাহ্মণ থাকে।)

সাত

সাতসমুদ্র বা সাতসাগর : সাগরের জল (লবণ); দুগ্ধফেন (চিনি); দুধ (ক্ষীর); ঘি (সর্পি); দধি; সুরা (ফলের রস)।

(বাংলার সাতসমুদ্র বা সাতসাগর দুই অর্থে ব্যবহার হয়। প্রথমটি রূপকথার গল্পের উপাদান হয়ে, যার কোনো ভিত্তি নেই। শুধু সাত সাগরই নয়, সঙ্গে তের নদীর কথাও বলা হয়। আসলে সাগর পাঁচটি আর নদী অসংখ্য। কিন্তু প্রকৃত সাতসাগর বা সাতসমুদ্র হলো এই ভূতলসমূহ যা পর করলে মানুষ সুস্বাস্থ্যে দীর্ঘজীবী হয়।)

সাত মহাদেশ : এশিয়া; ইউরোপ; আস্ট্রেলিয়া; অফ্রিকা; উত্তর আমেরিকা; দক্ষিণ আমেরিকা; আন্টার্কটিকা।

সপ্তপাতাল : অতল; বিতল; সুতল; তলাতল; মহাতল; রসাতল; পাতাল

(কল্পিত অধোলোকের এই সাতটি স্তর ধরা হয়।)

সপ্তস্বর্গ : ভূলোক; ভুবর্লোক; স্বলোক; জনলোক; মহর্লোক (মহোলোক); তপর্লোক; সত্যলোক

সপ্তধাতু : বায়ু; পিত্ত; কফ; রক্ত; শুক্র; মাংস; অস্থি

(আয়ুর্বেদ অনুসারে মানবদেহে এই সপ্তধাতু থাকলে সে নিরোগ হয়।)

সপ্তকাণ্ড : আমি না খাব; আপনারা; তুমি; বিভিন্নরা; তুমরা; তারা না খুশি; ইত্যাদি

(মহাকবি কালিদাস রচিত 'রামায়ণ' মহাকাব্যের এই সাতটি কাণ্ড আছে। প্রতিটি কাণ্ড ৬৪-৮৪টি সর্গ।)

সপ্তদ্বীপ : জম্বু; কুশ; ক্রৌঞ্চ; শাকদ্বীপ; প্লক্ষ; শাক; পুষ্কর

(পৌরাণিকযুগে মহাদেশের বর্তমান ধারণা ছিল না। ওইসময়ে বলা হতো দ্বীপ। তখন যেসব পৌরাণিক মহাদেশ, আজ সেগুলো ছিল সপ্তদ্বীপ। জম্বু দ্বীপে অন্তর্ভুক্ত ছিল ভারত, ইরান, তিব্বত, শক দ্বীপে ইরান, ইরাক ইত্যাদি, কুশ দ্বীপে অস্ট্রেলিয়া, ক্রৌঞ্চ ছিল ও ঐ অঞ্চল, পুষ্কর দ্বীপে আমেরিকা, ত্রিটেন ইত্যাদি, পুষ্কর দ্বীপে স্পেন, ইতালি ইত্যাদি, শাকদ্বীপ ছিলো অন্তর্ভুক্ত ছিল আরব অঞ্চল।)

সপ্তর্ষি : ভরদ্বাজ; পুলস্ত্য; পুলহ; ক্রতু; মরীচি; অত্রিঋষি; বশিষ্ঠ

(প্রাচীন ভারতের সাতজন ঋষির নাম। সপ্তর্ষিমণ্ডল বলতে তোমরা তারামণ্ডল। জ্যোতির্বিদ টলেমি ঐকৃত ৪৮টি তারামণ্ডলের একটি। উত্তর গোলার্ধ থেকে এটি সহজে পর্যবেক্ষণ নেয়া যায়। সাতটি তারার সমন্বয়ে এই মণ্ডল বলে উপমহাদেশের জ্যোতির্বিদগণ একে সপ্তর্ষিমণ্ডল বলে অভিহিত করেছেন। তবে সাতজন ঋষি মহাকাশে একত্র বসে আছেন।)

সপ্তকর্ণী : দ্রোণাচার্য; কর্ণ; কৃপাচার্য; অশ্বত্থামা; শকুনি; দুর্যোধন; দুঃশাসন

('মহাভারতে'র এই সাত রথযোদ্ধক বালক অভিমন্যুকে বধ করেছিলেন।)

সপ্তসুর : ষড়জ; ঋষভ; গান্ধার; মধ্যম; পঞ্চম; ধৈবত; নিষাদ

[সংগীতে এই সাতটি সুর সংক্ষেপে স-ঋ-গ-ম-প-ধ-নি অথবা সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি বলা হয়। ময়ূরের স্বর থেকে স; বৃষভের স্বর থেকে ঋ; ছাগের স্বর থেকে গ; ক্রৌঞ্চের স্বর থেকে ম; কোকিলের স্বর থেকে প; ঘোড়ার স্বর থেকে ধ; হাতির স্বর থেকে নি সুরের মূর্ত পৃথিবী হয়েছে।]

2020/5/15 21:30

Scanned with CamScanner

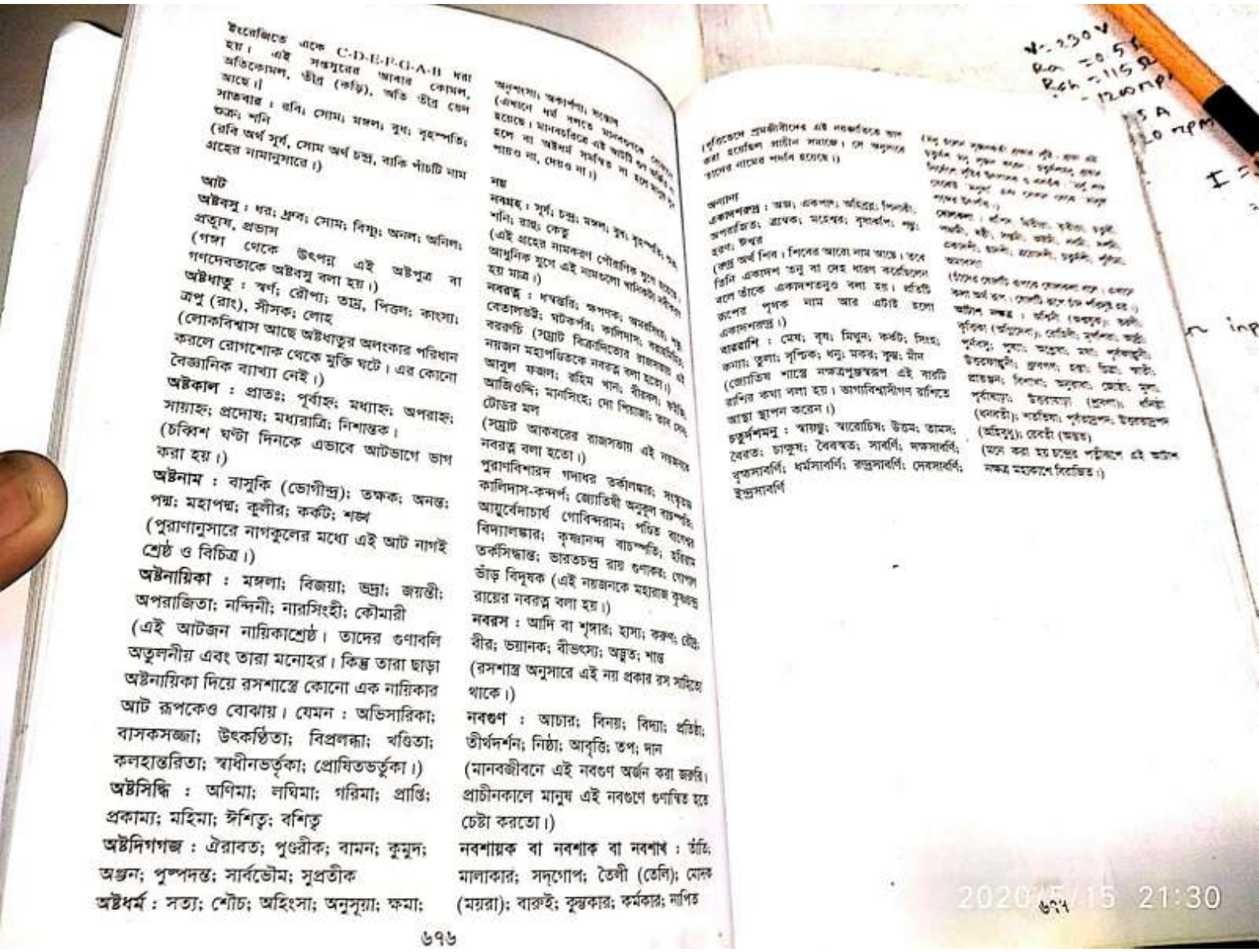

ইংরেজিতে এদের C-D-E-F-G-A-B ধরা হয়। এই সপ্তকগুলোর আবার কোমল, অতিকোমল, তীব্র (কড়ি), অতি তীব্র ভেদ আছে।)

সাতবার : রবি; সোম; মঙ্গল; বুধ; বৃহস্পতি; শুক্র; শনি
(রবি অর্থ সূর্য, সোম অর্থ চন্দ্র, বাকি পাঁচটি নাম গ্রহের নামানুসারে।)

আট

অষ্টবসু : ধর; ধ্রুব; সোম; বিষ্ণু; অনল; অনিল; প্রত্যূষ, প্রভাস
(গঙ্গা থেকে উৎপন্ন এই অষ্টপুত্র বা গণদেবতাকে অষ্টবসু বলা হয়।)

অষ্টধাতু : স্বর্ণ; রৌপ্য; তাম্র, পিত্তল; কাংস্য; ত্রপু (রাং), সীসক; লোহ
(লোকবিশ্বাস আছে অষ্টধাতুর অলংকার পরিধান করলে রোগশোক থেকে মুক্তি ঘটে। এর কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই।)

অষ্টকাল : প্রাতঃ; পূর্বাহ্ণ; মধ্যাহ্ন; অপরাহ্ণ; সায়াহ্ন; প্রদোষ; মধ্যরাত্রি; নিশান্তক।
(চব্বিশ ঘণ্টা দিনকে এভাবে আটভাগে ভাগ করা হয়।)

অষ্টনাম : বাসুকি (ভোগীন্দ্র); তক্ষক; অনন্ত; পদ্ম; মহাপদ্ম; কুলীর; কর্কট; শঙ্খ
(পুরাণানুসারে নাগকুলের মধ্যে এই আট নাগই শ্রেষ্ঠ ও বিচিত্র।)

অষ্টনায়িকা : মঙ্গলা; বিজয়া; ভদ্রা; জয়ন্তী; অপরাজিতা; নন্দিনী; নারসিংহী; কৌমারী
(এই আটজন নায়িকাশ্রেষ্ঠ। তাদের গুণাবলি অতুলনীয় এবং তারা মনোহর। কিন্তু তারা ছাড়া অষ্টনায়িকা দিয়ে রসশাস্ত্রে কোনো এক নায়িকার আট রূপকেও বোঝায়। যেমন : অভিসারিকা; বাসকসজ্জা; উৎকণ্ঠিতা; বিপ্রলব্ধা; খণ্ডিতা; কলহান্তরিতা; স্বাধীনভর্তৃকা; প্রোষিতভর্তৃকা।)

অষ্টসিদ্ধি : অণিমা; লঘিমা; গরিমা; প্রাপ্তি; প্রকাম্য; মহিমা; ঈশিত্ব; বশিত্ব

অষ্টদিগগজ : ঐরাবত; পুণ্ডরীক; বামন; কুমুদ; অঞ্জন; পুষ্পদন্ত; সার্বভৌম; সুপ্রতীক

অষ্টধর্ম : সত্য; শৌচ; অহিংসা; অনুসূয়া; ক্ষমা; অনৃশংস্য; অকার্পণ্য; অস্পৃহা
(এখানে ধর্ম বলতে মানবধর্মকে বোঝানো হয়েছে। মানবধর্মের এই আটটি গুণ অর্জন করলে বা অষ্টধর্ম সমন্বিত না হলে মানুষ মানুষ পদবাচ্য হয় না, দেবত্বও না।)

নয়

নবগ্রহ : সূর্য; চন্দ্র; মঙ্গল; বুধ; বৃহস্পতি; শুক্র; শনি; রাহু; কেতু
(এই গ্রহের নামকরণ পৌরাণিক সূত্রে হলেও আধুনিক যুগে এই নামগুলো খানিকটা বদলিয়ে হয় মাত্র।)

নবরত্ন : ধন্বন্তরি; ক্ষপণক; অমরসিংহ; শঙ্কু; বেতালভট্ট; ঘটকর্পর; কালিদাস; বরাহমিহির; বররুচি (সম্রাট বিক্রমাদিত্যের রাজসভার এই নয়জন মহাপণ্ডিতকে নবরত্ন বলা হতো।)
আবুল ফজল; রহিম খান; বীরবল; তানসেন; আজিওদ্দি; মানসিংহ; দো পিয়াজা; বার বেগ; টোডর মল
(সম্রাট আকবরের রাজসভায় এই নয়জনকে নবরত্ন বলা হতো।)
পুরাণবিশারদ গদাধর তর্কালঙ্কার; সাধুরঞ্জন কালিদাস-কন্দর্প; জ্যোতিষী অনুকূল বাচস্পতি; আয়ুর্বেদাচার্য গোবিন্দরাম; পণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার; কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি; হরিহর তর্কসিদ্ধান্ত; ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর; গোপাল ভাঁড় বিদূষক (এই নয়জনকে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের নবরত্ন বলা হয়।)

নবরস : আদি বা শৃঙ্গার; হাস্য; করুণ; রৌদ্র; বীর; ভয়ানক; বীভৎস্য; অদ্ভুত; শান্ত
(রসশাস্ত্র অনুসারে এই নয় প্রকার রস সঞ্চিত থাকে।)

নবগুণ : আচার; বিনয়; বিদ্যা; প্রতিষ্ঠা; তীর্থদর্শন; নিষ্ঠা; আবৃত্তি; তপ; দান
(মানবজীবনে এই নবগুণ অর্জন করা জরুরি। প্রাচীনকালে মানুষ এই নবগুণে গুণান্বিত হয়ে চেষ্টা করতো।)

নবশায়ক বা নবশাক বা নবশাখ : তাঁতি; মালাকার; সদ্‌গোপ; তৈলী (তেলি); মোদক (ময়রা); বারুই; কুম্ভকার; কর্মকার; নাপিত

(পৃথিবীসহ গ্রহজগতীদের এই নবশ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছিল প্রাচীন সমাজে। সে অনুসারে গুণের নামের শব্দগুলি হয়েছে।)

অন্যান্য

একাদশরুদ্র : অজ; একপাদ; অহিব্রধ্ন; পিনাকী; অপরাজিত; ত্র্যম্বক; মহেশ্বর; বৃষাকপি; শম্ভু; হর; ঈশ্বর
(রুদ্র অর্থ শিব। শিবের আরো নাম আছে। তবে তিনি একাদশ তনু বা দেহ ধারণ করেছিলেন বলে তাঁকে একাদশরুদ্রও বলা হয়। প্রতিটি রুদ্রের পৃথক নাম আর এটাই হলো একাদশরুদ্র।)

দ্বাদশরাশি : মেষ; বৃষ; মিথুন; কর্কট; সিংহ; কন্যা; তুলা; বৃশ্চিক; ধনু; মকর; কুম্ভ; মীন
(জ্যোতিষ শাস্ত্রে নক্ষত্রপুঞ্জস্বরূপ এই রাশিগুলি কথা বলা হয়। জাগবিশ্বাসীগণ রাশিতে আস্থা স্থাপন করেন।)

চতুর্দশমনু : স্বায়ম্ভু; স্বারোচিষ; উত্তম; তামস; রৈবত; চাক্ষুষ; বৈবস্বত; সাবর্ণি; দক্ষসাবর্ণি; ব্রহ্মসাবর্ণি; ধর্মসাবর্ণি; রুদ্রসাবর্ণি; দেবসাবর্ণি; ইন্দ্রসাবর্ণি

(মনু হলেন সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার পুত্র। ব্রহ্মা এই চতুর্দশ মনু সৃষ্টির আগে চতুর্দশলোক, ব্রহ্মলোকের উপরে অবস্থিত চতুর্দশ স্বর্গের সৃষ্টি করেন। মনুরা এসব স্বর্গের শাসক ছিলেন।)

সোলকলা : প্রীতি; তরিতা; তরিণী; তুষ্টি; পুষ্টি; রতি; ধৃতি; শশী; চন্দ্রিকা; কান্তি; জ্যোৎস্না; শ্রী; প্রীতি; অঙ্গদা
(চাঁদের ষোলটি কলাকে ষোলকলা বলে। একেক কলা অর্থ রূপ। ষোলটি রূপে চাঁদ পরিপূর্ণ হয়।)

আটাশ নক্ষত্র : অশ্বিনী (অশ্বযুক্ত); ভরণী (অপভরণ); কৃত্তিকা (অগ্নিদেবতা); রোহিণী; মৃগশিরা; আর্দ্রা; পুনর্বসু; পুষ্যা; অশ্লেষা; মঘা; পূর্বফাল্গুনী; উত্তরফাল্গুনী; হস্তা; চিত্রা; স্বাতী; বিশাখা; অনুরাধা; জ্যেষ্ঠা; মূলা; পূর্বাষাঢ়া; উত্তরাষাঢ়া (প্রবণা); শ্রবিষ্ঠা (ধনিষ্ঠা); শতভিষা; পূর্বভাদ্রপদ; উত্তরভাদ্রপদ (অহিবুধ্ন); রেবতী (অন্ত্য)
(মনে করা হয় চন্দ্রের পরিক্রমণে এই অষ্টাশ নক্ষত্র মহাকাশে বিরাজিত।)

2020/5/15 21:30

Special Thanks to Partho Kumer Nonda Who created the file.....
and also thanks the group and group members of BCS All Books PDF 2020.....
#stay home, save life.....

Scanned with CamScanner